দশ দিগন্ত

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

দশ দিগন্ত

[দশটি সম্পূর্ণ উপন্যাস]

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

boiRboi.net

মৌসুমী প্রকাশনী ।। কলকাতা-৯

প্রকাশকের বক্তব্য

'দশ দিগন্ত' সিরিজের চতুর্থ 'ডেসিলজি উপন্যাস' স্বনামধন্য কথাসাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত দশটি উপন্যাস নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। ইদানিং ছাপা, কাগজ, বিজ্ঞাপন, বাঁধাই—সবকিছুর মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার ফলে বইয়ের দাম 'অসম্ভব কম' রাখা সম্ভব হচ্ছে না। তবুও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—এই দুর্মূল্যের বাজারে অন্ততঃ দেড়শো টাকা দামের বই মাত্র পঞ্চাশ টাকায় সাহিত্যপিপাসু-ক্রেতাদের হাতে তুলে দিতে পারিলে ক্রেতা-প্রকাশক সম্পর্ককে আরও দৃঢ়তর করা সম্ভব হবে।

'দশ দিগন্ত' সিরিজের আগামী প্রকাশনাগুলির কাজও চলছে একটু ঢিমে তালে। গ্রাহক ও ক্রেতাদের সানুগ্রহে এই তাল গতিশীল হোক, প্রার্থনা করি। বিনীত—

দেবকুমার বসু

১লা মাঘ—১৩৯৪

boiRboi.net

সূচীপত্র

বৃষ্টির ঘ্রাণ	…	…	৯
ফেরিঘাট	…	…	১৫১
ফেরা	…	…	২২৩
বাসস্টপে কেউ নেই	…	…	৩২৩
নয়নশ্যামা	…	…	৩৯১
ভুল সত্য	…	…	৫২১
জীবন পাত্র	…	…	৫৮৭
সুখের আড়াল	…	…	৬৫৫
শূন্যের উদ্যান	…	…	৭৩৭
রক্তের বিষ	…	…	৮২৫

boiRboi.net

বৃষ্টির ঘ্রাণ

boiRboi.net

www.boiRboi.net

॥ সোমসুন্দর ॥

দীর্ঘ, শীর্ণ, কালো মানুষটা নৌকোর ওপর বসে আছে। হাতে জুৎমতো ধরা গাঁজার কল্কে। চোখের দৃষ্টি একটু উদাস। রুক্ষ লম্বা চুল ওড়ে হাওয়ায়। পাশে রাখা লম্বা লাঠিগাছ। তীব্রগতিতে উড়ে যাচ্ছে ছিপ নৌকা। বোঠে মেরে ঘেমে যাচ্ছে বিশ জোয়ান। বিশগাছ লাঠি নিরীহের মতো পড়ে আছে নৌকোর খোলে—শীতকালের সাপের মতো নির্জীব। আগে পেছনে আরো কয়েকখানা ছিপ। উড়ছে। দক্ষিণপুর আর বেশি দূর নয়। বেলাও শেষ হয়ে এল। সিংপাড়ার কাছে নদী বাঁক নিয়েছে। বাঁকের মুখে প্রকাণ্ড পুরোনো অশ্বত্থ। সেই বুড়ো গাছের তলা ক্ষয় করেছে নদী, গভীর মাটির নীচেকার শিকড় অজগরের পরিবারের মতো দেখায়। বুড়ো গাছটার কোমরের জোর গেছে, এখন ঝুঁকে নদীতে নিজের ছায়া দেখে। সেই অশ্বত্থের পিছনে অস্ত যাচ্ছে সুর্য। রাঙা আলো ঢেলে দিচ্ছে। ওই আলো সরে গেলে দক্ষিণপুর গাঁয়ে ঠিক ওইরকম আলো জ্বলে উঠবে। কিংবা ওর চেয়ে কিছু বেশি। আগুনের শিখা লাফ দিয়ে উঠে আকাশ চাটবে। একখানা ঘরও থাকবে না দাঁড়িয়ে। তখন ওই দীর্ঘ শীর্ণ কালো মানুষটি আর তার একশ জোয়ান লাঠি হাতে পাহারা দেবে সেই আগুন, যেন কেউ এক ঘটি জলও ঢালতে না পারে আগুনে। দক্ষিণপুর আর বেশি দূরে নয়। সূর্যও নিভে এল। মানুষটি উদাস চোখে সামনে তাকিয়ে আছে। কপ্ কপ্ বোঠের শব্দ। নিঃশব্দে মানুষটি গাঁজা টানে। ছিপ নৌকোগুলো উড়ে যাচ্ছে। মানুষটা স্বপ্ন দেখছে। আগুনের স্বপ্ন।

হয়তো বা দৃশ্যটা সত্য নয়। হয়তো বা সত্য। আমি কল্পনায় দৃশ্যটা মাঝে মাঝে দেখি। ঐ দীর্ঘ মানুষটি আমার ঠাকুর্দা কুমুদবন্ধু রায়। আমি যখন খুব ছোটো, তিনি তখন খুব বুড়ো। সেই বয়সেও তাঁর শরীরে একবিন্দু মেদসঞ্চার হয়নি। শ্বাস নিলে পাঁজরের মোটা হাড় ফুলে উঠত, তার ওপর দিয়ে কেঁচোর মতো শিরা উপশিরা। মল্লের মতো কাপড় পরতেন। খালি গা, হাতে গাঁজার কল্কে। দুটি কোটরগত চোখে প্রেতের মতো চেয়ে থাকতেন। যখন হাঁটতেন মনে হত মানুষটা রণপায়ে চলেছে। মাঠ ঘাট পার হতেন কোনাকুনি। রাস্তাঘাটের তোয়াক্কা না রেখে। কেউটে গোখরোরা সমঝে চলত। পারতপক্ষে তাঁর রাস্তায় শরীর বাড়াতো না। শেষ যৌবনে গাঁজায় নেশা হত না বলে আফিং ধরেছিলেন। ডেলা ডেলা খেতেন। ঐ মানুষকে কামড়ালে রক্ষে আছে!

বুড়ো বয়সে লোকটা কিংবদন্তীর মানুষ। তখন বাঙালীর হাতের লাঠি খসে পড়েছে প্রায়। তবু শৌখীন লেঠেলরা আসত শিখতে। পাখসাট মেরে উঠোনে তারা কসরৎ করত। দাদু তাঁর প্রেতচোখে উদাস চেয়ে দেখতেন।

জাতে ছিলেন কুলীন কায়স্থ। কিন্তু বৃত্তি বর্ণানুসারে গ্রহণ করেন নি বলে তাঁকে অনেকেই ব্রাত্যদোষে দুষ্ট মনে করত। তিনি জমিদারের তাঁবে লেঠেলদের সর্দারী করতেন। হুড় দিয়ে গিয়ে পড়তেন গাঁ গ্রামে। পূর্ববঙ্গে ডাকাবুকো, সাহসী, কুশলী নমঃশূদ্ররাই তাঁর প্রিয় সঙ্গী ছিল।

কুলগুরুর বংশের শেষ সন্তান পুলিনবিহারী দেবশর্মণঃ। তাঁর অবস্থা ভাল ছিল। জমি, পুকুর, বাগান ছিল বিস্তর। আমার ঠাকুর্দার বাবা তাঁর পুকুরে মাঝরাতে গোপনে জাল ফেলেছিলেন বলে পুলিনবিহারী তাঁকে সকলের সামনে খড়মপেটা করেন। দাদু তখন ভরা জোয়ান। নীরবে দৃশ্যটা দেখে প্রেতচোখে চেয়ে কেবল বলেছিলেন—তোমার মুখে পেচ্ছাপ করব।

তাই করেছিলেন। পুলিনবিহারী পাশের গাঁয়ে তাগাদা সেরে ফিরছিলেন। সঙ্গে একজন লাঠিধারী পাইক। পাইকের হাতে হ্যারিকেন। পুবের মাঠে দাদু ওঁৎ পেতে বসেছিলেন, হাতে রাম দা। সেটা হ্যারিকেনের আলোতে ঝলকাতেই পাইক হ্যারিকেন ফেলে দৌড় দিল। পুলিনবিহারীকে কাটলেন দাদু। সকালে সবাই এসে দেখল পুবের মাঠে এক কবন্ধ মূর্তি হাঁটু মুড়ে বসে আছে, দুই হাঁটুর মাঝখানে তখনো ধোঁয়াচ্ছে হ্যারিকেনটা। একটু দূরে মাথাটা পড়ে আছে। হাঁ করা মুখে তখনো এককোষ পেচ্ছাপ। গড়িয়ে পড়ছে কষ বেয়ে।

আমার ঠাকুর্দার গায়ে কুলগুরুর রক্তের ছিটে এসেছিল। বুড়ো বয়সে তিনি গায়ের জ্বালার কথা বলতেন, 'গা বড় জ্বলে। গা জ্বলে যায়।' কে জানে, গায়ের এই জ্বালার জন্যই লাঠি সড়কি ধরেছিলেন কিনা!

আমার বাবা কদমসুন্দর রায়ের শরীরে অল্পবয়সেই মেদসঞ্চার হয়েছিল। লাঠি সড়কি জীবনে ধরেন নি। মামাবাড়িতে থেকে পড়াশুনো করতেন। পড়াশুনোয় ভালই ছিলেন। বাপের ব্রাত্যদোষ স্খালনের জন্য তিনি প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করে উপবীত ধারণ করেন। তিনি ঠাকুর্দাকে বোঝাতেন, বর্ণহিন্দুদের প্রত্যেকেরই উপবীত ধারণ অবশ্য কর্তব্য।

দাদু সবই শুনতেন, তবু উদাসভাবে চেয়ে থাকতেন।

আমরা তিন ভাই। সকলেরই পৈতে হয়েছিল।

ঠাকুর্দার উপার্জন মন্দ ছিল না। নিষ্কর জমিও ছিল বিস্তর। কিন্তু সঞ্চয়ী ছিলেন না বলে আমার বাবা কদমসুন্দর ঠাকুর্দার কিছুরই উত্তরাধিকার পেলেন না। তাঁকে পোস্ট অফিসের চাকরি নিয়ে বিদেশে চলে যেতে হল। ঠাকুর্দার মৃত্যু হলে আমরাও বাবার কাছে চলে গেলাম। ফরিদপুরের সেই গ্রামের কথা এখন আর আমার কিছুই মনে নেই।

ঠাকুর্দার পাপ পাছে আমাদের ওপর বর্তায় সেই ভয়ে আমার বাবা সব সময়েই ধর্মপথে আছেন। বাড়িতে পুজো আর্চা লেগে থাকে। বাবা অবসর সময়ে শাস্ত্রপাঠ করেন। যদিও আমাদের অবস্থা ভাল নয়, তবু আমাদের বাসা থেকে ভিখিরি ফেরে না। আমার দুই দাদার একজন একটা কারখানার হাইস্কিল্‌ড্‌ অপারেটর, অন্যজন কেরানী।

আমি সোমসুন্দর রায়। ডাকনাম নেন্টু। আমার দুই দাদাই ভাল ছেলে,

নিরীহ। তাদের শরীরের গড়ন বাবার মতোই মেদবহুল। আমি লেখাপড়ায় তেমন কিছু পারিনি। বছর চারেক আগে আমি বি-এ পাস করি। তারপর থেকে বসে আছি। খেলাধুলোয় একসময়ে আমার খানিকটা নাম ছিল। আমার প্রিয় ছিল বক্‌সিং। এস ও পি সি-তে আমি বেশ কিছুকাল শিখি। কিন্তু ব্যাপারটা আমার বাবার মনঃপূত ছিল না। স্কুল কলেজে আমি বিস্তর ঘুষোঘুষি করেছি। জাতীয় চাম্পিয়ানশিপে আমার যাওয়ার কথা ছিল, বাবা যেতে দেন নি।

খেলাধুলো আমি ছেড়ে দিয়েছি। আমাদের বাসা দোতলায়। সামনের দিকে একটা বারান্দা আছে। এটা একসময়ে ছিল আমার জিম্‌নাসিয়াম। যন্ত্রপাতি এখন আর কিছুই নেই। সবই পাড়ার ক্লাবে দিয়ে দিয়েছি। এখন বারান্দায় কেবল ঘুঁষি মারবার থলিটা ঝুলে থাকে। ওটা আমি দিইনি। ঘুঁষি মারবার জন্য নয়, আমার অন্য কাজে লাগে।

আমার চেহারাটা বাবা এবং দাদাদের তুলনায় একটু খাপছাড়া। লম্বা, শীর্ণ, কালো। যে কেউ আমার ঠাকুর্দাকে দেখেছে সে আমাকে দেখলেই চমকে উঠতে পারে। ঠাকুর্দা হাঁটলে দূর থেকে মনে হত, রণপায়ে মানুষ চলেছে। আমি অতটা লম্বা নই। কিন্তু আমার গড়ন হুবহু আমার ঠাকুর্দার মতো। সেইরকম নিঃশব্দ পায়ে আমি হাঁটতে পারি। আমার চোখ কোটরগত না হলেও একটু গর্তে ঢোকানো। অনেকেই বলে আমার চোখে ক্রূরতা আছে।

এ সবই বাইরের মিল। এগুলো কিছু না। কিন্তু আমার সঙ্গে ঠাকুর্দার অন্য একটি গভীর মিল আছে। সেটাই সবচেয়ে মারাত্মক। ঠাকুর্দা বুড়োবয়সে তাঁর গায়ের জ্বালার কথা বলতেন। সেই জ্বালা কেমন তা আমি জানি না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আমার নিজেরও এক জ্বালা আছে। সেটা শরীরে, সেটা মনেও। এই জ্বালাই হিংস্রতা কিনা তা আমি জানি না। কাউকে আমি এ জ্বালার কথা বলিনি কখনো। কিন্তু আমার নিরন্তর ছটফটানি, চঞ্চলতা, এগুলো গোপন করা যায় না। খেলা হিসেবে বক্‌সিং আমার কতটা প্রিয় ছিল কে জানে। কিন্তু যখন বালির বস্তায় নাগাড়ে ঘণ্টা দুই ঘুঁসি মারতাম তখন তার ভিতর দিয়ে আমার এই অস্বস্তির একটা উপশম হত। আমি প্রতিপক্ষকে খুবই হিংস্রভাবে আক্রমণ করতাম। তার কারণও ওই। কিন্তু এমনিতে কারো বিরুদ্ধেই আমি কোনো আক্রোশ বোধ করি না। রিংয়ের বাইরে আমি কদাচিৎ কাউকে মেরেছি।

এখন ঘুঁযোঘুঁষি ছেড়ে দেওয়ার পর আমি যখন সেই জ্বালা টের পাই তখন আপনা থেকেই আমি দাঁতে দাঁতে শূন্যতাকে চিবিয়ে ফেলতে থাকি। হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আসে। শরীর রি-রি করে, চোখ আধবোজা হয়ে আসে। তখন ফাঁকা বারান্দায় এসে আমি প্রকাণ্ড ভারী বালির বস্তাটা খুব জোরে দুলিয়ে দিই। দুলতে দুলতে বস্তাটার ঝুল বাড়ে, বাড়ে আঘাত করার শক্তি। তখন আমি বস্তাটার ঝুলপথে দাঁড়াই। প্রচণ্ড সেই বস্তা এসে আমার মুখে লাগে, আমি মাটিতে ছিটকে পড়ি, আবার উঠি। বস্তাটা তার প্রচণ্ডতা নিয়ে ফিরে আসে। বুকে লাগে, পড়ি। আবার উঠি। এইভাবে আমার ঠোঁটে, মুখের এখানে ওখানে ফুলে ওঠে, রক্তবর্ণ হয়ে যায় মুখ। কিন্তু তার ফলে আস্তে আস্তে আমার অস্বস্তি কমে যায়। শরীর

সহজ হয়ে আসে, মন স্থিরতা ফিরে পায়।

আমার আর একটি প্রিয় খেলা হচ্ছে দাবা। খুব বেশি অভিনিবেশ দরকার হয় বলে এই খেলায় আমি নিজেকে ভুলে থাকতে পারি।

নিজেকে ভুলে থাকা। কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল। নিজেকে ভুলে থাকবার কী-ই বা দরকার আমার? কিন্তু কথাটা সত্যি। আমি মনে মনে জানি, নিজেকে ভুলে থাকা আমার একটু দরকার।

যদিও আমি এমনিতে নিরীহ, শান্ত, তবু আমার মাঝে মাঝে কেন যেন মনে হয়, আমি লোকটা বিপজ্জনক।

॥ মঞ্জু ॥

আমি মঞ্জু।

এখন আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটা একটা পোস্ট অফিস। বুকচাপা ভীড়। রাসবিহারী পোস্ট অফিসে মাসের প্রথম দিকটায় এরকমই ভীড় হয়। মনিঅর্ডারের লাইনটা বেড়ে বেড়ে, ঘুরে ফিরে বাইরে চলে গেছে। ভীড় রেজিস্ট্রেশনে, স্ট্যাম্পে, ভীড় সব জায়গায়। এই ভীড়ে কিছু ভাবা যায় না। লেখা যায় না। অথচ অদ্রিকে আমার চিঠিটা লেখা খুব দরকার। আধঘণ্টা ধরে চিঠি লেখার হেলানো বোর্ডের সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি, সামনে খোলা ইনল্যান্ড। ইনল্যাণ্ডের পাশে আমার ভ্যানিটি ব্যাগ আর রোদ-চশমা। আমার পিছনেই স্ট্যাম্প কাউণ্টার। আমার গা ঘেঁষে লোক আসছে যাচ্ছে। আমি কিছু লিখতে পারছি না, আমার কিছু মনে পড়ছে না।

অদ্রিকে চিঠি লেখা এত শক্ত ছিল না মোটেই। ওর সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে আরো চার বছর আগে থেকেই। তখন ও শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র।

ইতিহাসটা একটু আগে থেকে বলি। এক সময়ে আমরা খুব গরিব ছিলাম। আমার বাবা ছিলেন রেলের ডি-টি-এস অফিসের সামান্য কেরানী। কিন্তু চিরদিন কারো সমান যায় না। বাবা অনেক চেষ্টায় কেরানী থেকে মালবাবু হলেন। উত্তর বাংলার একটা ছোট্ট স্টেশনে তাঁর পোস্টিং হল। স্টেশন ছোটো কিন্তু কমলালেবু, চা, কাঠ এইসব বুকিং-এর জন্য স্টেশনটির নাম ছিল। সেখানে যাওয়ার পর থেকে আমরা ভাল থাকতে লাগলাম। ভাল খাই, ভাল পরি। বাবার মুখটা তখন থেকেই ভারী ভারী হয়ে এল। মাকে দেখাত হাসিখুশি।

পাঁচ বছর পর বাবা চাকরি ছেড়ে দিলেন। বাবার নামে ওয়ারেণ্ট নিয়ে পুলিশও এল। কিন্তু বাবা ছাড়া পেলেন। আমরা বুঝতে পারলাম না বাবা কী এমন

ঘুষ খেয়েছেন যাতে এত গোলমাল হল। ঘুষ সবাই খায়। আমরা বাচ্চারাও তা জানতাম। চাকরি ছেড়ে বাবা আমাদের কলকাতায় নিয়ে এলেন। কলকাতার বাড়িতে পা দিতেই বুঝতে পারলাম চাকরি ছেড়ে দেওয়া ছাড়া বাবার আর কিছুই করার ছিল না। কারণ আমাদের বাড়িটা বাবা করেছেন বালিগঞ্জে, বিরাট বাড়ি। তার ঘরে ঘরে ফ্যান ঘুরছে, স্টিকলাইট জ্বলছে। সোফা কোচ, ইংলিশ খাট—ঠিক সিনেমায় দেখা বড়লোকের বাড়ির মতো সব কাণ্ডকারখানা। বাবা সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে বললেন—এই হচ্ছে তোমাদের বাড়ি। সেই থেকে আমরা নিজেদের বড়লোক বলে জানি। বাবা অবশ্য বসে থাকলেন না। আরো বড়লোক হওয়ার জন্য ব্যবসা শুরু করলেন। এখন সেইসব ব্যবসাই চালু। লোহার কারখানা, অর্ডার সাপ্লাই, কনস্ট্রাকশন।

আমরা তিন বোন। আমি ছোটো। কলকাতায় আসার পরই এক বছরের মধ্যে আমার বড় দুই বোনের বিয়ে হয়ে যায়। আমি তখন দশ-বারো বছরের। মা-বাবার কোল-পোঁছা মেয়ে। খুব আদরের। যখন যা চেয়েছি পেয়েছি। আমার স্বভাব তাই একটু একগুঁয়ে, জেদী।

আমাদের পাশের বাড়িতে ফ্ল্যাটে ভাড়াটে এল অদ্রিরা। না, প্রথমে অদ্রি নয়। অদ্রি তখন তার মামার বাড়ি বোম্বেতে। অদ্রির মা-বাবা আর দুই বোন এল ফ্ল্যাটটায়। একটা বোন আমারই বয়সী। ওরা দুই বোন জানালা খুলে প্রায়ই আমাদের বাড়ির দিকে চেয়ে থাকত। ওদের অবস্থা খুব খারাপ ছিল না, কিন্তু আমাদের তুলনায় কিছু না। তাই ওরা আমাদের বাড়ির রেডিওগ্রাম, ফ্রিজিডেয়ার, আসবাব এইসব লোভীর মতো দেখত। দেখত আমি রোজ আলাদা শাড়ি পরি। চোখাচোখি হতে হতে ভাব। আমি ওদের বাসায় যাই, ওরা আমাদের বাড়িতে আসে।

তখন ওরা মাঝে মাঝে ওদের দাদা অদ্রির গল্প আমাকে বলত। অ্যালবাম খুলে দেখাত দাদার ছবি। আমি দেখতাম, খুব জোরালো চেহারার একটি সুন্দর ছেলে। ঠোঁটে আর চোখে একটু নিষ্ঠুরতা। কিন্তু তা সত্ত্বেও খুব আকর্ষণ করে। ওদের ঘরে একটা আলমারী বোঝাই করা কাপ, মেডেল, নানারকম প্রাইজ। এ সবই অদ্রি পেয়েছে খেলাধুলোয়। সত্যি বলতে কি অদ্রিকে না দেখেই মনে মনে তখন থেকে আমি তাকে চাইতে শুরু করি। সে বোম্বেতে গেছে আই-এস-সি পরীক্ষার পর দীর্ঘ ছুটিতে। যাওয়ার আগে অবশ্য ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়ে গেছে। বুঝতাম, অদ্রি হচ্ছে ওদের পরিবারের একমাত্র রঙের টেক্কা। বাবা দীর্ঘকাল অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেলের অফিসে কেরানী থেকে বুড়ো বয়সে এস এ এস পরীক্ষা দিয়ে অফিসার হয়েছেন। আয় যেমন ব্যয় তেমনি। অদ্রিই ওদের পরিবারের ভবিষ্যৎ দেখবে। এটাই ওদের বিশ্বাস।

অদ্রির যেদিন বম্বে থেকে ফেরার কথা সেদিন সকালে ইচ্ছে করেই আমি শোয়ার ঘরের পর্দা সরাইনি। খাটে বসে বই পড়েছি সারা সকাল। আমি যে খুব সুন্দর তা আমি জানি। অদ্রিকে আমি এমনভাবে দেখা দেবো যাতে প্রথম পলকেই ওর পলক স্থির হয়ে যায়।

boiRboi.net

অবশ্য অতটা হয়নি। অদ্রি সেই কম বয়সেও সুন্দর মেয়ে কিছু কম দেখেনি। অদ্রির আসার দিন রাণু আর সুনু আমার খোঁজখবর নিলই না। সারাদিন তারা তাদের দাদাকে নিয়ে ব্যস্ত। মাংসের গন্ধে ভুরভুর করছিল বাতাস। চীৎকার করে হাসি, ঠাট্টা—এইসব শব্দ পাচ্ছিলাম ঘরে বসে।

সারাদিন আমি অপেক্ষা করলাম। রাণু আর সুনু আমার খোঁজ করল না। পরদিন রাণু পর্দা সরিয়ে জানালা দিয়ে দু-একটা কথা বলল, বাসায় এল না, আমাকেও ডাকল না। মনে মনে বুঝতে পারছিলাম, ওরা ওদের মূল্যবান দাদাকে সবরকম আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা করে চলতে চায়।

কিন্তু অদ্রি আমাকে দেখেছিল ঠিকই। পাশাপাশি বাড়ি হলে ঠিকই দেখা হয়ে যায়। সত্যিকারের অদ্রি ফটোর চেয়েও সুন্দর। টকটক করছে ফর্সা রঙ। তার ওপর সে ছিল খুব চালাক চতুর, ব্যবহারে তার কোনো সঙ্কোচ লজ্জা ছিল না।

তিনচার দিন পর সে রাণুর সঙ্গে আমাদের বাসায় এল। হাতে একটা টেনিস বল, সেটা ক্রমান্বয়ে মাটিতে ফেলে লুফছে। চোখে সরল কৌতূহল। আমার মুখোমুখি হতেই বলল—আমাদের বাসায় আসেন না কেন? আমি আছি বলে?

ওইটুকু ছেলের পক্ষে খুবই পাকা কথা। তবু আমার ভালই লেগেছিল। কিন্তু রাণুর মুখের চেহারা ভাল না। কাঠ কাঠ হাসছে, যেন অদ্রির প্রস্তাবটা তার পছন্দ নয়।

রাণুর ঐ মুখভারটুকু আমি গায়ে মাখিনি। যা আমি চেয়েছি, বরাবর তা পেয়ে আসছি। তাই আমি ওদের বাসায় গেলাম। দশ বারো দিন মেলামেশার পরই অদ্রি আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল এবং খেতে লাগল। রোজ। মাসখানেক পর গেল হোস্টেলে এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। সপ্তাহে দুটো চিঠি দিত। দু সপ্তাহে একদিন আসত।

ব্যাপারটা এরকমই সহজ এবং রোম্যান্টিক। দুই পরিবারে ব্যাপারটা জানাজানিও হয়ে গেল যথা সময়ে। কোনো ঝামেলা হল না। অদ্রির বাবা আর আমার বাবা একদিন এক বৈঠকেই দুজনের বিয়ে ঠিক করলেন। অদ্রি পাশ করল, এবং সঙ্গে সঙ্গে চাকরি পেয়ে চলে গেল দুর্গাপুর। চার বছর আগে রাণুর বিয়ে হয়ে গেছে, সুনুরটা বাকি। ছেলে দেখা হচ্ছে, পছন্দমতো পেলেই বিয়ে হয়ে যাবে। সুনুর বিয়েটা হয়ে গেলেই আমাকে বিয়ে করে দুর্গাপুরে নিয়ে যাবে অদ্রি।

নিশ্চিন্ত এবং সুন্দর জীবন আমার। কোনোখানে কোনো গোলমাল নেই। সব যেন খাবারের মতো টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখা, আমি একটা একটা করে তুলে নিচ্ছি, খেয়ে যাচ্ছি।

এখন এই সকাল দশটায় রাসবিহারী পোস্ট অফিসে দাঁড়িয়ে অদ্রিকে চিঠি লেখা যে কী শক্ত! বার বার রুমাল তুলে মুখে চেপে চেপে ঘাম মুছতে হচ্ছে। এবছর একটুও বৃষ্টি হয়নি। পত্রিকায় রোজ খরার কথা থাকে। কলকাতায় কলেরা লেগেছে খুব। এত গরম আমারও সহ্য হয় না। অদ্রিকে চিঠিটা লিখেছি মাত্র তিন লাইন। লিখেই ভারী অবাক হয়ে দেখছি—এই তিন লাইনের যা কথা তা আমি অদ্রিকে আরো বহুবার লিখেছি।

গত সাত আট বছর ধরে অদ্রিকে আমি সপ্তাহে দুটো চিঠি দিই। হিসেব করলে প্রায় সাত আটশো চিঠি দাঁড়ায়। অত চিঠিতে অদ্রিকে আমি ইনল্যাণ্ড আর খামে কেবল ভালবাসার কথা লিখেছি, কখনো অভিমানের কথা, শরীরের যত্ন নেওয়ার কথা। নিঃসঙ্গতার কথা, কলকাতার কথা, মা বাবার কথা, সুনু-রাণুর কথা। ঘুরেফিরে একই কথা। আর কেবল ভালবাসা, চুমু, গভীর ভালবাসা, নিবিড় চুম্বন।

সপ্তাহে অদ্রিরও দুটো করে চিঠি পাই। সেই একই রকম। এখন ব্যাপারটা এমনই নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে যে মা বাবাও অদ্রির চিঠি আমার হাতে এনে দেন। আমি আর লজ্জা পাই না। কখনো মা জিজ্ঞেস করেন—কী লিখেছে? শরীর-টরীর ভালো তো? আমি একটুও লজ্জা না পেয়ে বলি—ভালই। ষাঁড়ের মতো মোটা হচ্ছে। রবিবারে এসেছিলো—দ্যাখোনি? মা বলে—ষাট ষাট। নজর দিস কেন? আমি লজ্জা পাই না। কেবল মুখটা ফিরিয়ে নিই।

গত সপ্তাহেও অদ্রি এসেছিল তার গাড়ির ডেলিভারি নিতে। ক্রীমরঙা নতুন মার্ক টু। ওর নতুন গাড়িতে আমি খানিকটা বেড়ালাম। দিনকাল খারাপ বলে দূরে কোথাও যাওয়া গেল না। গড়ের মাঠের চারপাশে চক্কর দিয়ে গাড়ি রেখে ঘাসে বসলাম। অদ্রি আরো মোটা হয়েছে। একটু ভুঁড়ি হয়েছে, সুন্দর সব বাহারী জামা প্যাণ্ট পরে আজকাল। সুন্দর দেখায়। আমাদের মধ্যে অনেক কথা হল। কথা বলতে বলতে এক সময় আমি থেমে গেলাম। মনে হল আমার বুকে একটা গোপন টেপ রেকর্ডার আছে। সেই যন্ত্র থেকে কথাটা উঠে আসছে—যে সব কথা অদ্রিকে আমি মাসখানেক আগেও বলেছি। তখন অদ্রির দিকে চুপ করে চেয়ে রইলাম। অদ্রি জিজ্ঞেস করল—কী হল? কথা বলছ না যে! চমকে উঠলাম, এ প্রশ্ন ও আগেও কতবার করেছে। আমি হাসলাম, কথা বললাম। দুটি টেপ রেকর্ডার ঘাসের ওপর বসে ঘুরে ঘুরে কথার ফিতে শেষ করে গেল।

গাড়িতে উঠেছি, অদ্রি গাড়ি ছেড়ে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে খুব নতুন একটা কথা বলল—গাছপালাগুলো দেখেছো! কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে সব!

বললাম—হুঁ।

—এ বছরটা একদম বৃষ্টি নেই, খুব খরা!

—হুঁ।

—চাষবাসের যে কি হবে এবছর। দুর্গাপুরের ওদিকটাও—

আমি হেসে বললাম—গাড়ির রঙটা সত্যিই সুন্দর হয়েছে। সামনের বছর এই রঙটাই থাকবে তো?

অদ্রি খুশি হয়ে বলল—তুমি বললেই থাকবে। আমি কি নিজের পছন্দে রঙ করবো? তোমার যা পছন্দ—

—এ রঙটাই ভালো।

এই রকমই সব কথাবার্তা আমাদের। কথার কিছু ঠিক থাকে না। বড় জংশন স্টেশনে ঢুকবার সময়ে গাড়ি যেমন এক লাইন থেকে ক্রমান্বয়ে আর এক লাইনে সরে

boiRboi.net

সরে যায়। তবু আমাদের কথাগুলো কেবলই ঘুরপাক খায়। একই কথা ফিরে ফিরে আসে।

শীগগিরই আমার আর অদ্রির বিয়ে হয়ে যাবে। আর কী লেখার আছে অদ্রিকে? কী লিখবো? আরো ভালবাসার কথা? আরো চুমু?

চিঠিটা শেষ করা সত্যিই এমন কিছু নয়। সব আমার মুখস্ত আছে। লিখে গেলেই হল। কিন্তু কেন যেন ইচ্ছে করছে না। তিন লাইন লিখে আটকে আছে চিঠিটা। খোলা কলমের মুখে শুকিয়ে যাচ্ছে কালি। আমার কিছু মনে পড়ছে না। কিছু ভাবতে পারছি না। এ বছর একদম বৃষ্টি নেই। খুব গরম। পোস্ট অফিসের ভিতরটা ভেপে আছে। গায়ে গায়ে ভীড়। এই ভীড়ের মধ্যে কিছু লেখা যায়? এই গরমে? হেলানো বোর্ডটার ওপাশে একজন মাঝবয়সী লোক মনি-অর্ডার ফর্ম ফিল-আপ করতে করতে আড়চোখে আমাকে দেখছে। কখনো মুখ নিচু করে দেখার চেষ্টা করছে চিঠিটাও। ইচ্ছে হচ্ছে, লোকটার হাতে চিঠিটা তুলে দিয়ে বলি,—পড়ুন।

বিরক্তিকর। লোকটা চিঠিটা দেখছে বলে নয়। লোকটা দেখছে, আমি তিন লাইন লিখে আটকে গেছি, আর লিখতে পারছি না। খুব অন্যমনস্কভাবে আমি একবার চোখ তুলে চারদিকের ভীড় দেখছি, কখনো চিন্তান্বিতভাবে চেয়ে দেখছি চিঠিটার দিকে। বুকের ভিতরে চলছে টেপ-রেকর্ডার। কথাগুলো উঠে আসছে। লিখতে ইচ্ছে করছে না। লিখতে চাইছি না।

ঠিক এই সময়ে ভীড়ের ভিতর থেকে কে যেন চেঁচিয়ে বলল—মিলেছে! মিলেছে! সই মিলেছে।

চমকে উঠলাম। তাকিয়ে দেখি এক ভীড় লোক সেভিংস অ্যাকাউন্টের কাউন্টারের দিকে তাকাচ্ছে।

ছেলেটা কালো, হিলহিলে লম্বা চেহারা, একটু গর্তে ঢোকা চোখ, পরনে ভাঁজহীন প্যাণ্ট আর আধ-ময়লা হাওয়াই শার্ট। মুখখানা দেখার মতো নিষ্ঠুর। নাকটা কেমন যেন ভাঙা, বাঁকা, মুখে কিছু কাটা ছেঁড়ার দাগ। ছেলেটা হাত উঁচু করে উইথড্রয়াল ফর্ম জনসাধারণকে দেখাচ্ছে। মুখে সরল হাসি।

ভীড় থেকে গলা বাড়িয়ে কে একজন জিজ্ঞেস করল—কী মিলেছে দাদা?

ছেলেটা সরল মুখে বলল—সই। গত চারদিন চেষ্টা করছি। প্রায় কুড়িটা ফর্ম নষ্ট করে এইমাত্র মিলল। বুঝলেন মশাইরা, আমি টাকাটা পাচ্ছি—

খরার গরমে বিরক্তিকর দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষেরা এই প্রথম একটু হাসল।

আমি হাসলাম না। ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে থাকলাম। ছেলেটিকে আমি কোথাও দেখেছি।

টাকা পেয়ে ছেলেটা আবার হাতের টাকা উঁচু করে জনসাধারণকে দেখিয়ে বলল—পেয়েছি! টাকা পেয়েছি!

একজন বলল—বাক আপ।

—দাদা একটা ভোজ দিন আমাদের।

boiRboi.net

উইথড্রয়াল ফর্মে সই মেলানো যে কী শক্ত তা আমি জানি। কিন্তু এরকম চেচাঁমেচি করার কী আছে! পাগল। কিন্তু ওকে আমি কোথায় দেখেছি!

ভাবতে ভাবতে আমি আবার চিঠিটার দিকে তাকাই। অদ্রিকে আমি কী লিখব? ওপাশে মনিঅর্ডার ফর্ম ফিল-আপ বন্ধ রেখে মাঝবয়সী লোকটা ঘাড় ঘুরিয়ে মজা দেখছে। মজা দেখা হয়ে গেলে আবার আমাকে দেখবে। চিঠিটা পড়ার চেষ্টা করবে।

তার চেয়ে এইভাবেই চিঠিটা শেষ না করে ডাকে ফেলে দিলে কেমন হয়? ইতি-টিতি কিছু লিখব না, নাম লিখব না। অদ্রি চিঠি পেয়ে নিশ্চয়ই ভীষণ অবাক হবে, দুশ্চিন্তা করবে, ভাববে, নিশ্চয়ই চিঠিটা এই পর্যন্ত লেখার পর কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে। হয় আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, নয়তো আমি মারা গেছি। ভাবতে ভাবতে অদ্রি চলেও আসতে পারে।

লম্বা কালো ছেলেটা ভীড় ঠেলে বেরিয়ে যাচ্ছে; অনেকেই দেখছে ওকে। ভাবছে, পাগল নয় তো! পাগল বড় বেড়ে গেছে আজকাল। আমিও ছেলেটাকে ভ্রূ কুঁচকে দেখলাম। কোথায়, কবে দেখা হয়েছিল আমাদের?

ছেলেটা বেরিয়ে গেলে আমি সত্যিই চিঠিটা বন্ধ করলাম। ডাকবাক্সে ফেলে বেরিয়ে এলাম বাইরে। চারপাশে চেয়ে দেখলাম, কোথাও সেই কালো লম্বা ছেলেটিকে দেখা যাচ্ছে কিনা। না নেই।

ফুটপাথে পা দিতেই একঝলক খরার রোদ এসে গায়ে পড়ে। সমস্ত শরীর চিড়বিড়িয়ে ওঠে। রোদ-চশমা পরে আকাশ দেখলে মেঘলা লাগে। কিন্তু আমি জানি আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই। বহুদিন ধরেই নেই। এমন অদ্ভুত আবহাওয়া আমি বহুকাল ধরে দেখিনি। একেই কি আকাশ বলে? খবরের কাগজে এই নিয়ে খুব লেখালেখি হচ্ছে আজকাল, অদ্রিও বলছিল। কিন্তু কলকাতায় নিজের চারদিকে তাকালে আকালের কোনো চিহ্ন দেখি না।

একটু অন্যমনস্কভাবে হেঁটেছিলাম। অদ্রিকে লেখা অসমাপ্ত চিঠি, কিংবা পোস্ট অফিসের সেই কালো লম্বা ছেলেটা কিংবা এবারকার গরম—এরকম কিছু একটা ভাবছিলাম। লক্ষ্য করিনি কিছু দূরে একটা চায়ের দোকানের সামনে গাছতলায় বসে থাকা কয়েকটা অল্পবয়সী ছেলে আমাকে দেখছে। এরকম কত ছেলে বসে আছে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায়—কে অত লক্ষ্য করে? আমিও করিনি। কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ দেখি, আমার যাওয়ার রাস্তা জুড়ে দুটো ছেলে মারামারি করছে। সত্যিকারের মারামারি নয়, ওদের ঠোঁটে সিগারেট, মুখে হাসি। আমার রাস্তা আটকানোই উদ্দেশ্য। এ ওর দিকে লাথি ছুঁড়ে গালাগাল দিচ্ছে। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। গাছতলায় বসে থাকা ছেলেদের একজন চেঁচিয়ে বলল—এই হাবু, রাস্তা ছেড়ে দে। দেখছিস না দাঁড়িয়ে আছে—

অমনি দুজন দুদিকে সরে দাঁড়ালো। তাদের একজন দেখতে ভারী সুন্দর। পরনে দামী জামাকাপড়, চোখে চশমা। সে আমার দিকে সোজা তাকিয়ে একটু হেসে বলল—এই যে রাস্তা। কিছু মনে করবেন না। ঐ শিবুটা একনম্বরের হারামী।

আমি জায়গাটা তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যাই। শুনি, পিছনে, শিবু বলছে—এই

boiRboi.net

শুয়োরের বাচ্চা হাবু, মেয়েটার সামনে আমাকে হারামী বললি কেন? সিগারেট দে তাহলে।

গাছতলায় হাসির শব্দ হয়। হাবু উত্তরে বলে—আর শুয়োরের বাচ্চা বললে চা খাওয়াতে হয়—তা জানিস?

খুব অসভ্যতা না করলে একটু আধটু ইয়ার্কী আমার খারাপ লাগে না। কিন্তু আজ একদম ভাল লাগল না। কী জানি কেন। হয়তো এই ভয়ঙ্কর গ্রীষ্মের জন্য, হয়তো অদ্রিকে লিখতে না পারা চিঠিটার জন্য।

ডানদিকে একটা রাস্তা চলে গেছে সোজা সাদার্ন অ্যাভিনিউ পর্যন্ত। মোড়টা পেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ খেয়াল হল, এই রাস্তায় মণিকা থাকে। মণিকার বাসায় অনেককাল যাওয়া হয়নি। বাড়ি ছাড়া আমার কোথাও যাওয়ার নেই, কোনো কাজ নেই-হাতে। অদ্রিকে চিঠি লেখা হয়ে গেছে। আমি তাই ডানদিকে মোড় ফিরলাম।

দোতলায় উঠে কড়া নাড়তেই মণিকা এসে দরজা খুলল। মুখে জ্যাবজ্যাবে ঘাম, চোখ দুটো ফোলা ফোলা। মুখ ভার, আঁচল লুটোচ্ছে, চুলে জট।

চমকে উঠে বললাম—কী রে?

ও হাসল—কতদিন পর এলি!

—তুই যেন কত যাস!

—বাঃ, আমার পরীক্ষা না!

—সত্যিই তো। তোর এবার এম-এ পরীক্ষা, খেয়ালই ছিল না।

ও বলল—আয়। সারাদিন ঘরে বসে বসে মাজা ব্যথা হয়ে গেল। এসে ভাল করেছিস। বাইরের কোনো খবরই পাই না।

বিছানাভর্তি বই আর খাতা ছড়ানো, চাদর কুঁচকে, বালিশ দুমড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে।

বললাম—খুব পড়ছিস!

—ধুস্। কিছু মনে থাকে না। দশবার পড়ছি, দশবার ভুলে যাচ্ছি। লাইব্রেরি থেকে গাদা গাদা নোট করে এনেছিলাম—সেগুলো নিয়ে আরো ঝামেলা।

বিছানাটা একটু টেনে টুনে দিল মণিকা।

—বোস। পাখাটা বাড়িয়ে দিই। এবার যা গরম পড়েছে!

আমি মণিকার সঙ্গেই বি-এ পর্যন্ত পড়েছিলাম। পাস করলাম টেনেটুনে কিন্তু আর পড়তে ইচ্ছে করল না। কী হবে পড়ে? আমার জীবন এতই ছকবাঁধা যে খামোখা ডিগ্রি বাড়িয়ে লাভ নেই। তাছাড়া অনার্স ছিল না, পাসকোর্সেও নম্বর খারাপ, এম-এ'তে ভর্তি হতে ঝামেলা হত। মণিকা অনার্সে হাই সেকেণ্ড ক্লাস পেয়েছিল, এম-এ'তেও ভালই করবে মনে হয়। ওর ছড়ানো বইখাতা থেকে একটা পুরোনো চেনা গন্ধ আসছিল। কাগজের গন্ধ।

বললাম—তুই ফার্স্ট ক্লাস পাবি।

—হ্যাঁ, আমাকে ফার্স্টক্লাস দেওয়ার জন্য সব ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে আছে। কিন্তু পাস আমাকে করতেই হবে। বাবা এ বছর রিটায়ার করছে। জানিস তো, দাদা আলাদা হয়ে গেছে।

boiRboi.net

—ওমা ! কেন ?

—সে অনেক কথা, বাদ দে । তুই কোথায় বেরিয়েছিলি ?

—অদ্রিকে একটা চিঠি লেখার ছিল । পোস্টঅফিসে গিয়েছিলাম ।

ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল । অদ্রির নাম উল্লেখে অনেক মেয়েরই এরকম হয় । আমার একটুও হিংসে হয় না ।

—কী লিখলি ?

আমি ঠোঁট উল্টে বললাম—লেখা হলই না । তিন লাইন লিখে ফেলে দিয়ে এলাম । পরীক্ষার আগে মানুষ মোটা হয় জানতাম না । তুই কিন্তু হয়েছিস ।

মণিকা নিজের হাতখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল, তারপর মুখ তুলে বলল—ভাবী হেডমিস্ট্রেসের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে ।

—চল্, বেরো । ঘরে বসে বসে মুটিয়ে যাচ্ছিস ।

—কোথায় যাবি ?

—দোকানে । শাড়ি কিনবো ।

ও হাসল—তার মানে তোর মেজাজ ঠিক নেই । বরাবর দেখছি, মেজাজ বিগড়োলে তুই শাড়ি কিনিস ।

লজ্জা পেয়ে বলি—মেজাজটা ঠিক নেই ঠিকই । চিঠিটাই কী সব আবোল তাবোল লিখলাম, রাস্তায় কতকগুলো ছেলে পেছনে লাগল—

—লাগতেই পারে । আমাদেরই ইচ্ছে করে ।

—চল্ না বাবা ।

ও পোশাক পরে এল । রাস্তায় পা দিয়েই বলল—এ বছর একটুও বৃষ্টি নেই দেখছিস্ !

রোদ-চশমা চোখে দেওয়ার আগে আমি মুখ তুলে আকাশ দেখলাম । পিঙ্গল আকাশ । ধুলোয় আকাশের নীল ঢেকে গেছে । আমি রোদ-চশমাটা পরে নিলাম । অমনি মেঘের ছায়ার মতো চারদিক স্নিগ্ধ হয়ে গেল ।

—বৃষ্টি না হলে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে । এ বছরই বাবা রিটায়ার করছেন—

এসব কথা আমার ভাল লাগে না । গড়িয়াহাটার বিরাট দোকানটায় ঢুকে হাজারটা শাড়ির ভিতরে ডুবে না গেলে আর নিস্তার নেই ।

ও ফের বলে—তোর জীবনটা কী সুন্দর । বিয়ে ঠিক হয়ে আছে—অদ্রির মতো সুন্দর ছেলে—তার ওপর এঞ্জিনিয়ার—আর আমি ! আমি তো বিয়ের কথা ভাবতেই পারি না । এম-এ পাস করেই চাকরি খুঁজবো হন্যে হয়ে—

আমি ঠোঁট ওলটাই—ও সবাই বলে । আবার ঠিক বিয়ে হয়েও যায় ।

মণিকা ম্লান হাসে—না রে । দাদা বৌদি আলাদা হয়ে গেল—এখন সংসারের খরচ অনেক । একা বাবা কী করে সামলাবে ? টুকুনটার জন্য যা কষ্ট হয় । যাওয়ার সময় গড়িয়ে কেঁদেছে । ঐটুকু ছেলে, ও তো সংসারের ন্যায় অন্যায় বোঝে না । দু মাস হয়ে গেল, একদিনও দাদা বৌদি আসেনি, টুকুনকে আমরা দুমাস দেখি না ।

মাণিকার চোখ ছল্‌ছল্ করছিল । হাতের রুমালে চোখ মুছে নিল । চোখ মুছেই আবার হাসল—তোদের বিয়ে কবে ?

—জানি না। ঠিক নেই।

—ঠিক তো হয়েই আছে বাবা।

—তা আছে। বলে শ্বাস ছাড়ি। তারপর বলি—তবু আসলে কিছু ঠিক নেই। কী হতে কী হয়ে যায়!

বাতাসে রহস্যের গন্ধ পেয়ে মণিকা টুকুনের দুঃখ ভুলে গেল। মুখ উঁচু করে বলে—তার মানে?

—অদ্রির সঙ্গে যে বিয়ে হবেই তা কে বলবে! অন্য কোথাও তো হতে পারে।

—কী করে হবে! অদ্রি তোর কিছু বাকি রেখেছে!

ব্যাগটা তুলে ওকে তাড়া করি। ও মাথা নিচু করে হাসে।

গাড়িয়াহাটার প্রকাণ্ড দোকানটায় ঢুকতেই রঙের জগতে হারিয়ে যেতে থাকি। একটার পর একটা শাড়ি দেখি। মনটা আস্তে আস্তে ভাল হয়ে ওঠে।

॥ সোমসুন্দর ॥

টাকাটা দেওয়ার সময় বড়দার মুখখানা ভারী অপ্রতিভ হয়ে গেল, দেখলাম। বলল—টাকা কোথায় পেলি? আমাকে দিচ্ছিস কেন?

—একটা ব্যাঙ্ক লুট করেছি।

বড়দা হাসে—যা দিনকাল পড়েছে, তোরা আর চাকরি পাবি না! ওই সবই করতে হবে। টাকা নিয়ে আমি কী করব?

—তোর লাগে না টাকা? নে, ধার হিসেবে নে। পরে শোধ দিস।

—বরং বাবার হাতে দে।

—টাকাটা আমার। আমি যাকে খুশি দেবো।

বড়দা একটু ভেবে হাত বাড়াল, খুবই সঙ্কোচের সঙ্গে।

—এখানে কত আছে?

—দেড়শো।

—তোকে নন্দু দিয়েছিল একটা স্যুট করাতে—সেই টাকাটা, না? স্যুটটা তো করালি না।

—স্যুট পরলে আমাকে ভাল দেখায় না।

—আর কত রইল তোর?

—পাঁচশো দিয়েছিল, আরো কিছু আছে। মাঝে মধ্যে তুলেছি তো।

—টাকাটা ভেঙে ফেললি, স্যুটটা আর হবে না।

বলে বড়দা ক্ষণকাল বাইরের দিকে চেয়ে রইল। নন্দু অর্থাৎ নন্দরানীর কথা এখনো সংসারে মাঝে মধ্যে নানা কথার মধ্যে এসে পড়ে। সে ছিল আমাদের একমাত্র বোন। বছর চারেক আগে বাচ্চা হতে গিয়ে মারা গেছে। তার কথা উঠলে আমরা স্বাভাবিকভাবেই একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। আমার আর বড়দার মধ্যে নন্দরানী হঠাৎ একটুক্ষণের জন্য একটা শূন্যতার বলয় তৈরি করল। বড়দার হাতে ধরা

boiRboi.net

নন্দরানীর দেওয়া টাকা। বড়দা বাইরের দিকে চেয়ে আছে। দোতলার জানালা দিয়ে কলকাতার বৃষ্টিহীন পিঙ্গল আকাশ অনেকটা দেখা যায়।

জামাটা জবজবে হয়ে ভিজেছে। সেটা খুলে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখছি, এমন সময়ে বড়দা মুখ ঘুরিয়ে বলল—নেনটু, সব পরিবারেই একটা পারিবারিক বৃত্তি থাকা ভাল। পেট-ভাতের যেন অভাব না হয়। ভারতবর্ষের ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনটা শূন্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। একদিন হুড়মুড় করে সবটা ভেঙে পড়বে।

—হুঁ।

বড়দা আকাশ দেখতে দেখতে অন্যমনে আবার বলে—কথাটা কিছুতেই কাউকে বোঝানো যাচ্ছে না। অথচ ওই দ্যাখ···

—কী?

—আকাশ দ্যাখ। মেঘের নামগন্ধ নেই। এ মাসটা এরকম চললে মাটি জ্বলে যাবে। চাষা ভিক্ষে করতে আসবে শহরে। সামনের বছর ট্র্যানজিস্টার রেডিও কিংবা রেফ্রিজারেটারের দাম কমতেও পারে। কিন্তু চালের দাম কমবে না। ইণ্ডাস্ট্রি দিয়ে কী হয় তবে? ভারতবর্ষের ইকনমি কৃষির ওপর দাঁড়িয়ে আছে—হা-ভাত জো-ভাত করে মরছে মানুষ—আর বাজার ছেয়ে যাচ্ছে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল গুড্‌সে। বলদকে দুয়ে কি দুধ পাওয়া যায়? গত তিন চার মাস আমি গ্রামে গ্রামে কম ঘুরিনি।

—খামোখা ঘুরেছিস। আর ঘুরিস না। গ্রামের লোকেরা এখন বাইরের অচেনা লোক পছন্দ করে না।

বড়দা শ্বাস ফেলে বলল—ঠিকই। ওরা এখন সবকিছুকে সন্দেহ করে। সব চেয়ে বেশি সন্দেহ করে পলিটিক্সের কথা। ওদের নিয়ে অনেক এক্সপেরিমেণ্ট হয়েছে। কিছু হয়নি।

—তাতে তোর কি?

বড়দা হাসে—কিছু না। আমি গ্রামে ঘুরেছি কমিউন তৈরী করার জন্য নয়। আমি গেছি অন্য কারণে।

—কি কারণ?

—ভাবছিলাম, গ্রামে একটু জমি-টমি নিয়ে কিছু করা যায় কিনা। যদি চাষ করা যায়। কি হাঁস মুর্গী নিয়ে পোলট্রি করা যায়, কি কয়েকটা তাঁত চালানো যায়, তাহলে হয়তো না খেয়ে মরব না। সবাই মিলে করব। আস্তে আস্তে একটা পারিবারিক বৃত্তি তৈরী হয়ে যাবে।

আমি হাসলাম—আমাদের একটা পারিবারিক বৃত্তি তো আছে।

—কী?

—দাদু যা করত।

বড়দা হাসে—দাদুর যা ছিল তা আমাদের মধ্যে কার আছে। থাকলে কি এত ভয় পেতাম! সেই চোখ, সেই শরীর, আর সাহস—ওগুলোও তো মানুষের অ্যাসেট। যার আছে সে আমার মতো একটা ধাক্কায় বসে যায় না।

—তুই কি বসে গেছিস? ভাবছিস কেন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

boiRboi.net

বড়দা মাথা নাড়ে—নেনটু, আমার সাহস নেই। দাদুর কিছুই আমি পাইনি। পেলে কি আমরা চাকরি ছেড়ে ঘরে বসে থাকি?

—তোর চাকরি তো যায়নি। ইউনিয়নের লোকেরা হয়তো একদিন তাদের ভুল বুঝতে পারবে।

—পারবে, কিন্তু ততদিনে হয়ত একশ বছর আর চারটে জেনারেশন পার হয়ে যাবে। অতদিন অপেক্ষা করতে বলিস?

কে যে ওর মাথায় কৃষির ব্যাপারটা ঢুকিয়েছে কে জানে! পারিবারিক বৃত্তি, কৃষি, পোলট্রি এইসব নিয়ে ও সারাদিন ভাবে। ভাবে ভারতবর্ষের অর্থনীতির বৈষম্যের কথা, ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে মাথা ঘামিয়ে ঘামিয়ে ওর টাক পড়ে গিয়েছিল একসময়ে। এখন আর শহরে ট্রেড ইউনিয়ন ওর পছন্দ নয়।

আমাদের বাসাটা দক্ষিণ কলকাতায় হলেও, পুরোনো। বাবার মাসতুতো ভাই—আমাদের গিরীশ কাকা উনিশশো ত্রিশ সাল থেকে এই তিন ঘরের দুই বারান্দাওলা ফ্ল্যাটটায় পঁয়তাল্লিশ টাকার ভাড়াটে ছিলেন। বাবা রিটায়ার করে কলকাতায় এলেন যখন, তখন গিরীশ কাকা পুঁটিয়ারীতে নিজস্ব বাড়ি তুলে ফেলেছেন। বাবাকে বললেন—তোমার যে চালচুলো কবে হবে কে জানে! যতদিন না হয় এ বাড়িটা দখল করে থাকো। আমি থাকতে থাকতেই ঢুকে পড়ো। আমার নামেই ভাড়া জমা দিও। বাড়িওয়ালা মামলা করে করুক, মামলা চলতে চলতে তোমার একখানা বাড়ি উঠে যাবে। আমরা এইভাবে এ বাড়িতে ঢুকলাম। বাড়িওয়ালা বিস্তর শাসিয়ে মামলা তুলল। মামলা এখনো চলছে। মাকালতলায় আমাদের জমিতে বাড়িটার ভিত গাঁথা হয়ে গেছে। বাড়িটা উঠেও যেত বর্ষার আগেই। কিন্তু বড়দা হঠাৎ বসে যাওয়ায় বাড়ির কাজ বন্ধ হয়ে গেল। যা বলছিলাম—এই বাড়িটার কথা। দোতালায় এই তিন ঘরের ফ্ল্যাট যদিও মন্দ না। তবু এর দেয়াল, দরজা আর ফাঁক ফোকর দিয়ে এ ঘরের কথা হাওয়ায় ভেসে অন্য ঘরে যায়। গত কয়েক রাত ধরে শুনি, পাশের ঘরে মাঝরাতে বড়দা আর বড় বৌদির ঝগড়া হয় খুব। কাল রাতেও হচ্ছিল। বড়দা ছিল হাইস্কিলড্ অপারেটর, ওভারটাইম নিয়ে মাসে হাজার টাকার মতো রোজগার। তার প্রায় সবটাই ঢেলে দিত সংসারে। এক পয়সাও জমায়নি। হঠাৎ রোজগার একদম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সম্পর্কগুলো ওলটপালট হয়ে যাচ্ছিল। কিছুদিন আগেও বড়দা রাত জেগে বৌদিকে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের কুফলের কথা বোঝাতো। আমি ঘুম ভেঙে শুনতাম, বড়দা বক্তৃতা দিচ্ছে—ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে বড় অসুবিধে হল ভারতবর্ষের বাজার। আমরা তৈরী করি রুম এয়ার কন্ডিশনার। এ জিনিসের চাহিদা আছে, কোম্পানীও আছে অনেক। চাহিদা মতো যোগান দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যেহেতু দেশটা উন্নত নয়, সেই হেতু এটা ঘরে ঘরে লোকে কিনবে না। কিনবে কিছু বড়লোক, অফিস, কারখানা, সিনেমা হল। দশ বিশ বছর পরে বাজার যাবে স্যাচুরেটেড হয়ে, চাহিদা কমে যাবে। অর্থনীতির নিয়ম অনুসারেই তখন মালিক হয় প্রোডাকশন কমাবে, নয়তো বন্ধ করবে। তখন ছাঁটাই হবে শ্রমিক, হবে লক্-আউট, বেকারে ভরে যাবে দেশ। ভারতবর্ষে হাজারটা ইন্ডাস্ট্রির ওপর ঐ খাঁড়া ঝুলছে। ফলে ইউনিয়ন শ্রমিককে ডেকে বলছে—কাজ কম করো, প্রোডাকশন কমাও,

বাজার যাতে স্যাচুরেটেড হয়ে না যায়, এটা তোমারই স্বার্থে। কিন্তু এটা হল নেতিবাচক পন্থা। এখন বলো তো রাণু ইতিবাচক পন্থাটা কি?

বৌদি শিশুর মতো জিজ্ঞেস করত—কি গো?

বড়দা তৃপ্ত গলায় বলত—কৃষি, গ্রাম। গ্রাম মূষে তৈরী হচ্ছে শহর। শহরে জড়ো হচ্ছে যাবতীয় মূলধন। তৈরী হচ্ছে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মার্কেট। শহর ছাড়া ইণ্ডাস্ট্রির বাজার নেই। অথচ যার চোখ খোলা আছে সেই দেখতে পায়, ভারতবর্ষের সমস্ত ইকনমিটা দাঁড়িয়ে আছে কৃষির ওপর, এর মেরুদণ্ড হচ্ছে গ্রাম। তবু আমাদের গ্রামগুলিতে কিছুই নেই। কৃষিপণ্য চলে আসে শহরের বাজার ধরতে, কামার কুমোর বৃত্তি ঘুচিয়ে ছোটে শহরে, কারখানায়। শহর থেকে গ্রামে কী যায়? কিছু আয়না চিরুনী, টর্চবাতি, বড়জোর কিছু জামাকাপড়। অর্থাৎ গ্রামে ইণ্ডাস্ট্রির কোনো বাজার নেই। বাজার তৈরী হয়নি, কারণ এখানে হয়নি কৃষি বিপ্লব, কুটিরশিল্প মেরে ফেলা হয়েছে। পেটে ভাত না থাকলে হাতপাখার কথাই ভাবা যায় না তো এয়ারকণ্ডিশনার।

ভয় পেয়ে বৌদি জিজ্ঞেস করেছে—তা তুমি কি করতে চাও?

বড়দা বিষণ্ণ গলায় বলছে—আমি পার্টি মিটিঙে এইসব বলতে চেয়েছিলাম। ওরা মনে করল, আমি উগ্রপন্থী। ওদের ধারণা হল, আমি হয়তো স্ট্রাইক বানচাল করব। মালিকের সঙ্গে হাত মেলাব। ওরা স্পষ্টই বলল, কৃষি ফ্রন্টের জন্য ভাববার লোক আছে। আমি যেন ওসব নিয়ে মাথা না ঘামাই। আমি তবু বললাম, পার্টির সব ক্ষমতা নিয়ে আগে কৃষি বিপ্লব করে নেওয়া দরকার। তাতে বাজার বড় হবে, শহরে ও গ্রামে আসবে অর্থনৈতিক সমতা। দেশের প্রয়োজনমতো ইণ্ডাস্ট্রি তৈরী হচ্ছে না, হচ্ছে বিদেশের অনুকরণ—গ্রামীন ভারতবর্ষকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কৃত্রিম অর্থনীতির দিকে। এইসব কথা শুনে ওরা আমাকে প্রথমে ওয়ার্নিং দিল। কিন্তু আমি আমার কথা বলতে লাগলাম। ইউনিয়নের কিছু লোক আমার দলে এল। সেই হল সর্বনাশ।

বৌদি তখন খুব দুঃখের সঙ্গে বলল—ওরা তোমাকে খুব মেরেছিল। মাগো! ভাল কথা বললেও লোকে আজকাল উল্টো বোঝে।

বড়দা হাসে—ওরা আমাকে কারখানার ছায়া মাড়াতে দেবে না আর। না দিক। আমি হাইস্কিল্ড্ অপারেটর, ইচ্ছে করলেই চাকরি পেয়ে যাবো। কিন্তু রাণু, আমি আর ইণ্ডাস্ট্রিতে থাকছি না। আমি চলে যাবো গ্রামে। তাই আমি ঘুরে ঘুরে গ্রামগুলো দেখছি।

বৌদি তখন আর কথা বলে না।

আমাদের বাসাটার এই হচ্ছে দোষ। এ ঘরের কথা ওঘরে শোনা যায়। শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। ওরা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকত। আবার কখনো এক রাতে শুনতাম বৌদি বলছে—তার চেয়ে দাদাকে চিঠি লিখি। দুর্গাপুরে তোমার একটা চাকরি হয়ে যাবে।

বড়দা রেগে গিয়ে বলত—তোমাকে এতদিন বোঝালাম কী? চাকরি করলে

boiboi.net

তোমার ইঞ্জিনিয়ার দাদার লেজ ধরতে হবে কেন ? আমাকে চাকরি দেওয়ার লোক আছে।

বৌদি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকত, তারপর একসময়ে হঠাৎ ফোঁপানির শব্দ পেতাম। বৌদি বলত—তোমার চার বছর বিয়ে হয়েছে। দুটো ছেলেমেয়ে—কোন্ আক্কেলে তুমি পলিটিক্স করতে যাও ? আমি তোমার সঙ্গে গ্রামে জঙ্গলে যেতে পারব না, আমি বাপের বাড়ি যাবো ! তুমি যেখানে খুশি যাও।

এইভাবে সম্পর্ক ওলট-পালট হতে লাগল।

এক ঘরে দুটি চৌকিতে ছোড়দা আর আমি শুই। রাতে খাওয়ার পর ছোড়দা চৌকিতে বসে সিগারেট শেষ করে বোধ হয় কিছুক্ষণ মালার কথা ভাবে। তারপর নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আমার ঘুম বরাবর পাতলা। একটু শব্দেই জেগে যাই। রোজ রাতে পাশের ঘরের কথাবার্তা শুনে ঘুম ভেঙে গেলে আমি অন্ধকারে শুয়ে সম্পর্ক বদলের নাটকটি শুনি। শুনতে পাই, বৌদি আর বড়দার ভিতরে টাকা নিয়ে কথা উঠেছে। আগে টাকার কথা থাকত না, আদর্শের কথা থাকত।

গতকাল রাত্রে বৌদি বলছিল—তুমি কতদূর ছোটলোক হয়ে গেছ জানো না ? পশু না হলে কেউ ওটুকু বাচ্চাকে বেবী ফুডের বদলে শটী কিংবা বার্লি খাওয়াতে বলে ? ওর শরীরে আছে কী দেখ, তো। আগে আপেল সেদ্ধ খেত, ভিটামিন ড্রপস খেত—এখন কি খায় ?

বড়দা উত্তর দিতে পারছিল না। বিড় বিড় করে কী বলল।

বৌদি ঝেঁঝে উঠল—দেশের হাজার হাজার বাচ্চা কী খাচ্ছে তা দেখে আমার কী হবে ! আমি আমার বাচ্চা বুঝি। ও সব বোলো না—যাদের মুরোদ নেই তারা বলে।

আমি শুয়ে শুয়ে ভাবি। বড়দার দুই ছেলেমেয়ে। বাবা রিটায়ার করেছেন দশ বারো বছর। ছোড়দা শীগ্‌গিরই মালাকে বিয়ে করবে—চলে যাবে আলাদা বাসায়। নন্দরানীর দেওয়া পাঁচশো টাকার মধ্যে আর মাত্র শ' দুই অবশিষ্ট আছে—স্যুটটা হবে না।

বরাবর বড়দা একটু খোলামেলা সরল মানুষ। নাদুস নুদুস চেহারা—অল্প পরিশ্রমে হাঁপিয়ে যায়। যে রাতে ও মার খেয়ে এল সেই রাতে ওর অসহায় মুখখানা আমার বরাবর মনে থাকবে। সমস্ত মুখটা ফেটে কেটে একাকার, মাথার চুল রক্তে জড়িয়ে আছে। রক্তবর্ণ দুটো ঠোঁট ঝুলে পড়েছে। স্লিংএ বাঁধা হাত। খুব মার খেয়েছে, পালাতে পারেনি। দুই চোখে আতঙ্ক, দিশেহারা ভাব।

কাল সারারাত খুব ছটফট করেছি ঘুমের মধ্যেও। আজ টাকাটা তুলে আনলাম। আর পঞ্চাশ টাকা রইল।

বড়দা আজকাল খরার পিঙ্গল আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকতে ভালবাসে।

বেরোতে যাচ্ছি, সিঁড়ির মুখে বৌদি এসে ধরল।

—শোনো, দাদাকে টাকা দিলে ?

নীরবে হাসলাম।

—আমি দেখেছি। কিন্তু কাজটা ভাল করোনি নেন্টু।

boiRboi.net

—কেন ?

—এ সময়ে ওর হাতে টাকাটা পড়া ঠিক হয়নি। ওর চোখমুখের ভাব ভাল না। ও নেশা করবে।

—কি করে বুঝলে ?

—আগে একটু-আধটু করত। তোমরা টের পাওনি, কিন্তু আমার কাছে তো লুকোনো চলে না।

উল্‌টে তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞেস করলাম—লুকোনো চলে না কেন ?

বৌদি হাসল—তুমি বড় পাজী নেন্‌টু।

—আমরা সবাই পাজী। জানো না এটা ডাকাতের বাড়ি! আমরা ডাকাতের বংশ!

—এখন জানি। আগে জানতাম না।

—জানলে কী করতে ?

বৌদি হাসল—সত্যিকারের ডাকাত জানলে খুশি হয়ে বিয়ে করতাম। কিন্তু তোমার দাদা তো তা নয়।

—তুমি খুশি হয়ে করোনি ?

বৌদি ভ্রূ কোঁচকায়—বাব্বাঃ, অত জেরার উত্তর দিতে পারি না আমি।

—দাদার নেশার কথা কি বলছিলে ?

—বলছিলাম আগে খেত। ইদানীং পলিটিকসের নেশা ছিল, তাই খেত না। কিন্তু এখন নিষ্কর্মা, কিছু করতে পারছে না, মাথায় অদ্ভুত সব চিন্তা। এখন ওর নেশা করা দরকার।

—চিন্তা করতে দাও কেন ?

—কি করব ?

—খুব আদর করতে পারো না—আদরে আদরে ডুবিয়ে দিও। চিন্তা করার ফাঁক পাবে না।

বৌদি হাসে—খুব আদরের স্বপ্ন দেখছো যে।

তারপর একটু শ্বাস ফেলে বিষণ্ণ মুখে বলল—আমাদের আগের কি সে তেজ আছে! আমরা পুরোনো হয়ে গেছি।

—তবে দাদার আর একটা বিয়ে দিই।

—দিও। কিন্তু এখন তার চেয়ে জরুরী কাজ চাকরিতে তোমার দাদাকে রাজী করানো। আমি দুর্গাপুরে চিঠি দিয়েছি। দাদা হয়তো একবার আসবে। ও তোমার দাদাকে বোঝাবে, কিন্তু তার আগে তোমাদেরও উচিত ওকে একটু বোঝানো। কৃষি বিপ্লব করতে এই বুড়ো বয়সে ও সাপ জোঁক শেয়ালের রাজত্বে যেতে চাইছে—মাগো, ভাবতে পারি না।

—দাদা বুঝবে না, আমি জানি।

বৌদি অসহায়ভাবে রেলিংটা চেপে ধরে বলল—তবে কি হবে ?

—অদ্রিকে লিখে দাও, যেন না আসে। এসে লাভ নেই।

এই বলে আমি সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। অদ্রি! কেন যে অদ্রির ওপর আমার এতটা রাগ তা আমি বলতে পারব না। ওর সঙ্গে প্রথম দেখা দাদার

boiRboi.net

বিয়ের দিন। ফুটপাথের ওপর প্যান্ডেল, চেয়ারে বসে অনভ্যস্ত ধুতি পাঞ্জাবী পরে ঘামছি। সেই সময়ে ভারী সুন্দর স্বাস্থ্যের চটপটে একটি আমার বয়সী ছেলে ঘুরে ঘুরে সবাইকে কোকাকোলা আর সিগারেট দিচ্ছিল। ধুতি আর ক্রিমরঙা পাঞ্জাবীতে তাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছিল কী বলব! কিন্তু সুন্দর কিছু দেখলেই আমার মন শক্ত হয়ে ওঠে। সে আমার কাছে কোকাকোলার ট্রে আনল, আমি নিলাম না। সে টপ্ করে একটা সিগারেট আমার বুক পকেটে ঢুকিয়ে মৃদু হাসল—বাইরে গিয়ে খাবেন। আমি শান্তভাবে সিগারেটটা তাকে ফিরিয়ে দিই। ছেলেটা একটুও অপমান বোধ করল না। বলল—মাপ করবেন, ঠিক বুঝতে পারি নি। মেয়েদের ভীড়ে সে দিব্যি ঘুরে ফিরে এল। অচেনা ভদ্রলোকদেরও আপ্যায়ন করল সুন্দর বিনয়ের সঙ্গে। সবাই তাকে দেখছিল তখন। হয়তো অদ্রির অসম্ভব সৌন্দর্য আর স্মার্টনেস আমি ভুলেই যেতাম। কালক্রমে তার সঙ্গে আমার ভাব হলেও হতে পারত। কিন্তু গোলমাল করল একটি সুন্দর মেয়ে। লাল বেনারসী, উঁচু খোঁপা, খোঁপায় মালা পরা মেয়েটি বার বার ভিতর থেকে ছুটে আসছিল অদ্রির কাছে। কী একটু কথা বলে আবার দৌড়ে চলে যাচ্ছিল। আমি ভেবেছিলাম ওদের আত্মীয়া। বোন টোন কেউ হবে। খেতে বসে সেই ভুল ভাঙল! আমরা বরযাত্রী বেশি ছিলাম না। বরযাত্রীদের ব্যাচ্-এ অনেক জায়গা খালি দেখে নিমন্ত্রিতরা বসে পড়ল। উল্টো দিকে একটা টেবিলে মেয়েরা। তাঁদের মধ্যে সেই মেয়েটিও। আমার ডান পাশে কয়েকজন ছেলে। পরে জেনেছিলাম, তারা অদ্রির বন্ধু। তারা বসেই মেয়েদের আলোচনা করছিল। একজন বলল—আজ অদ্রির জিৎ। মঞ্জুকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। আমি শুনে মেয়েদের সারিতে কোন্ জন মঞ্জু তা আন্দাজ করবার চেষ্টা করছিলাম। এমন সময়ে অদ্রি মাংসের বালতি নিয়ে এক পা এক পা করে হেঁটে আসছিল। কাছে আসতেই একজন বন্ধু বলল—মঞ্জুকে ঠিকমতো দিয়েছিস অদ্রি?

—দিয়েছি।

—কখন দিলি, দেখলাম না তো!

—সব জিনিস কি সবাইয়ের সামনে দেওয়া যায়?

কথাটা অশ্লীল এবং চাপা গলায় বলা। তবু আমার কানে এল। অমনি সেই জ্বালা। সারা গায়ে শুঁয়োপোকার রোঁয়া দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল। রী-রী করছিল শরীর। শক্ত হয়ে এল হাত পা। ইচ্ছে হল উঠে ঠাস করে একটা চড় দিই। কিন্তু সামলে গেলাম। নিজেকে বললাম—সোম, তোমার কি? তোমার কি?

মাংসের বালতি নিয়ে অদ্রি এগোতে পারছিল না। বন্ধুরা ওর হাত ধরে তখনো কী সব ঠাট্টা করছে। অদ্রি তখন মুখ ফিরিয়ে সেই সুন্দর মেয়েটিকে বলল—মঞ্জু, এরা কি সব বলছে!

মেয়েটি সপ্রশ্ন চোখে একটু তাকালো। তারপর হঠাৎ কি বুঝে মাথা নামিয়ে নিল লজ্জায়। মেয়েদের সারিতে হাসির ধুম পড়ে গেল। আমি বুঝলাম—ওই সুন্দর মেয়েটি—ও অদ্রির জন্য।

দু পা এগিয়ে আমার সামনে দাঁড়াল অদ্রি। প্রকৃত ভদ্র গলায় বলল—আপনি ভীষণ ঘামছেন। পাখার তলায় বসলেন না কেন?

আমি উত্তর দিলাম না।

অদ্রি এক হাতা মাংস আমার পাতে দিতেই আমি হাত চাপা দিয়ে বললাম—আর না।

অদ্রি অবাক হল—কি, মাংস খাবেন না? মাংস ছাড়া এ বয়েসে আর খাওয়ার কি আছে?

মাংস! কথাটা বিঁধে গেল আমার কানে। ওর বন্ধুরা হাসছিল। একজন গলা বাড়িয়ে বলল—খান মশাই। মাংসই তো আসল জিনিস।

আমি বললাম—আমি মাংস বেশি খাই না।

অদ্রি ঠাট্টা করে বলল—সেই জন্যই তো রোগা।

বুঝলাম, অদ্রি আমাকে খুব বেশি লক্ষ্য করছে। ওর দেওয়া কোকাকোলা আর সিগারেট ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। সেইজন্যই কি? ও কি আমাকে আঘাত করতে চেষ্টা করছে?

আমি চোখ তুললাম। আমার ঠাকুর্দার সেই ক্রূর চোখ—যা আমি জন্মসূত্রে পেয়েছি। যে চোখ আগুনের স্বপ্ন দেখত।

শান্ত অবাক গলায় বললাম—রোগা!

চোখ বড় করে অদ্রি বলল—আপনি রোগা নন। তবে কি মোটা?

ঠাট্টা, কিন্তু কথাটা সে বেশ জোরে বলল। এত জোরে যে মেয়েদের সারি থেকে মেয়েরা আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল। সেই সুন্দর মেয়েটাও।

অমনি আবার সেই জ্বালা। শুঁয়োপোকার রোঁয়া সারা গায়ে। রী-রী করছে শরীর। রাগে অন্ধ জন্তুর মতো হয়ে যাচ্ছে আমার ভিতরটা।

আমি আর একবার শান্ত অবাক গলায় বললাম—রোগা! তারপর তার দিকে চেয়ে রইলাম স্থিরভাবে। গর্তে ঢোকা আমার ক্রূর চোখে। ব্যাপারটা খুবই দৃষ্টিকটু হচ্ছিল। কিন্তু আমার কিছুই খেয়াল ছিল না। আমি শুধু অদ্রির দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

আমার পাশে বসেছিল আমার পিসতুতো ভাই। সে আমার হাত চেপে দিয়ে বলল—নেনটু, এই নেনটু কী হচ্ছে।

আমি চোখ নামিয়ে নিলাম। চোখ নামিয়ে নেওয়ার পরই আমার ভীষণ লজ্জা করছিল। আশেপাশের লোকজন তখনো আমায় দেখছে। ঠিক তখনই অদ্রি সপ্রতিভ ভাবে আমার সামনে থেকে সরে গেল। অমনি যেন সব আড়াল খসে গেল আমার ক্রূর ফণাতোলা মুখের সামনে থেকে। মেয়েদের সারি থেকে মেয়েরা কৌতূহলে আমাকে দেখছে। চোখ না তুলেও আন্দাজ করছিলাম সেই সুন্দর মেয়েটি ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তার অদ্রির দিকে কে এমন লোক নিষ্ঠুর চোখে তাকায়?

বিদায় নেবার সময়ে আমি ইচ্ছে করেই সবার আগে বেরিয়ে আসছিলাম। কিন্তু গেটের মুখে অদ্রি দাঁড়িয়েছিল। হাতে পান আর সিগারেটের ট্রে। আমি নিঃশব্দে তাকে পেরিয়ে আসতেই সে অন্য একটি ছেলের হাতে ট্রে-টা ধরিয়ে দিয়ে রাস্তায় এসে আমাকে ধরল।

—আমাকে মাপ করবেন।

—কেন ?

অদ্রি হাসলো—আমি জানতাম না যে, ইউ হ্যাভ বিন এ রেপ্যুটেড্ বক্সার।

—তাতে কি ?

—কিছু না ? বলুন, আপনি কিছু মনে করেন নি ?

আমি শান্ত গলায় বললাম—যা হওয়ার তা হয়ে গেছে।

শুনে খুশি হল অদ্রি।

বলল—আমার দুজন জ্ঞাতি ভাই এসেছে। তারা আপনাকে চেনে, লড়াই দেখেছে। তারা বলছিল। শুনে খুব অবাক হলাম। আমি নিজে স্পোর্টসম্যান।

এই রকম অনেক কথা বলেছিল অদ্রি। আমার অত মনে নেই। কিন্তু অদ্রি বোধ হয় আজও আমার একটা কথার অর্থ বুঝতে পারেনি। ঐ যে বলেছিলাম, আমি কিছু মনে করিনি কিংবা আমি সব ভুলে যাবো। প্রকৃতপক্ষে কথাটা আমি বলেছিলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে। আমি বলতে চেয়েছিলাম—যা হওয়ার তা হয়ে গেছে; এখন আর কিছুই ফেরানো যাবে না। আমি ভুলব না। আমি শোধ নেবো।

সেই দিন রাতে সবাই ঘুমোলে আমি চুপি চুপি বাইরের বারান্দায় এসে আমার বালির বস্তাটা দুলিয়ে দিলাম। অন্ধকারে দানবের মতো বস্তুটা দুলছিল। আমি তার মুখোমুখি শরীর দিয়ে দাঁড়ালাম।

চার বছর আগে ঐ বাক্যের যা অর্থ ছিল আজ অবশ্য আর তা নেই। কথাটা এ ভাবেই বলা যায় যে, অদ্রির ওপর আমার শোধ নেওয়ার আর কিছু নেই। চার বছর আগে আমার বয়স কম ছিল, তখন অদ্রি আর আমি প্রায় সমকক্ষ। তখন শোধ নেওয়ার কথা ভাবতে ভাল লাগত! এখন অবস্থা পাল্টে গেছে। অদ্রি এঞ্জিনিয়ারিং পাস করেই চাকরি পেয়ে দুর্গাপুরে গেল। দুবছরের মধ্যেই উন্নতি করল। কয়েক সপ্তাহ আগে গাড়ি কিনে নিয়ে গেল। সেই গাড়িতে বৌদি আর তার ছেলেমেয়েকে একদিন ঘুরিয়ে দিয়ে গেল কলকাতার রাস্তায় রাস্তায়। বৌদি আর বাচ্চাদের মুখের সেই উজ্জ্বলতা আমার এখনো মনে আছে। সুন্দর ক্রীমরঙা গাড়ি। অদ্রি আরো মোটা আর সুন্দর হয়েছে। একটুক্ষণের জন্য এসে বসেছিল বারান্দায়। বালির বস্তাটা দেখিয়ে বলল—এখনো ভোলোনি ?

—কি ?

—বকসিং।

—ভুলিনি। মনেও রাখিনি। কী ভেবে বললাম, কে জানে।

—তবে ওটা কেন ?

—অভ্যাস। স্মৃতিচিহ্ন। ওটা ছাড়া আমার কিছু নেই।

অদ্রি খুব হাসল। উঠে গিয়ে খালি হাতে দুটো ঘুষি মারল বস্তাটায়। মুখ ফিরিয়ে বলল—আমি সব ভুলে গেছি। কী ভেবে বলল, কে জানে।

—কি ?

—খেলাধুলো। সেদিন ক্রিকেটে নামলাম অফিসের ম্যাচ্-এ। দশ রানের মাথায় বোলড্। বল দেখতেই পাচ্ছিলাম না। সব গেছে।

boiRboi.net

এরকমই দুচারটে কথা। তারপর অদ্রি চলে গেলে আমি কিছুক্ষণ নিজের মনের অন্ধকারে ডুবে রইলাম। রিংয়ের বাইরে আমি কদাচিৎ কাউকে মেরেছি। অদ্রি আমার রিংয়ের অনেক বাইরে চলে গেছে।

প্রতিশোধের কথাটা আর মনে রেখে লাভ নেই। ওটা এখন ছেলেমানুষী। তবু কেন যে অদ্রির ওপর আমার একটা রহস্যময় রাগ রয়ে গেছে! হাতে কাজকর্ম না থাকলে মাথায় এসব ভূত এসে বসে। বসে বসে ঠ্যাং দোলায়!

আকাশের রঙ পাঁশুটে। নীল দেখা যায় না। খুব ধুলো ওড়ে আজকাল। শুকনো দমকা হাওয়া বয়ে যায়। সেই হাওয়ায় মালার রুক্ষ চুল উড়ছে। মোড়ের মাথায় রাস্তা পার হচ্ছে মালা, হাতে স্বরবিতানের দুটো খণ্ড। এলোমেলো শাড়ি, ফোলা-ফোলা মুখ। গোলাপী রঙের বাড়িটার দোতলায় ওরা থাকে। বাড়িতে ঢুকবার মুখে একবার অলস ভঙ্গীতে ঘাড় ঘোরাতেই আমাকে দেখল।

দাঁড়াল।

আমাকে দেখে দাঁড়ানোর কথা নয় মালার। অনেকদিন আগে এক মালা ছিল যে বকসিং-এর কিছুই বুঝত না, তবু বকসিং ভালবাসত। নাকি উল্টো বললাম? বক্সারকে ভালবাসত বলে বক্সিংকেও? কে জানে! এ সব রহস্যের কোনো কিনারা হবে না। তবু একদা এক মালা ছিল যে বকসিংকে ভালবাসত, বক্সারকেও। তখনো এরকম রাস্তায় দেখা হত, কিংবা হয়তো মালা থাকত দোতলার বারান্দায়, আমি রাস্তায়। দেখা হত, যেমন কলকাতায় সচরাচর হয়। তখন ভারী সুন্দর এক বিচিত্র বব্‌ছাঁটে চুল ছাঁটত মালা, বাঁকা সিঁথি করত, কম্বিনেশন ফ্রকের নীচে দুটো মসৃণ পা জুতো মোজা পরে হেঁটে যেত। মুষ্টিযোদ্ধার মজবুত হৃৎপিণ্ডও ধক্ ধক্ করে নড়ে উঠত।

সেই মালা ঐ দাঁড়িয়ে আছে, হাতে স্বরবিতানের দুটো খণ্ড। আমার ছোড়দা রবীন্দ্র সঙ্গীত ভালবাসে। মালা দক্ষিণীতে শিখছে।

আমাকে দেখে মালার দাঁড়ানোর কথা নয়। তবু দাঁড়াল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ওকে দাঁড়াতে বা তাকাতে দেখলে এখনো আমার হৃৎপিণ্ড ধক্ ধক্ করে। বেলা সাড়ে এগারোটার রোদে ওকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। টকটকে ফর্সা রঙ লালচে আভা দেয় রোদে। কপালের ওপর আঠাঘামে আটকে আছে চুলের গুছি। একদা ও নন্দরাণীর সঙ্গে ভাব করে আমাদের বাসায় এসেছিল বক্সারকে দেখতে। মুগ্ধ হয়েই দেখত, আমি বালির বস্তার চারধারে নানা স্ট্যান্স নিয়ে ঘুরে ঘুরে ঘুঁষি মারতাম। লহরার তবলায় যেমন চলে দ্রুত আঙুল, তেমন দ্রুত চলত আমার দুই হাত। কিন্তু বাস্তবিক ঘুঁষি ছাড়া মালাকে আর কিছুই দেখাবার ছিল না। তখন মাঝে মাঝে কাগজে আমার নাম থাকত, গ্রুপ ফটোতে বেরোতো ছবি। সেইসব কাটিং এখনো মালার কাছে আছে হয়তো। সেগুলো আর সে বোধহয় খুলে দেখে না। স্বরবিতান খুঁজে ছোড়দার প্রিয় গানগুলি হয়তো চিহ্নিত করে রাখে সেইসব বাজে কাগজে।

মুখোমুখি হতেই মালা বলে—সোম, মা তোমাকে একবার ডেকেছে। সময়মতো যেও।

—কেন ?

—কে জানে। ও উদাস গলায় বলল। মুখ ফিরিয়ে নিল। দরজা পেরিয়ে ভেতরের অন্ধকারে চলে গেল, সিঁড়ি ভাঙতে লাগল আস্তে আস্তে।

কোনো কিছু না ভেবেই আমি ওর পিছু পিছু ঢুকলাম। সিঁড়ি ভাঙতে লাগলাম আস্তে আস্তে।

চার সিঁড়ি ওপর থেকে ও একবার মুখ ফিরিয়ে আমাকে দেখল।

কিছু বলার নেই, তবু ডাকলাম—মালা।

—উঁ। ও দাঁড়াল। মাঝ সিঁড়িতে।

এরপর কী বলব ? না ভেবে তাড়াতাড়ি বললাম—নতুন গান তুলেছ ?

—হুঁ।

—কি গান ?

ও হাসল। দুটি গজদন্ত, গালে টোল। একটু ভারী হয়েছে মালা। আর কিছু পাল্টায়নি। বলল—কী ভাগ্য !

—কেন ?

—তুমি গানের খোঁজ করছ।

—কেন, আমি গান বুঝি না ?

—বোঝো ?

—বুঝি।

—ভালবাসো ?

—বাসি।

—কী ভাগ্য ! এসো, শোনাবো।

মালা মুখ ফিরিয়ে উদাসিনীর ভঙ্গিতে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। ওর চারসিঁড়ি পিছনে আমি—সতর্কভাবে উঠতে লাগলাম। শেষ ধাপে পা দেওয়ার আগে মালা একবার দাঁড়াল। মুখ ফিরিয়ে বলল—একটা কথা বলি।

—কি ?

—বিয়ের পর কিন্তু আমাকে মালা বলে ডেকো না। বিশ্রী শোনাবে।

—ডাকবো না। বৌদিই ডাকবো, যদি চান্স পাই।

—তার মানে ?

—বিয়ের পর তো তোমরা আমাদের সঙ্গে এক বাসায় থাকবে না।

মালার ভ্রু কুঁচকে গেল। দাঁতে ঠোঁট চাপল সে। তারপর বলল—সে সব তোমার ছোড়দা জানে।

বলে মালা বারান্দায় উঠে তেমনি অলস উদাস ভঙ্গিতে তার ঘরের দিকে চলে গেল, ফিরেও তাকাল না।

আনাজের খোসা ফুটপাথে ফেলে মালার মা ফিরে আমাকে দেখলেন।

—সমু, সত্যর কী খবর বলো তো ! ও কি আর চাকরি করবে না ?

—কী জানি ! ঠিক নেই।

boiRboi.net

—ও মা, জানো না কী। বিয়ে করেছে, দুটো ছেলেমেয়ে, ঘরে আর রোজগেরে মানুষ তো একমাত্র নীতু—সংসার চালাতে হবে না ?

তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ আমি অনুমান করতে পারি। অর্থাৎ আমার বড়দা সত্যসুন্দর যদি চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে থাকে তবে সংসার ভদ্রতাবশে চালাতে হবে আমার ছোড়দা নিত্যসুন্দরকে। যদি তাই হয়, তবে আমার ছোড়দা নিত্যসুন্দর কোন্ ভরসায় আগামী মাঘমাসে মালাকে বিয়ে করবে ? এতটা অনুমান করে আমি তাঁকে নিশ্চিন্ত করার জন্য বললাম—বড়দা এখানে থাকবে না। গ্রামে-টামে চলে যাবে হয়তো। সেইরকমই শুনেছি।

—ওমা, সেটাই বা কীরকম কথা ! তাহলে মা-বাবাকে দেখবে কে ? সংসার তো ওর ভরসাতেই চলত, মোটা মাইনের চাকরি। নিতু কীই বা পায়, তার নিজেরই চলে না।

এসব কথার কোনো উত্তর হয় না। বুঝলাম, আমার ছোড়দা নিত্যসুন্দর খুব মুশকিলে পড়েছে। এখন এ অবস্থায় মালাকে বিয়ে করে আলাদা হওয়াটা বড় দৃষ্টিকটু। মুশকিলে পড়েছেন মালার মা বাবাও। ভেবে দেখলে, সত্যসুন্দর—আমার বড়দা—একটা আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে কলকাতা থেকে দুর্গাপুর পর্যন্ত বিস্তর মানুষকে বিপদে ফেলেছে। তার কাণ্ডজ্ঞানের এই অভাব নিয়ে নিত্যসুন্দর—আমার ছোড়দা—প্রতিদিন অফিস থেকে ফেরার সময়ে মালাদের বাড়িতে বিস্তর অভিযোগ জানিয়ে যায় বোধ হয় !

মালার মা বললেন—এই বয়সে সত্যর এ সব কী কাণ্ড ! তোমরা ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেখ না। ছেলেমেয়েগুলোর মুখ চেয়ে যদি মনটা ফেরে !

আমি উত্তর দিলাম না।

তখন তিনি বললেন—তোমার জন্য একটু পায়েস রেখেছি। কাল মালার জন্মদিন গেল। আজকাল তো তোমাকে দেখিই না। খুব রাস্তায় রাস্তায় ঘোরো বুঝি ? চাকরি বাকরির চেষ্টা করছো না ! খেলোয়াড়রা তো খুব চাকরি পায় শুনি। এসো, ঘরে এসো।

জালের আলমারি থেকে পায়েসের বাটি বের করে একটু শুঁকে বললেন—না, নষ্ট হয়নি। জলের বাটিতে বসিয়ে রেখেছিলাম, তবু ভয় করছিল যদি নষ্ট হয়ে যায় ; যা গরম পড়েছে, এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। খাও, পুরু সর পড়ে আছে।

বেরোবার সময়ে মালার মা আমাকে বারান্দা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে রান্নাঘরে চলে গেলেন। ফাঁকা বারান্দাটা পার হয়ে সিঁড়ির মুখে এসে হঠাৎ দেখি মালার ঘরের সামনে বারান্দার রেলিঙে বসে ঝগড়া করছে কয়েকটা চড়াই। তার ওপাশে পার্কের বিবর্ণ গাছপালা, আর ধু ধু আকাশ। মালার ঘরটা একটেরে, নির্জন। হলুদ পর্দা উড়ছে হাওয়ায়। ওই ঘরে, নির্জনে, একাকীত্বে কি করছে মালা ?

দেখবো ? একবার দেখা করে যাবো ? বহুকাল মালার সঙ্গে একা কথা বলি নি।

মালা একটুও চমকাল না। মুখ ফিরিয়ে বলল—এসো।

অবাক হয়ে বললাম—আসবো ?

মালা বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে স্বরবিতানে গান খুঁজছিল। শাড়ি গুছিয়ে উঠে বসে বলল—ওমা ! আসবে না কেন ? তোমাকে যে গান শোনানোর কথা ছিল আমার !

হাসলাম—তাইতো।

মালা ভ্রূ কুঁচকে হেসে ফেলল—তার মানে গানের কথা তোমার মনে ছিল না।

পাছে গান ভালবাসি না ভেবে মালা আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার না করে সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি বললাম—না না, ভুলিনি। মাঝখানে হঠাৎ বড়দার কথাটা এসে পড়ল বলে একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। তার ওপর অমন সুন্দর পায়েস! বাসি পায়েসের সর আমি বরাবর ভালবাসি। আমাদের বাসায় বহুদিন ওসব হয় না, কতকাল খাইনি--

মালা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল—তোমাদের পারিবারিক ব্যাপারে মা মাথা ঘামান তা আমার পছন্দ না। তবু কেন যে মা—

আমি আবার তাড়াতাড়ি বললাম—তা কেন মালা? আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে কথা বলার অধিকার মাসীমার আছে। কারণ এর সঙ্গে তোমার ভালমন্দ জড়িয়ে।

মালা একটা শ্বাস ফেলে বলল—কি জানি সমু, নিজেকে সব সময়ে আমার অপরাধী ভাবতে ভাল লাগে না।

—তুমি নিজেকে অপরাধী ভাববে কেন?

ও আবার উদাস হয়ে গেল, বলল—কি জানি!

বললাম—তুমি বরং গান গাও।

মালা দাঁতে ঠোঁট চেপে একটু বাইরের দিকে চেয়ে রইল। অন্যমনস্ক। সেইরকম অন্যমনস্ক হাতেই হারমোনিয়ামের রীড-এ চাপ দিল। দামী হারমোনিয়ামের মিঠে আওয়াজে ভরে গেল ঘর। কিন্তু মালা গান গাইছিল না, বাজিয়েই যাচ্ছিল, বাজিয়েই যাচ্ছিল। অন্যমনে। শ্লথ বসবার ভঙ্গী। রুক্ষ চুল কাঁপছে ফ্যানের বাতাসে। ফর্সা মুখখানায় খরার আকাশের আভা এসে পড়েছে। চোখের পাতা আধা বুজে আছে।

বাজাতে বাজাতে এক সময়ে ও আমার দিকে তাকাল। একটু হাসল। তারপর হাসতে লাগল। হাসতেই লাগল। হারমোনিয়াম ছেড়ে হঠাৎ আঁচল চাপা দিল মুখে। বলল—মাগো।

অপ্রস্তুত মুখে বললাম—কী হল?

অনেকক্ষণ হেসে মালা সামলে নিয়ে স্মিতমুখে বলল—ওই রকম ভাবে চোরের মতো বসে, শরীর কাঠ করে, ভয়ে ভয়ে বসে কেউ গান শোনে? তুমি যে গানের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছো। থাক গে, তোমার শুনে কাজ নেই। গান তোমার প্রিয় নয়, সমু। আমি জানি। শুনতে চেয়ে বিপদে পড়েছো।

কথাটা সত্যি। আমি কাঠ হয়ে বসে আছি। গানবাজনার আমি তেমন কিছু বুঝি না সত্যি। কিন্তু সেজন্য নয়। মালার সঙ্গে এমন একা কিছুক্ষণ আমি বহুকাল কাটাইনি। কিন্তু আর বসে থাকার মানে হয় না। আমি ধরা পড়ে গেছি।

উঠে বললাম—চলি।

আমার সামান্য একটু অপমান বোধ হচ্ছিল। চলি—এই কথাটার মধ্যে বোধ হয় সেই অপমানের রেশ থেকে থাকবে।

মালা তার সুন্দর মুখখানা ফিরিয়ে বিপন্ন গলায় অসহায়ভাবে বলল—সত্যিই আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে না সমু।

একটু হেসে বললাম—ঠিক আছে।

boiRboi.net

মালা গলায় ঝাঁঝ দিয়ে বলল—না, ঠিক নেই। তুমি কেন গান শুনতে চাইলে? তোমাকে কি ওসব মানায়।

অবাক হয়ে বললাম—মানায় না কেন?

মালা মাথা নেড়ে বলল—সবাইকে সবকিছু মানায় না। তুমি ভরদুপুরে একটা মেয়ের সামনে অসহায়ভাবে কাঠ হয়ে গান শোনার জন্য বসে আছো—মাগো—ভাবতে পারি না।

—তবে আমাকে কি মানায়?

মালা হাসল। একদৃষ্টে একটুক্ষণ চেয়ে রইল আমার দিকে। তারপরই হঠাৎ আবার উদাস হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল—কি জানি!

কি জানি! ঐ কথাটা মালার একটা রোগ।

মালা মুখ ফিরিয়ে ছিল। কিছু না ভেবে আমি হঠাৎ নিখুঁত একটা স্ট্যান্সে দাঁড়ালাম। মুষ্টিবদ্ধ ডানহাতের আড়ালে মুখ, বাঁ হাত ফণা তুলে একটু এগিয়ে দুলছে, ডান পা বাড়ানো, শরীর গোল হয়ে ঝুঁকে আছে। ডান হাতের আড়ালে আমার দুই ক্রুর চোখ অপলক চেয়ে আছে প্রতিদ্বন্দ্বী শূন্যতার দিকে।

ঐ ভাবে দাঁড়িয়ে ডাকলাম—মালা! মালা মুখ ফেরাল।

—আমাকে এইরকম মানায়?

ভেবেছিলাম মালা আমাকে ওই ভঙ্গীতে দেখে হেসে উঠবে। একসময়ে তার প্রিয় ছিল আমার এইসব ভঙ্গী। এখন তার প্রিয় হচ্ছে গান। সে এইসব ভুলে গেছে। তাই ভাঁড়ের ভঙ্গীতে তাকে হাসাতে চেয়েছিলাম।

কিন্তু মালা হাসল না। অপলক চোখে চেয়ে রইল।

এক ঝটকায় ভঙ্গীটা ঝেড়ে ফেলে আমি হাসলাম।

মালা হাসল না। চেয়ে রইল। চেয়েই রইল।

তারপর হঠাৎ বিড় বিড় করে মালা বলল—আমার ভাল লাগে না সমু, আমার কিছুই ভাল লাগে না।

—কী?

—এই গান, এই ভালবাসা, ঘরসংসার।

বলতে বলতে মালা মুখ ফিরিয়ে নিল। উদাস হয়ে গেল আবার।

উদাস গলায় বলল—ছেলেবেলায় বেশ ছিলাম…বেশ ছিলাম, কেন যে বড় হতে গেলাম…

জ্বালা। সমস্ত শরীরে শুঁয়োপোকার রোমরাজি কাঁটা দিয়ে ওঠে।

মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

—চলি মালা।

উদাস গলায় ও বলল—এসো।

বারান্দায় রেলিঙে চড়াইগুলো নিশ্চুপ বসে আছে ছায়ায়। বাইরে খরার আকাশ গলিয়ে দিচ্ছে রুপো। আমি আস্তে আস্তে বারান্দাটা পেরিয়ে গেলাম। সিঁড়ি ভাঙতে লাগলাম।

আজ দুপুরে বারান্দায় বালির বস্তাটা আমাকে দোলাতে হবে!

boiRboi.net

—ওভাবে নয়, আর একটু ঘুরে দাঁড়াও। মুখটা অত ঘুরিও না। শরীর সহজ করে দাও।

—বাব্বাঃ! আমি অত পারি না। এইবার দ্যাখো, হয়েছে?

—এইবার সুন্দর হয়েছে।

—এবার তবে বলো, তুমি কী সুন্দর!

—তুমি কী সুন্দর!

—হি হি। হল না। আরো সুন্দর করে বলো।

—ধ্যাৎ, আমি কি অদ্রি?

ভারী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি—তবে তুমি কে?

—হা-হা। আমি এক অচেনা পুরুষ।

ঠোঁট টিপে হাসলাম—বটে!

—ইয়াঃ। এবার নাচো। কিন্তু মনে থাকে যেন নাচতে নাচতে বসন খুলে পড়া চাই। এমন নাচ!

—বাব্বাঃ। তাই হবে।

আমি হাত দুটো দুই সুন্দর ভঙ্গীতে শূন্যে ছড়িয়ে দি। শরীর ভেঙ্গে দিই পিছনে, ডান পা বাড়াই।

—এক···

রুপোর ঘুঙুর বেজে ওঠে।

—দুই······তিন······এক······দুই······তিন······

পাক খেয়ে আসি। দাঁড়াই।

—সুন্দর হয়েছে।

—ছাই।

—তবে?

অভিমানে বলি—কিছু হয়নি! এ নাচ তোমার ভাল লাগতেই পারে না।

—কিন্তু এই তো গ্রামাটিক্যাল নাচ। ছন্দোবন্ধ।

মুখ টিপে হাসি—কিন্তু এ নাচে বসন খোলে না যে!

—তবে কি নাচবো?

দাঁড়াও দেখাচ্ছি। আর একরকমের নাচ আছে যা ঝড়বাদলের মতো। পাগল-নাচ। শিব নেচেছিল।

তাতে গ্রামার নেই?

—পাগল! শিব সতীর দুঃখে পাগল হয়ে নাচছে—সে নাচে কে তবলা বাজাতে যাবে সাহস করে?

—তুমি কি শিব?

—না। কিন্তু ঐরকম একটা ছন্নছাড়া নাচ আমার শরীরে লুকিয়ে আছে। দেখবে?

boiRboi.net

—দেখি।

আমি বেণী খুলে দিলাম। আলগাভাবে শাড়িটা জড়িয়ে দিলাম শরীরে। আয়নার কাছ থেকে পিছিয়ে এলাম। হাসলাম। কী মাদক আমার হাসি।

আমার একা ঘরে আমি নাচতে লাগলাম। ঘুঙুর পাগলের মতো যা তা বলছে। বলুক। আমি নাচছি। ঘুরে যাচ্ছি। ফিরে আসছি। এই আমি পাহাড় বেয়ে উঠছি, লাফ দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছি ঝরনার জল, আলগা পাহাড়ের ওপর একটুক্ষণের জন্য আমি টলমল—পেরিয়ে গেলাম……আমি পাহাড় বেয়ে নেমে যাচ্ছি গড়িয়ে…বাতাস হয়ে ছুটছি মাঠের ওপর দিয়ে…এখন সমুদ্রের ঢেউ আমার পায়ের ঘুঙুর…নাচছি…খুলে পড়ছে বসন…খুলে পড়ছে… আমার দুই চোখে জল গড়িয়ে পড়ছে, মুখে হাসি …নাচছি…আমি নাচছি…সতীর দুঃখের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে নাচের আনন্দ…মিশে যাচ্ছে ভালবাসা আর প্রতিশোধ…শেষে কেবল ভালবাসা থাকবে…এই নাচ সেইখানে শেষ। …আমাকে শেষ পর্যন্ত পেঁছুতে হবে…নাচছি…আমি নাচছি…

—দেখলে ?

সারা শরীরে ঘাম, কপালের ঘাম পড়ছে টপ টপ করে। এলো চুল ফেঁপে ছড়িয়ে আছে চারধারে। মেঝের ওপর পড়ে আছে আমার স্খলিত শাড়ি। আয়নায় আমার পাগলিনী চেহারার প্রতিবিম্ব পড়েছে।

ফাঁকা ঘর। আমি শূন্যতার দিকে চেয়ে ঠোঁট টিপে হেসে প্রশ্ন করি—দেখলে অচেনা পুরুষ ?

মাঝে মাঝে দুপুরটা আমার এইরকম কাটে। আমার শূন্য ঘরে এক অচেনা পুরুষের গন্ধ পাই যেন। অমনি উঠে বসি। সাড়া দিই। আমাদের কল্পনার কথাবার্তা হতে থাকে। কিন্তু তাতে টেপ রেকর্ডারের ফিতে ঘুরে শেষ হয় না। কত কথা আসে বুক জুড়ে। পাগল পাগল কথা সব, কাউকে বলা যায় না, কেবল তাকে বলা যায়। সে সব শোনে। ক্ষমা করে। ভালবাসে।

নাচের পর আমি মেঝেতে শুয়ে থাকি, গায়ে শাড়ি নেই, মেঝের ঠাণ্ডা শরীরময় আরাম ছড়ায়। চোখ বুজে থাকি। অচেনা পুরুষ আমাকে স্নেহভরে দেখে। আমি লজ্জা পাই না। তার কাছে লজ্জা কি ? আমি শিশুর মতো নির্লজ্জ হয়ে শুয়ে থাকি। মুখ টিপে হাসি।

ঘরের দরজাটা কে যেন আস্তে আস্তে খুলে দিল। আলোর আভা পড়ল ঘরে। আমি চোখ খুললাম না। কেউ না নিশ্চয়ই। বোধ হয় বাতাস। এ সময়ে দোতলায় আমি একা থাকি। তিনতলায় ঘুমোয় মা, নীচের তলায় চাকর ঠাকুর আর ঝি। দোতলায় আমি একদম একা থাকি ভরদুপুরে। আর থাকে এক অলীক অচেনা পুরুষ, আয়নায় থাকে আমার ছায়া।

দরজায় কার ছায়া পড়ল। আমি আধো বোজা চোখে চাইলাম। চমকে উঠলাম। অদ্রি !

—যাঃ। টোকা দাওনি কেন ? তুমি কী !

অবাক হয়ে অদ্রি তাকিয়ে চারদিক দেখল।

—কী হচ্ছিল এসব ? পাগলা ষাঁড় ঢুকেছিল নাকি ?

boiRboi.net

আমি উঠে উবু হয়ে বসে দুহাতে মুখ ঢেকে হাসতে লাগলাম।

—নাচছিলে ?

—হুঁ।

—ও।

অদ্রির গলা খুব ক্লান্ত শোনাল। আমার রাগ হচ্ছে খুব। ও কোনোদিন আমার ঘরে টোকা দিয়ে ঢোকে না। ও হয় চোরের মতো আসে নয়তো ডাকাতের মতো। কেন এরকম করবে ?

—কাপড়টা পরে নাও। আমি পাশের ঘরে আছি। বলে অদ্রি বাইরে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

কত সাধু পুরুষ ! তুমি যদি এতই লাজুক তবে কেন দরজা খুলেছো ? দুপুরে একা ঘরে মানুষ পাগল-পাগল হয়ে থাকে জানো না ?

শাড়িটা পরতে পরতে আমি ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখলাম। —সত্যিই পাগল নাচ নেচেছি। ড্রেসিং টেবিলের ওপর থেকে আমার কস্‌মেটিক্‌সের শিশি আর কৌটো সব গড়িয়ে পড়েছে নীচে। একটা ক্লিনজিং ক্রীমের শিশি চুরচুর হয়ে ভেঙেছে। বিছানার চাদর লণ্ডভণ্ড। নাচের সময়ে কী যে করেছি, আর কী করিনি তা খেয়াল নেই। আয়নার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসল্যম।

খাওয়ার ঘরের প্রকাণ্ড টেবিলে মাথা রেখে অদ্রি একা বসে আছে। ওর চুল এলো-মেলো, তাতে ধুলো পড়েছে। গায়ে একটা সাদা স্পোর্টস গেঞ্জি। তাতেও লাল ধুলো। সারা গায়ে ধুলো। মুখে ঘাম। ক্লান্ত হয়ে চোখ বুজে পড়ে আছে।

—কি হয়েছে অদ্রি ?

অদ্রি তার অপরিসীম ক্লান্ত মুখখানা তুলল। একটু হাসল। তারপর আচমকা জিজ্ঞেস করল—তুমি আমাকে দেখে অবাক হওনি ?

একটু ভাবলাম। ঠিক। কেউ একজন ঘরে হুট করে ঢুকে পড়েছে বলে আমি চমকে উঠেছিলাম। কিন্তু অদ্রিকে দেখে একটুও অবাক হইনি। বললাম—অবাক হওয়ার কী আছে। দুর্গাপুর তো আর বিলেত নয়। তুমিও প্রায়ই আসো।

অদ্রি ক্লান্ত গলায় বলল, আজ তো আমার আসার কথা ছিল না।

ভ্রূ কুঁচকে একটু হাসলাম। বললাম—এমন ধুলো মেখে কোথা থেকে এলে পাগল ?

অদ্রি উত্তর না দিয়ে প্যান্টের পকেট থেকে একটা দোমড়ানো ইনল্যাণ্ড বের করে টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে বলল—এটা তোমার শেষ চিঠি, গত মঙ্গলবার পেয়েছি।

আমি মুখ নিচু করে হাসতে লাগলাম। ওটা সেই চিঠি—যাতে মাত্র তিন লাইন লেখা, ইতি নেই, নাম নেই।

অদ্রি একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল—আজ শনিবার। গতকাল তোমার একটি চিঠি পাওয়ার কথা ছিল, পাইনি।

মাথা নিচু রেখেই বললাম—লিখিনি।

—কেন ?

—চিঠি না পেলে তুমি চলে আসবে বলে। তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল।

বানিয়ে বলা। কিন্তু তবু অদ্রির ধুলোমাখা ক্লান্ত মুখে হাসি দেখা গেল। পর-

boiRboi.net

মুহূর্তেই আবার গম্ভীর হয়ে বলল—মঞ্জু, তুমি এখনো আমাকে জিজ্ঞেস করোনি আমি কিছু খেয়েছি কিনা।

—খাও নি ?

অদ্রি মাথা নাড়ল। অন্যমনস্কভাবে সিগারেট টানতে লাগল।

—খাওনি কেন ?

—একটানা গাড়ি চালিয়ে এসেছি। কোথাও থামতে ইচ্ছে করছিল না। আমার মনে হচ্ছিল হয় তোমার গুরুতর অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে, নয়তো তুমি মরে গেছো।

আমি হাসতে লাগলাম। বললাম—আচ্ছা পাগল। কী করে বুঝবো যে তুমি খেয়ে আসোনি।

—বুঝলে খুশি হতাম।

—আমি অত বুঝতে পারি না।

অদ্রি হাসতে লাগল। আমি রাগ করে বললাম, বাবু নিজের বাসায় না গিয়ে সোজা শ্বশুর বাড়িতে এসে উঠবেন, তা কি করে জানি ?

—মঞ্জু, আমার খুব খিদে পেয়েছে।

—দাঁড়াও, ঠাকুরকে ডাকছি। ঘরে ডিম আছে, মাখন পাউরুটি পুডিং আছে, মাছ আছে। একটু বোসো, পাঁচ মিনিট—

আমি ঠাকুরকে ডাকতে যাচ্ছিলাম, অদ্রি ঠোঁট থেকে সিগারেট সরিয়ে বিস্বাদ হাসল, বলল—থাক থাক, ঠাকুর বেয়ারাকে এই দুপুরে কাঁচা ঘুম থেকে তোলার দরকার নেই। আমি বাসাতেই যাচ্ছি। তুমি ভাল আছো দেখে গেলাম। এখন নিশ্চিন্ত।

বলে ও উঠে দাঁড়াল। মুখে রাগ অভিমান থম থম করছে। একটা মেয়ের কাছ থেকে পুরুষেরা যে কত কিছু চায় !

বললাম—বুঝেছি। আমাকে নিজের হাতে করে দিতে হবে, এইতো ? উঠতে হবে না, বোসো। আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি।

ও হাই তুলল। আঙুল মটকাল। তারপর অপরাধীর মতো একটু হেসে বসে পড়ল আবার। ছেলেমানুষের মতো মুখ করে বলল—ও সব ডিম পাউরুটি নয়, আমি ভাত খাব মঞ্জু।

—আচ্ছা বাবা, তাই হবে।

রান্নাঘরে কোথায় কি আছে আমার জানা নেই। ফ্রিজ খুলে, আলমারি হাটকে জিনিসপত্র পেতে আমার অনেক সময় লাগল। ডালসেদ্ধ, ভাত, ওমলেট আর মাছের ঝোল বেড়ে নিয়ে খাওয়ার ঘরে এসে দেখি, অদ্রি টেবিলে মাথা রেখে গভীর ঘুম ঘুমোচ্ছে। নাক ডাকছে ওর।

আমি ডাকলাম। ও লালচোখে তাকাল। তারপর হাসল। বলল—বাঃ, দাঁড়াও বাথরুম থেকে আসি।

ফিরে এসে টেবিলে বসল যখন, ওর ঘুলোটে ভাবটা তখন আর নেই। কালো মিশমিশে চুলের সীমারেখায় ওর মুখের ফর্সা রঙ সুন্দর দেখাচ্ছে।

—আজ অফিস করোনি ?

—না।

boiRboi.net

—কেন ?

ও মুখ তুলে হাসল। বলল—ওরকম ভুতুড়ে চিঠি পেলে অফিস করা যায়! তার ওপর কাল চিঠিই পেলাম না।

ওর চোখ অন্যমনস্ক। কী যেন ভাবছে। আমি জানি আমার কথা নয়। আমার দিকে খুব একটা তাকাচ্ছে না।

—আমার জন্যই দৌড়ে এলে ?

অদ্রি একটু ইতস্তত করে বলল—হুঁ।

আমি আর কিছু বললাম না। চুপ করে ওর খাওয়া দেখতে লাগলাম।

ও নিজে থেকেই আবার বলল—তোমার জন্যই। তবু, আর একটা কারণও আছে মঞ্জু। কয়েকদিন আগে রাণুর একটা চিঠি পেয়েছি। ও বড় অশান্তিতে আছে।

শ্বাস ফেলে বললাম—শান্তিতে কেই বা আছে! এই তো আমি। ভাবছিলাম কোথায় দুপুরে একটু ভাতঘুম ঘুমোবো, না বাড়িতে ডাকাত পড়ল।

অদ্রি হাসল—সারা ঘর লণ্ডভণ্ড করে ও তোমার কেমন ঘুম ? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছিল কোন পরপুরুষ এসে তোমার সর্বনাশ করে গেছে।

শ্বাস ফেলে বললাম—করেছেই তো। ওটা ছিল সর্বনাশের পর কালঘুম।

অদ্রি গম্ভীরমুখে বলল—সর্বনাশ যা করার আমিই করব আর কেউ না।

—আচ্ছা। রাণুর কথা কি বলছিলে ?

—ওর বর সত্য চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।

—তাতে কি ? আবার চাকরি পাবে।

—ব্যাপারটা অত সহজ নয়। ও বলছে, চাকরি করবে না। চাষবাস করবে।

—কেন ?

—কী জানি! রাণু অত কিছু লেখেনি। চাকরি গেলে, ও আবার চাকরি পাবে, হাইস্কিল্‌ড্‌ অপারেটাররা বসে থাকে না। তাছাড়া, আমিও আছি। কিন্তু ও চাকরি করতে চাইছে না অন্য কারণে। ও নাকি বলছে রুরাল ফ্রণ্টে রিভোলিউশন করবে।

—সেটা আবার কী ?

—রিভোলিউশন কথাটা এ যুগের শ্বাসপ্রশ্বাস। ছেলে-ছোকরাদের এই বাতাস লাগছে আজকাল খুব। কিন্তু সত্য ছেলে-ছোকরা নয়, ওর কেন এই বাতাস লাগল বুঝতে পারছি না।

—তা তুমি এসে কি করবে ?

—রাণু আমাকে আসতে লিখেছে, যেন আমি এসে সত্যকে বোঝাই। কিন্তু আমি জানি তাতে লাভ নেই। এমনিতে সত্য খুব ভাল মানুষ। নিরীহ, শান্ত। কিন্তু অসম্ভব জেদী আর একগুঁয়ে। যা ঠিক করবে তা করবেই। ওর সবকটা ভাই একই রকমের। ছোটজনকে তুমি বোধহয় দেখনি। নেন্টু। একসময়ে নামকরা বক্সার ছিল। ওর চোখ বড় সাংঘাতিক। ভাল করে চোখে চোখ রাখা যায় না। ও যদি মনে করে কলকাতার এক নম্বর গুণ্ডা হবে, তবে তাই হবে, কেউ আটকাতে পারবে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম—যার যা হতে ইচ্ছে হয় হোক। আমাদের কি ?

—ঠিক। কিন্তু সত্যর কথা না ভেবে, যে উপায় নেই। রাণু কোথায় যাবে ?

চিঠি পাওয়ার পর থেকেই আমার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে।

—চাষবাস তো ভালই। ক্ষেতের চাল, পুকুরের মাছ, গরুর দুধ পোষা মুর্গী…

বলতে বলতে হাসতে লাগলাম।

অদ্রি মাথা নাড়ল—শহরে বসে সবাই ওরকম ভাবে। কিন্তু এ দেশে চাষবাস কি রকম আনসার্টেন, তা জানো?

—তুমি যেন কত জানো!

অদ্রি আমার দিকে স্থির তাকিয়ে রইল একটুক্ষণ। তারপর ক্ষীণ হেসে বলল—আমি কিছুটা জানি মঞ্জু। কিন্তু তুমি একেবারেই জানো না। দুর্গাপুর থেকে গাড়ি চালিয়ে আসার সময়ে দেখলাম হাজার হাজার মানুষ কাতার দিয়ে চলেছে। মাথায় পোঁটলা, তোরঙ্গ, বাক্স, কোলে ছেলে। কিছু যাচ্ছে দুর্গাপুর আসানসোলের দিকে। কিছু আসছে বর্ধমান কলকাতায়। গ্রাম খালি করে শহরে যাচ্ছে। শহরে যদি কাজকর্ম পায় ভাল, না পেলে ভিক্ষে করবে।

—কেন যাচ্ছে?

অদ্রি হাসল—বললাম তো তুমি কিছুই খবর রাখো না। দেখছ না বর্ষাকাল শেষ হয়ে এল, তবু এবছর একফোঁটা বৃষ্টি হয়নি! ক্ষেত জ্বলে গেছে, খাওয়ার জল শুকিয়ে গেছে, কলেরা লাগছে। আর কয়েকদিন পরই দেখবে শহর ভরে গেছে ভিখিরিতে।

অদ্রি একটু চুপ করে থেকে বলল—ভীষণ গরম আর চড়া রোদের মধ্যে খালি পায়ে বুড়ো বাচ্চা সব মাইলের পর মাইল হেঁটে চলেছে—কোথায় যাচ্ছে, সেখানে কি হবে, কিছু ঠিক নেই। আর আমি তোমার চিঠি পাইনি বলে ষাট সত্তর মাইল স্পীডে গাড়ি চালিয়ে আসছি। এত খারাপ লাগছিল ব্যাপারটা ভাবতে। ওদের মধ্যে যারা একটু সাহসী তারা খালি গাড়ি দেখে হাত তুলে থামাতে বলছিল। চেঁচিয়ে বলছিল—আমাদের পৌঁছে দিন বাবু। দয়া করুন।

—তুমি গাড়ি থামালে?

—পাগল! আমার ছোট্ট একটু গাড়ি। আর ওরা হাজার হাজার। কতজনকে পৌঁছে দেবো? ভাবলাম, ওদের এক যাত্রা, কারো কারো পৃথক ফল হয়ে লাভ কি?

—বাচ্চাদের কিংবা মেয়েদের কয়েকজনকে তো নেওয়া যেত! কিছু করলে না? অদ্রি, তুমি বড় নিষ্ঠুর।

অদ্রি মিটিমিটি হাসতে লাগল। তারপর গম্ভীর হয়ে বলল—ভাবী স্বামীকে নিষ্ঠুর বলে ভাববার মধ্যে কষ্ট আছে। কিন্তু কষ্ট পেয়ো না মঞ্জু। আমার গাড়ি থেমেছিল।

সত্যি?

সত্যি। দুই বুড়ো, চারটে মেয়েলোক, গোটা দশেক বাচ্চা, তিনজন বুড়ি, জনা দুই জোয়ান। এ ওর কোলে, সে তার ঘাড়ে বসে এল। লাগেজ বুথেও একজোড়া স্বামী স্ত্রী আর তাদের কোলের বাচ্চা ছিল। সবাই ঠিক মতো কলকাতায় পৌঁছেছে। আমি তাদের হাওড়া স্টেশনে, ডালহৌসী আর এসপ্ল্যানেডে ছেড়ে দিয়ে এসেছি। সেই জন্যই এত দেরি হল। নইলে অনেক আগে পৌঁছোতাম।

অদ্রির প্রতি মমতায় আমার হঠাৎ চোখ ছলছলিয়ে এল। কি ভাল তুমি অদ্রি! খুব ভাল তুমি।

Boighar.net

অদ্রি হাসছিল, বলল—তাই বলছিলাম চাষবাসের ব্যাপারটা খুব আনসার্টেন। এর পর অসময়ে বৃষ্টি নামবে। একনাগাড়ে বৃষ্টি হবে। বন্যা হবে। আমাদের দেশে বাঁধের জলেও বন্যা হয়। রেল লাইন পাতলেও তাতে জল আটকে বন্যা হয়। মানুষ গাছে উঠে সাপের সঙ্গে বসে থাকে। ঘরদোর ভেসে যায়, বৌ-বাচ্চা মরে। জল নামলে ফের আবার গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে চলতে থাকে মানুষ। ভিখিরিতে ভরে যায় শহর। তবু সত্য গ্রামে যেতে চাইছে। বিপ্লব করবে।

আমি চুপ করে রইলাম।

অদ্রি শ্বাস ছেড়ে বলল—গাঁয়ের মানুষ এখন আর বাইরের লোক পছন্দ করে না। সন্দেহ করে। তা ছাড়া জমির স্বার্থ আর দখল বড় সাংঘাতিক জিনিস। একটু বেচাল দেখলেই মানুষ খুনে হয়ে ওঠে। কারণ জমি ছাড়া তাদের আর কিছু নেই। সে জমিও কখনো খরিয়ে যায়, কখনো ভাসে। ওরা মরিয়া হয়ে ওঠে। সেইখানে শুধু শুধু চাষবাস নয়, বিপ্লব করতে যাবে সত্য। তার মানে, খুব শীগগিরই ও খুন হবে। খুব শীগগিরই—

আধ-খাওয়া ভাত ফেলে অদ্রি উঠল। আমি ওকে খাওয়ার জন্য জোর করলাম না।

আঁচিয়ে এসে মুখ মুছতে মুছতে অদ্রি বলল—যাবে মঞ্জু? চলো না, রাণুকে দেখে আসবে।

অসুখী রাণুকে দেখতে ইচ্ছে করছিল আমার। অনেককাল দেখি নি। বললাম—যাবো।

রোদচশমা পরে গাড়ির ভিতরে বসে আছি। তবু বুঝতে পারছি চারদিকে রোদের ছুরি ঝলসাচ্ছে। ঝাপটা লাগছে গরম বাতাসের। যতদূর দেখা যায়, আকাশ মেঘহীন। খরা, বড় খরা। পৃথিবী জ্বলে যাচ্ছে। তবু আমার তেমন কিছু লাগছে না।

অদ্রিকে বড় ভাল লাগছে আজ। খুব ভাল লাগছে। হয়তো শীগগিরই একদিন অদ্রিকে আমি কিশোরী মেয়ের মত ভালবাসতে পারব।

অদ্রি কথা বলছিল না। দাঁতে দাঁত চেপে সামনের দিকে, উগ্র চোখে চেয়ে স্টিয়ারিংয়ের ওপর সাপের মত ঝুঁকে আছে। ওর ভিতরে তীব্র উত্তেজনা, অস্থিরতা। এত জোরে স্টিয়ারিং চেপে ধরে আছে যে আঙুলের ডগাগুলো সাদা দেখাচ্ছে। কেন জানি না, পুরুষের এই অস্থিরতার প্রচণ্ড চেহারাটা আমার ভাল লাগে। কী ভাবছে ও? রাণুর বরের কথা? নাকি খরার কথা? কিম্বা গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে ঘর ছেড়ে পথে বেরোনো মানুষের সারির কথা? যাই ভাবুক, আমার কথা ভাবছে না। সেই ভালো। কখনো কখনো পুরুষের অমনোযোগিতা মেয়েমানুষের কাছে বড় সুস্বাদু। যেমন এখন। উদাসীন থাকো অদ্রি, এখন আমার দিকে ফিরেও চেও না, আমি ততক্ষণ তোমাকে ভালবেসে নিই।

দুপুরের ফাঁকা রাস্তায় খুব জোরে গাড়ি ছেড়েছিল অদ্রি। ওর সুন্দর উগ্র ভঙ্গীটা চোখ ভরে দেখা হল না। রাস্তা ফুরিয়ে গেল।

গাড়ি থেকে নেমে অদ্রি বলল—নামো মঞ্জু।

আমি ইতস্তত করে বললাম—ওপরে যাবো? রাণুর শ্বশুর শাশুড়ী কিছু মনে

BDeBoi.net

ভাবেন না তো! বিয়ের আগেই জোড়ে যাচ্ছি।

অদ্রি ক্লিষ্ট ভাবে একটু হাসল—অত ভাববার সময় নেই। তুমি এসো। একা আমি সব ট্যাক্‌ল্‌ করতে পারবো না।

আমি নামলাম।

দরজা খুলল রাণুই, বড় রোগা হয়ে গেছে। দুচোখের কোলে জলের দাগ। দিশেহারা ভাবে আমাদের দেখল।

—দাদা! মঞ্জু! আয় ভিতরে আয় তোরা—

—সত্য কোথায়?

ঘরের ভিতরে ঢুকেই রাণু ফিরে তাকাল অদ্রির দিকে। ঠোঁট কাঁপছে। —ও নেই।

—মানে?

—তিন দিন ধরে নেই। কোথায় গেছে জানি না।

—সে কি!

রাণু মাথা নাড়ল—তিন চার দিন আগে নেন্‌টু কোথা থেকে কিছু টাকা এনে ওর হাতে দিয়েছিল, সংসার খরচের জন্য। টাকা পেয়ে রাতে নেশা করে এল। খুব বকলাম। সকালে উঠে কোথায় চলে গেছে।

উত্তেজিত ভাবে অদ্রি বলল—পুলিশে খবর দিয়েছিস?

—দিয়েছিলাম। জানতে পারলাম পুলিশও ওকে খুঁজছে।

—কেন?

—ওয়ারেণ্ট আছে। কারখানা থেকে ওর নামে ডায়েরী করেছে। পরশু বাড়ি সার্চ করল পুলিশ।

—কিছু পেয়েছে?

রাণু মাথা নাড়ল—না। নেন্‌টুকে ধরে নিয়ে গেছে।

—কেন?

—সার্চ করার সময়ে একজন পুলিশ জুতো পায়ে বাবার পুজোর ঘরে ঢুকেছিল। নেন্‌টু জুতো পায়ে ঢুকতে বারণ করেছিল, পুলিশটা শোনেনি। নেন্‌টু তখন তাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। সেইজন্য।

অদ্রি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমিও চুপ। কেবল চৌকির বিছানা থেকে ঘুম ভেঙে দুই-তিন বছরের ছেলেটা মাথা তুলে ঘুমচোখে একবার ডাকল—মা। তারপর আবার বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

রাণু একবার অদ্রির দিকে, একবার আমার দিকে তাকাল। তারপর হঠাৎ আমার কাছে এগিয়ে এসে ভাঙা গলায় বলল—মঞ্জু, কিছু মনে করিস না ভাই, কিছু মনে করিস না, আমি একটু কাঁদিবো—একটুখানি—

বলতে বলতে ও ছুটে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়ল বিছানায়। কাঁদতে লাগল। অদ্রি অস্বস্তি বোধ করছিল। কেবল বলল—কি হচ্ছে রাণু—এই রাণু—

এগিয়ে গেল রাণুর কাছে।

ওদের ভাইবোনের এখন একটু একা থাকা দরকার। আমি বাইরের লোক।

সামনে বারান্দার দরজাটা খোলা। আমি এক পা এক পা করে বারান্দায় এলাম।

boirboi.net

কী চড়া রোদ ! গরম বাতাসের ঝাপ্‌টা বয়ে যাচ্ছে।

আমি রেলিঙে কনুই রেখে দাঁড়িয়ে রইলাম একটু। ভিতর থেকে রাণুর কান্নার শব্দ আসছে। আমি আর একটু সরে দাঁড়ালাম। বারান্দার ঐ প্রান্তে ওটা কি ? দড়ি দিয়ে বাঁধা প্রকাণ্ড একটা বস্তা। কি আছে ওতে ?

আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম। হাত দিয়ে দেখি, বস্তাটা খুব ভারী। এটা দিয়ে কি হয় ? ভারী মজা তো !

আমি বস্তাটা ঠেললাম। ওটা দুলতে লাগল অল্প অল্প।

॥ সোমসুন্দর ॥

থানার হাতায় একটা বেলগাছ। তার তলায় একটুখানি ছায়া। চারপাশে তীব্র রোদ। ছায়াটুকুতে গা বাঁচিয়ে দু'তিনজন জড়োসড়ো হয়ে বসে। তাদের মধ্যে একজন আমার বাবা কদমসুন্দর রায়। ছাতাটা জীবনসর্বস্বের মতো ধরে আছেন। আমাকে দেখে একটু নড়লেন। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। রোদে শুকিয়ে গেছেন বাবা, মুখচোখ তাম্রাভ, অসুস্থ, অসুখী এক চেহারা। দূর থেকে আমাকে স্থির দৃষ্টিতে দেখছিলেন।

কাছাকাছি হতেই জিজ্ঞেস করলাম—বাবা, বড়দা ?

বাবা মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ, কোন খবর নেই।

কথা না বলে আমরা দুজন আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলাম। বাবা একটু আগে, আমি পিছনে। আমার ভয়ঙ্কর খিদে পেয়েছে। ঠিক দুপুরে জামিন দিল। তাই খেতে দিল না। হাঁটতে আমার একটু কষ্ট হচ্ছিল। কোমরে খুব ব্যথা। কিছু নয়। সেরে যাবে। বড়দা যে কোথায় গেল ! বড়দার এখন শত্রু অনেক। আমরা ওকে খুঁজে পাওয়ার আগে তারা যদি ওকে খুঁজে পায় ?

কি জানি কেন, ভাবতে ইচ্ছে করছে না। খিদে পেলে আমার চিন্তাগুলি ঠিক থাকে না। এক গ্লাস জল যদি পাওয়া যেত।

থানার গেট ছেড়ে প্রায় বিশ গজ নীরবে নতমুখে হাঁটলেন বাবা। তারপর দূরত্বটা নিরাপদ নয় মনে করে ফিরে তাকালেন।

—তোর হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে ?

—না।

বাবা চিন্তিত মুখে তাকিয়ে থেকে বললেন—খুব মেরেছে নাকি ?

—তেমন কিছু না। বড়দার খবরটা ওরা চায়।

—কিছু বলিসনি তো ?

—কি বলব ?

দুপুরের ফাঁকা রাস্তা ধু ধু করে জ্বলে যাচ্ছে। বাবা রাস্তার দুদিকে তাকিয়ে বললেন—তোর হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। একটা ট্যাক্সি নিই।

—একটুখানি রাস্তা, ট্যাক্সির কি দরকার ? হাঁটতে পারব। তেমন কষ্ট হচ্ছে না।

—এই রুটে বাস খুব কম, দুপুরবেলাটায় একদম থাকে না।

দূরে একটা টিউবওয়েল দেখা যাচ্ছে। তেষ্টা পেয়েছে খুব। কলকাতার বেশীর ভাগ টিউবওয়েল সারা বছর খারাপ থাকে। এটাও তাই কিনা কে জানে। বললাম—

boiRboi.net

তুমি একটু দাঁড়াও। জল খেয়ে আসছি।

বলে বাবাকে রেখে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। পেছনে বাবার চটির শব্দ সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল। যেন বা আমি দামাল শিশু ছেলে তাঁর। হারিয়ে যাবো, বাবা সেই ভয়ে সঙ্গ ছাড়তে চাইলেন না।

টিউবওয়েলটায় জল আছে। বাঁধানো চত্বরটা ভেজা এখনো। কেউ একটু আগে জল নিয়ে গেছে।

আমি হাতলটা ধরার আগেই বাবা এসে ধরলেন।

—খা, আমি পাম্প্ দিচ্ছি।

একপলক বাবা-ব্যাটায় চোখাচোখি হল। তারপর আমি হাঁটু গেড়ে বসে টিউবওয়েলের মুখে আঁজলা পাতলাম। ঠাণ্ডা সুস্বাদু ধাতুগন্ধী জলে শরীর ভরে গেল।

বাবা ক্লিষ্ট একটু হেসে বললেন—আমিও একটু খাই। বহুক্ষণ বসিয়ে রেখেছিল ওরা, বড় তেষ্টা পেয়েছে।

হাতলটায় চাপ দিতে দিতে বললাম, কি দরকার ছিল? আমি একা ফিরতে পারতাম না?

—কি জানি! ভাবলাম, খুব যদি মারধর করে থাকে তবে একা হয়তো ফিরতে পারবি না।

—জামিন কে দিল?

বাবা কোনদিন রুমাল রাখেন না। জল খেয়ে চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে জামার হাতায় মুখ মুছতে মুছতে বললেন—সুধাংশুবাবু।

—কে সুধাংশুবাবু?

—মালার বাবা। উকিল মানুষ, অনেক ঘাঁত-ঘোঁত জানা আছে। নিতুই বন্দোবস্ত করেছে সব।

—কেস দিয়েছে?

বাবা খানিকটা তটস্থ হয়ে বললেন, দেবে বোধ হয়। তারপর একটু ভেবে সান্ত্বনার সুরে বললেন—কোর্টে ওসব ফল্‌স্ কেস তো টেঁকে না। সারাবছর ওরকম কত কেস দিচ্ছে পুলিশ!

আমি একটু হাসলাম। হাঁটতে লাগলাম। বাবা একটু আগে, আমি পিছনে।

বাবা মুখ ঘুরিয়ে বললেন—রোদে হাঁটছিস কেন? ছাতার নিচে আয়।

ছাতা জিনিসটা আমি দুচোখে দেখতে পারি না। মাথার ওপর ও একটা অস্বস্তি! তবু ছাতার নিচে গেলাম। বাবা বেঁটে, আমি লম্বা। ছাতার শিক মাথায় লাগছিল, আমি হাত বাড়িয়ে নিঃশব্দে ছাতাটা নিয়ে নিলাম।

—বাবা, থার্ড জেনারেশন সম্পর্কে তুমি যেন কি বলো?

বাবা অন্যমনস্ক ভাবে আমার দিকে তাকালেন।

—কি বললি?

—থার্ড জেনারেশন।

—ও! বলে সামান্য একটু হাসলেন।

—মানুষের থার্ড জেনারেশন তার দোষ গুণগুলো পায়। না?

boiRboi.net

বাবা শ্বাস ফেললেন একটু জোরে।

—আমরা সেই থার্ড জেনারেশন।

বাবা গম্ভীরভাবে বললেন—বাবা যাই করুন তাঁর স্থিরবুদ্ধি ছিল। তিনি বিপদে পড়তেন, কাটিয়েও উঠতে জানতেন। কিন্তু তোরা অস্থির, চঞ্চল। কি করতে কি করে ফেলিস।

পিছনে বাসের শব্দ হচ্ছিল। বাবা দাঁড়িয়ে বললেন—দ্যাখ তো স্টপটা কোথায়।

—ঐ তো সামনে। দেখা যাচ্ছে।

—চল, দৌড়ো।

বাবা আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন। আমরা প্রায় দৌড়তে লাগলাম। টের পেলাম, আমার কোমরের চোটটা খুব সামান্য নয়।

দুপুরে ঘুমিয়েছিলাম। ঘুমটা যখন পাতলা হয়ে এসেছে তখন পাশ ফিরতে গিয়ে টের পেলাম আমার মুখের কাছে কার একখানা হাত আমার কপাল ছুঁয়ে সরে গেল। বালিশের পাশে পড়ে রইল হাতখানা। ঘুমচোখে দেখে চোখ বুজে রইলাম। হয়তো বাবা, কিংবা মা, বৌদিও হতে পারে। কিংবা আমার তিন বছরের ভাইঝি টিকুটাই হবে হয়তো। হাতখানা ধরার জন্য হাত বাড়িয়েও ধরলাম না।

আধোঘুমের মধ্যে ভাবছিলাম যদি হাতখানা বড়দার হয়! বড়দার হাত নরম। মায়ের মতো মন ওর। অল্পেই গলে যায়। ব্যথা-পাওয়া, আহত নেন্টুর পাশে বড়দাই বসে আছে হয়তো। আমার দুপুরের ঘুমের মধ্যে একসময় ও ফিরে এসেছে বোধহয়।

চোখ খুললাম না। অলস শরীরে বড়দার কথা ভাবছিলাম আধোঘুমে। হঠাৎ শুনলাম, পরিষ্কার মেয়েলী গলায় কে বলল—দি বক্সার ইজ ডেড।

ঘুমের আঁশ জড়ানো চোখে চেয়ে দেখি, মালা। আমার শিয়রে বসে আছে।

আস্তে আস্তে উঠে বসলাম। অপরাধীর মতো বললাম, খুব ঘুম পেয়েছিল। লক-আপে বড্ড মশা, ঘুম হত না।

মালা হাসছিল। সেই গজদন্ত গালে টোল। আবার বলল—দি বক্সার ইজ ডেড।

হাসলাম। মাথা নেড়ে বললাম—ঠিক।

মালা কথা বলল না। অল্প অল্প করে ও আবার উদাস হয়ে যাচ্ছিল। বলল—ঘুম আমারও হয় না।

—কেন?

—আমার লক্-আপেও বড্ড মশা।

—কি বলছ?

মালা থিরথিরে হাসি হাসল—আমি যে লক-আপে আছি, সেইখানে—

এই সংকেত বুঝতে না পেরে ব্যাগ্রভাবে বলে—কিসের মশা, মালা?

ও উদাস হয়ে বলল—চিন্তার। দুশ্চিন্তার।

বলেই উঠে দাঁড়াল। দরজার কাছ পর্যন্ত চলে গিয়ে ফিরে বলল—তোমাকে দেখতে এসেছিলাম। এসে দেখি ঘুমোচ্ছ। ও ভাবে তোমার শিয়রে বসে থাকা আমার ঠিক হয়নি। কিন্তু এসে দেখি ঘুমের মধ্যে খুব ঘামছো তুমি। এ ঘরে ফ্যান নেই,

boirboi.net

হাতপাখাও পেলাম না, তাই খবরের কাগজ দিয়ে একটু বাতাস করছিলাম।

বলে মালা দরজার ওপারে চলে গেল উদাস ভঙ্গীতে।

এক ব্যাগ্রতা বুক খামচে ধরল। তাড়াতাড়ি উঠতে যাচ্ছিলাম। মাঝ সিঁড়িতে এখনো মালাকে ধরা যায়।

উঠতে গিয়ে হঠাৎ থমকে গেলাম। মনে পড়ল, ছোড়দা এই বেশি বয়সে আবার পড়াশুনো করে ল পাস করেছে। এ বছর সে জুডিসিয়ারিতে ডব্লিউ-বি-সি-এস পরীক্ষা দিচ্ছে। পড়াশুনো ছেড়েই দিয়েছিল। আবার যে শুরু করেছে তা মালার কিংবা তার মা-বাবার তাড়নায় আমরা জানি। ছোড়দা অনেক স্বপ্ন দেখে, সেই সব স্বপ্ন মালাকে নিয়ে।

আমি উঠলাম না।

কিন্তু বিকেলে আমি আমার পেটমোটা, ভোঁদড়ের মতো চেহারার বস্তাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। হেসে তাকে বললাম—কি মক্কেল, এক হাত হবে নাকি?

বিকেলের বাতাসে বস্তাটা একটু একটু দুলছে। সেটার পেটে সুন্দর একটা জ্যাব করলাম আমি। কোমরের ব্যথা খচ করে উঠল। কিছু না। সেরে যাবে। একটু পিছিয়ে এলাম। আর একটা জ্যাব। বস্তাটা দুলে গেল। হেসে বললাম—কেমন? এখনো ঠিক আছি। না?

বস্তাটা দুলল। দুলতে লাগল। লহরার তবলায় যেমন চলে আঙুল তেমনি আমার অবিরল ঘুঁষি তার ওপর দিয়ে ঝড়ের মতো বয়ে যেতে লাগল।

নন্দরাণী মারা যাওয়ার পর থেকে আশু একা আছে। তার মা বাবা পাকিস্তানে, নন্দরাণীকে তাঁরা দেখেন নি। একা আশু নন্দরাণীকে বিয়ে করে প্রথম ঘরসংসারের স্বাদ পেয়েছিল। সংসার ভেঙে গেছে নন্দরাণী মারা যাওয়ার পর। তবুও আশু এখনো কালীঘাটের ফ্ল্যাটটায় আছে। যতদূর জানি নিজেই রান্না করে খায়, প্রতিদিন নন্দরাণীর ছবিতে মালা দেয়। বাবা বহুবার তাকে আমাদের বাড়িতে এসে সকলের সঙ্গে থাকতে বলেছিলেন, আশু রাজি হয়নি।

সন্ধেবেলা হঠাৎ মনে হল, একবার আশুর কাছে যাই। বড়দার সঙ্গে আশুর খুব ভাব। বলা যায় না, সে হয়তো বড়দার খোঁজ রাখতেও পারে। কে জানে বড়দা তার ফ্ল্যাটেই লুকিয়ে আছে কিনা!

ভেবেচিন্তে বেরিয়েছিলাম। রাসবিহারী আর ল্যান্সডাউনের মোড়ের কাছে বাঁধানো গাছতলায় মনোতোষের সঙ্গে দেখা। বিমর্ষ হয়ে বসে আছে, হাতে রেসের ছোটো বই। ভাবছে। আমাকে দেখে হাসল। বলল—বলুন তো আজ রাতে বৃষ্টি হবে কিনা!

নির্মেঘ ধুলোট আকাশে তারা ফুটেছে। একবার চোখ তুলেই বললাম—হবে না।

মনোতোষ দুঃখিতভাবে মাথা নাড়ল—সব শালা মশাই ঐ এক কথা বলছে। বৃষ্টি হবে না।

—হবে বললে কি করতেন?

—টেন টু টুয়েন্টি বাজি ধরতাম।

—আপনার কি মনে হয়, বৃষ্টি হবে?

boiboi.net

—না। মনোতোষ শ্বাস ছেড়ে বলল।

—তবে ?

—ঐ তো হয়েছে মুশকিল। বৃষ্টি হবে না, আমিও জানি। সকলেই জানে। তাই কেউ চান্স নিচ্ছে না। অথচ শনিবার টল বয় আমাকে ডুবিয়ে দিয়ে গেল। পাকা খবর পেয়ে সর্বস্ব ধরেছিলাম। হারামজাদা স্টার্ট নিল না। এখন পয়সাকড়ি নেই, তাই বাজি ধরছি।

—বেটার লাক্ নেক্সট স্যাটারডে!

মনোতোষ মাথা নাড়ে—বউ আর ঘোড়া দুই-ই খচ্চর। কারো কাছে কিছু এক্সপেক্ট্ করতে নেই। বলুন তো আকাশে সপ্তর্ষি আছে কিনা। না-না, আকাশের দিকে না তাকিয়ে বলুন।

আবার হাসলাম—অর্থাৎ বাজি ধরতেই হবে ?

—ক্ষতি কি! সময়টা তো কেটে যায়।

—আমার কাছে টাকা নেই।

—আনা আষ্টেক ধরুন না।

আমি চোখ বুজে একটু ভাবনার ভান করে বললাম—সপ্তর্ষি আছে।

মনোতোষ ঠোঁট উল্টে বলল—আছে কিনা আমিও জানি না। দেখিনি। কিন্তু আমারও মনে হচ্ছে, আছে।

—তাহলে তো বাজি হয় না।

মনোতোষ মাথা নেড়ে বলল—হয়। আছে জেনেও আমি বলছি নেই। আট আনা।

--আট আনা।

মনোতোষ গাছের ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে আকাশ খুঁজতে লাগল। আমি আকাশের দিকে তাকালাম না। পকেটে হাত দিয়ে একটি টাকা বের করে হাতে ধরে রইলাম।

মনোতোষ মাথা নেড়ে বলল—নেই।

টাকাটা বাড়িয়ে দিতেই মনোতোষ খুচরো আট আনা পকেট থেকে বের করতে করতে বলল—এক কাপ চা আর এক প্যাকেট চারমিনার এতক্ষণের চেষ্টায় হল। বেটার লাক নেক্সট্ টাইম।

আমি হাসলাম।

কিছুদূর চলে এসেছি, পিছন থেকে মনোতোষ ডাকল—সোমবাবু, ও মশাই, এই যে বক্সারদা—

ফিরে তাকিয়ে দেখি রাস্তা পার হয়ে মনোতোষ আসছে। হাতে আমার টাকাটা। কাছে এসে বলল—হল না।

—কি ?

—সপ্তর্ষি আছে। গাছের ওপাশটা লক্ষ্য করি নি। আপনি জিতেছেন।

—রাখুন না।

সে মাথা নাড়ল—তা হয় না। জিৎ জিৎ, হার হার।

—ধার হিসেবে রাখুন, পরে শোধ দেবেন।

—তবে টাকাটা ধরুন। আমার খুচরোটা ফেরত দিন।

boiRboi.net

ধরলাম। খুচরো ফেরত দিলাম।

—এবার বলছি আমাকে আট আনা ধার দিন।

হেসে বললাম—ফর্মালিটি?

—অভ্যাস রাখা ভাল। আমি পাঁড় জুয়াড়ি, ধার আর জুয়া এক করতে ভালবাসি না।

আমি জানতাম আকাশে সপ্তর্ষি আছে। তাই তাকাইনি। মনোতোষকে টাকাটা আবার দিতে ওর মুখ উজ্জ্বল হল। আবার আট আনা ফেরত দিতে দিতে বলল—অন্য কোনো আইটেমে খেলবেন?

—না। আমার সময় নেই।

—কেন?

—বড়দা বাড়ি থেকে চলে গেছে, ওর খোঁজ পাচ্ছি না। এক জায়গায় যাচ্ছি খোঁজে।

—চলে গেছে? কি আশ্চর্য! কোথায়?

—কি জানি!

মনোতোষ মুখে চুকচুক শব্দ করে বলল—হায়। দেখুন তো, এক পাড়ায় থাকি, অথচ কেউ কারো খোঁজই রাখি না।

—চলি।

—আচ্ছা। চিন্তা করবেন না, আমার মন বলছে আপনার বড়দা সামনের সোমবারের মধ্যে ফিরবে।

—কি করে বুঝলেন?

—আমার মন বলছে। আজ এক সোমবার, সামনের সোমে হয় সাত দিন। সাত দিনের মধ্যে ফিরবে। বাজি!

—কত?

—দশ।

—অত না। পাঁচ।

—আমার দশই রইল। আপনার পাঁচ। টেন টু ফাইভ!

—আমি হাসলাম—ঠিক আছে।

খুশি হয়ে মনোতোষ গাছের তলায় বাঁধানো জায়গায় ফিরে গেল।

একটি যুবতী মেয়ে দরজা খুলল। তার হাতে শাঁখা, সিঁথিতে সিঁদুর।

অবাক ভাবটা সামলে জিজ্ঞেস করলাম—আশু আছে?

—আছে। ভিতরে আসুন।

ভেতরে সবই সেই আগের মতো আছে। খাটে বিছানা, জোড়া বালিশ, দেয়ালে নন্দরাণীর ছবি, তাতে টাটকা মালা। তবু ঘরের গন্ধটা কেমন যেন অন্যরকম।

আশু বাথরুমে গিয়েছিল। ঘরে ঢুকে আমাকে দেখে একটু থমকাল।

আশু সম্পর্কে আমার ছোটো, কিন্তু বয়সে বড়। ফলে আমি তাকে দাদা ডাকি, সেও আমাকে দাদা ডাকে। তুমি করে বলি দুজনেই।

আশু থমকে আমাকে ভাল করে দেখল একটু, বলল—জামিন পেলে?

boirboi.net

অবাক হলাম। বললাম—তুমি খবর পেলে কোত্থেকে ?

—নিতু আমাকে ফোন করে প্রায়ই।

—তাহলে বড়দার খবরও জানো ?

—জানি।

—খোঁজ রাখো ?

আশু মাথা নাড়ল—না।

হতাশায় ভিতরটা ভরে গেল।

—খুব মারধর করেছে নাকি ? আশু জিজ্ঞেস করে।

—একটু আধটু।

আশু শ্বাস ছেড়ে বলল—তোমরা গ্রহের ফেরে পড়েছো নেনটুদা। এবার একটা স্বস্ত্যয়নী করাও। এই বয়সে বড়দার নিরুদ্দেশ হওয়ার মানে হয় না। তুমিই বা কেন পুলিশের গায়ে হাত দিতে গেলে ?

উঠতে উঠতে বললাম—আজ চলি আশুদা।

—আরে দাঁড়াও। চা খাও। ভেবে আর কি করবে, বরং একচাল দাবা খেলে যাও। গজ নৌকোর একটা নতুন চাল শিখেছি।

নন্দরাণী বেঁচে থাকতে আশুর বাসায় প্রায়দিনই আমরা দাবা নিয়ে বসতাম। খেলতে খেলতে রাত হয়ে যেত। নন্দরাণী বকাবকি করত দুজনকে। কখনো বা নিবিষ্ট মনে আশুর পিঠ ঘেঁসে বসে চাল দেখত। নন্দরাণী মরে যাওয়ার পর আমি আর আসি নি, আশুও দাবা খেলত না।

বললাম—চাল টাল সব ভুলে গেছি।

আশু বলল—আমিও। কতকাল খেলি না।

দাবার ছক বিছানার ওপর পাততে পাততে আশু মুখ ঘুরিয়ে ডাকল—পারুল, চা দিয়ে যাও।

মেয়েটি কে তা জিজ্ঞেস করতে পারছিলাম না। লজ্জা করছিল। আশুও আমার চোখ এড়াচ্ছে, চোখে চোখে তাকাচ্ছে না। তার ভাবসাবে একটা চোর-চোর ভাব।

দাবা নিয়ে বসার একটু পরেই নিঃশব্দে মেয়েটি চা নিয়ে এল। মুখ তুলে তাকে দেখলাম। দেখতে মন্দ না। শ্যামলা রঙ, ভাল স্বাস্থ্য, মুখখানায় লক্ষ্মীশ্রী আছে। আমাকে তাকাতে দেখে খুব লজ্জা পেল। মুখ নামিয়ে বলল, আপনাকে একটা ডিম ভেজে দিই ?

বললাম—দিন।

আশু বলল—দাও। নেনটুদা ডিম বড় ভালবাসে। যখন বক্সিং করত তখন কাঁচা ডিম খেত। ডবল ডিম ভেজে আনো।

মেয়েটি চলে গেল। মেয়েটি কে তা জিজ্ঞেস করার আর একটা লোভ সংবরণ করলাম। আশুর বাঁ হাতে কোনাচে একটা বোড়ে ওৎ পেতে বসে আছে। সেটার দিকে চেয়ে ছিলাম। হঠাৎ আশু বলল—নেনটুদা, তোমরা আমার ওপর রাগ করো না ভাই। একটা কথা বলব।

—কি ?

boiRboi.net

আশু হঠাৎ লজ্জায় লাল হয়ে মাথা নীচু করে বলল—আমি বিয়ে করেছি।

ভারী অবাক হলাম। নন্দরাণীর ফটোতে এখনো টাটকা মালা।

বললাম—সে কি। খবর পাইনি তো!

—একমাত্র নিতু জানে। খবর দেওয়ার মতো বিয়ে তো এটা নয়। রেজিস্ট্রি করেছি, আর বাড়িতে পুরুত ডেকে যজ্ঞটা করিয়ে নিয়েছি।

—ছোড়দা তো আমাকে বলেনি! কবে করলে?

—দিন কুড়ি হল। তোমাদের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা করছে।

—কেন?

আশু হঠাৎ আকুলি ব্যাকুলি হয়ে বলল—বিশ্বাস কর, নন্দরাণীর জায়গা কেউ কখনো নিতে পারবে না। সেই ঘর দোর সে যেমন গুছিয়েছিল সব ঠিক সেরকম আছে, কুটোটিও নাড়াইনি। পারুলকেও বলেছি, আমি সত্যিকারের ভালবাসি নন্দরাণীকে, সে ভালবাসা আর কাউকে দেওয়া যাবে না। পারুলও মেনে নিয়েছে। তাকে বলেছি, সে যেন এই সংসারে নন্দরাণীর ছায়া হয়ে থাকে।

বড় রাগ হল। বললাম—সে কী কথা আশুদা, একজন আর একজনের ছায়া হয়ে থাকবে কেন? এ সব তোমার ভারী অন্যায়। তবে বিয়ে করলে কেন?

—নেনটুদা, বিকেলে ঘরে ফিরে ভীষণ ভয় করত। স্বপ্ন দেখতাম, একটা গভীর কুয়োর মধ্যে পড়ে যাচ্ছি—পড়েই যাচ্ছি। মাঝে মাঝে রাতে বোবায় ধরত, ঘুম ভেঙে দেখতাম ঘামে সারা গা ভেজা। বোবায় ধরলে আগে নন্দরাণী ঠিক ঠেলে জাগিয়ে দিত। এখন কে দেয়?

আশুর আবোল-তাবোল কথা শুনে আমি হাসছিলাম। তাতে আশু আরো লজ্জা পেতে লাগল।

আশু ব্যাগ্র হয়ে বলল—না নেনটুদা, তুমি বুঝতে পারছো না। নন্দরাণী আমাকে প্রথম সংসারের স্বাদ দিয়েছিল। বিশ বাইশ বছর মা-বাপ ছাড়া হয়ে শেষে হোস্টেলে আমার জীবন কেটেছে। সংসার কেমন, ভালবাসা কি জিনিস, যত্ন কাকে বলে, জানতামই না। পেটে আলসার নিয়ে বুড়িয়ে যাচ্ছিলাম। নন্দরাণীকে বিয়ে করার পর হঠাৎ বন্যার মতো সব পাওয়া পেতে লাগলাম। সে যে কি ছিল আমার—সে যে কি ছিল—পারুলকে সব বলেছি। ঐ দেখ, পারুল নিজের হাতে মালা গেঁথে নন্দরাণীকে পরিয়ে রেখেছে। রোজ রাখবে।

ওমলেটের প্লেট সামনে রেখে পারুলও দাঁড়িয়ে গেল। অপরাধীর মতো মুখ করে বলতে লাগল—সত্যিই, দিদির কোন তুলনা হয় না। নতুন সংসার করতে এসে দেখি, ঠিক জায়গায় ঠিক জিনিসটি সাজানো আছে। হাতের কাছে সব পেয়ে গেছি। মশলার কৌটোগুলো ভরভর্তি, ট্রাঙ্ক বাক্স কি সুন্দর গোছানো। আমি কিচ্ছু নাড়িনি। দিদি এই সংসারে নেই হয়েও কতখানি যে আছেন!

আশু পারুলের দিকে চেয়ে বললো—পারুল, তোমাকে বলেছি কিনা যে আমার সব ভালবাসা নন্দরাণীর প্রতি, তুমি তার ছায়া হয়ে থাকবে। বলেছি কিনা?

পারুল সমস্বরে আমার দিকে চেয়ে বলতে লাগল—আমাদের ওপর আপনারা একটুও রাগ রাখবেন না দাদা, আমরা দিদিকে একটুও অসম্মান করব না। বলুন, আপনারা

আমাদের আশীর্বাদ করবেন !

বড় বিরক্তি বোধ করছিলাম। আমার কাছে ওরা কোনো অপরাধই করে নি, তবু দুজনে চোরের মতো কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাইছে। আশুর মতো আহাম্মক দেখি না।

একটা শ্বাস ছেড়ে বললাম—আমাদের বাসায় নন্দরাণীর কথা বড় একটা কেউ ভাবে না। তার স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাও নেই। তোমাদের বাড়িতে নন্দরাণী যদি বেঁচে থাকে তো থাক। ভালই তো।

সঙ্গে সঙ্গে পারুল আব্দারের গলায় বলে—তাহলে আমি কিন্তু আপনার ছোটো বোন। সেই সম্পর্কই রইল। ঠিক তো ?

হাসলাম—আচ্ছা !

—আগের মতো এসে দাবা খেলবেন ওর সঙ্গে। যত রাত হোক আমি কিছু মনে করব না।

আমি হাসলাম। একজনের পরিপূরক হয়ে ওঠা আর একজনের পক্ষে কত শক্ত ! নন্দরাণী হলে কিছুতেই বেশি রাত পর্যন্ত দাবা খেলার প্রস্তাব মানত না। বকত। দরকার হলে ধমকে বের করে দিত—যা তো ছোড়দা। বাড়ি যা।

এরপর দাবাটা আর জমল না। আশুর গজ নৌকোর নতুন চালটা আমি লক্ষ্যই করলাম না। মাৎ হয়ে গেলাম। ওরা ফুটপাথ পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিয়ে গেল।

রাতে একা শুয়ে মৃত নন্দরাণীর কথা ভাবতে ভাল লাগছিল। ওর দেওয়া পাঁচশো টাকার আর অল্পই অবশিষ্ট আছে। স্যুটটা হল না। না হোক, তার জন্যে আমার দুঃখ নেই ! কিন্তু এই যে আশু বিয়ে করল, এর মানে হচ্ছে নন্দরাণীর স্মৃতির ওপর রবার ঘষা শুরু হয়ে গেল। ওকে আর বেশিদিন কেউ মনে রাখবে না।

সকালে উঠে টের পেলাম, সারা রাত ঘুমের মধ্যেও নন্দরাণীর কথা ভেবেছি। আশুর বিয়ের কথা কাউকে বললাম না। থাক, মা বাবার একটা জীবন দু একটা সত্য না জেনেই কেটে যাক।

॥ মঞ্জু ॥

আকাশের রঙ ধুলোটে। রোজ সকালে উঠেই দেখি রোদ, তারপর সারাদিন কেবল রোদ আর রোদ। একটু মেঘও কখনো ছায়া ফেলে না। সারাদিন রাস্তায় হাঁটে ভিখিরিরা। অনেক রাত পর্যন্ত তারা চলাচল করে। গভীর রাতেও তাদের চীৎকার শোনা যায়। ভয় করে।

ভয় করে। আমার আজকাল একটু আধটু ভয় করে।

বাবা মার শোওয়ার ঘরে এয়ারকুলার লাগানো হল। আমারটাতে লাগাতে চেয়েছিলেন বাবা। আমি রাজি হলাম না। থাকগে, গরমে একটু কষ্ট করি, কষ্ট তো বড় একটা পায় না আমাকে।

এই যে ভয় আর অস্বস্তি—এটা আমার ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল অদ্রি। সারাদিন ভিখিরির চিৎকার শুনি, মেঘহীন আকাশে সূর্যের আলোর তীব্রতা দেখি। ভয় পাই। কি দরকার ছিল অদ্রির আমাকে ওসব কথা বলার ? জানি ইঞ্জিনিয়ারমশাই, পুরুষেরা কখনো চায় না তার মেয়েমানুষটি সুখে থাকুক। আমাদের কষ্ট কিংবা কান্না এ সবই পুরুষের প্রিয়। মঞ্জুকে ভয় দেখিয়ে তুমি সুখ পাও ইঞ্জিনিয়ারমশাই। তাই আমি

এখন ভিখিরির চিৎকার মন দিয়ে শুনি, অনুভব করি খরার দহন। ইঞ্জিনিয়ারমশাই, তোমার মেয়েমানুষটির আর সুখ নেই।

অদ্রিকে এ সপ্তাহে দুটো চিঠিই দিয়েছি। পরিপূর্ণ ভালবাসার চিঠি। আজ শনিবার, আজ আমার একটা চিঠি তার পাওয়ার কথা। যদি চিঠি পেয়ে অদ্রি আজ আসে? এলে বড় ভাল হয়। অদ্রিকে আমার দেখতে ইচ্ছে করছে। অদ্রির আসা উচিত। আমার জন্য না হলেও রাণুর জন্য। রাণুর বরের এখনো কোন খোঁজ নেই। রাণু কয়েকদিন এসে থেকে গেল বাপের বাড়িতে। রোজ যেতাম। সারাদিনই কাঁদত রাণু। বলত—আমার জন্য ও চলে গেছে।

আমি বোঝাতাম—তা কেন? স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কত রাগ অভিমান হয়। তা ছাড়া গিয়ে তো ভালই হয়েছে, নইলে পুলিশ ঠিক ধরে নিয়ে যেত।

রাণু কেবল মাথা নাড়ত—না রে। পুলিশকে বুঝিয়ে আমি ঠিক ছাড়িয়ে আনতাম ওকে। নেনটুকে তো ছেড়ে দিল। জানিস, নেনটুকে খুব মেরেছে ওরা। ওকে ধরলেও হয়তো মারত।

এরকম উল্টোপাল্টা কথা বলত রাণু। বেশিদিন বাপের বাড়িতে থাকতে পারল না। বলল—ও যদি এর মধ্যে আসে! আমাকে না দেখে খুব রেগে যাবে।

বরকে সত্যিই ভালবাসে রাণু। আমি বাপু অত ভালবাসতে পারবো কি না কে জানে। ইচ্ছে হয় খুব ভালবাসতে। কিন্তু মাঝে মাঝে আবার কেমন যেন মন ঝিমিয়ে পড়ে।

দুপুর গড়িয়ে গেল। মনে মনে আমি অদ্রির জন্য অপেক্ষা করছি। কিন্তু অপেক্ষা করতে আর একদম ভাল লাগে না। অস্থির লাগে, চঞ্চল লাগে, ছটফট করি। যা চাই তা এক্ষুনি না পেলে এরকম হয়। দাঁত দিয়ে আঁচল ছিঁড়ে ফেলি। নখ কামড়াই। পাগল পাগল লাগে।

পাঁচটা বেজে গেল, তবু এখনও ঠিক দুপুরের মতো খর রোদ। অদ্রি এল না। আসবে না বোধ হয়। ঘরে থাকতে আমার আর ইচ্ছে করছে না। এক্ষুনি রঙের মধ্যে আমাকে ডুব দিতে হবে। রঙ—রঙ ছাড়া এখন আর কিছুই আমাকে ভোলাতে পারবে না!

পোশাক পালটে আমি বেরিয়ে পড়লাম। যাই, গড়িয়াহাটার সেই চেনা শাড়ির দোকানটা থেকে ঘুরে আসি। শাড়ির স্তূপের মধ্যে ডুব দিয়ে এলে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

বুকে ধরা শাড়ির প্যাকেট, চোখে রোদ-চশমা, দোকানের বাইরে পা দিতেই একটি ছেলে পথ আটকাল। তার হাতে সাদা একটা কৌটো, বুকে কোন্ ক্লাবের ব্যাজ্। খটাখট কৌটোটা নেড়ে বলল—কিছু সাহায্য করুন।

—কিসের সাহায্য?

—খরাক্লিষ্টদের জন্য চাঁদা তুলছি।

চাঁদার টাকা কোথায় যাবে কে জানে! ব্যাগ থেকে একটা সিকি তুলে বিরক্তভাবে দিয়ে দিই। কিছুদূর যেতে না যেতেই আবার ঐ রকম ছেলেরা মুখের সামনে কৌটো নাড়ে। বলতে থাকে—খরাক্লিষ্ট—সাহায্য করুন, কিছু সাহায্য করুন।

boiRboi.net

'খরাক্লিষ্ট' শব্দটা বড্ড বইঘেঁষা। শক্ত শব্দ। আমার মাথার মধ্যে গিয়ে শব্দটা খটাখট ধাক্কা খেতে লাগল। ভারী বিরক্তিকর কথাটা।

বাড়ি এসে দেখি সেখানেও 'খরাক্লিষ্ট' শব্দটা আমার জন্য ওঁৎ পেতে বসে আছে। মায়ের ঘরে দক্ষিণ কলকাতা মহিলা সমিতির মিটিং বসেছে। মা সমিতির সম্পাদিকাদের একজন। তাঁর ঘরে প্রায়ই মিটিং বসে।

কিছু কিছু লোক থাকে তারা উভয়লিঙ্গ। হাবুলদা বোধহয় তাদেরই একজন। নইলে মহিলা সমিতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কিসের! অথচ দেখেছি মহিলা সমিতির প্রতি মিটিং-এ তিনি উপস্থিত আছেন।

আমি ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন—মঞ্জু, তুমি তো গান জানো?

—জানি। তাতে কি?

—কাল আমরা দল নিয়ে সাহায্যের জন্য রাস্তায় বেরোচ্ছি।

—কিসের সাহায্যে?

—খরাক্লিষ্টদের।

খট করে শব্দটা গুলির মতো কান দিয়ে মাথার মধ্যে খটাখট নড়তে লাগল।

আভা মাসী মুখ ফিরিয়ে বললেন—কাল আমাদের প্রসেশন বেরোচ্ছে। গানের দল নিয়ে।

—রাস্তায় গান গাইতে আমি পারব না।

হাবুলদা ব্যস্ত হয়ে বললেন—হাঁটতে হবে না। গানের দল থাকবে লরীর ওপর। মাইক্রোফোন থাকবে—কষ্ট হবে না। তাছাড়া গান তো হবে কোরাসে, গলা না ছাড়লেই হবে।

মা বলল—আমার শরীরটা ভাল নেই, অথচ এরা খুব ধরেছে। আমি বলছিলাম আমার বদলে বরং তুই যা মঞ্জু। এই রোদ আমার সহ্য হবে না, প্রেসার বেড়ে যাবে।

মহিলা সমিতির ফাংশনে আমি অনেকবার গান গেয়েছি, নৃত্যনাট্যে পার্ট করেছি, গতবারেও চণ্ডালিকা সেজেছিলাম। স্টেজ-ফ্রাইট আমার নেই। কিন্তু এখন আর আমার ধরাবাঁধা নাচ-গান ভাল লাগে না। আমার আছে গোপন এক পাগল নাচ। আমার আছে কথাহীন ক্ষ্যাপা গান। অচেনা এক অলীক পুরুষের জন্য।

হাবুলদা আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—প্রসেশন বেশ বড় হচ্ছে। অনেকগুলো সংস্থা একসঙ্গে মিলেমিশে করছি। ফিল্ম আর্টিস্টস্ গিল্ড আছে, সবুজ সংঘ আছে, মিলন সমিতি আছে। কয়েকজন ফিল্মস্টারও থাকছেন প্রসেশনে। নামকরা গায়ক-গায়িকারা থাকবেন।

আমি মুখ গোঁজ করে বললাম—ওসব ব্যাপার আমার ভাল লাগে না।

—খুব অ্যামেজিং এফেক্ট হবে, দেখো। তাছাড়া খরাক্লিষ্টদের কথা একবার ভাবো মঞ্জু। গাঁ-গ্রাম ছেড়ে সব চলে আসছে। আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু করার আছে—

কথাগুলো আমি শুনছিলাম না। কিন্তু নিশুতরাতে শোনা ভিখিরির চিৎকার আমার কানে আসছিল। কল্পনার চোখে আমি গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরে খর রোদে খালি-পায়ে হেঁটে যাওয়া হাজার হাজার মানুষের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম। অদ্রি আমার ভিতরের সব সুখ নষ্ট করে এই ছবি স্থাপন করে গেছে।

হাবুলদা বললেন—কাল সকালে আমি তোমাকে তুলে নিয়ে যাবো। কষ্ট হবে না। যেও কিন্তু—

আভামাসী বললেন—যাবে, যাবে। মঞ্জু আবার কবে এক কথায় রাজি হয়! ওকে সব সময়ে সাধাসাধি করতে লাগে আমাদের। তাই না মঞ্জু?

হাসলাম।

—যাস কিন্তু।

অদ্রি এল না। হয়তো কালও আসবে না। মন ছটফট করে। তার চেয়ে কিছু একটা করা ভাল। মেতে থাকা যাবে।

শ্বাস ফেলে বললাম—যাবো।

আভামাসী ঠাট্টা করে বললেন—আজ কিংবা কাল আবার অদ্রি আসবে না তো! দেখিস বাপু, শেষে শাপ-শাপান্ত করবি।

হাবুলদা তাড়াতাড়ি বললেন—অদ্রিবাবু এলে তাঁকেও নিয়ে নেবো প্রসেশনে। তাহলেই তো হল!

লজ্জা পেয়ে পালিয়ে আসি। অদ্রির কথা সবাই জানে। বিয়ে ঠিক হয়ে আছে—কাজেই ঠাট্টা করতে কারো আটকায় না।

অদ্রি এল না।

পরদিন রবিবার সকালে আমাদের মিছিল বেরলো। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। ফিল্মস্টারদের গন্ধে বিস্তর রবাহূত লোক জুটেছে। প্রথমে কথা ছিল ফিল্মস্টাররা হাঁটবেন। কিন্তু ভীড় দেখে সে সিদ্ধান্ত বদলাতে হল। লরীর মাথার ওপর গদী পেতে তাঁরা বসলেন। তাঁদের দুজনের মাথায় শোলার টুপি, একজনের মাথায় ঘোমটা, চোখ সান-গ্লাসে ঢাকা। লরীর পিছনে সতরঞ্চি পেতে গায়ক-গায়িকারা বসে, পিছনে মাইক্রোফোন। লরীতে আমাদের আশেপাশে অগায়ক-অগায়িকারা বিস্তর উঠে বসে আছে। সামনে লাল শালুতে মিছিলের উদ্দেশ্য লেখা। পিছনে বেশ কয়েক হাজার মানুষ। ভলান্টিয়ারদের হাতে চাঁদার কৌটো, বুকে ব্যাজ, আবার কাপড় পেতে ধরেও যাচ্ছে কিছু লোক।

'দারুণ অগ্নিবাণে……' গানের সঙ্গে সঙ্গে মিছিল চলতে শুরু করল। আমি ঘামতে লাগলাম। এত লোক একসঙ্গে দেখে কেমন ভয় ভয় করছিল। প্রাণপণে চোখ বুজে কোরাসে গলা মিলিয়ে দিলাম।

রাস্তার দুধারে লোক দাঁড়িয়ে যেতে লাগল। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম, রাস্তার দুধারে আগে থেকে কাতার দিয়ে মানুষ দাঁড়িয়ে। এই মিছিলের খবর আজ খবরের কাগজে বেরিয়েছে। তাই এত ভীড়! মিছিল যত এগোয় ততই রাস্তার দুপাশে চাপ ভীড় বাড়তে থাকে। এত লোকের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাওয়া যায় না। হারিয়ে যাওয়া বলে মনে হয়। কানের কাছে মাইক্রোফোনের চোঙা। আমাদের গলার স্বরেই আমাদের কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছে। কেমন হঠাৎ দিশেহারা, বিশৃঙ্খল, অদ্ভুত লাগছে সবকিছু। খোলা রাস্তায় আমি কোনোদিন গান গাই নি।

চারদিকে লোকজন। তার ভিতর থেকে মাঝে মাঝে ফিল্মস্টারদের নাম ধরে কেউ

কেউ ডাকছে। আনন্দে চিৎকার করছে। লরীর ওপর থেকে স্টাররা হাত নাড়ছেন মাঝে মাঝে। দেখতে পাচ্ছি, গলদঘর্ম ভলানটিয়াররা তাদের ভরা কৌটো লরীতে ফেলে দিচ্ছে, হাত বাড়িয়ে হাবুলদার কাছ থেকে খালি কৌটো নিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ছে ভীড়ে। পয়সার ভারে ঝুলে প্রায় রাস্তা ছুঁয়েছে চারজনের হাতে ধরা কাপড়। রাসবিহারী ধরে ধীরে ধীরে মিছিল এগোতে থাকে পশ্চিম দিকে।

গান গাইতে গাইতে হঠাৎ আমার চোখে জল আসছিল। আবেগে, উত্তেজনায়। এত লোকের ভীড়, বিশাল মিছিলে মানুষের পদযাত্রা, গানের সুর, মানুষের ব্যাগ্র হয়ে পয়সা দেওয়া—এসবের মধ্যে কি একটা মহত্ত্ব রয়েছে! ঠিক বোঝানো যায় না। আমি যেন এই প্রথম রাস্তায় নেমেছি, এই প্রথম আমি এক হয়ে গেছি সর্বসাধারণের সঙ্গে, আর পাঁচজনের সঙ্গে কোরাস গাইতে গাইতে এই প্রথম আমি দুঃখী মানুষের জন্য একটা কিছু করছি।

আমি গলা ঢেলে গাইতে লাগলাম। আমার গাল বেয়ে চোখের জল নামল।

মিছিলটা আটকাল দেশপ্রিয় পার্কের কাছে। প্রথমটায় বুঝতে পারলাম না কেন। রাস্তার মাঝখানে অল্পবয়সী ছেলে ছোকরা আর ফটোগ্রাফাররা লরীর আগে আগে হাঁটছে অনেকক্ষণ। তাই মাঝে মাঝে লরী আটকাচ্ছিল, থেমে থেমে চলছিল। কিন্তু এবার একদম দাঁড়িয়ে গেল। আমরা ঘুরে ফিরে 'বাংলাদেশের হৃদয় হতে…' গেয়ে যাচ্ছিলাম। গানের তীব্র শব্দ ভেদ করে চিৎকার ভেসে আসছিল। অবশেষে আমাদের গান থামাতে হল। মিছিলটা আটকে গেছে। কে যেন মিছিল যেতে দিচ্ছে না।

লরীর সামনে ছুটে যাচ্ছে লোকজন, ভলান্টিয়াররা চিৎকার করছে। কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

আমি তখনো আমার চোখের জল মুছিনি। উঠে লরীর ধার থেকে গলা বাড়িয়ে দেখি, রাস্তার মাঝখানে লরীর সামনে পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা ছেলে। পা ফাঁক করে দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে তারা পথ আটকে আছে। মাঝখানের ছেলেটার ভঙ্গী অন্যরকম। সে চিৎকার করে কিছু বলছে। শোনা যাচ্ছে না। লম্বা, রোগা কালো ছেলেটা, কিন্তু তার দুই চোখ ধক্ ধক্ করে জ্বলছে। সে কি বলছে তা শোনার জন্য অনেক দূর গলা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম, পিছন থেকে হাবুলদা আমার হাত টেনে বললেন—মঞ্জু, পড়ে যাবে, দেখো। আমি সেদিকে খেয়াল করলাম না। হাত ছাড়িয়ে নিলাম। ছেলেটাকে আমি দেখেছি। কোথায় যে দেখেছি, কবে যে!

ছেলেটা এক পা এক পা করে এগিয়ে এল। ভলান্টিয়াররা তার পথ আটকাচ্ছে। ছেলেটা তার আগুনে চোখে লরীর মাথার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল—এটাও কি অভিনয়?

চারদিকে লোকের চিৎকারে কিছু শোনা যাচ্ছিল না। আমি উগ্র আগ্রহে ছেলেটার দিকে মুখ করে শোনার চেষ্টা করছিলাম। ছাড়া ছাড়া ভাবে শুনতে পেলাম—এটা তো তামাসা। …রাস্তায় নেমেছেন যখন, রাস্তাতেই নামুন…মানুষের দুর্দশা বাংলাদেশ ঘুরে দেখে আসুন, নইলে বাড়ি ফিরে যান…এটাই কি স্থায়ী ব্যবস্থা যে যতবার বন্যা বা খরা হবে ততবার আপনারা রঙমিছিল নিয়ে বেরোবেন…এটাই বাংলাদেশের মানুষের সমস্যার স্থায়ী সমাধান? ডোল আর দয়া?…ঘেন্না করে না?…ফিরে যান, নতুন কিছু

ভেবে বার করুন…তামাসা করবেন না…বাংলাদেশের মানুষ কেন আপনাদের দয়ার জন্য বসে থাকবে? কালকের খবরের কাগজে আপনারাই বা কোন্ ঘেন্নায় নিজেদের ছবি দেখবেন, আর দয়ার কথা পড়বেন?…ফিরে যান…মানুষকে ভালবাসা এত সহজ নয়…

কথাগুলো সে বলছিল তীব্রতার সঙ্গে, রাগে আক্রোশে তার মুখ তামাটে। রোদ জ্বলছে তার চোখে। গায়ে হাওয়াই শার্ট, পরনে ভাঁজহীন রঙহীন প্যান্ট, পায়ে চপ্পল। এই তুচ্ছ পোশাকের সামান্য ছেলেটা একা মিছিল আটকে দাঁড়িয়ে আছে, পিছনে তার কয়েকজন মাত্র সঙ্গী। এত বড় মিছিলের সামনে এটা কোন প্রতিরোধই নয়। প্রকাণ্ড লরীটা অনায়াসে ওদের গুঁড়িয়ে দিয়ে যেতে পারে। হাজারটা মানুষ ছিঁড়ে ফেলতে পারে ওদের। ভয়ে আমার বুক কাঁপছিল। যদি সত্যিই মানুষজন ওরকম কিছু করে? ছেলেটা কেন ভয় পাচ্ছে না? কেন সরে যাচ্ছে না? আমি যে ওকে দেখেছি। সেই সামান্য চেনাটুকু মায়া হয়ে আমার বুকের ভিতরে ঢেউ তুলছে।

কয়েকজন সম্ভ্রান্ত চেহারার লোক এগিয়ে গিয়ে ছেলেটার সঙ্গে নিচুস্বরে কথা বলছেন। ছেলেটা মাথা নাড়ল। পথ ছাড়বে না। একজন ওর হাত ধরতেই ছট্‌কে হাত ছাড়িয়ে নিল। কোনো কথাই ও মানল না। মিছিল ও আটকাবেই। ওর ধারণা, বাংলাদেশের দুঃখী মানুষদের নিয়ে এ এক রঙ-তামাসা।

আশ্চর্য এই, আমার আবেগ হঠাৎ কোথায় উবে গেল। একটু আগে মহত্ত্বের ভাব চারপাশে অনুভব করে আমি কাঁদছিলাম। এখন হঠাৎ কেঁদেছি বলে আমার লজ্জা করতে লাগল। ঠিক। মানুষকে ভালবাসা অত সহজ নয় বোধহয়। হঠাৎ আমার ভয়ঙ্কর ক্লান্তি লাগছিল। গান গাওয়ার কষ্ট, রোদ, ঘাম এতক্ষণ এসব টেরও পাচ্ছিলাম না। অসম্ভব আবেগ। হঠাৎ গলার দুধারে ব্যথা করছিল, অসহ্য লাগছিল রোদ আর ভীড়। খুব তেষ্টা পেয়েছে আমার। দিশেহারার মতো আমি চারদিকে চেয়ে দেখছিলাম। এই মিছিল থেকে পালাবার কি কোনো পথ নেই?

কে যেন চিৎকার করে আমার কানের কাছে বলল—পুলিশ আসছে। পুলিশ—

সেই মুহূর্তেই ভীড়ের ভেতর থেকে দুটো গুণ্ডা চেহারার লোক বেরিয়ে এল। এতক্ষণ ওদের আমি দেখেছি লরীর পিছনের পাল্লায় বসে চুপচাপ সিগারেট খাচ্ছে। মাঝে মাঝে হাবুলদার সঙ্গে চোখের ইশারায় কি কথা বলে হাসছিল। নিঃশব্দে কখন লরী থেকে নেমে গেছে। তাদের একজন এগিয়ে গিয়ে ছেলেটার কাঁধে হাত রেখে কিছু বলল। ছেলেটা স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে আগুনে চোখ তুলে তাকাল। উত্তর দিল। শোনা গেল না। তারপরই দুজন দুদিক থেকে হঠাৎ ছেলেটার দুই হাত ধরল। রোগা ছেলেটা, গুণ্ডাদের হাতে এবার মার খাবে। আমার সমস্ত অস্তিত্ব দুই চোখে এনে আমি দৃশ্যটা দেখছিলাম! ছেলেটা কিন্তু সামান্য হাসল। লোকদুটোর দিকে তাকালও না। কেবল শরীরটায় একটু মোচড় দিয়ে হাত দুটো অনায়াসে ছাড়িয়ে নিল। তারপর আঙুল তুলে, ছেলেটা শাসাল। আমি শুনতে পেলাম, সে বলছে—তোমাদের দিন শেষ হয়ে আসছে।

শুনে লোকদুটো থমকে গেল। পরমুহূর্তেই লাফিয়ে পড়ল ছেলেটার ওপর। তারপর শুধু হাত, আর পা, আর মানুষের শরীর জড়িয়ে গিয়ে কি একটা হতে লাগল, আমি তার কিছু বুঝলাম না। ভীড় ঢেকে দিল সবকিছু।

গোলমালের মধ্যেও হাবুলদা আমাকে চোখে চোখে রেখেছেন। তিনি এসে আমার হাত ধরলেন আবার—মঞ্জু, ভয়ের কিছু নেই।

আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু না ভেবেই হঠাৎ বললাম—ওই লোকদুটোকে আপনি পাঠিয়েছেন হাবুলদা?

তিনি সবিস্ময়ে বললেন—কোন্ লোকদুটো?

—ওই যে যারা ছেলেটাকে মারছে।

—না তো! মারবে কেন, সরিয়ে দিচ্ছে, ছেলেটা পাগল।

আমি বললাম—আমার শরীর খুব খারাপ লাগছে। আমি চলে যাবো।

—সে কী! মিছিল তো সবে শুরু হয়েছে। নার্ভাস হয়ো না। এসব কিছু নয়। কত রকমের ছেলেছোকরা বদমাশ আছে কলকাতায়। এক্ষুনি সব ঠিক হয়ে যাবে।

—না। আমি পারছি না। আর একটুক্ষণ থাকলেই আমি অজ্ঞান হয়ে যাবো। আমাকে নামিয়ে দিন।

—সিরিয়াসলি বলছ?

—সিরিয়াসলি।

—আমি থাকতে তোমার কিছু ভয় নেই।

—না, আমি ভয় পাচ্ছি না। আমার পক্ষে আর যাওয়া সম্ভব না। আমি বাড়ী যেতে চাই।

হাবুলদা দাঁতে ঠোঁট কামড়ে কী একটু ভেবে বললেন—তুমি যখন চাইছো না—

—প্লীজ, আমাকে নামিয়ে দিন।

—ঠিক আছে। দাঁড়াও।

ভীড় আর গোলমালে কেউ আমাদের লক্ষ্য করছিল না। আমি হাবুলদার হাত ধরে খানিকটা ঝুলে, ছেঁচড়ে লরী থেকে ঝুপ করে নামলাম। ভীড় ঠেলে বেরিয়ে এলাম বাইরে। পিছন পিছন এসে হাবুলদা বললেন—তুমি একা যেতে পারবে?

—পারবো।

—মিছিলটার সঙ্গে আমাকে থাকতেই হবে, নইলে তোমাকে ঠিক পেঁছে দিতাম মঞ্জু।

হাবুলদা ফিরে গেলেন। আমি উদ্‌ভ্রান্তের মতো লোকজন ছাড়িয়ে ফাঁকার দিকে হাঁটতে লাগলাম। পিছনে তখন খুব চিৎকার, গোলমাল শোনা যাচ্ছে। মিছিলটা বোধ হয় শেষ পর্যন্ত ভেঙেই যাবে।

আমি আর ফিরে তাকালাম না। হাঁটতে লাগলাম, দিশেহারা উদ্‌ভ্রান্তের মতো। আমি যেন একটা সঙের দলে ছিলাম এতক্ষণ। আমার বিশ্রী লাগছিল।

ভীড় ছেড়ে ফাঁকায় পড়লাম। রাস্তাঘাট এখন স্বাভাবিক। উত্তেজনা নেই, আবেগ নেই, শান্ত মানুষেরা হাঁটছে। খুব ভাল লাগছিল আমার। যেন খুব জ্বর উঠেছিল, নেমে গেছে। শরীরটা দুর্বল, ঘাম দিচ্ছে, বুক জুড়ে তেষ্টা।

সামনেই একটা টিউবওয়েল। একটা পশ্চিমালোক হাতল লাগানো টিনে জল ভরছে। কোনো দ্বিধা না করে তার সামনে গিয়ে বললাম—ভাই, একটু জল খাবো।

—জী।

সে সসম্ভ্রমে তার টিন সরিয়ে পাম্প দিতে লাগল। আমি দু আঁজলা ভরে অনেক

জল খেলাম। লোকটা, গরিব পশ্চিমা লোকটা, স্নিগ্ধ চোখে আমাকে দেখল। এই হচ্ছে দয়া, ভালবাসা। কাছাকাছি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এক মানুষ অন্যজনের আঁজলা ভরে দেয় তেষ্টার জল। এর তুলনায় ওই মিছিল কী ভীষণ কৃত্রিম! মিছিলের শেষে ক্লান্ত হয়ে যে যার বাড়ি ফিরে আবার নিজস্ব জীবন যাপন করে যাবে। বাংলা দেশের মানুষ আবার পথে বেরোবে ভিটে ছেড়ে, মাইলের পর মাইল হাঁটবে শহরের দিকে ভিক্ষের আশায়। ছেলেটা ঠিকই বলেছিল।

রাস্তাটা চেনা লাগছে। এ রাস্তাতেই রাণুর বাড়ি না। ওই তো পুরোনো দোতলা বাড়িটা, রেলিং থেকে গোলাপী শাড়ি ঝুলছে। কেমন আছে রাণু কে জানে! ওর বর ফিরল কি! যাই, এক কাপ চা চাই রাণুর কাছে, তারপর মনপ্রাণ দিয়ে ওর কান্না শুনবো, ওর বরের ভালবাসার কথা শুনবো। সেই ভাল। কারো দুঃখের কথা শুনতে বড় ইচ্ছে করছে আমার।

খুব খুশি হল রাণু, তার অবস্থায় যতখানি খুশি হওয়া যায়। কাল রাতের চোখের জলের চিহ্ন এখনো চোখের কোল ভরে আছে।

বলল—ওমা! আয় মঞ্জু, ভিতরে আয়। বুকে আয় মঞ্জু—

বলে জড়িয়ে ধরল। বলল—কী চেহারা রে তোর! রোদে বেরিয়েছিলি বুঝি।

—রাণু, এক কাপ চা খাওয়াবি?

—ওমা! খাওয়াব না! আর কি খাবি বল?

—কিছু না।

—মুখপুড়ি তোর বুঝি খিদে পায়নি?

রাণু চা করে আনল, তেল দিয়ে মেখে আনল এক বাটি মুড়ি। খুব তৃপ্তির সঙ্গে খেলাম। কতকাল মুড়ি খাই না।

বারান্দার দিকে জানালা দিয়ে সেই দড়িতে ঝোলানো ভারী বালির বস্তাটা দেখা যাচ্ছিল। অদ্ভুত বস্তাটা।

—রাণু, ওটা কি রে?

রাণু হাসল—নেনটুর কাণ্ড। মন মেজাজ খারাপ থাকলে ওই ভারী বস্তাটা নিয়ে কি হুটোপাটি করে! এক একদিন বস্তাটা দুলিয়ে সামনে দাঁড়ায়, ওই ভারী বস্তা এসে শরীরে লাগে, পড়ে যায়, মুখচোখ ফেটে রক্ত পড়ে।

—কেন?

—পাগলামি। ওদের তিন ভাইয়ের মধ্যে দুটোই পাগল। বড়টা আর ছোটোটা। সেই জন্য দুটোতে খুব ভাব। বড়দার চাকরি গেল বলে ছোটোজন তার পোস্ট অফিসে জমানো টাকা তুলে এনে বড়দার হাতে দিল।

রাণু অন্যমনস্ক হয়ে গভীর শ্বাস ছাড়ল একটা—সেই টাকা থেকেই যত অশান্তি।

—তোর ছোট দেওরকে আমি কখনো দেখিনি।

—না। ও আমাদের বাড়ি যায় না।

—কেন?

—কি জানি। লজ্জা পায় বোধহয়। কিন্তু খুব যে লাজুক তাও নয়। দশজনের

boiRboi.net

সামনে রুখে দাঁড়াতে পারে। সেদিন বাবার ঠাকুরঘর থেকে পুলিশকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল, আর তার জন্য খেটে এল জেল। মামলাও চলছে। নেনটু ওই রকমই। আগে বক্সিং করত। বাবা বকে বকে ছাড়িয়েছে। কিন্তু এখনো বক্সিংয়ের সেই রোখটা রয়ে গেছে ওর ভিতরে। ওদের দুজনকে নিয়ে বড় জ্বালা এ সংসারে।

অনেকক্ষণ বসলাম রাণুর ঘরে। কথায় কথায় ক্লান্তি কেটে গেল। ভর দুপুরে উঠলাম।

সিঁড়ি দিয়ে নামছি, সঙ্গে রাণু। এ সময়ে নীচে থেকে সিঁড়ি বেয়ে একজন উঠে আসছে। তাকে দেখে আমার ভিতরটা চমকে উঠল। রোগা, লম্বা, কালো সেই ছেলেটা।

—নেনটু। রাণু আমাকে বলল, তারপর তার দিকে চেয়ে বলল—নেনটু, এই আমার বন্ধু মঞ্জু।

সে ভ্রুক্ষেপও করল না। গভীর চিন্তান্বিত তার লম্বাটে মুখ। একবার মুখ তুলে বলল—ও।

তারপর আমাদের পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে গেল।

রোদ-চশমাটা পরে নিয়ে বাইরের খরার পৃথিবীর দিকে চেয়ে বললাম—চলি।

—আসিস। যখন খুশি আসিস। বড় ভাল লাগে রে।

—আসবো।

॥ সোমসুন্দর ॥

মনোতোষ বোধ হয় বাজীটা হেরে গেল। আজ তার বাজীর সাত দিন। বড়দা আসেনি। বাজীটা জিতে যাচ্ছি বলে কিন্তু আমি একটুও খুশি নই। বড়দা এলে আমি দৌড়ে গিয়ে মনোতোষের বাজীর পাঁচটা টাকা দিয়ে আসি।

পরশুদিন আর একবার বাড়ি সার্চ হয়ে গেল। ঠিক সার্চ নয়, খোঁজখবর। থানা থেকে কয়েকজন লোক এসে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গেছে। তখন বেশ রাত। অফিসার আর কয়েকজন কনস্টেবল এসে কড়া নেড়ে ঘরে ঢোকে। বড়দার ঘরে তারা একবার মাত্র উঁকি মারে। তারপর বাসার সব লোককে ছেড়ে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। কেন জানি না, আমার ওপরই তাদের রোখটা বেশি।

অফিসার হাসিমুখে বললেন—খবর আপনারা ঠিকই জানেন। বলছেন না।

আমি ধীর গলায় বললাম—সত্যিই জানি না।

উনি উলটে তখন জিজ্ঞেস করলেন—জানলে কি করতেন? বলতেন?

চুপ করে থাকি।

উনি হাসেন, বলেন—হাজত জায়গাটা খারাপ হলেও নিরাপদ। সেখানে প্রাণের ভয় কম। হাজতের বাইরে বাংলাদেশটা কিন্তু নিরাপদ নয়। আপনার দাদা আমাদের হাতে ধরা না পড়লেও অন্য কারো হাতে ধরা পড়তে পারেন।

উদ্বেগে আর দুশ্চিন্তায় আমার ভিতরটা কেমন হয়ে গেছে। বড়দার এই পরিণতির কথা আমিও ভাবি। ভিতরটা কাঁপে, দুর্বল লাগে।

অফিসার বললেন—তাই বলছিলাম, জানা থাকলে বলে দিন। ওঁর প্রাণের ভয়টা অন্তত আমাদের কাছে নেই।

boiRboi.net

ঠিক এই সময় বাবা আমার পিছন থেকে বললেন—প্রাণের ভয় আবার কি ? প্রাণে কি ও বেঁচে আছে নাকি ! মেরে ফেলেছে নিশ্চয় এতদিনে—

অফিসার কৌতূহলে বাবাকে দেখলেন, বললেন—তার মানে ? কে মেরে ফেলেছে ?

বাবা হঠাৎ কথাটা বলে ফেলে পরমুহূর্তেই ঘাবড়ে গেছেন। আমতো আমতো করে বললেন—যে কেউ মেরে ফেলেছে। এখন তো সবাই খুনে।

অফিসার শ্বাস ফেলে উঠে বললেন—কারেক্ট কোনো ইনফর্মেশন থাকলে আমাদের জানাবেন।

আমি মাথা নাড়লাম।

উনি চলে যেতে যেতে ফিরে একবার আমাকে দেখলেন। বললেন—আপনার কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কিছু নেই তো !

—না।

উনি ভ্রূ কুঁচকে একটু তাকিয়ে থেকে বললেন—কয়েকদিন আগে এ পাড়ার কয়েকটা ছেলে একটা মিছিলের ওপর হামলা করে। মিছিলটা ছিল খরাক্লিষ্টদের জন্য সাহায্যের মিছিল। বড় বড় লোক তাতে ছিলেন। তাঁরা ডায়েরীও করে রেখেছেন, কিন্তু ছেলেগুলোকে আমরা কিছুতেই আইডেন্টিফাই করতে পারছি না। তারা কারা জানেন ?

আমি মাথা নাড়লাম।

উনি হাসলেন—ওঁদের দেওয়া একটা ছেলের বর্ণনার সঙ্গে কিন্তু আপনার বেশ মিল। সেই ছেলেটা তিন চারটে ছেলেকে ঘুঁষি মেরে ফেলে দেয়, তারপর ঘুঁষি চালাতে চালাতে ভিড় কেটে বেরিয়ে যায়। অতগুলো লোক তাকে ধরতে পারেনি।

আমি চুপ করে থাকি।

উনি ঠাণ্ডা গলায় বললেন—যতদূর জানি আপনি বক্সার ছিলেন। না ?

আমি একটা শ্বাস ফেলি।

উনি সেটা লক্ষ্য করলেন। বললেন—সোমসুন্দরবাবু, মিছিলটা কিন্তু কোনো পলিটিক্যাল মিছিল ছিল না। মিছিলটার উদ্দেশ্যও ভালই ছিল। তবু কেন তার ওপর কয়েকটা ছেলে হামলা করেছিল ? আপনি একটু ভেবে দেখবেন, ছেলেগুলো কাজটা ঠিক করেছিল কিনা। একটা নন-পলিটিক্যাল মিছিলের ওপর এই অ্যাগ্রেশনের কোনো মানে হয় না।

এই সব প্রশ্নের কোনো উত্তর হয় না ! সুন্দর অদ্রিকে দেখে দাদার বিয়ের আসরে আমার যেমন অযৌক্তিক রাগ হয়েছিল, এ-ও তেমনি একটা ব্যাপার। মিছিলটায় অনেক সুন্দর ছেলেমেয়ে ছিল, চিত্রতারকারা ছিলেন, গায়ক-গায়িকারা ছিলেন। মিছিলের ওই অভিজাত সৌন্দর্যটা আমার সহ্য হয় নি। পরিণতি কি হবে না ভেবেই আমি আমার রাস্তার বন্ধুদের ডাক দিয়ে ছুটে গিয়ে মিছিল আটকাই। আমার বন্ধুরা ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারেনি। তারা আমাকে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে হুজ্জুতে খানিকটা জড়িয়ে পড়ে। তারপর গোলমাল দেখে পালায়। তিন-চারজনের সঙ্গে নয়, মাত্র দুজনের সঙ্গে আমার হাতাহাতি হয়েছিল। তারা দিলীপ আর বাবু। এই এলাকার সবাই ওদের চেনে। নামকরা গুণ্ডা। দিলীপের সঙ্গে এক সময়ে গড়িয়াহাটায় আমি বিস্তর আড্ডা দিয়েছি। পুলিশের কাছে দিলীপ আমার নাম অনায়াসে বলতে পারত। বলেনি

দেখে অবাক লাগছিল। বস্তুতঃ ওই ঘটনার পর প্রতিমুহূর্তেই আমি পুলিশের জন্য অপেক্ষা করেছি।

অফিসার আমার মুখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে ছিলেন। আমি চোখ নামিয়ে নিলাম।

চলে যাওয়ার আগে উনি বললেন—আপনি একটু বেশিমাত্রায় অ্যাগ্রেসিভ।

পুলিশ চলে গেলে বাবা আমার মুখের দিকে একটু চেয়ে রইলেন! তারপর খুব হতাশ গলায় বললেন—মিছিলের ওপর হামলা করেছিস নাকি?

আমি হাসলাম—ও কিছু না।

বাবা বললেন—তোদের গায়ে কীসের জ্বালা কে জানে! তোরা দুটো ভাই আমাদের শান্তি দিবি না নাকি?

আমি অপরাধী মুখ করে চুপ করে থাকি।

বাবা বড় শ্বাস ফেলেন—ভেবেছিলাম, বাবার গায়ের জ্বালা যখন আমার মধ্যে নেই তখন আমার ছেলেদের মধ্যেও থাকবে না। কিন্তু ঠিক থার্ড জেনারেশানে বাবাই আবার ফিরে এসেছেন। তোকে দেখলে আমার বুক কাঁপে।

বারান্দায় অনেকক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন বাবা। আমি রেলিঙে ভর দিয়ে বাইরের দিকে চেয়েছিলাম। পুলিশ এসে চলে যাওয়ার পরও একমাত্র ছোড়দাই স্বাভাবিক আছে। বই নিয়ে আইনের ধারা মুখস্থ করছিল। ওর সামনে এখন আমরা কেউ নেই। আছে সুন্দর মেয়ে মালা, আছে ভবিষ্যৎ। পুলিশের বুটের শব্দে বাচ্চাটা উঠে পড়েছিল, তাকে আবার ঘুম পাড়িয়ে বৌদি এসে বারান্দায় বসল। মা ছোড়দার বিছানায় বসে আছে, হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ওর পিঠে। ছোড়দাকে এ সময়টায় মশা কামড়ায়। অন্য হাতে মা চোখের জল মুছছে—একটু আগে দেখে এসেছি।

বাবা মাথা টিপে ধরে বললেন—তোমাদের সংসারটা ভেসে যাচ্ছে বৌমা। সামাল দিতে পারবে না। ঐ নেনটুকে ধরে নিয়ে যাবে পুলিশে। খুব মারবে। মেরেই ফেলবে। আর একজনকে তো মেরে ফেলেছেই।

বৌদি চাপা ধমক দিয়ে বলল—কি বলছেন? অলক্ষুণে কথা—

বাবা মাথা নাড়েন—না হলেই ভাল। কিন্তু সত্য বাড়ির বাইরে কোথাও এতদিন থাকেনি। বড় ভীতু ছেলে, খুঁতখুঁতে। ও কি কোথাও গিয়ে থাকতে পারে? মেরেই ফেলেছে, লাশ সরিয়ে ফেলেছে কোথায়—

—বাবা? বৌদি আর্তনাদ করে।

মা উঠে এসে বলে—আস্তে কথা বলো। নিতু পড়ছে।

আমরা চুপ করে যাই। তারপর বারন্দায় তিনজন নিজেদের তিনরকম ব্যক্তিগত চিন্তায় মগ্ন হই। একা হয়ে যাই। গভীর রাত পর্যন্ত আমরা কেউ শুতে যাই না। ঘুমের কথা মনেই আসে না। রেলিঙে ভর দিয়ে আমি সামনের দিকে চেয়ে থাকি। বৌদি নিঃশব্দে কাঁদে। বাবা চুপ, পাথরের মতো। সেই নিস্তব্ধতায় কেবল ছোড়দার বই পড়ার গুন্ গুন্ শব্দ হয়।

মা কোন্ দলে তা ঠিক বোঝা যায় না। মা এখন যেমন নির্বিকারভাবে ছোড়দার পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, ঠিক ঐরকম দরকার হলে আমার পিঠেও দেবে। বড়দা ফিরে

এলে বড়দার পিঠেও হাত বোলাবে। মাঝে মাঝে মাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করি—আমাদের মধ্যে কাকে বেশি ভালবাসো মা? মা ফোকলা মুখে হাসে। আমার মা ঐরকমই। নন্দরাণী ছিল মার কোল-পোঁছা মেয়ে। সে মরে যাওয়ার পর থেকেই মার বোধবুদ্ধি যেন কেমন কমে গেছে।

অনেক রাত পর্যন্ত আমি মাকে নিয়ে ভাবলাম।

এ সবই পরশুদিনের কথা। মনোতোষ বলেছিল, সাতদিনের মধ্যে বড়দা ফিরবে। আমার মন বলছিল, মনোতোষ জিতে যাবে। কিন্তু আজ সেই সাতদিনের দিন। বড়দা ফেরেনি।

পুলিশ আমাদের কাছে বড়দার খোঁজ নেয়। আবার আমরা নিই পুলিশের কাছে। আজ সকালেই মালার বাবা সুধাংশুবাবু এসে আমাকে ডেকে নিলেন। ফর্সা বেঁটেখাটো লোকটি, দুটো চোখে খুব বুদ্ধির ঝিলিক। সন্ধের পর একটা পকেটওয়ালা ফতুয়া আর লুঙ্গি পরে যখন নিচের তলার ঘরে এসে বসেন তখন মক্কেলদের ভীড় লেগে যায়। আস্তে আস্তে ফতুয়ার পকেট টাকায় ফুলে ওঠে। গোনার সময় পান না। বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন এক আই-এ-এস্ অফিসারের সঙ্গে। দুই ছেলের একজন পুনায় চাকরি করে, অন্যজন নেপালের ভদ্রপুর থেকে বিদেশী জিনিস কিনে এনে কলকাতায় বেচে। বাড়িতে থাকে কমই। মোটামুটি সুধাংশুবাবুর মতো সুখী লোক দেখা যায় না। সে কথা তিনি পাঁচজনের কাছে স্বীকারও করেন। সন্তোষপুরে দুই বিঘা জুড়ে বাড়ি করেছেন। পুকুর আছে, বাগান আছে, গরু আছে। বারান্দায় গ্রীল, প্রতি ঘরে বাথরুম, মেঝেয় দামী মোজাইক। সেখানে কেউ থাকে না, একমাত্র মালি আর গরু দেখাশুনো করার লোক ছাড়া। মাঝে মাঝে কেবল তাঁরা ওখানে বেড়াতে যান। তিনচার দিন থেকে আসেন। রোজ সকালে সন্তোষপুর থেকে প্রথম বাস্-এ তাঁদের দুধ আসে, ফুল আসে, তরিতরকারী, এমন কি মাছও আসে। সেই বাড়ির ছবি তুলে দেয়ালে টাঙিয়ে রেখেছেন। মক্কেলরা দেখে, আমরাও দেখেছি। মক্কেলদের মাঝে মাঝে কেস হিস্ট্রির ফাঁকে ফাঁকে বলেন—লোকে বলে পুকুরভরা মাছ, গোয়ালভরা গরু, এসব সত্যযুগের কথা। কিন্তু আমার সন্তোষপুরের বাড়িতে যদি যান দেখবেন অবিকল তাই। পুকুরে মাছ, তিনটে হরিয়ানার গাই চব্বিশ সের দুধ দেয়, বাগানে তরিতরকারী, আমজামকলা, ছেলে দুটো বাইরে থাকে, ছোটো মেয়েটা তো খাওয়ার নামে মুখ সিঁটকোয়, আমরা বুড়োবুড়ি—তা খায় কে?

কোনো মক্কেল পরামর্শ দেয়—বেচে দেন না কেন?

শুনে ভারী রেগে যান—বেচবো কেন? বেচার জন্য তো করা নয়। আমার বড়লোক বাপ অল্প বয়সে একবার তাড়িয়ে দিয়েছিল বাড়ি থেকে। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, নিজের রোজগারে বাপকে ছাড়িয়ে যাবো। বলে হাসলেন। সে হাসিতে তৃপ্তি ফুটে ওঠে। বলেন—বাগানে তরিতরকারী শুকিয়ে যায়, গাছের ফল পেকে পড়ে যায়, গরুর দুধ খেয়ে নেয় বাছুর, মাছের গায়ে শ্যাওলা পড়ে—মশাই, এ আমার ভালই লাগে।

বেঁটে মানুষ। ট্রামে-বাসে মানুষের বগলের গন্ধ শুঁকতে হয়। তাই একটা গাড়ি কেনার কথা ভাবছেন ইদানিং! ভাতঘুমটা এই বয়সে বড্ড জ্বালায়। ফলে ট্রামে ঘুমের ঝোঁকে মাথাটা গোঁত্তা খেয়ে অন্যের গায়ে লাগে, লোকেরা ব্যঙ্গ করে। গাড়ি হলে দিব্যি

নিরিবিলিতে গাড়ির কোণে মাথা রেখে ঘুমটি পরিপাটি সেরে নেবেন।

সুখী সুধাংশুবাবু গম্ভীর মুখে আমাকে ডেকে বললেন—নেনটু, গত রাত্রে থানায় কিছু লোক ধরে এনেছে। একবার যাবে নাকি? যদি সত্য ওর মধ্যে থেকে থাকে!

তাঁর গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে একটুও দেরি হয় না যে আমার বড়দার জন্য তাঁর দুশ্চিন্তা নেই। আছে বিরক্তি। তাঁর সুখের জীবনে কোথাকার কে এক সত্যসুন্দর —কাক যেমন গেরস্তর বাড়িতে মরা ইঁদুর ফেলে যায়—তেমনি এক অদ্ভুত সমস্যা ফেলে গেছে। সত্যসুন্দর ফিরে এসে যতক্ষণ না আগের মতোই সংসারের ভার নিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত নিত্যসুন্দরকে কেড়ে নেওয়া যাচ্ছে না। মালা বড় একগুঁয়ে জেদি। অবিমৃষ্যকারীও বলা যায় তাকে। নিত্যসুন্দর পাত্র হিসেবে কিছুই না। জুডিসিয়ারি পাস করে মুনসেফ হলেও তাঁর বড় জামাইয়ের পাশে দাঁড়াতে পারবে না। নিত্যসুন্দরের আছে কেবল চেহারাটা। লম্বা ছিপছিপে ফর্সা, টেনিস খেলোয়াড়ের মতো ফিগার আর অসম্ভব সুন্দর মুখশ্রী। মুখখানা লম্বাটে, কালো মিশমিশে ভ্রু, টানা চোখ, সুন্দর নাক, ঠোঁট। সিনেমার পর্দা থেকে নেমে-আসা চেহারা। তবু সুধাংশুবাবুর বিষয়ী চোখ জানে, এসব জীবনে খুব একটা কাজে আসে না। এবং সুন্দর চেহারার বখেড়া অনেক, দাবিদার জুটে যায়। তবু মালার এই পছন্দকে তাঁদের মেনে নিতে হয়েছে। নিত্যসুন্দরের অবাধ যাতায়াত ও-বাড়িতে। ওই পরিবারের সঙ্গে সন্তোষপুরের বাড়িতেও কখনো কখনো চড়ুইভাতি করে আসে নিত্যসুন্দর। ফিফটি পার্সেন্ট জামাই হয়ে গেছে। লোকে জানে, আত্মীয়স্বজনরাও জেনে বসে আছে। সংসারের এই সব পাকা ঘুঁটি আর কাঁচানো যায় না। তাই নিত্যসুন্দরকে আলাদা হওয়ার পরামর্শ দিয়ে রেখেছেন তাঁরা। আমরাও জানি। সামনের মাসে বিয়েটা হয়ে গেলে নিত্যসুন্দর আলাদা হতেও পারে। গোল বাঁধিয়েছে সত্যসুন্দর। এই বুড়ো বয়সে কেউ যে এমন ছেলেমানুষী করতে পারে তা সুধাংশুবাবুর জ্ঞান অভিজ্ঞতায় আসেই না। ছোটজামাই জালে পড়ে ছটফট করছে, সুধাংশুবাবু টেনে তুলতে পারছেন না।

তাঁর গম্ভীর, চিন্তিত মুখের দিকে চেয়ে আমার একটু কষ্ট হল। কদিন আগে ভাবী আত্মীয়তার খাতিরে আমাকে তিনি জামিন দিয়ে নিয়ে এসেছেন। সত্যসুন্দরের এখনো খোঁজ নেই।

আমি বিনীতভাবে বললাম—বড়দা বোধহয় কলকাতায় নেই। থাকলে একটা খবর দিত ঠিকই। ছেলেটাকে বড্ড ভালবাসে। তাকে ছাড়া থাকতেই পারে না। তারও একটা খবর নেওয়ার চেষ্টা করত।

বড়দা তার শিফট ডিউটির শেষে যখন তখন ফিরত। ফেরার ঠিক ছিল না। কিন্তু যে সময়েই ফিরুক নিচের তলায় সিঁড়ির প্রথম ধাপটিতে পা দিয়েই ছেলের নাম ধরে চিৎকার করতে করতে উঠত। বাচ্চা বুবলা সাড়া দিত। ছুটে যেত সিঁড়ির মুখে। আনন্দে কেঁপে কেঁপে হাসত। আজকাল বুবলা ঘুমের মধ্যেও চমকে জেগে উঠে পরিষ্কার রাগের গলায় জিজ্ঞেস করে—মা, বাবা কোথায়? তার মা তাকে কত ভোলায় —এই তো আসবে। তোমার জন্য কত কি আনবে। পুতুল, বল, চকলেট—কত কি—! ছেলেটা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে। পৃথিবীর সর্বত্র একই নিয়মে বাচ্চাদের স্তোক দিয়ে, ভুলিয়ে রাখা হয়। বাচ্চারা ভুলে থাকে। কিংবা হয়তো মনে রাখে। আমরা

জানি না। তবে, বুবুলো তার বাবাকে ভুলে যাচ্ছে এ কথা ভাবতে আমার কষ্ট হয়।

সুধাংশুবাবু চিন্তিত মুখে বললেন—তবু একবার দেখে আসা ভাল। যদি সত্য থেকে থাকে তো জামিন দিতে হবে।

ও. সি. মানুষটি ভালই। যদিও মুখে অবিরল খারাপ কথা লেগে আছে। তবু তাঁর মাথা ঠাণ্ডা, হাসিটি সহৃদয়তায় ভরা। কানাঘুষোয় শুনেছিলাম, দর্শনশাস্ত্রে এম-এ। আমাকে দেখে মুখ তুলে হাসলেন, বললেন—কি, গায়ের ব্যথা কেমন ?

আমি চুপ করে রইলাম। গায়ের ব্যথা মরে গেছে। কিন্তু আমি কিছুই ভুলি না।

উনি গলা নিচু করে বললেন—কনস্টেবলরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, গাঁওয়ার, ওদের ব্যবহার মনে রাখবেন না। মারধরের নিয়ম চলে আসছে, আমরা ঠেকাতেও পারি না। সারাদিন চোরচোট্টা পকেটমার নিয়ে কারবার—বোঝেন তো ! অটোমেটিক্যালি মুখ খারাপ করে ফেলি, হাত উঠে যায়। বসুন না, বসুন।

বললেন—দাদার কোনো খবর পেলেন ?

মাথা নাড়লাম—না। খবর নিতেই এসেছি। কাল রাত্রে কয়েকজনকে নাকি ধরে এনেছেন আপনারা !

উনি মাথা নাড়লেন—ওর মধ্যে নেই। সকলের বয়সই কুড়ির নিচে বা একটু ওপরে। একটা বাড়িতে পাঁচ-সাতজন ছেলে আর তিন চারটে মেয়ে একসঙ্গে ছিল। একটা ছেলে বোমা ফেটে মরণাপন্ন, আমরা যখন রেইড করি তখন ছেলেটা চেঁচাচ্ছে—আমাকে মেরে ফেললে এরা, আপনারা বাঁচান।

বলেই হেসে ফেললেন তিনি। খিক্ খিক্ করে ইঙ্গিতময় একটা অশ্লীল হাসি। বললেন—সেই বিপ্লবের ডেরায় আমরা কি কি পেয়েছি জানেন ? বোমা, রিভলবার, শটগান, কারতুজ, কুড়ুল, ছোরাছুরি আর প্রচুর পরিমাণে কনট্রাসেপটিভস্।

আমি চুপ করে রইলাম।

উনি আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন একটুক্ষণ। মুখে সেই হাসি। বললেন—অবশ্য খবরের কাগজে কনট্রাসেপটিভসের কথা আমরা জানাবো না। কিন্তু আমরা জানি, এই রোমান্টিক বিপ্লবের পিছনে সেক্স অনেকটাই কাজ করেছে। বিপ্লবের মানে অনেকের কাছেই ফ্রীডম অফ সেক্স। বয়সের ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে থাকছে, উঠছে বসছে, এন্‌জয় করছে—কারো কিছু বলার নেই। এরা বেশিরভাগ গরিবঘরের ছেলেমেয়ে। ছাত্রছাত্রী কিংবা বেকার, ভবিষ্যতের আশা ভরসা কিছু নেই, বাড়িতে আদর নেই, বিয়েশাদীর কথা ভাবতেও পারে না। এইভাবে পুষিয়ে নিচ্ছে। আর কিছু আছে বড়লোকের ছেলে, পার্ক হোটেল, ব্লুফক্স বা ট্রিংকাতে মদ খায়, নাচে, ইংরিজি গান গায়, বাজনা বাজায়, ইংরিজি স্কুল বা ভাল কলেজে পড়ে—তাদেরও কিছু ফ্রাস্ট্রেশন আছে। তাদের কাছে জীবনটা বড্ড সিকিওরড্। একঘেয়ে, ঝুঁকিহীন জীবন। পাসটাস করলেই বাপ-দাদা বড় চাকরিতে বসিয়ে দেবে। কিংবা বিলেত ঘুরে আসতে পাঠাবে। ভবিষ্যতের চিন্তা নেই, অঢেল ব্ল্যাকমানি, মাথা চিন্তাশূন্য। তারা জীবনটাকে আর একটু ইন্টারেস্টিং করার জন্য বিপ্লবে নেমে পড়ে। ধরা পড়লে বাপ-দাদা খালাস করে নিয়ে যায়। বড় উকিল ব্যারিস্টার লাগায়, মিনিস্টারদের ধরা-করা করে।

উনি মিটমিট চোখে আমার মুখখানায় কি একটু খুঁজে বললেন—এই চ্যাংড়াদের দলে আপনার দাদা যে কেন ভিড়তে গেলেন !

এর কোনো উত্তর আমি জানি না।

উনি শ্বাস ফেলে বললেন—দেশের রাজনীতি এবং বিপ্লব-টিপ্লবের পিছনকার সবচেয়ে সত্যি কথাগুলো পুলিশেরই জানা আছে। পাবলিক পুলিশকে যতই ঘেন্না করুক, পুলিশের চেয়ে জ্ঞানী দেশে আর কেউ নেই। আপনার দাদাকে পেলে তাঁকে আমি এমন কিছু ইনফরমেশন দিতে পারতাম যে রাতারাতি তাঁর রাজনীতি ঘাম দিয়ে ছেড়ে যেত, তিনি পুনর্মূষিক হয়ে যেতেন। যদি দাদাকে পান আমার কাছে নিয়ে আসবেন।

উঠতে যাচ্ছিলাম। উনি হাত তুলে বসতে ইঙ্গিত করলেন। ঘরের মধ্যে অবিরল লোকের যাতায়াত। তিনি অফিসের কাজকর্ম দু' একটা সেরে নিচ্ছেন। বোঝা যায় গপ্পে লোক। অনেক কথা জমে আছে বুকে।

তারপর মুখ তুলে বললেন—আমরা খবর রাখি, কদিন আগে আপনি একটা মিছিলে হামলা করেছিলেন। আপনার নামে একটা ডায়েরীও করা আছে। কিন্তু যতদূর মনে হয়, আপনি কাজটা করেছিলেন অ্যাডভেঞ্চার হিসেবে, ভেবে চিন্তে করেননি। তাছাড়া আমাদেরও এসব ছোটোখাটো হামলা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই। রোজ খুন জখম ডাকাতি আর বিপ্লব সামলাতে হিমসিম খাচ্ছি। চুরি ছিনতাই মারধোরের গাদা গাদা ডায়েরী পড়ে আছে—অ্যাকশন নেওয়া যাচ্ছে না। আপনার বিরুদ্ধেও নিচ্ছি না। কিন্তু বলে রাখি, শরীর যখন খুব ছটফট করবে তখন বাইরে কোথাও চলে যাবেন। স্বাস্থ্যকর জায়গায় গিয়ে থাকলে লিভার স্টমাক সব ঠিক হয়ে যাবে। উত্তেজনা কমে যাবে। এবং স্বাভাবিক বোধ করবেন। খামোখা কারও ওপর হামলা করতে ইচ্ছে হবে না।

কোনো উত্তর না দিয়ে উঠে পড়লাম। উনি হাসলেন। বললেন—আসবেন মাঝে মাঝে। এখানে এলে জ্ঞান বাড়ে।

আকাশ পিঙ্গল। খুব ধুলো উড়ছে চারদিকে। কেঁচোর মতো ঘামের ফোঁটা নেমে যাচ্ছে শরীর বেয়ে। ঘামের ফোঁটা কপাল থেকে নেমে এসে চোখ ঝাপসা করে দিচ্ছে। রুমালটা বড্ড ময়লা, চোখ মুছলে চোখ জ্বালা করে ! আগে বৌদি রুমাল কাচত, গেঞ্জি কেচে দিত। আজকাল দেয় না। যেমন ছেড়ে রাখি, তেমন পরে বেরোই। ঘামে ভেজা গেঞ্জি থেকে উৎকট গন্ধ পাওয়া যায়। কাঠকয়লা দিয়ে দাঁত মাজি বলে মুখটা বিস্বাদ লাগে সারা দিন। গালের দাড়ি বেড়ে যায়, কামানোর কথা খেয়াল থাকে না। প্যান্টের ভাঁজ নষ্ট হয়ে গেছে, গ্রীষ্মকালে তিন-চার দিনের পরা শার্ট, ন্যাতার মতো গায়ে ঝুলছে, চটির রঙ ঢেকে গেছে ধুলোয়। নিজেকে নোংরা লাগে, দীন দরিদ্রের মতো মনে হয়। এই দীনদরিদ্র নোংরা চেহারাটা কেবল আমার নয়, সারা কলকাতার। ওই ধু ধু জ্বলে যাচ্ছে আকাশ, পার্কের গাছগুলোর পাতায় পাতায় ধুলোর আস্তরণ, মাঠে ঘাস নেই, পথে ভিখিরির সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে খুব। কলকাতা পুড়ছে, ধুলোয় ডুবে যাচ্ছে, মুমূর্ষু এই শহরের নিঃশব্দ চিৎকার ভিখিরিদের গলায় উঠে আসছে।

আমি আমার বড়দার মতো রোমান্টিক নই। বিপ্লব করি নি। কিন্তু মনে হয় কিছু একটা ওলট পালট আমারও করার ছিল। কি করব তা ভেবে পাই না। কিন্তু শরীর জ্বলে, হাত পা নিস্পিস্ করে। এইরকম এক অর্থহীন উত্তেজনায় সেদিন মিছিলের সামনে দাঁড়িয়ে যাই। লরীর মাথায় চিত্রতারকা বসে আছেন, মাইক্রোফোনে বাজছে গান। দুরন্ত রোদে ওই সাজানো মেকী মিছিলটা ভেঙে দেওয়া দরকার—এইরকম একটা বিশ্বাস হঠাৎ এসেছিল আমার ভিতরে। কিন্তু কাজ হয় নি। তাড়া খেয়ে আমি পালিয়ে যাই, মিছিলটা যথারীতি তার গন্তব্যে পৌঁছোয়, চিত্রতারকারা তাঁদের সুন্দর শীতল আবাসে নিরাপদে ফিরে যান, আর এদিকে আমাকে বাচ্চা ছেলে ঠাউরে নিয়ে থানার ও-সি, কিংবা পুলিশ অফিসার ধমক দেন, চোখ রাঙান। এমনই কঠিন এই শহরের আস্তরণ, মানুষের হৃদয় এবং ঘটনাবলী—এর কোথাও আমার আঁচড়-কামড়ের দাগ বসে না, বৃথা চেষ্টা।

দুপুরের বাস, তবু ভীড়ে অন্ধকার হয়ে আছে। এত লোক যে কোথায় যায়! ভিতরে মানুষের শরীরের ঘাম, তাপ, গন্ধে বাস্টা পচে আছে। শ্বাস-প্রশ্বাস গায়ে লাগে, কটু গন্ধ পাওয়া যায়। উঠতেই রোগা, হলদে চামড়াওয়ালা কণ্ডাকটর তার শীর্ণ নোংরা হাতটা বাড়িয়ে দেয় টিকিটের জন্য। সেই হাতটায় শিরা জেগে আছে, বড় নখ, নখের নিচে নীল ময়লা। তার ঘেমো গা থেকে, ঘামে ভেজা পয়সার ব্যাগ থেকে কটু চামসে গন্ধ আসছে। বিরক্ত হয়ে ভীড় ঠেলে ভিতরে এগিয়ে যাই। দু-একজন ফিরে তাকায়। মুখগুলো—আশ্চর্য—একই রকম দেখায়। সেইসব মুখে বিরক্তি, রাগ, হতাশা। আগুনের মতো হাল্কা বাতাস মানুষকে নির্জীব করে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বাইরে। আর বাসের ভিতরে দমবন্ধ বায়ুহীনতা। ঘাম—বড্ড ঘাম মানুষের শরীরে। গায়ে গা লাগলে শরীরগুলোকে মাছের পিছল শরীরের মতো মনে হয়।

এই দুপুরেও রড ধরে গায়ে গায়ে মানুষ দাঁড়িয়ে। একজন রগচটা ক্ষয়া চেহারার লোককে ঠেলে খানিকটা সরিয়ে ফাঁকে দাঁড়ালাম। লোকটা বোধ হয় বিরক্ত হয়েই মুখ তুলে তাকাল। গ্রাহ্য করলাম না। দাঁড়াতেই দেখি, সামনের সিটটা খালি হচ্ছে। বসে থাকা লোকটা উসখুস করছে, উঠি-উঠি ভাব, শরীরটা ঘাই দিচ্ছে। আমার দু পাশ থেকে দু-তিনজন লোক তীক্ষ্ন চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে। ডান পাশের জন আমাকে সরানোর জন্য কনুই দিয়ে একটু ঠেলা মারে, বাঁ পাশের জন হাত বাড়িয়ে আমার পথ আটকাতে চেষ্টা করে। এসব ক্ষেত্রে আমি বরাবরই পিছিয়ে যাই, জায়গা ছেড়ে দিই। কিন্তু আজ আমার ভিতরে খরার জ্বালা, বড়দা পুলিশ বিপ্লব বাবা মালা খরা—সব কেমন ঘুলিয়ে ওঠে। মাথাটা ঠিক নেই। বুঝতে পারছি, জায়গাটা আমার পাওয়া উচিত না, যে ক্ষয়া চেহারার লোকটা আমার বাঁদিকে দাঁড়িয়ে, জায়গাটা ওরই ন্যায্য পাওয়া উচিত। কিন্তু বসা লোকটা উঠে দাঁড়াতেই আমি শরীরটা বাঁ দিকে মুচড়ে ক্ষয়া চেহারার লোকটাকে সরিয়ে দিই। এমনই বিশ্রীভাবে যে আশপাশের লোক আমাকে লক্ষ্য করে। ক্ষয়া মানুষটার চেহারা খেঁকি ধরনের—যেন টোকা লাগলেই খ্যাঁক করে উঠে মেয়েলী গলায় ঝগড়া করবে। কিন্তু ঝগড়ার জন্য আমিও প্রস্তুত। কিছু বললেই আমি লোকটার ঘাড় ধরব। লোকটাকে সরিয়ে আমি তাই আমার আগুনে রাগের চোখে লোকটার দিকে রুখে তাকিয়েছি।

কিন্তু লোকটা – আশ্চর্য—একটুও রাগ নেই মুখে—আমার মুখের দিকে অকপটে তাকিয়ে বিনীতভাবে বলল—বইস্থন না, বইসুন।

কথার টানে বুঝি, সে পশ্চিমা। তার ভাঙা মুখে দুপুরের দারুণ গ্রীষ্মের কষ্ট ফুটে আছে। ফুটে আছে খিদের চিহ্ন, অপুষ্টি। তবু তার মুখখানা ভারি নম্র, ভীতু, লাজুক। বসতে লজ্জা হতে লাগল। তবু বসলাম। লোকটা আবার উদাস চোখে বাইরের জ্বলন্ত কলকাতা দেখতে লাগল। আমি বেশি দূরে যাবো না। মাত্র কয়েকটা স্টপ। না বসলেও আমার চলত। লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে ভারি একটা কষ্ট হতে থাকে বুকের মধ্যে। ওর বয়স আমার বাবার বয়সের সমান। নিজের ওপর ভারি রাগ হতে থাকে। পশ্চিমা, ভীতু ও ভদ্র লোকটা একটা ময়লা রুমালে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে এক পলক আমার চোখে চোখ রাখে। একটু হাসে! কি সহৃদয়তার হাসি!

সেই হাসিটা সহ্য করতে পারলাম না। তখনো দুটো স্টপ বাকি। হঠাৎ বুক থেকে একটা দলা গলার কাছে উঠে আটকে যায়। আমি উঠে দাঁড়ালাম। লোকজন ঠেলে এগিয়ে, ঘণ্টি মেরে নেমে পড়লাম।

চারদিকে কলকাতা জ্বলছে। নিজেকে মনে মনে বলি—নেনটু, এটুকু হেঁটে যাও। এই কষ্টের শাস্তিটুকু নাও। ওই লোকটাকে তুমি বড় নিষ্ঠুর ভাবে বসতে দাও নি। কষ্টটুকু তোমার ভালই লাগবে।

আশ্চর্য, ভালই লাগছিল। বাতাসের হলকা বুক পর্যন্ত সব রস শুষে নিচ্ছে। রোদের থাপ্পড় চড়াৎ করে মুখে এসে পড়ে। চোখ জ্বালা করে। ধুলোয় কির-কির করে দাঁত। হাঁটতে তবু ভালই লাগে। ভেতরের গরমটা কমে যায়।

এই রকম ছোটখাটো ঘটনায় আমার মন কখনো কখনো ভীষণ চমকে ওঠে। অস্থির লাগে। কিছুদিন আগে কলেজ স্ট্রীটে এক বিকেলে হাজার লোকের ভীড়ে আমি দুটি মানুষকে দেখেছিলাম। একজন খুব লম্বা, সুন্দর হিলহিলে শরীরের যুবাপুরুষ। শ্যামলা গায়ের রঙ, তীক্ষ্ন সুন্দর বুদ্ধিমান মুখশ্রী—খুব শিক্ষিত মানুষের ছাপ তার মুখে! সে একটা ফর্সা পায়জামা আর লখনৌ চিকনের পাঞ্জাবী পরে দাঁড়িয়ে ছিল। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। তবু তার চোখে ছিল কালো চশমা। তার পাশে দাঁড়িয়ে অন্যজন, কোলকুঁজো এক বুড়ি। সাদা থান তার পরনে, মুখে বিষণ্ণতা। একটা ইতর রিক্সা-ওয়ালার সঙ্গে বুড়ি দরদস্তুর করছিল। দরে বনছিল না। কাছে দাঁড়িয়ে শুনতে পেলাম বুড়ি হিন্দিতে বলছে—এত ভাড়া চাইছো! ওই ভাড়ার চেয়ে কমে ট্যাক্সিতে আসা যেত। রিক্সাওয়ালা তাকে অপমান করার জন্যই চেঁচিয়ে বলছিল—পায়দলে আরো সস্তা হয়। হেঁটে আসলেই পারতে!

বুড়ি তবু তর্ক করতে থাকে, বলে,—তোমরা ঠক, জোচ্চোর। কলকাতায় আমরা নতুন এসেছি বলে—। ছেলেটা চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে বুড়ির হাত একবার ছুঁয়ে বলল—ছোড় দিজিয়ে না মা-জী। তার গলা এমন ভদ্র, এত সুন্দর ক্ষমার সুর তাতে, এত নরম, যেন এই পৃথিবীর কারো ওপর সে কখনো রাগ করেনি। বুড়ি তখন হঠাৎ চুপ করে গেল। একবার লম্বা যুবাপুরুষের মুখখানার দিকে চাইল মাত্র। তারপর বিড় বিড় করে বলল—আমি আমার অন্ধ ছেলেকে নিয়ে বেরিয়েছি বলে সবাই যা খুশি করে। আমি বুড়ি, আমার বেটা অন্ধ—বলতে বলতে হাতের বটুয়া খুলে বুড়ি

আরো পয়সা দেয় রিক্সাওয়ালার হাতে। তখন আমি রিক্সাওয়ালাটাকে ধমকাতে পারতাম, ভাড়া ঠিক করে দিতে পারতাম, কিন্তু কিছুই পারিনি। একটা কান্নার দলা ঠেলে উঠেছিল গলায়, ঠোঁট থির থির করে কাঁপছিল। কলকাতার দয়াহীন রাস্তায় এক দেহাতী বুড়ি তার সুন্দর অন্ধ ছেলেটিকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অসহায়ভাবে, সামনে এক ইতর ঝগড়াটে রিক্সাওয়ালা—আমি দ্রুতপায়ে এই দৃশ্যটার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম।

এই রকম হয়। এইসব দুর্বল মুহূর্তে আমি আর স্বর্গত কুমুদবন্ধু রায়ের থার্ড জেনারেশন থাকি না। অন্যরকম হয়ে যাই। ঐ সুন্দর অন্ধ ছেলেটির ভগ্ন কণ্ঠস্বর আমার পেতে ইচ্ছে করে। বাসের ঐ পশ্চিমাটার মতো আমারও ইচ্ছে করে সহজে, স্বাভাবিকভাবে সামান্য স্বার্থ ত্যাগ করতে। কিন্তু কি যে হয়। কিছুতেই ওরকম হতে পারি না।

বাড়ির রাস্তায় ঢুকতেই দূরবর্তিনী মালাকে দেখতে পাই। বুকের কোথায় একটু ব্যথা আজও লেগে আছে। মালা এলোচুলে তাদের ঝুল বারন্দায় দাঁড়িয়ে আছে। দূরের দিকে চোখ। যেন কার অপেক্ষা করছে। মালা কোনোদিনই আর আমার জন্য অপেক্ষা করবে না। বড় দূরে লাগে তাকে। দুপুরের রাস্তা থেকে ঐ ঝুল বারান্দার এলোচুল মালা বড়ই দূরের।

ঝুল বারন্দার তলা দিয়ে যাওয়ার সময়ে একবার মুখ তুলে চেয়ে দেখি। চমকে উঠি। মালা ঝুঁকে আমাকে দেখছে। চোখে চোখ পড়তেই হাসল। জিজ্ঞেস করল—এই দুপুরে কোথায় বেরিয়েছো? আড্ডা বুঝি?

স্বরটা ভারী ভাল লাগে। মুখ তুলে বলি—না। থানায়। মেসোমশাইকে বোলো থানায় যাদের ধরে এনেছে তাদের মধ্যে বড়দা নেই।

—বলব।

কথা ফুরিয়ে যায়। মালার সঙ্গে বলার মতো কথা আমার কত কম। তবু জোর করে কথা বানিয়ে বলতে ইচ্ছে করে। একটু সময় তবু ওর দিকে চেয়ে থাকার অধিকার।

রাস্তা থেকে ঘাড় উঁচু করে ভিখিরির মতো বললাম—তুমি কিন্তু গান শোনাওনি।

ও ঝুঁকে রেলিঙের ওপর থেকে মাথা ঝুলিয়ে দিয়ে হাসে। বলে—পরশুদিন রেডিওতে তিনটে প্রোগ্রাম আছে। শুনে নিও।

মালা রেডিওতে গায়। একটু চমক লাগে। তবে তো মালা আমার সমস্ত সীমা ছাড়িয়েই গেছে।

—তুমি রেডিওতে চান্স পেয়েছো বলোনি তো!

ও ম্লান হেসে বলে—সমু, আমি রেডিওতে এর আগে আরো চারবার গেয়েছি। তুমি খবর রাখো না। যে খবর রাখে না তাকে আমার বলার দরকার কিসের?

মালা উদাসীন চোখে চেয়ে বলে—তুমি জনসাধারণ নও? নিজেকে তার বেশি ভেবো না সমু। দি বক্সার ইজ ডেড।

কথাটা আজকাল মালা বার বার বলে। আমি ঠিক অর্থ বুঝতে পারি না। কিন্তু বুকের ভিতরে এক ব্যাকুলতা জন্মায়। বলতে ইচ্ছে করে—এখনো মরেনি। একবার বলো, আমি দুই হাতের অবিরল আঘাতে সব ভেঙেচুরে দিয়ে যাবো।

কিন্তু তা আমি বলি না। আমার রিংয়ের পরিধি বড় ছোটো হয়ে গেছে।

মারবার পরিসর আর নেই। কোণ ঘেঁষে আমি দুই হাতের আড়ালে' কেবল মার বাঁচানোর চেষ্টা করছি। খুঁজছি পালানোর সুযোগ। তাই শুষ্ক মুখখানা তুলে নরম, ভদ্র গলায় বলি—চলি, মালা।

সে উদাস গলায় বলে—এসো। তোমাদের বাসার সামনে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সুন্দর ক্রীমরঙা গাড়ি। তোমাদের বাড়িতে বোধ হয় কেউ এসেছে।

অদ্রি। নিশ্চয়ই অদ্রি। অমনি আমার মন গুটিয়ে যায়। গাড়িওয়ালা, সুখী ও ও সুন্দর অদ্রির মুখোমুখি কিছুতেই দাঁড়াতে ইচ্ছে করে না এখন। দু পা এগিয়েও ফিরে আসি।

অসহায়ের মতো মুখ তুলে মালার কাছে প্রকৃত ভিক্ষুকের মতো বলি—এক গ্লাস জল খাওয়াবে মালা?

সে অবাক হয়। বাসা এত কাছে, তবু তার কাছে জল চাওয়া কেন! মালা হয়তো ভাবল, এটা একটা অছিলা, অজুহাত। এইভাবে তার কাছে যেতে চাই। সে তাই হেসে ফেলল। বলল—এসো। এ বাড়ির সিঁড়ি তো তোমার চেনা। এলেই পারো।

লজ্জা পেলাম। তবু আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেলাম ওপরে। মালা সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছিল। আন্তরিকভাবে বলল—এসো। রোদে একদম পুড়ে গেছ।

মালার বড় সাহস। আমাকে একা এই দারুণ দুপুরে তার ঘরে নিয়ে এল। ছায়ার ঘর। বিছানায় তানপুরো শুয়ে আছে। দেয়ালে প্লাস্টারের রবীন্দ্রনাথ। সুন্দর বুককেসে সুন্দর বই। বুককেসের ওপর সদ্য কেনা একটা হাই-ফাই রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার। গানের খাতা ছড়িয়ে আছে চারদিকে। চারদিকে তাকালেই বোঝা যায় এই ঘরে যে থাকে তার বাস বাইরের রুক্ষ ওই পৃথিবীতে নয়। তার বাস পৃথিবীর ধুলো মাটির আস্তরণের একটু ওপরে—একটা স্বপ্নের জগৎ—যেখানে অবিরল পৃথিবীর সব দুঃখ ও হতাশা, ব্যর্থতা এবং প্রত্যাখ্যান গান হয়ে যায়। অবিরল সবকিছু গলে যায় গানে। মালার ঘর তাই বহু উঁচুতে বলে মনে হয়। একশো কি দুশো তলা ওপরের এই ঘর। জানালায় মেঘ ভীড় করে, চাঁদ ছোঁয়া যায়, একটু মুখ বাড়ালেই দেখা যায় দক্ষিণের সমুদ্র, আর উত্তরের পর্বতমালা। কলকাতার কোনো কোলাহল এখানে পৌঁছোয় না।

মালা অবহেলায় বলল—বোসো।

তারপর ঘরের কোণে রাখা বেলে মাটির কুঁজো থেকে জল গড়াল। আমার সামনে আনতেই দেখি, এত পরিষ্কার কাচের গ্লাশ আমি কদাচিৎ দেখেছি। স্বচ্ছ, সুন্দর, ঠাণ্ডা জল। বুক কাঠ হয়ে আছে। জলটা শুষে নিই, বলি—আর এক গ্লাশ। মালা গ্লাশ ভরে আনে। চুমুক দিয়ে চোখ তুলে গ্লাশের কানার ওপর দিয়ে দেখি—মালা নিবিষ্ট চোখে আমাকে দেখছে। মুখে দয়ালু হাসি। গ্লাশটা নামিয়ে বলি—মালা, বাংলা-দেশের সব ঐতিহ্য মরে যাচ্ছে।

—কেন?

—আমাদের মা মাসীরা এই ভরদুপুরে বাইরের লোককে শুধু জল খেতে দিত না। একখানা বাতাসা হলেও দিত।

মালা হাসল না। ভ্রূ কুঁচকে বলল—তোমার এত দাবিদাওয়া কিসের সমু?

boiRboi.net

কথা ঘোরাবার জন্য বলি—জনসাধারণের কি দাবিদাওয়ার শেষ আছে ?

মালা হাসে আবার। বলে—দুপুরের খাওয়া হয়নি বুঝতে পারছি, কিছু খাবে সত্যি ? এখন খেলে তো ভাতের খিদে নষ্ট হয়ে যাবে—

—কিছু থাকলে দাও, আমার বড় খিদে পেয়েছে।

মালা প্রশ্রয়ের হাসি হেসে চলে যায়। আমি তার সুন্দর ঘরখানা দেখতে থাকি। দেখতে দেখতে ঘুম পেয়ে যায়। ইচ্ছে করে মালার সুন্দর সুগন্ধী নরম বিছানায় শুয়ে থাকি। গভীর ঘুমে তলিয়ে যাই।

কিন্তু তা হয় না। হাই তুলে উঠে একটু পায়চারি করি। দেয়ালে একটা পারিবারিক গ্রুপ ছবি। একমুহূর্ত তার সামনে দাঁড়াই। বহুকাল আগেকার দেখা মুখ সব। ছ-সাত বা দশ-বারো বছর এদের আর দেখি নি। মালার বাবা তখন আরো রোগা ছিলেন, ডানদিকে কাটা সিঁথি, একমাথা চুল, মুখে বিষয়কর্মের তেমন ছাপ পড়ে নি। মালার মা এখনকার মতোই—কেবল সে আমলে জমকালো শাড়ি পরতেন, এক গা গয়না ছিল। ডানদিকে মালার দিদি মণিমালা—বড় সুন্দরী ছিলেন, খুব সরল। পাঁপড়ভাজা খেয়ে ঠোঁট মুছতে ভুলে যেতেন, তেল লেগে থাকত। মাথার সিঁথি হত আঁকাবাঁকা। বিয়ের সম্বন্ধ হতে দেরি হচ্ছিল, সুধাংশুবাবুর তখন তেমন টাকার জোর নেই, অথচ মণিমালা সুন্দরী—তাই কম খরচায় তার ভাল বিয়ে দেবার আশায় তিনি অপেক্ষা করতেন। গেজেটেড অফিসার বা ইঞ্জিনীয়ার ছাড়া অন্য পাত্রপক্ষের সঙ্গে আলাপই করতেন না। বরং মেয়ের কোয়ালিফিকেশন বাড়াবার জন্য সেতার কিনে দিলেন, ভর্তি করলেন বাজনার স্কুলে। কিন্তু সেতারে মণিমালার মন ছিল না। সকাল-বিকেল টুং টাং করতেন, আমরা গেলে লজ্জায় হেসে বলতেন—দ্যাখ্, কী বিচ্ছিরী যন্ত্র, দুটো হাত দুভাবে নাড়তে নাড়তে আমার শরীর ব্যথা হয়ে গেল। অবশেষে মণিমালার আই-এ-এস বর জুটে যায়। পিছনে দাঁড়িয়ে মালার বড়দা রতন—গম্ভীর মানুষ। তাঁর সম্বন্ধে বেশি কিছু জানা নেই। শুধু জানতাম, তিনি অনেক ইণ্টারভিউ দেন। চাকরি পান না। আমরা তাদের ছাদে উঠলে ভারি বিরক্ত হতেন। একটু দূরে দাঁড়িয়ে মানিক। আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড়। ছোড়দার বন্ধু, লেখাপড়া তেমন হয় নি। তবে ভাল ফুটবল খেলত ছেলেটা। সেই জোরে রেল-এ চাকরি পেয়েছিল। এ পাড়ায় বিস্তর মারপিট করেছে সে। মার খেয়েছেও অনেক। একবার নন্দরাণীর ইস্কুলে যাওয়া সে প্রায় বন্ধ করেছিল রাস্তায় রোজ দাঁড়িয়ে থেকে। বোধহয় নিজেদের বাসায় সে কখনো নন্দরাণীকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে কিছু করেছিল। নন্দরাণী মার কাছে এসে একদিন মানিকের নামে নালিশ করে কেঁদে ফেলে। রিংয়ের বাইরে আমি কদাচিৎ কাউকে মেরেছি। যে দু-একজনকে মেরেছি তার মধ্যে মানিক একজন। দেশপ্রিয় পার্কের গোড়ায় তাকে ধরেছিলাম। সে আমার চোখে আঙুল ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল, লাথি ছুঁড়েছিল পেটে। কিন্তু তখন আমি ছমছমে লড়িয়ে। আমার শরীর প্রজাপতির মতো হালকা, লোহার মতো শক্ত। তাকে জমি নিইয়েছিলাম। সে লজ্জার কথা মানিক কাউকে বলে নি কখনো। কেবল ছোড়দা বোধহয় টের পেয়েছিল। তাই আমাকে খুব বকেছিল—বয়সে বড় ছেলের গায়ে হাত দাও—খুব বক্সিং শিখেছো ! তার ওপর মানিক আমার বন্ধু—ওদের বাড়িতে মুখ দেখানোর উপায় নেই, ছিঃ ছিঃ ! ছোড়দার জন্যই মানিক

মার খেয়েও দমে নি। নন্দরাণীর স্কুলের পথে দাঁড়িয়ে থাকত, চিঠি দিত, নববর্ষে বিজয়ায় পাঠাত কার্ড। নন্দরাণীও ক্রমশ নালিশ করতে ভুলে যাচ্ছিল, কারণ সেটা স্তাবকতা গ্রহণ করারই বয়স। বাধ্য হয়ে আমরা নন্দরাণীর বিয়ে দিয়ে দিই। মানিকের ছবিটার দিকে চেয়েছিলাম। বহুকাল দেখা হয় না। রেলের চাকরিতে পয়সা নেই বলে সে ব্যবসায়ে নেমেছে। তিন চার বছর আগে সে ভদ্রপুর থেকে আমাকে টেরিলিন শার্ট এনে দিয়েছিল। পুরোনো শত্রুতা আর নেই। নন্দরাণীও মরে গেছে। ছবির সামনে মাটিতে বসে আছে মালা। ঘাড় পর্যন্ত ববু চুল, চোখে কাজল, পায়ে জুতো মোজা। চোখে কৌতূহল —ক্যামেরার দিকে চেয়ে আছে। ঠিক ওই বয়সেই তার সঙ্গে আমার পরিচয়। ওই চোখে সে আমাকেও দেখত। হয়তো বা আমি একটু লাজুক ছিলাম, মালা তা ছিল না। টক্ টক্ করে দ্বিধাহীন পায়ে সে সিঁড়ি ভেঙে অনায়াসে উঠে আসত। নন্দরাণী বাড়িতে না থাকলেও সে আসত। একা বাইরের বারান্দার রেলিঙে পিঠ হেলিয়ে দাঁড়াত। দেখত আমার বালির বস্তায় ঘুঁষিমারা। তখনকার দিনে মেয়েদের সঙ্গে আমাদের মেলামেশা সহজ ছিল না। বন্য ও লাজুক বলে তার সুন্দর মুখ, পরিষ্কার সতেজ শরীর, চোখের কৌতুক—এ সবের দিকে তাকাতেই পারতাম না। ভয় করত। রেলিঙে হেলে দাঁড়িয়ে মালা হাসত। দু-একটা কথা বলত, ইয়ার্কি দিত। কখনো বা নিবিষ্ট মনে দেখত আমার ছায়া-লড়াই। মালাদের ছাদে উঠলে আমাদের ছাদ দেখা যায়। ভোরবেলা ছাদে যখন স্কিপিং করতাম তখন প্রায়ই পশ্চিম দিকে মালাদের ছাতে দেখতাম মালাকে। দূর থেকে ইশারা করত। এইভাবেই বুকের দুরুদুরুনি পার হয়ে একদা মালার কাছাকাছি হয়ে গেলাম। দুপুরের নির্জনতায় স্কুল-পালিয়ে আসতাম। মালাদের ছাদের সিঁড়িতে বসতাম দুজনে। পাশাপাশি। কথা হত। সে সব কথা ভালবাসার কথা নয়, কোনো অর্থও হয় না তার। তবু দুজনে দুজনের কথা হাঁ করে শুনতাম। মালা বলল—তোমার সত্যিকারের লড়াই আমাকে একদিন দেখাতে নিয়ে যেও। আমার সেই আসল লড়াই মালাকে দেখানো হয় নি আজও। আর দেখানো যাবে না। কবে যেন মণিমালার ফেলে-যাওয়া সেতার খেলার ছলে তুলে নিয়েছিল মালা, অনভ্যস্ত হাতে টুং টাং করেছিল। বোধহয় সেই সময়েই অকস্মাৎ সুরের মায়াবী জগৎ হঠাৎ তাকে ধরা দিয়েছিল। তারপর গানই টেনে নিল তাকে। তার পার্থিব ঘরখানা ক্রমশ পৃথিবী ছেড়ে, আমাদের সব নাগালের বাইরে একশো দুশো হাজার তলা উঁচুতে উঠে গেল। সেই সময়ে আমার ছোড়দা শখের তবলা ঠোকে, ফিল্মের গান গায়। মালার উন্নতি দেখেই বোধহয় সে এক ওস্তাদের কাছে তবলা শেখার জন্য নাড়া বাঁধল। আমার প্রতি উদাসীন হয়ে গেল মালা।

গ্রুপ ছবিটায় সেইসব দিনগুলি স্থির হয়ে আছে। মগ্ন হয়ে দেখছিলাম। ছবি নয়, স্মৃতি।

টেবিলের ওপর প্লেট রাখার মৃদু শব্দে ঘুরে দাঁড়িয়ে ভারি অবাক হই। মালা নয়, তাদের ঝি। বলল—দিদিমণি পাঠিয়ে দিলেন।

—উনি কোথায় ?

—মাথা ধরেছে খুব। মায়ের বিছানায় শুয়ে আছেন।

মুহূর্তে রক্তের ঝাঁক উঠে আসে চোখে মুখে। বাসের সেই পশ্চিমা লোকটার ভদ্র

boiRboi.net

ব্যবহারের স্মৃতি ভুলে যাই, ভুল হয়ে যায় সেই দীর্ঘকায় অন্ধ যুবকটির কথা। রাগে মুহুর্মুহু আঘাত করতে ইচ্ছে করে চারদিকে।

—খেয়ে নিন। বলে ঝি চলে গেল।

একা মালার এই ঘরে আমি কি করে থাকি! এই ঘর গানের। কিন্তু আমার সব রাগ দুঃখ বা অভিমান কখনো গান হয়ে যায় নি। আমার রাগ বহুকাল থাকে।

টেবিলের সামনে গিয়ে দেখি প্লেটে সাজানো ওমলেট, মিষ্টি, বাটিতে এক টুকরো মাছ, স্টিলের গ্লাসে ঠাণ্ডা ঘোল। কোনোটাই স্পর্শ করি না। রাগে শরীর কেঁপে কেঁপে ওঠে। গায়ে শুঁয়োপোকার রোমরাজি দাঁড়িয়ে যায়। গায়ে সেই জ্বালা। নিজের বা যে-কারো সর্বনাশ করে যেতে ইচ্ছে করে।

মালার সর্বনাশ আমি কি করে করব ভেবে পাই না। অদ্রির মতো সেও আমার রিংয়ের অনেক বাইরে চলে গেছে। অত দূরে আমার আঘাত পেঁছাবে না। তবু আমি তার ঘরের ভিতরে ঘুরে বেড়াই। কোথায় আঘাত করব মালাকে খুঁজি। বিছানায় শোয়ানো তার ঝকঝকে তানপুরা, ইস্পাতের তার মৃদু আলোতেও ঝল্‌কোচ্ছে, মেঝের কার্পেটে পড়ে আছে পেতলের ডুগি আর ছোট্ট তবলা। পড়ে আছে হারমোনিয়াম। চারদিকে গানের খাতা। বই। বুককেসের ওপর রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার। খোলা কাঠের বাক্সে রেকর্ডের গাদা। গানের মধ্যেই বেঁচে আছে মালা। তার সব দুঃখ, স্মৃতি, অনুভব—সবই গান হয়ে যায়। একরকমভাবে সে সুখীই। সেই সুখ নরম গদীর মতো ঢেকে রেখেছে তাকে। বাইরের আঘাত পেঁছোয় না। কিন্তু এই মুহূর্তে তাকে আঘাত করতেই হবে।

তানপুরার তারে আঙুল ছোঁয়াতেই সেটা ঝিন্‌ন্‌ করে বেজে ওঠে। আমি বাঁকা আঙুলে তারটাকে ধরে হ্যাঁচ্‌কা টান দিই। টং করে ছিঁড়ে যায়। একের পর এক চারটে তার ধনুকের টংকার তুলে ছিঁড়ে প্যাকিয়ে যায়। ভয়ঙ্কর কাঁপতে থাকে ছেঁড়া তারের ডগাগুলি। জীবনের সবচেয়ে জোরালো ঘুঁষিতে ডুগির চামড়া দমাস করে ফাটিয়ে দিই। পলকের মধ্যে আমি তার গানের খাতাগুলোর পাতা ছিঁড়ে ফেলি। ফ্যানের জোর হাওয়ায় পাতাগুলি ঘুড়ির মতো উড়তে থাকে। কি হল, কি হল, বলে ঝিটা ছুটে আসতে থাকে। রান্নাঘর থেকে মাসীমা চেঁচিয়ে বলছেন—কী হচ্ছে রে, ও মালা! আমি ততক্ষণে মালার বিছানার বালিশ টেনে ফেলে দিই, দুটো রেকর্ড ছুঁড়ে ফেলি মেঝেতে। কিন্তু তবু মালার সাড়া পাওয়া যায় না। মনশ্চক্ষে দেখি, সে ওধারের ঘরে শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে হাসছে। বিদ্রূপের হাসি। ঝিটা দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। পাগল-দেখার মতো ভীত চোখ তার, কি করবে বুঝতে পারছে না। আমি তার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে আসি। সিঁড়ি ভেঙে আস্তে আস্তে নেমে যাই। মালা বেরিয়ে আসে না, কিছুই করে না। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ওপরে মাসীমা আর ঝিয়ের গলা পাই—ওমা! কী কাণ্ড! কী কাণ্ড! এ কী পাগলামী!

রাস্তা থেকে এক পলক ওপরের ঝুল-বারান্দার দিকে তাকাই। না, মালা নেই। এই অবহেলায়, উপেক্ষায় আমার শরীর আবার রাগে কেঁপে ওঠে। অসহায়ভাবে বুঝতে পারি, পৃথিবীতে আমার আঁচড় কামড়ের কোনো দাগ বসে না। আমি বড় দুর্বল।

ক্রীমরঙা গাড়িটার গায়ে পাতলা চাদরের মতো ধুলোর আস্তরণ পড়েছে। গাড়িটা পেরিয়ে যেতে যেতে একটু দাঁড়াই। প্রতিশোধের কথা মনে পড়ে। আমি কিছুই ভুলিনি। গাড়িটার কাচ তোলা, ভিতরটা ফাঁকা। সুন্দর একটা নীল তোয়ালে পড়ে আছে স্টিয়ারিঙের ওপর। মজ রঙের গদীর পালিশ কী সুন্দর, তাতে চমৎকার চৌকো নক্সা। গাড়ির পিছনে পালকের ঝাড়ন, সুতো দিয়ে ঝোলানো একটা সুন্দর পুতুল। অদ্রির গাড়ি।

কাচটা ভেঙে দিয়ে যাবো? একখানা ইঁট হাতে নিলেই সুন্দর প্রতিশোধ নেওয়া হয়। আমার প্রতিশোধের নেশা চেপে গেছে। লোভীর মতো গাড়িটার দিকে চেয়ে থাকি। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে, জিনিসপত্রের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার কোনো গভীরতা নেই। মালার মতো উদাসীন উপেক্ষা অনেকের থাকতে পারে। আমার প্রতিশোধ তাহলে আবার আমাকেই ছোবল দেবে মুখ ঘুরিয়ে।

গাড়ির কাচটা তাই ভাঙা হল না। কেবল অন্যমনে একটা আঙুল দিয়ে গাড়ির গায়ের ধুলোর আস্তরণে লিখলাম—নেনটু, প্রতিশোধ।

মুখ ফেরাতেই ভারী অবাক হয়ে দেখি, আমাদের দোতলায় বারান্দায়, বালির বস্তাটার পাশে দাঁড়িয়ে একটা মেয়ে। সে একটু ঝুঁকে কৌতূহলে আমাকে দেখছে। বড় লজ্জা পাই। ছি ছি, মেয়েটা দেখেছে, আমি অদ্রির গাড়ির গায়ে আঙুল দিয়ে লিখছি। আমাকে পাগল ভাবছে হয়তো।

মুখ নামিয়ে আমি গাড়ির দরজা পেরিয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভাঙতে থাকি। মেয়েটা কে, ভেবে পাই না। অদ্রির সঙ্গেই এসেছে কি! কে জানে! একটু পরেই মেয়েটার সঙ্গে এক সমতলে দেখা হবে। ভাবতেই লজ্জা করে। পাগল, আমি একটা পাগল।

উপরে উঠেই প্রথমে বড়দার ঘর। সবুজ পর্দা ফেলা। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা যায়, অদ্রির কোলে বুবুলো বসে আছে, তার হাতে খেলনা। অদ্রির মুখখানা শুকনো, চুল উড়ছে। তবু তার মুখে একটা স্মিত ভাব। দরজা পেরোতে পেরোতে বৌদির ধরা-গলা শুনতে পাই—বেঁচে আছে এই ঢের। এ কদিন যে কিভাবে কেটেছে।

থমকে দাঁড়াই। কার কথা বলছে ওরা?

পর্দাটা সরাতেই অদ্রি মুখ তোলে, খুশির গলায় বলে, আরে নেনটু, এসো। ভালো খবর আছে।

কান্নায় বৌদির মুখ ফোলা, তবু তার মুখে একটা নিশ্চিন্তি। খুশির ভাব। বলল—তোমার বড়দা দুর্গাপুর গিয়েছিল। দাদার কাছে।

আমি অদ্রির দিকে তাকাই।

অদ্রি মাথা নাড়ল। বলল—পরশুদিন। ইদানীং ভুঁড়ি হয়ে যাচ্ছে বলে বিকেলের দিকে একটু টেনিস খেলি। পরশুদিন টেনিস খেলে ফিরে দেখি, বাসায় গেট-এর কাছে ভিখিরির মতো চেহারায় সত্য দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমটায় চিনতেই পারিনি। গালে কাঁচা-পাকা দাড়ি, চুল জট বেঁধেছে, গায়ে ভীষণ ময়লা, না-ঘুমোনো চোখ খুব লাল। কষ্টে চিনতে পারলাম। প্রথমটায় কোনো কথাই বলে না। জিজ্ঞেস করলে হয় হাসে, নয়তো গম্ভীর হয়ে থাকে। বাথরুমে গিয়ে অনেকক্ষণ ইচ্ছেমতো স্নান করল, দাড়ি-টাড়ি

কামাল, বলল—রাতে মুর্গীর ঝোল দিয়ে ভাত খাবো। সঙ্গে সঙ্গে চাকরকে দিয়ে মুর্গী আনালাম। খুব তৃপ্তির সঙ্গে খেল। পাছে পালায় সেই ভয়ে নিজের সঙ্গে নিয়ে শুলাম। কিন্তু কথাবার্তা হল না। সারারাত পাথরের মতো ঘুমোলো। উঠল অনেক বেলায়। রবিবার ছিল কাল, কাজেই নিজে দেখেশুনে ভাল রান্নাবান্না করালাম। ভাবলাম তোমাদের কাছে একটা টেলিগ্রাম করে দিই। সত্য বোধহয় সেটা আন্দাজ করে বলল—বাড়িতে কোনো খবর দেবেন না। সম্ভবতঃ পুলিশ আমাদের বাসার দিকে নজর রাখছে। ফলে সারাদিন সত্য শুয়ে রইল। দু'চারটে কথা থেকে যা বুঝতে পারলাম—এ কদিন সে পায়ে হেঁটে হেঁটে ঘুরেছে। যতদূর মনে হল, সে কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ছিল না। সে ঘুরেছে একা একা। কেন ঘুরেছে তা সঠিক বলল না। কেবল বলল—আশপাশটা একটু দেখে নিচ্ছি আর কি! এত বয়স পর্যন্ত তো কলকাতা-চাপা পড়ে রইলাম। আমি রাজনীতির কথাও জিজ্ঞেস করলাম। ও একটু ভেবেচিন্তে বলল—রাজনীতি মানে হচ্ছে শ্রেষ্ঠ নীতি। সেই নীতি ঠিক করতে একটু সময় নেওয়া দরকার। মনে হল, ওর ভিতরে একটু দ্বিধার ভাব এসেছে। বিকেলের দিকে বলল—আমার জুতোজোড়া ছিঁড়ে গেছে, একজোড়া জুতো কিনে দিন। আর দশটা টাকা। দিলাম। বিকেলে খুব নেশা করে ফিরল। একটু মাতলামী করল, বুবলার কথা বলে কান্নাকাটি করল কিছুক্ষণ। আজ সকালে উঠে দেখি, নেই। তোলপাড় করে আশেপাশে খুঁজলাম। কোথাও নেই। আরো খুঁজবার জন্য লোক লাগিয়ে আমি চলে এসেছি। ভাবছি, রাণুকে নিয়ে যাবো। রাণু আমার কাছে কয়েকদিন থাক। যদি সত্য ফেরে বা ওকে খুঁজে পাওয়া যায় তবে ওখানেই রাণুর সঙ্গে ওর দেখা হতে পারবে। আমার মনে হচ্ছে, সত্য ফিরবে ঠিক। আমার বাসাটা সেণ্টার করে চারদিকে ঘুরবে। রাণু বা বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা হলে মনটা নরম হবে ওর, ওসব পাগলামী কমে যাবে।

অদ্রির দিকে একাগ্রভাবে তাকিয়ে ছিল বৌদি। যেন যতবার অদ্রি গল্পটা বলবে ততবার সমান মনোযোগে সে শুনবে। অদ্রির কথা হয়ে গেলে বৌদি আমার দিকে ফিরে ছেলেমানুষের মতো বলল—যাবো ঠাকুরপো?

আমি হেসে বললাম—যাওয়াই তো উচিত। মা-বাবাকে খবর দাও। ও'দের ঘটনাটা জানানো দরকার।

বৌদি বলল—যাচ্ছিলাম। তুমি এসে গেলে, দাদা গল্পটা শুরু করল, তাই যাওয়া হল না।

বৌদি উঠে গেল। একটু বাদেই হতচকিত বাবা আর মা ঘরে এসে ঢুকল। বাবা নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করতে গিয়ে লাল হয়ে গেছেন, গাল কাঁপছে। মা কেঁদে ফেলেছে, চেঁচিয়ে বলছে—ও বাবা অদ্রি, আমার ছেলে নাকি বেঁচে আছে! সবাই বলে, মেরে ফেলেছে। বলো বাবা, তার কথা বলো। সে কেমন, কোথায়—

অদ্রি উঠে হাত ধরে মাকে বসাল। বাবা চেয়ারে বসে গলা খাঁকারী দিয়ে নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছেন।

ঘরে যখন এই দৃশ্য তখন হঠাৎ চোখে পড়ল, বারান্দার দরজায় সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে। অদ্রি দাদার কথা বলছে, সকলের চোখ তার দিকে। শুধু মেয়েটি একদৃষ্টে

boiRboi.net

আমাকে দেখছে। চোখে ভীষণ কৌতূহল। যেন বা সে আমাকে গুরুতর কোনো অন্যায় করতে গোপনে দেখে ফেলেছে।

লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিলাম। দাদার কথা শুনতে শুনতে মেয়েটির কথা ভুলে গিয়েছিলাম। ও দেখেছে, আমি অদ্রির গাড়ির গায়ে ধুলোর আস্তরণে লিখে রেখেছি—নেন্‌টু, প্রতিশোধ।

আর একবার মেয়েটির দিকে তাকাই। দেখি, তার ঠোঁটে চাপা কৌতুকের হাসি। পরণে নীল শাড়ি, নীল ব্লাউজ, কানে নীল পাথরের দুল, পায়ে নীল চটি। লালচে রঙের চুল এলো করে বাঁধা। ফর্সা, খুব সুন্দর চেহারা তার—এত সুন্দর কেবলমাত্র ধনীদের ঘরে জন্মায়। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা তাকে আমি কোথাও দেখেছি। কোথায় তা মনে পড়ছিল না। তার চোখে আমার চোখ আটকে গিয়েছিল। ছাড়াতে পারছিলাম না। ঘরের ভিতরে সবাই বড়দার কথা নিয়ে মগ্ন হয়ে আছে। সিঁড়ির দিকের দরজায় দাঁড়িয়ে আমি, আর বারান্দার দিকের দরজায় দাঁড়িয়ে সে। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে। কেউ আমাদের এই তুচ্ছ ঘটনাটি লক্ষ্যই করে না। মেয়েটি দেখছে এক গোপন অপরাধীকে—যাকে সে ছাড়া কেউ সনাক্ত করতে পারে না। আমি দেখছি সনাক্তকারীকে—যাকে আমি সঠিক চিনি না—কিন্তু চেনা চেনা মনে হয়।

কিন্তু মনে না পড়েও উপায় ছিল না। অত সুন্দর মেয়ে তো আমি খুব বেশি দেখিনি। ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে গেল। 'এই তো অদ্রির মঞ্জু। বিয়ের আসরে এ দেখেছিল আমার অপমান। একটু আগে সে-ই আবার দেখেছে, অদ্রির গাড়ির গায়ে আমি প্রতিশোধের কথা লিখে রাখছি। এর কাছ থেকে আমি কি করে পালাবো?

চোখ নামিয়ে আমি আস্তে আস্তে সরে এলাম। জামাকাপড় পাল্টে কলঘরে গিয়ে অনেকক্ষণ জল ঢালি গায়ে। গায়ে আজ বড় জ্বালা।

স্নান সেরে, রান্নাঘরে ঢাকা ভাত খেয়ে এসে দেখি বৌদি বিস্তর ট্রাঙ্ক-বাক্স খুলে জামা কাপড় বের করে স্যুটকেস গোছাচ্ছে। মা সামনে বসে বলছে—ওই কমলা রঙের শাড়িটা নিলে না! সত্য ওই রঙটা পছন্দ করে কিনে দিয়েছিল তোমায়।

বৌদি লাজুক হেসে বলে—আর জায়গা কোথায় মা?

মা বলে—হবে হবে। দরকার হলে তোমার শ্বশুরের স্যুটকেসটা নাও না। ওখানে গিয়ে সেজেগুজে থেকো। বেনারসীটা পড়ে রইল।

বৌদি বলল—এই গরমে বেনারসী?

—তাতে কি? বিয়ের পর তো পরোই নি। মা বলতে বলতে আমার দিকে তাকায়।

—নেন্‌টু, একটু মিষ্টি এনে দে। ওরা ভর দুপুরে এসেছে। তোর ঘরে পাখার তলায় বসিয়ে রেখেছি, ও ঘরে যাস না এখন। মিষ্টিটা এনে দিয়ে বরং আমাদের বিছানায় গিয়ে শো।

মিষ্টি এনে দিয়ে মার ঘরের দিকেই যাচ্ছিলাম। অদ্রি বাইরে বেরিয়ে এসে ডাকল—নেন্‌টু, শোন। মঞ্জু তোমাকে ডাকছে।

ভীষণ সংকুচিত হয়ে পড়ি। স্নানের পর হঠাৎ স্নানের আগের যাবতীয় অপরাধের

boiRboi.net

বোধ এসে আমাকে চেপে ধরে। জিজ্ঞেস করি—কেন?

অদ্রি চাপা হেসে বলে—এসো না। ও বলছে, তোমাকে ও চেনে

আমি ভ্রূ কুঁচকে তাকাই।

অদ্রি হাসে—ঘাবড়িও না। এসো।

আমার বিছানাতেই মঞ্জু বসে আছে। গরমের জন্য জানালা বন্ধ। ঘরটা ছায়া-ছায়া। মঞ্জুকে আবছায়ায় আরো সুন্দর দেখায়। হাতজোড় করেই হেসে বলল—বসুন, একটু কথা বলি।

মেয়েদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয় আমার অজানা। কাঠের মতো তার সামনে চেয়ার টেনে বসি। একটু বেপরোয়া হওয়ার চেষ্টা করে বলি—আপনি আমাকে চেনেন শুনলাম। গলাটা কেঁপে গেল। একটা নাকি সুর এসে গেল।

মঞ্জু তার মাথায় সুন্দর একটা ঝাপটা মেরে বলে—খুব ভাল চিনি না, একটু একটু চিনি।

অদ্রি সিগারেট ধরিয়ে আমার দিকে চেয়ে বলে—আমাকে কিন্তু মঞ্জু কিছু বলেনি, নেন্টু। শুধু বলেছে, ওই ভদ্রলোককে আমি চিনি, ডেকে আনো, আলাপ করব।

আমার চোখ মেঝেয় নেমে যায়। ঘামতে থাকি। প্রথমত তার গা থেকে খুব দামি বিদেশী সুগন্ধী বাতাস ভরে তুলেছে। দামী শাড়ি পরণে। সে অসম্ভব সুন্দর। এ সব আভিজাত্যের মুখোমুখি হলে আমার মন শক্ত হয়ে ওঠে। আঘাত করতে ইচ্ছা করে। আমি এসব সইতে পারি না। দ্বিতীয়ত, তার মুখের রহস্যময় হাসি দিয়ে সে বোঝাতে চাইছে, সে আমার গোপন খবর রাখে। আমি তাই আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে থাকি। মাথাটা এলোমেলো হয়ে যায়। মিষ্টি নিয়ে ফেরার সময়ে আমি বুদ্ধি করে অদ্রির গাড়ির গায়ের লেখাটা মুছে দিয়ে এসেছি। তবু মনটা স্থির হয় না। দোতলা থেকে পরিষ্কার লেখাটা দেখা যাচ্ছিল—নেন্টু, প্রতিশোধ। মুছতে বড় দেরি হয়ে গেছে। তার আগেই এই মেয়েটি জেনে গেছে—আমি তার অদ্রির ওপর প্রতিশোধ নিতে চাই।

মঞ্জু তার ছোট্ট রুমালে থুতনির ঘাম মুছল। বলল—রাণুর বিয়ের সময়ে আপনাকে দেখেছিলাম। বলেই সে হাসতে থাকে।

আমার চোখ মুখ ঝেঁঝে ওঠে। আমি মুখ তুলি।

—আর কোথায়?

—একটা পোস্ট অফিসে।

—আর?

—একটা মিছিলের মুখোমুখি। সেইদিনই আপনাদের এই বাসায় রাণুর সঙ্গে দেখা করতে আসি। চলে যাওয়ার সময়ে সিঁড়িতে আপনার সঙ্গে দেখা, রাণু পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আপনি গ্রাহ্য করেন নি। খুব অন্যমনস্ক ছিলেন।

একটা শ্বাস ফেলে বলি—মনে নেই।

মঞ্জু খুব হাসে। হাসি মেশানো গলায় বলে—আর একবার—

চমকে উঠে বলি—কোথায়?

সে মাথা নাড়ে—সেটা বলব না। থাক।

বলল না। গোপন থাকল। তার আর আমার মধ্যে। প্রতিশোধের কথাটা খুব বুদ্ধি করে চাপা দিল মঞ্জু। আমি নিশ্চিন্তির শ্বাস ছেড়ে বললাম—কাছাকাছি পাড়ায় থাকলে এরকম দেখা-সাক্ষাৎ হয়।

তার প্রেমিকের সামনেই অপলক চোখে সে আমাকে দেখে কিছুক্ষণ। বলে—মিছিল আটকানোটা কিন্তু অন্যায় সাহস, প্রায় পাগলামী।

অদ্রি মিষ্টির প্লেট হাতে ঝুঁকে পড়ে আমায় বলল—কি করেছিলে ?

মঞ্জু হাসি থামিয়ে বলে—সে এক উদ্ভট কাণ্ড। কিন্তু আমার খুব মজা লেগেছিল।

বলে মঞ্জু পা দোলায়। আমার দিকে চেয়ে মিট্ মিট্ করে হেসে বলে—আপনি এরকম আর কি কি করেছেন তা জানতে ইচ্ছে করে। বলবেন ?

আমি হাসি। তার আর আমার মধ্যে এক ইংগিতময় কৌতুকের খেলা চলছে। অদ্রি তাই কৌতূহল বোধ করে না। কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখে বলে—ইস্, তিনটে বাজে। রাণুটা দেরি করছে। দিনকাল ভাল না, ফিরতে রাত হয়ে যাবে। দাঁড়াও, রাণুকে তাড়া দিয়ে আসি'।

অদ্রি উঠে যেতেই মঞ্জু আবার আমাকে দেখে। বলে—আমি একটু বেশি কথা বলে ফেললাম। কিছু মনে করবেন না।

আমি একটা শ্বাস ফেলে হাসি। বলি—না, আপনি খুব বেশি বলেননি। ধন্যবাদ।

মঞ্জু হাসে।

আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসি। বুবলাকে একটু কোলে নিই, মিনুকে একটু আদর করি। বৌদির সঙ্গে রসিকতা করতে থাকি। বলি—বৌদি, তোমাদের হানিমুন দুর্গাপুরেই হচ্ছে তাহলে !

বৌদি ম্লান হাসে। বলে- ইয়ার্কি করো না। তোমরা দুইটি ভাই আমাদের যা জ্বালাচ্ছো ! ভগবান করুন, তোমার যেন বিয়ে না হয়।

বৌদির কানে কানে বলি—তাহলে তোমার আইবুড়ো বোনটার গতি হবে কি করে ?

বৌদি তেড়ে এসে বলে—থাক, ওসব মুখের কথা। স্নুনুকে তো তুমি চোখেও দেখনি।

গোছগাছ করে রওনা হয়ে গেল। সামনের সিটে অদ্রির পাশে বসা মঞ্জু একবার গলা বের করে মুখ টিপে হাসল মাত্র। কথা বলল না।

মনে মনে নিজেকে বললাম—নেনটু, অদ্রির ওপর যদি প্রতিশোধ নিতে হয় তবে ওর গাড়ির ওপর নিও না। প্রতিশোধের জন্য রয়েছে ওর মঞ্জু। মঞ্জুর ওপর নিও। ও অত সুন্দর কেন ? সুন্দর যা কিছু নষ্ট করে দাও।

বড়দার যা-হোক একটা খবর পাওয়া গেছে। কিন্তু সেজন্য আমি নিশ্চিন্ত বোধ করি না। আমার পাগল পাগল লাগে। অদ্রির গাড়ির ওপর থেকে প্রতিশোধের কথাটা মুছে দেওয়া গেছে। মালা তার তানপুরা সারিয়ে নেবে, তবলা ছেয়ে নেবে, গানের খাতা বেঁধে নেবে আবার। কিন্তু আমি কিছুতেই প্রতিশোধের কথা ভুলব না ! থানার ও-সি ভদ্রভাবে আমার গায়ের ব্যথার কথা জিজ্ঞেস করেছেন বন্ধুর মতো। তবু আমি ভুলি না। কিন্তু বাস্তবিক আমি এসব ভুলতে চাই। পৃথিবীর যাবতীয়

boiRboi.net

অপমান, ইতরতার উত্তরে সেই দীর্ঘকায় অন্ধ যুবকটির মতো নম্র গলায় বলতে ইচ্ছে করে—ছোড় দিজিয়ে না মাজী। কিংবা সেই পশ্চিমা বুড়োর মতো সহজে স্বার্থ ত্যাগ করে বলতে ইচ্ছে করে—বইস্থন না, বইস্থন।

॥ মঞ্জু ॥

মার প্রেশার খুব বেড়ে গেছে। হার্টও ভাল না। এমনিতে প্রেশার তো ছিলই, তার ওপর পরশুদিন দুপুরে একটা কাণ্ড হয়ে গেল। আমাদের বাড়ি থেকে দক্ষিণে গলির মধ্যে একটা স্কুল আছে। নীল প্যাণ্ট আর সাদা শার্ট পরা ছেলেরা পিঠে ব্যাগ নিয়ে গুটু গুটু করে স্কুলে যায়। সকাল সাড়ে দশটায় রোজ তাদের প্রেয়ারের স্থর আমাদের ঘরে ভেসে আসে—আগুনের পরশমণি···। আমার মায়ের খুব ছেলের শখ ছিল। পর পর আমরা তিন বোন মাকে হতাশ করি। শরীর খারাপ হয়ে যাওয়ায় মা আর বাচ্চা পেটে ধরতে সাহস পান নি। এই বয়সে মার ওই ইচ্ছে আর পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। মার মনে সাধটা কিন্তু রয়ে গেছে। আমি তো টের পাই। কতদিন দেখেছি, মা রেলিঙও ধরে ঝুঁকে তিনতলা থেকে সকাল দশটায় স্কুলের বাচ্চা ছেলেদের নিবিষ্ট মনে দেখে। পুঁটে পুঁটে ছেলেরা হল্লা করতে করতে যায়। তাই দেখে মার মুখে এক বিহ্বলতা ফুটে ওঠে। টিফিনের সময়ে ছেলেগুলো সর্ষে দানার মতো পিলু পিলু করে এধার ওধার ছড়িয়ে পড়ে। মা নিচের তলায় নেমে যায় তখন। কত ছেলে এসে আমাদের বাড়ি থেকে জল আর বিস্কুট খেয়ে যায়। শীতকালে অন্তত একদিন মা ওই স্কুলে চার ঝুড়ি কমলালেবু পাঠায়, গ্রীষ্মকালে একদিন পাঠায় ল্যাংড়া আম। আমি বাড়াবাড়ি দেখে কখনো সখনো রাগ করে বলি—অত প্রশ্রয় দিও না, ছেলেগুলো পেয়ে বসবে। মা ম্লান মুখে হেসে বলে—আমার বড় ইচ্ছে করে বাড়িতে একদিন বাল-ভোজন করাই। কিন্তু তাতে তো তোরা রাগ করবি। সে যাই হোক, ওই স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে আমাদের বাড়ির একটা সম্পর্ক তৈরী হয়ে গেছে। মা যখন রেলিঙে দাঁড়ায় তখন ওই ছেলেদের অনেকেই মুখ তুলে মাকে ডেকে যায়—আ-ণ্টি! কেউ বলে—মাসীমা—আ। মা হাত নাড়ে। তারা চলে যায়। মা কখনো সখনো আমাকে ডেকে ছেলেদের চিনিয়ে দেয়—ওই যে ফর্সা ছেলেটা—ওর মা নেই, বাবা আবার বিয়ে করেছে। আর ওই যে রোগামতন ও হচ্ছে বাবলু—ভীষণ দুষ্টু। আর ওই যে—। মা বলে যায়। আমি কখনো বা কৌতূহল বোধ করি, কখনো বা করি না। কিন্তু ছেলেগুলো আমাকেও চেনে ঠিক। রাস্তায় কখনো সখনো চমকে উঠে শুনি, অচেনা ছেলে ডেকে বলছে দিদি, কোথায় যাচ্ছো? চমকে উঠে হেসে ফেলি। একরকম ভালই লাগে। একদিন গড়িয়াহাটায় একটা বাচ্চা আমার হাত জড়িয়ে ঝুলে পড়েছিল—দিদি, ও দিদি। সঙ্গে তার বাবা আর মা। সে আমার হাত ধরে টেনে তার মার কাছে নিয়ে যায়, আর বলে—আণ্টির মেয়ে, আমাদের দিদি। কি লজ্জায় পড়েছিলাম। ছেলেটির মা বাবা দেখলাম, মার কথা খুব জানে। ভদ্রমহিলা বললেন—আপনার মার কথা শুনে শুনে কান কালা হয়ে গেছে। শুনে লজ্জা পাই। ছেলেরা আমাকে যে রাস্তায় ঘাটে দেখে ডাকে, খুশি হয়, মা বাবার কাছে নিয়ে যায়, সে তো আমার জন্য নয়! আমার

ভালবাসা তারা পায় নি। তবু তাদের আন্টির মেয়ে বলে আমার এত আদর। টিফিনের সময় আমাদের নিচের তলায় রাজ্যের ছেলেরা এসে মাকে ঘিরে ধরে বসে। জল খায়, বিস্কুট নিয়ে পকেটে পোরে। গল্প করে কত। মা প্রত্যেকের নাম, বাড়ির খবর রাখে। কিন্তু আমি তাদের অধিকাংশকেই চিনি না। রাস্তায় ঘাটে তাই আমাকে লজ্জা পেতে হয়। তবু ভালই লাগে। কখনো সখনো রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে আমিও তাদের দেখি। তারা হাসে, হাত নাড়ে, ডেকে যায়।

যা বলছিলাম। পরশুদিন দুপুরে রোজকার মতো মা বিছানা ছেড়ে উঠে সিঁড়ির মুখে গিয়ে মদনকে ডেকে বলল—ও মদন, জলের ড্রামটায় বরফ ফেলেছিস তো! বিস্কুটের প্যাকেটগুলো খুলে প্লেটে রাখ। সময় হয়ে এসেছে। এই বলে মা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র। সেই সময়ে হঠাৎ রাস্তায় একটা চেঁচামেচি শোনা গেল, কয়েকটা দৌড় পায়ের শব্দ। বারান্দায় মা উৎকর্ণ হয়ে টিফিনের ঘণ্টার শব্দ শোনার জন্য অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল—কি হয়েছে রে? ওরে, কি হয়েছে? ওই বড় বড় ছেলেগুলো দৌড়ে পালাচ্ছে কেন? ও মঞ্জু, দেখে যা! আমি উঠতে উঠতেই দুটো বোমার শব্দ শোনা গেল।

আমি বেরিয়ে দেখি, মা রেলিঙের ওপর দিয়ে আধখানা শরীর বাইরে ঝুলিয়ে দিয়েছে। মাকে টেনে আনি। দেখি, মার মুখ সাদা, কপালে ঘাম, ঠোঁট কাঁপছে। আমার দিকে বড় বড় আতঙ্কের চোখে চেয়ে মা বলল—কতগুলো বড় ছেলে স্কুলটার দিক থেকে দৌড়ে এল—ওরা স্কুলের ছেলে নয়—হাতে বড় বড় ছোরা, ছোটো টিন। দৌড়ে পালিয়ে গেল। ওই শোন, স্কুলের দিকটায় খুব গোলমাল শোনা যাচ্ছে।

আমি শুনলাম। ঠিকই, স্কুলের দিকটায় গোলমাল, লোকের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ টিফিনের ঘণ্টার শব্দ পাগলা-ঘণ্টির মতো বাজতে শুরু করল। বাতাসে এক ঝলক ধোঁয়ার গন্ধ, বারুদের গন্ধ, কেরোসিনের গন্ধ এল। মা ঝুঁকে দেখে চেঁচিয়ে বলল—স্কুলটায় আগুন লেগেছে!

মার কথা শেষ না হতেই দেখি, নীল প্যান্ট আর সাদা শার্ট পরা বাচ্চারা গলি দিয়ে দিশেহারার মতো দৌড়ে আসছে। ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল দু একজন, উঠে আবার দৌড়োচ্ছে। ব্যাগ খসে যাচ্ছে কাঁধ থেকে, প্যান্টে গোঁজা জামা বেরিয়ে পড়েছে, মুখ রক্তাভ। আতঙ্কে তাদের চোখ বড় হয়ে গেছে।

দৌড়ে নিচে নেমে গেলাম। সদর খোলাই ছিল। পিল্ পিল্ করে বহু ছেলে ঢুকে পড়ল বাড়িতে। আমি দুহাতে তাদের টেনে আনতে লাগলাম। তারা দিশেহারার মতো চেঁচাচ্ছে—আন্টি! আন্টি! দিদি···

কয়েকটা বাচ্চা কাঁদছে। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলতে শুরু করল। স্পষ্ট কিছু বুঝতে পারি না। শুধু এইটুকু বোঝা গেল, কয়েকটা বাইরের বড় ছেলে ছোরা নিয়ে স্কুলে ঢুকেছিল। তারা বলে গেছে, ছেলেরা স্কুলে এলে খুন করা হবে। মাস্টারমশাইদের বলেছে, স্কুল বন্ধ করে দিতে। হাফ্-ইয়ার্লি পরীক্ষা যেন না হয়। এই সব বলে তারা স্কুল বাড়িতে কেরোসিন আর পেট্রল ছিটিয়ে আগুন দিয়ে গেছে। বোমা মেরেছে। কাঁদুনে ছেলেগুলোকে কোলের কাছে টেনে এনে চুপ করালাম, তারপর বাচ্চাদের মধ্যে বসে রইলাম অনেকক্ষণ। তাদের মধ্যে

boiRboi.net

অনেকেই আশিটর খোঁজ করছিল। তখন আমার খেয়াল হল, মা নিচে আসে নি। তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে গিয়ে দেখি, মা মাঝখানের ঘরে মেঝের কার্পেটের ওপর শুয়ে আছে। মুখটা টকটকে লাল, কপালের দুধারে শিরা ফুলে উঠেছে। জ্ঞান আছে, কিন্তু কথা বলতে পারছে না, কেবল কাঁদছে।

পরশুদিন থেকে বিছানা নিয়েছে মা।

আমাদের বাড়িটা বড্ড ফাঁকা। বাবা সকালে বেরোয়। ফিরতে রাত হয়ে যায়। সারাদিন কেবল আমি আর মা। আমাদের বাড়িতে কারো অসুখ-বিসুখ হলে আমরা সেবা করি না। ভাড়া করা নার্স আসে। এবারও এসেছে। কাজেই আমার কিছু করার নেই। কেবল সারাদিন কয়েকবার মার ঘরে যাই। মা কেবলই জিজ্ঞেস করে—মঞ্জু ওদের কারো কিছু হয় নি তো?

—না।

—ঠিক বলছিস, না লুকোচ্ছিস!

—হয় নি। বিশ্বাস করো। হলে হৈ-চৈ শুনতে পেতে।

মা একটু চুপ করে থাকে। বলে—জলের ড্রামে মদনকে বরফ ফেলে রাখতে বলিস। দেরিতে বরফ ফেললে জল ঠাণ্ডা হবে না। আর বিস্কুটের প্যাকেটগুলো খুলে রাখিস। তুই নিজে দাঁড়িয়ে থেকে—

আমি হেসে বলি—কার জন্য? স্কুল বন্ধ আছে, ছেলেরা কেউ আসছে না দুদিন।

মা চুপ করে থাকে। চোখ বোজে। বোধহয় শিশুদের স্বপ্ন দেখে।

অল্পবয়সী চটপটে নার্স-মেয়েটির সঙ্গে দু একটা কথা বলি। সে খুব সংকুচিত হয়ে উত্তর দেয়। ইচ্ছে ছিল, এই দুপুরের নির্জনে তাকে ঘরে ডেকে নিয়ে একটু গল্প করব। কিন্তু, তার সংকোচ দেখে বুঝতে পারি আড্ডা জমবে না। তাই বেরিয়ে আসি। তারপর একা-ভূতের মতো সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াই। কখনো গান গাই, কখনো কোন পুরোনো হাসির কথা ভেবে আপনমনে হেসে উঠি, কখনো বা কান্না পায়।

সব জানালা দরজায় ভারী পর্দা কিংবা খসখস ঝুলছে। ঘরগুলো ছায়া ছায়া অন্ধকার। বাইরের বেলা বোঝা যায় না। সুগন্ধী ভেজা খসখস সরিয়ে এক পলক বাইরে তাকাই। দমকা গরম বাতাস শরীরে লাফিয়ে পড়ে। খরশান দুপুর বিশাল পুরুষের মতো জ্যোতির্ময়। রুপো রঙের দুপুরের দিকে খানিকক্ষণ মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকি।

কোথাও যাওয়ার নেই। এই খরার দুপুরে কোথাও যেতে ইচ্ছেও করে না। অদ্রি কাছে নেই। রাণুকে নিয়ে গেছে, কাজেই আর শিগগির আসবেও না। সেদিন ওদের বাড়ি থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে আমাকে বাড়িতে পেঁছে দিয়ে যাওয়ার সময়ে সেইরকমই বলে গেল অদ্রি—সাবধানে থেকো, রাণুকে নিয়ে যাচ্ছি। এখন ভুতুড়ে চিঠি লিখলেই চলে আসতে পারবো না।

রাণু অনেকবার বলল—তুইও চল মঞ্জু, ওখানে আমার খুব একা লাগবে। চল, কয়েকদিন থেকে আসবি।

—ধ্যাৎ! লোকে কি বলবে?

রাণু চোখ বড় বড় করে বলল—কি বলবে! একা তো যাচ্ছিস না, আমি আছি।

হেসে বললাম—তুই থাকলেই কি ? বিয়ের আগে এত মাখামাখি ভাল নয় রাণু, ওতে চার্ম নষ্ট হয়ে যায়।

কথাটা সত্যি। অদ্রি আর আমার সম্পর্কটা বড্ড পুরোনো হয়ে গেছে। এমন নয় যে অদ্রিকে আমি ভালবাসি না। কিন্তু ইচ্ছে করে অদ্রি খোলস পাল্‌টে নতুন হয়ে আসুক। ওই রুপো রঙের দুপুরের মতো এক অচেনা পুরুষ হয়ে দাঁড়াক আমার সামনে। আমাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলুক।

রাণুর ওই যে দেওরটা—নেন্‌টু, ও পাগল। ওদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটু দূরের এক বাড়ির বারান্দায় একটা সুন্দর মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। হঠাৎ দেখি নেন্‌টু রাস্তা থেকে সে মেয়েটার সঙ্গে কি কথা বলছে। তারপর ওপরে উঠল, মেয়েটার ঘরে গেল। ভারি অবাক হয়েছিলাম, রাণুর দেওর এই ভর দুপুরে ওই মেয়েটার ঘরে কেন! একটু পরে মেয়েটা বেরিয়ে গেল, খাবারের প্লেট হাতে ঝি ঢুকল। তারপরই দেখি, নেন্‌টু দৌড়ে নেমে আসছে, আর ওই বাড়ির ঝি আর গিন্নী ছোটাছুটি করছে। কিছু একটা কাণ্ড করে এসেছে ছেলেটা—সন্দেহ নেই। তারপরই দেখি, অদ্রির গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কি বিড় বিড় করল, আঙুল দিয়ে গাড়ির গায়ে লিখল—নেনটু, প্রতিশোধ। ভীষণ মজা লাগছিল আমার। অদ্রির ওপর ও কি প্রতিশোধ নিতে চায় ? কেন ? না কি ও প্রতিশোধ নিতে চায় নিজের ওপর ?

পরে রাণুকে জিজ্ঞেস করেছি—তোর ছোটো দেওরের মাথায় কি একটু ছিট্‌ আছে ?

রাণু বলল—একটু আছে বোধহয়। তবে আমার কর্তাটির মতো নয়। দুই ভাইয়ে মিল আছে অনেক। কেন ?

—এমনিই। তোদের বাড়ির পূর্বদিকে একটা লাল বাড়ি আছে, সামনে কৃষ্ণচূড়া গাছ, ওই বাড়িটার দোতলায় একটা খুব সুন্দর মেয়ে থাকে, মেয়েটা কে ?

রাণু একটু ভেবে চিন্তে বলল—ও, তুই মালার কথা বলছিস্‌। মালা দত্ত, রেডিওতে গান গায়। ওর সঙ্গে আমার সেজো দেওরের বিয়ে হবে সেই-কথা আছে। বলে হাসল রাণু—আসলে বিয়ে হবে কিনা কে জানে!

—কেন ?

রাণু কুলকুল করে হাসল, বলল—ও মেয়েকে একদম বোঝা যায় না। শুনি, একসময়ে নেন্‌টুর সঙ্গেও সেই-কথা ছিল। মেয়েটা কেমন যেন! আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, ও বোধহয় গানকেই একমাত্র ভালোবাসে, আর কিছুকে নয়, আর কাউকে নয়।

সেই থেকে আমি মাঝে মাঝে নেন্‌টুর কথা ভাবি। মালার কথাও। ওদের দুজনের সম্পর্ক কি তা বুঝতে চেষ্টা করি। নেন্‌টু ওই বাড়ি থেকে দৌড়ে নেমে এসেছিল কেন—সেই রহস্য নিয়েও মনে মনে নাড়াচাড়া করি। কয়েকটা ঘটনার টুকরো আমাকে দেওয়া হয়েছে যেন, গল্পটা সাজাতে হবে। সেই থেকে চেষ্টা করছি সাজাতে, হচ্ছে না। হচ্ছে না নেন্‌টুর জন্যই। ও যদি স্বাভাবিক মানুষ হত তবে গল্পটা আমি অনায়াসে সাজাতে পারতাম। কিন্তু যখনই রাণুর বিয়ের আসরে অদ্রির দিকে ওর সেই চোখ তুলে তাকানো মনে পড়ে, কিংবা পোস্ট-অফিসের সেই লোক হাসানোর চেষ্টা, মিছিলের সামনে দাঁড়ানো কিংবা অদ্রির গাড়ির গায়ে লেখা প্রতিশোধের কথা, তখনই সব গোলমাল হয়ে যায়। সবচেয়ে বেশি অবাক লাগে সেদিন রাণু যখন ওর সঙ্গে আমার পরিচয়

করিয়ে দিল তখন ও আমার দিকে তাকায় নি। আমার দিকে তাকায় না এমন মানুষ আমি দেখিই নি। তাই গল্পটা ঠিকঠাক খাপ খায় না, এখানে ওখানে সুতো ঝুলে থাকে। আশ্চর্য হই, পুরুষের আমি কিছুই জানি না। এক অদ্রি তো আর সমস্ত পুরুষ নয়! অথচ পুরুষ বলতে আমি মাত্র তাকেই জানি।

বিকেলের দিকে হাবুলদা এলেন। মার অসুখের খবর পেয়ে এসেছেন। আমার দিকে একবার চোখ নাচিয়ে 'কী খবর' বলে মার ঘরে ঢুকে গেলেন। হাবুলদা এরকমই আসেন। বাতাস বা চড়াই পাখির মতোই তাঁর অবাধ যাতায়াত। সকলের বাড়িতেই। আমার বাবা হাবুলদাকে সহ্য করতে পারেন না। বলেন—ওটা একটা মাদী পুরুষ। বাস্তবিক হাবুলদা বড্ড সাজানো গোছানো পুতুলটির মতো। রোজ দাড়ি কামান, কেয়ারি করে চুল আঁচড়ান, ধুতিটি পাঞ্জাবিটি রোজ পরিপাটি, জুতোয় পালিশ, আয়না দেখলেই সামনে একটুক্ষণ দাঁড়াবেনই। হাবুলদার চোখের নীচে একটু কাজলটানার ক্ষীণ রেখা চোখে পড়ে, পাউডার স্নোর গন্ধ পাওয়া যায়। গড়িয়াহাটার দিকে কিছু ছেলে সন্ধ্যেবেলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আড্ডা দেয়। তাদের মুখে স্নো পাউডার, ঠোঁটে ন্যাচারাল কালারের লিপস্টিক লাগানো। এসব বুঝতে মেয়েদের কষ্ট হয় না। গা জ্বালা করে। ওরা জানেই না একটু এলোমেলো একটু অন্যমনস্ক হলে ওদের কত সুন্দর দেখায়। মেয়েদের চিরকালের প্রিয় উদাসীন পুরুষ। পুরুষের সাজ হবে রুপোরঙের দুপুরের মতো তীব্র। খরার আকাশের মতো গম্ভীর। তার খানিকটা অচেনা থাকবে, খানিকটা চেনা।

আমি ঘরে ছিলাম। মার ঘর থেকে বেরিয়ে হাবুলদা আমার ঘরে এলেন।

—কি করছো মঞ্জু?

—কিছু না।

—একটা ফাংশানে যাবে? কার্ড আছে। শাস্ত্রীয় সংগীত।

—ইচ্ছে করছে না। বড্ড গরম।

হাবুলদা হাসে। বলে—তবে ঠাণ্ডা ঘরে যাই চলো। এই তো কাছে প্রিয়া সিনেমা।

—টিকিট পাওয়া যাবে না। নতুন বই, বড্ড ভিড়।

হাবুলদা চোখ গোল করে বলে—টিকিট! আমার টিকিটের অভাব! যে কোনো হল্-এ যে কোনো শো বলো—

এরকম রোজই হয়। হাবুলদা রোজ মার ঘর থেকে বেরিয়ে আমার খোঁজ করেন। এ-ফাংশান সে-ফাংশানে নিয়ে যেতে চান, কিংবা বেড়াতে। ব্যাপারটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। কথা বলতে বলতে তাঁর চোখ আমার শরীরের ওপর কাজ করে। আমি একটুও অস্বস্তি বোধ করি না। যে পুরুষ চোখে কাজল দেয় তার চোখকে আর ভয় কি? বরং শরীরটা আরো ছেড়ে দিই। মনে হয়, যদি সব খুলে ফেলে হাবুলদার সামনে দাঁড়াই, তবে হাবুলদা নিশ্চয়ই ভীষণ অসহায়ভাবে কেঁদে ফেলবেন, হাঁটু গেড়ে বসে বলবেন—আমাকে ক্ষমা করো।

মৃদু হেসে বলি—তার চেয়ে আর একটা জায়গায় নিয়ে যাবেন?

—কোথায় ?

—পার্ক স্ট্রীটের একটা রেস্টুরেন্টে। ঠাণ্ডা বীয়ার খাবো।

হাবুলদা হাসে না—খুব পেকেছো !

শ্বাস ফেলে বলি—ছেলেবেলা থেকেই আমি পুরুষদের ইংগিত বুঝতে পারি। চলুন না, খেয়ে আসি।

বলে হাবুলদার চোখের দিকে চেয়ে থাকি। উনি মনে মনে পিছু হঠছেন। বুঝতে পেরে হেসে ফেলি।

হাসিটাই বোধহয় তাঁর শরীরে আগুন ধরিয়ে দিল। আমার চোখে চোখ ফেরত দিয়ে বললেন—সত্যিই যেতে চাও ? না কি পরীক্ষা করছো ?

লাফ দিয়ে উঠে বললাম—সত্যিই যেতে চাই।

হাবুলদা চাপা গলায় বললেন—তবে চলো মঞ্জু। দেখি, কেমন পারো !

—এক মিনিট। আমি পোশাক পরে নিই।

ঝড়ের গতিতে আমি পোশাক পালটাই। আমার শরীরে সেই পাগলনাচ রক্ত নাচাচ্ছে। পাগল-পাগল লাগছে। আমি সম্পূর্ণ সবুজ সাজ পরলাম। ঘরে এসে দেখি হাবুলদা চেয়ারের পিঠে মাথা রেখে চিত হয়ে সিলিং দেখছেন। মুখে দুশ্চিন্তা। আমাকে দেখে সোজা হয়ে বসে বললেন—এ যে গ্রীন রিভোলিউশন ! সত্যিই যাবে মঞ্জু ?

—ভয় পাচ্ছেন ?

—না আমার ভয়ের কি ? ভয় তো মেয়েদের। অদ্রিবাবু যদি রাগ করেন ?

—কেউ জানবে না। চলুন।

ট্যাক্সিতে হাবুলদার পাশে বসে পার্ক স্ট্রীটে যেতে আমার একটুও অস্বস্তি হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল আমি একাই যাচ্ছি। সঙ্গে বড় জোর আমার চাকর রয়েছে। একা হওয়ার একটা উগ্র মাতলামী আছে আমার ভিতরে। চারদিকে খরার কলকাতা, ভিখিরির চিৎকার, ঝরে যাওয়া পাতার গাছ, ধুলোটে বাতাস আর অন্ধকার ঘর আমার ভাল লাগছিল না। পৃথিবীতে কাউকেই আমার ভয় পাওয়ার নেই। অদ্রি যদি জানেও, ক্ষমা করবে। সবাই ক্ষমা করবে আমাকে।

হাবুলদা অদ্রির কথা জানেন। তবু আমার হাতখানা ধরলেন। বাধা দিলাম না। উনি বললেন—মঞ্জু, সেদিন মিছিল থেকে পালিয়ে না এলেই পারতে !

—থাকলে কি হত ?

—বড় বড় আর্টিস্টরা ছিলেন, ফিল্মস্টাররা। কখন কার নজর পড়ে যেত, ভবিষ্যতটাই পালটে যেত হয়তো—বলে নিজেই হাসলেন, বললেন—শেষ পর্যন্ত কোনো হাঙ্গামাই হয় নি, সেই গুণ্ডা ছেলেটাকে আমরা মেরে তাড়িয়ে দিই।

আমি হেসে বললাম—সেই ছেলেটার সঙ্গে কিছুক্ষণ পরেই আমার দেখা হয়েছিল। তার গায়ে একটুও মারের চিহ্ন ছিল না।

হাবুলদা চমকে উঠে বললেন—তুমি তাকে চেনো ?

—চিনি।

boiRboi.net

—কে বলো তো ?

—বলব না।

হাবুলদা একটা শ্বাস ফেলে আমার হাতটা ছেড়ে দিলেন। সেই হাতেই পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক মুছে বললেন—আমি অবশ্য তাকে চিনি।

একটু চমকে উঠে বললাম—কে বলুন তো !

হাবুলদা আমার দিকে চেয়ে হাসলেন—তার নাম সোমসুন্দর রায়। ডাক নাম নেনটু। একসময়ে নামকরা বক্সার ছিল।

চুপ করে থাকি। হাবুলদা আমার হাত ধরার জন্য হাত বাড়ায়। আমার একটু ঘেন্না করে, ঐ হাতে লোকটা নাক মুছেছে। আমি হাত কোলের ওপর সরিয়ে নিই। হাবুলদার হাতটা সীটের ওপর একা পড়ে থাকে।

একটু চিন্তিত মুখে উনি বলেন—তুমি ঠিকই বলেছ মঞ্জু, সেদিন আমরা ওর খুব একটা ক্ষতি করতে পারিনি। খানিকটা বক্সিং জানে বলে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। পুলিশে ডায়েরী করা আছে, আমরাও লোক লাগিয়েছি। ও যাবে কোথায় ? আমি যদি ইচ্ছে করি তবে যে কারও লাশ ফেলতে পারি কলকাতায়। ওকে আমরা ঠিক পেয়ে যাবো মঞ্জু।

শুনে আমার হেসে উঠতে ইচ্ছে করে। যদি এতই তোমার ক্ষমতা, তবে কেন চোখে কাজল পরো ? জানো না, কাজল পরা দুর্বলতা ? ঐ কেয়ারী করা চুল, কামানো গাল, পরিপাটি ইস্ত্রি পাঞ্জাবি—এ সবই দুর্বলতা। পুরুষ তো ময়ূর নয় যে পেখম ধরবে।

হাবুলদা নিজের মনেই বলে—ছেলেটা ঠাণ্ডাই ছিল। হঠাৎ বড্ড নড়ছে চড়ছে। শুনেছি, পুলিশের গায়ে হাত তুলেছিল বলে জেল খেটে এসেছে। সস্তা একটা রঙবাজি করে মিছিলটা আটকে আমার প্রেস্টিজ নষ্ট করেছে। ওকে ঠিক পেয়ে যাবো মঞ্জু, ভেবো না। হাবুল সেন যে ফাংশান অর্গানাইজ করে তাতে কেউ মাস্তানী করেনি আজ পর্যন্ত। তুমি বলছিলে চেনো ! কিরকম চেনা ? আত্মীয় ?

আমি মুখটা বাইরের দিকে ফিরিয়ে নিলাম। বললাম—আপনি কি ভাবছেন, আমি নেনটুর জন্য ক্ষমা চাইব আপনার কাছে ?

হাবুলদা থতমত খেয়ে বলেন—না না, তা ভাববো কেন ?

বলি—তাহলে অত কথা বলার কি দরকার ? আপনারা যা খুশি করবেন ওকে। ও আমার কেউ না। মুখ চিনি মাত্র।

হাবুলদা চুপ করে যান। পলকের মধ্যেই আমি তাঁকে আবার ভুলে যাই। সব ভুলে যাই। ট্যাক্সির বাইরে উদ্দাম বয়ে যাচ্ছে কলকাতার রুপোলী রোদ, জ্যোতির্ময় দুপুর, একা নিঃসঙ্গ স্কাই স্ক্র্যাপার, ধুলোটে আকাশ। এখন কারো কথা মনে থাকে না।

—এ জায়গাটার নাম জানো ? হাবুলদা ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞেস করেন।

—কি ? চাপা গলায় বলি।

—রেস্টুরেণ্টের এই ঘরটার নাম পাপলা-ঘর।

boiRboi.net

মুখ টিপে হাসি। কি পাথরের মতো ঠাণ্ডা মেঝে! কি সুন্দর সব ড্রুম থেকে আলো ঝুলছে! মাঝখানে অনেকটা ফাঁকা জায়গায় স্বর্গের আলোতে নাচছে ছেলেমেয়ে। সে নাচের বাজনা বাজাচ্ছে যারা, তারা বসেছে দূরের অন্ধকারে। ড্রামের শব্দ, অদ্ভুত গীটারের শব্দ, বোঙ্গো বাজছে, বাজছে পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ান। আলো থেকে অন্ধকারে নাচিয়েদের মুখ বার বার ভেসে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে। সেইসব মুখে মাতাল হাসি, চোখে কুচি কুচি আয়না থেকে ছিটকে পড়া আলোর মতো মিলিয়া। মনে হয়, এখানে কেউ জেগে নেই। স্বপ্নের ভিতরে শুধু ঘুরে যাচ্ছে। ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে।

দেয়ালের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে গভীর গদীর চেয়ার, লাল রঙের মসৃণ টেবিল। মদের মিষ্টি গন্ধে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে। নাচ আর বাজনার শব্দ আমার বুকের ভিতরে দ্রিম্ দ্রিম্ করে প্রতিধ্বনি তোলে। সেখানে এক আদিম নাচ লুকিয়ে আছে কবে থেকে। একা ঘরে কতবার নেচেছি। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকি। কলকাতার খরা চোখ থেকে মুছে যায়।

হাবুলদা ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে—কেমন লাগছে?

—দারুণ।

হাবুলদা বীয়ারের লম্বা জগটা এগিয়ে দেন।

—খাও। আস্তে আস্তে খেও। মাংসের বড়া আসছে।

তেতো বীয়ার। কিন্তু তার গন্ধটা বড় মিষ্টি। আমি আস্তে আস্তে খেতে থাকি। ভাল লাগতে থাকে। মাংসের বড়া মুখে তুলি, পেঁয়াজ খাই, পাঁপর ভাজা দাঁতে ভাঙি, বীয়ারে চুমুক দিই। ভাল লাগতে থাকে। বহুকালকার পুরোনো অভ্যাসগুলি, স্মৃতিগুলি খুলে পড়ে যেতে থাকে। সেও একরকমের বসন-খোলা। বীয়ারের ওপর আমার মনটা ভাসতে থাকে।

বাজনাটা থামে। নাচের দলটা মিলিয়ে যায় অন্ধকার কোণে কোণে। বাজনাটা থামতেই আমার রক্তের তাল থেমে যায় যেন। দমবন্ধ হয়ে আসে। ঠোঁট থেকে বীয়ারের ফেনা মুছে হঠাৎ চেঁচিয়ে বলি—বাজাও।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলো পালটে সবুজ হয়ে যায়। বাজনা বেজে ওঠে। পাগলের মতো বাজতে থাকে। সমস্ত বিদেশকে, অচেনা পৃথিবীকে, পাহাড়-সমুদ্র-অরণ্যকে, আদিমতাকে ঘুরিয়ে এনে আছড়ে ফেলতে থাকে নাচ-ঘরের মেঝেয়। চারদিকে মানুষেরা দুলতে থাকে, কাঁপতে থাকে। আমি দেখি, এ যেন কয়েক হাজার বছর আগেকার পৃথিবীর আরণ্যক ছায়া, গাছের ফাঁকে ফাঁকে বহুৎসব, মানুষেরা শিকারের চারদিক ঘুরে ঘুরে জয়ের নৃত্য করছে। এখানে কেউ কারো নয়, যে যাকে চায় সে তার। অধিকারবোধহীন এ এক অবাক উৎসব।

চিতাবাঘের মতো সতেজ একটা ছেলে লাফ দিয়ে ভেসে এল। তার মুখে দাড়ি, চৌকো চোয়াল, বিশাল কাঁধ। মুখে একটা বোধহীন লোল হাসি, মুখের চামড়া এবড়ো খেবড়ো, তাতে ব্রোঞ্জের মতো একটা রঙ, চোখ ঝিকোচ্ছে। কোন্ অন্ধকার থেকে সে উঠে এল কে জানে! তামাটে রঙের ভীষণ চাপা প্যাণ্ট ফুঁড়ে ফুলে আছে তার সবল উরু, ঘন নীল শার্টের খোলা বোতামের ভিতর দিয়ে তার রোমশ বুক দেখা

যাচ্ছে। সেই বুকে একটা সোনার চেন্-এ ঝুলছে ক্রুশ। সে আমার টেবিলের ওপর ঝুঁকে অনায়াসে বিনা দ্বিধায় স্পর্শ করল আমার কনুই, ফিস ফিস করে আবেগের গলায় বলল—মিস্, ও মিস্, কম্ অন্—আজ তোমার দিন—আজ তোমার দিন—

এতটুকু দ্বিধা বোধ করি না। স্মৃতি নেই, বোধ নেই, কেবল দ্রিম্ দ্রিম্ করে বুকের ভিতরে যুদ্ধের বাজনার মতো কি যেন ডাকে। উতরোল সমুদ্রের মতো তার ডাক, স্তম্ভিত পাহাড়ের মতো তার আকর্ষণ, হাজার বছরের শ্যাওলায় সবুজ অরণ্যের মতো তার টান। অচেনা বিদেশ, অচেনা মানুষেরা চারদিকে। আমি তো কারো নই। আমার তো কেউ নেই। শুধু আছে মুহূর্তগুলি। আমি উঠে দাঁড়াই। বীয়ারটা ধরেছে আমাকে। মাথাটা ঘোরে, পা টলে একটু। ছেলেটা দুই বিশাল হাতে পাখির মতো আমাকে তুলে নেয়।

নাচের চত্বরে সে এনে আমাকে ছেড়ে দেয়। পা টলতে থাকে আমার, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে, আমি মাতালের হাসি হাসতে থাকি। ছেলেটার মুখ আমার মুখের ওপর ছায়া ফেলে। তার পরমুহূর্তেই সে আমাকে তার বিশাল বুকের মধ্যে টেনে নেয়। বাজনার শব্দ গভীর কুয়ার ভিতর থেকে উঠে আসতে থাকে। কি গভীর শব্দ। সে আমাকে চরকির মতো ঘোরাতে থাকে। আমি তার পুরুষালী গায়ের স্বেদগন্ধ পাই। মুখ তুলে হাসি। তার গলার ক্রুশটা আমার গালে লাগে, ঠোঁটে লাগে। গভীর তৃষ্ণায় আমি ক্রুশটা দাঁতে চেপে ধরি, মুখে নিই। ঠাণ্ডা স্বাদ। ছেলেটা চোখে চোখ রেখে হাসে। অচেনা সে, বড়ই অচেনা। তবু পৃথিবীতে কে কার! আমি ক্রুশ মুখে নিয়ে হাসি।

নাচের তালে আমার পা পড়ে না। বাজনা একদিকে বাজে, আমার পা পড়ে অন্য দিকে। আমি গভীর নির্ভরতায় তার বুকে মাথা রাখি। সবল হৃৎপিণ্ডের ডুব-ডাব্ ডুব ডাব্ শব্দ শুনতে পাই। সেই তালে পা ফেলি।

কে যেন চেঁচিয়ে বলে—দি গ্রীন—দি গ্রীন লেডী—হো—আ—

একটা লোহার বালা পরা হাত আমার হাত চেপে ধরে, কানের কাছে আর একটা পুরুষ গলা বলে—কম্ অন্ গ্রীন লেডী—

পরমুহূর্তেই ছেলেটার বুক থেকে অন্য একজন কেড়ে নেয় আমাকে। চুমু খায়। উদ্দাম ড্রামের শব্দ সংগীতের সব নিয়ম ভেঙে দিতে যাচ্ছে। কেউ বাজনার সাথে পা ফেলতে পারে না। তার দরকারও নেই। পাগল-ঘরে কোনো নিয়ম নেই। লজ্জা নেই। রাগ করবে না কেউ, মানা করবে না।

আমি অনায়াসে পা ফেলতে থাকি। নাচের সব সীমাবদ্ধতা ভেঙে দিতে থাকি। এক বুক থেকে আর এক বুকে চলে যাই। অচেনা সব হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে থাকি। কে যেন এক পলকের জন্য নাচের চত্বর থেকে তার অন্ধকার টেবিলে নিয়ে যায়। তার মুখ দেখতে পাই না। শুধু লাল টকটকে জামাটা দেখি। একটা গভীর খয়েরী রঙের মদ ঝকঝকে গ্লাসে তুলে দেয় আমার মুখে, ফিস্ ফিস্ করে বলে—ড্রিঙ্ক গ্রীন লেডী, ড্রিঙ্ক, ইউ হ্যাভ্ থার্স্ট—

শুনে মুহূর্তেই তাকে গভীর ভালবেসে ফেলি। চেরীর গন্ধে ভরা, মিষ্টি

ঝাঁঝালো মদ আমার বুকের তেষ্টা ভাসিয়ে নেয়। যুদ্ধের বাজনা দ্বিগুণ হয়ে ডাকে। লাল জামা পরা লোকটা আমাকে বুকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে নাচের চত্বরে।

কখন হাত-বদল হয়ে যাই। বিভিন্ন পুরুষের ঠোঁট স্পর্শ করে আমার ঠোঁট, গাল, কপাল। শরীরে শরীর চেপে ধরে। কেউ হিংসে করে না, কেউ চিরদিনের মতো নিয়ে যেতে চায় না। ছেড়ে দেয়। মাঝে মাঝে চিৎকার ওঠে—গ্রীন লেডী—হো—আ—

নাচতে থাকি। ভেসে যায় অতীত। স্মৃতি। সম্পর্ক। আমার সুখের স্থির জীবন। কেবল মুহূর্তগুলি দেখতে পাই। পুঁতির দানার মতো ছড় ছড় করে ছড়িয়ে পড়ছি আমি।

নাচ আর নাচ। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়। বাজনা মৃদু লয়ে নেমে যেতে থাকে। কে যেন টেনে নেয়। অন্ধকার টেবিলে নিয়ে বসায়। পিঠে হাত রাখে। ঠাণ্ডা সুস্বাদু মদ তুলে দেয় মুখে। আদর করে। আবার ধনুকের টংকারের মতো বেজে ওঠে গীটার। উঠে দাঁড়াই। গভীর ক্লান্তি আসে, শরীর টলতে থাকে। তেষ্টায় বুক পুড়ে যেতে থাকে। তবু নাচতে আমাকে হবেই। এ আমার নিয়তি।

নাচি, নাচতে থাকি। আমাকে ঘিরে কয়েকজন পুরুষ গোল হয়ে একটা বৃত্ত রচনা করেছে। লাল জামা, নীল জামা, হাতে বালা, চওড়া বেল্ট। তাদের কারো মুখ চেনা মনে হয় না। একটা মুখের আদল আর একটা মুখের মধ্যে মিলিয়ে যায়। তারা আমাকে ঘিরে ঘুরে ঘুরে হাততালি দেয়। আমি নাচতে নাচতে টলতে থাকি, টলতে টলতে নাচি। গভীর ভালবাসায় নীল জামার দিকে হাত বাড়িয়ে বলি—আমাকে নাও। সে এগিয়ে এসে আমার হাত স্পর্শ করে মাত্র, তারপরই হাত ধরে ঘুরিয়ে একা ছেড়ে দেয়। ফিরিয়ে দেয় নীল জামা। ফিরিয়ে দেয় হাত-বালা। কেউ কথা বলে না। হাসে আর হাততালি দেয়। আমি প্রাণপণে নাচি আর নাচি। দেখতে পাই, আলোগুলো নিভে গেল। পুরুষেরা মিলিয়ে গেল ছায়াবাজীর মতো।

চারদিকে লক্ষ বছরের পুরোনো গাছ। নিবিড় অন্ধকার। শ্যাওলায় পিছল মাটি। গভীর অরণ্যের ভেজা গন্ধ। আমি একা। গভীর ক্লান্তিতে শরীর ঝরে পড়ছে। চেনা, প্রিয় কোনো মানুষের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে যাই। ভয়ঙ্কর আতঙ্কে দেখি, সব নাম ভুলে গেছি। কারো নাম মনে পড়ে না, কারো মুখ না, কারো স্পর্শ না। গভীর অরণ্যে গম্ভীর বাতাস বয়ে যায়। ফিস্ ফিস্ করে বাতাস বলে যায়—গ্রীন লেডি, ড্যান্স অ্যালোন্—দিস্ ডে ইজ্ ফর ইউ—

আমি চিৎকার করে বলি, ক্ষমা করো। কিন্তু সব ভাষা ভুলে গেছি কবে! কেবল আদিম মানুষের ভাষাহীন শব্দ বুক থেকে বেরিয়ে আসে—হো—আ

boiRboi.net

॥ সোমসুন্দর ॥

—আমি বাজিটা হেরে গেছি।

আমি মাথা নেড়ে বললাম—না। বড়দা দুর্গাপুরে ফিরেছিল।

মনোতোষ বলে—তাতে কি! বাসায় তো ফেরেন নি। আমার বাজি ছিল, বাসায় ফিরলে আমি জিতবো।

আমি বলি—না ফিরলেই কি! খবর তো পাওয়া গেছে! তাছাড়া বাসায় ফেরাটা এখন সেফ্ নয়।

মনোতোষ মুখটা চকিতে ঘুরিয়ে বলে—কেন ?

বেফাঁস কথাটা বলেই বাতাস গিলেছি। মুখটা পাথরের মতো করে বললাম—ও কিছু না।

মনোতোষ তবু বলে—রাজনীতি নাকি ?

চুপ করে থাকি। মনোতোষ শ্বাস ফেলে বলে—আমার ভাইটা ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ত যাদবপুরে। সব ছেড়ে এখন ঐসব করে। সারাদিন বাসায় থাকে না, কত রাতে যে ঘুমোতে আসে তা কেবল মা জানে। সকালে দেখি, জামায়, আঙুলে আলকাতরার দাগ।

—কিছু বলেন না ?

—বলতে ভয় করে। ওটা যে ওর নেশা। আমার ঘোড়ার নেশার মতো। আমি যদি ওর রাজনীতি নিয়ে বলি, ও উল্টে আমাকে আমার ঘোড়া নিয়ে বলবে। কাজেই ছেড়ে দিয়েছি। কেবল মাঝে মাঝে তারকেশ্বরে আমি আর মা মানত করে রাখি। রবিবার গিয়ে পুজো দিয়ে আসি। বাবা তারকনাথই রেখেছে।

গাছতলায় বাঁধানো বেদীতে দুজন চুপ করে বসে থাকি। সন্ধ্যের পর একটু বাতাস দিচ্ছে। শুকনো বাতাস।

মনোতোষ একটু কেশে বলে—তাহলে বাজিটার কি হবে ?

—আমরা কেউ জিতিনি।

মনোতোষ আমাকে কনুইয়ের একটা ঠেলা দিয়ে খক্ খক্ করে হাসল। বলল—দূর মশাই! নিয়ম মাফিক বাজিটা আমিই হেরেছি। টাকাটা যদি না নেন তবে চলুন একটু খাওয়াদাওয়া করি। বেশি কিছু না, একটা করে মোগলাই, আর একটু কষা মাংস—

আমি মাথা নাড়ি।

মনোতোষ হাসে—কদিন আগে আট আনা ধার নিয়েছিলাম বলে দেখছি আমার ওপর আপনার ধারণা পাল্টে গেছে। ধারের ওই দোষ মশাই, লোকের কাছে পার্সোনালিটি রাখা যায় না। যে ধার দেয় সে করুণা করতে শুরু করে।

আমি হেসে ফেলি, বলি—তা নয়।

—তা-ই। তবে ভাববেন না। গত শনিবার ক্লোরা আমাকে একশ চল্লিশ

টাকা পেমেণ্ট দিয়েছে। বুড়ো ঘোড়া, এখন আর কেউ ফ্লোরার ওপর টাকা ধরে না। আমি মরিয়া হয়ে ধরেছিলাম। আমাকে পেমেণ্ট দেওয়ার জন্যই ফ্লোরা সেদিন মুখে রক্ত তুলে দৌড়ুলো। গত ছ'মাসে ফ্লোরার এই প্রথম উইন, আমারও ঘোড়ার মাঠ থেকে প্রথম আয়। চলুন, বেশি কিছু না। একটা করে মোগলাই, একটু কষা মাংস।

খেতে ইচ্ছে করছে না। বলতে গেলে সারাদিন আমার পেটে কিছু পড়েনি। দুপুরে খাওয়ার আগে দুর্গাপুর থেকে বৌদির চিঠি এল। আমাকে লেখা। এক জায়গায় লিখেছে—নেনটু একবার আসবে ভাই? তোমার বড়দাকে এখানে দাদা ছাড়া কেউ চেনে না। তাই কেউ খুঁজে পাচ্ছে না। আমার মনে হচ্ছে এখানেই ও আছে। কুলি, মুটে, মজুর সেজে, কিংবা চাষাভুষোদের সঙ্গে মিলেমিশে ঠিক লুকিয়ে আছে। দাদার বড় কাজ এখানে, সময় পায় না। তুমি চলে এলে বেশ হবে। তুমি আর আমি মিলে খুঁজবো। একা একা আমি পারি না। দাদা বেরিয়ে গেলে বুবলাকে দুপুরে ঘুম পাড়াই। মিনু ঘুমোতে চায় না, কাজেই ওকে নিয়ে চুপি চুপি বেরোই। দাদা জানলে রাগ করবে, তাই কাউকে জানাই না। রাস্তাঘাট চিনি না, বিরাট জায়গায় কোথায় খুঁজবো? তবু হেঁটে হেঁটে শহরের সব পাড়ায় ঘুরি। মিনু অত হাঁটতে পারে না। তাই তাকে কোলে নিতে হয়। মিনু তো রোগা, তবু ওকে টানতে এই দুপুরের গরমে কি যে কষ্ট হয়! তবু হাঁটি, লোকের মুখ দেখে দেখে বেড়াই। গরম একশ দশ পনেরো ডিগ্রী। পরশুদিন মিনু হঠাৎ মাঝরাস্তায় অজ্ঞান হয়ে গেল আমার কোলের মধ্যে। এই গরম কি সইতে পারে! কখনো তো কষ্ট পায়নি! কষ্ট পাওয়া শিখতে সময় লাগবে। মাঝরাস্তায় ওকে নিয়ে কি যে বিপদে পড়লাম! কোথাও একটু জল নেই। রাস্তাঘাট খাঁ খাঁ করছে। শহর ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম তো। বাড়ি ঘরও নেই সেখানে। কি কষ্টে যে বাসায় ফিরেছি! সেই থেকে মিনুর একশ চার ডিগ্রী জ্বর। ডাক্তার বলেছে, সাঁদগর্মী। মিনুর অসুখ হওয়াতে দাদা সব টের পেয়ে গেছে। রেগে বলেছে—এরকম করলে তোকে কলকাতায় রেখে আসবো। দাদার কথার উত্তর দিইনি। কিন্তু আমি যে না খুঁজে পারি না। এখনো অনেক লোকের মুখ দেখা বাকি রয়ে গেছে।······

চিঠিটা পড়ার পর দুপুরের খাওয়াটা হল না। ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম কেবল। মা বাবাকে জানালাম না কিছু। কিন্তু মিনুর টুলটুলে সুন্দর মুখখানা বারবার দেখি, জ্বরের ঘোরে নিভে যাচ্ছে। শুকনো ঠোঁট, আরক্ত মুখ, তড়কায় চমকে চমকে উঠছে মিনু।

অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলাম। মনোতোষ ঠেলে তুলল—উঠুন মশাই। একখানা করে মোগলাই, আর একটু কষা মাংস—

ভবানীপুরে ফেবারিট রেস্টুরেণ্টে চেনা টেবিল চেয়ারে গিয়ে বসি। বন্ধুরা কেউ আসেনি এখনো। মোগলাই আসে, কষা মাংস আসে। গন্ধে হঠাৎ চনচনে খিদে পায়।

—খান। মনোতোষ বলে—একটু তাড়াতাড়ি হাত চালাবেন। আড্ডাবাজরা এসে গেলে হামলে পড়বে। ফ্লোরার দেওয়া একশ চল্লিশ টাকার কীই বা আছে আর!

boiRboi.net

হাসতে থাকি। বৌদির চিঠিটার ওপর একটা বিস্মৃতির প্রলেপ পড়ে।

ফেবারিট রেস্টুরেন্টটা একটু গলির মধ্যে। বাইরের খদ্দের কম। গত দশ বছর আমরাই দখল করে আছি। গলিটা অন্ধকার। টিমটিমে রাস্তার আলো আছে, তবে দোকানের ভিতরের টিউবলাইটে বসলে বাইরেটা অন্ধকার দেখায়।

খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। চায়ে প্রথম চুমুকটা দিয়ে চোখ তুলতেই দেখি দরজার সোজাসুজি বাইরের অন্ধকারে একটা সিগারেট স্থিরভাবে জ্বলছে। প্রথমে একটা দেখি। তারপরেই বুঝতে পারি, একটা নয়। দশ বারোটা। নিঃশব্দে জ্বলছে সিগারেটগুলো। উঠছে, নামছে, কিন্তু সরে যাচ্ছে না।

চায়ের কাপটা রেখে দিয়ে টেবিলে দুটো টোকা দিই। মনোতোষ চোখ তুলতেই বলি—বাইরে কয়েকটা ছেলে। ওদিকে তাকাবেন না।

মনোতোষ হাঁ করে চেয়ে থাকে।

আমি হাসলাম, বললাম—আমি খবর রাখি, কয়েকটা ছেলে আমাকে খুঁজছে। বোধহয় এরাই। যদি আমার কিছু হয় তো—

বলে আমি দাঁতে ঠোঁট টিপলাম। কিছু মনে পড়ল না।

মনোতোষ ক্রমে ব্যাপারটা বুঝতে পারে খানিকটা। তার চোয়াল নড়ে। কষ্টে বলে—আপনি বসে থাকুন। ভিতরে কিছু করতে সাহস পাবে না।

আমি মাথা নাড়ি, বলি—দশ বারোজন আছে। আমি না বেরোলে ওরা ভিতরে আসবে। সময় দেবে না।

মনোতোষ হঠাৎ বলল—আপনি তো বক্সিং জানেন!

হাসলাম, বললাম—জানি না। জানতাম। সে অনেককাল আগেকার কথা। জানলেও লাভ ছিল না। মানুষ অতিমানুষ নয়। ওদের দশ-বারো জনের কাছেই আর্মস আছে।

মনোতোষ রুমাল বের করে মুছল। তারপর হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বেয়ারা হারুকে ডেকে বলল—বিল দে। তাড়াতাড়ি।

উত্তেজনায় মনোতোষ ভুলে গেছে এ দোকানে আমাদের কোনো কালে বিল দেয় না। মুখে মুখে হিসেব।

মনোতোষ তাড়াহুড়ো করে পয়সা দিচ্ছে দেখে বললাম—ব্যস্ত হবেন না। বসে থাকুন। আমি বেরোচ্ছি।

মনোতোষের মুখটা হঠাৎ লাল হয়ে গেল। চাপা হিংস্র গলায় বলল—আপনি কি ভাবছেন আমি পালাচ্ছি! আমি সঙ্গে যাচ্ছি দাঁড়ান।

ভীষণ অবাক লাগে। মনোতোষের হার্ট ভাল না। চিরকাল অতিরিক্ত খেয়ে তার ডায়াবেটিস দেখা দিচ্ছে। অল্পেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তারপর ক্লান্ত হয়। বন্ধুরা বিস্তর বকাঝকা করে, তবু মনোতোষ খাবেই। শুনেছি, ডায়াবেটিসের রোগীর কোন রোগ সহজে সারে না। কেটেকুটে গেলে রক্ত পড়া বন্ধ হতে চায় না। মনোতোষের বয়স চল্লিশ-টল্লিশ হবে। দুটো ফুটফুটে মেধাবী ছেলের বাবা। ছুটির দিনে সকালে মাঝে মাঝে ছেলেদের নিয়ে আসে ফেবারিটে, পাশে বসিয়ে ডিম ভাজা খাওয়ায়, ঠাট্টা করে বলে—তোদের বাবার কবর দেখে যা। এই রেস্টুরেন্টে

বসে বসেই স্কুল কলেজ ছেড়েছি, ঘোড়া ধরেছি, বাংলা ধরেছি। রোগ-টোগগুলোও সব এখান থেকে পাওয়া। এই রেস্টুরেন্ট থেকেই পাবো ফেয়ারওয়েলের উপহার থ্রম্বসিস্। বলেই ঝুঁকে পড়ে আমাদের দিকে চেয়ে বলে—কি যেন সেই জসীম-উদ্দিনের কবিতাটা—এইখানে তোর দাদীর কবর···বলে খক্ খক্ করে হাসে। ফুটফুটে ছেলে দুটো চারদিকে অবাক হয়ে চায়।

আমি ঝুঁকে বললাম—মনোতোষবাবু, এটা আমার ব্যাপার। একা আমি হয়তো বা বেরিয়ে যাবো, আপনি পারবেন না।

মনোতোষ তার স্থূল লাল মুখখানা স্থিরভাবে তুলে বলে—আমি আজ আপনাকে এখানে এনেছি। নইলে আপনি হয়তো আসতেন না। আমি আপনাকে বাসে তুলে দিয়ে আসবো।

মনোতোষের কথা শেষ করার আগেই চারটে ছেলে ঘরে ঢুকল। চারজনই অচেনা। কিন্তু অচেনা হলেও ওদের চোখ মুখে একধরনের পরিচয় দেওয়া আছে। এরা মারতে জানে। ঢুকে ওরা কোনো দিকে তাকায় না। কেবল চারজন চারটে টেবিলে গিয়ে বসে। বসে থাকে। যেন ভাবছে। রেস্টুরেন্টের ভিতরে কোন সম্ভাব্য গুপ্ত রাস্তা থেকে থাকলে ওরা সেটা আটকে দিল। আমাকে বেরোতেই হবে।

হারু মনোতোষের ফেরত-পয়সা হাতে দিয়ে সেই চারটে ছেলের একজনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—কি খাবেন ?

ছেলেটা মাথা নাড়ল।

এইটুকু দেখে আমরা উঠলাম।

দরজার কাছ বরাবর আমি মনোতোষকে কনুইয়ের ধাক্কায় পিছনে সরিয়ে দরজা জুড়ে দাঁড়াই। আলসেমীর ভান করে আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলি। ততক্ষণে দেখা হয়ে যায় যা দেখার। বড় রাস্তার দিকেই ওরা দলে ভারি। গলির ভিতর দিকটায় মাত্র দুজন। সিঁড়ির মুখটাতে বাবু দাঁড়িয়ে আছে, হাতে পাণ্ডু। বাবুর বদলে দিলীপ সামনে থাকলে আমি একটু মুশকিলে পড়তাম। আমি পেশাদার গুণ্ডা নই, কাউকে বন্ধু বলে ভাবলে এখনো হাত ঢিলে হয়ে যায়। বাবু আমার বন্ধু নয় কাজেই আমার অসুবিধে নেই।

সিঁড়িতে পা দিলাম না। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতেই চকিতে লাফ দিয়ে নামলাম। বাবু হাত তুলবার সময় পেল না। চরকির মতো ঘুরে বাঁ হাতের নিখুঁত মারে শুইয়ে দিলাম ওকে। ওই মারের বেগ থেকেই ঘুরে বাঁ দিকে ছুটতে লাগলাম।

এরা চেঁচিয়ে তাড়া করে না, নিঃশব্দে করে। মারে শব্দ না করে। বাঁ দিকের ছেলে দুটো একটু আনাড়ি। বোকার মতো ল্যাং মেরে আমাকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করল। আমি শুধু দৌড়ের মুখে তাদের উরুর ওপর দিয়ে লাফ দিয়ে যাওয়ার সময়ে দু দিকে দুজনকে কনুই ঠেকিয়ে গেলাম। দুটোই ছিট্‌কে গেল। দুদিকের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে সামলে ছুটতে লাগল।

চেঁচিয়ে লাভ নেই। এ পাড়ার লোক ওদের চেনে, বেরোবে না। চেঁচালে বরং দমের ক্ষতি। দমটা ধরে রেখে সিধে দৌড়োনো গেল। গলিটা সরু হয়ে এসেছে। হলেই সুবিধে। আমি ঠিক পালাতে চাইছি না। একটা জায়গা খুঁজছি যেখানে

জায়গাটা সংকীর্ণ হবে, ওরা এক-দুজনের বেশি একসঙ্গে মারতে পারবে না। গলিটা আর একটু সরু হলেই আমি ফিরে দাঁড়াবো।

কিন্তু অতটা সময় পাওয়া গেল না। আনাড়ি দুজনের মধ্যে একজন ভাল দৌড়োয়। গলিটা আরো সরু হওয়ার মুখে সে প্রায় আমার সমান্তরাল অবস্থায় চলে এল। এ অবস্থায় মারা চলে না, মারতে হলে থামতে হবে। আড়চোখে দেখি, ছেলেটা ডান হাত চালিয়ে দিল আমার পিঠের দিকে। কেবল একটু সরে যাই। তবু ছোরাটা বাঁ কনুয়ের ওপর চামড়া চিরে ফেলে। ছেলেটা আবার ছোরা তোলে, এবার ভুল করবে না আর।

থেমেই ঘুরে যাই। ঘুরতে ঘুরতেই ডান হাতে মারি। এটা আমার পুরোনো প্রিয় মার। ছেলেটা পড়ে যায়। একটু দুঃখ হতে থাকে। রিংয়ের বাইরে আমি এতকাল কদাচিৎ কাউকে মেরেছি। কিন্তু ইদানিং আমার রিংয়ের বাইরের প্রতিপক্ষ বেড়ে যাচ্ছে কেবল।

ঘুরবার সময় পেলাম না। দ্বিতীয় আনাড়ি ছেলেটা দৌড়ে এসে কি একটা ছুঁড়ল। মাথা চকিতে নীচু করি। সেটা মাথার ওপর দিয়ে উড়ে পিছনে কোন দেয়ালে ফাটল। ছেলেটার হাত এখন ফাঁকা, আমার নাগালের মধ্যেই। চকিত হাতে তার মুখে মারি। মেরেই চমকে গিয়ে বুঝতে পারি, ছেলেটা বকসিং জানে। মাথাটা সরিয়ে নিল আচমকা। আমার ঘুঁষিটা কেটে বেরিয়ে গেল। অমনি ভীষণ ভয়ে ভরে গেল বুক। ওদের মধ্যে অন্তত একজন বকসিং জানে—এ সত্যটা আমাকে পলকের মধ্যে দুর্বল করে দিল। আমি আর একদম জোর পেলাম না। ঘুরে আবার দৌড় দিলাম।

ডান দিকে এলগিন রোডের মুখ। পুলিশের টানা বাঁশি শুনে চোখ তুলে আবছা একটা কালো জীপ গাড়ি দেখতে পাই। ডানদিকের গলির মধ্যে ঢুকে পড়ি। একটা বুটের শব্দ তেড়ে আসে, চেঁচিয়ে বলে—হল্ট্! হল্ট্! গোলি মার দুঙ্গা!

গলি থেকে বেরিয়ে আশুতোষ মুখার্জী রোডে পড়ি। তারপর আর দৌড়তে হয় না। ভিড়ে মিশে যাই।

হাতটা নিয়েই মুশকিল। ঝর ঝর করে রক্ত পড়ছে। লোকজন তাকিয়ে দেখছে। সন্দেহের চোখ। থেমে কোনো ডাক্তারখানায় ঢুকতে সাহস পাই না। রাস্তাটা পার হয়ে ছোটো রাস্তায় ঢুকি। একটা বাস পেয়ে যাই।

পরদিন সকালেই পুলিশ আসে। সেই অফিসার।

গম্ভীর মুখে আমাকে বলে—কি খবর?

আমি স্থির গলায় বলি—আপনারা তো খবর জানেন।

নির্দ্বিধায় অফিসার আমাকে একটি চড় মারেন। বলেন—হ্যাঁ জানি। টুনো ইজ আওয়ার প্রফেশন। থানায় চলুন।

ঘটনাটা আমার মা-বাবার চোখের সামনে ঘটে। বাবা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকেন। মা ভীত চোখে ব্যাপারটা দেখে, তার ঠোঁট নড়তে থাকে। ছোড়দা শুধু বলে—মারছেন কেন? মারাটা তো আইন নয়। ওয়ারেণ্ট থাকলে নিয়ে যান।

boiRboi.net

থানায় এবারও আটকাল না। ছেড়ে দিল। সেই দার্শনিক ও-সি শুধু বললেন—ব্যাপারটা আমি আন্দাজ করছি। কিন্তু মশাই, আপনাকে আমি ঠাণ্ডা থাকতে বলেছিলাম কিনা! আপনারা যারা নন-পলিটিক্যাল তারা যদি এখন এমনভাবে পুলিশকে অসুবিধেয় ফেলেন তবে আমরা যাই কোথায়! আপনারা একটু আমাদের অসুবিধেগুলো বুঝুন দয়া করে। আমাদের লক-আপে আর জায়গা নেই।

হাঙ্গামা আমি করিনি। শুধু প্রাণভয়ে পালিয়েছি। কিন্তু সেসব কথা বলে লাভ নেই। পুলিশ তার নিজস্ব সূত্রে খবর রাখে।

ও-সি বললেন—এখন আর কোথাও যাবেন না। ঘরেটরেই থাকবেন। আর কোনো হাঙ্গামা হলে—

বলে হাসলেন। অর্থপূর্ণ হাসি। কিন্তু পরিষ্কার দেখতে পাই, আগের দিনের তুলনায় তাঁর মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ বেশি। একটু অস্বস্তির মধ্যে আছেন যে বোঝা যায়। অনেকক্ষণ শূন্যচোখে আমার দিকে চেয়ে কি যেন ভাবলেন। আবার হঠাৎ সচেতন হয়ে বললেন—দিলীপ আর বাবুদের আমি চিনি। ওরা একসময়ে খুব জ্বালিয়েছে। ওদের সঙ্গে আপনার লাগল কি করে?

উদাসভাবে বলি—লেগে গেল। আমি লাগাইনি।

উনি একটু শ্বাস ছেড়ে বললেন—তবে ওদের ধার কমে গেছে। পুরোনো মস্তানদের দিন আর নেই। এখন সবচেয়ে বিপজ্জনক টিন-এজার। এদের কোনো পরিচয় আমাদের খাতায় নেই। এদের রক্তটাই পাগল। আমরা এদের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত আছি। দিলীপ কিংবা বাবুদের নিয়ে মাথা ঘামানোর সময়ই নেই।

বসে শ্বাস ছেড়ে আমার দিকে আর একবার তাকালেন, বললেন—আপনার নামে তিনবার ডায়েরী লেখানো হল। এটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। সাবধানে থাকবেন।

মনোতোষের কোনো খবর জানি না। জানতে খুব ইচ্ছে হচ্ছিল। একটু ঘুরে ফেবারিটে গিয়ে উঁকি দিই। এগারোটা বেজে গেছে। টেবিলের ওপর চেয়ারগুলো উল্টে রেখে ঘর ধোলাই হচ্ছে। হারুকে ডেকে জিজ্ঞেস করতেই হাঁউমাউ করে বলল—কাল কি কাণ্ড হয়ে গেল বাবু!

—কি কাণ্ড?

—যে চারটে ছেলে ছিল এখানে, আপনি পালিয়ে যাওয়ার পর তারা বেরোতে যাচ্ছে হুড়মুড় করে, মনোতোষদা তাদের পথ আটকে দাঁড়িয়ে সে কি চেঁচানি! কেবল বলে—বেরোলেই মেরে ফেলব তোদের। ছেলেগুলো প্রথমটায় ভড়কে গিয়েছিল, তারপর মনোতোষদাকে দরজার কাছে ফেলে দিয়ে দারুণ লাথি মেরে অজ্ঞান করে চলে গেল। চেয়ারফেয়ার উল্টে, কাপ-ডিশ ভেঙে তুলকালাম। মনোতোষদার এমনিতে তেমন লাগেনি, কিন্তু ভয়ে গোলমালে কেমন হয়ে গিয়েছিলেন। আমরা ডাক্তার ডেকে আনলাম, বাসায় খবর দিলাম। রাত্রেই হাসপাতালে দিয়ে আসতে হল। খুব অসুখ মনোতোষদার।

দুপুরটা খুব দীর্ঘ লাগছিল। থানা থেকে ফেরার পর বাবা অনেকক্ষণ

জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।

—তোর কি হয়েছে আমাকে একটু বল্।

—কিছুই হয় নি, কি হবে!

—তোর মুখ তো তুই দেখতে পাস না। আমরা পাই। তোর চোখ মুখ অবিকল বাবার মতো হয়ে যাচ্ছে। বাবা যখন খুন করতেন তখন খুব ঠাণ্ডা হয়ে থাকতেন। কথাবার্তা কমে যেত। ঘন ঘন তামাক খেতেন। গভীর রাত পর্যন্ত শুনতাম উঠোনে খড়মের শব্দ তুলে পায়চারী করছেন। তারপর একদিন সময় হলে নিঃশব্দে বেরিয়ে যেতেন। ফিরে এসেই পুজো দিতে যেতেন কালীবাড়ীতে। সেইসব সময়ে বাবাকে দেখলেই মনে হত—এ বাবা নয় অন্য লোক। ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যেতাম। তোকে দেখে আমার আজকাল সেরকম হয়। তুই কোথায় যাস্? কাদের সঙ্গে মিশিস্?

—কারো সঙ্গেই নয়।

—মিশিস্, আমি জানি। পলিটিক্স্ করে একজন ফেরার। অন্যজন হাঙ্গামা বাঁধিয়ে আসছে। কাল থেকে তোর হাতে ওটা কিসের ব্যাণ্ডেজ?

—পড়ে গিয়েছিলাম।

—পড়ে গেলে সকালে পুলিশ এসেছিল কেন? থানায় নিয়ে গেল কেন? মিথ্যে কথা বলিস না নেন্টু। যা হয়েছে খুলে বল।

—কিছু হয় নি বাবা।

বাবা হতাশ গলায় বলেন—আমাকে বলবি না সে আমি জানি। ছেলেরা একটা বয়সের পর বাপকে গ্রাহ্য করে না। মনে করে, তাদের ব্যাপারগুলো বাপ বুঝবে না।

বাবার জন্য একটু কষ্ট হয়। বলি—বললেই বা তুমি কি করবে?

বাবার মুখ রাগে লাল হয়ে যায় হঠাৎ। বলেন—কি করব? কিছুই করব না। তোদের মেরে ফেলুক লোকে, আমার কি?

আমি চুপ করে থাকি।

বাবা অনেকটা সময় নিয়ে সামলে যান। বলেন—মানুষের পীড়ক হয়ো না। বরং সমাজ সংসার থেকে পালিয়ে যাও।

—বাঃ, আমি কাকে পীড়া দিলাম?

—দিচ্ছো কিনা তা তুমিই জানো। তোমার হাতে ব্যাণ্ডেজ, পুলিশ আসছে প্রায়ই। এসব তো এমনিতেই হচ্ছে না?

—যদি বলি আমাকেই লোকে পীড়া দিচ্ছে?

—যদি দিয়ে থাকে তো তার নাম বলো। আমি পুলিশে গিয়ে বলবো, মিনিস্টারদেরও দরকার হলে জানাব, তোমাকে নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দেবো। এ সবই আমি করতে পারি। তবে আমার কাছে লুকোনো কেন?

নৌকো ঘাট ছেড়ে দরিয়ার স্রোতে পড়ে গেছে। একা এক হাটুরে দেরিতে এসে নৌকো ধরতে পারে নি, ঘাটে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে নৌকো ফেরাতে বলছে, দৌড়াচ্ছে নৌকোর সমান্তর আঘাটার জঙ্গল ভেঙে। কিন্তু জানে নৌকো ফিরবে না, তবু তার আপ্রাণ চেষ্টা। ওই নৌকো আর ঘাটের যা তফাৎ, আমার আর বাবার মধ্যে

boiRboi.net

তফাৎটা সেইরকমই। বাবা তবু প্রাণপণে চেষ্টা করছেন নৌকো ফেরাতে। ফিরবে না জেনেও।

—তোমার বড়দার বিরুদ্ধে পুলিশ কি কেস দিয়েছে জানো? খুনের।

—জানি। কিন্তু বড়দা খুন করতেই পারে না।

বাবা বড় চোখে আমাকে দেখেন। সেই চোখে একটা অপরিচয়ের আবরণ ভেদ করে আসল মানুষটাকে চেনবার চেষ্টা আছে। যেন বা এই বয়সে বাবা হঠাৎ বুঝতে পেরেছেন, তাঁর ছেলেরা তাঁর সবচেয়ে বেশি অচেনা রয়ে গেছে।

গলা খাঁকারি দিয়ে গলার কফ সরিয়ে বললেন—কি করে জানবো যে খুন করে নি? দেখতে শান্তশিষ্ট ছিল বলে বলছো? ওতে কিছু যায় আসে না। খুব শান্ত নিরীহ মানুষের মধ্যেও খুনের ইচ্ছা লুকিয়ে থাকতে পারে। একটা মানুষের মধ্যে তার বংশধারার নানা মানুষের ছায়া থাকে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না হয়তো, কিন্তু ভিতরে ভিতরে মানুষ কখনো সখনো অন্য মানুষ হয়ে যেতে থাকে। এ সবই রক্তের দোষ। তোমার বাবাকে দেখেছি, কোনো শিশুর কান্না শুনলে ভীষণ অস্থির হয়ে পড়তেন। কোনোখানে কোনো বাচ্চা কাঁদছে, বাবা অস্থির হয়ে কেবল বলতেন—ওকে চুপ করা, শিগগির! বাচ্চারা কাঁদবে কেন? অ্যাঁ! কাঁদবে কেন? কেমন সংসার করিস তোরা, কেমন তোরা মা বাপ যে ছেলে কাঁদে? আবার আমাদের উঠোনেই কত বিধবা এসে আছড়ে পড়ে কেঁদেছে, অভিশাপ দিয়েছে, কত মানুষ এসে কেঁদে বাবার পা জড়িয়ে ধরেছে, বাবা সেসব শুনতে পেতেন বলে মনে হ'ত না। মানুষের এক আধটু আচরণ ভাল দেখে কিছুই বোঝা যায় না। একটা মানুষ বংশধারার নানা মানুষের সমষ্টি, তাই তার ভিতরে এক এক সময়ে এক একজনের প্রবৃত্তির বেগ জেগেও ওঠে। একটা মানুষই অবস্থার চাপে, সঙ্গে বা সংঘর্ষে নানারকমের মানুষ হয়ে যায়। তোমার বড়দা সম্পর্কে তাই কিছু স্থির করে বলা যায় না। তাই, একজন মানুষকে বিচার করতে হলে তার পুরো বংশধারাটা খুঁটিয়ে দেখতে হয়, বিচ্ছিন্ন ভাবে তাকে দেখলে কিছুই বোঝা যায় না।

বলতে বলতে বাবার স্বর একটু একটু ভেঙে যেতে থাকে। বার বার গলা পরিষ্কার করছেন। চোখমুখ লাল হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারি, বড়দা সম্পর্কে তাঁর এই সিদ্ধান্ত তাঁরও অভিপ্রেত নয়। বড়দা খুন করেছে—এটা তিনি ভাবতে চাইছেন না, ভাবতে তাঁর ভাল লাগছে না। কিন্তু তাঁর এই বয়সে ছেলেদের বড় অচেনা লাগছে। নৌকো ঘাট ছেড়ে তফাৎ হয়েছে। মাঝখানে যোজন যোজন দুস্তর জলরাশি চলে এল। এক আবছায়া ভেদ করে তিনি প্রাণপণে নিরীক্ষণ করছেন—কিন্তু নৌকোর গতি প্রকৃতি আর বোঝা যায় না। দিগন্তের ধারে নৌকোর দূর মাস্তুল এক মহাপৃথিবীর বিশাল গ্রাসের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।

সব মা বাবাই সন্তানদের ছেলেবেলার গল্প তাদের শোনাতে ভালবাসে। আমরা যখন আরো ছোটো ছিলাম, কতদিন রাতে মা-বাবাকে ঘিরে বসে আমাদের শিশুকালের গল্প শুনেছি তাঁদের কাছে। শুনেছি, বড়দা শিশুবয়সে খুব মোটাসোটা আর ভারী ছিল। টেনে কোলে নেওয়া যেত না। তার গা ছিল ঠাণ্ডা, খুব ঘামত। তেমনি ছিল তার ঠাণ্ডা স্বভাব। যে জায়গায় তাকে বসিয়ে রাখা হত সেইখানেই সে বসে থাকত

সারাদিন। কখনো কাঁদত না। বসে বসে খেলত, খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে পড়ত, জেগে উঠে আবার খেলত। এমনই চুপচাপ ছিল সে, যে মাও কখনো কখনো তার কথা ভুলে যেত। ছেলেটা যে আছে—খেয়ালই থাকত না। আমার ঠাকুর্দার সে ছিল খুব প্রিয় নাতি। তাকে বুকে চেপে ঠাকুর্দা গাল দিতেন—এই শালা হয়েছে একেবারে জলঘট। কখনো বলতেন—তুই বাণ্ডোৎ শালগ্রামশিলা। মেয়ে-পটানো ছাড়া তোর দ্বারা কিছু হবে না। তোর বাপ হয়েছে পোস্টমাস্টার, তুই হবি মাগীমাস্টার। যাত্রার দলে সখী সাজবি, মিহি সুরে গান গাইবি, কোমর দুলিয়ে হাঁটবি, বড় বড় চুল রাখবি, ঢুলু ঢুলু তাকাবি—তোর দ্বারা আর কিছু হবে না। তোকে বউ-মাস্টারের অপেরায় ভিড়িয়ে দেবো। বড়দার সেই শান্তস্বভাব বরাবর বজায় রইল। বড় হয়েও সে ঠাণ্ডা, নড়াচড়া কম করে, একটু আয়েসী, বউ-বাচ্চাদের সঙ্গে ভারি নেটিপেটি, কারো কষ্ট সহ্য করতে পারে না। কেবল একটা জেদী স্বভাব ছিল তার। যা করবে বলে ঠিক করত, তা করত। কেউ ঠেকাতে পারত না। তখন বাধা পেলে সেই শান্ত মানুষটা খুনের মতো ক্ষেপে ওঠে। তখন মনে হয়, ও বড় ভয়ংকর। ও যেদিন কারখানায় মার খেয়ে আসে তার কয়েকদিনের মধ্যেই ইউনিয়নের একজন লোক শিবপুরে খুন হয়। ইউনিয়ন থেকে বড়দা এবং আরো কয়েকজনের নামে ডায়েরী করে।

বড়দার কথা ভাবতে ভাবতে বোধহয় বাবা তার শিশুবয়সের কয়েকটা দৃশ্য মনশ্চক্ষে দেখে নিলেন। দেখলেন, দাওয়ায় বসে খেলতে খেলতে তার শান্ত শিশু ছেলেটি মাটির ওপর শুয়ে আছে, হাঁ-মুখের কাছে উড়ে বসছে মাছি, টোপা টোপা ঘাম জমেছে গায়ে, শিথিল ছোট্ট মুঠি থেকে আদরের খেলনা খসে পড়ে গেছে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দিশেহারার মতো বাবা চারদিকে একবার তাকান, চনমন করে ওঠেন, গলা খাঁকারি দিতে থাকেন। আমার চোখ নামিয়ে একটু ভাঙা গলায় অনুতপ্তের মতো বলেন—নেনটু, সত্যি খুন করেছে—একথা আমি বলিনি। বলেছি?

আমি বড় মায়াবোধ করে বলি—না।

বাবা ভীতু চোখে মিট্ মিট্ করে আমার মুখ দেখে বলেন—আমি বলতে চাইছি, তোমাদের ব্যাপার স্যাপার আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের সব সমস্যার কথা আমাকে খুলে বলো তবে আমি ঠিক বুঝতে পারবো। তোমাদের রক্তের ধাত আমি চিনি। তোমাদের জন্য এখনো আমি অনেক কিছু করতে পারি। বোলো, আমাকে তোমাদের সব কথা বোলো।

একটা শ্বাস ফেলি মাত্র। বড় মায়া হয়।

boiRboi.net

বিকেলে হাসপাতালে মনোতোষকে দেখতে গেলাম।

টান হয়ে শুয়ে আছে। গা ঘেঁষে বিছানায় ওর বৌ বসে আছে—তার মুখখানা লালচে, সেখানে কান্না থম্ ধরে আছে। দু-চারজন আত্মীয়-স্বজন দাঁড়িয়ে, বসে থেকে, ঘিরে রেখেছে ওকে। বড় ছেলেটা ভয় পাওয়া চোখে বাবার মুখের দিকে চেয়ে, মনোতোষ একটা হাতে ছেলেটার হাত ধরেছে। একটু আগেই বোধহয় অক্সিজেনের নলটা খোলা হয়েছে নাক থেকে, সিলিণ্ডারটা নল সমেত এখনো বেড-এর

পাশেই। মনোতোষের মুখটা ফুলেছে খুব। চোখ দুটো বরাবরই একটু ডেলা-পাকানো, এখন সে দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে যেন, চোখে জল জমে আছে, শিরা উপশিরা দেখা যাচ্ছে।

আমাকে দেখেই তাড়াতাড়ি উঠে বসবার চেষ্টা করতে গিয়ে হাঁপাতে লাগল। সবাই চোখ তুলে দেখল আমাকে। অপরাধীর মতো তাড়াতাড়ি গিয়ে মনোতোষের মাথায় হাত রাখলাম।

—কেমন আছেন?

মনোতোষ খানিকক্ষণ দম নিতে নিতে আমাকে চেয়ে দেখল। একটু হাসল। গলায় নাকিসুর এসে গেছে ওর। বলল—বেঁচে আছেন তাহলে? আমি তো ভেবেছিলাম, এতক্ষণে মর্গে পেঁছে গেছেন। কাটাকুটি হচ্ছে।

আমি হাসলাম মাত্র।

ও বলল—আজ সকাল থেকে আশেপাশের বেডগুলোতেও খুঁজেছি আপনাকে। যদি নিতান্ত মেরে ফেলতে না পেরে থাকে তবে অন্তত এখানে তো আসবেন।

ওর বউ ধমক দিল—অত কথা বোলো না।

মনোতোষ হাঁফ্-ধরা গলায় ওর বউকে বলে—সকাল থেকে আশপাশের বিছানায় নেন্টুবাবুকে কেন খুঁজছি জানো?

—কেন?

আড্ডা দেবো বলে। সারাদিন হাসপাতালে হাজারটা অচেনা লোকের মধ্যে পড়ে থাকা—দূর দূর—এসব কি আমাদের পোষায়? আমাদের জান্ পোঁতা আছে দেশপ্রিয় পার্কের কাছে বাঁধানো গাছের তলায়, ফেবারিটে। এইসবের জন্যেই মরে আবার জন্মাতে ইচ্ছে করে।

—কথা বোলো না। তোমার ভাগ্য ভাল যে স্ট্রোক্‌টা হয়নি।

—বাগড়া দিও না। নেন্টুবাবুর সঙ্গে একটু কথা বলতে দাও। দু-তিনটে কথা। প্লীজ।

ওর বউ ভদ্রতাবশত একটু সরে বসে বলল—বসুন না। তুমি আস্তে আস্তে কথা বোলো কিন্তু।

আমি বসলাম না। খাটের লোহার রেলিঙে বুক দিয়ে ঝুঁকে রইলাম। ওর মুখটা ফুলে ব্যাঙের মতো বিচ্ছিরি দেখতে হয়েছে। সেই মুখে তবু হাসছে। বলল—আপনি বেরিয়ে গেলে আমি ভিতরের চারটে ছেলেকে আটকানোর চেষ্টা করেছিলাম।

—শুনেছি। কিন্তু কাজটা ভাল করেন নি।

—করি নি? বলেন কি মশাই। রোজ একজন মানুষকে জলজ্যান্ত চোখের সামনে দেখি, চোখের পাতা ওঠে নামে, হাসে, কথা বলে, রক্তমাংসের তরতাজা একটা মানুষ—তাকে হঠাৎ পাঁচটা ছেলে এসে মেরে দেবে চোখের সামনে? আর আমি ডায়াবেটিস আর প্রেসারের কথা ভেবে চুপচাপ বসে থাকবো। অবশ্য আমার ক্ষমতা কিছু নেই, বক্‌সিং টক্‌সিং জানি না। কিন্তু শুনি, মাস্তানের মতো হাঁকডাক করে ফাঁকা আওয়াজ দিলেও আজকাল একভীড় মানুষ পালিয়ে যায়। সেইটেই এক্সপেরিমেন্ট করলাম। কাজ হ'ল না। ছেলেগুলো একটু থমকে গিয়েছিল ঠিকই, তারপর

boiRboi.net

হাত পা চালিয়ে শুইয়ে দিল। শক্‌টা মারাত্মক। পড়ে গিয়ে দম নিতে পারি না, অসম্ভব শ্বাসকষ্ট হতে লাগল। প্রথমটায় ভেবেছিলাম, ছোরাটোরা মেরেছে বোধহয় —আমি টের পাচ্ছি না। তখন মরে যাওয়ার কথা ভাবছি, বউ বাচ্চার কথা ভাবছি, আপনার মুখও মনে পড়ছে, আবার ভাবছি সামনের শনিবার জ্যাকপটে পাঁচটা ঘোড়া বাছা আছে, স্টারডাস্টের ওপর পঞ্চাশ টাকা উইন খেলব ঠিক করেছি—কিছুই হ'ল না।

মনোতোষ হাত বাড়িয়ে আমার গাল ছুঁয়ে বলল—যা-ই বলুন, আপনি বেঁচে আছেন দেখে বড় ভাল লাগছে। বম্বে-ছবির নায়কের মতো বেঁচে আছেন। দেখে আমারও বাঁচতে ইচ্ছে করে।

হেসে বললাম – বাঁচবেন না কেন? কিছুই তো হয় নি।

—দাঁড়ান মশাই, ই-সি-জি-র রিপোর্টটা আগে আসুক। হার্ট কি হয়ে আছে কে জানে!

—হার্ট ঠিক আছে। না থাকলে চারটে ছেলেছে আটকানোর চেষ্টা করতেন না।

—তাহলে বলছেন বাঁচবো?

—নিশ্চয়ই।

মনোতোষ আমার গলা ধরে মুখটা কাছে টেনে চাপা গলায় বলে—বাজী!

—কত?

—দশ। বাঁচলে আপনার দশ, মরলে আমার।

—দশ।

মনোতোষ আমার মাথাটা ছেড়ে দিয়ে শ্বাস ফেলে বলল—বাঁচতেই ইচ্ছে করে। বাঁধানো গাছের তলায় আড্ডা, ফেবারিটে চা, আর ঘন সবুজ মাঠের ওপর দূরে আকাশের গায়ে আঁকা ঘোড়াদের দৌড়। বেঁচে থাকাটা ভালই।

মিট মিট করে হাসতে লাগল। হাসিটা আমার খুব ভাল লাগে। মনোতোষকে পৃথিবীতে আরো বহুকাল বেঁচে থাকতে দেখতে ইচ্ছে করে।

বেরিয়ে আসার আগে মনোতোষ বলে—সামনের শনিবার আমার হয়ে স্টারডাস্টের ওপর দশটা টাকা খেলবে? সিওর উইন।

ভিজিটিং আওয়ার্স তখনো অনেকটা বাকি আছে। বেরিয়ে এলাম। ঘাসের ওপর ফস্‌ফরাসের মতো রোদ জ্বলছে। রোদে গন্ধকের মতো পোড়া গন্ধ। দেয়াল তেতে তাপ দিচ্ছে। এমার্জেন্সীর সামনে ভীড়। স্ট্রেচারে কাকে যেন নামাচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স থেকে। খুব একটা কৌতূহল বোধ করি না। কেবল চোখের সামনে রোদ ঝলসায়। যতদূর চোখ যায় আকাশ জ্বলে যাচ্ছে। হঠাৎ কাল থেকে ঘটা যাবতীয় ঘটনা ভুলে যাই। মিনুর মুখটা ভেসে আসে চোখে। এই রোদে বৌদি দুর্গাপুরের মাঠে ঘাটে দাদাকে খুঁজে বেড়ায়। অচেনা মানুষের মুখ দেখে দেখে ফেরে। একশ আঠারো ডিগ্রী গরম, জোরো বাতাস, ধুলো, পায়ে-হাঁটা পথ—বড় আশায় তবু বৌদি ভিখিরির মত হাঁটে। মিনু কেমন আছে? ভাল ডাক্তার দেখছে মিনুকে নিশ্চয়ই। তবু কে জানে কি হয়। হাসপাতালের ওষুধের গন্ধ, জীবাণু-নাশকের গন্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য আমি খুব জোরে হাঁটতে থাকি।

সন্ধেবেলা একটা ঠাণ্ডা কোকাকোলা খাওয়াল শ্যামল। বলল—কাল ফেবারিটে খুব গোলমাল হয়েছে তোর জন্য, শুনলাম।

—ও কিছু না।

—কারা এসেছিল ?

—সেই মিছিলের পার্টি।

শ্যামল একটু চিন্তিত হয়। বলে মিছিল আটকানোতে তো আমিও ছিলাম।

—তোকে কিছু করবে না। কারণ, তোকে ওরা চেনে না। আমাকে চেনে।

শ্যামল খুচরো পয়সা পকেটের ভিতরেই নাড়তে নাড়তে বলে—কাজটা ঠিক হয়নি নেন্টু, তোর মাথায় যে কি ভূত চাপল!

হঠাৎ ঝেঁঝে উঠে বলি—ভূত চাপবে কেন ? যা করার ঠিকই করেছি। সারা দেশ জ্বলে যাচ্ছে আর ওরা জাপানী পুতুল সেজে মিহি গান গাইতে গাইতে ঘুরবেন, লোকে হাততালি দেবে, খবরের কাগজে ছবি বেরোবে—এসব যথেষ্ট হয়েছে। তাতে কলকাতার একটা ভিখিরিরও কিছু যায় আসেনি।

শ্যামল বিমর্ষ হয়ে বলে—সেটা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু মিছিলটার সামনে দাঁড়িয়ে কয়েক মিনিট ওটাকে আটকে রেখেই বা কি লাভ হল ? আমরা যে মিছিলটা আটকেছিলাম সে নিউজটা পর্যন্ত পরদিন কাগজে দেয়নি, কিন্তু ওদের ছবি ঠিকই বেরিয়েছে। মাঝখানে তুই ফেঁসে গেলি, মনোতোষ হাসপাতালে। হয়তো আমাদেরও খুঁজে বের করবে। কি লাভ হল ? এমনও নয় যে আমাদের মাস্তানী দেখে কোনো ফিল্মস্টার প্রেমে পড়ে গেল।

আমি উদাস গলায় বলি—লাভ হয়নি, কি করে বুঝলি! আমাদের প্রোটেস্টটা আমরা জানিয়েছি, তার এফেক্টও হয়েছে ঠিকই। রঙ করা মেকী মানুষরা একটা চমক তো খেয়েছে! হয়তো সেই দিনটা ওদের মাটি হয়ে গেছে। ভাল করে খেতে পারেনি, রাত জেগে অনেকক্ষণ চিন্তা করেছে—যা ওরা কখনো করে না। চিন্তাশূন্য, স্বার্থপর মানুষের ভিতরে কিছু বাস্তব এবং সৎ চিন্তা ঢুকিয়ে দেওয়াটাও মস্ত কাজ।

শ্যামল হাসে, বলে—এসব রোমাণ্টিক কল্পনা। ওরা আমাদের পাত্তাই দেয়নি। একজন ফিল্মস্টার মাইরি, মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছিলও। কী সুন্দর মুখখানা—ওই দিকে চেয়ে আমি পালাতে ভুলে যাচ্ছিলাম।

আমি ভীষণ হেসে উঠে শ্যামলের কাঁধ চেপে ধরে বলি—শালা, আলু!

শ্যামল মুখ গোমড়া করে বলে—নেন্টু, তোর ওপর কিন্তু আবার হামলা হবে। এর একটা মীমাংসা করা দরকার।

—কি করতে চাস ?

একটু ইতস্তত করে শ্যামল বলে—দিলীপের সঙ্গে আমার চেনা আছে। চল একবার ওর কাছে যাই। আমরা হুজুগের মাথায় কাজটা করেছিলাম—এটা বুঝিয়ে বলে মিটমাট করে নিই।

—তোর সঙ্গে কি করে চেনা হল ?

শ্যামল একটু অস্বস্তি বোধ করে, চোখে চোখ রাখতে পারে না। অন্যদিকে চেয়ে বলে—ওর বোনের সঙ্গে আমার প্রেম ছিল।

boiRboi.net

তাহা মিথ্যে। তাই হো হো করে হেসে উঠি। বলি—তোর সে সাহসই হবে না। দিলীপের বোনের জন্য বড় কল্‌জেওলা লোক চাই।

শ্যামল একটু হেসে বলল—সে যাই হোক, পরিচয় আছে। আমাদের বাড়িতে আসত-টাসত—এখনো গেলে খাতির করবে। যাবি?

হঠাৎ আচম্‌কা ঘটনাটা আমার মনে পড়ে গেল। গত শীতের আগের শীতে একবার শ্যামল একটা ভীষণ মুশকিলে পড়ে যায়। ওর ছোটোবোন রাখীকে আমরা দেখেছি। ছোট্টোখাট্টো মেয়ে। শ্যামলা রঙ, মুখখানা ঢলঢলে। দেশপ্রিয় পার্কের সামনে দিয়েই গীটার হাতে গীটারের স্কুলে যেত। সেই কুমারী বোনটার পেটে বাচ্চা এসেছে। অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে শুধু এইটুকু বলেই সে কেঁদে ফেলেছিল—তোরা একটা নার্সিংহোম-টোম কিছু ঠিক করে দে। অ্যাবরসন করাতে না পারলে ইজ্জৎ থাকবে না। অবশেষে ফেবারিটের মালিক তার এক ডাক্তার বন্ধুকে ধরে ব্যাপারটা করিয়ে দেয়। আমি তখন কানাঘুষো শুনেছিলাম। সরাসরি কিছু শ্যামল আমাকে বলেনি। তারপর থেকে শ্যামল কিছুদিন রক্তাভ মুখে পকেটে ছুরি নিয়ে ঘুরে বেড়াত। মাথার তেলহীন পিঙ্গল চুল উড়ছে, চোখে একটা চকচকে ভাব, ঠোঁটে কি যেন বিড়বিড় কথা। প্রায়ই বলত—খুন করে ফেলব। বন্ধুরা ওকে ডেকে বোঝাতো—কি করবি, গুণ্ডা বদমাশদের সঙ্গে আমাদের কি করার আছে? তোর বোনটার রুচি ওরকম হ'ল কি করে বুঝি না। ইত্যাদি। ব্যাপারটা ওখানেই চাপা পড়ে যায়। কদিন পর শ্যামল আবার স্নান করতে শুরু করে, দাড়ি কামায়, চুল আঁচড়ায়, পোশাক পরে, অফিস যেতে শুরু করে। তারপর আবার আড্ডা, বন্ধুবান্ধব, হাসি-ঠাট্টা। ওর বোনও কদিন বাদে আবার দেশপ্রিয় পার্কের সামনে দিয়ে গীটারের স্কুলে যেতে থাকে। আমরা দেখলাম মেয়েটা খুব রোগা আর রক্তহীন হয়ে গেছে, মুখে খড়ি-ওঠা ভাব, চোখ ছলছলে। ক্রমে সে স্বাস্থ্য ফিরে পায়। মাত্র কদিন আগে তার বিয়েতে নেমন্তন্ন খেয়েছি।

সেই ছেলেটা দিলীপ কিনা আমি জানি না। তবু আমি হঠাৎ মুখ তুলে বলি—দিলীপের কাছে যেতে তোর লজ্জা করবে না?

কথাটা ঠিক জায়গায় গিয়ে বেঁধে। মুখটা বিকৃত হয়ে যায় ওর, চোয়াল নড়তে থাকে। বলে—লজ্জা কিসের? কি বলছিস?

আমি ওর কাঁধের হাড়টা চেপে ধরে বলি—তোরা কি করে প্রতিশোধের কথা ভুলে যাস? কি করে ক্ষমা করিস?

শ্যামল হঠাৎ ভীষণ রেগে বলল—নেনটু, বাজে কথা বলিস না। কিসের প্রতিশোধ? ক্ষমাই বা কিসের? চুপ কর।

আমার গায়ে শুঁয়োপোকার মতো রোঁয়া দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। থির থির করে শরীর কাঁপছে। কিন্তু আবার আমি সামলে যাই। একটা নিস্তব্ধ পুকুরে হঠাৎ ঢিল পড়লে ঢেউ ভাঙে ঠিকই, আবার সময় নিয়ে নিস্তরঙ্গ হয়ে যায় জল। মানুষের সমাজ ওই রকম। মানুষের আছে স্বস্তিকর বিস্মৃতি। বিয়ের আসরে রাখী আর তার ভদ্র সুপুরুষ আপার ডিভিশন বরকে দেখেও আমাদের সেই ঘটনার কথা মনে পড়েনি। ভুলে যাওয়াই ভাল।

শ্যামল অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। একসময়ে বিবর্ণ মুখখানা তুলে বলল—নেনটু, তোকে মিথ্যে বলে লাভ নেই। তুই জানিস। কিন্তু দিলীপকে আমরা কি করতে পারতাম? আমরা ওকে বিয়ে করার জন্য ধরেওছিলাম, কিন্তু দেখি এর আগে ওর বিয়ে হয়ে গেছে। বউটা কংকালসার, তিনটে বাচ্চা। বোধহয় কোথা থেকে ভাগিয়ে এনেছিল, তারপর চার্ম চলে যাওয়ায় মারধর করে, বেশির ভাগ দিন বাসাতেই থাকে। দিলীপ বিয়ে করতে রাজী ছিল, কিন্তু দেখলাম রাখীর ভবিষ্যৎ ঐ বউটার মতোই হবে। মারধর খাবে। পিছিয়ে গেলাম। ওকে মারবো বলে ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু সে তো সম্ভব নয়। প্রথম কথা, ওকে মারবার সাধ্য নেই, দ্বিতীয়ত, মারলে আমার কি হবে? হয় ওর দল মারবে, নয়তো পুলিশ ঝোলাবে। কয়েকদিন ঘুরে বেড়িয়ে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে গেলাম। রাখীর ভাল বিয়ে হয়ে গেছে, সবাই ভুলে গেছে, মিটে গেছে ব্যাপারটা। এখন আর প্রতিশোধের কথা বলে লাভ কি? সেই ঘটনার পরে এক দুইবার দিলীপের সঙ্গে দেখাও হয়েছে, সে হেসে কথা বলেছে, আমিও বলেছি। মানুষে মানুষে খার থেকে যাওয়া ভাল না। এখন সেইসব কথা যদি ওঠে, যদি জানাজানি হয় তো রাখীর কি হবে?

ভীষণ লজ্জা পেলাম। ওর হাতটা ধরে বললাম—আমার মাথাটা ঠিক নেই শ্যামল। কদিন ধরে দিনকাল ভাল যাচ্ছে না।

—জানি। নেনটু, তোর কিছু টাকা চাই? ধার নিবি?

—দিস।

আর একটা ঠাণ্ডা কিছু খা।

—নে।

দুজনে আবার ঠাণ্ডা অরেঞ্জ খাই। হাসি, কথা বলি।

ওই তো রাস্তার ওপারে দেশপ্রিয় পার্ক। ওখানে ফুটবল মাঠের ধারে গাছতলায় মানিককে মেরেছিলাম। সে নন্দরাণীর যাতায়াতের পথে দাঁড়িয়ে তাকে বিরক্ত করত, জোর করে চিঠি গুঁজে দিত হাতে। নন্দরাণী কেঁদেছিল মার কাছে এসে। তারপর কোথায় চলে গেছে নন্দরাণী! কোথায় মানিক। পৃথিবীতে ঘটনাগুলির গভীরতা কত কম! সময়ের দমকা হাওয়া আসে, ধুলোবালির মতো সব উড়ে যায়। ভুলো-মন মানুষের মতো পৃথিবী ঘুরে চলে।

অরেঞ্জটা শেষ করে শ্যামল সতর্কভাবে বলল—নেনটু, যদি বিপদ বুঝিস তো বল, আমি না হয় দিলীপের কাছে যাবো।

আমি মাথা নেড়ে বললাম—না।

শ্যামল শ্বাস ফেলে বলল—একদিন ফুটে যাবি শালা।

হাসলাম।

বেঁচে থাকাটা এক-একজনের এক-একরকম। মানোতোষ যেমন আড্ডার জন্য, ঘোড়ার জন্য, ছেলে-বউয়ের জন্য বেঁচে থাকতে চায়। আমি কেন বেঁচে থাকতে চাই? কার জন্য? মিনুর জন্য কি? নাকি বুবলার জন্য? বড়দার জন্য? নাকি বক্সিংয়ের জন্য? কিছুই ভেবে পাই না। মাঝে মাঝে কেবল মনে হয়,

কয়েকটা প্রতিশোধের জন্যই বেঁচে থাকা বুঝি ! কিন্তু কোথাও আমার আঁচড় কামড়ের দাগ বসছে না । বড় আলগাভাবে লেগে আছি পৃথিবীতে ।

বাঁধানো গাছটার তলায় আড্ডার লোকজন জমায়েৎ হয়ে গেছে । সবাই ডাকে আমাকে—আরে মশাই, কাল ফেবারিটে কী কাণ্ড হয়ে গেল !

ফেবারিটের ঘটনা শুনবার জন্য সবাই ঘিরে ধরে । ঘন ঘন শ্বাস পড়তে থাকে, উগ্র কৌতূহল চারদিকে । অনুত্তেজিতভাবে উত্তর দিয়ে যাই ।

জমায়েৎ থেকে একটু তফাতে বুকে আড়াআড়ি হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে নীতু । অনেককাল ওকে দেখিনি । গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করি—কি খবর নীতু ? কোথায় ছিলে ?

নীতু উত্তর দেয় না । একটু হাসে মাত্র । বরাবর ওর হাসি একটু বিষণ্ণ । শান্ত, সুশ্রী মুখ । গালে স্বল্প দাড়ি । নীতুর চেহারাটা দেখার মতো । অনেকটা লম্বা, মেদহীন স্বাস্থ্য, মোটা হাড় । ব্যায়াম করত । পোশাক ঠিকমতো পরলে ওকে নিশ্চয়ই এই চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সে ভীষণ ভাল দেখাবে । কিন্তু নীতুর সেই পুরোনো পোশাক, ফুলহাতা বুশ শার্ট, তার হাতা গোটানো, পরনে প্যাণ্ট, পায়ে ধুলোটে চপ্পল । দক্ষিণে ডায়মণ্ডহারবারের দিকে কোথায় যেন মাস্টারী করে । অসম্ভব বই পড়ার নেশা, ভীষণ সিগারেট খায় । আগে আড্ডায় রোজ আসত । এখন মাঝে মাঝে । দীর্ঘকাল আসে না । শান্ত স্বভাব, ধীর কথা এবং আবেগহীন হাসির জন্য অনেকে ওকে পছন্দ করে । অনেকে ওই জন্যই করে অপছন্দ । একটা অহংকারী ভাব আছে নীতুর । কিন্তু আমার ওকে ভালই লাগে । ওর স্বভাবে গাছের ছায়ার মতো স্নিগ্ধকর কী যেন আছে । কাছে বসলে টের পাওয়া যায় ।

যখন আড্ডা খুব জমে উঠেছে, তখনো মাঝে মাঝে লক্ষ্য করছিলাম নীতু আড্ডার মধ্যে আসছে না । একটু অন্যমনস্ক, একটার পর একটা সিগারেট খাচ্ছে । মাঝে মাঝে আড্ডায় আসা বা আড্ডা থেকে চলে যাওয়া বন্ধুদের সঙ্গে এক আধটা কথা বলছে । আবার একা হয়ে যাচ্ছে । ভাঁড়ের চা খেল দুবার ।

আড্ডা ভেঙে যাওয়ার মুখে সে আমাকে ডাকে—নেন্টু, কথা আছে ।

দুজনে লেক-এর দিকে হাঁটতে লাগলাম । নীতু বলল—তোমার ঘটনাটা শুনলাম । খুব বেঁচে গেছ কাল ।

একটু হাসি ।

সে বলল—মিছিলের ঘটনাও শুনেছি । মনে হচ্ছে, তুমি একটা কিছু করতে চাইছো, কিন্তু কি করতে চাও তা স্পষ্ট করে জানো না ।

নীতুর ওই দোষ । কথাগুলো এমন সরাসরি, স্পষ্টভাবে বলে যে লোকে আহত হয়, ওকে অহংকারী ভাবে । আমি কিছু মনে করলাম না । হাসলাম মাত্র ।

ও নিজে থেকেই বলল—তোমার বড়দা কিন্তু জানতেন তিনি কি চান ।

একটু থমকে গিয়ে বলি—তুমি বড়দাকে চেনো ?

—চিনি, কিন্তু তোমার সূত্রে নয়, অন্য সূত্রে ।

—কিসের সূত্রে ?

—পার্টি ।

—তুমি ওই দলে ?

নীতু বিষন্ন হাসিটা হাসে। আমরা হাঁটতে থাকি।

নীতু বলে—কলকাতায় আমাদের আন্দোলনের যে কজন পায়োনীয়ার ছিলেন সত্যদা তাঁদের একজন। আমার ঘনিষ্ঠ ছিলেন খুব।

—বলোনি ত!

—বলার কি ? আমাদের ঘনিষ্ঠতা তো বন্ধুর দাদা বা ভাইয়ের বন্ধু বলে নয়। সম্পর্কটা অন্যরকম। সিগারেট লুকোনোর সম্পর্ক আমরা মানি না।

—বড়দার কোন খবর জানো ?

নীতু মাথা নেড়ে বলল—না। এখন কেউ কারো খবর রাখি না। সবাই ছড়িয়ে পড়েছি। আমাদের আন্দোলনে কো-অর্ডিনেশনের দরকার হয় না। মোটামুটি আন্দোলনের ধারাটা সকলের জানা আছে। কে কোথায় মরল বাঁচল তার খবর রাখা প্রায় অসম্ভব। তবে জানি সবাই অ্যাকশনে আছে।

লেক্-এর ঝুঁঝ্কো অন্ধকারে ঘাসে পা দিই। জল-ছোঁয়া বাতাস এসে ঝাপ্টা মারে। জলের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে কদিন আগেও ছেলে মেয়ে জোড় বেঁধে বসত। আজকাল লেক্-এ মেয়ে চোখেই পড়ে না। এধারে-ওধারে মদের বোতল, ভাঁড় পড়ে আছে, শালপাতা উড়ছে। আবছায়ায় দেখা যায় তিন চারজন করে লোক, অল্পবয়সী ছেলে বসে আছে, সামনে মদের বোতল, ভাঁড়, ঠোঁটে সিগারেট। এদের পেরিয়ে যাওয়ার সময়ে শোনা যায়, নিজেদের মধ্যে অশ্লীল কথা বলছে; খ্যা খ্যা করে হাসছে। হঠাৎ ভুঁইফোড় এক আধজন মেয়ে হেঁটে যায়—চোখে কাজল, মুখে চড়া পাউডার, মুখশ্রী রুক্ষ, এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে যায়, শিস্ দিলে থামে, ইশারায় কাছে আসে। দর হলে কোন ঝোপ বা গাছের আড়ালে চলে যায়। আজকাল মেয়েরা আর ঘরে নেয় না পুরুষকে। লেক্-এর পাড়ে খোলা জায়গাতেই সবটুকু হয়। বড় জোর আলো থেকে একটু গাঢ় অন্ধকারে চলে যায়। সকালে মাঝে মধ্যে এখানে সেখানে লাশ পাওয়া যায়। কিনারা হয় না। মারপিট লাগে প্রায়ই।

আমরা অনেকটা হেঁটে অন্ধকার দেখে বসলাম।

নীতু বসেই বলল—চারদিকটা কেমন চট্ করে পালটে যাচ্ছে দেখছো ?

—দেখছি। আমরাও পালটাচ্ছি।

—হুঁ। তুমি কোনোদিন মারকুটে ছেলে ছিলে না, হুজ্জৎ করোনি। যারা বক্সিং-টক্সিং করে তারা এককালে একটু আধটু রংবাজ হয়। কিন্তু তুমি তা হওনি। কিন্তু হঠাৎ ইদানীং তুমি পালটে গেছ।

চুপ করে থাকি।

নীতু নিজেই বলে—একটু অ্যাগ্রেসিভ হওয়া ভাল নেন্টু। আমরা তো বহুকাল অপেক্ষা করলাম। এবার ভাঙচুর দরকার। তোমার বড়দা এতকাল শান্তভাবে সংসার করে হঠাৎ ছেলে মেয়ে বউ ফেলে চলে গেল কেন—তা কখনো খুব গভীরভাবে ভেবেছো ?

আমি মাথা নেড়ে বলি—না। কিন্তু বড়দার ফিরে আসা খুব দরকার নীতু, বড়দা না এলে আমাদের সংসারের সব হিসেব গোলমাল হয়ে যাবে।

boiRboi.net

নীতুর সুন্দর দাঁত অন্ধকারে ঝিকোয়। বলে—সব সংসারেরই এক কথা। যারা কাজে নেমেছে তারা জেনেই নেমেছে।

—বড়দার নামে খুনের কেস আছে বলে বড়দা পালিয়ে গেছে।

—খুনের কেস্ কার নামে নেই?

—তোমার নামে আছে?

—দু তিনটে।

—তুমি খুন করেছো?

অন্ধকারে আবার তার দাঁত ঝল্সায়।

দম বন্ধ হয়ে আসে। বলি—বড়দা করেছে?

ও মাথা নেড়ে বলে—জানি না। করে থাকলে কিছু অন্যায় করেনি। পুরোনো নীতিবোধ নিয়ে এসব দেখো না, তোমার বড়দা হিসেবেও বিচার করো না। পারিবারিক মানুষটার চেয়েও সামাজিক মানুষটা বেশি। সমাজের জন্য এসব করলে মানুষের কিছু অন্যায় হয় না।

একটু চুপ করে থেকে নীতু বলে—যে সব এলিমেণ্ট তোমাকে মারার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের সুবিধে মতো পেলে তুমি কি করবে? মারবে না?

—জানি না।

—জানো না কেন? ওরকম ভাসা ভাসা সিদ্ধান্ত ভাল না। বরং জেনেশুনে ছক বেঁধে কাজ করা ভাল। হয় মারবে, না হয় মারবে না। একটা কিছু স্থির করে রাখো। তাতে কাজের সুবিধে হয়, দ্বিধা আসে না।

একটু হেসে জিজ্ঞেস করি—তুমি হলে কি করতে?

—মারতাম।

—কেন?

—ওইরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছি বলে।

—তবে তো অসংখ্য লোক মারতে হয়।

নীতু হাসে। তারপর হঠাৎ বলে—লক্ আপে পুলিশ তোমাকে মেরেছিল। না?

—হুঁ।

নীতু শ্বাস ফেলে বলে—এত মার খাবে কেন নেন্টু? একবার ঘুরে দাঁড়াও না। আজ পুলিশ মারবে, কাল গুণ্ডা এসে মারবে—এত মার খাওয়ার কি আছে? ওরা কি বিশ্বনিয়ন্তা?

—কি করব?

নীতু আবার চুপ করে থাকে। তারপর বলে—তোমার বড়দা কলকাতায় অনেক কাজ রেখে গেছেন। সেগুলো করো। যদি করো তো তোমাকে আমি প্রোটেকশন দেবো। দিলীপ কিংবা বাবুরা অমর নয় নেন্টু। আমরা ওদের চেয়ে অনেক বেশি মরিয়া। কিন্তু তুমি আগে সিদ্ধান্ত নাও ওদের পেলে কি করবে, মারবে না পালাবে?

সিদ্ধান্ত নিতে আমার দেরি হতে থাকে। বুঝতে পারি, নীতু ঠাট্টা করছে না। এসব যারা করে তাদের কাছে এইসব সিদ্ধান্তই জীবন।

আমি চুপ করে থাকি। কিন্তু নীতু ধৈর্য হারায় না। অপেক্ষা করে শান্ত ভাবে।

মাতালের পা আমাদের পাশ দিয়ে চলে যায়। দূর থেকে ভাঙা গান ভেসে আসে। হাসির শব্দ। জলে ছলাৎ করে একটা বোতল পড়ে যায়। উদ্দেশ্যহীন, গভীরতাহীন একটা জীবন যাপন করছিল বলে মনে হয়। নীতু অপেক্ষা করে। মনে ছবি আসে, লম্বা ছিপ্ নৌকায় দীর্ঘকায় শীর্ণ এক মানুষ বসে আছেন। প্রেতের মতো চোখ। পাশে রাখা বশংবদ লাঠি। কুমুদবন্ধু রায়। আমার দাদু। আমার বাবার কথা মনে পড়ে। বড়দার কথা। থানার ভদ্রলোক ও-সির মুখখানা দেখতে পাই। মনে পড়ে, গড়িয়াহাটায় দিলীপের সঙ্গে কত আড্ডা দিয়েছি। বাঁ হাতের ব্যাণ্ডেজের ভিতরে হাতটা এখনো টন্‌টন্ করে। সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়। নীতু অপেক্ষা করে। আজ সকালে অফিসার আমাকে চড় মেরেছিল। আমার মা বাবার সামনে, ছোড়দার নাকের ডগায়। যেখানে দাঁড়িয়ে চড়টা মেরেছিল তার কয়েক হাত দূরে বারান্দায় আমার বহুকালের সঙ্গী সেই বালির বস্তাটা ঝুলছে। জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে মনোনীত মুষ্টিযোদ্ধা একটিও শব্দ না করে চড়টা খেয়েছে। সারা শরীরে রোমরাজি হঠাৎ দাঁড়িয়ে যেতে থাকে, গা জ্বালা করে। নীতু অপেক্ষা করে।

—মারবো।

নীতু শ্বাস ফেলে। যেন এতক্ষণ দম বন্ধ করে ছিল। অন্ধকারে ওর দাঁত ঝিকোয়।

আস্তে করে বলে—তোমাকে একটা জিনিস দিয়ে যাবো।

—কি ?

ও কাত হয়ে প্যাণ্টের পকেট থেকে একটা খেলনা মতো ছোট্ট রিভলভার বার করে। আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে—কাছে রাখো।

ইতস্তত করি। ভয় পেতে থাকি।

নীতু আস্তে বলে—ওরা আবার তোমার পিছনে লাগবে নেন্টু। কিন্তু তোমার জীবন এই মুহূর্ত থেকে আমার কাছে মূল্যবান। তোমাকে খালি হাতে ছাড়তে পারি না। রাখো।

আমি হাত বাড়িয়ে নিই না। হাতটা পাতি, নীতু দেয়। হাল্কা ছোট্ট একটুখানি যন্ত্র। মনেই হয় না, এটা দিয়ে কিছু করা যায়।

—কোথায় পাও এসব ?

নীতু অবহেলার গলায় বলে—জাপানী জিনিস। ভদ্রপুরে ঢেলে বিক্রি হয়। ওখানকার লোক এসে দিয়ে যায়।

—অনেক দাম ?

—বোধহয়। ঠিক জানি না।

নীতু নিঃশব্দে সিগারেট খায়। তারপর বলে—চালাতে জানো ?

—না।

নীতু শ্বাস ফেলে আড়মোড়া ভেঙে বলে—সেইটে আন্দাজ করে গুলি ভরে দিইনি। ঠিক আছে, আপাতত ওটা নিরালায় বসে নাড়াচাড়া করো, সময়মত গুলি পেয়ে যাবে। আমি আবার আসবো নেন্টু।

নীতু ওঠে, আমিও। উঠতে গিয়ে টের পাই, শরীর ভার লাগছে খুব। ক্লান্ত

boiRboi.net

লাগছে। বিকেল পর্যন্ত আমি অন্যরকম ছিলাম, কিন্তু এখন যেন আর-একরকম। কিরকম যেন লাগে। গা গুলোয়, ভেতরটা ভয় ভয় করে, মন চমকায়।

বাসায় ফেরার পথে সারাক্ষণ বার বার কেবলই হাত গিয়ে প্যান্টের ডান দিকের পকেটটা স্পর্শ করে আসে, শরীরে ব্যথার জায়গায় যেমন বার বার মানুষের হাত চলে যায়।

বৌদি চলে যাবার পর আমি তাদের ঘরে শুই।

সারা রাত প্রায় ঘুমই হ'ল না। স্বপ্ন দেখে বার বার জেগে উঠলাম। জল খেলাম। আড়মোড়া ভাঙলাম। বাতি জ্বেলে সাবধানে তোষক উল্‌টে জিনিসটা দেখলাম বার বার। ছোট্ট খেলনার মতো। খুব ঝক্‌ঝকে, সুন্দর। ছেলেবেলায় একটা রিভলভারের কত শখ ছিল! হাতে পেলে কত মানুষ মেরেছি। সত্যিকারের রিভলভারটা তার চেয়েও কাল্পনিক লাগছিল।

ভোর রাতে গভীর ঘুম হল। সকালে ঘুম ভাঙতেই প্রথম হাত পড়ল ব্যথার জায়গাটাতে। তোষক সেখানে খুব সামান্যই উঁচু হয়ে আছে। ওপর থেকে বোঝাই যায় না। আমি উঠলে মা বিছানা ঝাড়তে আসবে। জেগেই তাই যন্ত্রটা হাতে নিলাম। মুঠোয় হাতলটা, চড়াই পাখির বুকের মতো ছোট্টো। কেবল বুকের ধুকধুকুনিটা নেই। যখন গুলি ছুঁড়বো কোনোদিন, তখন কি রিভলভারের বুক ধক্‌ করে উঠবে।

আলমারী খুলে বইয়ের পিছনে রেখে দিলাম।

কালকেও আমি অন্যরকম মানুষ ছিলাম। আজ অন্যরকম। বাথরুমে সারাক্ষণ গান গাইলাম আমি। চায়ের স্বাদ অন্যরকম লাগল। আয়নায় আজ অনেকক্ষণ নিজের মুখখানা দেখি। ওয়াল্‌টেয়ারে সেবার বেনুধর মেরেছিল, চুল ঘেঁষে এখনো সেই কাটা দাগ। থার্ড রাউণ্ডে বেনুধরকে নক-আউট করি। তখন কপালের রক্তে আমার সারা গা ভেসে যাচ্ছে। রেফারি রক্ত দেখে লড়াই থামাতে চেয়েছিল, আমি রাজি হইনি। বিনীতভাবে বলেছিলাম—ইট ইজ জাস্ট্‌ এ মাইনর কাট্‌ স্যার, আই অ্যাম নট হার্ট। বলিনি, আমি কখনো লড়াই থামাতে বলি না। গতকাল শ্যামল দিলীপের কাছে যেতে চেয়েছিল, আমি যেতে দিই নি। লড়াই থামাতে বলি না এখনো। সোমসুন্দর শেষ পর্যন্ত লড়বে।

বারান্দায় রোদ পড়ে আছে। বাতাস নেই। নুয়ে পড়া বুড়োর মতো বস্তাটার কুঁজ দেখা যাচ্ছে। স্থির হয়ে ঝুলে আছে ফাঁসি-দেওয়া লাশের মতো। আস্তে আস্তে এগিয়ে যাই। বক্সিং রিংয়ে আমার আর কোনোদিনই ফিরে যাওয়া হবে না। তবু শরীর চন্‌মন্‌ করে লড়াইয়ের জন্য। কিসের লড়াই তা সঠিক জানি না। তবু বস্তাটার কাছে এসে স্ট্যান্স্‌ নিই। বাঁ হাতে ব্যথা। ছিঁড়ে পড়ে হাত। তবু লহরার তবলায় যেমন চলে আঙুল তেমনি দ্রুত ঘুঁষির ঝড় বইয়ে দিতে থাকি। ব্যাণ্ডেজ উপ্‌চে রক্ত পড়তে থাকে হাত বেয়ে। বেনুধর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল সেবার, ওয়ালটেয়ারে। রক্তে ভেসে যাচ্ছিল শরীর। তবু লড়াই থামাইনি। আজই বা থামাবো কেন?

শরীরে ঘাম দিল খুব। একটা জ্বোরো ভাব ছেড়ে গেল শরীর থেকে। ক্লান্ত হয়ে একসময়ে রেলিঙ ধরে বাতাসে দাঁড়াই। দূরে, মোড়ের কাছে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ, সেই গাছে আধো-ঢাকা মালাদের বারান্দা দেখা যায়। অনেককাল মালাকে দেখি না আর। সেই কবে ওর তানপুরার তার ছিঁড়ে, তবলা ফাটিয়ে, গানের খাতা টুকরো করে দিয়ে এসেছিলাম। আশ্চর্য এই, মালা তারপর এসে কোনো দোষারোপ করে নি, দায়ী করে নি আমাকে। বোধহয় কাউকেই কিছু বলে নি মালা। নীরবে হেসেছে। ক্ষমা করেছে কি? কিন্তু ক্ষমা কে চেয়েছিল? মালা ভুলে গেছে তার গানের জগতের বাইরে থেকে যে সব মানুষ আসে তাদের কোনো ছায়া মালার ঘরে থাকে না। মালা তাদের আনায়াসে ভুলে যায়। রাস্তা দিয়ে যেতে আসতে ওদের ঝুল বারান্দার মাথার ওপর দেখি। সেখানে মালা দাঁড়ায় না।

ঘরে এসে আলমারী খুলে রিভলভারটা বের করি। ছোট্ট খেলনা। গুলি নেই। ট্রিগারে আঙুল দিতেই চেম্বারটা ক্লিক করে ঘুরে গেল। বারবার সেই শব্দটা শুনি। আত্মবিশ্বাস বাড়ে। মনে হয়, রিভলভার সঙ্গে থাকলে সবকিছু করা যায়।

প্রায় নটা বাজে। রোদে ভেসে যাচ্ছে চারিদিক। শূন্য রিভলভারটা প্যাণ্টের পকেটে নিয়ে সিঁড়ি ভাঙতে থাকি।

মালাদের ঝুল-বারান্দা পেরোতে গিয়ে একবার ওপরে তাকাই। কৃষ্ণচূড়ার মরা ডালগুলোর ভিতর দিয়ে বারান্দাটাকে খাঁচার মতো দেখায়। শূন্য বারান্দা। বারান্দা পেরিয়ে মালার ঘর। ওই ঘরে আর কোনোদিন যাওয়া হবে কি আমার। সাহস পাবো না।

হাতটা ব্যথার জায়গায় চলে যায়। পকেটটা খুব সামান্য ফুলে আছে। বাইরে থেকে দলা পাকানো রুমালের মতো দেখায়। ছুঁতেই আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে থাকি। কোনো কিছু ভাবি না। একটু শিস দিয়ে মালাদের সিঁড়ির দরজার চৌকাঠ ডিঙোই। হালকা পায়ে সিঁড়ি ভাঙতে থাকি।

ডান পকেটে হাত। হাতে নিস্তব্ধ এক চড়াই পাখির বুক। আমি মালার দরজায় দাঁড়াই। দাঁড়িয়েই চমকে উঠি।

মালার বিছানায় ছোড়দা বসে আছে। বাসা থেকে বেরোবার মুখে ওর ঘরটা দেখে আসিনি। ভুল হয়ে গেছে। মালা মেঝেতে কার্পেটের ওপর বসে। তানপুরা কোলে শুইয়ে রেখে ঝুঁকে স্বরলিপি দেখছে।

ছোড়দাকে কখনো মালার ঘরে আমি দেখিনি। মালার ঘরে তো আর আসা হয় না। দেখে কষ্ট লাগছিল খুব।

ছোড়দা আমাকে দেখে একটু ভ্রূ তুলে বলল—কি রে? কিছু বলবি?

মালা তাকাল কিনা বুঝলাম না। ঝুঁকেই রইল।

রাত জাগার সুগভীর ক্লান্তি ছোড়দার সুন্দর মুখটাতে গভীর হয়ে বসেছে। মুখের চামড়া রুক্ষ, চোখ ফোলা ফোলা, লাল। সুন্দর লাল দুটি ঠোঁট ফ্যাকাশে দেখায়। কপালের মাঝখানে, যেখানে অনেকের রাজটিকা থাকে, সেখানে দুটো শিরা জড়িয়ে আছে। মাথার চুল ফণা ধরে দুলছে।

boiRboi.net

পকেট থেকে শূন্য হাত বের করে এনে বলি—দু-চারটে টাকা দিবি ?

—কেন ?

—দরকার।

ছোড়দার সঙ্গে বহুকাল কথাই হয় না ভাল করে। মানুষটাকে আমি তেমন লক্ষ্য করি না। ভিতরে ভিতরে ছোড়দাও বোধহয় তা জানে। আমি বরাবর টাকা নিয়েছি বড়দার কাছ থেকে, বাবাও বড়দার কাছেই হাত পাতত। ছোড়দা সেই অবহেলা সহ্য করেছে এতদিন। এখন আমি টাকা চাইতে ওর মুখে একটা চাপা আনন্দ খেলে গেল যেন। সুন্দর ঠোঁটে একটু বোধহয় হাসলও।

প্রশ্রয় দেওয়ার স্বরে বলল—আমার টেবিলের ডানদিকের টানায় আছে। বেশি নেই। যা আছে নিয়ে নে।

টাকার দরকার ছিল না। বাসায় ফিরলাম না। কেবল ওই কথা বলে ছোড়দার কাছ থেকে পালিয়ে এলাম।

ছোড়দা অফিসে। দুপুরে খেয়ে উঠে ওর বিছানার ওপর এসে একটু বসলাম। টেবিলের ওপর রাশিকৃত বই, অজস্র নোট করা খাতা। অ্যাসট্রে উপচে পড়ছে পোড়া সিগারেটের স্তূপে। টেবিলের তলায় একটা হ্যারিকেন। রাতে মাঝে মাঝে আলো নিভে যায়, তখন ছোড়দা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে বসে। বিছানার চাদর পালটানো হয় না অনেকদিন, বালিশের পাশে ময়লা রুমাল, বালিশের তলাতেও বই। একটা খাতা খুলে দেখি, প্রথম পাতার ওপরে লেখা—শ্রীশ্রীতারকেশ্বর সহায়। দেখে বুকের ভেতরে একটা যন্ত্রণা হয়। ছোড়দার এই পরীক্ষা ওর জীবন বাঁচনের পরীক্ষা। ওকে পেরোতেই হবে। কিন্তু পড়তে পড়তে মাথার শিরা ছিঁড়ে পড়ে, চোখ ফেটে যেতে চায়, তবু পড়ে যেতে হয়। মনে থাকে না। আবার পড়ে। নিজের শক্তিতে সন্দেহ আসে। ভয় করে। তাই গোপনে, লজ্জায়, অসহায়ের মতো আত্মসম্মানের হাত বাঁচিয়ে বাবা তারকনাথের নাম চুপি চুপি খাতার ওপরে লিখে রাখে ছোড়দা।

মালার বাড়িতে আর যাবো না। মালার ঘরে ঢোকা আর আমার উচিত হবে না। ছোড়দার এই প্রাণপণ অধ্যবসায় দেখে মনে মনে আমি এইসব সিদ্ধান্ত নিই। মনটা উদাস হয়ে যায়।

দুপুরে ঠিক ঘাম হয় না। কাজ নেই বলে চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে শুয়ে থাকি। কাল রাতে ঘুম ভাল হয়নি বলেই বুঝি আজ একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমের মধ্যেই একটা সুন্দর গন্ধ পাই।

চোখ চেয়ে দেখি, ঘরের মাঝখানে মালা দাঁড়িয়ে আছে। আমার চোখে তার অকপট চোখ।

উঠে বসি।

—মালা, একটু আগে ভাবছিলাম তোমাকে ভুলে যাবো।

মালা সুন্দর চোখে অবাক হয়ে তাকায়—ভুলে যাবে ?

boiRboi.net

—ভুলে যেতে হবে।

মালা এগিয়ে এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটু ঝুঁকে তাকিয়ে মিষ্টি গলায় বলে—নেন্টু, আমি ভুলতে দেবো কেন ?

—তার মানে ?

—কোনো মানুষ কি চায় যে তাকে সবাই ভুলে যাক ? ভুলে যাওয়াটা ভীষণ নিষ্ঠুর কাজ। ওর চেয়ে মরা ভাল। ভুলবে কেন।

আমি চেয়ে থাকি।

মালা বলে—তোমার কত টাকা দরকার ?

—দশ হাজার।

মালা হাসে। বলে—অত টাকা একসঙ্গে চোখে দেখলে তুমি অজ্ঞান হয়ে যাবে। তার চেয়ে যা এনেছি, রাখো।

—দরকার নেই।

—রাখো নেন্টু। তোমাদের সংসারের অবস্থা আমি জানি।

—বিশ্বসংসারের অনেকের অবস্থা আমাদের চেয়েও খারাপ। তোমার কাছে আমার দাবিদাওয়া কিসের মালা ? আমি তো জনতার একজন।

—দাবিদাওয়া না থাকলে কেউ আমার তানপুরার তার ছিঁড়ে, তবলা ভেঙে, খাতা ছিঁড়ে আসবার সাহস পায় ?

আমি এক অস্থিরতা বোধ করে বলি—মালা, সকালে যখন তোমার ঘরে গিয়েছিলাম তখন আমার ডান পকেটে পিস্তল ছিল। ছোড়দা না থাকলে—

মালা বড় বড় চোখে চেয়ে বলে—আমার ক্ষতি করার জন্য পিস্তলের দরকার কি নেন্টু ? তোমার শুধু হাতই যথেষ্ট ক্ষতি করেছে।

আমি উঠে আলমারি খুলে রিভলভারটা বার করে আনি।

—দেখ, সত্যি বলছি কিনা। শুনে তোমার বিশ্বাস হয়নি, জানি।

মালা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে। নিষ্পলক চোখে আমার হাতে পিস্তলটা দেখে।

আমি ফিস ফিস করে বলি—মালা, তুমি গান ছেড়ে দাও।

—কেন ?

—যতক্ষণ তোমার গান আছে ততক্ষণ আমি তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারি না।

—তুমি আমার ক্ষতি করতে চাও ? কেন ?

মনে মনে বলি—আমাকে একবার প্রতিশোধ নিতে দাও। দয়া করো। গান ছেড়ে দাও মালা। গান তোমাকে মন্ত্রের মতো ঘিরে রেখেছে।

মালা শ্বাস টেনে বলে—নেন্টু, তুমি পাগল। গান ছেড়ে দিলে মালার কি থাকবে বলো তো ? গান ছাড়া আমি কিছু ভাবতেই পারি না।

আমি মনে মনে অবিরল বলতে থাকি—তুমি কেন ঝিয়ের হাতে খাবার পাঠিয়েছিলে ? কেন নিজে আসোনি ? কেন তুমি তানপুরা, তবলা, গানের খাতার জন্য আমার ওপর এসে রাগ করে যাওনি ? এ কিরকম অবহেলা তোমার মালা ?

মুখে আমি কিছু বলি না। রিভলভারটা মালার বুকের দিকে তুলে ধরি।

মালা স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে। নড়ে না। চেঁচায় না। ব্যারেলের ওপর মাছিটা ওর দুই চোখের মাঝখানে, কপালের ওপর গিয়ে স্থির হয়। মাছির ওপর দিয়ে নিবিড়ভাবে ওকে লক্ষ্য করি। হঠাৎ তখন বুঝতে পারি, ওর চোখে বিন্দুমাত্র ভয় নেই। কেবল বিস্ময় আছে। আর দেখি, ওর দু চোখ ভরা কেবল গান আর গান। চারদিকের শব্দময় পৃথিবী থেকে, সমুদ্র থেকে, পাহাড় পর্বত আকাশ ও গভীর নিস্তব্ধতা থেকে অদৃশ্য গানের উতরোল ঢেউ উঠে আসে ওর চারদিকে। ঢেউ ঘিরে ধরে মালাকে। ঘিরে রাখে মন্ত্রের মতো। ওকে ভয় পেতে দেয় না।

আমি ট্রিগার টিপি। শূন্য রিভলভারের একটা চেম্বার শুধু ক্লিক করে ঘুরে যায়।

আমি ফিস ফিস করে বলি—মালা, দ্যাখো, আমি তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারি না। গান ভুলে যাও। নইলে দেশ জুড়ে আমার মুহুর্মুহু পিস্তলের শব্দ তুমি কোনোদিন শুনতেই পাবে না।

মালা শুধু চেয়ে থাকে। অপলক।

॥ মঞ্জু ॥

মানুষের মুখ নাকি তার মনের আয়না? কই, আমার মুখে তো কোনো ছাপ পড়েনি। তেমনই একটু লম্বাটে ধাঁচের মুখ, চোখের কোল ঝকঝকে পরিষ্কার, চামড়া ফেটে রক্তের রঙ আভা দিচ্ছে। ডান গালে একটা ব্রণ। এখনো কাঁচা। টিপলে শাঁস বেরোয় না। আর কিছু বোঝা যায় না। কতকগুলি অচেনা পুরুষের রোমশ বুক, মুখ, চওড়া হাত মনে পড়ে। কিংবা তাদের ঠোঁটের স্বাদ। একটা ক্রুশ। সে সব কি সত্যিই ঘটেছিল? ঠিক বোঝা যায় না। কী যে হয়েছিল তারপর, জানি না।

দুপুর। দূরের স্কুলে টিফিনের মিষ্টি ঘণ্টা বাজছে। মা আস্তে আস্তে ওঠে। নার্স মেয়েটির কাঁধে ভর রেখে বারান্দা পর্যন্ত যায়। চেয়ারে বসে হাঁফাতে থাকে। আমি আস্তে আস্তে নিচে নেমে যাই। এই সময়ে বাড়িতে ডাকাত পড়ে। কেবল জুতোপরা দৌড়-পায়ের শব্দ, আর চিৎকার—দিদি! আ—ন্টি! ক্ষুদে ডাকাতে বাড়ি ভরে যায়। তাদের মুখ লাল, গা রোদে গরম, গায়ে শৈশবের সুগন্ধ। ঠান্ডা জল খায়, বিস্কুট চিবোয়, ঘরে ঢোকে, দোতলায় উঠে জুতো পায়ে কার্পেট নোংরা করে, এটা ধরে ওটা টানে। আধঘণ্টা ছোটাছুটি করে তাদের সামলাই।

যেমন চড়াই পাখির মতো আসে, তেমনি উড়ে যায়। বাড়িটা তখন ভয়ংকর নিঃঝুম লাগে। বারান্দা থেকে মা আবার নার্সের কাঁধে ভর দিয়ে ঘরের দিকে ফেরে। মার সঙ্গে প্রায় দিনই কথাই হয় না। বড়জোর মা কোনোদিন বলে—ওদের রোজ বিস্কুট দিস, রোজ কি এক জিনিস ভাল লাগে? মুখে রোচে না হয়তো। একদিন সন্দেশ দিস।

—দেবো।

মা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চলে যায়।

boiRboi.net

তারপর আমি একা। দুপুরে একা। দুই একা মুখোমুখি হই।

পিওন ঠিক আসে। ভুল করে না। চিঠি রেখে যায়। ইচ্ছে হয়, ওকে ডেকে বলি, একদিন ভুল চিঠি দিয়ে যেতে পারো না? খুলে দেখবো, অদ্রি নয়, অন্য লোক। তার অন্য ভালবাসা, অন্য কথা। পড়ে দেখবো কেমন লাগে। একদিন ভুল চিঠি দিও।

টোপর মাথায় দিয়ে যে আসবে সে তো অদ্রিই। শুভদৃষ্টি যার সঙ্গে হবে সে তো অদ্রিই। অন্য কেউ নয়। তাই হোক। তবু, মাঝে মাঝে আমি পেয়ে যাবো ভুল চিঠি। অচেনা হাতের লেখা। মাঝে মাঝে আমার গাল স্পর্শ করবে এক সোনার ব্রুশ। তাতে দোষ নেই। ওই তো আয়নায় আমার মুখ—তাতে কোনো ছাপ পড়ে না। আমি সেই মঞ্জুই তো। অন্য কেউ নই।

অদ্রি খুব বিপদে পড়েছে। সে লেখে '···রাণুকে নিয়েই বিপদ। সত্যকে খুঁজতে এক একদিন নিজেই বেরিয়ে পড়ে। একা একা এই কাঠফাটা রোদে মাঠে ঘাটে পাগলের মতো ঘুরে বেড়ায়। কোথায় সত্যকে পাবে? রাত্রে মাঝে মাঝে উঠে শুনি, একা একা কাঁদছে। মেয়েটা ভীষণ জ্বরে ভুগে উঠল, ছেলেটার হাম। আমি হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি মঞ্জু।···' চিঠির বাদবাকি কথাগুলো আমি তেমন মন দিয়ে দেখি না। রাণুর বর হারিয়ে গেছে, রাণু তাই কাঠফাটা রোদে, খরার দুপুরে, অবিরল তাকে খোঁজে। অদ্রি, তুমি কোনোদিন হারাবে না। তবু যদি হারিয়ে যাও, তবে আমি ঠিক ওইরকম করে তোমাকে খুঁজবো। একটা কিছু, একজন কাউকে খুঁজে বেড়ানো আমার খুব দরকার। আমি যে সব পেয়ে যাচ্ছি! কিছুই খুঁজতে হচ্ছে না।

একদিন হাবুলদা এলেন। চোরের মতো নিঃশব্দে। গিয়েছিলেন মার ঘরে। বেরোবার সময়ে সিঁড়ির মুখে আমি ধরলাম।

—হাবুলদা।

—মঞ্জু! বলে তিনি তাকালেন। ভয়-পাওয়া মুখ, অপরাধবোধে মাখা।

আমি গলায় গার্গলের শব্দ করে হেসে বলি—কি খবর?

হাবুলদা ইতস্তত করে বলেন—আমার দোষ নেই মঞ্জু। ও জায়গাটা যে ওরকম তা জানতাম না।

—দোষ কে দিয়েছে? আমি তো নিজের ইচ্ছেয় গিয়েছিলাম।

—তা ঠিক। তবু—

আমি বলি—আপনি কোনো কাজের নন।

—কেন?

—ব্ল্যাকমেলের কেমন একটা সুযোগ ছিল আপনার, কাজে লাগাচ্ছেন না।

—ব্ল্যাকমেল?

—নয় কেন? আমার বাবা বড়লোক, অদ্রি ভাল চাকরি করে। অন্য কেউ হলে আমাকে শুষে ফেলতে পারত।

হাবুলদা অসহায় ভাবে চেয়ে বলেন—কি সব বলছো?

আমি গী-গী শব্দ করে হাসি। গলায় গার্গলের শব্দ ওঠে। বলি—কেউ

boiRboi.net

আমাকে ব্ল্যাকমেল করলে খুশি হতাম।

হাবুলদা ম্লান হাসেন—তোমার সঙ্গে পারা যায় না মঞ্জু।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি—সেটাই হয়েছে মুশকিল। কেউই আমাকে শাসন করে না, ভয় দেখায় না, দোষ করলেও সহজেই ক্ষমা করে।

হাবুলদা তেমনি হাসিমুখে বলেন—তোমার ভাগ্য ভালই মঞ্জু।

আমি মাথা নেড়ে বলি—না, এরকম হয়ে চললে মানুষ পাগল হয়ে যায়।

—তুমি তো পাগলই। নইলে কেউ ওরকম নাচ নাচে! আমি কতবার চেষ্টা করেছি তোমাকে ফেরাতে, কিন্তু তোমাকে ঘিরে যে ছেলেগুলো ছিল তারা তোমার কাছে যেতেই দিল না। তোমাকে ওরকম নাচতে দেখে ভাবলাম, বোধহয় তুমি পাগল হয়ে গেছ। আমার কথা তোমার মনেই নেই।

অকপটে বলি—ছিল না-ই তো।

হাবুলদা আমার চোখের দিকে চেয়ে বললেন—আমি তোমাকে গিয়ে ধরলাম, যখন তুমি পড়ে যাচ্ছিলে। তুমি কি একটা চিৎকার করলে, আমার মনে হল আমার নাম ধরে ডাকছো। তখন তুমি একা—নাচের চত্বরে কেউ নেই, তোমার ওপর একটা সবুজ আলো পড়ে ছিল। তুমি কি সত্যিই আমার নাম ধরে ডেকেছিলে মঞ্জু?

অবাক হয়ে বলি—না তো!

—তবে কাকে ডেকেছিলে?

আমি বলি—হো—আ—

—ওর মানে কি?

—সাঁওতালরা ওই ভাবে পোষা কুকুরদের ডাকে। ওটা একটা বুনো শব্দ, ওর মানে নেই।

হাবুলদা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন। বোধহয় ভাবেন, আমি তাঁকে অপমান করার চেষ্টা করছি কিনা। তারপর বলেন—তুমি যাকেই ডেকে থাকো মঞ্জু, আমিই গিয়েছিলাম। আমি তোমাকে ধরে তুললাম, নিয়ে এলাম টেবিলে। কিন্তু তখন তোমার বসবার ক্ষমতা নেই, টলে টলে পড়ে যাচ্ছো। কি যে মুশকিলে পড়লাম! তোমাকে নিয়ে কোথায় যাবো! নিজের বাড়িতে হাজার লোক, আমরা জয়েন্ট ফ্যামিলি—সেখানে ঢুকলে পরদিন বাড়ি ছাড়তে হবে। তোমাদের বাড়িতে আনলে মেসোমশাই কাণ্ড দেখে আমাকে পুলিশে দেবেন।

—আমাকে সবাই ক্ষমা করত হাবুলদা, কেউ কিছু মনে করত না।

—তা তো জানতাম না মঞ্জু। এসব কাণ্ড করলে আমাদের বাড়িতে যা হয়, তোমাদের বাড়িতেও তা-ই হবে ভেবেছিলাম। তাই সাহস পাইনি। বন্ধুবান্ধব কারো বাড়িতেই নিয়ে যাওয়া যায় না। প্রাণপণে ভাবছিলাম, কোথায় যাই। বাইরে এসে ট্যাক্সি ধরলাম। ট্যাক্সিওয়ালাকে বললাম, ঘুরতে থাকো। সময় হলে আমরা নেমে যাবো। ট্যাক্সিওয়ালারা এসব জানে, অভ্যাস আছে। কিন্তু কপাল এমনই খারাপ যে, আমাদের ট্যাক্সিওয়ালাটা একটা ছোকরা পাঞ্জাবি। বোধহয় নতুন চালাচ্ছে কলকাতায়। সে কিছুদূর গিয়েই কাঁইমাই করতে থাকে। তখন তুমি ট্যাক্সির মেঝে, সীট, আমার জামাকাপড় ভাসিয়ে গল্ গল্ করে বমি করছো। দেশপ্রিয় পার্কের কাছ বরাবর

ছোকরাটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে দিয়ে কেবলই বলতে লাগল—আমার গাড়ি ধুইয়ে দাও, তোমরা নেমে যাও, মিটারের টাকা মিটিয়ে দাও। কিছুতেই তাকে বোঝাতে পারি না। ভাবলাম, ছেলেটাকে টাকা দেখাই। বিশ-পঞ্চাশ টাকার লোভ দেখালাম, ছেলেটা তবু কেবলই বলে—আমার বাবার অসুখ বলে আমি গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছি। বাবা যদি জানতে পারে টাকার লোভে গাড়িতে মাতাল-বদমাশ তুলেছি তো কেটে ফেলবে। তোমরা নেমে যাও। বড় রাস্তার ওপর এইসব কাণ্ড। তখন সন্ধ্যা উৎরে গেছে। রাস্তায় ভীড়। দেখতে না দেখতে আমাদের ঘিরে ভীড় জমে যাচ্ছিল। একটা গাছের নিচে বাঁধানো চত্বরে আড্ডা মারছিল কয়েকটা ছেলে। তারা মজা দেখতে উঠে এল। বেশ মাস্তান টাইপের ছেলে। ভীড় হাটিয়ে জানালার ওপর ঝুঁকে বলল—কি হয়েছে? তাদের মুখ দেখে ঘাবড়ে গেলাম। রাস্তার বকাটে ছেলে, হুজ্জত করে বেড়ায়। মাতাল যুবতীর সঙ্গে মাতাল যুবক দেখলে হাঙ্গামা করবে, আওয়াজ দেবে, কত কি করতে পারে। পাবলিক যাবে ওদের দিকে। কি যে বিপদ তখন, ইচ্ছে করছে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠি।

আমি হাসতে থাকি।

—হেসো না মঞ্জু। বিপদটা তুমি টের পাও নি, আমি পেয়েছিলাম। চারদিকে দিশেহারার মতো একজন চেনা লোক খুঁজছি তখন। কোনোরকমে ছেলেগুলোর গাড্ডা থেকে যদি বেরোতে পারি। ওরা ততক্ষণে ট্যাক্সিওয়ালাটাকে ধরেছে। ট্যাক্সিওয়ালা ওদের অকপটে সব বলছে। বুঝলাম এবার ঝাড় হবে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তোমাকে ওরা কী করবে! যদি তোমাকে ট্যাক্সি থেকে টেনে নামায়, তবে রাস্তার এক ভীড় মানুষ তোমাকে মাতাল অবস্থায় দেখবে, কে জানে কোন্ চেনা মানুষের নজরে পড়ে যাবে তুমি। তারপর মেশোমশাই জানবেন, অদ্রিবাবু জানবেন, একটা মেয়ের জীবন নষ্ট। একটা ছেলে সেই ভীড়ের ভিতর থেকে চেঁচিয়ে বলল—ফুর্তি দ্যাখ্, শালাদের। দেশের হাজারটা লোক ভিখিরি হচ্ছে, ফেরার হচ্ছে, খুন হচ্ছে, বেকার বসে আছে, তবু শালাদের ফুর্তি। ঝট্ করে একজন দরজা খুলে আমার জামা ধরল, বলল—নামুন তো মশাই, আপনাকে একটু চিনে রাখি। ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, মাথার ঠিক ছিল না, তবু সে অবস্থাতেই হঠাৎ মনে হল, ছেলেটা আমার চেনা। আমি দু হাত তুলে বললাম—নেন্টুবাবু! ছেলেটা থমকে গেল।

শুনতে শুনতে আমার হাত-পা অবশ হয়ে যাচ্ছিল। বুকের ভিতরটা কেঁপে গেল একটু। বললাম—নেন্টু!

হাবুলদা হাসলেন—সে-ই। আমি তার নাম ধরে ডাকতেই সে থমকে একটু ভ্রূ কুঁচকে তাকাল, বলল—আপনাকে তো চিনি না। আমি হাতজোড় করে বললাম—আমাকে চিনবেন না, কিন্তু এই মেয়েটি মঞ্জু, ওকে আপনি চেনেন। বলেই ভয় হল। তুমি বলেছিলে, নেন্টুকে চেনো, কিন্তু কি রকম চেনো তা বলো নি। আবার, তুমি অনেক সময়েই ইচ্ছে করে লোককে ক্ষ্যাপানোর জন্য মিথ্যে কথা বলো। নেন্টুর ব্যাপারটাও সেরকম কিনা, তাই ভেবে ভয় পেয়ে গেলাম। যদি নেন্টু না চিনতে পারে তো কি হবে। তুমি তখন সীটের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছো। নেন্টু কি একটু ভেবে ঝুঁকে তোমার মুখ দেখল। ঘেন্নায় মুখটা বেঁকাল একটু, কিন্তু বুঝলাম,

চিনতে পেরেছে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল—এঁর সঙ্গে আপনি জুটলেন কি করে? আপনি কে? উত্তর কিছু ভেবে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু নেনটু ব্যাপারটা গায়ে মাখল না। বন্ধুদের কি যেন বলল। ছেলেগুলো ট্যাক্সিওয়ালাকে দুই ধমক দিয়ে গাড়িটা পিছিয়ে গলির মধ্যে অন্ধকারে নিয়ে গেল। কোথা থেকে জোগাড় করে আনল জল, পাখা, লেমন স্কোয়াস। আমি ট্যাক্সি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে রইলাম। যা করার ওরাই করছিল। কিছুক্ষণ পরে দেখি, তুমি উঠে বসেছো। টলছো তখনো, কিন্তু সাড় ফিরে আসছে। কেউ আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করল না। বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। ট্যাক্সিওয়ালাটা ভয় পেয়ে গেছে অতগুলো ছেলেকে দেখে। অবশেষে সেই ট্যাক্সিতেই আমরা ফিরেছিলাম। সঙ্গে নেনটু ছিল। তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি হেঁটে বাড়িতে ঢুকতে পারবে কিনা। তুমি বললে, পারবে। ট্যাক্সি বাইরে দাঁড় করিয়ে আমি মদনকে ডাকলাম। সে এসে তোমাকে নিয়ে গেল। তারপর ভয়ে ভয়ে অনেকদিন তোমাদের বাড়িতে আসিনি।

আমার বুকে বাতাস আটকে যাচ্ছিল। হাত-পা ঝিম্ ঝিম্ করছে। আঁচলটা দাঁতে তুলে চিবিয়ে ফেলি। জিজ্ঞেস করি—আর নেনটু?

হাবুলদা মাথা নেড়ে বলল—কিছুই করেনি। ট্যাক্সিতে বসে থেকে সে কেবল দেখল, তুমি বাড়িতে ঠিকমতো ঢুকে গেছো কিনা। তারপর একটিও কথা না বলে সে ট্যাক্সি থেকে নেমে চলে যায়। কোনো প্রশ্ন করেনি।

আমি হঠাৎ আত্মবিস্মৃতের মতো জিজ্ঞেস করি—কেন?

—কী জানি! বোধহয় বড়লোকদের কাণ্ডকারখানা সম্পর্কে তার কোনো কৌতূহল নেই। কিংবা, তুমি তো বলোনি মঞ্জু, তোমাদের কিরকম পরিচয়। আমার মনে হয়েছিল, সে হয়তো বা তোমাকে ভালবাসত, তোমার ওই অবস্থা দেখে অভিমানে সে প্রশ্ন করতে ভুলে গেছে।

বলে হাবুলদা হাসতে থাকেন। হাসিটা ম্লান। বলেন—তুমি তো জানো না মঞ্জু, কতজন তোমাকে ভালবেসেছে। পাগলঘরে ছেলেরা তোমার জন্য সত্যিই পাগল হয়ে গিয়েছিল। এমন কি সেখানকার বাজনা গেল পাগল হয়ে, আলো গেল পাগল হয়ে—সে কী নাচ—সে কী কাড়াকাড়ি!

হাবুলদা হাসতে থাকেন। আমি নির্মমভাবে আঁচল চিবোই।

তবু কেউ আমাকে দায়ী করে না। হাবুলদা না, নেনটু না। তবে আমার সময় কাটে কি করে! কি নিয়ে বেঁচে থাকে মঞ্জু?

আমাদের একটা গাড়ি গ্যারেজেই পড়ে থাকে। বড় দেখে কেনা হয়েছিল, যাতে পরিবারের সবাই একসাথে বেড়াতে কি পিকনিকে যেতে পারে। এখন আর কেউ যায় না। গাড়িটা তবু ঝকঝকে তকতকে, তেলভরা হয়ে পড়ে থাকে। বাইরে রুপোরঙের প্রকাণ্ড দুপুরটা জানলায় দাঁড়িয়ে দেখি। বিশাল দুপুর তার জ্বলন্ত বুকের দিকে ইসারা করে ডাকে। আমি বে-খেয়ালে উঠে পড়ি। শাড়ি পালটে রোদ-চশমা পরে নিই। বেরিয়ে পড়ি। গাড়ির শব্দে মদন ঘুম ভেঙে দৌড়ে আসে—দিদিমণি,

boiRboi.net

আমি সঙ্গে যাবো ?

—না, তুই ঘুমো গিয়ে।

—বাবা যে তোমাকে গাড়ি নিয়ে বেরোতে মানা করেছিল। মাঝরাস্তায় যদি গাড়ি বিগড়োয় তো তখন একা মেয়েছেলে তুমি কি করবে ?

—তোকে ফোন করব। তখন যাস।

—কোরো কিন্তু ঠিক। বলে সে হাই তুলে শুতে যায়।

গাড়ি ছেড়ে দিই। মসৃণ ছুটতে থাকে গাড়ি। দুপুরের গভীর বুকের মধ্যে চলে যেতে থাকি। গাড়ির কাচগুলো তোলা থাকে। দুপুরের হল্‌কা ঢোকে না, শব্দ আসে না। মনে হয়, শহর বড় নিস্তব্ধ। কলকাতা ছেড়ে মানুষজন জ্যোৎস্না রাতের খোঁজে কোন বনে চলে গেছে। পরিত্যক্ত রাস্তা, জনহীন বাড়ি, নির্জন—গভীর নির্জন একটা শহরে কেবল আমার শ্বাসের শব্দ ওঠে। আর বিদেশী গাড়িটা ভ্রমরের মতো গুণ গুণ করে।

ওকে কি আমি ভয় করি ? কেন করবো ! ঠিক বুঝতে পারি না, কেন আমার নেন্‌টুকে ভয় করা উচিত ! তবু বুকের শ্বাসের বাতাস আটকে যায়, ছলাৎ করে ঢেউ দেয় হৃৎপিণ্ড। আমি স্টিয়ারিং হুইল চেপে ধরি। এদিকে ওদিকে গাড়ি ঘোরাতে থাকি। আমি কেন ভয় করবো ? আমার তো লুকোবার কিছু নেই। আমি দশজনকে সাক্ষী রেখে পাগল-ঘরে নাচতে পারি, আমি বেহেড মাতাল হয়ে সকলের সামনে দিয়ে টলতে টলতে ফিরতে পারি। আমি জানি সবাই আমাকে রাস্তা ছেড়ে দেবে, ক্ষমা করবে, ভালবাসবে। মঞ্জুর তাই কিছু লুকোনোর নেই। মঞ্জু কাউকে ভয় পায়নি কোনোদিন। এই গাড়িটাতেই এক সকালে কেয়াতলা লেন-এর মুখে একটা দুধের সাইকেল উলটে দিই। সাইকেলটার আধখানা চাকার তলায় চলে গিয়েছিল, দুধওলা ছেলেটা ধাক্কার চোটে শূন্যে উঠে আছড়ে পড়ল রাস্তায়, দুধের বোতল ভাঙার মুড়মুড় শব্দ হয়েছিল, দুই ব্যাগ ভর্তি বোতল থেকে দুধের স্রোত নামল রাস্তায়, ভাঙা কাচে ভরে গেল জায়গাটা। ত্রিশ চল্লিশটা মারমুখো লোক এসে ঘিরে ধরল গাড়ি, চেঁচাতে লাগল, গাল দিতে লাগল। আমি একটুও ভয় পাইনি। দরজা খুলে শান্ত মুখে নামলাম, সকলের দিকে একবার সরল চোখে অকপটে তাকালাম শুধু। লোকজন মিইয়ে গিয়ে গুণগুণ করতে লাগল।

দুধওলা ছেলেটার হাঁটুর চামড়া উঠে গেছে, কনুই কেটেছে, কপালে কালশিটে। দাঁড়াতে পারছে না। তাকে লোকেরা টেনে তুলছিল। আমার দিকে চেয়ে কতজন তখন কত কথা বলছে। স্বাভাবিক মুখে গাড়ির গ্লাভস্‌চেম্বার থেকে ফার্স্ট এইড-এর বাক্স খুলে আমি নীরবে ছেলেটার কাটা জায়গায় ডেটল লাগালাম, তার পিঠে হাত রাখলাম, ব্যাগ খুলে গুনে গুনে একশটা টাকা দিলাম তার হাতে। জনতার মুখের ছবি পালটে যাচ্ছিল। তারা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। একজন ছেলেটার পিঠ থাবড়ে বলল—তোমারই কিন্তু দোষ বাপু, মোড়ের মাথায় দেখেশুনে বাঁক নিতে হয়। ইনি বলে গাড়ি থামিয়েছেন, লোক খারাপ হলে এই অবস্থায় পিষে ফেলে পালিয়ে যায়। তোমার কপাল ভাল। এইভাবেই বরাবর সমস্ত বিরুদ্ধতা আমার স্বপক্ষে এসে যায়। আমি জানি বলেই ভয় পাই না।

তবে নেনটুকে আমার ভয় কিসের! আমার কিছু গোপন করার নেই। আমার মুখে কোনো ছাপ পড়ে না। কিন্তু নেনটু! নেনটুর গোপন করার আছে অনেক। স্কুল বারান্দার সেই সুন্দর মেয়েটি—মালা—ভর দুপুরে একা নেনটু তার ঘরে গিয়েছিল। নেনটু অদ্রির গাড়ির গায়ে লিখেছিল প্রতিশোধের কথা। নেমে এসে দেখি গাড়ির গায়ে লেখাটা কে মুছে দিয়ে গেছে, তখনই জানি—নেনটুর গোপন করার আছে অনেক কিছু। আমি অদ্রিকে কিছু বলিনি, শুধু মনে মনে হেসেছিলাম।

তবু কি ওকে আমি ভয় পাই! ঠিক বোঝা যায় না। এ কথা ঠিক যে, বহুকাল আগে রাণুর বিয়ের দিন ও অদ্রির দিকে যখন ভীষণ রেগে তাকিয়েছিল, আমার মনে হয়েছিল, ও একদিন অদ্রিকে খুন করবে। যখন মিছিল আটকে দাঁড়িয়েছিল, মনে হয়েছিল, ও হাজারটা মানুষকে মেরে ফেলতে পারে। যখন প্রতিশোধের কথা লিখেছিল···! কিন্তু না, এসব কারণে আমি ওকে ভয় পাই না। আমার ভয়ের কারণ অন্য। কি যে সেই কারণ তা ঠিক বুঝতে পারি না। আবছা, অস্পষ্ট একটা কারণে আমার বুকে বাতাস আটকায়, শরীর রিম্‌ঝিম্‌ করে।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিই। অলি-গলি পার হয় গাড়ি, একটা পার্কের পাশ দিয়ে যেতে থাকে। ক্রমে দূর থেকে রাণুদের দোতলার বারান্দা দেখা যায়। রোদে ছেয়ে আছে। দেয়ালে ছায়া ফেলে বালির বস্তাটা ঝুলে আছে। কেউ কোথাও নেই। একপলক দেখে চোখ নামিয়ে নিই। গাড়িটা একটু টাল খায়। আবার সোজা করে নিই। কোথাও থামি না। কেন ওকে ভয় পাই তা একদিন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জেনে নিতে হবে।

একদিন মণিকার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

ভীষণ খুশি হল। জড়িয়ে ধরে বলল—জানিস, আমি চাকরি পেয়েছি।

—কোথায়?

—একটা স্কুলে। ডেপুটেশন ভ্যাকেন্সি। কিছুতেই পার্মানেণ্ট পোস্ট পাচ্ছি না।

—দশ মাস তো সময় আছে। খুঁজে নিস্‌।

—কলকাতায় খুঁজলেও হবে না। এক একটা মেয়ে-স্কুলে একটা চাকরি খালি হলে দুশো আড়াইশো দরখাস্ত পড়ে। ডেপুটেশনেও। কপালে চাকরিটা পেয়েছি, কিন্তু দশ মাস পর কী যে হবে! বাবা রিটায়ার করেছেন, দিদি মুখপুড়ির বিয়ে বাকি, ভাই দুটো পড়ছে···আমাদের কী হবে বল তো! বাবা মোটে একশ টাকা পেনশন পান, বাড়ি ভাড়াই দেড়শো। দশমাস পর···

শুনতে শুনতে আমি অন্যমনস্ক হয়ে যাই। যেন নামতা শুনছি।

মণিকা একটু রোগা হয়ে গেছে। তিনটে টিউশনি করে, তার ওপর স্কুল আর এম. এ-র পড়া। তবু বেশ আছে মণিকা। জীবনে কত রহস্য এখনো অপেক্ষা করে আছে ওর জন্য। একটু একটু করে ও পৃথিবীতে ওর জমি দখল করবে, উপভোগ করবে সেই দখলের লড়াইয়ের তীব্র আনন্দ। মণিকাকে যে আমি কী ভীষণ

হিংসা করি।

বললাম—চল, একটা শাড়ি কিনবো।

—তার মানে মেজাজ খারাপ। না? চল, সারাদিন আমারও ভাল লাগে না। কতদিন শাড়ি দেখি না। ফেরিওলা হেঁকে যায়। এক এক দুপুরে খুব ইচ্ছে করে ডেকে এনে শাড়ি দেখি। কিন্তু আবার ভাবি, কিনবো না তো! বেচারা রোদ্দে রোদ্দে কষ্ট করে ফিরি করছে, শাড়ি দেখে ফিরিয়ে দেবো? তাই ডাকি না। শাড়ি দেখতে কী ভীষণ ভাল লাগে বল!

রাস্তায় ভিখিরিরা সংসার পেতে বসেছে। কাঠকুটো জেলে রাঁধছে, ঝগড়া করছে। বাচ্চারা হামা দিচ্ছে ফুটপাতে, খেলা করতে করতে হঠাৎ খেলা ছেড়ে ভিখিরির ছেলেরা হাত পেতে দাঁড়ায়। আবার ফিরে যায় খেলায়। ত্রিকোণ পার্কের কাছে কয়েকটা ছেলে আড্ডা মারছে, তাদের সামনে দাঁড়িয়ে এক কিশোরী ভিখিরির মেয়ে। ছেলেগুলো আমাদের দেখে মেয়েটাকে লেলিয়ে দিল—যা, ওই ওদের অনেক পয়সা, যদি পাঁচ পয়সা আনতে পারিস তো দশ পয়সা পাবি, ওরা যা দেবে তার ডবল দেবো, যা।

মেয়েটা দৌড়ে আসে। দাঁতে ঠোঁট টিপে একটু দাঁড়াই। মণিকা হাত ছুঁয়ে বলে—কি করছিস?

—একটু মজা করি, দাঁড়া।

বলেই ব্যাগ থেকে পাঁচ টাকার একটা নোট বের করে দিই মেয়েটার হাতে। বলি—এবার ওদের কাছ থেকে দশ টাকা চেয়ে নাও।

মেয়েটা লোভে বিহ্বল হয়ে ছুটে যায়। ছেলেগুলো থমকে গেছে। রোদ চশমার ভিতর দিয়ে ওদের স্থিরভাবে দেখি। ওরাও চেয়ে আছে। বললাম—দিন। দিয়ে দিন।

চারজনের মধ্যে তিনজন পার্কের রেলিঙ টপ্‌কে ভিতরে ঢুকে যায়। যে একজন বাকি থাকে তার মুখ ফ্যাকাসে, তবু পকেটে হাত দিয়ে ব্যাগ বের করে। দশটাকার নোট বের করে মেয়েটার হাতে দেয়।

দেখতে না দেখতে ভিখিরির পাল চারিদিকে ঘিরে ধরে আমাদের। হাঁটতে পারি না। শাড়ি ধরে টানে, নোংরা হাতে ব্যাকুলভাবে হাত ছোঁয়, চিৎকার করে, দিশেহারা কিশোরী মেয়েটা টাকা কোমরে গুঁজে গাছতলায় সংসারের কাছে সুসংবাদ দিতে ছুটে যায়।

মণিকা রাগ করে বলে—তোর সঙ্গে বেরোনোটাই ঝামেলা। কখন যে কি করিস! গেল তো ছেলেটার দশ টাকা! হয়তো বা কষ্টের রোজগার!

কিন্তু সে সব আমার কানে যায় না। চারদিকে উদ্যত ভিখিরির হাত, তাদের কালো গায়ের ঘামে ঝল্‌সানো রোদ, সোঁদা শরীরের গন্ধে আমার শরীরের রোমকূপ শিউরে ওঠে। হঠাৎ যেন আমার চারদিকে বয়ে যাওয়া যে জীবন—যা আমি কাছে থেকেও কখনো দেখি না—তা-ই যেন হঠাৎ আমার চারদিকে বক্ষ-উন্মোচন করে দিয়েছে। এক পলকের রোমাঞ্চ কেটে যায়। মণিকা হাত ধরে টেনে নেয়। হাঁটতে থাকি।

boiRboi.net

গড়িয়াহাটার দোকানে দোকানে শাড়ির রঙের মধ্যে হারিয়ে যাই। খেলা, কত খেলা তৈরি করে নিতে হয় সারাদিন আমাকে !

মাসীমা এসে বললেন—মঞ্জু, আজ সুনুকে দেখতে আসবে। ও তো সাজগোজ করতে জানে না, কসমেটিক্‌সও নেই। তুমি দুপুরের দিকেই তোমার সাজগোজের জিনিসগুলো নিয়ে চলে যেও।

—যাবো।

তিনি শ্বাস ফেলে বলেন—এ জামাই কেমন হবে কে জানে! বড় জন তো পাগল। বলেই তিনি চোখে আঁচল চাপা দেন।

সুনু দেখতে ভাল নয়। অনেক পাত্রপক্ষ দেখে গেছে। বলতে কি ওর বিয়ের জন্যই আমাদের বিয়েটা আটকে আছে। কিন্তু কপাল, ওকে কেউ পছন্দ করছে না।

দুপুরে আমার কসমেটিক্‌সের শিশি বোতল নিয়ে গিয়ে দেখি, সুনু একা ঘরে কাঁদছে।

—কি হয়েছে সুনু ?

অনেকক্ষণ কাঁদল সে। তারপর চোখ মুছে বলল—ওরা ফর্সা মেয়ে চায়। বলেই গিয়েছিল—ফর্সা কিনা বলুন, নইলে দেখতে গিয়ে লাভ নেই। আমি তো কালো মঞ্জুদি, তবু বাবা ওদের বলে এসেছে আমি ফর্সা। এর কোনো মানে হয় ? আমি এখন কোন্‌ লজ্জায় ওদের সামনে যাবো ?

চোখ মুছে সুনু সাজতে বসল। মন দিয়ে ওকে সাজালাম। কারিগর যেমন মূর্তি গড়ে। সাজতে সাজতে ও হাসতে থাকে—মঞ্জুদি, নিজের বিয়ের রাস্তা তৈরি করছো ? কিন্তু এবারও হবে না, দেখো।

রোদ থাকতেই পাত্রপক্ষ আসে। দুজন বয়স্ক লোক—তারা পাত্রের বাবা আর মামা, আর দুজন যুবক—পাত্রের দাদা আর বন্ধু। আড়াল থেকে নিবিষ্টভাবে তাদের লক্ষ্য করি। সুনু সামনে গিয়ে বসতেই তাদের চোখে হতাশা ফুটে ওঠে। নিজেদের মধ্যে কি একটু কথা বলে তারা। সুনু প্রশ্নের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে। তারপর বুড়ো দুজন ভদ্রতাবশত দু-একটা আলগা প্রশ্ন করে, যুবক দুজন নিশ্চুপ বসে থাকে। পছন্দ হয় নি।

হঠাৎ একটা খেলা তৈরি করি। মুখ টিপে হাসি। মিষ্টির প্লেট এখনো ঘরে যায় নি। সুনুর ঘরে ঢুকে আয়নার সামনে তাড়াতাড়ি সেজে নিই। শাড়িটা গোছ করে পরি। তারপর বিনা দ্বিধায় সামনের ঘরে গিয়ে ঢুকে সুনুর চেয়ারের পিছনে দাঁড়াই।

যুবক দুজনকে একসঙ্গে বিদ্যুৎ স্পর্শ করে। বয়স্ক দুজন, মুখের রসগোল্লা চিবানো একটুক্ষণের জন্য বন্ধ করেন। আমার ভাবী শ্বশুর শাশুড়ি অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন।

—মেয়েটি কে ? একজন বয়স্ক প্রশ্ন করেন।

আমার ভাবী শ্বশুর আমার দিকে একবার বিরক্তির চোখে চেয়ে দেখেন। সঠিক উত্তর দিতে হলে বলতে হয়—আমার ভাবী বৌমা। কিন্তু তিনি তা বলেন না, কেবল অস্ফুট গলায় বলেন—পাশের বাড়ির—

—বড় সুন্দর তো। তোমরা কি কায়স্থ মা? কতদূর লেখাপড়া করেছো?

আমি বিনীতভাবে উত্তর দি। তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে থাকেন। আমার ভাবী শ্বশুরকে জিজ্ঞেস করেন—এর বিয়ের সম্বন্ধ চলছে নাকি?

তিনি আম্‌তা আম্‌তা করতে থাকেন।

মনে মনে আমি হেসে গড়াই।

ওরা আরো খোঁজ খবর নিতে থাকেন। নিতান্ত নির্লজ্জের মতো বলেন—রাস্তা ঘাটে কত সুন্দরী মেয়ে দেখা যায় কিন্তু বিয়ের সময়ে খুঁজেই পাওয়া যায় না।

পরদিনই বাবার কাছে টেলিফোন আসে। বাবা নাকচ করে দেন।

আমি আড়ালে হাসি।

সুনু এসে বলে—মঞ্জুদি, তোমার জন্যই হল না। নইলে ওদের নাকি আমাকে ভীষণ পছন্দ হয়েছিল।

বলে সুনু হাসে। তারপর বলে—মা-বাবাদের যে কি সব অদ্ভুত ধারণা থাকে। জামাইবাবুর জন্য চিন্তা করে ওঁদের মাথার ঠিক নেই।

রাতে মাঝে মাঝে ভাল ঘুম হয় না। জেগে থেকে কত শব্দ শুনি। ভিখিরির চিৎকার অনেক রাত পর্যন্ত শোনা যায়। মানুষের রাতের খাওয়ার সময় পেরিয়ে গেলে তারা পাত কুড়োতে বেরোয়। আমাদের বাড়ির সামনে রোজ এক পাল আসে।

রাত গভীর হয়ে গেলে বহু দূর দূরের শব্দ শোনা যায়। শুনি, পশ্চিমাদের গান, লোকজনের হল্লা, কখনো বোমার শব্দ। মাঝে মাঝে গুলির শব্দ শুনি, দৌড়-পায়ের আওয়াজ, খবরের কাগজে আজকাল খুব খুনের খবর থাকে। বুঝতে পারি, চারধারে কি একটা গোলমাল জল ঘোলা করে দিচ্ছে। ফুঁসে উঠছে মানুষ। কিন্তু সেসব আমাকে তেমন স্পর্শ করে না।

প্রতি সপ্তাহে অদ্রির চিঠি আসে। তাতে মাঝে মাঝে অদ্রি লেখে, রাণুর বরের এখনো কোনো খবর নেই। এ খবর অদ্রির বাড়িতেও আসে। কান্নাকাটির শব্দ শোনা যায়।

ভাল লাগে না। কিছুই ভাল লাগে না। রাণুর বরের কথা ভাবি, ওর দেওর নেনুটুর কথা ভাবি, সেই কৃষ্ণচূড়া গাছের আড়ালে লাল রঙের বাড়ির ঝুল-বারান্দায় দেখা সুন্দর মেয়েটির কথা ভাবি। মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখি একটা মোটা লোক ফাঁস দিয়ে ঝুলে আছে অন্ধকার বারান্দায়। চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে হঠাৎ বুঝতে পারি, লোক নয়, একটা বালির বস্তা। কোথায় যেন দেখেছিলাম বস্তাটাকে? ওঃ, রাণুর বাড়িতে। ওর দেওর সেই নেনুটু বক্সার ছিল। হাবুলদা কি ওর ওপর শোধ নিয়েছে শেষ পর্যন্ত? নিক, আমার কি?

একদিন নার্স মেয়েটিকে গিয়ে বলি—নার্সিং কোথায় শেখা যায় বলুন তো। আমি শিখবো।

মেয়েটি তটস্থ হয়ে বলে—অনেক জায়গা আছে।

আমি ভেবেচিন্তে বলি—আপনিই শেখাতে পারেন তো।

—কিছুটা পারি।

boiRboi.net

—শেখাবেন ?

সে ঘাড় নেড়ে সঙ্গে সঙ্গে রাজী।

তার কাছে ব্যান্ডেজ বাঁধতে শিখি, ক্ষত পরিষ্কার করার কলাকৌশল শিখি, জ্বরের চার্ট রাখা থেকে শুরু করে সবই সে আমাকে শেখাতে চেষ্টা করে।

জিজ্ঞেস করি—পচা ঘা বাঁধতে ঘেন্না করে না? রক্ত দেখলে, কাটা ফাটা দেখলে ভয় লাগে না?

—প্রথম প্রথম লাগত। তারপর অভ্যাস হয়ে যায়।

—আমার হবে না। আমি আজও তেমন রক্তটক্ত দেখিনি।

সে চুপ করে থাকে। নীরবে মুগ্ধচোখে আমাকে দেখে। তার চোখ দেখে বুঝতে পারি, আমার কাছ থেকে একটু ভাল কথা শুনতে পেলে সে বর্তে যায়। মনে মনে হাসি। মেয়েটার জন্য কষ্ট হয়।

এক একদিন দুপুরবেলা ডেকে এনে বলি—আপনার কথা তো কিছুই বলেন না। আপনার কথা বলুন, শুনবো।

সে লজ্জায় মাথা নিচু করে থাকে। অনেকক্ষণ ধরে সাহস সঞ্চয় করে বলে—আমাদের কথা শুনতে আপনার ভাল লাগবে না। আমরা একটুও ভাল না, সুন্দর না।

হেসে চোখ বড় করে বলি—তাই নাকি?

সেও হাসে, মাথা নত করে বলে—সত্যিই।

ঠাট্টা করে বলি—খুব কুচ্ছিৎ সবাই?

সে লাজুক গলায় বলে—তা কেন। আমার ছোটো বোন আমার চেয়ে ফর্সা, মার রঙ পেয়েছে। আমি পেয়েছি বাবার রঙ, বাবা কালো ছিলেন শুনেছি।

—আপনার মা তাহলে সুন্দর।

সে মাথা নাড়ে—মার নাক চাপা, চোখ ছোটো। আর গায়ের রঙ? সেও আপনার তুলনায় কিছুই না। আমাদের মধ্যে ফর্সা হলেও আপনার পাশে কালোই।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের হাতখানা একটু ঘুরিয়ে দেখে বলি—আমারও রঙ কিছু নেই। ঘষা-মাজা হয়ে থাকি, বাইরে বেরোই না বড় একটা। ছায়ায় থেকে থেকে ফ্যাকাসে হয়ে গেছি। আপনার মতো বাইরে বেরোনোর কাজ করলে আমিও কালো হয়ে যাবো।

মেয়েটা লজ্জা পেয়ে বলে—ধ্যাৎ। রঙ বুঝি আমি চিনি না।

—ফর্সা ছাড়া বুঝি সুন্দর হয় না?

—হবে না কেন? আমার দাদা তো কালো, কিন্তু খুব সুন্দর। ভাই বোনদের মধ্যে শুধু নয়, আমাদের পাড়ার মধ্যেও সব থেকে সুন্দর। সবাই বলে।

বলতে বলতে মেয়েটার গলা হঠাৎ একটু ধরে আসে।

আমি কৌতূহল দেখাই না। শুধু বলি—তাই নাকি?

সে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে—খুব লম্বা, চওড়া হাড়, দারুণ স্বাস্থ্য। দাদাকে যে দেখে সে-ই দুদণ্ড তাকিয়ে থাকে।

—ও।

মেয়েটা হঠাৎ বোকার মতো বলে—আপনাকে যেদিন প্রথম দেখি, সেদিনই মনে

ভেবেছিলাম, আমার দাদার সঙ্গে আপনাকে খুব মানায়। আপনি আমার বৌদি হলে আনন্দে আমি নাচতাম।

আমার মুখে চোখে রক্তের গরম হল্‌কা লাগে। মুখ ফিরিয়ে নিই।

মেয়েটা আবার স্তিমিত গলায় বলে—কিন্তু দাদা অত সুন্দর হয়েও কোনো লাভ হল না।

চকিতে মুখ তুলে বলি—কেন?

মেয়েটার চোখ জলে ভরে আসে আস্তে আস্তে। বলে—ডায়মণ্ডহারবারের কাছে মাস্টারী করত। খুব বই পড়ার নেশা ছিল। সারাদিন কেবল বই আর বই। জীবনে উন্নতি করার চেষ্টাই ছিল না। একবার সেলস্‌ম্যানের চাকরি পেয়েছিল, ভাল মাইনে, কিন্তু সারাদিন বই পড়ার সময় পেত না বলে ছেড়ে দিল। মাস্টারী করছিল বেশ। কিন্তু তারপর হঠাৎ কী যে হয়ে গেল ওর! স্কুলে বেশির ভাগ দিনই যায় না। বাড়িতেও থাকে না। একটা দলের সঙ্গে মিশে কী সব রাজনীতি করতে শুরু করে। মাঝে মাঝে গভীর রাতে ফেরে, ভোর হওয়ার আগেই চলে যায়। একদিন পুলিশ এসে বাড়ি সার্চ করে ওর ঘর থেকে একগাদা বইপত্র নিয়ে গেল। ও এখন পালিয়ে বেড়ায়। কোথায় খায়, কোথায় শোয় ঠিক নেই। একগাল দাড়ি রেখেছে, চুলে তেল নেই, রোগা হয়ে গেছে, অসম্ভব সিগারেট খায়। মাসে হয়ত একদিন বাসায় আসে, অল্পক্ষণ থেকেই চলে যায়। মা বিয়ের কথা বললে এমন ভাবে তাকায় যে রক্ত জল হয়ে যায়। সবচেয়ে বেশি বদলে গেছে ওর চোখ। আগে বড়, টানা চোখ ছিল ওর, চাউনি ছিল কবির মতো। এখন সেই চোখ কেমন লাল্‌চে, রুক্ষ, জ্বলজ্বলে। আমরা এখন ওর চোখের দিকে তাকাই না। আগে আমাদের দুই বোনকে কত কবিতা পড়ে শুনিয়ে মানে বুঝিয়ে দিত, বই-পড়া আমরা তার কাছেই শিখি। আমরা দুই বোন ছিলাম ওর পাঁজরের মতো। কী ভালবাসত! এখন ফিরেও দেখে না। সব সময়ে ভিতরে ভিতরে কী উত্তেজনায় যেন ও কাঁপে। ভয়ঙ্কর অন্যমনস্ক থাকে। কবিতার বই পড়েই না।

মেয়েটি লজ্জা ভুলে কাঁদতে থাকে। ওর দুই চোখ ভেসে যায় জলে। আমি হাত বাড়িয়ে ওকে ছুঁয়ে বলি—কাঁদে না—ছিঃ, কাঁদে না।

ও তবু কাঁদতে কাঁদতেই বলে—পাড়ার লোকে বলে, ওকে নাকি মেরে ফেলার জন্য লোক ঘুরছে।

—কেন?

—কী জানি! কিন্তু যারা মারতে চায়, তারা তো জানে না আমার দাদা কী ভাল ছিল। কী ভীষণ ভাল। কবির মতো চোখ, বড়লোকের ছেলের মতো সুন্দর মুখ, বই ছাড়া বিশ্বসংসারের আর কিছু খেয়ালই থাকত না ওর।

মার ঘর থেকে একটু অস্ফুট শব্দ আসে। ও টপ্‌ করে উঠে দাঁড়িয়ে বলে—যাই।

চোখের জল মুছে একটু হাসে, বলে—আমার আর কখনো বৌদি হবে না, জানেন! একটা বৌদির কত শখ ছিল আমাদের! বৌদির সঙ্গে কিরকম ঠাট্টা করবো, কত সিনেমায় যাবো, কিরকম ভালবাসবো—আমরা দুই বোন সব ঠিক করে রেখেছিলাম। বউদির চেহারা হবে ঠিক আপনার মতো। ভীষণ সুন্দর। রাস্তায় বেরোলে সবাই

হিংসে করবে। সব রঙের শাড়ি, সবরকম গয়না যাকে মানাবে।

একটু থেমে, স্তিমিত গলায় বলে—যাই, মঞ্জুদি।

এখনো দক্ষিণ কলকাতার রাস্তায় সুন্দর পোশাক পরা ছেলেরা আড্ডা দেয়। গড়িয়াহাটার মোড়ে সেই ছেলেগুলোকে দেখি, মুখে পাউডার, ঠোঁটে লিপস্টিকের ছোঁয়া, টেরিলিন টেরিকটন পরে সময় কাটিয়ে দিচ্ছে। দাঁড়িয়ে মেয়ে দেখে।

রাসবিহারী পোস্ট অফিসের কাছে চায়ের দোকানের সামনে এখনো বসে থাকে শিবু আর হাবুর দলবল। সুন্দর মেয়ে দেখলে নকল মারপিট করে পথ আটকায়, নকল ভদ্রতায় ক্ষমা চায়। সবই ঠিক আছে। তবে কেন নার্স মেয়েটির দাদা কবিতা পড়া ছেড়ে দিয়ে ফেরার হয়েছে? তবে কেন রাণু তার বরকে খুঁজে পায় না।

প্রতিদিনই বিকেলে আমি আর সুনু আজকাল বেড়াই। আমরা দুজনেই একা। আমার বাড়িতে আমি, ওদের বাসায় ও। রোদ পড়ে এলে সুনু ঠিক জানালায় দাঁড়িয়ে ডাকে—মঞ্জুদি!

আমি জানালায় মুখ রাখি।

ও হাসে—বেড়াবে না?

—বেড়াবো। তুই তৈরি হয়েছিস?

—হুঁ।

—দাঁড়া আমি গা-টা ধুয়ে নিই।

ওদের ভাড়াটে বাড়ির এজমালি ছাদ। সেখানে বেড়ানোর সুবিধে নেই। একগাদা বাচ্চা কাচ্চা এক্কা দোক্কার কোর্ট কেটে লাফায়। বাড়িওয়ালার ছেলের গোঁফ উঠেছে, সে ঘাড়ে পাউডার দিয়ে স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরে ছাদের একটা কোণে রোজই এসে দাঁড়ায়। দু-চারটে আইবুড়ো মেয়ে উঠে গুজ্ গুজ্ করে, আর হাসে।

সুনু তাই আমাদের ছাদেই রোজ আসে। নিরালা ছাদ আমাদের। নানা রঙের টালি বসানো, পিছল-মসৃণ। সাদা তোয়ালে ঢাকা ইজিচেয়ার পেতে দিয়ে যায় মদন। আমরা অবশ্য কদাচিৎ বসি। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতেই আমাদের গল্প হয় বেশি।

সুনু প্রায়ই আজকাল বলে—মঞ্জুদি, বাবাকে বলে আমার বি-টি পড়ার একটা ব্যবস্থা করে দাও। আমি চাকরি করব।

জিজ্ঞেস করি—কেন?

—বিয়ে তো হচ্ছে না, দেখছোই। হবেও না। তার চেয়ে একটা কিছু নিয়ে আইবুড়ো থেকে যাই।

—তোর খুব ভাল বিয়ে হবে, দেখিস।

সুনু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে—ভাল বিয়ে হবে? তুমি কি হাত গুনতে জানো?

—আমার মনে হয়।

—আমি দেখতে কুচ্ছিৎ মঞ্জুদি। কালো, দাঁত উঁচু, বেঁটে। কে নেবে?

—নেবে সেই। গোকুলে বাড়ছে।

boiRboi.net

—আমার বিয়ে করতে ইচ্ছে করে না। যদি বাবা টাকা পয়সা, জিনিস-পত্রের লোভ দেখিয়ে কোনো পাত্রপক্ষকে রাজি করানও, তবু আমি হয়তো স্বামীর ভালবাসা পাবো না।

—তুই পুরুষের জানিস কি রে মুখপুড়ি? পুরুষরা যে কখন কাকে ভালবাসে! ভালবাসলে একদম অন্ধ হয়ে যায়।

সুনু মাথা নেড়ে বলে—তবু আমি ওই বিয়ে চাই না। ছেলের বাপ টাকার লোভে রাজি হল, খরচ করে বাবা বিয়ে দিলেন—আমার কেমন যেন লাগে। দিদির বিয়েতে বেশি খরচ হয়নি, কিন্তু আমার বিয়ের জন্য বাবা প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে মোটা ধার নেবে বলে ঠিক করেছে, দাদা মাইনের টাকা থেকে আলাদা করে প্রতিমাসে একশ টাকা রাখে। এ সবের অর্থ হল, ওরা দরকার হলে ছেলে কিনবে। কিন্তু আমার ওইরকম বিয়ে পছন্দ নয়।

—তবে কিরকম বিয়ে চাস?

—আমি চাই, পাত্র নিজে আমাকে দেখুক। পছন্দ হলে মুখের ওপর বলুক। শাঁখা সিঁদুর দিয়ে বিয়ে করে নিক। সে পাত্র খুব সামান্য চাকরি করলেও আমার আপত্তি নেই। আমি গরিবের ঘর করতে পারব। কিন্তু ওইরকম বিয়ে আমার পছন্দ না। তার চেয়ে আমাকে বি-টি পড়তে দিক বাবা। আমি মাস্টারী খুঁজে নেবো। কোনো গ্রামে মফঃস্বলে চলে যাবো। ছোট্ট একটা একার বাসা হবে, সেইখানে থাকবো। চারদিক খুব নির্জন হবে, নিঃঝুম হবে। একা একা একটা নির্জন জীবন, দেখো ঠিক কাটিয়ে দেবো।

একটু হেসে বলি—ও বাবা, সব ভেবে রেখেছিস!

—রেখেছি। আমি বিয়ে করে কাউকে ঠকাতে চাই না।

—তোকে যে নেবে সে ঠকবে না।

—কি করে বুঝলে?

—তুই যাকে পাবি তাকে খুব ভালবাসবি। তোর মুখচোখ সেই কথা বলে।

শুনে ওর মুখ হঠাৎ থম্ থম্ করে। কান্না আসার আগের মুহূর্তের মতো একটা থরথর কাঁপুনি ওঠে গালে। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে সামলায় নিজেকে।

তারপর বলে—ভালবাসা-টাসা আমি বুঝি না।

—আমিও না।

—বাঃ, তোমার যে সাত আট বছরের প্রেম!

—হলেই কী! ভালবাসা জিনিসটা খুব রহস্যের। আমি ভাল বুঝি না।

—মঞ্জুদি, তোমাকে একটা কথা রোজ বলবো বলে ভাবি। বলা হয় না। অনেক-দিন ধরে চেষ্টা করছি।

রহস্যের গন্ধ পেয়ে বলি—বল্ না। প্রেমে পড়েছিস নাকি?

ও চুপ করে থাকে।

সাহস দিয়ে বলি—বল না। লজ্জা কি?

ও কেমন এক রকম করে তাকায়। তারপর অনেকক্ষণ ভ্যাবলার মতো অন্যমনে চেয়ে থেকে বলে—ব্যাপারটা খুবই লজ্জার মঞ্জুদি! তুমি আমার বন্ধুর মতো হয়ে

boiRboi.net

গেছ, তোমাকে তো সব বলা যায়। তবু এটা বলতে লজ্জা করে। ভীষণ লজ্জা।

—কি হয়েছে সুনু?

—আমি একজনকে ভালবাসতাম।

অবাক হয়ে বলি—সে কি? কখনো টের পাইনি তো সে কে?

—সে কে তা কী করে জানবো। পরিচয় বেশি দিনের নয়।

—এত কাছাকাছি থাকি, তবু কখনো তো কোনো ছেলের সঙ্গে তোকে দেখিনি! তুই তো বাড়ি থেকে বেশি বেরোসও না।

—বাড়ির বাইরেই তার সঙ্গে দেখা হত। সপ্তাহে এক বা দুই দিন।

—কি করে ছেলেটা?

—কিছুই না। বি. কম পাস করে চাকরি পায়নি। তাই টাইপ আর শর্টহ্যান্ড শিখত। নাম অনিন্দ্য সান্যাল।

—কোথায় দেখা হয়েছিল তোদের?

সুনু রেলিঙে ভর দিয়ে আলসেতে থুথু ফেলে আবার সেই ভ্যাবলা চোখে আমার দিকে চেয়ে বলল—মঞ্জুদি, আমার কিছু ভাল লাগছে না।

—আগে ছেলেটার কথা বল।

—বলার কিছু নেই। কালীঘাটে পিসিমার বাড়ি থেকে এক বিকেলে ফিরছিলাম। বাসে ট্রামে তখন অফিসের ভীড়। এইটুকু রাস্তা বলে হেঁটে আসছি, অলি-গলির ভিতর দিয়ে, নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য লেন-এর ভিতরে একটা পার্ক আছে, সেখান থেকে ছেলেটা পিছু নিল। রাস্তাঘাটে আমার পিছু বড় একটা কেউ নেয় না। নিলেও ভুল করে নেয়, একটু পরেই ভুল ভেঙে গেলে ফিরে যায়। এই ছেলেটা কিন্তু ফিরল না। ঐ পার্কের কাছ থেকে বরাবর আমার পিছনে পিছনে আসতে লাগল। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। ছেলেটা ভুল করছে, খুব ভুল করছে। আমি যে কুচ্ছিৎ তা বুঝতে পারছে না। বুঝতে দেরি হচ্ছে। ও কি অন্ধ! আমি প্রায় ছুটছি তখন, তবু ছেলেটা ঠিক আসতে লাগল। আমার কপালে ঘাম দিচ্ছে, চোখ মুখ অপমানে লজ্জায় জ্বালা করছে, কিছু ভাবতে পারছি না। কেবল পালাতে চাইছি। ভীষণ জোরে হাঁটছিলাম, রাস্তা দেখতে পাইনি, হোঁচট খেয়ে হঠাৎ স্যান্ডেলের স্ট্র্যাপ্‌টা ছিঁড়ে গেল। পায়ে ব্যথাও পেলাম খুব! কী বিপদ বোঝো! অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে পড়েছি, স্যান্ডেলটা কুড়িয়ে হাতে নিয়েছি, পা নাড়তে পারছি না, পিছনে হাত দশেক দূরে ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে। তখন হঠাৎ মনে হয়েছিল, পৃথিবীতে আমার কেউ নেই, কিছু নেই, আমি ভীষণ একা, অসহায়, দুর্বল—আমার কেউ নেই, কিছু নেই। কেউ নেই···কিছু নেই···ভাবতে ভাবতেই ঠোঁট কাঁপল, শরীরে ঢেউ দিল কান্না, চোখ বেয়ে আপনিই জল পড়তে লাগল। আমি প্রাণপণে কান্না আটকানোর চেষ্টা করছি। পারছি না। অনেকদিনের জমা কান্না বুক ঠেলে বেরিয়ে আসছিল, সব দুঃখ একসঙ্গে ভীড় করছিল মনে। আমি বোকার মতো দাঁড়িয়ে হাতে চোখ মুছছিলাম। সে সময়ে ছেলেটা এগিয়ে এল, খুব সঙ্কোচের সঙ্গে বলল—আরে, আপনি কাঁদছেন কেন? শুনে হঠাৎ ভয় ভুলে ভীষণ রেগে আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। আমার সমস্ত শরীর আক্রোশে রাগে ঘেন্নায় কাঁপছে। আমি বললাম—লজ্জা করে না? কেন আপনি

আমার পিছু নিয়েছেন ? ছেলেটা খুব অবাক হয়ে বলল—আমি ভাবিনি যে আপনার এরকম রি-অ্যাকশন হবে। আসলে হাতে কোনো কাজ ছিল না বলে—কাজ নেই বলে—সময় কাটছে না তাই—আমি ভাবলাম কিছু একটা লক্ষ্য করে হাঁটি। অনেকদিন ধরে আমি কোথাও যাই না, কিছু একটা লক্ষ্য করে হাঁটি না, এমনি এমনি ঘুরে বেড়াই। আজ হঠাৎ মনে হল—আপনার পিছু নিয়ে খানিকটা হাঁটি—একটা কিছু লক্ষ্য করে হাঁটা হবে, কলকাতার মেয়েরা তো এসব মাইন্ড করে না। কিন্তু আপনি—দেখুন, রাগ করবেন না, আপনার চটিটা আমার হাতে দিন, ঐ মোড়ে একটা বুড়ো মুচি বসে।

আমি হাসতে থাকি। সুনু হাসে না। গম্ভীর চোখে আমাকে দেখে বলে—ঐ মুচির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতে আমাদের ভাব হয়ে গেল। একটুও বাড়িয়ে বলছি না।

—বিশ্বাস করছি। তারপর বল।

সুনু আবার আলসেতে থুথু ফেলে সেইদিকে চেয়ে থাকে। তারপর মুখ লুকিয়ে বলে—মঞ্জুদি আমি তাকে সর্বস্ব দিয়ে দিয়েছি।

একটু চমক লাগে। কথাটা ঠিক বুঝতে পারি না।

বলি—কি বলছিস ?

—বললাম তো। বারবার শুনতে চেও না।

বুঝতে সময় লাগে না। এসব এক পলকে বোঝা যায়। তবু হাত পা শিরশির করে। মনে করতে ইচ্ছে করে, ভুল শুনেছি।

—সুনু, কি হয়েছে ?

—কী জানি। আমার শরীর কেমন করে।

—কেমন ?

—যেমন অন্যের হয় বলে শুনেছি, তেমন।

ওর কাঁধে হাত রেখে বলি—কেন এমন করলি সুনু ? অপেক্ষা করা যেত না ?

ও মাথা নাড়ে—না। অপেক্ষা করতে আমার ভয় করে। ও তো আমাকে সত্যিই সুন্দর দেখেনি। ও ভুল দেখেছে। অপেক্ষা করলে যদি ভুল ভেঙে যায় ? তুমি যে বললে আমি যাকে পাবো তাকে খুব ভালবাসবো—সেটা খুব সত্যি কথা। আমি ওকে খুব ভালবেসেছিলাম। ভয় হচ্ছিল, যদি ওর ভুল ভাঙে তবে আমার সেটা সহ্য হবে না। তাই আমার যা আছে সব দিয়ে ওকে খুশি করেছি।

আমি আবার হঠাৎ হাসতে থাকি। বলি—তাতে অবশ্য তেমন কিছু হয়নি। সব ঠিক হয়ে যাবে। সেই ছোঁড়াটার নাম-ঠিকানা দে। অদ্রিকে চিঠি লিখে আনাই, নেগোশিয়েট করে ফেলি।

ও মাথা নেড়ে বলল—ব্যাপারটা অত সহজ হলে তোমাকে বলবো কেন ? ওর সঙ্গে আমার মাত্র তিন চার মাসের পরিচয়। বেশি কিছু জানতাম না। দিন পনেরো আগে যখন প্রথম শরীরের আবিল্য টের পাই তখন ঠিক করলাম, ওকে সব বলে বিয়ে করে ফেলবো। সেদিন দেশপ্রিয় পার্কের এক গাছতলায় দেখা হওয়ার কথা ছিল। ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। ও এল না। মন তখন ভীষণ অস্থির। একা একা এই বিরাট ঘটনাটা বইতে পারছিলাম না। সন্ধে পার করে ফিরে এলাম। সারারাত ঘুম হল

না। কথা থাকলে ও ঠিক আসে, ভুল করে না। তবে এল না কেন? কিছু ভেবে পাই না। ওদের বাড়িটা নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য লেন-এ। বেশ বড় বাড়ি। সামনের দিককার একটা ঘরের ভাড়াটে উঠে গেছে। ফাঁকা ঘরে বসে আড্ডা দিতাম দুজনে, ভিতরবাড়িতে কখনো যাইনি। বাড়ির লোকজন বলতে ওর বিধবা মা, আর এক স্বামী-তাড়ানো দিদি। কাউকেই চিনি না তবু পরদিন সকালে উঠেই ওর বাড়িতে গেছি। দোতলায় উঠেছি যখন, তখন আমার বুক কাঁপছে, মাথা ঘুরছে, ভয় করছে। কিন্তু অন্য কোনো উপায় তো নেই। আমাকে ওদের মুখোমুখি হতেই হবে। সাড়া পেয়ে ওর মা বেরিয়ে এলেন—রাশভারী চেহারা, মুখটা থমথমে। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম। ওর মা অনেকক্ষণ দেখলেন আমাকে, তারপর বলালন—ও তো নেই। ওকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। কোথায় আছে তাও আমরা জানি না। তুমি কে? আমার তখন বুক খালি খালি লাগছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে। কোনোক্রমে জিজ্ঞেস করলাম—কেন? উনি বললেন—কি জানি। কোন পুলিশের অফিসারকে প্রিয়া সিনেমার কাছে কারা মেরেছে, পুলিশ বাড়ি ঘুরে কতজনকে ধরে নিয়ে গেল। আমরা নাওয়া-খাওয়া ছেড়েছি। ওর দুই দাদাকে টেলিগ্রাম করা হয়েছে। কি করবো কিছু ভেবে পাচ্ছি না। তুমি কে? ওর সঙ্গে চেনা হল কি করে? কোনোক্রমে দু-চারটে মিথ্যে কথা বলে চলে এসেছি। দাদার এক সার্জেণ্ট বন্ধু আছে, পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে লাল মোটর সাইকেল থামিয়ে ট্র্যাফিক সামলায়। সাত-আট দিন আগে তাকে গিয়ে ধরলাম, অনিন্দ্য সান্যালের খোঁজ এনে দিতে। সে তিন-চার দিন আগে খবর দিল, অনিন্দ্যর কেস খুব খারাপ। পি-ডি অ্যাক্টে চালান দিয়েছে, আলিপুরে আছে। সে-ই ব্যবস্থা করে দিল। পরশু দিন গিয়ে অনিন্দ্যর সঙ্গে দেখা করেছি।

বলে চুপ করে রইল। জিজ্ঞেস করলাম—কি দেখলি?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুনু বলল—চেনাই যায় না। হাঁটতে পারছিল না। দুজন ধরে ধরে নিয়ে এল। খুব মেরেছে। মুখ-চোখ ফুলে আছে। আমাকে দেখে একটু হাসবার চেষ্টা করল, তারপর কেঁদে ফেলল। কোনো কথাই বলতে পারলাম না মঞ্জুদি। কি বলবো? বলেই বা কি হবে? কেঁদে ফেলেই আবার সামলে গেল। বলল—আমার জন্য আর অপেক্ষা কোরো না। করে লাভ নেই। হয় আমি মরে যাবো, নয়তো পাগল-খোঁড়া-পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকবো···বলতে বলতে আবার কাঁদে। নিজের বিপদের কথা ওকে বলতেই পারলাম না, কাঁদতে লাগলাম। ও যে কত ভাল ছিল, ওকে কত ভালবাসি, সেই কথা মনে করি, আর কাঁদি। রাজনীতি ও কখনো করেনি, ওসব ও বুঝতোই না। দাদার বন্ধুকে সেসব কথা বললাম। সে গম্ভীর হয়ে বলল—দ্যাখ সুনু, পুলিশ খামোখা কাউকে ধরে না। ওর সম্বন্ধে পুলিশের ইনফর্মেশন খুব পাকা। শুনে প্রথমটায় বিশ্বাস হল না। পরশু রাতে অনেকক্ষণ ওকে ভাবলাম। ভাবতে ভাবতে মনে হল, হতেও পারে।

—কি?

—হতেও পারে যে ও খুনেদের দলে ছিল। ওর সব ভাল, কিন্তু একটা ব্যাপার ছিল, ও খুব উদ্দেশ্যহীন। কখন কি করবে তার ঠিক পেত না। যেমন একদিন হাতে ওর কাজ নেই বলে আমার পিছু নিয়েছিল, তেমনি লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীন বলে

boiRboi.net

ওর পক্ষে হঠাৎ কোনো কাজ করে ফেলা সম্ভব। ওর জীবনের কোনো লক্ষ্যই ছিল না। অনেক বয়স পর্যন্ত চাকরি নেই, পড়াশোনা করে দেখেছে সব পণ্ডশ্রম, ক্রমে অলস নিস্তেজ আর গেঁতো হয়ে যাচ্ছিল, নিজের উপর বিশ্বাস ছিল না। এমন কি, ঘটেনি বলে প্রেমও করেনি আগে। আমিই প্রথম। তাই আমাকে নিয়ে ওর বাড়াবাড়ি ছিল খুব।

—তবে তুই ওকে ঠিক করে নিসনি কেন?

—কী করে করবো মঞ্জুদি, আমি তো যথাসর্বস্ব দিয়েছি। কিন্তু একটা মেয়ে তো একজন মানুষের সব হতে পারে না। কোনো কোনো ছেলে থাকে, যাদের লক্ষ্যই হল মেয়েমানুষ। ও তো সেরকম ছিল না। মেয়েমানুষকে ছাড়িয়েও একটা কিছু অস্তিত্ব ছিল। সেটা আমি বুঝতে পারতাম না। আমি ওর যেটুকু চিনতাম না সেটুকুর মধ্যে কি ছিল কে জানে? মাত্র তো তিন-চার মাসের পরিচয়।

সন্ধ্যে উতরে গেছে কখন। লালচে আভার আকাশ। একটা এলোমেলো হাওয়া আমাদের মুখ থেকে কথা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে সুনুর মুখ দেখতে পাই না। ও রেলিঙে ঝুঁকে, শরীর কুঁজো করে, আঁচলে মুখ চেপে কেমন পুঁটলির মতো হয়ে আছে। বিস্বাদ মুখে আল্‌সেয় থুথু ফেলছে।

মুখ গুঁজে রেখেই বলল—কি করবো মঞ্জুদি?

উত্তর দিতে পারি না। সুনু বড় গৃহস্থ মেয়ে। সাত-আট বছর ধরে দেখে আসছি, মায়ের সঙ্গে ঘুর ঘুর করে সারাদিন কাজ করে। রাণুর কাজের এত গোছ ছিল না। ও সারাদিন ঘর গোছায়, রান্না করে, মেসিন চালিয়ে সেলাই করে। সবাই বলে—যে ঘরে যাবে সে ঘরের শ্রী ফিরবে। শেষ পর্যন্ত সুন্দর ঘরই জুটবে না হয়তো। কোনোদিনই সুনুকে তেমন আলাদা করে লক্ষ্য করিনি। বলতে গেলে, এই প্রথম তার প্রতি আমার মায়া হতে থাকে। সহজে উত্তর দিতে পারি না।

সুনু নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে। আমি ওর মাথাটা বুকের কাছে টেনে আনি। মনে মনে বলি—কাঁদ্ সুনু, আর একটু কাঁদ্ আমি তোর সঙ্গে কাঁদি আয়।

কিন্তু আমার ভিতরে কোনো কান্না জমা নেই। মেঘ ছাড়া তো বৃষ্টি হয় না। আমার ভিতরে মেঘ কই। একটা জ্বালা-জ্বালা ভাব আছে, প্রবল পিপাসার মতো উৎকণ্ঠা আছে, মায়া আছে, কিন্তু কান্না কই! কাঁদতে পারি না বলে আমার কষ্ট আরো বেশি হয়। ওর মাথাটা চেপে চেপে ধরি। ভিতরটা ফেটে যেতে থাকে।

ও মুখ তুলে বলে—মঞ্জুদি, এ অবস্থায় কারো ওপর নির্ভর করতে হয়। একা মাথায় তো কুলোয় না। আমি আর পারি না। তুমি আমার ভার নেবে? যা করতে বলবে, করবো।

ওর কথার মধ্যে কী একটু ছিল। এরকম আগে কেউ আমাকে কখনো বলেনি। হঠাৎ আমার মনে হতে থাকে, সুনু ছোট্ট মেয়ে, আমি অনেক বড়—অনেক বড়—যেন ওর মা। কয়েকটা মুহূর্তের জন্য ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘুচে যায়। আমি একটুও না ভেবে বলি—নেবো।

ও অনেকক্ষণ কেঁদে শান্ত হয়।

আমি জিজ্ঞেস করি—ছেলেটাকে কিছুতেই ছাড়ানো যাবে না—না রে?

ও মাথা নাড়ে—গেলে দাদার বন্ধু ঠিক ব্যবস্থা করত।

আমি ঝুকে বলি—তুই কি সিওর যে তুই প্রেগন্যান্ট।

ও ইতস্তত করে বলে—শরীরটা কেমন করে যে। এরকমই হয় তো শুনেছি। যদি না হয় মঞ্জুদি, তোমাকে আমি খুব খাওয়াবো, একটা প্রেজেণ্টেশন দেবো—

বড় কষ্ট হয়। চুপ করে থাকি।

ও নিজে থেকেই আবার বলে—তারপর নিশ্চিন্তমনে ওর জন্য অপেক্ষা করবো। তুমি আমার ভার নিলে তো মঞ্জুদি?

—বাড়ি যা সুনু। ঘুমো। ভাবিস্ না।

প্রায় সারা রাত ঘুমোই নি। মাথার মধ্যে কী যে সব কুটোকাটা ঘুরপাক খেল! জ্বরের মতো এক প্রবল উৎকণ্ঠা। মাঝে মাঝে আধো ঘুমের মধ্যে কতবার কাৎরে উঠে পাশ ফিরলাম, জেগে জল খেলাম, আবার স্বপ্ন দেখলাম। কেউ কখনো এরকমভাবে আমার হাতে নিজেকে দিয়ে দেয় নি। আমি কখনো কারো ভার নিইনি। এই প্রথম। কেমন যে লাগে! শরীর ভার হয়ে আসে, নিজেকে বিরাট বলে মনে হয়। আবার দুর্বলও লাগতে থাকে। পথ খুঁজে পাই না। কিন্তু তার মধ্যেও এক সুখবোধ আমাকে আচ্ছন্ন করে—একজন আমার ওপর নির্ভর করে আছে। আমার কোলে একদিন আমার শিশু আসবে, সেই ন্যাংটাপুটো অসহায় শিশু নির্ভর করবে আমার ওপর। আমার মুখ চেয়ে হাসবে কাঁদবে, ভয় পেলে জড়িয়ে ধরবে আমাকেই। সেই অসহ্য সুখের মাতৃত্বের মতো একটা বোধ আমাকে মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন করছিল। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালবেলায় নার্স মেয়েটি টুক্ টুক্ করে মার বিছানা গোছাচ্ছিল। ধপ্‌ধপে সাদা তার পোশাক, পরিচ্ছন্ন হাত-পা, চোখ তীক্ষ্ণ সতর্ক, তার চলাফেরায় সহজ একটা পটুত্বের ভাব, চটপটে হাত-পা। তার কাজ করা দেখতে আমার ভাল লাগে।

—শুনুন।

সে সসম্ভ্রমে আমার দিকে চায়।

—আমার ঘরে একবার আসবেন। দরকার।

সে মাথা নাড়ে। একটু হাসে। একটু দাঁত-উঁচু, কালো মুখখানার দিকে তাকিয়ে ওকে হঠাৎ খুব বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়। ওর মেয়েলিপনা নেই, কাজ বোঝে, কাজ নিয়ে থাকে।

সকালবেলাতে আমাকে সুন্দর দেখায়, আমি জানি। চোখের পাতা ভারী থাকে, ঠোঁট টস্ টস্ করে, রস জমে মুখখানা ভরে ওঠে। লালচে আভার এক ঢল চুল এলো হয়ে চালচিত্রের মতো মুখখানা ঘিরে থাকে।

মেয়েটি আমার সামনে বসে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে। প্রশ্ন করে না। মুখে একটু সম্মোহিতের মতো ভাব।

তাকে চা এগিয়ে দিয়ে বলি—বলুন তো, কেউ প্রেগন্যান্ট হয়েছে কিনা তা কি করে বোঝা যাবে!

মেয়েটাও একটু ভ্রু তোলে না। স্বাভাবিক নরম গলায় হেসে বলে—কতগুলো

boiRboi.net

লক্ষণ আছে। তবে খুব প্রথম দিকের স্টেজ হলে গাইনীর ডাক্তার দেখাতে হয়।

আমি তার চোখে চোখ রেখে চা খাই।

সে বিমুগ্ধভাবে চেয়ে থাকে। চোখ সরাতে ভুলে যায়।

জিজ্ঞেস করি—গাইনীর ডাক্তার না দেখালে জানা যাবে না? আপনি বলতে পারেন না?

মেয়েটি হাসে—কার জন্য?

আমি একটু আড়মোড়া ভেঙে বলি—আমার জন্য। আমার কেবলই মনে হচ্ছে আমি—

মেয়েটা একটুও চমকায় না, চোখ বড় করে না। মুখের বিমুগ্ধ ভাবটা তেমনই লেগে থাকে। যেন বা আমার কোনো দোষ হতে নেই। সবই যেন আমাকে মানায়।

সে তেমনি সুন্দর স্বরে বলল—কেমন লাগে আপনার?

—মুখে থুথু আসে, গা কেমন করে, শরীর গুলোয়।

—বমি?

—বমি পায়।

—ক্রিমিও হতে পারে। গাইনোকোলজিস্ট না দেখালে সিওর হওয়া যাবে না। যাবেন? পি-জিতে ভাল ডাক্তার আছে আমার চেনা। দেখিয়ে দেবো। কেউ জানবে না। চেম্বারেও দেখাতে পারেন।

—যদি দেখা যায় প্রেগন্যান্সি তাহলে কি হবে?

মেয়েটি তেমনই গলায় বলে—আপনি কি করতে চান?

—ঠিক জানি না। ঠিক করি নি।

হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙি।

মেয়েটা চেয়ে থাকে, স্মিতমুখ, সম্মোহিতের মতো বলে—যা চাইবেন তাই হবে। আমি সব ঠিক করে দেবো। আজকাল কোনো অসুবিধে নেই।

আমি আবার হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে বলি—দেখি। বলবো।

সে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ায়। নরম গলায় বলে—আসি মঞ্জুদি।

মেয়েটি চলে গেলে আমি একা একা হাসি। আজকাল কত সহজে সব হয়ে যায়। ভাববার কিছু নেই। মিছিমিছি চিন্তা করেছি সারা রাত। একা হাসতে থাকি।

তারপর একা একা সারা সকাল অন্যমনস্ক থাকি। গাড়িটা নিয়ে বেরোই, গড়িয়াহাট থেকে তিন চারটে শাড়ি কিনে নিই। অদ্রিকে চিঠি লিখি। গ্রামাফোন বাজাই। বেলা বাড়ে। মেঘশূন্য দিনে সূর্য ক্রমে আমাদের কাছাকাছি এগিয়ে আসে। খস্‌খসে পিচকিরি দিয়ে জল দেয় মদন। সুগন্ধে ঘর ভরে যায়। একা ভূতের মতো আমি সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াই। যদি এত সহজেই সব মিটে যায় তবে মঞ্জু কি নিয়ে থাকবে? তার কি কিছুই করার থাকবে না? সকলেই ক্ষমা করে তাকে, কেউ দোষ দেখে না। হায়, মঞ্জুর আর কোনো খেলনা থাকছে না। বড় নিশ্চিত তার পরিণতি।

॥ সোমসুন্দর ॥

একটা উঁচু ঢিবি পেরোনোর সময়ে আমরা দূর থেকে গ্রামটা দেখতে পাচ্ছিলাম। রোদে থির থির করে বাতাস কাঁপছে। গ্রামটা খাঁ খাঁ করে। চারিদিকের মাঠ ঘাটে সবুজ রঙ দেখাই যায় না। চষা মাটির ঢেলা রোদে শুকিয়ে বালি হয়ে যাচ্ছে।

নীতু আগে, আমি পিছনে। আল ধরে হাঁটছি। আখের চারা লাগিয়েছিল কে, সেগুলো দড়ি দড়ি হয়ে মাটিতে নুইয়ে আছে। বাতাসে থর থর করে শুকনো শব্দ ওঠে, পোয়াল-নাড়ায় যেমন শব্দ হয়। নীতু সিগারেট ধরানোর জন্য দাঁড়ায়। আমি চারিদিকটা দেখার চেষ্টা করি। কিন্তু কিছু দেখার নেই। গ্রামদেশে এক জায়গার সঙ্গে আর এক জায়গার বড় একটা তফাৎ হয় না। একই রকম। এ সময়টায় গাছে নতুন পাতা আসে। এবার আসেনি। রোদে চোখে ধাঁধা লাগে।

গ্রামটার কাছাকাছি চলে আসি। তবু লোক দেখা যায় না। গরু ছাগল কুকুর কিছুই না।

নীতু মুখ ফিরিয়ে বলে—কলেরা।

—কি?

নীতু হাসে—আমরা আসার আগে এ জায়গায় কলেরা এসে গেছে।

একটা পত্রহীন গাছের নীচে পাতকুয়া দেখে দাঁড়াই। নীতু কুয়ো না দেখেই বলে—ওতে কিছু নেই নেন্টু। বলে একটা পাথর কুড়িয়ে কুয়োর মধ্যে ছুঁড়ে মারে। অনেকক্ষণ পরে ঠং করে ক্ষীণ শব্দ উঠে আসে।

নীতু হেসে বলে—শুনেছো?

চারদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি গ্রামটা একেবারে অজ। পাকা রাস্তা থেকে অনেক দূর, কাছাকাছি খাল বা নদী নেই। মাটির বাড়ির দেয়াল রোদে টন্‌টনে হয়ে আছে। এর আগের গ্রামটার নাম জপুর। সেখানে হেল্‌থ সেণ্টার আছে, হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, একটা ব্যাঙ্ক। ওখানে আমরা গত রাত্রিতে ছিলাম। কিন্তু এ গ্রামটায় কিছু নেই।

একটা সজনে গাছে সরু সরু কয়েকটা সজনে ঝুলছে। বোধহয় রস কষ নেই। একটা কাক ঝিম হয়ে বসে আছে। উত্তরদিকে একটা খাদের মতো। পচা গন্ধ আসছে। দু পা এগিয়ে দেখি, এধার ওধার গরুর পাঁজর আর হাড়ের স্তূপ পড়ে আছে। অনেক শকুন বসে চারদিকে। দুটো কুকুর রক্তাভ চোখ তুলে তাকাল।

নীতু বলে—ট্যানারি। এটা বোধ হয় চামারদের পাড়া। পাতকুয়োর ভিতরে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে নীতু। আমরা আবার হাঁটতে থাকি।

দাওয়ায় বসে একটা লোক দড়ি পাকাচ্ছে নিবিষ্ট মনে। আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকাল।

নীতু দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে—সোনামুখী কোনদিকে হে?

লোকটা তটস্থ হয়ে দাঁড়ায়—গ্রাম পেরিয়ে পশ্চিমে রেল-বাঁধ পাবেন, সেটা পেরিয়ে ঝিল, দু ক্রোশ হেঁটে গেলে নদী, তার ওপারে।

boiRboi.net

আমি বলি—একটু জল খাওয়াতে পারো ?

লোকটা তাকায়। নীতু আমার হাত চেপে ধরে চাপা গলায় বলে—খেও না।

—কেন ?

—কুষ্ঠ।

তখন লোকটাকে দেখি। তেমন কিছু বোঝা যায় না। নাকটা একটু ফোলা, লাল। হাতের আঙুল বাঁকা। মুখটার এখানে ওখানে ডুমো ডুমো মাংস ফুলে আছে।

লোকটা বলে—জল খাবেন তো—

নীতু মাথা নাড়ে—খাবো না।

—কোথা থেকে আসছেন ?

—জপুর। এ গ্রামের অবস্থা কি ?

—দেখছেন তো। খরা গেল, তার পর কলেরা। সব পালিয়েছে, মাত্র দশ বারোটি মনিষ্যি আছি আমরা। সবাই কুঠে। আপনারা কি সেটেলমেণ্টের লোক নাকি বাবু ?

—না।

—তবে ?

—যাচ্ছি আত্মীয়বাড়ি।

লোকটা আমাদের সঙ্গ নেয়। কাছ ঘেঁষে চলতে থাকে।

—সুয্যিঠাকুরের ধুন্ধুমার দেখেছেন এবার ?

আমরা কথা বলি না। তফাতে থাকার চেষ্টা করি। লোকটা এক নাগাড়ে কথা বলে যায়। বলতে বলতে কাছ ঘেঁযে আসে। আমরা প্রাণপণে তফাত থাকার চেষ্টা করি।

নীতু তবু তার মধ্যেই জিজ্ঞেস করে—মোট দশ বারোজন আছো তোমরা ?

—আজ্ঞে। আমরা সবাই কুঠে।

—ফাঁকা ফাঁকা লাগে না ?

লোকটা মাথা নাড়ে—না। লোকজন বেশি থাকলে তো আমাদের নড়াচড়া, বেড়িয়ে বেড়ানো নিষেধ। কোথায় কার সঙ্গে ছোঁয়া লাগে। এখন আমরা কজন কুঠে মনের আনন্দে গ্রাম চষে বেড়াই, ঘরবাড়িতে ঢুকে যাই, সন্ধেবেলা কেত্তন করি কজনায়। খারাপ লাগে না।

লোকটার মুখে একটা চাপা আনন্দ দেখা যায়।

নীতু বলে—খাও কি ?

—ভিক্ষে-সিক্ষে আছে। বাঁশের কোঁড় পাই, জঙ্গুলে শাক আছে, চলে যায়—

—চাষবাষ ?

—বীজধান ধুলো হয়ে গেল। কোথায় চাষবাস ? মাটিতে কোদাল মারলে ফিরে এসে মাথায় লাগে।

গ্রামের প্রান্ত পর্যন্ত সে সঙ্গে এল। আরো আসত। দূরে মাঠের মধ্যে একটা লোক কুঁজো হয়ে কি খুঁজছিল। তাকে দেখে চেঁচিয়ে বলল—হেই—

boiRboi.net

সে লোকটা দূরে থেকে হাত তুলে বলে—পেনু রে—

লোকটা মাঠের মধ্যে দ্রুত নেমে গেল।

নীতু বলল—মেঠো-ইঁদুর।

—কি করবে?

—খাবে।

এক ঝলক শুকনো বাতাস গো-ভাগাড়ের গন্ধ ছড়িয়ে যায়। নীতু পিছন ফিরে একবার মাঠের মধ্যে লোক দুটোকে দেখে। বলে—খুব আনন্দে আছে। পুরো গাঁ-খানা পেয়ে গেছে কদিনের জন্য।

মেঠো রাস্তাটা একটু চওড়া। পাশাপাশি হাঁটা যায়। নীতু পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলে—বাঁকুড়ার কুষ্ঠ হাসপাতাল থেকে মাঝে মাঝে রুগীরা ছুটি পায়। তখন রোগটা ছড়িয়ে দিয়ে আসে।

—তুমিও রোগ ছড়াতে বেরিয়েছো।

নীতু একটু থমকে যায়। ভ্রূ কুঁচকে তাকায়। তারপর হঠাৎ তার সুন্দর মুখখানা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে যায়। শব্দ করে হাসে নীতু। বলে—বাঃ, ঠিক বলেছো তো! খুব ঠিক। রোগ ছড়াতে বেরিয়েছি—বাঃ! বেশ বলেছো।

নিচু জমি ভাঙতে ভাঙতে হঠাৎ চোখ তুলে রেলের রাস্তাকে পাহাড়ের মতো উঁচু মনে হয়। পতিত জমিতে কিছু বাদামী রঙের আগাছা। মাটির ডেলায় পা হড়কে যায়। রেল রাস্তায় উঠতে দম বন্ধ হয়ে আসে—এত খাড়াই। ওপরে দাঁড়াতেই হুস্-হাস্ করে পাল্কি-বেয়ারার মতো বাতাস শব্দ করে ছুটে আসে। টেলিগ্রাফের তারে শিস্ দেওয়ার শব্দ হয়। ঝক্‌ঝকে দু'ফলা ইস্পাত রোদে পড়ে আছে। এটার ওপর দিয়ে রেলগাড়ি যায়। রেলগাড়ি কলকাতায় যায়। আমার ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। রেলরাস্তার ওপর দজনেই একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। বোধহয় নীতুরও ফিরে যাওয়ার কথা মনে পড়ে। রেলরাস্তা চিরকাল প্রবাসীকে ঘর-সংসারের কথা মনে করিয়ে দেয়।

নীতু লাইন পার হয়ে বলে—নেন্টু, জামাটা খুলে মাথা ঢেকে নাও। তোমার অভ্যাস নেই, এই রোদে সর্দিগর্মী হয়ে যায় যদি। মাথায় রোদ লাগা ভাল না। তারপর আর কথা হয় না। তেষ্টায় বুক কাঠ হয়ে আছে! কথা বলতে গেলে বুকে গরম বাতাস ঢোকে।

রেলরাস্তার ওপারে একটা জলা জমির মতো। জল নেই, কাদা আছে। কোথাও কোথাও কাদা শুকিয়ে পাথরের মতো জমে গেছে। জমির রঙ লাল। নীতু বলে—এটা ঝিল ছিল, শুকিয়ে মাঠ হয়ে যাচ্ছে।

আমরা ধার দিয়ে হাঁটতে থাকি। কোথাও বুক সমান উঁচু ঘাসের মতো ঝোপ। নীতু হাতের লাঠি দিয়ে ঝোপ পিটিয়ে নেয় মাঝে মাঝে। সাপে ব্যাঙ ধরেছে, সেই শব্দ মাঠ-ঘাটকে নিস্তব্ধ করে রাখে।

উৎকর্ণ হয়ে শুনে বলি—দাঁড়াও নীতু, ব্যাঙটাকে ছাড়িয়ে দিয়ে আসি।

নীতু হেসে মাথা নাড়ে—লাভ নেই। ছাড়িয়ে দিলেও ব্যাঙটা মরবে। একবার সাপে ধরলে বড় একটা বাঁচে না।

boiRboi.net

কথাটা গুরগুর করে ওঠে বুকের মধ্যে। একবার সাপে ধরলে বড় একটা বাঁচে না।

একটু ঝিমুনির মতো এসেছিল। কুঁজো হয়ে বসেছি বলে পকেটের পিস্তল তলপেটে এঁটে বসে।

গাছের ছায়া ঠিক ঠাণ্ডা নয়, তবু বসা যায়। নদীর ধার বলে জল-ছোঁয়া বাতাসে সোঁদা মাঠির গন্ধ পাওয়া যায়। এদিকে আবাদ হয়েছে, চোখ চাইলে স্নিগ্ধ সবুজ চোখ জুড়োয়।

চোখ চেয়ে দেখি, নীতু বসে ম্যাপ দেখছে। কাঁচা হাতের আঁকা ম্যাপ। ঠিক বোঝা যায় না, রাস্তা ভুল হয়।

আমি বললাম—সোনামুখী নদীর ওপারে তো।

নীতু অন্যমনস্ক ভাবে বলে—সোনামুখীতে কে যাচ্ছে।

—বললে যে!

—ওরকম বলতে হয়। আমরা যাবো হাঁসখালি, আরো পাঁচ মাইল।

উঠে পড়ি। হাঁটতে থাকি। খুব ঘুম পায়, শরীর আলসেমিতে ছেড়ে দেয়। তলপেটে পিস্তলের বাঁট এঁটে বসেছিল ঘুমের সময়ে। ব্যথার জায়গাটায় হাত চলে যায়। তারপর হাত ঘুরে এসে থামে পকেটের ওপর। আমার পিস্তলে এখনো গুলি নেই। গুলির প্যাকেট বাঁ পকেটে। এখনো ভরি নি।

নদীর পাড়ে বলে হাঁসখালি ঠিক আর গাঁ নেই। গঞ্জ হয়ে উঠেছে। নদীতে নৌকো, ঘাটে হাট বসেছে। বুড়ো বটের তলায় বাঁধানো চত্বরে লোকজন বসে আছে। সম্পন্ন গৃহস্থদের ঘরদোর চোখে পড়ে। পুরোনো গাছ প্রকাণ্ড অন্ধকার ছায়া দিয়ে ঢেকে রেখেছে গ্রামখানাকে। তিনতলা সমান উঁচু একটা বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। পুরোনো দীঘির জলে বহুকালের শ্যাওলা জমে আছে। দীঘির পাড়েই নতুন-ওঠা বি-ডি-ওর অফিস, থানা। একটা ছোটো হাসপাতাল, স্কুল। ফাঁকে ফাঁকে ঘন বাঁশবন, কণ্টিকারীর ঝোপ, ছাড়া জায়গা। তারপর আবার গাঁদাললতা-বাওয়া বেড়ার আড়ালে বাড়ির চাল দেখা যায়। পোড়ামাটির কাজ করা একটা সুন্দর শীতলা মন্দিরের পাশ দিয়ে রাস্তা ঢুকে গেছে। জঙ্গুলে রাস্তা। হাঁটতে গেলে চারপাশের লতা পাতা গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। ছায়া ছায়া রাস্তাটার শেষে বড় একটা গেরস্ত বাড়ি। ঘের দেওয়া উঠোন, উঠোনের চারপাশে ঘর। আমরা বাড়িতে ঢুকি না। বাড়ির বাইরের দিকে একটা আলাদা ঘর। দরজা বন্ধ। নীতু দরজায় ধাক্কা দিতে একটা ছেলে ঘুম চোখে এসে দরজা খুলল।

—কাকে চাইছেন?

—জপুরের ফটিক পাঠিয়েছে। আমার নাম নিত্যানন্দ সেন। আপনি হারু না?

ছেলেটার চোখে একসঙ্গে ভয় আর বিস্ময় ফুটে ওঠে। সরল ভালমানুষের মতো মুখখানা, মালকোচা দেওয়া কাপড় আর খালি গায়ে তাকে আরো গ্রাম্য দেখায়। ভারি নিরীহ চোখের দৃষ্টি। নীতুর দিকে একটু চেয়ে থেকে বলল—আসুন, আসুন।

boiRboi.net

আমরা তো আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি। ভিতরে আসুন কমরেড।

কমরেড কথাটা কানে খট্ করে লাগে। বিশ্রী—কি বিশ্রী যে শোনায় মালকোঁচা দিয়ে পরা কাপড় আর সরল চেহারার ছেলেটার মুখে। মনে হয় কৃত্রিম, মেকী একটা শব্দ। যার মধ্যে গভীরতা নেই।

ঘরটা—স্পষ্টই বোঝা যায়—পড়ার ঘর। বড় একটা টেবিলে বই খাতা ছড়ানো, আলমারী বোঝাই বই। একধারে খাটে বিছানা পাতা। ছেলেটা আমাদের বসিয়ে ভিতরবাড়ির দিকের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল—এখানে এই ঘরটায় আমি একা থাকি। আপনারা নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন।

আমরা জামাকাপড় খুলতে থাকি।

নীতু সংক্ষেপে বলে—স্নান করবো।

—হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। সামনেই পুকুর—বলেই সে আবার ঢোক গিলে কমরেড কথাটা যোগ করে।

অনেকক্ষণ পুকুরে নেমে স্নান করি। ওপরের জল গরম, গভীরে ঠাণ্ডা জল। বার বার ডুব দিয়ে উঠে আসি। নীতু সাঁতরায়। ঘাটলায় দাঁড়িয়ে, কিংবা আনাচ-কানাচ থেকে বৌ-ঝিরা উঁকি দেয়। কৌতূহলী কয়েকটা ছেলেমেয়ে এসে দাঁড়ায় পুকুরের পাড়ে।

উঠোনে কামলারা কাজ করছে, একধারে এক বুড়ো দাঁড়িয়ে—গলায় কণ্ঠী, হাতে হুঁকো। ছেলেটা চিনিয়ে দেয়—ঐ আমার জ্যাঠামশাই। উনিই চাষবাস দেখেন। বাবা গাঁয়ের স্কুলে মাস্টার। দুই কাকা কলকাতায় চাকরি করে……

ঘরে এসে দেখি তিন-চারটে ছেলে এসে গেছে। এ আমার পরিচিত দৃশ্য। যেখানেই নীতু যায় সেখানেই ছেলেরা জোটে। ওদের মিটিং হয়। আমি মিটিঙে থাকি না। হয় ঘুরে বেড়াই, নয়তো ঘুমোই। আজ আমার ঘুম পাচ্ছে।

দুধ-মুড়ি, শশা আর আম দিয়ে এক পেট খেয়ে নিয়ে বলি—একটু ঘুমানো যাবে?

সরল মুখ, নিরীহ চোখের ভদ্র ছেলেটা ব্যগ্র হয়ে এগিয়ে আসে—নিশ্চয়ই। আপনি বিছানায় শুয়ে পড়ুন। আর একটা বালিশ দেবো? আমি এক বালিশে শুই —আপনার হয়তো অসুবিধে হবে—

আমার চোখ আঠা-ঘুমে লেগে আসে। তবু ঘুমের আঁশজড়ানো চোখে ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। ছোটো চুল, সুন্দর ছোট্ট কপাল, ভোঁতা নাক, স্বচ্ছ চোখের ছেলেটা। দেখলেই মনে হয়, আদরে মানুষ। এখনো সংসারের কিছুই জানে না। একটু আগেই ওর জ্যাঠামশাই ওকে 'হারু' বলে ডাক দিয়েছিলেন। গম্ভীর সেই ডাকের মধ্যে কি গভীর মমতা ছিল! হারু তটস্থ হয়ে ছুটে গিয়েছিল। যেন বা জন্মাবধি ঐ ডাকের সঙ্গে ও সুতো দিয়ে বাঁধা আছে। ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে আমার মায়া হয়।

আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ি।

রাতে খাওয়ার আগে নীতু ঠেলে তোলে। রাত হয়ে গেছে। একটা স্বচ্ছ হ্যারিকেন জ্বলছে টেবিলের ওপর। হারু হ্যারিকেনের পাশেই মুখ রেখে বসে আছে। মিটিং ভেঙে গেছে। আর কেউ নেই।

boiRboi.net

চোখে জল দিয়ে আসি। হারু তখনো হ্যারিকেনের পাশে বসে আছে। চোখ তুলে তাকায় না। মুখখানা গম্ভীর। আরো ভাল করে ওর মুখখানা দেখার জন্য কাছে এগিয়ে যাই। নিচু হয়ে দেখি, বিকেলের দেখা ছেলেটা তো নয়। এ অন্য লোক। এর কপালে ভ্রূকুটি, নিরীহ চোখ দুটো পাল্টে গেছে হঠাৎ—জ্বল জ্বল করে জ্বলছে, চোঁয়ালে ঢিপ। মাত্র কয়েক ঘণ্টায় ছেলেটা বদলে গেছে।

নীতুর দিকে তাকাই। চোখে চোখ পড়তেই নীতু হাসে। সাফল্যের হাসি।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলি। নীতু এইসব পারে। মাত্র কয়েক ঘণ্টায় যে বদলে দেয় মানুষকে। ছুরি দিয়ে চেঁছে ফেলে দেয় ডালপালা, তীক্ষ্ণধার করে তোলে। তারপর মানুষ নীতুর হাতের অস্ত্রের মতো হয়ে যায়।

অন্ধকার উঠোন থেকে জ্যাঠামশাই গম্ভীর ডাক দিলেন—হারু ওঁদের খেতে নিয়ে এসো।

হারু একটু চমকায়। কিন্তু ঠিক ছুটে যায় না। নড়েচড়ে বসে।

রাতে শোওয়ার সময়ে নীতু হাই তুলে বলে—কাল কলকাতায় ফিরে যাবো নেন্টু। এখানকার কাজ হয়ে গেল।

আমি স্তিমিত গলায় বলি—কী কাজ হল!

নীতু হাসে, বলে—যাজন শব্দের অর্থ জানো?

—না!

—যাজন মানে নিজের আদর্শে অন্যকে টেনে আনা, উদ্বুদ্ধ করা। ব্রাহ্মণদের যাজন ছিল অবশ্য কর্তব্য।

—তোমার যাজন হল নীতু? ওরা কথা বুঝল?

—বুঝল। বোঝালে বুঝবে না কেন?

চুপ করে থাকি।

নীতু বলে—এদের থিয়োরি বুঝিয়ে লাভ নেই। গ্রামের সরল সোজা ছেলে, থিয়োরি মাথায় ঢোকালে বা বেশি বই পড়তে দিলে ভাবতে ভাবতে ভ্যাবলা হয়ে যাবে। তার চেয়ে কি করতে হবে তা বুঝিয়ে দিলেই কাজ হয়। আমি শুধু তাই বুঝিয়েছি।

সকালে উঠে দুজনে বেরিয়ে পড়ি। মাঠ-ঘাট ভাঙি না। বাসে উঠি। যেতে থাকি রেল স্টেশনের দিকে। কলকাতার দিকে। বড় ভাল লাগতে থাকে। প্রায় দশদিন হল বেরিয়েছি, কিন্তু মনে হয়, কতকাল—কতকাল আমি কলকাতায় নেই।

সকালে যখন এসে পৌঁছোলাম তখনো বাবা খবরের কাগজ পড়ছেন। চোখ তুলে বললেন—কোনো খোঁজ পেলে?

—না।

—কোথায় কোথায় খুঁজলে?

—বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া—

বাবা শ্বাস ফেলেন।

আমি বড়দাকে খুঁজতে যাইনি। গেছি নীতুর সঙ্গে। আমিও আস্তে আস্তে বড়দা হয়ে যাবো। চলে যাবো একদিন। কেউ খুঁজে পাবে না।

boiRboi.net

বাবা বললেন—মেরেই ফেলেছে। নেন্টু, খুঁজবার আর দরকার নেই। যারা আছো তারা ঘরেই থাকো। আমাদের বড় একা লাগে।

গাছতলায় বাঁধানো চত্বরে জমজমাট আড্ডা বসেছে। মনোতোষ দুহাত তুলে চেঁচায়—বক্সারদা, কোথায় ছিলেন ? আমি পকেটে টাকা নিয়ে ঘুরছি।

হেসে বলি—কেন ?

—কেন ! চোখ তুলে মনোতোষ বিস্ময় প্রকাশ করে—মনে নেই, বাজী ছিল আমি বাঁচলে আপনার দশ।

সবাই ঘিরে ধরে প্রশ্ন করে—কোথায় ছিলাম। উত্তর দিই—ঘুরে এলাম একটু। একঘেয়ে একটানা কলকাতায় থাকা ভাল লাগে ?

জমাট আড্ডা হয়। সন্ধ্যের পর গঙ্গার বাতাস দেয় খুব। বেলফুলের গন্ধ আসে কোথা থেকে ! রঙীন দোকান, সুন্দর মেয়েরা হাঁটে, ডবলডেকারের শব্দ, ট্রামের শব্দ। কলকাতা তার উত্তপ্ত বুকে চেপে ধরে আমাকে। ভীষণ ভাল লাগে বন্ধুদের মুখ। ওই তো মনোতোষ মোড়ের দোকান থেকে পান খেয়ে পিচ ফেলছে—দেখে বোঝাই যায় না ও ব্লাডপ্রেশার আর ডায়বেটিস নিয়েও দশ বারোটা খুনে ছেলের ভিতর দিয়ে আমাকে বাসরাস্তায় পেঁাছে দিতে চেয়েছিল। ঐ তো শ্যামল—ঐ শঙ্কর, বরেন, সত্যেন, বিভূতি—চেনা-মুখ—প্রিয় মুখগুলি। নীতু এদের কেউ নয়। কোনোদিন, এখন আর নয়। নীতু আড্ডা মারতে আর আসে না কিন্তু নীতু আসবেই। এই কলকাতার উত্তপ্ত বুক থেকে ছিঁড়ে নিয়ে যাবে আমাকে। মাট-ঘাট ভেঙে আবার যাবো। নিয়তি। সরল চেহারা, নিরীহ চোখের ছেলেদের মুখ ক্রমশ কঠিন হয়ে যাবে। বদলে যাবে তাদের মুখ। চোখ বুজলেই দেখতে পাই নীতু বসে বসে ছুরি দিয়ে গাছের ডাল থেকে বাহুল্য ডাল পাতা কেটে ফেলছে। তার মুখে সাফল্যের হাসি।

নীতু আসবেই। যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ আমি কলকাতায় মগ্ন হয়ে থাকি।

ফেরার সময় মনোতোষ সঙ্গ নিল—মশাই, সেই স্টারডাস্টের ওপর খেলেননি তো ! আপসেট করে অনেক টাকা পাইয়ে দিয়েছে। খেললে ভাল করতেন।

হাসি। মনোতোষ গলা নামিয় বলে—ঐ পার্টি আবার পিছু নিয়েছিল নাকি।

—না।

—পুলিশে একটা রিপোর্ট করে রাখুন।

হঠাৎ মনে পড়তে প্রশ্ন করি—আপনার সেই ভাইটা, সে কি করে এখন ?

—কি জানি ? বোধহয় স্কুল-কলেজ বন্ধ করে বেড়ায়, দেয়ালে লেখে-টেখে। আমি ওর দিকে তাকাই না। বাবা তারকেশ্বর ভরসা।

আমি আস্তে করে বলি—মনোতোষবাবু, আপনি সেদিন আমার জন্য যা করেছেন তার তুলনা হয় না। কোনোদিন বুঝতে পারিনি তো আপনি আমাকে অতটা ভালবাসেন।

মনোতোষ থমকায় একটু, তারপর বলে—নেন্টুবাবু, আমরা কত বছর ধরে ঐ গাছতলায়, ফেবারিটে আড্ডা মেরেছি বলুন ! শাস্ত্রে আছে, দশ'পা একসাথে হাঁটলে

বন্ধু হয়, আর আমরা এত বছরে হইনি। বাইরে থেকে সম্পর্কটা যতটা আলগা দেখাক, ভিতরে ভিতরে বাঁধ পড়ে গেছে। দু'দিন একটা চেনা মুখ না দেখলে চিন্তা হয়। বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসি। এই কদিন আপনি ছিলেন না। কত বার খোঁজ নিয়েছি! ভাবি, ঐ গুণ্ডাগুলো বুঝি পেয়ে গেল আপনাকে। ঘরে স্ত্রী-পুত্র পরিবার, বাইরে আপনারা—এ ছাড়া আমাদের আছেটা কি? মনে ভাবি, যারা আছে তারা চিরকাল থাক কাছাকাছি, কেউ যেন দূরে না যায়, মরেটরে না যায়।

মনোতোষের গলা কেঁপে যায়। বলে—রথীন বিলেত চলে গেল, তুলসী গেল বোম্বাই—বুকের একটা দিক ঠিক ফাঁকা আছে ওদের জন্য। রাত-বিরেতে ঘুম ভেঙে গেলে আচমকে মনে পড়ে। শেষদিন পর্যন্ত মনে থাকবে।

আমি স্বপ্নোত্থিতের মতো হঠাৎ ফিস্ ফিস্ করে বলি—আমারও কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। যদি কেউ নিয়ে যেতে চায় তাকে ঠেকাতে পারবেন? আমি কোথাও যেতে চাই না—

মনোতোষ বিস্মিত গলায় বলে—কোথায় যাওয়ার কথা বলছেন? বাইরে চাকরি পেয়েছেন নাকি?

সামলে যাই। হেসে বলি—কিছু না। আপনি যান, আমি একবার আমার ভগ্নীপতির বাড়ি ঘুরে যাই।

পারুল দরজা খুলে চোখ বড় করে বলে—ওমা! ছোড়্দা!

ভীষণ চমকে যাই। চেয়ে থাকি। নন্দরাণী ঠিক এইরকম বলত। আশু হৈ হৈ করে তেড়ে আসে—মাইরি নেন্টুদা, বিয়ে করেছি বলে সত্যিই পর করে দিলে? কতকাল আসো না।

—দেখ, ছোড়্দা কি রোগা হয়ে গেছে!

ওরা সমস্বরে কথা বলতে থাকে। নন্দরাণীর ছবিতে বেলফুলের মালা। ধূপকাঠি জ্বলছে। ঘরটা সুগন্ধময়। মনটা হঠাৎ কেমন যেন ভাল হয়ে যায়। পৃথিবীতে বহুকাল বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে।

বললাম—দাবাটা পাড়ো আশুদা, একহাত খেলে যাই।

—পাড়ছি। পারুল, ডিম ভেজে আনো। ডবল।

পারুল বলে—রাতে খেয়ে যান না ছোড়্দা, আমার খুব শীগগির রান্না হয়ে যাবে।

সস্নেহে তার দিকে চেয়ে নন্দরাণীকেই দেখি, বলি—দূর পাগল! মা ভাত কোলে করে বসে থাকবে যে!

—তবে একদিন খাবেন কিন্তু। সামনের রবিবার মাংস রেঁধে রাখবো। এই, তুমি বলো-না ছোড়্দাকে।

—বলার কি আছে? শুনতে পাচ্ছে তো। পর বলে না ভাবলে আসবে ঠিক।

দাবার ছক পেতে দুজনে বসি। আস্তে আস্তে সব ভুলে যাই।

অনেক রাতে উঠি। আশু আর পারুল রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। বলে—পর করে দিও না নেন্টুদা। এসো। যা দিনকাল পড়েছে। মানুষগুলো কেমন ছিটকে

যাচ্ছে এদিক ওদিক। যারা আছি তারা মোয়ার মতো বেঁধে থাকবো—কি বল? বড়দা যে কোথায় গিয়ে কি করছে! এই বুড়ো বয়সে এসব……রোজ বড়দার কথা ভাবি—বুঝলে? বাবাকে বলো, শিগগির একদিন যাচ্ছি।

—পারুলকে নিয়ে যেও।

—সে আমি পারবো না, সে বড় লজ্জার।

—লজ্জার কি? তোমাকে সুখী দেখলে ওঁরা সুখী হবেন। যেও।

ওরা চুপ করে চেয়ে থাকে। আমার চলে-আসা দেখে। ওদের মুখে অকপট অপরাধবোধ। বড় মায়া হয়।

রাস্তাঘাট ফাঁকা ফাঁকা। হাঁটতে থাকি। মনে হয়, এই যে একহাত দাবাখেলা, পারুলের স্নেহ, মনোতোষের সঙ্গে গাছতলায় বসা, কলকাতার রাস্তায় একটু ঘুরে বেড়ানো— এর বেশি আমি কিছু চাই না।

কিন্তু নীতু আসবে। আসবেই।

মালাদের ঝুল-বারান্দায় একটা সবুজ আলোর আভা এসে পড়েছে। মালার ঘরে সবুজ পর্দা উড়ছে হাওয়ায়। মৃদু তানপুরার শব্দ ছড়িয়ে যাচ্ছে এদিক ওদিক। কৃষ্ণচূড়া গাছটায় এখনো পাতা নেই। শুকনো ডালপালা অন্ধকারে ভিখিরির হাতের মতো এদিকে ওদিকে বাড়ানো। চোখ নামিয়ে নিয়ে হাঁটি। গাও। তুমি গাও মালা। আমার কোনো দাবি-দাওয়া নেই। নীতু এসে নিঃশব্দে আমাকে নিয়ে যাবে।

রাতে শোওয়ার আগে দরজা বন্ধ করে পিস্তলটা বের করি। তার গুলির প্যাকেট। টেবিলে পাশাপাশি সাজিয়ে চেয়ে থাকি। আলোয় জাপানী পিস্তলটা ঝিকমিক করতে থাকে। নীতু আমাকে বলেছিল, গুলি ভরে রেখো। আমার ইচ্ছে করে না। এখনো শিশুর খেলনার মতো নিষ্পাপ, মেয়েদের গয়নার মতো সুন্দর। যতক্ষণ গুলি ভরা নেই, ততক্ষণ। পিস্তলটার সৌন্দর্য নীতু হয়তো কখনো লক্ষ্য করেনি।

বারান্দায় এসে দাঁড়াই। হঠাৎ চমকে উঠি—ওধারে একজন কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। পরমুহূর্তেই হেসে এগিয়ে যাই। বস্তাটার গায়ে হাত রাখি। আদর করে বলি—মক্কেল, বুড়ো হয়ে গেছ। তোমার খোরাকি জোটে না। বলে হাত বুলোই বস্তাটার গায়ে। বস্তাটা নড়ে। খুব আস্তে আস্তে দোলে।

রেলিঙে ঝুঁকে চেয়ে দেখি। মালার ঘরে সবুজ আলো জ্বলছে। কেউ নেই। না, আছে। ছায়ার মতো, মৃদু আলোর আভা তার গায়ে পড়েছে। আবছা শরীর ঝুঁকে আছে রেলিঙের ওপর। মালা একা। কি দেখছে মালা? কি ভাবছে? বোধহয় গান। শ্বাস ফেলি। দুটো বারান্দার মধ্যে অন্তহীন শূন্যতার ব্যবধান।

কলকাতার মেয়াদ ক্রমে ফুরিয়ে আসছে। নীতু আসবে। পাঁচ-ছটা দিন কলকাতায় কেটে গেল। আমি কৃপণের মতো দিন গুনি। যেন প্রবাসী ঘরে ফিরে ছুটির হিসেব করে।

সকালে বাবা খবরের কাগজ পড়ছেন বারান্দায় বসে। আমাকে ডেকে বললেন—দ্যাখ তো নেনটু, এই নম্বরটা, সি না জি।

উঁকি দিয়ে দেখি, পশ্চিমবঙ্গ লটারীর ফল।

বললাম—সি দুই দুই তিন···

—তাহলে হল না। আমারটা জি সিরিজ, নম্বরটা প্রায় লেগে গিয়েছিল।

হাসতে থাকি। সেই সময়ে খবরের কাগজে একবার চোখ ঘুরে এল। মনে হল, একটা নাম যেন দেখলাম। নামটা আমার চেনা। খুঁজে দেখতে থাকি। পেয়ে যাই। হাঁসখালি—এই তো হাঁসখালি। খবরটা ছোট্ট, ভাল কিছু বোঝা যায় না। হাঁসখালিতে একজন খুন হয়েছে। জোতদার।

মনে ভেসে আসে ঝক্‌ঝকে হ্যারিকেন, তার পাশে হারুর মুখ। জ্যাঠামশাই গম্ভীর গলায় ডাকেন—হারু···। সেই ডাকের সঙ্গে ও যেন সুতো দিয়ে বাঁধা। তটস্থ হয়ে উঠে যায়। কিছু ডালপালা ছিল হারুর—নিরীহ ভাব, সরলতা, বাড়ির সঙ্গে সুতোর টান। সেগুলো ছেঁটে দিয়েছে নীতু।

পরদিন জপুরের খবর বেরোয়। আমি আর খবরের কাগজ দেখি না।

পিস্তলটা গুলি ভরে রাখতে বলেছিল নীতু। থাকগে।

বালির বস্তাটায় অনেক কাল ঘুঁষি মারা হয় না। বস্তাটা স্থির হয়ে ঝুলে থাকে। ঘুঁষি মারতে ইচ্ছেও করে না। দুটো নগ্ন হাতের চেয়ে অনেক ভাল অস্ত্র আমার রয়েছে। নীতুর দেওয়া পিস্তল। ঘুঁষি মেরে কি হবে?

গাছের বাঁধানো চত্বরে আড্ডা মারি। আশুর সঙ্গে দাবা খেলি। রাত করে ফিরি। সময় কেটে যায়। আবার কাটেও না। নীতু তো আসবেই।

আসে ঠিক। রাত এগারোটা তখন। বাড়িতে ঢুকবো, কোথা থেকে এসে পিঠে হাত রাখে নীতু। মুখ ফেরাতেই হেসে বলে—কাল চলো নেন্‌টু।

—কোথায়?

—কাল বলবো। সকালে হাওড়া থেকে গাড়ি ছাড়বে।

বলে হাসতে থাকে। কী সুন্দর হাসি ওর। সাদা দাঁত। কী সুন্দর গলার স্বর। যদি গলা ছেড়ে আবৃত্তি করে—এবার ফিরাও মোরে···তাহলে কান ভরে শুনতে ইচ্ছে করবে।

নীতু গলা নামিয়ে বলে—তোমার একটা উপকার করেছি।

—কি?

—বাবু খতম।

বিশ্বাস হয় না। বলি—কবে?

—কাল। আমার বন্ধুর পিছনে কেউ খামোকা সময় নষ্ট করে—এটা ঠিক না।

কৃতজ্ঞতায়, নাকি ভয়ে আমি তার সামনে নুয়ে পড়ি।

খড়্‌গপুর থেকে বাস। নারায়ণগড়ে নেমে আবার পথ হাঁটি। হাঁটতে থাকি। নীতুর পথ ফুরোয় না। এক-এক জায়গায় থামে। নাম বলে। ছেলেরা জুটে যায়। মিটিং চলতে থাকে। আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম ভেঙে উঠে দেখি—মুখগুলো পালটে গেছে। নীতু হাসে। সাফল্যের হাসি।

গভীর রাতে স্বপ্ন দেখি। আমাদের কলকাতার বাসার বারান্দায় অন্ধকারে কে যেন ফাঁস দিয়ে ঝুলে আছে। ঘুমের মধ্যে শব্দ করতে থাকি। কে? লোকটা কে? বাবা? বড়দা? নাকি ছোড়দা? চীৎকার করতে থাকি। নীতু আমাকে ঠেলে তুলে দেয়—কি হয়েছে?

—ওঃ নীতু, স্বপ্ন···

নীতু হাসে—স্বপ্ন? কিসের?

—একটা বালির বস্তা। তাতে আমি ঘুঁষি মারতাম।

নীতু খস্ করে সিগারেট ধরায়। বাঁশের ঘরে বাতাসের নানা শব্দ হয়। মাটির নীচে ইঁদুরের যাতায়াত। বাইরে ঝিঁঝি ডাকে। শিয়াল কাঁদে দূরে। নীতু হঠাৎ অস্ফুট গলায় কবিতা আবৃত্তি করে—কোনো এক বিপদের গভীর বিস্ময় আমাদের ডাকে। পিছে পিছে ঢের লোক আসে···

তারপর হঠাৎ থেমে যায়। শরীরের গভীর অন্ধকারে সব কবিতা ঢাকা দেয়।

॥ মঞ্জু ॥

একটু রক্তশূন্য দেখায় সুনুকে। আর কিছু বোঝা যায় না। খুব কাঁদে বোধহয় আড়ালে-আবডালে। চোখ ফোলা-ফোলা। মুখখানা ভার। কার জন্য কাঁদে? অনিন্দ্যর জন্য? নাকি পেটের যে অঙ্কুরটা নষ্ট হয়ে গেল—তার জন্য? যে-কারণেই হোক, ও কাঁদে। জিজ্ঞেস করলে স্বীকার করে না। আমার দিকে যখন তাকায় তখন দুচোখে কৃতজ্ঞতা ফুটে ওঠে। ছাদে বিকেলে যখন বেড়াই. তখন রোজই বলে—মঞ্জুদি তোমার জন্য বেঁচে আছি।

জিজ্ঞেস করি—শরীর কেমন বুঝিস্?

—একটু দুর্বল লাগে। আর কিছু না।

পৃথিবীতে কিছুই দাগ কাটে না। কত কিছু ঘটে আবার মুছে যায়। একখানা শ্লেটের মতো।

—সুনু!

—উঁ।

—সেই ছেলেটার সঙ্গে দেখা করিস নি?

—না। কি হবে দেখা করে?

—তবে এখন কি করবি?

—বলেছি তো, বি-টি পড়বো। মাস্টারী নিয়ে কোনো গ্রামে চলে যাবো। একা থাকবো। ঝিঁঝির ডাক বড় ভাল লাগে আমার। আর গাছপালা, প্রজাপতি, পুকুরের জল। জানো, আমি কখনো ডুব দিয়ে স্নান করি নি।

নার্স মেয়েটি রোজ আসে। তেমনি স্বচ্ছ মুখচোখ, চটপটে হাত-পা। মাঝে মাঝে আমার ঘরে ডেকে আনি। দুজনে চা খাই। সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসে। আমি তার দিকে তাকিয়ে হাসি।

একদিন দুপুরে সুনুর মা এলেন। সিঁড়ি ভেঙে উঠে হাঁফাচ্ছেন। বোঝা যায়

boiRboi.net

দৌড়ে এসেছেন প্রায়। হাতে একটা চিঠি।—মঞ্জু!

লক্ষ্মী মেয়ের মতো উঠে দাঁড়াই—আজ্ঞে।

—দ্যাখো কী কাণ্ড। ওরা সুনুকে পছন্দ করেছে।

—কারা?

—যারা দেখে গেল কদিন আগে, তুমি গিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলে। মনে নেই?

—ও।

—লিখেছে, শ্রাবণে বিয়ে। দু' হাজার টাকা নগদ, স্টিলের আলমারি আর দশ ভরি সোনা। পরশুদিন পাটিপত্র করতে আসছে। যেও। তোমার মাকে বলে যাই—

আনন্দে উদ্ভাসিত তাঁর মুখ। দৌড়ে তিনি মার ঘরে ঢোকেন।

—বেয়ান, ও বেয়ান—

বিকেলে সুনু আসে। ছাদে উঠে যাই দুজনে।

—সুনু!

—উঁ।

—কি করবি?

সুনু আঁচলটা তুলে মুখ ঢাকে। একটু কাঁদে।

তারপর আঁচল ফেলে দিয়ে বলে—কি করবো বলে দাও।

—কী বলবো?

সুনু বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলে—আমি এখনো তোমার ওপর নির্ভর করে আছি মঞ্জুদি। তুমি যা বলবে শুনবো।

—বিয়েটা কর।

সুনু চুপ করে থাকে। একটু পরে বলে—তুমি বলছো?

—বলছি।

ও মাথাটা নামিয়ে নিয়ে বলে—করবো।

আমি ওর কাঁধে হাত রাখি। কিন্তু মনে মনে হাসি। যদি বলতাম বিয়ে করিস না, অপেক্ষা কর। তাহলে কি হত?

সুনুর মুখটা ভার দেখায় ঠিকই। চোখ ফোলা-ফোলা। তবু ওর মুখে কোথা থেকে আজ এক শ্রী এসেছে। এই প্রথম কারো পছন্দ হল ওকে। এই প্রথম। পৃথিবীতে আর কোনো দুঃখ নেই এখন।

দুপুরে আমি গাড়ি নিয়ে রোজ বেরোই। কাচ তোলা থাকে। শহরটা জনহীন, নিস্তব্ধ বলে মনে হয়। আমার শ্বাসের শব্দ ওঠে। ভ্রমরের মতো গুন্ গুন্ শব্দ করে বিদেশী গাড়ি মসৃণ ছুটতে থাকে। দুপুরের গভীর বুকের মধ্যে চলে যাই।

এক-একদিন রাণুদের বাসার সামনে দিয়ে যাই। কাউকে দেখি না। বস্তাটা ঝুলে থাকে। নেন্টুকে আমি কেন ভয় করি? কেন? একদিন মুখোমুখি হলে জেনে নেবো। জেনে নিতে হবে।

কোথাও থামি না। চক্কর দিই। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় অকারণ ঘুরে মরে গাড়ি। আমার কোথাও যাওয়ার নেই। শুধু দুপুরের ধাঁধা ভেদ করতে চেষ্টা

boiRboi.net

করি। রূপোরঙের এক অপার্থিব পুরুষের মত ঘিরে আছে দুপুর। তার দহনজ্বালা। লোকে এই খর-দুপুরের নিন্দে করে। বলে, ফসল হল না। গাঁ ছেড়ে মানুষ শহরে যাচ্ছে ভিক্ষে করতে, কলেরা লাগছে, ভিখিরি বেড়ে যাচ্ছে শহরে। আমার সে সব কিছু মনে হয় না। কেবল মনে হয়, আমি এই খর-সূর্যের চিহ্নিত নারী। কী ভীষণ টান তার! ঘরে পাগল-নাচ-নাচায়, ঘর থেকে টেনে নিয়ে যায় কোথায় কোথায়! তার রূপোরঙ, তার জ্বালা, তার গভীরতার দিকে তেষ্টায় ঠোঁট বাড়িয়ে দিই, শরীর বাড়িয়ে দিই, সর্বস্ব দিয়ে দিতে চাই। সে নেয় না, ফিরিয়ে দেয়। গাড়িটা চক্কর খেয়ে ফেরে। তাই কোনো পুরুষই ঠিকঠাক পায় না আমাকে।

বিয়ের ক'দিন আগে অদ্রিরা এল। সঙ্গে রাণু। ওকে আর চেনাই যায় না। হাতে চুড়িগুলো ঢল ঢল করে, মুখখানা বুড়িয়ে গেছে। তবু দেখে হাসল। বলল—সুনুর বিয়ে মঞ্জু, কত আনন্দ! নারে?

মাথা নাড়ি।

ও দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

জিজ্ঞেস করি—তুই কেমন আছিস?

—ভালই। হ্যাঁরে মঞ্জু, এখনো আমি বারো বছর সধবা থাকবো! না?

—কি বলছিস?

ও চুপ করে থাকে। তারপর বলে—জানিস, আমার শ্বশুরের ফার্স্ট স্ট্রোক হয়ে গেল।

—তাই নাকি?

—হবে না? কত চিন্তা!

অদ্রি আর ঠিক সেই তরুণ প্রেমিকটি নেই। আবেগ উচ্ছ্বাস অনেক কমে গেছে। মুখে দুশ্চিন্তা। আমাকে একা ঘরে পেয়ে খানিক আদর করে বলল—তুমি বদলে যাচ্ছো।

—কি রকম?

—কী জানি! গোপনে প্রেম-ট্রেম করছো নাকি?

হেসে বলি—তুমি করছো না তো?

—সময় কই! প্ল্যাণ্টে অনেক কাজ। তারপর সত্যর জন্য ছোটাছুটি।

—ওঁকে পাওয়া গেল না?

অদ্রি অন্যমনে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করে। মাথা নেড়ে বলে—না।

—কি হবে?

অদ্রি হাসে—চিন্তা করে কি করবো মঞ্জু? চলো, এই শ্রাবণে সুনুর বিয়ে হয়ে গেলে, সামনের অগ্রহায়ণে আমাদেরটা সেরে ফেলি। বড্ড পুরোনো হয়ে যাচ্ছি।

আমি সায় দিয়ে মাথা নাড়ি।

boiRboi.net

তখনো রাস্তার জামাকাপড় খুলিনি, উপুড় হয়ে বাবার মুখ দেখলাম। নিভন্ত মুখ। মুখখানা লাল। চোখ বোজা।

মা বলে—কী যে ঝড় গেল!

বাবার বাঁ দিকটা পড়ে গেছে। অসাড়। চোখ চেয়ে আমাকে একবার দেখলেন। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

—সত্য কোথায়?

চুপ করে থাকি! বাবা চেয়ে থাকেন। চোখের জল গড়িয়ে নামে।

—তোমরা আমাদের কিছু দিলে না। নো পীস। তোমাদের জেনারেশনের কিছু দেওয়ার নেই?

আমি ঝুঁকে বলি—কি দেবো বাবা?

বাবা ডান হাত বাড়িয়ে আমার হাতটা ধরেন—আর কিছু না হোক, অন্তত কাছে থাকো। দূরে যেও না। চলে যেও না। বড় একা লাগে।

চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। কুমুদবন্ধু রায়ের ছেলে কদমসুন্দর শুয়ে আছে। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে দেখছে একটা দূর নৌকোর মাস্তুল ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে। সামনে এক মহাপৃথিবী।

কিন্তু নীতু আসবে। আসবেই। তাই বাবাকে কাছে থাকবো বলে কথা দিতে পারি না।

ঠিক আগের মতোই আড্ডা বসে গাছের নিচে, চত্বরে। সেখান থেকে উঠে যাই আশুর বাসায় দাবা খেলতে। পারুল ঠোঁট ফুলিয়ে বলে—এলেন না তো! কী সুন্দর মাংসটা রেঁধেছিলাম। আশু নতুন চালে মাৎ করে আমাকে। রাত বাড়ে। মালার ঘরের তলা দিয়ে বাসায় ফিরি। কৃষ্ণচূড়া গাছটায় আজও পাতা আসেনি। কিন্তু মালার ঘরের পর্দা হাওয়ায় উড়লে একটা সবুজ আলো এসে পড়ে শুকনো গাছটার গায়ে। গাছটা সবুজ বলে ভ্রম হয়। ছোড়দা ঠিক পড়ে যায়। অনেক রাত পর্যন্ত। বারান্দায় স্থির হয়ে ঝুলে থাকে বালির বস্তাটা। পিস্তলে আজও গুলি ভরা হয় নি। রাতে বাতি জেলে চেয়ে থাকি। তার সৌন্দর্য দেখি।

নীতু আবার আসবে।

সকালে বৌদি আসে। অদ্রির গাড়ি থামে। ওরা নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসে। কোন হৈ-হৈ হয় না।

বাথরুম থেকে বেরিয়েই ওদের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। বৌদিকে চেনাই যায় না। এত রোগা হয়ে গেছে। কপালে আর সিঁথিতে ডগ্‌ডগ্ করছে সিঁদুর। এত সিঁদুর বৌদি কখনো পরত না। আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই বৌদির ঠোঁট কাঁপল।

—নেন্টু, বাবা?

—ভাল আছেন। ঘরে যাও।

boirboi.net

মিনু কোলে আসতে লজ্জা পায়।

—চিনতে পারিস মিনু? বল তো আমি কে?

মিনু মুখ লুকিয়ে বলে—ছোটো কাকা তো!

বুবলা অবাক চোখে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন সে এ বাড়িতে কখনো আসেনি। কোলে নিই। সে আমাকে চিনতে পারে না। কেঁদে ওঠে।

অদ্রির দিকে তাকাতেই হঠাৎ মঞ্জুর কথা মনে পড়ে। মঞ্জু বড় সুন্দর। না, আমি মঞ্জুর কথা অদ্রিকে বলবো না।

অদ্রি ম্লান হাসে—নেনটু, রোগা হয়ে গেছ।

—তুমিও।

দু-একটা কথা হয়।

বিকেলেই নীতু আসে।

—নেনটু, কাল খুব ভোরে ট্রেন, শিয়ালদা থেকে। আমি ভোরে আসবো।

—এবার কোথায়?

—বলবো। গাড়িতে।

হাসে। সুন্দর দাঁত ঝিকিয়ে ওঠে। রোদে পুড়ে গেছে ওর মুখ। চোখের চারদিকে কালি। তবু হাসিটা এখনো অমলিন।

মাথা নাড়ি।

অনেক রাত পর্যন্ত বৌদির সঙ্গে গল্প হয়। মিনু বুবলা ঘুমিয়ে পড়েছে। ছোড়দা পড়ছে। আমরা বারান্দায় বসে থাকি। রাতের দিকে একটু শিরশিরে বাতাস দেয়। মশা ওড়াউড়ি করে।

বৌদি ডাকে—নেনটু ভাই!

—উঁ।

—আমার কি হবে বলো তো!

—কি হবে?

—তোমার দাদা যদি না-ই ফেরে, বড় ঠাকুরপো যদি আলাদা হয়েই যায়, তবে কোথায় যাবো? ওই দুটো বাচ্চা। ওদের মানুষ হতে কত দেরি! নেনটু ভাই কী হবে বলো তো!

চুপ করে থাকি।

বৌদি আস্তে আস্তে বলে—যখন বিয়ে হয়ে এ বাড়িতে এলাম তখন তোমরা কত পর ছিলে। কিন্তু পাঁচ বছরে একটু একটু করে কখন এ বাড়ি আমার আপন হয়ে গেছে। যদি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়—

বৌদি কাঁদে।

ধমক দিই—কাঁদচো কেন?

বৌদি মুখ তুলে বলে—আমাকে কখনো তাড়িয়ে দিও না—দেখো—

boiRboi.net

ভোরবেলা নীতু এসে ডাকে। তখনো সবাই ঘুমে।

পোশাক পরে, ব্যাগ কাঁধে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাই। সদর খুলে রাস্তায় পড়ি।

খুব ভোর। আলো ফোটেনি। কুয়াশার মতো একটা ভাপ চারদিকে। আবছা কলকাতার আকাশ-রেখায় একটা তারা জ্বলে। আমরা নিঃশব্দে রাস্তা পার হই। একটু হাঁটলে দেশপ্রিয় পার্ক। আমরা পার্কে ঢুকে যাই। আড়াআড়ি রাসবিহারীর দিকে হাঁটতে থাকি। নীতু সিগারেট জ্বালিয়ে নেয়। আগে আগে হাঁটে। মুখ ফিরিয়ে বলে—তাড়াতাড়ি হাঁটো নেন্টু। দেরি হয়ে যাবে।

আমি তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারি না। ঘাসে শিশির পড়েছে। ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যায়। কত লোক এখনো ঘুমে। পৃথিবী কী শান্ত! নিরালা। আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। আমার ইচ্ছে করে, ফিরে গিয়ে আর একটু ঘুমোই। বেলা হলে উঠবো। চা খাবো। খবরের কাগজ পড়বো। মিনু এসে পিঠে ঝুলবে। বুবলা মুড়ির বাটি নিয়ে বসবে বারান্দায়—দেখবো। ওর মুখটা বড়দার মতো হয়েছে। এরকম কত কি করার কথা মনে পড়ে। যেতে ইচ্ছে করে না। কেন তোমার সঙ্গে যাব নীতু? কেন যাবো? বাবুকে খতম করেছ বলে? আমার হাতে একটি মহার্ঘ পিস্তল দিয়েছো বলে? দেখ, পিস্তলে আজও আমি কার্তুজ ভরিনি।

আমি ধীরে পিস্তলটা টেনে বের করি। নীতু আগে আগে হাঁটছে। এক ঝলক সিগারেটের ধোঁয়া উড়ে আসে। আমি পিস্তলটা তুলি। চলন্ত নীতুর মাথার দিকে লক্ষ্য স্থির করার চেষ্টা করি। কেন নীতু, তুমি শক্তিমানের মতো এসে দাঁড়াও, আর আমি মাথা নুইয়ে তোমার পিছনে পিছনে চলে যাই? কি আছে তোমার? কি করে মানুষকে যাদু কর তুমি? হারু তার জ্যাঠামশাইয়ের গম্ভীর ডাক শুনতে পায় না আর। মানুষের কাছ থেকে তুমি কেড়ে নাও সব—তার সর্বস্ব। ছেলেরা সম্মোহিত হয়ে যায়। জপুর, হাঁসখালিতে খুন হতে থাকে, কলকাতায় লাশ পড়ে। বন্দুকের শব্দে পাখিরা বাংলাদেশ ছেড়ে উড়ে যায়। কে তোমার কবিতা কেড়ে নেয়? কেড়ে নেয় বাঁচবার সাধ? তুমি কে? আমি যাবো কেন নীতু? আমি যাচ্ছি কেন? কে তোমাকে এমন শক্তিমান করেছে?

পিস্তলটা ওর মাথায় স্থির থাকে না। নলের মাছিটা অবিকল আসল মাছির মতো ওর মাথা থেকে উড়ে উড়ে বসে। স্থির হয় না। স্থির থাকে না। নীতু মুখ ঘোরায়। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ে। চিৎকার করে বলে—নেন্টু কি করছো?

আমি বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে থাকি। কী করছি তা বুঝতে পারি না। কিন্তু কিছুতেই বলতে পারি না যে পিস্তলটা ফাঁকা। ওতে কার্তুজ নেই। ভরা হয় নি।

—রাস্কেল! বলে বুকফাটা চিৎকার করে নীতু অন্ধের মতো তেড়ে আসে। বাধা দিই না। নীতু এক ঝটকায় পিস্তলটা কেড়ে নেয়।

আমি আস্তে আস্তে বলি—গুলি ছিল না।

নীতু পিস্তল তুলে দেখে। তারপর আমার দিকে চায়। ওর চোখে গভীর ক্লান্তি আর অনিদ্রার একটা গাঢ় কালো ছোপ পড়েছে। সেই কালোর ভিতরে ওর চোখদুটো

গগ্‌লস পরা মানুষের চোখের মতো রহস্যময় দেখায়। বুঝতে পারি ওর সন্দেহ এসে গেছে। অবিশ্বাস। ভয়।

ও হাঁফ-ধরা গলায় বলে—গুলি ছিল না তো এটা দিয়ে কি করছিলে?

আমি আস্তে বলি—গুলি থাকলেই আমি কি করতাম?

ও ভয়ঙ্কর চোখে আমার দিকে চায়। কিন্তু আমি ভয় পাই না। চেয়ে থাকি। ও বলে—নেন্‌টু, আমাকে নিয়ে খেলা কোর না।

হঠাৎ অনেকদিন বাদে আমার শরীর জ্বালা করে ওঠে। শরীরে রোমকূপ শুঁয়োপোকার মতো কাঁটা দেয়। দীর্ঘ ছিপ নৌকোয় বসে থাকা এক দীর্ঘকায় শীর্ণ প্রেতচক্ষু মানুষটিকে মনশ্চক্ষে দেখি। কোন অতীত থেকে স্যাণ্ড ব্যাগে ঘুঁষির মতো শব্দ ভেসে আসতে থাকে। রিংয়ের ওপরে ঝোলানো আলোগুলো জ্বলে যায়। প্রতিপক্ষ মাথা নিচু করে, গ্লাভসের আড়ালে দুই ক্রূর চোখে চেয়ে এগিয়ে আসে।

নীতুর মুখ ঘেন্নায় বেঁকে যায়। যাদুকর যেমন সম্মোহনের আঙুল নাড়ে, তেমনি আঙুল নেড়ে সে চাপা গলায় বলে—কি করছিলে? ওয়াজ দ্যাট এ রিহার্স্যাল?

বুঝতে পারি, আর নীতু বিশ্বাস করবে না। ও স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে, আমি ভয় পাচ্ছি না। আমার ওপর থেকে ওর সম্মোহন কেটে গেছে। ও তাই এগিয়ে আসে। ভুলে যায়, আমি জাতীয় চ্যাম্পিয়ানশিপের জন্য মনোনীত মুষ্টিযোদ্ধা ছিলাম।

খুব ক্লান্ত লাগে। তবু এক পা বাড়িয়ে আমি বাঁ হাতে ঘুঁষিটা মারি। চকিতে! নীতুর ছবিটা ভেঙে পড়ে যায়। আমার পায়ের কাছে পড়ে আছে ওর স্ট্যাচু। ঘুরে ছুটতে থাকি।

শিস্‌ দিয়ে ছুটে আসে নীতুর সীসে। পড়ে যাই। কোথায় লাগে ঠিক বুঝতে পারি না। আবার উঠি। ছুটতে থাকি। আর গুলির শব্দ হয় না।

একটু ডেটল লাগিয়ে দিই উরুতে। ছেঁড়া ন্যাকড়া জড়িয়ে নিই। ব্যস, মিটে যায়। বেরোবার সময়ে একবার পাড়ার ডাক্তারের কাছে যাবো।

বারান্দায় বসে চা খাই। খবরের কাগজ পড়ি। মিনু এসে পিঠে ঝুল খায়। অদূরে মুড়ির বাটি নিয়ে বসে বুবলা কাক-শালিক-পায়রা দেখে ডাকে। আমি চেয়ে থাকি। অনেকদিন বাদে বাড়িটা ভর-ভরন্ত লাগে।

ছোড়দা অফিসে বেরোনোর আগে গিয়ে বলি—মাংস আনবো। টাকা দিবি?

ছোড়দা একটু তাকিয়ে থেকে আবার মোজা পরতে নিচু হয়ে বলে—টেবিলের টানায় আছে। নিয়ে নিস্‌। আগে একদিন চেয়েছিলি, নিসনি তো। এসে দেখি, টাকা রয়ে গেছে।

উত্তর দিই না। একটু হাসি। ড্রয়ার থেকে দশটা টাকা বের করে ছোড়দার দিকে তাকাই। ও শার্ট গুঁজছে প্যাণ্টে। একটা চুলের ঘুরলি এসে দুলছে কপালে। বড় সুন্দর দেখায় ওকে।

boiRboi.net

॥ মঞ্জু ॥

সুনুকে সুন্দর দেখাচ্ছে আজ। সারা বিকেল ওকে সাজিয়েছি। যত্নে, একটু একটু করে। ধমকে বলেছি—খবর্দার, কাঁদবি না। চোখের জলে সব ধুয়ে যাবে।

ও কাঁদেনি। সেজেছে।

কদিন ধরে ঝেঁপে বৃষ্টি হচ্ছে। একটু থামে, আবার আকাশ কালো করে আসে। রেলিঙ থেকে ঝুঁকে দেখি, রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গেছে। আজ বৃষ্টিটা বড্ড বেশি। খরার শোধ তুলে নিচ্ছে। বর আসবে দমদম থেকে। আসতে পারবে তো! যা জল! আমাদের দুটো গাড়ি গেছে, আর গেছে অদ্রির গাড়ি। নিয়ে আসবে ঠিক। ছাদ থেকে মাংসের গন্ধ আসছে। মাইক্রোফোনে বিসমিল্লার সানাইয়ের রেকর্ড শেষ হয়ে এল। বৃষ্টির ছাট উড়ে এসে গুঁড়ো গুঁড়ো মুখে লাগে, চুলে লাগে। একটু দাঁড়িয়ে থাকি। আমার এখনো সাজ হয় নি। যাই।

সানাইয়ের আর একটা রেকর্ড চাপিয়ে দিই। রাণু ডেকে বলে—মঞ্জু, যা বৃষ্টি। কেউ আসতে পারবে না দেখিস।

—আসবে ঠিক।

—নেন্টুকে গয়না আনতে পাঠিয়েছি। সেও তো এখনো এল না। স্যাকরাটা কী যে করছে। সব সময়ে শেষ মুহূর্তে দেবে।

—রাণু, তুই এখনো সাজিসনি ?

—সাজবো, ছেলেটাকে খাওয়ালাম।

—যা, একটু সেজে নে।

—কী পরবো বল তো!

—আয় না, তোকেও সাজিয়ে দিই।

রাণু হাসে। বলে—দূর মুখপুড়ি, তুই তো আগুনে সাজ সাজাস। আমার কি ওসব মানায়! সুনুর বিয়ে—কতকাল পর একটা অনুষ্ঠান—তাই একটু সাজবো। কিন্তু সে একটুখানি। তুই যা, সেজে আয়। নেন্টুটা এখনো এল না।

—কি গড়াতে দিয়েছিস ?

—বেশি কিছু না। এক জোড়া ঝুমকো। নিজেরই পুরোনো গয়না ভেঙে··· একটু থামে রাণু, অন্যমনস্কভাবে বলে—যদি দিন ফেরে তো সুনুকে আবার দেবো। একটা নেকলেস দেওয়ার কথা ছিল···

সাজতে আমার আজ ভাল লাগছিল না। একটা লাল রঙের সেট বের করে রেখেছিলাম। সেটা আবার ওয়ার্ডরোবে তুলে রাখি। ক্রীমরঙা একখানা শাড়ি পরে নিই। অল্প একটু স্নো-পাউডার, একটু কাজলের ছোঁয়া। ব্যস, সাজ হয়ে যায়।

সানাই থেমে গেল। বর এসেছে কি ?

উলুর শব্দ। শঙ্খ বাজছে। এসে গেল ওরা।

সাত পাক হয়ে গেল। বরকনে ছাদে চাঁদোয়ার নিচে বসে গেছে। মন্ত্র পড়াচ্ছে

boiRboi.net

পুরুত। সেই ভীড়ে উঁকি দিয়ে একবার সুনুর মুখখানা দেখি। না, কিছু বোঝা যায় না। মুখের সাদা ভাবটা ঢাকা পড়েছে। কোনো ছাপ নেই। প্রথম পুরুষ-স্পর্শের লজ্জা ওর কুমারীর মতো মুখখানা নুইয়ে রেখেছে। না, কিছু বোঝা যায় না। একটা নিশ্চিন্তির শ্বাস ফেলি। বরটা একটু রোগা হল কি সুনুর? একটু কালো? তা হোক। মুখখানায় কোনো কুটিলতা নেই। চোখ সরল। একটু লাজুক ভাব। ওরা মিলেমিশে যাবে—মনে হয়।

ভীড় থেকে রাণু হাত ধরে টেনে আনল—এ কি সাজ করেছিস মুখপুড়ী?

—আজ সাজতে ভাল লাগছিল না।

—কেন রে?

—এমনিই। রাণু, তোর বর ফিরে এলে তোদের আবার বিয়ে দেবো। তোর বরকে বলবো—বিয়েটা ঠিকমতো করেন নি মশাই, মন্ত্র ভুল পড়েছিলেন, তাই এত ঝামেলা। তোর বরের সঙ্গে তোর বিয়ে দেবো আবার, সেদিন সাজবো।

—দিস্। বলে রাণু হাসে। তারপরই চোখ ছল্‌ছল্ করতে থাকে। বলে—যদি সত্যিই ফেরে তবে তোকে একটা নেকলেস দেবো মঞ্জু।

—দিস।

রাণু হঠাৎ হাসতে থাকে—কত লোককে কত কী দেবো বলে ঠিক করে রেখেছি, কত মানসিক। ডাবের জল আর দুধ দিয়ে সধবার মুখ ধোয়াবো, কুমারী ভোজন করাবো···কত কী!

রাণুর কাছ থেকে চলে আসি। ভীড়ের মধ্যে একবার অদ্রির সঙ্গে চোখাচোখি হয়। লক্ষ্মৌ চিকন্‌-এর কাজ করা পাঞ্জাবী পরেছেন বাবু, ফিনফিনে ধুতি। মারাত্মক দেখাচ্ছে। একবার চোখ নাচায়। পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময়ে বলি—মেয়ে-মহলে বেশি ঘুরো না, বঁড়শী আটকাবে।

ও হাসে। হাত ধরবার চেষ্টা করে। পিছলে যাই।

—কি হল?

—অগ্রহায়ণে।

ও হাসে—খুব ব্যস্ত?

—একটু। রিহ্যার্সাল দিচ্ছি।

সিঁড়ির মাথা থেকে সদরটা দেখা যায়। সদরের ওপাশে ফুটপাথ বৃষ্টিতে সাদা হয়ে যাচ্ছে। কল্‌কল্ করে ছুটছে জল। সেই জলে কালো কালো আবছা কয়েকজন ভিখিরি কোলকুঁজো হয়ে বসে আছে। নড়ছে না। বাতাসে ম্যারাপের বাঁশ মড়মড় শব্দ করে। ফটাশ করে আলগা ত্রিপলের শব্দ হয়। বিসমিল্লার সানাই শেষ হয়ে আসে। আবার শুরু হয়। সদর পার হয়ে কালো লম্বা একজন লোক উঠে আসছে। গায়ের বর্ষাতি খুলতে খুলতে সিঁড়িতে পা দিল। তার মাথা ভিজে গেছে, জামা ভেজা, প্যান্টেও ছোপ ছোপ জলের দাগ। মুখটা অন্যমনস্ক। সিঁড়ি ভেঙে আস্তে আস্তে ওঠে।

পানের রেকাবটা একটা চলন্ত মেয়ের হাতে দিয়ে দিই। সিঁড়ির মুখটাতে

দাঁড়াই। দেখা হয়।

—ভিজে গেছেন।

—ও কিছু না।

—দাঁড়ান, একটা তোয়ালে আনি। বর্ষাতিটা আমার হাতে দিন।

ও চোখে চোখ রাখে না। লজ্জা পায় বোধহয়। বর্ষাতিটা দিয়ে মৃদুস্বরে বলে—বৌদিকে একবার ডেকে দেবেন ?

—দিই। আগে মাথাটা মুছে নিন। মাথায় জল বসা ভাল না। আসুন।

আমার পিছু পিছু বাধ্য ছেলের মতো আসে। আমার বুক কাঁপতে থাকে।

ভিতর বাড়ির এক কোণে দাঁড়িয়ে ও মাথা মোছে। গা মুছে নেয়। চিরুনি এনে দিই। চুল একটু পাট করে। মুখটা অনেক রুক্ষ হয়ে গেছে। রোদে পোড়া চামড়া। কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে আছে। চিরুনিটা ফিরিয়ে দিয়ে একটু ইতস্তত করে। কি একটা বলবে-বলবে করে। বলে না।

মুখ টিপে হাসি। বলি—রোগা হয়ে গেছেন কেন ?

—ও এমনিই।

আর কিছু বলে না। আমিও বলি না। দুজনের মধ্যে একটা নিস্তব্ধতার বলয় তৈরী হয়। মানুষে মানুষে কতরকমের সম্পর্ক তৈরী হয়। ভালবাসার, ঘেন্নার, প্রতিশোধের। এ সবের বাইরেও বোধহয় আর একরকমের সম্পর্ক আছে। সেটা কেমন তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। কিন্তু আছে। আমি টের পাই।

কেউ কোন কথা বলি না। এক ভীড় মানুষ কাছ ঘেঁষে যাচ্ছে, আসছে। তার মধ্যেই কয়েক মুহূর্তের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থেকে আমি সম্পর্কটা অনুভব করি। অন্যমনে মুখ টিপে হাসি। নেন্টু একপলক আমার মুখ দেখে। চোখ নামিয়ে নেয়। তারপর মৃদু হাসে।

বলি—দাঁড়ান, রাণুকে ডেকে দিচ্ছি।

সেই রাণুর বিয়ের দিনের মতো অদ্রি মাংসের বালতি নিয়ে এগিয়ে আসছে। নেন্টুর পাতের কাছে এসে দাঁড়াল। দুজনে চোখাচোখি। দুজনেই হাসে। বন্ধুত্বের হাসি।

—বেশি দিও না অদ্রি। আমি মাংস ভালবাসি না।

—আরে খাও, না খেলে ছাড়বো নাকি ?

নেন্টু হাসে—পাতে পড়ে থাকবে। লোকসান।

—হোক।

আমি ছাদ থেকে নেমে আসতে থাকি।

boiRboi.net

॥ সোমসুন্দর ॥

বৃষ্টিটা ধরল না। পড়ছে তো পড়ছেই।

আমি বর্ষাতি গায়ে রাস্তায় নামি। চটিসুদ্ধ গোড়ালি জলে ছপ করে ডুবে যায়।

বৃষ্টির ফোঁটা বর্ষাতির গায়ে ডুগডুগির মতো বাজতে থাকে। অদ্রি গাড়ি করে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল। আমি রাজি হইনি। এখন তো বৃষ্টি প্রায়ই হবে। একদিন গাড়িতে গিয়ে লাভ কি? বৃষ্টি হবে, ঝড় হবে, খরার সূর্য পোড়াবে চারদিক। আমাকে তো তবু বেরোতে হবেই।

বৃষ্টি মনের আনন্দে পড়ছে তো পড়ছেই। জলে মাটিতে গভীর ভালবাসার শব্দ হয়।

একটা অন্ধকার শো-কেস-এর পাশে লম্বা একজন ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। চমকে উঠি। নীতু না?

না নীতু নয়। আমি আবার হাঁটি। আপনমনে হাসি। ভয় কি নেন্টু? এ তো জানা কথা যে, হয়তো আবার পুলিশ আসবে। বার বার সার্চ করবে বাড়ি। তোমাকে নিয়ে যাবে হয়তো বা। বাবু নেই, দিলীপ রয়েছে। তার দলবল ঘুরছে কলকাতায়। নীতুর গুলি ফসকেছে কিন্তু সেও আসবে। চারদিকে কোথাও তোমার জন্য কোনো নিরাপদ জায়গা নেই। খোলা রাস্তায় তোমাকে বেরোতো হবেই। তাতে ভয় কি নেন্টু? এসব তো ঘটেই। এরকম তো হয়।

হয়। জীবন এরকমও হয়। আবার অন্যরকমও হয়। নানা রকমের। আমি আমারটা যাপন করছি। ভয় কি?

চারদিকে বৃষ্টির ঘেরাটোপ। বোধহয় রাত বারোটা বেজে গেছে। লোকজন নেই। গাড়ি নেই। জলে কলকাতার প্রতিবিম্ব ভেঙে ছড়িয়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা হয়ে আসে মাটি। আমার শীত করে। বর্ষাতিটার সব বোতাম নেই। ভিজে যাচ্ছে গা। হু-হু হাওয়া দিচ্ছে। তবু হাঁটতে থাকি।

হাঁটতে তো হবেই।

boiRboi.net

ফেরিঘাট

boiRboi.net

সিঁড়ির তলা থেকে স্কুটারটা টেনে নিয়ে রাস্তার পাশে ফুটপাথ ঘেঁসে দাঁড় করাল মধু, তার হাতে পালকের ঝাড়ন। মুছবে। মুছলেও খুব একটা চকচকে হয় না আজকাল। রঙটা জ্বলে গেছে, এখানে ওখানে চটা উঠে গেছে। বেশ পুরনো হয়ে গেল স্কুটারটা।

জানালা দিয়ে নীচের রাস্তায় স্কুটারটা একটুক্ষণ অন্যমনে দেখল অমিয়। বহুকালের সঙ্গী। মায়া পড়ে গেছে। কল্যাণ তিন হাজার টাকা দর দিতে চেয়েছিল। জিনিসটা ইটালীয়ান বলে নয়, মায়া পড়ে গেছে বলেই বেচেনি অমিয়। তা ছাড়া একবার বেচে দিলে নতুন আর কেনা হবে না। অমিয়র দিন চলে গেছে।

মুখ ফিরিয়ে অমিয় টেবিলে সাজানো একপ্লেট টোস্ট, একটা আধসেদ্ধ ডিম, এক গ্লাস দুধ, নুন-মরিচের কৌটো, চামচ—এসব আবার দেখে। সকাল আটটা কি সোয়া আটটা এখন। সাড়ে আটটায় সে রোজ বেরোয়। বেরোবার আগে সে রোজ টোস্ট ডিম নুন-মরিচ দিয়ে খায়। দুধ পান করে। আজ কিন্তু খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখতেও তার অনিচ্ছা হচ্ছিল। খিদে নেই। বমি-বমি ভাব। রাতে ভাল ঘুম হয় নি, বার বার উঠে সিগারেট খেয়েছে। সকালে অনেকক্ষণ স্নান করেছে চৌবাচ্চা খালি করে। তবু শরীর ঠিকমত ঠাণ্ডা হয় নি। খাওয়ার কথা এখন ভাবাই যাচ্ছে না।

টেবিলের ওপাশে মুখোমুখি রোজকার মত হাসি বসে নেই। শোয়ার ঘরের দরজায় হাসি দাঁড়িয়ে আছে। কাল রাতে হাসিও বোধহয় ঘুমোয়নি। ঘুমোলে যে ছোট ছোট অবিরল শ্বাস পড়ে ওর, সেই শব্দ তো কৈ শোনে নি অমিয়। বেত আর বাঁশ দিয়ে তৈরী ভারী সুন্দর একটা খাট শখ করে কিনেছিল হাসি, যখন অমিয়র সুদিন ছিল। পুরনো বড় খাটটা বেচে দিয়ে অমিয় কিনে নিল একটা সোফা-কাম-বেড। সেই থেকে দুজনের বিছানা আলাদা। বেতের খাটে হাসি, সোফা-কাম-বেডে অমিয়। সেইটাই কি মারাত্মক ভুল হয়েছিল?

বস্তুত তো ছোটবেলা থেকেই অমিয় যৌথ পরিবারে মানুষ। সেখানে বড় খাটের সঙ্গে আর একখানা বড় খাট জোড়া দেওয়া। বিশাল মাঠের মত বিছানা, শামিয়ানার মত বড় মশারি। দাদু ঠাকুমা শুতো, আর সেই সঙ্গে তারা রাজ্যের ছেলেপুলে। পরিবারের অর্ধেক এক বিছানায়। যারা সেই বিছানায় শুয়ে বড় হয়েছে তারা আজও কেউ একে অন্যের সঙ্গে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয় নি, যে যার কাজের ধান্দায় আলাদা হয়ে ভিন্ন সংসার করেছে, দাদু ঠাকুমা মরে গেছে কবে। তবু সেই প্রকাণ্ড বিছানার স্মৃতি আজও অমিয়র পিসতুতো, মাসতুতো, জ্যাঠতুতো, খুড়তুতো, ভাই আর বোনদের কাছ থেকে খুব দূরে সরাতে পারে নি। দেখা হলে সবাই অকৃত্রিম খুশী হয়, এক-আধবেলা জোর করে ধরে রাখে, প্রাণপণে খাওয়ায়, কত পুরনো দিনের গল্প হয়।

অমিয় খেতে পারছে না। একদম না। একটা টোস্ট মুখে তুলে দেখল। ভাল টোস্ট হয়েছে, মুড়মুড় করে ভেঙে যাচ্ছে দাঁতের চাপে। তবু অমিয়র কাছে কাঠের গুঁড়োর মত বিস্বাদ লাগে। ডিমটা থেকে আঁশটে গন্ধ আসে। দুধটাকে খড়িগোলা

মনে হয়। অমিয় টোস্ট হাতে ধরে রেখে একবার চেষ্টা করে হাসির দিকে তাকায়। আসলে তাকাতে তার ভয় করছিল।

চোখে চোখ পড়ে। হাসির কোন দ্বিধা নেই, ভয় নেই। এমন নিষ্ঠুর মেয়ে অমিয় খুব কমই দেখেছে। অমিয়কে কখনো হাসি সমীহ করে নি। আজ পর্যন্ত বলতে গেলে হাসি সঠিক বৌ হয়নি অমিয়র। ইচ্ছে হয়নি বলে হাসি সন্তান-ধারণ করল না আজ পর্যন্ত। না করে ভালই করেছে। তাহলে এখন অসুবিধে হত। হাসি তাই অমিয়র চোখে সোজা চোখ রাখতে পারে। ভয় পায় না। অমিয়র কাছে তার কোন দায় নেই।

—আমি কিন্তু কয়েকটা জিনিস নিয়ে যাব। হাসি সকালে এই প্রথম কথা বলে।

অমিয় ভ্রূ তুলে বলে—কী বললে?

হাসি বলে—আমি কয়েকটা জিনিস নিয়ে যাব। এখানে তো আমার নিজস্ব কিছু নেই।

—কী নেবে?

—এই কয়েকটা শাড়ি ব্লাউজ, সাজগোজের জিনিস, একটা স্যুটকেস, কয়েকটা টাকা…

অমিয় শান্তগলায় বলে—নিও। বলার দরকার ছিল না।

—বলেই নেওয়া ভাল। দরকারে নিয়ে যাচ্ছি। দরকার ফুরোলে ফিরিয়ে দেব।

শরীরের ভিতরটা তিড়বিড় করে অমিয়র। কিন্তু কিছু বলে না। বলা মানেই আবার অশান্তি। ছোট কথার ঢিল ছুঁড়ে হাসি দেখতে চায় মজা পুকুরটায় কি রকম ঢেউ ওঠে। মজা পুকুর ছাড়া অমিয় নিজেকে আর কিছু ভাবতে পারে না।

হাসি আবার বলে—এ সংসারে আমি তো কিছু নিয়ে আসিনি, কাজেই নিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

অমিয় উঠল। টেবিলে তার টোস্ট ডিম আর দুধের ওপর মাছি উড়তে লাগল, বসতে লাগল।

স্কুটারটা রোদে দাঁড়িয়ে আছে। অমিয় জানালা দিয়ে একবার দেখে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করে নেয়। দরজার উপর একটা ছবি টাঙানো আছে। ছবির চারধারে একটা মালা কবে টাঙানো হয়েছিল, মালাটা গত বছরখানেক ধরে শুকিয়ে এখন রুদ্রাক্ষের মালার মত দেখায়। ছবিতে ধুলো পড়েছে। বেরোবার সময়ে রোজই একবার ছবিটার দিকে অভ্যাসবশত তাকিয়ে বেরোয় সে। একবার হাতজোড় করার ভঙ্গী করে বেরিয়ে যায়।

আজও তাকাল।

বেরোবার মুখে দরজা থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল—যা খুশী নিয়ে যেও।

হাসি বলল—যা খুশী নেব কেন? যা না হলে চলবে না সে রকম দু'একটা জিনিস ধার নেব। আবার ফিরিয়ে দেব।

অমিয় বলল—আচ্ছা।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে আর হাসির কথা মনে থাকে না। দু'চারদিন বৃষ্টির পর গরম কমে গেছে। আকাশ গভীর নীল। বাতাস পরিষ্কার। স্কুটারটা মৃদু গোঙানির

boiRboi.net

শব্দ করে ছুটছে। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা এসে যত অপ্রীতিকর কথা ভুলিয়ে দিয়ে মাথা পরিষ্কার করে দেয়। পরতে পরতে খুলে যাচ্ছে কালো রাস্তা। কলকাতার এক রকম সুন্দর গন্ধ আছে। বর্ষার পর রোদ উঠলে প্রায়ই গন্ধটা পায় সে। রাস্তার পর রাস্তা পার হয় অন্যমনে।

ত্রিশ নম্বর ধর্মতলায় তার অফিস। ফুটপাত থেকেই সোজা কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে খাড়া। সিঁড়ির পাশেই ফুটপাথে একটা গেঞ্জী, ব্রেসিয়ার, রুমাল, আণ্ডার-ওয়্যারের স্টল চালায় আহমদ। অমিয়র স্কুটারটা সারাদিন সে-ই পাহারা দেয়। রুমালটা আণ্ডারওয়্যারটা আহমদের কাছ থেকেই নেয় অমিয়। বদলে আহমদ স্কুটারটা নজরে রাখে। দরকারে অল্প স্বল্প টাকা ধার দেয়। অমিয়র দুচারজন পাওনাদারকেও সে চিনে রেখেছে। নীচের তলা থেকেই তাদের তাড়ায়, বলে—তিনতলার সিঁড়ি খামোখা ভাঙবেন কেন, একটু আগেই বেরিয়ে গেছেন।

সিঁড়িটা সত্যিই খাড়া। উঠতে জানু বেরিয়ে যায়। সিঁড়ির আট ধাপে একটা ছোট্ট চাতাল। সেই চাতালটা আহমদের একটা সংসার। দুপুরে তার ভাত আসে, কাছেই কোন স্কুলে পড়ে তার দুই ছেলে, টিফিনে তারাও এসে হাজির হয়। চাতালে বসে অন্ধকারে বাপ-ব্যাটারা ভাত খায়। গা ঘেঁষে লোকজন ওঠানামা করে, ধুলো ওড়ে, কাঠের সিঁড়ি কাঁপে, তবু তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। চাতালের একদিকে আহমদের পোঁটলা-পুঁটলি, দেয়ালের পেরেকে ঝোলানো জামাকাপড়, জুতো।

তিনতলায় উঠতে আজ বেশ কষ্ট হল। অফিস বলতে যা বোঝায় তা তো নয়। ঘরটা বড়ই, তার তিন অংশীদার। আসলে ঘরটার মূল ভাড়াটে কল্যাণ। দশ-বারো বছর আগে এই ঘড় ভাড়া নিয়ে তৃষ্ণা অ্যাণ্ড কোং খুলেছিল। আজও কোম্পানী আছে, কল্যাণও আছে। তফাতের মধ্যে এই যে, সেই ঘরে পাশাপাশি টেবিলে আরো দুটো কোম্পানী চালু হয়েছে। একটা রজতের, একটা অমিয়র। তারা দুজন কল্যাণের সাবলেটের ভাড়াটে। একই ঘরে এ-রকম চার-পাঁচটা কোম্পানীও চলে। একটা টেলিফোন আর একটা ঠিকানা থাকলেই কলকাতায় ব্যবসায় নামা যায়।

মিশ্রিলাল বসে আছে। একমাত্র মিশ্রিলালকেই আহমদ কখনো ঠেকাতে পারে নি। ধৈর্যশীল মিশ্রিলাল ঠিক তিনতলা পর্যন্ত উঠবেই, উঠে অমিয়কে না দেখলে বসে থাকে, বসে থাকতে থাকতে ঝিমোয়। বিকেল পর্যন্তও বসে থাকে সে। অমিয়কে দেখে মিশ্র একবার চোখ তুলে নামিয়ে নিল। হাতে একটা টেণ্ডারের চিঠি।

রাজেন গ্লাসে ঢেকে জল রেখে গেছে। টেবিলে কাগজপত্র প্রায় কিছুই নেই। দুটো চিঠি। টেণ্ডার। চিঠি দুটো দেখে রেখে দিল সে। চেয়ার টেনে বসল। রাস্তার ওপারে গভর্নমেন্টের একটা স্টোর। লরী থেকে মাল খালাস করছে। রাস্তায় ট্রামের শব্দ হচ্ছে, বাস যাচ্ছে। কাচের পাল্লাটা বন্ধ করে দিয়ে শব্দ আটকাল অমিয়।

মিশ্র বলল—কিছু দেবেন নাকি ?

—ও সপ্তাহে।

—ও বাবাঃ, তিনমাস হয়ে গেল। আমিও মাল তুলতে পারছি না, একজনকে নিয়ে তো আমার কারবার নয়।

—ও সপ্তাহে এসো।

boiRboi.net

—পুরো চাইছি না, কিছু দিন।

—কোত্থেকে দেব ? পেমেণ্ট চারমাস আটকে আছে।

—কেন ?

—সেনগুপ্ত চারটে এয়ারকণ্ডিশনিং মেশিন কিনেছিল, চারটে স্ক্র্যাপ। মেশিন আমার অর্ডারে খাইয়ে ঝগড়া করে ক্যাপিটাল তুলে নিয়ে গেল ! তখনো জানতাম না যে স্ক্র্যাপ মেশিন খাইয়ে গেছে প্যাটারসনে। প্যাটারসন থেকে সেদিন চিঠি এসেছে, মেসিন স্ক্র্যাপ, পেমেণ্ট হবে না। সব বিল আটকে রেখেছে। সাত হাজার টাকার।

চুক-চুক করে জিভে একটা ক্ষোভের শব্দ করে মিশ্রিলাল।

—সেনগুপ্ত ডুবিয়ে গেল একেবারে !

অমিয় একটু হাসে। বলে—ডুবিয়ে যাবে কোথায় ? ঠিক পেয়ে যাব।

—বিলটার জন্য কবে আসব ? আমার তো বেশী নয়, মোটে ন'শো টাকা। আমি গরিব মানুষ।

—মিশ্রি, বিলের আশা ছাড়। বরং আমাকে আরও কিছু ধার দাও। নগদ না দিলে মাল দাও। আমার হাতে তিনটে টেণ্ডার। দুটো লোয়েস্ট হয়েছে, আর একটাও পেয়ে যাব। এখন সেনগুপ্ত নেই আমি একা। টাকা মার যাবে না।

মিশ্রি গলা চুলকোয়। বলে—তিনমাসে পেমেণ্ট পাচ্ছি না। কী যে বলেন। পুরনো লোক বলে ছাড়ছি না আপনাকে। কিন্তু কম্প্রেসারের পার্টসের জন্য লোকে ছিঁড়ে ফেলছে আমাকে। নগদ টাকার ছড়াছড়ি। এ-সব মাল এখন ক্রেডিটে দেয় কোন বুদ্ধু ?

অমিয় জলটা একটু একটু করে খায়। স্বাদটা ভাল লাগে। তেষ্টা পেয়েছে খুব। গ্লাসটা আবার ঢেকে রেখে বলে—এবার কাটো তাহলে।

—সামনের সপ্তাহে আবার আসব।

—রোজ আসতে পার। কিন্তু লাভ নেই।

—বললেন যে আসতে। কিছু দেবেন। মোটে তো ন'শো টাকা।

ধৈর্যশীল মিশ্রিলাল ঝগড়া করে না। করলে করতে পারত। কিন্তু শান্ত মুখেই উঠে যায়। আবার ঠিক আসবে।

অমিয় নতুন টেণ্ডারের চিঠি দুটো টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ে অন্যমনস্কভাবে ; ছেঁড়া টুকরোগুলো টেবিলের ওপর সাজায় তাসের মত। চেয়ে থাকে। সেনগুপ্ত কোথাও না কোথাও আছে ঠিক। কলকাতা হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড জলাশয়, তাতে ডুবসাঁতার কাটা যায়। কিন্তু একদিন না একদিন দেখা হবেই।

আজ-কালের মধ্যেই হাসি চলে যাবে। আজ বিকেলে বাসায় ফিরবার ইচ্ছে নেই অমিয়র। ফিরে খুব খারাপ লাগবে। হাসি যে কোথায় যাচ্ছে তা অমিয় জানে না। বোধহয় প্রথমে বাপের বাড়ী যাবে আসামে। তারপর বাগনানের কাছে এক গ্রামে, যেখানে ও চাকরি পেয়েছে, আগামী মাস থেকে চাকরি শুরু করবে। তারপর কী করবে হাসি ? চাকরি করবে ? তারপর ? চাকরিই করবে। চাকরিই করে যাবে বরাবর ! কিছু মনে পড়বে না ! একা লাগবে না ! খারাপ লাগবে না !

কল্যাণ টেবিলের ওপর পা তুলে চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘুমোচ্ছে ! তৃষ্ণা কোম্পানী

দাঁড়িয়ে গেছে। দুজন কর্মচারী আউটডোরে ঘুরে বেড়ায়, কল্যাণকে কেবল অফিসটা দেখতে হয় আর ইনকাম-ট্যাক্স। কোম্পানী দাঁড়িয়ে গেলে আর তেমন ভাবনা নেই। রজতের টেবিল খালি। বড় একটা থাকে না রজত, প্রচণ্ড খাটে আর ঘোরে। দাঁড়িয়ে যাবে।

অমিয় নিঃশব্দে বসে থাকে কিছুক্ষণ। ভাবনা-চিন্তা করার মত মাথার অবস্থা নয়। মনে হয় বেশী ভাবতে গেলেই মাথায় সমুদ্রের মত বিশাল ঢেউ উঠে সে পাগল হয়ে যাবে।

বসে থাকলে এ রকম হবেই, অমিয় তাই উঠল।

কল্যাণ একবার তাকিয়ে বলল—কোন দিকে যাচ্ছেন?

—যাই একবার প্যাটারসনে। ওদের কাল মিটিং গেছে। লাহিড়ী বলছিল একটা ডিসিশন হবেই। যদি কিছু হয়ে থাকে দেখে আসি।

—মিশ্রলাল কত পায়?

—ন'শো।

—গতকাল আমি একটা পেমেণ্ট পেয়েছি। শ' চারেক দিতে পারি। মিশ্রকে আপাততঃ কাটাবেন না, কিছু দিয়ে হাতে রাখুন।

—কেন?

—ফুড সাপ্লাইয়ের টেণ্ডারটা ধরে রাখুন। মিশ্রকে কিছু খাওয়ালে ক্রেডিটে আবার মাল দেবে।

—আপনি তো দুশো অলরেডি পান।

—দেবেন এক সময়ে। পালাবেন কোথায়?

আবার চোখ বোজে। কল্যাণ ওরকমই। খুব মহৎ কাজও খুব অবহেলার সঙ্গে করে। অমিয় ঠিক কৃতজ্ঞতা বোধ করতে পারে না। মনটা সেরকম নেই। সেনগুপ্ত পালিয়েছে, হাসি চলে যাচ্ছে। ব্যবসা ঝুল।

নীচে এসে স্কুটারটা চালু করে সে। ভীড় কাটিয়ে ধীরগতিতে এগোয়।

কাঁচের টেবিলে ছায়া পড়তেই লাহিড়ী মুখ তোলে।

—ভাল খবর মশাই।

—কী?

—আবার অর্ডার পাবেন। আপনার টেণ্ডার আমরা নেবো। কাল খুব লড়ালড়ি হল আপনার জন্য।

— কত টাকার অর্ডার?

—কম। হাজার পাঁচেক। কিন্তু ব্যাড বুকে আছেন এখন, এই অর্ডারই আপাততঃ পাঁচলাখের সমান। মেশিনগুলো যদি পাল্টাতে না পারেন তবে অন্ততঃ মেরামত করে দেবেন, বিল কিছু ছাঁট-কাট হবে। সাত হাজারের জায়গায় হাজার চারেক পেয়ে যাবেন কিন্তু সেটা পাবেন মেশিন মেরামতের পর।

অমিয় ম্লান মুখে বসে থাকে। খবরটা ভালই। খুব ভাল। কিন্তু পাঁচ হাজারের অর্ডার ধরাও মুসকিল। পেমেণ্টটা আটকে রইল।

লাহিড়ী চা বলল। তারপর জিজ্ঞেস করে—কী হয়েছে, খারাপ দেখছি যে?
—কিছু না। শরীরটা ভাল নেই।
—বয়স কত?
—পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ।
লাহিড়ী গম্ভীর ভাবে বলে—ড্রিঙ্কস্?
—একটু-আধটু।
—মেয়েছেলে?
—নীল।
—স্মোক?
—দিনে চল্লিশ পঞ্চাশটা।
—চেক-আপ করান। হার্ট, ব্লাড, ইউরিন।

চা এসে যায়। দামী চায়ের গন্ধ। ভাল লাগে অমিয়র। আস্তে আস্তে চেখে চেখে খায়। প্যাটারসন ওগিলভি অ্যামালগামেশান পুরনো কোম্পানী। ব্রিটিশারদের হাত থেকে গত বছর কিনল এক পাঞ্জাবী। দশ বছর ধরে প্যাটারসনের সঙ্গে ব্যবসা করছে অমিয়। সকলের সঙ্গেই চেনা হয়ে গিয়েছিল, গুডউইল তৈরী হয়ে গিয়েছিল। সেনগুপ্ত ডুবিয়ে দিয়ে গেল। পুরনো সাপ্লায়ার বলে প্যাটারসন অমিয়কে ছাড়াল না, কিন্তু নীচু নজরে দেখবে এখন, বেশি টাকার অর্ডার দিতে ভয় পাবে।

লাহিড়ীর খাঁই বেশি নয়। ওয়ান পার্সেণ্ট নেয় বিল থেকে। অন্য পারচেজ-অফিসারদের বায়নাক্কা অনেক। সেই তুলনায় লাহিড়ী দেবতা।

অমিয় উঠে বলল—অনেক ধন্যবাদ।
লাহিড়ী হাসল। বলল—সেনগুপ্তর খবর কী?
—খবর নেই।
—ক্যাপিটাল তুলে নিয়ে গেছে?
—হ্যাঁ!
—ও-সব মাল আমরা চিনি। আপনিই চিনতে পারেন নি।
অমিয় দীর্ঘশ্বাসটা চেপে রাখে।

নীচে এসে আবার স্কুটার চালু করে অমিয়। কোথাও যাওয়ার নেই। সব জায়গায় পাওনাদার বসে আছে। হাজার দশ-বারো টাকার ক্রেডিট বাজারে। গোটা দুই বিলের পেমেণ্ট সামনের সপ্তাহে পাওয়া যাবে। তার আগে অমিয়র কোথাও যাওয়া হবে না। পেমেণ্ট পেলেই কিছু ধার শোধ হবে। হাতে কিছুই থাকবে না।

প্যাটারসন ওগিলভি অ্যামালগামেশন পিছনে ফেলে অমিয়র স্কুটার ধীরগতিতে, ভ্রমরের গুঞ্জন তুলে চলতে থাকে। উদ্দেশ্যহীন।

চললে বাতাস লাগে। থেমে থাকলে গুমোট। একটা পেট্রোল পাম্পে থামতেই গুমোটটা টের পায় সে। তিনটে গাড়ি তেল নিচ্ছে কাজেই একটু অপেক্ষা করতে হয় তাকে। কাঁচা পেট্রোলের গন্ধে একটা মাদকতা আছে। গন্ধটা বরাবর ভাল লাগে তার। মন চনমন করে ওঠে। বুক ভরে সে পেট্রোলের গন্ধ নেয়। ঝিমোয়। কয়েক মুহূর্তেই শার্টের নীচে ঘাম কেঁচোর মত শরীর বেয়ে নামে। হাতের তেলো ভিজে যায়।

পিছনে একটা গাড়ি তীব্র হর্ন দেয়। অমিয় ঝাঁকুনি খেয়ে চোখ চায়। সামনের গাড়ি চলে গেছে। অমিয় এগোয়। ট্যাঙ্ক-ভর্তি তেল নেয়। আবার স্কুটার ছাড়ে। উদ্দেশ্যহীন ঘুরতে থাকে।

মধ্য-কলকাতার অফিসপাড়ায় কত বাড়ি তৈরি হচ্ছে। দারুণ দারুণ বাড়ি, লাখ লাখ টাকা খরচ। ভিতরে কোটি কোটি টাকার লেন-দেন।

অফিস, কোম্পানী, ব্যাঙ্ক, জীবনবীমার বাড়ীর ছায়ায় ছায়ায় অমিয় তার স্কুটার চালায়। শরীরের ঘাম মরে আসে। হাসি কিছু টাকা চেয়েছে। কত টাকা তা বলেনি। স্টীলের আলমারীতে শ' তিনেক আছে মনে হয়। অমিয়র পকেটে বড় জোর শ' খানেক। হাসি জানে, অমিয় এখন দড়ির ওপর হাঁটছে, তাই বেশি নেবে না বোধহয়। হাসি টাকা চায় না। মুক্তি চায়। কিন্তু ওকে এ সময়ে কিছু টাকা দিতে পারলে অমিয় খুশি হত।

সোনাদা যে ব্যাঙ্কে চাকরি করে সেই ব্যাঙ্কটা পেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থামে অমিয়। বছর তিনেক আগেই সোনাদা অ্যাকাউণ্ট্স অফিসার ছিল। এখন কি আর একটু ওপরে উঠেছে। সাহেবী ব্যাঙ্ক, একগাদা মাইনে পায় সোনাদা। কপালটা বড় হয়ে হয়ে অনেকটা মাথা জুড়ে টাক পড়েছিল। এখন বোধহয় টাকটা পুরো হয়ে গেছে। সোনাদা বরাবর গম্ভীর। দেখা হলে হাসে না, কথাও বেশি বলে না। পাত্তা না দেওয়ার ভাব। কিন্তু অমিয় জানে, সোনাদা মানুষটা বাইরে ঐ রকম, ওর মুখে কথা কম, ভাবের প্রকাশ কম। কিন্তু এখনো অমিয়কে দেখলে ওর চোখের পাতা কাঁপে। স্নেহে, মমতায়। কত কষ্ট করেছে সোনাদা! বড় কষ্টে মানুষ।

অমিয় স্কুটার থেকে নেমে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ব্যাঙ্কটায় ঢুকে যায়। সোনাদার কাছে কোন কাজ নেই। তবু একবার অনেকদিন বাদে দেখা করে যেতে বড্ড ইচ্ছে করছে। মনটা ভাল নেই।

কাউণ্টারে ভীড়। অজস্র সুন্দর কাউণ্টারে ছাওয়া চারদিক। রঙীন দেওয়াল, টিউব-লাইট—সব মিলিয়ে ব্যাঙ্কটার ভিতরটা বড় চমৎকার।

জিজ্ঞেস করতেই একজন পিওন সোনাদার ঘর দেখিয়ে দেয়। ঘষা কাচের পাল্লা। বাইরে টুলে বেয়ারা বসে আছে। একটা টেবিলের ওপর সাজানো স্লিপ, ডটপেন।

নিজের নাম লিখে অমিয় স্লিপ পাঠায়। একটু পরে বেয়ারা এসে ডাকে।

প্রকাণ্ড টেবিলের ওপাশে সুন্দর পোশাকের সোনাদাকে প্রথমটায় আত্মীয় বলে ভাবতে কষ্ট হয় তার। গোলাপী রঙের টাক মাথায়, নীলাভ কামানো গাল, খুব ব্যস্ত। একবার চোখ তুলে আবার কাগজপত্রে ডুবে গেল। বসতেও বলল না। অমিয় একটু হেসে নিজেই বসে।

সোনাদা ঐরকমই। বসতে বলে না। জানে, বসতে বলার কিছু নেই। অমিয় তো বসবেই। এটা তার সোনাদার ঘর নয় কি?

ছোটবেলা থেকে তারা ভাইবোনেরা একে অন্যকে আপন বলে ভাবতে শিখেছিল। যৌথ পরিবার ঐ একটা রক্তের গূঢ় সম্পর্ক তৈরি করে দিয়ে গেছে। এ জীবনে ওটা আর ভাঙবে না।

সোনাদা একবার একফাঁকে প্রশ্ন করে—শরীরটা দেখছি শেষ করেছিস?

boiboi.net

—হ্ঁ।

—কেন?

—শরীরটা ভাল নেই।

—কোম্পানী লালবাতি জ্বালেনি তো?

—জ্বালছে।

—জ্বালাই উচিত। তখন যদি ব্যাঙ্কের চাকরিটা নিতিস, আজ কত মাইনে হত জানিস?

—কত?

—হাজার খানেকের ওপরে। গর্দভ।

—মাসে ওর চেয়ে অনেক রোজগার আমি করেছি। ব্যবসা বলে তোমরা গুরুত্ব দাও না। বাঁধা মাইনের লোকেরা ব্যবসাকে ভয় পায়।

সোনাদা ভ্রূ কুঁচকে একটু তাকায়। কোথায় একটা গোপন বোতাম টেপে, বাইরে রি-রি করে বেল বাজে। বেয়ারা এলে সোনাদা চা আনতে বলে। তারপর আবার কাজেকর্মে ডুবে যায়।

ঠাণ্ডা ঘরখানা। অমিয়র ঝিমুনি আসে।

সোনাদা আবার চোখ তুলে তাকে দেখে, হঠাৎ জিজ্ঞেস করে—প্রবলেমটা কী?

—তুমি বুঝবে না। অমিয় শ্বাস ছাড়ে, তারপর বলে—সোনাদা, তুমি কি প্রমোশন পেয়েছ?

—চাকরিতে থাকলে প্রমোশন হয়। তোর মত ব্যাবসাদাররা চিরকাল ব্যবসাদার থেকে যায়।

—তুমি কি খুব বড় পোস্টে আছ?

সোনাদা হাসে। মাথা নাড়ে।

—তাহলে আমার ব্যবসার জন্য তোমার ব্যাঙ্ক থেকে কিছু ধার পাইয়ে দাও না!

—তোকে ধার দেবে কেন? ইণ্ডাস্ট্রি বা এগ্রিকালচার হলেও না হয় কথা ছিল।

—যদি সিকিউরিটি দেখাই, যদি হাই ইণ্টারেস্ট দিই?

সোনাদা ভ্রূ কুঁচকে বলে—তোর আবার সিকিউরিটি কী? একটা পুরনো স্কুটার, ত্রিশ নম্বর ধর্মতলায় একখানা ভাগের অফিস। আর কী আছে তোর? বড়জোর একখানা রিফিউজি সার্টিফিকেট, তা সেখানাও বোধহয় হারিয়ে ফেলেছিস। কাজে লাগাতে জানলে রিফিউজি সার্টিফিকেটও মস্ত অ্যাসেট—কিন্তু তা তুই লাগালি কোথায়?

অমিয় চুপ করে থাকে।

সোনাদা আবার জিজ্ঞেস করে—প্রবলেমটা কী?

অমিয় উত্তর দেয়—তুমি বুঝবে না। মানুষ কতরকম গাড্ডায় যে পড়ে সোনাদা!

—তোর গাড্ডাটা কী রকম?

অমিয় শুধু হাসে। চারদিকে একবার তাকায়। যে চেয়ারে সে বসে আছে তা ফোম্ রাবারের গদীওয়ালা, টানলে শব্দ হয় না, ভীষণ ভারী। টেবিলখানা লম্বা এল্-এর মত। ঘসা কাচের দরজা, ঢেউখেলানো কাচ দিয়ে তৈরী ঘরের পার্টিশন। ওপাশে

boiRboi.net

লোকজন চললে কাচের ঢেউয়ে বিচিত্র প্রতিবিম্ব দেখা যায়। এই একখানা চেম্বার করতেই ইণ্টিরিয়র ডেকরেটর অন্ততঃ দশ বিশ হাজার কি তারও বেশী নিয়েছে। এ-রকম একখানা অফিস-ঘর বানাবার ইচ্ছে তার অনেক দিনের। হবে না আর। এ-রকম নিস্তব্ধ কাচের ঘর, মাছি উড়লে যেখানে শব্দ পাওয়া যায়, এ-রকম ঠাণ্ডা ঘর ফোম্‌ রাবারের গভীর তলিয়ে-যাওয়া গদী, বিচিত্র ডিজাইনের সেক্রেটারিয়েট টেবিল, আলো —এইসব আর কোনদিন হবে না।

—লাঞ্চে তুমি কী খাও সোনাদা?

—তোর মুণ্ডু।

—এই ঘরটা সাজাতে কত খরচ পড়েছে?

—তোর মত দশটা ব্যাবসাদারকে বিক্রি করলে যত ওঠে।

—এরা তোমার বাড়ি-ভাড়া দেয়? গাড়ি?

সোনাদা তাকে গ্রাহ্য না করে কাজ করে যায়। কিন্তু সোনাদার কপালে কয়েকটা দুশ্চিন্তার রেখা দেখা দেয়। কাজ করতে করতেও এক-আধবার চোরা চোখে অমিয়কে দেখে নেয়।

অমিয় বলে—উঠি।

—বোস। প্রবলেমটা কী বলে যা।

—কিছু না।

—টাকা সত্যিই চাস?

অমিয় মাথা নাড়ে—না।

—দরকার হলে ম্যাক্সিমাম হাজারখানেক নিতে পারিস। ব্যাংকের টাকা নয়, আমার টাকা।

—কোনদিন নিয়েছি?

সোনাদা চুপ করে থাকে।

অমিয় বলে—তুমি যদি সাপ্লায়ার হতে, কিংবা সুদখোর মহাজন, কি আমার ক্লায়েণ্ট, তো নিতাম। তুমি আমার সোনাদা, কিন্তু আমার ব্যবসার কেউ নও। তোমার কাছ থেকে নিলে আমি তোমার আর পাঁচজন আত্মীয়ের মত নীচু হয়ে যাব।

—তার মানে?

অমিয় হাসে—আমাদের আত্মীয়দের মধ্যে তুমিই সবচেয়ে সাকসেসফুল। তোমার কাছ ঘেঁষে বহু আত্মীয় ঘোরাফেরা করে, আমি জানি। কিন্তু তুমি জেনে রেখো, আমি তাদের দলে নই।

সোনাদা একটু হাসে।

—সোনাদা, আমার একটা প্রবলেমের কথা তোমাকে বলব? শুনবে ঠিক?

সোনাদা ভ্রূ কুঁচকে তাকায়। ছোট্ট একটা নড্‌ করে।

—আমি প্রায়ই একটা স্টীমারঘাটকে দেখতে পাই।

সোনাদা নড়ে-চড়ে বসে বলে—কী রকম?

—আমি যেন উঁচু বালির চড়ায় বসে আছি। অনেক দূর পর্যন্ত বালিয়াড়ি গড়িয়ে গেছে—আধমাইল—একমাইল—তারপর ঘোলা জল—একটা জেটি—প্রকাণ্ড নদী দিগন্ত

boiboi.net

পর্যন্ত। কখনো কখনো দেখি, রাতের স্টীমারঘাট—কেবল বিন্দু বিন্দু আলো জ্বলে, জেটির গায়ে জলের শব্দ—ওপারে ভীষণ অন্ধকার। কেন দেখি বল তো?

সোনাদা তাকিয়ে থাকে।

—এ কি মৃত্যুর-প্রতীক নাকি? অমিয় বলে।

—ইয়ার্কি হচ্ছে?

—ইয়ার্কি নয় সোনাদা। কাজকর্মে, ঘুরতেফিরতে হঠাৎ হঠাৎ চোখের সামনে ঐ বালিয়াড়ি, আর বালিয়াড়ির পর জেটি, জল—এই-সব ভেসে ওঠে।

সোনাদার চোখ হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ব্যস্ত সোনাদা একটু হেলান দিয়ে বসে। টেবিলের ওপর থেকে হাতড়ে ইণ্ডিয়া কিংসের সোনালী প্যাকেটটা তুলে নিয়ে একটা সিগারেট ধরায়। মৃদু ধোঁয়ার গন্ধ অমিয়র নাকে এসে লাগে। সোনাদার সামনে খায় না, নইলে এই মুহূর্তে তারও একটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু যৌথ পরিবারের শিকড়-বাকড় সব রয়ে গেছে ভিতরে। সোনাদার সামনে কোনদিনই আর সিগারেট খাওয়া যাবে না।

সোনাদা বলে—এ সবই নস্ট্যালজিয়া। আমারও হয়। দেশের বাড়িতে করমচা তলার ছায়ায় মাটির ওপর শ্যাওলা গজাত। সেই ঠাণ্ডা জায়গাটার কথা হঠাৎ কেন যে মনে পড়ে।

অমিয় মাথা নাড়ে—না এটা শৈশব-স্মৃতি নয়। স্টীমারঘাট আমি আর ক'বার দেখেছি। দু তিন বার বড় জোর। তরপরই তো কলকাতায় পার্মানেন্ট চলে এলাম। তাছাড়া সেই স্টীমারঘাট তো দেশে যাওয়ার গোয়ালন্দী ঘাট নয়। এটা কেমন যেন ধু ধু বালুর চর, নির্জন অথৈ ঘোলা জল, ওপারটা দেখা যায় না।

সোনাদা হাসে। বলে—ভাল খাওয়া-দাওয়া কর। হাসিকে নিয়ে কিছুদিন বাইরে টাইরে ঘুরে আয়।

অমিয় অবাক হয়ে বলে—কেন?

—তাহলে ওসব সেরে যাবে।

—সারাতে চাইছে কে? আমার তো খারাপ লাগে না। কলকাতার ভিড়ভাট্টা গরম, ঘাম, কাজকর্মের ভিতরে মাঝে মাঝে হঠাৎ ছুটি পেয়ে একটা অচেনা স্টীমারঘাটে চলে যাই, বালিয়াড়িতে বসে থাকি, বেশ লাগে। একে সারাব কেন? শুধু জানতে চাইছি, ব্যাপারটা কী। তুমি জানো?

উত্তর দেওয়ার সময় পায় না সোনাদা। স্টেনোগ্রাফার পার্সী মেয়েটি ঘরে ঢোকে। লম্বা ফর্সা, ভাঙাচোরা মুখ। তবু মুখে একটা অদ্ভুত শ্রী আছে। দারুণ একখানা বাটিকের শাড়ি পরনে। মেয়েটা সোনাদার ডানদিকে গিয়ে নিচু হয়ে একটা টাইপ করা চিঠি দেখায়। কথা বলাবলি হয়। ততক্ষণ অমিয় মেয়েটার শাড়ি দেখে। হয়তো বা এরকম শাড়িতে হাসিকে ভাল মানাত। হাসির কথা মনে পড়তেই অমিয়র একধরনের শারীরিক কষ্ট হয়। বুক পেট জুড়ে একটা তীক্ষ্ণ বেদনার আভাস পাওয়া যায়। দম বন্ধ হয়ে আসে। বুক ধড়ফড় করে। একটা চেক-আপ বোধহয় অমিয়র দরকার ছিল। বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ, ইররেগুলার জীবন, অতিরিক্ত চা আর সিগারেট, ব্যবসার উত্তেজনা, শক, সব মিলিয়ে ভিতরটা ভাল থাকার কথা নয়। হাসিকে এই শাড়িটায়

বোধহয় এখনো মানায়। নীলের ওপর হলুদ বাটিকের কাজ। পকেটে একশোর কাছাকাছি টাকা আছে। বাজার ঘুরে একবার খুঁজে দেখবে নাকি শাড়িটা। অবশ্য তা আর হয় না। হাসি বড় অবাক হবে, তাকিয়ে থাকবে, বা দু-একটা বিদ্রূপাত্মক কথাও বলতে পারে। দরকার নেই। হাসি নিষ্ঠুর। তার হৃদয় নেই।

মেয়েটা ফাইলিং ক্যাবিনেটে কাগজপত্র ঘাঁটে। সোনাদা আবার কাজকর্মে ডুবে যায়। একজন দুজন করে অফিসে লোকজন আসে। সুন্দর পোশাকের চটপটে লোকেরা। সোনাদা হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করে, চমৎকার ইংরেজীতে কথা বলে। বিজনেসের পিক-আওয়ার। সোনাদার দম ফেলার সময় নেই।

এক ফাঁকে অমিয় বলে—সোনাদা, উঠি।

কাগজপত্র ঘেঁটে কী একটা খুঁজে পায় সোনাদা। সেটা দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখ তুলে অমিয়কে বলে—সামনের সোমবার মিণ্টুর জন্মদিন। তোর বৌদি হয়তো হাসিকে খবর দিয়েছে। তবু বলে রাখছি, বিকেলের দিকে হাসিকে নিয়ে চলে যাস, রাতে খেয়ে একেবারে ফিরবি।

—আচ্ছা।

—তোর স্টীমারঘাটের ব্যাপারটা আমি ভেবে দেখব।

অমিয় হাসে। জন্মদিনে যাওয়া হবে না। স্টীমারঘাটের কথা সোনাদা ভুলে যাবে।

ব্যাংকটা থেকে বেরোতেই জবরো কলকাতা চেপে ধরে। কী তাপ রোদের। গুমোট।

অমিয় তার স্কুটার চালু করে। কোথায় যাবে, ভেবে পায় না, তবু যায়। যেতে থাকে।

টিফিন। কিন্তু টিফিনের সময়েও সোমাদি বাইরে যায় না, আড্ডা মারে না। নিজের জায়গায় বসে থাকে। প্রকাণ্ড হলঘরের একধারে টাইপিস্টদের সারি সারি মেশিন। সব খালি। কেবল সোমাদি ঠিক বসে আছে। ডান হাতে একখানা এক-কামড় খাওয়া টোস্ট, আলতো ভাবে ধরা, বাঁ হাত মেশিনে ছোবল মারার জন্য উদ্যত। অমিয় এগিয়ে যেতে শুনল টুক করে মেশিনের একটা অক্ষর লাফিয়ে উঠল। অমিয়র করুণা হয়।

সোমাদির বয়স পঁয়তাল্লিশের নীচে নয়। সিঁথির কাছে চুল পাতলা হয়ে এসেছে। চোখে প্লাস পাওয়ারের চশমা! রোগা গড়নের বলে বয়স খুব বেশী দেখায় না, কিন্তু দীর্ঘদিনের ক্লান্তির ছাপ আছেই। নাকের দুধার দিয়ে গভীর রেখা নেমে গেছে, মেচেতার ছোপ ধরেছে মুখে। বছরে বড়জোর এক দুদিন ছুটি নেয়। চোদ্দ বছর টানা চাকরি করছে আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কণ্ট্রোলে, তবু চাকরি পাকা হয়নি। কণ্ট্রোল উঠে যাবে বলে চাকরি কারোই পাকা নয় এখানে। ওর বিয়ের জন্য কেউ তেমন করে চেষ্টাই করল না। পিসেমশাই মারা যাওয়ার পর একটা চাকরিতে ঢুকেছিল, তারপর চাকরিই করে গেল। বার দুই দুটি ছেলেকে বোধহয় ভাল লেগেছিল। তাদের একজন ছিল ভিন্ন জাতের, অন্যজনের ছিল কম বয়স। হল না। হবেও না। সোমাদি তা জানে বলেই কোথাও আর যায় না। মনপ্রাণ দিয়ে চাকরি করে! ছুটি পেলে হাঁফ ধরে যায়।

টোস্টটা আর এক-কামড় খাওয়ার জন্য মুখের কাছে এনে সোমাদি তাকায়। প্রথমটায় বোধহয় চিনতেই পারে না। তাকিয়ে থাকে।

— সোমাদি, কেমন আছ ?

সোমাদি টোস্টটা রেখে দিয়ে একটু চেয়ে থেকে বলে—বেরো বেরিয়ে যা।

— কেন ?

—লজ্জা করে না ? একবছরের মধ্যে একবার মাকে দেখতে যাওয়ার সময় হয়নি ? কতবড় অসুখ গেল মা-র, তোকে দেখার জন্য আকুলি-বিকুলি, তিনটে চিঠি দিলাম, একটা উত্তরও দিসনি। বেরো—কেন এসেছিস ?

—তুমি কত মাইনে পাও ?

—তাতে কি দরকার ? চালাকি ছাড়।

—চালাকি না। সত্যিই জিজ্ঞেস করছি।

—ভারি তো ব্যবসা। অফিসে মাছি ওড়ে, সেই ব্যবসা করেই তোর সময় হয় না। অমানুষ !

একটা চেয়ার টেনে অমিয় বসে নিজের থেকেই। মাঝখানে মেশিন, ওপাশে সোমাদি। বলে—এর পরের জেনারেশনে আর এইসব চোটপাট শোনা যাবে না সোমাদি। যা বকাবকি করার তা তোমরাই করে নিলে।

—তার মানে ?

—আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে একটা ফ্যামিলি আছে। স্বামী স্ত্রী আর বাচ্চা ছেলে একটা। একদিন সাজগোজ করে বিকেলে কোথায় বেরোচ্ছে, ছেলেটার গাল টিপে জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় যাচ্ছ বাবু ? সে উত্তর দিল—ঠাকুমার বাড়ী। বুঝলে সোমাদি,—কথাটা সেই থেকে বুকে মাঝে মাঝে ধাক্কা দেয়। ঠাকুমার বাড়ি! মাই গড, ঠাকুমার বাড়ি যে একটা আলাদা বাড়ি, সেখানে যে মাঝে মাঝে বেড়াতে যাওয়া যায় তা আমরা ভাবতেই পারি না এখনো। ঠাকুমার বাড়ি আবার কী! ঠাকুমা যে আমাদের রক্ত-মাংস-মজ্জায় মিশে আছে—তার বাড়ি কী করে আলাদা বাড়ি হয়। এই যে তুমি আমাকে বকছ, পিসিমাকে দেখতে যাইনি বলে, এসব সম্পর্কের টান আমাদের সময়েই শেষ। এরপর পিসতুতো মামাতো ভাইবোনে দেখা হলে হয়তো হাতজোড় করে নমস্কার করবে, আপনি আপনি করে কথা বলবে। বলবে—একদিন কিন্তু আমাদের বাড়িতে যাবেন, কেমন। খুব খুশী হব।

সোমাদি একটু হাসে! বলে, তোর সঙ্গে তো আমাদের সম্পর্ক তাই দাঁড়িয়ে গেছে। একবছরে ঢাকুরিয়া থেকে বেহালা যাওয়ার সময় হয় না, কী করে বুঝব যে সম্পর্ক রাখতে চাস ?

—গত একবছর ধরে আমি ভাল নেই সোমাদি।

—কী হয়েছে ?

—তুমি কত মাইনে পাও বললে না ?

—জেনে কী হবে ?

—এমনিই। কৌতূহল। বল না।

—সব কেটে ছেঁটে পৌনে আটশো। হাসি কেমন আছে ?

boiRboi.net

—ভাল। গত বছর তুমি একটা ষ্টীলের আলমারী কিনেছ আর একটা সিলিং ফ্যান, না?

সোমাদি হাসে—এ বছর একটা সুতোর কার্পেট কিনেছি, ড্রেসিং টেবিল করেছি, গ্যাসের উনুন কিনেছি। দেখে আসিস।

—পৌনে আটশোর মধ্যে কী করে ম্যানেজ করো? তোমার তো উপরিরও রাস্তা নেই।

—এইসব জানতেই এসেছিস? হাসিকে নিয়ে কবে যাবি বল?

—তোমার পোষ্যও তো কম নয়। পিসিমা, নীতা তোমার এক জ্যাঠতুতো ভাই তোমার কাছেই থাকে, কী করে ম্যানেজ করো?

—কী করব! তোরা ভাইরা তো আর মাসোহারা দিস না, ওতেই কষ্টে-সৃষ্টে ম্যানেজ করে নিই। একটা টোস্ট দিয়ে টিফিন সারি, বিড়ি সিগারেট খাই না, সাদামাটা পোশাক করি, সিনেমা দেখি কালে-ভদ্রে, কোথাও বেড়াতেও যাই না। তোদের তো তা নয়। হাসির খবর কিছু বললি না, বাচ্চা কাচ্চা হবে নাকি?

—তুমি খুব কষ্ট করো, না সোমাদি?

—দূর পাগলা, তোর হয়েছি কী? এসব বলছিস কেন?

—তুমি এত কষ্ট করছ কেন?

—কেন আবার, নিজের জন্য।

—দূর। নিজের জন্য কষ্ট করে সুখ কী। কষ্ট করলে করতে হয় ভালবাসার মানুষের জন্য। তুমি সবচেয়ে বেশী কাকে ভালবাস সোমাদি?

—কী জানি? তোর হয়েছে কী?

—কিছু না!

—হাসিকে নিয়ে কবে যাবি? হাসি তো আমাদের ভাল করে চিনলই না।

—যাব একদিন ঠিক। আগে বল, তুমি কার জন্য এত কষ্ট করছ?

—বললাম তো, নিজের জন্য।

—তবে তো তুমি নিজেকে ভালবাস।

—বললাম তো, বাসি।

—আমি বাসি না।

—তুই হাসিকে বাসিস। ভালবাসলেই হল।

—নিজেকে ভালবাসলে হাসিকেও ভালবাসা যায়। এই যে তুমি নিজেকে ভালবাস বললে, স্বামী-পুত্র হলে তাদেরও বাসতে, বাধা হত না। ভালবাসা তো মাস মাইনে নয় যে টান পড়বে।

—হাসির সঙ্গে ঝগড়া করেছিস নাকি? কী হয়েছে বল? দরকার হলে আমি না হয় গিয়ে হাসিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মিটমাট করে আসি। মাত্র তিন বছর হল বিয়ে, এখনই ঝগড়াঝাঁটি হলে—

—পাকামী করো না। ম্যারেড লাইফ সম্পর্কে তুমি কী জান? ঐ ব্যাপারে আমি তোমার সিনিয়র।

—তা হলে এই গরম দুপুরে ঘামে নেয়ে এসে ভালবাসা-ভালবাসা করছিস কেন?

boiRboi.net

কিছু খাবি? বেয়ারা ডেকে কিছু আনিয়ে দিই। একটা ডিমভাজা—না গরমে একটু দৈ খাবি?

—আমার মুশকিল কি জানো?

—কী?

—আমি হাসিকে ভালবাসতাম, ব্যবসাকে ভালবাসতাম, স্কুটারকে ভালবাসতাম, কিন্তু এইসব ভালবাসার মাঝে মাঝে একটা স্টীমারঘাট এসে পড়ছে।

—স্টীমারঘাট?

—হুঁ।

সোমাদি চেয়ে থাকে। বলে—কী বলছিস?

—খুব উঁচু বালিয়াড়ি থেকে তুমি কখনো কোন নির্জন ফেরীঘাট দেখেছ? একটা জেটি—তারপর বিশাল ঘোলা জলের নদী···ওপারটা ধু ধু করে···দেখা যায় না। দেখেছ? আমি চোখ বুজলেই দেখি।

সোমাদির মুখটা কেমন হয়ে যায় যেন। বয়েস হয়ে যাওয়া, কৃচ্ছ্রসাধনের ছাপওলা নীরস মুখ সোমাদির। তবু কয়েক পলকের জন্য যেন একটা কোমলতা গাছের ছায়ার মত মুখে খেলা করে। মুখের কর্কশ রেখাগুলি লাবণ্যের সঞ্চারে হঠাৎ ডুবে যায়।

—কোন্ স্টীমারঘাটের কথা বলছিস? কলকাতার গঙ্গা, নাকি গোয়ালন্দ, আমিনগাঁতেও ফেরীঘাট দেখেছিলাম।

—ওসব নয়। এ একটা অন্যরকম ফেরীঘাট। বহু দূর পর্যন্ত বালিয়াড়ি, তারপর ঘোলা জল—চোখ বুজলেই দেখতে পাই। ভীষণ ভয় করে, আবার ভীষণ ভালও লাগে।

—আমি ঠিক জানি, তুই হাসির সঙ্গে ঝগড়া করেছিস। কিংবা ব্যবসাতে মার খেয়েছিস। কত টাকা রেখে গিয়েছিল মামা?

—হাজার দশেক।

—সেটাই ভুল হয়েছিল। কে যে তোর মাথায় ব্যবসা ঢুকিয়েছিল। বাঙালী ছেলে আবার কবে ব্যবসা করতে শিখেছে। তার চেয়ে একটা বাড়ি করে ভাড়াটে বসিয়ে গেলে—

—স্টীমারঘাটটার কথা তুমি কিছু জান না, না?

—কী জানব? তোর মাথায় যতসব পাগলামীর পোকা। হাসিকে নিয়ে কবে আসবি বল?

—তোমার কিছু মনে হয় না? স্টীমারঘাট বা ওরকম কিছু?

সোমাদি হাসে। বলে—আচ্ছা জ্বালাতন! ভাবনা-চিন্তা করার সময় কোথায় আমার বল তো? সকাল সাড়ে আটটার লেডীজ স্পেশাল ধরতে বেরোই, মাইলখানেক হেঁটে বাস-রাস্তা, অফিসে সারাক্ষণ কাজ, ফিরতে ফিরতে আটটা হয়ে যায়। তখন শরীরে থাকে কী? খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি, স্বপ্নও দেখি না।

অমিয় শ্বাস ফেলে। বলে—তুমি কাঠ হয়ে গেছ।

একটু ইতস্তত করে সোমাদি বলে—তোর দেশের পুকুরঘাটের কথা মনে পড়ে। খুব

boiroi.net

বড় বড় কচুপাতা বাতাসে নড়ত। মাছ ফুট কাটত জলে। কদমগাছের ছায়ায় আমরা গঙ্গা-যমুনা খেলতাম। মনে হওয়ার কি শেষ আছে! কত কী মনে হয়। ওসব নিয়ে ভাবনার কী। হাসির সঙ্গে ভাব করে ফেল! ফেরার সময়ে একখানা শাড়ি আর দুটো সিনেমার টিকিট কিনে নিয়ে যা। কালকের দিনটা হোটেলরেষ্টুরেণ্টে খাস। এরকম একটু আধটু করলেই দেখিস আর ঝগড়া হবে না।

—তুমি এসব কবে থেকে ভেবে রেখেছ সোমাদি! বিয়ে হলে বরের সঙ্গে কী রকম সব মান-অভিমান হবে, সব ভেবে রেখেছিলে। আর বলছ, ভাববার সময় পাও না!

সোমাদি হেসে ওঠে। বলে—ঠিক বলেছিস।

একজন দুজন করে মেশিনগুলোর সামনে মেয়েরা এসে বসছে। টিফিন শেষ।

অমিয় উঠে দাঁড়ায়।

—চলি।

সোমাদি প্লাস পাওয়ারের চশমার ভিতর দিয়ে তাকায়। চোখে অন্যমনস্কতা। বলে —সম্পর্কটা রাখিস অমিয়। মাকে গিয়ে দেখে আসিস। হার্ট ভাল না, কখন কী হয়ে যায়।

—যাব।

অফিসে এসে অমিয় দেখে, কেউ নেই। দুপুরের ডাকে ইন্সিওরেন্সের একটা চিঠি এসেছে। গতবছরের প্রিমিয়াম বাকী। বছর তিনেক আগে, বিয়ের পরই দশ হাজার টাকার একটা পলিসি করিয়েছিল। দু বছর প্রিমিয়াম টেনেছে। যাকগে, পেইড-আপ্ হয়ে যাবে।

গ্লাসের নীচে চাপা দিয়ে কল্যাণ একটা চিঠি রেখে গেছে—বাগচী, হায়দার তাগাদায় এসেছিল। ভুজুং-ভাজুং দিয়ে বিদায় করেছি। ইনকাম-ট্যাক্সের অজিতকে একবার ফোন করবেন, ওকে আপনার কথা বলা আছে। ওর দাদা একটা লোন সোসাইটির মেম্বার, একটা লোন পাইয়ে দিতে পারে। আমি সিনেমায় যাচ্ছি, আজ ফিরব না। রাজেনের কাছে চারশো টাকা রাখা আছে। কাল সকালেই গিয়ে মিশ্রিলালকে দিয়ে আসবেন। ফুড-সাপ্লাইটা ছাড়বেন না—

চোখটা একটু ঝাপসা লাগে। চিঠিটা রেখে দেয় অমিয়। অফিস ঘরটা নির্জন। পাখার হাওয়ায় কোথায় যেন একটা কাগজ উড়বার শব্দ হয় কেবল। অমিয় বসে হাই তোলে। তারপর টেবিলে মাথা রেখে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ে।

বিকেলের দিকে রজত ফিরে এসে ডাকে—বাগচী—

—উঁ।

—আমার কাছে কেউ এসেছিল?

—না।

—দূর! কেউ আসে নি!

—রাজেনকে জিজ্ঞেস করুন তো।

—করেছি। ও তো বিশ্বের বাইরে যাচ্ছে চা খাবার সিগারেট আনতে। আমার মোটর পার্টস্‌টা দিয়ে গেল না শালা রায়চৌধুরী। কাল ডেলিভারি নিতে আসবে।

boiRboi.net

অমিয় আড়মোড়া ভাঙে। ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা। বাইরে এখনো ফর্সা রোদ।

রজত তার চেয়ার টেনে বলে—ব্যবসার মুখে পেচ্ছাপ। ভিসা পেয়ে যাচ্ছি কাল।

—কবে রওনা?

—দিন পনেরোর মধ্যে। প্রথমে ডুসেলডর্ফে যাব মাধুর কাছে। সেখান থেকে বন্ হয়ে কাজের জায়গায়। দাঁড়ান, আজ আমি চা খাওয়াব, সন্দেশ খাবেন?

—খাব। খুব খিদে পেয়েছে। অমিয় বলে।

বেল বাজায় রজত। রাজেন এলে চা সন্দেশ আনবার পয়সা দেয়। তারপর অমিয়কে বলে—খুব দামী সিগারেট কী আছে বলুন তো?

—আপনি তো খান না।

—আজ খাব।

—ইণ্ডিয়া কিংস্।

রাজেনের দিকে ফিরে রজত বলে—ইণ্ডিয়া কিংস এনো, এক প্যাকেট, আর দেশলাই। বাগচী, যাওয়ার আগে একটা পার্টি দেব।

অমিয় হাসে।

—শুধু একটা ভয়, বুঝলেন বাগচী!

—কী?

—এর আগে গুরুপদ গিয়েছিল। ল্যাংগুয়েজ জানত না বলে ওকে ফেরত পাঠিয়েছে। আমিও ভাল জানি না। ওদিকে ব্রজগোপালদাকে দিয়ে জার্মান ভাষায় করেসপণ্ডেন্স করেছি, নিজে শেখবার সময়ই পেলাম না। শেষে গুরুপদর মত ফেরত পাঠাবে না তো?

—সকলের কপাল সমান না।

চেয়ারটা পিছনে হেলিয়ে একটু দোল খায় রজত। ভাবে। বলে—অবশ্য মাধুও জানত না। কোম্পানী ওকে তবু রেখে দিয়েছে।

অমিয় রজতকে একটু দেখে। অন্তত দশ বছরের ছোট রজত। বাচ্চা ছেলে। কোন জমিতেই শেকড় নেই। কলকাতায় জন্ম-কর্ম। অমিয়র মনে হয়, কলকাতায় জন্মালে মাটির টান থাকে না। রজতের খুব ইচ্ছে, আর ফিরবে না। একটা আবছায়া স্টীমারঘাট চোখের সামনে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। অমিয় ক্যালেণ্ডারের ছবিটা দেখে। একটা মেয়ে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে, মাথায় একটা কলসী, কোমরের কলসীটা কাৎ করে ধরা তা থেকে অঝোরে জল পড়ে যাচ্ছে।

রজত মুখ তুলে বলে—আমার একটা লাভ অ্যাফেয়ার প্রায় ম্যাচিওর করে এসেছিল বুঝলেন বাগচী!

—হুঁ।

—সেটার কি করব বলুন তো?

—আপনার কী ইচ্ছে?

—ইচ্ছে নেই।

অমিয় চেয়ে থাকে।

রজত আবার বলে—চলেই যাচ্ছি যখন, তখন আবার এখানে একটা ফ্যাকড়া রেখে

boiRboi.net

যাই কেন। মেয়েটা হয়তো অপেক্ষা করবে। করতে করতে বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাবে। এক ফাঁকে এসে অবশ্য বিয়ে করে নিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু তার আর কী দরকার! ওখানেই যখন বারবার থাকব তখন ওদিকেই বিয়ের সুবিধে। তাই মেয়েটাকে সব বুঝিয়ে কাটিয়ে দিয়ে যাব। ভাল হবে না?

অমিয় মাথা নেড়ে বলে—হবে।

রজতকে খুশি দেখায়। সে একবার শিস্ দেয়, দু'কলি গান গুণ গুণ করে গায়।

কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হচ্ছে। কেউ আসছে। টপ করে নিজের অজান্তেই উঠে পড়ে অমিয়।

—রজতবাবু, কেউ এলে কাটিয়ে দেবেন। আমি বোসের ঘরে ফোন করতে যাচ্ছি।

রজতের অভ্যাস আছে। অনেকদিন ধরেই অমিয়র সময় ভাল যাচ্ছে না। রজত মাথাটা হেলিয়ে একটু হাসল—ঠিক আছে ঠিক আছে। বাগচী, উই আর কমরেডস আফটার অল—

সিঁড়ি দিয়ে যে উঠেছে সে যে-ই হোক অল্পের জন্য অমিয়কে ধরতে পারল না। অন্ধকার প্যাসেজটা প্রায় লাফিয়ে পার হয়ে এল অমিয়।

বোস বুড়ো মানুষ। দুই ভাই পাশাপাশি চেয়ারে বসে থাকে। এক সময়ে ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার হিসাবে একটু নাম ছিল। এখন কিছু নেই। অফিস আছে। এই পুরো তিনতলাটা তাদের লীজ নেওয়া। লীজ নিয়ে কল্যাণের তৃষ্ণা, এবং আরও কয়েকজনকে অফিস ভাড়া দিয়েছে। ওইটাই আয় এখন। জটাওয়ালা একজন তান্ত্রিক এসে প্রায়ই দুই ভায়ের মুখোমুখি বসে থাকে। আজও আছে। ঠাণ্ডা অন্ধকার ঘরে তিনজন বয়স্ক, নিস্তব্ধ মানুষ। কোন কাজ নেই।

টেলিফোনটার সামনে একটু দাঁড়ায় অমিয়। কাকে ফোন করবে বুঝতে পারে না। কোন নম্বর মনে আসে না। তবু হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নেয়, ডায়াল টোন শোনে। কিড়-কিড় শব্দ হয়। কোন নম্বর মনে আসে না। তবু অমিয় আঙুল বাড়ায়। দুইয়ের গর্তে আঙুল ঢুকিয়ে ডায়াল ঘোরায়। তারপর তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত—। অপেক্ষা করে। টেলিফোন একটু নিস্তব্ধ থাকে। তারপর খুট করে একটা শব্দ হয়। পরমুহূর্তে হঠাৎ অমিয়কে চমকে দিয়ে ওপাশে একটা দীর্ঘ টানা মুমূর্ষু চীৎকার শোনা যায়—অমিয়—ও—ও, অমিয়—ও—ও, অমিয়—ও—ও—

অমিয় কেঁপে ওঠে প্রথমে। 'কে?' বলে চীৎকার করতে গিয়েও থেমে যায়। তারপর বুঝতে পারে, ওটা এনগেজ্‌ড্ সাউণ্ড। ধীর কান্নার মত বিষণ্ণ শব্দ। কতবার শুনেছে সে। আসলে মনটা ঠিক জায়গায় নেই। ফোনটা আবার রেখে দেয় অমিয়। দাঁড়িয়ে থাকে। একটু আগে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে কে উঠে এল তা ভাবতে চেষ্টা করে। অন্ধকার সিঁড়িতে আবছায়া নতমুখ একটা অবয়বকে এক ঝলক দেখেছিল। একটু সময় কাটানো দরকার।

আবার ডায়াল ঘোরায় অমিয়। সম্পূর্ণ আন্দাজে। কোন নম্বরে আঙুল তা তাকিয়ে দেখে না। । খুব খিদে পেয়েছে অমিয়র। মুখটা তেতো-তেতো। বোধহয় পিত্তি পড়েছে। সকাল থেকে সে প্রায় কিছুই খায়নি। মাথাটা ঘোরে। শরীর দুর্বল লাগে। এর পর থেকে অফিসের নীচে, খোলা রাস্তায় আর স্কুটারটা রাখা যাবে

না। নীচে স্কুটারটা দেখে সবাই বুঝতে পারে, অমিয় অফিসে আছে। আহমদকে বলবে একটা গোপন জায়গায় বন্দোবস্ত করতে। ঘড়ির দোকানের পাশে একটা এঁদো গলি আছে—সেখানে রাখলে কেমন হয় ?

ফোনটা কানে চেপে ধরে থাকে অমিয়। ডায়াল টোন থেমে গেছে। এইবার নম্বর আসবে। অমিয় অপেক্ষা করে। স্পষ্ট শুনতে পায় ওপাশে দু-একটা কলকব্জা নড়ছে, লিভার উঠছে। প্রথমে ভার্টিকাল তারপর হোরাইজণ্টাল খোঁজ শুরু করে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। কিন্তু নম্বরটা খুঁজে পাচ্ছে না। খুঁজছে—প্রাণপণে খুঁজছে যন্ত্রটা। খুঁজে পাচ্ছে না। অমিয় অপেক্ষা করে। যন্ত্রের শব্দ থেমে যায়। নম্বরটা কি পাবে না অমিয় ? সে অপেক্ষা করে।

যন্ত্রটা অস্ফুট শব্দ করে, তারপর প্লাগ দেয়। রিং করার শব্দ হয় না, এনগেজড্ থাকারও শব্দ হয় না। কিন্তু তবু কনেকশন ঠিকই পায় অমিয়। স্পষ্ট বুঝতে পারে, ওপাশে টেলিফোন হাতে নিয়েছে এক গভীর নিস্তব্ধতা। সেই নিস্তব্ধতায় খুব উঁচু থেকে বালিয়াড়ি নেমে গেছে বহুদূরে। ধু ধু বালিতে শব্দহীন জ্যোৎস্না পড়ে আছে। হাড়ের মতন সাদা বালি—গড়ানে—তারপর অন্ধকার জেটি, ঘোলা জল। শেয়ালের চোখের মত চক চক করে ওঠে জোনাকিপোকা। এ-পাড়ে দিনের আলো থেকে ও-পাড়ে গভীর রাতের মধ্যে চলে যায় টেলিফোন। সেখানে বাতাসের শব্দ নেই, জলের শব্দ নেই। বালির ওপরে একটা সাপের খোলস উল্টে পড়ে আছে। বালিতে ঢেউয়ের দাগ। বহু দূর-দিগন্তব্যাপী সেই নিস্তব্ধতা টেলিফোন ধরে থাকে ওপাশে। অমিয় সেই নিস্তব্ধতাকে শোনে।

ক'দিন ধরেই ইঁদুরের খুটখাট সারা বাড়িময় শুনছে হাসি। কখনো ওয়ার্ডরোবে, কখনো খাটের তলায়, জুতোর র‍্যাকে, রান্নাঘরে। অবিরল দাঁতে কেটে দিচ্ছে সংসার। নিশুতি রাতে ঘুম ভেঙে মাঝে মাঝে শুনেছে এক ঘর থেকে আর এক ঘরে চিঁ-চিক-চিক আনন্দিত চিৎকার ছুটে যাচ্ছে। কুড়-কুড়-কুড়-কুড় কাটার শব্দ হয়েছে। হাসি তেমন গা করেনি। কাটছে কাটুক।

সকালে অমিয় বেরিয়ে যাওয়ার পরই হাসি গোছগাছ করতে বসেছে। থাকে থাকে শায়া, ব্লাউজ, ব্রেসিয়ার জমে গেছে। এতসব পরার সময় হয় নি। ট্রাঙ্ক ভর্তি রয়েছে শাড়ি, র‍্যাকে নানারকমের জুতো, ড্রেসিং টেবিলে সাজগোজের অসংখ্য টুকি-টাকি। এসব কিছুই নেবে না সে। দু-চারটে মাত্র নেবে···যা নাহলে নয়।

নীচের থাক নাড়া দিতেই হাসি দেখতে পায় ইঁদুরের কাটার চিহ্ন। তার শায়া, ব্লাউজ, ব্রেসিয়ারের এখানে-সেখানে ফুটো। গরম-জামার থাক ভর্তি জামাকাপড় কেটে রেখেছে। কত কি কেটেছে দেখার জন্য হাসি সব জামাকাপড় নামিয়ে মেঝেতে স্তূপ করে। একটা পুরোনো ফুলহাতা সোয়েটারে জড়ানো দু-বাণ্ডিল চিঠি। চিঠির বাণ্ডিল তুলতেই ঝুর-ঝুর করে কাগজের টুকরো ঝরে পড়ে। অমিয় দু দফায় দিল্লি আর কানপুর গিয়েছিল। প্রথমবার দু-মাস, দ্বিতীয়বার মাসখানেকের জন্য। আর দুবার বাপের বাড়িতে গিয়ে কিছুদিন করে ছিল হাসি। সেইসব সময়ে অমিয় লিখেছিল এইসব চিঠি। ইঁদুর নষ্ট করে গেছে। সবচেয়ে ওপরের চিঠিটা খুলে কয়েক পলক দেখে

হাসি। ছিদ্রময় প্রেমপত্র। 'প্রিয়তমাসু…' হাসি পড়তে থাকে…'তোমার জন্য ভীষণ (ফুটো) হয়ে আছি। কবে আসছ? তোমার জন্য এমন (ফুটো) লাগছে যে কি বলব। আমার (ফুটো) ভিতরটা তো তুমি (ফুটো) পাও না…রাণী আমার, আমার (ফুটো), কবে (ফুটো)? তোমার জন্য আমি সব (ফুটো) পারি। তাড়াতাড়ি চলে (ফুটো)…'

হাসি একটু হাসে। চিঠিটা দেখে নয়। প্রেমপত্র লিখতে অমিয় জানে না। দু-চারটে দুর্দান্ত এলোমেলো আবেগের লাইন লিখেই তার সব কথা ফুরিয়ে যায়। কোনো ইনল্যান্ডের একটার বেশী ফ্ল্যাপ ভর্তি করতে পারেনি সে।

ছিদ্রময় এই চিঠিগুলো নিয়ে কি করবে তা ঠিক করতে পারে না সে। নিয়ে যাবে? নাকি পুড়িয়ে ফেলবে? ভাবতে ভাবতেই আবার পুরনো পুলওভারে চিঠিগুলো জড়িয়ে ওয়ার্ডরোবে আগের জায়গায় রেখে দেয়। থাকগে। থাকতে থাকতে একদিন পুরোনো হয়ে হয়ে ধুলো হয়ে যাবে আপনা থেকে।

মধুকে ডেকে হাসি ন্যাপথলিন আনতে বলে, আর ইঁদুর মারা বিষ। তারপর একে একে ট্রাংক বাক্স, স্টিলের আলমারী—সবই খুলে ফেলে সে। জামাকাপড় নামায়, ছিদ্র খুঁজে দেখে। সব জায়গাতেই হয়েছে ইঁদুরের দাঁতের দাগ। ভিতরে ভিতরে সব ফোঁপরা করে দিয়ে গেছে। আবার সব গোছ করে তুলতে বেলা গড়িয়ে যায়। সঙ্গে নেওয়ার জন্য সাদামাটা কয়েকটা জামাকাপড় আলাদা করে রাখে হাসি। দু একটা প্রসাধন। কিছু টাকা। কবে যাওয়া হবে তার কিছু ঠিক নেই। দার্জিলিং মেলে এখন সামার-রাশ। জামাইবাবুকে রিজার্ভেশন করতে বলা আছে।

ঘর-দোর আবার ঝাঁট দেয় হাসি, আটার গুলিতে বিষ মিশিয়ে রাখে ওয়ার্ডরোবে, খাটের তলায় রান্নাঘরে। স্নান করে খেয়ে উঠতে বেলা দুটো বাজে।

মেঝের শতরঞ্জি পেতে একটু গড়িয়ে নেয় হাসি। মেঝে থেকে শীতভাব উঠে আসে শরীরে। বাইরে রোদের মুখে ছায়া পড়েছে। মেঘ করল নাকি! বুকের ওপর সিলিং ফ্যানটার ঝকঝকে ইস্পাতের রঙের ব্লেডগুলো একটা প্রকাণ্ড স্থির বৃত্ত তৈরী করেছে। ঘূর্ণিঝড়ের মত। বাতাস নেমে এসে মেঝেতে চেপে ধরে হাসিকে! মধু রান্নাঘর ধোলাই করছে। কলঘরে জলের শব্দ। দূরে মেঘ ডাকছে। জানালা-দরজায় সবুজ পর্দা ফেলা। ঘরে একটা সবুজ আভা। হাসি একটু চেয়ে থাকে, কিন্তু কিছুই দেখে না। দেখার জন্য সে চেয়েও নেই। দুই ঘরের এই যে ছোট্ট বাসা, এই কি সংসার? খাট, আলমারী, খাওয়ার টেবিল, ড্রেসিং টেবিলের আয়না—দৃশ্যমান যা কিছু আছে, যা ধরা-ছোঁয়া যায় তার কোনোটাই কি মানুষের সঙ্গে আর একটা মানুষকে আটকে রাখতে পারে? ঘরে দরজা দিয়ে দাও, শরীরে শরীর মিশিয়ে ফেল, সারাবেলা বল ভালবাসার কথা, পোষা পাখীর মত, ওয়ার্ডরোবে জমে উঠুক প্রেমপত্র—তবু কিছুই প্রমাণ হয় না। সরকারী দপ্তরে হাসি আর অমিয়র বিয়ের দলিল নব্বই একশো বছর ধরে জমা থাকবে অতদিন ধরে তাতে লেখা থাকবে যে তারা আইনগত ভাবে স্বামী-স্ত্রী। তবু কিছুই প্রমাণ হয় না। হাসি পাশ ফিরে শোয়।

খামের ওপর সাঁটা একটা ডাকটিকিট জলে ভিজিয়ে খুব সাবধানে তুলে নিচ্ছে হাসি। খামের ওপর টিকিটের চৌকো চিহ্ন একটা থেকে যাবে—থাকগে। নাকি

কোনদিনই টিকিটটা ঠিকমত সাঁটা ছিল না থামের গায়ে? দুটো শরীর কেবল পরস্পরকে ডাকাডাকি করেছে এতকাল? মন নয়, বিশ্বাস নয়, নির্ভরতা নয়।

ছেলেবেলা থেকেই তার মন বলত—কলকাতা কলকাতা!

গরীব ঘরেই জন্ম হয়েছে হাসির। তার বাবা কাছাড়ের এক ছোট্ট চা বাগানের কেরানী। তারা ছয় ভাইবোন। হাসি চতুর্থ। লেখাপড়ার কোন সুযোগ ছিল না। শিলচরে থাকত এক মাসী, তার ছেলেমেয়ে নেই। সেই মাসিই নিয়ে গেল হাসিকে, পালত পুষত। শিলচর কলেজ থেকেই সে বি-এ পাস করে, শিলচরেই শেখে মণিপুরী নাচ। লেখাপড়া, নাচ, গানবাজনা—এ সবই হাসি শিখত প্রাণ দিয়ে। এই সব লোকে শেখে কত কারণে। হাসির কারণ ছিল ভিন্ন। হাস্যকর সে কারণ, তবু কত সত্য।

ছেলেবেলা থেকেই তার মন বলত—কলকাতা, কলকাতা! চা-বাগানে তার ছেলেবেলা কেটেছে। চারদিকে ঘন গাছের বেড়াজাল, বৃষ্টি পড়ত খুব, আবার রোদ উঠলে চা-পাতার মাতলা গন্ধে ম-ম করত বাতাস। রাতে কেউ ডাকত, শেয়াল কাঁদত, তাদের বাড়ির আনাচে-কানাচে এঁটোকাঁটা খেতে আসত শুয়োরের মত মুখওয়ালা বাগডাশা। ঝিঁঝিঁর ডাক রাতে অরণ্যকে গভীর করে তুলত। শীতকালে পড়ত অসহ্য শীত, মাটির ভাপ কুয়াশার মত হয়ে বর্ষাকালে চরাচর আড়াল করত। পাহাড়ী পথ হঠাৎ বাঁক ঘুরে রহস্যে হারিয়ে যেত। তারা ভাইবোনেরা উৎরাই ভেঙে দৌড়ে দৌড়ে খেলত ছোঁয়াছুঁয়ির খেলা। দীনদরিদ্র ছিল তাদের পোষাক, আসবাব। তাদের ছোট্ট বাড়িটিতে তাদের অতজনের ঠিক আঁটত না। সেই বাগানে তার ছেলেবেলায় প্রথম বাবার কাছে কলকাতার গল্প শোনে। বেশিরভাগই কলকাতার দৃশ্যের গল্প। গাড়িঘোড়া আলো দোকান আর লোকজনের গল্প। বাবা গল্প বলতেন সুন্দর আস্তে আস্তে, সময় নিয়ে প্রতিটি দৃশ্য যেন নিজেও প্রত্যক্ষ করতেন। সেই সব গল্পে তাঁর যৌবনকালে কলকাতার ছাত্রজীবনের নানা দীর্ঘশ্বাস মিশে থাকত। আর থাকত কলকাতা ছেড়ে আসবার বিরহ-যন্ত্রণা। হাসির মনে সেই প্রথম কলকাতার নাম বীজের মত ঢুকে যায়। সে বাবাকে বলত—চল না বাবা, কলকাতা যাই। বাবা স্থির থেকে বলত - দূর! আর যাওয়া হবে না। সেখানে আমাদের আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই, কোন কাজও নেই সেখানে, খামোখা টাকা-পয়সা খরচ করে চারদিনের রাস্তার ধকল সয়ে কার কাছে যাব? হাসির মন বলত—কেন, কলকাতার কাছে।

শিলচর ছিল সুন্দর ছিমছাম শহর। লোকজন বেশী না, গাড়িঘোড়া বেশী না, চারদিকে জঙ্গল-ঘেরা ছোট্ট শহর। সেখানে মাসীর বাড়িতে এসে সে প্রথম শহরের স্বাদ পায়। সুন্দর সেই স্বাদ। তখন তার মনে কলকাতার বীজটি ফেটে অঙ্কুর দেখা দিয়েছে। সে বুঝতে পারে—শহর—শহরের মত জায়গা নেই। সাত বছর সে শিলচরে কলকাতার আরো বিচিত্র গল্প শোনে বন্ধুবান্ধবীর কাছে। মাসীদের আত্মীয় হারু-কাকার ক্যান্সার হয়েছিল, সে গেল চিকিৎসার জন্য কলকাতায়। শচীন নামে কলেজের একটি ছেলে বেশ কবিতা লিখত, সে গেল কলকাতায় বড় কবি হওয়ার জন্য। অনুরাধা ক্লাসিকাল গাইত গোহাটি রেডিও থেকে। সে প্রায়ই বলত—মফস্বলে কিছু হয় না, শিখতে হলে যেতে হবে কলকাতা। হাসির মন বলতে থাকে—কলকাতা, কলকাতা!

তুমি গান গাও? নাচো? কবিতা লেখো? তুমি চাকরি চাও? উন্নতি চাও? তোমার মরাণাপন্ন অসুখ! তবে কলকাতা যাও। যাও কলকাতায়। একবার কলকাতা থেকে ঘুরে এস। মানুষকে কলকাতা সব দিতে পারে। খ্যাতি, টাকা, প্রাণ পর্যন্ত। কলকাতা থেকে যারা শিলচরে ফিরে যায় সেই সব বন্ধুদের কাছ ঘেঁসে কলেজে বসত হাসি। দেখত—ঠিক। ওদের মুখে-চোখে আলাদা দীপ্তি, ঝলমলে আনন্দিত ওদের পোশাক, গায়ে কলকাতার মিষ্টি গন্ধ। মাসীকে বলত—মেসোকে বলত—কী গো তোমরা! ভারী ঘরকুনো, চল একবার কলকাতা যাই। মাসী মেসো সমস্বরে বলত—সে ভারী দূরের রাস্তা, পথের কষ্ট খুব, একগাদা টাকা খরচ, তা সেখানে গিয়েই বা হবে কী? যা ভীড়, গণ্ডগোল, মারপিট—আমাদের মত সুন্দর নিরিবিলি শহর নাকি সেটা? চোর পকেটমার, রকবাজ ছেলে, রাজনীতি—দূর দূর—

যাওয়া হত না। হত না বলেই হাসির কল্পনায় কলকাতা ক্রমে ক্রমে এক বিশাল ব্যাপক রাজত্ব স্থাপন করে। কলকাতায় যেন বা আলাদা সূর্য ওঠে, আলাদা চাঁদ, কলকাতা শূন্যে ভাসমান বুঝি বা। কলকাতাকে ঘিরে যে সব কল্পনা হাসির—সে সব কল্পনা কলকাতার দিগ্বিজয়ী সৈন্যদলের মত তার ভিতরটা তছনছ করে দিয়ে যেত। কলকাতা কল্পনা-লতা তার ওপর দুচোখের পল্লবের ছায়া ফেলেছিল। কলকাতা বলে কোথাও কিছু নেই তবে। লোকে কেউ কখনো যায় নি। সবাই মিলে যোগাযোগ করে বানিয়েছে গল্প। যারা কলকাতার কথা জানে তারা, নিজেদের মধ্যে চোখ টেপাটেপি করে, কানাকানি করে, যুক্তি করে, হাসিকে এক কাল্পনিক শহরের কথা শোনায়। কলকাতার খণ্ডিত ছবি সে অনেক দেখেছে ভূগোলের বইতে, খবরের কাগজে, ক্যালেণ্ডারে। কখনো জি-পি-ও-র ঘড়ি, হাওড়া ব্রীজ, ভিক্টোরিয়া, মনুমেণ্ট, তা থেকে কিছুই বোঝা যায় না। ক্রমে সে বুঝতে পারে, কলকাতার দৃশ্য নয়, রাস্তা ঘাট আলো নয়; নয় তার দোকান-পাট কিংবা বিচিত্র পসরা—এ সবের অতীত, কিংবা এসব মিলিয়ে কলকাতা এক মন্ত্রের মত। কিংবা কলকাতা কি জ্বলন্ত পুরুষ, তার বুকে রহস্যের শেষ নেই, সীমাহীন তার নিষ্ঠুর উদাসীনতা, চুম্বকের মত তার আকর্ষণ! দূর দুরান্ত থেকে, প্রেমিকারা চলেছে কলকাতার দিকে! কেবলই চলেছে!

কলকাতা এক প্রেমিকেরই নাম। জ্বলন্ত দুর্বার এক প্রেমিক পুরুষ। কলকাতায় একবার গেলে আমি আর ফিরব না, ভাবত হাসি।

হাসি লেখাপড়া শিখত কলকাতায় যাবে বলে। গান শিখত, নাচ শিখত—কলকাতায় যেতে হলে কোনটা যে দরকার হবে, কোনটার সূত্রে কলকাতায় যাওয়া হবে তা বুঝতে পারত না। কিন্তু হাস্যকর হলেও এ কথা খুবই সত্য যে তার সব কিছুর পিছনেই ছিল কলকাতা, কলকাতা। বিয়ের সম্বন্ধ মাসীই খুঁজছিল। হাসি একদিন খুব লজ্জার সঙ্গে তাকে বলে—যদি বিয়ে দাও তো কলকাতায় দিও। মাসী অরাজী ছিল না। কিন্তু অত দূরের পাল্লায় ঠিকমত যোগাযোগ কে করে!

সেই সময়ে ডিগবয়ের তেল কোম্পানীর এক এঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে চমৎকার সম্বন্ধ এসে গেল হাসির। বিলেত-ফেরত ছেলে, বেশ স্মার্ট চেহারা, দেড় দুই হাজার মাইনে। হাসিকে পাত্রপক্ষ পছন্দও করে গেল। মণিপুরী নাচে, রবীন্দ্র-সঙ্গীতে শিলচরে তখন হাসির বেশ নাম। রঙ চাপা হলেও বড় সুশ্রী ছিল হাসি। সবাই জানত হাসির

ভালই বিয়ে হবে। হয়েও যাচ্ছিল। পাত্রের ঠাকুমা মারা গিয়েছিল মাস আষ্টেক আগে, চারমাস পর কালাশৌচ কাটবে। তখন অস্থি বিসর্জন দিয়ে বিয়ে হবে—ঠিক হয়েছিল। হয়ে গেল পাটিপত্র, এমন কি আশীর্বাদের ব্যাপারে কালাশৌচ ওঁরা মানেননি। হাতে তখন চার মাস সময়। মাসীর অ্যালবামে পাত্রের ফটো সাঁটা হয়ে গেছে, পাশে হাসির ফটো। মাসী মাঝে মাঝে হাসিকে অ্যালবামের সেই পাতাটা খুলে দেখাত—দ্যাখ হাসি!

হাসির মন বলত—কলকাতা, কলকাতা। বহু দূরে এক বিশাল পর্বতের মতো বীর্যমান পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে। চতুর্দিককে কেন্দ্রাভিগ আকর্ষণে টানছে চুম্বক পাহাড়ের মত। সেখানে গেলে ফিরত না হাসি। যাওয়া হবে না কি!

কাছাড়ের এক লোকনাট্য দল সেবার কলকাতায় যাচ্ছে। তারা হাসিকে দলে নিতে রাজী। হাসি মাসীকে গিয়ে ধরল—এখনো চারমাস বাকী। একবার ঘুরে আসি মাসী। মাত্র তো পনেরোটা দিন।

—বিয়ের আগে কলকাতায় গিয়ে নাচবি গাইবি, সেটা কী ভাল দেখাবে? পাত্রপক্ষ যদি কিছু মনে করে!

হাসি হাসে—কলকাতার জলে রঙ ফর্সা হয়, জানো না?

অনেক বলা-কওয়ায় মাসী রাজী হল।

কলকাতা কী রকম দেখতে, তা আজও হাসি সঠিক জানে না। প্রথম দিনের মতই। বহুদূর থেকে একটা যৌবনকালের প্রতীক্ষা নিয়ে সে যখন কলকাতায় নামল তখন আর রাস্তার কষ্টের কথা মনেও ছিল না. খুব পিপাসা পেয়েছিল, বিবেকানন্দ ব্রীজ পেরিয়ে আসার সময়ে যে গুম গুম আওয়াজ করেছিল রেলগাড়ি, সেই আওয়াজ শিয়ালদা পর্যন্ত তার বুকের ভিতরে কলকাতার শব্দতরঙ্গ তুলেছিল। শিয়ালদার ঘিঞ্জি কলকাতা সে তো চোখে দেখেনি। শুভদৃষ্টির সময়ে কেউ কী বরের মুখ ঠিকঠাক দেখতে পায়, নির্লজ্জ ছাড়া? সে গাড়ি থেকে প্লাটফর্মে পা দিতেই এক দুরন্ত পুরুষের প্রকাণ্ড উষ্ণ বুকের মধ্যে চলে এল। গর্জমান এক কামুক পুরুষ যার শিরা-উপশিরায় প্রাণস্রোত, যার আদরে অবহেলায় সর্বক্ষণ জীবন বয়ে যাচ্ছে। সেই প্রথম পুরুষটির আদরে লজ্জায় চোখ বুজেছিল বুঝি হাসি। চোখ আর খোলা হল না। কলকাতা তার চারদিকে সর্বক্ষণ এক শিশু বয়সের বিস্মৃত রঙীন মেলার মত কাল্পনিক হয়ে রইল।

জ্যাঠতুতো দিদির বাড়িতে উঠেছিল হাসি, চিৎপুরের এক ফ্ল্যাটবাড়িতে। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে সে একদিন লোকনৃত্যের অনুষ্ঠানও করল। কিন্তু সারাক্ষণ সে কেবলই তার শিরায় শিরায় উল্লসিত রক্তের স্পন্দনে কলকাতার শব্দ শুনল। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে থেকে টের পেল তার যুবতী বুক কলকাতার পাথুরে বুকের সঙ্গে মিশে আছে। একের হৃদস্পন্দন মিশে যাচ্ছে আর একজনের সঙ্গে। আমি তোমাকে ছেড়ে কী করে আবার ফিরে যাব—মনে মনে বলত হাসি।

পাশের ফ্ল্যাটে এক দম্পতি ছিলেন, আর ছিল অমিয়। দম্পতি অমিয়রই দিদি জামাইবাবু। এ ফ্ল্যাটে হাসিরও দিদি জামাইবাবু। দুই পরিবারে যাতায়াত ছিল। সামনের বারান্দাটা কমন। সেইখানে দাঁড়িয়ে কলকাতা দেখতে দেখতে হাসি কতদিন

দেখেছে পাশের ফ্ল্যাট থেকে সুন্দর পোশাক পরে অমিয় বেরোচ্ছে, নীচে রাস্তায় রাখা তার স্কুটার। স্কুটারে চলে যেত ছেলেটা, যাওয়ার আগে তাকে লক্ষ্য করত। কিন্তু অমিয়কে কেন লক্ষ্য করবে হাসি ? কলকাতার প্রেমিকা কেন গ্রাহ্য করবে অন্য পুরুষকে ?

দুই পক্ষের দিদি জামাইবাবুরা প্রায় রাতেই খাওয়ার পর কিছুক্ষণ ফিস খেলার আসর বসাতেন। হাসি থাকত, অমিয়ও। দুপক্ষের কথাবার্তা মাঝে মাঝে হাসি আর অমিয়কে ঘেঁষে যেত। সে সব ঠাট্টার গুরুত্ব ছিল না। হাসির দিদি জামাইবাবু জানতেন হাসির বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।

হাসি অমিয়কে তেমন করে লক্ষ্য করত না ঠিকই, কিন্তু তার মন বলত—কলকাতা, কলকাতা।

অমিয় খুব বেশীমাত্রায় লক্ষ্য করেছিল হাসিকে। কতটা তা হাসি টের পায়নি। কিন্তু একদিন অমিয় খুব দুঃসাহসের সঙ্গে প্রস্তাব করেছিল—চলুন, আমার স্কুটারে আপনাকে কলকাতা দেখিয়ে আনি। প্রথমদিন হাসি রাজী হয়নি। কিন্তু কয়েকদিন পরে হয়েছিল। কলকাতার মেয়াদ তখন শেষ হয়ে এসেছে। কয়েকদিন পরই হাসি চলে যাবে।

মসৃণ, সুন্দর ক্যাথিড্রাল রোড হয়ে ময়দানের দিকে স্কুটার ছুটিয়ে অমিয় প্রস্তাব দিয়েছিল—যদি কিছু মনে না করেন—

কলকাতা—কেবলমাত্র কলকাতার জন্য হাসি থেকে গেল। কয়েকটা কাগজপত্রে সই করে বিয়ে, বাড়িতে চিঠি লিখে ব্যাপারটা জানানো, তারপরই ঢাকুরিয়ার ফ্ল্যাট।

হাসির মন বলত—কলকাতা, কলকাতা!

হাসির জীবনে অমিয় কোথাও ছিল না। যৌবনকালে একশো ছেলে ভালবেসেছে হাসিকে। শিলচর জুড়ে ছিল তার প্রেমিকেরা। তাদের মধ্যে ছিল আসামের রঞ্জি ট্রফির ক্রিকেট খেলোয়াড়, কবি, অধ্যাপক, ছাত্রনেতা, ভবঘুরে। তাদের অনেকের সঙ্গে হাসির দীর্ঘকালের সম্পর্ক। কোথায় ছিল অমিয়! পাত্র হিসেবেও অমিয় তো কিছুই না। সদ্য ব্যবসা শুরু করেছে! কয়েকটা অর্ডারে লাভ পেয়ে কিনেছে স্কুটার, দুহাতে টাকা ওড়ায়, পোশাক কেনে। সেই অমিয় হাসির জীবনে এসে গেল! এসে গেল, আবার এলও না। সারাদিন টাটা-বিড়লা হওয়ার আশায় সারা কলকাতা দৌড়-ঝাঁপ করে যখন অমিয় ফিরত, তখন সদর খুলে অমিয়কে দেখে একটু অবাক হয়ে এক পলকের জন্য হাসি ভাবত—আরে এ লোকটা কে ? স্বামী ? তার মনে পড়ত, সারাদিন সে অমিয়র কথা ভাবেই নি!

শরীরে শরীরে কথা হত ঠিকই। অমিয়র প্রথম দিকের ভালবাসা ছিল তীব্র, শরীরময়, আক্রমণাত্মক। হাসি সেই খেলায় আগ্রহভরে অংশ নিয়েছে। কিন্তু সে কতটুকু সময়ের ভালবাসা ? শরীর জুড়োলেই তা ফুরোয়। তারপর আর আগ্রহ থাকে না অচেনা পুরুষটির প্রতি। হাসি তখন থেকে নিষ্ঠুর।

চিৎপুরের দিদি-জামাইবাবু এসে বলতেন—হাসি, তোমার বাবা-মা আমাদের দোষ দিয়ে চিঠি লিখেছেন, আমরা কী লিখব ওদের ?

—দোষ! আপনাদের দোষ কী ?

—দোষ নেই ঠিকই, তুমি ভালবেসে বিয়ে করেছ, কিন্তু আমাদের বাসায় থেকেই তো ব্যাপারটা ঘটল!

boiRboi.net

ভালবাসা ! হাসি ভারি অবাক হত। ভালবাসা কিসের ! কাকে ! অমিয়কে ? অমিয়কে তো সে কোনকালে ভালবাসেনি। সে ভালবেসেছিল কলকাতাকে। বিশাল কলকাতার কতটুকু প্রতিদ্বন্দ্বী অমিয় ? অমিয়কে জানালায় এসে বসা চড়াইপাখীর মত তুচ্ছ মনে হত তার। যার সঙ্গে হাসির বিয়ে ঠিক হয়েছিল, বা তার শিলচরের অন্য প্রেমিকেরা—তাদের তুলনাতেও অমিয় কিছুই না। কিছুই না। অমিয় কেবল কলকাতায় হাসিকে আশ্রয় দিয়েছে।

বিয়ের ছ'মাস পরে মাসী আর মেসোমশাই এসেছিলেন।

—এটা কী করলি হাসি ? সেই ডিগবয়ের ছেলেটা বিয়েই করল না।

হাসি উত্তর দেয়, আমি যা চেয়েছিলাম, পেয়েছি।

—কী চেয়েছিলি ?

হাসি মুখে কিছু বলল না। মনে মনে বলল—কলকাতা।

তিন বছরে ডাকটিকিটটা ভিজে ভিজে আলগা হয়ে এসেছে। খামের গা থেকে এবার সাবধানে তুলে নেবে হাসি, একটা চৌকো দাগ থেকে যাবে কী ? থাক। শরীর বহতা নদীর মত, শরীরে কোন চিহ্ন থাকে না। অমিয়কে শরীরের বেশী দেয়নি হাসি।

সিলিংফ্যানের ঝকঝকে ইস্পাতের রঙের ঘূর্ণী বৃত্তটা দেখতে দেখতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল হাসি। উঠে দেখল রোদের মুখে বসেছে কালো মেঘ। গুড় গুড় শব্দ হচ্ছে। পুবের বাতাসে পর্দা উড়ে আসছে। উদ্ভিদহীন কলকাতায় প্রকৃতির বন্য গন্ধ নিয়ে আসে বৃষ্টি।

পাশ ফিরতেই খুব অবাক হয়ে হাসি দেখে, শতরঞ্জির একধারে তার মাথার কাছেই একটা ছোট্ট লালচে ইঁদুর মরে পড়ে আছে। শিশু শরীর ইঁদুরটার, উদোম ন্যাংটো, মুখে নির্দোষ একখানা ভাব, চুপ করে মরে গেছে কখন। আহা রে ! এত দূর এসেছিলি কেন ? কিছু বলতে চেয়েছিলি আমাকে ? লাল টুকটুকে হাত-পা, সুন্দর সতেজ লেজ, রেশমের মত রোমরাজি, ঠোঁটে গোঁফের নরম সাদাটে চুল। আস্তে আস্তে উঠে বসে হাসি। তার একটু কষ্ট হয়। বিষ সে নিজে মিশিয়েছিল।

উঠে মধুকে ডাকে হাসি—ঘরগুলো খুঁজে দেখ মধু. ইঁদুরগুলো কোথায় কোথায় মরে পড়ে আছে। পচে গন্ধ বেরোবে।

চারটে বেজে গেছে। জামাইবাবুকে একটা ফোন করা দরকার। রিজার্ভেশনটা যদি পাওয়া যায় !

জলে কলকাতার ভঙ্গুর প্রতিবিম্ব পড়েছে, ভেঙে যাচ্ছে। জল হলে এক কলকাতা অনেক কলকাতা হয়ে যায়। ঢাকুরিয়া থেকে বাস ধরে হাসি গড়িয়াহাটায় এসে পেট্রোল পাম্প থেকে জামাইবাবুর অফিসে টেলিফোন করে।

—জামাইবাবু, আমি হাসি।

—বল।

—আমার রিজার্ভেশনের কী হল ?

—হয়নি। দার্জিলিং মেলে ভীষণ ভীড় হচ্ছে। এখন সামার রাশ।

—রেলে যে কে আপনার বন্ধু আছে চেকার ?

boiRboi.net

—থাকলেই বা, সিটি বুকিংগুলো দেখে এস না। তিনদিন ধরে লাইন দিয়ে বসে আছে লোক—কোথায় কত টিকিটের কোটা আছে সব তাদের মুখস্থ, একটা টিকিট কম পড়লে আস্ত রাখবে?

—এত লোক যাচ্ছে কোথায়?

—কলকাতা থেকে পালাচ্ছে; আবার কলকাতায় পালিয়ে আসবে বলে।

—আমার মনে হয়, আপনি গা করছেন না।

—তা তো করছিই না।

—কেন?

—তুমি সুখের পাখী উড়ে যাবে, আর আমরা পড়ে থাকব হাঁফিয়ে ওঠা ভ্যাপসা কলকাতায়—তা কী হয়!

—আমার যে যাওয়াটা দরকার।

—কেন?

—যাব না কেন?

ওপাশে জামাইবাবু একটা শ্বাস ফেলে।

—হাসি, গতকাল অমিয় আমার কাছে এসেছিল।

হাসি তীক্ষ্ণ গলায় বলে—কেন?

—ভয় পেও না। সে তোমার চলে যাওয়া আটকানোর ষড়যন্ত্র করতে আসে নি।

হাসি চুপ করে থাকে।

—ও এসেছিল একটা স্টীমার ঘাটের কথা বলতে।

—স্টীমারঘাট!

—স্টীমারঘাট। ও আজকাল মাঝে মাঝে একটা স্টীমারঘাট দেখতে পায়।

—তার মানে?

—তার মানে তোমাকেই আমরা জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম।

—স্টীমারঘাটের কথা আমি কী জানি। কোথাকার স্টীমারঘাট।

—তার আগে বল, ওর ব্যবসার অবস্থা কী?

হাসি একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে—বোধহয় ভাল না। বাজারে অনেক ধার জমে গেছে।

—আর এ সময়ে তুমি সুখের পাখী উড়ে যাচ্ছ?

—আমি কী করব জামাইবাবু?

ওপাশে জামাইবাবু আবার চুপ।

—আমার রিজার্ভেশনের কী করবেন বলুন? কাছে-পিঠের রাস্তা হলে আমি রিজার্ভেশন ছাড়াই চলে যেতাম। কিন্তু চারদিন ধরে যাওয়া তো সে ভাবে সম্ভব না।

—দেখছি।

—আমার কিন্তু সময় নেই। আর পনেরো দিনের মাথায় খুশীর বিয়ে। তারপর ফিরে এসে স্কুলে জয়েন করব। বুঝলেন?

—বুঝেছি। কিন্তু অমিয়র স্টীমারঘাটের কী হবে?

boiRboi.net

—আমি কী জানি।
—হাসি, অমিয়র ওজন কত ?
হাসি হেসে ফেলে। বলে—আমি কী দাঁড়িপাল্লা ?
—না। কিন্তু বৌরা তো স্বামীর ওজন জানে। জানা উচিত।
—ফোন রেখে দেব কিন্তু।
—আমি ইয়ার্কি করছি না। অমিয়কে দেখে মনে হয় অন্ততঃ কুড়ি কে. জি. ওজন কমে গেছে।
হাসি একটা শ্বাস ফেলে। অমিয় বোধহয় তাকে ভালবেসেছিল। কিন্তু তাতে হাসির কিছু যায় আসে না।
—জামাইবাবু, আমি ওর সঙ্গে ঝগড়া করি নি। আমাদের মধ্যে কোন ভুল-বোঝাবুঝি নেই।
—তোমার দিদির সঙ্গে আমার রোজ চারবার করে ঝগড়া হয়, আর ভুল বোঝাবুঝি ? আমরা জীবনে কেউ কাউকে বুঝব না। কিন্তু গত চারমাসেও আমার ওজন দুই কে. জি. বেড়েছে।
—ওজনের কথা বলছি না।
—আমি ওজনের পয়েন্টেই স্টিক্ করতে চাই। হাসি, অমিয়র ওজন কমে যাচ্ছে কেন ?
—আমার রিজার্ভেশনের কথাটা মনে রাখবেন। ছেড়ে দিচ্ছি—
—ছেড়ো না। শোন, স্টীমারঘাটের কথা ও তোমাকে কখনো বলে নি ?
—না।
—আশ্চর্য !
—আশ্চর্যের কী ? ও আমাকে অনেক কথাই বলে না।
—কিন্তু স্টীমারঘাটের ব্যাপারটা বলা উচিত ছিল।
—কেন ?
—স্টীমারঘাটটা ও খুব স্পষ্ট দেখতে পায়. আর এমন ভাবে বলে যে আমিও যেন সেটা দেখতে পাই। শুনতে শুনতে কেমন যেন অদ্ভুত লাগছিল।
—কী রকম স্টীমারঘাট সেটা ?
—খুব উঁচু একটা বালিয়াড়ি বহুদূর গড়িয়ে নেমে গেছে...কিন্তু ফোনে অত সব বলা যায় না। তুমি ওর কাছে শুনো।
—আমি শুনব কেন জামাইবাবু ? আমার কৌতূহল নেই।
—তুমি আসাম থেকে কবে ফিরবে হাসি ?
—বললাম তো, খুশীর বিয়ে হয়ে গেলেই। ফিরে এসে স্কুলে জয়েন করব।
—সেটা তো ফেরা নয়। স্কুলে মানে বাগনানের কাছে যাবে, গ্রামে। কিন্তু তুমি অমিয়র কাছে কবে ফিরবে হাসি ?
হাসি উত্তর দেয় না। ফোনটা খুব আস্তে ক্র্যাডলে নামিয়ে রাখে।
আজ কলকাতা বৃষ্টির পর বড় সুন্দর সেজেছে। সূর্যের শেষ আলো সিঁদুর-গোলা রঙ ঢেলেছে রাস্তায় রাস্তায়। গড়িয়াহাটার বাড়িগুলোর গায়ে সেই অপার্থিব

boiRboi.net

রঙ। জলে ছায়াছবি। রাস্তাগুলো ভেজা, রাস্তার নীচু অংশে পাতলা জলের স্তর জমে আছে। সেই জল থেকে আলোর অজস্র প্রতিবিম্ব উঠে আসে। একা একা হাঁটতে বড় ভাল লাগছে হাসির। মোড়ের দোকানগুলোর শো-কেসে সে সুন্দর শাড়ীগুলো ঘুরে ঘুরে দেখল একটু। পায়ে পায়ে হাঁটতে লাগল। কী ভীড় চারদিকে! তবু এ ভীড় বড় রঙীন। বাগনান থেকে হয়তো প্রায়ই আসা হবে না, কিন্তু পুরোনো ভালোবাসার টানে ছুটি-ছাটায় ঠিক চলে আসবে হাসি, উঠবে চিৎপুরে দিদি জামাইবাবুর কাছে। একা একা ঘুরবে কলকাতায় যেমন সে গত তিনবছর ধরে ঘুরেছে এবং ক্লান্ত হয়নি। কলকাতার রূপ কখনো ফুরোয় না।

একটা মরা বেড়াল পড়ে আছে বৃষ্টিতে কাদায় মাখামাখি হয়ে। ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নামতে বেড়ালটাকে ডিঙিয়ে গেল হাসি। পচা গন্ধ, কাছেই বসে কোনো নেমন্তন্ন-বাড়ীর এঁটো-কাটার রাশ খবরের কাগজে জড় করে বসেছে এক ভিখিরি মেয়ে তার বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে। হাসি ট্রামলাইন পেরিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। তার মন বলে, আজও বলে—কলকাতা, কলকাতা।

চলে যাবে বলে উঠে দাঁড়িয়েছিল অমিয়, ঠিক সে সময়ে নিঃশব্দ পায়ে কালীচরণ এল। সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ হয়নি। অমিয় একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

—চলে যাচ্ছিলেন? কালীচরণ জিজ্ঞেস করে। তার মুখে ঘাম, উৎকণ্ঠা।

—হুঁ।

—আমি আপনার কাছেই এসেছিলাম।

অমিয় চুপ করে থাকে।

—গত দুমাস কিছু চাইনি। জানতাম আপনি অসুবিধেয় আছেন। কিন্তু এখন আমার বড় ঠেকা। পেমেণ্টের একটা তারিখ দিন এবার।

অমিয় জিজ্ঞেস করে—সিঁড়িতে তোমার পায়ের শব্দ হয়নি কেন কালীচরণ?

কালীচরণ একটু থমকে যায়। চেয়ে থাকে। অমিয় হাত বাড়িয়ে ওর ঘেমো হাতখানা ছুঁয়ে বলে—কাঠের সিঁড়িটা বড় পুরনো হয়েছে, বেড়াল বাইলেও শব্দ হয়। তুমি কী করে শব্দ না করে উঠলে? তুমি বেঁচে আছ তো! ভূত হয়ে আসনি তো কালীচরণ? কিংবা পাখায় ভর করে?

কালীচরণ একটু হেসে একটা ময়লা রুমালে মুখ মোছে। তার গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। হার্ডওয়ার বাজার যদিও কালীচরণের পায়ের তলায়, কিন্তু তবু বাইরের চেহারায় সে ভদ্রলোক থাকেনি। ময়লা মোটা ধুতি, গায়ে লংক্লথের হাফ-হাতা জামা, পায়ে টায়ারের চটি।

—বাগচীবাবু, আমার মেয়ের বিয়ে। তিনহাজার যদি আপনার কাছে আটকে থাকে তো আমি গরিব, কী দিয়ে কী করব?

অমিয় একটু চুপ করে থাকে। তারপর হঠাৎ বলে—দুটো সরকারী অর্ডার আছে কালীচরণ, পনের হাজার টাকার। করবে?

—আপনি পেয়েছেন?

boiboi.net

অমিয় মাথা নাড়ে—আমারই। কিন্তু আমি করব না। তুমি করো তো তোমাকেই ছেড়ে দিই।

কালীচরণ সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করে—আপনি কত পারসেণ্ট নেবেন?

—এক পয়সাও না। শুধু পেমেণ্টের জন্য আমাকে একটু সময় দাও।

—অর্ডার দেখি—বলে কালীচরণ হাত বাড়ায়।

অমিয় অর্ডারের কাগজপত্র বার করে দেয়।

কালীচরণ কয়েক পলক অর্ডারের কাগজপত্র দেখে বলে—মাত্র আট পারসেণ্ট উঁচু দর দিয়েছেন! তাও হচ্ছে একমাস দেড়মাস আগকার দর। গত একমাসে মেসিন পার্টস, কয়েল আর স্প্রীংয়ের দর দশ থেকে কুড়ি পারসেণ্ট বেড়েছে। পনেরো হাজার টাকার অর্ডার, অফিসার আর বিল ডিপার্টমেণ্টকে খাইয়ে হাজারখানেকও ঘরে তোলা যাবে না। পরিশ্রম পোষায়?

—তুমি করবে না?

কালীচরণ একটু হাসে—করব না কেন? ব্যবসা চালু রাখতে হলে কাজ ধরতেই হবে, লোকসান হলেও।

গায়ের জামা খুলে স্যাণ্ডো গেঞ্জি গায়ে রজত টেবিলের উপর শুয়ে ছিল। তার রায়চৌধুরী এখনো আসেনি। শুয়ে থেকেই মুখ ফিরিয়ে বলল—কালীচরণ, বাগচীর জায়গায় আমি হলে অর্ডার দুটো কেড়ে নিয়ে তোমাকে ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতাম।

—কেন?

—সরকারী অর্ডারের জন্য হাজারটা লোক হন্যে হয়ে ঘুরছে। তুমি ভদ্রলোক হলে লোকসানের কথা বলতে না। পনের হাজারে তোমার অন্তত ছ'হাজার মার্জিন থাকবে।

কালীচরণ বিড় বিড় করে বলে—দেনা-পাওনার কথা উঠলেই সব জায়গায় খিচাং—

রজত ধমক দিয়ে বলে—দেনা-পাওনা আবার কী। বাগচীর তিন হাজার ঐ অর্ডারে শোধ হয়ে গেল। আর এসো না।

—তার মানে? তিন হাজার টাকা আমি এখনো পাই—

—না পাও না। তোমাকে সেনগুপ্ত এনেছিল, তার আমলে তুমি সাপ্লায়ার ছিলে। পারো তো তাকে খুঁজে বের করো।

—তাকে পাব কোথায়?

—বাগচী তার কী জানে কালীচরণ? ছোট কোম্পানী, আট-দশ হাজার টাকা ক্যাপিটাল তুলে নিয়ে গেল, আর লায়বিলিটি সব রেখে গেল—এটা কী মগের মুল্লুক?

—আমি তার কি জানি!

—তোমাদের সঙ্গে সেনগুপ্তর ঘাট আছে, আমি জানি! সে-ই তোমাদের পাঠাচ্ছে তাগাদায়। যাতে বাগচী বিপদে পড়ে। বাগচী ভাল লোক কালীচরণ, দেনা সে সব মেনে নিচ্ছে, সরকারী অর্ডার বিলিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু মনে রেখো গড়বড় করলে ঝামেলা হবে।

কালীচরণ চুপ করে থাকে।

রজত হাই তুলে বলে—সকলের দিন সমান যায় না। বাগচী তোমাদের অনেক বিজনেস দিয়েছে। এখন বেরোও—

boiRboi.net

কেউ তার হয়ে বোঝাপড়া করুক, কিংবা তাকে করুণা করুক, এটা আজও পছন্দ করে না অমিয়। সেইটুকু অহংকার তার এখনো আছে। তবু সে কিছুই বলে না। চেয়ে থাকে।

দুর্বল চোখে একটু চেয়ে থেকে কালীচরণ উঠে পড়ে।

শ্লথ ভঙ্গীতে টেবিল থেকে রজত তার চেয়ারে নেমে বসে। অলস ভঙ্গীতে বুশ-শার্টটা চেয়ারের পিঠ থেকে খুলে নিয়ে গলায় দিতে দিতে অমিয়র দিকে তাকায়। চোখে ভর্ৎসনা।

কেমন লজ্জা করে অমিয়র। চোখ সরিয়ে নেয়। অর্ডার দুটো রাখবার জন্য তাকে অনেকবার কল্যাণ বলেছিল। তিন চার মাস কোন অর্ডার পায়নি অমিয়, এই দুটো পাওয়াতে দিন সাতেক আগে তারা তিনজন অফিসঘরে একটা ছোটো উৎসব করেছিল। সবীর থেকে রেজালা আর তন্দুরী রুটি এনেছিল, আর কে-সি দাসের সন্দেশ। কল্যাণ মুখার্জী, রজত সেন আর অমিয় বাগচী—তারা কেউ কারো বন্ধু নয়। একটা ঘরে তিনটে টেবিলে তাদের তিনটে আলাদা কোম্পানী। যে যার ব্যবসার ধান্দায় ঘোরে। রোজ দেখাও হয় না। কিংবা খুব কম সময়ের জন্য দেখা হয়। তবু কি করে যেন তাদের মধ্যে বুনো মোষের মত পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ততা এসে গেছে। তারা কেউ কখনো তিনটে কোম্পানীকে এক করার কথা বলেনি। তারা বন্ধুও নয়, তাহলে কী? তা ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু বাগচীর কিছু হলে আপনা থেকেই রুখে দাঁড়ায় মুখার্জী আর সেন, যেমন সেনের কিছু হলে রুখে ওঠে বাগচী আর মুখার্জী। বোধহয় এই ঘরটাই তাদের এই সম্পর্ক তৈরী করে দিয়েছে।

সেনের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে অমিয় মাথা নিচু করে ছিল।

রজত ইণ্ডিয়া কিংসের প্যাকেটটা ছুঁড়ে দেয় অমিয়র টেবিলে। বলে—আপনার ঠোঁটে সন্দেশের গুঁড়ো লেগে আছে বাগচী, মুছে নিন।

অমিয় একটু হাসে। সহজ হতে চেষ্টা করে। বলে—আমার দ্বারা সাপ্লাইটা হত না সেন।

রজত ভ্রূ কুঁচকে একটু তাকিয়ে থেকে বলে—গত তিন মাস আপনি বিজনেস পাননি বাগচী। এই অর্ডারটা ছাড়তে আপনাকে আমরা বারণ করেছিলাম।

—আমি পারতাম না।

—আমরা চালিয়ে দিতাম। আফটার অল উই আর কমরেডস।

রজত ওঠে। তার ডেস্ক, আলমারী বন্ধ করতে করতে হঠাৎ একটু হেসে বলে—জার্মানী থেকে আপনাকে কী পাঠাব বলুন তো! ঘড়ি? শেভার? নাকি কলম? তার চেয়ে জব ভাউচার একটা পাঠিয়ে দেব বরং—কী বলেন?

রজত নিজেই হাসে—কিন্তু মিসেসকে রেখে আপনি তো যাবেন না। গিয়েও শান্তি পাবেন না। ম্যারেডদের ঐ এক বিপদ।

সে কথার উত্তর না দিয়ে অমিয় তার গম্ভীর অন্যমনস্ক মুখ তুলে বলে—সেন, লক্ষ্য করেছেন কালীচরণের পায়ের কোন শব্দ হয় না!

—কী বলছেন? রজত ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে।

—বলছি, যাদের পায়ের শব্দ হয় না তারা খুব ডেঞ্জারাস। সেনগুপ্তরও হত না।

boiRboi.net

সেনগুপ্তর উল্লেখে রজতের মুখটা ঝুলে পড়ে। চাপা গলায় সে বলে—বাস্টার্ড। আপনাকে কী সেনগুপ্ত হিপনোটাইজ করেছিল বাগচী? কী করে তবে সে জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের টাকা তুলে নিল, আদায় করে নিল চার চারটে বিল-পেমেন্ট, সমস্ত লায়াবিলিটি কী করে আপনার ঘাড়ে ফেলে গেল?

অমিয় একবার হাত উল্টে তার অসহায়তা প্রকাশ করে মাত্র। কথা বলে না। হতাশ গলায় রজত বলে—ব্যবসা আপনার কর্ম নয় বাগচী। আপনি ভীতু হয়ে যাচ্ছেন, লোককে দাবড়াতে পারেন না।

সেনগুপ্তর পায়ের কোন শব্দ হত না—এই সত্যটা আবিষ্কার করে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে অমিয়। কালো ছিপছিপে সুপুরুষ এবং হিংস্র সেনগুপ্ত ছিল বার্ড কোম্পানীর চাকরে। চাকরি নামে মাত্র, সে ছিল কোম্পানীর টিমের নাম-করা গোলকীপার। খেলার জন্যই চাকরি পেয়েছিল। পোস্ট থেকে পোস্টে উড়ে শট আটকাত, বহুবার পেনাল্টি ধরেছে। অবধারিত একটা লিফট পেত, কিন্তু সেবার হাঁটুর মালাই-চাকী ভেঙে পড়ে রইল ছ'মাস। উন্নতির আর আশা নেই দেখে চাকরি ছেড়ে ব্যবসা করতে এল অমিয়র সঙ্গে।

তখন অমিয় মারাত্মক পোশাক পরত, দারুণ হাসত, পীচের রাস্তার মত গড়গড়ে ইংরেজী বলত। সাপের মত সাবলীল ছিল তার নড়াচড়া, ক্রুর চোখ, ঘন ভ্রূ। সেনগুপ্ত তার দিকে সম্মোহিতের মত চেয়ে থাকত। একটা সময় ছিল তখন সেনগুপ্তর মত বিপজ্জনক ছেলেকে নিপুণভাবে চালাত অমিয়। তখন সাপ্লায়ারেরা সাবধানে মাল দিত, ছ'মাস ন'মাস তাগাদা করত না। অর্ডার আসত ঝাঁকে ঝাঁকে। চোখা, চালাক, সাহসী অমিয় হিংস্র মারকুট্টা সেনগুপ্তকে ব্যবহার করত ব্যবসার ডেকর হিসেবে, কখনো তাকে বানাত দেহরক্ষী, কখনো তাকে আউটডোরে ঘুরিয়ে আনত সেলসম্যান হিসেবে। সেনগুপ্তকে তৈরি করেছিল সে-ই। তারপর কবে থেকে—কবে থেকে যেন—বহু দূরের এক অচেনা নির্জন ফেরীঘাট জাহাজের মত ধীরে অমিয়ের কাছাকাছি চলে আসতে থাকে। তখন থেকেই সে মাঝে মাঝে সেনগুপ্তর দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে চমকে উঠত। সে দেখতে পেত—তার সামনে স্বাভাবিক পোশাক পরা সেনগুপ্ত নয়—সেনগুপ্তর পরনে কালো শর্টস্, লাল টকটকে গেঞ্জী, দস্তানা পরা দুটো হাত থাবার মত উদ্যত হয়ে আছে, মাথায় টুপি, টুপির ছায়ায় দুটো আলপিনের মত চোখ, ফণা তুলে দুলছে এক হিংস্র গোলকীপার, অমিয়র সব রাস্তা বন্ধ করে সে দাঁড়িয়ে।

মানুষের পতনের কোন শব্দ হয় না। তবু আশপাশের কিছু লোক ঠিক কেমন করে টের পায়, এ লোকটার দিন শেষ হয়ে এসেছে। কোনদিন দীর্ঘ টেন্ডার টাইপ করতে করতে হঠাৎ চোখ তুলে সেনগুপ্ত হয়তো দেখেছিল, অমিয় ভীত চোখে তার দিকে চেয়ে আছে। কিংবা হয়তো কোনদিন অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করে দুজনে বেরোনোর সময় অন্ধকার সিঁড়িতে সেনগুপ্তর আগে আগে নামতে দ্বিধা করেছে। কিংবা এরকমই কোন তুচ্ছ কিছু লক্ষণ দেখেছিল সেনগুপ্ত। বুঝেছিল ব্যবসাতে অমিয়র দিন শেষ, তার শুরু। বুঝেছিল সাপ্লায়াররা, পারচেজাররা। বুঝেছিল আরো অনেকে। সবার শেষে বুঝেছে অমিয়। স্পষ্টই নিজের ভেতরে সে এখন এক দিনাবসান টের পায়, প্রত্যক্ষ করে সূর্যাস্ত। বহু দূর থেকে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে এক নির্জন ফেরীঘাট

তার জেটি, তার অতলান্ত জল অমিয় মুখ তোলে—কিছু বলছেন সেন ?

—একটা মেয়েকে কী করে রিফিউজ করতে হয় বাগচী ? আমি কোন ল্যাংগুয়েজ খুঁজে পাচ্ছি না। নাকি জার্মানীতে গিয়ে চিঠি দেব ?

অমিয় একটু হাসে—ল্যাংগুয়েজের দরকার হয় না সেন। রিফিউজাল মনে থাকলেও লোকে ঠিক বুঝে নেয়। ডোণ্ট বদার।

—মাইরি! তাহলে বেঁচে যাই।

অমিয় হাসে।

—চলি বাগচী। সিগারেটের প্যাকেটটা আপনি রেখে দিন। যদি রায়চৌধুরী আমার মোটর পার্টস নিয়ে আসে তবে আমার হয়ে ওর পাছায় তিনটে লাথি কষবেন—তিনটে—ভুলবেন না—

অমিয় অনেকক্ষণ বসে থাকে। অফিসঘরটা অন্ধকার হয়ে আসে। অমিয় আলো জ্বালে না। রাস্তার নানা আলোর ছায়াছবি এসে সিলিংয়ে কাঁপতে থাকে, দেয়ালে চমকায়। কাকের পাখার মত অবসাদ নেমে আসে অমিয়র শরীর জুড়ে।

বাড়ির দেয়ালের কোন গোপন কোণে হঠাৎ উঁকি দেয় এক অশ্বত্থ চারা। কেউ লক্ষ্য করে না। কলকাতায় শ্যাওলা জমে, দেয়ালের চাপড়া খসে পড়ে। কেউ লক্ষ্য করে না। কিন্তু ঐ ভাবেই অলক্ষিতে শুরু হয় একটা বাড়ির ক্ষয়। অমিয় নিজের ভিতরে সেই অশ্বত্থের গোপন চারাটিকে খুঁজছে। অনুসন্ধান করছে। শ্যাওলা জমল কোথায়, কোথায়ই বা খসে পড়ছে চাপড়া। খুঁজে পাচ্ছে না। কিন্তু এ তো ঠিকই যে সে সেনগুপ্তকে ভয় পেতে শুরু করেছিল একদিন। অথচ ভয়ের তেমন কারণ ছিল না। গোলকীপারের পোশাক বহুকাল আগেই ছেড়ে ফেলেছিল সেনগুপ্ত, খুলে রেখেছিল দস্তানা, ক্রমে হয়ে আসছিল অমিয়র বশংবদ। সাপুড়ে কবে আবার তার ঝাঁপির সাপকে ভয় পেয়েছে ?

কিন্তু এর জন্য তো সেনগুপ্ত দায়ী নয়।

সারা কলকাতা দৌড়-ঝাঁপ করত অমিয়, আর তার স্কুটার। সন্ধ্যাবেলা বাড়ির সামনে থেকে ভারী স্কুটারটা অবলীলায় টেনে তুলত সিঁড়ির তলায়, শিস দিয়ে সিঁড়ি ভাঙত অমিয়। ভাবত দরজা বন্ধ করেই সে এক সুন্দর জগতে চলে যাবে। কিন্তু প্রায়দিনই সে অর্গলহীন দরজা ঠেলে এক আবছা অন্ধকার ঘরে ঢুকত। পরিত্যক্ত বাড়ির মত ঘর। দেখত, হাসি তার জন্য প্রস্তুত হয়ে নেই। হয়তো শুয়ে আছে, কিংবা দাঁড়িয়ে আছে ব্যালকনিতে। মুখোমুখি হতে হাসির চোখে সে বিস্ময় দেখতে পেত। কোনদিন বা দেখত, হাসি ঘরে নেই।

পরস্পর আশ্লিষ্ট রতিক্রিয়ার সময়ে সে কি দেহসংলগ্ন হাসির শীৎকার শোনেনি ? অনুভব করেনি তার শিহরণ, বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনা ? লক্ষ্য করেনি মুখমণ্ডলে মুক্তোর মত স্বেদবিন্দু ? করেছিল। হাসির শরীরে অর্গলহীন দরজা খুলে ফেলে অমিয় দেখেছে, সেখানেও এক আবছা অন্ধকার ঘর—পরিত্যক্ত ঘরের মত নিরিবিলি—সেখানে হাসি সাজেগোজে চুল বাঁধে, আয়নায় দেখে মুখ, প্রতীক্ষা করে—অমিয় সেই ঘরে ঢুকলে হাসি যেন অবাক মুখ তুলে নীরব প্রশ্ন করে—তুমি কে ?

মারাত্মক ঘটনা ঘটেছিল একদিন। গতবারে। জ্যাঠামশাইয়ের মেয়ে অনুর

boirboi.net

বিয়েতে যাবে তারা। সে আর হাসি। ধুতি-পাঞ্জাবি কোনদিনই পরে না অমিয়। ধুতি-পাঞ্জাবিতে কোনদিন অমিয়কে দেখেনি হাসি। বিয়েতে যাওয়ার সময়ে অমিয় সেদিন ওয়ার্ডরোব খুঁজে হাঁটকে বের করেছিল পাঞ্জাবি আর ধুতি। বহু যত্নে পরিশ্রমে ধুতির কোঁচা কুঁচিয়েছিল সে। অন্য ঘরে তখন হাসি সাজগোজ শেষ করে সবশেষে তার বেনারসী পরছে। হাসি বেরিয়ে এসে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা অমিয়কে দেখে ভ্রূ ওপরে তুলে হেসে ফেলবে, বলবে—ওমা, তোমাকে যে চেনা যাচ্ছে না। এরকমই হবে বলে ভেবেছিল অমিয়। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে সে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল এ ঘরে, ও-ঘরের দরজার দিকে মুখ, মুখে অপ্রতিভ হাসি। হাসি বেরিয়ে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু একটুও অবাক হয়নি। ঘড়ি দেখে কেবল বলেছিল—বড় দেরী হয়ে গেল, বর এসে গেছে বোধহয়—তোমার হল? একসঙ্গে তারা বেরলো, ট্যাক্সিতে উঠল, গেল বিয়ে-বাড়ি। সেখানে অমিয়কে পরিবেশন করতে হয়েছিল, বরযাত্রীদের তদারকও। দৌড়-ঝাঁপে পাঞ্জাবির ভাঁজ গেল নষ্ট হয়ে, ধুতি গেল দুমড়ে-মুচড়ে, ঝোল-তেলের দাগ ধরল তাতে। ফেরার সময়ে আবার ট্যাক্সিতে পাশাপাশি বসে আসছিল তারা। অমিয়র মুখে বিকেলের প্রথম ধুতি-পাঞ্জাবি পরে হাসির সামনে দাঁড়ানোর সেই অপ্রতিভ হাসিটি কখন বিষণ্ণ ক্লান্তিতে ডুবে গেছে। শরীরের ঘামে, ঝোলে, তেলে ন্যাকড়া হয়ে গেছে তার পোশাক। হাসি তবু লক্ষ্য করেনি। ট্যাক্সিতে হাসির খোঁপা থেকে বেলফুলের মালার গন্ধ আসছিল, আর প্রসাধনের সুবাস, গয়নার টুং-টাং শব্দ। অভিজাত মহিলাকে ভিখিরি যেমন দেখে, তেমনই হাসির দিকে ভয়ে ভয়ে একবার চেয়েছিল অমিয়। বলেছিল—হাসি, আমি আজ অন্য পোশাক পরেছিলাম। তুমি দেখনি।

হাসি চমকে বলল—কৈ?

অমিয় হাসল—দেখছ না?

হাসি ভ্রূ কুঁচকে বলল—নতুন পোশাক কোথায়, এ তো ধুতি আর পাঞ্জাবি, তুমি তো প্রায়ই পর।

—পরি! কবে পরেছি?

—পরনি? হাসি একটু ভেবে-টেবে বলে—গতবার মিঠুর কাকার শ্রাদ্ধের সময়ে পরেছিলে না?

—না। অফিস থেকে এসেই তো তোমাকে নিয়ে বেরোলাম, পোশাক পাল্টানোর সময় ছিল না।

—তাহলে বোধহয় জামাইবাবুদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারিতে।

—না।

—তবে নিশ্চয়ই দিপালীর বিয়ের সময়ে—

—তাও নয় হাসি।

—কী জানি! আমার তো মনে হচ্ছে তুমি পরেছ, আমি দেখেছি।

—না হাসি, তুমি দেখনি।

হাসি একটু হাসল, তারপর বলল—দেখি, কেমন দেখাচ্ছে। বাঃ বেশ তো, একদম নতুন মানুষ। তোমাকে চেনাই যাচ্ছে না।

boiRboi.net

শুনে কেমন একটু ভয় এসে ধরেছিল অমিয়কে।

এই সব তুচ্ছ ঘটনা থেকেই কি মানুষের ভয় জন্ম নেয়! মূল্যহীন হয়ে যাওয়ার ভয়! গুরুত্ব না পাওয়ার ভয়!

গির অরণ্যে একবার সিংহ দেখতে গিয়েছিল অমিয়। বহুকাল আগে। দেখেছিল পিঙ্গল জটার মাঝখানে রাজকীয় গম্ভীর মুখ সিংহ বসে আছে, তার চারদিকে কয়েকটা সিংহী ঘুর-ঘুর করে কাছে আসছে, গা শুঁকছে, গড়-গড় শব্দ করে জানাচ্ছে তাদের প্রেম। পিঙ্গল জটার সিংহ গ্রাহ্যই করছে না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে সেই অপরূপ, উদাসী, নির্মম সিংহকে দেখেছিল অমিয়, দেখেছিল তার ভয়ঙ্কর পিঙ্গল কেশর, পঞ্জরসার দেহটিতে স্তম্ভিত বিদ্যুৎ, নিষ্ঠুরতা। বারে বারে তার পায়ের কাছে মাথা নত করে দিচ্ছে প্রেমিকরা, সে ফিরেও দেখছে না।

সেই সিংহটির কথা ভাবলে নিজের তুচ্ছতাকে বুঝতে পারে অমিয়, আজ। সে স্কুটারের পিছনে হাসিকে বসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ক্যাথিড্রাল রোডে, উপযুক্ত পরিবেশ খুঁজে বের করেছিল, মিষ্টি মোলায়েম কয়েকটা কথা মনে মনে তৈরী করেছিল আগে থেকে। বিয়ের পর সে কত খুশী করতে চেয়েছে হাসিকে, নিজেকে বার বার নানা পোশাকে সাজিয়ে ডামির মত দাঁড়িয়েছে হাসির সামনে। হাসি তাকে ভালবাসেনি।

গির এর প্রায়ান্ধকার অরণ্যে একটা সিংহকে প্রায়ই ভাবে অমিয়। সেই সিংহকে কেউ নারীপ্রেম শেখায়নি। প্রকৃতিদত্ত পুরুষকার বলে সে উদাসী, নির্মম! মানুষেরাও ছিল সেই সিংহের মত! পঞ্জরসার দেহে স্তম্ভিত বিদ্যুৎ, পিঙ্গল কেশর-ঘেরা মুখে বৈরাগ্য, চোখে দূরের প্রসার—পুরুষ এরকমই ছিল বহুকাল থেকে। কে তাকে শেখাল নারীপ্রেম, হাঁটু গেড়ে প্রেমভিক্ষা, মোলায়েম ভালবাসার কথা!

বলতে গেলে তখন থেকেই অমিয়র পতনের শুরু, যখন সে হাসির কাছে ক্যাথিড্রাল রোডে, ময়দানের সুন্দর বাতাসে স্কুটারে ভেসে যেতে যেতে ভিক্ষা চেয়েছিল হাসিকে। তখনই তার পতনের, ক্ষয়ের প্রথম অশ্বত্থচারাটি উঁকি দিয়েছিল অলক্ষ্যে।

সেই পতনের প্রথম চিহ্ন ছিল এই, সে সারাদিন হাসির কথা ভাবত। নির্বিকার হাসির কথা, তার নিষ্ঠুরতা, উপেক্ষা—ভাবতে ভাবতে তার ঘুম হত না। ডিগবয়ের তেল কোম্পানীর বিলেতফেরৎ এঞ্জিনীয়ারটির কথা বলত হাসি, বলত তার শিলচরের প্রেমিকদের কথা, তার মনিপুরী নাচের কথা। শুনতে শুনতে ভিতরে ভিতরে উন্মাদ হয়ে যেত অমিয়। কিনে আনত পোশাক প্রসাধন—হাসির মনের মত সাজত, হাসিকে খুশী করার জন্য সুন্দর কথা ভেবে রাখত সারাদিন, অন্যমনস্ক হাসির কাছে অনর্গল বলত সে একদিন বড় হবে, খুব বড় ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট্, বিজনেস্ ম্যাগনেট। সে হাসির জন্য শাড়ী কিনেছিল, গয়না, চমৎকার সব আসবাব, একটা ফ্রিজও। হাসি কিছুই তেমন আদর করে নেয়নি। অমিয়কেও না। রাতে শরীরে শরীর মিশিয়ে দিত অমিয়, মিশিয়ে ভাবত—পেয়েছি, পেয়েছি তোমাকে। তারপর মুখের স্বেদবিন্দু মুছে তৃপ্ত হাসি যখন পাশ ফিরে ঘুমোত, তখন উত্তপ্ত মাথায় সারা রাত ছিল অমিয়র জেগে থাকা। নিজের সেই পতন তখনও টের পায়নি অমিয়, তখনো গির অরণ্যে দেখা পঞ্জরসার দেহে স্তম্ভিত বিদ্যুৎ সেই সিংহের ছায়া তার চোখে পড়ত না। সে আধোঘুম থেকে চমকে জেগে উঠে দীর্ঘশ্বাস ফেলতো তখন, খুব জোরে স্কুটার চালাতে ভয় পেত,

তখন থেকেই তার নিজের ভবিষ্যৎ এবং কর্মক্ষমতার ওপর সন্দেহ জন্মাতে থাকে। আর জন্ম নেয় ভয়।

ব্যবসা হচ্ছে তারের ওপর হাঁটা। সবাই লক্ষ্য রাখে, মানুষ কখন টলছে, পড়ো-পড়ো হচ্ছে, কখন পা ফেলছে না ঠিক জায়গায়। লক্ষ্য রেখেছিল তার সাপ্লায়াররা, পারচেজাররা, প্রতিদ্বন্দ্বীরা আর সেনগুপ্ত। সি-এম-ডি-এর একটা বিল পেমেণ্ট গোপনে আদায় করেছিল সেনগুপ্ত, চেক ক্যাশ করেছিল। অমিয় টের পেয়েছিল দেরীতে। দুর্দান্ত সেনগুপ্তর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল খুব। সেনগুপ্ত তার ক্যাপিট্যাল তুলে নিয়ে গেল। আর অন্যমনস্ক, দুঃখিত অমিয়র চোখের আড়ালে আদায় করে নিয়ে গেল আরো তিনটে বিল-পেমেণ্ট। সেগুলো টের পেতে আরো অনেক দেরী হয়েছিল তার। কলকাতার রাস্তার ভীড়ে আজও সেনগুপ্তকে খুঁজে বেড়ায় অমিয়। কিন্তু দেখা হলে কী করবে তা বুঝতে পারে না। চোখ বুজলেই সে দেখতে পায়, কালো শর্ট, লাল টুকটুকে গেঞ্জী, দস্তানা পরা দুটি উদ্যত হাত, টুপির ছায়ায় আলপিনের মত দুটি হিংস্র চোখ—সেনগুপ্ত ফনা তুলে দুলছে। পোস্টে পোস্টে উড়ে যাচ্ছে সেনগুপ্ত, পেনালটি আটকাচ্ছে বেতের মত শরীর বেঁকিয়ে। আশ্চর্য! সেনগুপ্তর খেলা কোনদিনই দেখেনি অমিয়, তবু চোখ বুজলেই ঐ কাল্পনিক ভয়ঙ্কর দৃশ্যটিই সে দেখতে পায়।

বাইরের লড়াইয়ে যে হারতে থাকে, সে তত ভিতরে ঢুকে কল্পনার দৃশ্য দেখে। কল্পনায় প্রতিশোধ নেয়; কল্পনায় ভয় পায়। হাসির জন্যই কী? কে জানে!

অমিয় আলো জ্বালল না। অন্ধকারেই উঠল। দু-একটা কাগজ গুছিয়ে রাখল, বন্ধ করল ডেস্ক, চাবি কুড়িয়ে নিল। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ওপর থেকেই বৃষ্টির গন্ধ পায় অমিয়। ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে এসে লাগে।

গাড়ি-বারান্দার তলায়, এক-ভীড় লোক বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাতে দাঁড়িয়ে আছে। স্কুটারটা ফুটপাথে তুলে রেখেছে আহমদ। স্কুটারটা ছুঁয়ে বাইরের ঝিরঝিরে বৃষ্টি একটুক্ষণ দেখে অমিয়। তারপর স্কুটারটা টেনে বৃষ্টিতে রাস্তায় নেমে পড়ে। বৃষ্টির ঝরোখার ভিতর দিয়ে তার প্রিয় স্কুটার চলে লঞ্চের মত জল ভেঙে। অমিয় ভিজতে থাকে। কপালের ঘামের নোনা স্বাদ জলে ভিজে গড়িয়ে এসে স্পর্শ করে তার জিভ। একটা সুন্দর কাচের বাসন ভেঙে ছড়িয়ে পড়লে যেমন দেখায়, বৃষ্টির ভিতর তেমনি শতধা বিদীর্ণ কলকাতার প্রতিবিম্ব দেখা যায়। চারদিকের কাচের টুকরোর মত ধারালো, রঙীন, ভঙ্গুর কলকাতা ছড়িয়ে পড়ে আছে।

গড়িয়াহাটা পর্যন্ত একটানা চলে এল সে। তারপর খাড়াই ভেঙে স্কুটার উঠতে থাকে গড়িয়াহাটা ব্রীজের ওপর, ধনুকের পিঠের মত সম্মুখ আড়াল করে উঠে গেছে রাস্তা। স্কুটারের মেশিন গোঙাতে থাকে ভয়ঙ্কর। বরাবর এইটুকু উঠতে ভাল লাগে তার। ঝড় তুলে স্কুটার উঠতে থাকে। ব্রীজের সবচেয়ে উঁচু বিন্দুতে উঠে এলে হঠাৎ দিগ-দিগন্তের বাতাস ঝাপটা মারে এসে, চারদিকে বহু দূরের বিস্তার ডানা মেলে দেয়। সামনে স্বচ্ছন্দ উৎরাইয়ের শেষে তার বাসা। বাসায় হাসি।

প্রবল বৃষ্টির ফোঁটা বর্শাফলকের মত ঝকঝকে হয়ে ছুটে আসে। মুখের চামড়া ফেটে যায়। ব্রীজের সবচেয়ে উঁচু বিন্দুটিতে বাতাস-পাগল বৃষ্টির ফোঁটা খরশান।

স্কুটার টাল খায় এখানে। ডানদিকে একটা অন্ধকার মাঠে বিস্ফোরকের মত বিদ্যুৎ ফেটে পড়ে। এমন বাদলার দিন—এই দিনে হাসির কাছে ফিরে গিয়ে কী হবে অমিয়র ?

অমিয় উৎরাই ভেঙে নেমে আসে। বড় রাস্তার ওপর ঐ দেখা যায় অমিয়র বাসা। দোতলায় আলো জ্বলছে, উড়ছে সবুজ পর্দা। বাইরের দিকে একটা ঝুল-বারান্দা। অমিয় একপলক তাকায়। তারপর অচেনা বাড়ির দিকে চেয়ে যেমন চলে যায় রাস্তার লোক, তেমনিই না থেমে চলতে থাকে অমিয়। স্কুটার ভেসে যায়।

বহুদূর পর্যন্ত সোজা চলে তার স্কুটার। তারপর বাঁক নেয়। রাস্তার আলো এখানে ক্ষীণ, বহু দূরে দূরে। দু-ধারে গাছ-গাছালি, ব্যাঙের ডাক শোনা যায়, রাস্তায় লোকজন বিরল। এক-আধটা দোকান খদ্দেরহীন, আলো জেলে বসে আছে দোকানী। এই সব রাস্তা পার হয়ে অমিয়র স্কুটারের আলো পড়ে একটা লেভেল ক্রসিংয়ের সাদা লোহার গেটে। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় লাফায় হাল্কা স্কুটার,- ভেঙ্গে পড়তে চায়। অমিয় দাঁতে দাঁত চেপে হাতল সোজা রাখে। লেভেল ক্রসিংয়ে লাইনের মাঝখানে গভীর খন্দ, তাতে জল জমে আছে। ঝাঁকুনীতে ঘাড়ের রগ ছিঁড়ে পড়তে চায়। গর্তে পড়ে জলে ঢেউ তোলে স্কুটার। অমিয়র জুতো-মোজা ভিজে যায়। লেভেল-ক্রসিং পার হয়ে অন্ধকার কাঁচা রাস্তা। রাস্তার দুধারে ফাঁকা জমিতে দু একটা ঘুমন্ত বাড়ী চোখে পড়ে। স্কুটার গোঙায়, তবু এগোয় ঠিক। বহুকাল আসা হয় না এদিকে। রাস্তাটা একটু গোলমেলে লাগে, স্কুটার থামিয়ে হেডলাইটটা বার কয়েক চারধারে ফেলে অমিয় স্কুটার ছাড়ে। এগোয়। অনেকটা গিয়ে ডানধারে ইঁটখোলাটা দেখতে পায় অমিয়। নাবাল মাঠে জল জমে গেছে। কী গম্ভীর ব্যাঙের ডাক। মনে হয় রাত নিশুতি হয়ে গেছে। ইঁটখোলার গা বেয়ে একটা শুঁড়ি পথ। দুধারে এই বর্ষায় আগাছা জন্মেছে খুব। পিছল হয়েছে রাস্তা, ক্ষয়ে গেছে। সেই রাস্তায় স্কুটার এগোয় না। এঁটেল মাটিতে চাকা পড়ে একই জায়গায় ঘুরতে থাকে। অমিয় টেনে তোলে। আবার এগোয়।

একটা নিমগাছ ছিল এখানে, আর কলার ঝাড়। সামনে উঠোন। মনে করতে চেষ্টা করে অমিয়। স্কুটার অনিচ্ছায় বহন করে তাকে। অনেকটা ভিতরে ঢুকে যায় সে। চারদিকে বাড়ীঘর নেই। আলো নেই। কোন মানুষ চোখে পড়ে না। অমিয় এগুতে থাকে। আঁকাবাঁকা পথে স্কুটার ঘোরে। কাদা ছিটকে আসে, ব্যাঙ লাফায়, জলের কল কল শব্দ হতে থাকে। বিদ্যুৎ চমকায় জলে-স্থলে। অমিয় প্রাণপণে চেয়ে দেখে, চিনতে চেষ্টা করে জায়গাটা। বহুকাল আসা হয়নি। বহুকাল।

স্কুটার লাফিয়ে উঠে একটা কলার ঝাড়ে আলো ফেলে এক মুহূর্তের জন্য। আভাসে একটা নিমগাছ দেখা যায় অবশেষে। উঠোন জলে ভাসছে। একটা অন্ধকার বেড়ার ঘর, টিনের চালে অবিরল বৃষ্টির শব্দ উঠছে। অমিয় স্কুটার থেকে নেমে উঠোনের আগল ঠেলে গোড়ালি-ডুব জলে পা দেয়। ডাক দেয়—খুড়ীমা! ও খুড়ীমা!

দরজা খুলতেই একটা হ্যারিকেনের ম্লান, হলুদ আলো দেখা যায়।

—কে ?

অমিয় বারান্দায় উঠে আসে। একটা স্যাণ্ডো গেঞ্জী গায়ে বোকা চেহারার ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। শোভনাদির ছেলে ভাসান। অমিয় চিনতে পারে।

—ভাসান, আমি অমিয়মামা। খুড়ীমা কেমন আছে ?

ছেলেটা ঠিক চিনতে পারে না প্রথমে, বিশ্বাস করতে পারে না। বোকা চোখে চেয়ে থেকে একটু সময় নেয় বুঝতে। তারপর বলে—অমিয়মামা ? তুমি এই রাতে ? কী হয়েছে ?

অমিয়র হঠাৎ লজ্জা করতে থাকে। কী বলবে সে ! এত রাত্রে মানুষ বড় জোর বাড়ী ফেরে। কোথাও যায় না।

ভিতর থেকে ঘুম-ভাঙা বুড়ি-গলায় কে জিজ্ঞেস করে—কে রে ? কে এল রে ভাসান ?

—অমিয়মামা।

—কে অমিয় ?

ভাসান আলোটা সরিয়ে দরজা ছেড়ে বলে—ভিতরে এসো অমিয়মামা। দিদিমা ভাল নেই। হার্ট খুব খারাপ।

অমিয় তার ভেজা জুতো ছাড়ে। জামা-প্যাণ্ট থেকে যতদূর সম্ভব জল ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে। ঘরে ঢুকতেই ম্লান আলোয় বহুদিন আগেকার সেই ঘরখানা দেখে। হ্যারিকেনের গন্ধে ঘর ভরা, বিছানায় মশারি ফেলা ! মশারির ভিতর হাতপাখা নড়ার শব্দ। খুড়িমার কাছে মা মরার পর বহুদিন শুয়েছিল অমিয়। ঘুমের মধ্যেও খুড়িমার পাখা নড়ত নির্ভুলভাবে।

—কে এলি রে ? মশারির ভিতর থেকে প্রশ্ন আসে।

—আমি খুড়ীমা, আমি অমিয়।

একটা অস্ফুট শব্দ করে খুড়ীমা, গোঁজা মশারির এক দিক তুলে বুড়ো মুখখানা বের করে। চোখে আলো লাগতে মিট মিট করে তাকিয়ে বলে—অমিয় মানে মেজঠাকুরের ছেলে ?

ভাসান ধমক দেয়—তো আর কে অমিয় আছে ?

—হ্যারিকেনটা তোল তো ভাসান, দেখি। অমিয়, কাছে আয়। দেখি তোর গা। ঠিক তুই তো ?

ভাসান বলে—শার্টটা ছেড়ে ফেল অমিয়মামা। ইস্ ! তুমি খুব ভিজে গেছ।

অমিয় বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়ে বলে—খুড়ীমা, তুমি এত বুড়ো হলে কবে ? এত বুড়িয়ে যাওয়ার কথা তো ছিল না তোমার !

—তুই কি এই বৃষ্টিতে এলি ? কী হয়েছে তোর ? খারাপ খবর আছে কিছু ? কাছে আয় না, দূরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ?

—তুমি কাকার থেকে চৌদ্দ বছরের ছোট ছিলে, তবে বুড়ো হলে কী করে ?

মশারি তুলে খুড়ীমা উঠে বসে। গা উদোম। কাপড় খসে গেছে। কোমরের কাপড় ঠিক করতে করতে বলে—তোর কাকা গেছে বিশ বছর আগে, তখনই আমার পঞ্চাশ পুরে গেছে। বয়সের হিসেব তুই কি জানবি ? মেজঠাকুরের বুড়োবয়সের

সন্তান তুই! তোর জন্মের সময়ে মেজঠাকুরের বয়স পঞ্চাশ-বাহান্ন, তোর মা-র চল্লিশ। তোর এখন বয়স কত?

—পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ।

—তবে? বয়সের হিসেব ঠিক রাখতে পারিস না তোরা। কাছে আয় তো দেখি, কী রকম ভিজেছিস!

খুড়ীমা হাত বাড়িয়ে অমিয়কে ধরে কাছে টেনে নেয়। সমস্ত শরীরে মরা হাতখানা দিয়ে সেঁক দেওয়ার মত চেপে চেপে ধরে তার শরীর দেখে।

—তুই কী পাগল? এমন কাক-ভেজা কেউ ভেজে? ভাসান, জামাকাপড় দে এক্ষুনি, তার আগে গামছা দে। রাখুকে বল এক পাতিল আগুন করতে, সেঁক না দিলে ও মরে যাবে।

—খুড়ীমা, তুমি কেমন আছ?

—কী জানি! ডাক্তার বলেছে, ভাল না। কাপড়ে-চোপড়ে হেগে মুতে ফেলি, আর বুকে একটা চাপ ব্যথা হয়। কতকাল আসিস না।

—আজ তো এলাম।

—এটা কী রকম আসা। তোর মাকে আমি রোজ স্বপ্নে দেখি। আমার ভরসায় তোকে ছেড়ে গিয়েছিল, তাই রোজ এসে খবর নিয়ে যায়। বাইরের নিমগাছতলায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে, ডাকে। বহুকালের পুরনো ঝগড়া শত্রুতা তার সঙ্গে। ক'দিন পর আমিও তো তার কাছে যাব, এখন যদি তোর কিছু হয় তো সে আমাকে আস্ত রাখবে? এই বৃষ্টিতে ভিজে এলি, তুই কেমন পাগল? ও ভাসান—

—দিই।

—তাড়াতাড়ি দে।

—খুড়ীমা, আমি তোমাকে দেখতে এসেছি, চলে যাব। এখন আর জামা-কাপড় ছেড়ে কী হবে?

—তোর বর্ষাতি নেই? ছাতা কিনিসনি? ওরে তোরা ওঠ, ও ভাসান, পাখীকে বল চা করবে, রাখুকে ঠেলে তুলে দে, পাতিলের আগুনটা করে দিক, আমি ওকে সেঁক দেব। অমিয়, কেন এসেছিস? অমিয়র বলতে ইচ্ছা করে, এইজন্যই। কিন্তু তা বলে না অমিয়, বলতে নেই। চুপ করে থেকে তার বুকে পিঠে মাথায় কঙ্কালসার হাতখানা অনুভব করে সে। এইটুকুর জন্য এত রাতে, দীর্ঘ পথ জল কাদা ঝোড়ো বাতাস ভেদ করে এসেছে সে।

—কেন এসেছিস? আমাকে দেখতে? আমি মরে গেলাম কিনা দেখতে এসেছিস? বলতে বলতে খুড়ীমা একটু কাঁদে। বলে—সত্যিই খুড়ীমাকে ভালবাসিস অমিয়? তোর বৌ বাপের বাড়ীতে গেছে নাকি? বাচ্চা-কাচ্চা হবে না তো?

—না।

—তোর বাচ্চা হয় না কেন রে? অ্যাঁ! কী করিস তোরা? আঁট-বাঁধ দিয়ে রেখেছিস নাকি? বুড়োবয়সে হলে মানুষ করার সময় পাবি না। এখন হইয়ে ফেল।

—চুপ কর খুড়ীমা।

—আমার তো ছেলে নেই। ভাসানকে বলি তোর খবর আনতে। তা সে তোর

boiRboi.net

দোরগোড়ায় গিয়ে গিয়ে ফিরে আসে, ভিতরে ঢোকে না, এসে বলে—মামা বাড়ীতে থাকে না, মামীকে চিনি না, লজ্জা করে। আমি অবাক হই। মামীকে আবার চেনার কী আছে। গিয়ে কোলে বসে পড়বি, আবদার করবি, জ্বালাবি—তাতেই চিনবে।

—চুপ কর, তুমি চুপ কর।

—চুপ করব কেন? অমিয়, কেন এসেছিস?

—তোমাকে দেখতে।

ঘুম ভেঙে উঠে এসেছে রাখী আর পাখী। কেটলীতে জল ফোটে। পাতিলে কাঠকয়লার আগুন জ্বালে রাখী। অমিয় খালি গায়ে, ধুতি পেঁচিয়ে বসে। তাকে ঘিরে হ্যারিকেনের আলোয় একটা ছোট উৎসব শুরু হয়।

—আমার কেউ নেই অমিয়। শোভনা তার তিন ছেলেমেয়ে রেখেছে আমার কাছে, রক্ষা। ভেবেছিলাম, শোভনা আমার মেয়ে আর তুই ছেলে। তুই কেমন ছেলে?

পাতিলের আগুনের ওপর দুই হাত মেলে ধরে খুড়ীমা। গরম হাত দুখানা এনে তার গায়ে চেপে চেপে ধরে। কতকালের পুরনো এক রক্তস্রোত আর এক রক্তস্রোতের খবর নিতে থাকে।

—রাখু, ভাত চড়াসনি?

—না তো! মামা কী খেয়ে যাবে?

—খেয়ে যাবে না তো কী? কোথায় খাবে?

—আমি খাব না খুড়ীমা।

—কেন খাবি না? বৌ রেঁধে রেখেছে বলে? গেরস্তর ঘরে কখনও ভাত নষ্ট হয় না। খেয়ে যা। আপিস থেকে এলি তো?

—হ্যাঁ।

—পাখী, তুই একটু হাত গরম করে শেঁক দে। আমি একটু শুই, বুকটা কেমন করে।

—কথা বোলো না।

—বলব না! কেন? কাছে এসে বোস আরো। তোর বৌকে বিয়েতে আমি গয়না দিইনি, না? কী দিয়েছিলাম যেন?

পাখী মুখ তুলে বলে—দিয়েছিলে। নাকছাবি।

—ওঃ। নাকছাবি আবার গয়না! অমিয়, তোর ছেলেমেয়ে হলে একছড়া গোঠ দেবো। তিন ভরি সোনা। তুই কোথায় থাকিস যেন?

—ঢাকুরিয়া।

—সে কী অনেক দূর? যদি দূর না হয় তো তোর বৌ, কী-নাম যেন, তাকে নিয়ে আসিস। ভাসান, পাখী, তোরা ওর সঙ্গে কথা বলছিস না কেন? কথা বল।

—তুমি অত তাড়া দিলে কথা বলবে কখন? চা করছে, গা সেঁকছে, ভাত রাঁধছে, ওদের তো বসতেই দিচ্ছ না।

—তাড়া কী সাধে দিই! তোর মাকেই আমার ভয়। তার মুখের বড় ধার ছিল। এখনো এ বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরে জিভ শানাচ্ছে, আমি গেলেই ধরবে আমাকে। হ্যাঁ রে, পরের মেয়ে বৌ হয়ে এসে আপনজন হয়ে যায়, আর পরের মা কিছুতেই কী মা

boiboi.net

হতে পারে না ? কেন এসেছিস অমিয় ?

—খুড়ীমা, তুমি আমাকে গল্প বল।

—কিসের গল্প শুনবি ?

—আমার গল্প বল। আমি কেমন ছিলাম ?

—তুই ? তুই আবার আলাদা কি ছিলি ! আর পাঁচজনের মতই ছিলি তুই। শিশুকালে সবাই এক থাকে, বড় হয়ে আলাদা রকমের হয়।

—তবু বল।

—খুব দুষ্টু ছিলি। ভীষণ। মা ছিল না বলে তোর আদর ছিল সবচেয়ে বেশী। আসকারা পেয়ে মাথায় উঠেছিলি। তোর দিদি নানি সেই তুলনায় ঠাণ্ডা ছিল। পারুলিয়ার বাড়িতে একটা মস্ত দিঘি ছিল—তার এপার ওপার দেখা যায় না, তার কালো জল খুব গভীর, বড় বড় মাছ ছিল। দিঘির পারে একটা ডিঙ্গিনৌকো বাঁধা থাকত—তাতে চড়ে মাঝ-দিঘিতে শ্বশুরমশাই মাছ ধরতে যেতেন। সেই ডিঙ্গিনৌকোয় চড়ে এক দুপুরে তুই আর নানি চুপি চুপি দিঘির মাঝখানে চলে গিয়েছিলি। চীৎকার শুনে আমরা দিঘির পাড়ে গিয়ে দেখি, নানি উঠে দাঁড়িয়ে বৈঠা তুলে চেঁচাচ্ছে, তুই নৌকোর এক ধারে ঝুঁকে আছিস। কেৎরে নৌকোটা ভেসে আছে। সে যে কতদূর চলে গিয়েছিলি তোরা—এই টুকু টুকু দেখাচ্ছিল তোদের। চারদিক থেকে লোকজন ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে কিন্তু তোরা এতদূরে যে পেঁছিতে পারছিল না। নৌকোটা কেবলই কাৎ হচ্ছিল তখন, তুই ঝুলে ছিলি, পড়ে যাচ্ছিলি। কী ভয় আমাদের !

—তুমি কী করেছিলে ?

—আমি ! আমি কী করব ? বোধহয় খুব চেঁচিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। তোরা মা-মরা দুটো ভাইবোন কেন যে ঐ বিদঘুটে খেলা করতে গিয়েছিলি ! লোকে বলাবলি করেছিল যে তোদের ভূতে পেয়েছে। কেন গিয়েছিলি অমিয় ?

—আমরা কী করে ফিরে এলাম আবার ?

—কেউ ধরার আগেই তুই ঝাঁপ দিয়েছিলি জলে। তোকে কেউ ধরতে পারেনি। একা সাঁতরে এলি পাড়ে। খুব রোখ ছিল তোর।

—খুড়ীমা, আমি একটা জলের স্বপ্ন খুব দেখি।

—কী রকম জল ?

—অনেক জল, অথৈ জল। একটা খুব বড় নদী, তার ওপার দেখা যায় না। তার একধারে একটা বিরাট বালিয়াড়ি, আর একটা স্টীমার বাঁধার জেটি। সেখানে কেউ নেই। বালির ওপর একটা কেবল সাপের খোলস পড়ে আছে।

খুড়ীমা হঠাৎ রোগা, মরা হাত বাড়িয়ে অমিয়র হাত ধরে। বলে—অমিয়, কী বলছিস ?

—একটা স্টীমারঘাটের কথা। একটা বালিয়াড়ির কথা।

খুড়ীমা একটু চুপ করে থাকে।

—খুড়ীমা তুমি এই স্টীমারঘাটের কথা কিছু জান ?

খুড়ীমা, আস্তে আস্তে একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়। বলে—না তো ! স্টীমারঘাটের কথা কী জানব ! তুই কবে থেকে এটা দেখিস ?

boiRboi.net

অমিয় একটু ভাবে। তারপর বলে—অনেকদিন থেকে: এক দিন ঘুমের মধ্যে ঐ স্বপ্ন দেখে জেগে উঠি। তারপর আবার ঘুমোই, আবার সেই স্বপ্ন। তিনবার করে স্বপ্নটা দেখে আর ঘুম হল না। একা একা শুয়ে খুব ভয় করতে লাগল। মনে হল, কেউ পাশে থাকলে খুব ভাল হত।

—বৌয়ের সঙ্গে কি তোর ঝগড়া অমিয় ?

—কেন, ওকথা জিজ্ঞেস করছ কেন ?

—এই যে বললি—তুই একা শুস। একা শুবি কেন অমিয় ? বৌ বিছানায় নেয় না ? আলাদা শোয় ? তা তার এত গুমোর কিসের ? ঐ জন্যই তোদের বাচ্চা হয় না—

—খুড়ীমা স্টীমারঘাটের কথাটা আগে শোন।

—কী শুনব ! স্টীমারঘাটের কথা আমি কিছু জানি না। রাখু, ভাতটা টিপে দ্যাখ, হাঁ করে গল্প শুনছিস, ভাত গলে যাবে। একটু ডাঁটো থাকতে নামাস, অমিয় ঝরঝরে ভাত ভালবাসে। ভাসান, কত রাত হল রে ?

—ন'টা।

—অমিয় যাওয়ার সময়ে টর্চ জেবলে বড় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিস। আমি একটু চোখ বুজে থাকি। আমার মনটা ভাল লাগছে না।

—কেন খুড়ীমা ?

—তুই কেন স্টীমারঘাটের কথা বললি ? ওসব অলক্ষুণে কথা, মন বড় খারাপ হয়ে যায়।

খুড়ীমা মশারির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে নেয়, হাতপাখার মৃদু শব্দ হতে থাকে। রাখু এসে বলে—মামা, রান্না হয়ে গেছে। বসবেন না ?

অন্যমনস্ক অমিয় ওঠে।

খেয়ে উঠে পোশাক পরছিল অমিয়। খুড়ীমা ঘুমচোখে বলে—ভেজা পোশাক আবার পরছিস অমিয় ঠাণ্ডা লাগবে না ? ওগুলো ছেড়ে রেখে যা—

রাখু বলে—উনুনে ধরে শুকিয়ে দিয়েছি দিদিমা।

—ওতে কি শুকোয় ? সেলাইয়ের জল থেকে যায়। স্টীমারঘাটের কথা যেন কী বলছিলি অমিয় ?

—তুমি তো শুনতেই চাইলে না।

খুড়ীমা একটু অস্ফুট শব্দ করে। তারপর বলে—ছেলেবেলা থেকে তুই বড় একা। সেই জন্যে তোর দুঃখ নেই তো অমিয় ? তোর মা-বাপ নেই—সে বড় দুঃখ। আমি তোর মা হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু চাইলেই কি হওয়া যায় ! নিজের মেয়েটা, এই যে সব নাতি-নাতনী—এ সব থেকেও তো কেমন একা লাগে। রাত-বিরেতে ঘুম ভাঙলে কারো নাম মনে পড়ে না। ডাকতে গিয়ে দেখি, মাথা অন্ধকার লাগে। মনে হয় কেউ নেই আমার। সে বড় কষ্ট। ভাবি মানুষের আপনজন কে-ই বা আছে ! তুই কেন এসেছিলি যেন অমিয় ?

—তোমাকে দেখতে।

একটা শ্বাসের শব্দ হয়। খুড়ীমা বিছানায় পাশ ফিরে শোয়। তারপর বলে—

স্টীমারঘাটের কথা কেন বললি ? কী জানি কেন, আমিও ঠিক একটা ধু ধু বালির চর দেখতে পাই এখন, অনেক দূরে একটা ঘাট, তারপর অথৈ জল···সাবধানে যাস অমিয়, উঠোনটা পিছল, রাস্তা ভাল না, অনেক রাত হয়েছে !

—খুড়ীমা, তুমি ঘুমোও।

—ঘুম কী আসে। ভাসান টর্চটা ধর। অমিয় তোর বৌয়ের নাম যেন কী ?

—হাসি।

—হাসি ! হাসির কেন বাচ্চা হয় না রে ? আঁট-বাঁধ দিয়ে রেখেছিস নাকি ?

অমিয় চুপ করে থাকে।

—বাচ্চা না হলে বৌ আপন হয় না। আঁটকুড়ি নয় তো ? ডাক্তার দেখাস। তোর কেউ নেই অমিয়, বাচ্চা-কাচ্চা হলে একটু বাঁধা পড়বি। কিন্তু বয়স হলে আবার সেই—

—কী ?

—সেই যে কী যেন বললি ! সেই স্টীমারঘাট—অথৈ জল···অমিয় সাবধানে যাস—

মেঘ কেটে ভয়ঙ্কর জ্যোৎস্না পড়েছে। অমিয় নির্জন রাস্তায় তার স্কুটার চালায়। বাতাস লাগে, জল-মাটির গন্ধ পায় সে। চলতে থাকে। হাসি এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। অমিয়র ঘুম হয় না আজকাল।

দূরে সিংহের ডাকের মত মেঘগর্জন শোনা যায়। গির-অরণ্যে দেখা এক সিংহের অবয়বের ছায়া পড়ে অমিয়র চোখে। সে চলতে থাকে !

স্কুটারের শব্দ ঠিকই শুনতে পেল হাসি। আধো ঘুমের মধ্যেও। যেন এতক্ষণ সে এই শব্দের অপেক্ষায় ছিল। উঠে ঘড়ি দেখল সে। রাত এগারোটা বেজে গেছে। অমিয়র জন্য তার কোন কৌতূহল নেই। সে শুধু আধো জেগে ছিল বলে মাঝে মাঝে রাস্তার চলমান স্কুটারগুলির শব্দ শুনে উঠে একবার ঘড়ি দেখেছে। কোন স্কুটারের শব্দই এতক্ষণ থামেনি।

হাসি শুনতে পেল, অমিয় স্কুটার টেনে সিঁড়ির নীচে নামিয়ে রাখছে। আবার বিছানায় এসে শুয়ে থাকল হাসি। আগে আগে অমিয় এলে অন্ততঃ খাওয়ার টেবিলে গিয়ে বসত সে। মুখোমুখি দুচারটে কথা হত। খাওয়ার পর ছিল তাদের বাঁধা রীতিক্রমা। এখন আর হাসি খাওয়ার টেবিলে যায় না।

সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসে অমিয়র পায়ের শব্দ, ভেজানো দরজা ঠেলে ও-ঘরে ঢোকে। জামাকাপড় ছাড়ে। বাথরুমে যায়।

ও ঘর থেকে একটা চৌকো আলো এসে এ ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকে অনেকক্ষণ। অমিয়র রাতে ভাল ঘুম হয় না—হাসি জানে। অনেক রাত জেগে ও বই পড়ে। সিগারেট ধরানোর শব্দ হয় রাতে, পায়চারীর শব্দ হয়, কাশির।

চৌকো আলোটাতে একটা মানুষের ছায়া পড়ে। বাঁকা ছায়াটা, একটা কাঁধ উঁচু

boiRboi.net

দেখায়, মাথাটা বেঁকে পড়ে আছে।

হাসি চেয়ে থাকে।

দরজার কাছ থেকে অমিয় বলে—কেউ এসেছিল ?

হাসি মৃদুগলায় বলে—টেলিফোনের লোক। কাল তোমার টেলিফোন দিয়ে যাবে।

—টেলিফোন! একটু অবাক হয় অমিয়।

—বলল, তুমি তিন বছর আগে অ্যাপ্লাই করেছিলে, এতদিনে মঞ্জুর হয়েছে।

—টেলিফোন দিয়ে আমি এখন কী করব ?

হাসি একটু হাসে। বলে—লোকের সঙ্গে কথা বলবে। কত কথা আছে মানুষের, শোনার লোকেরও অভাব নেই।

—আমার কোনো কথা নেই।

—কে বলল নেই! শুনতে পাই, তুমি লোককে একটা স্টীমার ঘাটের কথা বল।

—সে কথা থাক হাসি। আর কে এসেছিল ?

—এক বুড়োমত ভদ্রলোক, তোমার পিসেমশাই। তাঁর মেয়ের বিয়ের চিঠি রেখে গেছেন।

—চিঠি দেখেছি। তিনি কিছু বলেননি ?

—বলেছেন। পরশু বিয়ে, আমি যেন অবশ্যই তোমাকে নিয়ে বিয়েতে যাই। অনেকবার বললেন। আমি বলেছি—যাব। চা করে খাইয়েছি। অনেকক্ষণ বসেছিলেন তোমার জন্য।

—আর কিছু বলেন নি ?

—না। বোধহয় কিছু বলার ছিল, তোমাকে বলতেন। আমাকে কিছু বলেন নি।

—বলেছিলাম, রেখার বিয়েতে এক হাজার টাকা দেব। এত তাড়াতাড়ি বিয়ে ঠিক হয়ে যাবে ভাবি নি।

—দেবে যখন বলেছিলে তখন তো দেওয়াই উচিত। তাঁর পোশাক দেখেই মনে হয় অবস্থা ভাল না।

—কোথা থেকে দেব ?

—তুমি আমাকে যে সব গয়না দিয়েছিলে সব স্টীলের আলমারীতে আছে। দরকার হলে নিতে পার, আমি তো নিচ্ছি না।

—আমাদের বংশের কেউ কখনো ঘরের জিনিস বেচেনি।

—তা হলে কী করবে ?

—বুঝতে পারছি না।

হাসি লক্ষ্য করে একটা ধুতি জড়িয়ে অমিয় দাঁড়িয়ে আছে। কোমরের ওপর ওর খালি গা। পিছন থেকে আলো এসে পড়েছে ওর গায়ে। মাথাটা বোধহয় ভেজা, পাটকরা চুল থেকে আলো পিছলে আসছে। লম্বাটে হাড়সার দেহ অমিয়র। অমিয় রোগা হয়ে গেছে কিনা তা ঠিক বুঝতে পারে না হাসি। এসব বোঝা খুব মুশকিল। ঐ দেহটির স্বাদ সে বহুবার পেয়েছে। তার দুই হাতে, নগ্ন শরীরের আনাচে-কানাচে

boiRboi.net

আজও ছড়িয়ে আছে সেই স্বাদ। কতবার সে বেষ্টন করেছে ঐ শরীর, মথিত হয়েছে। তবু ঐ শরীরের সব খবর তার জানা নেই।

অমিয়র ঠোঁটে একটা সিগারেট একটু জ্বলে উঠল। সেই আগুনটাই বোধহয় একটা আশ্লেষ তৈরী করে হাসির শরীরে। সে শরীরের ভঙ্গী বদলায়। হঠাৎ প্রশ্ন করে—তোমার ওজন কত?

অমিয় একটু থমকে থাকে। প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করে—কী বলছ?

—তোমার ওজন কত?

—কেন?

—এমনিই জিজ্ঞেস করছি। জামাইবাবু বলছিল, তুমি নাকি রোগা হয়ে গেছ। তোমার কি ওজন কমে গেছে?

—কী জানি।

—তুমি ওজন নাও না?

—না।

হাসি একটু শ্বাস ফেলে বলে—আমার রিজার্ভেশন পাওয়া যায় নি। কলকাতায় আমাকে আরো কয়েকদিন থাকতে হবে।

—থাকবে। তাতে কী?

—আমি দিদি-জামাইবাবুর কাছে চলে যেতে পারতাম এ ক'দিনের জন্য। কিন্তু সেখানে পাশের ফ্ল্যাটে তোমার দিদি-জামাইবাবু থাকেন। গেলে ও'রা নানারকম সন্দেহ করতে পারেন বলে যাই নি।

—যেমন তোমার ইচ্ছে।

—খুশির বিয়ের তারিখ এসে গেল। রিজার্ভেশন পাওয়া যাচ্ছে না। কি যে করব!

—প্লেনে চলে যাও।

—তুমি ভাড়া দেবে? অনেক ভাড়া কিন্তু।

—দেব।

—তুমি আমাকে অনেক দিয়েছ।

—প্লেনের ভাড়া কত?

—দু তিনশো হবে বোধহয়। আমি ঠিক জানি না। তোমার ব্যবসার অবস্থা কী?

—ভাল নয়।

—খুব খারাপ?

—হুঁ।

—কী রকম খারাপ?

—উঠে যাওয়ার মত।

—কেন?

—হাসি, আমি প্লেনের ভাড়া ঠিক দেব।

হাসির ঘুম পায়। সে হাই তুলে বলে—দরজার পর্দাটা টেনে দেবে? চোখে আলো লাগছে।

boiRboi.net

পরদিন দুপুরবেলা জামাইবাবুকে ফোন করে হাসি।

—জামাইবাবু, রিজার্ভেশন যদি না পাওয়া যায় তো আমি প্লেনে যাব।

—তার দরকার নেই, তেরো তারিখের একটা স্লিপার বার্থ পাওয়া গেছে।

—পাওয়া গেছে? সত্যি?

—সত্যি। সুখের পাখী এবার উড়ে যাও।

হাসি চুপ করে থাকে।

—ফোন কি ছেড়ে দিয়েছ হাসি?

—না।

—কাল ছেড়ে দিয়েছিলে। একটা প্রশ্নের জবাব দাও নি।

—জামাইবাবু, আমাদের মধ্যে কোন ঝগড়াঝাটি হয় নি। কথাবার্তা বন্ধ হয় নি। কাল রাতেও অনেকক্ষণ আড্ডা মেরেছি। আমরা সম্পূর্ণ নরমাল। এমন কি কোর্ট-কাছারির কথাও ভাবছি না।

—তবে কি ফিরে আসার কথাও ভাবছ?

—না!

—তুমি কোথা থেকে ফোন করছ হাসি?

—কেন?

—ফ্রিলী কথা বলতে পারবে?

—আমি বাসা থেকে ফোন করছি।

—বাসা থেকে! বাসায় কবে ফোন এল?

—আজ। বছর তিনেক আগে অ্যাপ্লাই করেছিল, আজ কানেকশান দিয়ে গেছে।

—ফোন কেন নিতে গিয়েছিল অমিয়? দুপুরে অফিস থেকে তোমার সঙ্গে প্রেম করার জন্য?

—হবে হয়তো।

—ফোন কোম্পানীর মত বেরসিক দেখিনি। যখন পাখী উড়ে যাচ্ছে তখনই এল ফোন! এখন দুপুরে কার সঙ্গে কথা বলবে অমিয়? বেচারা!

—কি বলছিলেন বলুন।

—ডিগবয়ের তেল কোম্পানীর সেই এঞ্জিনীয়ার, সে এখনো বিয়ে করে নি শুনেছি। সত্যি?

—সত্যি।

—সে কখনো তোমার সঙ্গে দেখা করেছিল হাসি?

হাসি একটু দ্বিধা করে বলে—না না।

—তবে কী করেছিল?

—একটা দীর্ঘ চিঠি দিয়েছিল। তাতে বারবার একটা প্রশ্ন করেছিল—আমার কী দোষ? আমাদের অপরাধ কী? আপনি কেন এমন করলেন? আরো লিখেছিল, যদি কখনো নিজের ভুল বুঝতে পারি তবে যেন তাকে জানাই, সে সারা জীবন অপেক্ষা করবে, নিঃশর্তে গ্রহণ করবে আমাকে···জামাইবাবু, আপনি কি শুনছেন? আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস-ও যে শোনা যাচ্ছে না।

boiRboi.net

—শুনছি। বল।

—সে এই কথা লিখেছিল। আরো লিখেছিল, তাদের কালাশৌচের মধ্যেই যে তারা আমাকে আশীর্বাদ করে রেখেছিল, সেটাও তারই আগ্রহে। তার ভয় ছিল, আশীর্বাদ করে না রাখলে ঐ সময়ের মধ্যে আর কেউ এসে আমাকে বিয়ে করে ফেলবে। তখন শিলচরে আমার স্যুটার অনেক, ঝাঁকে ঝাঁকে চিঠি পেতুম···শুনছেন?

—শুনছি।

—কালো হলেও তো আমি সুন্দরী-ই। তার ওপর দারুণ নাচতাম, গাইতাম। আমার পায়ে পুরুষদের মাথা নূপুরের মত বাজত।

ও-পাশে জামাইবাবু বহুক্ষণ শ্বাস ধরে রেখে আবার অনেকক্ষণ ধরে শ্বাস ছাড়ে। হাসি হাসে।

—কিছু বুঝলেন জামাইবাবু?

—বুঝলাম।

—কী?

—তুমি আর ফিরবে না হাসি।

ও-পাশে জামাইবাবু একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। হাসি অপেক্ষা করে।

—হাসি, স্টীমারঘাটটা সাবধানে পার হয়ো। ও জায়গাটা ডেঞ্জারাস।

হাসি চমকে উঠে বলে—স্টীমারঘাট! কোন স্টীমারঘাট?

—বাঃ, ফারাক্কায় তোমাকে ঘাট পেরোতে হবে না?

—ওঃ। বলে স্তব্ধ হয়ে থাকে হাসি।

—একা যাচ্ছ, আমরা চিন্তায় থাকব। ওপারে বঙ্গাইগাঁও এক্সপ্রেসে তোমার রিজার্ভেশন আছে, ভুল করে দার্জিলিং মেলে উঠো না।

—ভুল ট্রেনে ওঠাই কি আমার স্বভাব জামাইবাবু?

জামাইবাবু একটু চুপ করে থেকে বলে—ভুল ট্রেনের কথা বলছ হাসি! কিছু ইঙ্গিত করছ কি? তবে বলি, আমাদের আমলে ভুল ট্রেনে উঠলেও শেষ পর্যন্ত যেতে হত। হয়তো ভুল জায়গায় গিয়ে পেঁছোতাম। কিন্তু তবু যেতে হত। তোমাদের আমল আলাদা। তোমরা ভুল ট্রেন বুঝতে পারলেই চেন টেনে নেমে পড়তে পার।

—আমরা ভাগ্যবান।

—দেখা যাক। আমি আরো কিছুদিন বাঁচব হাসি।

হাসি হাসে।

—এখোনো সাত আট দিন সময় আছে, এ ক'দিন কী করবে হাসি?

—কী করব! ঘুরব, ঘুরে বেড়াব!

—কোথায় যাবে?

—কোথাও না। কলকাতা—কেবল কলকাতায় ঘুরব—ইচ্ছেমত।

—কলকাতায় আর কোথায় ঘুরবে, কী আছে কলকাতায়?

—কী আছে? কী জানি! আমি তো বিশেষ কোথাও যাব না। আমি ঘুরে বেড়াব রাস্তায় রাস্তায়। রঙীন দোকান দেখব, আলো দেখব, পার্কে বসে থাকব, কলকাতা পুরানো হয় না।

— কলকাতায় তুমি কী পেয়েছ হাসি ?

কী পেয়েছি ! হাসি, তা ভেবে পায় না। সে চোখ বুজে থাকে। মনে মনে বলে—কলকাতা ! কলকাতা আমার প্রেমিক। জ্বলন্ত এক পুরুষ কলকাতা। সে আমাকে সব সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করে টেনে এনেছিল, সুখী হতে দেয় নি। সে আমাকে নিয়ে আরো কত খেলা খেলবে, তোমরা দেখো।

—হাসি; ফোন কী ছেড়ে দিয়েছ ?

— না তো।

—তোমার শ্বাস-প্রশ্বাসও যে শোনা যাচ্ছে না।

—শুনছি। বলুন।

—এ কয়দিন অমিয়কে সঙ্গে নিয়ে ঘুরো।

—ও-মা ! ওকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরব না কেন ? এইতো ওর পিসতুতো বোনের বিয়েতে যাচ্ছি একসঙ্গে। ওর স্কুটারে বহুদিন চড়িনি। ভাবছি ওর স্কুটারের পিছনে বসে এ-ক'দিন ঘুরে বেড়াব। অফিসপাড়া, কলেজ স্ট্রীট, পার্ক স্ট্রীটের রেস্টুরেণ্ট দেখে বেড়াব দুজনে। জামাইবাবু, আপনি কী ভাবছেন আমার প্রেজুডিস আছে ? একদম নেই। আমরা দুজনে কথা বলি, হাসি-ঠাট্টা করি, কখনো ঝগড়া করি না। এমন কী মাঝে মাঝে একবিছানায়···জামাইবাবু; শুনছেন ?

—কী ভয়ঙ্কর !

—কী ?

—তোমার নিষ্ঠুরতা।

মাথা আস্তে আস্তে পিছনে হেলিয়ে দিচ্ছিল হাসি। ক্রমে পিঠ বেঁকে গেল পিছনে, মাথা প্রায় স্পর্শ করল পিঠ। কত উঁচু বাড়ি। উঠে গেছে তো উঠেই গেছে। কী বিশাল বাড়িটার বুক, কী পাথুরে গড়ন ! দেখতে দেখতে নেশা ধরে যায়। হ্যারিংটন স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে বাড়িটার ঠিক পায়ের তলা থেকে চূড়া দেখার চেষ্টা করল হাসি, তার মুখে ঘাম জমে গেল বেদনায়।

—বাব্বাঃ ! আপনমনে বলল সে ! হেসে আঁচলে একবার মুখ মুছে নিল। কলকাতার প্রোথিত ইমারত চারদিকে, তার মাঝখানে নিজেকে ধূলিকণার মত লাগে তার। কান পাতলে—পাতালের খরস্রোতা নদীর গর্জনের মত উতরোল কলকাতার গম্ভীর শব্দ শোনা যায়। কী রোমাঞ্চ জাগে শরীরে ! কলকাতা—তার চারদিকে উচ্চ কল্লোলিত কলকাতা !

হাসি পায়ে পায়ে পার হয় রাস্তা। ময়দানের দিকে ট্রামলাইন পেরোলে দেখা যায় সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এলোমেলো পড়ে আছে—যেন যা যে খুশী নিয়ে যেতে পারে। ঘনপত্র গাছের ছায়া। পাতা ঝরে পড়ছে। পাখিরা ফেলে দিচ্ছে কুটোকাটা। নিবিড় ছায়া এখানে। পায়ের নীচে ঘাস, পাতা। নির্জনতা। হাসি পায়ে পায়ে উদ্দেশ্যহীন হাঁটে। কিছুই দেখে না, অথচ সবকিছু অনুভব করে তার সর্বগ্রাসী মন।

সামনেই একটা কালো হেরাল্ড গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। নতুন চকচকে গাড়ি। গাড়ির

boiRboi.net

বনেটে হাত রেখে একজন পুরুষ দাঁড়িয়ে। ফর্সা, মজবুত চেহারা, লম্বা জুলপী, ঘন বড় চুল, চৌকো মুখ। রঙীন চৌখুপওলা শার্ট তার পরনে, আর জলপাই-রঙা সরু চাপা প্যাণ্ট, পায়ে চোখা জুতো, কোমরের চওড়া বেল্টের বক্‌লশে একটা ইস্পাত রঙের ইংরিজি 'ডি' অক্ষর ঝলসে ওঠে। কবজীর ঘড়িতে মোটা সোনারঙের চেন। মানুষটা হাসিকে দূর থেকেই লক্ষ্য করে। অন্যমনে একটা ঘাসের ডাঁটি তুলে আলস্য-ভরে চিবোয়। হাসি এগিয়ে যায় ধীরে ধীরে। সেই হাঁটা দেখে লোকটা। দেখে তার পোশাক, মুখশ্রী, তার বুক, চোখ। চোখই বেশী লক্ষ্য করে। চেয়ে থাকে। একটা লক্ষণ খুঁজে দেখে। বোধহয় লক্ষণটা মিলে যায়। মিলিয়ে লোকটা হাসে। একটু বড় এবং মসৃণ দাঁত তার। ধারালো। হাসির একটুও ভয় করে না। সে এগোতে থাকে। লোকটা হাসে। হাসি এগোয়। হেরাল্ড গাড়িটার গায়ের পালিশে হাসির ছায়া পড়ে। লোকটা বনেট থেকে হাতের ভর তুলে নেয়। ঝুলে-পড়া শার্ট, কোমরে গুঁজে এক পা এগিয়ে আসে। আর এক পা। আর এক পা এগুলেই হাসির পথ আটকাতে পারে, ছুঁয়ে ফেলতে পারে হাসিকে। ডাক দেয়—মিস—ও মিস—

হাসি ছেলেটার দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু হাসে। প্রশ্রয়ের হাসি। ছেলেটা লক্‌লক্‌ করে ওঠে লোভে। দাঁতাল হাসি হাসে। বেল্টের 'ডি' অক্ষরটা ঝলসায়। ভাঙা গলায় ডেকে বলে—আই হ্যাভ এ কার মিস—

হাসি বড় বড় চোখে ছেলেটাকে দেখে। ছেলেটা টেরও পায় না, ঠিক তার পিছনেই উদাত্ত আঠারো তলা উঁচু এক হিংস্র ইমারত। সেই ইমারতের সামনে তাকে কত তুচ্ছ, এইটুকু পতঙ্গের মত দেখায়। হাসি সেই ইমারতের ফ্রেমে ছেলেটার ক্ষুদ্রতা মাত্র একপলক অবাক হয়ে দেখে। ছেলেটা ঝুঁকে ফিস ফিস করে কী যেন বলে। অমনি ময়দান থেকে মার মার করে ছুটে আসে বাতাস, তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে যায়। হাসির করুণা হয়। তার প্রেমিক কলকাতা চারদিকে জেগে আছে সহস্র চোখে। উদাসী, নির্মম, আবার ঈর্ষায় কাতর। যদি ইঙ্গিত করে হাসি তবে অমনি তার প্রেমিক কলকাতা পিছনের ঐ আঠারোতলা বাড়িটার চুড়া হয়ে মড় মড় করে ভেঙে পড়বে ছেলেটার মাথায়। গুঁড়ো করে মিশিয়ে দেবে মাটিতে। কিন্তু করে না হাসি। শুধু মুখটা ফিরিয়ে নেয় অবহেলায়। একা একা ঘোরে বলে এরকম কত মানুষ কতবার তার পিছু নিয়েছে, ডাকাডাকি করেছে ইঙ্গিতে, কীটপতঙ্গের মত সব ছোট মাপের জীব। কলকাতার গায়ে উড়ে এসে বসে, আবার উড়ে যায়।

হাসি হাঁটতে থাকে। কত দূরে দূরে হেঁটে যায় হাসি। কখনো ট্রামে ওঠে। কিছুদূর গিয়ে আবার নেমে পড়ে। ধ্বংসাবশেষ দুর্গের শেষ একটিমাত্র স্তম্ভের মতো মনুমেণ্ট দাঁড়িয়ে আছে, দেখে। দেখে, গঙ্গার কোল জুড়ে শুয়ে আছে হাওড়ার পোল। তার চোখের পাশ দিয়ে ভেসে যায় ভাঙা টুকরো সব দৃশ্যাবলী, ছায়া পড়ে, ভেঙে যায়। চাকিতে মানুষের চোখ ঝলসে ওঠে। কানাগলির মুখ সরে যায়। গভীর গভীর অগাধ কলকাতার ভিতর হারিয়ে যায় হাসি। ভোগবতীর গম্ভীর নিনাদের মত কলকাতার কত শব্দ হয়।

জাহাজঘাট! হাসি থমকে দাঁড়ায়। মাস্তুল। জল। না এখানে নয়। এ তো কলকাতা থেকে বিদায়ের বন্দর। এর অর্থ তো ছেড়ে যাওয়া। মাস্তুল অদৃশ্য

boiRboi.net

রুমাল উড়িয়ে বিদায় জানায়। জাহাজ ভেসে যাবে দূর সমুদ্রে। হাসি ফিরে দাঁড়ায়। এখানে নয়, এখানে নয়। এখানে কলকাতার শেষ। জীবনের শেষ, এখানে অচেনার সুরু। হাসি ফিরে আসে।

সেনগুপ্ত নিয়ে গেছে অনেক। হিসেব করলে কত দাঁড়াবে তা ভেবে দেখেনি অমিয়। হিসেব করা সে প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। ক্যাপিট্যাল শেয়ার আর সেই সঙ্গে লভ্যাংশ মিলে একটা বেশ বড় অঙ্কের টাকা। অমিয় আটকাতে পারেনি। কিন্তু তবু সেটা কিছু নয়। সেনগুপ্ত বা তার টাকা কোনোটার অভাবেই ব্যবসা আটকাত না। যদি অমিয় খাড়া থাকত। তরতরে তাজা জোয়ান বয়সের মানুষের কাছে এ আবার একটা সমস্যা ছিল নাকি। ছিল না—অমিয় তা জানে, কিন্তু সে কেমনধারা মেঘলা মানুষ হয়ে গেল। দিন না ফুরোতেই আলো মরে গিয়ে ঘনিয়ে এল দিনশেষ।

দুপুরে অমিয় আজকাল কিছুই খায় না। লাঞ্চ সে প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। কল্যাণ বা রজত সবাই এ সময়টায় বাইরে থাকে, পাঞ্জাবী হোটেল বা গাঙ্গুরামে টিফিন সারে। ডিউক রেস্টুরেন্টে নতুন একটা আড্ডা হয়েছে কল্যাণের। সেখানে সারাটা দুপুর কাটায় কখনো কখনো। অমিয় একসময়ে যেত। এখন টিফিনের সময়টায় বসে থাকে চুপচাপ। রাজেন এক কাপ চা রেখে যায় না বলতে। আজ চায়ের সঙ্গে একটা শাল-পাতার ঠোঙায় কয়েকটা দেওঘরের প্যাঁড়া রেখে গেছে। কোন ভাই যেন এনেছে দেশ থেকে।

চা-টা খেল অমিয়, প্যাঁড়া ছুঁতে ইচ্ছে করল না। পেটে খিদে মরে একটা গুলিয়ে ওঠা ভাব। সবাই তাকে লক্ষ্য করে আজকাল। সে যে খায়নি, সে যে বিপাকে পড়েছে। ভাবতে চোখদুটো ঝাপসা হয়ে আসে। রাত্তিরে অফিস বাড়িটা ফাঁকা থাকে। তখন রাজ্যের দেশওয়ালী মুটে মজুর রিক্সা বা ঠেলাওয়ালাকে এখানে এনে তোলে রাজেন। এক রাত্তির বসবাসের জন্য মাথাপিছু দুচার আনা করে নেয়। তারা দিব্যি ফ্যানের হাওয়া খায়। অনেক রাত অবধি বাতি জেবলে গল্পসল্প করে। মাসের শেষে মস্ত অঙ্কের ইলেকট্রিক বিল আসে। তাই রাজেনকে তার সাইড বিজনেসের জন্য বিস্তর বকাবকি করেছে অমিয়, কল্যাণ আর রজত। সেই খারাপ ব্যবহারটুকুর জন্য এখন প্যাঁড়াগুলির দিকে চেয়ে একটু বুকটা টনটন করে। রাজেন আজ কাল না বলতেই টিফিনের সময়ে কোন কোনদিন একঠোঙা মুড়ি বাদাম হাতের কাছে রেখে যায় নিঃশব্দে। এ সবই সহৃদয়তার নিদর্শন। কিন্তু অমিয়র ভিতরটা জ্বালা করে।

দুপুরের দিকে পিসেমশাই ফোন করলেন।

—অমিয়, আমি সেদিন তোর বাসায় গিয়েছিলাম। রেখার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে রে!

—শুনেছি পিসেমশাই, পাত্র কেমন?

—খুব ভাল। টাটার ইঞ্জিনীয়ার, তবে দাবী দাওয়া অনেক।

অমিয় একটা শ্বাস ছাড়ল। পিসেমশাই আবার বললেন—মেয়েটার সুন্দর মুখ দেখে পছন্দ করেছে, নইলে গরীব ঘরের সঙ্গে সম্বন্ধ করার মতো পাত্র তো নয়।

boiRboi.net

—পিসেমশাই আপনার কত দরকার ?

পিসেমশাই লজ্জিত হন বোধহয়। একটু নীরব থাকেন। তারপর আস্তে করে বলেন, দরকারের কি শেষ আছে অমিয় ! প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা যা অবশিষ্ট ছিল সবই প্রায় তুলেছি। কিছু ধার কর্জ করেছি। এখনো দু তিন হাজার কম পড়বে। আলমারীটা এখনো কেনা হয় নি, সোনার দোকানেও যা আন্দাজ করেছিলাম তার বেশী পড়ে গেল।

—ঠিক আছে, আমি হাজারখানেক দেবো।

—দিতে তোর কষ্ট হবে না তো ?

—কষ্ট কি পিসেমশাই ? রেখার বিয়েতে আমার তো দেওয়ার কথাই ছিল।

পিসেমশাই হাসলেন ফোনে। বললেন—কথা দিয়েছিস বলেই আবার কষ্ট করে দিস না।

অমিয় একটু আহত হল। সে দিতে পারবে না—এমন যদি কেউ ধরে নেয় তবে তার আহত হওয়ারই কথা।

সে একটু নীচু স্বরে বলল—পিসিমা বেঁচে থাকতে, সেই কবে ছেলেবেলায় আমি পিসিমাকে প্রায় সময়েই বলতাম, রেখার বিয়ে আমি দেবো, সে কথা তো রাখতে পারলাম না পিসেমশাই।

পিসিমার উল্লেখে পিসেমশাই নীরব হয়ে গেলেন। অনেকটা পরে যখন কথা বললেন তখন টেলিফোনেও বোঝা গেল, গলাটা ধরে গেছে।

বললেন—তা হোক, ছেলেবেলায় মানুষ কত কী বলে। যা দিতে পারিস দিস।

—আচ্ছা পিসেমশাই।

—শোন, বৌমাকে বিয়ের দুএকদিন আগে আমাদের এখানে পাঠাতে পারবি না ? বিয়ের কাজকর্ম মেয়েছেলে ছাড়া কে বুঝবে !

হাসিকে বললে হাসি রাজি হবে কিনা তা কে জানে। তাই অমিয় উত্তরটা ঘুরিয়ে দিল—সেদিন যখন গিয়েছিলেন তখন নিজেই তো বৌমাকে বলে আসতে পারতেন।

—লজ্জা করল। বৌমা তো আমাকে খুব ভাল চেনেন না, দু একবার মাত্র দেখেছেন, তুইও সাহেবী কায়দায় বিয়ে করলি, সামাজিক অনুষ্ঠান হল না !

অমিয় লজ্জা পায়। বলে—তাতে কী ?

—সামাজিক বিয়ে হলে সেই অনুষ্ঠানে সব আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে নতুন বৌয়ের চেনাচিনি হয়ে যায়। তোর বেলায় তো সেরকম হয়নি, তাই একটু দূরের মানুষ হয়ে আছি আমরা। তবে তোকে বলি অমিয়, বৌমা ভারি ভাল হয়েছে। পরিচয় দিতে কত যত্ন আত্তি করল। আজকালকার মেয়েদের মতো নয়।

অমিয় উত্তর দিল না।

—অমিয়।

—বলুন পিসেমশাই।

—পারিস তো বিয়ের আগে হাসিকে পাঠিয়ে দিস।

—দেখি।

—দেখি টেখি নয়, এয়োর কাজ করার লোক নেই।

boiRboi.net

—আচ্ছা।

—ছাড়ছি, বলে পিসেমশাই ফোন রাখলেন।

ফোনটা রেখে অমিয় তিন বুড়োর দিকে তাকালো, তিনজনই পাথর হয়ে বসে আছে। একেই কি স্থবিরতা বলে! তান্ত্রিক লোকটা একবার চোখ তুলে অমিয়র দিকে তাকায়, মাথায় জটা, কপালে মস্ত লাল একটা ফোঁটা, চোখ দুটোয় বেশ তীব্র চাউনী। হেসে এবং তাকিয়ে হঠাৎ শ্বাস ছেড়ে বলল—টাকা!

অমিয় হাসে। উল্টো দিকের দুই বুড়ো খুব আগ্রহের সঙ্গে তান্ত্রিকের দিকে ঝুঁকে বসল, বাবা যদি এবার কিছু বাণী দেন।

অমিয় মাথা নেড়ে বলল—টাকা।

তান্ত্রিক তার দুই ভক্তের দিকে চেয়ে আস্তে করে বললে—টাকা।

ভক্ত দুজন কী বুঝল কে জানে। জুল জুল করে চেয়ে থাকে।

অফিসঘরে এসে অমিয় ফাঁকা ঘরটার চারদিকে চাইল। কেউ নেই। কাগজপত্র হাওয়ায় নড়ে শব্দ করছে। পুরোনো ফ্যান থেকে একটা ঘট-ঘটাং শব্দ উঠছে।

কিছুক্ষণ বসে থাকল অমিয়। রেখার বিয়ে, এক হাজার টাকা দিতে হবে।

অমিয় বেরিয়ে এল।

স্কুটারটা এখনো তার আছে। বেশীদিন থাকবে না। কল্যাণকে সে দিয়ে দিয়েছে, যতদিন ও না নেয় ততদিন তার। আহমদ একটা মফঃস্বলের লোককে জাঙ্গিয়া গছানোর চেষ্টা করছে। অমিয়কে দেখে নিচু গলায় বলল—সাহা ব্রাদার্স থেকে লোক এসেছিল তাগাদায়, হটিয়ে দিয়েছি। আবার তিনটের পর আসবে।

অমিয় উত্তর না দিয়ে গিয়ে স্কুটার চালু করে।

যে ব্যাঙ্কে অমিয়র অ্যাকাউণ্ট আছে তা অনেকটা তার ঘরবাড়ির মতো হয়ে গেছে, বহুকাল ধরে একই ব্যাঙ্কে সে টাকা রাখছে, তুলছে, চেক বা ড্রাফ্ট্ ভাঙাচ্ছে। সবাই মুখচেনা হয়ে গেছে। কেউ কেউ একটু বেশী চেনা। এবং একজনের সঙ্গে পরিচয় আরো একটু গভীর।

ব্যাঙ্কের বাইরে স্কুটার রেখে অমিয় ভিতরে আসে। সোনাদার ব্যাঙ্ক যেমন বড়, আর হালফ্যাশানের এ ব্যাঙ্কটা তেমন নয়। প্রাইভেট আমল থেকেই এর মলিন দশা, কাউণ্টারের পুরোনো কাঠ গাঢ় খয়েরী রং ধরেছে, দেয়ালের রং বিবর্ণ, কাঠের পার্টিশনগুলো নড়বড় করে।

কারেণ্ট অ্যাকাউণ্টটা অমিয় বহুদিন হল বন্ধ করে দিয়েছে। সেভিংসে কিছু টাকা থাকা সম্ভব, পাশবইটা বহুকাল এণ্ট্রি করানো হয়নি। কত টাকা আছে কে জানে!

টোকেন ইসু করার কাউণ্টারে এক সময়ে নীপা চক্রবর্তী বসত। ভিতরের দিককার একটা ঘরে বসে আপন মনে কাজ করে। পাবলিকের সামনে আর থাকে না।

কাউণ্টারের মেয়েটি ফোর ওয়ান নাইন নাইন অ্যাকাউণ্ট লেজার খুলে দেখে বলল—না, হাজার টাকা তো নেই। দুশো পঁয়ত্রিশ টাকা আছে!

অমিয় যন্ত্রের মত শব্দ করে—ও।

আরো দুটো ব্যাঙ্কে অ্যাকাউণ্ট আছে অমিয়র। কিন্তু সেখানে আর যাওয়ার আগ্রহ হয় না। খুব বেশী নেই। যা আছে তাতে হাত দেওয়া যায় না। হাসি চলে যাবে।

অনেক পেমেণ্ট বাকী। একটা হতাশা ভর করে তাকে। মুখটা বিস্বাদ। খালি পেটে সম্ভবতঃ পিত্ত পড়েছে। মাথার মধ্যে একটা ঝিমঝিম। চোখের সামনে একটু অন্ধকার, অন্ধকারে উজ্জ্বল কয়েকটি তারা খেলা করে মিলিয়ে গেল। দুর্বলতা থেকে এরকম হয়।

দুটো বাজতে আর খুব বেশী দেরী নেই। বেলা দুটোয় সব জায়গায় টাকা পয়সার ওপর ঝাঁপ পড়ে যায়।

ভিতরের দিকে একটা করিডোর গেছে। ওদিকে একটা বাইরে যাওয়ার দরজা আছে। ব্যাঙ্কের সামনের দরজা বন্ধ হয়ে গেলে ওদিক দিয়ে যাতায়াত করে লোক। ব্যাঙ্ক আওয়ারের পরে এসেও বহুদিন ঐ দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকেছে অমিয়, চেক ক্যাশ করে নিয়ে গেছে। নীপা চক্রবর্তী ঐটুকু ভালবাসা দেখাত।

দুশো পঁয়ত্রিশ টাকায় হাত দিল না অমিয়। থাকগে। সে করিডোর ধরে ভিতরের পার্টিশনের কাছে এসে দাঁড়ায়। কাঠের পার্টিশনে কাচ লাগিয়ে বাহার করার চেষ্টা হয়েছে। ময়লা ঘোলা কাচের ভেতর দিয়ে দেখা যায় লম্বা লম্বা টেবিলের ওপর ঝুঁকে কয়েকজন কাজ করছে। তৃতীয়জন নীপা। শ্যামলা রং রোগা শরীরে ইদানিং একটু মাংস লেগেছে। মুখখানা নোয়ানো বলে ভাল দেখা যায় না। কিন্তু অমিয় জানে মুখখানা ভালই নীপার। টস টসে মুখ বলতে যা বোঝায় তাই। বড় বড় দুখানা চোখ ভরে একটা নরম সৌন্দর্য ছড়িয়ে থাকে। চোখে কাজল দেয় নীপা, কপালে টিপ পরে, সাদা খোলের শাড়ি পরে বেশীর ভাগ সময়ে। রঙীন পরলে হালকারঙা। গায়ের রং চাপা বলে চড়া সাজ কখনো করে না। তাতে ও ফুটে ওঠে বেশী।

অমিয়র সঙ্গে নীপার এমনিতে কোনো সম্পর্ক ছিল না।

চেক জমা দিয়ে টোকেন নেওয়ার সময়ে, বা অ্যাকাউন্টের টাকার অঙ্ক জানতে এসে, মুখোমুখি একটু বেশীক্ষণ কি দাঁড়াত অমিয়?

চোখে চোখ পড়লে সহজে চোখ সরাত না বোধহয়? মাঝে মাঝে একটু আধটু হাসত কি? সে যাই হোক, তাদের চেনাজানা ছিল খুব সহৃদয়তায় ভরা। অনুভূতিশীল। ব্যাঙ্ক আওয়ার্সের পরে এসে অমিয় বলত—একটু জ্বালাতে এলাম।

নীপা মৃদু অহংকারী হাসি হেসে বলেছে—কে না জ্বালায়! জ্বলে যাচ্ছি। দিন কি আছে···বলে হাত বাড়িয়ে চেক নিত।

রোগা মেয়ে পছন্দ করত অমিয়। মোটা বা বেশী স্বাস্থ্যবতী তাঁর পছন্দের নয়। বুকের স্নিগ্ধ ফল দুটি মুখ তুলে চেয়ে থেকেছে পুরুষের দিকে। কনুই বা কণ্ঠীর হাড় তেকোণা হয়ে চামড়া ফুঁড়ে উঠে থাকত না। শরীরের চেয়ে অনেক আকর্ষক ছিল গলার স্বরে নম্রতা। অমিয় ছাড়া আর কাউকে কথনও ঠাট্টা করে কথার উত্তর দিয়েছে এমনটা অমিয় দেখেনি। খুব সিরিয়াস ভাবে কাজ করত। মেয়েরা অফিসের কর্মচারী হিসেবে খুব সিরিয়াস ভাবে কাজ করত। মেয়েরা অফিসের কর্মচারী হিসেবে বেশীর ভাগই ভাল হয় না। যেখানে তিনচারটে মেয়ে জোটে সেখানে বেশীর ভাগই ভাল হয় না। যেখানে তিনচারটে মেয়ে জোটে সেখানে কাজ হওয়া আরো মুস্কিল! কিন্তু নীপা ছিল অন্যরকম। শনিবার যখন প্রচণ্ড রাশ হয়, কিংবা কোনো ছুটির আগে যখন টাকা তোলার ধুম পড়ে যায় তখনো নীপাকে বরাবর নীচু গলায় লোকের সঙ্গে কথা

বলতে দেখেছে অমিয়, দেখেছে মুখে স্নিগ্ধ হাসি, অবিরল ব্যস্ততার মধ্যেও নানা লোকের অপ্রয়োজনীয় বোকা-প্রশ্নের উত্তর দিতে। একদিন দুজন অল্পবয়সী ছোকরা স্রেফ ইয়ার্কি দিতে ব্যাঙ্কে ঢুকে পড়েছিল। তারা উইথড্রয়াল স্লিপ নিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা লিখে জমা দিয়ে টোকেন নিল। ব্যাপারটা ধরতে দু মিনিটের বেশী লাগেনি নীপার। লেজার বইটা খুলে অ্যাকাউণ্ট দেখে যখন তার উচিত ছিল দারোয়ান ডেকে ছোঁড়া দুটোকে বের করে দেওয়া, তখনও সে বিনীত ভাবে তাদের ডেকে বলেছিল—সইয়ে যে নাম লিখেছেন তার সঙ্গে অ্যাকাউণ্টের নাম মিলছে না। ছেলে দুটো সাহস পেয়ে আরো কিছু ইয়ার্কি দেয়, একজন বলে—তাহলে অ্যাকাউণ্ট খুলব। ফর্ম দিন। নীপা আশ্চর্য, ধৈর্য ধরে রেখে ওদের ফর্মও দিয়েছিল যেটা ওরা কিছুক্ষণ কাটাকাটি করে ছিঁড়ে ফেলে চলে যায়। দৃশ্যটা অমিয়র চোখের সামনে ঘটে। নীপা স্বাভাবিক হাসি হেসে বলেছিল তাকে—এরকম প্রায়ই হয়। আমরা কিছু মনে করি না।

তখনো হাসির সঙ্গে দেখা হয়নি। এ হচ্ছে প্রাক্-হাসিতিক ঘটনা। তখন অমিয় মাঝে মাঝে নীপার কথা ভাবত বিরলে। মনে-পড়া শুরু হয়েছিল, ভাবতে ভাল লাগত। ঘন ঘন তখন ব্যাঙ্কে যাওয়ার দরকার পড়ত তার। রাজেন বা সেনগুপ্তকে পাঠালেও যখন কাজ চলে তখনও সে নিজেই যেত। নীপা যেদিন আসত না সেদিন ক্ষুণ্ণ হত সে। পরদিন এলে অনুযোগ করত—কাল আসেননি কেন? কাল আমার পেমেণ্ট পেতে অনেক দেরী হয়েছে।

নীপা সে অনুযোগের সহৃদয় উত্তর দিত। বলত—রোজ তো আসি। এক আধদিন না এলে বুঝি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়। যন্ত্র তো নই।

এ ধরনের কথা নীপা একমাত্র তাঁর সঙ্গেই বলত এবং তখন চোখে চোখে মানুষের গভীর হৃদয় গোপন বার্তা পাঠাত না কি।

ব্যাঙ্কের বাইরে দেখা হয়েছিল মোটে একদিন। গ্র্যাণ্ট স্ট্রিটের একটা দোকানে নীপা পুজোর জামাকাপড় কিনতে ঢুকেছিল। অফিসের পাড়া। অমিয় ডাব খাচ্ছিল পাশের পানের দোকানটায়। নীপা দেখেনি। অমিয় ভিতরে ঢুকে নীপাকে ধরল—এই যে!

নীপার সঙ্গে অফিসের আরো দুটি মেয়ে ছিল। তারা একটু ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে দেখল অমিয়কে। নীপারই ভ্রূ সহজ ছিল। মুখে হাসি ফুটল সহৃদয়তার। অনেক কিছু এড়িয়ে যাওয়ার কথা বলতে পারত। কিন্তু খুব আন্তরিক লাজুক গলায় একটা ঘন নীল পাছা-পেড়ে শাড়ি তুলে দেখিয়ে বলল—দেখুন তো, এটা অদিতিকে মানাবে না? অদিতি সঙ্গী মেয়েদের একজন। ফর্সা। অমিয় হেসে বলে—নীল শাড়ি সবাইকে মানায়।

যতক্ষণ শাড়ি কিনেছিল ওরা ততক্ষণ নীপা চোখের শাসনে আটকে রাখল অমিয়কে। অমিয় যতবার বলে—এবার যাই, কাজ আছে। ততবার নীপা বলে—দাঁড়ান। মেয়েরা ঠিক ঠিক শাড়ি পছন্দ করতে পারে না। পুরুষেরা অনেকে পারে। আমাদের শাড়ি পছন্দ করা হয়ে গেলে যাবেন।

শাড়ি কেনা হলে সঙ্গিনীরা চলে গেল। বোধহয় একটা ষড়যন্ত্র করেই। নীপা একা

boighar.net

হয়ে বলল—এবার আমাকে সাউথের বাসে তুলে দিন তো।

অমিয় তার স্কুটার দেখিয়ে বলে—বাসের দরকার কী! যদি সাহস থাকে তো উঠে পড়ুন। পৌঁছে দিয়ে আসি।

—ও বাবা! স্কুটার! পড়ে টড়ে যাবো, কখনো চড়িনি।

অবশেষে উঠেছিল নীপা স্কুটারেই। মাঝপথে একটা রেস্টুরেণ্টে চা খেয়ে নিয়েছিল তারা। অনেক কথাও হয়েছিল। এলোমেলো কথা। আর কথার মাঝখানে লজ্জার সঙ্কোচের এবং আকর্ষণের ঝাপটা এসে লাগছিল। মাঝে মাঝে কথা বন্ধ হয়ে যায়। নীরবতা নৈকট্যকে অদ্ভুতভাবে টের পায় তারা।

শেষ পর্যন্ত কিছুই বলা হয়নি। টালিগঞ্জের খাল পাড় পর্যন্ত নীপাকে পৌঁছে দিল অমিয়। তারপর সিগারেট জেবলে থেমে থাকা স্কুটারে বসে দেখল নীপা নড়বড়ে সাঁকো পেরিয়ে ওপাড়ে চলে যাচ্ছে। যাওয়ার সময়ে অনেকবার পিছু ফিরে চেয়ে দেখল তাকে। মুখটায় স্মিত গভীর একটা বিশ্বস্ততা।

না, কিছু হয়নি শেষ পর্যন্ত। হয়ত হতে পারত। মাঝপথে হাসি এসে সব তছনছ করে দিল। তুলে নিল তাকে। নিল, আবার নিলও না। বড়ঘরের মেয়েরা যেমন নিত্য নূতন জিনিস কিনে সেসব জিনিসের কথা ভুলে যায় দুদিন পর। অবহেলায় ফেলে রেখে দেয়। তেমনি অমিয়কে কবে ভুলে গেছে হাসি।

ঘোলা ময়লা কাচের ভিতর দিয়ে কয়েক পলক চেয়ে থাকে অমিয়। নীপা টের পায়। মুখ তোলে।

অমিয় একটু হাসে। নীপাও একটু হাসে। ওর সিঁথিতে সিঁদুর। হাসিটা তেমনি সহৃদয়তায় ভরা। দেখে ভিতরে একরকম ছুঁচ ফোটার যন্ত্রণা হয়। ঘোলা ময়লা কাচের ভিতর দিয়ে প্রায়ান্ধকার করিডোরে দাঁড়ানো অমিয়কে চিনতে পেরেছে নীপা।

চেয়ারটা ঠেলে সরিয়ে উঠে এল।

—কী খবর? আবার বুঝি জবালাতে এসেছেন? নীপা করিডোরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে।

অমিয় মাথা নাড়ল। বলল—না। কোনদিন আপনাকে কাজ ছাড়া দেখি না। আজও দাঁড়িয়ে দেখছিলাম।

—কাজের জায়গায় দেখা হলে কাজ-ছাড়া কী করে দেখবেন?

অমিয়র এখন আর সাহসের অভাব হয় না। সে বলে—অকাজের জায়গায় কেমন দেখাবে কে জানে!

আশেপাশে ব্যস্তসমস্ত লোকেরা যাচ্ছে আসছে। নীপা বলে—বলুন না বাবা কী কাজ আছে। কোনো চেকের ক্লিয়ারেন্স আসেনি নাকি!

—ওসব নয়। অ্যাকাউণ্টে টাকাই নেই। চেক জমা দিই না অনেকদিন।

—সে তো জানি।

—কী করে জানলেন?

—আপনার অ্যাকাউণ্টটা দেখি মাঝে মাঝে। আজকাল কেবল উইথড্রয়াল হচ্ছে, জমা পড়ে না। কী ব্যাপার?

অমিয় একটা শ্বাস ফেলে। মাথা নেড়ে বলে—আপনি আমাকে মনে রেখেছেন!

boiRboi.net

—মনে রাখব না! ব্যাঙ্কের সব ক্লায়েণ্টকে আমার মনে থাকে।

বানানো কথা। মিথ্যে।

অমিয় একটা বিষ বোলতার কামড় খায় এই কথায়। বলে—কোন পক্ষপাত নেই, না?

নীপার মুখে একটু দুঃখের ছায়া খোঁজে অমিয়। পায় না। হাসিকে বিয়ে করার পর মাস দুই বাদে নীপার বিয়ে হয়। কেউ কাউকে নিমন্ত্রণ করেনি। জানায়ওনি। কিন্তু জানাবার দরকার হয় না। অমিয় তখন বিয়ের পর দেদার টাকা ওড়াত। হাসিকে স্কুটারের পিছনে বসিয়ে নিয়ে আসত ব্যাঙ্কে। টাকা তুলত আর টোকেন নিয়ে অপেক্ষা করার সময় কলকলাত দুজনে। সেসব কি দেখেনি নীপা? তেমনি আবার দুমাস বাদে নীপার সিঁথিতে সিঁদুর দেখেছে অমিয়। কেউ কাউকে প্রশ্ন করেনি। জেনে গেছে।

নীপার মুখে তাই কোন দুঃখের ছায়া নেই। কিন্তু তবু সে কেন অমিয়র অ্যাকাউণ্টের খবর রাখে?

অমিয় বলে—আপনার টিফিনের সময় হয়নি?

—হয়ে গেছে। কেন?

হতাশ অমিয় বলে—হয়ে গেছে! আমি ভাবছিলাম আজ আপনাকে খাওয়াবো।

—তাই বা কেন! কোনো খাওয়া কি পাওনা হয়েছে। নীপা দাঁতে ঠোঁট কামড়ে হাসল।

অমিয় মাথা নেড়ে বলল—খাওয়ার জন্য নয়।

—তাহলে?

অমিয় বুঝল, নীপার সঙ্গে আসলে তার কোনো বোঝাবুঝি তৈরী হয়নি। এমন অধিকার তার নেই যে সে ইংগীতে ডেকে নিয়ে যেতে পারে বিশ্বস্ত নীপাকে। এখন তার উচিত হবে ভদ্রতাসূচক দু একটি কথা বলে চলে যাওয়া।

কিন্তু চলে যেতে পারে না অমিয়। আস্তে করে বলে—আপনি মিস চক্রবর্তী ছিলেন, এখন কী হয়েছেন?

নীপা একটু তাকিয়ে থাকে তার দিকে। বোধ হয় মনে মনে বলে—আর যাই হই, বাগচী হইনি। তাকিয়ে থেকে নীপা মৃদুস্বরে বলে—আমার বুঝি কাজ নেই! কী দরকার বললেই তো হয়।

—আমার জানা দরকার, আপনি চক্রবর্তী ছেড়ে কী হয়েছেন!

নীপা মৃদু হাসল বটে, কিন্তু ভ্রূ কুঁচকে গেল একটু। বলল—চক্রবর্তীদের অনেক গোত্র হয় জানেন তো! আমি চক্রবর্তী থেকে চক্রবর্তীই হয়েছি। গোত্রটা আলাদা। জেনে হবে কী!

—এমনি, কৌতূহল।

—আপনার চেহারাটা খারাপ হয়ে গেছে। আনঅফিসিয়াল কথাটা বলে ফেলেই বোধহয় লজ্জা পায় নীপা। মুখ ফিরিয়ে বলে—চলি।

অমিয় মাথা নাড়ল, তারপর করিডোর ধরে হাঁটতে থাকে ধীরে ধীরে। দরজাটার কাছ বরাবর এসে ফিরে তাকায়। নীপা দাঁড়িয়ে আছে।

boiRboi.net

অন্য মেয়ে হলে এই অবস্থায় চোখে চোখ পড়তেই পালিয়ে যেতে। নীপা পালাল না। হাতটা তুলে তাকে থামতে ইংগীত করল। তারপর ঢুকে গেল ভিতরে।

অমিয় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। অপেক্ষা করে, একটু বাদেই নীপা আসে। হাতে ব্যাগ, ছোটো ছাতা, মুখখানায় একটু রক্তাভা। কাছে এসে বলে—আজ ছুটি নিয়ে এলাম। বাড়ি যাবো।

অমিয় অবাক হয়। বলে—বাড়ি যাবেন ?

—হ্যাঁ।

—তাহলে আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখলেন যে !

নীপা উত্তর দিল না।

রাস্তায় এসে তারা ঝিরঝিরে একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়ায়। অদূরে অমিয়র স্কুটার। অমিয় স্কুটারটা দেখিয়ে বলে—আজ আপনাকে পৌঁছে দিতে পারি। যাবেন ?

মুখ নীচু করে নীপা মাথা নেড়ে বলে—না। রাধাবাজারে আমার স্বামীর-ঘড়ির দোকান আছে। কাছেই। এখন ওখানে যাবো। সেখানে আমাদের গাড়ি আছে। তাতে ফিরব। এখন আমি নর্থ-এ থাকি। পাইকপাড়ায়।

—ও। অমিয় বুঝতে একটু সময় নেয়। নীপাকে ছাড়া নীপার আর কিছুই জানত না অমিয়। এখনো জানে না। শুধু ঘড়ির দোকান, স্বামী, গাড়ি আর পাইকপাড়া শব্দগুলো তার ভিতরে খুচরো পয়সার মতো হাত খসে পড়ে গিয়ে গড়াতে থাকে।

—আপনি কী যেন বলতে চেয়েছিলেন। বললেন না।

অমিয় কষ্টে হাসে। ঘড়ির দোকানে স্বামী। স্বামীর গাড়ি। আর গাড়িতে পাইকপাড়া—এ সবই খুব রহস্যময় লাগে তার কাছে। নীপার কেন স্বামী থাকবে। সে কেন স্বামীর গাড়িতে পাইকপাড়া যাবে। কেন সে আজও অমিয়র নিজস্ব জিনিস নয় —তা ভেবে এক ধরনের ক্রোধ আর হতাশা মিশে যায় তার ভিতরে।

সে বলল—শুনুন।

—কী ?

—আপনার সম্পর্কে কিছুই কোনদিন জেনে নেওয়া হয়নি।

নীপা মৃদু হেসে বলে—জানাটা কি দরকার ছিল ?

—আমার সম্পর্কেও আপনি কিছু জানেন না।

—না। তবে আপনার বৌকে দেখেছি। খুব সুন্দর বৌ।

অমিয় স্থির চোখে নীপাকে চেয়ে দেখে। ঠিক। হাসি নীপার চেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী। হাসিও কালো। নীপার মতোই। তবু হাসির মুখ চোখ, শরীরের গঠন অনেক উঁচু জাতের। নীপার হিংসে হতে পারে।

অমিয় মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বলে—আমরা কেউ কারো সম্পর্কে জানলাম না কেন ?

নীপা এ কথার উত্তর দিল না। কারণ, এ বড় বিপজ্জনক কথা। উত্তর হয় না।

অমিয় বলল—স্কুটার থাক, চলুন আপনাকে রাধাবাজারের দিকে একটু এগিয়ে দিই। পথে বরং এক কাপ চা খেয়ে নেবো।

তারা হাঁটতে থাকে। নীপা মাথা নত রাখে। অমিয়কে সে যে অতিরিক্ত পশ্রয়

BanglaBoi.net

দিচ্ছে সে বিষয়ে সচেতন। দূরত্ব বজায় রাখছে। বোধহয় ভয়ও পাচ্ছে মনে মনে। আবার বোধহয় চাইছেও, অমিয় তাকে কিছু বলুক।

—আজ এমন করছেন, কী হয়েছে আপনার? নীপা তার মস্ত চোখ তুলে হঠাৎ বলে।

আশপাশ দিয়ে কলকাতার দৃশ্যাবলী মিলিয়ে যাচ্ছে ডাইলিউশনে। রেলগাড়ির মতো বয়ে যাচ্ছে কলকাতা। সেই গতিশীলতার মধ্যে তারা ধীরে হাঁটে। অমিয় বলে—আমার ব্যাঙ্কের অ্যাকাউণ্ট কী বলছে?

নীপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—ও!

আবার হাঁটতে থাকে তারা। ওল্ড কোর্টহাউস স্ট্রীট পার হতে হতে অমিয় বলে—আমি ভাল নেই নীপা।

নিজের নাম শুনে একটু চমকে ওঠে নীপা। চমকটা ঢাকা দিয়ে মৃদুস্বরে বলে—কেন? ব্যাঙ্কের অ্যাকাউণ্টের কথা ভেবে?

—না। অমিয় বলে—আমি তোমাকে ভালবাসতাম। কিন্তু সে কথা কখনো বলা হয়নি। এই অপরাধে।

নীপা ঠোঁট কামড়ায়, মাথা নত করে।

কলকাতার প্রকাশ্য রাজপথে। চারদিকে মানুষ আর মানুষের মধ্যে, প্রবল গাড়ির আওয়াজের মধ্যে এক নিস্তব্ধতার ঘেরাটোপ নেমে আসে।

অমিয় হঠাৎ দাঁড়ায়। ভিতরে বিষবাষ্প জমে উঠেছে আজ।

নীপা তার দিকে মুখ তুলে তাকায়। দুটি চোখ বাষ্পময়। কিছু বলতে চায়।

অমিয় আস্তে করে বলে—দেখা হবে। আবার।

—কোথায়?

অমিয় তেমনি আস্তে টরে-টক্কার মতো মৃদু লয়ে বলে—একটা স্টীমার ঘাট আছে। সেইখানে সকলের দেখা হয়।

—কোথায়? নীপার কপালে ভাঁজ পড়ে।

—ধু-ধু গড়ানে বালিয়াড়ি বহুদূর নেমে গেছে। তারপর কালো গভীর জল। একটা ফাঁকা শূন্য জেটি। অথৈ জল। ওপরে একটা কালো আকাশ ঝুঁকে আছে। বালির ওপরে পড়ে আছে একটা সাপের খোলস। হাহাকার করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে সেখানে।

অবাক চোখে চেয়ে আছে মেয়েটা।

অমিয় বলে—দেখা হবে।

তারপর হেঁটে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল অমিয়।

নীপা খুব ধীরে ধীরে হাঁটে। ভাবে। মুখে কয়েকটা দুশ্চিন্তার রেখা খেলা করে যায়। তারপর কখন যেন চোখ ভরে জল আসে। জলভরা চোখে চেয়ে দেখে। কলকাতা শহরটা কেমন ভেঙে চুরে গেছে! আবছা, অস্পষ্ট আর অলীক হয়ে গেল চারধার। অর্থহীন হয়ে গেল জীবন। বেলুনের মতো ফেটে গেল বাস্তবটা।

চোখের জল মুছে নেয় নীপা। ভুল রাস্তায় চলে যাচ্ছিল। সতর্ক হয়ে ফিরে

boiboi.net

এল সঠিক রাস্তায়। মানুষটা কেমন! খুব অদ্ভুত, না? ফের জল আসে চোখে। ওর অ্যাকাউন্টে মোটে দুশো পঁয়ত্রিশ টাকা আছে, নীপা জানে।

স্বামীর দোকানের দিকে হাঁটতে থাকে নীপা। কলকাতা শহর চারদিকে, তবু কেবলই মনে হয়, বালিয়াড়ির ভিতরে ডুবে যাচ্ছে পা। সামনে জল। জলের শব্দ। কেউ কোথাও নেই, কেবল বাতাস ঝড়ের মতো বয়ে যায়। মাথার ওপর কালো আকাশ ঝুঁকে আছে।

টাপে টোপে প্যাণ্ডেলের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে উঁকি দেয় কুকুরের মুখ। তারা আসছে সতর্ক পায়ে। ক্রমে ক্রমে। বেড়ালেরা আসছে নিঃশব্দে, ভিখিরিরা বাইরের গাছতলায় অনেকক্ষণ বসে আছে। একটা ভিখিরির ছেলে ঢুকে গেছে প্যাণ্ডেলে। কুকুর-বেড়ালের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে পাতার ঠোঙায় কুড়িয়ে নিচ্ছে এঁটো-কাঁটা। মাংসের হাড়, লুচির টুকরো, মাছের কাঁটা জড় করছে এক জায়গায়। খাঁ খাঁ করছে প্যাণ্ডেল। স্টিক লাইট জ্বলছে, ঘুরছে পাখা, এঁটো পাতা উড়ে উড়ে গড়িয়ে পড়ছে মাটিতে। উৎসব-শেষের বীভৎসতা চারদিকে।

বর-বৌ শোওয়ার ঘরে চলে গেল। নিয়ম নয়, কিন্তু আজকাল তো কেউ আর বাসর জাগে না। প্যাণ্ডেলের এক কোণে এখনো যজ্ঞের ছাই পড়ে আছে, দুটো রঙ করা চিত্রিত পিঁড়ি এখনো তোলা হয়নি, দেবদারু পাতায় সাজানো দরজায় মঙ্গল কলস, রঙীন কাগজের শিকল দুলছে হাওয়ায়।

একটা সিগারেট ধরিয়ে অমিয় দৃশ্যটা দেখে। সে এরকমভাবে বিয়ে করেনি। কয়েকটা সই করে তারা বিছানায় চলে গিয়েছিল।

পিসেমশাইয়ের হাতে এক হাজার টাকা দেওয়া গেছে অবশেষে। গতকাল সারাদিন ঘুরে বেড়িয়েছে অমিয়। টাকা-টাকা করে। প্যাটারসনের লাহিড়ী শুনে বলল—দূর মশাই, কে-বি ফিট করুন না।

—কে বি কি?

—কাবুলে। আপনার যদি জানাশুনো না থাকে আমি ফিট করে দিচ্ছি। কিন্তু সাবধানে ট্যাক্‌ল্‌ করবেন। এক হাজার ধার নিলে দু হাজার লিখে দিতে হবে।

—সে কী?

—ভয় নেই। আসলে ওরা লাইসেন্স-ওলা মানিলেণ্ডার, গভর্নমেণ্টের বেঁধে দেওয়া সুদের বেশী আইনতঃ নিতে পারে না। আপনাকে লেখাবে ছয় পারসেণ্ট সুদ, নেবে তার দ্বিগুণের বেশী। যদি বাইচান্স আপনি সুদ নিয়ে ঝামেলা করেন, তখন মামলা করবে দু হাজার টাকার ওপর। আর যদি সুদ ঠিক মত দিয়ে এক হাজার শোধ দেন তাহলে কাগজ ছিঁড়ে ফেলবে। কিন্তু সাবধানে ট্যাক্‌ল্‌ করবেন।

আজ সকালে টাকা পেয়ে গেছে অমিয়। এক হাজার। পিসেমশাইকে কথামত দেওয়া গেল। রেখার বর ভালই হল। টাটার এঞ্জিনীয়ার। দু হাজার নগদ, গোদরেজের আলমারী, সিঙ্গল খাট দুটো, সোফাসেট, পনেরো ভরি গয়না। পিসেমশাইয়ের বোধহয় আকাশ-বাতাস চাঁদ-সূর্যের আলো ছাড়া আর কিছু রইল না।

অমিয়র জন্য সারাদিন হা-পিত্যেশ করে বসে ছিলেন বুড়ো মানুষ। অমিয় এসে টাকাটা হাতে দিতেই উদ্ভাসিত হয়ে গেল মুখখানা। চোখের কোলে জল। বললেন—ভাবলাম তুই বুঝি আর এলি না! ভয়ে তোর অফিসে ফোন করিনি, যদি খারাপ খবর শুনি!

অমিয় একটু হেসেছিল।

হাসি আজ কিছুতেই ট্যাক্সিতে উঠতে চায়নি। বলেছে—এত সুন্দর রাত আজ। বাতাস দিচ্ছে, চাঁদ উঠেছে, বন্ধ গাড়িতে বসে কেন যাব! আমাকে তোমার স্কুটারে নিয়ে চল।

তাই এনেছে অমিয়। তার কোমর ধরে বসে এল হাসি। মেয়েদের দঙ্গলে মিশে গেছে এখন। উৎসবে হাসিকে চেনা যায় না।

রাস্তায় পার্ক করা শেষ দুটো মার্ক টু গাড়ির একটা ছেড়ে গেল সোনাদাকে নিয়ে। যাওয়ার সময়ে সোনাদা মুখ বাড়িয়ে বলল— অমিয় তোর সঙ্গে কথা আছে।

—কী কথা?

—সেই যে, মনে নেই কী বলেছিলি?

—কী সোনাদা?

—তুই বড় পাজী অমিয়, চিরকাল পাজী ছিলি.

—কেন?

—আমার বয়স হচ্ছে না রে? এই বয়সে মানুষ একটু গুছিয়ে বসতে চায়, এই বয়সেই তো সংসারের ভোগ সুখ, এই চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশে।

অমিয় চেঁচিয়ে হেসে বলেছে—ঠিকই তো।

—তবে তুই কেন আমাকে স্টীমারঘাটের কথা বলতে গেলি?

—কেন, কী হয়েছে?

—অমিয়, তুই কী বলিস তুই জানিস না! তুই চিরকালের পাজী। জানিস না, ওটা বলতে নেই! অমিয়, তুই চলে আসার পর থেকেই আমার বড় অস্থির লাগে। রাতে ঘুম হয় না। সারাদিন যখন-তখন অন্যমনস্ক হয়ে যাই। কেবলই মনে পড়ে—স্টীমারঘাট—স্টীমারঘাট।

শেষ মার্ক টু-টা দাঁড়িয়ে আছে। ওটা কার তা জানে না অমিয়। গাড়িটার আড়ালে তার স্কুটার হিম হয়ে আছে। হ্যাণ্ডেলটা একদিকে বাঁকানো। দেখে মনে হয়, ক্লান্ত মানুষ যেমন বসে বসে ঘুমোয় তেমনি ঘুমোচ্ছে।

পরিবেশনের সময়ে এঁটো-কাঁটার গন্ধে গা গুলিয়েছে বলে কিছু খায়নি অমিয়। হাসি কখন আসবে কে জানে! রাত অনেক হয়েছে। পায়ে পায়ে প্যাণ্ডেল ছেড়ে খোলা মাঠে আসে অমিয়। ঠাণ্ডা। দক্ষিণের বাতাস দিচ্ছে। সেই বাতাসে আকাশ-জোড়া এক বৃক্ষ নড়ে ওঠে, বকুলের মত খসে পড়ে একটি তারা।

অন্ধকার বারান্দায় দুই বুড়ো বসে আছেন। বরের মামা, আর পিসেমশাই। বরের মামার দুগালে পানের ঢিবি। তিনি পিসেমশাইয়ের দিকে ঝুঁকে বলছেন—পুরুতেরা আজকাল বড় শর্টকাট শিখেছে বিয়াই, আধ ঘণ্টায় কুসুমডিঙে সেরে ফেলল। আমার বিয়ের সময়ে চারঘণ্টা লেগেছিল যজ্ঞে। কনে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাকে তুলতে

দেখে আমি চিমটি কেটে জাগিয়ে দিই।

পিসেমশাই মুখ তুলে বলে—তুই কিছু খাসনি অমিয় ?

—না। বমি-বমি করছে।

—খুব খেটেছিস। সোমাকে বলি তোকে একটু সরবৎ করে দিক।

—না, আমি এবার চলে যাই।

—অমিয়, লোকজন খেয়ে কী বলল ? কিছু দোষ ধরেনি তো ?

বরের মামা পিচ ফেলে বললেন—আজকালকার বাজারে যা করেছেন যথেষ্ট।

ঘরে মেয়েদের ভীড়। অমিয় দরজায় দাঁড়িয়ে দেখে। হাসিকে দেখা যায় না।

সেই ভীড় থেকে সোমাদি এগিয়ে আসে—অমিয়, কী খাবি ?

—কিছু না।

—আমি তো নেমন্তন্নের রান্না খেতে পারি না, তাই এ ঘরে একটু ঝোল-ভাত রেঁধে রেখেছি। খাবি তো আয় ভাগ করে খাই।

—হাসি কোথায় সোমাদি ?

—ওকে তো সব ঘিরে রেখেছে। বলছে, তুমি ফাঁকি দিয়ে রেজেস্ট্রি বিয়ে করেছ, আমাদের খাওয়া মার গেছে। এবার খাওয়াও। অমিয়, হাসি দেখতে কী সুন্দর হয়েছে।

—রাত অনেক হয়ে গেল সোমাদি। হাসিকে ডাকো।

—তোর তো স্কুটার আছে, ভুস করে চলে যাবি। রাত হলে ভয় কী ? তোকে একটু দৈ-মিষ্টি এনে দিই ?

—সোমাদি, তুমি এত কষ্ট কর কেন ?

—কিসের কষ্ট ?

—খুব খাটো তুমি, টিফিনের পয়সা বাঁচাও, এত খেটে কী হবে সোমাদি ?

—তোকে তো বলেছি, আবার জিজ্ঞেস করছিস কেন ?

—সোমাদি, একটা স্টীমারঘাট—

—অমিয়, আমার এখনো অনেক কিছু করা বাকি, টাকা জমাচ্ছি, আমার অনেক-দিনের শখ, একটা রেকর্ড-চেঞ্জার কিনব। রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলের গানের অনেক রেকর্ড। শোন অমিয়, তুই নাকি রেখার বিয়ের জন্য মেসো-মশাইকে এক হাজার টাকা দিয়েছিস। সত্যি ?

—সোমাদি, তোমাকে সেদিন বলছিলাম—

—কি বলছিলি ?

—একটা ফেরিঘাটের কথা—

—অমিয়, মেসোমশাইকে এক হাজার টাকা দিয়ে খুব ভাল করেছিস। আমারও দেওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কী করে দেব ? জানিস তো, গত চৌদ্দ-পনেরো বছর আমার চাকরির ওপরই সংসার চলছে। রেখাকে একটা আঙটি দিলাম, তাতেই ধার হয়ে গেল। তুই টাকা দিয়ে ভাল করেছিস। মেসোমশাই সবাইকে ডেকে ডেকে তোর দেওয়া টাকার কথা বলেছেন।

—সোমাদি—

—শোন অমিয়, এখন আর আমার চাকরি করতে ভাল লাগে না রে। তুই যে সেদিন গিয়ে বললি, ভালবাসার লোক না থাকলে রোজগার করে সুখ নেই, সেটা বাজে কথা নয়। এখন আমি বুঝতে পারি সংসারে আমার যেটুকু আদর তা ঐ চাকরিটার জন্য। এ চাকরিটা যদি ছাড়ি তবে দেখব আমি কিছু নই, কেউ নই। আজকাল তাই ভীষণ টায়ার্ড লাগে। বাসায় ফিরে রাত্রে এমন মন খারাপ লাগে! একটা ইজিচেয়ার কিনেছি, সামনের মাসে কিনব একটা রেকর্ড-চেঞ্জার। বুঝলি অমিয়, বারান্দায় অন্ধকারে বসব। উঠোনে থাকবে অন্ধকার, চুপচাপ বসে চেঞ্জার চালিয়ে দেব—গান হবে—দুঃখের গান—বিরহের গান···শুনতে শুনতে কাঁদব হয়তো—আর মনে পড়বে···কী মনে পড়বে রে অমিয়···?

অমিয় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—তুমি তো জানো সোমাদি···

সোমাদি মাথা নেড়ে চাপা গলায় বলে—জানিই তো, জানব না কেন? মনে পড়বে···

পিসেমশাই সামনে এসে দাঁড়ান। কুঁজো দেখায় তাঁকে, বুড়ো দেখায়। অমিয়র দিকে অপলক একটু তাকিয়ে থেকে বলেন—আমি ভাবতাম ওর পিসিমা মরে গেছে বলেই বোধহয় অমিয় আর আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না, কিন্তু তা নয়। সোমা, অমিয় আমাকে—

—জানি মেসোমশাই। অমিয় বড় ভাল ছেলে।

পিসেমশাই শ্বাস ছেড়ে বলেন—আমি বড় একা হয়ে গেলাম। শেষ মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। সোমা, মাঝে মাঝে আসবি তো? অমিয় তুই?

—আসব না কেন!

—কী কথা হচ্ছিল তোদের?

সোমাদি মাথা নীচু করে বলে—কিছু না মেসোমশাই, অমিয় মাঝে মাঝে একটা ফেরিঘাটের কথা বলছে—

—ফেরিঘাট! কিসের ফেরিঘাট? কী রে অমিয়?

—স্টীমার বাঁধার জেটি, জল···

—ওঃ। পিসেমশাই হাসেন—স্টীমারঘাট মনে পড়তেই খালাসীদের মাংস রান্নার গন্ধ নাকে এসে লাগে এখনো। গোয়ালন্দে পারাপারের সময়ে ঐ গন্ধ যে কী ভাল লাগত। বুঝলি, বাহাদুরাবাদে একবার কাজলি মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়েছিলাম—সর্ষেবাটা, কাঁচালঙ্কা দিয়ে ঝোল—তেমন আর কখনো কি খাওয়া হবে? এক কাঠা চালের ভাত তুলে ফেলেছিলাম। তুই কোন ফেরিঘাটের কথা বলছিস অমিয়? গোয়ালন্দ? নাকি···

—কী জানি? আমি ঠিক জানি না। খুব উঁচু একটা বালিয়াড়ি গড়িয়ে নেমে গেছে বহু দূর পর্যন্ত···কালো ছোট্ট একটা জেটি···নির্জন···বালিতে একটা সাপের খোলস পড়ে আছে কেবল···আবছায়ায় জল দেখা যায়···সেকী জল···অনন্ত, অথৈ এক নদী বয়ে যাচ্ছে···

পিসেমশাই আর একটু কুঁজো হয়ে যান। একটা শ্বাস ফেলে বলেন—এখন এই বাড়িতে আমার একা কাটবে, বাদবাকী যে ক'টা দিন আছি। অমিয়, রাত হল রে,

boiRboi.net

বৌমাকে নিয়ে যাবি, অনেকটা রাস্তা, এইবার বেরিয়ে পড়। সোমা, তুই তো আজ যাবি না, না ?

—না।

—অমিয় আর দেরি করিস না। সোমা, বৌমাকে ডেকে দে।

—দিই।

—বড় একা লাগবে, বুঝলি অমিয় ? মাঝে মাঝে বৌমাকে নিয়ে চলে আসবি। দু-চারদিন করে থেকে যাবি। মনে করিস, আমি তোর এক বুড়ো ছেলে, আমার তো কেউ রইল না···

অমিয়র স্কুটার ডাকছে। গুড় গুড় গুড় গুড়। পিছনে হাসি। বাতাস সামনে থেকে পিছনে বয়ে যাচ্ছে। তবু মাঝে মাঝে এক এক ঝলক হাসির গন্ধ এসে নাকে লাগে। হাসির গন্ধ ! তা তো নয় হাসির আবার গন্ধ কী ? ও তো ওর খোঁপার বেলফুলের গন্ধ, সেণ্ট আর প্রসাধনের গন্ধ।

হাসির মুখ দেখতে পাচ্ছে না অমিয়। কেবল তার দু-খানা হাত অমিয়র কোমর বেষ্টন করে আছে। একবার ঝুঁকে নিজের পেটের কাছে হাসির জড়িয়ে থাকা হাতের পাতাদুটি দেখল অমিয়। আঙুলে আংটি ঝলসে ওঠে। মোমে মাজা আঙুলগুলি কী নরম হয়ে লেগে আছে তার পেটে।

হাসি দুরন্ত শ্বাসের সঙ্গে বলে—আরো জোরে চালাও না।

—কেন ?

—জোরে না চালালে স্কুটারে ওঠার আনন্দ কী !

—হাসি, আমার স্কুটারটা পুরনো হয়েছে। স্পীড নেয় না।

—পচা, তোমার স্কুটারটা পচা।

অমিয় হাসে। তিন, সাড়ে তিন বছর আগে ক্যাথিড্রাল রোডে, এই স্কুটারে···

—জ্যোৎস্না, ফুটেছে কেমন, দেখছ ?

—হুঁ।

—ঠিক দুধ-ভাতের মত জ্যোৎস্না, আমার খেতে ইচ্ছে করে।

—হাসি তুমি কবে যাচ্ছ ?

—তেরই।

—তোমার যদি টাকার দরকার থাকে···

—সামনে ওটা কী, ঐ উঁচু মত ?

—গড়িয়াহাটা ব্রীজ।

—ওমা ! ওর ওপর দিয়ে তো রোজ যাই আসি, কৈ অত উঁচু বলে তো মনে হয় না, ঠিক টিলার মত দেখাচ্ছে দেখ। চা-বাগানে আমরা ছেলেবেলায় টিলা থেকে ছুটে নামতাম···একবার দৌড় শুরু করলে আর থামা যায় না, কেবলই গতি বেড়ে যায়।

—হুঁ।

—তোমার স্কুটারটা পচা। আর একটু জোরে চালাও না।

boighar.net

—কেন ?

—আমার স্পীড ভাল লাগে।

গুড় গুড় করে স্কুটার ডাকে। গড়িয়াহাটা ব্রীজের গোড়া থেকে চড়াই ভাঙে। অমিয় স্পষ্টই টের পায় তার বয়স্ক স্কুটারটার এই চড়াই ভাঙতে কষ্ট হচ্ছে। 'খুব বেশিদূরে নয় আর, সে মনে মনে তার স্কুটারকে বলে, 'আর একটু কষ্ট করো স্কুটার। তারপর অন্ধকার সিঁড়ির নীচে তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোবে।'

—ব্রীজের ওপর ঠিক মাঝখানটায় দাঁড়াবে ?

—হাসি, অনেক রাত হয়েছে।

—ক'টা বাজে ?

—বারোটা চল্লিশ।

—হোকগে। তুমি দাঁড়াও।

ব্রীজের ঠিক ওপরটায় বাতাসের জোর বেশী। আকাশের কাছাকাছি উঠে তারা দাঁড়ায়। হাসি রেলিংয়ের কাছে চলে যায়। ডেকে বলে—দেখ, কত দূরে পর্যন্ত কী ভীষণ জ্যোৎস্না। সব দেখা যাচ্ছে। এত রাতে কলকাতা কখনো দেখি নি।

অমিয় বাতাসে সিগারেট ধরাতে পারছিল না। বার বার দেশলাইয়ের কাঠি নিভে যাচ্ছে। সে স্কুটারের ওপর না-ধরানো সিগারেট মুখে নিয়ে বসে রইল। হাসি তাকে ডাকে না। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে হাসি একা জ্যোৎস্নায় প্লাবিত অনন্ত শহরটি দেখে মুগ্ধ চোখে। এখন যদি নিঃশব্দে অমিয় তার স্কুটারকে ব্রীজের ঢালুর ওপর দিয়ে গড়িয়ে দেয়, যদি চলে যায়, তাহলে হাসি অনেকক্ষণ টেরই পাবে না। যে অমিয় চলে গেছে। কিছুক্ষণ পরে মুখ ফিরিয়ে স্কুটার এবং অমিয়কে না দেখে একটুও অবাক হবে না হাসি। তার মনেও পড়বে না যে, এই ব্রীজের ওপর সে অমিয়র সঙ্গে এসেছিল, তার স্কুটারে। হাসির মনেই পড়বে না।

না-ধরানো সিগারেট মুখে অমিয় অপেক্ষা করে। বাতাসে আকাশজোড়া এক বৃক্ষ নড়ে। বকুলের মত খসে পড়ে তারা। অমিয় অপেক্ষা করে।

একদিন যায়। দুদিন যায়।

দীর্ঘ টেণ্ডার টাইপ করতে করতে অমিয়র কাঁধ ব্যথা করে। চোখে ঝাপসা দেখে। সিগারেটে সিগারেটে জিভ বিস্বাদ। রাজেন চা এনে রেখে গেছে। খাওয়া হয় নি।

—বাগচী। কল্যাণ ডাকে।

—উঁ ?

—আপনার কি কিছু টাকার দরকার ?

অমিয় হাসে।

—রাজেনের কাছে আমি আরো ছ'শো টাকা রেখে দিয়েছি। আমি থাকি বা না থাকি, যখন দরকার হয় নেবেন।

—অনেক ধার হয়ে গেল মুখার্জী।

—আপনার সময়টা ভাল যাচ্ছে না। সেনগুপ্তের কোন পাত্তা পেলেন ?

—না।

boiRboi.net

—কত টাকার বিল পেমেণ্ট নিয়ে গেছে ?

—প্রায় সাত হাজার।

—ওকে খুঁজে পেলে কী করবেন—

—কিছুই না। কেবল একটা কথা বলব—

—কী কথা ?

—বলব…

অমিয় আর বলে না। বলতে পারে না। টাইপরাইটারের ওপর ঝুঁকে পড়ে তার মুখ। চোখে মেঘ। বাষ্পরাশি জমে ওঠে। সে দেখে, টাইপ করা লাইনের অক্ষরগুলো কে যেন আঙুলের টানে লেপে দিয়ে গেছে। কালো রেখার মত দেখায়। লাইনগুলো ধীরে আঁকাবাঁকা হয়ে যেতে থাকে। দুলতে থাকে। অমিয় দেখতে পায়, লাইনগুলো দুলতে দুলতে ঢেউ হয়ে যাচ্ছে।…ঢেউ আর ঢেউ। ফুলে উঠছে জল——অনন্ত অথৈ মহাসমুদ্রের মত জল। কালো মহাআকাশ ঝুঁকে আছে তার ওপর। বালিয়াড়ি ধু ধু করে সাদা হাড়ের মত। গড়ানে বালি, বালির ওপর ঢেউয়ের দাগ। সাপের খোলস উল্টে পড়ে আছে।

—মুখার্জী, আমি আপনাকে একটা জিনিস প্রেজেণ্ট করব।

—কী ?

—আমার স্কুটারটা।

—তা কেন বাগচী! এখন আপনার সময় ভাল যাচ্ছে না। প্রেজেণ্ট সুসময়ে করবেন।

—এই ঠিক সময় মুখার্জী। স্কুটারটার আর আমার দরকার নেই।

কল্যাণ একটু চুপ করে থাকে—যদি দরকার না থাকে তো ওটা আমি কিনে নিতে পারি।

—না মুখার্জী, আমাদের বংশে কেউ কখনো ঘরের জিনিস বেচেনি। আমি ওটা আপনাকে দিয়ে দেব। অভাবের সময়েই দেওয়া ভাল, সুসময়ে দেওয়া হয় না।

কল্যাণ চুপ করে থাকে।

—রাজেনের কাছে টাকাটা আছে বাগচী, দরকার হলে নেবেন।

—আচ্ছা।

টেণ্ডার সীল করে অমিয় বেরোয়। মেঘ কেটে রোদ উঠছে। চারদিকে পাথুরে শহর। প্রতিদ্বন্দ্বী কলকাতা। নীচে স্কুটারটা দাঁড়িয়ে আছে। অমিয় চেয়ে থাকে। তারপর স্কুটার ছাড়ে।

boiRboi.net

—লাহিড়ী।

—উঁ।

—টেণ্ডার দিয়ে গেলাম।

—আচ্ছা। দেখব।

—লাহিড়ী, প্যাটারসন কি এখনো আমাকে বিশ্বাস করে ?

লাহিড়ী হাসে। বলে—ওসব রোমাণ্টিক কথা ছাড়ুন। কে কাকে বিশ্বাস করে! অর্ডার আপনি পাবেন। ঠিকমত রেট দিয়েছেন তো, যেমন বলেছিলাম?

—দিয়েছি।

—ঠিক আছে।

অমিয় বেরোয়। ঘুরতে থাকে। মাঝে মাঝে নিজের অফিস ছুঁয়ে যায়।

—বাগচী।

—উঁ?

—ল্যাংগুয়েজ নিয়েই সবচেয়ে মুশকিল।

অমিয় হাসে। বলে—কেন?

রজত হাই তুলে বলে—কিছুতেই ল্যাংগুয়েজ খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ মেয়েটা রোজই মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ভারী অস্বস্তি।

—চেয়ে থাকে কেন?

—বোধহয় এক্সপেক্ট করে, জার্মানী যাওয়ার আগে আমি তাকে ফাইনাল কিছু বলে যাব। বাঙালী মেয়েদের জীবন খুব অনিশ্চিত তো। অথচ আমি কিছু বলতে পারছি না। ল্যাংগুয়েজ নিয়েই মুশকিল।

—কবে যাচ্ছেন?

—হরি সিং-এর সঙ্গে কণ্ট্যাক্ট করেছি। দিন কুড়ির মধ্যেই চলে যাব।

—আমাদের একা লাগবে।

—জানি। আফটার অল উই ওয়্যর কমরেডস্। বাগচী, আপনার জন্য কী পাঠাব বললেন না?

—ভেবে দেখি।

—সেনগুপ্তকে যদি কখনো খুঁজে পান বাগচী, গিভ হিম অ্যান এক্সট্রা কিক্ ফর মি। মনে রাখবেন।

অমিয় হাসে।

মিশ্রিলাল এসে চুপ করে বসে থাকে, ধৈর্য ধরে।

—বাগচীবাবু।

—জানি মিশ্রিলাল।

—আপনি তো আর কোন অর্ডার পেলেন না! বিজনেসের কী হবে? আমি ডুবে যাবো না তো।

বোধহয় দূরে কোথাও মেঘ-গর্জনের মত একটা শব্দ হয়। অমিয় কান পেতে শোনে। শার্শির বাইরে আজ প্রবল রোদ। কোথাও মেঘ নেই, তবুও শব্দটা কোথা থেকে শোনে অমিয়? একবার চোখ বোজে সে। অমনি এক পঞ্জরসার দেহে স্তম্ভিত-বিদ্যুৎ সিংহ তার চোখে ছায়া ফেলে দাঁড়ায়। গভীর অরণ্যের ছায়ায় বহু দূরের সিংহ ডাকে—মেঘ-মাটি কেঁপে ওঠে।

সে বলে—ডুববে না মিশ্রিলাল। আমি আছি। থাকব।

boiboi.net

হাসির সঙ্গে বড় একটা দেখা হয় না আজকাল। রাত পর্যন্ত সে বাইরে থাকে। ফিরে এসে দেখে, হাসির ঘর ফাঁকা। বোধহয় হাসি কলকাতায় তার চেনাশোনা মানুষদের সঙ্গে দেখা করতে যায়, দেখে সিনেমা-থিয়েটার, বোধহয় তার নেমন্তন্ন থাকে খাওয়ার। কে জানে! মধু তাকে চা করে দেয়। জিজ্ঞেস করে—বাবু, আপনার গাড়ি!

—দিয়ে দিয়েছি একজনকে।

বুড়ো মধু বিড় বিড় করে কী যেন বলে। বোধহয় জীবনের অনিত্যতার কথা নিজেকে শোনায়।

রাত বেড়ে যায়। ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসে। ঘুম হয় না। উঠে বসে অমিয় আলো জ্বালে। অফিসের কাগজপত্র দেখে। টেণ্ডারের খসড়া তৈরী করে। সে সময়ে ভেজানো দরজা ঠেলে হাসি আসে। নিঃশব্দে ঘরে চলে যায়। কাপড় ছেড়ে কলঘরে ঢোকে। বেরিয়ে আসে, জল খায়। শুয়ে পড়ে।

তাদের মধ্যে কোন কথা হয় না। হাসির যাওয়ার দিন এসে গেল।

রোদের তাপ আজকাল খুব বেড়ে গেছে। অমিয়র তাই কষ্ট হয় খুব। অনেকটা হাঁটতে হয়। কল্যাণ প্রায়ই বলে—বাগচী, স্কুটারটা নিয়ে বেরোবেন।

অমিয় হাসে। নেয় না। কল্যাণ কয়েকদিনে ভালই শিখে গেছে চালাতে। ও যখন স্কুটার চালায় তখন মুগ্ধ হয়ে দেখে অমিয়। ভাল লাগে। হিংসে হয় না।

রজতের কোন কাজ নেই আজকাল। ব্যবসা সীল করে দিয়েছে। তবু রোজ এসে দেখা করে যায়।

—কবে ফ্লাই করছেন সেন?

—বলিনি আপনাকে? বিশ তারিখ, টিকিট পেয়ে গেছি।

—বাঃ! ভাল খবর।

—বাগচী, ইউ আর সাফারিং টু মাচ্।

—ধারগুলো শোধ করতে হবে সেন।

—পালিয়ে যান না। সেনগুপ্তকে কে আর ধরতে পেরেছে।

—ঠিক দেখা হবে একদিন—তখন? অমিয় হাসে।

—বাগচী যদি সত্যিই কেটে পড়তে চান তো ব্যবস্থা করতে পারি।

—কী রকম ব্যবস্থা?

—জব্ ভাউচার। তিন মাসের মধ্যে আপনাকে নিয়ে যাব।

অমিয় হাসে।

কখনো কখনো শূন্য ঘরে, তার টেবিলের ওপর বিশাল সিংহ এক লাফ দিয়ে উঠে আসে। ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলে তার শরীর, পঞ্জরসার দেহ, পিঙ্গল কেশর। মুখে বৈরাগ্য, চোখে দূরের প্রসার। পুরুষের এরকমই হওয়ার কথা ছিল। কে তাকে শেখাল নারী প্রেম, হাঁটু গেড়ে প্রণয়ভিক্ষা, মোলায়েম ভালবাসার কথা! অপরূপ মগ্ন হয়ে দেখে অমিয়।

তারপর টাইপরাইটার টেনে নিয়ে বসে।

boiRboi.net

—আপনি বার বার কেন একটা স্টীমারঘাটের কথা বলেন জামাইবাবু ?

—আমি বলি না। অমিয় বলে। তুমি ওর কাছ থেকে কখনো শুনে নিও।

—কী করে শুনব ! আমি কাল চলে যাচ্ছি।

—শুনলে ভাল করতে।

—কেন ?

জামাইবাবু টেলিফোনের অন্যপ্রান্তে শ্বাস ফেলে।

—হাসি, আমাদের বয়স হয়ে গেল।

—হঠাৎ একথা কেন ?

—কী জানি ! আজকাল হঠাৎ কাজকর্মের মাঝখানে বয়সের কথা মনে পড়ে। আর মনে পড়ে—

—কী ?

—স্টীমারঘাট—তুমি সাবধানে যেও হাসি। গঙ্গার ওপর ব্রীজটা যে কবে ওরা শেষ করবে !

—আমি পাগল হয়ে যাব জামাইবাবু, স্টীমারঘাটের কথাটা আগে বলুন। কোন স্টীমারঘাট ?

—ফরাক্কা।

—না, ফারাক্কার কথা আপনি বলছেন না।

জামাইবাবু চুপ করে থাকে।

—বলবেন না ?

—তুমি অমিয়র কাছে শুনো।

—ওর সঙ্গে আমার দেখা হবে কখন ? ও অনেক রাতে ফেরে, খুব সকালে বেরিয়ে যায়।

—কাল স্টেশনে অমিয় যাবে না ?

—বলেছিল তো যাবে। অফিসে কাজ আছে, সেখান থেকেই সম্ভব হলে স্টেশনে যাবে।

—তবে আর সময় হবে না।

—কীসের ?

—স্টীমারঘাটের কথা শোনার। ফোন রেখে দিচ্ছি হাসি—

হাসি রিসিভার রেখে দেয়।

পরমুহূর্তেই আবার তুলে দ্রুত ডায়াল করে।

—হ্যালো আমি অমিয় বাগচীর সঙ্গে কথা বলতে চাই। এক্ষুনি, জরুরী দরকার।

একটু অপেক্ষা করতে হয়। তারপর অমিয়র গলা ভেসে আসে—বাগচী বলছি।

—শোন, তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা আছে।

—কী কথা ?

—তুমি আমাকে একটা কথা কোনদিন বল নি।

—কী ?

—স্টীমারঘাটের কথা। সবাইকে বলেছ, আমায় ছাড়া। একবার আমাকে বলবে ?

boiRboi.net

—আমার সময় নেই হাসি।

—কেন?

—আমি খুব ব্যস্ত।

—কেন ব্যস্ত?

—অনেক কাজ হাসি। আমাদের সময় তো বেশী নয়।

—বলবে না?

—সময় বড় কম হাসি।

—স্টীমারঘাটের অর্থ কী?

—কী করে বলব। আমিই কি জানি?

—কী আছে সেখানে?

—কিছু নেই। শুধু একটা উঁচু বালিয়াড়ি, ধু ধু বালি গড়িয়ে নেমে গেছে, একটা সাপের খোলস উল্টে পড়ে আছে। বালির শেষে দূর থেকে একটা কালো জেটি দেখা যায়। তারপর জল। সে খুব অথৈ জল, অনন্ত জল, প্রকাণ্ড এক নদী, তার ওপর কালো আকাশ ঝুঁকে আছে…

হাসি স্তব্ধ হয়ে থাকে।

—এর মানে কী?

—আমি জানি না। তবে মনে হয়, এখানে একদিন সকলের দেখা হবে।

—কেন?

—…

—কেন?

—…

—কেন?

—…

—কেন

প্যাটারসনের অর্ডারটা আজ বেরিয়েছে।

সকাল থেকেই অমিয় ঘুরছে বাজারে। ভাদ্র মাস পড়ে গেল প্রায়। রোদের তাপ অসম্ভব। মাঝে মাঝে ধুলোর ঝড় ওঠে। ঘূর্ণী হাওয়ার মত হাওয়া দেয়। হাঁটতে খুবই কষ্ট হয় অমিয়র। তবু সে হাঁটে। মাঝে মাঝে স্পষ্ট দেখতে পায় সামনে, ভীড় ভেদ করে চলেছে এক প্রকাণ্ড সিংহ। পিঙ্গল কেশর, পঞ্জরসার দেহটিতে স্তম্ভিত বিদ্যুৎ, গায়ে বৈরাগ্যের ধূসর রঙ, চোখে দূরের প্রসার। সিংহ মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে দেখে নেয়। দেখে নেয়, অমিয় ঠিকঠাক চলছে কিনা।

অমিয় চলে। সাপ্লায়ারদের কাছে ঘোরে। দোকান যাচাই করে। সে আছে। থাকবে।

স্টীমারঘাটের ছায়াটা চকিতে ভেসে ওঠে চোখে। মিলিয়ে যায়। দেখা হবে, একদিন সকলের সাথে দেখা হবে।

দুপুরের দিকে অফিসে ফিরে একটা সিগারেট মুখে টাইপরাইটারের সামনে বসে অমিয়। টাইপ করতে থাকে।

কল্যাণ ঘরে ঢুকেই বলে, এ কী বাগচী?

—কী?

—আপনি এখনো যাননি?

—কোথায়?

—কাল যে বলছিলেন আজ দার্জিলিং মেলে আপনার স্ত্রী চলে যাচ্ছেন!

—ওঃ।

—ভুলে গিয়েছিলেন?

অমিয় লজ্জিত হয়ে হাসে। সে ভুলে গিয়েছিল। হাসির কথা তার মনেই ছিল না।

—ক'টা বাজে মুখার্জী?

—বারোটা চল্লিশ। পঞ্চাশে ট্রেন ছেড়ে যাবে।

—তাহলে আর গিয়ে কী হবে!

—উঠুন তো। নীচে স্কুটার রয়েছে—তাড়াতাড়ি করুন, হার্ড লাক—পেতে পারেন। উঠুন, উঠুন—

দেরিই হয়ে গেল অমিয়র।

স্কুটার থেকে নেমে সে দ্রুত পায়ে উঠে এল স্টেশনের হলঘরে। আট নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে আসছে মানুষ—যারা প্রিয়জনদের বিদায় জানাতে এসেছিল। কোলাপ্-সিব্‌ল গেটের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অমিয় শূন্য রেল লাইনটা দেখে। বহু দূর পর্যন্ত দেখা যায়, লাইনটা চকচক করছে। কয়েকজন লোক বেরিয়ে আসছিল। তারা সরে যেতেই অমিয় দেখতে পেল হাসি দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে সুটকেস। সে একা।

—কী হল?

হাসির মুখ চিন্তান্বিত। কপালে ভ্রূকুটি। কেমন যেন আস্তে আস্তে চিন্তা করে বলল, আমি ট্রেনটা ধরতে পারিনি।

—কেন?

—পারলাম না।

—কেন?

হাসি খুব বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে। বলে—কী জানি! আমাকে কখনো জিজ্ঞেস কোর না।

অমিয় একটু হাসে।

boiRboi.net

আজকাল অমিয় যখন সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর ঘুমোয় তখন তার স্বপ্নের মধ্যে উপর্যুপরি সিংহের ডাক শোনা যায়।

মেঘ-গর্জনের মত সেই ডাক। মাটিতে লেজ আছড়ানোর শব্দ হয়। পিঙ্গল কেশর, পঞ্জরসার দেহে স্তম্ভিত বিদ্যুৎ, গায়ের ধূসর রঙের বৈরাগ্য, চোখে দূরের প্রসার—সিংহেরা তার ভিতরে ঘুরে বেড়ায়। উপর্যুপরি ডাক দেয়, মেঘ-মাটি কেঁপে ওঠে। ঘুমের মধ্যে

অমিয় হাসে।

অন্য ঘরে হাসির তেমন ঘুম হয় না। বহুদূর থেকে এক অচেনা রহস্যময় স্টীমার-ঘাটে এগিয়ে আসে। সে দেখে ধু ধু বালিয়াড়িতে চাঁদের আলো পড়েছে। পড়ে আছে সাপের খোলস। উঁচু থেকে দেখা যায়—গড়ানো বালিয়াড়ির শেষে জেটি, তারপর অনন্ত নিঃশব্দ জলরাশি—অথৈ। সেই স্রোতের ওপর আবহমান কাল ধরে ঝুঁকে আছে কালো আকাশ। ঐখানে সকলের দেখা হবে। কেন না, তারা বিশ্বস্ত থাকেনি নিজের প্রতি, এই দুর্লভ পার্থিব জীবন নিয়ে তারা হেলাফেলা করেছিল।

এসব সে নিজেই ভাবে। ভাবতে ভাবতে ভাবনা পাল্টে ফেলে। বারংবার সে ঐ স্টীমার ঘাটের অর্থ খুঁজতে থাকে। খুঁজে পায় না। কিন্তু না বুঝেও সে মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে অপলক চেয়ে থাকে। জলে চোখ আপনি ভেসে যায়।

॥ শেষ ॥

boiRboi.net

boiRboi.net

ফেরা

boiRboi.net

boiRboi.net

এক

বন্ধুগণ, হাওয়া ঘুরছে।

বাতাস এখন ওলট পালট। সামলে। ভয় নেই, সংকট মানেই পরিত্রাণ। বাতাস ঘুরছে। ঘোরার মুখটাতেই যা একটু গোলমাল। ঘরের চাল উড়ে যায়, মাথার ওপর আকাশ বেরিয়ে পড়ে। মড় মড় করে ভেঙে পড়ে গাছের ডাল। মেঘ চমকায়, কড়াৎ করে বাজ পড়ে। তবু মনে রাখবেন, হাওয়া ঘুরছে। হাওয়া ঘুরে যাচ্ছে। হাত বদল হচ্ছে পৃথিবীর অধিকার। দেরী নেই।

প্রিয় বন্ধুগণ, হে চলাচলকারী জনসাধারণ, একদিন আমি বিপ্লবের অপেক্ষায় রাস্তার মোড়ে ফুলের মালা হাতে দাঁড়িয়ে থেকেছি। ওপরের ব্যালকনি থেকে উৎসাহ ভরে দেখেছি কত না মিছিল। মিছিলে আমি হেঁটেওছি কতবার, পতাকা বহন করেছি। চেঁচিয়ে বলেছি আমাকে এটা দাও, সেটা দাও। কিংবা বলেছি—তুমি নিপাত যাও, অমুক নিপাত যাক। পুলিশের কালো গাড়ির ভিতরে বসে জালে আবদ্ধ কলকাতাকে দেখতে দেখতে গেছি জেলে। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক—এই কথা চেঁচিয়ে বলেছি, বলেছি মনে মনে।

সন্ত্রাসবাদের আমলে আমার বয়স হয় নি, আমার বাবার হয়েছিল। কিন্তু তিনি সন্ত্রাসবাদী ছিলেন না, অসহযোগীও না। তিনি ছিলেন খুবই সফল এক রেল-কেরানী। বড় ইংরেজ-ভীরু লোক, আবার স্বদেশীদেরও সম্মান করেছেন বরাবর। কাজে ফাঁকি দেন নি, তাঁর ক্যাজুয়্যাল লীভ বছর বছর পচে যেত। জ্ঞান-বয়সে একমাত্র দাদুর শ্রাদ্ধের সময়ে, আর দিদির বিয়ের জন্য দু'টি দিন তিনি স্বেচ্ছায় ছুটি নিয়েছিলেন। একেবারে চাকরির শেষ দিকটায় তাঁর প্রোমোশন হয়েছিল। শেষ একটা বছর তিনি স্বাধীন ভারতীয় রেলে কমার্শিয়াল ইন্‌সপেক্‌টর ছিলেন। তাঁর সেই উজ্জ্বল সাফল্যের কথা তিনি এখনো লোককে ডেকে শোনান। এখনো তিনি ইংরেজদের গুণগান করেন। লক্ষ্য করে দেখেছি, ভারতের স্বাধীনতা কিংবা তজ্জনিত আন্দোলন, কিংবা গান্ধী বা ঐ রকম নেতারা, তাঁর মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করাতে পারে নি, যতটা পেরেছিল তৎকালীন ইংরেজ ডি. টি. এস. কিংবা ওপরওয়ালা অন্য কোন সাহেব।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমার এই বাবাটির জন্যই আমি বরাবর মনে মনে বিপ্লবী। দিনশেষে বাবা বাসায় ফিরে রুটি খেতেন, তখন আমরা ছয় ভাইবোন তাঁকে ঘিরে ধরতাম। বাবা ভাগ দিতেন। মা আমাদের তাড়া দিলে তিনি দুই বাহু বাড়িয়ে বলতেন—আহা, থাক, থাক। রাতে পড়া করার সময়ে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে গেলে হঠাৎ শুনতে পেতাম, রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে বাবা মাকে

বলতেন—এবারও হল না, বুঝলে! সান্যাল আমার কত জুনিয়র, অথচ ও বেরিয়ে গেল প্রোমোশন পেয়ে। শুনতাম, মা ঝেঁঝে উঠে বলছেন—তা তুমি করো কী? বাবা উত্তর দিতেন না। ভাবতেন। কখনো বা পড়ার ঘরে এসে বলতেন—ইংরিজিটা খুব ভাল করে শেখো। চাকরিতে কাজে লাগবে। একবার রেলের এক ফুটবল ফাইন্যাল দেখতে গেছি। সুন্দর তাঁবুর নীচে ভাল ভাল চেয়ারে সাহেবরা বসে, পাশে মেম, সামনের টেবিলে কাচের গেলাস অ্যাশ-ট্রে, বেয়ারারা ছোটাছুটি করছে। সেই তাঁবুর পাশে বাবা ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে খেলা ছেড়ে, চোর-চোখে, সেইসব অতিকায় সাহেবসুবো দেখছিলেন। আমি বাবাকে দেখছিলাম। সেই বোধহয় প্রথম আমি বাবার তুচ্ছতা বুঝতে পারি। সেই দৃশ্যটা, বাবার সেই মুখ, একটা বিষ-বিছের কামড়ের মতো লেগে আছে আমার বুকে। খেলার শেষে সাহেবসুবো, খেলোয়াড়দের জন্য লেমনেডের ক্রেট এসে পেঁছিলো। বাড়তি বোতলগুলোর জন্য শুরু হয়ে গেল হুড়োহুড়ি। সেই ভিড়ের মধ্যে আমি আমার অসহায় অক্ষম বাবাকে আর একবার লক্ষ্য করি। ঠেলা-ধাক্কায় তাঁর চশমা পিছলে যাচ্ছে নাক থেকে, কোঁচা খুলে পড়ছে, অতি কষ্টে তিনি, যে লোকটা লেমনেডের বোতল বিলি করছে তার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে বললেন—তারকদা, আমাকে একটা। এই যে আমি—আমাকে—। অবশেষে একটা বোতল তিনি অতিকষ্টে পেয়েছিলেন। অর্ধেক খেয়ে আমার দিকে বোতলটা বাড়িয়ে বললেন, খা। খুব মিষ্টি। তাঁর মুখখানায় তখন সেই মিষ্টি স্বাদ ছড়িয়ে আছে। কিন্তু লেমনেডের বোতলে মুখ দিয়ে সেই প্রথম আমি জীবনের তিক্ততার স্বাদ পাই।

তেতো স্বাদের সেই শুরু। তারপর মাঝে মাঝে আমি ক্রমান্বয়ে সেই তিক্ত স্বাদ পান করেছি। আমাদের ছেলেবেলা খুব সুখের হওয়ার কথা নয়। সুখের ছিলও না। কাটিহারে যে রেল কোয়ার্টারে আমার শৈশবের অনেকটা সময় কাটে, সেটা ছিল খুপড়ি, অন্ধকার। লালারাম ইনস্টিটিউটের উল্টো দিকে রেল ইয়ার্ডের গা ঘেঁষে সেই মোটা দেওয়াল, ছোট্ট ছোট্ট জানালার ঘর। সারাদিন শান্টিং ইঞ্জিনের ধোঁয়া আমাদের বাড়িটার ভিতরে জমে থাকত। সেই কাঁচা কয়লার ধোঁয়ার আবছায়ায় আমরা দীনভাবে প্রতিপালিত হতাম। ময়লা মশারি, ময়লা বিছানা, রঙচটা আয়না, তুচ্ছ আসবাব, অতি নিম্ন মধ্যবিত্তের ঘরে যেমনটা দেখা যায়। সারা বাড়িতে ঝুল ঝুল অন্ধকার বাদুড়ের মতো ঝুলে থাকে। একটা ভ্যাপসা গন্ধ। অবশ্য আমাদের বেশির ভাগ সময়ই কাটত বাজারের রাস্তায়, প্ল্যাটফর্মে, খালাসী-টোলায়, ল্যাংড়াবাগানে। বাইরে থেকে কখনো বাসায় ফিরতে ইচ্ছে করত না। যতক্ষণ বাইরে থাকা যায় ততক্ষণ আমরা থাকতাম। পড়তে বসেছি, মা হয়তো মশলা আনতে পাঠাল। মশলা আনতে গিয়ে কতবার রাস্তায় বাজীকরের খেলা, কুষ্ঠরোগীর ভিক্ষে চাওয়া, বাঁদরনাচ, খালাসীর ছেলেদের মারামারি, নিদেন পক্ষে ইঞ্জিনের শান্টিং দেখে খামোখা খানিকটা সময় কাটিয়ে আসতাম। আমার দুই দিদি সারাদিন ঘুরেফিরে ছোট্ট জানালার মোটা মোটা গরাদ ধরে বাইরের দিকে চেয়ে থাকত। তাদের বাইরে বেরোনোর নিয়ম ছিল না। মনে পড়ে, সে সময়ে বিয়ে, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন পেলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকত না।

এ. টি. এস. সাহেবের ছেলেকে বাবা দশ টাকা মাইনেয় পড়াতেন। সেই বাড়িতে একবার আমি বাবার সঙ্গে জন্মদিনের নেমন্তন্ন খেতে যাই। সেটা ছিল গার্ডেন পার্টি। বিশাল লনে ফুলের কেয়ারী ছিল, কুঞ্জবন ছিল, পাথরে বাঁধানো চাতাল ছিল। তখন শীতকাল, পপী ফুলের বাগানে প্রজাপতির মতো ক্ষীণজীবী ফুলেরা আলগোছে ফুটে আছে। ক্রিসেনথিমাম, সূর্যমুখী, মোরগ ফুল, আর গোলাপের ফাঁকে ফাঁকে রঙীন আলোর ডুম জ্বলছে। দুধের মতো শাদা ঢাকনায় ছোটো ছোটো টেবিল ঘিরে দুটো-চারটে করে চেয়ার। টেবিলের ওপর গেলাসে, পাকানো শাদা তোয়ালে, কী সুন্দর সব ছেলে-মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে চারধারে। সে যেন পৃথিবীর দৃশ্য নয়। সেই সব সুন্দর সুগন্ধী শিশুরা যেন বড় হবে বলে পৃথিবীতে আসে নি, তাদের নেই জীবনযাপন। তারা স্বপ্নরাজ্য থেকে নিমন্ত্রণে এসেছে, আবার ফিরে যাবে। কালো প্যান্ট, বুট আর সাটিনের কোট পরা একটা ছেলে এগিয়ে এসে বাবাকে বলল, মাস্টারমশাই! বাবা তাকে রিবনে বাঁধা একখানা গল্পের বই উপহার দেবেন বলে সঙ্গে করে এনেছিলেন। বইটা আমার হাতে দিয়ে বললেন—এই হচ্ছে হিমাদ্রি, সাহেবের ছেলে। ওর জন্মদিন, বইটা ওকে দাও অতনু। আমি দেখেছিলাম জন্মদিনে ও এয়ারগান থেকে শুরু করে অনেক দামী উপহার পেয়েছে, এক সেট ক্রিকেটের সরঞ্জামও। তুচ্ছ বইটা সুন্দর ছেলেটির হাতে দেওয়ার সময়ে আর একবার আমার মনে হল, আধ-খাওয়া মিষ্টি একটা লেমনেডের বোতলে মুখ দিয়ে আমার সমস্ত শরীর তেতো স্বাদে ভরে গেল। সেই সুন্দর বাগানের চারপাশে চেয়ে মনে হয়েছিল—এখানে কোথাও আমাকে মানায় না। খবরের কাগজের জামা পরে বসে পশ্চিমা নাপিতের কাছে মাসে একবার খুব ছোটো করে চুল ছাঁটতে হয় আমাদের, পুজোর সময়ে কেনা বছরের বরাদ্দ একজোড়া জুতো কদাচিৎ কালি করা হয়। আমার সবচেয়ে ভাল জামাটি সস্তা রামধনু মার্কা জাপানী সিল্ক থেকে তৈরি, পরনে শাদা মোটা জিন্-এর হাফপ্যান্ট। গায়ে কালো মোটা কুটকুটে কোট—গতবার আমার পিসতুতো দাদার ছোটো হয়েছিল বলে আমি পেয়ে যাই। তার ওপর আমরা উপহার এনেছি মাত্র আট আনা কি বারো আনা দামের গল্পের বই। চারদিকের বিস্ময়ের মাঝখানে আমি দিশেহারা। লজ্জায় নিজের ভিতরে ডুবে যাচ্ছি। সেই সময়ে হিমাদ্রির মা এসে বাবাকে বললেন—ওমা, মাস্টারমশাই, আপনি এখানে কেন? আপনি তো বাইরের লোক নন। আমাদের ঘরের লোক। যান, ভিতরে গিয়ে বসুন গে। এইটি ছেলে বুঝি। বড্ড রোগা তো—

শ্রেণীবৈষম্যের সেটা হয়তো প্রাথমিক বোধ। একটা স্বপ্নের বাগানে পৃথিবীর ধুলোমাখা পায়ে দু'টি লোক ঢুকে পড়েছে—আমার শৈশবের শ্রেণীচেতনা ঐ দৃশ্যটি থেকে জন্মলাভ করেছিল হয়তো। সেই বাড়িতে আমাদের কোনো অনাদর করা হয় নি—কেবল সেই বাগানের দৃশ্যটিকে নিখুঁত রাখার জন্য আমাদের খুবই ভদ্র এবং বিনীতভাবে হিমাদ্রির পড়ার ঘরে সরিয়ে নিয়ে বসতে দেওয়া হয়েছিল। সে ঘরটিও সুন্দর। এবং সেখানে হিমাদ্রির দিদির গানের মাস্টারমশাই, হিমাদ্রির বাবার অফিসের বড়বাবু, এরকম দু' চারজন লোক ছিলেন। ছিল তাঁদের ছেলেমেয়েরা। সেখানে আমাদের আদর করে প্রচুর খাবার দেওয়া হয়েছিল। সেই খাবার থেকে

আমি গোপনে কোটের পকেটে সন্দেশ আর চানাচুর প্লেট থেকে সবার চোখের আড়ালে সরিয়ে, মা আর ভাই-বোনের জন্য নিয়েছিলাম। কত কী যে খেয়েছিলাম তা আর খেয়াল নেই। তবু তারপর অনেকদিন ধরে আমার কেবলই মনে হত—অত খাবার, অত আপনকরা আদরের চেয়েও যেন ঐ স্বপ্নের বাগানটির একটি টেবিল ঘেরা চেয়ারে একবার বসতে পাওয়া অনেক বেশি সৌভাগ্যের ছিল। ঐ সুন্দর দৃশ্যটি থেকে কেন যে আমাদের বাদ দেওয়া হল! স্কুলের ফুটবল টিমের গ্রুপ ছবি উঠছে একবার, কালো কাপড়ে ঢাকা সেই রহস্যময় ক্যামেরার মুখোমুখী দাঁড়াতে খুব একটা ইচ্ছা ছিল ছেলেবেলায়। তাই অনাহূতে আমি সেই ফুটবল টিম্-এর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। বড় ছেলেরা তখন আমাকে বার করে দেয়। সেই দুঃখ ও লজ্জার সঙ্গে কোথাও যেন এই ঘটনার মিল ছিল। যদিও আমাদের বের করে দেওয়া হয় নি, অপমানও করা হয় নি। কেবল মাত্র বাইরের সুন্দর বাগানটির দৃশ্যকে নিখুঁত রাখা হয়েছিল। এইসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অপমান আমার বাবা হয়তো বুঝতে পারতেন না। আমি পারতাম। পারতাম বলেই আমার জীবন ঠিক আমার বাবার মত হয় নি।

আমার দশ-বারো বছর বয়সে এক বন্ধু জুটেছিল। খুবই রোগা সে। তার কানে পুঁজ, দাঁতে পোকা, হাঁটু আর কনইুয়ে দীর্ঘস্থায়ী ঘা, পেছনের বেঞ্চে বসা ছেলে। সে পড়া পারত না, মিথ্যে কথা বলত। তার নাম ছিল প্রকাশ। টিফিনের পর প্রায় দিনই সে স্কুল পালাত। কিন্তু বাড়ী ফিরত না। তার বাবা ছিল খালাসী। ঘরে-বাইরে এবং ইস্কুলে সে বেদম মার খেত রোজ। কিন্তু তবু তার স্বভাব পাল্টাত না। স্কুল পালিয়ে সে প্রায় দিনই গিয়ে স্টেশনের ওভারব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে রেল-ইয়ার্ডে গাড়ির শাণ্টিং দেখত অনেকক্ষণ। রাস্তায় রাস্তায় মার্বেল খেলত, কিংবা ডাংগুলি। বাজারের মোড়ে যে চোখে-ছানিওলা বুড়ো ঢ্যাপের মোয়া বিক্রি করত, তাকে ফাঁকি দিয়ে ঢ্যাপের মোয়া চুরি করত সে। সে স্কুলের ছেলেদের পেন্সিল, রবার, পয়সা চুরি করত প্রায়ই। সবাই জানত প্রকাশ চোর। তার পাশে কেউ বসতে চাইত না। টিফিনের সময়ে বা ছুটির পর স্কুলের ছেলেদের খেলাই ছিল প্রকাশকে খ্যাপানো। তার নাম বলতে গিয়ে কেউই শুধু নামটা বলত না। বলত—চোট্টা প্রকাশ, ঘেয়ো প্রকাশ, গান্ধা প্রকাশ। সমস্ত স্কুলটা, নিজের বাড়িটা, বাইরের জগৎটা, সবই ছিল প্রকাশের বিরুদ্ধে। কিন্তু প্রকাশের একটা অদ্ভুত গুণ ছিল এই যে, সে কখনো কাউকে ভয় পেত না। যখন স্কুলের রাস্তায় দশ-বিশ ছেলে তার পিছনে লাগত, তখন রেগে গিয়ে প্রকাশ বরাবর ঘুরে দাঁড়িয়েছে। একা রোগা প্রকাশ প্রায় দিনই দশ-বিশ জনের সঙ্গে মারপিট করতে গিয়ে প্রচুর কিল-চড়-লাথি খেত। কাঁদত। কিন্তু পরদিনও আবার মারপিট করত। খালাসীটোলায়, ল্যাংড়া বাগানে, বাজারে এ রকম ঘটনা ঘটত হামেশাই। কেউ গাল দিলে, খ্যাপালে, মারলে প্রকাশ ঘুরে দাঁড়াত, মারপিট করত। মার খেত রোজ, তবু মারপিট করতে ছাড়ত না। খালাসীটোলার ছেলেরা তাকে রাস্তায় ধুলোয় পিষে দিয়েছিল প্রায়, তবু সে আবার লাগত তাদের সঙ্গে।

প্রকাশের ঐ একটিই গুণ ছিল। তার সাহস। বড় দুর্লভ গুণ। মারকুটে,

গুন্ডা বদমাস অনেক ছেলে থাকে, কিন্তু প্রকৃত সাহসী ছেলে থাকে কম। প্রকাশের ঐ গুণ আমাকে তার দিকে টানত। আমি গান্ধা, ঘেয়ো, চোর প্রকাশের পাশাপাশি বসতাম। একসঙ্গে স্কুল পালাতাম। ল্যাংড়া বাগানে, সাহেব পাড়ায়, খালাসী-টোলায় রাস্তায় রাস্তায় খেলে বেড়াতাম। প্রকাশের সঙ্গে থাকার ফলে প্রায়ই আমাকে হাঙ্গামায় পড়তে হত। প্রথম প্রথম কিছুদিন মারপিট লাগলে প্রকাশকে একা ফেলে আমি পালিয়ে যেতাম। প্রকাশ তার জন্য কখনো আমাকে দোষ দিত না। সে জানত, তার লড়াই তার একার। একাই সে দশ-বিশ ছেলের মার হজম করত। তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মারপিট দেখলেই আমার বুক কাঁপতে থাকত, হাত পা যেত অবশ হয়ে, দিশেহারা বোধ করতাম। প্রকাশ সেটা বুঝত। মার-পিটের সম্ভাবনা দেখলেই সে চেঁচিয়ে বলত—অতনু, তুই পালা—

আর কোনো বন্ধু ছিল না বলেই প্রকাশ আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। ল্যাংড়া বাগানে গ্রীষ্মের প্রথম সময়ে, দুপুরবেলায়, ছুরিতে কাঁচা আম ছাড়াতে ছাড়াতে প্রকাশ বলত—তোর গায়ে যদি কখনো কেউ হাত দেয় তো তাকে আমি দেখে নেবো।

আমি ভেবে পেতাম না, কেউ কখনো কেন আমার গায়ে হাত দেবে। আমি মারকুটে নই, চোর নই, কেউ আমাকে খ্যাপায় না। তাই আমি বলতাম—আমাকে কেউ মারবেই না।

—তবু যদি মারে—

আমি তখনই বড়াই করে বলতাম—সাহসই হবে না কারো।

প্রকাশ আমার সেই বৃথা অহংকার দেখে একটুও হাসত না। গম্ভীরভাবে বলত—তা অবশ্য ঠিক।

এক একদিন সে গভীর ভাবে চিন্তা-টিন্তা করে আমাকে বলত—অতনু, তোর সঙ্গে আমার কখনো আড়ি হবে না।

—কেন?

—হবে না—দেখিস। আমাদের জন্মের মতো ভাব।

বুঝতাম, তার মন চাইছে আমার সঙ্গে তার জন্মের মতো ভাব থাক। আমি তার একমাত্র বন্ধু, তার আর কেউ নেই। সে বলত,—আমার দিদি রেণুদির সঙ্গে সই পাতিয়েছে। তাদের জন্মের মতো ভাব হয়ে গেল, আর কখনো আড়ি হবে না।

তারপর খুব লজ্জার সঙ্গে প্রকাশ বলত—অতনু, সই পাতাবি?

—দূর। পুরুষেরা কি সই পাতায়?

—তবে? অসহায়ভাবে প্রশ্ন করত প্রকাশ। তার বন্ধুকে বাঁধবার আর কোন কৌশল তার মাথায় আসত না।

আমি বরাবর তার বন্ধু থাকব কিনা এ বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত হতে পারত না বলেই, ঘুরে ঘুরে আমার কাছে আসত। সকালবেলায় পড়তে বসেছি, হঠাৎ জানালায় প্রকাশের হাসি মুখখানি উঁকি মারত—পড়ছিস?

—হুঁ।

boiRboi.net

—পড়। এবার দেবীকে হারিয়ে ফার্স্ট হওয়া চাই।

আসলে দেবীকে হারিয়ে ফার্স্ট হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। আমি লেখাপড়ায় নিতান্তই সাধারণ, ফার্স্ট সেকেণ্ডদের ধারে কাছেও নই। তবু প্রকাশ ঐ কথা বলত, আমাকে খুশি করার জন্য। আমি হাসতাম।

প্রকাশ গম্ভীর হয়ে বলত—তুই খেটে পড়লে ওরা পারবে নাকি?

প্রকাশ আমার জানালার বাইরে থেকে রোজই কথা বলে যেত। কিন্তু বাড়ির ভিতরে আসত খুবই কম। সে এলে আমার দিদিরা, ভাই-বোনেরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করত। সে লজ্জা পেত খুব। আবার বোকার মত সে আমার দিদিদের ফাই-ফরমাশও খেটে দিত।

সারাদিন শহরময় ঘুরে বেড়াত প্রকাশ। খালি পায়ে হাঁটত বলে পায়ের নীচে কড়া পড়েছিল, পায়ের পাতাটা পুরো ফেলতে পারত না প্রকাশ। একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই সারা শহরে ঘুরত সে। কোথায় কী চুরি করত, কাকে গাল দিত, কার সঙ্গে লাগত কে জানে। একবার তার সঙ্গে বাজারের ওধারে বেল পাড়তে গেছি, ভুঁইয়াদের দশ-বারোটা ছেলে এসে প্রকাশকে ধরল—তুই শালা আমাদের ক্ষেতি থেকে শালগম উপড়ে নিয়ে গেছিস।

প্রকাশ উদাস গলায় বলল—আমি না।

আমি পালাব বলে পা বাড়িয়েছি, একটা ছেলে এসে আমার কোমর পেঁচিয়ে ধরল—এ শ্যালা ভি চোট্টা, এই গান্ধাটার সঙ্গে এটাও ঘোরে।

—মার শালাকে—

ভুঁইয়াদের মারকুটে স্বভাব আমার জানা ছিল। ভয় পেয়ে আমি হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে বলছি—আমি না। ঐ প্রকাশ চোর। ও চুরি করেছে।

কিন্তু ছেলেগুলো ছাড়বে না কিছুতেই। প্রকাশকে দু'জন ধরে রেখেছে, একজন তার পিছন থেকে বগলের নীচে দিয়ে হাত ঘুরিয়ে ঘাড়ের ওপর ধরে কুঁজো করে রেখেছে, অন্যজন ধরেছে চুলের মুঠি, চারপাশ থেকে আর সবাই গাল দিচ্ছে আর কিল চড় মারছে। সেই মারের দৃশ্য দেখে আমি ভয়ে অবশ হয়ে গেলাম, সারা শরীরে ঘাম, তিন-চারজন আমাকে ঘিরে ধরেছে তখন। গাল দিচ্ছে। আমি বোবা হয়ে, বোকার মত চেয়ে আছি। মারবে! এরা আমাকে মারবে! আমি জীবনে কখনো বাড়ি কিংবা স্কুলের বাইরে এরকম হাটুরে মার খাই নি। কিন্তু তারা মারবার আগেই কী কৌশলে প্রকাশ পাঁচ সাতটা ছেলের হাত ছিটকে ছাড়িয়ে এল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে এসে রোগা কনুয়ের ধাক্কায় আমার চারপাশের ছেলেগুলোকে দু' হাত হটিয়ে দিয়ে বলল—খবর্দার, ওর গায়ে হাত দিবি না, আমি চুরি করেছি তো আমার সঙ্গে লড়। বলেই সে দুই হাত আর পা চালাতে লাগল কাঁকড়ার মতো। ধাক্কা খেয়ে আমি পড়ে গিয়েছিলাম। ঐ অবস্থাতেই দৃশ্যটা দেখলাম আমি। পায়ের তলায় কড়া বলে একটু খোঁড়া প্রকাশ, মাথায় আ-ছাঁটা চুলের জন্য তার প্রকাণ্ড মাথাটা রোগা শরীরের ওপর ঝুল-ঝাড়ুনির মতো দেখাচ্ছে, হাতে-পায়ে ঘা, চিট ময়লা নোংরা জামা-কাপড়। তাকে দেখলে এমনিতে হাসি পায়। তবু হাস্যকর চেহারার সেই ছেলেটির তীব্র রাগ আর লড়িয়ে তেজ আমার

boiRboi.net

boiRboi.net

ভিতরটায় উপর্যুপরি কয়েকটা ছুঁ্যাকা দিয়ে দিল। আমি লাফিয়ে উঠলাম। মারধরের কিছুই জানি না। তবু হাতে-পায়ে-দাঁতে নখে আমি সেই দশ-বারোটা ছেলেকে এলোপাথাড়ি মারতে লাগলাম। মুহূর্ত পরেই আমার মারগুলো ফিরে আসতে লাগল। ঠোঁটে, নাকে, মাথায়, পিঠে। ঠোঁট কেটে রক্তের নোনতা স্বাদ পাচ্ছি, চোখ ফুলে বন্ধ হয়ে আসছে, টানের চোটে পটাপট ছিড়ে যাচ্ছে মাথার চুল। তবু লড়ে যাচ্ছি। আমার দুর্বল হাত দিয়ে, পা দিয়ে যতদূর সম্ভব মারছি। ক্রমে শিথিল অবশ হয়ে আসছে শরীর, ঘাম দিচ্ছে। পড়ে যাচ্ছি। সেই সময়ে বাজারের দিক থেকে লোকজন ছুটে এসে আমাদের আলাদা করল।

আমার তখন দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। অসম্ভব কাঁপছে হাত-পা। রী-রী করে শরীর কাঁপছে। ঘামে ভেজা শরীরে বাতাস লাগতেই শীতে কুঁকড়ে যাচ্ছি। একটা দোকানের বারান্দায় বসে মুখে চোখে জল চেপে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। পাশে প্রকাশ। সে আমার তিন গুণ মার খেয়েছে। কপালে বিরাট কালশিটে, ঠোঁট কাটা, চুল খাড়া হয়ে আছে, কনুই হাঁটু ছড়ে গেছে। তবু হাসছে সে। অনাবিল আনন্দের হাসি। আমিও টের পাচ্ছি, আমার ভিতরে কোনো দুঃখ নেই। বড় ঝরঝরে লাগছে ভিতরটা। মার খাওয়ার ভয় এতকাল রোগ জীবাণুর মতো আমার ভিতরে ভিতরে ক্ষয় করাচ্ছিল। প্রকৃত মার খাওয়ার পর হঠাৎ সেরে গেছে। ফাটা কাটা, ব্যথার শরীর জুড়ে কোথায় যেন একটা টলটলে জ্বর-সেরে-যাওয়ার আনন্দ জমে উঠছে। আমি প্রকাশের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। প্রকাশ ফিস্ ফিস্ করে বলল—মার খেতে খেতে আমার হাড্ডিগুড্ডি পেকে গেছে—এখন আর লাগে না। তোর বড্ড লেগেছে—না রে?

আমি মাথা নাড়লাম—ও কিছু না। আমারও আর লাগবে না—দেখিস।

এইভাবেই আমার আর একটা জীবনের শুরু। প্রায় সময়েই আমরা মারপিট করতাম। বেশিরভাগ সময়েই মার খেতাম। তবু একটা নেশার মতো ছিল সেটা, ছিল রোমহর্ষ, আনন্দ।

স্কুলে, পাড়ায় ক্রমশ মারকুটে ছেলে বলে সবাই চিনতে লাগল আমাকে। আমি আর প্রকাশ গোপনে মারপিটের নানা কৌশল আয়ত্ত করতাম। দেয়ালে ঘুঁষি মারা, দৌড়, নানা রকম প্যাঁচ, হঠাৎ লেঙ্গী মেরে ফেলে-দেওয়া—এইসব নানা ছেলেমানুষী কায়দা-কানুন। পকেটে গুলতি থাকত, পাথর থাকত, থাকত পেন্সিল-কাটা ছুরি। কার্যকালে অবশ্য কেবল হাত-পা-ই চলত। তাতেই আনন্দ ছিল বেশি। আদিম মানুষের হিংস্রতার যেটুকু আমাদের ভিতরে আজও আছে, দাঁতে-নখে লড়াইতেই তার সর্বাধিক তৃপ্তি।

আমার দশ-বারো বছরের জীবনে সেই প্রথম আমি আমার বাবার অসফল হীন জীবনের জন্য পৃথিবীর জন্য পৃথিবীর ওপর প্রতিশোধ নিতে শুরু করি। কথাটা হয়তো এ ভাবে বলা ঠিক হল না। কারণ আমার ঐ বয়সে প্রতিশোধের কথাটা অমন স্পষ্ট ভাবে আমিও বুঝতাম না। তবে, নিজেদের সংসারে হীনতা, দারিদ্র্য, বছরের পর বছর কেরানী থেকে যাওয়া এবং তার জন্য আক্ষেপ, উপরন্তু সেই ফুটবল মাঠে লেমনেডের বোতলের স্বাদ, এ. টি. এস. সাহেবের ছেলের জন্মদিনে সেই

স্বপ্নের বাগান থেকে নির্বাসন—এ সব কিছুই আমার ভিতরে একটা রাগের ধোঁয়াকে পুঞ্জীভূত করে তুলত। মনে হত, আমাদের চারিদিকে যা কিছু আছে সবই আমাদের বিরুদ্ধ শক্তি।

এ কথা সত্য, আমার ভিতরে সেই বয়সেই মান-অপমানের বোধ বড় প্রবল ছিল, প্রবল ছিল জেদ। এই জেদের বসেই আমি কিছু কিছু অঘটন ঘটিয়েছি। প্রকাশের সঙ্গে মিশে, মারপিট করে তখন আমার বদনাম হয়ে গেছে। হাফ্-ইয়ারলি পরীক্ষায় তিন বিষয়ে ফেল্। রাগী মাস্টার ছোটনাগবাবু প্রায় দিনই কান মলে বেত মেরে বলে যেতেন—তোরা যদি পাশ করিস তো আমার হাতের তেলোয় চুল গজাবে। কথাটা আমার হীনমন্যতায় গুলির মতো সেঁধিয়ে গিয়েছিল। জেদের বসে আমি পড়াশুনো শুরু করলাম। পড়া দেখিয়ে দেওয়ার কেউ ছিল না। তবু এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে, মাস্টারমশাইদের বাড়ি গিয়ে পড়া বুঝে আসতাম। অ্যানুয়েল পরীক্ষার তখনও মাস চারেক বাকী। প্রথম মারপিট করার উত্তেজনার মতোই এক উত্তেজনা আমাকে রাতে জাগিয়ে রাখত, ভোরে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিত। খুব পড়তাম। জলের মতো মুখস্ত হয়ে যেত পড়া। তবু, ইচ্ছে করেই ক্লাশে পড়া বলতাম না। মাস্টারমশাইরা গাল দিতেন; মারতেন। আমি মনে মনে হাসতাম। সকলের ওপর গোপনে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আড়ালে তৈরি হতাম। দেবীপ্রসাদ চৌবে নামে যে ছেলেটি আমাদের ক্লাশে ফার্স্ট হত, সে যথার্থ ভাল ছেলে ছিল। অ্যানুয়েল পরীক্ষায় তাকে মারতে পারলাম না বটে, কিন্তু অনেকগুলো ছেলেকে ডিঙ্গিয়ে হয়ে গেলাম সেকেণ্ড। সমস্ত স্কুলে, পাড়ায়, বাড়িতে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। ছোটোনাগবাবু ভ্রূ তুলে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বলেছিলেন—ট্রীকস নি তো! সবচেয়ে খুশি প্রকাশ। সে নিজে সেকেণ্ড হলেও এত খুশি হত না। সে তখন প্রায়ই আমাকে বলত—এবার থেকে তুই ফার্স্ট বেঞ্চে বসবি—না রে? কিন্তু বাইরে আমরা একসঙ্গে ঘুরব তো? ওদিকে আমি সেকেণ্ড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিবারে একটা প্রত্যাশা জেগে উঠেছিল। বাবা প্রায়ই মাকে বলতেন—গরীবকে ভগবান দেখেন, বুঝলে? ছেলেটা দেখো, ঠিক মানুষ হবে।

আমাদের গরীবের সংসারে সেই প্রথম একটা গৌরবের ঘটনা ঘটেছিল। সেই গৌরবের স্বাদ পেয়ে আমি পরের বছরও সেকেণ্ড হই। হয়ে মাইনর স্কুল ছেড়ে যাই হাই স্কুলে। প্রকাশ সে বছর পাশ করতে পারল না। হাই স্কুলে আমি তখন হিমাদ্রির সঙ্গে এক ক্লাশে পড়ি। অনেক নতুন বন্ধু আমার। রাস্তায় ঘাটে প্রকাশের সঙ্গে দেখা হয়, সে মুখ গোঁজ করে থাকে। কথা বলতে চায় না। কিন্তু আবার বাসায় আসে, জানালা দিয়ে অনেকক্ষণ কথা বলে। সে সবই অভিমানের কথা। বলে—তুই আমাকে ভুলে গেছিস।

প্রকাশকে সেই বয়সে তখন মাঝে মাঝে আমার ভয় হত। আমার প্রতি তীব্র এক অধিকারবোধ ছিল তার। সেটা সে কখনো ভুলতে পারত না। আমি ভাল ছেলে হয়ে গেছি, চলে গেছি অন্য স্কুলে, আমার অনেক বন্ধু—এই সব দেখেই বোধহয় তার চোখে মুখে এক তীক্ষ্ণতা ফুটে উঠত। সে ডাকলে তখনো আমি তার সঙ্গে গেছি ল্যাংড়াবাগানে, খালাসীটোলায়, কুশী নদীর ধারে। কখনো সখনো

এক-আধটা মারপিটেও অংশ নিয়েছি। কিন্তু কোথায় যেন দুজনের মধ্যে একটা ব্যবধান তৈরি হচ্ছিল। ব্যবধানটা বোধহয় এইখানেই যে প্রকাশ তখনো বন্ধুহীন, সঙ্গীহীন, একা। আর, আমার অনেক বন্ধু। মাঝে মাঝে দেখি, প্রকাশ আমার স্কুলের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। কোনো কথা নেই, কেবল একটু সতৃষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকা। আমি জিজ্ঞেস করলে লজ্জা পেয়ে, মাথা নেড়ে চলে যেত। কখনো বা এক আধটা অদ্ভুত কথা বলত। তার কোনো মানে হয় না।

একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে দেখি, সে দাঁড়িয়ে আছে। উড়ো খুড়ো চুল, খুব বিষণ্ণ মুখ।

—কী রে প্রকাশ, কিছু বলবি ?

প্রকাশ একটু অপ্রস্তুত হাসল। বলল—অতনু, মা কাল মারা গেছে।

সেই বয়সে মা ছাড়া কিছু ভাবা যায় না। আমি দুঃখ পেয়ে ওকে কী যেন বলতে যাচ্ছিলাম, ও একটু রাগের স্বরে বলল—ভালই হয়েছে। মা আমাকে ভীষণ মারত, খুব মারত। মরে গিয়ে ভাল হয়েছে, খুব ভাল হয়েছে, মারত কেন ?

বলতে বলতে প্রকাশের চোখে জল এসে গেল। তবু শব্দ করে কাঁদল না সে। যেন বা মায়ের ওপর কোনো প্রতিশোধ নেওয়া যায় নি বলেই আক্রোশে সে দাঁতে দাঁতে চেপে বলল—রোজ মারত আমাকে, জলখাবার কম দিত। বাবার কাছে নালিশ করত রোজ। কেন মারবে ? আমার লাগে না ? মরে গিয়ে ভাল হয়েছে, খুব হয়েছে—কেন মারত আমাকে ?

অনেকক্ষণ ধরে আমরা রাস্তায় রাস্তায় হাঁটলাম, আর প্রকাশ অনর্গল তার মায়ের ওপর সেই সব আক্রোশের কথা অসংলগ্ন ভাবে বলে গেল। কিন্তু বার বার তার চোখে জল আসছিল। রাস্তায়-ঘাটে রোজ অবিরল মার খেয়ে যার হাড় পেকে গেছে সেই প্রকাশ তার কনুই তুলে আমাকে খুব অস্পষ্ট একটা দাগ দেখিয়ে বলল—এইখানে একবার পাখার ডাঁট দিয়ে মেরেছিল, জানিস ? কী ভীষণ লেগেছিল আমার ! আজও দাগ রয়ে গেছে, দ্যাখ। কখনো আদর করত না—কখ্‌খনো না।

এইসব কথা বলতে বলতে প্রায় প্রলাপ বকছিল প্রকাশ। ক্রমশঃ অসংলগ্ন হয়ে যাচ্ছিল তার কথা। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেলে আমি তার হাত ধরে বাসার দরজায় যখন পেঁছে দিলাম সে তখন বলল—জানিস্‌, বাবা মাকে বড্ড মারত। খালাসীর রাগ বড় ভীষণ। আমার মনে হয়, মারের চোটেই মা মরে গেছে। তিন-চারদিন আগে ভীষণ মেরেছিল বাবা—

বলতে বলতে একটু থমকে গেল সে। একটু ভাবল। তারপর বলল—কিন্তু বেশ হয়েছে, ভাল হয়েছে, খুব ভাল। কেন মারত—কেন মারত আমাকে ?

বলতে বলতে আবার কাঁদতে লাগল প্রকাশ।

তিন-চার মাস বাদে আবার একদিন স্কুলের রাস্তায় আমাকে ধরল প্রকাশ—অতনু।

—কী রে ? সস্নেহে বলি।

প্রকাশ খুব লাজুক হাসি হেসে বলল—আমার নতুন মা এসেছে।

শুনে চুপ করে থাকি। সৎ মায়েরা ভালবাসে না, এইরকমই জানা ছিল।

প্রকাশ পায়ের আঙুলে মাটি খুঁটতে খুঁটতে মুখ নীচু করে বলল—নতুন মা খুব সুন্দর। আমাকে ভীষণ ভালবাসে।

আমার বিশ্বাস হল না। মনে হল, প্রকাশ মিথ্যে কথা বলছে।

তবু প্রকাশ বলল- বাবা বলেছিল, তোর তো লেখাপড়া হবে না, সাহেবকে বলে তোকে পোর্টারের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিই। নতুন মা তাতে রাজি হয় নি। বলেছে, আমি যদি পরীক্ষায় সেকেণ্ড হতে পারি তো একটা হাওয়া বন্দুক কিনে দেবে। নতুন মা আমাকে খুব ভালবাসে।

প্রকাশ আবার লজ্জা-টজ্জা পেয়ে বলল—আমি নতুন মাকে বলেছি, এবার আমি সেকেণ্ড হবোই।

আমি অবাক হয়ে বলি—সেকেণ্ড কেন প্রকাশ! হলে তুই ফার্স্ট হবি। লোকে তো ফার্স্ট হতেই চেষ্টা করে, সেকেণ্ড হয়ে যায়।

প্রকাশ মাথা নেড়ে বলে—না। ফার্স্ট না। ফার্স্ট হয়ে কী হবে! আমি সেকেণ্ড হবো। তোর মতো।

খুব অবাক হয়েছিলাম। সেই অবাক হওয়ার ঘোর কাটতে না কাটতেই আমাদের বদলীর অর্ডার এসে গেল। প্রকাশ সেকেণ্ড হতে পেরেছিল কিনা, তা আর আমার জানা হয় নি। আমাদের চলে যাওয়ার আগে পুরোনো বন্ধুরা সবাই দেখা করল। প্রকাশ এল না। দুদিন তার বাড়িতে গিয়ে খোঁজ করলাম, সে নেই। প্রকাশের সঙ্গে দেখা হল না বলে খুব মন খারাপ লাগছিল।

বিকেলের গাড়িতে আমরা কাটিহার ছেড়ে যাচ্ছি। তখন ম্লান আলোয় চরাচর জুড়ে এক অপরূপ ছবি ফুটে উঠেছে। জানালার ধারে বসে এক পুরানো জগতের হারিয়ে-যাওয়া দেখছি। সরে যাচ্ছে চেনা প্ল্যাটফর্ম, সাহেবপাড়ার রাস্তায় দেবদারুর সারি, ল্যাংড়া আমের বাগান। ক্রমে অচেনা এক জগতের দিকে রেলগাড়ি ঘুরে যাচ্ছে। ইটখোলার মাঠ পেরিয়ে যাচ্ছি, সেই সময়ে হঠাৎ আমার জানালার ধারে ঠং করে জোর একটা ঢিল এসে লাগল। পলকে মাথা সরিয়ে চোখ বুজে ফেলেছিলাম। তাকিয়ে দেখি, খোলা মাঠের ভিতর দিয়ে প্রাণপণে ছুটছে প্রকাশ। ছুটে রেলগাড়ি থেকে, আমার কাছ থেকে দূরে—আরো দূরে পালিয়ে যাচ্ছে।

প্রকাশ ঐ ভাবেই আমাকে বিদায় জানিয়েছিল।

boiRboi.net

দুই

লিচু গাছে ছাওয়া দোমোহানী একটা ঘুমন্ত গঞ্জ। সারাদিন রাস্তায় বাতাস ধুলো ওড়ায়। লোক চলাচল দেখাই যায় না। একটা স্টেশন, একটু বাজার, রেলের অফিস, আর কোয়ার্টার—এইটুকুতেই দোমোহানী ফুরিয়ে যায়। ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের ওধার থেকে ঘন বন শুরু হয়ে গেছে। সেইখানে, কাছে গৃহস্থের গোয়ালে মাঝে মাঝে হানা দেয় চিতাবাঘ। একটা নিঃঝুম ভাব ঘিরে থাকে চারধারে। পলহোয়েল সাহেবের স্কুলে তখনো ম্যাট্রিকের সীট পড়ে না।

ছুটির দিনে ডি. টি. এস. হুদা সাহেব বন্দুক নিয়ে শিকারে বেরোন। সঙ্গে থাকে আরো দু চারজন বন্দুক হাতে মানুষ, কুকুর, আর্দালি। আমরা পিছু নিই। বেশি দূর যেতে হয় না। দোমোহানীর উপকণ্ঠে গাছগাছালি জুড়ে পাখিদের মেলা। হুদা সাহেব ঘুঘু মারেন, বেলেহাঁস নামিয়ে আনেন, মারেন বন-মুর্গী। বন্দুক হাতে মানুষদের পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিমান বলে মনে হয় তখন।

নিজেকে লাগে তেমনি অসহায়। নিরস্ত্র। নির্জীব। একটা খেলনা-বন্দুকের জন্য কত বায়না করেছি। বাবার কিনে দেওয়ার সাধ্য ছিল না। ভারতবর্ষ জুড়ে তখন যে অর্ধনগ্ন ফকির এক অস্ত্রহীন অন্দোলন গড়ে তুলছেন, বাবা আমাকে সেই গল্প বলতেন। বলতেন—বৃটিশদের কত কামান-বন্দুক-সৈন্য, গান্ধীর তো কিছু নেই। যাদের চরিত্র আছে, তাদের অস্ত্র লাগে না।

বাবা মুখে গল্প বলতেন বটে, কিন্তু কার্যতঃ তিনি ছিলেন রাজভক্ত। বৃটিশের গুণমুগ্ধ। তাঁর কাজেকার্মে তাই বিন্দুমাত্র অসহযোগ থাকত না। রেলের ইউনিয়নকে তিনি সন্দেহের চোখে দেখতেন। সবচেয়ে বেশি ভয় পেতেন বাঙালীদের সহিংস আন্দোলনকে। সন্ত্রাস তাঁর দু'চোখের বিষ ছিল। বৃটিশরা চলে যাবে—এ ছিল তাঁর কল্পনার অতীত।

আমি গুলতি তৈরি করে নিতাম বানাতাম টিনের তলোয়ার। বাঁখারির ধনুক আর তীর। পশু-পক্ষীর ওপর আমার শত্রুতা ছিল না। ছেলেবেলাতেই আমি বুঝে গিয়েছিলাম, আমাদের শত্রু একধরনের মানুষ। তারা দেখতে শুনতে অনেকটা আমাদের মতোই, আবার পুরোপুরি আমাদের মতোও নয়। আমার অদৃশ্য লড়াই ছিল তাদের সঙ্গে। কল্পনায়। তাই আমার তীর ছুটত না। গুলতির পাথর পকেটেই থেকে যেত।

আমার বাবা তখন স্টোরের বাবু। স্টোরের বাবুদের কিছু অবৈধ আয় থাকে। আমার বাবারও হয়তো ছিল। কিন্তু সেটা খুবই সামান্য। ঐ আয়টুকুর জন্য বাবা বড় ভয়ে ভয়ে থাকতেন। রেলের গুদামে একরকমের লোহার রিং পাওয়া যেত।

সেই রিংয়ে চাকা চালানো ছিল মজার খেলা। চাকা চালানো আমাদের ছেলেবেলায় যত প্রিয় ছিল, এখন আর তত নেই। সেই রিঙ কতদিন বাবার কাছে চেয়েছি। বাবা ভয়ে দেননি, পাছে লোকে সন্দেহ করে। আবার হয়তো দিয়েছেন, খুব চুপেচাপে। সাবধান করে দিয়েছেন—খুব সাবধান বাবা, চালাতে হয় তো নির্জন নিরিবিলি জয়গায় গিয়ে চালাবে।

বলতে গেলে এই ভীরুতাই তার উন্নতির প্রধান অন্তরায় ছিল। সৎ বা অসৎ— মানুষ যা-ই হোক না কেন, জোরের সঙ্গে না হলে তার কোনো মূল্য নেই। আমার বাবাকে দেখে তা আমি বুঝেছি।

অপরদিকে, ছেলেবেলায় প্রকাশের সঙ্গে মিশে আর তার সঙ্গে নানা জায়গায় মারপিট করে করে আমার ভীরুতা ঝরে গিয়েছিল। সাহসী ছেলে বলে আমার খ্যাতি ছিল। সেই ছেলেবেলাতেও আমার অনুকারী সঙ্গীর অভাব ছিল না। আমি ছিলাম স্কুলের মনিটর।

ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করার পর আমার পড়াশুনোর অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। কাছাকাছি কলেজ নেই! হোস্টেলে থাকবার সামর্থ্য নেই। বাবা দরখাস্ত করলেন, এমন জায়গায় তাঁকে বদলী করা হোক যেখানে কলেজ আছে। অনেক দরবার করলেন বাবা, সাহেবদের টাকা খাওয়াবার চেষ্টা করলেন। অবশেষে তাঁকে শিলিগুড়িতে বদলী করা হল। জলপাইগুড়ির কলেজে আমি ভর্তি হলাম।

জলপাইগুড়িতে আমি আমার পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনের স্বাদ পাই। তখন সদ্য দেশ ভাগ হয়েছে। পশ্চিম বাংলা, আসাম জুড়ে পিঁপড়ের মতো ছড়িয়ে পড়ছে মানুষ। আমরা ভলান্টিয়ার হয়ে খাটি, আশ্রয়শিবিরে গিয়ে শরণার্থীদের তদারক করি। প্রায় দিনই বাসায় থাকি না। লেখাপড়া চুলোয় যাচ্ছে। নিজের বাসা, স্কুল বা কলেজের সীমাবদ্ধতা থেকে হঠাৎ এক বৃহৎ মানব পরিবারের ভিতরে গিয়ে পড়েছি তখন। মানুষকে দেখার একটা নেশা আছে, সহজে তা ছাড়া যায় না। আমার ভিতরে তখন সবসময়ে এক উত্তেজনা, একটা আক্ষেপ ফেটে বেরোতে চায়। রেলস্টেশনে একটা বৌকে দেখেছিলাম যে কথা বলতে ভুলে গিয়েছিল। অনেক সাধ্যসাধনা করে তাকে খাওয়াতে হত। তার সঙ্গীরা বলত, বৌটা বাঁচবে না। গ্রামে যখন লুঠেরারা আগুন দেয় বৌটার ছেলে তখন বিছানায় ঘুমোচ্ছে। ঘরে আগুন লাগতেই বৌটা ঘরে ঢুকে ছেলে কোলে নিয়ে দৌড়াতে থাকে। প্রায় মাইলখানেক দূরের রেলস্টেশনে এসে দেখে খুব অবাক হয়ে যায়—কোলে ছেলে তো নেই। ছেলের কোলবালিশটা বুকে করে নিয়ে এসেছে সে। দিশেহারা হয়ে ছেলের বদলে ... ...। বৌটা কথা বলত না, খেতে চাইত না, বিরক্ত হয়ে তার স্বামী তাকে মারত। আমরা গিয়ে লোকটাকে ধমক চমক করলে লোকটা হাউ মাউ করে বলত—বাবু, ছেলে গেছে, এখন বৌটাও যদি যায় তবে আমার থাকে কী? আপনারা ওরে একটু কাঁদান। নইলে ও বাঁচবে না।

মনে পড়ে, বীথি নামে একটি মেয়েকে দেখতাম, যে ছিল ধর্ষিতা। অল্পবয়সেই সে তাই বড় উদাসীন আর গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। জল-কাদার মধ্যে অতি নড়বড়ে বাঁশের ঘরে যেসব অসুবিধার মধ্যে উদ্বাস্তুরা থাকত, তার মধ্যেই সে ছিল। যখন

boiRboi.net

রিলিফের জিনিস আমরা ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে যেতাম সে কখনো এসে হাত পাতে নি। যেন বা এ জন্মের মতো তার খাওয়া-পরার সাধ ঘুচে গেছে। একদিন সে লজ্জায় আমাকে ডেকে গোপনে জিজ্ঞেস করেছিল—এখানে খারাপ মেয়েছেলেরা কোথায় থাকে। আমার বয়স তখন কম, একটি যুবতী মেয়ের এই প্রশ্নের উত্তরে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে বলেছিলাম—তা দিয়ে কী হবে? মেয়েটা হেসে বলল—এদের সঙ্গে থাকা ভাল দেখায় না। আমি তো নষ্ট হয়ে গেছি, খারাপ মেয়েদের সঙ্গেই থাকা ভাল।

উদ্বাস্তুশিবিরগুলি ছিল সরাইখানার মতো। সেখানে কেউ দু'-চার-ছ' মাসের বেশি থাকত না। পাকাপাকি আস্তানার সন্ধান পেলেই চলে যেত কাছাড়ে, উত্তর-বাংলা, ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকার কোথাও, কিংবা উত্তর বা পূর্ব আসামে। কিন্তু শিবিরগুলো খালি থাকত না বড় একটা। কাতার দিয়ে মানুষ আসত। সেই অল্প বয়সেই তাই আমি আকণ্ঠ মানুষের বহমান এক ধারাতে নিমজ্জিত ছিলাম। প্রাণপণ খাটতাম আমরা। কিন্তু মানুষের তুলনায় রিলিফ নেহাত অল্প পাওয়া যেত। এমনও হয়েছে, নিজেদের বাড়ি থেকে পুরানো কাপড়, চাল ডাল পয়সা এনে দিয়েছি। কিন্তু তাতে কিছুই হত না। মানুষের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার সামনে অসহায় লাগত নিজেকে। দেখতাম, আড়কাঠিরা মেয়ে ধরার জন্য ঘুরছে, উত্তর আসামের চা-বাগানের জন্য নিয়ে যাচ্ছে মজুর, ডোলের চাল বেশি দাম দিয়ে কিনে নিচ্ছে মহাজন। সোনাদানার সন্ধানে আসে লোক, ঘটিবাটির জন্য আসে চোর। আর সবার অলক্ষ্যে মাঝে মাঝে লাফ দিয়ে আসে কলেরা। এ সবের মধ্যেও একধরনের লোক এসে উদ্বাস্তুদের জড়ো করে বক্তৃতা দিয়ে বলত—সরকার অনেক টাকা দিচ্ছে, চাল ডাল কাপড় দিচ্ছে তোমাদের। কিন্তু ভাইসব, দালাল আর আমলাদের জন্য তোমরা তা পাচ্ছো না। নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে তোমরা সজাগ হও, কেড়ে নাও—ইত্যাদি। এ সবের ফলে মাঝে মাঝে রিলিফ বিলি করতে গিয়ে আমরা মুস্কিলে পড়ে যেতাম। উদ্বাস্তুরা দল বেঁধে আসত—জোচ্চোর তোমরাই সব মেরে দিচ্ছো। আমরা পাচ্ছি না।

মাঝে মাঝে মনে হত এইবার রিলিফের কাজ ছেড়ে আবার কলেজের ক্লাশঘরে পালিয়ে যাই। মানুষের অকৃতজ্ঞতায় জীবনের তিক্তস্বাদ পেতাম। কিন্তু নেশা। মানুষের নেশা বড় মারাত্মক। রিলিফের কাজে আমার তখন বেশ নাম-ডাক। কংগ্রেস নেতারা পরিদর্শনে এসে আমার খোঁজ করেন। সভা হলে আমাকেও মঞ্চে ডাকা হয়। রিলিফের রিপোর্ট তৈরি করি, টাকাপয়সার হিসেব রাখি। কেউ কেউ চোর বলে মনে করে, কেউ কেউ শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যায়, খাতির রাখে। এমন কিছু খারাপ লাগে না। রিলিফের অফিস ঘরেই মাঝে মাঝে রাতে শুয়ে থাকি। বাসায় মা ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে জেগে উঠে হয়তো অস্ফুটে জিজ্ঞাসা করেন—অনু, এলি নাকি। বাবা বিরক্ত হন। ভাইবোনেরা হতাশ। বাসার ভালো ছেলেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ঠিক নষ্ট বলা যায় না, তবে কি রকম যেন!

বাবা একদিন আমাকে ডেকে বললেন—অনু, মানুষের জন্য তুমি করো, এ ভালই। কিন্তু, মানুষের ঐ দুঃখ-দুর্দশা যেন তোমার বা তোমার পরিবারের ভাগ্যে

না ঘটে, তোমাকে বা তোমার পরিবারকে যেন পরের দয়ায় বা সাহায্যে বেঁচে থাকতে না হয়—এ তুমি নিশ্চয়ই চাও। আমি গরীব, তোমাদের ভাল ভাবে মানুষ করতে পারছি না, কিন্তু যেটুকু সুযোগ আছে তা কাজে না লাগালে একদিন তোমাদেরও পরের দয়ার জন্য বসে থাকতে হবে। সে বড় ভয়ানক। আজ তুমি পরিত্রাতা হয়েছো—ভালই, কিন্তু একদিন যখন তুমি নিজেই আর্ত হবে তখন?

আমি বাবার মুখের দিকে চেয়ে সেই পুরোনো ভয় এবং ভবিষ্যৎ-চিন্তা দেখলাম। কী জানি কেন নিজেকে নিয়ে আমার কোনো ভয় বা ভবিষ্যৎচিন্তা ছিল না। বাসার সঙ্গে, পরিবারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভিতরে ভিতরে ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। খাওয়া-শোওয়ার কোনো ঠিক ছিল না। দীন-দরিদ্র ভিখিরিদের সঙ্গেই তখন আমার সারাদিন ওঠাবসা। তাদের দেখে দেখে নিজের ভবিষ্যতের ভয় আমার কখন কেটে গিয়েছিল। প্রবহমান এক মনুষ্যধারা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারতাম না। স্কুলবাড়ির একটা ঘরে বেঞ্চ জোড়া দিয়ে আমরা কয়েকজন ভলান্টিয়ার শুয়ে থাকতাম। ছাড়পোকা কামড়াত, মশার জ্বালায় ঘুম হত না। বাইরে এসে নিঃঝুম চরাচরের দিকে চেয়ে বসে থাকতাম। স্নিগ্ধ রাত্রিটি ঘিরে ধরত আমাকে। নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে অনুভব করার সেই ছিল সবচেয়ে সুন্দর সময়। বহু লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ দূর থেকে প্রাচীন নক্ষত্রের আলো এসে স্পর্শ করত আমাকে, শীতল চাঁদের আলোয় ছিল স্বপ্নময় অবগাহন। আকাশের হিম অন্ধকারের দিকে চেয়ে এক শব্দহীন মহাসমুদ্রের অন্তহীনতাকে অনুভব করতাম। কখন আমার আমি হারিয়ে যেত। মনে হত কে আমাকে ডেকে বলছে—শোনো যতি, শোনো সন্ন্যাসী, পৃথিবীতে তোমার শয়ন হবে এই ভূমিশয্যা, তোমার গৃহের ছাদ হবে ঐ আকাশ, তোমার আহার ভিক্ষালব্ধ অন্ন। তোমাকে আমি দেবো না কিছুই, তুমি চলো দেখি। এক-একদিন সেই নিঃঝুম মহাশূন্যের মাঝখানটিতে বসে রক্ত গভীর হয়ে যেত। আমার মনে হত, আমার জীবন, মাটি ও আকাশের মাঝখানে যে সহজ প্রসার সেইখানে গড়ে উঠবে। সহজ মানুষের মধ্যে। আমি আর কিছুই চাই না।

আমার বাবা তাঁর গৃহকে ভালবেসেছিলেন, গৃহস্থালী ছিল তাঁর প্রিয়, তিনি ঘরের বাইরে মানুষের প্রবহমানতায় কখনো গা ভাসান নি। তাই তাঁর সুখ-দুঃখের পরিমাপও ছিল ছোটো, সীমাবদ্ধ। আমার প্রতিজ্ঞা, আমি কিছুতেই তাঁর মতো হবো না। কী জানি কেন, ঘরের চেয়ে বাইরেটাই ক্রমে আমার প্রিয় হয়ে উঠছিল। সারাদিন কাজের অবধি ছিল না। কাজ চাইলেই কাজ এসে ঘাড়ে পড়ে। জমি দখল করে উদ্বাস্তু বসতি গড়ে তুলতে চলে যাই ডুয়ার্সের কোন গর্ভে, কোথায় কোথায় যে। ডাবগ্রাম, মাটিগাড়া, বীরপাড়া, আমবাড়ি। যেখানেই যাই, চেনা মানুষেরা ছেঁকে ধরে। জঙ্গল কেটে বসত হচ্ছে মাত্র, কিন্তু চাষের জমি নেই, খাবার নেই, রুজি নেই, ব্যবসার মূলধন নেই, সমস্যা বিশাল এবং ব্যাপক। লোকেরা আমাকে উদ্বাস্তু শিবিরে কাজ করতে দেখেছে, তারা দেখেছে আমাকে নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে, বক্তৃতা দিতে। তাদের ধারণা আমি সরকারের লোক। কাজেই তারা রাজ্যের অভাব-অভিযোগ নিয়ে আসে। সমাধান চায়। আমার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু চেষ্টা ছিল। অবিরল সেই চেষ্টা। লড়াই। কিন্তু মানুষের অসহায়তা

বার বার তার কাছেই ফিরে আসে। এইসব কাজে ডুবে থাকতে থাকতেই খবর আসে, বড়দির বিয়ে হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে আমার যাওয়া হল না। জামাইবাবুকে দেখলামই না।

আলিপুরদুয়ারে তখন সদ্য এক রেলওয়ে জংশন গড়ে উঠছে। আসাম লিঙ্কের নতুন রেললাইনের কাজ প্রায় শেষ। কোর্টে একটা মামলার সাক্ষী দিয়ে ফিরছিলাম। তখন হঠাৎ ইচ্ছে হল, রেল কলোনীটা দেখে যাই। একটা জনপদ তৈরি হচ্ছে, কত লোকের বসত হবে। দেখে যাই।

সন্ধে হয় হয়। নির্জন রেল কলোনীর অনেক বাড়ি খালি পড়ে আছে, রাস্তায় চাঙর চাঙর পাথর সাজানো হয়েছে মাত্র। সে রাস্তায় চলা যায় না, পাশের মেঠো পথ দিয়ে চলতে হয়। চারিদিকে জল-কাদা। বাজারের দিকে কিছু লোক চোখে পড়ে মাত্র, আর সব নিরালা, নিঝুম। বাজারের পাশে ছোট্ট একটু মাঠ। তখন ঝুঁঝকো আঁধার নেমে আসছে। দেখি, সেই মাঠের মাঝখানে ছোট্ট একটা সভা বসেছে। কুড়ি-পঁচিশ জন কুলি-কামারি গোছের লোক, দু' চারজন বিড়ি-বাঁধিয়ে। কিছু পিওন-আর্দালি খালাসী বসে আছে। মঞ্চ নেই, একটা ন্যাংটো টেবিলের পাশে দুটি লোহার চেয়ার। বাঁশের উপর একটা লাল ঝান্ডা উড়ছে। একটা চেয়ারে একজন চশমা-পরা লোক বসে আছে, একজন রোগা, লম্বা, কালো লোক খুব চেঁচিয়ে মেঠো গলায় বক্তৃতা দিচ্ছে। হ্যাজাক নেই, কোনো আলো নেই, দিনের আলো মরে আসছে, সেই মরা আলোয় বক্তার মুখখানা আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে। কয়েক পলক সেই হাস্যকর সভাটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। রাস্তা ছেড়ে নেমে গেলাম সভা-স্থলীতে। শুনি, লম্বা রোগা কালো মানুষটা তার শ্রোতৃবৃন্দকে একটা সংগ্রামে নামতে আহ্বান জানাচ্ছে। তখন তার বক্তৃতার শেষ পর্যায়, খুব তাড়াতাড়ি কথা বলছিল সে। বুঝতে পারছিলাম, হ্যাজাক জ্বালার সংস্থান তাদের নেই। দিনের আলো ফুরোবার আগেই তাই সভা শেষ করতে হবে। সভা ঘেঁষে আমি ঘাসে বসে পড়লাম। বক্তার মুখখানা শেষবেলার আলোতে তখনো সামান্য দেখা যাচ্ছে। কুয়াশায় আবছা হয়ে গেছে স্মৃতি, তবু অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার আগে হঠাৎ মনে হল, মুখখানা প্রকাশের। লোকটা ঘাসের ওপর থেকে একটা চোঙা তুলে নিয়ে সভাশেষে শ্লোগান দিচ্ছে তখন, বলছে —কহিয়ে আপলোক, ইনকিলাব—

সবাই বলল —জিন্দাবাদ।

সভা শেষ হল। লোকদুটো তাড়াতাড়ি টেবিল চেয়ার চোঙা, ঝান্ডা গোছাতে লাগল। ধরাধরি করে নিয়ে তুলল পাশের দর্জির দোকানে। শ্রোতৃবৃন্দ নির্বিকার বসে রইল, কেউ কেউ বিষয়কর্মে উঠে গেল, কেউ গিয়ে বসল মাঠের ধারে পেচ্ছাপ করতে।

আমি গিয়ে লোকটাকে ধরলাম —প্রকাশ না তুই?

বড় চমকে গেল লোকটা।

রেলের চাকরির এই এক সুবিধে। কোনো মানুষই হারিয়ে যায় না। ঘুরে-ফিরে দেখা হয়ে যায়। পুরোনো মানুষ ফিরে আসে, পুরোনো জায়গায় ফিরে যাওয়া যায়।

boiRboi.net

দেখি, ঝগড়াটে, বেয়ো, গান্ধা প্রকাশ আর নেই। ছিপছিপে, টান চেহারার ছেলেটির মুখে-চোখে বাড়ন্ত বয়সের কাঁচা লাবণ্য। যদিও সে রোগা তবু একটা সতেজ দীপ্তি গোটা মানুষটা থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে। প্রকাশ দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরল—অতনু, তোকে আমি একটুও ভুলি নি। একটুও না।

একসঙ্গে হুড়মুড় করে সব মনে পড়ে যাচ্ছিল। কাটিহারের পাড়ায় পাড়ায় আমাদের দু'জনের কীর্তি, কত মার পিট, প্রকাশের সেকেণ্ড হওয়ার ইচ্ছে, এ. টি এস. সাহেবের বাগানে সেই জন্মদিনের বিকেল, প্রকাশের অদ্ভুত বিদায় জানানো—সব একসঙ্গে ঠেলে উঠছিল বুকের ভিতরে। যন্ত্রণাময় একটা আবেগ টের পেয়ে আমি প্রকাশের দুই হাত জোরে চেপে ধরলাম। আমার হারানো পৃথিবী, আমার শৈশব ঝড়ের মতো ফিরে আসছিল। বললাম—প্রকাশ মনে পড়ে? সব মনে পড়ে?

প্রকাশ মাথা নাড়ে—সব। আমি কিছুই ভুলি নি।

—তুই এখানে কী করছিস?

—চল, বলছি।

প্রকাশ তার লোকজনের কাছে বিদায় নিয়ে এল।

আলিপুরদুয়ার জংশনের নিঃঝুম রেল-কলোনীতে অন্ধকার নেমে আসছে। ফাঁকা জায়গা পড়ে আছে অনেক। বালি, ইঁট, সুড়কি আর লোহালক্কর স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। গোধূলির কুয়াশা ঝুলে আছে মাঠে ঘাটে। রাস্তার পাথরে, গর্তে হোঁচট খেতে খেতে দু'জনে হাঁটছি। প্রকাশ বলছে—বাবা মারা গেল। তাড়াতাড়িই মরার কথা ছিল তার। অত মদ খেলে লোকে বেশি বাঁচে না। তার ওপর ঐ খাটুনি, খেতেও পেতো না তেমন। আমার মা মরে যাওয়াতে বাবা খুব খিটখিটে হয়ে গিয়েছিল। নতুন মাকেও ভীষণ মারত, আমাকেও। সৎমা সম্পর্কে কত কথা শোনা যায়। কিন্তু আমার সৎমা খারাপ হওয়ার সুযোগই পায় নি। তার ছেলেপুলে হয় নি বলে আমাকে ভালবাসত খুব। তার ওপর বাবার ঐ অত্যাচার আমাদের দু'জনকে আরো এক করে তুলেছিল। বাবা আমাকে মারলে নতুন মা এসে বুক দিয়ে পড়ত, নতুন মাকে মারলে আমি গিয়ে ঠেকাতাম। অতনু, অত্যাচার এবং দুঃখকষ্ট চিরকাল মানুষকে একতাবদ্ধ করেছে—আমার ঘরে সেটা আমি নিত্য দেখতাম। তারপর যথারীতি বাবা মারা গেলে আমরা হাঁফ ছাড়লাম। তখন দেখি আমার নিষ্পর, রক্তের সম্পর্কহীন নতুন মা কবে আমার আসল মা হয়ে গেছে। আমাদের দু'জনের আমরা দুজন ছাড়া কেউ নেই। তখন আমাদের অবস্থা বড় খারাপ। বাবার প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের সামান্য টাকা পেতে কী যে কষ্ট গেছে। তার ওপর রেল থেকে তখন বার বার তাগাদা দিচ্ছে কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে। আমরা মাহাতোদের বস্তিতে উঠে গেলাম, মার দু' একটা গয়না বেচে কিছুদিন চলল। তারপর মাকে নিয়ে অফিসে অফিসে ঘুরে সাহায্য চাইতাম। এমন কি স্কুলের মাস্টারমশাইদের কাছেও গিয়ে কতদিন চেয়েছি। স্কুলের ছেলেরা চাঁদা তুলে সাহায্য করত। ক্রমে ক্রমে আমরা একেবারে সমাজের নীচু তলায় নেমে যাচ্ছিলাম। বুঝতে পারছিলাম, আমরা এইভাবে ভিখিরি হয়ে যাবো। এক-একদিন মাকে লুকিয়ে, পূর্ণিয়ার শাটল ট্রেনে উঠে, অচেনা লোকজনের কাছে ভিক্ষে করেও

এসেছি। মা ঘোমটায় মুখ ঢেকে আমাকে নিয়ে সাহেবদের বাড়ি বাড়ি যেত, বলত —আমার এই ছেলেকে চাকরি দিন, নইলে আমরা মরে যাবো। অতি কষ্টে একটা ক্লীনারের চাকরি পেলাম। কয়েক বছর পর এখন ফায়ারম্যান হয়ে এখানে এসেছি। মা আর আমি—আমরা বেঁচে গেলাম।

বলে হাসল প্রকাশ। বলল—অতনু, এখনো বেঁচে আছি রে। মাঝে মাঝে বিশ্বাস হয় না। আমার ছেলেবেলাটা বড় অন্ধকার। ছেলেবেলার কথা ভাবলে এখনো শিউরে উঠি। মাতাল বাবা সন্ধেবেলা ফিরে কত কাণ্ড করত। ভাতের হাঁড়িতে পেচ্ছাপ করত, বিছানায় বমি, মাকে ভীষণ মারত। আমার মা ঐ মার সইতে না পেরেই মরে যায়। বেঁচে থাকতে কত কষ্ট পেত। তার ওপর আমি ছিলাম ঐরকম—সারাদিন বাইরে বাইরে ঝগড়া করে বেড়াতাম, মারধর খেতাম, চুরি করতাম। ঘরে ফিরলে মা মারত, মারত মাতাল বাবা, খেতে পেতাম না। এখনো কী করে বেঁচে আছি—ভাবলে অবাক লাগে। নতুন মাকে নিয়ে আমার সংসার, চাকুরি করে পয়সা হাতে পাই, খাই পরি নিজের মনের মতো থাকি এ যেন আমার জীবনই নয়। এই জীবনযাপন করতে করতে মাঝে মাঝে যখন সেইসব দিনের কথা ভাবি তখন বড় অস্থির লাগে। আমার শিশুকালটা কেন অমন অন্ধকার, ভয়ংকর ছিল? কেন শৈশবের কোনো সুখস্মৃতি আমার নেই—যা সকলের থাকে! কেন কেড়ে নেওয়া হয়েছে আমার জীবন থেকে আমার সবচেয়ে ভাল সময়টা! ভাবতে ভাবতে বুঝতে পারি, এ জগতে অভাবের দুঃখ নেই। জটিল কার্যকারণসূত্রে সে-ই নিয়ন্ত্রণ করছে মানুষের আচার-ব্যবহার, চরিত্র, মনুষ্যত্ব। এখন আমি এইসব নিয়ে খুব ভাবি। আমার ছেলেবেলা, দেশের অর্থনীতি, মানুষের ভবিষ্যৎ—এই সব কিছুর সম্পর্ক আবছা ভাবে বুঝতে পারি। ভিতরে ভিতরে অস্থির হই, কখনো রাগে ফেটে পড়ি, কখনো শান্তভাবে সমাধানের উপায় ভাবি। একদিন রেলের ইউনিয়নের সুপ্রিয় গুপ্তের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি আমাকে ট্রেড-বোঝালেন, বোঝালেন মানুষের মৌলিক অধিকার, শ্রেণীচেতনা এবং শ্রেণীযুদ্ধ, দাবী আদায়, স্বার্থ-সচেতনতা। আমার এলোমেলো চিন্তাগুলি সাজিয়ে দিলেন তিনি। এখন বুঝতে পারি—কেন নীচুতলার পরিবারে মানুষে মানুষে ভালবাসার গিঁট আলগা হয়ে যায়, ভাগ্যনির্ভর মানুষ সুদিনের অপেক্ষা করতে করতে কী করে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, কী করে অদেখা শ্রেণীর লড়াইয়ে উঁচুতলার মানুষ গরীবের সংগ্রাম করার ক্ষমতা কেড়ে নেয়। অতনু, আমি ইউনিয়নে নেমেছি। চোঙা ফুঁকে মিটিং করি। মিটিঙে লোক হয় না। কিন্তু দেখিস, আমি এটুকু করেই ছাড়বো না, আমি মানুষের জন্য বিরাট লড়াই করব। মার খাবো, মরে যাবো, তবু লড়বোই।

রেল-লাইন পেরিয়ে প্রকাশের বাসা। সেইখানে ছোট্ট হ্যারিকেনের আলো জেলে প্রকাশের নতুন মা প্রকাণ্ড এক অন্ধকারের মধ্যে বসে আছেন। প্রকাশ বাইরে থেকেই চেঁচিয়ে বলল—মা, দ্যাখো, কাকে এনেছি।

শান্তচোখে তিনি আমাকে দেখলেন। চিনতে পারলেন না। কিন্তু ছেলের মতোই আদরে নিলেন ঘরে। একখানাই ঘর, ভিতরে বারান্দা আছে, সেই বারান্দাটা

boiRboi.net

বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে প্রকাশ তার স্টাডি বানিয়েছে। সেখানে ছোট্টো তক্তাপোশে সে শোয়। কেরোসিন কাঠের একটা টেবিলের ওপর রাজ্যের রাজনীতির বই, ইশতেহার, ইউনিয়নের সার্কুলারের খসড়া, প্রকাশের লেখা কিছু পাণ্ডুলিপি, ডায়েরী।

দুইদিন আমি প্রকাশের কাছে রইলাম। দুটো দিন আমার কাটল প্রকাশের রাজনৈতিক বই আর ইশতেহার পড়ে। প্রকাশের সঙ্গে পুরানো কথা যত না হল তার চেয়ে ঢের বেশী হল ট্রেড-ইউনিয়ন এবং রাজনীতির কথা। এতকাল মানুষ নিয়ে আমি যত ভেবেছি, মানুষের জন্য আমার আবেগ বা ভালবাসা, মানুষের প্রতি আমার রাগ বা ঘৃণা, অভিমান বা উপেক্ষা—সবকিছুই ঐ দুই দিনে অন্যরকম চেহারা নিয়েছিল। বুঝতে পারছিলাম, রাজনীতি নামে এক বিশাল রহস্যময় জগৎ আছে। প্রকাশের জীবনে একটা বিশাল পরিবর্তন এসেছে। সে আর তার নিজের পরিবারে আটকে নেই। সে ক্রমে মানুষের পরিবারের একজন হয়ে উঠছে। আমার বড় লোভ হল।

দুদিন পর যখন চলে আসবো তখন খেতে বসিয়ে প্রকাশের নতুন মা বললেন—বাবা, পৃথিবীতে রক্তের সম্পর্কের কেউ নেই আমার, যা আছে আমার সব নিজের হাতে গড়ে নেওয়া সম্পর্ক। ঐ যে প্রকাশ—ও আমার ছেলে—ভালবাসাই ওকে আমার ছেলে করেছে নইলে কেউ না। তুমি আমার প্রকাশের চেয়ে পর নও—তাই আপন বলে আমার কাছে এসো।

দেখলাম, প্রকাশ যা করে তার সব তাতেই তার মায়ের সায় আছে। বুঝলাম, প্রকাশের হবে। ওর নতুন মা ওর কমরেড। ওর বাসা ওর সংগ্রামের ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়।

সে-বয়সটা আশা-ভরসা করার পক্ষে সুন্দর বয়স। আলিপুরদুয়ার থেকে শিলিগুড়ি ফেরার পথটা আমি গভীর চিন্তায় ডুবে রইলাম। মানুষের বৃহৎ পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। আমার ছিল না কেবল একটি সুবিন্যস্ত, অস্তিবাচক চিন্তাশক্তি। প্রকাশ আমাকে সেইটে ধরিয়ে দিয়েছে। বড় নেশার মতো লাগছিল।

ফিরে এসে শুনি, আমার বাবা প্রমোশন পেয়েছেন। শীগগিরই তিনি পাণ্ডুতে বদলী হয়ে যাবেন। বাড়িতে একটা আনন্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছে।

কেন জানি না এই পারিবারিক আনন্দে আমি নির্বিকার রইলাম। আমার মন বলছিল, ছোটো 'পাওয়া' মানুষকে তার বৃহৎ 'পাওয়া'র সংগ্রাম থেকে দূরে নিয়ে যায়।

boiRboi.net

তিন

বিপ্লব, লড়াই, অধিকারের জন্য সংগ্রাম, মৌলিক অধিকার, রাজনৈতিক মুক্তি, সাম্য—এইসব শব্দ সেই বয়সে কী ভীষণ মাদকতাময় ছিল! আমাদের বুকের ভিতরের বাতাস এইসব শব্দে বাঙ্ময় হয়ে উঠত। শরীর মনকে মুচরে বেজে উঠত বৃহৎ পৃথিবীর ডাক। মনে হত, আমিই লেনিন।

সুপ্রিয় গুপ্ত আমাদের রাজনৈতিক জীবনের প্রথম গুরু। কিন্তু তিনি নিজে ট্রেড-ইউনিয়নের বাইরে আসতে চাইতেন না। বাইরের রাজনীতি তোমরা কর—এই কথা বলতেন প্রায়ই। প্রকাশও ট্রেড-ইউনিয়নে আটকে ছিল। আমার সেরকম কোনো বাধা ছিল না। আমার দু'টি চমৎকার গুণ ছিল। আমি যা নিজে বুঝতাম তা সহজেই অন্য সবাইকে বোঝাতে পারতাম, আর আমি সহজেই অন্যের মাথায় আশা আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্ন ঢুকিয়ে দিতে পারতাম। রাজনৈতিক নেতারা আমার কার্যকলাপে মনোযোগী হতে সুরু করলেন। উত্তর বাংলা এবং আসামে আমি দ্রুত সংগঠন শুরু করি। সুপ্রিয় গুপ্তর দল আমাকে তাদের রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

পাণ্ডুর পাঁচ নম্বর ফেরীঘাটে বাবা যে বাসা পেয়েছিলেন আমি সেখানে মাঝে মাঝে যেতাম। দুই-একদিন থেকে আবার বেরিয়ে পড়তাম। তখন আমার অল্প-স্বল্প নাম-ডাক হয়েছে, এম-পি এম-এল-এ মন্ত্রীদের সঙ্গে আমার মেলামেশা অবাধ, বড় অফিসাররাও আমাকে একটু আধটু খাতির করে। এইসব দেখেই বোধহয় বাবা বুক বেঁধেছিলেন। আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে আর আমাকে ভৎর্সনা করতেন না। কেবল মা আমাকে বাসায় গেলেই চেপে ধরতেন—অনু, তুই যে পার্টি করিস, এসব কিন্তু ভাল না। লোকে নানা কথা বলে।

—কী বলে?

—বলে ওসব বিয়ে করার পার্টি। যেসব ছেলেদের চাকরি হয় না, আর যেসব মেয়েদের বিয়ে হয় না তারাই নাকি পার্টি করে। একসঙ্গে ওঠে বসে, তারপর হুট হাট নিজেদের মধ্যে বিয়ে করে ফেলে। আজকাল নাকি যেসব কুচ্ছিৎ মেয়ের বিয়ে হয় না তাদের বাবারা তাদের পার্টিতে ভিড়িয়ে দেয়। পার্টি করতে করতে তাদের বিয়ে হয়ে যায়।

শুনে আমি মায়ের ওপর ভীষণ রাগ করি।

কিন্তু মা তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। সন্তানের স্বার্থরক্ষায় কোন মা কবে পিছ-পা হয়েছে। আমি রাগ করলে মাও শাসিয়ে বলে—যদি কোনোদিন তুমি পার্টির মেয়ে বিয়ে করে আনো, তবে আমি গলায় দড়ি দেবো—মনে রেখো।

আমি তখন মাকে খ্যাপানোর জন্য বলি—পার্টির মেয়ে খারাপ হবে কেন! আমাদের সঙ্গে অনেক মেয়ে কাজ করে, তারা বেশ সুন্দর লেখাপড়া জানা মেয়ে, কেমন বুদ্ধিশুদ্ধি রাখে!

শুনে মার চোখমুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। বলে—ও, এইসব হচ্ছে! তাই বলি, অণু আমার এত বাউণ্ডুলে হয়ে গেল কেন! দাঁড়াও, তোমার বাবাকে বলছি।

মাকে ঐরকম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রেখে আমি আবার বেরিয়ে পড়তাম।

লামডিং-এর কালী মিত্র ছিলেন আমাদের দলের একজন বড় ট্রেড-ইউনিয়নিস্ট। তিনি চাকরি করতেন না, ছিলেন পার্টির হোল-টাইমার। তাঁর কাজ ছিল, প্রায় দিনই থানার মাঠে ঝাণ্ডা পুঁতে একটা টেবিল, এক জোড়া চেয়ার পেতে চোঙা ফুঁকে বক্তৃতা করা। রেল-কর্মচারীদের স্বার্থ-সচেতন করে তুলতেন, অফিসারদের দুর্নীতির বিবিধ উদাহরণ দিতেন তথ্য সহযোগে। অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করতেন। পার্টিতে তাঁর সুনাম ছিল না। শোনা যেত, ক্লাশ থ্রী এবং ক্লাশ ফোর কর্মচারীদের বদলী রদ করা, সাসপেনসন্ অর্ডারের প্রত্যাহার, বিশেষ জায়গায় বদলী করা, ইত্যাদি কাজের জন্য তিনি টাকা খেতেন। উপরন্তু বুকিং ক্লার্ক স্টেশন মাস্টারদের ঘুষ এবং হ্যাণ্ডলিং থেকে তাঁর নিয়মিত রোজগার ছিল। কিন্তু তাঁর একটা অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি নিপুণ গোয়েন্দার মতো রেলের দপ্তর থেকে সব গোপন তথ্য জোগাড় করতে পারতেন। এইটাই ছিল তাঁর সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র। প্রতিটি কর্মচারী থেকে অফিসাররাও তাঁকে ভয় পেতেন। কালী মিত্রের কোপ কখন কার ওপর পড়ে তার ঠিক ছিল না। কিন্তু যার ওপর পড়ত তার দুর্গতি হতই। কারণ, কালী মিত্র সঠিক তথ্য ও প্রমাণ সহযোগে প্রকাশ্য সভায় সব ফাঁস করতেন। হৈ-চৈ পড়ে যেত। অন্ততঃ তিনজন জেলা অফিসারকে তিনি লামডিং থেকে তাড়িয়েছিলেন। ফলে অফিসাররাও তাঁকে খাতির করতেন। পার্টিও তাঁকে ঘাঁটাতে সাহস করত না।

হঠাৎ খবর পাওয়া গেল কালী মিত্র আমাদের ইউনিয়ন ছেড়ে সরকারী ইউনিয়নে যোগ দিয়েছেন। আমি রেলের ইউনিয়নের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলাম না। আমার কাজ ছিল চা-বাগানের শ্রমিক, চাষী, স্কুল শিক্ষক, উদ্বাস্তুদের নিয়ে সংগঠন তৈরি করা। তবু সুপ্রিয় গুপ্ত আমাকে ডেকে বললেন, অতনু, কালীদার মতো ওয়ার্কার চলে গেলে দলের ক্ষতি হবে। আমরা অনেক চেষ্টা করেছি, তিনি থাকতে চাইছেন না। তোমার আইডিয়াগুলো খুব ফ্রেশ, বলতে কইতেও জানো, তোমার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণও আছে। দ্যাখো তো কালীদাকে ফেরাতে পারো কিনা! কিন্তু মনে রেখো, লোকটা ঝুনো ট্রেড-ইউনিয়নিস্ট, পলিটিক্যাল থিয়োরীর ধার ধারেন না। যতদূর সম্ভব নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে লোকটাকে পটাতে চেষ্টা করবে, আদর্শের কথা বেশি বোলো না।

লামডিং সুন্দর টিলার শহর। রেল লাইনের পশ্চিম ধারে প্রকাণ্ড খেলার মাঠ। সেই মাঠে ক্রিকেট খেলা হয়, ফুটবল, বেসবল নামে, সাহেব সুবোরা একসময়ে এটাকে গলফ্ লিঙ্ক বানিয়েছিলেন। লেভেলক্রসিং পার হলেই দেখা যায়, একটা চওড়া সুড়কির রাস্তা মাঠকে ডাইনে ফেলে ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে। টিলার পর টিলা, ঝাউ

boiRboi.net

আর শাল গাছের ফাঁকে ফাঁকে স্বপ্নের মতো বাংলোবাড়ি সব। সেখানে নীলাভ আলো জ্বলে, অর্গ্যাণ্ডির পর্দা ওড়ে হাওয়ায়, অফিসার্স ক্লাব থেকে ইংরিজি বাজনা ভেসে আসে, হুল্লোড়ের শব্দ শোনা যায়। সেই রাস্তায় হাঁটলে মনে হবে এ যেন বিদেশ। এখানে যেসব সুখী মানুষ বাস করে তাঁরা কেউ ভারতের অর্থনীতির শরিক নন, তাঁরা বিদেশী, তাঁরা অন্য পৃথিবীর মানুষ।

অন্যদিকে রেললাইনের পুবধারে কয়েকটা টিলার ওপর বাবুদের বাস। আরো এগোলে ক্রমে শহরটা ছোটো ঘিঞ্জি আর নোংরা হয়ে এসেছে। কাঁচা ড্রেনের গন্ধ, ইঁট-ওঠা সরু রাস্তা, বস্তির মতো বাড়ি, মাতালের এলোমেলো পদক্ষেপ, রাস্তায় ন্যাংটা ছেলেমেয়ে। এদিকে এলে কিছুতেই বিশ্বাস হয় না, এই শহরের অন্য দিকটাই এক অবিশ্বাস্য সুন্দর বিদেশ, যেখানে বিদেশী সুখী মানুষেরা বাস করে। প্রতিটি শহরেরই আলাদা চরিত্র থাকে।

এই ঘিঞ্জি এলাকায় একটা ছোট্ট কাঠের-বাড়িতে পা দিয়ে দেখি, সামনের বারান্দায় একটা ময়লা তেলচিটে ইজিচেয়ারে একজন একা মানুষ আধশোয়া হয়ে আছে। হাড় বের-করা রুক্ষ চেহারা, গালে গর্ত, চোখে চশমা। অনেক লড়াইয়ের চিহ্ন তাঁর শরীরে ফুটে আছে। কঠিন বাস্তব তাঁর রক্ত-রস নিংড়ে একটা ছিবড়ে মানুষকে ফেলে রেখে গেছে। সন্ধ্যার আধো-অন্ধকারে দেখি লোকটা বড় অন্যমনস্ক, হাতে সিগারেট জ্বলে যাচ্ছে, লম্বা হয়ে ঝুলে আছে সিগারেটের পতনোন্মুখ ছাই। দেখি, লোকটা পশ্চিম দিকের সেই স্বপ্নের সুন্দর শহরটার দিকে চেয়ে আছে যেন। হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মতো আমার মনে হল, লোকটা স্বপ্ন দেখছে। ঐ যে পশ্চিমের সুন্দর শহর, ঐখানে কোনোদিন তার যাওয়া হয় নি, সুখী মানুষদের একজন সে হয়নি কখনো, তার ঘরে ওড়েনি অর্গ্যাণ্ডির পর্দা। অভিশপ্ত কিছু মানুষের একজন সে হয়ে রইল চিরকাল, লড়াই করেছে অনেক—কিন্তু স্বপ্নের শহর রয়ে গেল দূরে। যাওয়া হল না! ক্রমে বয়স বেড়ে গেল, পিছনে ফিরে তাকালে দেখা যায় বিশাল হাহাকারের গহ্বরে ভরা একটা জীবন তার, মুঠো খুললে দেখা যায় প্রাপ্তি—শূন্য। তাই এই ভর সন্ধ্যায় একা নির্জন মানুষটি স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্ন দেখছে, সে পশ্চিমের ঐ শহরটিতে চলে যাবে।

কালী মিত্র মুখ তুলে আমাকে দেখলেন। সিগারেটের ছাই খসে পড়ল। আমাকে চিনতে পেরে হাসলেন— এসো অতনু।

নির্দেশ ছিল, যেন রাজনৈতিক আদর্শের কথা না তুলি। যেন ব্যক্তিগত প্রভাব দিয়ে তাঁকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করি। কিন্তু তার কিছুই দরকার হল না। দলত্যাগী কালী মিত্র যেন তাঁর সব কথা কাউকে বলার জন্য তৈরিই ছিলেন। আমাকে পেয়ে বেঁচে গেলেন।

পরিপাটি কথায় যিনি ওস্তাদ সেই কালী মিত্র সেই সন্ধ্যায় খুব গুছিয়ে কথা বলতে পারছিলেন না। তাঁর কথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। যেমন, প্রথমেই তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন—অতনু, বিয়ে করেছো ?

আমি মাথা নাড়লাম।

তিনি অন্যমনস্কভাবে বললেন—তোমার আর বয়স কী! বিয়ে করার অনেক সময় পাবে। কিন্তু আমার বয়স পঁয়তাল্লিশ। আমি এখনো বিয়ে করি নি। অতনু, তুমি কাউকে ভালবাসো?

আমি আবার মাথা নাড়লাম।

তিনি বললেন—আমি একজনকে ভালবাসি। বিশ বছর ধরে বাসি। তার বয়স এখন উনচল্লিশ। বিশ বছর আগে সে যেমন সুন্দর দেখতে ছিল, এখন আর তেমন নেই। মোটা হয়ে গেছে, মুখে মেচাতা পড়েছে, চামড়া ঝুলে গেছে। খুব এক ঢাল চুল ছিল তার, এখন সেসব কিছুই নেই। গত বিশ বছরে আমরা আমাদের সুন্দর বয়সটা হারিয়েছি। কিন্তু আর না। অতনু, তোমার বাবা এখনো চাকরি করেন, বোধ হয় কমার্শিয়াল ইন্‌সপেক্‌টার। না?

আমি মাথা নাড়লাম।

উনি বললেন—তা হলে তোমাকে কখনো তোমার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য তেমন চিন্তা করতে হয় নি। কিন্তু সেই ষোলো সতেরো বছর বয়স থেকে আমাকে সংসার টানতে হয়েছে। কী করে টেনেছি তা ভগবান জানেন। বিড়ি বেঁধেছি, বোকাজানে গুড়ের কারবার করেছি, কাপড়ের গাঁট ফিরি করেছি। আমার পড়াশুনো বেশি না। মার্ক্স-লেনিন-গান্ধী—আমি কিছুই বুঝি না। যারা বোঝে তারা আমার চেয়ে বেশি কাজ করে নি। আমি হার্ডেন্‌ড্‌ পলিটিশিয়ান। বিশ বছর আগে ছিলাম ফার্স্ট ফায়ারম্যান। আর ক'দিন পরেই ড্রাইভার হওয়ার কথা। সেই সময়ে রেল ইঞ্জিনের বড়ো টানাটানি, মালগাড়ির বগির খুব চাহিদা। আসামের এই অঞ্চলে তখন রাস্তাঘাট হয় নি, একমাত্র রেলওয়েই ভরসা। এই চাহিদার সুযোগে মার্চেন্টদের কাছ থেকে সাহেবরা দু'হাতে পয়সা লুটত। একটা পুরো মালগাড়ির জন্য কয়েক হাজার টাকার লেনদেন হত। সেই সময়ে আমাদের ইঞ্জিনের স্টীম ব্রেকটা গরবর করছিল। ইঞ্জিন 'শেড'-এ দেওয়া হয়েছে, মেরামতি তখনো হয় নি—সেই সময়ে ইয়ার্ডে একটা গাড়ির অর্ডার হয়েছে। গাড়ি তৈরি, ইঞ্জিন নেই। খবর পেয়ে সাহেবদের মাথায় হাত। তক্ষুণি সাহেবরা লোকোশেডে ফোন করে সেই ডিফেক্‌টিভ ইঞ্জিন বের করতে বললেন। আমরা আপত্তি করলাম, সাহেব ধমক দিলেন—ঐটুকু ডিফেক্‌ট কিছুই না। আমি ইঞ্জিনীয়ার, আমার চেয়ে তোমরা বেশি জানো? আমাদের উপায় ছিল না, ইঞ্জিন বের করলাম। তিনসুকিয়ার কাছে সিগন্যাল না পেয়ে গাড়ি থামাতে গিয়ে টের পেলাম স্টীম ব্রেক কাজ করছে না, ওদিকে গাড়িটাতে ভ্যাকুয়ামও দেওয়া হয় নি। গাড়ি সিগন্যাল পেরিয়ে দুটো পয়েন্ট ফাটিয়ে ডিরেল হল, পাঁচ-ছ' খানা বগি উল্টে গিয়ে মালপত্র সব নষ্ট। ইন্‌স্‌পেকশন্‌ হল, ইঞ্জিনের গলদ ধরা পড়ল, রিপোর্ট গেল। আমরা সাসপেনশন অর্ডার পেলাম। সাহেব যে ঐ ইঞ্জিন নিয়ে যেতে আমাদের বাধ্য করেছিলেন তা আমরা লিখিতভাবে জানালাম। কাজ হল না। সাহেব স্বীকার করলেন না। আমরা আন্দোলন শুরু করলাম, অ্যাকসিডেন্টের জন্য চিরকাল ড্রাইভার-ফায়ারম্যান কিংবা পয়েন্টসম্যানদের চাকরি যায়, এবার থেকে অ্যাকসিডেন্টের জন্য সাহেবদেরও কৈফিয়ৎ তলব করা হোক। সেই আন্দোলনে কেউ

গুরুত্ব দিল না। জীবনের শুরুতেই ঐ রকম ঘা খেয়ে কেমন হয়ে গেলাম। একদিন রাতে সোজা চলে গেলাম সাহেবের বাংলোয়। বললাম, দেখা করতে চাই। সাহেব বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। আমার হাতে একটা পাঁচ ব্যাটারীর টর্চ ছিল, সেইটে দিয়ে মাথায় মারলাম। অফিসার মানুষ—ভাল খায় দায়, জীবনীশক্তি বেশি, কিছু হল না। আমার জেল হল, চাকরি গেল। জেল থেকে বেরিয়ে আমি ইউনিয়ন করা সুরু করি। অতনু, আসামের এই অঞ্চলে আমি প্রায় একা রেলের ইউনিয়নকে জোরদার করে তুলি। তুমি জানো ?

আমি মাথা নাড়লাম।

তিনি অন্যমনস্কভাবে বললেন—ইউনিয়ন করতাম, বিড়ি বাঁধতাম, গুড় বেচতাম, কাপড়ের গাঁট ফিরি করতাম। আমার পরিবার প্রতিপালন এবং আন্দোলন—দুই-ই এই দুই হাতে করেছি। বিশ বছর প্রতিশোধের নেশা ছিল, আন্দোলনের নেশা ছিল। বিশ বছর আমি বিয়ে করি নি, বিশ বছর একটি সুন্দর মেয়ে অপেক্ষা করে আছে। অপেক্ষা করতে করতে তার যৌবন কেটে গেল, ঝরে গেল রূপ, এক ঢাল চুল পাতলা হয়ে গেল। বিশ বছর ধরে আমি কী আন্দোলন করেছি—হিসেব করতে গিয়ে দেখি—বিশ বছর আমি কিছু স্বার্থপর লোভী লোকের বদলী আটকেছি, সাসপেনশন রদ করেছি, ঘুষ ধরেছি কিংবা আরো অনেক কিছু করেছি—কিন্তু তাতে কী হয়েছে ? কিছু না, অভাবে অভাবে আমার চরিত্র নষ্ট হয়েছে, টাকা খেয়েছি, বদনাম কিনেছি। এর বেশি আর কিছু হওয়ার নেই আমার। বলেছি তো, আমি মার্ক্স-লেনিন-গান্ধী বুঝি না। আমি সহজ হিসেব-নিকেশ করে দেখেছি—আমার যা পাওয়া উচিত ছিল আমি তা পাই নি। কিন্তু অন্যেরা আমাকে ভাঙিয়ে কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে। অতনু, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে এখন হঠাৎ আমার নিজেকে বড় বোকা-বোকা লাগছে। অতনু, সুপ্রিয়দাকে বোলো, আমার লড়াই আমি করেছি। আর আমার কিছু করার নেই। এখন জীবন থেকে আমি কিছু পেতে চাই। মরবার আগে যেন অন্ততঃ একবার মনে হয়—জীবনটা সুন্দর ছিল।

নিমেষে আমি ছোবল তুললাম। দেখলাম ব্যক্তিগত স্বার্থের দুর্বলতম স্বপ্নে নুয়ে পড়েছে একটি শক্ত-সমর্থ লোক। কাঠ-জোয়ান, লড়াকু একটা মানুষ—মানুষের বৃহৎ লড়াই, সামগ্রিক সংগ্রাম, যৌথ স্বার্থ ভুলে পশ্চিম লামডিঙের টিলার সুন্দর শহরের স্বপ্ন দেখছে। এমন একটা মানুষ যদি এইভাবে সকলের চোখের সামনে ভেঙে পড়ে তবে বহু ছেলেই আত্মবিশ্বাস হারাবে। আমি কালী মিত্রকে বললাম—দাদা, আমিও এই কাজে নেমেছি। আমারও সুখের সংসার নয়······ইত্যাদি।

কালী মিত্র কেবল মিটিমিটি হাসলেন, বললেন—আমি জানি অতনু, তোমার মত সৎ কর্মী পার্টিতে বেশি নেই। তুমি অনেক দূরে উঠবে। কিন্তু সকলেই একরকম ক্ষমতা নিয়ে জন্মায় না। আমি যা করেছি তা একটা প্রতিশোধের জন্য। তা পূর্ণ হয়েছে। এখন আমাকে ছেড়ে দাও। বিপ্লবের অর্থ প্রতি বছর পাল্টে যাচ্ছে, পার্টি কেবলই তার সংগ্রামের দিক পাল্টাচ্ছে। বড় দামাল সময় এখন। এত ওলট-পালটের মধ্যে আমি বড় বেমানান। আমি তো কবে থেমে গেছি। আমার

সাধ্য নেই তোমাদের সঙ্গে চলি। কাজেই আমাকে ছুটি দাও। চাকরিতে রিটায়ারমেণ্ট আছে, রিটায়ার করার পর মানুষ তার নিজস্ব জীবন যাপন করে। তেমনি আমাকে রিটায়ার করতে দাও। আমাকে ভুলে যাও।

আমি যতবার ছোবল তুলি, তিনি ততবার মিষ্টি হেসে ধুলোপড়া দিয়ে দেন। তারপর এক সময় হঠাৎ উঠে বললেন—চলো, আমার সঙ্গে এক জায়গায়।

বেশি দূর না। ঘিঞ্জি পাড়ার আর একটু ভিতরে একটা দরিদ্র বাড়িতে তিনি নিয়ে গেলেন আমাকে। বাইরে থেকে ডাক দিলেন—বিভা বিভা—

বিভা এসে সামনে দাঁড়ালেন। ময়লা শাড়ি, দেহে গার্হস্থ্যের নির্ভুল ছাপ। এক কালে সুন্দরী ছিলেন—বোঝা যায়। আমাদের ঘরে নিয়ে বসালেন। হ্যারিকেনের আলোটা উস্কে দিয়েই বিভা আমার দিকে তীব্র চোখে তাকালেন। সেই চোখে অনেক প্রশ্ন ছিল এবং সংশয় আর ভয়। কিন্তু কোনো প্রশ্ন করলেন না। কালী মিত্র বললেন—পার্টির ছেলে। খুব চোখা। ওর নাম শুনেছো বোধ হয়, অতনু সেন। চারটে চা-বাগানে একনাগাড়ে পনেরো দিন ধর্মঘট করিয়েছিল একা। খুব হৈ-চৈ হয়েছিল।

বিভা বললেন—শুনেছি।

কালী মিত্র বললেন—ও আমাকে ফেরাতে এসেছে।

বলে হাসলেন। বিভা কথা বললেন না, কিন্তু অনেকক্ষণ সংশয়ের চোখে দেখলেন আমাকে। বুঝলাম, তিনি খুব ভয় পেয়েছেন।

কালী মিত্র বললেন—তুমি চা করে আনো, আমরা বসছি।

বিভা চলে গেলে কালী মিত্র বললেন—এটা ওর দাদার সংসার। বিশ বছর ও এই সংসারে পড়ে আছে। দাদারা সামান্য দোকানদার। সংসারে অনটন, বৌদিরা ভাল ব্যবহার করে না। অনেক ভাল বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল, কিন্তু সব ও ভেঙ্গে দিয়েছে বলে কেউ ওকে ভাল চোখে দেখে না। আমার সঙ্গে মেশে বলে পাড়াতেও যথেষ্ট নিন্দে আছে ওর নামে। এই সংসারে ও কাপড় কাচে, বাসন মাজে, ছেলে মানুষ করে, খেতে-পরতে পায় না, আদর-ভালবাসা নেই। বিশ বছর ধরে ও এই জীবন যাপন করছে। অতনু, এটা কতবড় স্বার্থত্যাগ তা বাইরে থেকে বোঝা মুস্কিল।

আমি বললাম—আপনি পার্টিতে থেকেও তো বিয়ে করতে পারেন—

কালী মিত্র হাসলেন—শুধু বিয়ের জন্য পার্টি ছাড়ছি—কে বলেছে। ওকে এতকাল ইচ্ছে করেই কষ্ট দিয়েছি। বিয়ে করবার কথা মনেই হত না। কথা উঠলে বলতাম—অপেক্ষা করো, এখন অনেক কাজ। কাজে কাজে বেলা বয়ে গেল। কত কাজ করেছি এতকাল! তারপর হঠাৎ মনে হল, পুরোটাই নিজেকে ফাঁকি দেওয়া। এই ফাঁকির হাত থেকে বাঁচতে হলে দুটো কাজই একসঙ্গে করব। পার্টি ছাড়বো, বিয়েও করব। রেল থেকে অনেকদিন ধরে আমাকে অফার দিয়েছে। সরকারী ইউনিয়নে গেলে আমাকে ওরা বড় চাকরি দেবে। আমি হবো ওয়েলফেয়ার অফিসার, ইচ্ছে মতো জায়গায় পোস্টিং পাবো, আমার বাংলো হবে। আমি ওদের বড় জ্বালাচ্ছি, তাই আমাকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা ওদের খুব দরকার।

আমি কিছু বলার জন্য মাথা তুলেছিলাম। তুলে দেখি, কালী মিত্র ছোটো চোখে আমাকে তীক্ষ্ণ ভাবে দেখছেন। আমি মুখ তুলতেই প্রসন্ন, শান্ত হাসি হাসলেন, বললেন—রাগ কোরো না। আমি বিস্তর মানুষ দেখেছি। একটু প্রমোশন, একটা বদলী, একটু অপরাধের মার্জনা—এ সবের জন্য মানুষ কী প্রচণ্ড ছোটাছুটি ধরাধরি করে। তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস করো, বুড়ো বয়সে কমার্শিয়াল ইন্‌স্‌পেক্‌টর হতে তাঁর কীরকম ধকল গেছে। সব মানুষই সুখে থাকার জন্য এসব করছে—আমার অপরাধ কোথায়? তাছাড়া ভেবে দেখ, এক্সিডেন্ট করে অন্যায়ভাবে চাকরি না গেলে আজ আমার ফোরম্যান কিংবা অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার হওয়ার কথা। চাকরি না গেলে আমি পার্টিতে কিংবা ট্রেড-ইউনিয়নে আসতাম না, ফোরম্যান বা অফিসার হতাম। হলে কি কেউ আমার দোষ দেখত? তা হলে এখন ওয়েলফেয়ার অফিসার হলেই বা তোমরা আমার দোষ দেখবে কেন?

বিভা চা নিয়ে এলেন। তারপর চুপচাপ ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কালী মিত্র বললেন—বিভা, তুমি অতনুকে কিছু বলো।

বিভা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কেন এসেছেন?

বললাম—এমনিই। দেখা করতে।

বিভা মাথা নাড়লেন—না। পার্টি থেকে আপনাকে পাঠিয়েছে।

আমি ইতঃস্তত করে বললাম—না, ঠিক তা নয়।

বিভা হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে বললেন—আমি জানি। আপনি—আপনি এসেছেন ওকে—

কালী মিত্র হেসে উঠলেন। বিভা ওঁর দিকে চেয়ে ধমক দিলেন—তুমি হেসো না। তারপর আমার দিকে ফিরে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন—আপনি ওকে খুন করতে এসেছেন।

ভীষণ চমকে উঠে বললাম—সে কী?

কালী মিত্র হাসছিলেন। বললেন—ওর ঐ এক ভয়। ও কেবলই ভাবে, দলকে বিট্রে করছি বলে আমাকে খুন করা হবে। এর আগে পার্টি থেকে যারা এসেছে তাদেরও ও এই কথা বলেছে।

কালী মিত্র একটু শ্বাস ছেড়ে বললেন—না বিভা, আমাকে কেউ খুন করবে না। এখন কেউ আর আদর্শের জন্য খুন করার রিস্ক্ নেয় না, স্বদেশী আমলে যেমন নিত। এখনকার রাজনীতি আলাদা। তোমার ভয় নেই, অতনু খুন করতে আসে নি।

বিভা নতমুখ হলেন। মুখ তুলে সজল চোখে বললেন—আমার এক দাদা স্বদেশী করতে করতে সব ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। স্বদেশীরা তাঁকে সন্দেহ করে খুন করেছিল। সেই থেকে আমার ভয়।

আমার ভিতরটা রাগে, ঘেন্নায় ফেটে যাচ্ছিল। চায়ের কাপ রেখে আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম—আমি খুন করতে আসি নি। খুন করার দরকারই বা কী?

মানুষটাকে তো মরতেই দেখে গেলাম।

কালী মিত্র হাসছিলেন। অবিরল হাসছিলেন।

বেরিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত রাখলেন তিনি। বললেন—অতনু, তোমাকে দু'-একটা ইনফর্মেশন দিয়ে রাখি। আমরা সবাই ক্যারিয়ারিস্ট্। একটা বয়সের পর আমরা কেউ খামোখা রাজনীতি করি না। সুপ্রিয় গুপ্ত বড় ট্রেড-ইউনিয়নিস্ট। তাঁর ত্যাগও অনেক। আমি খবর রাখি, তিনি অফিস করেন না বলে মাসের শেষে মাত্র বাইশ তেইশ টাকা মাইনে পান। সার্ভিস রুল অনুযায়ী খুব শীগগিরই তাঁর চাকরি যাবে। তখন কী হবে জানো? একদিকে রেলের কর্মচারীরা চাঁদা তুলে তাঁর হয়ে মামলা লড়বে, অন্যদিকে পার্টি তাঁকে খুব ভাল কনস্টিটুয়েন্সী থেকে পার্লামেণ্টারী সীটের জন্য দেবে নমিনেশন। তিনি রিটার্নড্ হবেন। সব ঠিক হয়ে আছে। এম-পি হওয়াটা একটা মস্ত ক্যারিয়ার অতনু, সারা ভারতবর্ষে মাত্র শ' পাঁচেক লোক হতে পারে। সেই তুলনায় একটা সামান্য ওয়েলফেয়ার অফিসারের চাকরি কিছুই না।

বলে তিনি হাসতে লাগলেন।

আমি জ্বলতে লাগলাম।

চার

ছ'মাসের মধ্যেই কালী মিত্র ওয়েলফেয়ার অফিসার হয়ে গোরক্ষপুরে চলে গেলেন। বিয়ে করেছেন, তাও শুনলাম। লামডিঙের রেলের ইউনিয়ন বেশ একটা ঘা খেল।

বছরখানেক পর। একদিন মাল জংশনে একটা চা-বাগানে মিটিং করে ফিরছি। স্টেশনে প্রকাশের সঙ্গে দেখা। বিমর্ষ মুখে সে বলল—অতনু, সুপ্রিয়দার চাকরি গেছে।

অবাক হলাম না। কালী মিত্র ঝানু লোক। ঠিক খবর রাখত।

স্টেশনের স্টলে দাঁড়িয়ে দু'জনে চা খাচ্ছিলাম। প্রকাশ বলল—আমরা চাঁদা তুলছি, মামলা করব।

আমি হাসলাম, বললাম—চাকরি গেলেই বা কী। পার্টি তাকে পার্লামেণ্টারী সীটে নমিনেশন দেবে।

প্রকাশ অবাক হয়ে বলল—কী করে জানলি?

—একবছর আগে থেকেই জানি।

প্রকাশ অবিশ্বাসে বলল—যাঃ। মোটে দু'দিন আগে পার্টির মিটিঙে এরকম

boiRboi.net

একটা কথা উঠেছিল। এখনো কথাটা পাকা নয়। একবছর আগে কেউ জানতই না যে এমন হঠাৎ সুপ্রিয়দার চাকরি যাবে।

আমি বললাম—প্রকাশ, আমরা অনেক কিছুই জানি না। আমাদের জানানো হয় না। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই ছক-বাঁধা হয়ে আছে এক দেড় বছর আগে। কালী মিত্র ঠিক এইটাই আমাকে বলেছিল।

প্রকাশ ঠোঁট উল্টে বলল—কালী মিত্র! ও নিজেই তো আসামের অ্যাসেম্বলীর সীটে নমিনেশন চেয়েছিল। জোচ্চোর লোক, ওকে নমিনেশন দিলে পার্টির বদনাম হবে বলে দেয় নি। সেই জ্বালায় আজে বাজে বলত।

আমি হেসে বললাম—তোর কথাই হয়তো ঠিক। তবু, সুপ্রিয়দার যে চাকরি যাবে, আর পার্টি তাঁকে পার্লামেণ্টে পাঠানোর চেষ্টা করবে—এটা কালী মিত্র খুব আন্দাজে বলেনি। একটা কিছু আঁচ করেছিল। আমরা যারা ফিল্ড ওয়ার্কার বা সাধারণ ট্রেড-ইউনিয়নিস্ট তারা অনেক কিছুই জানি না, প্রকাশ।

প্রকাশ কথাটা মানতে চাইছিল না। কিন্তু তাকে বিমর্ষ দেখাচ্ছিল।

আমি বললাম—তোরা খামোখা মামলা করছিস কেন! যদি সুপ্রিয়দা পার্লামেণ্টে যায়, তা হলে আর মামলা করে কী হবে? তোরা জিতলে সুপ্রিয়দা আবার চাকরিতে ফিরে আসবেন?

প্রকাশ মাথা নাড়ে—তা কেন? তাঁর সংগ্রামের ক্ষেত্র অনেক দূর বিস্তৃত হল। আমাদের দাবী দাওয়া তিনি সরাসরি পার্লামেণ্টে তুলতে পারবেন। তিনি ফিরবেন না, কিন্তু তাঁকে যে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে সেটা আমরা সবাইকে বুঝিয়ে দেবো।

আমি বললাম—খামোখা। সার্ভিস রুল অনুযায়ী তাঁর চাকরি গেছে। লড়ে জিতলেও তিনি ফিরবেন না। তবে কেন গরীব কর্মচারীদের টাকার অপব্যবহার করব!

শুনে প্রকাশ রেগে গেল, বলল—তুই এসব কী বলছিস? সুপ্রিয়দার জন্য আমরা লড়ব না! তিনি সারা জীবন আমাদের জন্য লড়েছেন!

আমি কোন উত্তর দিলাম না। কিন্তু বার বার দুশ্চরিত্র, দলত্যাগী কালী মিত্রর কথাটা আমার মনে পড়ছিল—একটা বয়সের পর আমরা কেউ আর খামোখা রাজনীতি করি না। আমরা সবাই ক্যারিয়ারিস্ট্। সুপ্রিয়দার ব্যাপারটা এমনিতে দেখতে গেলে খুবই সাধারণ। কোন অন্যায় নেই এর মধ্যে, চুরি নেই, চরিত্রহীনতা নেই। কিন্তু আমার মন কেবলই বলছিল, ব্যাপারটা যেন গোপনে ছক বাঁধা হয়ে ছিল! তবে কি পার্টি কাউকে কাউকে গোপনে লোভ দেখিয়ে জীইয়ে রাখে! প্রতিশ্রুতি দেয়, যে, তোমার চাকরি গেলে তোমাকে এম-পি বা এম-এল-এ বানাবো? যদি তাই হয় তবে আমরা সুপ্রিয়দা বা কালী মিত্রর মত লোককে চিরকাল হারাবো। প্রকাশের চোখে হয়তো কালী মিত্রর অফিসার হওয়া আর সুপ্রিয় গুপ্তর এম পি হওয়া সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। কিন্তু আমার কাছে আবছা ভাবে দু'টিই এক কার্যকারণসূত্রে বাঁধা বলে মনে হচ্ছিল।

প্রকাশের সঙ্গে আর খুব বেশী কথা হল না। আসাম লিংক এসে পড়ল। সে

চলে গেল আলিপুরদুয়ারের দিকে। আমি রাতের গাড়িতে শিলিগুড়ি রওনা হলাম। আমার ভিতরে ভিতরে কোথায় যেন ছোট্ট পোকার কামড়ের মতো যন্ত্রণা হচ্ছিল। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, মানুষের জন্য আমরা যেসব সংগ্রাম এতকাল ধরে করেছি—সব বৃথা যাবে। গৃহসুখ, অর্থসুখ, ভবিষ্যৎ—এই সব ভেবে যোদ্ধারা যুদ্ধ শেষ না করেই রণক্ষেত্র ছেড়ে যাচ্ছেন, মানুষের সংগ্রাম পড়ে থাকছে। বিপ্লবের পথ বেঁকে যাচ্ছে গার্হস্থ্যের দিকে। বনের সন্ন্যাসী ফিরে যাচ্ছে ঘরে।

সেবার সুপ্রিয় গুপ্ত বিহারের একটা বাই-ইলেকশনে জিতে পার্লামেন্টে গেলেন। প্রকাশের সঙ্গে দেখা হয়। দুজনে রাত জেগে গল্প করি। কত গল্প হয়। সে তার ট্রেড ইউনিয়নের কথা বলে, আমি বলি ফিল্ডওয়ার্কের কথা। বলতে বলতে কখন অলক্ষ্যে আমাদের কথাবার্তায় একটা বিষণ্ণতা আর হতাশার সুর চলে আসে। তার রাজনীতির গুরু সুপ্রিয়দা চলে যাওয়াতে একটু ভেঙ্গে পড়েছিল প্রকাশ। আবার সামলে গেছে। এখন তার দায়িত্ব অনেক। তার পিছনে গোয়েন্দা ঘোরে, গুণ্ডা পিছু নেয়, কর্তৃপক্ষ শত্রুতা দেখায় প্রকাশ্যে। তবু তার গুরুত্ব বেড়েছে অনেক। কিন্তু সেই সঙ্গে বেড়েছে বয়স আর অভিজ্ঞতা। ফলে, আশা করার, স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা গেছে কমে।

ক্রমে আমার ভিতরেও আসছে হতাশা। মনে হচ্ছে পৃথিবী জোড়া মানুষের বিপুল সমস্যার ভার আমরা কী করে ঠেলবো! প্রতি বছর বিপ্লবের অর্থ পাল্টে যাচ্ছে, পাল্টাচ্ছে সংগ্রামের স্ট্র্যাটেজি। তবু বছরের ছয়মাস অবসাদে কাটে, বাকী ছয়মাস বুনো মোষ তাড়িয়ে ফিরি। তখনই মনে হচ্ছিল, যে বিশেষ দলটিতে আমি আছি তাতে থেকে খুব একটা লাভ নেই। এই দল সত্যিকারের বিপ্লব চায় না, চায় সমঝোতা, কিংবা মীমাংসা, কিংবা দাবী-আদায়।

প্রকাশকে বলি—প্রকাশ, ট্রেড ইউনিয়ন করে কিছু হবে না।

—কেন ?

—ট্রেড ইউনিয়ন কেবল লোকের অসৎ প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিচ্ছে। মানুষের দাবী আদায় করে দেওয়াই কেন আমাদের ট্রেড ইউনিয়নগুলির কাজ হবে ? দাবী আদায় বরং মানুষগুলোকে আরো নষ্ট করে দিচ্ছে, ওরা লড়াইয়ের শরিক হচ্ছে না, ইউনিয়ন বলতে ওরা বোঝে ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার উপায় মাত্র। ওরা খারাপ জায়গায় বদলী হতে চায় না, বা ভাল জায়গায় পোস্টিং চায়, অন্যায় করে শাস্তি এড়াতে চায়, ব্যক্তিগত প্রতিশোধ চায়—এইসব বিচিত্র চাওয়াকে পূরণ করে গেলে কিন্তু মানুষ-গুলো কেবলই পিছলে যাবে। ওদের মূল স্বভাব পাল্টাবে না। ওরা কাজ কম করবে, ফাঁকি দেবে, চুরি করবে, নিজেরটা গুছিয়ে নেবে, কখনোই বৃহত্তর স্বার্থের লড়াইতে নামবে না। এইসব লোভী, নীচ, স্বার্থপর মানুষদের শুদ্ধ করবে কে ?

প্রকাশ গম্ভীরভাবে বলে—অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হলে ওরাও পাল্টাবে।

আমি বলি—দূর। তা হলে অফিসারেরা চুরি করত না, মন্ত্রীরা সৎ হত, ক্যাপিট্যালিস্টরা আয়কর ফাঁকি দিত না। অভাব নষ্ট করলে স্বভাব যায় না। তুইও জানিস।

প্রকাশ ভাবে। কথা বলে না। হয়তো দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় সেও বুঝতে

পারছিল বাইরে থেকে মানুষের অবস্থা পাল্টে দিয়ে কোন লাভ নেই। মানুষের ভিতরে পচন। সেই পচন নালী ঘায়ের মত সমাজের শরীরে ফুটে উঠছে। আমার মন বলত, দল নয়, মানুষ, মানুষই মূল কথা। মানুষের জন্য হাজারবার দল পাল্টানো যায়, হাজারবার দল গড়া যায়। কিন্তু কথাটা যেন মনে থাকে—মানুষের জন্য, মানুষের জন্য, মানুষের জন্য।

এইসব কথা আমি কিছু কিছু প্রকাশ্যেও বলতাম। দলের কাজের প্রকাশ্য প্রতিবাদও করি কয়েকবার। কর্মী হিসেবে আমার নাম ডাক ছিল। ডুয়ার্সকে আমি চিনতাম আমার হাতের নখের মত। আমার অনুগত ছিল দলের সবচেয়ে ভাল কর্মীরা। কাজেই আমার সমালোচনা পার্টি মুখ বুজে সয়ে গেল। আর সাধারণ নির্বাচনে আমাকে বিধানসভায় দিল নমিনেশন।

পুরোনো কায়দা। অবাধ্য কর্মীকে বশে রাখার চেষ্টা। যে কনস্টিটুয়েন্সি আমাকে দেওয়া হল তা ছিল নিশ্চিত হারের জায়গা। আমার প্রতিপক্ষ একজন উপমন্ত্রী। সেই কনস্টিটুয়েন্সিতে কেউ আমাকে তেমন চেনেই না।

তবু লড়াইটা আমি লড়েছিলাম খুব। পার্টি আমাকে যে চ্যালেঞ্জটা ছুঁড়ে দিয়েছিল, সেটা লুফে নিয়ে আমি নির্বাচনে প্রচণ্ড খাটি। আলিপুরদুয়ার থেকে প্রকাশ এসে আমার পাশে দাঁড়াল। বহু জায়গায় আমাদের সভায় ইঁটপাটকেল পড়েছিল, ভাড়াটে গুণ্ডা করেছিল তাড়া। প্রকাশ আমাকে বলল—পার্টি তোকে এ কী কনস্টিটুয়েন্সি দিয়েছে! এখানে জেতার কোন আশা নেই। তোর মত কর্মীকে অনেক ভাল জায়গা দেওয়া যেত। তুই কেন রিফিউজ করিস নি!

আমি ম্লান হেসে বললাম—প্রকাশ, ছেলেবেলায় তুই আর আমি যখন মারপিট করতাম তখনকার কথা মনে আছে? তখন আমরা লোক বেছে মারপিট করি নি। যার সঙ্গে লাগত লড়ে যেতাম। কত মার খেয়েছি, পিছিয়ে যাই নি। আমি সে লড়াই আজও ভুলিনি।

শুনে প্রকাশ গুম হয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলল—ঠিক আছে। আমিও ভুলি নি। অতনু, আমি চিরকাল তোর রইলাম! আমি আছি, মনে রাখিস।

নির্বাচনে আমি হাজার দুয়েক ভোটে হেরে গেলাম। কিন্তু খাটুনীর এত ধকল গেল যে নির্বাচনের পরদিনই আমার একশ চার ডিগ্রী জ্বর উঠে গেল। জ্বর আর নামে না। খবর পেয়ে বাবা আর মা এসে আমাকে পাণ্ডুতে নিয়ে যান।

boiRboi.net

পাঁচ

মাসখানেক টাইফয়েডে ভুগে উঠলাম। তখনো ভাল চলতে পারি না। চিন্তাশক্তি যেন কমে গেছে। বারান্দায় মা ইজিচেয়ার পেতে দেন। একটা বই হাতে সারাদিন সেখানে বসে থাকি। সামনে পাঁচ নম্বর ফেরীঘাটে গ্যাদাবোট নোঙর ফেলে দাঁড়ায়, মালগাড়ি লোড হয়। আর তার পিছনে বিপুল গৈরিক জলরাশি নিয়ে ব্রহ্মপুত্র নিরন্তর বয়ে যায়। ওপাড়ে আমিনগাঁওয়ের টিলাগুলো দেখা যায়, দূরে নীলাভ ধূসর পাহাড়। ডাইনে নীল পর্বতে কামাখ্যার মন্দির, নদীর ওপর ওঁ বাবার আশ্রম। নির্জন চারদিকে সবকিছু সারাদিন স্থির থাকে। শুধু অবিরল নদী চলে। তার নিরন্তর চলা সারাদিন দেখি, তবু দেখা ফুরোয় না। একটা জীবন আমি এরকম অবসর ভোগ করি নি। বসে থেকে থেকে চিন্তারাশি মাথায় মেঘ করে আসে। মনে হয়, রাজনীতি না করলেও পারতাম। মানুষের প্রতি আমার স্বাভাবিক ভালবাসা ছিল—সেটাই ছিল ভাল। মানুষের মুক্তির সংগ্রাম করতে গিয়ে আমি এক সংকীর্ণ অন্ধ রাস্তায় চলে এসেছি। ঐ নদীর মতোই আমি একদিন বহমান ছিলাম, আজ আর নেই। নিজেকে স্থবিরের মত লাগে। নদীর বয়ে যাওয়ার দিকে তাই মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকি। ফেরী স্টীমারের ভোঁ বাজে, ইঞ্জিন শিস্ দেয়, চমকে উঠি—মনে পড়ে—বয়স হল। ঢের বয়স হয়ে গেল। কত মুখ ভীড় করে আসে মনে। অসহায় দুঃখী মুখ সব। একটি মেয়ের কথা মনে পড়ে—বেশ্যা হতে চেয়েছিল। একটি বৌয়ের মুখ মনে পড়ে—লুঠেরাদের তাড়া খেয়ে যে আগুনের ঘর থেকে ছেলে কোলে নিয়ে এক মাইল দৌড়ে গিয়ে দেখেছিল—তার কোলে ছেলের বদলে ছেলের পাশবালিশ। একটা দুঃখী মেয়ে কবে যেন একটা ভাঙা পুতুলের একটি হাত মাত্র কুড়িয়ে পেয়েছিল, তার অন্য খেলনা ছিল না বলে সারাদিন সেই হাতখানা রাখত বুকে করে। এইরকম মুখ আসে যায়। মনে হয়, মানুষের বৃহৎ সমাজের বিচিত্র ধারাকে রাজনীতি খুব সামান্যই দিতে পারে। নদীর দিকে চেয়ে থাকি, মনে মনে পথ হাতড়াই। মানুষ দেখে আমার এই বিশ্বাস স্থির হয়েছে যে, মানুষের ভিতরে অনন্ত শক্তির আকর রয়েছে। তাকে গতি দিলে, তাকে শক্তি দিলে সে অনায়াসে নিজের দুই কূলের সীমা উপচে প্লাবিত হতে পারে। মানুষ দুঃসহতম ক্লেশ অক্লেশে করতে পারে বহন। রাজনীতি সেই শক্তিকে উপেক্ষা করে কেবলই তার জন্য দাবী-আদায় করার চেষ্টা করছে, খুশি রাখার চেষ্টা করছে তাকে। মরে যাচ্ছে তার ভিতরকার শক্তি। সে আর্ত হয়ে পড়ে থাকছে চিরকাল, অথচ তার ভিতরে ছিল মানুষকে ত্রাণ করার অমোঘ ক্ষমতা।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম ভাঙলে আবার চেয়ে থাকি। আবার

ঘুমোই। সারাটা দিন কেটে যায়। ধর্ম-বিষয়ে লেনিনের গ্রন্থখানা অপঠিত থেকে যায়, কিংবা কোনদিন আমার কোলের ওপর খোলা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বইখানার পাতাগুলি হাওয়ায় উল্টে যায় কেবল। বই ভাল লাগে না। বরং ইচ্ছে করে তীর্থযাত্রীর মত বেরিয়ে পড়ি মানুষের মেলায়। সে মেলায় বড় ধুম। সে মেলায় একশো মজা।

সামনের রাস্তাটা দিয়ে একটা মেয়ে মাঝে মাঝে হেঁটে যায়। বড় কমনীয় তার মুখশ্রী। গায়ের রঙ শ্যামলা। ছিপছিপে শরীর। সদ্য কৈশোর পার হয়ে সে শাড়ি ধরেছে। যেতে যেতে কখনো বা একপলক আমাকে দেখে যায়। রোগা এক পুরুষ সারাদিন শুয়ে শুয়ে কী করে—তাই দেখে বোধ হয়। তার চোখে সরল কৌতূহল লক্ষ্য করি। মাঝে মাঝে সে তার ভাইয়ের সঙ্গে যায়, মাঝে মাঝে একা একা। তাকে রোজ লক্ষ্য করি। ক্রমে লক্ষ্য করতে ভাল লাগে। আমার দীর্ঘ অবসর সহজে কাটতে চায় না। মাথা অলস লাগে। সেই আলস্যের ফাঁকে ফাঁকে মেয়েটি ক্রমে আমার শূন্য মাথায় বাসা নেয়। বড় সুন্দর তো মেয়েটা!

অল্প অল্প করে হাঁটাহাঁটি শুরু করি। প্রথমে বাগানের গেট পর্যন্ত। কিছুদিন সামনের রাস্তায়। এ অঞ্চলটা খুব নির্জন। কয়েকটা বাংলো বাড়ীর পরই নদীর ঢাল, শান্টিং লাইন। হাঁটতে হাঁটতে পাড়ার শেষ সীমা পর্যন্ত চলে যাই। দেখি, শেষ বাড়ীটার লনে বিকেলবেলা নেট টাঙিয়ে ব্যাডমিণ্টন খেলছে কারা। খেলা দেখতে এগিয়ে গিয়ে বাগানের বেড়া ঘেঁষে দাঁড়াই। দেখি, সেই মেয়েটা, তার ভাই, আরো দুটি ঐ বয়সের মেয়ে নিতান্ত অপটু হাতে খেলছে। অমাকে দেখে তারা লজ্জা পায়। র‍্যাকেট হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি সরে আসি। অন্যমনে হাঁটতে হাঁটতে নদীর ধার পর্যন্ত চলে যাই। জলে পা দিয়ে দাঁড়াই। বড় অন্যমনস্ক লাগে, চিন্তাগুলি এলোমেলো হয়ে যায়। হৃৎপিণ্ডের শব্দ হঠাৎ পাল্টে যাচ্ছে—শুনতে পাই।

মায়ের কেবল এক কথা। বিয়ে কর। আগে কথাটা শুনলে বড় রেগে যেতাম। আজকাল রাগি না। কিন্তু বড় অসহায় লাগে। তাই মাকে ঝেঁঝে উঠে বলি—যাও তো মা, আমাকে একা থাকতে দাও।

মা কাকুতি মিনতি করে। বলে - এখন বয়সের জোরে ঐসব বলিস। কিন্তু যখন বয়স হবে তখন তোকে দেখবে কে? যে নিজেকে নিয়ে ভাবে না, তার জন্য ভাবনা করার একজন লোক চাই।

আমি চুপ করে থাকি। মা অনর্গল বকে যায়।

এক একদিন মা চুপি চুপি এসে বলে—যদি পার্টির কোনো মেয়েকে তোর পছন্দ তো বল, স্বজাত স্বঘর হলে আমার আপত্তি নেই।

নিরস্ত হয়ে বলি—বিয়ে করে আমি খাওয়াবো কী?

অমনি শুনি বাবা ভিতরের ঘর থেকে গম্ভীর গলায় বলেন—যে দেশশুদ্ধ লোকের খাওয়া পরার ভার নিয়েছে তার নিজের বৌকে খাওয়াবার প্রব্লেম থাকা উচিত নয়।

শরীরটা সারলে কিছুদিনের জন্য আবার বেরিয়ে পড়ি। আসাম আর উত্তর

বাংলার মাঠ-ঘাট জঙ্গল ভেঙ্গে কিছুদিন পর আবার ফিরে আসি।

এসে দেখি সেই মেয়েটা আমার বোনের বন্ধু হয়ে গেছে। দুজনে দুপুরবেলা একসাথে উল বোনে, সন্ধ্যেবেলা হারমোনিয়াম বাজিয়ে একে অন্যের কাছ থেকে গান তুলে নেয়। দেখা হলে মেয়েটি হরিণীর মতো ভীতু চোখে আমার দিকে তাকায়। মেয়েটা সম্ভবতঃ শুনেছে, আমি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে অল্প ভোটে হেরে গেছি, আমি পার্টির একজন স্তম্ভ, আমি নেতা। আর কিছু না থাক এই সব গ্ল্যামার তো আমার আছেই। মেয়েটি তাই ভয়ে ভয়ে আমার দিকে তাকায়।

আমার চিন্তার রাজ্য খুবই ব্যাপক। সেখানে একটি মেয়ের স্থান কতটুকুই বা! হাজার মুখের ছবির মধ্যে, হাজার সমস্যার চিন্তার মধ্যে তার হারিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তবু হারায় না।

পাঁচ নম্বর ফেরীঘাট জায়গাটা বোধ হয় ভাল না। এই জায়গা মানুষের মনকে নরম করে ফেলে। চারদিকে আকাশ আর নীলাভ পাহাড়ের মায়া, রেলের মন্থর শান্টিঙের শব্দ, স্টিমারের বিষণ্ণ ভোঁ, আর সব কিছুর ভিতর দিয়ে অবিরল জলের শব্দ তুলে ব্রহ্মপুত্রের বয়ে যাওয়া—এই সবের ভিতরে কী যেন রয়েছে। মন এলিয়ে পড়ে। দু'দণ্ড বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে করে। অবসর ভোগ করতে বাসনা জাগে। ভাবতে ভাল লাগে একটি কমনীয় মুখশ্রীকে।

সেবার বাড়িতে আসতে একদিন মা মেয়েটাকে দেখিয়ে বললেন—ঐ মেয়েটা, ওর নাম দুলু। ওকে আমার বড় পছন্দ। স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে এবার কলেজে পড়ছে—

না শোনার ভান করে উঠে যাই। তবু বুকের মধ্যে একটা চমক খিচ ব্যথার মতো চেপে ধরে থাকে। আবার পালাই। চা বাগানের শ্রমিক, উত্তর বাংলার চাষীদের নিয়ে মেতে থাকি, মিটিং করি, রাত জেগে পড়ি বই, ডুয়ার্সের মাঠ-জঙ্গল ভেঙ্গে অবিরল ঘুরতে থাকি। রোদে জলে পোড় খেয়ে শরীরটা রুক্ষ কঠিন হয়ে আসে। কিন্তু যখনই একটু অবসর পাই, যখনই কর্মহীন একটু সময় যাপন করি, তখনই পাঁচ নম্বর ফেরীঘাটের মায়াবী প্রকৃতি মনে পড়ে, মনে পড়ে—শান্টিঙের শব্দ, স্টীমারের ভোঁ, নদীর বয়ে চলা। শুনতে পাই, আমার হৃৎপিণ্ডের শব্দ আস্তে আস্তে পাল্টে যাচ্ছে।

এই সময়ে একদিন প্রকাশ এসে আমাকে ধরল— অতনু, মা কিছুতেই ছাড়ছে না। তুই মাকে একটু বুঝিয়ে বল, আমি কিছুতেই এখন বিয়ে করতে পারব না।

আমি বললাম—কেন?

প্রকাশ গম্ভীর হয়ে বলে—বিয়ে করা আমার ঠিক হবে না অতনু। নতুন মা যে আমার সৎমা তা আমি ভুলেই গেছি। অনেক দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়ে, অনেক মারধর খেয়ে আমরা দুজন—মা আর ছেলে হয়েছি। আমার আর বেশি কিছু চাওয়ার নেই। অন্যের মেয়ে এসেই আমাদের সম্পর্কের ভিতর ফাটলটা খুঁজে বের করবে। সে আমাকে দখল করতে চাইবে মা'র কাছ থেকে। এইভাবে আমার মা আস্তে আস্তে সৎমা হয়ে যাবে। না অতনু, যতদিন মা আছে ততদিন বিয়েতে আমার কাজ নেই।

শুনে ভারী অবাক হলাম। আমি ভেবেছিলাম, প্রকাশ বিয়েতে আপত্তি করবে অন্য কারণে। সে বলবে রাজনীতিই তার প্রতিক্ষণের শ্বাসপ্রশ্বাস, ট্রেড-ইউনিয়ন করে বলে তার উন্নতি বন্ধ, তাছাড়া সে হয়তো পার্টির হোলটাইমার হয়ে একদিন বৃহত্তর রাজনীতিতে যাওয়ার চেষ্টা করবে, তাই বাধা পড়তে চায় না। তার বদলে প্রকাশ এ কী বলছে! আমার নিজের মাকে, কৈ এত ভালবাসতে পারি নি তো!

কিন্তু প্রকাশের বিয়ে ঠেকানো গেল না। মাসীমা জেদী বাচ্চা মেয়ের মতো মুখের ভাব করে বললেন - আমি মরে গেলে প্রকাশের আর কেউ থাকবে না। পরের মেয়ে ওর বৌ হয়ে আসবে বলে ও ভয় পায়। কিন্তু একজন পরের মেয়ে যে ওর মা হয়ে এসেছে তার বেলা?

খুব সাধারণ একটি মেয়ের সঙ্গে প্রকাশের বিয়ে হয়ে গেল। সে বিয়েতে প্রকাশ দানসামগ্রী প্রায় কিছুই নিল না। না ঘড়ি-আংটি-বোতাম না খাটপালঙ্ক। নিজের খরচে দীনভাবে বৌ-ভাত সারল। বরকর্তা হয়ে আমি খুব ছোটাছুটি করলাম। নেমন্তন্ন মিটতে খুবই রাত হয়ে গেল। তারপর একা আমি সিগারেট ধরিয়ে চুপ করে সামনের মাঠটায় গিয়ে বসলাম। অমনি মহাশূন্যের একটি নিস্তব্ধতার ঘেরাটোপ আমার চারধারে নেমে এল। তখন আমার ভরা যৌবন। টলটল ছলছল এক নদীর মতো আমার কূল ছাপিয়ে যাচ্ছে বানের জল। বড় একা লাগল। ভূতে-পাওয়া মানুষের মতো বসে বসে শুনতে লাগলাম আমার অবাধ্য হৃৎপিণ্ডের শব্দ পাল্টে যাচ্ছে।

পাণ্ডুর পাঁচ নম্বর ফেরীঘাটে আমাদের বাসায় যাওয়া হয় নি বহুকাল। মা চিঠি লিখছে বারবার, লোক পাঠাচ্ছে, মাঝে মাঝে টিফিন ক্যারিয়ারে চেনা গার্ড সাহেবের সঙ্গে পিঠেপায়েস তৈরী করে পাঠিয়ে দেয়! আমার যাওয়া হয় না। ইচ্ছে করেই যাই না। বুকে একটা খিচ ধরে মাঝে মাঝে। সব চেপেচুপে দাঁত টিপে নিজেকে সামলাই। কয়েকবছর আগে জলপাইগুড়ি কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেছিলাম। তারপর থেকেই ইচ্ছে ছিল, আইন পড়ব। উত্তর বাংলার কৃষি-আইন নিয়ে বিস্তর মাথা ঘামাতে হয়, জানতে হয় লেবার রেগুলেশনস্। ইচ্ছে ছিল, কলকাতায় গিয়ে পড়ব। সেটা হয়ে ওঠে নি। কয়েকটা ভূমি-সংক্রান্ত আইনের বই যোগাড় ছিল। সেগুলো দিনরাত পড়তাম, যেন কালই আমার পরীক্ষা। বস্তুতঃ কিছুই পড়া হত না। একা লাগত। একা একা দম বন্ধ হয়ে আসত মাঝে মাঝে। বার বার ঘর ছেড়ে মাঠেঘাটে বেরিয়ে পড়তাম। চিরকাল বাইরের টান আমার। মাঠ-ঘাট-জঙ্গলেই ভাল থাকতাম বেশি।

সেবার শীতকালে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। বীরপাড়ার কাছে এক ধানকলের মাঠে কৃষকদের সভা ছিল। যখন বীরপাড়ায় বাস থেকে নামলাম তখন শীতের বেলা দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। মাঠ-ঘাট থেকে দ্রুত রোদের চাদর গুটিয়ে নিচ্ছে আকাশ। বীরপাড়া থেকে মাইল খানেক দূরে সেই ধানকল। বাসস্ট্যান্ডের দোকানে এক কাপ চা খেয়ে, মেঠো পথে নেমে পড়লাম। চারদিকে ক্ষেত। ক্ষেতে ধানের গোড়া পড়ে আছে, শুকনো খড়ের গন্ধ। রবিশস্যের চাষ দিয়েছে কেউ কেউ। গাঢ় সবুজ হয়ে আছে ক্ষেত। মাঠ থেকে ভাপ উঠে আসছে, কুয়াশা জমছে। নীচু মেঘের মতো

boiRboi.net

ধোঁয়া জমে আছে এখানে সেখানে। চারদিকে অপার্থিব নির্জনতা। একা একা হেঁটে যেতে বড় ভাল লাগছিল। রাঙামাটির রাস্তা। গরুর খুরের ধুলো তখনো উড়ছে। কিন্তু কী এক কার্যকারণসূত্রে কোথাও কোনো লোক নেই, গরুবাছুর নেই, রাস্তায় নেই শিশুরা। শুধু মাথার ওপর দিয়ে সাঁই সাঁই পাখিরা উড়ে যাচ্ছে। রাস্তার পাশে গাছে গাছে তীব্র হুলুধ্বনির মতো তাদের শব্দ শোনা যাচ্ছে। চরাচরে কুয়াশার মেঘ, গাছগাছালিতে ঘনায়মান অন্ধকার, আর মাটির গন্ধ, শুকনো খড়ের গন্ধ। দূরে কোথাও পাতা জ্বেলে আগুন করেছে কেউ—সেই ঝাঁঝালো গন্ধ। অন্যমনে আমি হাঁটছিলাম।

সামনেই একটা ঘন ঝোপ, ঝোপের পাশ দিয়ে রাস্তাটা মোড় নিয়েছে। পড়ন্ত বেলায় সেই ঝোপটা তার দীর্ঘ ও গাঢ় ছায়া ফেলেছে রাস্তার ওপর। কোথাও কিছু ছিল না, হঠাৎ সেই গাঢ় ছায়াময় জায়গাটিতে পা দিতেই ধুলো থেকে ধুলোটে রঙের একটা সাপ পলকে ফণা তুলে দাঁড়াল। এত কাছে যে হয়তো বা তার ছায়া আমার গায়ে পড়েছিল, তার শ্বাস স্পর্শ করেছিল আমার শরীর। দুটি পুঁতির দানার মতো চোখ আমার ওপর স্থির, তার শরীরে একটা মৃদুমন্দ দোল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার শরীরে বর্ম নেই, হাতে নেই অস্ত্র। উদোম আকাশের নীচে, খোলা জায়গায় তার আর আমার মধ্যে একটুমাত্র শূন্যতার ব্যবধান।

ডুয়ার্সের মাঠে-জঙ্গলে সাপ আমি অনেক দেখেছি। কিন্তু এমন মুখোমুখী উদ্যতফণা প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো কখনো দেখা হয় নি। তখন আমার চারপাশে ঘনায়মান পড়ন্ত বেলার কুয়াশা, ফসল-কেটে নেওয়া মাঠ, কুয়াশার মেঘ ঝুলে আছে এখানে ওখানে, এক নির্জনতার ছায়াচ্ছন্ন কোণে সকলের অগোচরে সে আর আমি মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আছি। পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে লাভ নেই, পিছু ফেরার উপায় নেই, চোখ সরাতে পারছি না। অপলক চোখে তার দুই চোখে চেয়ে আছি। কেবল চার-পাশে পাখিরা চিৎকার করছে, ঝোপে ঝাড়ে মাঠে তাদের ঝগড়ার শব্দ, আমাদের চারপাশে কেবল পাখির ডানার আওয়াজ। একটু আগেই এই রাস্তা দিয়ে মানুষ হেঁটে গেছে, ফিরেছে গরুর পাল, রাখাল ফিরেছে, হাটুরেরা গেছে দল বেঁধে। তখন সাপটা কোথায় ছিল কে জানে। কে জানে, কী করে আমাদের এরকম দেখা হয়ে গেল। নইলে আমি আর সে—আমরা দুজন দুই আলাদা পৃথিবীর বাসিন্দা। কোথায় ছিলাম আমি। কত দূরে। ডুয়ার্সের চাষীদের সাথে, আমাদের জঙ্গলে, চা বাগানে। কত মিছিল মিটিং, আন্দোলন, ধর্মঘট, শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন দেখতে দেখতে জেগে পথ হাঁটা। বহু দূরে বিস্তৃত এক কর্মক্ষেত্র জুড়ে ছিল আমার ছড়িয়ে থাকা। আর সে তখন ঘাস ও তৃণভূমি ছেড়ে জলায়, কখনো ফসলশূন্য ক্ষেত পার হয়ে নাবালে তার সুন্দর পিছল শরীর নিয়ে নেমে গেছে, শরীর গুটিয়ে ঘুমিয়েছে গাছের ছায়ায়, ইঁদুরের সন্ধানে সতর্ক চোখে ফসলের ক্ষেতের ভিতরে গর্ত খুঁজে ফিরেছে, লাফ দেওয়া ব্যাঙকে শূন্য থেকে মুখে লুফে নিয়েছে। তার এক রকমের জীবন, আমার অন্যরকমের। কোথাও আমাদের দেখা হওয়ার কথা ছিল না। এই তো একটু আগে বাস থেকে নেমে কত নিশ্চিন্তে চায়ের দোকানে বসে এই শীতে আরামে এক কাপ গরম চা খেয়েছি। তার স্বাদ এখনো জিভ আর ঠোঁটে জড়িয়ে

আছে। তখন এই পথে হাটুরেরা হেঁটে গেছে, গেছে রাখাল, চাষী, গ্রামের শিশুরা ফিরেছে দূরের ইস্কুল থেকে। তখন কোথায় ছিল সে! এই গভীর শীতের শেষ বেলায় সে হয়তো তার গর্তের উষ্ণ আরামে শুয়ে ছিল। তবে কে আনল তাকে এই পথের ওপর। এই ঝোপের ছায়ায়, ধুলোয় সে কেন অপেক্ষা করে ছিল? আমারই জন্য কী?

আমার সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়েছে। কপালে ঘাম ফুটছে চিন্ চিন্। হাত-পা খিল ধরে শক্ত হয়ে আছে। বুঝতে পারি, একটা জীবন মানুষের জন্য আমার সব সংগ্রাম বৃথা গেছে। বৃথা হয়ে গেছে যৌবনের কূলে কূলে পরিপূর্ণ ঢল। বৃথা জন্ম, বৃথা ভালবাসা। হঠাৎ নেমে এল শূন্য মুহূর্ত। মূল্যবান—মহামূল্যবান কয়েকটি ক্ষণ মাত্র আছে আর—তাও বয়ে যাচ্ছে। এত সহজে মানুষ মরে যায়? এমন অগোচরে, অলক্ষ্যে, নিঃশব্দে? প্রতিবাদহীন এ আমার কেমন মৃত্যু হচ্ছে? এই গভীর শীতে কোথা থেকে এল সাপটা! কেনই বা?

মাথা থেকে সমস্ত স্মৃতি মুছে যায়, মুছে যায় স্বপ্ন। ভাষা ভুলে যাই, প্রিয়জনের মুখ মনে পড়ে না। শুধু সবিস্ময়ে দেখি জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে একটুমাত্র শূন্যতার ব্যবধান। আলো আঁধারময় সেই শূন্যতাটুকুই মাত্র আমার জীবন। অতি তুচ্ছ তা, মূল্যহীন। সতেজ সাপটি তার বুকের শাদাটুকু তুলে দাঁড়িয়ে আছে, পথ বন্ধ, সমস্ত সঞ্চিত বিষ সে তুলে আনছে মুখে, শিকড়ের মত তার জিভ লোভী আগ্রহে চেটে নিচ্ছে, শুষে নিচ্ছে তার ও আমার মাঝখানের শূন্যতাটুকুকে। সে দুলছে, সে আসছে।

আমার শরীর হাহাকার করে ওঠে। কত রহস্য অজানা রয়ে গেল পৃথিবীতে, জীবন ও মৃত্যুর অর্থ বোঝা গেল না, পথের মাঝখানেই ফুরিয়ে গেল পথ। কেন জন্মেছিলাম, কেনই বা মরে যাচ্ছি?

সাপটা দুলছে। শূন্যতাটুকু পার হয়ে আসছে সে।

হঠাৎ টের পাই, আমার জিভ নড়ছে, আমার ঠোঁট নড়ছে। চারদিকে শীতার্ত নির্জনতা। তার ভিতরে হঠাৎ শুনতে পাই অন্য মানুষের অচেনা কণ্ঠস্বর। কে যেন বলছে—দয়া করো। দয়া করো। দয়া করো···

আস্তে আস্তে বুঝতে পারি, এ আমারই গলা। আমার দুই হাত বুকের ওপর জড়ো হয়েছে কখন। জলে ভেসে যাচ্ছে আমার চোখ, গাল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা খসে যাচ্ছে পথের ধুলোয়। জলে আবছা চোখে অদ্ভুত দেখাচ্ছে চরাচর। আস্তে আস্তে আমি ধুলোয় পথের ওপর হাঁটু ভেঙে বসি। আমার কপালের সমান্তরাল সেই সাপটার শাদা বুক, তার ফণা, তার মিটমিটে চোখ। আস্তে আস্তে সেই ফণার সামনে নত হয়ে যাই আমি। অচেনা মানুষের গলায় বিকারগ্রস্তের মতো বলে যাই—দয়া করো। দয়া করো। দয়া করো·······

সাপটা স্থির হয়ে দাঁড়ায় কিছুক্ষণ। তার তীব্র শ্বাসের শব্দ ধীরে ধীরে কমে আসে। শ্লথ হয়ে যায় শরীর। ধীরে ধীরে সে মাথা নীচু করে আনে। আবার ধুলোয় মিশিয়ে দেয় মাথা। শেষ বেলার আলো মরে গেছে। ঝোপের ছায়াটা আরো গাঢ় হয়েছে। সে অবহেলায় আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে তার রহস্যময় আলাদা

জীবনের অন্ধকারে চলে যায়।

চারদিকে এক বিপুল মহাপৃথিবীর শূন্যতার মাঝখানে আমি বসে থাকি। পথের ধুলোয়। অনেকক্ষণ আমার কোনো চেতনা থাকে না। তখনো আমি বিড় বিড় করে কেবলই বলছি—দয়া করো। দয়া করো। দয়া করো ......

কিছুক্ষণ পরে চাষীদের সেই মিটিঙের কয়েকজন সভা ভেঙে ফেরার পথে আমাকে এই অবস্থায় দেখতে পায়। সাপের কথা শুনে আমার শরীরে তারা দাঁতের দাগ খুঁজল। এক চাষীর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে গরম লোহা দিয়ে নুন পুড়িয়ে খাওয়াল। টর্চ জেবলে পৌঁছে দিল বাসের রাস্তায়। বলল—শীতকালে সাপ বড় একটা দেখি না আমরা। ঐ শালা যে কোথা থেকে এল!

কোথা থেকে এল তা আমিও জানি না। কিন্তু এই ঘটনার পর থেকে আমি ধীরে ধীরে অন্যমনস্ক হয়ে যাই। মাঝে মাঝে অকারণে গা শিরশির করে, খেয়ে উঠে বমি পায়, ঘুমে দুঃস্বপ্ন দেখি। কেবলই মনে হয়, সাপটার কাছ থেকে পাওয়া ভিক্ষালব্ধ আমার এই জীবনটা যেন বা ঠিক আমার নয়। অতনু সেন নামে একজন বীরপাড়ার রাস্তায় সেই সন্ধ্যাবেলায় পথের ধুলোয় সর্পদষ্ট হয়ে পড়ে আছে। তার পরের এই যে আমি—এই আমি অন্য একটা লোক—ভিক্ষালব্ধ আয়ু পেয়ে বেঁচে আছি। আমি ঠিক অতনু নই।

চিন্তার স্রোত মাঝে মাঝে এলোমেলো হয়ে যায়। একা থাকতে ভয় পাই। রাতে যথার্থ ঘুম হয় না। কেবলই মৃত্যুর কথা ভাবি। এইভাবে আমার মেলাংকলিয়ার সৃষ্টি হয়। মাঝে মাঝে মনে হয়, মানুষের যে স্বার্থের সংগ্রাম চলেছে পৃথিবী জুড়ে, তার বাইরে পড়ে আছে এক রহস্যময় অচেনা জগৎ। তার খোঁজ আমি কখনো করি নি। মৃত্যুর অর্থ আমার অজানা রয়ে গেছে, কেন মানুষের জন্ম—তাও জানি না। ভিক্ষালব্ধ এই যে আমার দ্বিতীয় জীবন—এই জীবনটায় আমি সেইসব রহস্য মোচন করে যাবো।

বহুকাল বাদে পাণ্ডুর পাঁচ নম্বর ফেরীঘাটের বাসায় ফিরে আসি। সেই ব্রহ্মপুত্র বয়ে যাচ্ছে, ডাইনে নীলপর্বত, ওপারে আমিনগাঁওয়ের টিলার সৌন্দর্য, মালগাড়ি শান্টিঙের শব্দ, স্টিমারের ভোঁ। কিন্তু তবু ঠিক আগের মতো লাগে না। মনে হয়, সব অন্যরকম। ব্রহ্মপুত্রের দিকে চেয়ে নিরালা তীরে বসে থাকি। বীরপাড়ার সেই সন্ধ্যার দৃশ্যটি কত অসংখ্যবার ভেবেছি, তবু আবার ভাবি। কোন কার্যকারণসূত্রে সাপটা আমার পথের ওপর অপেক্ষা করে ছিল! কী করে আমার দয়াভিক্ষার ভাষা সে বুঝতে পেরেছিল! সেই সময়ে কে আমার মুখে ঐ কথা সঞ্চার করেছিল—দয়া করো!

সামাধান পাওয়া যায় না। অন্যমনে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে আসতে থাকি। শেষ বাংলো বাড়িটার লনে আগের মতোই 'নেট' টাঙিয়ে ব্যাডমিণ্টন খেলা হচ্ছে। খেলছে কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে। সেই মেয়েটি নেই। তারা দু'মাস আগে বদলী হয়ে গেছে বদরপুরে। দু'এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে খেলা দেখি। একটা শূন্যতা ভর করে মনের ভিতর। আর হয়তো দেখা হবে না। বাবা এক্সটেনশনে আছেন। সামনের বছর তাঁর রিটায়ারমেণ্ট। কলকাতার বেহালায় জমি কিনে রেখেছেন।

রিটায়ার করার পর বাড়ি তুলে চলে যাবেন।

দুপুরে মা ঘুমোতে পারে না। আমার পাশটিতে এসে বসে। বলে—অনু, তুই কী করবি? আমাদের সঙ্গে কলকাতায় যাবি না?

অন্যমনে বলি—দেখি।

মা শ্বাস ছেড়ে বলে—একটা জীবন তোকে কাছেই পেলাম না। আমার কোল-ছাড়া হয়ে কত দূরে চলে গেছিস। আমার যে একটা বড়সড় ছেলে আছে তা বুঝলামই না।

আমার ছোটো এক বোন, আর দুই ভাই। তাদের সঙ্গে বস্তুতঃ আমার তেমন পরিচয়ই নেই। দাদা বাড়ি এলে তারা কৌতূহলী হয়ে দেখে। কিন্তু বড় একটা কাছে ঘেঁষে না। ভয় পায়, সমীহ করে। আমার দুই দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। একজন দিল্লীতে, অন্যজন কলকাতায়। বহুকাল দেখা হয় নি। ছোটো বোনটার বিয়ের চেষ্টা চলছে।

বাবা ডেকে বললেন—অনু, পাত্রটি কেমন বুঝছো! অ্যাসিস্ট্যাণ্ট আই-ও-ডব্লিউ, বেশ স্মার্ট। বাড়ির অবস্থা……

শুনে যাই মাত্র। বাবা বিরক্ত হয়ে বলেন—কোনো বিষয়েই তোমার গা নেই। আমি এখন বুড়ো হয়েছি, বিয়ের খাটাখাটনি কি আমার পোষাবে। তুমি বড় ছেলে, সংসারের দায়িত্ব একটুও নিলে না। তোমার দুই দিদির বিয়েতে একবার উপস্থিতও থাকলে না। এসব কেমন দেখায় পাঁচজনের চোখে।

অপরাধী মুখ করে বসে থাকি।

বাবা বলেন—এই বিয়েটা আর ফাঁকি দিও না। অনুষ্ঠানে অনেক কাজ। এবরটা থেকো।

বললাম—থাকবো।

বিয়ের তিন দিন আগে আমার কলকাতার দিদি এল। সঙ্গে তার প্রফেসর বর। ভাবুক, অন্যমনস্ক মানুষটি। মেজদি তার বরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময়ে বলল—এই আমার ভাই, একজন হতে পারত এম-এল-এ। দেশোদ্ধারে ব্যস্ত ছিল বলে আমার বিয়েতে আসে নি।

জামাইবাবু মিষ্টি হাসলেন। বিয়ের সময়ে তিনি ছিলেন স্কুল মাস্টার, বিয়ের পর দিদির তাড়নায় এম-এ পাশ করে প্রফেসর হয়েছেন। দিদির সেই জন্য খুব অহংকার, জামাইবাবুরও দেখি দিদির ওপর খুব টান।

আমার দিল্লীর দিদি আসতে পারল না। তবু বেশ কিছু আত্মীয়স্বজন এল। বাড়ি গম্‌গম্‌ করে সব সময়ে। সারাদিন হাসি-ঠাট্টা চলে। আমাকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি। মেজদি, মা সবাই ঠাট্টা করে বলে—অঞ্জুর বড় ভাগ্য। একমাত্র ওর বিয়েতেই অনু বাড়িতে আছে।

পারিবারিক আবহাওয়া আমার ঠিক সহ্য হয় না। তবু কী কারণে যেন এই পারিবারিক সম্মেলনটি আমার বড় ভাল লাগছিল। মনে হচ্ছিল, অঞ্জুর বিয়ের পর এবার আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বোধ হয় একটু কষ্ট হবে।

বিয়ের আগের দিন। সোনার দোকানে তাগাদা দিয়ে, গৌহাটির পার্টি অফিসে

আড্ডা দিয়ে, মালিগাঁওয়ে রেল হেড্ কোয়ার্টার্সে দু'চার জন দলের লোকের সঙ্গে দেখা করে ফিরতে দুপুর হয়ে গেল। ফিরে অবাক হয়ে দেখলাম, সামনের বারান্দায় পাশাপাশি চেয়ারে অঞ্জু আর দুলু বসে আছে। সামনেই একটা সুটকেস আর বেডিং, তখনো তোলা হয় নি ঘরে। আমাকে দেখে দুলু উঠে দাঁড়াল তটস্থ হয়ে।

এক একটা সময় আসে যখন নিজেকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা বৃথা। নির্ভুলভাবে টের পেলাম, আমার হৃৎপিন্ডের শব্দ পাল্টে যাচ্ছে, বুকে একটা খিঁচ্ ধরছে হঠাৎ, কান মুখ ঝাঁ ঝাঁ করছে।

সম্ভবতঃ দুলুর এইসব দুর্বলতা নেই। তার বন্ধুর দাদা, আর রাজনীতিতে নামডাকওলা লোকটির প্রতি হয়তো তার সহজাত শ্রদ্ধা ছিল। আমি বারান্দায় উঠতেই সে আমাকে প্রণাম করল। পায়ে সামান্য স্পর্শ। সেই স্পর্শটুকু যেন আমাকে হাজার মাইল আনন্দে দৌড় করাতে পারে।

বন্ধুর বিয়েতে এসে সে চারদিন রইল আমাদের বাসায়। সেই চারদিন আমি তার কাছে ঘেঁষবার অনেক সুযোগ পেয়েছিলাম। নিই নি। কিন্তু আমার মন কাঁটার মতো ঘুরে ঘুরে একটা সিদ্ধান্তে স্থির হয়ে ছিল।

প্রায়দিনই মা আর মেজদি আমাকে বিয়ের কথা বলত। বিয়ের পরের পরদিন বাসা যখন অনেক ফাঁকা, এক দুপুরে আবার সেই কথা উঠল। মেজদিকে আড়ালে ডেকে বললাম—বিয়ে করব। দুলুকে বলু, ও যদি রাজি থাকে—

মেজদি একটা লাফ দিল আনন্দে। চেঁচিয়ে ডাকল—মা!

দৃশ্যটা আমি দেখেছিলাম। পরদিন বৌভাত, বৌভাতের নেমন্তন্ন খেয়ে তার পরের দিন দুলু চলে যাবে। বৌভাতের আগের দিন সন্ধ্যাবেলা একটা লুডো খেলার আসর বসেছিল। মা, দুলু, মেজদি ও আমার একজন পিসিমা। আমি বারান্দায় অন্ধকারে বসে আছি। বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। বাগানে ফুলের গাছগুলি ইকড়ি মিকড়ি ছায়া ফেলেছে। লুডোর আসর ভেঙে উঠবার সময়ে মেজদি দুলুর হাত ধরে টেনে বলল—চলো দুলু, বাইরে চাঁদ উঠেছে, একটু বাগান ঘুরে আসি।

ওরা আমাকে দেখতে পায় নি। বারান্দা পার হয়ে ওরা দু'জন বাগানে নেমে গেল। গেট্-এর কাছে দাঁড়াল। হাসি আর কথার শব্দ শোনা যাচ্ছে। তারপর একসময়ে মেজদি বলে—তোমার সঙ্গে কিন্তু একটা সিরিয়াস কথা আছে।

এই কথা বলে মেজদি ঝুঁকে কী একটু গোপনে বলল দুলুর কানে। হঠাৎ দেখি, দুলুর মাথা নুয়ে পড়েছে বুকের ওপর। একটু পরে আবার মুখখানা ধীরে ধীরে তুলল সে। জ্যোৎস্নায় ভাল দেখা যায় না, কিন্তু মনে হল, বোধহয় একটু হাসল।

বৌভাতের পর দুলু চলে গেল।

boiRboi.net

দিন সাতেক বাদে বাবা আমাকে ডেকে বললেন—বাসুবাবু আমাকে একটা চিঠি দিয়েছেন। তাঁর খুব ইচ্ছে তাঁর মেয়ে দুলুর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ করেন। আমি মত দিয়েছি।

আমি চুপ করে রইলাম।

বাবা বললেন—বাসুবাবুর ধারণা, তোমার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল, একদিন তুমি দেশের গণ্যমান্য মানুষ হবে। চিঠিতেও সেই কথা লিখেছেন। আর আমাদেরও সকলেরই দুলুকে পছন্দ।

আমি চুপ।

বাবা আমার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে কিছু বুঝবার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন—বিয়ের পর কী করবে ভেবেছো?

আমি মাথা নেড়ে জানালাম—না।

বাবা বললেন—ভাববার অবশ্য কিছু নেই। বিয়ে করতে আজকালকার ছেলেরা যত ভয় পায়, ব্যাপারটা আসলে তত ভয়ংকর নয়। তোমার কথা অবশ্য আলাদা। বিয়ে করা তোমার কাছে কোন সমস্যাই হওয়া উচিত নয়। তুমি রাজি থাকলে যখন যে কোন ফার্মে চাকরি পেতে পারো। এমন কি আমাদের রেলেই তোমার ভাল চাকরি হতে পারে। তুমি একটু রাজি হলেই হয়।

বাবার ধ্যানধারণা খুব সাধারণ মানুষের মতই। সুযোগ মত গুছিয়ে নাও। আর দেরি কেন! পলিটিক্স অনেক করেছো, এইবার কিছু ঘরে আনো।

বাবা অবশ্য অন্য কথা বললেন। একটু ভেবেচিন্তে বললেন—সামনের বছর আমি রিটায়ার করছি। তুমিও আমাদের সঙ্গেই কলকাতায় চল। তোমার ল' পড়ার ইচ্ছে ছিল, সেটা পড়ে নাও। তোমার পার্টির কাজকর্ম ওখানেও হতে পারবে। তারপর ওখানেই গুছিয়ে বোসো। তুমি কাছে থাকলে আমার একটা বল-ভরসা হয়। তোমার ছোটো ভাই দু'টি এখনো বলতে গেলে নাবালক। একটা জীবন তোমার জন্য দুশ্চিন্তা করে আমরা কাটিয়েছি। এই শেষ বয়সটা তুমি না হয় কাছেই থাকলে!

বললাম—ভেবে দেখি।

মনে মনে কেন যেন বুঝতে পারছিলাম, আমার জীবনে একটা পরিবর্তন আসছে। সেটা ভাল কি মন্দ কে জানে। ডুয়ার্স আমার এত চেনা, এত বেশি জানা, এত প্রিয়—তবু কেন যেন আর এখানে ভাল লাগছিল না। সমস্ত আসাম, উত্তরবাংলা, বিহারের কিছু অংশ, সিকিম, ভুটান, নেপাল জুড়ে আমি ঘুরেছি কম নয়, কাজও করেছি। তবু মনে হচ্ছিল, এখানে থাকলে ক্রমে আমি ঝিমিয়ে পড়ব। নতুন জায়গায়, নতুন মানুষদের মধ্যে গেলে বোধহয় আবার নতুন করে প্রাণ পাওয়া যাবে।

মাস ছয় পরে দুলুর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল।

boiRboi.net

ছয়

আমার নিজের বিশ্বাস, রাজনীতিতে আমি ইচ্ছে করে আসি নি। আমার ছিল বাউণ্ডুলের মতো বাইরের টান, আর মানুষ দেখার নেশা। ঐ দুই থেকে আমি রাজনীতিতে চলে এসেছি। প্রত্যক্ষভাবে দলের কাজে আমাকে টেনে নামিয়েছিল প্রকাশ। ফলে আমার স্বাধীন ইচ্ছেয় বাইরের জগতে ঘুরবার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, নষ্ট হয়েছিল মানুষ দেখার নেশা। ভিতরে ভিতরে তৈরি হয়েছিল ক্ষমতার লোভ।

বিয়ের কিছুদিন পরেই উত্তরবাংলায় দুটো বাই-ইলেকশন হল। তার একটাতে পার্টি আবার নমিনেশন দিল আমাকে। আমি নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেলাম। প্রকাশ আগের মত সব কাজ ছেড়ে চলে আসতে পারল না, কিন্তু তবু এল। মিটিং করল, ঘরোয়া সভায় বসল। কলকাতা থেকে দলের প্রাদেশিক সেক্রেটারি এসে ঘুরে গেলেন। যাওয়ার আগে আমাকে ডেকে বললেন—যদি আপার-হাউসে যেতে আপত্তি না থাকে তো বলুন। নেক্সট টাইমে—

আমি মাথা নাড়লাম। না। জেতার স্বাদ আলাদা। আমি জিততে চাই। এ নেশাটা ক্রমে ক্রমে আমার ভিতরে তৈরি হয়েছিল।

আমার প্রতিপক্ষ এবারেও শক্ত। লোকটার বিস্তর দান-ধ্যান আছে। একটা এলাকার উদ্বাস্তুদের জন্য সে করেছেও খুব। প্রতিপক্ষ আরো দু'জন ছিল। তারা ভোট ভাঙাতে দাঁড়িয়েছিল। দেখেশুনে এবারও প্রকাশ বলল—অতনু, তুই জিতবি না। পার্টি তোকে হারাতেই দাঁড় করিয়েছে।

—কেন?

—এমনি, মনে হল।

বুকটা দমে গেল খুব। পার্টির ওপর-মহলের সঙ্গে আমার মাখামাখি নেই। আমি চিরকাল তাদের মাঠ-ঘাটের কর্মী। কিছুটা অবাধ্য। কিন্তু একটা অংশের ওপর আমার প্রভাব বেশি। তারা আমাকে ঘাটাতে সাহস করে না। নমিনেশনও দেয়।

প্রকাশ বলল—অতনু, সময় থাকতে তুই নাম উইথড্র করে নে।

—কেন?

—পার্টিতে তোকে বেইজ্জত করার জন্যই নমিনেশন দিয়েছে।

আমি চুপ করে রইলাম।

প্রকাশ বলল—পর পর দু'বার হেরে গেলে পাবলিক ইমেজ নষ্ট হয়ে যাবে। এর পরের বার তোকে নমিনেশন না দিলে কারো কিছু বলার থাকবে না। তোর

boiRboi.net

রাইভ্যাল রাঙাবাবু কত টাকা ঢালছে দ্যাখ। কুলী বস্তিতে হাঁড়িয়ার বান বয়ে যাচ্ছে, রিফিউজি কলোনীতে ইলেকট্রিফিকেশনের জন্য দেড়শো খুঁটির দাম দিচ্ছে রাঙাবাবু। রাস্তা মেরামত হচ্ছে, রাঙাবাবুর তিনটে লরী ফেলছে মাটি আর কাঁকর। আর তুই কেবলই ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা নিয়ে আছিস, মিটিং করে বলছিস আদর্শের কথা। পার্টি টাকা ঢালছে না কিছুই, তোরও টাকা নেই। উত্তর বাংলার মানুষ এখনো বড় গরীব, তারা টাকাটা চেনে।

আমি যে জানি না তা নয়। তবু কেন জানি না, কবে থেকে যেন বুকের ভিতরে আমার অলক্ষ্যে জমে উঠেছে লোভ।

সেই রাত্রে একা একা অনেকক্ষণ বিছানায় জেগে শুয়ে রইলাম। দলছুট যখন ছিলাম তখন আমার অকারণ আনন্দ ছিল, ছিল মানুষের প্রতি পক্ষপাতহীন ভালবাসা। আমি মাঠে-ঘাটে মুক্তির আনন্দে ঘুরে বেড়িয়েছি। তখন আমার প্রতিপক্ষ ছিল না কোন মানুষ, কোন দল, কোন মতবাদ। আমি তখন কত ভাল ছিলাম। ক্রমে রাজনৈতিক শিক্ষা, মতাদর্শ আমার বাহুল্য আবেগগুলো ছেঁটে কেটে ফেলে দিল, হরণ করল আমার নিরপেক্ষ ভালবাসা। তৈরি করল প্রতিপক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বী। মানুষের প্রবহমান ধারাটি আমার চোখে কবে যেন খণ্ডিত হয়ে গেছে।

গভীর রাতে বিছানা ছেড়ে উঠে দরজা খুললাম। বাইরে অন্ধকার। অদূরে চা-বাগানের তেজা তীব্র মাদকতাময় গন্ধ নাকে এল। আমার অনেক কালের চেনা গন্ধ। গাছগাছালিতে বাতাসের শব্দ। মনে হল, চলে যাই। আর একবার পুরনো অতনু সেন হয়ে চলে যাই মানুষের কাছাকাছি।

আবার ফিরে এসে শুই। বহুদূরে, পাঁচ নম্বর ফেরীঘাটের বাসায় দুলু অপেক্ষা করে আছে। বড় আশা তার স্বামী এম-এল-এ হবে। একদিন হয়তো বা হবে মন্ত্রী, দেশের অন্যতম প্রধান। সেই আশায় সে আজ বিছানার শূন্য অংশটিতে তার হাতখানা বাড়িয়ে রেখেছে। ঐ হাতে সে আমাকে জড়িয়ে রাখে নি। রাখলে ভাল করত।

নির্বাচনের শেষ ক'টা দিন আমি আর তেমন ঘুরলাম না। যেটুকু না হলে নয় সেটুকুমাত্র কাজ করলাম। সেই কবে ছেলেবেলায় ফুটবল মাঠে বাবার আধখাওয়া লেমনেডের বোতল মুখে দিয়ে জীবনের তিক্ত স্বাদ পেয়েছিলাম, টের পেলাম—আবার সেই তিক্তস্বাদে আমার শরীর ভরে গেছে।

ভোট হয়ে গেল। আমি অনেক ভোটে হেরে গেলাম।

আমার বাবা আর শ্বশুরমশাই হতাশ হন। আমার বৌ দুলু একটু গম্ভীর হয়ে যায়।

আমি পার্টির মেম্বারশিপ ছেড়ে দিলাম।

বেহালায় আমাদের বাড়িটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমরা সেই বাড়িতে চলে গেলাম।

boiRboi.net

সাত

বন্ধুগণ, বিপ্লবের অর্থ প্রতি বছর একবার করে পাল্টায়। তবু নেশা যায় না। কারো কারো রক্তে রাজনীতির নেশা থেকে যায়। পোকার মত কেটে কেটে ক্ষয় করে মানুষটাকে।

উত্তর বাংলার এক চা বাগানের মালিক বিপদ বুঝে আমাকে খুশি করার চেষ্টায় ছিলেন। কলকাতায় তাঁর অন্য কারবার ছিল। আমি পার্টি ছেড়ে কলকাতায় চলে আসছি শুনে তিনি আমাকে ডেকে তাঁর কলকাতার কারবারে আমাকে লেবার অফিসারের চাকরি দিতে চাইলেন। আমি স্বভাবতঃই সে চাকরি প্রত্যাখ্যান করি।

শুনে বাবা খুব রেগে গেলেন। বললেন—তুমি পার্টি ছেড়েছো, এখন কে তোমাকে মূল্য দেবে? যেটুকু সুযোগ ছিল তা কাজে লাগালে না, তোমার মত এমন বোকা কেউ আছে? পার্টি না ছাড়লে কোনদিন হয়তো বা অ্যাসেম্বলিতে যেতেও পারতে—

আমার বৌ দুলু বাইরে কখনো রাগ দেখায় না। এখনো তার মুখ তেমনই লাবণ্যে ঢল ঢল করে। কৈশোর ছেড়ে সে ক্রমে যৌবনের ভর-ভরাট চেহারা নিয়েছে। তবে তার মুখের হাসি কমে এসেছে। সারাদিন সে ঘরের কাজ করে, কথা বলে কম। ক'দিন আগেও শ্রমিক, চাষী, শিক্ষকদের নিয়ে মিটিং করে, রাত জেগে বই পড়ে, বহু দূরে দূরে সংগঠন করে ফিরেও তার মুখে হাসি আর অভিমান দুই-ই দেখেছি। এখন সে হাসে কম, অভিমান করেই না। নীরবে শরীর দেয়। কলকাতায় এসেই সে কলেজে ভর্তি হল। সকাল-বিকেল দুটো অল্প টাকার টিউশনি শুরু করল। সে বুঝতে পেরেছিল অকর্মণ্য লোকের স্ত্রী হয়ে থাকতে গেলে সংসারে তার আদর হবে না। সকলের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই সে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল।

আমিও দুটো টিউশনি করি। সকালের ল' কলেজ করি। সারাদিন ইউনিভার্সিটি ক্যান্টিনে ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেদের সঙ্গে বসে থাকি। দু'চার দিনের মধ্যেই আমার নাম ছাত্রমহলে ছড়িয়ে পড়ে। ল'কলেজে তখন ছাত্রদের দুটো দল। একটা দলের খুব রবরবা, অন্যটা টিম্‌ টিম্‌ করে চলছে। দুটো দলকে যাচাই করে আমি দ্বিতীয় দলে যোগ দিই। তারপর ভূতের মত খাটতে থাকি ইউনিয়ন ইলেকশনে। রাত জেগে পোস্টারের বয়ান লিখি, বক্তৃতার খসড়া তৈরি করি, দিনে বক্তৃতা দিই, ঘরোয়া সভা করি, অন্য দলের ছাত্র ভাঙাই। এসব কাজ আমার কাছে ছেলেখেলার মত লাগে। তবু সেই ছেলেখেলার মধ্যেও মৌতাত জমতে থাকে। তার ওপর আমার গ্ল্যামার তো ছিলই। আমি রাজনীতি করা লোক, বিধানসভার নির্বাচনে দু'বার নমিনেশন-পাওয়া। ছাত্র-ছাত্রীরা আমার পিছনে ঘোরে।

ইলেকশনে সেবার দ্বিতীয় দলটা রৈ-রৈ করে জিতল। আমি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেনারেল সেক্রেটারি হলাম। ফলে ছাত্রদের এই দলের পিছনে যে রাজনৈতিক দলটি ছিল তার সঙ্গে আমার অনায়াসে যোগাযোগ হয়ে গেল। আমি বছর দুয়েকের মধ্যে মেম্বারশিপ পেয়ে গেলাম।

তারপর আবার নেশা। আইন পাশ করে আমি সম্পূর্ণভাবে পার্টির কাজে নেমে গেলাম। এ দল আমার আগের দলের চাইতে অনেক বড়। প্রায় একটি সর্বভারতীয় দল। আন্তর্জাতিক দলের শরিক। ফলে কর্মীর সংখ্যা অনেক বেশি, ভাল কর্মীর অভাব নেই। এই দলে প্রাধান্য পাওয়া শক্ত। তবু কলকাতা এবং চব্বিশ পরগণায় ধীরে ধীরে আমার আন্তরিক কাজ স্বীকৃতি পেতে লাগল, প্রায় সারাদিন পার্টি-অফিসে পড়ে থাকি। কল-কারখানায় ট্রেড-ইউনিয়নের সঙ্গে কাজ করি। ছোটো-বড়ো সভায় বক্তৃতা করার সুযোগ জুটে যায়। মাঝে মাঝে খবরের কাগজে নাম বেরোয়। পুলিশের খাতায় নাম ওঠে। রাজভবনের সামনে কর্ডন ভেঙ্গে একবার গ্রেপ্তার হই। আর একবার খাদ্য আন্দোলনে।

বাবার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। ভাই দুজনের একজন বি-এ, অন্যজন বি-কম পাশ করে বসে আছে। কিংবা ঠিক বসেও নেই। একজন একটা ক্ষীয়মান পাবলিসিটি ফার্মে কপি লিখে আশি টাকা রোজগার করে, অন্যজন একটা সিনেমা কাগজে বিজ্ঞাপন যোগাড় করে সামান্য কমিশন পায়। দুলু বি-এ পাশ করে বি-টি দিল নিজের চেষ্টায়। পাশ করে স্কুলের একটা চাকরির জন্য ছোটাছুটি করতে লাগল। আমাদের তখন দুটো বাচ্চা হয়েছে। বড়টা মেয়ে, ছোটোটা ছেলে। তাদের ভবিষ্যৎ ভেবে দুলুর চোখে ঘুম নেই। একটা চাকরি তাকে পেতেই হবে। আমার টাকা ছিল না, কিন্তু প্রভাব ছিল বেশ। সেই জোরে বেহালার একটা স্কুলে দুলু চাকরি পেল। রাত জেগে, খেটে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে এম. এ. দিল। পাশও করল। সকাল-বিকেল ছাত্রী পড়াতে লাগল। জেদের বশবর্তী হয়ে সে আর একবার এম. এ. দিল অর্থনীতিতে এবং ভাল সেকেণ্ড ক্লাশ পেয়ে গেল। তিন-চার বছরের মধ্যেই সে হল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমিস্ট্রেস। শিখল অঙ্ক, মৌখিক ইংরিজি, সাধারণ বিজ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার জোরে বাড়ীর বারান্দায় একটা টিউটোরিয়ালও খুলল। পরের বছর সেই টিউটোরিয়ালের ছাত্রী-সংখ্যা পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেল। প্রতিজন মাথা পিছু কুড়ি টাকা—এই হিসাবে দুবেলার টিউটোরিয়াল থেকে দুলুর মাসিক আয় দাঁড়াল হাজার টাকা। অবশ্য এর জন্য তাকে খাটতে হত প্রচুর। আমার অবসর থাকলে আমি, বাবা এবং আমার ছোট ভাই দুলুকে সাহায্য করতাম। সেই টিউটোরিয়াল এবং দুলু-ই তখন আমাদের পরিবারে একমাত্র ভরসাস্থল। আমরা সবাই এই দুটিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতাম। আমার দল আর একবার আমাকে নমিনেশন দেওয়ার কথা ভাবছে তখন। দুলু যখন ধীরে ধীরে দুই পায়ে দাঁড়াচ্ছে, দাঁড় করিয়ে রাখছে সংসার, তখন অন্য দিকে আমি ডুবছি। দল বদল করার ফলস্বরূপ শেষ পর্যন্ত আমাকে নমিনেশন দেওয়া হল না। আমি ঝিমিয়ে পড়লাম।

দুলু আর আমি তখন এক ঘরে দুই খাটে শুই। অনেক রাত জেগে দুলু

পরীক্ষার খাতা দেখে, শক্ত অংক কষে, প্রশ্নের উত্তর লিখে রাখে, প্রকাশকদের নির্বন্ধে নোটবই লিখে দেয়। শুয়ে থেকে দেখি টেবিলল্যাম্পের আলো ওর ভারী চশমায় ঝিকিয়ে উঠছে। বড় ভয় করত দুলুকে। কতকাল ওর শরীর ছোঁয়া হয় নি! ও যে আমার বৌ তা প্রায় ভুলে গেছি। দেখতাম, দুলু তখনো শ্রীময়ী আছে, বরং বয়সের সাথে সাথে ওর চরিত্রের দৃঢ়তা, গাম্ভীর্য আর জেদ ওকে আরো সুন্দর করেছে। আত্মপ্রত্যয় মানুষকে সুন্দর করে। অন্যদিকে নিজের মুখখানা কল্পনা করি, মাথায় অল্প টাক, ভাঙা মুখ, অগভীর, চিন্তাকুটিল চোখ। হীনমন্যতার দরুন দুলুর কাছাকাছি যাওয়ার সময় হত না। দুলু কত রাত কেঁদে বালিশ ভিজিয়েছে। আর এখন রাজনৈতিক হতাশায় ক্লান্ত আমি দুলুর দিকে চেয়ে থাকি। আমার ভিতরে এক পুরুষ জেগে ওঠে। কিন্তু বড় ভয় করে দুলুকে। অনেক রাত পর্যন্ত লেখাপড়া করে ও ওর ছেলে-মেয়ের পাশে শুয়ে পড়ে। একবারও আমার বিছানার দিকে চেয়ে দেখে না। দিনের পর দিন কথা বলে না দুলু, সময় হয় না। আমি চেয়ে দেখি, সেই মধ্যযৌবনে আমার ব্যর্থতায় হতাশ হয়ে সেই যে গাম্ভীর্যের ছাই মেখেছিল দুলু, আজও সেই ছাই তাকে সন্ন্যাসিনী করে রেখেছে। বাড়ির সবাই তাকে ভয় পায়। বাচ্চারা তার সামনে কাঠ হয়ে থাকে। ছাত্রীরা টুঁ শব্দ করতে সাহস পায় না। বুঝতে পারি, ব্যক্তিত্বময়ী মধ্যযৌবনা দুলুকে আমিও ভয় পাই।

অভ্যাসবশতঃ আমি তখনো সকালে বেরিয়ে যাই। বিভিন্ন আড্ডায় ঘুরি, পার্টি-অফিসে সময় কাটাই, এক বন্ধুর দোকানে বসে থাকি। দুপুরে এসে খেয়ে আবার বেরোই। কখনো-সখনো ঘরোয়া মিটিং কি জনসভা হয়, সেই পুরনো বিপ্লবের কথা বলি—যার অর্থ তখনো আবছা। কাগজে ছোট্ট করে কখনো-সখনো নাম বেরোয়। কিছু ছেলে-ছোকরা তখনো আশে-পাশে ঘুর ঘুর করে। তাদের তালিম দিই, পথসভা করাই, কিন্তু বুঝতে পারি, একটা জীবন শেষ হয়ে এল, বিপ্লবের অর্থ বোঝা গেল না। না যাক, ক্ষতি নেই। এবার অন্ততঃ একবার নিজের কাছে ফিরি। বাবার দুঃখ দেখে পৃথিবীর দুঃখমোচন করতে গিয়েছিলাম। সেই দুঃখের পাহাড় আমাকে ঠেলে দিয়েছে এবার। একটা জীবন আমি কম খাটি নি। কিন্তু বয়স এবং হতাশার ভার আছে, আছে গৃহপালিতের মত ব্যক্তিগত দুঃখগুলি। একবার খোলামেলা মন নিয়ে নিজের কাছে বসা ভাল। নিজের ক্ষতস্থানের পরিচর্যা আর আমি কবে করব! দুলু আর আমার দিকে ফিরেও চায় না। বাবা-মা এক-আধবার চেয়ে দেখে। ছোট ভাই সমীহ করে বরাবর দূরত্ব রেখে চলে। আমি রাতের ঢেকে-রাখা খাবার একা বসে খাই। সারাদিন চা আর সিগারেটের ফলে শরীরে ঢক্ ঢক্ করে অম্বল। খেতে পারি না, অর্ধেকের বেশি ভাত পাতে পড়ে থাকে। কেউ লক্ষ্য করে না। রাতে শুয়ে থেকে দূর থেকে দুলুকে দেখি, শরীরে পুরুষ জেগে ওঠে। নিপুণ সাপুড়ের মত সেই উদ্যত পুরুষকে ঝাঁপিতে ভরে রাখি। তারপর ঘর অন্ধকার হয়ে গেলে মশার শব্দের মত আমার নানা ব্যর্থতার চিন্তা বিন্ বিন্ করে সারা মাথায় ঘোরে। এক একদিন পেটে একটা উৎকট ব্যথা হয়, মাঝে মাঝে বমি পায়। মাথা ঘোরে, শরীর দুর্বল লাগে

অভ্যাসবশতঃ কাউকে কিছু বলি না। কিন্তু রাত্রে মাঝে মাঝে উৎকট ব্যথায় কঁকিয়ে কঁকিয়ে উঠতাম, তারপর বালিশে মুখ গুঁজে চাপা দিতাম শব্দটা। দুলু টের পেত কিনা জানি না। টের পেলেও উঠে আসত না। আমার সঙ্গে বিবাহিত জীবন যাপন করে স্বভাবতই সে একটু নিষ্ঠুর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেজন্যে আমার অভিমান ছিল না। কারণ, রাজনৈতিক জীবনের ব্যর্থতার তীব্রতর অভিমান এইসব ছোটখাটো ভাবপ্রবণতাকে ঠেকিয়ে রাখত। দুলু উঠে আসত না, আমি ব্যথা চেপে শুয়ে থাকতাম। হয়তো দুলুরও ঘুম হত নিঃসাড়ে। সারাদিনে তারও তো খাটা-খাটনি কম ছিল না!

রবিবার রান্নাঘরের ভার নিত দুলু। ঐ তার একটা শখ। ছুটির দিন সে তার পছন্দমত খাবার রান্না করত। কখনো শুঁটকী মাছ, কখনো তেল-কৈ, কি পোস্ত-চচ্চড়ি। জলখাবারও করত সে-ই। সেদিন রান্নাঘরে কেউ বড় একটা যেতে সাহস পেত না। আমি বরাবর দেরিতে উঠি, আমি উঠলে আমাকে আমার চা দেওয়া হয়। কিন্তু রবিবার দুলু তার নিয়মে সংসার চালায়। সকালে চায়ের পাট চুকে যায়। রবিবারে আর চা হয় না। তাই আমাকে লুঙির ওপর শার্ট চাপিয়ে ঋন্টুর দোকানে যেতে হয়।

সব দিন সমান যায় না। একটা রবিবার সকালে উঠে আমার শরীর খুব দুর্বল লাগছিল। সারারাত জেগে থেকে সকালের দিকে ঘুমিয়েছিলাম। সেই শরীরে বাইরে যেতে ইচ্ছে করছিল না আমার। ঘরে বসে এক কাপ চা খেতে ইচ্ছে করছিল। দুলুর সঙ্গে বহুদিন হল কথা নেই। সেই সকালে ইচ্ছে হচ্ছিল একটু কথা বলি। রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম—এক কাপ চা দেবে?

দুলু তার গম্ভীর মুখ ফিরিয়ে আমাকে একবার দেখল। আমি মুষড়ে পড়লাম। দুলু আস্তে করে বলল—চায়ের দোকানের অভাব নেই। আমি ভাত চাপিয়েছি, নামালে নষ্ট হয়ে যাবে।

চলে এলাম। মাথা ধরেছিল খুব। সকালে চা না পেলে এরকম হয়। জামাটা গায়ে চড়িয়ে বেরোতে যাচ্ছি, দেখি, আমার দু'টি ছেলেমেয়ে সিঁড়ির কাছে মুড়ির বাটি হাতে বসে আছে। আমার মেয়ে ঝিমলির বয়স বছর সাতেক, ছেলে তিতুর বছর সাড়ে চার। সংসারে তখনো এ দু'টি প্রাণীর কাছে আমার কিছু মূল্য ছিল। খুব সাবধানে, মায়ের চোখের আড়ালে, তারা আমার কাছে আসত। তাদের প্রিয় ছিল তাদের ব্যর্থ বাবা। আমি তাদের কতবার উত্তর বাংলার জঙ্গলে বাঘ দেখার গল্প বলেছি, বলেছি সিকিমের পাহাড়ের গল্প, চা-বাগানের কুলি-কামিনদের গল্প। সেই সব গল্প আর কেউ কখনো শুনতে চায়নি, আমিও কাউকে বলি নি। নইলে উত্তর বাংলার পাহাড়ে-জঙ্গলে যে-সব দিন আমি কাটিয়েছি, তার কিছু বলার মত গল্প ছিল। একবার জীপ উল্টে আমি প্রায় ত্রিশ ফুট নীচে গড়িয়ে যাই, আর একবার ঝড়ে গাছ পড়েছিল আমার মাথার ওপর। আমার এই দুই প্রায়-নিশ্চিত অপঘাতের কথা কখনো কাউকে বলা হয় নি। জিজ্ঞেসও করে নি কেউ। সে-সব গল্প জানে কেবল ঝিমলি আর তিতু। তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রায় বন্ধুর। বাচ্চা তিতু আমাকে দেখলেই উঠে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতখানা পিছনে নিয়ে

গম্ভীরভাবে আমার বক্তৃতা নকল করতে থাকে, 'বন্ধুগণ, আজ এই সভায় ....' ইত্যাদি। ঝিমলি তাকে ধমকায়—'অ্যাই, বাবা গুরুজন না!' আমি তাদের সামলাই। আমাকে নিয়ে কেউ একটু-আধটু ঠাট্টা করলে তখন আমার খারাপ লাগে না। বস্তুতঃ কেউ আমার দিকে করুণ চোখে চেয়ে থাকে, এটা আমি চাই না। তার চেয়ে ঠাট্টা বরং ভাল। কিন্তু মায়ের সামনে তারা আমার দিকে তাকায়ও না। মায়ের বারণ আছে বোধহয়।

সেই রবিবার সকালে হতাশ মন আর ক্লান্ত শরীরে চায়ের দোকানে বেরোবার মুখে দুই শিশুমুখ দেখে থমকে দাঁড়ালাম। সকালের রোদে তারা মুখ তুলে ঝকমকে দাঁত দেখিয়ে নীরবে হাসল। বাবাকে তারা ভালবাসে। তারপর সতর্ক চোখে চারদিকে দেখে নিল। আমিও হাসলাম। তারপর অবসন্ন শরীরে বসলাম তাদের কাছে। সিঁড়ির শেষ ধাপটায়। তিতু উঠে দাঁড়াল। হুবহু আমায় নকল করে বলতে লাগল—বন্ধুগণ, আজকের এই সভায়—

চিড়িক করে মাথায় একটা বদ মতলব খেলে গেল।

তিতুকে দু'হাতে জড়িয়ে বুকে টেনে নিয়ে বললাম—বাবা, আজ একটা নতুন খেলা খেলবে?

—কী খেলা?

—চল, একটা মিছিল বের করি।

তারা দু'জন দু'জনের দিকে চেয়ে হাসল।

ঝিমলি তার চুলের ঝাপটা সরিয়ে বলল—কিসের মিছিল বাবা?

আমি হাসলাম—ভুখ্‌খো মিছিল। তোমার মা আমাকে আজ চা দেয় নি।

কয়েকটা পুরনো জুতোর বাক্সের পিচবোর্ড কাটা হল, তাতে লেখা হল স্লোগান—বাবাকে চা দিতে হবে। আমাদের দাবি মানতে হবে। নইলে গদী ছাড়ো। ইত্যাদি। কাঠিতে সেই প্ল্যাকার্ড উঁচু করে ধরে আমাদের তিনজনের ছোট্ট মিছিল ধ্বনি দিতে দিতে রান্নাঘরের দিকে এগোচ্ছিল। মা বেরিয়ে এসে বললেন—এ কী?

তারপর সবাই হেসে খুন।

রান্নাঘরে দুলু তখন গনগনে আঁচের মত লাল হয়ে ভাতের ফ্যান গালছে। উনুনে চেপেছে মাংসের হাঁড়ি, আওয়াজ শুনে মুখ তুলে অনেকক্ষণ হাঁ করে রইল। আমরা নীরবে তিনজন দরজা জুড়ে দাঁড়ালাম। হাতে প্ল্যাকার্ড। বহুকাল দুলুর সঙ্গে এরকম ঠাট্টা করা হয় নি। তাই ঠাট্টাটা ধরতে দুলুর সময় লাগল।

বুঝে খুব ক্ষীণ একটু হাসল সে। ছেলেমেয়েদের দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে বলল—এসব শিখতে হবে না। বরং কাজ করতে শেখো। নিষ্কর্মারাই মিছিল মিটিং করে।

তারপর একটু ভেবে বলল—আচ্ছা যাও, তোমাদের দাবি আমি মেনে নিলাম।

নিজের ঘরে এসে একা বসলাম। একটু পরে দুলু নিজেই চা নিয়ে এল। চা দিয়েই চলে গেল না। একটু দাঁড়িয়ে থাকল। বলল—লিকার পাতলা করেছি।

বললাম—ঠিক আছে।

আবার একটু চুপ করে থেকে বলল—নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা করতে তোমার লজ্জা করে না ?

—ঠাট্টা কিসের ?

—ঠাট্টা নয় ! মিছিল তো তোমার প্রাণ। তুমি তো কেবল বোঝ মানুষের মুক্তি-যুদ্ধ মানেই মিছিল করা, বিপ্লবের পথও ঐ মিছিল। তবে সেই মিছিলকে নিয়ে ঠাট্টা কেন ?

চুপ করে রইলাম।

চলে যাওয়ার আগে দুলু বলল—ছেলেমেয়েদের ওসব শিখিও না। ওরা যখন বড় হবে, তখনকার সময়ে তোমাদের এই মিছিলের ধাপ্পা আর চলবে না।

বলে, চলে গেল দুলু।

আমি একটুও রাগ করলাম না। মিছিলের ভাবপ্রবণ দিকটা নিয়ে তখন আমিও ভাবি। সারাজীবন মিছিল মিটিং করা ছাড়া লোকশিক্ষার জন্য আমরা তো আর তেমন কিছু করি নি। সত্যিকারের কর্মঠ লোকের ন্যায্য দাবি উপেক্ষিত হয় না। দুলু নিজেই তার প্রমাণ। আর আমার ব্যর্থতাই প্রমাণ করে যে, আমি ভুল পথে চলেছি এতকাল।

দুলুর ওপর তাই রাগ করার কিছু নেই। বরং দীর্ঘকাল পর দুলুর নিজের হাতে করা চা-টুকু আমি বেশ উপভোগ করছিলাম।

সেদিন যথারীতি দুপুরের খাবার হয় নি। অনেক রাত পর্যন্ত মাংসের ঢেঁকুর উঠল। পেটের উৎকট ব্যথাটা উঠল চাগিয়ে। বালিশে মুখ চেপে ধরে অস্ফুট আর্তনাদ করছি, হঠাৎ টের পেলাম ওপাশের বিছানা থেকে মশারি তুলে দুলু বেরিয়ে এল। পরমুহূর্তে চুড়ি আর শাড়ির শব্দ করে, একঝলক মারকোলাইজড ওয়াক্স-এর সুগন্ধ ছড়িয়ে দুলু আমার বিছানায় ঢুকে এল। হাত বাড়িয়ে আমার মাথা ছুঁয়ে বলল—কী হয়েছে ?

—কিছু না।

—কিছু না ? বলে দুলু আমার চুলের মুঠি আলতো চেপে ধরে মাথাটা ঘুরিয়ে মুখোমুখি তাকাল। কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছি না আবছায়ায়। কিন্তু দুলুর মুখখানা আমার মুখস্থ, যেন দেখতে পাচ্ছিলাম, অভিমানে তার নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে, কাঁপছে ঠোঁট, চোখ নিষ্পলক হয়ে আছে। এরকম দেখতে দেখতে আমি ব্যথা ভুলে দু'হাত বাড়িয়ে দিলাম। আমার ভিতরকার পুরুষটি জেগে উঠল। দুলুও বাধা দিল না। কিংবা দিয়েছিল হয়তো, আমি বুঝতে পারি নি।

দীর্ঘকাল পরে আমি দুলুর স্বাদ নিলাম। আমাদের মাঝখানের বাঁধ ভেঙে গেল। পর পর কয়েকদিন দুলু আদর করতে করতেও আমাকে গাল দিত—অপদার্থ বাউণ্ডুলে, ছোটলোক—

কিন্তু সেই গালাগালের মধ্যেও তীব্র আশ্লেষ ছিল। তখন যৌবনের শেষ ঢল ভাঁটিতে নেমে যাচ্ছে। পিছল মাটিতে দাঁড়িয়ে আমরা পরস্পর টাল সামলে নিচ্ছিলাম। দুলু বলত—এটা কীরকম দাবি আদায় ?

কয়েকদিন পর দুলু তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য ফিরে পেল আবার। তবে

boiRboi.net

সম্পর্কটা তেমন শুকনো রইল না। মাঝে মাঝে আমার দিকে চেয়ে দেখত। কখনো বলত—চুলগুলো বড় হয়েছে, ছেঁটে এসো। কখনো ঝিমলিকে বলত—সন্না দিয়ে তোর বাবার সামনের পাকাচুলগুলো তুলে দে তো। সপ্তাহে এক-দুই দিন অন্ধকার আবছায়ায় আমার বিছানায় আমরা পরস্পর কাছে থেকে দেখতাম।

মাস দুই পর এরকমই এক আবছায়ায় আমাদের দেখা হলে দুলু খুব গম্ভীর তেতো গলায় বলল—আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।

চমকে উঠে বলি—কীরকম?

সে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল—বোঝ না? সর্বনাশ তো তুমিই করেছ!

আমি বুঝলাম। বললাম—তুমি তো ছেলেমানুষ নও। জেনেশুনেই যা করার করেছ। এতে সর্বনাশের কী? আর একটা বাচ্চা কি হতে নেই?

দুলু ঝেঁঝে উঠল—না, হতে নেই।

—কেন?

—এই বুড়ো বয়সে লোকে কী বলবে।

—তোমার কি খুব বয়স হয়ে গেছে?

—হয়েছেই তো। আমার সারাদিনে দম ফেলার সময় নেই, দেখছ না? এতসব সামলে এসব ঝামেলা কে পোয়ায়। আমি পারব না।

আমি চুপ করে ওর মেরুদণ্ডের ওপর হাত বুলিয়ে দিলাম।

এ একটু চুপ করে থেকে বলল—তাছাড়া, ছাত্রীদের সামনে বেঢপ পেট নিয়ে ঘোরা—মাগো, সে আমি পারব না। লজ্জায় মরে যাব।

—কেন মিস্ট্রেসদের বাচ্চা হয় না?

—হোক গে। আমি পারব না। তোমার কী, হওয়ার যে কী কষ্ট তা তুমি কী বুঝবে! আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে চল কাল সকালেই। আমি এটা নষ্ট করে ফেলব।

অবাক হলাম না। এরকমটা আশা করেছিলাম। বললাম—ঠিক আছে।

ডাক্তার দেখানো হল। অনেক ওষুধ খেল দুলু। কিন্তু বাচ্চাটার প্রাণশক্তি ছিল বটে। সে-সব ওষুধ হজম করল সে। পাঁচ মাসের মাথায় মাতৃগর্ভে সে প্রথম নড়াচড়াও শুরু করল। আতঙ্কে দুলু একরাত্রে ছুটে এল আমার বিছানায়—ওগো, ওটা এখনো বেঁচে আছে, মরে নি।

—তা হলে, বেঁচে থাকতে দাও।

দুলু রাগ করল—তুমি তো বলবেই! তোমার আর কী?

যথাসময়ে আমার দ্বিতীয় পুত্র জন্মলাভ করে। তার নাম ছোটন। ওষুধপত্রের জন্যেই কিনা জানি না, ছেলেটা খুব রোগা হল, তার মাথায় ছিল জন্মাবধি দীর্ঘস্থায়ী ঘা। বালিশে মাথা রাখলে ব্যথায় কেঁদে কেঁদে উঠত। তাকে নিয়ে দুলুর কষ্টের শেষ ছিল না। সারাদিন সে অবশ্য পিসি আর ঠাকুরমার কাছে থাকত, কেবল রাত্রে থাকত মায়ের কাছে। কিন্তু ঘায়ের ব্যথায় তার ঘুম হত না বলে মাঝে মাঝে জেগে উঠে কাঁদত, সারাদিন খাটুনির পর দুলু ঘুমোতে পারত না। গাল দিত আমাকে। ডেকে তুলে বলত—তোমার ছেলে তুমি গিয়ে দেখ। আমার না ঘুমোলে চলবে না।

আমার পেটের ব্যথাটা তখন ক্রনিকে দাঁড়িয়ে গেছে। গোপনে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খাই। ব্যথাটা কমে যায়। আবার বাড়ে। রাত্রে কষ্ট হয় সবচেয়ে বেশি। তবু আমি কষ্ট চেপে দুলুর বিছানায় গিয়ে তার জায়গা নিতাম। দুলু শুতো একা, আমার বিছানায়।

শিশুরা মায়ের গন্ধ চেনে। ছোটন আমার কাছে থাকতে চাইত না। ঝিমলি একটু বড় হয়েছে তখন। মাঝরাতে উঠে সে-ও আমার সঙ্গে ছোটনকে সামলাত।

ছোটন আর একটু বড় হল। যখন তার আড়াই বছর বয়স, তখন দেখা গেল, সবাইকে ছেড়ে সে তার মায়েরই ভক্ত হয়ে উঠেছে। সে পেটে থাকতে মা ছিল তার সবচেয়ে বড় শত্রু। ছোটন তা জানত না। সে তার গম্ভীর এবং কাজের মানুষ মাকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসত। মায়ের মতই সে ছিল গম্ভীর।

ছোটন হওয়ার পর থেকেই দুলু নানারকম অসুখে ভুগছিল। তবু খাটত খুব।

রাজনৈতিক জীবনে আর আমার কিছুই করার ছিল না। চেষ্টা করছিলাম কী করে সব গন্ধ ঝেড়ে ফেলা যায়। একটা ব্যবসার কথা প্রায়ই ভাবতাম। লরীর পারমিটের জন্য ঘোরাঘুরিও করলাম কিছুদিন।

আট

চশমার পাওয়ার পাল্টাতে হল। কষের দুটো দাঁত উপড়ে ফেললাম। বয়স হচ্ছে, কিংবা সঠিক বয়স-হওয়া এ নয়। এ হচ্ছে বুড়িয়ে যাওয়া।

কিছুকাল আগে আমার দলটি একটি জাতীয় সংকট উপলক্ষ্য করে দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। আমার মেম্বারশিপের চাঁদা বাকি পড়েছিল অনেক। সে চাঁদা আর দিতে ইচ্ছে করছিল না। আমি কোন দলের তা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। পুঁথিপত্র ঘেঁটে তখনো বিপ্লবের অর্থ বুঝতে চেষ্টা করি। বোঝা যায় না। মাথা ধরে যায়। চোখে জল চলে আসে।

আমার বন্ধু দীপ্তিনাথ দল ছেড়ে একটা ছোট্ট দলে চলে গিয়েছিল। তার বুদ্ধি ছিল না, কিন্তু খাটত খুব। সে এসে একদিন আমাকে বলে—অতনু, তোমার দল কি তোমাকে নমিনেশন দিচ্ছে এবার?

আমি মাথা নাড়ি—আমার চাঁদা বাকি পড়েছে। মেম্বারশিপ রিনিউ করা হয় নি।

দীপ্তিনাথ বলে—ঐ দল তোমাকে নমিনেশন দেবে না কোনো দিন। দল ছাড়ো। তোমার মতো এফিসিয়েন্ট ওয়ার্কার পড়ে থাকবে কেন? ইলেকশনে আমার দল

boiboi.net

তোমাকে নমিনেশান দেবে। আমরা প্রাণ দিয়ে খাটবো। তোমাকে আমি চিনি—বিধানসভায় তোমাকে পাঠাবোই।

বুকটা কেঁপে ওঠে হঠাৎ। প্রত্যাশা জগে। তবু ইতস্ততঃ করতে থাকি।

দীপ্তিনাথ হেসে বলে—বয়স হল না অতনু? আর কবে আমরা অ্যাসেম্বলীতে যাবো?

আমার বাবা-মা-ভাইরা বহুকাল আমার দিকে চেয়ে আছে। কবে আমি এম-এল-এ বা এম. পি. হই, কবে হয়ে উঠি নেতা, অপেক্ষা করতে করতে তারা ঝিমিয়ে পড়েছে, তারা আমার কাছ থেকে কিছু আশা করতে ভরসা পায় না। তাদের জন্য একবার অন্ততঃ আমার কিছু হয়ে ওঠা দরকার।

কয়েকটা দিন ভেবেচিন্তে আমি দল বদল করলাম। দলটা নতুন, একটা বড় দল ভেঙে কয়েকজন নেতা বেরিয়ে এসে এটা তৈরি করেছেন। উৎসাহী কর্মী আছে। আমাকে তারা সাদরে নিল। খবরের কাগজে আমার দল বদলের খবর বেরোলো। বাবা খবরের কাগজ হাতে সকালেই আমার ঘরে এসে বললেন—আবার দল পাল্টালে? বরং এবার জীবনটা পাল্টাও, বৌমা মুখে রক্ত তুলে রোজগার করছেন, আমরা খাচ্ছি—ছিঃ ছিঃ –।

নতুন দলটা আমাকে বাই-ইলেকশনে নামিয়ে দিল। কিন্তু দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার প্রত্যন্ত প্রদেশে কেউ আমাকে তেমন চিনত না। উপরন্তু দলত্যাগীর ওপর মানুষের বিশ্বাস নেই। হারলাম।

বাড়িতে একটু হাসাহাসি হল। দুলুর মুখ থমথম করতে লাগল। পুরোনো দলের কর্মীরা এসে আমাকে ধরল—দাদা, এখন দল ভাঙ্গার সময় না। আমরা বিরাট পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। আপনার মতো কর্মী চলে গেলে আমরা কোথায় দাঁড়াবো? আপনি চলে আসুন। আমরা আপনার মেম্বারশিপ রিনিউ করে দিচ্ছি।

বার বার তিন বার হেরে গেছি আমি। তবু বুঝতে পারি, আমার পাবলিক ইমেজ না থাক, দলে আমার কাজের সুখ্যাতি আছে এখনো। আমায় তারা বলল—দাদা, পোলারাইজেশন হবেই, তখন ঐ সব ছোটো দল হয় ভেসে যাবে, নয়তো বড় দলের সঙ্গে জোট বাঁধবে, ওদের আলাদা এনটিটি থাকবেই না। আপনি কেন পরগাছা দলে পড়ে থাকবেন? আমাদের নেতারা জানেন, আপনি ভুল করেছেন। তাঁরা এখনো আপনাকে চান।

ভাবি। ভাবতে থাকি। বিপ্লবের অর্থ বোঝা গেল না এখনো। অথচ বুঝতেই হবে। দিশেহারা বোধ করি। নির্বাচনে হারলেই দলের মধ্যে প্রভাব একটু কমে যায়ই। নতুন দলেও আমার আদর কমেছিল। তারা জানত, আমি কাজ করার জন্য তাদের দলে আসি নি, এসেছি নমিনেশনের জন্য। তারা আমাকে সঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না।

কিছুদিন পর আবার আমি পুরোনো দলে ফিরলাম। আবার খবরের কাগজে খবর বেরোল। বাবা কেবল বললেন—হুঁ!

সাধারণ নির্বাচন এসে গেল। খুব খাটছিলাম। এবার নমিনেশন পাই নি

boiRboi.net

ঠিকই, তবু নিভে যাওয়ার আগে শেষ জ্বলে ওঠার মতো আমি মন-প্রাণ দিয়ে কাজ করছিলাম। দল ভেঙে দু'ভাগ হয়েছে। পুরানো সহকর্মীরা এখন প্রতিপক্ষ। কাজেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাংঘাতিক। কোন্ দল থাকবে কোন্ দল প্রাধান্য পাবে— এই নিয়ে অস্তিত্বের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। সেই চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যেই একদিন কাগজে উত্তর বাংলার প্রার্থীদের নাম বেরিয়েছে দেখলাম। দেখি, উত্তর বাংলার আমার পুরোনো দল প্রকাশকে নমিনেশন দিয়েছে। যে জায়গায় আমি দ্বিতীয়বার হেরে যাই সেই জায়গায়। এবারও প্রকাশের প্রতিপক্ষ রাঙাবাবু।

হঠাৎ আবেগে আমার চোখে জল আসছিল। প্রকাশ! সেই প্রকাশ ছেলেবেলায় যে প্রথম আমার সব ভয় হরণ করে লড়াই করতে শিখিয়েছিল। সেই প্রকাশ, যে আমার নির্বাচনে খেটেছিল বুক দিয়ে। বলেছিল, অতনু, আমি তোর আছি। চিরকাল তোর পক্ষে রইলাম।

চোখে জল নিয়েও হাসি আসে। প্রকাশ আমার সারা জীবনের বন্ধু হতে চেয়েছিল একদিন। বলেছিল, আয়, আমরা একটা কিছু পাতাই। ভালবাসার আক্রোশে আর অভিমানে সে ঢিল ছুঁড়ে মেরেছিল আমাদের রেলগাড়ি লক্ষ্য করে। পৃথিবী তার অতনুকে কেড়ে নিচ্ছে কেন? সেই আক্রোশেই সে একদিন সেকেণ্ড হওয়াকেই জীবনের লক্ষ্য বলে ধরে নিয়েছিল।

যাবো! গিয়ে প্রকাশের নির্বাচনী এলাকায় প্রাণ ঢেলে কাজ করে আসবো? প্রকাশ তো আমার জন্য করেছিল। খুশি হবে প্রকাশ। বড় অবাক হবে। যাবো?

কিন্তু বাস্তবিক তা হয় না। প্রকাশ এক দলের, আমি অন্য দলের। আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিপক্ষ। বহুকাল দেখা হয় না প্রকাশের সঙ্গে, প্রথম প্রথম কিছুদিন চিঠিপত্র চালাচালি হয়েছিল, তারপর কবে বন্ধ হয়ে গেছে। এখন প্রকাশের সঙ্গে দেখা হলে কী করবে?

নির্বাচনের ফল বেরিয়ে গেল। প্রবল উত্তেজনায় দেখি, কাগজে উত্তর বাংলার ফলে রাঙাবাবুকে চার হাজার ভোটে হারিয়ে প্রকাশ জিতেছে।

বিধানসভার অধিবেশন বসল। আমি গেলাম। গ্যালারি থেকে দেখলাম প্রকাশকে। পিছন হেলে বসে আছে। চোখে চমশা, একটু রোগা হয়ে গেছে বুঝি। তবু সেই অকপট মুখ, আন্তরিকতা মাখানো চেয়ে থাকা, রাজ্যপালের ভাষণের ওপর বিতর্ক হচ্ছিল। প্রকাশও বলল। থেমে থেমে ভেবেচিন্তে বলার ভঙ্গি। আগের মতো আবেগতপ্ত ঝোড়ো বক্তৃতা নয়। যেন বা দ্বিধা এসে গেছে, সংশয় এসেছে। একটু বলেই বসে পড়ল।

বেরিয়ে এসে লবীতে অপেক্ষা করতে লাগলাম। নতুন এম-এল-এ-রা ঘোরাফেরা করছে, চা-সিঙ্গাড়া কিনে খাচ্ছে। তাদের মধ্যে অনেকেই আমার চেনা। একটু দাঁড়াতেই আমার চারধারে জনাকয় জড়ো হয়ে গেল। তাদের সঙ্গে কথা বলি কিছুক্ষণ। আবার লবীতে ঘুরি, প্রকাশকে খুঁজি।

অনেকক্ষণ বাদে প্রকাশ বেরিয়ে এল। সেই প্রকাশ—গান্ধা, চোর, মারকুটে।

boiRboi.net

এখন দেখা যায়—চিন্তায় ভারাক্রান্ত মুখ, অন্যমনস্ক চোখ, চোয়ালে ধারাল ভাব। মুখোমুখী হতেই দু'হাত বাড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল—এই শালা।

দু' পক্ষের দু'জন। চারদিকে কৌতূহলীদের ভিড় জমে গেল। কী ব্যাপার সবাই জানতে চায়। সেই ভিড় থেকে প্রকাশকে টেনে আনলাম—এখানে না। বাসায় চল।

কাটিহারের সেই ছোট্ট ছেলেটি এত উন্নতি করেছে দেখে বাবা বড় খুশি হলেন। উন্নতিশীল মানুষ দেখলেই তিনি খুশি হন। প্রকাশকে সামনে বসিয়ে সব জেনে নিলেন। বললেন—তোমারও আগে অনু তিনবার নমিনেশন পেয়ে জিততে পারল না। কপাল। এখন তোমরা দেখ, ওর জন্য কিছু করে দিতে পারো কিনা। বুড়ো হতে চলল—কিছুই হল না। আমরা কত আশা করেছিলাম—ও কিছু একটা হবে। এখন দেখ, দুলু রোজগার করে বলে খেয়ে-পরে আছি। তোমরা ওকে একটু দেখ—

আমি মনে মনে হাসি। বাবা বোঝেন না, আমরা বন্ধু হলেও দু'জনে দু' দলের। এখন আমাদের জীবন যার যার নিজস্ব ব্যক্তিগত জীবন। রাজনীতি ক্ষেত্রে আমরা আর একে অন্যের জন্য কিছু করতে পারি না।

কথায় কথায় প্রকাশ বলল—চাকরিটা ছাড়তে হয়েছে। রেলের কোয়ার্টার এখনো ছাড়ি নি কিন্তু শীগগিরই ছাড়তে হবে। মাকে নিয়ে যে কোথায় উঠবো ভেবে পাই না। মাঝে মাঝে মনে হয়, নমিনেশন না নিলেই ভাল হত। বাঁধা চাকরিটাই ভাল ছিল। এখন এই এম-এল-এ হয়ে থাকাটা বড় অনিশ্চয়ের কাজ। বড় ভয় করে রে। এই বয়সে নতুন কিছু করতে ভরসা পাই না।

জিজ্ঞেস করি—প্রকাশ, তুই কী করে জিতলি? রাঙাবাবু এবার টাকা ঢালে নি?

প্রকাশ হাসল, বলল,—ঢেলেছিল। কিন্তু সব মানুষেরই ওঠ-পড়া আছে। রাঙাবাবু পড়তির দিকে এখন। তা ছাড়া, মানুষের রাজনৈতিক চেতনার চোখ খুলছে। অতনু, এই কাজ তুই-ই করে এসেছিস। তুই কী করেছিস তা তোর জানা নেই। জমি চষার শক্ত কাজটা তোরই করা। লোকে তোকে ভোট দেয় নি ঠিকই, কিন্তু তোর তারিফ করেছে বারবার। এখনো পার্টিতে তোর কথা হয়। আমরা তোর কথা বলি। লোকেও বলে। কাগজে তোর দল ছাড়ার খবর পেয়ে সবাই দুঃখ করে।

চোখ ঝাপ্সা হয়ে আসে। উত্তর বাংলার মাঠ-ঘাট-জঙ্গলের ছবি ফুটে ওঠে। অজস্র মানুষের মুখ ভেসে যায় চোখের ওপর দিয়ে।

প্রকাশ একটু ভেবে বলে—কেউ কেউ আছে বাউল-বৈরাগীর মত, দলে তারা বেমানান। তোকে দেখে আমার মনে হয় তোর সব কাজ বৃথা যায় নি—তুই যতটা ভাবিস ততটা নয়, দলীয় রাজনীতি আলাদা ব্যাপার—সেটা তোর হয় নি বলে আমার দুঃখ নেই। তুই মানুষের জন্য অনেক করেছিস।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকি। প্রকাশের সব কথা বিশ্বাস হয় না। তবু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়।

প্রকাশ বলে—অতনু, মানুষ তোকে ভোলে নি। বিশ্বাস কর, ভোলে নি। তুই দেখিস।

বিধানসভার প্রথম সেসন শেষ হলে প্রকাশ উত্তর বাংলায় ফিরে গেল। পরের সেসন এল আবার। দেখা হল। কত কথা হয় দুজনে। কথায় কথায় রাজনীতির কথা এসে পড়ে। তর্ক হয়। দলীয় আদর্শের তফাৎ নিয়ে ঝগড়া করি দুজনে। এক এক সময়ে প্রকাশ আমার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে মিটমিটি হাসে, বলে—অতনু, আমার বিশ্বাসই হয় না যে তোর ব্রেনওয়াশ হয়েছে। তোর তা হতে পারে না। আমার মনে হয় তুই কোনোদিনই কোনো দলকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসিস নি।

আমি চুপ করে থাকি। ভাবি। হয়তো প্রকাশ ঠিকই বলছে। কিন্তু আমি কিছু ভেবে পাই না।

প্রকাশ আবার বলে—কোন কোন মানুষ আছে, মানুষের ভাল করতে গিয়ে পলিটিক্স করে, কেউ কেউ বা সাধু-সন্ন্যাসী-সন্ত হয়। তুই দ্বিতীয় দলের। আমরা জোর করে তোকে পলিটিশিয়ান বানিয়েছি।

হেসে উঠি।

আবার প্রকাশ চলে যায়। আবার আসে। বিধানসভায় কতগুলো বিল-প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তার বক্তৃতা বেশ সুখ্যাতি পেল। একটু নাম করল প্রকাশ।

পরিষ্কার টের পাচ্ছিলাম, দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া পাল্টে যাচ্ছে। দীর্ঘকাল ধরে ক্ষমতাসীন দল চাল মাৎ হয়ে বসে আছে। নতুন কিছু করার নেই। পুরোনো আদ্যিকালের কাঠামো রয়ে গেছে সমাজের চেহারায়। সেই ঘুণধরা কাঠামোর ওপরে মাটি চাপিয়ে প্রতিমা গড়ার চেষ্টা। বার বার ভেঙে যাচ্ছে মূর্তি। কারিগর বুঝতে পারছে না কী করতে হবে।

মিহির নামে একটা ছেলেকে চিনতাম। বাঁকুড়ার গ্রামে তার বাড়ি, কলকাতায় থেকে চাকরি করত। মিহিরের বড় ইচ্ছে ছিল, তার গাঁয়ে একটা পোস্ট অফিস হয়। সে সেই জন্যই অনেক ঘোরাঘুরি করেছে। বহু দরখাস্ত পাঠিয়েছে পি-এম-জি-র কাছে। সেইসব দরখাস্ত যাতে গুরুত্ব পায় সেইজন্য সে যথাবিহিত নামের পাশে এম-এ কথাটা উল্লেখ করে দিত। কখনো বা গ্রাম থেকে গণ-দরখাস্ত পাঠাত। পত্রিকায় অন্ততঃ তার 'পোস্ট অফিস চাই' শিরোনামায় চারটে চিঠি বেরিয়েছিল। কিছুই হয় নি। তখন সে এক অদ্ভুত পন্থা নেয়। গাদা গাদা খাম পোস্টকার্ড কিনে সে তার গ্রামের বিভিন্ন লোকের নামে চিঠি দিতে শুরু করে। তার বিশ্বাস ছিল, যদি তার গ্রামে বহু সংখ্যক চিঠি যেতে শুরু করে তবে সরকার বাধ্য হয়ে পোস্ট অফিস খুলবে সেখানে। এত চিঠি একা লেখা সম্ভব ছিল না বলে সে চেনা জানা যাকে পেত তাকেই একখানা ঠিকানা লেখা পোস্ট কার্ড দিয়ে বলত—কয়েক লাইন লিখে দাও। যা খুশি।

—সে কী। অচেনা লোককে কী লেখা যায়?

—অন্ততঃ একটু শুভেচ্ছা জানিয়ে দাও। চিঠি যার কাছে যাবে সেও জানে—এ চিঠি নয়, এ আসলে হচ্ছে লড়াই। যেমন করেই হোক পোস্ট অফিস আমাদের চাই।

মিহিরের গ্রামে ওরকম চিঠি আমিও পাঠিয়েছি।

বেশ কয়েকমাস গাঁটের কড়ি খরচা করে চিঠি লিখেও যখন পোস্ট অফিস হল না তখন সে ভারী মুষড়ে পড়ে। তার গ্রাম থেকে একজন বুড়ো-সুড়ো মোড়ল গোছের লোক প্রায়ই মিহিরের কাছে আসতেন। তাঁর সঙ্গে গভীর পরামর্শ করত সে। কলকাতায় মিহির আমাদের দলের হয়ে খাটত। কিন্তু গাঁয়ে গিয়ে সে ক্যাম্পেন করত সরকারের পক্ষে। আমার কাছে স্বীকার করত সব, বলত—দাদা, এখনো গাঁয়ের মেইন রাস্তাটা পাকা হয় নি। তিনটে টিউবওয়েল বসানোর কথা চলছে, ইলেক্ট্রিক আসার কথা, আর ঐ পোস্ট অফিসটা....বিরাট একটা ফিরিস্তি দিয়ে যেত সে। তারপর বলত—এগুলো আগে আমরা গুছিয়ে নিই, তারপর দেখবেন রাজনীতি পাল্টে যাবে।

আমি তার কান্ড দেখে খুব হাসতাম।

অবশেষে একদিন মিহির সেই বুড়ো মানুষ ভদ্রলোককে নিয়ে আমার কাছে এসে বলে—দাদা, হল না। অনেক করে দেখলাম। এবার আমরা উল্টো পার্টির লোক দাঁড় করাবো। আপনি চলুন আমাদের গাঁয়ে, মিটিং করবেন।

এই কথা শুনে হঠাৎ আমার চোখের সামনে একটা পর্দা সরে যায়। রাজনীতির চেহারাটা প্রকট হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষেরা ডিপ্লোম্যাট হয়ে যাচ্ছে! চালছে উল্টো কূটনৈতিক চাল। ভারতের রাজনৈতিক কাঠামোতে মানুষের স্বার্থই কি একটা পরিবর্তন আনবে!

মিহিরের গ্রামে গিয়ে আমি মিটিং করলাম। পরে নির্বাচনের সময়টা ধীরে ধীরে এসে গেল।

সেই নির্বাচনে সরকার পাল্টাল। স্টেট্সম্যান লিখল—এ ভোট অব অ্যাংগার। ঠিক কথা। এ হচ্ছে রাগের ভোট। মিহিরের গাঁয়ের লোকেরা বড় আশায় ছিল। পাকা রাস্তা, টিউবওয়েল, বিজলী বাতি, একটা পোস্ট অফিস—কিছুই হয় নি। মিহির কলকাতায় একটা দল করত আন্তরিকভাবে, গাঁয়ের স্বার্থে সেখানে গিয়ে করত অন্য দল। এই ছোট্ট বাঁকুড়ার গ্রামখানিই বাংলাদেশের ছবি, ভারতবর্ষের চেহারা। রাগের ভোট! ঠিকই তো! আমিও জানি, বাংলাদেশে বামপন্থীরা কিছু গঠনমূলক কাজ করে নি। ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ করেছে মাত্র। তাতে কিছু যায় আসে না। পার্টি পার্টির কাজ করে গেছে। তাতে জনগণের আস্থা বাড়ে নি। বিশ্বাস আসে নি। তবু তারা যে দান উল্টে দিল তার কারণ তাদের সরকারের উপর রাগ। সেই নেতিবাচক ভোট পেয়ে বাম দলগুলি লাফাতে থাকে। কলকাতায় সেই সন্ধ্যাবেলা বাসে ট্রামে টিকিট কাটে নি কেউ, কণ্ডাক্টর পয়সা চায় নি। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে আমি শহর দেখলাম। কিন্তু কেমন যেন নিস্পৃহতা এসে গেছে আমার। আমি আর সেরকম আনন্দ পাই না।

প্রকাশ আবার জিতে এল। জড়িয়ে ধরল। তার দল আর আমার দল এবার মিলেমিশে সরকার তৈরি করছে। খুশি হয়ে বলল—অতনু, যদি সত্যিই আমরা এরকম মিলতে পারি, যদি মিশে যাই, তা হলে কী ভীষণ কান্ড হবে।

তেমন উৎসাহ বোধ করি না। কেমন যেন লাগে। প্রকাশ যে বলেছিল—তুই দলের জন্য নয়—সেই কথাটা বড় মনে পড়ে। কেবলই মনে হয়, গণ্ডী ভেঙে

বেরোনো দরকার। খুঁজে দেখা দরকার সব দলকে গ্রাস করে নেওয়ার মতো কোনো আদর্শ কোথাও জন্ম নিয়েছে কিনা। মানুষ পাল্টাল না, কেবল রাজনীতি পাল্টে গেল—এ কেমন কথা ?

প্রকাশ বড় আশাবাদী। তর্ক করে। ঝগড়া হয়। বলে—মানুষ পাল্টাচ্ছে অতনু।

আমি উত্তর দিই—কে তাদের পাল্টাল ? কবে ? হাজারটা দল হাজার রকমের কথা বলছে, করছে নীতির লড়াই, আমাদের বক্তৃতার অধিকাংশ জুড়ে থাকে এর ওর তার নিন্দে, গালাগাল, অভিশাপ। আমাদের মিছিলের স্লোগানে থাকে আক্রোশ। মানুষকে আমরা ঐসব শেখাচ্ছি। তার মুখে বসিয়ে দিচ্ছি দলের কথা, চিন্তায় ঢুকিয়ে দিচ্ছি দলের স্বার্থ। আমরা মানুষকে শেখাচ্ছি দাবি আদায় করতে—এর বেশি কিছু না। প্রকাশ, এ ভাবে মানুষ পাল্টায় না। মানুষের ভিতরে কবে আমরা সততা, দয়া, কর্মনিষ্ঠা জাগাবার চেষ্টা করেছি ? ক'জন মানুষকে শিখিয়েছি আলস্য ত্যাগ করতে ? ক'জনকে মদ ছাড়িয়েছি, সচ্চরিত্র করেছি ক'জনকে ? যখন রিফিউজি কলোনীতে ভলান্টিয়ার হয়ে প্রাণপণে খাটতাম, ঘরের চালডাল পয়সা কাপড় এনে দিতাম, তখন থেকেই রাজনীতির লোকেরা এসে রিফিউজিদের স্বার্থচেতন করত, বলত সরকারী সাহায্য দালালরা মেরে দিচ্ছে, তোমরা পাচ্ছো না… ইত্যাদি। রিফিউজিরা ক্ষেপে গিয়ে আমাদের মারতে আসত। অথচ ঐ রিফিউজি ক্যাম্প থেকে কয়েকটা মেয়ে বেশ্যা হয়ে যায়—তাদের কেউ ঠেকাতে পারে নি। কত ছেলে চোর, পকেটমার হয়ে গেল, কত মানুষ দুঃখ ভুলতে ঘটিবাটি বেচে মদ্যপ হল—কেউ তখন তাদের সচেতন করে নি। মানুষের চরিত্র যখন অন্ধকারের দিকে বেঁকে যায় তখন কে আমাদের মধ্যে গিয়ে তার পথ আটকে দাঁড়িয়েছি। প্রকাশ, মানুষের ভাত-কাপড়ের অভাব আমি মানি—তার জন্য লড়াই আমিও করি। কিন্তু আমার মনে হয়, আমাদের সবচেয়ে বড় লড়াইটা ছিল মানুষের চরিত্রের জন্য—সে লড়াই আমরা লড়ি নি। মানুষের ধর্মের চেয়ে বেশি কিছু দেওয়ার নেই। ধর্ম আর চরিত্র পেলে মানুষ আপনি দাঁড়ায়। এত হাঁকডাকের দরকার হয় না। মানুষ আমাদের আদর্শকে বিশ্বাস করে এবার ভোট দেয় নি, দিয়েছে রাগের ভোট—ক্ষমতাসীন দলকে তারা অবিশ্বাস করে। আমরা সেই অবিশ্বাসের ভোট পেয়েছি।

প্রকাশ হাসে। গুরুত্ব দেয় না।

আমি তবু বলি—দ্যাখ, সে-বার দেশ স্বাধীন হওয়ার বছরে মানুষের কী ভীষণ উৎসাহ দেখা গিয়েছিল। একদিন রেলের কম্পার্টমেন্টে উঠে এক চেকার প্রথমেই হাতজোড় করে বলল—ভাইরা, দিন পাল্টে গেছে। আমি টিকিট চাইবার আগে বলে নিই—যারা টিকিট কাটেন নি, তাঁরা জরিমানা দেবেন, এবং প্রতিজ্ঞা করবেন যে, আর বিনা টিকিটে কখনো যাবেন না। আমিও প্রতিজ্ঞা করছি, আর ঘুষ নেবো না। শুনে আমরা ভীষণ অভিভূত হয়ে পড়লাম। কোন চেকারের মুখে এমন কথা কেউ কখনো শোনে নি। কামরার অনেকের টিকিট ছিল না, তারা কেউ কেউ জরিমানা দিল, প্রতিজ্ঞাও করল অনেকে। দু' একজন আবেগে চোখের জল ফেলল। সেই

চেকা; ভদ্রলোক কাঁদছিলেন। জনে জনে হাতজোড় করে বলছিলেন—ভাইসব, আমি অনেক ঘুষ নিয়েছি। মহাপাপ করেছি। কিন্তু আর না। আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করবেন। শুনে সকলে মূক হয়ে গেল। কেউ কেউ বিড় বিড় করে আশীর্বাদ করল। এক বুড়ো তাঁকে বুকে চেপে ধরে আর ছাড়তেই চান না, কেবল বলছেন—তুই আমার পোলা। তুই আমার সোনার গোপাল—। সেই কামরাটায় কয়েক মুহূর্তের জন্য সে এক স্বর্গীয় আবহাওয়া। আমার বুক ঠেলে উদ্বেল আবেগ উঠে আসছিল। সেই চেকার ভদ্রলোককে কী যে মহান মনে হয়েছিল। ভেবেছিলাম, এই হচ্ছে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের জনগণের প্রতীক। সেই কামরাটা যেন ভারতবর্ষেরই একটা ছোট্ট ছবি।

প্রকাশ চুপ করে ভাবে।

আমি বলি—সেইদিনও আমার মনে হয়েছিল, জনগণ পাল্টে যাচ্ছে। সুদিন এল বুঝি। কিন্তু মানুষের আবেগ—তাকে বিশ্বাস নেই। আবেগ দু'দণ্ড থাকে অতিথির মতো। তারপর চলে যায়। আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি। একবছরের মধ্যেই সেই চেকারকে আমি নিজের চোখে ঘুষ নিতে দেখেছি। মানুষ সহজে পাল্টায় না প্রকাশ, তাকে পাল্টানোর জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম পড়ে আছে। কেউ সেই লড়াই লড়ছে না। কেবল দাবি আদায় করে দিয়ে সন্তুষ্ট রাখছে তাকে, তপ্ত করে তুলছে স্বার্থের লড়াইতে, জোরদার করছে দলের শক্তি। মানুষ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে কেবল। তাদের ঘরের দরজায়-জানালায় কেবল চোর-গুণ্ডার উঁকিঝুঁকি, আড়কাঠিদের ছায়া, তার বিপদের রাস্তায় পুলিশের বাড়ানো হাত, চারিদিকে লুট অরাজকতা, তার বেঁচে থাকা মানেই আত্মরক্ষা। ট্রেনের কামরায় দেখা সেই দৃশ্যটা স্বপ্নের মত মনে হয়।

নয়

উত্তর বাংলায় একটা বড় রকমের গণ্ডগোল হয়ে গেল। কৃষক বিদ্রোহ। চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল খুব। চাষীদের সশস্ত্র সংগ্রামের বৃত্তান্ত কাগজের হেডিং।

প্রথমটায় চমকে উঠলাম। উত্তর বাংলার মাটিতে আমি মিশে আছি। সেই স্নিগ্ধ মাটি থেকে এই অগ্ন্যুৎপাত!

দৌড়ে গেলাম প্রকাশের কাছে। প্রকাশ খুশি নয়, বিমর্ষও নয়। চিন্তিত। আমাকে বলল—অতনু, ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না।

boiRboi.net

আমি বললাম—আমারও না। এটা গণতন্ত্রের পথ নয় ঠিক। কিন্তু আমি জানতে চাই, এটা বিপ্লবের পথ কিনা। এদেশে মানুষ দীর্ঘকাল বিপ্লবের জন্য অপেক্ষা করছে। এটা কি তারই পূর্বাভাস?

প্রকাশ ম্লান হেসে বলে—সেটা তোরই ভাল জানার কথা। তোর দল বিপ্লবের কথা সবচেয়ে বেশি বলে।

একটু চুপ করে থেকে প্রকাশ আবার বলে—মানুষ এত সহজে পাল্টায় না—এ তো তোরই কথা।

দীর্ঘকাল রাজনৈতিক ব্যর্থতার রোগে ভুগে আমি খিট্‌খিটে হয়ে গেছি। মনে হয় সমস্ত শরীরে আমার জ্বালা, দাঁতে-মুখে বিষ। হাত-পা নিশ্‌পিশ্ করে। আমি প্রকাশকে বললাম—ভাল হোক মন্দ হোক, তবু একটা কিছু হয়ে যাক। একটা চূড়ান্ত কিছু হওয়া বড় দরকার। একটা বড় ঝাঁকুনি, ওলটপালট বড় দরকার।

কথাটা স্বস্তির মুখে পড়ল। বাংলাদেশে রাজনৈতিক ঝড় এসে গেল হঠাৎ। বার বার বিধানসভা ভেঙে যায়। সেই ঝড়ের মধ্যে বৃক্ষপতনের মত লাশ পড়তে শুরু করল। প্রথমটায় খুব চমকে গেলাম। কিন্তু খুনের সেই শুরু। খুনের পর দেয়ালে লেখা হয় অমুক খতম তমুক খতম। নতুন রাজনৈতিক মতবাদ লেখা হতে লাগল চারদিকে। এর আগে বেলেঘাটায় একজন পলাতক নেতা রাস্তার ওপর পুলিশের তাড়া খেয়ে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পালাবার সময়ে জনতার হাতে মারা পড়েছিলো। আমার আর প্রকাশের খুব চেনা লোক। আমরা দু'জনেই খবর পেয়ে মুষড়ে পড়লাম। এমনটা না হলেও পারত. এতটা যেন এদেশের মাটিতে মানায় না।

বিপ্লবের ডাক কারা লিখে যায় দেয়ালে। স্কুল-কলেজ ছেড়ে চলে আসার আহ্বান করে ছাত্রদের। লেখে—শ্রেণীশত্রুর রক্তে যার হাত রঞ্জিত হয় নি সে কমিউনিস্টই নয়। আরো কত কথা। পড়তে অবাক লাগে। বিপ্লব! এই কি তবে বিপ্লব!

আবার পুঁথিপত্র খুলে বসি। মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করি। কিছু মেলে, কিছু মেলে না। বরাবর এই এক ব্যাপার দেখে আসছি। পুঁথিপত্রে যা লেখা আছে তার কিছু মেলে, কিছু মেলে না।

তবু সশব্দে চারদিকে লাশ পড়তে থাকে।

খুব অবাক হয়ে ভাবি, উত্তর বাংলার গ্রামে যে বিপ্লবের শুরু তা গ্রাম থেকে গ্রামে ছড়িয়ে না পড়ে কেন শহরে এসে বাসা নিয়েছে! গ্রাম দিয়ে তবে এরা কী করে শহর ঘিরবে। বড় অবাক লাগে।

রাত-বিরেতে একা একা ফিরতে গা ছম্‌-ছম্ করে। বার বার পিছু ফিরে দেখে নিই। বাতাসকে বিশ্বাস হয় না, গাছটাকেও সন্দেহ করি। যদিও রাজনীতিতে আমি মরা ঘোড়া হয়ে গেছি তবুও গায়ের গন্ধ বহুদূর যায়। আমাদের রাস্তার চৌমাথায় পাড়ার ছেলেরা আড্ডা মারে। চেনা ছেলে, তবু তাদের সেই দঙ্গল দূর থেকে দেখে হঠাৎ ভয় লাগে। চেনা ছেলে বটে, কিন্তু যদি ভিতরে ভিতরে রং বদলে থাকে। নীচের তলার ঘরে শুই, শিয়রের জানালা খোলা থাকে। রাতে ভাল ঘুম

হয় না। দুঃস্বপ্ন দেখে উঠে বসি। তারপর মাঝরাতে সিগারেট জ্বেলে জানালায় দাঁড়িয়ে নির্জন চরাচর দেখি। দূরে গাঢ় নীল হিম আকাশের দিকে অপলক চেয়ে থাকি। মৃত্যুর কথা ভাবি। পরকালে আমার কি বিশ্বাস আছে? কে জানে! তবে চিরকাল আমি বস্তুবাদী। নিজের মৃত্যুর কথা ভাবতে গেলেই বীরপাড়ার রাস্তায় ঝোপের গাঢ় ছায়া থেকে আজও ধূসর রঙের একটা সতেজ সাপ উঠে তার বুকের সাদা রঙ আমাকে দেখায়। শরীর শিউরে ওঠে, ভয় করে।

কিন্তু বস্তুতঃ মৃত্যুকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই আমার, আমার পারিবারিক সম্পর্ক আলগা, বাইরের জগৎ থেকেও কিছু পাওয়ার নেই। বেঁচে থাকার আর কী অর্থ? মরলেই বা ক্ষতি কী? নিছক বেঁচে থাকার জন্যই বেঁচে থাকাটা কোনো কাজের নয়। কেঁচো, কীট, পশুরাই ওরকম বাঁচে। এসব কথা নিজেকে বলেছিও কতবার। যখন রাজনীতিতে প্রথম নেমেছিলাম, তখন অন্ততঃ মৃত্যুভয় আমার ছিল না, সেই সব দিনে কতবার ভাড়াটে গুন্ডা, গোয়েন্দা পুলিশ, অন্য দলের মারমুখো সমর্থকদের মুখোমুখী দাঁড়িয়েছি অনায়াসে। তবে কি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ভয় বাড়ে? বাড়ে আয়ুর প্রতি ভালবাসা? যদি আমি রোজগেরে মানুষ হতাম, যদি আমার ওপর নির্ভর করত আমার ছেলে-মেয়ে-বৌয়ের ভবিষ্যৎ, তবে হয়তো বেঁচে থাকার প্রতি ভালবাসা স্বাভাবিক হত। কিন্তু তাও তো নয়।

সেই আন্দোলনের প্রকাশ্য নিন্দে করল প্রকাশ। কাগজে ওর লেখা বেরোলো। গিয়ে প্রকাশকে সাবধান করে দিলাম—দিনকাল ভাল না প্রকাশ। সাবধান।

প্রকাশ মুখ গম্ভীর করে আমাদের সেই চেনা নিহত পলাতক রাজনৈতিক নেতার কথা উল্লেখ করে বলে—ও মারা যাওয়ার পর থেকে আমার মন চারদিকটার ওপর বিষিয়ে গেছে। ওর আর আমার দল আলাদা ছিল, তবু আমাদের কাজ আসলে তো আলাদা নয়। এখন এইসব যা হচ্ছে এই-ই বা কী অতনু? বাচ্চা ছেলে সব —এরা কী বোঝে? কেন এসব—! প্রটেস্ট করে রাখলাম অতনু, ভবিষ্যতের মানুষ যখন এই অন্যায়ের নিন্দা করবে তখন তারা খুঁজে দেখবে, কেউ সাহস করে এর প্রতিবাদ করেছিল কিনা, আমি সেটা করে রাখছি—।

সুখের বিষয়, আমার অভিজ্ঞতা প্রকাশের চেয়ে বেশি। আমি এখন ভবিষ্যতের ভাবনা কম ভাবি। আমার চিন্তা বর্তমানকে নিয়ে। এইসব ঝোড়ো দিনগুলো মাথা নুইয়ে কাটিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সুযোগ যদি আসে আসবেই— তখন দেখা যাবে। প্রকাশ তা বোঝে না। তর্ক করে। ঝগড়া হয়।

রাশি রাশি ছেলে ধরা পড়ছে। তবু খুন কমছে না। অবাক হয়ে দেখি বাংলাদেশের নরম মাটি থেকে এ কারা জন্মাল। তিনটি-চারটে ছেলে গিয়ে স্কুল জ্বালায়, পুলিশ ব্যারাকে আক্রমণ করে, সশস্ত্র এস-আইকে খুন করে। দিনের বেলায় হাজার লোকের চোখের সামনে ট্র্যাফিক পুলিশ মারে। এক-আধজন এম-এল-এও খুন হয়।

থানার ও-সি চেনা লোক। একটু খাতির করেন। কেস্ মারাত্মক না হলেও আমার ক্যাডারদের অযথা আটকে রাখেন না। আমি গেলে ছেড়ে দেন। হেসে

বলেন—আমাদেরও জায়গা নেই। দেশ শুদ্ধ ছোকরারা ক্রিমিন্যাল হয়ে গেলে আমরা রাখি কোথায়।

মাঝে মাঝে থানায় যাই। আড্ডা মারার জন্য নয়। পরিস্থিতি বুঝবার জন্য। থানার খবর সবচেয়ে পাকা। ও-সি বসান, চা খাওয়ান, অল্পস্বল্প ইনফর্মেশন দেন। আর বার বার বলে দেন—সাবধানে চলাফেরা করবেন। আমাদের দেশে একরকম কাঁঠাল হত। মাটির নীচে ফলত। পেকে গন্ধ ছড়ালে আমরা টের পেতাম। আপনারা হচ্ছেন সে কাঁঠালের মতো। লুকিয়ে থাকলেও গন্ধে লোকে টের পাবে ঠিক।

আগেই বলেছি, জীবনের প্রতি আমার তেমন গাঢ় অনুরাগ থাকার কথা নয়। তবু দেখি এত হেলাফেলা করে যে জীবনটা কাটিয়ে দিলাম, যে আমি সংসারে কারো কাজে লাগলাম না, যে আমাকে এই সংসারও বড় বেশি হেলাফেলা করেছে, তারও রয়েছে মৃত্যু-চিন্তায় প্রগাঢ় কাপুরুষতা।

ন্যাকি এ স্বাভাবিক বাঁচার আকুতি।

সিদ্ধান্তে আসতে পারি না। বীরপাড়ার রাস্তায় ধুলোয় হাঁটু গেড়ে বসে একদা আমি প্রাণভিক্ষা চেয়েছিলাম একটি সাপের কাছে। সে অবহেলা ভরে ছুঁড়ে দিয়ে গিয়েছিল আমার আয়ু। সেই কথা মনে পড়ে।

আমাদের বাড়ির পিছনের দিকে একটু উঠোন, একটু বাগান। দেয়াল ঘেরা। সারা দুপুর সেইখানে খেলা করে তিতু আর ঝিমুলি। আমি আজকাল একটু বেশি ঘরে থাকি। দুলু স্কুলে চলে যায়, ভাইরা বেরোয়, বাবা আর মা ঘরে শুয়ে বসে থাকে। আমি একা বারান্দায় বসে থাকি। একা আমি চিরকালই। ঘরের প্রবাস আমার। দুলু কয়েকটা দিন শুধু আমার কাছে এসেছিল। খানিকটা ভালবাসায়, খানিকটা আক্রোশে। ঘৃণা আর ভালবাসার দূরত্ব বুঝি বেশি নয়। মানুষের মনে তারা পাশাপাশি দু'টি পাখির মতো বাস করে। একজন ডাক দিলে অন্য জনও ডেকে ওঠে। দুলুর সঙ্গে বাস করে আমার এখন এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। দুলুর উদাসীনতায় আমি বাস করি। এক এক সময় দুলু সচেতন হয়ে আমাকে ভালবাসে কিছু, কিছু ঘৃণা করে।

ঐ যে তিতু আর ঝিমুলি—ওরা কি ঘৃণার ফসল, নাকি ভালবাসার তা আমি বুঝি না। চেয়ে থাকি। বুঝতে চেষ্টা করি। সারাটা দুপুর ওরা উঠান আর বাগানময় খেলাঘর তৈরি করে, আর ভাঙে। এক এক সময়ে আমাকেও ডাকে। আমি তাদের পুতুলের কাপড় পরিয়ে দিই, পাহাড় বানাই, মিছিমিছির নেমন্তন্ন খাই। ছোটন সাধারণতঃ এইসব খেলায় থাকে না. ছয় বছর তার, তবু বাড় নেই। তিন কি চার বছরের শরীর তার, কথা আধো-আধো, মুখ দিয়ে লালা পড়ে, মাথায় ঘা, সারাটা দিন দাদু আর ঠাকুমার মাঝখানে শুয়ে থাকে। কোনো কোনোদিন সেও উঠে এসে খেলা করে। খেলা শেষ হয় একসময়ে। তখন গল্প বলার পালা। বারান্দায় তারা আমাকে ঘিরে বসে। আমি জঙ্গল আর পাহাড়ের গল্প বলি। বলতে বলতে একসময়ে তাদের কথা আর খেয়াল থাকে না। আমি গল্প বলে চলি নিজেকেই। সাপ, বাঘ, পাহাড়, জঙ্গল, আর মানুষ—উত্তর বাংলার সেই জীবনের বিচিত্র আলো-

আঁধারিতে কখন হারিয়ে যাই। তিতু, ঝিমুলি আর ছোটন হাঁ করে শোনে। শিউরে উঠে আমার গা ঘেঁষে আসে।

বিকেলে দুলু ফিরে এসেই তাদের সরিয়ে নেয়। আমাকে চাপা ধমকের সুরে বলে— ছেলেমেয়েদের নষ্ট কোরো না, ওদের ভিতরে তোমার মাঠ-ঘাট-পাহাড় আর রাজনীতির বাউণ্ডুলেপনা ঢুকিও না।

বুকের ভিতরে এখনো খিঁচ ধরে। হৃৎপিণ্ডের শব্দ পাল্টে যায়। রাগে, হতাশায়। বড় নিষ্ঠুর তুমি দুলু। তোমার মায়া নেই।

চারিদিকে প্রতিদিন লাশ পড়ছে। তবু কেউ আমাকে সাবধান করে না। কারো উদ্বেগ নেই আমার জন্য। মনে হয়, তারা সবাই আমাকে চোখের সামনে দেখেও প্রতিদিন ভুলে যাচ্ছে। এর চেয়ে মৃত্যু খুব বেশি মর্মান্তিক নয়। দুলু নিষ্ঠুর হাসি হেসে বলে—তুমি কেন বেরোও না? তুমি বেরোলেই আমি নিশ্চিন্ত থাকি।

মর্মান্তিক। তবু ঘটনাটা ঘটে যায়।

মধ্য কলকাতার পার্টি অফিসের ঘরে থাকত প্রকাশ। বিধানসভার অধিবেশন শেষ হলে উত্তর বাংলায় ফিরে যেত। এবারও যাওয়ার কথা। যাওয়ার আগের দিন ঘুরে ঘুরে কিছু বাজার করেছিল। বাচ্চাদের জন্য খেলনা, বড়বাজার থেকে ডালের বড়ি, হাওড়া হাট থেকে ছিটকাপড়। ফিরতে বিকেল হয়েছিল। পার্টি অফিসের সামনের গলিতে চারজন লোক তাকে ঘিরে ধরে।

প্রকাশের হার্ট ভাল ছিল না, সম্ভবতঃ ডায়াবেটিসও ছিল। খুব মিষ্টি খেত প্রকাশ। উত্তেজিত হলে ইদানীং থর থর করে কাঁপত। বলতাম—ডাক্তার দেখা, একটা জীবন শরীরের দিকে তাকাস নি, এখনও সময় থাকতে—

প্রকাশ বলত—বাদ দে। শরীরটা পুষে রাখার জন্য নয়, কাজে লাগাবার জন্য। যতদিন কাজে লাগবে লাগুক, তারপর ফেলে দেবো।

কখনো বা বলত—ডাক্তারের কাছে যেতে মাইরি ভয় করে। ফায়ারম্যান ছিলাম, কত ধকল গেছে। পার্টি করতে গিয়ে শরীরের ওপর কত অত্যাচার করেছি। কোথায় কী হয়ে আছে শরীরের ভিতর কে জানে! হয়তো ক্যান্সার, ক্যান্সার, যক্ষ্মা, প্রেসার, ডায়বেটিস কি হার্টের ব্যামো। ডাক্তার দেখালেই সব ধরা পড়ে যাবে। তার চেয়ে না জেনে এই বেশ আছি—

প্রকাশের বৌ দুলুর মতো সুন্দর ছিল না। ছিল না দুলুর মতো নিষ্ঠুরও। সে প্রকাশকে ভালবাসত খুব। বৌয়ের কথা বলতে প্রকাশ বলত—যা ভয় করেছিলাম, বৌটা সেরকম হয়নি। আমার নতুন মাকে কেড়ে নেয় নি। বরং আমি বারমুখো বলে তারা শাশুড়ী বৌ জোট বেঁধে থাকে। মা বাচ্চাগুলোকে সামলায়, বৌ ঘরদোর দেখে। ভরী লক্ষ্মীশ্রী ফুটিয়ে রেখেছে ঘরে— গরীবের ঘরে যতটা ফোটানো যায়। কিন্তু আমি কেমন লক্ষ্মীছাড়া দ্যাখ, সেই ঘরে আমার থাকাই হয় না। এত দূরে পার্টি অফিসে পড়ে আছি, টেবিল পেতে শতরঞ্জি বিছিয়ে শুয়ে থাকি, পাউরুটি আর জল খেয়ে কত দিন কেটে যায়।

আমাদের বাড়িতে কতবার প্রাকাশকে থাকতে বলেছি, থাকে নি। বলেছে— দূর। লোকে কী বলবে! আমাদের দল আলাদা—সেটা ভুলিস না।

বড় একটা চমক লাগত। প্রকাশের দল আলাদা। হায় ঈশ্বর, কাটিহারের রাস্তায় রাস্তায় আমরা যে একসঙ্গে কতবার মার খেয়েছি!

যতদূর জানি, প্রকাশ শব্দটিও করতে পারে নি। চারজন তাকে ঘিরে ধরেছিল। খোলা রাস্তায়, তার পার্টি অফিসের সামনেই। খবর পেয়ে গিয়ে দেখি, খুব ভিড়। পুলিশ সদ্য এসেছে। মেডিক্যাল কলেজের এমার্জেন্সীতে প্রকাশের দেহটা শোয়ানো।

কিন্তু, এ কে? একে তো কখনো চিনতাম না আমি। এই কি প্রকাশের চেহারা। তার মাথাটা প্রায় নেই ই। আকারহীন, ফাটা ভাঙ্গা একটা মাথা, চোয়ালও ভেঙ্গেছে। সমস্ত শরীর ছোরায় ছোরায় লণ্ডভণ্ড। একটা বয়স্ক, দুর্বল দেহের ওপর এ কেমন আক্রোশ ওদের। এতটার দরকার ছিল না। প্রকাশের হৃৎপিণ্ড দেখা যাচ্ছে, পেটের ভিতর থেকে একটা নাড়ি বেরিয়ে এসে ঝুলছে। আমি চোখ ফেরাতে পারি না, তাকাতেও চোখ ফেটে যাচ্ছে।

পুলিশ আমার কাছে একটা বিবৃতি চেয়েছিল। কিছুই বলতে পারি না। কথা এলোমেলো হয়ে যায়। আবোল-তাবোল কী সব বলি। মাঝে মাঝে শরীরে কাঁপুনি উঠে যায়। হিক্কা ওঠে। অনেকক্ষণ শূন্য লাগে মাথা, পুলিশের সাব ইন্সপেক্টরটি আমাকে বললেন—আপনার শরীর বোধহয় ভাল নেই। যাক গে, পরে হলেও চলবে।

পত্রিকার লোক দু' একজন আমাকে ধরে। আমি ভীষণ অবাক হয়ে চেয়ে থাকি, তারা সরে যায় অবশেষে। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উবু হয়ে বসে এক কোষ জল বমি করি।

দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা হল—প্রকাশ খতম।

মাসখানেক ভাল করে খেতে পারি না। বরাবর মন অস্থির হলে আমি বাইরে বেরিয়ে পড়ি। ঘুরে ঘুরে মন ঠিক হয়ে যায়। এখন আর তেমন বাইরেও যাওয়া হয়ে ওঠে না। ঘরেই বেশির ভাগ থাকি। অবিরাম পায়চারি করি। মাথার ভিতরে চিন্তার ঘূর্ণীঝড় ওঠে। মাঝে মাঝে বসে থাকি, বসেই থাকি।

পৃথিবীতে সুখকর বিস্মৃতি আছে। মানুষের দুঃসময়ে যা সবচেয়ে বড় বন্ধু। একটু দেরিতে আসে, কিন্তু আসে ঠিকই। আস্তে আস্তে ক্রমশঃ বিস্মৃতির প্রলেপ পড়তে থাকে।

boiRboi.net

দশ

একদিন রাত দুটো নাগাদ দরজার কড়া নড়ল। ঘুমের মধ্যে সেই শব্দ তীরের মতো বিঁধে কাঁপতে লাগল। জেগে উঠেও বুকের দুরদুর আর থামে না। দুলুও তার বিছানায় উঠে বসেছে; টের পেলাম। কিন্তু কিছু বলল না, জানালা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কে?

কয়েকটা ছেলে জানালার সামনে এগিয়ে বসে বলল—অতনুদা, আমরা।

চিনলাম। পাড়ারই ছেলে, যারা চৌরাস্তার মোড়ে আড্ডা মারে। দেখে ভয়ও পেলাম একটু।

তাদের মধ্যে একজন জানালার কাছে এসে নীচুস্বরে বলল—আমাদের মণিকে আজ পুলিশে তুলে নিয়ে গেছে। ওর কোনো দোষ নেই। ও-সি আপনার চেনা, যদি একটু বলে দেন।

একাজে আমি অভ্যস্ত। অতীতে বহুবার বহুজনকে ছাড়িয়ে এনেছি। কিন্তু এবার একটু ইতঃস্তত করতে থাকি। বলি—এত রাতে?

বলেই মনে মনে হাসলাম। কোনোকালেই আমার কাছে দিন-রাতের কোনো ভেদ ছিল না। এখন এইসব গৃহস্থের সংস্কার আমার আসছে। ভয় খামচে ধরেছে বুক। এইসব ছেলেরা চেনা হয়েও আমার অচেনা। কোন অছিলায় বার করে নিয়ে গিয়ে যদি মারে। মেরে ফেলে?

সামনের ছেলেটা বলল—এত রাতে আসতাম না। কিন্তু ওকে যদি মারধোর করে! একটা নির্দোষ ছেলে সারারাত মার খাবে!

হঠাৎ সাহস এল। ভাবলাম, এদের নিয়েই বাস। যদি এরা আমাকে পেতে চায়, তবে পাবেই কোনো না কোনো দিন। তাই তর্ক করলাম না। বুঝলাম, যদি পিছিয়ে যাই তবে এরা হয়তো বা চিরকালের মতো আমার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। এগোলে যদি বিপদ থাকে তো পিছোলেও বিপদ আছে। তাই বললাম—চলো, দেখা যাক।

গায়ে জামা চড়াতে চড়াতে অন্ধকারেই দুলুকে লক্ষ্য করে বললাম—সদরটা দিয়ে দিও। আমি ঘুরে আসছি।

অতীতে দুলু বহুবার রাতবিরেতে উঠে ঘুম-চোখে সদর দিয়েছে কিংবা খুলেছে, একটিও কথা বলে নি, এবার বলল—ওরা কারা?

—পাড়ার ছেলে।

—চেনো তো?

—চিনি।

boiRboi.net

একটু চুপ করে থেকে বলল—কীরকম চেনো? ভাল করে?

চাপা গলায় বললাম—ওরা জানালার কাছেই আছে। শুনতে পাবে।

দুলেদু উদাস গলায় বলল—দেখতে পাচ্ছি।

তারপর উঠে এসে আমার পিছু পিছু সদর পর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতে বলল—ওদের জন্য আমার ছাত্রীরা এখানে আসতে ভয় পায়। রাস্তার মোড়েই ওরা থাকে। ওদের কাউকে যদি পুলিশ ধরে থাকে তো বেশ করেছে, তুমি ছাড়িয়ে এনো না।

উত্তর না দিয়ে দরজার হুড়কো খুললাম। ছেলেগুলো গম্ভীর নিস্তব্ধ মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। বললাম—চল।

—আপনাকে কষ্ট দিলাম অতনুদা, বৌদি হয়তো রাগ করছেন।

একটু কেঁপে উঠে বললাম—না না, রাগের কী। মানুষের বিপদে-আপদে দেখতে হয় না!

ওরা আর কিছু বলল না। কয়েকজন আমার আগে, কয়েকজন পিছনে হাঁটতে লাগল। বড় অদ্ভুত অবস্থা হল আমার। আগের দলকেও বিশ্বাস হচ্ছে না, পিছনের দলকেও না। রাস্তার মোড়ে একটা তেঁতুলগাছ, তার ঝুপসী ছায়া। ছায়াটা পেরোবার সময়ে চোখ বুজে বিড় বিড় করে বললাম—বোধহয় এইবার—এইখানে—।

কিন্তু ছেলেগুলো আমার দিকে তাকালও না। পিছনে কয়েকজন একটু দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল, দেশলাইয়ের শব্দ পেলাম। নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল। সারাটা রাস্তায় আমি হাঁটতে হাঁটতে ভয়ে ঘেমে গেলাম। অদূরে থানার আলো যখন দেখা যাচ্ছিল তখনো আমার ভয় কাটে নি।

থানার দেউড়ির একটু দূরে ছেলেগুলো দাঁড়িয়ে বলল—আপনি যান। আমরা এখানে রইলাম।

বললাম—তোমরাও এসো না।

একজন একটু হেসে বলল—আমাদের অনেকের নামেই ওয়ারেন্ট আছে। ঝামেলায় কাজ কী? এসব ব্যাপারে আপনি একাই একশো।

খুবই বিপন্ন বোধ করলাম এই ভেবে যে, এদের সঙ্গেই হয়তো এতটা পথ আবার আমাকে একা ফিরতে হবে। আজকাল পথ আর আমার ফুরোয় না।

চেনা ও-সি মুখ তুলে ভ্রূ তুললেন—আপনি!

আমি হাসলাম—ঐ যে মণি নামে ছেলেটা—

ও-সি অবাক হয়ে বললেন—সে তো আপনার দলের ছেলে নয়। বরং বোধহয় উল্টো পার্টির।

আমি উদাস গলায় বললাম—না। আমার পাড়ার ছেলে, আমি চিনি।

ও-সি মাথা নাড়লেন—এ ব্যাপারে আপনার চেয়ে আমার খবর বেশি পাকা। বরং আপনি ছেলেটিকে একবার দেখুন ভাল করে, আপনার ভুল হতে পারে—।

আমি ইতস্তত করছি দেখে ও-সি হাসলেন—দেখলেই বুঝতে পারবেন, এ আপনার দলের নয়। আসুন—

ও-সির সঙ্গে সঙ্গে উঠে লক-আপে গেলাম। ভিতরে একটি ছেলে মেঝের ওপর বসে আছে। ঘাড় পর্যন্ত তার লম্বা রুক্ষ চুল, গালে না-কামানো দাড়ি, বেশ লম্বা

ছেলেটা, কাঁধের হাড় চওড়া। গায়ে মাংস নেই, কিন্তু হাড়গুলো মজবুত। দুটো চোখ লালচে। আমাকে দেখে সেই লাল চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল। তাকে আমি আগে কখনো দেখেছি বলে মনে হল না।

শান্ত গলায় সে বলল – কী চাই?

আমি ও-সির দিকে তাকালাম, তাঁর মুখে সন্দেহের ছায়া।

মুখ ফিরিয়ে ছেলেটার সঙ্গে নকল পরিচিতের সুরে বললাম– কী হয়েছিল মণি? কী করেছিলে?

ছেলেটি একটু চেয়ে থেকে শান্ত গলায় বলল—আপনি এখানে কেন দালাল মশাই?

একটু থমকে গেলাম। বুঝলাম, ছেলেটা আমাকে চেনে। 'দালাল' কথাটা প্রমাণ করে যে, ছেলেটি আমার দলের নয়। বরং ও-সির কথাই বোধহয় ঠিক। ছেলেটা উল্টো পার্টির।

তবু মুখ বাঁচানোর জন্য চাপা স্বরে বললাম– মণি, কী হচ্ছে। আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

ভারি অবাক হল ছেলেটা। তারপর ধীরে ধীরে তার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে, মুখে দেখা দেয় রাগের রক্তিমাভা। দাঁতে দাঁত চেপে বলে– কে চায় ছাড়া পেতে? আপনি কোন পার্টির দালালী করেন আমি কি তা জানি না!

তার গলা হঠাৎ ক্ষ্যাপা কুকুরের চিৎকারের মত তুঙ্গে উঠে যায়। সে চেঁচিয়ে বলতে থাকে— যাদের দালালী করে এসেছেন এতদিন, তাদের জন্য দারোগার কাছে নাকে কাঁদুন গে। সাচ্চা বিপ্লবী চোখ দেখেছেন একটাও? আমি যখন বেরোব, এই থানার দেয়াল ভেঙ্গে বেরোব, আপনার মত দালাল কুত্তার হাত ধরে নয়। এই দারোগা, এটাকে বের করে দিন, আমার ঘেন্না করছে।

রাজনীতি করার একটা শিক্ষা হচ্ছে এই যে, নিজের রাগ অনুভূতি ইত্যাদির ওপর নিয়ন্ত্রণ আসে, অপমান সহ্য করার মত সহনশীলতা জন্মায়। আমি রাগলাম না। ও-সি কে একটু তফাত হতে বললাম। তিনি একটু হেসে সরে গেলেন।

আমি সেল্-এর কাছে গিয়ে ছেলেটিকে বললাম—তোমার বন্ধুরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তোমাকে তারা নিয়ে যেতে চায়।

ছেলেটার চোখ আবার ঝিকিয়ে উঠল। ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল— কারা আমার বন্ধু? তাদের নাম কী?

সকলের নাম আমার জানা ছিল না। দু' একজনের ডাক নাম জানতাম। বললাম– ভুলু মণ্ডল, শচী, এরা সব।

ছেলেটা হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে সন্দেহে কুটিল হয়ে গেল তার মুখ, গরাদের শিক ধরে উঠে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে হঠাৎ আমার গায়ে একঝলক থুথু ছুঁড়ে দিল সে। দাঁতে দাঁতে ঘষে বলল—ওরা আমার বন্ধু? কুকুরের বাচ্চা, আমি তোমার মতলব বুঝি না?

থুথুর ভয়ে আমি পিছিয়ে এসেছিলাম। তাছাড়া ছেলেটার রাগের তাপও আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। আমার ভয় করছিল। আমি অবাক হয়ে বললাম

—ওরা তোমার বন্ধু নয় ?

ছেলেটা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল—ওরা আমার কীরকম বন্ধু আপনি জানেন না ? না জেনেই এত কষ্ট করে মাঝরাতে বৌয়ের কোল ছেড়ে উঠে এসেছেন ?

হঠাৎ আমারও কেমন সন্দেহ হচ্ছিল কোথাও একটা ভুল হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। তবু আমি ঐকান্তিকভাবে বলার চেষ্টা করলাম—ওরা তোমার বন্ধু কিনা জানি না। তবে ওরা ভয় পাচ্ছে পাছে তোমাকে পুলিশে মারধোর করে, তাই আমাকে ডেকে এনেছে।

ছেলেটা দুই শক্ত হাতে এত জোরে গরাদ চেপে ধরল যে তার আঙুলের মাথাগুলো শাদা হয়ে গেল। তেমনি ঠাণ্ডা রাগের গলায় বলল—আমাকে মারধোর করার সাহস এদের নেই। যদি করে, তবে নির্বংশ করে দেব। কিন্তু ঐ যারা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, তারা কেন দাঁড়িয়ে আছে, আমি জানি। আপনি ওদের হয়ে কেন এসেছেন তাও জানি। দালাল আর কুত্তার দল কেউ থাকবে না। আপনার দিন শেষ হয়ে এসেছে—ওদেরও।

এই বলে হঠাৎ সেল্-এর দরজাটা ঝনাৎ করে খুব জোরে নাড়া দিয়ে ছেলেটা ডাকল—এই দারোগা—

ও-সি ধীরে সুস্থে এলেন। আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে চোখে ইঙ্গিত করলেন। আস্তে বললেন—বলেছিলাম কিনা!

ছেলেটা চেঁচিয়ে বলল—এ লোকটা এখানে কেন এসেছে জানেন ?

ও-সি বললেন—অতনুবাবুকে আমি চিনি।

ছেলেটা শিকের ওপর জোর একটা ঘুঁষি মেরে বলল—ছাই চেনেন! বাইরে কতগুলো কুত্তা দাঁড়িয়ে আছে, আর এটা হচ্ছে সেই কুত্তাদের এজেন্ট। আমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে এসেছে, বাইরে নিয়ে গিয়ে—হিস্‌হিস্—বলে ছেলেটা হাত তুলে নিজের গলায় নলীটার ওপর চালিয়ে দেখাল। তারপর হাসল। বলল—গলাটা কেটে ফেলবে।

ও-সি তাকিয়েছিলেন।

ছেলেটা গনগনে মুখে বলল—একে আপনি কিছুই চেনেন না।

ও-সি আমার দিকে ফিরে বললেন—বাইরে কারা দাঁড়িয়ে আছে ?

আমার ভয়ংকর বুক কাঁপল। আমার বিরুদ্ধে বহু ষড়যন্ত্রই আমি ধরতে পারি নি। মনে হচ্ছিল বেশির ভাগ মানুষই আমার চেয়ে চালাক। আমি বড় বোকা রয়ে গেছি।

নামগুলো ও-সি কে বললাম।

তিনি রুদ্ধশ্বাসে বললেন—এতক্ষণ বলেন নি কেন ? ওদের আমরা খুঁজছি—

বলতে বলতে তিনি হাতে স্বয়ংক্রিয় রিভলবার টেনে বের করে ব্যস্তভাবে চলে যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে বলে গেলেন—পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি। ওরা কোথায় আছে ?

—বাদামতলায়।

মুহূর্তের মধ্যে বুটের শব্দ ঝড়ের মতো ছোটাছুটি করল। একটা জীপের

শব্দ পেলাম। ব্যস্ততা।

শরীরের ভয়ঙ্কর অবসাদ টের পেয়ে আমার পা ভেঙে আসছিল। আমি আস্তে আস্তে আস্তে দেওয়াল ধরে মেঝেতে বসে পড়লাম।

মুখোমুখি সেল্-এর ভিতরে শিকের ফাঁক দিয়ে ছেলেটা আমার দিকে চেয়ে আছে। তেমনি জ্বলজ্বলে চোখ। আমাকে বসে পড়তে দেখে একটু হাসল। বলল—খুব খারাপ লাগছে? লাগবেই—প্ল্যানটা ভেস্তে গেল।

আমি মাথা নাড়লাম। বললাম—আমি কিছুই জানি না।

ছেলেটা ব্যঙ্গের হাসি হাসল—জানেন না।

—না।

ছেলেটা মুখে জিভ দিয়ে চুক্ চুক্ শব্দ করে বলল—আমার দলের ছেলেরা যখন আপনার পাত্তা নেবে তখন একথা বলবেন।

ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে টের পেলাম, আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত এক অদ্ভুত অসহনীয় ভয়। আমার সমস্ত শরীর কাঁপছে। আমি সম্মোহিতের মত ছেলেটার দিকে চেয়ে রইলাম। এরকম রাগ আর তীব্রতা আমি আর কোন মানুষের মধ্যে দেখি নি। ছেলেটার রাগ, ব্যঙ্গ, ঠাট্টা, শান্তভাব—সব যেন এক সুরে বাঁধা। একটা চরম বা শেষ কিছু করার জন্যই যেন জন্মেছে। স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, এর আয়ু বেশি না। খুব অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এর তার হাতে খুন হয়ে যাবে। কিন্তু যতক্ষণ ও বেঁচে আছে, ততক্ষণ ওর বেঁচে থাকার তীব্র স্পন্দন চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। ওকে ভয় না পেয়ে উপায় নেই।

আমার গলার স্বর ভেঙে অন্য রকম হয়ে যাচ্ছিল, কাঁপছিল বুক, হাত, পা। মাথার মধ্যে গুলিয়ে যাচ্ছে বোধবুদ্ধি। আমি বললাম—আমি তোমাকে চিনতাম না মণি।

ঠাণ্ডা গলায় সে বলল—চিনবেন! সময় যায় নি।

বুঝলাম, ওর কোন মায়া দয়া নেই।

আমি মিনমিন স্বরে বললাম—আমাকে ওরা ভুল বুঝিয়েছিল। আমি বুঝতে পারি নি যে, তুমি ওদের দলে নও।

ছেলেটা শরীর ঝাঁকি দিয়ে বলল—আমি কুত্তাদের দলে কেন যাব। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে মেয়েদের শিস্ দেওয়া কি কাজ? সাচ্চা বিপ্লবীরা ওসব ঘেন্না করে—বলে ছেলেটা সেল্-এর মধ্যে থুথু ফেলল।

তারপর আবার হাসল—আপনি চিরকাল এর-ওর পা চেটে এসেছেন, বিধানসভার নমিনেশনের জন্য। আজ আবার এদের পা চাটছেন—কিসের জন্য? আমি আপনাকে এবং আপনাদের চিনি, এবার আপনারা একটু আমাদের চিনুন। আমার নাম মণি বোস—এঞ্জিনীয়ারিংয়ের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র ছিলাম। ভাল ছাত্র—পরীক্ষা দিলে ফার্স্ট ক্লাস পেতাম। মাদ্রাজে আমার বাবা আমার জন্য ভাল চাকরি ঠিক করে রেখেছিল। আমাকে বিয়ে করার জন্যে ছেলেবেলা থেকে একটি খুব সুন্দর মেয়ে অপেক্ষা করে আছে। সব কিছুই ছিল আমার ফেভারে। সে-সব ছেড়ে আমি বিপ্লবে নেমেছি কেন?

আমি ভীতমুখে তাকিয়েছিলাম। প্রশ্ন করলাম—কেন?

ছেলেটা হাসল, বলল—কারণ বিপ্লব মানে আমি মিছিল-মিটিং বুঝি না। বিপ্লবের মানে কাডারদের লক্-আপ্ থেকে ছাড়িয়ে আনাও নয়। বিপ্লব মানে বিধান-সভার সীট পাওয়াও নয়। আর বিপ্লবী বলেই আমি বৌয়ের পয়সায় বসে খাব—এও হয় না। লরীর পারমিটের জন্য ঘুরব তাও হয় না।

এই পরিণত বয়সে আমি এই প্রথম একটি বাচ্চা ছেলের কাছে বিপ্লবের মানে শুনছিলাম। বেশ উৎকর্ণ হয়েই শুনছিলাম।

ছেলেটি লক্ আপের ভিতর থেকে এমনভাবে আমাকে দেখছিল, যেন আমিই লক্-আপে আছি, সে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

বলল—সত্যিকারের বিপ্লব এ সব কিছুকেই ধুয়ে-মুছে দিয়ে যাবে। আমি সব ছেড়েছি কাজেই সব কিছুর শেষ দেখে যাব।

বলে সে মুখ ফিরিয়ে নিল।

জীপের শব্দটা ফিরে এল।

ছেলেটা উৎকর্ণ হয়ে শব্দ শুনল। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল—পুলিশ আপনার কুত্তাদের কয়েকজনকে বোধহয় ধরে এনেছে। এবার যান, দারোগার পা চেটে খালাস করুন গে।

আমি উঠলাম। দুর্বল লাগছিল খুব।

বাইরে থানার হাতায় তখন জীপটা থেমেছে। ও-সি নামলেন। গম্ভীর মুখ। জীপের পিছন থেকে সিপাইরা ধরাধরি করে একজনকে নামাচ্ছিল। তারা শরীর থেকে রক্ত পড়ছে টপ্ টপ্ করে। ছেলেটার মুখ আমি দেখলাম না। চোখ ফিরিয়ে বাইরের রাস্তায় ম্লান ল্যাম্পপোস্টের আলো ঝুপসী গাছের ছায়া, এবং দূরবর্তী বিরাট, ব্যাপক অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলাম।

ও-সি আমাকে ডাকলেন—অতনুবাবু, ভিতরে আসুন। কথা আছে।

টেবিলে মুখোমুখী বসে আমি ও-সিকে সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিলাম। যেমন বরাবর দিই। উনি সিগারেট নিলেন না। হাতটা নেড়ে বললেন—একজনকে ধরেছি, কিন্তু আনহার্ট নয়। এক্ষুনি হাসপাতালে পাঠাতে হবে। তবে আগে আপনি একটু দেখুন। আইডেন্টিফাই হওয়া দরকার।

আমি চুপ করে রইলাম।

সিপাইরা ছেলেটাকে বারান্দায় শুইয়ে প্রাথমিক ওষুধপত্র লাগাচ্ছিল। আমি উঠে গিয়ে দেখলাম। মাথার একটা দিক থেঁতলে গেছে প্রায়, পায়ের দিকটা গুরুতর জখম। মুখটা দেখে চিনলাম, যে ছেলেটা সবার আগে-ভাগে ছিল সে-ই, নাম জানি না।

ও-সিকে বললাম—নাম জানি না। তবে ঐ দলে ছিল।

ও-সি আবার হাত নাড়লেন—ঠিক আছে। নাম-ধাম আমারা পেয়ে যাব। দলে ছিল কিনা সেটাই বড় কথা।

তিনি আবার আমাকে ঘরে এনে বসালেন। কিছু একটা লিখলেন ডায়েরিতে, তারপর পেন্সিলটা তুলে মুখের সামনে আড়াআড়ি ধরে বললেন—মনে হচ্ছে, আপনি

ওদের ভাল করে চেনেন না।

আমি মাথা নাড়লাম—না। তবে পাড়ার ছেলে, চিনি।

ও-সি শ্বাস ছেড়ে বললেন—সেই মুখচেনার ওপর নির্ভর করে এত রাত্রে ওদের সঙ্গে আসা আপনার ঠিক হয় নি। ওরা আপনাকে কাজে লাগিয়েছিল। আপনার কথায় আমি বোসকে ছেড়ে দিলে আজ রাত্রেই মণি মার্ডার হত ওদের হাতে। তখন আপনি কী করতেন।

আমি নিঃশব্দে সিগারেট টানতে লাগলাম।

উনি আবার বললেন—কতখানি ঝুঁকি নিয়েছিলেন, বুঝতে পারছেন?

আমি মাথা নাড়লাম। পারছি।

উনি হাসলেন—আপনাদের আমলে রাজনীতি একরকম ছিল। এখন অন্যরকম। একটু বুঝে চলবেন।

আমি মাথা নাড়লাম।

উনি শ্বাস ছেড়ে বললেন—এখন আপনি একটু বিপদের মধ্যে আছেন কিন্তু। ঐ দলের বারা পালিয়েছে তারা পাড়ার রাস্তাতেই বোধহয় অপেক্ষা করছে আপনার জন্য।

আমি শীতলতা অনুভব করলাম শরীরে।

উনি বললেন—আমাদের প্রিজন ভ্যান ছেলেটাকে হাসপাতালে পৌঁছে দেবে। আপনিও ঐ ভ্যানে চলে যান। হাসপাতাল ঘুরে আপনার বাড়িতে দিয়ে আসবে।

কথা বলতে পারছিলাম না। কেবল আবার মাথা নাড়লাম।

দুলু জেগে অন্ধকার ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ি থামতেই এসে দরজা খুলল। আমি ঢুকতে সাবধানে আবার দরজা দিয়ে বলল—তুমি পুলিশের গাড়িতে এলে?

—হুঁ।

—কেন?

—ওরাই পৌঁছে দিল।

দুলু শ্বাস ছেড়ে বলল—একটু আগে দুটো ছেলে এসে খোঁজ করে গেছে তুমি ফিরেছ কিনা।

আমি অন্ধকারে কেঁপে উঠলাম। বললাম—কেন?

—কেন তা তো আমিই জানতে চাইছি। তুমি তো ওদের সঙ্গেই গিয়েছিলে, তবে ওরা তোমার খোঁজ করেছিল কেন?

—তুমি ওদের জিজ্ঞেস করোনি?

—করেছিলাম। ওরা কেবল বলল, কাজ আছে।

ঘরে ঢুকে দুলু বাতি জ্বালতে হাত বাড়িয়েছিল। আমি নিষেধ করলাম—বাতি জ্বেলো না।

—কেন?

—দরকার কী। আলো জ্বাললে ছোটনটা হয়তো জেগে যাবে। অন্ধকারে

boiRboi.net

জমাটা ছেড়ে শুয়ে পড়ব এক্ষুনি।

দুলু আলো জ্বালল না। একটু চুপ করে হঠাৎ বলল—জানালাটা বন্ধ করে দেব?

আমি থমকে গেলাম। দুলু বোধহয় বুঝতে পেরেছে কিছু।

একটু ইতস্তত করে বললাম—দাও।

জানালাটা শীত-গ্রীষ্ম সব সময়ে খোলা থাকে। আবছা একটু রাস্তার আলোর আভা ঘরে আসে। দুলু জানালাটা বন্ধ করতেই নিবিড় অন্ধকার আর গুমোটে ঘর ভরে গেল। তবু নিশ্চিন্ত। এখন আর বাইরে থেকে আমাকে দেখা যাবে না।

শোওয়ার কোন মানে হয় না। ঘুম অসম্ভব। একটা সিগারেট জেবলে বিছানায় বসলাম মশারি সরিয়ে। দুলু তখনো শোয় নি। অন্ধকারেই জল খেল। তারপর তার হাই তোলার শব্দ পেলাম।

—তুমি কতক্ষণ জেগে থাকবে? দুলু জিজ্ঞেস করে।

—বেশিক্ষণ না। সিগারেটটা শেষ করেই শোব। তুমি শুয়ে পড়ো।

অন্ধকারে ওকে দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু টের পেলাম, ও আমার কাছে আসছে। শাড়ির শব্দ, চুড়ির শব্দ, মারকোলাইজড ওয়াক্স-এর গন্ধ। আমার গা ঘেঁসে বসল এসে। তারপর হাত বাড়িয়ে আমার সিগারেটটা কেড়ে নিয়ে বলল—আমি একটু খাই।

অন্ধকারেই দেখলাম, ও সিগারেট টানছে। আগুনের আভায় মাঝে মাঝে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে মুখ। বাধা দিলাম না। অনেকক্ষণ সিগারেটটা খেল দুলু, শেষ ধোঁয়া মুখ থেকে বের করে বলল—মাথা ধরেছিল খুব। সিগারেটে সেরে গেল। বেশ জিনিস তো! এবার থেকে মাঝে মাঝে খাবো।

—খেও।

—বকবে না?

হাসলাম। দুলুকে তো কখনো আমি বকি না।

নিবিড় অন্ধকারে দুলুর একখানা নরম ভারি হাত আমার গলাটা জড়িয়ে ধরল, পরমুহূর্তে আর একখানা হাত জড়াল আমার পিঠ। ওর উষ্ণ দুই ভেজা ঠোঁট চুম্বকের মত লাগল এসে আমার ঠোঁটে। আমি ওকে দুই হাতে ধরে বললাম—আস্তে, মশারি ছিঁড়বে।

—ছিঁড়ুক।

দুলুকে আমি ঠিক বুঝি না। মুহূর্তে মুহূর্তে ও পালটে যায়। কখনো আমাকে চেনেই না, কখনো বা এত বেশি চেনে যে, আমার হাঁফ ধরে যায়।

ঠাট্টা করার মত মন নেই। তবু বললাম—হয়তো আবার ছোটনের মত কোন দুর্ঘটনা ঘটে যাবে।

ও ঘন শ্বাসের সঙ্গে বলল—ঘটুক।

আমি মশারি তুলে দুলুকে বিছানার ভিতরে আনলাম। দুলু আমাকে তার আদর সোহাগ দিয়ে যথেষ্ট আক্রমণ করছিল। খুবই সুখের ঘটনা সেটা। কালেভদ্রে আমি দুলুর স্বাদ পাই। কিন্তু এই মুহূর্তে দুলুকে শরীরে জড়িয়েও আমি ওর

স্বাদ পাচ্ছিলাম না। অন্ধকারে আমার চোখের সামনে তখন সেল্-এর গরাদের ফাঁক দিয়ে তীব্র একখানা তাম্রাভ মুখ ধক্ ধক্ করে জ্বলছে। কেবলই টের পাচ্ছি, শিয়রের বন্ধ জানালার ওপাশে কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে।

আমার অনিচ্ছা বোধহয় বুঝতে পারল দুলু। হঠাৎ আদর থামিয়ে বলল—কোনদিন তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করি নি, আজ করছি—ঐ ছেলেদুটো তোমার খোঁজ করছিল কেন?

—কি জানি।

—তুমি কেন পুলিশের গাড়িতে ফিরলে?

হাসলাম।—বললাম তো ওরা এদিকেই আসছিল, আমাকে পেঁছে দিল। একটু চুপ করে থেকে দুলু আবার জিজ্ঞেস করে—আমার আদর তোমার ভাল লাগছে না কেন?

—লাগছে তো।

—না। তুমি খুব অন্যমনস্ক। সেই ছেলেটা ছাড়া পায় নি বুঝি?

আমি অবসন্ন গলায় বললাম—না।

—কেন? ও-সি তোমার কথা শুনলেন না?

—তা নয়। ছেলেটা ছাড়া পেতে চাইল না।

—জামিনেও না?

—না।

—কেন?

—এখনকার ছেলেদের ধাত আলাদা। ওরা কষ্ট পেতে ভালবাসে। কষ্ট দিতেও।

দুলু আমার কাছেই শুয়ে রইল। অন্য বিছানায় গেল না। আমি তাকে মাঝে মাঝে আদর করছিলাম, যান্ত্রিকভাবে। আদর না করলে পাছে ও কিছু মনে করে। ওদিকে আমি উৎকর্ণ হয়ে আছি কখন আমার শিয়রের জানালায় টোকা পড়ে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য টোকা পড়ল না। বোধহয় আমাকে পুলিশের গাড়িতে ফিরতে ওরা দেখছে। হয়তো পুলিশের গন্ধেই ওরা আসছে না। কিন্তু আসবে। আজ না হয় কাল। দেখা হয়ে যাবে। হয় ঐ দলের সঙ্গে, নয়তো ও দলের। কোথায় পালাবে বাবা—হুঁ। হুঁ।

আমার কোলের কাছেই দুলু ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভোরের আবছা আলোয় তার ঢলঢলে মুখখানা মন দিয়ে দেখলাম। দুলু আমাকে ভালবাসে? কেউ কি ভালবাসে? কারো কাছে কি এখনো আমার কোন মূল্য আছে? ভাবতে ভাবতে ভোর রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লাম।

বেলায় ঘুম ভাঙল। টের পেলাম, ঘুমের মধ্যে আমি অস্বস্তিকর স্বপ্ন দেখছি। সারা শরীরে জ্বরের অবসাদ। মুখ তেতো। সবচেয়ে ক্লান্ত মন। কিছু ভাবতে পারছি না। মাথার মধ্যে নানা চিন্তা গুলিয়ে যাচ্ছে। সে দিনটা আর বেরোলাম না। শুয়ে রইলাম। ঝিমুলি মর্নিং স্কুল থেকে ফিরে এসে আমার মাথা টিপে দিল। অনেকক্ষণ ছোটনকে বুকে নিয়ে তার শরীরের গন্ধ নিলাম। ভাল লাগছিল।

বিকেলের দিকে দুলু স্কুল থেকে ফিরল। ওর মুখ-চোখ সাদা দেখাচ্ছিল। স্কুল থেকে ফিরে ও রোজ দুটো ভাত খায়। আজ খেল না। শাড়ি-টাড়ি পাল্টে, বাথরুম ঘুরে এসে অনেকক্ষণ ধরে চুল আঁচড়াল। আমি অপেক্ষা করছিলাম, হয়তো ও আমাকে কালকের ব্যাপার আর কিছু জিজ্ঞেস করবে।

কিন্তু সে ব্যাপারে কোন কথা বলে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে বলল—তুমি আজ বেরোও নি?

—না।

—সে কী! সূর্য আজ কোন দিকে উঠেছিল?

হাসলাম, বললাম—শরীরটা ভাল নেই। বয়সও হচ্ছে।

—সেটা বুঝতে এত সময় লাগল।

চুপ করে রইলাম।

ও মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—শরীরটা আমারও ভাল যাচ্ছে না ভাবছি কিছুদিন বাইরে থেকে ঘুরে এলে কেমন হয়! যাবে?

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম—তুমি যেতে চাও? কিন্তু তোমার স্কুল, আর টিউটোরিয়াল?

—তারা পালাবে না। ছুটি নিচ্ছি।

একটু ভেবে বললাম—আমার তো অনন্ত ছুটি। কবে যাবে?

—কালই চল।

অবাক হয়ে বলি—এত তাড়াতাড়ি?

ও আয়নার দিকে তাকিয়ে সিঁথিতে সিঁদুর দিতে দিতে বলল—তাড়াতাড়িই ভাল। দেরি করলে উৎসাহ নিভে যায়। তা ছাড়া আবার কোন বাধা আসে ঠিক কী!

ইতস্তত করে বললাম—কিন্তু যাওয়ার তো একটা প্রস্তুতি আছে। রিজার্ভেশান নেই, কোথায় যাওয়া ঠিক নেই, তা ছাড়া পার্টি-অফিসে আর দুচার জায়গায় খবরও দিয়ে যেতে হবে—

ও দৃঢ় গলায় বলল—না। কোথাও খবর দিতে পারবে না। আমরা চুপ করে চলে যাব, বাড়ির লোক ছাড়া কেউ জানবে না, কোথায় যাচ্ছি তা বাড়ির লোককেও বলে যাব না।

অবাক হয়ে বললাম—কেন?

—আমার ইচ্ছে। ছেলেবেলা থেকে আমার একটা শখ ছিল কারো সঙ্গে পালিয়ে যাবার। যাওয়া হয় নি। বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, তাই শখটা মিটিয়ে নিই। তোমার সঙ্গে কাল আমি পালাব।

ক্লিষ্ট হাসলাম। বললাম—ছেলেমেয়েরা?

—ওরাও যাবে।

—কোথায় যাওয়া হবে?

—এখন বলব না। স্কুলের বেয়ারাকে টিকিট কাটতে পাঠিয়েছি, সন্ধ্যে নাগাদ এসে দিয়ে যাবে।

—কিন্তু থাকার জায়গা ?

ও হাসল, ব্যাগ থেকে একটা চিঠি বের করে দেখিয়ে বলল—যেখানে যাচ্ছি সেখানে সারাবছর অনেক বড়লোকের বাড়ি খালি পড়ে থাকে। তাদের একজনকে পটিয়ে এই চিঠি এনেছি। ওখানে মালী থাকে। চিঠি দেখালেই সে বাড়ি খুলে দেবে।

এত অল্প সময়ে এত ব্যবস্থা দুলু করেছে দেখে খুবই অবাক হলাম। কিন্তু প্রতিবাদ করলাম না। উত্তর বাংলা ছাড়ার পর দশ বছর হয়ে গেছে কোথাও যাওয়া হয় নি। গাছপালা, পাহাড়-জঙ্গলের জন্য মন কাঁদে। তাই হঠাৎ এ অবস্থায় ভালই লাগছিল। কিন্তু ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছিলাম না। দুলু কি টের পেয়েছে আমার খুব বিপদ !

আমার বাবা এই বুড়ো বয়সেও মেরুদণ্ড সোজা রেখে রোজ বিকেলে অনেকটা হেঁটে আসেন। সেদিনও এলেন। এসেই উত্তেজিত ভাবে বাইরের ঘরে মাকে জিজ্ঞেস করলেন—অনু কই ? বাইরে-টাইরে যায় নি তো ?

মা বললেন—না বোধহয়। বিকেলেও ঘরে শুয়ে ছিল। শরীরটা বোধহয় ভাল নেই।

—না বেরিয়ে ভাল করেছে। দিনকাল বড় খারাপ।

—কেন ?

—বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, হঠাৎ নজরে পড়ল দেয়ালে কারা ওর নামে কী সব লিখছে। অনেকগুলো দেয়ালেই লেখা।

—কি লিখেছে ?

—চোখে ভাল দেখি না, ঠিকমত পড়তে পারি না। তবে মনে হল লিখেছে—বিশ্বাসঘাতক, মুণ্ডু চাই, আরো কী কী যেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে ঠিক সাহস হল না।

ঘর অন্ধকার হয়ে এসেছিল। মশার জন্য টেকা যাচ্ছিল না। আমি আস্তে আস্তে উঠে বসলাম। দুলু কেন কালকেই আমাকে নিয়ে পালাতে চাইছে তা খানিকটা বোঝা গেল।

মা তখনো ব্যগ্রকণ্ঠে বাবাকে জিজ্ঞেস করছে—ওর নামে লিখবে কেন ? ও তো কিছু করে নি।

বাবা তেতো গলায় বললেন—আর কিছু না করুক পলিটিক্স তো করেছে।

—কিন্তু কারো ক্ষতি করে নি। আমি ওকে জানি।

—আরো কারো না করুক, নিজের ক্ষতি যথেষ্ট করেছে। কাল রাতে যারা ওকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল তাদের একজন ধরা পড়েছে, শুনেছিলাম।

—তাকে কি ও ধরিয়ে দিয়েছে ?

—কী জানি।

মা চুপ করে রইল।

অন্ধকারে বসে নিঃশব্দে আমি এইসব শুনলাম। মনটা বিস্বাদে ভরে গেল। কারা বিশ্বাসঘাতক তা আমি জানি না। তবে এটুকু জানি, কাল রাতে নিজের

boiRboi.net

অজ্ঞাতে আমি একটি ফাঁদে পা দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার বাবা কি মনে করেন, বিশ্বাসঘাতক আমিই! আর দুলু? সে কী ভাবছে? আমার ওপর কি এদের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! এতক্ষণ আমি এদিকটা ভাবি নি। ভেবে মন বড় খারাপ হয়ে গেল।

কাউকে কিছু জানানো হল না। পরদিন সন্ধ্যের পর ট্যাক্সি ডাকা হল। স্তব্ধতা, ভয়, সন্দেহের মাঝখানে আমি, দুলু আর আমার তিন ছেলেমেয়ে হাওড়া স্টেশনে এসে গাড়ি ধরলাম।

রওনা হওয়ার সময়ে বাবাকে বলেছিলাম—সাবধানে থেকো।

বাবা গম্ভীর চিন্তিত গলায় বললেন—আমরা বুড়ো হয়েছি। আমাদের জন্য আর চিন্তা কী! তোমাদের এখনো বয়স আছে, সাবধানে তোমরা থেকো। বুদ্ধি-বিবেচনা হারিয়ে ফেলো না। চারদিকে বিপদ।

এগারো

'বিপদ' কথাটা সারারাত গাড়ির শব্দের সঙ্গে নূপুরের মত বাজল। সারারাত দুলু আর ছেলেমেয়েরা থার্ডক্লাশের ভিড়ে শুয়ে বসে ঝিমোলো, আমিই কেবল অপলক চোখে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলাম।

ভোর-রাত্রে যশিডি জংশনে গাড়ি থামল। আমরা নামলাম।

আবছা অন্ধকারে টাঙ্গা চড়াই-উৎরাই ভেঙে চলেছে। ঘোড়ার পায়ের কপ্ কপ্ শব্দ। আমার গা ঘেঁষে দুলু। দুলুর কোলে ছোটন ঘুমোচ্ছে। তিতু টাঙ্গা-ওয়ালার পাশে জড়োসড়ো হয়ে বসে ভোরবেলার দেওঘর দেখছে। ঝিমুলি টাঙ্গার ছইয়ের তলায় হাঁটু মুড়ে বসে আছে। ওর মুখে চোখে ভয়। যেতে যেতে মাঝে মাঝে আকাশের দিকে চেয়ে দেখছিলাম। স্তব্ধ, হিম আকাশ। মনটা জুড়িয়ে যাচ্ছিল। আজকাল দেখছি আকাশের দিকে তাকাতে ভাল লাগে।

দুলুকে সে কথা বললাম।

সে হাসল—আকাশ সংসারের বাইরের জিনিস, তাই তোমার ভাল লাগে। সংসারের কিছু তো কোনদিন ভাল লাগল না তোমার।

এই কথা শুনে দুলুর দিকে তাকালাম। আবছায়ায় দেখলাম, সেই মুখে প্রশান্ত ভাব। কলকাতা থেকে হঠাৎ বাইরে এলে বিশাল প্রকৃতির মধ্যে মানুষের খুব অবাক লাগে। সেই বিস্ময় ওর মুখে ফুটে আছে।

বললাম—সংসারের বাইরে এসে তোমার খারাপ লাগছে?

—না। ও মাথা নাড়াল, তারপর হেসে বলল—আমিও আকাশ দেখছি। বুড়ো

boiRboi.net

বয়সে বোধহয় এইসব ভাল লাগে। আমরা বুড়ো হলাম।

হঠাৎ আমার বুক মুচড়ে উঠল একটা দুঃখে। আচমকা বললাম—দুলু, তুমি আমাকে সন্দেহ করো না তো ?

ও অবাক হয়ে বলল—কেন ?

আমি বললাম—ঐ ছেলেটাকে কিন্তু আমি ধরিয়ে দিই নি।

দুলু চুপ করে রইল।

খানিকটা ভেবে আমি আস্তে আস্তে শ্বাস ছেড়ে আবার বললাম—দুলু, আসলে ওকে বোধহয় আমিই ধরিয়ে দিয়েছি।

দুলু একটু শিউরে উঠল। তারপর অনেকক্ষণ স্তব্ধ থেকে বলল—তুমি পরশু থেকে ঘরের বার হও নি। তাই কোন খবর জান না। ছেলেটা কাল হাসপাতালে মারা গেছে। আজ সকালে শোক-মিছিল বেরোনার কথা। দেওয়ালে তোমার নামে পোস্টার পড়েছে।

একটা শ্বাস ছেড়ে বললাম—জানি।

দুলু তাড়াতাড়ি বলল—কিন্তু আমি জানি, ওরা বাজে ছেলে। তুমি কিছু অন্যায় করো নি।

আমি চুপ করে আকাশের দিকে তাকালাম। ওখানে বড় শান্তি মনে হল।

এখানে আমি আগে আর কখনো আসিনি। ভোরের আলোয় প্রথম দেখে জায়গাটি বড় ভাল লাগল। ছোট টিলা, পাহাড়, ছোট্ট নদী ধারোয়া, নানা চড়াই-উৎরাই জুড়ে নির্জন শহরের প্রসার। ক্যাস্টর টাউন খুবই নির্জন জায়গা। ইউক্যালিপটাস গাছ, আর বোগেনভেলিয়ার লতানে রঙিন ফুলের ভিতরে বাগানঘেরা বিরাট বাড়িগুলো ঝিমিয়ে আছে। বেশিরভাগ বাড়িতেই কেউ থাকে না। কালে-ভদ্রে লোকজন আসে। আমাদের বাড়িটা পুরনো, বাগানে খুব আগাছা জন্মেছে।

গেটের কাছে একটা বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে হাই তুলছে। আমাদের টাঙ্গা থামতেই দু'-এক পা এগিয়ে এল। লক্ষ্য করলাম, খোঁড়া। পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ডান পায়ের পাতাটা অর্ধেক নেই। তার উঁচু দাঁত পুরু দুই ঠোঁটে ঢাকা পড়ে না। তার ওপর সে আবার সব সময়েই হাসে।

জিজ্ঞেস করলাম—মালী নেই ?

সে ঘাড় নাড়ল—আছে।

—ডাকো তো।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে ভিতরে গেল। একটু পরেই বুড়ো মত একটা লোককে নিয়ে এল। অবাক হয়ে দেখি খালি গা আর ময়লা হেঁটো ধুতি পরা লোকটার চোখে ভারি একটা চশমা। একটা কাচ আবার ঘষা। বুঝলাম, হয় ও চোখটা নেই, নয়তো ছানি আছে।

আমাদের চিঠিটা সে হাত বাড়িয়ে নিল। তারপর ভাঙা বাংলায় বলল—আমার চোখ কমজোরী। এ কি দাশবাবুর চিঠি ?

—হ্যাঁ। ঘর-দোর খুলে দাও।

boiRboi.net

—জী।

তারপর সেই খোঁড়া ছেলেটাকে বলল—সামান উতরো।

টাঙ্গাওয়ালা আর সেই খোঁড়া ছেলেটাতে মিলে আমাদের মালপত্র ধরাধরি করে বারান্দায় তুলতে লাগল।

কাঠের জাফরি দেওয়া বারান্দা, তারপর বিশাল ঘরগুলি। প্রকাণ্ড দরজা খুলতেই পুরনো বাতাস বেরিয়ে এল।

বারান্দায় পা দিয়েই বললাম—দুলু, এ বাড়ি একপুরুষের নয়। ক্ষুধিত পাষাণ।

দুলু উত্তর দিল—হুঁ।

তারপর মালীকে বলল—ঘর-দোর ভাল করে পরিষ্কার করে দাও। কত পোকা-মাকড় বাসা বেঁধে আছে কে জানে।

বারো

বন্ধুগণ, ঐ যে দেখুন, একটা গুবরে পোকা দেওয়ালে ঠোক্কর খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ল। যেমন বোকা স্বভাব, তেমনি বেঢপ শরীর। হাত-পা নেড়ে প্রবল চি-রু-রু শব্দে চিৎ হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে, চেষ্টা করছে উপুড় হতে। ওকে লক্ষ্য করুন। উপুড় হয়ে ও করবে কি? আবার তো সেই ওড়া, উড়ে উড়ে দেওয়ালে ঠোক্কর খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আবার উপুড় হওয়ার চেষ্টা। নিরন্তর, অর্থহীন, একঘেয়ে এই চেষ্টা থেকে ওকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই পোকাটির ওপর স্প্রে গান-এর মুখটা ধরলাম আমি। নাক পর্যন্ত আমার মুখের অর্ধেক রুমাল বাঁধা। রুমালের আড়ালে আমি সামান্য একটু হাসলাম। বন্ধুগণ, পোকাটার জন্য আমার একটু মায়াও হচ্ছে। আমার হাতে নতুন কেনা স্প্রে-গান, তার মধ্যে তীব্র কীটানুনাশক বিষ। যন্ত্রটার হাতল টেনে আমার হাত একটু থেমে আছে। বস্তুতঃ এই পোকাটা মরতে চায় না। যতই অর্থহীন হোক তার বাঁচা, তবু সে বাঁচতেই চায়। বন্ধুগণ, স্প্রে-গান-এর ওপরে আমার হাত থেমে আছে. মুখ রুমালে ঢাকা, আমি এখন কী করতে পারি?

সামান্য একটু সময়। দ্বিধা বা মনুষ্যত্ব—যা বলুন। ঐটুকু সময় পোকাটা বেঁচে রইল। তারপর আস্তে হাতলটায় চাপ দিই। চিড়বিড় করে ওঠে পোকাটা, লাট্টুর মত ঘুরপাক খেতে থাকে। এবার দ্বিধাহীনভাবে জোরে স্প্রে করি আমি। তীব্র ঝাঁঝালো কীটানুনাশকের গন্ধে ভরে গেল ঘর। ধোঁয়ার মত তা ঢেকে ফেলল পোকাটাকে। শুনতে পাচ্ছি, পোকাটা চিৎকার করছে। ভাষাটা বোঝা যায় না। কিন্তু এসময়ে সকলেরই ভাষা এক আমি তা বুঝতে পারি, কিন্তু তা বলে থামি না। তীব্র ঝাঁঝ বিষে ভিজিয়ে দিই তাকে। হঠাৎ পোকাটা উল্টে গেল। উড়ল।

boiRboi.net

ভাবলাম, পালাবে বুঝি। পারল না। এক চক্কর ঘুরল ঘরের ভিতরে, তারপর দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে পড়ল। শেষ কয়েকটা চিরু-শব্দ। তারপর চুপ।

হাতের উল্টো পিঠে কপালের চুল সরিয়ে রুমালের আড়ালে একটু হাসি। নতুন কেনা পোকাদের বিষ, তার প্রথম শহীদ একটা গুবরে পোকা। হত্যাকারী অতনু সেন, একজন হতে-পারত এম. এল. এ.।

পা দিয়ে পোকাটাকে জোর একটা লাথি কষাই। খাটের দু পায়ার ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল সেটা। গো-ও-ল! গোলদাতা অতনু সেন—দুলুর স্বামী, তিতু-ঝিমলি ছোটনের বাবা।

রুমালের আড়ালে আমি হাসি। হত্যাকাণ্ডের সবে তো শুরু। এখনো অনেক বাকি। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকি খাটের নীচে। বহুকাল ধরে বন্ধ পড়েছিল ঘর। যদিও সকালেই আজ ভাল ঝাড়পোঁছ হয়েছে, জলের দাগ এখনো মুছে যায় নি, তবু বন্ধ ঘরের একটা গন্ধ আছেই। আর কে জানে, ফাটা মেঝে কিংবা দেয়ালে, কোন ঘুপচিতে কোথায় ঘাপটি মেরে আছে কাঁকড়া তেঁতুল বিছে। আরশোলাই কি কম। আর ছারপোকা। সবচেয়ে বেশি অবশ্যই মশা। কাজেই হত্যা-হাহাকারের সবে শুরু। রুমালের আড়ালে আমি হাসি। পিঁচ পিঁচ করে বিষের ঝরনা ছড়াই। ধুন্ধুমার লেগে যায় কীটের জগতে। চোঁ-ও-ও, চিড়িক, পিড়পিড়—কতরকম সর্বনাশের শব্দ ওঠে তাদের জগৎ থেকে! রুমালের উপর আমার দু'টি চোখ উগ্র কৌতূহলে তাদের লক্ষ্য করে। বিষে ভিজিয়ে দিই বাতাস। মশা আর শ্যামাপোকা, কয়েকটা বাচ্চা মথ দেয়ালে উড়ে উড়ে বসে, বিন্ বিন্ করে পাগলের মত ঘোরে। আমি স্প্রে-গান্ তুলে ধরি। মেঘের মত বিষ উড়ে যায় পোকাদের কাছে। নম্র স্পর্শ করে তাদের শরীরে। দেয়াল থেকে একটি একটি করে খসে পড়ে মশা, শ্যামাপোকা, মথ। দরজা-জানালা বন্ধ, কোথাও পালানোর উপায় নেই। বড় জোর চেষ্টা করে সিলিং পর্যন্ত উঠতে পার। তবে তাই ওঠো। তাতে পড়াটা হবে আরো চমৎকার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কীটানুনাশবের কণায় তেলতেলে হয়ে গেল ঘরের মেঝে। মেঝের ওপর মরা-আধমরা পোকা গিজ্ গিজ্ করছে। একটা লালচে ফড়িং বোধহয় উত্তরের ঘাসফুলের জঙ্গল থেকে এসে বেভুলে ঢুকে পড়েছিল। সে এখনো মরে নি। চিৎ হয়ে পড়ে থেকে শরীরের সরু নিম্নাংশ আমার দিকে আঙুলের মত একবার তুলল। হাঁটু গেড়ে ফড়িংটাকে একটু দেখি। ভারি সুন্দর তো! এমন লাল ফড়িং কখনো দেখি নি। আগে দেখলে জানালা খুলে তাড়িয়ে দিতাম। এখন আর কিছু করার নেই। সুন্দর ফড়িংটার দিকে চেয়ে বললাম—গিল্টি মিলর্ড। শান্তভাবে ফড়িংটা তার শরীর নামিয়ে নিয়ে মারা গেল। যতদূর দেখা যাচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র শান্ত। একটি পোকারও ওড়া-উড়ি নেই। বিষের ঝাঁঝে চোখে জল আসছে, সুড়সুড় করছে নাক। বাতি নিভিয়ে ঘর বন্ধ করি আমি।

বাইরের ঘরটায় সোফা, টেবিল, চেয়ার, ফুলদানী, একটা ক্যাম্পখাট। এই ঘরেও স্প্রেটা ভালই ছাড়লাম আমি। অভ্যাসে মানুষের লক্ষ্য স্থির হয়। প্রায় পঞ্চাশটা আরশোলা মরল আমার হাতে, একটা বাচ্চা ইঁদুর পালাল বটে কিন্তু একঝাঁক বিষ খেল সে-ও। একটা টিকটিকির বুকেও ঢুকে গেল খানিকটা বিষ।

একটা উড়ন্ত বোলতাকে কয়েক ঝাঁক বিষ খাওয়ালাম আমি। সেটা মরল। ক্রমে বাইরের ঘরটাও স্তব্ধ, বিষপূর্ণ হয়ে গেল।

এতক্ষণ প্রবল এক উত্তেজনা বোধ করছিলাম আমি। সেটা এবার থিতিয়ে এল। স্প্রে-গানটা রাখলাম উদোম টেবিলের ওপর। টস্‌টসে ঘাম জমেছে কপালে। রুমালের আড়ালে ভারী শ্বাস। ওষুধের গন্ধে গুলোচ্ছে পেট। শরীর ক্লান্ত।

বাতি নিভিয়ে দরজা খুলে বারান্দায় পা দিতেই একঝলক পরিষ্কার ঠাণ্ডা বাতাসে শীত করে উঠল। রুমালটা খুলে ফেলতেই পরিষ্কার বাতাসে ভরে গেল বুক।

বারান্দার সিঁড়িতে ছেলেমেয়ে নিয়ে বসে আছে দুলু। বসে আকাশপাতাল ভাবছে। ঝিমলি বসে আছে সিঁড়ির শেষ ধাপটায়, ওর পায়ের কাছে বুড়ো মালীর ছেলে বুধিয়া। বুধবারে জন্ম হয়েছিল বলে ওর এ নাম। দুপুরবেলা আমার ঘুম হয় না। খাওয়া দাওয়ার পর দুলু যখন ছেলেমেয়ে নিয়ে ভিতরের ঘরে ঘুমোচ্ছিল, তখন বাইরের ঘরে ক্যাম্প-খাটে শুয়ে আমি বুধিয়ার গল্প শুনছিলাম। গত বছর রেল ইয়ার্ডে কয়লা কুড়োতে গিয়েছিল, সে সময়ে খালাশীদের বড় বড় ছেলেরা তাড়া করে। পালাবার সময়ে লাইন ডিঙোতে গিয়ে আই বাপ্—এক শাণ্টিং এঞ্জিন। এঞ্জিনটা ওর পা মাড়িয়ে দিয়ে গেল। পায়ের জন্য ওর খুব একটা দুঃখ নেই। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে গেলে হাত-পা চোখ সব যে সবসময়ে ঠিকঠাক থাকবেই তার কোন মানে নেই। ওর বাবার একটা চোখে ছানি বেশী পেকে গিয়েছিল, ডাক্তাররা ছুরি চালাতেই খানিকটা পুঁজ বেরোলো—ব্যাস, চোখটা ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেল। আর একটা চোখেও ছানি আসছে, ওটা কাটলেও যদি পুঁজ বেরোয় তো পুরো দুটো চোখ অন্ধকার হয়ে যাবে—তা বলে কি বাবা কাঁদতে বসবে? ভিখ্‌মাঙ্গা সুরদাসেরা কি বেঁচে নেই? তেরো-চোদ্দ বছর বয়সে বুধিয়ার এই হল জীবন-দর্শন।

এখন ছিমলির পায়ের কাছে বসে সে ভূতের গল্প বলছে। দক্ষিণের ঐ শিমুল গাছের ডাল বেয়ে দু একটা পরী এসে নামে পিছনের গোলাপ-বাগানে। সুযোগ পেলে তারা মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে যায় তাদের রাজ্যে। দু চারদিন খুব তোয়াজ করে, নানা সুখাদ্য খাওয়ায়, গোলাপজলে স্নান করায়। সুন্দর ফুলের বিছানায় শুতে দেয়। তারপর আবার ফিরিয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু যাকে পরীতে নেয় সে ফিরে এলেও তার আর পৃথিবীর কিছুই ভাল লাগে না। না খাবার, না বিছানা, না ঘর-সংসার। সে তখন কেবলই পরীর রাজ্যের কথা বলতে থাকে। বলতে বলতে আর ভাবতে ভাবতে হয়ে যায় পাগল। খাবার খেতে পারে না বলে, না খেয়ে খেয়ে হয়ে যায় কাঠির মত রোগা। তারপর একদিন মরে যায়। কতদিন বুধিয়ার বাপ রাতবিরেতে গোলাপবাগানে জ্যোৎস্নার মত গায়ের রংওয়ালা পরীদের দেখেছে।

দুলুর দিকে চেয়ে বললাম—আর আধঘণ্টা। তারপর দেখো, আর একটাও পোকামাকড় নেই।

দুলু অন্যমনস্কভাবে গেট-এর দিকে চেয়েছিল। আমার কথায় চমকে উঠে মুখ ফেরাল। একটুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল—কয়েকটা ছেলে রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেল।

এইমাত্র।

—তাতে কী হয়েছে।

দুলুর মুখ গম্ভীর। বলল—এদিকে খুব তাকাতে তাকাতে যাচ্ছিল।

ভিতরে ভিতরে একটু চমকে উঠলাম। অজান্তে আমার মুখের রক্ত সরে যাচ্ছিল। সামলে নিয়ে হাসলাম—কত ছেলে আছে! এখানকার লোকাল ছেলেই হবে হয়তো।

—তাহলে তাকাবে কেন?

—বাঃ! খালি বাড়ীতে নতুন লোক এলে তাকায় না?

দুলু তবু স্বস্তি পেল না। ওর কোলে ছোটন ছটফট করছে। তবু আঁকড়ে ধরে আছে দুলু। সে অন্যমনস্ক।

আমি ছোটনের দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম—আয় বাবা, চল বেড়িয়ে আসি।

ছোটন হাত বাড়িয়ে আসছিল। দুলু তাকে আমার দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে থমকে বলল—হাত ধুয়েছ?

—না তো!

—পোকামারার ওষুধ বিষ—জান না?

—খেয়াল ছিল না।

—খেয়াল রাখতে হয়। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর—

ছোটন হওয়ার আগে একরাতে বিছানায় শুয়ে জেগে থেকে দেখছিলাম, দুলু ভ্রূণ নষ্ট করবার বড়ি জল দিয়ে গিলে খাচ্ছে। মুখে জল নিয়ে হাঁ করে ঊর্ধ্বমুখ দুলু যখন বড়িটা মুখে ফেলতে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে আমি চোখ বুজে ফেলেছিলাম। কী নির্দয় দেখিয়েছিল দুলুকে! আজ দুলু ভাবতেও পারে না সেই সব দৃশ্য। অথচ এখনো ছোটন বয়সের অনুপাতে রোগা, তার মাথায় দীর্ঘস্থায়ী ঘা।

আমি বাথরুম থেকে হাত ধুয়ে এলাম।

—সাবধানে যেও। বেশীদূরে যাওয়ার দরকার নেই। বেরোবার আগে দুলু সাবধান করে দিল।

কোলে ছোটন, দুধারে ঝিমলি আর তিতু, আগে আগে খোঁড়া বুধিয়া, তার হাতে একটা বেতের লাঠি। আমরা ক্যাস্টর টাউনের নির্জন রাস্তায় বিকেলের পড়ন্ত রোদে ইউক্যালিপটাসের ছায়ায় পা দিই। সুগন্ধী নির্জনতা, লাল কাঁকরের পথ, বহুদূর পর্যন্ত কাউকে চোখে পড়ে না। শেষ বর্ষায় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে দুপুরে, তাই বহু দূরে কুয়াশার মত ভাপ উঠছে। মৃদু বাতাস বইছে। ঘরে ফেরা পাখি ডাকছে খুব। ঝিমলি আর তিতু এই সৌন্দর্যে মূক হয়ে যায়। জন্মাবধি তারা কলকাতার বাইরের জগৎ দেখেনি। আমার গা ঘেঁষে হাঁটতে থাকে তারা। ছোটন আমার কোল থেকে বড় বড় চোখে চেয়ে থাকে।

একটা ঢালু বেয়ে পথটা নেমেছে, আবার চড়াই বেয়ে উঠেছে অনেকটা ওপরে। ঢালু বেয়ে নামতেই একটা কালভার্ট। কয়েকটা হনুমান বাচ্চা বুকে নিয়ে রাস্তা পেরোচ্ছে। ভয়ে ঝিমলি আর তিতু আমাকে জড়িয়ে ধরে। হেসে গড়ায় বুধিয়া।

হাঁটতে হাঁটতে এক সাথে তিতু আর ঝিমলি এগিয়ে গিয়ে বুধিয়ার সঙ্গে হাঁটে। রাজ্যের গল্প করে বুধিয়া। আমার কোলে ছোটন তার হাত তুলে এটা ওটা দেখায়। প্রশ্ন করে। অন্যমনস্ক ভাবে আমি হাঁটি।

চৌরাস্তার মোড়ে কয়েকটা দোকানপাট। তিন-চারটে রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে। লোকজনের চলাচল দেখা যায়। চার প্যাকেট সিগারেট কেনার জন্য দাঁড়াই। ততক্ষণে বুধিয়া, ঝিমলি আর তিতুকে নিয়ে কোন রাস্তায় গেল ঠিক খেয়াল করিনি। সিগারেটের প্যাকেট পকেটে ভরে ফেরত পয়সার জন্য হাত বাড়াতেই হঠাৎ খেয়াল হয়, ওরা কোন রাস্তায় গেল লক্ষ্য করিনি তো।

চিন্তার কিছু নেই। সঙ্গে বুধিয়া আছে, জায়গাও নিরিবিলি, ওরা হারাবে না। তবু একটু খুঁজে দেখা দরকার। যে পথটা সোজা গেছে, সে পথটাতেই যাওয়া সম্ভব। এই ভেবে আমি চৌরাস্তা পার হয়ে সোজা হাঁটি। কিন্তু রাস্তাটা সোজা গেছে, বহু দূর পর্যন্ত কাউকে দেখা যায় না। আমি আবার ফিরে আসি চৌরাস্তায়।

পান-সিগারেটের দোকানদারকে জিজ্ঞেস করি—দুটো বাচ্চা ছেলেমেয়ে আর একটা খোঁড়া ছেলেকে যেতে দেখেছ ?

লোকটা মাথা নাড়ে—খেয়াল করিনি।

একটা ছোকরা রিক্সাওয়ালা তার রিক্সার সীট থেকে টপ্ করে নেমে বলল—লেংড়া বুধিয়ার সঙ্গে দুটো খোকাখুকি তো ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ—

—এই তো এই রাস্তায় গেছে। চলুন না নিয়ে যাচ্ছি।

—না, রিক্সার দরকার নেই।

ডানদিকের রাস্তাটাই দেখাল রিক্সাওয়ালা। পথটা একটা চড়াই ভেঙে বেঁকে গেছে। আমি আস্তে আস্তে এগোই। ছোটনকে কোল বদলে নিই। ছেলেটাকে ক্রমশঃ ভারী লাগছে, ঘেমে যাচ্ছে আমার গা।

বাঁক পেরোতেই আবার উৎরাই, আবার একটা বাঁক। ওদের দেখা গেল না। দিনের আলো আস্তে আস্তে মরে আসছে। একটা ধোঁয়াটে মেঘ ঢাকা দিয়েছে পশ্চিম আকাশ। বাড়ী থেকে বহুদূর চলে এসেছি। অন্ধকার হয়ে আসছে। আমার ভাল লাগছে না।

বাতাসে তীব্র ফুলের গন্ধ। ভেজা মাটির গন্ধ। সিগারেটের জন্য আনচান করছে শরীর। কোলে ছোটনকে ক্রমশঃ ভারী লাগছে।

ছোটনকে বললাম—একটু নামবে বাবা ?

সে মাথা নেড়ে আমাকে জোরে আঁকড়ে ধরল।

—নিজেকে একটু হাল্কা করো বাবা, অত জোরে আঁকড়ে ধরো না।

ছোটন গম্ভীর ভাবে আমাকে ধরেই রইল।

ডানদিকে প্রকাণ্ড একটা ভুতুড়ে বাড়ির বাগান পেরিয়ে একটা ছোট্ট পরিষ্কার মাঠ। সেইখানে ছায়াহীন স্পষ্ট দিনের আলো পড়ে আছে।

একটু জিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করছে। সিগারেটের জন্য আনচান করছে শরীর। ছোটনকে মাঠের ওপর ছেড়ে দিয়ে বললাম—একটু হেঁটে এসো তো বাবা!

boiRboi.net

ছোটন হাঁটল না। আমার হাঁটু খামচে দাঁড়িয়ে রইল। আমাকে বসতে দেখেই কাঁদতে লাগল—মা-র কাছে যাব।

বিরক্তিতে একটা থাপ্পর তুলেছিলাম। অমনি সেই দৃশ্যটা মনে পড়ল—উর্ধ্বমুখে দুলে জল নিয়ে বড়ি গিলছে। আর মারা হল না। কোলের কাছে টেনে বসিয়ে বললাম—কাঁদে না, এক্ষুণি দাদা আর দিদি আসবে এই রাস্তা দিয়ে, দেখো।

গোটা দুই সিগারেট শেষ হয়ে গেল, সামনের রাস্তাটা দিয়ে কেউ ফিরল না। মাঠের ওপর আলো নিস্তেজ হয়ে এল। ভেজা মাটির ভাপ উঠে কুয়াশার মত ঢেকে দিয়েছে চারধার। মাটি ভিজে উঠছে। বাতাসে হিমভাব। বার বার বিরক্তিতে কেঁদে উঠছে ছোটন—বাড়ি যাব, মা-র কাছে যাব।

তিতু আর ঝিমলির জন্য দুশ্চিন্তা নিয়ে উঠলাম। কোলে ছোটন। রাস্তায় ভাল আলো নেই। দুধারে অন্ধকার সব বাগান। বাগানের মধ্যে নিঝুম বড় বড় বাড়ি। কদাচিৎ কোন বাড়িতে আলো চোখে পড়ে। দুশ্চিন্তা নিয়ে হাঁটলাম। চড়াইটা ভাঙছি, হঠাৎ ওপর দিকে চেয়ে দেখি চড়াইয়ের মাথায় চারটে ছেলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। ওদের মাথার ওপর একটা ল্যাম্প-পোস্ট। তার ম্লান আলোতে দেখা যাচ্ছে, পরনে সরু প্যাণ্ট, গায়ে চেক শার্ট, কিংবা গেঞ্জী। স্থির দাঁড়িয়ে চারজন আমাকে দেখছে। সিগারেট জ্বলছে তাদের হাত এবং মুখে।

আমার পাঁজরে দ্রুত হাতে ধাক্কা মারল হৃৎপিন্ড। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম।

এত তাড়াতাড়ি ওরা খবর পাবে, আমি জানতাম না। কত সহজেই ওরা পেয়ে গেল আমাকে। আমার বন্ধু প্রকাশ মরার সময় টুঁ শব্দটিও করতে পারেনি। তার সমস্ত শরীর ছোরায় ছোরায় লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল, উপর্যুপরি রডের আঘাতে সমস্ত মাথাটা দুমড়ে গিয়ে ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল। অতটা করার দরকার ছিল না। একটা রডের ঘা, দুচারটে ছোরার আঘাতই ছিল যথেষ্ট। প্রকাশ দীর্ঘদিন ধরে ভুগছিল ডায়াবেটিসে, হার্টও তার ভাল ছিল না। তবু যে অতটা করা হয়েছিল তার শরীর নিয়ে—আমার মনে হয়—তার কারণ দুটো। এক, ঘৃণাকে যতখানি সম্ভব প্রকাশ করা। দুই, লোকের মনে ঐ বীভৎসতার দ্বারা প্রচণ্ড আতঙ্ক সৃষ্টি করা। দুটো উদ্দেশ্যই সফল। প্রকাশের মৃতদেহে আমি কাঁধ দিয়েছিলাম। তার ফলে আজও সেই ভাঙা চৌচির মাথা আর ছোরার ঘায়ে হাঁ হয়ে থাকা তার এলানো শরীর যতবার ভাবি ততবার আমার ভিতরে কী একটা রী-রী করে ওঠে। মৃগী রুগীর মত আমি দাঁতে দাঁত চেপে ধরি, হাত মুঠো হয়ে যায়। চিন্তা-ভাবনা গুলিয়ে যায়।

ঢালুর ওপর চারটে ছেলে শান্তভাবে অপেক্ষা করছে। জ্বলছে সিগারেট। অপেক্ষা করছে হয় আমি তাদের কাছে উঠে যাব, নয়তো তারাই আমার কাছে নেমে আসবে। আমি তাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি। তারা আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার কোলে যে ছোটন রয়েছে সে কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

হঠাৎ সেই স্তব্ধতার মধ্যে ছোটন আমাকে পায়ের ধাক্কা দিয়ে বলল, চল বাবা। বাড়ি যাব।

—হ্যাঁ চল।

boiRboi.net

তারপর আমি ফিস্‌ ফিস্‌ করে নিজেকে বললাম—ঠিক আছে। কেন বললাম, তা জানি না। ছোটনকে আমি আর একটু জোরে চেপে ধরলাম বুকে। একবার পিছন ফিরে দেখলাম—অন্ধকার সর্পিল রাস্তা। নির্জন। আমার দুটো ছেলেমেয়ে আর বুধিয়া গেছে এই পথে। ফেরেনি। কোথায় গেল ওরা শেষবারের মত ওদের মুখ যদি দেখতে পেতাম!

প্রকাশের কথা মনে না করার চেষ্টা করছিলাম। তবু মনে এল। অমনি সমস্ত শরীর কুঁকড়ে গেল আমার শীত করল। ঘাম দিল। অবশ লাগল। মাথার মধ্যে ঘূর্ণীঝড়ে ওড়া খড়কুটোর মত চিন্তারাশি এলোমেলো উড়তে লাগল। মাথা নীচু করে আমি আস্তে আস্তে উঠতে লাগলাম। ছোটন বাড়ি যাবে। যতটা পথ সম্ভব তাকে এগিয়ে দিই।

ল্যাম্প-পোস্টের কাছাকাছি উঠে এলাম। মুখ তুলে দেখি চারটে ছেলে একই ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখছে। তাদের জুলপী বড়। মাথায় লম্বা চুল। লম্বাটে তাদের চেহারা। তাদের স্থির-নিশ্চিত ভঙ্গী দেখে আমার আর কিছুই বোঝবার রইল না। কী জানি কেন আমি তাদের দিকে চেয়ে একটু কাঠ হাসি হাসলাম। তারা হাসল না। তাকিয়ে রইল।

ঢালুটা সম্পূর্ণ উঠে তাদের মুখোমুখি হতেই আমার ভুল ভাঙল। দলে তারা চারজন নয়। ছয়জন। অদূরে রাস্তার পাশে এক বাগানবাড়ির বাগানের দেয়ালে পেচ্ছাপ করে বাকী দুজন প্যান্টের বোতাম আঁটতে আঁটতে আসছে। তাদের একজন চেঁচিয়ে বলল—বুঝলি পরিতোষ, এদের বাগানে যা জল দিয়ে গেলাম না, দারুণ ফলন হবে—

এরা চারজন হাসল। এরা ওদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ।

আমি ছোটনকে কোলে নিয়ে তাদের পেরিয়ে গেলাম। তারা ঢাল্‌ বেয়ে নামতে লাগল।

বেঁচে থাকা কী রকম ভাল। মানুষ কত বন্ধুর মত একে অন্যকে পেরিয়ে যায়, আক্রমণ করে না।

ঢালুর ওপর দাঁড়িয়ে আমি একবার পিছু ফিরে চাইলাম। নেমে যেতে যেতে ছয়জনের একজন একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

ছোটন বাড়ি যাবে। আমি দ্রুত হাঁটতে লাগলাম। সামনেই চৌরাস্তা। কয়েকটা রিক্সা দাঁড়িয়ে, আলো, লোকজন। আমি ডাকলাম—এই রিক্সা—

গেট-এর কাছে দুলু দাঁড়িয়ে, তার পাশে ঝিমলি, তিতু। রাস্তায় খানিকটা এগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রায়-অন্ধ মালীটা। রিক্সা থামতেই তিতু আর ঝিমলি চেঁচিয়ে উঠল—এই তো বাবা—ছোটন সোনা—

দুলু গেট খুলে এগিয়ে এল, বলল—এর চেয়ে আমাকে মেরে ফেল।

—কেন?

—উঃ, চিন্তায় চিন্তায় আমার মধ্যে আমি নেই। রোগা ছেলেটাকে নিয়ে গেছ—ইস্‌—কখন থেকে না-খেয়ে আছে ছেলেটা—

—ওরা কখন এল ?

—অনেকক্ষণ, ওরা একটা শর্টকাট ধরে এসেছে। এসে বলল, তুমি ওদের পেছন পেছন আসছ। তারপর অনেকক্ষণ আসছ না দেখে, একটু আগে, বুধিয়াকে পাঠালাম আবার—দাঁড়িয়ে আছি কখন থেকে—

তিতু আর ঝিমলি আমার দুহাত ধরে ঝুলে পড়ে—বাবা আমারা কী রকম শাল-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এলাম! আমরা তো ভেবেছি তুমি পিছনেই আসছ, জানতাম না তো যে তুমি হারিয়ে গেছ!

সন্ধ্যে পার করে চাঁদ উঠল। আমি বাইরের সিঁড়িতে একা বসে। সামনে চরাচর, জ্যোৎস্না। বড় বেশী নির্জনতা এখানে। এই নিস্তব্ধ জ্যোৎস্না ও দূরের বিশাল প্রসার, তার একাকীত্ব আমি সহ্য করতে পারছি না। এক সময়ে মাঠ-ঘাট আমার প্রিয় ছিল, ভালবাসতাম অরণ্য, পাহাড়। কী জানি, নিজের অজান্তে কবে কলকাতার বুক-চাপা ভীড়, ভাল লেগে গেছে। ভিতরে এক বাঘের আস্তানা। সেই বাঘের নাম ভয়, নিঃসঙ্গতা, দুশ্চিন্তা। একা হলেই সেই রঙীন বাঘ লাফ দিয়ে ধরে এসে। ছিঁড়ে খায় অস্তিত্ব। এখন আর গাছের ছায়া ভাল লাগে না, ভাল লাগে না বিশাল ফাঁকা বাড়ি, জনহীন রাস্তাঘাট, কিংবা অন্ধকার।

ঐ যে ছয়জন, ওদের একজন আমাকে পিছন ফিরে দেখেছিল। দুবার। ও কি চিনেছিল আমাকে? হবেও বা। আমি যে জীবন যাপন করেছি, তাতে অনেকেই চিনে রেখেছে আমাকে, চিহ্নিত করে রেখেছে। অথচ, তাদের অধিকাংশকেই আমি চিনে রাখিনি। চিনে রেখে তারা মনে মনে ভাবছে—কোথায় পালাবে বাবা! হুঁঃ-হুঁঃ!

দুলু নিঃশব্দে এসে ভরা জ্যোৎস্নায় দাঁড়াল সিঁড়ির মাঝের ধাপে। কয়েক পলক মুগ্ধচোখে চেয়ে দেখল চাঁদ। শ্বাস ফেলল একটা।

জিজ্ঞেস করলাম—ছেলেমেয়েরা খেয়েছে?

—হুঁ। ঘুম পাড়িয়ে এলাম।

—তাহলে এবার বোসো এখানে।

দুলু বসল। বসে বলল—বাড়িটা বড্ড পুরনো। একটু আগে একটা বিছে মারলাম রান্নাঘরে। বড় বিছে। বচ্চাদের যদি কামড়ায় তো শেষ হয়ে যাবে।

—সাবধানে থেকো। ওসব প্রকৃতির জীব, সব জায়গায় আছে। খামোখা কামড়ায় না।

—তবু, ভয় করে।

ভয় করে· কথাটা শোনামাত্র আমার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে গেল। স্নায়ু-মজ্জায় সেতারের ঝংকারের মত বাজতে লাগল। ভয় করে, আমাদের বড় ভয় করে।

দুলু বাইরের দিকে চেয়ে থেকে অন্যমনস্ক ভাবে আস্তে আস্তে বলল, তুমি পোকামারা ওষুধ দিয়েছিলে ঘরে। আধঘণ্টা পর যখন ঘর ঝাঁট দিলাম তখন—মাগো—কত পোকা যে বেরোলো। ওজন করলে কয়েক সের হবে। তার মধ্যে কয়েকটা আবার বেঁচে ছিল। অত পোকা একসঙ্গে দেখে গা শির শির করছিল।

boiRboi.net

—এখন আর পোকা নেই। হলে, আবার ওষুধ দেব।

দুলু আমার দিকে তাকিয়ে বাচ্চা মেয়ের মত লাজুক হাসি হেসে বলল—সে কথা না। ভাবছিলাম, আমরা অত পোকা মারলাম, পোকারা যদি কখনো তার শোধ নেয়।

আমি হো হো করে হেসে বললাম—দুলু, ভয় পেতে পেতে ভয় তোমার বিকারে দাঁড়িয়ে গেছে।

দুলু মাথা নীচু করে বলল—বুধিয়া পোকাগুলো কাগজে করে নিয়ে বাইরে ফেলতে যাচ্ছিল। বাচ্চা ছেলে তো! বোধহয় কষ্ট হয়ে থাকবে। বলল, এতগুলো জীব মেরে ফেললেন! এমনভাবে বলল বুকটা কেঁপে উঠল।

আমার আর হাসি পেল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম—দুলু তোমার ছুটি ক'দিনের?

—একমাস।

—একমাস পর কি আমরা ফিরব?

—দেখি। কলকাতার চিঠি আসুক! অবস্থা বুঝে ফিরব।

—যদি অবস্থার উন্নতি না হয়?

—ছুটি বাড়াব।

—এভাবে কতদিন চলবে?

দুলু অনেকক্ষণ ঝিম মেরে থেকে খুব হতাশার গলায় বলল, কী জানি। আমি এত ভাবতে পারি না।

আমি আস্তে করে বললাম—তোমার জমানো টাকা খরচ হয়ে যাবে। সোর্স অফ ইনকাম বন্ধ। এভাবে চলে না। এখানকার নির্জনতাও আমার খুব একটা সহ্য হচ্ছে না। তার চেয়ে চল ফিরে যাই—

দুলু চকিতে মুখ তুলে বলল—কী বলছ। কলকাতায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে—দুলু বাকীটুকু বলল না। থেমে গেল।

—সঙ্গে সঙ্গে কী? আমি জিজ্ঞেস করি।

—কেন, তুমি জান না?

আমি চুপ করে রইলাম। সামনে এক ভয়াবহ বন্য জ্যোৎস্না, নিস্তব্ধ চরাচর। দুজনের মধ্যে একজন আমাকে মুখ ফিরিয়ে দুবার দেখেছে। ও কি চেনে আমাকে? আমি চুপ করে ভাবতে লাগলাম।

boiRboi.net

তেরো

তিতু একটি ফড়িং ধরে দুহাতে তার পাখনা ছিঁড়ছে। তার মুখ নির্বিকার। এই সাঙ্ঘাতিক দৃশ্য আমি এক আশ্চর্য প্রকাণ্ড জানালায় দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। তিতু বাগানে, খেজুরগাছের মত, কিন্তু আরো সুন্দর এক গাছের তলায় দাঁড়িয়ে। যে ফড়িংটার পাখনা সে ছিঁড়ছে সেটা একটা সুন্দর লাল ফড়িং। আমি তার মুখের নির্বিকার নিষ্ঠুরতা দেখে আতঙ্কে চীৎকার করে বলছি—তিতু—তিতু—তোর মায়া-দয়া নেই! ও তুই কী করছিস।

তিতু নিষ্ঠুর চোখে আমার দিকে তাকাল। তারপর হঠাৎ পকেটে হাত ঢুকিয়ে মুঠো বের করে আনল। মুঠো খুলতেই দেখলাম, একমুঠো মরা মশা, মথ, একটা বোলতা। মুঠোর সেই পোকাদের বাগানের মাটিতে ছড়িয়ে দিয়ে হি হি করে হাসতে লাগল তিতু, চেঁচিয়ে বলল—বাবা, পোকাদের গাছ হবে। দেখ।

একটা গাঢ় লাল আলো এসে পড়ল বাগানে। সূর্যের আলো অত লাল হয়, জানতাম না। সেই লাল আলো এসে পড়তেই দেখি ঘাসের ফল থেকে বীজের মত জন্ম নিচ্ছে পোকামাকড়, মশা, বোলতা। উড়ে আসছে—উড়ে আসছে—আমাদের ঘরের দিকে।

দুলুর ডাক শুনে আমার ঘুম ভাঙল। ঘুম ভেঙে দেখি বাইরের ঘরে ক্যাম্প-খাটে শুয়ে আছি। গায়ে ঘাম।

ও-ঘর থেকে দুলু বলল—জেগেছ?

—হ্যাঁ।

—ইস্। তোমাকে বোবায় ধরেছিল। ঠিক হয়ে শোও।

—ঠিক আছে।

—এমন ভয় পাইয়ে দাও না! খারাপ স্বপ্ন দেখেছিলে বুঝি?

দুলু ঘুম গলায় বলল। তারপর আমার উত্তর না পেয়ে ও আবার ঘুমিয়ে পড়ল, টের পেলাম।

এ বাড়ির বেশীর ভাগই কাচের শার্সিওলা পাল্লা। কাঠের পাল্লা প্রায় নেই। তাকিয়ে দেখি, কাচের শার্সি দিয়ে বাইরের ম্লান জ্যোৎস্নায় বাগান দেখা যাচ্ছে। রাতে আবার কখন এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে বুঝি। বাইরের জ্যোৎস্নায় একটা শাদা ধোঁয়াটে ভাব মিশে আছে।

অস্বাস্তিকর ঘুমহীনতা নিয়ে সেই দিকে চেয়ে রইলাম। যতবার চোখ ফিরিয়ে নিতে চাই, যতবার চোখ বুজি, ততবার আপনা থেকে চোখ খুলে যায়। সম্মোহিতের মত শার্সিটার দিকে চেয়ে থাকি। বাইরে বন্য, ভয়ংকর, রহস্যময় জ্যোৎস্না।

boiRboi.net

বিশাল নিস্তব্ধ চরাচর। ভয় করে। বড় ভয় করে।

চেয়ে আছি। চেয়ে থাকাই আমার নিয়তি। হঠাৎ একটা ছায়া লাফ দিয়ে উঠল শার্সির গায়ে। চিৎকার করে উঠতে গিয়েও করলাম না। একটা বেড়াল। একটু দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর ভাঙা শার্সির ভিতর দিয়ে সন্তর্পণে ঘরে এল। অন্ধকারে সে একপলক তাকাল মশারির দিকে। সবুজ ফসফরাস জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল। নিঃসাড়ে পড়ে রইলাম। একটু পরে আমাদের এঁটো বাসন কোসনের কাছে তার চপ্ চপ্ খাওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম।

কখনো ঘুম, কখনো জাগরণের মধ্যে রাত কেটে গেল। ভোররাতে যখন মুর্গী ডাকছে, তখন শার্সির রং উজ্জ্বল। নিশ্চিন্ত হয়ে আমি গভীর ঘুমে ঢলে পড়লাম।

আউট-হাউসের দিকে বুধিয়াদের একটা ছোট্ট ভুট্টার ক্ষেত। সকালে বাজারে বেরোবার সময় চোখে পড়ল, ভুট্টার ক্ষেতে লুকোচুরি খেলছে ঝিমলি, তিতু আর বুধিয়া। ঘাসের জঙ্গলে উদাসভাবে বসে বিড়ি খাচ্ছে বুড়ো মালী, হাতে ঘাস নিড়োবার হেঁসো। তার চশমার কাচে রোদ ঝিকিয়ে উঠেছে। চারিদিকে আলোয় আলো।

মনটা আবার হঠাৎ ভাল হয়ে গেল।

ভুট্টা-ক্ষেত থেকে মুখ বার করে তিতু চেঁচিয়ে বলল—বাবা, প্যাঁড়া এনো—

ঝিমলি দৌড়ে আসে—বাবা, দুগজ লাল রিবন। আমার রিবন আনতে মা ভুলে গেছে।

তিতু ঝিমলির এইসব আনন্দিত চিৎকার আমার মনের মধ্যে রিন্ রিন্ করে বাজতে থাকে। অনেক বেলা হয়েছে, তবু একটা কুয়াশার মত ভাপ চারিদিকে। ছায়াহীন রোদ পড়ে আছে। আমি হাঁটতে থাকি।

বাজারের মুখে পুরনো একটি মিনার। মিনারের তলায় দোকান। দোকানের সামনে কয়েকজন দাঁড়িয়ে জটলা করছে। সেদিকে একপলক তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলাম, হঠাৎ চোখে পড়ল সেই জটলা থেকে লম্বা মত একজন—তার চোখে কালো চশমা—ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখছে। গতকালের সেই ছয়জনের একজন কি? কে জানে! আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

বাজারে ঢুকতেই বুড়ো এক পাণ্ডা সঙ্গ ধরল—চল, বৈদ্যনাথজী দর্শন করিয়ে দিই।

আমি মাথা নাড়ি—আমার ভগবানে বিশ্বাস নেই বাপু।

লোকটা অবাক মানে—বিশ্বাস নেই। সাক্ষাৎ বৈদ্যনাথজীকে বিশ্বাস নেই। তুমি কি ম্লেচ্ছ?

—হবে তাই।

—তুমি হিন্দু না?

—উঁহু। আমার বাবা হিন্দু, আমি নই।

লোকটা অবাক হয়—তুমি কি তবে ধর্মত্যাগী?

—তাও না। আমি মোটে ধর্মেই বিশ্বাস করি না। আমি ম্লেচ্ছ।

boiRboi.net

সে হাসে—তোমার বাপ যখন হিন্দু, তুমিও হিন্দুই। ম্লেচ্ছ কী করে হবে?

আমি তর্কের মধ্যে না গিয়ে পাশ কাটাই। মেছোবাজার পর্যন্ত লোকটা আমার পিছু পিছু আসে। তারপর হতাশ হয়ে চলে যায়।

দিন কেটে যায়। একই ভাবে। সাতটা দিন।

মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে স্টেশনে যাই। একটা খবরের কাগজ কিনি। একটা চায়ের স্টলে বসে একভাঁড় চা নিয়ে তন্ন তন্ন করে কাগজটা খুঁজি। বেহালার খবর খুব একটা নেই। তবে লাশ পড়ছে নানা জায়গায়। মৃতদের নাম দেখি, চেনা নাম চোখে পড়ে না।

এখানকার ঠিকানা জানিয়ে বাবাকে চিঠি দেওয়া হয়েছে, তার কোন উত্তর নেই। সাতদিন হয়ে গেল, আমাদের বাড়িতে কী হচ্ছে কে জানে। এখানকার ঠিকানা বাবাকে জানানোর ইচ্ছে দুলুর ছিল না। বাবা বুড়ো মানুষ, যদি কেউ বাবাকে ভয় দেখিয়ে ঠিকানাটা জেনে নেয়।

মাঝে মাঝে লক-আপে গরাদের ওপারে একখানা ধারালো উগ্র মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অস্বস্তি বোধ করতে থাকি।

বিকেলের দিকে ঝাঁশিডি থেকে একটা শাটল্ ট্রেন আসে। অমনি খবরের কাগজের আড়ালে মুখ ঢেকে চোখ জ্বালিয়ে যাত্রীদের লক্ষ্য করি। দেহাতীরা নামে, নামে বৈদ্যনাথধামের তীর্থযাত্রীরা। অল্প কয়েকজন যাত্রী, কিছুক্ষণের মধ্যেই স্টেশন আবার ফাঁকা হয়ে যায়। সন্ধ্যের ঘোর লাগবার আগেই আস্তে আস্তে হেঁটে ক্যাস্টর টাউনের ইউক্যালিপটাসের ছায়ায় পা দিই। একটা চড়াই ভেঙে উঠলেই দেখা যায় দূরে মাতৃকুটিরের বাগানের গেট। তখন নিশ্চিন্ত লাগে।

শুক্লপক্ষ শেষ হয়ে গেছে। এখন সন্ধ্যার পর চাঁদ ওঠে না। ঘোর এক অন্ধকার কালো বেড়ালের মত লাফ মেরে নামে বাইরের বাগানে। সিঁড়িতে আমরা বসি। আমি, দুলু, ঝিমলি আর তিতু, দুলুর কোলে ছোটন। সিঁড়িতে শেষ ধাপে বসে বুধিয়া বলে—ঐ যে আকাশের তারা—ওগুলো হচ্ছে ভগবানের চোখ। যতগুলো মানুষ পৃথিবীতে আছে ততগুলো চোখ আছে ভগবানের। এক এক চোখে ভগবান এক একজনকে নজর রাখেন। যেই পৃথিবীতে একটা মানুষ মরে যায়, অমনি নিভে যায় আকাশের একটা তারা, আবার যখনই কেউ জন্মায়, তখনই নতুন একটা তারা ফুটে ওঠে....

ঝিমলি আর তিতু অবাক হয়ে শোনে।

—সত্যি বাবা? ঝিমলি জিজ্ঞেস করে।

অন্যমনস্ক ভাবে বলি—হুঁ।

একটু রাত হলে ওরা খেয়ে ঘুমোতে যায়, আমি তখনো বাইরে বসে, ভগবানের অলীক চোখে ভরা আকাশের দিকে চেয়ে থাকি। জল বয়ে যাওয়ার শব্দের মত অবিরল শালবনে বাতাস লাগবার শব্দ ভেসে আসে।

বাচ্চারা ঘুমোলে দুলু বাইরে আসে। বলে—আজও কলকাতার চিঠি এল না।

—হুঁ।

boiRboi.net

—কী যে হচ্ছে ওখানে।

আমি চুপ করে থাকি।

দুলু হঠাৎ বলে—আজ তুমি যখন বিকেলে বেরিয়েছিলে তখন একটা ছেলে এসেছিল।

একটু চমকে উঠি।

—কী রকম ছেলে ?

—ফর্সা, লম্বা, ছিপছিপে, খেলোয়াড়ের মত দেখতে, বাইশ-তেইশ বছর বয়স। কথাবার্তায় খুব ভদ্র। জিজ্ঞেস করল, এ বাড়িতে অতনু সেন বলে কেউ থাকে কিনা।

—তুমি কি বললে ?

—বললাম না! এখানে এনামে কেউ নেই।

—শুনে চলে গেল ?

—না। একটু হেসে ক্ষমা টমা চেয়ে বলল, রাস্তায় ঠিক অতনু সেনের মত একজনকে সে দেখেছে। একটু খোঁজ নিতেই একজন রিক্সাওয়ালা এই বাড়ি দেখিয়ে দেয়।

—কেন খোঁজ করছে জিজ্ঞেস করলে না ?

—করলাম। তখন ও আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমি অতনু সেনের নাম শুনেছি কিনা। আমি বললাম, শুনি নি। ও বলল অতনু সেন খুব বড় লীডার হতে পারতেন। এত পড়াশুনা ছিল তাঁর। বাংলাদেশে অনেকেই অতনু সেনকে তাঁর রাজনৈতিক পাণ্ডিত্যের জন্য সম্মান করে। অতনু একবার বিধানসভায় দাঁড়িয়েছিলেন। যে কন্স্টিটুয়েন্সি থেকে দাঁড়িয়েছিলেন, সেখানের এক চা-বাগানের ডাক্তার হচ্ছে ছেলেটির বাবা। একবার সে-বাগানে মিটিং করতে গিয়ে ঝড়ের রাতে অতনু সেন ফিরতে না পেরে ওদের বাসায় ছিলেন। আর তখন, সেই রাতে অতনুর সঙ্গে ছেলেটির খুব ভাব হয়ে যায়। অতনু তাকে অনেক গল্প বলেছিলেন। তারপর আর অতনুর সঙ্গে তার দেখা হয় নি। কাগজে অবশ্য মাঝে মাঝে নাম দেখেছে।

আমার আবছা মনে পড়ছিল, এক ঝড়ের রাতে আমি হায়পাথাড় চা-বাগানে আটকে পড়েছিলাম। ডাঃ আশুতোষ রায়ের বাড়িতে ছিলাম একরাত্রি। তার একটি ফুটফুটে ছেলে ছিল। খুব ভাল লেগেছিল আমার।

আমি আস্তে বললাম—ছেলেটা বোধহয় সত্যি কথাই বলে গেছে।

দুলু বলল—আমারও সেটা মনে হচ্ছিল। তবু আমি কিছুই স্বীকার করি নি। বলেছি, অতনু সেন না, আমার স্বামীর নাম মিহির দাশগুপ্ত। বেসরকারী অফিসের কেরানী। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য এসেছি। অবশ্য আমি ছেলেটিকে আবার আসতে বলেছি। যদি আসে তবে তুমি ছেলেটিকে ভাল করে দেখে নিও। সাবধানের মার নেই। স্বীকার করো না যে তুমিই অতনু সেন।

আমি ঠাট্টা করে বললাম—কেন দুলু, আমি কি নেই ?

দুলু গম্ভীর গলায় বলল—না, আমরা নেই। আমরা আমাদের কথা ভুলে যাব।

আমরা নেই, আমরা নেই, ভাবতে ভাবতে সেই রাতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

চোদ্দ

বুড়ো মালী ঘাস-জঙ্গলের অনেকটা নিড়িয়ে দিয়েছে। ছাতিমতলা এখন পরিষ্কার। দুপুরে আমি জাফরি-ঢাকা বারান্দায় বসে বইপত্র পড়ি। চেয়ে দেখি, ছাতিমতলায় ছোট্ট একটা জনসভা বসেছে। শ্রোতা দুজন—ঝিমলি আর বুধিয়া। বক্তা তিতু। অবিকল আমার মত বাঁ হাতখানা পিছনে নিয়ে সামনে ঝুঁকে তিতু বলছে—বন্ধুগণ, আজ এই সভায়······

অপলক তাকিয়ে থাকি। এক সময়ে হঠাৎ চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। তিতু যেন কখনো রাজনীতি না করে। বরং চিরকাল ও আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করুক।

এখানে এসে ক্রমে ক্রমে আমি গৃহী হয়ে যাচ্ছি। রোজ বাজার করি। স্নানের সময় নিজের গেঞ্জি রুমাল কেচে দিই। ঘরের কাজে দুলুকে সাহায্য করি। অনেক সময়ে রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে বলি—দুলু, মা যে পোস্ত বাটা দিয়ে ডাঁটার চচ্চড়ি রাঁধে—ওরকম একবার রেঁধে খাওয়াবে?

শুনে দুলু খুশী হয়। চিরকাল আমি খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে উদাসী। যা পাই খাই। পাঁউরুটি আর জল খেয়ে কত দিন কেটে গেছে। আমার যে কোন কিছু ইচ্ছে হয় তা জানতামই না। এখন নিজের পছন্দমত অনেকক্ষণ ধরে বাজার করি। পুঁইশাক কিনলে কুমড়ো কিনতে ভুলি না। খেতে বসে নুন কম, কিংবা ঝাল বেশী—এইসব মতামত দিই। এখন জানি, ঝোল শুষলে ডালনার স্বাদ হয়।

দুলুর মুখে চিরকাল আমার প্রতি এক নিরন্তর নিষ্ঠুরতা দেখে এসেছি। এখন আমি ওর কাছাকাছি থাকলে ওর-মুখে লাজুক রক্তাভা দেখা যায়। আমি মাঝে মাঝে ভাবি—এখনো বোধহয় আমাদের খুব বেশী বয়স হয়ে যায় নি। বোধহয় খুব বেশী সময় আমি নষ্ট করি নি জীবনের।

আয়নায় দেখি, অবিরল দুশ্চিন্তার মধ্যে বাস করেও আমার গালে মাংস লেগেছে, ঢেকে গেছে কণ্ঠার হাড়। পুরনো গেঞ্জিগুলো শরীরে আঁট হয়ে বসে। দুলুর মুখের দিকে চেয়ে মনে হয়, ঐ রক্তাভাটুকু বোধহয় কেবল লজ্জার নয়, ওতে স্বাস্থ্য মিশে আছে। ব্লাউজের হাতার নীচে ওর হাতের ডৌল ফেটে পড়েছে। ছোটন আর তেমন ঘ্যান্ ঘ্যান করে না তো; একা বসে বারান্দায় রাজ্যের খেলনা নিয়ে খেলে। মাথার ঘা শুকিয়ে আসছে আস্তে আস্তে। এখন মামড়ি খসছে। তিতু বহুদূর দম ধরে দৌড়ায়, অবিরল স্কিপিং করে ঝিমলি। কেউই সহজে হাঁফায় না। কখনো বা তিতু আর ঝিমলির সঙ্গে চোর-চোর খেলি। ফাঁকা, প্রকাণ্ড বাড়ি, একটা টু দিলে দশটা ফিরে আসে।

আমাকে চমকে অবাক করে দিয়ে প্রায় রাত্রেই দুলু বাইরের ঘরে চলে আসে। ওঘরে বড় বিছানায় ছেলেমেয়েরা ঘুমোয়। রাত গভীর হয়। তখন দুলু আসে। অন্ধকারে তার কলপ দেওয়া শাড়ির খস্‌খস্‌ শব্দ পাই, চুড়ির শব্দ হয়, তার শরীরের সুগন্ধে ভরে যায় ঘর। মশারি তুলে সে বিছানায় চলে আসে। ক্যাম্বিসের ছোট্ট খাটে শব্দ হয়। দুধার থেকে ক্যাম্বিসের ঢালু নেমে এসে ঝুলে থাকে, মাঝখানটায় অপরিসর একটা গর্তের মতো। দুলু সেই চাপা জায়গায় আমার সঙ্গে আঠার মতো লেগে থাকে। ঘন শ্বাস ফেলে আমার মাথার চুল মুঠো করে ধরে চাপা গলায় বলে—বুড়ো, বুড়ো। মাথায় টাক পড়ছে, দাঁত নেই—বুড়ো বর। এই বর নিয়ে আমি কী করব। কী করব!

মাথার ভিতরে মেঘ করে আসে স্মৃতি। পাণ্ডুর পাঁচ নম্বর ফেরীঘাটে বিয়ের পর কয়েকটা দিন মনে পড়ে। দুলু আমাকে দু'হাতে আঁকড়ে জিজ্ঞেস করত—তুমি কে? তুমি কে গো? চিনি না তো! অচেনা মানুষের এ কেমন ব্যবহার একটা মেয়ের সঙ্গে। আমার কিছুই রাখলে না তুমি? সব নিয়ে নিলে?

অন্ধকারে দুলু হাসত। সেই হাসি তার বুকের গভীর থেকে উঠে আসত। মাঝখানে খরা গেছে বহু কাল। আজকাল আবার দুলু সেরকম হাসে। কিন্তু আমি যে হাতে তাকে জড়িয়ে ধরি সেই হাত শিথিল হয়ে গেছে অনেক। তেমন শক্ত হাতে ধরতে পারি না। যেন বা আমার দাবিদাওয়ার সাহস নেই আর। ভিখিরির হাত বাড়িয়ে যতটুকু পাই নিই। তাই জোর আসে না। বরং আমার উল্টে বলতে ইচ্ছে করে—তুমি কে? তুমি কে গো। চিনি না তো। অচেনা পুরুষের সঙ্গে এ তোমার কেমন ব্যবহার?

দুলু ঠাট্টা করে—তুমি ধরতেও শেখো নি আমাকে।

আমি হাসি—অভ্যেস নেই কিনা।

দুলু পায়ে পা ঘষে বলে—অভ্যেস নেই কেন। কে অভ্যেস করতে বারন করেছিল? তুমিই তো ছেড়ে দিলে আমাকে, ফিরেও তাকাও নি।

আমি মৃদু কণ্ঠে বলি—জীবনে আমি নিজের জন্য খুব বেশী কিছু চাই নি দুলু। যে দু' একটা জিনিস মুখ ফুটে চেয়েছিলাম তার মধ্যে তুমি একটা।

দুলু গভীর গলায় বলে—চেয়েছিলে ঠিকই, কিন্তু নাও নি।

আমি চুপ করে থাকি ভয়ে। পাছে পুরোনো কথা উঠে পড়ে।

কিন্তু দুলু ছাড়ে না, বলে—নিলে আমার দিন এত দুঃখে কাটত না। কতদিন দুধ জোটে নি বলে তিতু ঝিমলিকে শটীফুড খাইয়েছি, কিংবা বার্লির জল। সে-সব কি পেটে থাকে, সারাদিন খিদেয় কাঁদত। পাড়া-প্রতিবেশীরা ঠাট্টা করে বলত—হবু এম-এল-এ-র বৌ। কী লজ্জা! রাত জেগে পড়ে, টিউশানি করে আমার শরীর গেল কর্কশ হয়ে, বয়স গেল বয়ে। কারো আদর পাই নি কখনো, কী দিয়েছো তুমি আমাকে, বলো তো?

উত্তর দিই না। দুলু আক্ষেপে আমার বুকে তার হাত দিয়ে ঘন ঘন চাপড় দিয়ে বলে—নষ্ট করেছো। নষ্ট করেছো আমাকে। কিছুই দাও নি।

বলতে বলতে সে আমাকে আবার আশ্লেষে জড়িয়ে ধরে। প্রবল চুমু খায়।

আবার চুমু খেতে খেতে কাঁদতে থাকে—কেন একটা জীবন আমাদের বয়ে গেল! তোমার লজ্জা করে না? কোন লজ্জায় তুমি আমার মুখোমুখী হও?

অনেকক্ষণ কাঁদে দুলু, তারপর হঠাৎ বলে—আমাকে আদর করো। শীগগির।

আদর খেতে খেতে বলে—শত্রু! মহাশত্রু তুমি আমার।

বুঝতে পারি, এইসব আবেগ আর আদরের পিছনে পরোক্ষে প্রকাশের মৃত্যু কাজ করছে। দুলু হঠাৎ সচেতন হয়ে বুঝতে পেরেছে, তার স্বামীর আয়ু বড় অনিশ্চিত। কোথায়, কোন লুকানো জায়গায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে আমার অপ্রত্যাশিত ঘাতক তা কেউ জানে না। কেন মারবে—তার কারণ স্পষ্ট নয়। জীবনযাপন করতে করতে আমরা কেবলই ভুলে যাই যে মানুষ মরণশীল। ভুলে যাই বলেই এই দুর্লভ জীবন আমরা হেলায়ফেলায় যাপন করি। অবহেলা করি কাছের মানুষকে, চোখের সামনে দেখেও ভুলে যাই। নিষ্ঠুর উদাসীন আমাদের মুখ ফিরিয়ে রাখা। কিন্তু যখন হঠাৎ মৃত্যুর ছায়া এসে পড়ে, মরণশীলতা অমোঘ হয়ে দেখা দেয়, তখনই বোধহয় এইরকম ক্ষতিপূরণ করে নিতে চেষ্টা করি। কেড়ে নিতে চাই শেষ সময়টুকু।

আজকাল রোজ সকালে স্নান করে দুলু। লালপেড়ে গরদ পরে বাগানের ফুল তোলে মন দিয়ে। বুধিয়া কোথা থেকে বেলপাতা আর কাঁচা দুধ নিয়ে আসে। রিক্সাওয়ালার সঙ্গে বাঁধা বন্দোবস্ত করেছে দুলু। সকালে আটটার মধ্যে রিক্সা এসে ভেঁপু বাজাতে থাকে।

দুলু যায় বৈদ্যনাথের মন্দিরে পুজো দিতে। রোজ। অনেকক্ষণ ধরে পুজো দেয়। ফিরতে দুপুর হয়ে যায়। যাওয়ার সময় বলে যায়—উনুনে ডাল চড়িয়ে গেলাম। সম্ভার দিও। চার কৌটো চালের ভাত চাপিয়ে দিও। চাল ধুয়ে নিও ভাল করে। আমার ফিরতে দেরি হবে।

আমি হাসি। দুলুর কথা মতো ডালে সম্ভার দিই। ভাত চাপাই। তারপর ছেলেমেয়েদের নিয়ে খেলা করতে থাকি।

দুলু ফিরে আসে। রোদে ম্লান হয়ে গেছে মুখ। ক্লান্ত দেখাচ্ছে। উপোস করে থাকে বলে ঠোঁট শুকিয়ে থাকে, চোখ বসে যায়। সকলের হাতে প্রসাদী সন্দেশের টুকরো দেয়, প্রসাদী ফুল মাথায় ঠেকায়। আমাকে প্রণাম করে।

খেতে বসে প্রায়দিনই বলে—বরটা বুড়ো হলে কী হবে, ভারি কাজের তো! ডালে কী সুন্দর সম্ভারের গন্ধ হয়েছে। ওমা! আবার শুকনো লংকা ভেজে দেওয়া হয়েছে! বুদ্ধি দেখ!

শুনে তিতু আর ঝিমলি হেসে গড়িয়ে পড়ে।

কখনো কখনো প্রকাশকে দেখি।

দুপুরে দুলু তার ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘরে ঘুমোয়। আমি দুপুরের হা-হা বাতাসে বারান্দায় এসে বসি। কী নির্জন চারধার! লোক চলাচল নেই কোথাও। একটা কুকুরও হাঁটে না। কেবল বাতাস খেলা করে, রোদ ভেসে যায়। হঠাৎ দেখতে পাই প্রকাশ গেট-এর ওপাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে হাসি, অবিন্যস্ত চুল। ডানহাতের

boiRboi.net

মুঠি ঊর্ধে উৎক্ষেপ করে বলে—লড়াই অতনু। লড়াই।

বাড়িটা বিশাল। বহু ঘর বন্ধ পড়ে থাকে। এক-একদিন একা ভূতের মতো সময় কাটাতে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়াই। একা একা কথা বলি। মাঝে মাঝে এমন হয়, একটা ঘরের দরজা খুলতেই দেখি, মেঝের ওপর প্রকাশ বসে আছে উবু হয়ে। আমাকে দেখে মুখ তুলে বলে—অতনু, আমার মা-বৌ-বাচ্চাদের খোঁজ নিলি না? কেমন আছে ওরা সব? কী করে চলছে ওদের? দ্যাখ, একদিন হঠাৎ বাবা মারা গিয়েছিল বলে আমি আর মা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলাম। ভিখিরি হয়ে গিয়েছিলাম প্রায়। আমার ছেলেমেয়েগুলোরও ওরকম হয় নি তো? বড় ভয় করে। তোরা দেখিস।

আমার ঠোঁট কেঁপে ওঠে। বুক চেপে ধরে স্মৃতি। আমি সেই ফাঁকা ঘরে একা দাঁড়িয়ে গোপনে বাঁধ ভাঙা কান্না কাঁদি। প্রকাশ, যারা খুন করে তারা জানে না, একটা মানুষ মানে একটা জগৎ। কত সম্পর্কে জড়িয়ে থাকে একটা মানুষ—বৌ-বাচ্চা-মা-বাবা-ভাই-বোন-বন্ধু—ওরা তা ভুলে যায়। ওরা মারে বিচ্ছিন্ন একটা মানুষকে। সেই মার সেই লোকটাকে ছাড়িয়েও ছড়িয়ে যায়। একজন মানুষের সঙ্গে আরো কত মানুষ শেষ হয়। যারা খুন করে তারা কি তা জানে?

সারা বাড়িময় আমি উদ্দেশ্যহীন স্মৃতিতাড়িত হয়ে ঘুরে বেড়াই আর বলি—আমি নিরপরাধ ফেরারী প্রকাশ। এই অজ্ঞাতবাসে আমি একরকম সুখেই আছি। সারাটা যৌবনকাল দুলু ফিরেও তাকায় নি। এখন দ্যাখ, মৃত্যুর ছায়া পড়েছে বলে সে আমাকে আঁকড়ে ধরেছে। পৃথিবীতে কার কতদিন আয়ু তা কে বলতে পারে। পৃথিবীর অধিকার কার হাতে যাবে তার মীমাংসার সংগ্রামে কত লোক চলে যাবে! সময় তাই আমাদের বড় কম। বড় মূল্যবান। আমাকে এই সময়টুকু ভোগ করতে দে প্রকাশ। আমরা যারা লড়াই করেছিলাম তাদের পরিবার বরাবর ভেসে গেছে। তাদের ভাগ্যই দেখেছে তাদের। আমাকে তোর পরিবারের কথা ভাবতে বলিস না। আমি পারবো না। আমাকে ছেড়ে দে। নতুন উদ্বেগ নতুন দায়িত্ব—এ বড় ভয়ের ব্যাপার এখন। আমাকে ক্ষমা কর। আমাদের ভালবাসার সময় সকলের আগে শেষ হয়।

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হলে নিঃঝুম হয়ে কোনো গাছের ছায়ায় গিয়ে বসি। বনস্থলীতে বিচিত্র ছায়া পড়ে। পাখী ডাকে, উড়ে যায়। আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ি কখন। স্বপ্ন দেখি, পাখি হয়ে মানুষের অস্ত্রাঘাত থেকে উড়ে যাচ্ছি অনায়াসে। বন্দুকের শব্দ এড়িয়ে শরতের আকাশ লক্ষ্য করে তীরের মতো ছুটে যাচ্ছি। আকাশ নির্বাধ, অনন্ত। কোন ভয় নেই। পালাবার পথ সেখানে শেষ হয়ে যায় না।

সন্ধে হয়ে এলে দুলু আর ছেলেমেয়েরা ডাকতে ডাকতে আমাকে খোঁজে। তাদের গলার স্বরে উদ্বেগ। খুঁজে পেয়ে দুলু বড় বড় চোখে আমাকে দেখে—তুমি কী গো। জানো না, ভয়ে বুক শুকিয়ে থাকে আমার। একটা সময়ও নিশ্চিন্ত থাকি না।

ঝিমলি দুলে দুলে একটা ছড়া বলে প্রায়ই—পাটের শাড়ি বের করো মা, দখিন যাবো গো। তালতলা দিয়ে জল যাচ্ছে মা, ডুবে মরি গো।

ছড়াটা শুনতে শুনতে আমার মুখস্থ হয়ে যায়। এক একটা সময়ে যখন গভীর

boiRboi.net

অন্যমনস্কতা আসে, তখন আপনমনে আমি ঐ ছড়াটার একটা লাইন বিড় বিড় করে বলি—তালতলা দিয়ে জল যাচ্ছে মা, ডুবে মরি গো...তালতলা দিয়ে জল যাচ্ছে মা, ডুবে মরি গো।

বলতে বলতে দেখতে পাই, কাটিহারের খালাসীটোলার নোংরা ঘরে একটা বাচ্চা ছেলে রোগশয্যায় শুয়ে আছে। ধুম জ্বর উঠেছে তার। বিকারের ঘোরে ঘোর লাগা চোখে চেয়ে আছে। তার মুখের ওপর ঝুঁকে আছে মায়ের মুখ! সে বলছে—তালতলা দিয়ে জল যাচ্ছে মা, ডুবে মরি গো....তালতলা দিয়ে জল যাচ্ছে মা, ডুবে মরি গো...

আমার শরীরে রোমকূপ শিউরে ওঠে। আমার কোলের ওপর ছায়া ফেলে প্রকাশ সামনে দাঁড়ায়। বলে—অতনু, শোধ নিবি না?

মুখ ফিরিয়ে নিই।

সংসার আমার ভাল লাগে আজকাল। ভাল লাগে দুলু, ঝিমলি, তিতু, আর ছোটনের সঙ্গে মেখে-জুখে থাকতে। বাগানের একদিকে খানিকটা জমি বেছে নিয়ে আমি মাটি কোপাই। দুলু ফুলের চারা লাগাতে চায়। আমি চাই রাইশাক হোক। কিন্তু সে জন্য নয়, আসল কথা মাটি কোপান আমার ব্যায়াম। শরীরটাকে ঠিক করে নিতে হবে। অম্বলের ব্যথাটা আর টের পাই না। বর্ষা শেষ হয়ে এল। শরতের সাদা মেঘখন্ড আকাশে ভেসে বেড়ায়। সকালে গেট-এর পাশে শিউলি ফুল ঝরে থাকে।

বুড়ো মালীটা নির্বিকার বাগানে বসে থাকে। সে কথা বলে কম, উদাসভাবে বসে থাকতে ভালবাসে। কিন্তু তার মুখে কোন দুঃখের ছায়া নেই। মাঝে মাঝে আগাছা নিড়োয়, তারপর গাছপালা মাটির সঙ্গে মিশে ঝিম মেরে এই প্রকৃতির বৈরাগ্যকে নিজের ভিতরে অনুভব করে। নিজের চোখের কথা ওর বোধহয় বেশী মনে পড়ে না। বেঁচে থাকার কিছু কিছু মূল্য দিতে হয়—এরকমই সে জানে। ওর কাছ থেকে ঐ বৈরাগ্যটুকু সারাদিন ধরে অল্প করে শিখে নিই। আমার একটা জীবনে বহু উচ্চাকাঙ্ক্ষা নষ্ট হয়ে গেছে, সেটা ভুলতে ঐ বুড়ো মালীর বৈরাগ্যটুকু আমার বড় দরকার।

শিমুলগাছের তলায় একটা মসৃণ পাথর পড়ে আছে। নির্জনে সেখানে গিয়ে বসি। ডানদিকে ঢালু মসৃণ সবুজ, চারদিকে ভাঙের জঙ্গল, ভাটফুল কণ্টিকারী। পাখি-পাখালির অবিরল তীব্র ডাক। নিস্পন্দ বসে থাকি। হঠাৎ মনে হয় পৃথিবীর অধিকার হাতবদল হচ্ছে। বিনা বিপ্লবে, নিঃশব্দে। পুরনো বাড়িটার মাথায় ফাটা দেওয়ালে ঐ যে অশ্বত্থের গাছ উড়ছে নিশানের মত। ঐ নিশান বলছে, একদিন পৃথিবীর মানুষের সব সংগ্রাম শেষ হলে তারা আসবে। পা টিপে টিপে নিঃশব্দে এগিয়ে আসবে উদ্ভিদ-জগৎ। অধিকার করে নেবে সবকিছু। তারাই ভেঙে ফেলবে বাড়ি-ঘর, ঢেকে ফেলবে রাস্তাঘাট, কল-কারখানা চাপা দেবে মাটিতে। এইভাবে নিঃশব্দে হাতবদল হচ্ছে পৃথিবীর। শিমুলগাছের তলায় পাথরে বসে মাঝে মাঝে আমি এই বোধ করি। নিস্তব্ধতার মধ্যে অনুভব করি উদ্ভিদের পদসঞ্চার আমার গায়ে রেমকূপ খাড়া হয়ে ওঠে। কাঁটা দেয়।

দু'-একদিন পর পর আবার ঘর ভরে যায় পোকামাকড়ে। তীব্র কীটানুনাশক ছড়িয়ে দিই ঘর বন্ধ করে। অবিকল হত্যাকারীর মত দেখায় আমাকে। মুখে রুমাল ঢাকা, তার আড়ালে আমি হাসি। পোকাদের ডেকে বলি—বন্ধুগণ, আমি জানি, মানুষের হাত থেকে একদিন পৃথিবীর অধিকার যাবে তোমাদের হাতে। আমার এ সংগ্রাম বৃথা। চিন্তাশূন্য আমার এই আক্রমণ, তোমরা আমাকে ক্ষমা কর। তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে সুন্দর প্রতিশোধ।

লক্ষ্য করি পরিশ্রমী পিঁপড়েদের সারিবন্ধ চলাচল। মুগ্ধচোখে দেখি। পৃথিবীর অধিকার কার হাতে যাবে? পিঁপড়েদের? তবে তাই হোক। আমেন্। মানুষ হিসেবে আমাদের আর কিছু করণীয় নেই।

রাতে মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙে। ক্যাম্প-খাটের পাশে টেবিলে ঢাকা দেওয়া জলের গ্লাস তুলে খাই। বাথরুম সেরে আসি। বাইরের জ্যোৎস্না দেখি নির্ভয়ে। সিগারেট ধরাই। কাশি। অনেকক্ষণ চুপ করে জেগে বসে থাকি। তখন কখনো চারপাশে অদৃশ্য কীটানুজগৎ অনুভব করি, বাতাসে জীবাণুদের গতায়াত। আমার গা শিউরে ওঠে।

বন্ধুগণ, পৃথিবীর অধিকার হচ্ছে হাতবদল। নিঃশব্দে, বিনা বিপ্লবে।

পনেরো

টের পাচ্ছি, ক্রমে ক্রমে ভোঁতা হয়ে আসছে আমার মাথা। চিন্তাভাবনা হয়ে আসছে সীমাবন্ধ। টের পেয়ে আমি আনন্দিত হই।

আনন্দিত মনে সকালের রোদে খালি গায়ে, খালি পায়ে, আমি মাটি কোপাচ্ছিলাম। মাটির ঢেলা ভেঙে চৌরস করছিলাম জমি। সেই সময়ের তির্যক-রোদে একটা লম্বা ছায়া পড়ল সামনের জমিতে। চোখ তুলে দেখি, একজন বাইশ-তেইশ বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে। লম্বাটে, ফর্সা চেহারা। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবী, চোখে কৌতূহল।

আমি মুখ তুলতেই হাতজোড় করে বলল, আমার নাম শচীন রায়। একদিন ভুল করে এ বাড়িতে ঢুকে পড়েছিলাম। সেদিন বৌদির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আজ আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

কোদাল ফেলে আমি বললাম—আসুন।

মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আমার যে নকল নামটা দুলু একে বলেছিল সেটা কিছুতেই মনে পড়ছে না।

বারান্দায় তাকে বসিয়ে হাত-পা ধুয়ে আসার ছল করে আমি প্রথমেই গেলাম

boiRboi.net

রান্নাঘরে দুলুর কাছে।

—সেই ছেলেটা এসেছে।

—কোন ছেলেটা ?

—ঐ যে অতনু সেনের ভক্ত, যে আর একদিন এসেছিল।

—ও।

—কিন্তু আমি তো অতনু সেন নই।

দুলু ঠোঁট টিপে হেসে বলল—ঠিকই তো।

—কিন্তু তা হলে আমি কে! যে নামটা বলেছিলে তা মনে আছে ?

খুব মুশকিলে পড়ে গেল দুলু। ঠোঁট কামড়ে অনেকক্ষণ ভাবল তারপর জিব কেটে বলল—যাঃ, ভুলে গেছি।

চিন্তিতভাবে বললাম—তা হলে বরং ছেলেটিকেই জিজ্ঞেস করি।

দুলু হাঁ করে চেয়ে থেকে বলল—আহা! ঢং!

তারপর একটু ভেবে বলল—তুমি এত লোকজনের সঙ্গে মিশেছ, আর এই একটুখানি ব্যাপার সামলে নিতে পারবে না ?

হেসে বললাম—পারব বোধহয়।

বাথরুমে ছোট্ট হাত-আয়নাটা পেরেকে টাঙানো। হাত-মুখ ধুতে গিয়ে নিজের মুখের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে হাসলাম। বললাম—তুমি আর তুমি নও। সাবধান! মনে রেখো। তুমি তুমি নও।

বাইরে এসে ছেলেটির মুখোমুখী বসলাম। বললাম—আমার স্ত্রী না জানলেও আমি কিন্তু অতনু সেনের নাম জানি।

ছেলেটি হাসল। বলল—আপনার সঙ্গে তাঁর চেহারার আশ্চর্য মিল। আমি আপনাকে কয়েকদিন রাস্তায় দেখেছি। চেহারাটা চেনা। ভাবতে ভাবতে অতনু সেনের কথা মনে পড়ল।

আমি নিস্পৃহভাবে বললাম—অতনু সেন কোথায় আছে জানেন ?

ছেলেটি মাথা নাড়ল—না।

আমি একটু চিন্তিতমুখে বললাম—বোধহয় ওঁর রাজনৈতিক জীবন শেষ হয়ে গেছে।

ছেলেটি চুপ করে থেকে বলল—হতে পারে। রাজনীতিতে সকলে টেঁকে না। কিন্তু আমার মনে হয়, উনি থেমে নেই। কাজ করছেন।

—এরকম কেন মনে হয় আপনার ?

—রাজনীতিতে একটা ক্যারিয়ার আছে। সেখানে তিনি আনসাকসেসফুল হতেও পারেন। সেটা বড় কথা নয়। বড় হচ্ছে অতনু সেন মানুষটা। আমি তাঁকে একরাত্রির জন্য দেখেছিলাম। তাতে আমার চোখ খুলে যায়।

—কী রকম ? আমি সাগ্রহে জিজ্ঞেস করি।

—আমি তখন ছোট। উনি তখন নাম-করা নেতা। তবু মিটিংয়ের পর অনেক রাত পর্যন্ত তিনি আমাকে নানা গল্প বলেছিলেন। সেগুলো সবই ছিল মানুষের দুঃখের গল্প। তিনি একটা শাকওয়ালা বুড়ির গল্প বলেছিলেন, তার

boiRboi.net

অনেক বয়স, ঘরে উপোসী কয়েকটা নাতি-নাতনী রেখে সে হাটে এসেছে শাক বেচতে। দু' পয়সা আঁটির শাক। সে বয়ে আনতে পেরেছে মাত্র বিশ-ত্রিশ আঁটি। শাক বেচে চল্লিশ কি ষাট পয়সা নিয়ে চাল কিনতে গিয়ে দেখে চালের সের টাকা টাকা, তখন সেই বুড়িটা ভাঙা হাটে পয়সা ক'টা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—বুড়িটা কী ভাবছে বলতে পার? আমি পারি নি। তিনি বলেছিলেন, মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান কিছুতেই বুড়ির সেই ভাবনাচিন্তার নাগাল পাবে না। এই গল্প বলতে বলতে তিনি কেঁদেছিলেন। তিনি একটি চাষী পরিবারকে দেখেছিলেন একবার, বোলপুর স্টেশনে সেই চাষী পরিবার ডাউন দার্জিলিং মেলে উঠতে এসেছিল, যাবে বর্ধমানের এক মেলায়। চাষা, চাষার বৌ, আর বাচ্চা একটা মেয়ে। তারা যথাসাধ্য নতুন রঙীন জামাকাপড় পরে এসেছে, মেলায় যাওয়ার আনন্দ উত্তেজনায় মেয়েটি অধীর, বৌটি ঘোমটা সরিয়ে চারদিক দেখছে। সেই ট্রেনে অসম্ভব ভিড় ছিল, দরজার হাতলে ঝুলছিল লোক। চাষা তার বৌ আর মেয়ের হাত ধরে এক দরজা থেকে আর এক দরজায় ছোটাছুটি করছে, কেউ তাদের উঠতে দিচ্ছে না। বাচ্চা মেয়েটা তার প্রথম ট্রেনে চড়ার আনন্দে দু'হাত বুকের কাছে জড় করে ক্লিষ্ট একটু হাসি মুখে নিয়ে অধীর আগ্রহে কাঁপছিল। তারা উঠতে পারছিল না। উগ্র আগ্রহে একটা দরজায় ওঠবার জন্য তারা যখন প্রাণপণ চেষ্টা করছিল, তখন একটা লোক—যে ঘাট থেকে ঝুলে ঝুলে যাচ্ছিল—ভীষণ বিরক্ত হয়ে চাষা লোকটাকে একটা লাথি মেরেছিল। অমনি চাষা পরিবার থমকে দাঁড়িয়ে গেল। অসহায় অপমানে, নিরুপায় দুঃখে চাষা তাকিয়ে আছে, চাষী-বৌ লজ্জায় আবার ঘোমটায় ঢেকেছে মুখ, মেয়েটা তখনো কাঁপছে—তার হাসিটা বদলে আস্তে আস্তে কান্না হয়ে যাচ্ছে—এই দৃশ্যটুকুর ওপর দিয়ে ডাউন দার্জিলিং মেল সরে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে। ঐ শিশু মেয়েটিকে মানুষের সভ্যতা কি দিল?

অতনু সেন না হয়ে অন্য কেউ হলে আমি নিশ্চয়ই এই গল্প শুনে হেসে উঠতাম। কিন্তু বস্তুতঃ মুশকিল এই যে, আমি অতনু সেন। এই সব ঘটনা আমার বুকে লেগে আছে, যেমন লেগে আছে ছেলেবেলায় খেলার মাঠে দেখা আমার বাবার অসহায় মুখখানা।

আমি হাসলাম না।

ছেলেটি বলল—অতনু সেন জানতেন কী করে গল্প বলতে হয়। মানুষকে ভাল না বাসলে ঐ সব তুচ্ছ গল্প ঐভাবে কেউ বলতে পারে না, যাতে চোখের জল আসে, বুকে কান্না জমে ওঠে সেই শিশু বয়সেও যা শুনে আমার রাতে ঘুম হয় নি। সেই প্রথম আমি মানুষের কথা ভাবতে শুরু করি। আজও অতনু সেনের সেইসব গল্প স্পষ্ট মনে আছে। এখনো চোখ বুজলেই ভাঙা হাটে সামান্য পয়সা হাতে এক বুড়িকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি, দেখি বোলপুরের প্ল্যাটফর্মে অপমানিত বাবার হাত ধরে দাঁড়িয়ে এক শিশু মেয়ে। তাই, এখনো মাঝে মাঝে নিজেকে ধিক্কার দেওয়ার মত জোর আমি পাই। অতনু সেন আমার জন্য অনেক করেছেন, কতখানি করেছেন তা তিনিও জানেন না। আমার বিশ্বাস, তিনি থেমে নেই। সেই বুড়ি বা সেই চাষী মেয়ের জন্য, বা ওরকম আরো অনেকের জন্য পৃথিবী তোলপাড় না

করে ছাড়বেন না।

আমি কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে, আস্তে আস্তে ধরা গলায় বললাম—অতনু সেন অনেকবার দল বদল করেছিল।

—তাতে কী? আমাদের কোন দলই উপযুক্ত নয়। একদিন মানুষ আপনা থেকেই তাঁর চারদিকে দলবদ্ধ হবে। আমি নিজে তাঁর সন্ধানে আছি।

চমকে উঠলাম। চুপ করে রইলাম। দুলুর সতর্কবাণী মনে পড়ল। আমরা আর আমরা নই। আমি নই আমি। আমি আমাকে ভুলে যাব। যেতেই হবে।

পৃথিবীর অধিকার হয়ে যাচ্ছে হাতবদল! বৃথা মানুষের সংগ্রাম। আসছে উদ্ভিদ কীট, আসছে জীবাণুরা। হুররে!

দুলু চা নিয়ে এল। ছেলেটির দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলল—ভুল ভেঙেছে তো? ছেলেটি হেসে মাথা নাড়ল কেবল। অন্যমনস্ক ছিল বলে উত্তর দিল না। তেমনি অন্যমনস্কভাবেই বসে বসে আস্তে আস্তে চা-টুকু শেষ করল। ততক্ষণ আমি চুপ করে রইলাম।

তারপর এক সময়ে শচীন বলল—আপনাকে প্রথম দেখে ঠিক যেন মনে হয়েছিল এই অতনু সেন। তারপর জানলাম আপনি অতনু সেন নন। কী যেন অপনার নামটা বৌদি বলেছিলেন কিন্তু ঠিক মনে পড়ছে না—

আমি তাড়াতাড়ি বললাম—হিরন্ময় চৌধুরী।

ছেলেটা হাসল – ঠিক।

তারপর উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ দেখি সকালের তীব্র আলোয় তার চোখ দুটো হঠাৎ ঝলসে উঠল, একটু হেসে সে বলল—অতনু সেনের আর একটা গল্প আপনাকে শুনিয়ে যাই। এটা ভৌতিক গল্প। একটা লোক তার নিজের ছায়াকে নিয়ে মুশকিলে পড়েছিল। ছায়াটা ঘড়ি ঘড়ি বদলে যায়! কখনো দেখে তার ছায়াটা একটা বাঘের ছায়া কখনো বা দেখে একটা বেড়ালের। কখনো বা দেখে ফণাতোলা একটা সাপের চেহারা নিয়েছে আবার কখনো বা একটা ঝুপসি গাছের মত হয়ে বাতাসে দোল খাচ্ছে। লোকটা ঐ সব দেখে আর ভাবে তাই তো! তবে কি আমি মাঝে মাঝে হয়ে যাই বাঘ, কিংবা বেড়াল! হয়ে যাই সাপ কিংবা গাছ? লোকটা ভাবত আর দিন-রাত ছায়া দেখত। দেখতে দেখতে আর ভাবতে ভাবতে সে ক্রমে ক্রমে ছায়ার মতই হয়ে যেতে লাগল। বাঘের ছায়া দেখলে সে বাঘের মত গর্জন করত, সাপের ছায়া দেখলে করত ফোঁস ফোঁস, আবার গাছের ছায়া দেখলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হুবহু এক গাছের মত বাতাসে দোল খেত। শেষ জীবন পর্যন্ত লোকটা বুঝতেই পারল না, সে আসলে কী।

আস্তে আস্তে তার মুখ থেকে স্খলিত হয়ে আমার চোখ নীচে নেমে এল। নুয়ে এল মাথা।

সে বলল—চলি।

আমি উত্তর দিলাম না।

সে চলে গেল।

অনেকক্ষণ বাদে তাদের খেলা সেরে রাঙা মুখে তিতু আর ঝিমলি এসে আমাকে

boiRboi.net

একই ভাবে বসে থাকতে দেখল। তারা চিৎকার করে আমাকে হনুমান আর কাঠবেড়ালী দেখার গল্প বলল।

তারপর ঝিমলি বলল—কে একটা লোক এসেছিল না বাবা। ঐ লোকটা ঢুকবার সময়ে আমাদের ডেকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করছিল।

—কী জিজ্ঞেস করেছিল?

—তোমার নাম কী, তুমি কী কর।

—তোমরা বললে?

—বললাম। আমার বাবার নাম অতনু সেন। আমার বাবা নেতা। ঠিক বলি নি বাবা?

আমি কষ্টে হাসলাম।

রাত অনেক। ছেলেমেয়েরা ঘুমোতে গেছে। শোওয়ার আগে দুলু তার শরীরে পাউডার ছড়াচ্ছিল।

আমি সেই সুন্দর দৃশ্য দেখছিলাম। দুই বাহু ঊর্ধ্বে তোলা। আধখোলা বুক উন্নত হয়ে পাতলা শাড়ি ভেদ করে আসছে। পিছল মসৃণ শরীর। লাবণ্যময়। একটু দেখে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। আমার মাথার মধ্যে আবার ঝড় উঠেছে। স্মৃতি আর স্মৃতি। অনন্ত দুঃখের স্মৃতিগুলি শূন্য থেকে উড়ে আসে। মানুষের জন্য—মানুষের জন্য—মানুষের জন্য এখনো সংগ্রাম বাকি রয়ে গেছে। কে করবে? কে আছ কোথায়? কে করবে?

আমি বিড় বিড় করে বললাম—দুলু, আমরা উদ্ভিদের হাতে পৃথিবীকে ছেড়ে দেব না।

দুলু চমকে ঘুরে বলল—কী?

আমি বিভোর হয়ে বললাম—কীট-পতঙ্গের হাতেও না।

—কী বলছ? কী ছেড়ে দেবে না?

—পৃথিবীর অধিকার। দুলু, আমাকে আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। আমি ছাড়া আর কে করবে?

boiRboi.net

বাসস্টপে কেউ নেই

boiRboi.net

boiRboi.net

ঘুমচোখে নিজের ঘর থেকে বেরোবার মুখে পাশের ঘরের পর্দাটা সাবধানে সরিয়ে রবি তার বাবাকে দেখতে পায়। খোলা স্টেটস্‌ম্যানের আড়াল থেকে ধোঁয়া উঠছে, আর সামনে একটা ক্ষুদে টেবিলের ওপর এক জোড়া পা, পায়ের পাশে একটা গরম কফির কাপ। ঐ স্টেটস্‌ম্যান, পা আর কফির কাপ—ঐ তার বাবা। রবি প্যান্টের পকেটে হাত ভরে রিভলভারটা বের করে আনল। সেটা তুলল, এক চোখ ছোটো করে লক্ষ্যস্থির করল। তারপর টিপল ট্রিগার।

ঠিসুং···ঠিসুং···ঠিসুং···তিনটে বুলেট ছুটে গেল চোখের নিমেষে। স্টেটস্‌-ম্যানটা খসে পড়ে যায় প্রথমে, দামী স্প্রিংয়ের ওপর দুর্ধর্ষ নরম ফোম রবারের গদির ওপর ঢলে পড়ে যায় বাবা, গদির ওপর দুলতে থাকে শরীর। বাবা চমৎকার একটা মৃত্যু চিৎকার দেয়—আঃ আ-আ-আ···

রবি হাসে একটু। রিভলভারটা আবার পকেটে ভরে দু পা এগোয়, তার বাবা দেবাশিস শুয়ে থেকেই তার দিকে চেয়ে বলে—শট্‌! শট্‌!

রবির ঘুমমাখা কচি মুখে চাপা রহস্যময় হাসি। বলে—নাইস অব ইউ টেলিং দ্যাট।

দেবাশিস উঠে বসে। জ্বলন্ত সিগারেটটা ঠোঁটে নেয়। স্টেটস্‌ম্যানটা দিয়ে মুখ ঢাকার আগে বলে—প্রসিড টুওয়ার্ডস দা বাথরুম ম্যান।

—ইঁয়া। বলে রবি হাই তোলে। ডাকে—দিদি!

অমনি অন্য পাশের ঘরের পর্দা সরিয়ে আধবুড়ী ঝি চাঁপার হাসিমুখ উঁকি দেয়—সোনা!

দুহাত বাড়িয়ে রবি ঘুমন্ত গলায় বলে—কোল।

চাঁপা তাকে কোলে নেয়। এই সকালের প্রথম বাথরুমে যাওয়াটা বড় অপছন্দ রবির। একটু সময় সে দিদির কোলে উঠে থাকে রোজ সকালে। কাঁধে মাথা রেখে হাই তোলে।

চাঁপা কানে কানে বলে—আজ রবিবার।

—হুঁ।

—ছুটি।

—হ্যাঁ।

—সোনামণি আজ কোথায় কোথায় যাবে বাবার সঙ্গে?

কচি মুখখানা আনন্দের সুস্বাদু হাসিতে ভরে যায় রবির। প্রকাণ্ড শার্শিওলা চওড়া জানালার পাশ থেকে চাঁপা পর্দা সরিয়ে দেয়। সাততলার ওপর থেকে বিশাল কলকাতার দৃশ্য ছবির মতো জেগে ওঠে। নীচে একটা মস্ত পার্ক। পার্কের মাঝখানে পুকুর। চারধারে বাঁধানো রাস্তায় লোকজন হাঁটছে।

boiRboi.net

ও ঘরে টেলিফোন বাজে, রিসিভার তুলে নেওয়ার 'কিট' শব্দ হয়। তারপর দেবাশিসের স্বর—হ্যালো।

রবি বলে—ফোন।

চাঁপা বলে—হুঁ।

—কার ফোন বলো তো?

—বাবার বন্ধু কেউ!

—না, মণিমার। রবি বলে!

চাঁপার মুখখানা একটু গম্ভীর হয়ে যায়। বলে—এবার চলো, মুখখানা ধুয়ে নেবে!

রবি হাই তোলে, বলে—কাল রাতের গল্পটা শেষ করোনি।

চাঁপা হাসে—বলব। দাঁত মাজতে মাজতে।

ও ঘর থেকে দেবাশিসের হাসির শব্দ আসে। বলে—আজই?…হুঁ…হুঁ…না, না, রবিবার শুধু রবির দিন। এ দিনটা ওর সঙ্গে কাটাই।…আচ্ছা…

রবি উৎকর্ণ হয়ে শোনে। বলে—ঠিক মণিমা।

—এখন চলো তো। চাঁপা বলে।

বাথরুমে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করতে করতে হাই তোলে রবি। চাঁপা তার ছোট্ট ব্রাশে পেস্ট লাগাতে যাচ্ছিল, রবি রাগের স্বরে বলে—না, না পেস্ট না!

—তবে কী দিয়ে মাজবে?

—তোমার কালো মাজনটা দিয়ে।

—ও তো ঝাল মাজন! পেস্ট মিষ্টি।

—না, পেস্ট বিচ্ছিরি। ফেনা হলে আমার বমি পায়।

—বাবা যদি টের পায় আমার মাজন দিয়ে মেজেছো তাহলে রাগ করবে কিন্তু।

—টের পাবে কি করে! চুপ চুপ করে মেজে দাও। আঙুল দিয়ে কিন্তু। ব্রাশ বিচ্ছিরি।

চাঁপার বুড়ো মুখখানা মায়ার হাসিতে ভরে ওঠে। সে রান্নাঘর থেকে তার সস্তা কালো মাজনের শিশি নিয়ে এসে দাঁত মেজে দিতে থাকে।

রবি ভ্রূ কুঁচকে বলে—গল্পটা বলবে না?

—হ্যাঁ হ্যাঁ তারপর…কতটা যেন বলেছিলাম সোনাবাবু?

—তোমার কিছু মনে থাকে না। শিবুচরণ রাত্তির বেলা এক মাছ ধরতে গিয়েছিল নৌকোয়। জাল টেনে তুলতেই দেখে মাছের সঙ্গে একটা কেউটে সাপ।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, লালটেমের আলোয় জাল খুলতেই মাছের সঙ্গে একটা কেউটে সাপ বেরিয়ে এল। ছোট্ট নৌকো, চার হাত খানেক হবে। তার এধারে শিবুচরণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে, মাঝখানে লালটেম জ্বলছে ওধারে ফণা তুলে কালকেউটে। আর খোলের মধ্যে জ্যান্ত মাছগুলো তখনো দাপাচ্ছে। চারধারে কালিঢালা অন্ধকার নিশুত নিঃঝুম। মাঝগাঙে শিবুচরণের সে কী বিপদ! নড়তে চড়তে পারে না, ভয় বুদ্ধিভ্রংশ হাতে পায়ে সাড় নেই।

রবি প্রথম কুলকুচোটা সেরে নিয়েই বলে—জলে ঝাঁপ দিল না কেন ?

চাঁপা একটু থতিয়ে গিয়ে বড় বড় চোখ করে চায়—ঠিক তো সোনাবাবু ! কী বুদ্ধি বাবা তোমার ঐটুকুন মাথায় ! উঃ !

বলে চাঁপা রবির মুখ তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে কোলে তুলে নেয়। মাথাটা কাঁধে চেপে রেখে বলে—সোনাবাবুর মাথার মধ্যে বুদ্ধির বাসা। এমনটি আর দেখিনি।

রবি মুখ টিপে অহংকারের হাসি হেসে মুখ লুকিয়ে বলে—উঃ তারপর বলো না !

—হ্যাঁ তা শিবুচরণের হাতে পায়ে তো খিল ধরে গেছে তখন। কাঁপুনি উঠছে। ভাবছে এই মলুম, এই গেলুম আর বাপভাই ছানাপোনার মুখগুলো দেখতে পাবো না। কালসাপে খেলে আমাকে গো ! কে কোথায় আছো মানুষজন, এসে পরাণটা রাখো। কিন্তু কোথায় কে ! শীতে মাঝরাতে মাঝগাঙে জনমনিষ্যি নেই। শিবুচরণ বুঝল যে মানুষজনকে ডাকা বৃথা। কেউ তার ডাক শুনতে পাবে না। তখন ভয়ের চোটে শিবু রামনাম করতে থাকে, কিন্তু সাপটা নড়ে না। শিবুর মনে হল, তাইতো রামনাম তো ভূতের মন্ত্র। তখন সে মা মনসাকে ডাকতে থাকল। তাতে যেন আরো জোর পেয়ে সাপটা এধার ওধার গোটা দুই ছোবল মারল। লালটেমটা মাঝখানে থাকতে রক্ষে ! কিন্তু সে আর কতক্ষণ। শিবু বুঝে গেল মা মনসা কুপিত আছেন কোনো কারণে তার ওপর। ডেকে কাজ হবে না। হিতে বিপরীত হয় যদি ! তখন শিবুচরণ মনে করল গাঁয়ের পুরুতমশাই বলেন বটে বাপ পিতেমোর আত্মা···সোনাবাবু বোসো।

চাঁপা ডাইনিং রুমে এনে চেয়ার টেবিলে বসায় রবিকে। রবি বিরক্ত হয়ে চাঁপাকে আঁকড়ে ধরে বলে—উঃ ! তুমি আগে বোসো, আমি তোমার কোলে বসব।

চাঁপা চারধারে চেয়ে কানে কানে বলে—আমি কি চেয়ারে বসতে পারি ? বাবা দেখলে যে রাগ করবে !

—একটুও রাগ করবে না। উঃ বোসো ! কথা শোনো না কেন !

—বসছি বসছি। বলে চাঁপা তাকে কোলে নিয়ে বসে। প্লেটে সেঁকা রুটি মাখন, দুধের গেলাস রেখে যায় প্রীতম চাকর। রেখে সে বলে—রবিবাবু, কাল যখন সন্ধ্যেবেলা আমি ঘুমোচ্ছিলাম তখন কে আমার কানে জল ঢেলে পালিয়ে গেল শুনি !

—তুই ঘুমোস সন্ধ্যেবেলা ? বাবা রাগ করে না ?

—ওঃ ঘুম নয়। চোখ বুজে তোমার জন্য একটা গল্প ভাবছিলাম আর তুমি জল ঢেলে পালিয়ে গেলে। কানের মধ্যে এখনো জলটা ফচ ফচ করছে। আজ বাবাকে যদি বলে না দিই !

পকেট থেকে গম্ভীর ভাবে রিভলভারটা বের করে রবি তুলেই ট্রিগার টেপে।

ঠিসুং···ঠিসুং···ঠিসুং···আঃ আ আ, বলে প্রীতম টাল খেয়ে পড়ে যেতে যেতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

দুধের গ্লাসে চুমুক দিয়ে রবি বলে—তারপর বলো।

চাঁপা অসহায় ভাবে বলে—কী যেন বলছিলাম !

—বড্ড ভুলে যাও তুমি।

—বুড়ো হচ্ছি না !

BoiRboi.net

—বুড়ো হলে কি ভুলে যেতে হয় ?

চাঁপা তার গালে গালটা ছুঁইয়েই সরিয়ে নেয় মুখ, বলে—বুড়ো পুরুতমশাই বলেন বাপপিতেমোর আত্মারা সব সময়ে আমাদের নাকি চোখে চোখে রাখেন। এমনিতেই কিছু করতে পারেন না, কিন্তু প্রাণ ভরে তারা এসে আপদ বিপদের আসান করে দিয়ে যান। শিবুচরণ তখন ডাকতে থাকে—ও মোর বাপপিতেমো, তোমরা কে কোথায় আছো, দ্যাখোসে তোমাদের আদরের শিবের দশাখানা। নিশুত রাতে কে বা জানবে শিবেকে দংশেছে নিঘিন্নে জীব, কে ডাকবে ওঝা-বদ্যি শিবে যে যায়··· এইসব বিড়বিড় করে বলছে যখন, তখনই সাপটা হঠাৎ ঠিক মানুষের গলায় বলে—ওহে শিবুচরণ—

ও-ঘর থেকে পর্দাটা সরিয়ে দরজায় দাঁড়ায় দেবাশিস। একটু ভারী গলায় বলে—আনে হারি আপ, হারি আপ—

—গী—মুখ ফিরিয়ে হাসে রবি। চাঁপা জড়োসড়ো হয়ে উঠে দাঁড়ায়, কোলে রবি।

দৃশ্যটা দেখে একটু হাসে দেবাশিস। পর্দাটা ফেলে দেয়। ও ঘর থেকে তার গলা পাওয়া যায়—ড্রেস আপ ম্যান ড্রেস আপ।

—ইঁয়া। উত্তর দেয় রবি। তারপর দুটো টোস্ট দু কামড় করে খেয়ে ফেলে দিয়ে বলে—দিদি, তাড়াতাড়ি করো।

—কিছু খেলে না সোনাবাবু !

—আঃ খেতে ইচ্ছে করছে না যে।

—দুধটুকু তবে দু চুমুক, দাদা আমার !

—ইস্ কী যে যন্ত্রণা করো না !

বলে রবি ঢকঢক করে দুধটা খায়। হাতের উল্টো পিঠে মুখ মুছে ছুটে পাশের ঘরে গিয়ে ডাকে—দিদি তাড়াতাড়ি।

দেবাশিস ভিতর দিকের দরজা ভেজিয়ে দিল সাবধানে। রবি ওঘরে পোশাক পরছে। ঘড়িতে আটটা বাজে। তৃণা এখন নিশ্চয়ই ঘুম থেকে উঠেছে। ও একটু দেরীতে ওঠে। ওদের বাড়ীর এখনকার দৃশ্যটা মনশ্চক্ষে দেখে নিল দেবাশিস। তৃণার বর শচীন এখন বাগানে। এমন ফুল-পাগল, গাছ-উন্মাদ লোক কদাচিৎ দেখা যায়। কেবল মাত্র ঐ গাছের জন্য ফুলের জন্য হাজরা রোডের ওপর সাতকাঠার মতো জমি সোনার দাম পেয়েও বেচবে না। ঐ সাতকাঠার কোন দরকারই হয় না ওদের, বাড়ির চারধারে বিস্তর জমি। বাড়ি ছাড়িয়ে রাস্তা, রাস্তার ও পাশে ঐ ফালতু জমিটায় তার বাগান। এতক্ষণে সেখানে গাছপালার মধ্যে জমে গেছে শচীন। তৃণার এক ছেলে, এক মেয়ে মনু আর রেবা। মনু টেনিস শিখতে যায় রবিবারে, রেবার নাচগানের ক্লাশ থাকে। আটটা থেকে সোয়া আটটার মধ্যে তৃণার চারধারে চাকর-বাকর ছাড়া কেউ বড় একটা থাকে না। অবশ্য থাকলেও ক্ষতি নেই। সবাই জানে, দেবাশিস আর তৃণার মধ্যে একটা প্লাস চিহ্ন আছে। এমন কি দেবাশিসের বৌ চন্দনা আত্মহত্যা করেছিল না খুন হয়েছিল এ বিষয়ে সকলের সন্দেহ কাটেনি এখনো। পুলিশ অবশ্য কেস দিয়েছিল কোর্টে খুনের দায়ে দেবাশিসকে জড়িয়ে,

কিন্তু দুর্বল কেসটা টেকেনি। কিন্তু জনগণের মধ্যে এখনো সম্ভবতঃ দেবাশিস আসামী।

ডায়াল করার পর নির্ভুল রিং-এর শব্দ হতে থাকে আর দেবাশিসের একটা দুটো হৃৎস্পন্দন হারিয়ে যায়। শ্বাসের কেমন একটা কষ্ট হতে থাকে।

—হেল্লো। তৃণা বলে।

—দেব।

—বুঝেছি।

—কথা বলার অসুবিধে নেই তো!

—একটু আছে।

—ঘরে কেউ আছে নাকি?

—হুঁ।

—তাহলে দশ মিনিট পরে ফোন করব।

তৃণা একটু হাসে। বলে—না, না, ভয় নেই এসময়ে কেউ থাকে নাকি! একে রোবার, তার ওপর বাদলা ছেড়ে কেমন শরতের রোদ উঠেছে! কেবল আমিই পড়ে আছি একা, কেউ নেই।

—কী করছিলে?

—টেলিফোনটা পাশে নিয়ে বসে ছিলাম, হাতে খোলা জীবনানন্দের সাতটি তারার তিমির; কিন্তু একটা কবিতাও পড়া হচ্ছিল না।

দেবাশিস গলাটা সাফ করে নিয়ে বলে—কী করবে আজ?

—কী আর! বসে থাকব। তুমি?

—আজকাল রবি ছুটির দিনগুলোয় চাঁপার কাছে থাকতে চায় না।

—বড় হচ্ছে তো, রক্তের টান টের পায়। শত হলেও তুমি বাপ।

—তুমি বেরোচ্ছো না?

তৃণা একটা শ্বাস ছেড়ে বলে—জানোই তো, চারদিকে লোকনিন্দের কাঁটাবেড়া, একা বেরোলেই শচীন এমন একরকম কুটিল চোখে তাকায়! আজকাল বুড়ো বয়সে বড্ড সাসপিসিয়াস হয়েছে। ছেলেমেয়েরাও পছন্দ করে না। তাই আটকে থাকি ঘরে।

—দূর! ওটা কোন কথা হল নাকি?

—তবে কথাটা কি রকম হলে মশাইয়ের পছন্দ?

—আমি বলি, তুমিও বেরিয়ে পড়ো, আমিও বেরিয়ে পড়ি।

—তারপর?

—কোথাও মীট করব।

তৃণা একটু চুপ করে থেকে বলে—দেব, রবি কিন্তু বড় হচ্ছে।

—কী করব?

—সাবধান হওয়া ভাল। যা করো ছেলেকে সাক্ষী রেখে কোরো না।

—তিনু, তুমি কিন্তু এতটা গেরস্ত মেয়ে ছিলে না, দিন দিন কী হয়ে যাচ্ছো?

—বয়স হচ্ছে।

boiRboi.net

—ওসব আমি বুঝি না। গত সাতদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি।

—মিথ্যুক।

—কী বলছ ?

—বলছি তুমি মিথ্যুক। তৃণা হাসে।

—কেন ?

—পরশুদিনও তুমি সন্ধ্যের পর গাড়ী পার্ক করে রেখেছিলে রাস্তায়, যেখান থেকে আমার শোয়ার ঘরের জানালা দেখা যায়।

বাঁ হাতে বুক চেপে ধরে দেবাশিস, শ্বাসকষ্ট। হৃৎস্পন্দন হারিয়ে যায় একটা… দুটো…গভীর একটা শ্বাস টানে সে। বুকে বাতাসের তুফান টেনে নেয়।

দেবাশিস আস্তে করে বলে—কী করে বুঝলে যে আমি।

—তোমাকে যে আমি সবচেয়ে বেশী টের পাই।

—গাড়ির নাম্বার প্লেট দেখেছো।

—না। আবছা গাড়িটা দেখেছি। আর দেখেছি ড্রাইভিং সীটে একটা সিগারেট আর দুটো চোখ জ্বলছে।

—যাঃ।

—আমি জানি দেব, সে তুমি ছাড়া আর কেউ নয়।

দেবাশিস দাঁত টিপে চোখ বুজে লজ্জাটাকে চেপে ধরে মনের মধ্যে। গলার স্বর কেমন অন্য মানুষের মতো হয়ে যায়, সে বলে—তুমি ছাড়া আর তো কেউ জানে না।

—জানবে কি করে! তৃণা হাসে—তোমাকে যে না চেনে সে কী করে জানবে রাস্তায় কার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কে বসে আছে ড্রাইভিং সীটে একা ভুতের মতো! আমি ছাড়া এত মাথাব্যথা আর কার ?

—তুমি অনেকক্ষণ বড় জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলে, পিছনে ঘরের আলো, তাই তোমার মুখ দেখতে পাইনি। যদি জানতাম যে তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছো!

—তাহলে কী করতে ?

—তাহলে তক্ষুনি রাস্তায় নেমে ছক্করবাজি নাচ নেচে নিতাম।

—দেব, বয়স বাড়ছে।

দেবাশিস তৎক্ষণাৎ বলে—পাগলামিও।

—বুঝলাম। কিন্তু কেন ? ওরকম কাঙালের মতো আমার বাড়ির পাশে বসে থাকবার মতো কী আছে ? নতুন তো নয়।

দেবাশিস ঠিক উত্তরটা খুঁজে পায় না। রক্ত কলরোল তোলে। বুকে আছড়ে পড়ে বন্ধ জলোচ্ছ্বাস। সে বলে, তিনু, আমি বড় কাঙাল।

তৃণা একটু শ্বাস ফেলে। কিছু বলে না।

দেবাশিস বলে—শুনছো ?

—কী ?

—আমি বড় কাঙাল।

—কাঙাল কী না জানি না তবে বাঙাল বটে।

boiRboi.net

—তার মানে ?

—বাঙাল মানে বোকা। বুঝেছো ?

—তাই বা কেন ?

—রবি কোথায় ? তোমার এসব পাগলামির কথা তার কানে যাচ্ছে না তো ?

—কানে গেলেই কী ! ও বাচ্চা ছেলে, বুঝবে না।

তৃণা একটা মৃদু হাসি হেসে বলে—তুমি বাচ্চাদের কিছু জানো না। ওরা আজকাল পাকা বিচ্ছু হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া বাচ্চারা কিন্তু সব টের পায়।

দেবাশিস একটু হতাশার গলায় বলে—শোনো, রবির জন্য চিন্তার কিছু নেই। যদি টের পায় তো পাক। আগে বলো, তোমার সঙ্গে দেখা হবে কি না।

তৃণা মৃদুস্বরে বলে—কোথায় ?

—তুমি যেখানে বলবে।

—আমার লজ্জা করে। তোমার সঙ্গে যে তোমার ছেলে থাকবে !

—ও তোমায় চেনে না নাকি ! এসব নতুন ডেভেলাপমেণ্ট তোমার কবে থেকে মনে হচ্ছে।

—রবি বড় হচ্ছে তাই ভয় পাই। বুঝতে শিখছে।

—ভয় পেয়ো না। গাড়ি নিয়ে বেরোচ্ছি। ঘণ্টা খানেক চিড়িয়াখানা আর রেস্টুরেণ্টে কাটাবো। দুপুরে আমার বোনের বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ। অবশ্য একা রবিরই নিমন্ত্রণ, ওদের বাড়িতে যে আমি খুব জনপ্রিয় নই তা তো জানোই। রবিকে সেখানে পেঁৗছে দিয়ে আমি ফ্রী।

—তার মানে এগারোটা কী বারোটা হবে বেলা। আমি কী তোমার মতো স্বাধীন দেব ? দুপুরে সকলের খাওয়ার সময়ে বাইরে থাকলে লোকে বলবে কী ?

—তাহলে চিড়িয়াখানা বা রেস্টুরেণ্টে এসো।

—তাহলে রবিকে চোখ এড়ানো যাবে না।

—উঃ। তুমি যে কী গোলমাল পাকাও না।

তৃণা হেসে বলে—আচ্ছা, না হয় দুপুরের প্রোগ্রামই থাকল। কোথায় দেখা হবে ?

—তুমি ফাঁড়ির কাছে বাসস্টপে থেকো।

দেবাশিস চোখের কোণ দিয়ে দেখে রবি এসে দাঁড়িয়েছে পর্দা সরিয়ে দরজার চৌকাঠে। স্ট্রেচলনের একটা হাল্কা নীল রঙের প্যাণ্ট আর দুধ-সাদা একটা টি-শার্ট পরনে, বুকের কাছে বাঁ ধারে মনোগ্রাম করা ওর নামের আদ্য অক্ষর। মাথায় থোপা থোপা চুলের ঘুরলি। একটু হাসি ছিল মুখে। সেটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে এখন।

—তাহলে ? দেবাশিস ফোনে বলে।

—আচ্ছা ছাড়লাম।

—সো লং।

ফোনটা রেখে দেয় সে।

হাসিটা আর রবির মুখে নেই, মিলিয়ে গেছে, চেয়ে আছে বাবার দিকে, চোখে চোখ পড়তেই মুখটা সরিয়ে নিল।

boiRboi.net

দেবাশিস ছেলের দিকে চেয়ে থাকে। বুকের মধ্যে ঝড় থেমেছে, ঢেউ কমে এল, শুধু অবসাদ। টেনশনের পর এমনটা হয়, মুখে একটু সহজ হাসি ফুটিয়ে তোলা এখন বেশ শক্ত, টানাপোড়েন এখনো তো শেষ হয়নি। তৃণার সঙ্গে দুপুরে দেখা হবে, ফাঁড়ির কাছের বাসস্টপে। তার স্নায়ুর ভিতরে এখনো একটা তৃষ্ণার্ত উচাটন ভাব। দেখা হবে, পিপাসা বাড়বে, তবু এক সমুদ্রের তফাৎ থেকে যাবে সারা জীবন তৃণার সঙ্গে তার।

রবি মুখ তুলতে দেবাশিস ক্লিষ্ট একরকম হাসি হাসে। রবি কি সব বোঝে! বুকের মধ্যে একটা ভয় আচমকা হৃদ্‌যন্ত্রকে চেপে ধরে তার।

চতুর ভঙ্গিতে দেবাশিস এক পা এগিয়ে হাত বাড়িয়ে বলে—দিস ইজ দেবাশিস দাশগুপ্ত।

বাড়ানো হাতখানা রবি ধরে শেকহ্যান্ড করতে করতে বলে—দিস ইজ নবীন দাশগুপ্ত প্লীজড টু মীট ইউ।

রবির পিছনে চাঁপা দাঁড়িয়ে শাড়ি পরেছে চুল আঁচড়েছে। দেবাশিসের চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে ভারী নরম সুরে বলে—বাবা আমি কি সোনাবাবুর সঙ্গে যাবো ?

দেবাশিস অবাক হয়ে বলে—কোথায় ?

চাঁপা লাজুক গলায় বলে—সোনাবাবু ছাড়ছে না, কেবল সঙ্গে যেতে বলছে!

রবি করুণ মুখভাব করে বলে—দিদি যাবে বাবা ?

দেবাশিস একটু ক্ষীণ হাসি হাসে, বলে—তোমার ইচ্ছে হলে যাবে কিন্তু খাবে কোথায়! ওর তো নেমন্তন্ন নেই।

চাঁপার মুখ একটা হাসির ছটায় আলো হয়ে যায়, বলে—আমি কিছু খাবো না, সকালে পান্তা খেয়ে নিয়েছি, সোনাবাবুর সঙ্গে সঙ্গে থাকব, সেই আমার খাওয়া।

দেবাশিস অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ে, গাড়ির চাবিটা আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে দরজা খুলে লিফটের দিকে এগোয়।

দুই

প্রেম একরকম, পাপ আর একরকম, কোনটা প্রেম, কোনটা পাপ তা বোঝা যদিও মুশকিল, তবু কতকগুলো লক্ষণ তৃণা জেনে গেছে। মনে মনে যখন সে দেবাশিসের কথা ভাবে তখন তার শচীনের দিকে তাকাতে লজ্জা করে, ছেলেমেয়ের দিকে চাইতে পারে না আর বুকের মধ্যে একরকম তীব্র শুষ্ক বাতাস বয়, গলা শুকোয়, জিভ শুকোয়, বিনা কারণে চারিদিকে চোরাচোখে তাকিয়ে দেখে। নিজের ছায়াটাকেও কেমন ভয়-ভয় করে।

boiRboi.net

বাথরুম থেকে স্নান সেরে বেরোতে গিয়েই তৃণা ভারী চমকে ওঠে। কিছু না, বাইরের বেসিনে শচীন খুবই নিবিষ্টভাবে তার বাগানের মাটিমাখা হাত ধুচ্ছে। বেঁটেখাটো মানুষ, বছর বিয়াল্লিশ বয়স, বেশ শক্তসমর্থ চেহারা, চোখে মুখে একটা কঠোর পুরুষালী সৌন্দর্য আছে। শচীন তার দিকে তাকিয়েও দেখেনি, তবু তৃণা বাথরুমের দরজার পাল্লাটা ধরে নিজেকে সামলে নিল। খোলা শরীরের ওপর কেবল শাড়িটা কোন রকমে জড়ানো। কেমন লজ্জা হল তার, তাড়াতাড়ি ডানদিকের আঁচল টেনে শরীরের উদোম অংশটুকু ঢেকে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে দ্রুত ঘরে চলে এল।

ঘরটা তার একার, সম্পূর্ণ একার। একধারে মস্ত খাট, বইয়ের সেলফ খাটের নাগালের মধ্যেই, অন্যধারে ড্রেসিং টেবিল, একটা ওয়ার্ডরোব, একটা আলমারি, সবই দামী আসবাব, মস্ত বড় বড় দুটো জানলা দিয়ে সকালের শারদীয় রোদ এসে মেঝে ভাসিয়ে দিচ্ছে, উজ্জ্বলতা প্রখর। সাধারণ সায়া ব্লাউজ পরে নিল সে, শাড়িটা ঠিক করে পরল, ওয়ার্ডরোব খুলে বাইরে বেরোনোর পোষাকী শাড়ি আর ম্যাচ করা ব্লাউজ বের করে পেতে রাখল বিছানায়। দূরে থেকে একটু ঘাড় ফিরিয়ে দেখে সেগুলো, তারপর আয়নার সামনে গিয়ে বসে। তার চেহারা ছিপছিপে, ফর্সা, মুখশ্রী হয়তো ভালই, কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক তার মুখের সজীবতা। চোখ কথা কয়, চোখ হাসে, নাকের পাটা কেঁপে ওঠে অল্প আবেগে। ঠোঁট ভারী, গাল ভারী, সব মিলিয়ে তার বয়স সত্যিকারের তুলনায় অনেক কম দেখায়। আবার বয়সের ঢলে তার কোথাও যে কোনো খাঁকতি নেই সেটাও বোঝা যায়। নিজেকে ভালবাসে তৃণা, ভালবাসার মতো বলেই। মাঝে মাঝে সে নিজের প্রেমে পড়ে যায়।

পাশের ঘরে শচীনের সাড়া পাওয়া যায়। সুরহীন একরকম গুনগুন শব্দ করে শচীন। গান নয়, অনেকটা গানের মতো। শচীনের ঐ এক মুদ্রাদোষ। ঐ সুরহীন গুনগুন শব্দ কি ওর একাকিত্বের?

যদি তাই হয়, তবু ঐ একাকিত্বের জন্য তৃণা দায়ী নয়। দেবাশিসও নয়। একদা শচীনই ছিল তৃণার সর্বস্ব। কিন্তু শচীনের কে ছিল তৃণা? তৃণা তাই ঐ স্বরটা শোনে উৎকর্ণ হয়ে। দু ঘরের মাঝখানের দরজা রাতে বন্ধ থাকে, দিনে মস্ত ভারী সাটিনের পর্দা ঝুলে থাকে। শচীন অবশ্য বেশীক্ষণ ঘরে থাকে না, যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ঐ পর্দা থাকে অনড় হয়ে। কেউ কারো ঘরে যায় না। এ বাড়ির আর এক কোণে থাকে ছেলেমেয়েরা। তাদের সঙ্গেও হুটহাট দেখা হয় না। হলেও কথাবার্তা হয় বড্ড কম। একমাত্র খাওয়ার সময়ে তৃণা সামনে থাকে। সেও এক নীরব শোকসভার মতো। সবাই চুপচাপ খেয়ে যায়। তৃণার চোখে জল আসে, কিন্তু তাতে লাভ কি? চোখের জলের মতো শক্তিশালী অস্ত্র যখন ব্যর্থ হয় তখন মানুষের আর কিছু নেই। সে তখন থাকে না। যেমন তৃণা এ বাড়িতে নেই, এ সংসারে নেই। মৃত্যুর পর বাঁধানো ফটো যেমন ঘরের দেয়ালে সেও তেমনি। তাই তৃণা দায়ী নয়।

তৃণা ঘাড়ে গলায় পাউডারের নরম পাফ ছুঁইয়ে দেয়। সিঁদুর দেয়। সামান্য ক্রীম দু হাতের তেলোয় মেখে মুখে ঘষে। এখন আর কিছু করার নেই। সারাদিন তার

করার কিছু থাকেও না বড় একটা। যে লোকটা রান্না করে সে একশ টাকা মাইনে পায়। তার অর্থ, লোকটাকে শেখানোর কিছু নেই। যে সব চাকর বা ঝি ঘরদোর গুছিয়ে রাখে তারাও নিজেদের কাজ বোঝে। তৃণা শুধু ঘুরে ঘুরে একটু তদারক করে। কখনো নিজের হাতে কিছু রাঁধে। সে কারো মুখে তেমন রোচে না, তৃণাও রান্নাবান্না ভুলে গেছে। শুধু কবে কী কী রান্না হবে সেটা বলে দিয়ে আসে। তাই হয়। কেবল নিজের ঘরটাতে সে নিজে বইপত্র গোছায়, বিছানায় ঢাকনা দেয়, ওয়ার্ডরো সাজায়, ড্রেসিং টেবিলে রূপটানের জিনিস মনের মতো করে রাখে। কাগজ ভিজিয়ে তা দিয়ে আয়না মোছে। এ ঘরে কেউ বড় একটা আসে না। এ তার নিজের ঘর, বড্ড ফাঁকা বড্ড বড়। রাস্তার দিকে একটা ব্যালকনি আছে সেখানে একা ভূতের মতন কখনো দাঁড়ায়। কবিতার বই, পত্র-পত্রিকা গল্প-উপন্যাস আর ছবি আঁকার জলরঙ মোটা কাগজ, তুলি—এইসবই তার সারাদিনের সঙ্গী। ইদানীং সে কবিতা লেখে, দু একটা কাগজে পাঠায়। সে সব কবিতা দুঃখভারাক্রান্ত, নিঃসঙ্গতাবোধ মন্থর ব্যক্তিগত হা-হুতাশে ভরা ভাবপ্রবণতা—এখনো ছাপা হয়নি। এক আধটা কবিতা ছাপা হলে মন্দ লাগত না তার। যে সব ছবি সে এঁকেছে তার অধিকাংশই প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি। নারকোল গাছ, চাঁদ আর নদীতে নৌকো—এ ছবি আঁকা সবচেয়ে সোজা। তারপরই পাহাড়ের দৃশ্য। তৃণা আঁকতে তেমন শেখেনি, তুলি রঙের ব্যবহারও জানে না। ছবি জ্যাবড়া হয়ে যায়, তবু আঁকে। ভাবে একটা এগজিবিশন করবে নাকি একাডেমী বা বিড়লা মিউজিয়ামে! করে লাভ নেই অবশ্য, কেউ পাত্তা দেবে না। ছবি আঁকার মাথামুণ্ডুই সে জানে না। তৃণা কলেজে ভাল ক্যারাম খেলতো। বাড়িতে, বিশাল দুটো বোর্ড আছে। একা একা মাঝেমধ্যে গুটি সাজিয়ে টুকটাক স্ট্রাইকার টোকা দিয়ে গুটি ফেলে সে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী নেই বলে খেলার কোন টেনশন থাকে না, ক্লান্তি লাগে। নিজের প্রতিপক্ষ হয়ে একবার কালো, আবার উল্টোদিকে গিয়ে নিজের হয়ে সাদা গুটি ফেলে কতক্ষণ পারা যায়?

শচীন একটানা গুনগুন শব্দে কথাহীন সুরহীন একটা গান গেয়ে যাচ্ছে পাশের ঘরে। বনেদী বড়লোক তাই নিজের হাতে প্রায় কিছুই করতে হয়নি তাকে, বাবাই করে গিয়েছিলেন। বাবার বিশাল সম্পত্তি চার ভাই ভাগ করে নিয়েও বড়লোকই আছে। বাড়িটা শচীনের ভাগে পড়েছে। সিমেণ্টের কারবার নিয়েছে বড় ভাই, ছোটো দু ভাই নিয়েছে একজন ওষুধের দোকান অন্যজন ভাল কয়েকটা শেয়ার। শচীনরা চার ভাই-ই শিক্ষিত। সে নিজে ইঞ্জিনীয়ার, ভাল চাকরী করে বড় ফার্মে। একবার নিজের পয়সায় অন্যবার কোম্পানীর খরচায় বিলেত ঘুরে এসেছে! পৃথিবীর সব দেশেও গেছে সে, চীন আর রাশিয়া ছাড়া। এমন মানুষ আর এমন ঘর পেলে কোন মেয়ে না বর্তে যায়! শক্তসমর্থ এবং কিছুটা নিরাসক্ত শচীন ভালবাসে ফুল, সুন্দর রঙ, ভালবাসে চিন্তাভাবনা, মানুষের প্রতি তার আগ্রহ আছে। তবু এইসব ছুটির দিনে বা অবসরে সে যখন বাগান করে, মন্থরভাবে নিজের ঘরে জার্নাল নাড়াচাড়া করে, যখন গুনগুন করে তখন তাকে বড় নিষ্কর্মা মনে হয়।

ছুটির দিনে তাই তৃণারও অসহ্য লাগে। একা একরকম আর জন থাকা সত্ত্বেও একা আর একরকম।

বড় অদ্ভুত বাড়ি। সারাদিনেও একটা কিছু পড়ে না, ভাঙে না, দুধ উথলে পড়ে না, ডাল ধরে যায় না। সুশৃঙ্খলভাবে সব চলে। তৃণাকে কোনো প্রয়োজনই হয় না কোথাও। একটা অ্যালসেশিয়ান আর একটা বুলডগ বক্সার কুকুর আছে। সে দুটোরও কোনো ডাকখোঁজ নেই। কেবল শচীনের বুড়ো কাকাতুয়াটা কথা বলে পাকা পাকা। কিন্তু সে হচ্ছে শেখানো বুলি, প্রাণ নেই। অর্থ না বুঝে পাখি বলে—তৃণা, কাছে এসো....তৃণা কাছে এসো...

পাখিটা বুড়ো হয়েছে। একদিন মরে যাবে। যখন তৃণাকে কাছে ডাকার কেউ থাকবে না।

না, থাকবে। দেবাশিস। ও একটা পাগল। এমন ভাবে ডাকে যে দেশসুদ্ধ, সমাজসুদ্ধ লোক জেনে যায়। শচীন জানে, ছেলেমেয়েরাও জেনে গেছে। তৃণার বুকের ভিতরটা সব সময় কাঁপে। কখনো নিষিদ্ধ সম্পর্কের উত্তেজনায়। কখনো ভয়ে। শচীন কিংবা ছেলেমেয়েরা তাকে বেশ্যার অধিক মনে করে না। আর দেবাশিস? সেও কি তাকে নষ্ট মেয়েমানুষ ছাড়া আর কিছু ভাবে?

কাকাতুয়াটা ডাকছে, কাছে গিয়ে একটু আদর করতে ইচ্ছে করে। পাখিটাকে। মস্ত দাঁড়টা ঝোলানো আছে শচীনের ঘরের বারান্দায়। যেতে হলে ও ঘর দিয়ে যেতে হবে। শচীন না থাকলে যাওয়া যেত। কিন্তু ওঘরে থেকে সমানে সুরহীন গুন্ গুন্ শব্দটা আসছে। শচীনের চোখের সামনে নিজেকে নিয়ে গেলেই তার নষ্ট মেয়েমানুষ বলে মনে হয় নিজেকে। এ বড় জ্বালা। ভদ্রলোক বলেই শচীন তাকে কিছু বলে না আজকাল। মাস ছয়েক আগে ধৈর্যহারা হয়ে একদিন চড়চাপড় আর ছড়ির ঘা দিয়েছিল কয়েকটা। তারপর থেকেই হয়তো অনুতাপ এসে থাকবে। কিন্তু তৃণা ওকে জানাবে কি করে যে ওর হাতের সেই মার বড় সুখের স্মৃতি হয়ে আছে তৃণার কাছে আজও! কারণ, তার বিবেক ও হৃদয় একটা শাস্তি সবসময়ে প্রত্যাশা করে।

তৃণা তার পড়ার টেবিলের কাছে গিয়ে উপুড় করা বইটা তুলে পড়তে বসল। কবিতার বই, বহুবার পড়া, মুখস্থ হয়ে গেছে। তবে খোলা সনেটটার দিকে চেয়ে থাকে। কিন্তু মন দিতে পারে না, বইটা রেখে প্যাড আর কলম টেনে নেয়। কলম খুলে ঝুঁকে পড়ে, ধৈর্যহীন চঞ্চলতায় কলম উদ্যত করে নাড়ে। কিন্তু লিখতে পারে না। কয়েকটা রোগা লম্বা লোকের চেহারা এঁকে ফেলে। তারপর সারা কাগজটা জুড়ে হিজিবিজি আঁকতে আর লিখতে থাকে। কাগজটা নষ্ট করে দলা প্যাকিয়ে ফেলে দেয়। আবার হিজিবিজি করে পরের কাগজটাতে।

কাকাতুয়াটা শচীনকে ডাকছে—শচীন, চোর এসেছে...শচীন, চোর এসেছে...

শচীনের ঘর এখন নিস্তব্ধ। কেউ নেই। তৃণা উঠে শচীনের ঘরে উঁকি দেয়। গোছানো ঘর। বাপের আমলের বাড়িটা শচীন আবার নতুন করে একটু ভেঙে গড়ে নিয়েছে। নতুন করে তৈরী করার জন্যই ডাক পড়েছিল দেবাশিসের! সিভিল ড্রাফটসম্যান আর ইন্টিরিয়র ডেকরেটর 'ইনডেক্'-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

boiRboi.net

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর কথাটা বড্ড ভারী, ইনডেক এমন কিছু বড় কোম্পানী নয়। কলকাতায় ওরকম কোম্পানী শতাধিক আছে। তবু ইনডেক-এর কিছু সুনাম আছে। ইন্টিরিওর ডেকরেশন ছাড়াও ওরা ছোটোখাটো কনস্ট্রাকশন কিংবা রিনোভেশন করে। বাড়ির প্ল্যান করে দেয়। এত কিছু একসঙ্গে করে বলেই কাজ পায়। দেবাশিস দাশগুপ্ত এক সময়ে আর্টিস্ট ছিল। কমার্শিয়াল লাইনে চমৎকার নাম করেছিল সে। কিন্তু উচ্চাশা বলবতী হওয়ায় সে কিছুদিন সিনেমার পরিচালনায় হাত লাগাল। সবশেষে ইন্টিরিয়র ডেকরেশনে এসে মন লাগাতে পারল। আর্টিস্ট ছিল বলে, এবং রং ও ডিজাইনের নিজস্ব চোখ আছে বলে, আর পূর্বতন গুডউইলের জন্যও ওর দাঁড়াতে দেরি হয়নি। এখন চৌরঙ্গীতে অফিস করেছে। একজন সিভিল ইঞ্জিনীয়ার, দুজন ড্রাফট্সম্যান এবং আরো কয়েকজনকে মাইনে দিয়ে রেখেছে, একটি মেয়ে রিসেপশনিস্ট আছে। নিজস্ব চেম্বারটা এয়ারকণ্ডিশন করা, নিজের কেনা ফ্ল্যাটে থাকে। একটা মরিস অক্সফোর্ড গাড়ি হাঁকড়ায়।

কিন্তু এ হচ্ছে আজকের দেবাশিস, পুরানো দেবাশিসকে এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া ভার।

এ বাড়ি রিনোভেট করতে দেবাশিস যেদিন এল, বাইরে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে চতুর পায়ে শচীনের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখছিল বাড়িটা। চোখে উগ্র স্পৃহা, চলাফেরায় কেজো লোকের তাড়া। শচীন বাড়িটা ঘুরে দেখাচ্ছিল। কোথায় দেয়াল ভেঙে ব্যালকনি হবে, কোথায় মেঝের টালি পালটাতে হবে। কোথায় নতুন ঘর তুলতে হবে, আর কেমনভাবে সাজাতে হবে, পুরোনো বাড়িটাকে আধুনিক করে তুলতে। শচীনের সঙ্গেই এই লম্বাপানা সুগঠন লোকটাকে অহংকারী তৃণা খুব হেলাভরে এক-আধপলক দেখেছে, লক্ষ্য করেনি। শচীনই তাকে ডাকে, তৃণা, তোমার যে কী সব প্ল্যান আছে তা দাশগুপ্তকে বুঝিয়ে দাও…

চায়ের টেবিলে ওরা তখন বসেছে। মুখোমুখি দেবাশিস। তৃণা তার দিকে একপলক তাকিয়েই মুখ নীচু করে প্যাডে একটা স্টাডি রুমের ছবি এঁকে দেখাতে যাচ্ছিল, দেবাশিস একটু ভোম্বলের মতো তাকিয়ে থেকে বলে—তৃণা না ?

তৃণা চমকে উঠেছিল। তাকিয়ে একটু কষ্টে চিনতে পেরেছিল দেবাশিসকে। ছেলেবেলার কথা, চিনতে তো কষ্ট হবেই।

শচীন বলে—চেনেন নাকি ?

দেবাশিস বড় চোখে চেয়ে বলে—চেনা কঠিন বটে, তৃণার তো এতকাল বেঁচে থাকার কথাই নয়। যা ভুগত, ভেবেছিলাম মরে-টরে গেছে বুঝি এতদিনে।

—বটে! বলে শচীন হাসে।

—বটেই তো! দেবাশিস অবাক হয়ে বলে—আমাদের মফঃস্বল শহরে পাশাপাশি বাস ছিল। ওর সব কিছু আমি জানি। ছেলেবেলায় দেখতুম, ও হয় বিছানায় পড়ে আছে, নাহলে বড়জোর বারান্দা কি উঠোন পর্যন্ত এসে হাঁ করে অন্য খেলুড়িদের খেলা দেখছে। কখনো আমাশা, কখনো টাইফয়েড, কখনো নিউমোনিয়ায় যায়-যায় হয়ে যেত, অবার বেঁচেও থাকত টিক-টিক করে। আমরা যখন ও শহর ছেড়ে চলে আসি তখন ও বোধ হয় ম্যালেরিয়ায় ভুগছে। আমার মা প্রায়ই দুঃখ করে

বলত মদনবাবু মেজো মেয়েটা বাঁচলে হয় !

তৃণা ভারী লজ্জা পেয়েছিল। সত্যিই সে ভুগত। বলল—আহা, সে তো ছেলেবেলায়।

—তারপর তো আর তোমাকে দেখিনি। আমাকে চিনতে পারছ তো !

—পারছি !

—বলো তো কে !

—রাজেন জ্যাঠার ছেলে।

দেবাশিস হঠাৎ হাহা করে হেসে বলে—রাজেন জ্যাঠা আবার কি ! আমার বাবাকে ঐ নামে কেউ চিনতই না। হাড়কেপ্পন ছিল বলে বাবার নাম সবাই দিয়েছিল কেপ্পন দাশগুপ্ত। সেটা সংক্ষেপ হয়ে হয়ে লোকে বলত কেপুবাবু। আমাদেরও ছেলেবেলায় কেউ কোন বাড়ির ছেলে জিজ্ঞেস করলে বলতুম—আমি কেপুবাবুর ছেলে।

তৃণার সবটাই মনে আছে। যারা রোগে ভোগে তাদের স্মৃতিশক্তি প্রখর হয় ! কেপুবাবুর ছেলে দেবাশিসকে সবাই চিনত ডানপিটে বলে। অমন হারামজাদা পাজি ছেলে বড় একটা দেখা যায় না। যত ছেলেবেলার কথা বলে উল্লেখ করেছিল দেবাশিস তত ছেলেমানুষ তখন ছিল না। তখন রোগে-ভোগা তৃণার বয়স বছর-তের দেবাশিসের উনিশ কুড়ি। পাড়ার সব মেয়েকেই চিঠি দিত দেবাশিস, একমাত্র রোগজীর্ণ তৃণাকেই তেমন গুরুত্ব দেয়নি বলে চিঠি লেখেনি। বহুকাল পরে সেই উপেক্ষিত মেয়েটিকে পরিপূর্ণ ঘরসংসারের চালচিত্রের মধ্যে দেখে তার বিস্ময় আর শেষ হয় না।

বলল—মেয়েদের মুখ আমার ভীষণ মনে থাকে। নইলে তোমাকে চেনবার কথা নয়। বেঁচে আছো, তাই বিশ্বাস হতে চায় না। শচীনবাবুর ভাগ্যেই বোধ হয় বেঁচে আছো। ম্যারেজেস্ আর মেড ইন্ হেভেন। তুমি বেঁচে না থাকলে শচীনবাবুকে আজও ব্যাচেলার থাকতে হত।

ঘটনাটা এরকম নিরীহভাবেই শুরু হয়েছিল। ইনডেক তাদের বাড়িটা ভেঙে মেরামত করছে, সাজিয়ে দিচ্ছে, ব্যালকনি বানাচ্ছে, জানালা বসাচ্ছে—সেইসব তদারক করতে সপ্তাহে এক-আধবার আসত দেবাশিস্। ভারী ব্যস্ত ভাবসাব, চটপটে কেজো মানুষের মতো বিদ্যুৎগতিতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যেত। গম্ভীর, পদমর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন দেবাশিস কোনোদিকে তাকাত না। দেখাশোনা শেষ করে কোনোদিন তৃণাকে ডেকে বলত—চলি। কোনোদিন বা দূরত্বসূচক হাল্কা গলায় বলত চা খাওয়াবে নাকি কাদম্বিনী ?

ও নামটা সে নিয়েছিল রবি ঠাকুরের 'জীবিত ও মৃত' গল্প থেকে। 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল যে সে মরে নাই।' একদিন লাইনটা উদ্ধৃত করে দেবাশিস বলেছিল—তুমি হচ্ছ সেই মানুষ, মরোনি প্রমাণ করার জন্যই বেঁচে আছো, কিন্তু কি জানি, বিশ্বাস হতে চায় না।

উল্টে তৃণা এলিয়টের লাইন বলেছে—আই অ্যাম ল্যাজারাস, কাম ফ্রম দি ডেড, কাম্ টু টেল্ ইউ অল্, আই শ্যাল টেল্ ইউ অল……

শচীন সবসময় বাড়ি থাকে না। রেবা আর মনু বড়লোকের ছেলেমেয়ে যেমন হয় তেমনি নিজেদের ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তৃণা সারাদিন একা। সে ক্যারাম খেলতে পারে, টেবিল-টেনিস খেলতে পারে, একটু আধটু ছবি আঁকে, কবিতা লেখে। কিন্তু কোনোটাই তার সঙ্গী নয়! এবং কবিতার বই খুলে বসলে একরকম দূরের অবগাহন হয় তার। দেবাশিস নামকরা আর্টিস্ট, দুটো ফ্লপ ছবির পরিচালক, বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী মহলে তার গভীর যোগাযোগ। তৃণার সেইটেই অবাক লাগত। ঐ ফাজিল, মেয়েবাজ, এঁচোড়েপাকা ছেলেটির মধ্যে এসব এল কোত্থেকে!

কখনো চা বা কফি খেতে বসে দেবাশিস বলত—তৃণা তোমার সত্যিই কিছু বলার আছে?

তৃণা অবাক হয়ে বলেছে—কী বলার থাকবে?

—ঐ যে বলো, আই শ্যাল টেল ইউ অল।

—যাঃ, ও তো কোটেশন।

—মানুষ যখন কিছু উদ্ধৃত করে তখন তার সাবকনশাসে একটা উদ্দেশ্য থাকে।

—আমার কিছু নেই।

দেবাশিস গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবত।

রেবার জন্মদিনে সেবার দেবাশিসকে সস্ত্রীক নেমন্তন্ন করেছিল তৃণা। দেবাশিসের বৌ এল তার সঙ্গে। মানানসই বৌ। ভাল গড়ন, লম্বাটে চেহারা। রং কালো, মুখশ্রী খারাপ নয়। কিন্তু সারাক্ষণ কেবল টাকা আর গয়না আর গাড়ি আর বাড়ির গল্প করল। বুদ্ধি কম, নইলে বোঝা উচিত ছিল, যে-বাড়িতে বসে বড়লোকী গল্প করছে সে-বাড়ি তাদের তিনগুণ ধনী। হঠাৎ যারা বড়লোক হয় তারা টাকা দিয়ে কী করবে বুঝতে পারে না, হা-ঘরের মতো বাজার ঘুরে রাজ্যের জিনিস কিনে ঘরে জঙ্গল বানায়, বনেদী বড়লোকেরা ওরকমভাবে টাকা ছিটোয় না, গরম দেখায় না। দেবাশিসের বৌ চন্দনা টাকায় অন্ধ হয়ে চোখের সামনে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না। মুখে বেড়ালের মতো একটা আহ্লাদী ভাব, চোখে সম্মোহন, বার বার স্বামীকে ধমক দিচ্ছিল। অনেক অতিথি ছিল বাড়িতে। ওদের সঙ্গে বেশিক্ষণ সময় কাটাতে পারেনি তৃণা। অল্প যেটুকু সময় কাটিয়েছিল তাতেই তার বড় লজ্জা করেছিল। দেবাশিসের বৌ বস্তুজগৎ ছাড়া আর নিজের সুখদুঃখ ছাড়া কোনো কিছুর খবর রাখে না!

এসব বছর-দুই আগেকার ঘটনা। বাড়ি রিনোভেট করা সদ্য শেষ হয়েছে তখন। নতুন হয়ে ওঠা বাড়ি ঝলমল করছে। তৃণা নিজের ঘরটা বেশী সাজায়নি। বেশী সাজানো ঘর তার পছন্দ নয়। তাতে তার মনের ধূসরতা নষ্ট হয়ে যায়। একটা সাদাসিধে, নরম রঙ, আর আলো-হাওয়ার ঘরই তার ভাল লাগে। ভাল লাগে বিষণ্ণতা, একা থাকা, কবিতা।

দেবাশিস বলেছিল—তৃণা, ইনডেক তোমার কিছু করতে পারল না, একটা ব্যালকনি ছাড়া।

—আমার জন্য ইনডেকের কিছু করার নেই যে, আমি ডেকরেশন ভালবাসি না।

—জানি। তুমি ক্লায়েণ্ট হিসাবে যাচ্ছেতাই!

তৃণা হেসেছিল একটু।

বিপজ্জনক দেবাশিস দাশগুপ্ত বলল—কিন্তু মেয়ে হিসেবে ইউনিক। ঠিক বয়সটিতে ঠিক সময়ে তোমার সঙ্গে দেখা হলে বড় ভাল হত।

তৃণা ভয় পেয়ে বলে—ইস্!

দুঃখের মুখ করে দেবাশিস বলে—আমার বৌকে তো দেখেছো!

—দেখলাম।

—কেমন?

—সুন্দর।

—সুন্দর কিনা তা কে জিজ্ঞেস করেছে?

—তবে?

—স্বভাবের কথা বলছি।

—বাঃ! তা কী করে বলব! একবার তো মোটে দেখেছি, বেশী কথাবার্তা হয়নি। তবে স্বভাব খারাপ নয় তো।

—ও টাকা আর স্ট্যাটাস ছাড়া কিছু বোঝে না, কোন অনুভূতি নেই।

—তাতে কী! সব মেয়েই ওরকম।

—তুমি তো নও?

তৃণা বিষণ্ণ হয়ে বলেছে—আমার কথা ছেড়ে দাও, বহুদিন রোগে ভুগে আমি একটু অ্যাবনরমাল। আমি যে বেশি ভাবি, বেশি চুপ করে অন্যমনস্ক থাকি, কবিতা লিখি—এসব আমার অস্বাভাবিক মন থেকে তৈরী হয়েছে। এ-বাড়ির কেউ আমাকে তাই পছন্দ করে না। ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত ইন্টেলেকচুয়াল মা বলে ক্ষ্যাপায়।

—হবে।

—শোনো, নিজের বৌয়ের নিন্দে বাইরে কোরো না। ওটা রুচির পরিচয় নয়। যেমনটি পেয়েছো তেমনটির সঙ্গেই মানিয়ে চলো। তুমি বড় ছটফটে, চঞ্চল, বহু মেয়েকে চিঠি দিতে। অত মন তুলে নাও কী করে? তোমার যাকে-তাকে হুট করে ভাল লাগে, আবার হুট করে অপছন্দ হয়ে যায়। মনটা কোথাও একটু স্থির না করলে সারা জীবন ছুটে বেরাতে হবে।

দেবাশিস মৃদু হেসে বলে—তুমি এত কথা জানলে কি করে। আমি তো এখনো তেমন করে বৌয়ের নিন্দে তোমার কাছে করিইনি। কী একটা বলতে শুরু করেছিলাম তুমি আগ বাড়িয়ে একগাদা কথা বললে।

ভারী লজ্জা পেয়ে গেল তৃণা। আসলে তার মন বড় বেশী কল্পনাপ্রবণ, একটু কিছু ঘটলেই তার পিছনে একটা বিশাল কার্যকারণ ভেবে নেওয়া তার স্বভাব। একবার আলমারী আর বাক্সের এক থোকা চাবি হারিয়ে ফেলেছিল সে, তার আগের দিন বাড়ির একটা দোখনো চাকর বিদেয় হয়েছে। চাবিটা চেনা জায়গায় খুঁজে না পেয়েই তৃণা ভাবতে বসল, এ নিশ্চয়ই সেই চাকরটার কাজ। জিনিষপত্র কিছু হাতাতে না পেরে চাবিটা নিয়ে পালিয়েছে। এরপর গাঁয়ের লোক জুটিয়ে একদিন ফাঁক বুঝে

হাজির হবে। তৃণাকে মেরে রেখে ডাকাতি করে নিয়ে যাবে। কাল্পনিক ব্যাপারটাকে এতদূর গুরুত্ব দিয়ে সে প্রচার করেছিল যে শচীন বাধ্য হয়ে থানা-পুলিশ করে। চাকরটার গাঁয়ে পর্যন্ত পুলিশকে সজাগ করা হয়। কিন্তু তিনদিনের মাথায় বাথরুমে সাবানের খোপে চাবিটা তৃণাই খুঁজে পায়।

তার মন ঐরকমই, দেবাশিসকে সে প্রায় অকারণে বৌয়ের ব্যাপারে দায়ী করেছে, দেবাশিস তার প্রেমে পড়ে গেছে গোছের চাপা একটা আশঙ্কাও প্রকাশ করে ফেলেছে। লজ্জা পেয়ে সে বলে—আমার কেমন যেন মনে হয় তোমাকে। সাধারণ জীবনে তুমি খুশী নও।

দেবাশিস শ্বাস ফেলে বলেছে—তা ঠিকই। তবে খুব ভয়ের কিছু নেই।

যাই বলুক, ব্যাপারটা অত নিরাপদ ছিল না। এটা বোঝা যেতেই, দেবাশিস তার বৌকে ভালবাসে না। অন্য দিকে তৃণাকে ভালবাসে না শচীন। কিংবা তৃণার কল্পনাপ্রবণ মন যেন সেইটাই ভেবে নেয়। মিথ্যে নয় যে, তৃণার একথা ভাবতে ভালই লাগত যে শচীন তাকে ভালবাসে না, রেবা ভালবাসে না, মনু ভালবাসে না। সংসারে কেউ তাকে ভালবাসে না। সে একা, সে বড় দুঃখী। তার এই দুঃখের কোনো ভিত্তি থাক বা না থাক, একথা ভাবতে তার ভাল লাগত। এই দুঃখই তাকে সবচেয়ে বড় রোম্যাণ্টিক সুখটা দিত। দুঃখের চিন্তা বা চিন্তার দুঃখ কারো কারো কাছে বড় সুস্বাদু।

দেবাশিস সেই রন্ধ্রপথের সন্ধান পেয়েছিল। এ বাড়ির অনেক ফাটা ভাঙা দুর্বল স্থান সে যেমন খুঁজে বের করে মেরামত করে ঢেকে সাজিয়ে দিয়ে গেছে, তেমনি তৃণার সঠিক দুর্বলতাটুকু জেনে নিল সে, অনায়াসে। কিন্তু সারিয়ে দিয়ে গেল না, বাড়িয়ে দিয়ে গেল।

তৃণার মন এমনই একটা কিছু চেয়েছিল। কোনো অঘটন, একটু পতন, একটু পাপ সামান্য অপরাধবোধ উজ্জ্বলতম রঙের মতো স্পষ্ট করে দেয় জীবনকে। তার সেই দুর্বলতা দেবাশিস ফুলের মতো চয়ন করে নিজের বাটনহোলে সাজাল লাল গোলাপের মতো। গোলাপটা লাল কেন? তৃণা ভেবে দেখেছে। লোকলজ্জার রাঙা আভায় তা লাল। কিছু পাপ কালো, কিছু পাপ রাঙা।

রাঙা শাড়িটা পরে নিল তৃণা। সাজল। ঘড়িতে এখনো বেশি বাজেনি, সময় আছে। থাকগে। তৃণা একটু ঘুরবে। তারপর বাসস্টপে গিয়ে দাঁড়াবে।

boiRboi.net

তিন

পেট্রল পাম্পে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে নেমে দেবাশিস আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলল। হাই তুলতে তুলতেই বলল—বিশ লিটার। বলে পকেট থেকে ক্রেডিট কার্ডটা বের করে দিল।

রবি নেমে আইসক্রীমের স্টলটার কাছে চলে গিয়েছিল। সেখান থেকে চেঁচিয়ে বলে—বাবা, বন্ধ যে!

—কী আর করা যাবে!

রবি বুটের শব্দ তুলে ছুটে আসে—আজ কেন বন্ধ?

—একটু পরে খোলে। চলো, তোমাকে ক্যান্ডি কিনে দেবো!

গাড়ির ভিতর থেকে চাঁপা ডেকে বলে—সোনাবাবু, তোমার জন্য আমি তো খাবার এনেছি, বাইরের জিনিস তবে কেন খাবে?

রবি তার বাবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছোটো চোখে বাবাকে একটু দেখল। প্যান্ট শার্ট পরা দীর্ঘকায় বাবা, গলায় একটা সিল্কের ছাপা সাদা-কালো স্কার্ফ। একটু অন্যমনস্ক হয়ে বাবা জুতোর আগাটা তুলছে নামাচ্ছে, পকেটে হাত, ভ্রূ কোঁচকানো।

রবি ডান পা বাড়িয়ে, ডান হাত মুঠো করে তুলে মুখ আড়াল করে দাঁড়ায়। তারপর বাঁ হাত বাড়িয়ে বক্সিংয়ের স্ট্যান্স তৈরী করে এগিয়ে এসে বাঁ হাতটা বাবার পেটে চালিয়ে দিয়ে শব্দ করে—হোয়্যাম্!

দেবাশিস কোলকুঁজো হয়ে সরে যায়। তারপর সেও ফিরে দাঁড়ায়। অবিকল রবির মতো স্ট্যান্স নিয়ে এগিয়ে ভুয়ো ঘুঁষি মারে তার মুখে, রবি চট্ করে মুখটা সরিয়ে নিয়ে ঘুরে এগিয়ে আসে। নিঃশব্দে দুজন দুজনের দিকে চোখ রেখে চক্কর খায়, ঘুঁষি চালায়। চাঁপা গাড়ি থেকে মুখ বের করে স্মিত চোখে চেয়ে থাকে। পেট্রল ভরতে ভরতে পাম্পের অ্যাটেনডেণ্ট খুব হাসে।

দেবাশিস পেটে একটা ঘুঁষি খেয়ে উবু হয়ে বসে পড়ে। সামনে তেজী বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রবি রেফারির মতো গুণতে থাকে ওয়ান···টু···থি···এইট···নাইন আউট! বলে শূন্যে আঙুল তোলে রবি।

দেবাশিস উঠে দাঁড়ায়। হাত বাড়িয়ে বলে কংগ্র্যাচুলেশনস ফর জাস্ট বিয়িং দা নিউ হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ন অব দা ওয়ার্ল্ড।

থ্যাংকস্। রবি হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দেয়। মৃদু হাসে। তারপর আস্তে করে বলে—মে আই পুট থ্রু এ টেলিফোন কল?

—টু হুম?

—মাই ফ্রেণ্ড রঞ্জন।

—গো এহেড।

boiRboi.net

দ্বিধাহীন গটমটে পায়ে রবি কাচের দরজা ঠেলে গিয়ে অফিস ঘরে ঢোকে। ফোন তুলে নেয় চালাক চতুর ভঙ্গিতে। দেবাশিস কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায়। শুনতে পায় রবি বলছে—হেল্লো, ইজ রঞ্জন অ্যারাউণ্ড ?…ইয়েস, রঞ্জন, দিস ইজ রবি—আউট ফর ফান…ফার্স্ট টু জু, দেন টু মণিমা অ্যাট মানিকতলা…ইয়েস। ওঃ নো, নট মহেশতলা, মানিকতলা…এম ফর…এম ফর…

দরজার কাছ থেকে দেবাশিস প্রম্পট্ করে—মীরাট।

চোখের কোণ দিয়ে দেবাশিসকে একবার দেখে নিয়ে মাথা নাড়ে রবি। ফোনে বলে—এম ফর মাদার। এ ফর…

—এলাহাবাদ। বলে দেবাশিস।

—এলাহাবাদ। রবি প্রতিধ্বনি করে—অ্যাণ্ড এন ফর নিউ দিল্লী, আই ফর ইণ্ডিয়া।

দেবাশিস আস্তে সরে আসে। গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে বসে। অন্যমনস্কভাবে একটা সিগারেট ধরায়। কথাটা কানে বিঁধে থাকে। এম্ ফর মাদার।

রবি যখন গাড়িতে এসে উঠল দেবাশিস একটু গম্ভীর। গাড়ি ছেড়ে চালাতে চালাতে বলে—তুমি ওভাবে স্পেলিং করছিলে কেন? ফোনে স্পেলিং করতে জায়গার নাম বলাই সুবিধে। মাদার কি কোনো জায়গা ?

রবি একটু শিশুর হাসি হাসে। বলে—জাগাই তো!

—জায়গা ? মাদার আবার কি রকম জায়গা ?

—যেমন মাদারল্যাণ্ড!

দেবাশিস হাসে। তারপর শ্বাস ছেড়ে বলে—কিন্তু তুমি তো শুধু মাদার বললে, ল্যাণ্ড তো বলোনি।

লজ্জায় দু হাতে চোখ ঢেকে একটু হাসে রবি। বলে—ভুল হয়েছিল।

গভীর একটা শ্বাস ফেলে দেবাশিস। রবি এখনো ভোলেনি, শুধু চেপে আছে। ওর ভিতরে হয়তো কষ্ট হয় মায়ের জন্য। কে জানে!

রবি সীটের ওপর হাঁটু মুড়ে বসেছে, মুখে আঙুল, দুলছে সীটের ওপর। চাঁপা সতর্ক গলায় বলে—পড়ে যাবে সোনাবাবু।

—তোমার কেবল ভয়। বলে রবি ইচ্ছামতো দোল খায়, বলে—বাবা, আমি পিছনের সীটে বসব, দিদির কাছে ?

—যাও। দেবাশিস অন্যমনস্কভাবে বলে।

চাঁপা হাত বাড়িয়ে সীটের ওপর দিয়ে পিছনে টেনে নেয় রবিকে।

সারাক্ষণ এরকমই করে রবি। একবার পিছনে যায়, একবার সামনে আসে। দুষ্টু হয়েছে খুব। কিন্তু দেবাশিস ওকে বকে না। মায়া হয়। ওর কি বড় মায়ের কথা মনে পড়ে ?

দেবাশিস চন্দনাকে পছন্দ করে বিয়ে করেছিল। একটা সময় অনেক মেয়ের সঙ্গে ভাব ছিল তার। কাকে বিয়ে করবে তার কিছু ঠিক ছিল না। চন্দনা ছিল সেসব মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে দুঃসাহসী আর কৌশলী। কুমারী অবস্থায় সে গর্ভে দেবাশিসের সন্তান নেয়। সেই অবস্থায় তাকে ফেলতে পারার সাধ্য দেবাশিসের

হয়নি। চন্দনা সন্তান নষ্ট করতে দেয়নি। বলেছে—তুমি যদি বিয়ে না করো না করবে, ও আসুক কুমারী মায়ের কোলে।

সেটাই ছিল ওর কৌশল। দেবাশিস দু'মাসের গর্ভবতী চন্দনাকে বিয়ে করে আনল। যথাসময়ে রবি হ'ল। ওর চার বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিল চন্দনা।

বড় রাগী ছিল, ভেবেচিন্তে কিছু করত না।

তৃণার সঙ্গে দেবাশিসের সম্পর্কটা তখনো তৈরী হয়নি। তৃণা মাঝে-মধ্যে তাকে ডাকত ছবি আঁকার সুলুকসন্ধান জানতে। ওটা তখন তার বাই। জলরঙা ছবি আঁকতে গিয়ে তুলির জ্যাবড়া দাগ আর অসহিষ্ণু টান দিয়ে হয়রান হত। দেবাশিস তাকে তুলি চালাতে শিখিয়েছিল। দুটো রঙের মাঝখানে কি ভাবে একটা রঙের সঙ্গে আর একটাকে মেলাতে হয় তার কৌশল অভ্যাস করাত। কিন্তু তাতে সময়টা নিত বড্ড বেশি। ব্যস্ত দেবাশিস তার অর্থকরী সময়টা যে নষ্ট করছে তা খেয়াল করত না। বড় ভাল লাগত।

তৃণা দেখতে খুব সুন্দর তা তো নয়, উপরন্তু বিবাহিতা, দুটি বড় বড় সন্তানের মা, এমন মেয়ের প্রতি আকর্ষণবোধ বড় অদ্ভুত দেবাশিসের পক্ষে। সে তো মেয়ে কিছু কম দেখেনি। তৃণার প্রতি এই দুর্বলতার তবে কারণ কি?

কারণ একটাই, কৈশোরকাল। সেই বয়সটার যাবতীয় স্মৃতিই বড় মারাত্মক। তৃণার মধ্যে আর কিছু না থাক, ছিল সেই স্মৃতির সৌরভ তাকে ঘিরে। রোগা দুঃখী সেই কিশোরী মেয়েটাকে সে কবে ভুলে গিয়েছিল। দুরন্ত সময় তাকে নতুন করে ফিরিয়ে এনেছে তার কাছে। আর একটা কারণ চন্দনা নিজে।

তৃণার সুখের ঘর কেন ভাঙতে যাবে দেবাশিস? সে ভাল লোক ছিল না কোনোদিনই। তবু তার তো রুচি ছিল। সুযোগ পেলে সে যে-কোনো মেয়েকেই উপভোগ করে, সন্দেহ নেই। কিন্তু পাগল হয় না তো কারো জন্য! আর তৃণা পাগল-করা মেয়েও নয়। যদিও তৃণার বয়স গড়িয়ে যায়নি, তবু তো ছেলেমেয়ের মা, গিন্নিবান্নি! এখন কি আর চোখে রঙ ছুঁড়ে দেয়ালা করে কেউ? ছবি-আঁকার ছলে তারা পরস্পরের দীর্ঘ-শ্বাস শুনেছিল। একজনের ছিল শচীন, অন্যজনের ছিল চন্দনা। তবু এও ঠিক, পৃথিবীতে কেউ কারো নয়।

দেবাশিস একটা জীবন যদি মেয়েবাজি না করত তবে তার চরিত্রে রাশ টানার অভ্যাস হত। কিংবা যদি চন্দনা হত মনের মতো বৌ, তবে রাশ টানতে পারত চন্দনাই।

তা হল না। চন্দনা তাকে ঘরে টিকতে দিত না। কেবলই বলত—কোথায় ছবি আঁকা হচ্ছে, সব আমি জানি। তুমি মরো।

তখন সুন্দর ফ্ল্যাটটায় বাস করে তারা। লিফটে ওঠে নামে। গ্যারেজে গাড়ি। রবি তখন অজস্র কথা বলে। সংসারটা সবে জমে উঠেছে।

একদিন ছুটির সকালে চন্দনা দেরি করে ঘুম থেকে উঠল। রবি ঘুমন্ত মাকে জ্বালাচ্ছিল খুব। উঠেই ঘা কতক দিল রবির পিঠে। যখন মারত তখন বড় নির্মমভাবে মারত, মায়া করত না, আবার একটু পরেই থামলে আদর করত। চন্দনার মাথায় একটু ছিট তো ছিলই।

সেদিন সকাল থেকেই চন্দনা বিগড়ে গেল।

দেবাশিস রোজকার মতো বসেছিল তার বাইরের ঘরে। সামনে খোলা স্টেটস্‌ম্যান, টুলের ওপর রাখা পা, পায়ের পাশে কফির কাপ। চন্দনা এসে স্টেটস্‌ম্যানটা কেড়ে নিল হাত থেকে। বলল—কী ভেবেছো তুমি?

—কী ভাববো! ক্লান্ত দেবাশিস জবাব দেয়।

—কত লোক অন্যায় করে ধরা পড়ে। তুমি কেন পড়ো না?

দেবাশিসের মনে পড়ে, সে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাইটা হাত বাড়িয়ে নিয়েছিল। মনে মনে প্রার্থনা করেছিল—হে ঈশ্বর, চন্দনা কেন বেঁচে আছে? মুখে বলেছিল—চুপ করো।

চন্দনা চুপ করল না। অসম্ভব রেগে গেল। উল্টোপাল্টা বকতে লাগল দেবাশিসকে। গালাগাল দিল অজস্র। অবশেষে কাঁদল এবং কাঁদতে কাঁদতেই অসংলগ্ন বকতে লাগল একা—তুমি আমার বাবাকে ঠকিয়েছো—আমার ছেলেকে ঠকিয়েছো—তুমি আমাকে লুকিয়ে টাকা জমাও—

এসব কথা বাস্তব সত্য নয়। কোনো মানেও হয় না। ডাক্তার ডাকা হল। ডাক্তার মত দিল—অজস্র মাথাধরার বড়ি, ঘুমের পিল, তার ওপর নিজের নির্ধারিত অসুখের জন্য নিজস্ব প্রেসক্রিপশনে খাওয়া ওষুধ, দুশ্চিন্তা উদ্বেগ—সব মিলেমিশে একটা নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে।

সেই মানসিক ভারসাম্যহীনতা আর স্নায়ুর বিকার থেকে কোনো দিনই সুস্থ হতে পারেনি চন্দনা। একদিন মরল। সাততলা থেকে সোজা লাফিয়ে পড়ল। তখন খুব ভোর। দেবাশিস আর রবি তখনো ওঠেনি।

দেবাশিস অবশ্য ছাড়া পেয়ে গেল কোর্ট থেকে। কিন্তু বেঁচে চন্দনা যতটা না ছিল, মরে তার চেয়ে ঢের বেশী ফিরে এল জীবনে। তাকে ভুলতেই তখন তৃষ্ণার পিপাসা ইচ্ছে করে খুঁচিয়ে তোলে দেবাশিস। যা অবৈধ তার মতো মাদক আর কি আছে!

—বাবা! রবি ডাকে।

—উঁ। দেবাশিস অন্যমনস্ক উত্তর দেয়।

—চিড়িয়াখানায় আমরা কেন যাচ্ছি?

—যাবে না?

—অনেকবার গেছি তো! ভাল লাগে না।

বিস্মিত দেবাশিস প্রশ্ন করে—তবে কোথায় যাবে?

রবি লজ্জার সঙ্গে বলে—বেড়াতে ইচ্ছে করছে না।

—তবে?

—মণিমার কাছে চলো।

—ও! দেবাশিস গাড়ি ধীর করে একটু হাসে। তারপর মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলে—ঠিকই তো! সব ছুটির দিনে চিড়িয়াখানা কি আর ভাল লাগে!

—ফিরে যাই চলো।

দেবাশিস মাথা নেড়ে বলে—পার্ক স্ট্রীটের কোন রেস্টুরেন্টে কী যেন খাবে

boiRboi.net

বলেছিলে। খাবে না?

রবি তার চালাক হাসিটা হেসে বলে—পিপিং।

দেবাশিস বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বলে—যাবে না?

—যাবো। বুড়োদা, নিনকু, পল্টু, বাপি, ঝুমু আর নানির জন্য নিয়ে যাবো। ওদের বলেছিলাম এই রবিবারে পিপিঙের খাবার খাওয়াবো।

—হ্যাঁ?

—হ্যাঁ। রবি হাসে।

স্নিগ্ধ চোখে তার দিকে চেয়ে থাকে দেবাশিস। গাড়ি ঘুরিয়ে নেয়।

—বাবা।

—উঁ।

—মণিমা আমাকে খুব ভালবাসে।

—জানি তো।

—বুড়োদা, নিনকু, পল্টু সবাই।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ খুব ভালবাসে। গেলে ছাড়তেই চায় না। বলে—তুই আমাদের কাছে থাক।

—ও।

—আমি কেন ওদের কাছেই থাকি না বাবা? মণিমা সকলের চেয়ে আমাকে বেশী ভালবাসে।

দেবাশিস সামান্য গম্ভীর হয়ে যায়। প্রথমটায় কথা বলতে পারে না। অনেকক্ষণ রবি নিঃশব্দে বাবার মুখখানা চেয়ে দেখে। মুখ দেখে বোধ হয় বুঝতে পারে, বাবা খুশী হয় নি।

পিছন থেকে চাঁপা বলে—তুমি বাড়ীতে না থাকলে আমরা কার কাছে থাকবো সোনাবাবু? বাবার যে তোমাকে ছাড়া ভীষণ মন খারাপ হয়।

—অল্প ক' দিন থাকবো। রবি উত্তর দেয়।

—তারপর চলে আসবে? চাঁপা প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ। আমিও তো বাবাকে ছেড়ে থাকতে পারি না।

ময়দানের ভিতর দিয়ে গাড়ি উড়িয়ে দেয় দেবাশিস। এম ফর মাদার—কথাটা ভুলতে পারে না সে। তার ফ্ল্যাটবাড়িতে চন্দনার কোন ফটো নেই। ইচ্ছে করেই চন্দনার সব ফটো সে তার লকারে চাবি দিয়ে রেখেছে, যাতে রবির চোখে না পড়ে। এই বয়সে মাতৃহীনের মায়ের কথা বেশী মনে পড়া কষ্টকর। চন্দনার শাড়ি পোশাক প্রসাধনের সব জিনিসপত্র, তার হাতের লেখা কাগজ কিংবা যত চিহ্ন ছিল সবই সরিয়ে দিয়েছে দেবাশিস, শাড়িগুলি বিলিয়ে দিয়েছে একে ওকে। মানিকতলার বোন ফুলিকে কয়েকটা দামী শাড়ি দিয়েছিল, ও নিতে চায়নি তবু জোর করে দিয়েছিল দেবাশিস—পড়ে থেকে নষ্ট হবে, তুই পর।

একদিন মনের ভুলে ফুলি একটা জয়পুরী ছাপওলা সিল্কের শাড়ি পরেছিল রবির সামনে। রবি হাঁ করে কিছুক্ষণ দেখল শাড়িটা, তারপর মুখখানায় হাসি-

কান্না মেশানো একরকম অদ্ভুত ভাব করে বলল—মণিমা, আমার মায়ের ঠিক এরকম একটা শাড়ি ছিল।

শিশুদের মনের খবর রাখা খুবই শক্ত। ওদের স্মৃতি কত দূরগামী, কত ছবির মতো স্পষ্ট ও নিখুঁত তা বুঝতে পেরে একরকম অদ্ভুত যন্ত্রণা পেয়েছিল দেবাশিস। পারতপক্ষে সে তার মায়ের কথা বলে না। জানে, সে মায়ের কথা বললে তার বাবা খুশি হয় না। এতটা বুদ্ধি ঐ শিশুমাথায়!

বুকের ভিতরটা চলকে ওঠে দেবাশিসের। ছেলের প্রতি হঠাৎ ভালবাসায় ছটফট করে। পার্ক স্ট্রীটের একটা বড় রেস্টুরেন্টের সামনে গাড়ি থামিয়ে রবিকে নিয়ে নামে। রেস্টুরেন্টে বসে মেনুটা রবির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে—তোমার যা ইচ্ছে হয় অর্ডার দাও। যা খুশি।

বলে ছেলের দিকে চেয়ে থাকে।

রবি অবাক হয়ে বাবার দিকে চায়। মিট্‌মিটে চোখে বাবার মুখখানা দেখে বলে—আমার তো খিদে নেই।

দেবাশিস হতাশ হয়ে বলে—সে কী?

রবি মাথা নেড়ে বলে—দিদি সকালে কত খাইয়েছে! বলতে বলতে গেঞ্জিটা ওপর দিকে তুলে পেটটা দেখিয়ে বলে—পেট দ্যাখো কেমন ভর্তি।

দিনের মধ্যে একশবার রবির গায়ে হাত দিয়ে দেখত চন্দনা, টেম্পারেচার আছে কিনা! রবির গায়ে হাত দিয়ে আবার নিজের গা দেখত, কখনো বা দেবাশিসকে ডেকে বলত—দেখি তোমার গা, রবির চেয়ে ঠাণ্ডা না গরম।

সব মায়েরই এই বাতিক থাকে। তার নিজের মায়েরও ছিল। আরও, দিনে একশবার রবিকে খাওয়ানোর জন্য মাথা কুটত চন্দনা, খাইয়ে পেট দেখত। খেতে না চাইলে অনুনয়-বিনয়, খোশামোদ, তারপর কিলচড় কষাত। বলত—না খেয়ে একদিন শেষ হয়ে যাবি। আমি মরলে আর কেউ তোর খাওয়া নিয়ে ভাববে ভেবেছিস?

খাওয়ার ব্যাপার হলেই ছোট্ট রবি মাকে পেট দেখাত

গেঞ্জিটা নামিয়ে করুণ চোখে চেয়ে রবি বলে—খাবো না বাবা।

দেবাশিস একটা শ্বাস ফেলে বলে—আচ্ছা!

—বাবা।

—উঁ।

—মণিমা তো মুর্গী খায় না।

—দেবাশিস খেয়াল করল। বলল—তাই তো! কিন্তু অর্ডার দিয়ে দিলাম যে।

—মণিমার জন্য কী দেবে?

—তুমিই বলো।

—সন্দেশ আর দৈ, হ্যাঁ বাবা?

—আচ্ছা।

রবি খুশি হয়ে হাসল। দেবাশিস রবির কথা শোনে। রবি যা চায় তাই দেয়। রবির যা ইচ্ছে তাই হয়। চন্দনার সময়ে তা হত না। রবি কিছু

boiRboi.net

বায়না ধরলেই ক্ষেপে যেত চন্দনা। বকত! মারত। তবু সারাদিন চন্দনার পায়ে পায়ে ঘুরত রবি। বকা খেত, মার সহ্য করত, তবু আঁটালির মতো লেগেও থাকত।

ঐ রাগী আহাম্মক মেয়েটার মধ্যে আকর্ষণীয় বস্তু কি ছিল? ভেবেই পায় না দেবাশিস। যে অবস্থায় চন্দনার বিয়ে হয়েছিল তাতে তার বাপের বাড়ির দিকের কেউ খুশী হয়নি। চন্দনার বাবা তাকে প্রচণ্ড মারধোর করে বেঁধে রেখেছিলেন, মা কাঁদতে কাঁদতে হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হন। সেই গোলমাল হাঙ্গামার ভিতর থেকে চন্দনাকে খুব শালীনতার সঙ্গে বিয়ে করে নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। দেবাশিস কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে একদিন ওদের বাড়ি চড়াও হয়। পাড়ার ছেলেদের আগে থাকতেই মোটা পুজোর চাঁদা দেওয়া ছিল। দেবাশিস চন্দনার বাবাকে শাসিয়ে এল—ফের যদি ওর গায়ে হাত তুলবেন তো মুস্কিল আছে।

চন্দনার বাবা ভয় পেয়ে গেলেন। আজকাল ভদ্রলোক মানেই ভেড়ুয়া। এরপর থেকে চন্দনার ওপর অত্যাচার কমে গেল বটে, কিন্তু বাড়ির লোক তার সঙ্গে কথা বলত না। দেবাশিস তখন মানিকতলার বোনের বাড়িতে আলাদা একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। একজন গর্ভবতী মেয়েকে বিয়ে করে বাড়িতে তোলা ভগ্নীপতি ভাল চোখে দেখেনি। বোনও রাজি ছিল না। চন্দনা প্রায়ই টেলিফোন করে বলত—বেশি কিছু তো চাইনি, কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে সিঁথিতে একটু সিঁদুর ছুঁইয়ে দাও। তাহলেই হবে।

দেবাশিস বলত—তা হবে না। সেটা তো পরাজয় মেনে নেওয়া। আমি তোমাকে ফুল স্কেলেড বিয়ে করে নিজের বাসায় তুলব।

তাই করেছিল সে। পাগলের মতো ঘুরে যাদবপুরে বাসা ঠিক করে ফেলল। হাতে টাকার অভাব ছিল না। প্রচুর গয়না শাড়ি দিয়ে সাজিয়ে বিয়েবাড়ি ভাড়া করে পুরুত ডেকে বিয়ে করল। চন্দনার এক দাদা সম্প্রদান করে যান।

চন্দনার মতো একটা অপদার্থ মেয়ের জন্য অত পরিশ্রম আর হাঙ্গামা কেন করেছিল দেবাশিস, তা ভাবলে অবাক লাগে। বিয়ের অল্প কিছু পরেই চন্দনার তাগাদায় অভিজাত পাড়ায় অনেক টাকা দিয়ে পূর্ব-দক্ষিণ খোলা ফ্ল্যাট কিনল। এই বিপুল উদ্যোগ বৃথা গেছে। বিয়ের অল্প কিছু পরেই দেবাশিস বুঝতে পারে, বিয়ে কোনো স্বর্গীয় বিধি নয়। চন্দনা তার বৌ হওয়ার উপযুক্তই নয়। এত অগভীর মন, এত রাগ, অধৈর্য, এমন অর্থকেন্দ্রিক মন-সম্পন্ন মেয়ের সঙ্গে কী করে থাকবে সে। নিজে চরিত্রহীন হলেও তার কিছু শিল্পীসুলভ নিস্পৃহতা আছে, সামান্য কিছু ব্যবসায়িক সততা, কর্মনিষ্ঠা। তার মনে হত সারাদিন কাজের পর পুরুষ যখন বাসায় ফেরে তখন দগ্ধদিনে ছায়ার মতো স্ত্রী তাকে আশ্রয় দেয়। স্ত্রী হচ্ছে বিশ্রামের জায়গা।

দেবাশিস প্রায়দিনই বাসায় ফিরে চন্দনাকে দেখতে পেত না। হয় মার্কেটিং, নয় সিনেমা-থিয়েটার, নয়তো বাপের বাড়ি চলে যেত চন্দনা। বিয়ের পর বাপের বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক কীভাবে যেন নিদারুণ ভাল হয়ে গিয়েছিল।

ঐ সময়ে নিঃসঙ্গ তৃণা এক নিভৃত জলস্রোতে নৌকোর মতো তার কাছাকাছি

এসে গেল। উতরোল স্রোত। কিন্তু নিশ্চিত। দেবাশিস কোনোদিনই কারো প্রেমে পড়েনি এতকাল। এবার পড়ল। এক অসহনীয় অবস্থায়। অসম্ভব এক প্রেম।

রবি এখন ঐ তার মুখোমুখি বসে আছে। কী চোখে রবি চন্দনাকে দেখেছিল তা ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে। ঐ রাগী অপদার্থ, অগভীর মাকে কেন অত ভালবাসত রবি? রবির কাছে তা জেনে নিতে ইচ্ছা হয়! জানতে ইচ্ছা করে, কোনোভাবে না কোনোভাবে ভালবাসার কোনো উপায় ছিল কিনা!

বেয়ারা মস্ত একটা বাদামী কাগজের প্যাকেটে মোড়া বাক্স নিয়ে এল ট্রেতে। সঙ্গে বিল। দাম আর টিপস্ মিটিয়ে উঠে পড়ে দেবাশিস। ঘড়ি দেখল। এখনো অনেক সময় আছে। চিড়িয়াখানার সময়টা বেঁচে গেল।

চার

পোশাক যতই পরুক, আর যতই সাজুক, তৃণার মুখের দুঃখী ভাবটা কখনো যায় না। একটা অপরাধবোধে মাথা মুখখানায় করুণ হাসিহীন, শুকনো ভাব ফুটে থাকেই। চোখে ভীরু চঞ্চল ভাব!

বেরোবার মুখে দেখল, হুড়মুড় করে সাইকেল নিয়ে গেট দিয়ে ঢুকে এল মনু। চমৎকার লালরঙা স্পোর্টস সাইকেল। মনুর চেহারা বেশ বড়সড়। পরনে সাদা শর্টস্, সাদা গেঞ্জি, কাঁধে একটা টার্কিশ তোয়ালে, পায়ে কেড্স আর মোজা। হাত পায়ের গড়ন সুন্দর, বুকের পাটা বড়। হাতে টেনিস র‍্যাকেট। মাটিতে পা ঠেকিয়ে সাইকেলটা গাড়িবারান্দার তলায় দাঁড় করাল। চোখ তুলে মৌন মুখে মাকে দেখল একবার।

ভারী পাল্লার কাচের দরজার সঙ্গে সিঁটিয়ে যাচ্ছিল তৃণা। বুকের ভিতরটা কেমন চমকে ওঠে। ছেলের চোখে চোখ পড়তেই, হাত পায়ে সাড় থাকে না। মনু আজকাল কদাচিৎ কথা বলে। দিনের পর দিন একনাগাড়ে উপেক্ষা করে যায়।

কাচের দরজার কাছ থেকে একটুও নড়তে পারল না তৃণা। মনু সাইকেলে বসে থেকেই সাইকেলে ঠেস দেওয়ার কাঠিটা পা দিয়ে নামাল। সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে লঘু পায়ে নেমে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। তৃণার দিকে এক পলক দেখল আবার। চোদ্দবছরের ছেলের আন্দাজে মনুকে বড় দেখায়। চেহারাটা তো বড়ই, চোখের দৃষ্টিতেও পাকা গাম্ভীর্য, এটা বোধহয় ওর বাপের ধারা। বয়সের আন্দাজে ওর বাপও গম্ভীর, বয়স্কজনোচিত হাবভাব।

সামনেই মস্তো কয়েরের পাপোষ পাতা। মনু তার কেড্সটা ঘষে নিচ্ছিল, দরজার চৌকাঠে হাত রেখে। ওর শরীরের স্বেদগন্ধ, রোদের গন্ধ তৃণার নাকে এল। সে যে এই বড়সড় সুন্দর চৌখস ছেলেটির মা তা কে বিশ্বাস করবে! চেহারায় অমিল, স্বভাব অমিল, তার ওপর মনু আজকাল ডাকখোঁজ করেই না।

boiRboi.net

কতকাল 'মা' ডাক শোনেনি তৃণা।

তাকে কাচের দরজায় অমন সিঁটিয়ে থাকতে দেখে মনু আবার একবার তাকাল। ভ্রূ কোঁচকাল। মনে মনে বোধ হয় কী একটু শুঁকে নিল বাতাসে। হঠাৎ চূড়ান্ত তরল গলায় বলল—চ্যানেল নাম্বার সিক্স! না?

তৃণা ভারী চমকে ওঠে। সত্যি কথা। সে যে সেণ্টটা আনিয়েছে তা চ্যানেল নাম্বার সিক্স। কিন্তু এত ঘাবড়ে গিয়েছিল তৃণা যে উত্তর দিতে পারল না। কেবল বিশাল দুটি চক্ষু মেলে তাকিয়ে থাকল ছেলের দিকে ভূতগ্রস্তের মতো। কারণ, ছেলের চোখে চোখ রাখতে আজকাল তার মেরুদণ্ড ভেঙে নুয়ে যায়।

মনু অবশ্য তার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য অপেক্ষা করে না। চটপটে পায়ে ভিতরবাগে চলে যায়, লবি পেরিয়ে সিঁড়ির দিকে। ও এখন ঠাণ্ডা জলে স্নান করবে, পোশাক পরবে, তারপর বেরোবে কোথাও।

ওর চলে যাওয়ার রাস্তার দিকে অপলক চেয়ে থাকে তৃণা। তক্ষুনি বেরোতে পারে না। আস্তে আস্তে ঘুরে আসে। অনেকখানি মেঝে পেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসে দোতলায়। একটু বিশ্রাম করে যাবে।

মনু আর রেবার ঘর বাড়ির দক্ষিণ প্রান্তে। মাঝখানে হল, হলে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ দিকের ঘর থেকে সে মৃদু একটা শিসের শব্দ শোনে। এক পা এক পা করে এগোয় দক্ষিণের দিকে। এদিকে সে আজকাল একদম আসে না। এলে ছেলেমেয়েরা বিরক্ত হয়, ভ্রূ কোঁচকায়, সামনে থেকে সরে যেতে চেষ্টা করে। এবাড়িতে সে এক পক্ষ, আর ছেলে মেয়ে বাপ মিলে আর এক পক্ষ। মাঝখানে অদৃশ্য কুরুক্ষেত্রে বিচিত্র সব চোখের বাণ ছোটাছুটি করে, আর মৌনতার অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হয় পরস্পরের দিকে।

মনুর ঘরে মনু আছে। দরজা আধখোলা, পর্দা ঝুলছে। অন্যপাশে রেবার ঘর। ঘরটা নিস্তব্ধ, তৃণা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনে। না, ভিতরে কোনো শব্দ নেই। খুব দুঃসাহসে ভর করে সে কাঁপা, ঠাণ্ডা, দুর্বল হাতে পর্দা সরিয়ে ভিতরে পা দেয়। ফাঁকা ঘর। একধারে বইয়ের র‍্যাক, পড়ার টেবিল, ওয়ার্ডরোব, আলমারী, মাঝখানে দামী চেয়ার কয়েকটা। নীচু সেণ্টার টেবিলে তাজা ফুল রাখা।

ঘরভর্তি মৃদু ধূপকাঠির সৌরভ। রেবার বয়স বারো, কিন্তু সে একজন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার মতোই থাকে। তৃণা ফোম রবারের গদিওলা বিছানাটায় একটু বসে। বুকজোড়া ভয়। পড়ার টেবিলের ওপর স্ট্যাণ্ডে রেবার ছবি। পাতলা গড়নের ধারালো চেহারা। নাকখানা পাতলা ফিনফিনে, উদ্ধত। টানা চোখ। গাল ভাঙা, কিন্তু সব মিলিয়ে একটা তীক্ষ্ন বুদ্ধির ছাপ আছে। সে তুলনায় মনুর চেহারাটা একটু ভোঁতা, রেবার মতো বুদ্ধি মনু রাখে না। রেবা মডার্ন স্কুলের ফার্স্ট গার্ল। সম্ভবত হায়ার সেকেণ্ডারিতে স্ট্যাণ্ড করবে। মনু অত তীক্ষ্ন নয়, সে কেবল টেনিস কিংবা অন্য কোন খেলায় ভারতের এক নম্বর হতে চায়। হাসিখুশি আহ্লাদি ছেলে, মনটা সাদা। সেই কারণেই বোধ হয় কখনো সখনো মনু এক আধটা কথা মার সঙ্গে বলে ফেলে।

কিন্তু রেবার গাম্ভীর্য একদম নীরেট আর আপসহীন। যেমন তার তীক্ষ্ন বুদ্ধি তেমনই তার উপেক্ষার ভঙ্গি। যতরকমভাবে অপমান এবং উপেক্ষা করা যায় ততরকমই করে রেবা। মার প্রতি মেয়ের এমন আক্রোশ কদাচিৎ কোনো মেয়ের মধ্যে দেখা যায়! মনকে যতটা ভয় করে তৃণা, কিংবা শচীনকে, তার শতগুণ ভয় তার রেবাকে। মেয়েদের চোখ আর মন সব দেখে, সব ভাবে। ফ্রক-পরা রোগা মেয়েটাকে তৃণা তার জীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ মানুষ বলে জানে।

ঘরে ধূপকাঠির গন্ধ, স্নো ক্রীম ফাউণ্ডেশনের গন্ধ, ঘর-সুগন্ধির মৃদু সুবাস। দেয়ালের রঙ হাল্কা নীল, আর সবুজ। বিপরীত দেওয়ালগুলি একরঙা। নানা-রকম আলোর ফিটিংস লাগানো, জানালা দরজায় পর্দা, পেলমেটে কেষ্টনগরের পুতুল সারি সারি সাজানো। বুককেসের ওপর একটা রেডিও, টেপরেকর্ডার, একধারে রেকর্ড-প্লেয়ার আর রাশীকৃত রেকর্ডের অ্যালবাম। সমস্ত বাড়িটাই দেবাশিস সাজিয়েছিল। আসবাবপত্রগুলি সবই সাপ্লাই দিয়েছিল তার কোম্পানি।

ফটো-স্ট্যাণ্ডে রেবার ছবিটার দিকে ভীত চোখে চেয়ে ছিল তৃণা। তার মনে হচ্ছিল, সে রেবার মুখোমুখি বসে আছে। রেবা তাকে দেখছে। ফটোতে রেবার সুন্দর হাসিটা যেন আস্তে আস্তে পাল্টে শ্লেষ আর ঘৃণার হাসি হয়ে যাচ্ছে।

তৃণার বুক কেঁপে কান্নার গন্ধ মেখে একটা শ্বাস বেরিয়ে আসে। দূরে বৃষ্টি হলে যেমন জলের গন্ধ আনে বাতাস তেমনি কান্নাটা ঘনিয়ে উঠছে। গন্ধ পায় তৃণা। কিন্তু বৃথা। কত তো কেঁদেছে তৃণা, কেউ পাত্তা দেয় নি।

তৃণা বহুকাল এই বাড়ির এদিকে আসেনি। রেবার ঘরে ঢোকেনি। এখন একা চোরের মতো ঢুকে তার বড় ভাল লাগছিল। বারো বছর বয়সে মেয়েরা মায়ের বন্ধু হয়ে ওঠে। এই বয়ঃসন্ধির সময়ে কত গোপন মেয়েলি তথ্যের লেনদেন হয় মা আর মেয়ের মধ্যে, এই বয়সেই বন্ধুত্ব হয়ে যায় পাকা। মেয়ে আর মেয়ে থাকে না, সখী হয়ে ওঠে।

কিন্তু হায়, রেবার সঙ্গে তৃণার কোনোদিনই আর সখিত্ব হবে না। ভীতু তৃণাকে মানসিক ভারসাম্যের শেষ সীমা পর্যন্ত ঠেলে দেবে রেবা। বুদ্ধিমতী এবং নিষ্ঠুর ঐ মেয়েটা।

তৃণা উঠল, রেবা গানের স্কুলে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরবে, কিন্তু নিঃশব্দে ফিরবে না। ওর ছটফটে দৌড়-পায়ের আওয়াজ অনেক দূর থেকেই পাওয়া যায়। তাই সাহস করে তৃণা উঠে ঘুরে ঘুরে ওর ঘরটা দেখে। বুককেস খুলে বই হাতড়ায়। ওয়ার্ডরোবের ভিতরে ওর হরেক রকম ফ্রক, ঘাগরা, প্যারালেলস আর শাড়িতে হাত বুলিয়ে দেয়। বিছানার ওপর একটা নাইটি পড়ে আছে। ভীষণ পাতলা একটা বিদেশী কাপড়ের তৈরী। সেটা গুছিয়ে ভাঁজ করে রেখে দেয়। বেডকভারটা টান করে একটু। পড়ার টেবিলটা সাজানো আছে। তবু একটু নেড়েচেড়ে রেখে দেয়, খুঁজতে খুঁজতে কয়েকটা ড্রইং খাতা পায় তৃণা, তাতে জলরঙা সব ছবি আঁকা। বুকের ভিতরটা ধুপধুপ করে ওঠে। রেবা কি ছবি আঁকে?

বুককেসের মাথায় রঙের বাক্স আর তুলির বাণ্ডিল খুঁজে পায় তৃণা। হ্যাঁ, সন্দেহ নেই, রেবা ছবি আঁকে। দরজার পাশে একটা নীচু শেলফে তবলা ডুগি,

হারমোনিয়ম, তানপুরা সব সাজানো। হারমোনিয়মের বাক্সের ওপর একটা কবিতার বইও পেয়ে যায় সে। বুকে একটা আনন্দ সদ্যোজাত পাখির ছানার মতো শব্দ করে। রেবা কি কবিতা পড়ে ?

আবার গিয়ে বুককেসটা খোলে তৃণা! বইগুলো ঠিকমতো সাজিয়ে রাখা নেই। তাই অসুবিধে হয়। তবু একটু খুঁজতেই তার মধ্যে কিছু কবিতার বই খুঁজে পায় তৃণা। অবাক হয়ে উল্টেপাল্টে বইগুলো দেখে, সময়ের জ্ঞান হারিয়ে যায়।

অন্যমনস্কতাবশত সে পায়ের শব্দটা শুনতে পায়নি, যখন শুনল তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

পর্দা সরিয়ে রেবা ঘরে ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়ল। রোগা তীক্ষ্ণ মুখখানা হঠাৎ সন্দিগ্ধ আর কুটিল হয়ে উঠল। ভ্রু কোঁচকানো, রেবা তার দিকে একপলক চাইল, তারপর চোখ ফিরিয়ে পা নেড়ে চটিদুটো ঘরের কোণে ছুঁড়ে দিল। ঘূর্ণিঝড়ের মতো ঘুরে গিয়ে দাঁড়াল আয়নার সামনে। একপলক সে তাকিয়েছিল তৃণার দিকে, তাতে চোখে একটু বুঝি বিস্ময়, আর একটু ঘৃণা। বাদবাকি ব্যবহারটা উপেক্ষার।

পরনে একটা কমলারঙের হালফ্যাশনের ফ্রক। রোগা হলেও রেবা বেশ লম্বা। গায়ে মাংস লাগলে একদিন ফিগারটা ভালই দেখাবে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখের একটা ব্রণ টিপল। আঙুল দিয়ে ঘষল জায়গাটা।

বলল—কি বলতে এসেছো ?

একটু চমকে উঠল তৃণা। এ ঘরে সে যে অনধিকারী তা মনে পড়ল। বিপদ যা ঘটবার তা ঘটে গেছে, সে তো আর পালাতে পারে না এখন। আস্তে করে বলল—তোর আজ তাড়াতাড়ি হয়ে গেল যে !

অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে রেবা উত্তর দেয়—এ সময়েই ছুটি হয়। তাড়াতাড়ি আবার কী ?

বলে আয়নায় মুখ দেখতে থাকে। আয়নার ভিতর দিয়েই বোধ হয় তৃণাকে এক-আধ পলক দেখে নিল। কিন্তু তৃণার সেদিকে তাকাতে সাহসই হল না। অপরাধীর মতো মুখ নীচু রেখে বলে—তুই কি ছবি আঁকিস রেবু ?

রেবা একটু অবাক হয় বোধ হয়। বলে—হ্যাঁ আঁকি।

—জানতাম না তো !

—ক্লাসে আমাদের ড্রইং শেখায়। এ সবাই জানে।

—কবিতা পড়িস ?

—পড়ি।

তৃণা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

রেবা একটু ঝাঁজ দিয়ে বলে—আর কী বলবে ?

—কিছু না।

—আমার এখন অনেক কাজ আছে। পোশাক ছাড়ব। তুমি যাও।

—যাচ্ছি। তৃণা উঠে দাঁড়ায়। কোনো বয়সের মেয়েই মায়ের সামনে পোশাক ছাড়তে লজ্জা পায় না। তবু তৃণা সঙ্কোচে উঠে দাঁড়াল। এই ঘরে তার উপস্থিতির কোনো জরুরী অজুহাত খুঁজে না পেয়ে দুর্বল গলায় বলে—তুই নতুন কী রেকর্ড

boiRboi.net

কিনলি দেখতে এসেছিলাম।

রেবা উত্তর দিল না। আয়নায় মুখ দেখতে থাকল!

তৃণা একটু শুকনো গলায় বলে—ওয়ার্ডরোবে শাড়ি দেখছিলাম। পরিস না কি?

—ইচ্ছে হলে পরি। তুমি যাও!

—যাচ্ছি। আমার তো অনেক শাড়ি। তুই নিবি?

—না।

—কেন?

—আমার অনেক আছে। দরকার হলে বাপি আরো কিনে দেবে।

তৃণা শ্বাস ছেড়ে আপন মনে ভ্রূ কুঁচকে মাথা নাড়ে। এ সত্য তার জানা। প্রয়োজন হলে শচীন রেবাকে বাজারসুদ্ধু শাড়ি কিনে এনে দেবে। রেবা নিজে গিয়েও কিনে আনতে পারে বাজার ঘুরে, পছন্দ মতো। তবু বাঙালী ঘরের রেওয়াজ, বয়স হলে মেয়েরা মায়ের শাড়ি পরে। সেটা শাড়ির অভাবের জন্য নয়। নিজের শাড়ি পরিয়ে মা মেয়েকে দেখে। মুখ টিপে মনে মনে হাসে। মায়েরা ঐ ভাবেই আবার জন্মায় মেয়ের মধ্যে! কিন্তু রেবার তা দরকার নেই।

মুখশোষ টের পায় তৃণা। হাতে পায়ে শীত, মাথা গরম, শ্বাস গরম। দু-পা হেঁটে যায় দরজার দিকে। একটু দাঁড়ায়। ফিরে তাকায় একবার। তার ভ্রূ কোঁচকানো, চোখে বিশুদ্ধ কান্না। ঐ গুয়ের গ্যাংলা মেয়েটা কত সহজে তার মা-পনা ঘুচিয়ে দেয়।

এ বাড়িতে দুটো ভাগ আছে। একদিকে তৃণা একা, অন্যদিকে শচীন, মনু আর রেবা! সিণ্ডিকেট ঘরগুলোর মাঝখানে যোজন-যোজন ব্যবধান পড়ে থাকে সারাদিন। তার পক্ষে কেউ নয়। তবু ওর মধ্যে কি মনু একটু মায়ের টান টের পায়? অনেকদিন ভেবেছে তৃণা। ঠিক বুঝতে পারে না। ন'মাসে ছ'মাসে এক-আধবার মা বলে ডেকে ফেলে মনু। হয়তো কোনো কথা বলে ফেলে। খেতে বসে হয়তো এটা-ওটা চায়। তড়িঘড়ি এগিয়ে দেয় তৃণা। মনু কখনো কিছু বললে বাধ্য মেয়ের মতো তাই করে, তাই দেয়। কিন্তু বুকে এত কাঙালপনা নিয়েও তৃণা জানে, মনুর আসলে টান নেই। ও সোজা সরল ছেলে, দিনরাত খেলার কথা ভাবে, মাকে নিরন্তর ঘৃণা করার কথা মনে রাখতে পারে না। অন্যমনস্কতাবশত ভুলে যায়। একটু আগে কেমন স্মিতমুখে বলেছিল—চ্যানেল সিল্ক না?

রেবার কখনো ভুল হয় না। নিরন্তর বুকে সাপের মতো পুষে রাখে উপেক্ষা আর ঘেন্না। কখনো তা থেকে অন্যমনস্ক হয় না রেবা। বয়স মোটে বারো বছর, এখনো ঋতুমতী নয় বোধ হয়, তবু কেমন সব গোপন করে রেখেছে মায়ের কাছে। কেমন স্বাধীন, ডাকাবুকো।

তৃণা যাই যাই করেও খানিক দাঁড়ায়, বলে—আমার লকারে গাদা গয়না পড়ে আছে। পাঠিয়ে দেবোখন, পরিস।

—কে চেয়েছে?

—চাইতে হবে কেন? ও তো তোর পাওনা!

boiRboi.net

—আমি গয়না পরি না! তার ওপর সোনার গয়না! মাগো! বলে ঠোঁট মুখের একটা উৎকট ভঙ্গি করে রেবা।

তৃণা হ্যাংলার মতো হাসে। বলে—তা অবিশ্যি ঠিক। সলিড সোনার গয়না তোদের বয়সীরা আজকাল কেউ পরে না। বরং ভেঙে নতুন করে গড়িয়ে নিস।

—আমি পরব না। তুমি পরো।

—তুই তো একরত্তি মেয়ে, ঐ রোগা শরীরে আর কখানা গয়নাই বা ধরবে। আমার অনেক আছে। তোকে দিয়েও থাকবে। তোরই তো সব।

—তোমার কিছুই আমার নয়। না পরলে বিলিয়ে দিও।

—কেন, পরবি না কেন?

—ইচ্ছে। শাড়ি গয়নার কথা শুনলে আমার মাথা ধরে। তুমি এখন যাও।

ভুল অস্ত্র। কিন্তু এ ঠিক তৃণার দিক থেকে লোভ দেখানো নয়! কিছুক্ষণ রেবার ঘরে থাকার জন্য এ হচ্ছে এলোপাথাড়ি কথা কওয়া, নইলে সে জানে, রেবার কিছু অভাব নেই। এখনকার মেয়েরা শাড়ি গয়নার নামে ঢলে পড়ে না।

রেবা খাটের অন্যধারে বসে পা দোলায়। পায়ের আঙুলের রুপোর চুটকিতে ঝুনঝুন শব্দ হয় একটু। খুব অবহেলায় অনায়াস ভঙ্গি। তৃণার বারো বছর বয়সটা কেটেছে বিছানায়। ঐ সময়ে এত সতেজ, প্রাপ্তবয়স্কতার ভাবভঙ্গি তার ছিল না। ঐ বয়সে ছিল কত ভয়, সংশয়, কত আত্ম-অবিশ্বাস! তবু তৃণা মনে মনে একরকম খুশীই হয়। মেয়েটা তার মতো হবে বোধ হচ্ছে। ছবি আঁকে, কবিতা পড়ে, শাড়ি গয়নার দিকে মন নেই।

ও ঘরের বাথরুম থেকে মনুর সুরহীন হিন্দী গান শোনা যায়। তার সঙ্গে জলের প্রবল শব্দ। সেই জলের শব্দে তেষ্টা পায় তৃণার। আসলে বুকটা কাঠ হয়েই ছিল। জলের কথা খেয়াল হচ্ছিল না তার।

ভিখিরির মতো তৃণা বলে—একটু জল খাওয়াবি রেবু?

রেবা ভীষণ বিরক্ত হয়। তার রোগা, তিরতিরে বুদ্ধির মুখখানার কোন মুখোশ নেই। সহজেই রাগ, বিরক্তি, অভিমান বোঝা যায়। ভ্রু, নাক, চোখ কুঁচকে উঠল। তবু পড়ার টেবিলের কাছে গিয়ে দেয়ালে পিয়ানো রিডের মতো একটা স্যুইচ টিপে ধরল।

ঠিন ঠিন করে গোটা দুই সুরেলা আওয়াজ হল ভিতরে। অমনি ঝি দুর্গার মা এসে দাঁড়ায় দরজায়, নীরবে।

রেবা বলে—এক গ্লাস জল।

এরকমই হওয়ার কথা। রেবা নিজের হাতে জল গড়িয়ে দেবে না, এ কি জানত না তৃণা?

দুর্গার মা হলঘরের কুলার থেকে ঠাণ্ডা জল এনে দিল। ট্রের ওপর স্বচ্ছ কাট-গ্লাসের পাত্র, ওপরে একটা কাঁচের ঢাকনা। জলটা হীরের মত জ্বলছে। তৃণা সবটুকু খেয়ে নিল।

রেবা বলে—এবার হয়েছে? এখন যাও। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

তৃণা ভাল মেয়ের মতো বলে—এই খাড়া দুপুরে আবার বেরোবি নাকি?

—বেরোলেই বা !

—কোথায় যাবি ?

—কাজ আছে।

—তুই যে কবিতার বইগুলো কিনেছিস ওগুলোর সব আমার নেই। এক আধ-খানা দিস তো, পড়ব।

বেরা উত্তর দিল না। ওয়ার্ডরোব থেকে পছন্দমতো পোশাক বের করতে লাগল। একটা লুঙ্গি আর কামিজ বের করে সাজাল বিছানার ওপর। বিশুদ্ধ সিল্কের হালকা জামরঙের লুঙ্গি। সোনালি সিল্কের ওপর ছুঁচের কাজ করা কামিজ।

—বাঃ ভারী সুন্দর তো !

—কী সুন্দর ? ঝামরে ওঠে রেবা।

—পোশাকটা। কবে করালি ?

রেবা তার পাতলা ধারাল মুখখানা তুলে তৃণাকে এক পলকের কিছু বেশি লক্ষ করল। তৃণা চোখ সরিয়ে নেয়।

রেবা বলে—তুমি যেখানে যাচ্ছো যাও।

তৃণা হ্যাংলার মতো তবু বলে—বচ্ছ রোদ উঠেছে আজ। ছাতা নিবি না ?

—সে আমি বুঝব।

—রেবু, আমার শরীরটা বড্ড খারাপ লাগছে।

—ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো।

—তুই অমন করছিস কেন ?

রেবা উত্তর না দিয়ে তার ঘরের লাগোয়া বাথরুমে চলে গেল। সশব্দে দরজা বন্ধ করল।

ফাঁকা ঘরে একা তৃণা দাঁড়িয়ে থাকে। সত্যিই তার শরীর খারাপ লাগছিল। খুব খারাপ, যেন বা গা ভরে জ্বর এসেছে। চোখে জ্বালা, হাত পা কিছুই যেন তার বশে নেই। আর মাথার মধ্যে চিন্তার রাজ্যে একটা বিশৃঙ্খলা টের পায় সে। পূর্বাপর কোনো কথাই সাজিয়ে ভাবতে পারে না।

শরীরটা কাঁপছিল, খুব ধীর পায়ে বেরিয়ে আসে তৃণা। হলঘরে হাল্কা অন্ধকার। ঠাণ্ডা। একটু দাঁড়ায়, তারপর অবশ হয়ে দেওয়ালের গায়ে লাগানো নরম কোঁচটায় বসে পড়ে। কোঁচের পাশে মস্ত রঙীন কাঠের বাক্সে লাগানো পাতা-বাহারের গাছের পাতা তার গাল স্পর্শ করে।

ঝিম মেরে একটুক্ষণ বসে থাকে তৃণা। কতকাল সে তার শরীরের কোনো খোঁজ রাখে না, ভিতরে ভিতরে কী অসুখ তৈরী হয়েছে কে জানে! মাথাটা ঠিক রাখতে পারছে না সে। স্খলিত হয়ে যাচ্ছে স্মৃতি, পারম্পর্যহীন সব এলোমেলো কথা ভেসে আসছে মনে। ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে খুব।

একটা তীব্র শিসের শব্দে সে মুখ তোলে। গায়ে ব্যানলনের দুধসাদা গেঞ্জি, পরনে পাতিলেবুর রঙের স্ট্রেচলনের বেলবটম পরা মনু নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে চলে যাচ্ছিল। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ডান হাতের ব্রেসলেটে ঢিলা করে পরা ঘড়িটা দেখল। সময়টা বিশ্বাস হল না বুঝি। ঘড়িটা কানের কাছে তুলে

শব্দ শুনলে। তারপর তৃণাকে লক্ষ্য না করেই আবার চলে যাচ্ছিল সিঁড়ির দিকে।

পাতাবাহারের আড়াল থেকে মনুর সুন্দর চেহারাটা দেখে তৃণা। এই বয়সেই মনু মোটর চালায়, টেনিস খেলে, বিদেশী নাচ শেখে। তৃণার জগৎ থেকে অনেক দূরে ওর বসবাস। বড়সড় স্বাস্থ্যবান ঐ ছেলেটা যে তার গর্ভজ সন্তান তা তৃণার বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস হলেও এক এক সময়ে বড় ভয় করে, এক এক সময়ে অহংকার হয়। কিন্তু এও সত্যি কথা, মনুর জগতে তৃণা বলে কেউ নেই।

সিঁড়ির মাথায় চলে গিয়েছিল মনু। এক্ষুনি নেমে যাবে।

তৃণার গলায় একটুও জোর ফুটল না। ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকল—মনু!

ডাকটা মনুর শোনার কথা নয়। মস্ত হলঘরটার অন্য প্রান্তে চলে গেছে সে। তার ওপর শিসে একটা গরম হিন্দী টিউন তুলছে। তা ছাড়া যৌবনবয়সের চিন্তা আছে, আর আছে ঘরের বাইরে জগতের আনন্দময় ডাক। মায়ের ক্ষীণকণ্ঠ তার শোনার কথা নয়। তবু দ্রুত দু ধাপ সিঁড়ি চঞ্চল পায়ে নেমে গিয়েও দাঁড়াল সে! একটু এপাশ ওপাশ তাকাল। হয়তো ক্ষীণ সন্দেহ হয়ে থাকবে যে কেউ ডেকেছে।

পাতাবাহারের আড়ালে মুখখানা ঢেকে তৃণা তেমনি ক্ষীণ গলায় বলে—মনু, আমি এখানে।

এবার মনু শুনতে পায়। ফিরে তাকায়। মুখে একটু ভ্যাবলা অবাক ভাব। শরীরটা যত বড়ই হোক, ওর বয়সে এখনো ছেলেরা মায়ের আঁচলধরা থাকে।

মনু তাকে দূর থেকে দেখল। রাঙা শাড়ি পরেছে তৃণা, মেখেছে দামী বিদেশী সুগন্ধ, আর নানা রূপটান। নষ্ট মেয়ের সাজ। একটু আগে বাড়িতে ঢোকার সময়ে তাই কি ঠাট্টা করে মনু বলেছিল—চ্যানেল নাম্বার সিক্স, না? নষ্টামিটা কি তৃণার শরীরে খুব অস্পষ্ট হয়ে আছে?

মনু সিঁড়ির দুধাপ উঠে আসে। হলঘরটা লম্বা পদক্ষেপে পার হয়ে সামনে দাঁড়ায়। মুখে একটা গা-জ্বালানো ঠাট্টার হাসি। হাল্কা গলায় বলে—আরে! তুমি তো বেরিয়ে গেলে দেখলাম!

তৃণা তৃষিত মুখখানা তুলে ওকে দেখে। কী বিরাট, কী প্রকাণ্ড সব মানুষ এরা।

মাথা নেড়ে তৃণা বলে—যাইনি।

—যাওনি তো দেখতেই পাচ্ছি। কী ব্যাপার?

—তুই কোথায় যাচ্ছিস?

—বেরোচ্ছি।

—আমার শরীরটা বড্ড খারাপ লাগছে।

শুনে মনুর মুখে খুব সামান্য, হাল্কা জলের মতো একটু উদ্বেগ।

মনুর মুখখানা অবিকল তৃণার মতো। মাতৃমুখী ছেলে! ওর চোখে একটা মেয়েলি নম্রতা আছে। এ সবই তৃণার চিহ্ন। মনুর মুখে চোখে তৃণার চিহ্ন ছড়ানো আছে। অনেকদিন বাদে একটু লক্ষ্য করে তৃণা খুব গভীর একটা শ্বাস ফেলে।

মনু একটু ঝুঁকে তাকে দেখে নিয়ে বলে—খুব সেজেছো দেখছি! তবু তোমাকে খুব পেলু দেখাচ্ছে। চোখও লাল। ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো।

boiRboi.net

—আমাকে একটু ধরে নিয়ে যাবি ?

—এসো। বলে সঙ্গে সঙ্গে মনু হাত বাড়ায়।

ভারী অবাক মানে তৃণা, ও কি তাকে ছোঁবে ? ঘেন্না করবে না ওর ? তৃণা সঙ্কুচিত হয়ে বলে—তোর দেরি হচ্ছে না তো !

—হচ্ছে তো কি ? এসো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাই ঘরে।

তৃণা উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ তাকে চমকে স্তম্ভিত করে দিয়ে মনু তাকে এক ঝটকায় পাঁজাকোলে তুলে নিয়ে চেঁচিয়ে হেসে বলে—আরে ! তুমি তো ভীষণ হাল্কা !

তৃণার মাথা ঘুরে যায়, দম বন্ধ হয়ে আসে। সে কঁকিয়ে কান্না গলায় বলে—ছেড়ে দে, ওরে !

—তুমি কি ভাবছ তোমাকে নিতে পারব না ?

—ফেলে দিবি। ক্ষীণ কণ্ঠে বলে তৃণা।

—দূর ! আমি ওয়েটলিফটার, জানো না ? তুমি তো মশার মতো হাল্কা। বলে দুহাতে তৃণার শরীরটা ওপরে নীচে একবার দুলিয়ে দেখায় মনু। তৃণা তখন ছেলের শরীরের সুঘ্রাণটি পায়। মৃদু সাবান পাউডার, আর জামাকাপড় ওয়ার্ডরোবের পোকা তাড়ানো ওষুধের গন্ধ। এসব ভেদ করে মনুর গায়ের রক্তমাংসের একটা গন্ধ, একটা স্পন্দন পায় না কি সে ?

অনায়াসে মনু হলঘরটা পার হয়ে যায় তৃণাকে পাঁজাকোলে নিয়ে। তৃণা ভয়ে ভয়ে চোখ বুজে ছিল, মুঠো হাতে খামচে ধরে ছিল মনুর গেঞ্জির বুকের কাছটা।

নরম বিছানায় মনু তৃণাকে ঝুপ করে নামিয়ে দিয়ে হাসে—দেখলে তো ?

তৃণা একটু ক্ষীণ হেসে বলে—নিজের শরীরে অত নজর দিস না নিজের নজর সবচেয়ে বেশি লাগে।

—সবাই আমাকে নজর দেয়। বন্ধুরা আমাকে স্যামসন বলে ডাকে।

—বালাই ষাট।

মনু ঠাট্টার হাল্কা এবং বোকাহাসি হাসে। বলে—চলি ?

—কোথায় যাবি ?

—যাওয়ার অনেক জায়গা আছে।

মনু মাথা ঝাঁকায়। দরজার কাছ থেকে একবার সাহেবী কায়দায় হাতটা তোলে। চলে যায়।

মনুর শরীরের সুঘ্রাণ এখনো ভরে আছে তৃণার শ্বাসপ্রশ্বাসে। ছোটো থেকেই মনু মোটাসোটা ভারী ছেলে, টেনে ওকে কোলে তুলতে কষ্ট হত। তখন থেকে সবাই ছেলেটাকে নজর দেয়। এখন দেখনসই চেহারা হচ্ছে। পাঁচজনে তাকাবেই তো। ভাবতে এক রকম ভালই লাগে তৃণার। দুঃখ এই যে, ছেলে তার হয়েও তার নয়। একটু বুঝি বা কখনো মনের ভুলে মাকে মা বলে মনে করে। তারপরই আবার আলগা দেয়। দূরের লোক হয়ে যায় সব। তৃণা ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। কত রকম যে ভয় তার ! সে চুপ করে শুয়ে মনুর কথা ভাবতে থাকে।

শচীন কোথায় গিয়েছিল, এইমাত্র ফিরে এল। পাশের ঘর থেকে তার সুরহীন গুন্‌গুন্‌ ধ্বনি আসে। হলঘরে ঘড়িতে ঘণ্টা বাজছে। ঘরের মধ্যে শুয়ে থেকে

সেই ঘণ্টাধ্বনি শোনে তৃণা। শুনতে শুনতে হঠাৎ চমকে উঠে বলল, এগারোটা না?

বুকের মধ্যে ধুপ ধুপ করে। উত্তেজনায় নয়। হঠাৎ উঠে বসায় বুকে একটা চাপ লেগেছে। বাসস্টপটা খুব দূরে নয়। দেবাশিস এসে অপেক্ষা করবে। নিজের মানুষ-জনের কাছে বড্ড পুরোনো হয়ে গেছে তৃণা, পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে গেলে এমন কাউকে চাই যার কাছে প্রতিদিন তৃণার জন্ম হয়।

সে উঠল। শরীর ভাল নেই। মন ভাল নেই। এই ভরদুপুরে সে যদি বেরিয়ে যায়, অনেকক্ষণ ফিরে না আসে তবু কারো কোনো উদ্বেগ থাকবে না। কেউ একফোঁটা চিন্তা করবে না তৃণার জন্য।

হলঘর থেকে রেবার উচ্চকিত স্বর পাওয়া গেল—বাপি!

শচীন গম্ভীর-স্বরে জবাব দেয়—হুঁ!

—আমি বেরোচ্ছি।

—আচ্ছা।

শচীন তার দাঁড়ে সব পাখিকে শেকল পরাতে পেরেছে। এ সংসারে তৃণার মত পরাজিত কেউ না। শচীন একই সঙ্গে ছেলেমেয়ের মা ও বাবা, ওরা কোথায় যায় কী করে তা তৃণার জানা নেই। যেমন, আজ দুপুরে কে কে বাড়িতে খাবে, বা কার বাইরে নিমন্ত্রণ আছে, তা সে জানে না। কেউ বলে না কিছু। যা বলে তা শচীনকে। একা, অভিমানে তৃণার ঠোঁট ফোলে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে তার কোঁচকানো শাড়িটা ঠিকঠাক করে নেয়, বেরোবে।

বেরোবার মুখে সে হলঘর পেরোতে গিয়ে দেখে শচীন টবের গাছগুলি ঝুঁকে দেখছে। তৃণার দিকে পিছন ফেরানো। চল্লিশের কিছু ওপরে ওর বয়স, স্বাস্থ্য ভাল। তবু ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গির মধ্যে একজন বৃদ্ধের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। কিছু ধীরস্থির, চিন্তামগ্ন বিবেচকের মতো দেখতে, পাকা সংসারীর ছাপ চেহারায়।

তৃণা নিঃশব্দে বেরিয়ে এসেছিল। শচীনের টের পাওয়ার কথা নয়। তবু শচীন টের পেল। হঠাৎ ঝুঁকে কী একটা তুলে নিয়ে ফিরে সোজা তার দিকে তাকাল। হাতে একটা ছোট্ট রুমাল। তৃণার।

শচীন জিজ্ঞেস করে—এটা তোমার?

খুব সূক্ষ্ম কাপড় আর লেস্ দিয়ে তৈরী রুমালটা তারই। সোফায় বসে থাকার সময়ে পড়ে গিয়ে থাকবে।

তৃণা মাথা নাড়ল।

—এখানে গাছের গোড়ায় পড়ে ছিল। বলে শচীন রুমালটা সোফার ওপর আলতোভাবে রেখে দিয়ে আবার গাছ দেখতে লাগল। জাপান থেকে বেঁটে গাছ আনাচ্ছে, শুনেছে তৃণা। সে গাছ কাচের বাক্সে হলঘরে রাখা হবে। বোধ হয় সে ব্যাপারেই কোন প্ল্যান করছে।

রুমালটা তুলে নিতে গিয়ে তৃণাকে শচীনের খুব কাছে চলে যেতে হল। তার শ্বাস প্রশ্বাস গায়ের গন্ধ ও উত্তাপের পরিমণ্ডলটির ভিতরেই বোধ হয় চলে যেতে হল তাকে। তৃণা নিজের শরীরে বিদ্যুৎ তরঙ্গ টের পায়। অবশ্য শচীন খুবই অন্যমনস্ক। সে মোটে লক্ষ্যই করল না তাকে!

তৃণা রুমালটা তুলে নিল। চলে যাচ্ছিল সিঁড়ির দিকে। হঠাৎ দাঁড়াল, তার কিছু হারাবার ভয় নেই, কিছু পাওয়ার আশাও নেই তাহলে বেরা আর মনুর পর এ লোকটাকে একটু পরীক্ষা করে দেখলে কেমন হয়? কিছুদিন আগে শচীন তাকে মেরেছিল। জীবনে ঐ একবারই বোধহয় পদস্খলন হয়ে থাকবে লোকটার। তা ছাড়া আর কখনো তৃণার জন্য বোধ হয় কোনো আবেগ বোধ করে নি। শচীনের ঐ মারটা একটা সুখস্মৃতির মতো কেন যে!

তৃণা আচমকা বলে—আমি যাচ্ছি।

শচীন শুনতে পেল না।

তৃণা মরীয়া হয়ে বলে—শুনছো!

অন্যমনস্ক শচীন দীর্ঘ উত্তর দেয়—উঁ…উঁ!

তারপর ধীরে ফিরে তাকায়। সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ে লগ্ন চোখ!

—আমি একটু বেরোচ্ছি। তৃণা হাঁফধরা গলায় বলে।

শচীন বড় অবাক হয় বুঝি! বিস্ফারিত চোখে তার রাঙা পোশাকপরা চেহারাটা দেখে। অনেকক্ষণ পরে বলে—ওঃ!

শচীনের উত্তেজনা কম, রাগ কম। কিন্তু একরকমের কঠিন কর্তব্যনিষ্ঠার বর্ম পরে থাকে। স্ত্রী বিপথগামিনী বলে তার মনে নিশ্চয়ই কিছু প্রতিক্রিয়া হয় কিন্তু তা প্রকাশ করা তার রেওয়াজ নয়, এমন কি তৃণাকে সে তাড়িয়ে দিতে পারলেও দেয়নি, চমৎকার সুখ-সুবিধের মধ্যে রেখে দিয়েছে। লোকলজ্জাকেও গায়ে মাখে না। এ কেমনতর লোক? এমন হতে পারে, তৃণাকে ভালবাসে না, কখনো বাসে নি। কিন্তু ভালবাসুক চাই না বাসুক, পুরুষের অধিকারবোধও কি থাকতে নেই? কিংবা আত্মসম্মানবোধ? তৃণার শরীর ভাল নয়, মাথার ভিতরটাও আজ গোলমেলে। নইলে সে এমন কাণ্ড করতে সাহসই পেত না। সে তো জানে, শচীনের তাকে নিয়ে কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই। সে কোথায় যায় বা না যায় তার খোঁজ কখনো রাখে না।

তৃণা খুব অসম্ভব একটা চেষ্টায় শচীনের ওপর নিজের চোখ রেখে তাকিয়ে রইল। শচীন খুব গম্ভীর। অন্যমনস্কতা কেটে গেছে। একটু চিন্তিত দেখাচ্ছে মাত্র।

শচীন মাথাটা নেড়ে বলল—যাবে যাও। বলার কী?

এই উত্তরই আশা করেছিল তৃণা। কিন্তু আজ তার একটা মরীয়া ভাব এসেছে। কেবলই মনে হয়েছে টানবাঁধা উদ্বেগ ও শঙ্কায় ভরা এইসব সম্পর্কের ভিতরের সত্যটা তার জেনে নেওয়া দরকার। যেন আর খুব বেশী সময় নেই।

তাই তৃণা বলে—এ ছাড়া তোমার আর কিছু বলার নেই?

শচীন অবাক হয়ে বলে—কি থাকবে? এখন বলা-কওয়ার স্টেজ পার হয়ে গেছে।

তৃণা তার শুকনো ঠোঁট বিশুষ্ক দাঁতে চেপে ধরল। মুখে জল নেই, পাপোষের মতো খসখসে লাগছে জিভটা। কিন্তু আশ্চর্য যে বহুদিন পরে শচীনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার বুক কাঁপছে না ভয়ও হচ্ছে না তেমন।

তৃণা বলে—আমি যদি একেবারে চলে যাই তাহলেও কিছু বলার নেই?

—বলার অনেক কিছু মনে হয়। কিন্তু বলতে ইচ্ছে করে না।

—কেন ?

—বলা মানে কাউকে শোনানো, আমার তো শোনানোর কেউ নেই।

তৃণা চুপ করে থাকে। কান্না আসে, কিন্তু কাঁদে না। তার কান্নার মূল্যই বা কী ?

শচীন টেবিল থেকে জলের জগটা তুলে নিয়ে আলগা করে একটু জল খেল। তারপর তৃণার দিকে তাকিয়ে তেমনি চিন্তিত গলায় বলে—তুমি কী একেবারেই যাচ্ছো ?

তৃণা কিছু বলল না। দুঃসাহসভরে তাকিয়ে থাকল।

শচীন বলে—এ সিদ্ধান্তটা আরো আগেই নিতে পারতে।

—তাহলে কী হত ?

—তাহলে অন্তত উদ্বেগ আর মানসিক কষ্ট হত না। দেবাশিস বাবুও নিশ্চিন্ত হতে পারতেন।

তৃণা অধৈর্য হয়ে বলে—আমি সে-যাওয়ার কথা বলিনি।

—তবে ?

—আমার মনে হচ্ছে আমি আর বেশি দিন বাঁচব না।

—ও। শচীন একটু চুপ করে থাকে। তারপর, যেন বুঝেছে, এমনভাবে মাথা নাড়ল। বলল—তাও মনে হওয়া সম্ভব। বহুকাল ধরেই তোমার নার্ভের ওপর চাপ যাচ্ছে। তার ওপর আছে নিজেকে ক্রমাগত অপরাধী ভেবে যাওয়ার হীনমন্যতা! এ অবস্থায় মরতে অনেকেই চাইবে।

—তুমি কি সিমপ্যাথি দেখাচ্ছ ?

না। কিন্তু তোমাকে সাহসী হতে বলছি। চোরের মতো বেঁচে আছো কেন ? যা করেছো তা আরো সাহস আর স্পষ্টতার সঙ্গে করা উচিত ছিল।

—কী বলতে চাও তা আরো স্পষ্ট করে বলো।

শচীন তার দিকে ক্ষণকাল চেয়ে রইল, যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না তৃণার এই ব্যবহার। তারপর বলে—এ ঘরটা কথা বলার ঠিক জায়গা নয়। এসো।

বলে শচীন হলঘরের সামনের দিকের ঘরটায় ঢোকে। এই ঘরে পাতা রয়েছে সবুজ রঙের পিঙপঙ টেবিল, ক্যারাম, দাবা, দেয়ালে সাজানো টেনিস আর ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট। কাঠের ফ্রেমে গলফ্ কীট। একধারে জুতোর র‍্যাক্, দেয়াল আলমারিতে সাজানো কয়েকটা বন্দুক, রাইফেল, কয়েকটা ভাল সোফা দেয়ালের সঙ্গে পাতা রয়েছে।

তৃণার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, শচীন তার সঙ্গে কথা বলার জন্যে একটুও আগ্রহ দেখাবে। ঘটনাটা যেন স্বপ্নের মধ্যে ঘটছে। কিন্তু এও জানে তৃণা, কথা বলে এ সমস্যার কোনো সুরাহা হওয়ার নয় !

ঘরটা একটু আবছায়া। শচীন ঢুকে তৃণার ঘরে ঢোকার জন্য অপেক্ষা করল। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিল। পিঙপঙ খেলার জন্য এ ঘরে কয়েকটা খুব বেশী পাওয়ারের আলো লাগানো আছে। শচীন আলো জ্বালে। চোখ ধাঁধানো আলো।

boiRboi.net

তৃণার মাথার মধ্যে একটা বিকারের ভাব। বন্ধ ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েই তার মনে হয়, এ ঘরে একটা মিলনান্তক নাটক করার জন্যই শচীন তাকে ডেকে এনেছে। শেষমেশ জড়িয়ে-টড়িয়ে ধরবে না তো! না, না, তাহলে সহ্য করতে পারবে না। বড় বিতৃষ্ণা হবে তাহলে।

শচীন পিঙপঙ টেবিলের ওপাশে একটা চেয়ার টেনে বসল, টেবিলের ওপরে সাবধানে নিজের হাত দু'খানায় ভর রেখে তৃণার দিকে চেয়ে বলল—এবার বলো।

তৃণা ভ্রূ কুঁচকে বলে—আমি কী বলব?

—বলাটা তুমিই শুরু করেছো।

তৃণা একটু থমকে থাকে। সময় চলে যাচ্ছে। ফাঁড়ির কাছের বাসস্টপে দেবাশিস তার গাড়ি নিয়ে এসে বসে থাকবে। সেটা ভাবতেই তার শরীরে অসুস্থতাকে ভাসিয়ে দিয়ে একটা জোয়ার আসে তীব্র, তীক্ষ্ণ আনন্দের! শচীনের দিকে তাকিয়ে তার এ লোকটার সঙ্গ করতে অনিচ্ছা হতে থাকে।

তৃণা শ্বাস ফেলে বলে—আমি বোধ হয় বেশিদিন বাঁচব না।

—সেটা হঠাৎ আজ বলছ কেন?

—আজ বলছি, আজই মনে হচ্ছে বলে।

শচীন মাথা নেড়ে ধীর স্বরে বলে—যদি মনে হয় তাহলে তার জন্যে আমরা কী করতে পারি?

তৃণা অধৈর্যের গলায় বলে—আমি কিছু করতে বলিনি।

—তবে?

তৃণা একটু ভাবে। ঠিকঠাক কথা মনে পড়ে না। হঠাৎ বলে—আমি এ বাড়িতে কী রকমভাবে আছি তা কি তুমি জানো?

শচীন চুপ করে চেয়ে রইল খানিক। তৃণার আজকের সাহসটা বোধহয় তারিফ করল মনে মনে। তারপর বলল—বাইরে থেকে কেমন আছো তা জানি। কিন্তু মনের ভিতরে কেমন আছো তা কী করে জানব? প্রত্যেক মানুষই দুটো মানুষ।

—সে কেমন?

—বাইরেরটা আচার আচরণ করে, সহবৎ রক্ষা করে, হাসে বা কাঁদে, ভালবাসে বা ঘেন্না করে। আর ভিতরের মানুষটা এক পাগল। বাইরের জনের সঙ্গে তার মিলমিশ নেই, বনিবনা নেই, একটা আপস-রফা হয়তো আছে। সেই ভিতরের মানুষটাকে জেনুইন অন্তর্যামী ছাড়া কেউ জানতে পারে না!

—আমি তত্ত্বকথা শুনতে চাই না।

শচীনকে খুব শান্ত ও নিরুদ্বেগ দেখাচ্ছে। এ মানুষটার এই শান্তভাবটা তৃণা কখনো ভাল মনে নিতে পারে না। শচীন শান্তমুখে বলে—তত্ত্বকথা মানেই তো আর পুঁথিপত্রের কথা নয়। জীবন থেকেই তত্ত্ব কিংবা দর্শন আসে। আমি তো স্পষ্ট করেই বলছি যে, তোমার জন্য আমরা কিছু আর করতে পারি না।

—তা জানি। আমি তবু একটা কথা জানতে চাই। তোমার চোখে এখন আমি কী রকম?

শচীন হাসল না। তবু একটু দুর্বোধ্য কৌতুক চিকমিক করে গেল তার চোখে।

বলল—অ্যাপারেণ্ট্‌লি তুমি তো এখনো বেশ সুন্দরীই। ফিগার ভাল, ছেলেমেয়ের মা বলে বোঝা যায় না।

তৃণা রেগে লাল হয়ে গেল। বলল—সে কথা জিজ্ঞেস করিনি।

—তবে ?

—আমি জানতে চাইছি, তুমি আমাকে কী চোখে দেখ!

—ও। বলে শচীন তেমনি চুপ করে চেয়ে থাকে তার দিকে। চোখে কোন ভাষা নেই, নীরব কৌতুক ছাড়া। বলে—তোমাকে আসলে আমি দেখিই না। অনেক চেষ্টা করে তবে এই না-দেখার অভ্যাস করেছি।

তৃণার এ সবই জানা। তবু বলল—এই যেমন এখন দেখছ! এখন কোনো প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না ?

—হচ্ছে।

—সেটা কেমন ?

—রাস্তার ভিখিরিদের আমরা লক্ষ্য করি না। আবার তাদের মধ্যে কেউ যখন সাহসী হয়ে, কিংবা মরীয়া হয়ে কাছে এসে তাদের দুঃখের কথা বলে তখন তাকে দেখি, মায়া হয়, করুণা বোধ করি। এও ঠিক তেমনি, তোমার জন্য মায়া এবং করুণা হচ্ছে। আবার যখন ভিখিরিটা দঙ্গলে মিশে যাবে, তখন আবার তাকে লক্ষ্য করব না। আমরা কেউ কাউকে কনস্ট্যাণ্ট মনে রাখতে পারি না, সে যত ভালবাসার বা ঘেন্নার লোক হোক না কেন। কখনো মনে রাখি আবার ভুলে যাই, ফের মনে করি—এমনিভাবেই সম্পর্ক রাখি। মানুষ দুভাবে থাকে।

—সে কেমন ?

—এক, কেবলমাত্র শারীরিকভাবে থাকে। দুই, মানুষের মনের মধ্যে থাকে। আমার কাছে, তুমি কেবল শারীরিকভাবে আছ, আমার মনের মধ্যে নেই।

তৃণা ভ্রূ কোঁচকায়। বিরক্তিতে নয়, যখন সে খুব অসহায় হয়ে পড়ে তখন ভ্রূ কোঁচকানো তার স্বভাব।

তৃণা শ্বাস ফেলে বলে—এটা সত্যি কথা নয়।

—তাহলে কোনটা সত্যি কথা ? তুমি কি আমার মনের মধ্যে আছো ?

তৃণা মাথা নেড়ে বলে—আমি সে কথা বলিনি। আমি জানতে চাই আমাকে—আমার প্রতি তোমার প্রতিক্রিয়া কী ?

শচীন মাথাটা নামিয়ে সবুজ টেবিলের ওপর তার দুহাতের আঙুল দেখল। তারপর মুখ না তুলেই বলল—আমি খুব সিমপ্যাথেটিক। তোমার সমস্যাটা আমি বুঝি, তাই তোমাকে সাহসী হতে বলেছিলাম।

—আমাকে চলে যেতে বলছো ?

শচীন মাথা নেড়ে বলল—না, তুমি এ বাড়িতে থেকেও যা খুশি করতে পারো। তাতে আমাদের যে কিছু আসে যায় না তা তো তুমি বোঝোই, কিন্তু তোমার তাতে আসে যায়। তুমি কেবলই পাপবোধে কষ্ট পাচ্ছো, আমরা তোমাকে নিয়ে নানা জল্পনা করছি বলে সন্দেহ করছ। হয়তো একথাও ভাবো যে, দেবাশিসবাবুর স্ত্রী তোমার জন্যই আত্মহত্যা করেন। এসব তোমার ভিতরে ক্ষয় ধরাচ্ছে। আমি তোমাকে

boiRboi.net

চলে যেতে বলছি না, কিন্তু গেলে তোমার দিক থেকেই ভাল হবে।

—আমি থাকি বা যাই, তাতে কি তোমাদের কিছু যায় আসে না ?

—না।

—আর যদি মরে যাই ?

—সেটা স্বতন্ত্র কথা ! অন্য মানুষকে মরতে দেখলে আমাদের নিজের মৃত্যুর কথা মনে পড়ে, তাই মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু, মরবে কেন ?

—আমি ইচ্ছে করে মরব, এমন কথা বলিনি। কিন্তু মনে হয়, আমি আর বেশি-দিন বাঁচবও না।

—তাহলে সেটা দুঃখের ব্যাপার হবে। যাতে মরতে না হয় এমন কিছু করাই ভাল। শরীর খারাপ হয়ে থাকলে ডাক্তার দেখাও।

তৃণা ঘুরে দরজার দিকে এগোয়। ছিটকিনি খুলতে হাত বাড়িয়ে বলে—দেখাবো। কিন্তু দয়া করে মনে কোরো না যে, আমি তোমার বা তোমাদের করুণা পাওয়ার জন্য মরার কথা বলেছিলাম।

শচীন চেয়ার ঠেলে উঠল। কথা বলল না।

তৃণা আর একবার ফিরে তাকাল না। দরজা খুলে সে বেরিয়ে এল হলঘরে। তারপর সিঁড়ি ভেঙে বাগানের রাস্তা ধরে চলে আসে ফুটপাথে। খুব জোরে হাঁটতে থাকে।

আপন মনেই বিড়বিড় করে কথা বলছিল তৃণা—যাবে না কেন ? আমি তো তোমাদের কেউ না।

কোনো লক্ষ্য স্থির ছিল না বলে তৃণা ভুল রাস্তায় এসে পড়ল। ঘড়িতে খুব বেশি সময় নেই। দেবাশিস আসবে। ফাঁড়ির কাছের বাসস্টপে তাদের দেখা হবে। দেখা হলেই পৃথিবীর মরা রঙে উজ্জ্বলতা ফুটে উঠবে।

তৃণা ঠিক করে ফেলল, আজ সে দেবাশিসকে বলবে, বরাবরের মতো চলে যাবে তৃণা, ওর কাছে।

সামনেই একটা থেমে থাকা মোটর সাইকেল স্টার্ট দিচ্ছে অল্পবয়সী একটা ছেলে। স্টার্টারে লাথি মারছে লাফিয়ে উঠে। স্টার্ট নিচ্ছে না গাড়িটা দু-একবার গরগর করে থেমে যাচ্ছে। নিস্তব্ধ রাস্তায় শব্দটা ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি হয়ে মস্ত বড় হয়ে যাচ্ছে। সেই শব্দটায় যেন তৃণা সম্বিৎ ফিরে পেল। সে চারধারে তাকিয়ে দেখল এ তার রাস্তা নয়। ফাঁড়ি আরো উত্তরে।

সে ঘুরে হাঁটতে থাকে। পিছনে মোটরসাইকেলটা স্টার্ট নেয়। ভয়ঙ্কর একটা শব্দ তুলে মুখ ঘুরিয়ে তেড়ে আসে। ফুটপাথে উঠে যায় তৃণা। মোটর সাইকেলটা ঝোড়ো শব্দ তুলে তাকে পেরিয়ে চলে যায়।

boiRboi.net

পাঁচ

গাড়ির শব্দ পেয়েই ফুলি হাঁপাতে হাঁপাতে নেমে আসে। অল্পবয়সেই ফুলি বড় মোটা হয়ে গেছে। একদল ছেলেপুলের মা। তবু বোধ হয় সন্তানের তেষ্টা ওর মেটেনি। রবির জন্য একবুক ভালবাসা বয়ে বেড়ায়।

ফুলির আদর সোহাগ সবই সেকেলে ধাঁচের। রবি গাড়ি থেকে নামতে না-নামতেই ফুলি হাত বাড়িয়ে রাস্তাতেই ওকে বুকে টেনে নেয়। মৃদু সুখের ঘুনঘুনে শব্দ করতে করতে বলে—ধন আমার মানিক আমার গোপাল আমার…বলে মুখে বুকে মুখ ডুবিয়ে দেয়। রবি প্রথমটায় লজ্জা পায়। হাত-পা দিয়ে আদর ঠেকায়। কিন্তু তারও দুর্বলতা আছে! সারা সপ্তাহ ধরে সে এই অদ্ভুত গ্রাম্য আদরটুকুর জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই দেখা যায়, রবি দুহাতে আঁকড়ে ধরেছে তার মাশিমাকে, কাঁধে মাথা রেখেছে। বলছে—রোজ রাতে আমি তোমাকে স্বপ্ন দেখি মাশিমা।

ফুলির বুকে বোধহয় এই কথায় একটা ঢেউ উঠে নতুন করে। সেই ঘুনঘুনে আদরের শব্দটা করতে করতে পিষে ফেলে রবিকে। আর রবি এবার নির্লজ্জের মতো আদর খায়।

ফুলির ছেলেপুলেরা সাড়া পেয়ে হৈ-হৈ করে এসে ঘিরে ধরে রবিকে। রবি ওদের কাছে একটা বিরাট বিস্ময়। সে সাহেবদের মতো চমৎকার ইংরাজী বলে, অদ্ভুত সব দামী পোশাক পরে, নিখুঁত সহবৎ মেনে চলে! ফুলির ছেলেমেয়েরা এসব দেখে ভারী মজা পায়।

ফুলি তার ছেলেমেয়েদের মধ্যে রবিকে ছেড়ে দিয়ে মুগ্ধচোখে একটু চেয়ে রইল, আপন মনেই বলল—রোগা হয়ে গেছে।

চাঁপা হটবক্স ফ্লাস্ক আর দৈ-মিষ্টির ভাঁড় নামিয়ে রাখতে রাখতে বলে—কিছু খেতে চায় না!

ফুলি মাথা নেড়ে বলে—খাবে কি? ওর ভিতরটা যে খাক হয়ে যায়। সে আমি বুঝি।

ফুলিদের আলাদা বসবার ঘর নেই। ঢুকতেই একটা লম্বাটে ঘর দালানের মতো আছে, সেখানে কয়েকখানা চেয়ার পাতা। ফুলির বর শিশির বি এন-আর-এ চাকরি করে। বয়স বেশি নয়, কিন্তু ভারী প্রাচীনপন্থী। বছর বছর ছেলেপুলে হয় বলে দেবাশিস ওকে একবার বলেছিল—ভায়া বৌটাকে তো মেরে ফেলবে, ছেলেপুলে গুলোও মানুষ হবে না।

BoiRboi.net

শিশির একটু ঘাড় তেড়া করে বলল—তা কী করব বলুন ?

তখন দেবাশিস বলে—কন্ট্রাসেপটিভ ব্যবহার করো না কেন ?

শুনে বড় রেগে গিয়েছিল শিশির, বলল—কেন, আমি কি নষ্ট মেয়েমানুষের কাছে যাচ্ছি নাকি যে ওসব ব্যবহার করব ?

এই হচ্ছে শিশির। আধুনিক জগতের কোনো খোঁজই সে রাখে না, তার ধারণা চাঁদে মানুষ যাওয়ার ঘটনাটা স্রেফ কারসাজি আর পাবলিসিটি। আজও সে বিশ্বাস করে না যে চাঁদে মানুষ গেছে। কথা উঠলেই বিজ্ঞের মতো একটা 'হুঁ' দিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দেবাশিসকে সে একেবারেই সহ্য করতে পারে না। দেবাশিসের অর্থকরী সাফল্যকে সে হয়তো ঈর্ষা করে, কিংবা তার আধুনিক ফ্যাশানদুরস্ত হাবভাব, চালাক চতুর কথাবার্তা অপছন্দ করে।

দেবাশিস ঘরদালানের চেয়ারে বসল একটু। ভিতরের ঘরে রবিকে ঘিরে ধরে পিসতুতো ভাইবোন হল্লা করছে। মুর্গ মুসল্লমের প্যাকেট হটবক্স বের করা হয়েছে বোধ হয়। তাই দেখে চেঁচাচ্ছে ফুলির আনন্দিত ছেলেমেয়েরা। বাথরুমের দিক থেকে গামছা-পরা শিশির বের হয়ে এল। দেবাশিসকে দেখে একটু হাসল। বলল—কী খবর ? হাসিটা তেমন খুলল না।

—এই তো, চলে যাচ্ছে।

—রবিকে এনেছেন ?

—হ্যাঁ, আওয়াজ পাচ্ছো না ?

শিশির এবার সত্যিকারের হাসি হাসল। দেবাশিসকে যতই অপছন্দ করুক শিশির, রবির প্রতি তারও ভয়ঙ্কর টান আছে। রবি এলে সে রসগোল্লা কিনে আনে, টফি আনে, খেলনা। ডাকে রবিরাজ বলে।

ফুলি এক কাপ চা হাতে এল। শিশিরকে দেখে ঘোমটা দিল মাথায়। ওর চালচলনে এখনই কেমন গিন্নি-বান্নির ঠাট ঠমক পাকা হয়ে গেছে। একগাল পান মুখে।

চা-টা একটা ছোট্ট টুলে দেবাশিসের সামনে রেখে হাঁসফাঁস করতে করতে বলে—সুজি করেছি, খাবে ?

—না।

পানের পিক ফেলতে বাথরুমে মুখ বাড়িয়ে আবার ফিরে এল ফুলি। চাঁপার দিকে চেয়ে বলল—তুই দিনমান থাকবি তো চাঁপা, না কি দাদার সঙ্গে চলে যাবি ? আমি একাহাতে আজকের দিনটা সামলাতে পারি না। ক্ষুদে ডাকাতরা সারা বাড়ি তছনছ করে, তার ওপর আজ আবার ওদের বাপ শনিঠাকুরটি বাড়িতে আছেন। আমি বলি বরং তুই থেকে যা।

চাঁপা ঘাড় নাড়ল ! বলে—সোনাবাবুর কাছছাড়া হতে ভাল লাগে না।

মুখটা খুশীতে ভরে ওঠে ফুলির, বলে—আহা রোগা হয়ে গেছে।

দেবাশিস ভদ্রতাবশত চায়ে চুমুক দেয় ! আসলে ফুলির বাসার চা সে খেতে পারে না। চায়ের সুঘ্রাণ নেই, আছে কেবল লিকার আর গুচ্ছের দুধ-চিনি। দুধ বেশি পড়ে গেছে ফলে চা সাদা দেখাচ্ছে। ছেলেবেলায় বেশি দুধের চাকে তারা বলত সাহেব চা। সাহেবদের রং ফর্সা বলেই বোধ হয় উপমাটা দিয়ে থাকবে।

boiRboi.net

—ফুলি, এ যে সাহেব চা! দেবাশিস বলে।

ফুলি প্রথমটায় বুঝতে পারে না। তারপর বুঝে লজ্জা পেয়ে বলে—তোমার তো, আবার সব সাহেবী ব্যাপার—পাতলা লিকার অল্প দুধ-চিনি ওসব কি আর মনে থাকে! আমাদের বাঙালী বাড়িতে যেমনটি হয় তেমনটি করে দিয়েছি। আবার করে দিই।

—থাকগে। খারাপ লাগছে না। দেবাশিস বলে।

ফুলি সামনে মোড়া পেতে বসল। গায়ে মোটা মোটা গয়না, আঁচলে চাবি সব মিলিয়ে ওর নড়াচড়ায় এক ঝনৎকার শব্দ হয়। জোরে শ্বাস ফেলে, শ্বাসের সঙ্গে একটা শারীরিক কষ্টে ওঃ বা আঃ শব্দ করে। সম্ভবত কোনো মেয়েলী রোগ আছে। শরীরের নানা আধি-ব্যাধির কথা বলে। কিন্তু বসে শুয়ে থাকে না কখনো। সারাদিন কাজকর্ম করছে স্টীম-রোলারের মতো।

বসে ফুলি বলল—দাদা, এবার রবির ব্যাপারে একটা কিছু ঠিক করো।

—কী ঠিক করব?

—ওকে আর তোমার ফাঁকা ভুতুড়ে ফ্ল্যাটে রেখে লাভ কী? সারাদিন ওর মনের মধ্যে নানা ভয়-ভীতি খোঁড়ে। দেখছো না, কেমন রোগা হয়ে যাচ্ছে! খাওয়ায় অরুচি, সারাদিন নাকি মুখ গোমড়া করে থাকে। সঙ্গী-সাথীও নেই।

—সব সয়ে যাবে।

—সইছে কোথায়! প্রায় সময়েই আমার কাছে এসে মায়ের কথা বলে। দুপুরে ঘুম পাড়িয়ে রাখি, ঘুমের মধ্যে দেখি খুব চমকে চমকে ওঠে। এ সব ভাল লক্ষণ নয়। মুখে কিছু বলে না, লজ্জায়। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কাঁদে।

দেবাশিস একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। চায়ের কাপটা রেখে দিয়ে বলল—আমি তো ও যা চায় দিই।

—আহা! বাচ্চাদের কাছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে মা আর সঙ্গী। তা ও পায় কোথায়! আমি বলি, আমার কাছে থাক। মণিমা-মণিমা করে কেমন অস্থির হয় দেখনি?

দেবাশিস একটু হেসে বলে—তোরই তো অনেক ক'জন, তার ওপর আবার রবি এসে জুটলে—

ফুলি ধমকে ওঠে—ও সব অলক্ষুনে কথা বলো না! ছেলেমেয়ে আবার বেশি হয় নাকি?

দেবাশিস হাসে, বলে—তোর তা'হলে এখনো ছেলেমেয়ের সাধ মেটেনি?

ফুলি কড়া গলায় বলে—না। মিটবেও না। আমি বাপু ছেলেপুলে কখনো বাড়তি দেখি না। যত হবে তত চাইব। মা হয়েছি কিসের জন্য?

যদিও এটা কোনো যুক্তি নয়, তবু এর প্রতিবাদও হয় না। কারণ এ যুক্তির চেয়ে অনেক জোরালো জিনিস। এ হচ্ছে বিশ্বাস। শিশিরের সঙ্গে থেকেই বোধ হয় এইসব গ্রাম্যতা ওর মনে পাকাপোক্ত হয়ে গিয়ে থাকবে। বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তির লড়াই বোকামি তাই দেবাশিস একটু চুপ করে থাকে। একটা সিগারেট ধরায়। বলে—দেখি।

—দেখবে আবার কী! রবিকে আমার কাছে দিয়ে দাও। তোমার পায়ে পড়ি।

boiRboi.net

—ওখান থেকে ওর ইস্কুলটা কাছে হয়, তাছাড়া একভাবে থেকে থেকে সেট হয়ে গেছে, এখন তোর এখানে এসে থাকলে দেখবি ওর মন বসছে না।

—কী কথা! এ বাড়ীতে এলে ও কখনো যেতে চায় দেখেছো?

—সে এক-দু'দিনের জন্য, পাকাপাকিভাবে থাকতে হলেই গোলমাল করবে।

—সে আমি বুঝব! তুমি বাপু ছেলেকে সাহেব করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছো। আজকাল আমার সঙ্গেও ইংরিজি বলে ফেলে, কথায় কথায় 'সরি' আর 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে।

শিশির গামছা ছেড়ে লুঙ্গি পরেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল—আসলে গরীবের বাড়ীতে রাখতে দাদার ভয়। এখানে সব খারাপ সহবৎ শিখবে। খানা-পিনাও তেমন সায়েন্টিফিক হবে না।

দেবাশিস মনের মধ্যে এসব কথাই ভাবে। এখানে দংগলের মধ্যে পড়ে রবি তার আচার আচরণ ভুলে যাবে, স্মার্টনেস হারাবে। চীৎকার করতে শিখবে, খারাপ কথা বলতে শিখবে। এবং হয়তো বা দেবাশিসকে একটু একটু করে বিস্মৃত হবে।

দেবাশিস মৃদু গলায় বলে—না, সে সব নয়। আসলে ও আছে বলেই ফ্ল্যাটটায় ফিরতে ইচ্ছে করে।

ফুলি বলে—তুমি আর কতক্ষণের জন্যই বা ফেরো। রাতটুকু কেটে গেলেই তো আবার টো-টো কোম্পানি। ও যে একা সেই একা।

দেবাশিস একটা শ্বাস ফেলে বলে—ভেবে দেখি।

—দাদা, আমি রবিকে বুক দিয়ে আগলে রাখব। একটুও চিন্তা কোরো না।

—সে আমি জানি। তবু একটু ভেবে দেখতে দে।

—ভাবতে ভাবতেই ওকে শেষ করে ফেলো না। এখানে থাকলে ও সব ভুলে থাকতে পারবে। ফাঁকা ঘরে থাকে বলেই ওর সব মনে পড়ে। আমার কাছে কত কথা এসে বলে!

দেবাশিস ফুলির দিকে একটু অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে দেখছিল। ছেলেপুলের কী অপরিসীম সাধ ওর। গর্ভযন্ত্রণার কথা ভাবে না, ঝামেলার কথা ভাবে না! দুবার ওর পেটের ছেলে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলে আজও দুঃখ করে। এই অভাব, দারিদ্র্য দুঃসময়—এগুলো ওর কাছে ব্যর্থ হয়ে গেছে। দুটি বা তিনটি সন্তানের সরকারী বিজ্ঞপ্তি ও কখনো বোধহয় চোখ তুলে দেখে না। শুনলে বলে—ওসব শোনাও পাপ।

দেবাশিস একটু হেসে বলে—পারিসও তুই।

ভিখিরির মতো ফুলি বলে—রবিকে দেবে দাদা?

দেবাশিস মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে—আজ উঠি রে।

সে উঠে দাঁড়ায়। চাঁপা দৌড়ে গিয়ে রবিকে বলে—সোনাবাবু এসো! বাবা চলে যাচ্ছে। দেখা করে যাও।

কিন্তু রবি সহজে আসে না। দেবাশিস সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। চাঁপা রবিকে হাত ধরে নিয়ে আসে। দেবাশিস দেখতে পায়, ইতিমধ্যেই রবির চুল ঝাঁকরা হয়ে গেছে। ব্যানলনের গেঞ্জি বুক পর্যন্ত গুটিয়ে তোলা। মুখে চোখে

boiRboi.net

একটা আনন্দের বিভ্রান্তি। দেবাশিসের দিকে চেয়েই রবি দূর থেকেই চেঁচিয়ে বলল—বাবা তুমি যাও।

দেবাশিস ক্লিষ্ট একটু হাসে। বলে—আচ্ছা।

ফুলি সিঁড়ি পর্যন্ত আসে। কয়েক ধাপ নামে দেবাশিসের সঙ্গে। গলা নীচু করে বলে—শোনো দাদা।

দেবাশিস অন্যমনস্ক ভাবে বলে—উঁ।

—রবি তোমার কাছে থাকলে ক্ষতি হবে। ও বড় দুঃখী ছেলে। তুমি কেন বুঝতে পারছো না?

দেবাশিস হাসল। মড়ার মুখের মতো হাসি। তারপর ফুলিকে পিছন ফেলে নেমে এল রাস্তায়।

গাড়ীর দরজা খুলতে খুলতে একটা কণ্ঠস্বর শুনে হঠাৎ ওপরে তাকাল। চমকে উঠল ভীষণ। দোতলার রেলিঙের ওপর দিয়ে আধখানা মুখ বাড়িয়ে ঝুঁকে আছে রবি। আশেপাশে পিসতুতো ভাইবোনেরা। খুব উত্তেজিতভাবে কী যেন দেখছে দূরে। হাত তুলে আঙুল দিয়ে পরস্পরকে দেখাচ্ছে। হয়তো কাটা ঘুড়ি। কিংবা হেলিকপ্টার।

দেবাশিসের বুকের ভিতরটায় প্রবল একটা ঝাঁকুনি লাগে। গাড়ি হঠাৎ ব্রেক কষলে যেমন হয়।

—রবি! বলে একটা চীৎকার দেয় সে।

মস্ত ভুল হয়ে গেল চীৎকারটা দিয়ে। এমন অবস্থায় কাউকে ডাকতে নেই। রবির মা সাততলা ফ্ল্যাট থেকে লাফিয়ে পড়ে মারা যায়।

শরীরের আধখানা বাইরে ঝুলন্ত অবস্থায় রবি ডাকটা শুনতে পেয়ে চমকে উঠল। দুলে উঠল শিশু-শরীর। শূন্যে হাত বাড়িয়ে একটা অবলম্বনের জন্য অসহায়-ভাবে হাত মুঠো করল। টালমাটাল ভয়ঙ্কর কয়েকটি মুহূর্তের সন্ধিসময়। দেবাশিসের প্রায় সজ্ঞাহীন শরীরটা টাল খেয়ে গাড়ির গায়ে ধাক্কা খায়। চোখ বুজে ফেলে সে। দাঁতে দাঁত চাপে।

রবি সামলে গেল। ওর ভাইবোনেরা ওকে ধরেছে। টেনে নামিয়ে নিচ্ছে রেলিং থেকে! ফুলি এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে।

দেবাশিস অবিশ্বাসভরে চেয়ে থাকে। রবি রেলিঙের ফাঁক দিয়ে বাবার দিকে চেয়ে হাসে। তারপর হঠাৎ প্যান্টের পকেট থেকে রিভলভার বের করে আনে। বাপের দিকে তাক করে গুলি ছুঁড়তে থাকে—ঠিসুং...ঠিসুং...

দেবাশিস একবার ভাবল ফিরে যাবে ফুলির বাসায়। তারপর ভাবল—থাক। ওরও তো ছেলেমেয়ে আছে। কেউ তো পড়ে মরেনি কখনো!

রবির দিকে চেয়ে দেবাশিস একটু হাসে। তার বুকে কোথায় যেন রবির খেলনা রিভলভারের মিথ্যে গুলি এসে লাগে। সে গাড়ির খোলা দরজা দিয়ে কোনোক্রমে হুইলের পিছনে বসে পড়ে। তারপর গভীরভাবে কয়েকটা শ্বাস নেয়।

গাড়ী ছাড়ে। কিন্তু উইণ্ডস্ক্রীন জুড়ে কেবলই দোতলার রেলিং থেকে ঝুঁকে-থাকা রবির চেহারাটাকে দেখতে পায়। চমকে চমকে ওঠে। দাঁতে দাঁত চাপে।

boiRboi.net

হুইলে তার মুঠো করা হাত প্রবল চাপে সাদা হয়ে যায়। পদে পদে ভুলভাবে গাড়ি চালাতে থাকে সে।···রবির মা চন্দনা লাফিয়ে পড়েছিল সাততলা থেকে, কথাটা ভুলতে পারে না।

রবিও কি কিছু ভোলেনি? সব মনে রেখেছে।

তৃণার সঙ্গে দেখা হবে। ফাঁড়ির কাছের বাসস্টপে। দেবাশিস খুব সাবধানে গাড়ি চালাতে থাকে।

ছয়

দুপুরের ফাঁকা রাস্তায় তৃণা একটু বেশী তাড়াতাড়ি হাঁটছিল। পিছনে কে যেন আসছে! ফিরে দেখল। কেউ না! কিন্তু বারবার মনে হচ্ছে, পিছনে কে আসছে। কে যেন চুপিচুপি আসছে। কার চোখ তীব্র ভাবে, গোয়েন্দার মতো নজর করছে তাকে। কেউ নয়। তবু তৃণা প্রাণপণে হাঁটে। বড় রাস্তায় তুখোর রোদ। দোকান বাজার বন্ধ। রাস্তা ফাঁকা ফাঁকা, তৃণা কি আজ খুন হবে? গোপন থেকে কোন আততায়ী কেবলই আসে তৃণার দিকে?

তৃণা চারধারে তাকায়। কেউ নয়। উল্টোবাগে চলে এসেছে অনেকখানি। বাসস্টপটা এখনো বেশ দূরে। তৃণা বেশী হাঁটতে পারে না। হাঁটা জিনিষটা বড্ড ক্লান্তিকর। রিক্সাতেও সে কখনো ওঠে না। বড্ড মায়া হয়। দুপুরের পীচ-গলা রাস্তায়, এই চাবুক রোদে রোগা মানুষগুলো রিক্সা টানে, তাতে সওয়ার হতে একদম ভাল লাগে না তার।

ল্যান্সডাউনের মোড়ে পেট্রল-পাম্পের কাছ ঘেঁসে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। ট্যাক্সি-ওলা হাঁটু তুলে বসে ছোট্ট একটা বই পড়ছে। সম্ভবতঃ রেসের বই, কিংবা গীতাও হতে পারে। একা ট্যাক্সিতে তৃণা ওঠে না। ভয় করে। কিন্তু শরীরটা কেমন যেন কাঁপছে। ভয় করছে। উৎকণ্ঠা।

সাহস করে দু'পা এগোলো তৃণা।

—ভাই, ট্যাক্সি কি যাবে?

—যাবে। ট্যাক্সিওলা গম্ভীরভাবে বলে।

ট্যাক্সিটা দক্ষিণদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। তৃণা উঠতেই ট্যাক্সিটা ঐ দিকেই চলতে থাকে, তৃণা কিছু বলেনি। তখন সে সুস্পষ্ট এবং পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল, রেবার ঘরে সে বসে আছে, আর রেবা, হৃদয়হীনা রেবা, তার দিকে স্বচ্ছ শীতল চোখে তাকিয়ে আছে, পরমুহূর্তেই সে তার ছেলেকে দেখতে পায়। মোটাসোটা স্বাস্থ্যবান মনু তাকে কোলে করে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে। কি সুন্দর মনুর গায়ের গন্ধটুকু। আবার দেখে শচীন পিংপং টেবিলের ওপাশে বসে আছে, বলছে—তোমাকে আজকাল আমি লক্ষ্য করি না···

ভ্রূ কোঁচকায় তৃণা। তার সংসারে সে আজকাল আর নেই। কেউ তাকে লক্ষ্য করে না। এ কেমন? সে ও-বাড়ির কারো মা, কারো গৃহকর্ত্রী। তার অতবড়

পতন, ঐ কলঙ্ক, পরকীয়া ভালবাসা, এসব ওদের একেবারেই কেন উত্তেজিত ও দুঃখিত করে না? কেন ওদের শান্তি ও স্বাভাবিকতা অক্ষুণ্ণ আছে? এ কি শচীনের ষড়যন্ত্র। শচীন কি ওদের শিখিয়ে রেখেছে—ওর দিকে তাকিও না, কথা বোলো না, ওকে উপেক্ষা কর। এর চেয়ে বড় শাস্তি আর নেই!

ট্যাক্সিওলা আয়না দিয়ে তাকে দেখছিল। ছোটো আয়না, তাতে শুধু মধ্যবয়স্ক ও জোয়ান চেহারার ট্যাক্সিওলার ক্রূর চোখদুটো দেখা যায়। ফট্ করে চোখ পড়তেই চমকে উঠলো তৃণা। আতঙ্কিত একটা শব্দ উঠে এসেছিল গলায়। অস্ফুট শব্দটা মুখে হাতচাপা দিয়ে আটকালো। বলল—থামুন।

—এইখানে নামবেন? বলে ট্যাক্সিওলা গাড়ি আস্তে করল।

—এইখানেই। বলে তৃণা অবাক হয়ে দেখে, সে দেশপ্রিয় পার্কের কাছে এসেছে, এদিকে তার আসার কথা নয়। সে যাবে বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে বাসস্টপে। বার বার সে কেন তবে সে-জায়গা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে অন্যমনস্কতায়, বিভ্রমে? তৃণা আস্তে করে বলল—এটা কোন জায়গা। দেশপ্রিয় পার্ক?

—হ্যাঁ, এখানেই নামবেন? বলে মধ্যবয়স্ক জোয়ান লোকটা তার দিকে পরিপূর্ণ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। লোকটার মুখে ঘাম, অশিক্ষার ছাপ! বন্যজন্তুর মতো একটা কামস্পৃহা লক্ষ্য করে তৃণা। বুকটা একটু কেঁপে ওঠে। গাড়ীর দরজার হাতলটা কিছুতেই খুলতে পারছিল না তৃণা। খুব তাড়াহুড়ো করছিল। একবার মনে হল, লোকটা কোন কৌশলে দরজাটা আটকে দেয়নি তো! যাতে তৃণা খুলতে না পারে। লোকটাই হঠাৎ তার প্রকাণ্ড ঘেমো হাতটা বাড়িয়ে তৃণার হাতটা ঠেলে লকটা খুলে দিল।

তৃণা নেমে যাচ্ছিল! খুব তাড়া। লোকটা পিছন থেকে খুব একটা ব্যঙ্গের গলায় বলল—ভাড়াটা কে দেবে?

তাড়াতাড়িতে আর ভয়ে কত ভুল হয়। তৃণা ব্যাগ খুলে ভাড়া দিয়ে দিল! লজ্জায় কান-মুখ ঝাঁ ঝাঁ করছে।

ট্যাক্সিওলার চোখের সামনে থেকে তাড়াতাড়ি পালানোর জন্যই তৃণা এলোপাথারি খানিক হাঁটল উদ্‌ভ্রান্তের মতো, চলে এল, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ পর্যন্ত। কিছুতেই তার মনে পড়ছিল না এখান থেকে কোন রুটের বাস ফাঁড়ি পর্যন্ত যায়! মনটা বড় অশান্ত, বুকের মধ্যে কেবলই একটা পাখা ঝাপটানোর শব্দ, কাকাতুয়াটা ডাকছে… তৃণা…তৃণা…তৃণা

আজ দুপুরের কলকাতাকে নিঝুমপুরে নাম দেওয়া যায়। কেউ কোথাও নেই। ফাঁকা হু হু, মন কেমন করা রাস্তা, রোদ গড়াচ্ছে, তৃণা ফাঁড়ির কাছে বাসস্টপে যাবে, কিন্তু সে বড় অনেক দূরে রাস্তা বলে মনে হয়। সে বড় অফুরান পথ। কোনোদিনই বুঝি পাওয়া যাবে না। বেলা একটা বেজে গেছে। তৃণার গায়ের চ্যানেল নাম্বার সিক্সের গন্ধটা অল্প অল্প করে উবে যাচ্ছে হাওয়ায়, বাতাসে চুল এলোমেলো।

রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে একটু ভাবল তৃণা। কি করে যাবে! সেই বারোটায় যাওয়ার কথা ছিল। দাঁড়িয়ে ভাবতে ভাবতেই আবার অস্বস্তি বোধ করে পিছু ফিরে চাইল তৃণা। কে তার পিছনে আসছে? কে

boiRboi.net

তাকে লক্ষ্য করছে নিবিষ্টভাবে ?

আতঙ্কিত তৃণা হঠাৎ দেখল, একটা বিয়াল্লিশ নম্বর বাস মোড় নিচ্ছে। মনে পড়ল, এই বাসটা ফাঁড়ি হয়ে যায়। চলন্ত বাসটার সামনে দিয়ে হরিণ-দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে গেল তৃণা। বিপন্নার মতো চীৎকার করে বলল—বেঁধে ভাই, বেঁধে……

প্রাইভেট বাস, যেখানে সেখানে থামে। এটাও থামল। তৃণা ভর্তি বাসটায় একটু কষ্ট করে উঠে পড়ে।

দেবাশিস যে উন্নতি করেছে তা এমনি নয়। কতগুলো অদ্ভুত গুণ আছে তার। একটা হল ধৈর্য। তৃণা বাস থেকে নামতে নামতেই দেখল, বাসস্টপে দেবাশিসের গাড়ি থেমে আছে। আর সামনের জানালা দিয়ে অবিরল সিগারেটের ধোঁয়া বেরিয়ে যাচ্ছে।

ক্লান্ত তৃণা হাতের তেলোয় চেপে চুল ঠিক করতে করতে এগিয়ে গেল। খুব ফ্যাকাসে একটু হাসল।

দেবাশিস কিন্তু গম্ভীর। দরজাটা খুলে দিয়ে বলল—উঠে পড়ো।

তৃণা ঝুপ করে সীটে বসে বলল—অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছো। আজ আমার বড় দেরী হয়ে গেল।

দেবাশিস মাথা নেড়ে বলল—ঠিক উল্টো।

—মানে ?

—দেরীটা আমারই হয়েছে। তুমি আসার দুমিনিট আগে আমি এলাম। মনে মনে ভেবে রেখেছিলাম, তুমি এসে ফিরে গেছ। আমিও চলে যাবো যাবো করছিলাম, হঠাৎ দেখি তুমি বাস থেকে নামলে। তোমার দেরী হল কেন ?

তৃণা একটু শ্বাস ফেলে চোখ বুজে বলে—ঠিক বেরোবার মুখেই কতগুলো ইনসিডেন্ট হয়ে গেল। রবির ঘরে গিয়েছিলাম, ও ছিল না। হঠাৎ এসে বিশ্রী ব্যবহার করল। আর শচীনবাবুর সঙ্গেও একটু কথা কাটাকাটি, সেই থেকে মনটা এমন বিচ্ছিরি, আর অন্যমনস্ক, রাস্তা ভুল করে অনেকদূর চলে গিয়েছিলাম। তোমার দেরী হল কেন ?

দেবাশিস গাড়ি চালাতে চালাতে বলল—তোমার সঙ্গে মিল আছে। ফুলির বাসায় রবিকে পৌঁছে দিয়ে বেরোবার সময়ে দেখি দোতলার রেলিং ধরে রবি…উঃ ! মনশ্চক্ষে দৃশ্যটা দেখে একবার শিউরে ওঠে দেবাশিস। তারপর আস্তে করে বলে, রবিকে ফুলি কেড়ে রাখতে চাইছে। রবিও আর আমার সঙ্গ তেমন পছন্দ করে না !

তৃণা চুপ করে থাকে। একটা গভীর শ্বাস চাপতে গিয়ে বুকের ভিতরটা কুয়োর মতো গভীর গর্ত হয়ে যায়। অনেকক্ষণ বাদে সে বলল—কি ঠিক করলে, রবিকে ওখানেই রাখবে ?

—রাখতে চাইনি। তবু রয়েই গেল বোধ হয়। ওকে রেখে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে ভীষণ অন্যমনস্ক ছিলাম। দুটো ট্র্যাফিক সিগন্যাল ভায়োলেট করেছি, পুলিশ নাম্বার নিয়েছে। পার্ক সার্কাসে একটা বুড়ো লোককে ধাক্কাও দিয়েছি, তবে সে মরেনি। কিছুক্ষণ ঐরকম র‍্যাশ ড্রাইভ করে দেখলাম, আর গাড়ি চালানো উচিত হবে না। আস্তে আস্তে গাড়িটা নিয়ে অফিসে গেলাম। বন্ধ অফিস খুলে অনেকক্ষণ

ফাঁকা ঘরে বসে রইলাম। ঠিক নরমাল ছিলাম না! সময়ের জ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছিল। রবি কেন আমাকে আর তেমন পছন্দ করছে না বলো তো! আমি তো ওকে সব দিই। তবু কেন? বুঝলে তৃণা, আজ ফাঁকা অফিস ঘরে বসে আমার মতো কেজো মানুষেরও চোখে জল এল।

—আস্তে চালাও, তুমি বড় অন্যমনস্ক। গাড়ি টাল খাচ্ছে।

দেবাশিস সামলে গেল। গাড়ি চালাতে চালাতে বলে—অফিসে বসেই একটা ডিসিসন নিলাম। তারপর একটা ট্যাক্সি ডেকে চলে গেলাম ফুলির বাড়িতে। তখন গাড়ি চালানোর মতো মনের অবস্থা নয়। গিয়ে বললাম—ফুলি, আজ থেকেই রবি তোর কাছে থাকল। ফুলির সে কি আনন্দ! ঐ মোটা শরীর নিয়েও লাফ ঝাঁপ দৌড়োদৌড়ি লাগিয়ে দিল। রবি ঘুমোচ্ছিল, আমি আর ওকে ডাকিনি। ঘুমন্ত কপালে একটা চুমু রেখে চলে এসেছি! ছেলেটা বুঝি পর হয়ে গেল। যাকগে।

তৃণা কাঁদছিল। নীরবে একটু ফোঁপানির শব্দ হচ্ছিল কেবল। দেবাশিস হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁয়ে বলল—কেঁদো না। সব কিছু কি একসঙ্গে পাওয়া যায়?

তৃণা মুখ না তুলে কান্নায় যতিচিহ্ন দিয়ে দিয়ে বলে—আমিও চলে এসেছি। চিরকালের মতো, আর ফিরব না।

দেবাশিস একটু গম্ভীর হল। শান্ত গলায় বলে—ভালই করেছো। শচীন কিছু বলল না?

—অনেক কথা বলল। তত্ত্বকথা। আমাকে সাহসের সঙ্গে তোমার কাছে চলে আসতে উপদেশ দিল।

দেবাশিস একটু ভ্রু কুঁচকে বিষয়টা ভেবে দেখে। তারপর বলে—শচীন ভেবেছে ও আমাকে চান্স দিচ্ছে। আই অ্যাম রেডি ফর দি ক্যাচ তৃণা। শচীন ইজ আউট।

তৃণা ঝুঁকে বসে কাঁদতে লাগল।

দেবাশিস কাঁদতে দিল তৃণাকে। একবার কেবল বলল—তোমার খিদে পায়নি তৃণা? আমার কিন্তু পেয়েছে।

তৃণা সে কথার উত্তর দিল না। কেবল নেতিবাচক মাথা নাড়ল।

কান্নাটা বড়ই বিরক্তিকর। একটা মেয়ে সামনের সীটে উপুর হয়ে বসে কাঁদছে—এ একটা সীন। গাড়ির কাঁচ দিয়ে বাইরে থেকেই দেখা যায়। অনেকে দেখছেও। দেবাশিস একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। বাড়িতে আজ রান্না হয়নি। ইচ্ছে ছিল রেস্টুরেন্টে খেয়ে নেবে। কিন্তু তৃণার এই বেসামাল অবস্থায় রেস্টুরেন্টে যাওয়া সম্ভব নয়। বাড়িতেই যেতে হয়। আজ সকাল পর্যন্ত কী তীব্র পিপাসা ছিল তৃণার জন্য। এখনো কি নেই? কিন্তু কেবলই রবির কথা মনে পড়ছে, রবিকে ফুলির কাছে রেখে এল দেবাশিস। বদলে কি তৃণাকে পেল চিরকালের মতো? দুজনকে দুদিকের পাল্লায় বসিয়ে দেখবে নাকি কোনদিকটা ভারী?

কিছুতেই কিন্তু ভাবা যাচ্ছে না যে তৃণা চলে এসেছে চিরকালের মতো। হাতের নাগালে বসে আছে। একই ফ্ল্যাটে এরপর থেকে তারা থাকবে। দেবাশিস ভেবেছিল, এ এক অসম্ভব প্রেম। দুটো নৌকা, স্রোত আরো কি কি যেন।

তৃণা বাথরুমে স্নান করছে। দেবাশিস বাইরের ঘরে বসে অপেক্ষা করে। বিকেল চারটে বাজে মোটে। প্রীতম একবার চা দিয়ে গেছে। তারপর দোকানে গেছে খাবার আনতে। তৃণা এলে তারা খাবে।

দেবাশিস সিগারেট ধরিয়ে তার ফ্ল্যাটের বিশাল জানালার ধারে এসে দাঁড়ায়। বহু নীচে ফুটপাথ। এই সেই খুনী জানালা। অত নীচে কী করে, কোন সাহসে লাফিয়ে পড়েছিল চন্দনা? হাত পা হঠাৎ নিসপিসিয়ে ওঠে তার।

ভাল করে পর্দা সরিয়ে পাল্লা খুলে ঝুঁকে দেখল দেবাশিস। ঝিম ঝিম করে ওঠে মাথা। অবলম্বনহীন শূন্যতা তাকে দুহাত বাড়িয়ে আকর্ষণ করে, এসো এসো। সাততলার ওপর সারাদিন, সব ঋতুতেই প্রচণ্ড হাওয়া খেলা করে, কী বাতাস। মার মার করে ছুটে আসছে ঠাণ্ডা, বুক জড়ানো বাতাস। তবু অত হাওয়াতেও দেবাশিসের মুখে ঘাম ফুটে ওঠে। কত নীচে ফুটপাথ! কী তীব্র আকর্ষণ অধঃপাতের! সব-সময়েই, অবিরল পৃথিবী তার বুকের কাছে সবাইকে টানছে। যখন জানালার চৌ-কাঠের অবলম্বন জীবনে শেষবারের মত ছেড়ে দিয়েছিল চন্দনা, ফুটপাথ স্পর্শ করবার আগে এই যে অবলম্বনহীন দীর্ঘ শূন্যতা বেয়ে নেমে গিয়েছিল তার শরীর, এই শূন্যতাটুকু কিভাবে অতিক্রম করেছিল ও? বাঁচতে ইচ্ছে করেনি ফের? পোকার মত মানুষ হাঁটছে, গাড়ি যাচ্ছে, একটা দুটো গাছ, কালো মিশমিশে রাস্তা। কী ভয়ঙ্কর! মুখের সিগারেটটা বাতাসে পুড়ে গেল দ্রুত। শেষ অংশটা ছুঁড়ে দিল দেবাশিস। বাতাসে খানিকটা ভেসে গেল, তারপর অনেক অনেকক্ষণ ধরে পড়তে লাগল নীচে···
···নীচে···নীচে।

বাথরুমের দরজা খোলার শব্দ। তৃণা বেরিয়ে এল।

দেবাশিস শরীরটা তুলে আনল ভিতরে। বাতাস লেগে চোখে জল এসে গেছে।

তৃণার কান্না আর বিষণ্ণতা স্নানের পর ধুয়ে গেছে। কিছুটা গম্ভীর দেখাচ্ছে তাকে। শোওয়ার ঘরে দুটো একা খাট, বিছানা পাতা। তার পাশে একটা পর্দা ঘেরা সাজবার ঘর। জানালার পাশেই লম্বা আয়না লাগানো সাজবার টেবিল। তৃণা সেখানে গিয়ে বসল। চন্দনা এখানে বসে সাজত।

তৃণা নিজেকে আয়নায় দেখল। কিন্তু তেমন দেখবার নেই। একটু সামান্য সাজগোজ করল। চুলটা ফেরাল। কোনদিনই সে খুব একটা সাজে না।

আয়নায় দেবাশিসের ছায়া পড়ল। পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে একটু হাসি। চুলগুলো খুব এলোমেলো।

বলল—কেমন লাগছে তৃণা?

তৃণা বিষণ্ণ হেসে বলল—ভালই।

—আজ থেকে···বলে চুপ করে দেবাশিস। কী বলবে?

তৃণা কথাটা পূরণ করে নিল মনে মনে। লজ্জায় মাথা নোয়াল। বলল—তুমি যাও দেব। স্নান করে ফিরে এসো।

দেবাশিস আঙুলে ধরা সিগারেটটা তুলে দেখাল, বলল—যাচ্ছি। সিগারেটটা শেষ করে নিই।

—অন্ততঃ ও ঘরে যাও। পুরুষের সামনে আমি সাজতে পারি না।

boiRboi.net

—ও। বলে দেবাশিস পর্দার ওপারে গেল। ওখান থেকেই বলল—শোনো তৃণা, তোমার যা যা দরকার প্রীতমকে দিয়ে আনিয়ে নাও। আজ রোববার, দোকান অবশ্য সবই বন্ধ।

—কী আনাবো ? আমার কিছু দরকার নেই।

—এক কাপড়ে তো বেরিয়ে এসেছো।

—চন্দনার শাড়ি টাড়ি কিছু নেই ?

—না। সব বিলিয়ে দিয়েছি।

—কেন দিলে ?

—রবির জন্য। ওসব থাকলেই তো ওর মায়ের কথা মনে পড়ত।

তৃণা বেশ ছিল এতক্ষণ। হঠাৎ একথায় বুকে একটা ধাক্কা খেল। তবু হেসে বলে—তবু কি মনে পড়ে না ?

—পড়ে। সেটা চেপে রাখে। আমার ফ্ল্যাটটা কিন্তু আমি সাজাইনি, চন্দনা সাজিয়েছিল। সেইভাবেই সব আছে। এক একবার ভাবতাম সাজানোর প্যাটার্ন পাল্টে দিই। কিন্তু সময় পাইনি, এত কাজ। সেই সাজানো ঘরে চন্দনার কথা ওর মনে তো পড়বেই। এবার তুমি সাজাও।

—দূর বোকা। মনে পড়া কি ওভাবে হয় ! তুমি জানো না।

দেবাশিস একটা শ্বাস ফেলে বলল—আর রবির জন্যে আমার ভাবনা নেই। ফুলির বাড়ির দঙ্গলে মিশে গেলে আর কিছু ওর মনে থাকবে না।

—সিগারেটটা শেষ হয়েছে ?

—হয়েছে।

—এবার যাও। আমার এখন খুব খিদে পাচ্ছে।

—তোমার কি কি দরকার বললে না ?

—অনেক কিছুই দরকার। কিছু তো আনিনি। সে পরে হলেও চলবে।

—লজ্জা কোরো না। এ তো আর পরের বাড়ি নয়। তোমার নিজের।

তৃণা একটু শ্বাস ফেলে বলল—তাই বুঝি ?

—নয় ?

তৃণা একটু হেসে বলে—এত সহজে কি নিজের হয় ? অনেক সময় লাগবে। আমাকে একটু সময় দিও, তাড়া দিও না।

দেবাশিস একটু উষ্মাভরে পর্দার ওপাশ থেকে বলে—কেন ? সময় লাগবে কেন ?

—লাগবে না ! গাছ উপড়ে দেখো তার শিকড়ের সবটা কি একবারে উঠে আসে ? কতো শিকড়বাকড়ের ছেঁড়া সুতো কিছু কিছু মাটির মধ্যে থেকে যায়।

—তৃণা।

—উ !

—গাছ তো একটানে ওপড়ানো হয়নি। দীর্ঘকাল ধরে তার শিকড়ের মাটি ক্ষয় হয়ে ছিল না কি !

—আবার বলছি, তুমি বোকা।

boiRboi.net

—কেন ?

—উপমা দিয়ে কি সব বোঝানো যায় ? গাছের সঙ্গে মানুষের কিছু তফাৎ আছেই।

পর্দা সরিয়ে উত্তেজিত দেবাশিস এ ঘরে চলে এল হঠাৎ। মেঝেতে তৃণার কাছে বসে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে বলল—তৃণা, আমি বড় কাঙাল।

—জানি তো।

—আজ আমার কেউ নেই।

তৃণা তাকিয়ে রইল।

দেবাশিস বলল—আর আমাকে এখন ওসব ভয়ের কথা বোলো না। তোমারও যদি ছেঁড়া শেকড় অন্যজায়গায় থেকে থাকে তবে আমার কি হবে ? আজ থেকে রবিও পর হয়ে গেল।

তৃণা স্নিগ্ধস্বরে বললে—রবির জন্য তোমার বুকের ভিতরটা কেমন করে দেব, তা বোঝো না !

—ভীষণ বুঝি।

—ওটুকু কি আমার হতে নেই ?

দেবাশিস চুপ করে গেল। জোব্বা জামার পকেট থেকে ফের সিগারেটের প্যাকেট বের করে আনল। ধরাল। তারপর মাথা নেড়ে বলল—বুঝেছি।

তৃণা তেমনি স্নিগ্ধস্বরে বলল—আমরা তো আর ঠিক সকলের মতো হতে পারি না।

দেবাশিস বলল—তাও ঠিক। তবে আমরা কিরকম হবো তৃণা ?

—খুব সুখী হবো না ; একটু কি যেন থেকে যাবে দুজনের মধ্যে !

—তুমি কী ভীষণ স্পষ্ট কথা বলছ আজ তৃণা !

—আজই বলে নেওয়া ভাল।

—কেন ? আজই কেন ?

তৃণা চোখ মুছে হাসিমুখে বলে—আজ সপ্তাহের ছুটির দিন। তোমার সময় আছে। কাল থেকেই তো তুমি আবার ব্যস্ত মানুষ। তোমার কি আর সময় হবে ?

—তুমি কথাটা ঘোরালে তৃণা।

—তুমি বাথরুমে যাও। আমার খিদে পেয়েছে !

দেবাশিস তবু বসে রইল। চুপচাপ। অনেকক্ষণ বাদে মুখ তুলে বলে তৃণা,

—বলো।

—মানুষকে তার সব সম্পর্ক থেকে ছিঁড়ে আনা যায় না। একজনকে ভাল না বাসলেই যে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল এমন নয়। আবার কাউকে ভালবাসলেই যে নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠল এও নয়। তবে ভালবাসা দিয়ে আমরা কী করব ?

তৃণা কপালটা টিপে ধরে বলল—ও, আবার সেই তত্ত্বকথা ! জানো না মেয়েরা তত্ত্বকথা ভালবাসে না। মাথা ধরেছে, তুমি তাড়াতাড়ি স্নান সেরে এসো।

টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিয়েছে প্রীতম। বড় রেস্টুরেন্টের দামী সব খাবার। প্রীতমের মুখে খুব একটা হাসি নেই। কেবল বিনয় আছে।

দেবাশিস যখন খাওয়ার টেবিলের ধারে এসে বসল তখনও তৃণা নিজের কপাল

টিপে বসে আছে, বলল—তোমার চাকরকে পাঠিয়ে একটা মাথা ধরার বড়ি আনিয়ে দাও।

দেবাশিষ মৃদুস্বরে বলে—ও তোমার চাকর। অবশ্য পাঠানোর দরকার নেই। মাথাধরার বড়িটড়ি আছে বোধ হয়। খুঁজতে হবে।

—খিদে চেপে রাখলে, বা কাঁদলে আমার মাথা ধরে।

দেবাশিস চোখ তুলে ইংগীতে প্রীতমকে সরিয়ে দিল। তারপর হাত বাড়িয়ে তৃণার একখানা হাত ধরে বলল—তুমি প্রস্তুত হয়ে আসোনি জানি। হুট করে চলে এসেছো। তাই কাঁদছো। আমি মনে মনে প্রস্তুত ছিলাম তোমার জন্য।

তৃণা হেসে বলল—খুব প্রস্তুত! একখানা শাড়িও যদি কিনে রাখতে। কাল আমাকে বাসি কাপড়ে সকালবেলাটা কাটাতে হবে, যতক্ষণ শাড়ি কেনা না হয়।

—একটা দিন সময় দাও! প্লীজ। কাল থেকে সব ঠিক হয়ে যাবে। আজ দোকান বন্ধ।

তৃণা মাথা নেড়ে বলল—সময়! সময়! দাঁড়াও, সময় নিয়ে কি একটা কবিতার লাইন মনে আসছে—

এল না। মাথাটা ফেটে যাচ্ছে যন্ত্রণায়!

দেবাশিস বলে—খেয়ে একটু রেস্ট নাও। শোওয়ার ঘরের পর্দাগুলো টেনে দিচ্ছি, ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকো একটু।

—তুমি কোথায় যাবে?

কোথাও না। তোমার কাছেই বসে থাকব। বক বক করব। তৃণা সস্নেহে হাসল।

পাঁচটা প্রায় বাজে। সাততলা ফ্ল্যাটের শার্শির গায়ে অত্যন্ত উজ্জ্বল সোনালী রোদ এসে পড়েছে। এখনো অনেক বেলা আছে। অন্ধকার হতে এখনও অনেক বাকি। পর্দায় ঢাকা শোওয়ার ঘরে শুয়ে আছে তৃণা। গায়ে খয়েরী পর্দার আলোর আভা। দুটো বড়ি খাওয়ার পর আস্তে আস্তে মাথাধরাটা সেরে যাচ্ছে। সারাদিনের ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে শরীর। তবু কি ঘুম আসে! দেবাশিস অনেকক্ষণ মাথাটা টিপে দিল। ঝিম্ মেরে শুয়ে ছিল তৃণা, ঘুমের ভান করে। সে ঘুমিয়েছে মনে করে দেবাশিস উঠে গেছে পা টিপে টিপে।

ঘরটা ঠিক অন্ধকার হয়নি। আবার আলোও নেই। সাততলার ওপর খুবই নিরাপদ আশ্রয়। একা শুয়ে আছে তৃণা। মাথা ধরা সেরে গেছে। নরম বিছানায় এলিয়ে আছে ক্লান্ত শরীর। এ একরকমের আলস্য। সুন্দর আলসনী। কিন্তু ঘুম হবে না। আরো কতকাল ঘুম হবে না তৃণার।

সে চোখ চেয়ে দেখল ছাদের মসৃণ রঙ, চৌকা দেয়াল। দেয়ালে রহস্যময় আলো। চেয়ে থাকতে সেই সুরসুরির মতো একটা অনুভব। কে যেন দেখছে। খুব নিবিষ্ট-ভাবে দেখছে তাকে।

চমকে উঠল তৃণা। মাথাটা একবার তুলে চারদিকে তাকাল। আবার মাথাটা বালিশে রেখে চোখ বোজে! কিন্তু অবিরল তার ঐ অনুভূতি হয়, কে যেন দেখছে। ভীষণ দেখছে। চন্দনার ভুত? নাকি তার মনেরই প্রক্ষেপ? সে নিজেই হয়ত

ভাবতে ভাবতে মুখটা আস্তে ফেরাল তৃণা। চোখটা আপনা থেকেই খুলে গেল। আর ভীষণভাবে চীৎকার করে উঠে বসে সে—কে? কে?

খাওয়ার ঘরের দিকটার দরজার পর্দার ওপাশে যে দাঁড়িয়ে ছিল সে পর্দাটা আস্তে সরিয়ে মুখ বাড়াল ভিতরে। ভার গলায় বলে—আমি, প্রীতম।

তৃণা অবিশ্বাসের সঙ্গে চেয়ে থেকে বলে—কী চাও?

চাকরটা একটু ভয়ের হাসি হেসে বলে—সাহেব বলে গেলেন আপনি ঘুম থেকে উঠলে খবর দিতে, উনি একটু কোথায় বেরোলেন। এক্ষুনি আসবেন।

—কোথায় গেছেন?

—বলে যাননি। গাড়ি নিয়ে গেলেন দেখেছি।

—ও।

তৃণার বুকের ভিতরটা এখনো ঠক্ ঠক্ করছে। শ্লথ আঁচল টেনে নিয়ে সে উঠল। বলল—দাঁড়াও। তোমাদের ঘরটরগুলো আমাকে একটু দেখিয়ে দাও। চিনে রাখি।

চাকরটা উত্তর করল না, খুশীও হয়নি। তবু এক রকম বিরক্তি বা ঘেন্না চেপে রাখা মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। ও হয়তো ভাবছে, সাহেব রাস্তার মেয়েছেলে ধরে এনেছে, রাখবে। দেবাশিস তো ওকে বলেনি যে তৃণা আসলে কে! বললেও বুঝবে না। এমন অবস্থার দুটি মানুষের ভিতরকার প্রেমের সত্য কে কবে বুঝেছে! সবাই একটা কিছু ধরে নেয়।

শোওয়ার ঘর দুটো। একটা খাওয়ার ঘর। একটা বসবার। অনেকটা জায়গা নিয়ে খোলামেলা ফ্ল্যাট। দ্বিতীয় শোয়ার ঘরটা রবির। সেখানে অনেক খেলনা, ট্রয়াইকেল, ছবির বই, ছোট্ট ওয়ার্ডরোব। এই ঘরটায় একটু বেশীক্ষণ থাকল তৃণা। চাকরটাকে বলল—এককাপ কফি করে আনো।

ফোনটা বাজছে বসবার ঘরে। বাজছেই। চাকরটা রান্নাঘরে। ওখান থেকে শুনতে পাবে না। তৃণা ইতঃস্তত করছিল, ফোনটা কি সে ধরবে? পরমুহূর্তেই ভাবল অমূলক ভয়। এ বাড়ীতে যদি তাকে থাকতেই হয় তবে এসব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলাই উচিত। সে উঠে এল বসবার ঘরে। ফোন হাতে নিয়ে অলস গলায় বলে—হ্যালো।

একটা কচি গলা শোনা গেল—বাপি? ওঃ···থেমে গেল স্বরটা। তারপর নম্বরটা বলে জিজ্ঞেস করল—এটা কি ঐ নম্বর?

তৃণা বুঝে নিল, রবি। ফোনের গায়ে লেখা নম্বরটা তৃণারও তো মুখস্ত। বলল -কে বলছ?

—তুমি কে? বলে কচি গলাটা অপেক্ষা করল। হঠাৎ ভয়ার্ত গলায় বলল—মা?

তৃণা এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। ফোনটা কানে চেপে দাঁড়িয়ে রইল। রবি ফোন করছে। যদি তৃণা রং নাম্বার বলে ফোন ছেড়ে দেয় তো রবি আবার ফোন করবে, শুধু আজ নয়, কালও করবে। হয়তো প্রায়ই বাবার সঙ্গে দরকার পড়বে তার, তৃণা কোথায় পালাবে? পালাবেই বা কেন? তবু প্রথম ধাক্কাটা সামলানোর জন্য একটু সময় দরকার। সে চোখ বুজে বলল—রং নাম্বার।

ফোন রেখে দিল। ভেবে পেল না, রবি কেন মা কিনা জিজ্ঞেস করল।

প্রীতম কফি করে এনেছে। সেই সময়েই ফোনটা আবার বাজে। প্রীতম তার দিকে তাকায়। তৃণা ঘাড় হেলিয়ে বলে—রবি ফোন করছে। ওকে আমার কথা বোলো না।

প্রীতম ফোন তুলে নিয়ে বলে—হ্যালো। রবিবাবু ?

—...

—না তো। ফোন বাজেনি।

—...

—সাহেব বাইরে গেছেন।

—...

—না। আমি একা। তুমি আর আসবে না ?

—...

—চাঁপাদি আসবে না ? আচ্ছা বলে দেবো। তোমার সব জিনিস কাল পাঠিয়ে দেবো।

—আচ্ছা তুমি আসবে না কেন ?

...

—এলে বলব। ছাড়ছি।

ফোন রেখে প্রীতম একবার আড়চোখে তৃণার দিকে চেয়ে বাইরে চলে গেল।

সাড়ে পাঁচটা। দরজায় কলিং বেজে উঠল।

তৃণা ভেবেছিল দেবাশিস এসেছে। তাই তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজা খুলেই অপ্রস্তুত। দেবাশিস নয়। টেরিলিন পরা দিব্যি ঝকমকে একজন যুবা পুরুষ। সেও একটু অপ্রস্তুত। বলল—দেবাশিস নেই ?

—না। বেরিয়েছে।

—ও। বলে খুব কৌতূহলভরে চেয়ে দেখল তৃণাকে।

তৃণা কি ওকে বসতে বলবে ?

লোকটা নিজেই বলে—রবি নেই ?

—না।

লোকটার চোখে স্পষ্টই একটা প্রশ্ন—আপনি কে ? কিন্তু লোকটা সে প্রশ্ন করে না, ভদ্রতায় বাধে। তাই বলল—আমি রবির মামা।

—ও ? আসুন।

—বসে আর কি হবে ! কেউ নেই যখন ! বলতে বলতেও যুবকটি কিন্তু ঘরে আসে। একটু ইতঃস্তত করে বসে। একটা শ্বাস ফেলে হাতে হাত ঘষে বলে—আপনি ওর রিলেটিভ বোধ হয় ?

তৃণা মৃদু হেসে বলে—হ্যাঁ।

—চন্দনা আমার দিদি ছিল।

তৃণা তার এলো চুলের জট আঙুলে ছাড়াতে ছাড়াতে বলে—বুঝেছি বুঝেছি। বসুন ও এসে পড়বে।

যুবকটি ঘড়ি দেখে বলে—একটু বসতে পারি। আমি ভাবলাম—বলে একটু কথা সাজিয়ে নিয়ে বলে—আসলে কাল আমাদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি। বলছিলাম কি

boiRboi.net

দেবাশিসদা তো যাবেনই, সেইসঙ্গে আপনিও···যদিও ঠিক আচমকা এভাবে—

তৃণার ছেলেটির জন্য মায়া হয়। বুঝতে পারছে না, বুঝতে চাইছে। বলল—কফি খান। ও এসে পড়বে।

ছেলেটি প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে তাকে দেখতে থাকে! চোখে চোখ পড়তেই সরিয়ে নেয়। কিন্তু দেখে। তৃণা কফি বানাতে বলবার ছল করে উঠে এল। রান্নাঘরে প্রীতমকে খবর দিয়ে শোওয়ার ঘরে গিয়ে বসে রইল চুপচাপ। শুনল, ওঘরে প্রীতমের সঙ্গে কথা বলছে লোকটা! চাপা স্বর। এরকমই হবে এর পর থেকে। তৃণার জায়গাটা স্থির হতে অনেক সময় লাগবে। অনেক সময়। তৃণা শুষ্কমুখে বসে থাকে। চুলের জট ছাড়ায় অন্যমনে।

দেবাশিসের ফিরতে ছ'টা বেজে গেল। তখনো ছেলেটা বসে আছে সামনের ঘরে। আর দেবাশিসের হাতে কয়েকটা শাড়ির প্যাকেট, রজনীগন্ধার ডাঁটি, কসমেটিক্সের বাক্স, খাবারের বাক্স। চন্দনার ভাই সে সব দেখে অবাক। পর্দার ফাঁক দিয়ে দৃশ্যটা দেখল তৃণা।

না, দেবাশিস খুব একটা ঘাবড়াল না। চালাক লোকরা এরকম বিপদে পড়লে খুব গম্ভীর হয়ে যায়। দেবাশিসও হল। দু চারটি কী কথা হল ওদের। ছেলেটা চলে গেল।

দেবাশিস বেশ হাঁক ছেড়ে ডাকল—তৃণা।

তৃণা ঘরের মাঝখানটায় না গিয়ে পর্দা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলে—কি?

দেবাশিস একগাল হাসি হেসে বলল—সব এনেছি।

—কোত্থেকে?

—তোমাকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে হঠাৎ মনে পড়ল যাদবপুরে যখন থাকতাম তখন দেখেছি ঐ অঞ্চলের রবিবারে দোকান খোলা থাকে। গাড়ি নিয়ে চলে গেলাম, দেখ তো সব!

সব দেখে তৃণা হেসে কুটিপাটি। বলল—কী এনেছো এসব?

—কেন?

—এ রংচঙে শাড়ি আমি পরি নাকি?

—পরো না?

—এসব তো রেবা পরে। আর অত কসমেটিক্স! হায় রে আমি কবে আবার ওসব আলট্রা মডার্ন লিপস্টিক মাখি, কিংবা কাজল!

দেবাশিস হেসে বলে—এবার মেখো। বুড়ি সাজা তোমার কবে ঘুচবে বলো তো।

—মেয়ে বড় হয়েছে দেব, কদিন পরেই প্রেম করবে। এখনই করছে কিনা কে জানে!

দেবাশিস হেসে বলে—বাঙালী মেয়েদের ঐ হচ্ছে রোগ। তুমি সাজবে না কেন তৃণা?

তৃণা শুধু হাসল। স্নিগ্ধ হাসি। বলল—রবি ফোন করেছিল।

দেবাশিসের মুখের হাসিটা মরে গেল, বলল—কী বলল?

—আমি ধরেছিলাম। রং নাম্বার বলে ছেড়ে দিয়েছি। পরে আবার ফোন করেছিল,

boiRboi.net

তখন প্রীতম ধরে।

দেবাশিস একটু ভেবে বলল—থাকগে।

উঠে পোশাক পাল্টে এল দেবাশিস। চা খেল ফের।

ডাকল—তৃণা।

—উঁ!

—কিভাবে শুরু করা যায় বলো তো!

—কী? কিসের কথা বলছো?

—বুঝতে পারছো না?

—না তো।

—তোমার আর আমার এই জীবনটা।

—শুরু আবার করবে কিভাবে?

—ধরো বিয়ে হ'লে পুরুতের মন্ত্র, ফুলশয্যা-টয্যা দিয়ে একটা শুরু করা যায়। রেজিস্ট্রি করলে তারও সরকারী মন্ত্র আছে। আমরা কি দিয়ে শুরু করব?

তৃণা লজ্জা পেয়ে বলে—ওসব বোলো না। কানে লাগে। আমরা কিছু শুরু করলাম, নাকি শেষ করে এলাম?

—তোমার কি তাই মনে হয়? তার উত্তরে বলা যায় যে একটা শেষ না করলে অন্যটা শুরু করা যায় না তৃণা।

ফের তত্ত্বকথা!

—তুমি যে শুরুটাকে শেষ বলছ!

—শোনো দেব, আমি কিছু শেষ করে আসিনি। শুরুর কথাও ভাবিনি। আমি বাড়িতে ভূতের তাড়া খেয়ে বেরিয়ে এসেছি। আমি কি করছি আমি নিজেও জানি না। মাথার ভিতরটায় বড় গণ্ডগোল। আজ আমি কিছু ভাবতে পারছি না। শুধু একটা জিনিস জানি।

—কী তৃণা? আগ্রহে দেবাশিস ঝুঁকে বসে।

—তোমাকে আমার ভীষণ দরকার এ সময়ে। আর কিছু না।

—তৃণা, তবে আমরা সেই আদিমভাবে শুরু করবো! যখন কোন অনুষ্ঠান ছিল না, কেবল শরীর ছিল!

—ছিঃ। ওভাবে বলো না।

দেবাশিস হেলান দিয়ে বসে বলে—ছেলেবেলায় আমি ছিলাম বদমাস। মেয়েদের হাতে চিঠি গুঁজে দিতাম। বসন্তবাবুর বাড়ির ছাদে প্রত্যেকদিন ঘুড়ি গোঁত্তা মেরে নামিয়ে দিতাম তাতে লেখা থাকত আই লাভ ইউ। বসন্তবাবুর মেয়ে রাণীকে উদ্দেশ্য করে। তখন শুরু করার কোনো প্রবলেম ছিল না। ভাবতে শিখিনি, রচনা করতে শিখিনি, সাজাতে শিখিনি, ঐ ভাবেই শুরু করতাম। চন্দনার সঙ্গেও হুট করে শুরু। প্রথমে শরীর, তারপর ভালবাসার চেষ্টা, দেন ফ্যাস্টেশন অ্যাণ্ড দি এণ্ড, তোমাকে নিয়ে তো সেভাবে শুরু করা যায় না। আজ আমার মস্ত প্রবলেম।

—আজকের দিনটা অত ভেবো না। মাথা ঠাণ্ডা করো।

দেবাশিস শ্বাস ছেড়ে বলে—আজকের দিনটা অদ্ভুত। বুঝলে? আজ রবিকে

পার্মানেণ্টলি ওর পিসির বাড়িতে দিয়ে এলাম। আর তারপরই শুনলাম তুমি চলে আসছ। শচীন কিছু বলল না?

—কী বলবে?

—অধিকার ছেড়ে দিল এক কথায়? তুমিই বা কী বলে এলে? তৃণা শুধু কুঁচকে বলে—কী বলব? আমি কিছু বলে আসিনি। দেবাশিস চমকে উঠে বলে—বলে আসো নি?

—না। আমি প্রায়ই যেমন বেরোই তেমনি বেরিয়ে এসেছি।

—আমার কাছে এসেছো সে কথা কেউ জানে না?

—না।

—কাউকে বলো নি?

—না।

—বোকা।

—কেন?

—তুমি না ফিরলে ওরা তো থানা পুলিশ করবে। হাসপাতালে খোঁজ নেবে।

—নেবে! বলছো?

—নেবে না?

—আমার তো মনে হয় না। ওরা কি জানে যে আমি আছি?

—তুমি। বোকা তৃণা। বলে আসলেই হত। শচীনবাবু কি তোমাকে কামড়াত?

—তা নয়। ওরা আমাকে নিয়ে বহুকাল ভাবে না। আজ একটু ভাবুক।

দেবাশিস মাথা নেড়ে বলে—তা হয় না।

বলেই উঠে গেল দেবাশিস। ডায়াল করতে লাগল। তৃণা ওর কাছে গিয়ে বলল ফোন কোরো না। কিছুক্ষণের জন্য আমাকে নিরুদ্দেশ থাকতে দাও। ওরা ভাবুক।

—তা হয় না। মাথা নাড়ল দেবাশিস। ফোন কানে তুলে শুনে বলল—এনগেজড।

তৃণা একটা নিশ্চিন্তের শ্বাস ফেলল।

দেবাশিস ঘুরে বলল—আমি যা করব তা পাকাপাকি। কোনো অনিশ্চয়তা থাকবে না, দ্বিধা থাকবে না।

সাত

পৌনে সাতটা বাজেনি তখনো। বাজছে প্রায়। সাততলার ঘরের শার্শি দিয়ে দেখা যায়, কলকাতার ওপরকার আকাশটা মস্ত বড়। আকাশে তারা ফুটছে। শহরটা অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, আলোয় তিলোত্তমা।

বসবার ঘরটা অন্ধকার। কিংবা ঠিক অন্ধকার নয়। একটা রঙীন কাচের ঢাকনার ভিতরে শূন্য শক্তির আলো জ্বলছে। জানালার পর্দা সরানো। বাইরে চাঁদ। ঘরের ভিতরে জ্যোৎস্নার চৌকো চাঁপা রঙের আলো পড়ে আছে। আর ঝড়ের মতো বাতাস।

boiRboi.net

দেবাশিস একা ভূতের মতো বসে আছে। তার পরনে বাইরে যাওয়ার পোশাক। সামনে দুটো ঠ্যাং ছড়ানো, সোফার কাঁধে হেলানো মাথা। ছাদের দিকে মুখ। দুটো হাত অসহায় ভাবে দুদিকে পড়ে আছে। সে তৃণার কথা ভাবছে। জলস্রোত উল্টোপাল্টা, পালে পাগলা বাতাস, তবু বিপরীতগামী দুটি নৌকো একটা অন্যটার সঙ্গে জুড়ে গেল। বাঃ। বেশ।

তৃণা ওঘরে সাজছে। তারা বেড়াতে যাবে। তৃণা যেতে চায়নি। শরীরটা আজ ভাল নেই। দেবাশিস বলেছে—বেড়ালে মনটা একটু হাল্কা হয়। তোমার তো শেকড়ের প্রবলেম আছে।

তৃণা বেড়াতে ভালবাসে না। তার প্রিয় অভ্যাস ঘরের কোণে একা থাকা। ছবি আঁকবে, কবিতা লিখবে, বই পড়বে, গান শুনবে। কেউ কথা-টথা বলতে এলে বিরক্ত হয়। রোগে ভুগে ভুগে ছেলেবেলা থেকে ওর ঐ অভ্যাস হয়ে গেছে।

ফোনটা বাজছে। দেবাশিস হাত বাড়িয়ে ফোনটা তুলে নিল।

—হ্যালো।

মহিলাকণ্ঠে কে বলল—দেবাশিস দাশগুপ্ত আছেন?

—বলছি।

—ওঃ। দাদা…

ফুলি। ফুলির গলা টেলিফোনে কেমন অদ্ভুত শোনাচ্ছে। ভীষণ ভয় খেয়ে গেল দেবাশিস। শরীরটা ঝিম ঝিম করে উঠল বিদ্যুৎ স্পর্শে। রবির কোনো কিছু হয়নি তো!

—ফুলি! কী হয়েছে?

—তুমি ফিরেছো! বাঁচা গেল। রবি সেই থেকে বাবা-বাবা করছে। দুবার ফোন করেছিল।

—কী হয়েছে?

—কিছু না। কী হবে? অত ভেবো না তো। রবি আছে আমার কাছে আর আমি অনেক ছেলেপুলের মা।

দেবাশিস বিরক্ত হয়ে বলে—কী ব্যাপার বলবি তো!

—রবি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। বলছে বাবা কেন দেরী করছে ফিরতে!

—মন খারাপ নাকি!

—না না। দস্যিপনা করছে সব সময়ে। বেশ আছে।

—ওকে ফোনটা দে।

একটু পরেই রবির গলা শোনা গেল—বাবা।

—বলো। ভারী স্নিগ্ধ হয়ে গেল দেবাশিসের গলা।

—আমরা বেড়াচ্ছি।

—কোথায়?

—ট্যাক্সি করে বেরিয়েছি। এখন আছি শ্যামবাজারে।

—সঙ্গে কে আছে?

—মণিমা, পিসেমশাই, নিনকু…

boiRboi.net

—এনজয় ম্যান।

—বাবা, আমার বই, জামা প্যাণ্ট খেলনা, সব কবে পাঠাবে?

—কাল প্রীতম দিয়ে আসবে।

—এখান থেকেই স্কুলে যাবো তো?

—যেও।

—আর দিদি আমার কাছেই থাকবে তো বাবা? দিদি গল্প না বললে আমার খাওয়া হয় না। মণিমা বলেছে চাঁপা থাকুক।

—থাকুক।

—তুমি রাগ করোনি তো বাবা?

—রাগ? না রাগ করব কেন?

—আমি যে মণিমার কাছে চলে এলাম!

—তা বলে রাগ করব কেন?

—তুমি যে আমাকে ছাড়া থাকতে পারো না।

দেবাশিস একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—পারি বাবা। পারতে তো হবেই।

—নিনকু বলছিল—তোর বাবা তোকে ছাড়া একা ভয় পাবে দেখিস। আমাদের বাড়িতে কি ভূত আছে বাবা?

—ভূত? কে তোমাকে ভূতের কথা শেখাচ্ছে? ভূত টুত আবার কি?

—বাপি বলছিল।

—কি বলছিল?

রবি বোধ হয় একটু লজ্জা পায়। একটু থেমে বলে—বাবা মানুষ মরে গেলে তো ভূত হয়। তাই—

—তাই কি?

—বাপি বলেছে। আমি না।

—কি বলেছে?

—বলেছে মা মরে গিয়ে নাকি ভূত হয়ে আছে ও বাড়িতে।

—ওসব বাজে কথা রবি। ওসব বিশ্বাস করতে নেই।

—বড়োদাও বলেছে—ও বাড়িতে আর যাসনে রবি। গেলে তোর মা ঠিক তোর ঘাড় মটকে দেবে। ভূতেরা নাকি যাদের ভালবাসে তাদের মেরে নিজের কাছে নিয়ে যায়।

—ছিঃ রবি। এসব কথা শিখলে তোমাকে আমি ওখান থেকে নিয়ে আসবো।

—দিদিও আমাকে কত ভূতের গল্প বলে।

—আমি চাঁপাকে বারন করে দেবো। ওসব গল্প শুনো না!

—আচ্ছা। কিন্তু বাবা—

—বলো। দেবাশিসের গলাটা গম্ভীর।

—আমি যখন আফটারনুনে ফোন করেছিলাম তখন—

—তখন কি?

—আমার মনে হয়েছিল আমাদের বাড়িতে মা ফোন ধরেছে।

boiRboi.net

—কি যা তা বলছ ?

—না না, ওটা রং নাম্বার ছিল। কিন্তু যে লেডি ফোনটা ধরেছিলেন তার গলা শুনে আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল মার ভূত ঠিক ফোন ধরেছে।

—এ রকম ভাবতে নেই। আর ভেবো না।

—বাবা কাল আমি ইস্কুলে যাবো না।

—কেন ?

—আমি তো স্কুল-ড্রেস আনিনি, বই খাতাও নয়।

দেবাশিস একটু ভেবে বলল—ঠিক আছে। পরশু থেকে যেও। স্কুলে চিঠি লিখে দেবো বাস এবার ওখানে যাবে।

—কাল তাহলে ছুটি বাবা ?

—ছুটি।

—কাল তাহলে কোথায় বেড়াতে যাবো বলো তো !

—কোথায় ?

রবি ফোনে হাসল। কী স্নিগ্ধ কৌতুকের হাসি। বলল—মণিমা বলেছে কাল আমরা ফ্ল্যাটে বেড়াতে যাবো।

দেবাশিস উদ্বিগ্ন হয়ে বলে—এখানে ! এখানে কাল এসে কী করবে ? আমি তো থাকব না।

—মণিমা বলছে কাল নিজে আমাকে নিয়ে যাবে, আমার সব জিনিস গুছিয়ে আনবে আর আমাদের ফ্ল্যাটটা সাজিয়ে দিয়ে আসবে !

—না, না তার দরকার নেই।

—যাবো না ?

—দরকার কি রবি ? আমিই পাঠিয়ে দেবো।

—দাঁড়াও তাহলে মণিমাকে বলি।

ফোনের মাউথপীসে হাতচাপা দিয়ে রবি ফুলির সঙ্গে পরামর্শ করছে দৃশ্যটা স্পষ্টই দেখতে পায় দেবাশিস। খুবই উদ্বিগ্ন বোধ করে। আর সেটুকু সময়ের মধ্যেই সে ভেবে দেখল তার মহিলা ভাগ্য ভাল নয়, প্রথমবার বিয়ে করেছিল চন্দনাকে। পেটে বাচ্চা সমেত। দ্বিতীয়বার যাকে আনছে তারও বড় বড় ছেলেমেয়ে, স্বামী, সংসার সব থেকে ছিঁড়ে আনতে হবে। কোনবারই তার সহজ সরল বিয়ে হল না। যেন চুপি চুপি পাপ কাজ সারছে।

রবি বলল—হ্যালো ?

—বলো।

—আমরা কাল যাবো না।

—আচ্ছা।

—রবিবারে যাবো।

দেবাশিস হেসে বলে—রবিবারে আমিই যাবো।

—তাহলে ?

—তাহলে কি রবি ?

boiRboi.net

—আমি আমাদের ফ্ল্যাটে বেড়াতে যাবো কবে ?

—আসবে। বেড়াতে আসবে কেন, এ তো তোমার নিজেরই ফ্ল্যাট। যখন খুশী আসতে পারবে। তবে এ সপ্তাহে নয়।

—কাল তাহলে আমরা ট্যাক্সিতে করে দক্ষিণেশ্বরে যাবো।

—যেও।

—ছাড়ছি বাবা। গুডনাইট।

—নাইট।

ফোন রেখে দিল দেবাশিস! ভ্রু কোঁচকালো। মুখটায় চিন্তার রেখা।

অন্ধকার ঘরে, পাশের ঘর থেকে আলো এসে লম্বা হয়ে পড়েছে। সেই আলো পিছনে নিয়ে ছায়ামূর্তির মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে তৃণা।

দেবাশিস অস্ফুট একটা যন্ত্রণার শব্দ করল। যন্ত্রণাটা কোথায় তা বুঝতে পারছিল না।

বলল—রেডি তৃণা ?

—হুঁ। কিন্তু আমার শরীরটা ভাল নেই!

—কি হয়েছে ?

—কি করে বলব! আজ বড্ড টায়ার্ড।

—গাড়িতে তো বসেই থাকবে। খোলা হাওয়ায় দেখো, ভাল লাগবে।

—তোমার ফ্ল্যাটে খোলা বাতাসের অভাব নেই।

—না, না। চলো প্লীজ। এই ফ্ল্যাটটায় আমার একদম ভাল লাগে না।

—কেন, বেশ সুন্দর তো ?

—কি জানি কেন। বেশীক্ষণ ভালো লাগে না।

তৃণা একটু হাসির শব্দ করে বলে, আমারও কি খারাপ লাগবে দেব ?

—না। তোমার লাগবে না। আমার তো কতগুলো রিফ্লেক্স আছে। সবই তো তুমি জানো। দেয়ার আর বিটার মেমোরিজ, লোনলিনেস…সব মিলিয়ে একটা সাফোকেসনের মতো হয় মাঝে মাঝে। রবিটারও হত।

—রবি ফোনে তোমাকে ভূতের কথা কী বলছিল দেব ?

ছেলেমানুষ তো। কে যেন ভয় দেখিয়েছে ওর মা নাকি ভূত হয়ে আছে এখানে।

তৃণা একটু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ বলল—যখন দুপুরের পরে ফোন করেছিল তখন রবি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি কে ? মা ?

—তুমি কি বললে ?

—কি বলব! মিথ্যে করে বললাম রং নাম্বার।

—ঠিকই করেছো!

—ও কি ভেবেছিল ওর মায়ের ভূত কথা বলছে ?

শব্দ করে হাসল দেবাশিস। বলল—হ্যাঁ। আচ্ছা পাগল আমার ছেলেটা।

—শোনো।

—কি ?

—আর একটু পরে বেরোও। আমি একটু বসি। হঠাৎ মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে

boiRboi.net

উঠল।

দেবাশিস এগিয়ে তৃণার হাত ধরে এনে সোফায় বসায় যত্ন করে। নিজে তার পাশে বসে। হাতখানা ধরে থেকে বলে—তোমার নাড়ি বেশ দুর্বল।

তৃণা ঘাড় এলিয়ে রেখে বলল—আজকের দিনটা কেমন যেন ভাল নয়। বিশ্রী দিন।

উদ্বেগে দেবাশিস ঝুঁকে বলে—কেন তৃণা?

দেবাশিসের কাছে আসা মুখখানা হাত তুলে আটকায় তৃণা। বলে—এক একটা দিন আসে সকাল থেকেই কেবল সব কাজ ভুল হতে থাকে। যেন ভূতে পায় মানুষটাকে।

—কিরকম?

—দেখ না, কোনো দিনই তো আজকাল রেবার বা মনুর ঘরে যাই না! আজ যেন ভূতে পেল। গেলাম। রেবা হঠাৎ এসে পড়ল, চোরের মতো ধরা পড়ে গেলাম; কি বিশ্রী রকমের ব্যবহার যে করল ও!

—তুমি রেবাকে বড্ড ভালবাসো তৃণা।

—ভীষণ ভালবাসি। সেইজন্যেই তো ও আমার বুক ভেঙ্গে দেয়।

—সাতটা কিন্তু বেজে গেছে তৃণা।

—দাঁড়াও না। আজ কি একটা সাধারণ দিন! সকাল থেকেই সব অনিয়ম চলছে। অদ্ভুত দিনটি আজ। ঘড়ি টড়ি দেখো না।

—দেখব না। বলো।

—তারপর মনু। ওকে বলেছিলাম, ঘরে পেঁছে দে, শরীরটা ভাল না। তো ছেলে আমাকে জাপটে কোলে তুলে নিল। এমনিতে কথাও বলে না। তবে কেন আজ…? তারপর শচীনবাবু। সেও আজ অন্যরকম। রুমাল কুড়িয়ে নিল…অনেক কথা বলল…

—শোনো তৃণা, শচীনকে ফোনটা কিন্তু করা হয়নি।

—পরে কোরো।

—এতক্ষণে নিশ্চয়ই ওরা তোমার খোঁজ করছে। ওদের কেন অযথা ভাবতে দিচ্ছ?

—ভাবুক। একটু ভাবুক। কোনোদিন তো ভাবে না।

—না তৃণা। তুমি ভুল করছ। যা করছ তা আরো বলিষ্ঠভাবে করো। চুরি তো করোনি।

তৃণা দেবাশিসের হাতটা ধরে বলল—আঃ! তোমার কেবল ভয়। শোনো না।

দেবাশিস শ্বাস ছেড়ে বলল—বলো।

—ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই আমাকে আজ ভূতে পেল।

—সে কি রকম?

—ভুল রাস্তায় চলে গেলাম। ঠিক যেন নিশি-পাওয়া মানুষের মতো। একটা ছেলে মোটরসাইকেল চালিয়ে গেল, সেই শব্দে চেতনা হয়। তারপরও ফের ভুল। একটা ট্যাক্সিওলা নিয়ে গেল দেশপ্রিয় পার্কে। তাকে ডিরেকশন দিতে মনে ছিল না, রাস্তাটাও খেয়াল করিনি। তাই মনে হচ্ছে, আজকের দিনটা খুব অদ্ভুত।

—কী বলতে চাও তৃণা?

তৃণা অন্ধকারেই মুখ ফেরাল তার দিকে। বলল—এক একটা দিন আসে, ভুল দিয়ে

boiboi.net

শুরু হয়। ভুলে শেষ হয়। ভুতুড়ে দিন।

—না তৃণা, ভুল দিয়ে শেষ হচ্ছে না। তুমি বড্ড সেকেলে।

—না দেব। শোনো, আমি শুধু একটাই ঠিক কাজ করেছি আজ।

—কি ?

—শচীনকে বলে আসিনি।

—বলে আসা উচিত ছিল। এটাই ভুল করেছো।

তৃণা মাথা নেড়ে বলে—না। বলে আসলেই ভুল করতাম।

দেবাশিস অধৈর্যের গলায় বলে—আমি এক্ষুনি ফের শচীনকে ফোন করছি।

বলেই বাধা না মেনে উঠে গেল দেবাশিস। ফোনের ওপর ঝুঁকে পড়ে অল্প আলোয় ঠাহর করে করে আস্তে আস্তে ডায়াল ঘোরাতে থাকে।

ফোনটা কানে তুলে অপেক্ষা করছে। তৃণা উঠে এল কাছে। ফোনটা নিয়ে নিল হাত থেকে। রেখে দিতে যাচ্ছিল, শুনল ওপাশ থেকে একটা মেয়ের স্বর বলে উঠল—হ্যালো।

রেবা বোধ হয় ! তৃণা তাই ফোনটা কানে লাগায়।

ওপাশে চঞ্চল ও ধৈর্যহীন গলায় রেবা বলছে—কে ? হ্যালো কে ?

উত্তর দিতে সাহস হল না তৃণার। কেবল খানিকক্ষণ শুনল !

রেবা চেঁচিয়ে তার বাবাকে ডাকছে—বাপি, দেখ, ফোনটা বাজল, কেউ সাড়া দিচ্ছে না এখন।

পরমুহূর্তেই শচীনের গলা—হ্যালো।

তৃণা মাউথপীসে হাত চাপা দিয়ে রাখল।

শচীন রেবাকে ডেকে বলল—গোস্ট কল। আজকাল টেলিফোনে যত গোলমাল।

বলেই আবার, শেষবারের মতো বলল—হ্যালো ! কে ?

কেউ না। আমি কেউ না। একথা মনে মনে বলে তৃণা।

দেবাশিস কানের কাছে মুখ নামিয়ে নরম গলায় বলে—তৃণা বলতে পারলে না ?

শচীন ফোন রেখে দিল।

তৃণা মাথা নেড়ে বলল—না। আজকের দিনটা থাক। দিনটা ভাল নয় দেব।

—খুব ভাল দিন তৃণা।

—না দেব, আজ কোনো ডিসিশন নেওয়া ঠিক হবে না।

—তাহলে কি করবে তৃণা ?

—তাহলে···

তৃণা ভ্রু কুঁচকে ভাবতে থাকে। অনেকক্ষণ ধরে ভাবে।

দেবাশিস অপেক্ষা করে উগ্র আগ্রহে।

আট

গাড়ি থামল। গাড়ি চলে গেল।

নিজের বাড়ির সামনে একা দাঁড়িয়ে তৃণা। বুকে একটা খাঁ খাঁ আকাশ। সেই

boiRboi.net

আকাশে নানা ভয়ের শকুন উড়ছে।

রাত আটটা বেজে গেছে। তবু তেমন রাত হয়নি। এখনো স্বচ্ছন্দে বাড়িতে ঢোকা যায়। কেউ ফিরেও তাকাবে না সে জন্য। দেবাশিসের গাড়িটা গড়িয়াহাটা রোডের মুখে গিয়ে বাঁ ধারে মোড় নিল।

তৃণা বাড়ির গেট দিয়ে ধীর পায়ে ঢোকে। মস্ত আলো জ্বলছে বাইরে। ছোট বাগানটার গাছপালার ওপর আলো পড়ছে। হাওয়া দিচ্ছে। চাঁদ উঠেছে। ফুলের গন্ধ মুঠো মুঠো ছড়াচ্ছে বাতাস।

আজকের দিনটা দেবাশিসের কাছে ভিক্ষে নিল তৃণা। আজ দিনটা ভাল নয়। এই ভুতুড়ে দিনে এতবড় একটা সাহসের কাজ করতে তার ইচ্ছে করল না। আজকের দিনটি কেটে গেলে এরপর যে কোনোদিন সে চলে যাবে। কেন থাকবে এখানে? কেন থাকবে!

আস্তে ধীরে সে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল। বাঁ ধারের ঘরটায় টেবিল-টেনিস খেলছে রেবা আর তার এক মাদ্রাজী মেয়ে-বন্ধু সরস্বতী। ছোটাছুটি করছে। হাসছে। কেউ তাকে দেখল না।

শচীনের কাকাতুয়াটা চেঁচিয়ে বলল—চোর এসেছে। চোর এসেছে। শচীন! শচীন!

তৃণা ধীরে তার ঘরে এসে দাঁড়ায়। আলো জ্বালে না। চুপ করে বিছানায় বসে থাকে কিছুক্ষণ, এবং বসে থাকতে থাকতেই টের পায়, বুকে আকাশ, আকাশে শকুন।

মনটা ভাল থাকলে এই নিয়ে একটা কবিতা লিখত সে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল তৃণা। অলক্ষ্যে এবং নিজেরও অজান্তে চাকর এসে ডাকল—মা, খাবেন না? সবাই বসে আছে।

তৃণা উঠল। চাকরের মুখের মা ডাকটা কানে বাজতে থাকে।

বাথরুম সেরে এসে খাওয়ার টেবিলে চলে গেল সে। রাতের খাওয়ার সময়টা সে প্রায়ই থাকে। নিয়ম। না থাকলেও ক্ষতি নেই, তবু নিয়ম।

খাওয়ার টেবিলে আজ সবাই খুব হাসি খুশী।

শচীন ছেলেমেয়েদের কাছে গল্প বলছে। কথামৃতের গল্প। সবাই শুনছে। এসব গল্পের মধ্যে অবশ্য তৃণাকে ওরা রাখে না। টেবিলের একধারে তৃণা চুপ করে বসে থাকে। টেবিলে সাজানো খাবার। যে যার প্লেটে তুলে নিয়ে খায়!

শচীন গল্পের শেষে বলল—জাপানের চালানটা এলে দেখবি। বামন গাছের এমন একটা বাগান করব।

—আমাদের স্কুলে ইকেবানা শেখায়। রেবা বলে।

মনু বলল—সে আবার কি?

—ফুলদানী সাজানো। খুব মজার। জাপানীরা স্বর্গ, মানুষ আর পৃথিবী এই প্যাটার্নে সাজায়! অদ্ভুত।

মনু বলে—জাপানীরা খুব প্রগ্রেসিভ। না বাবা?

—প্রগ্রেসিভ! শচীন বলে—তাছাড়া ওদের মতো মাথা কারো নেই। শুধু দোষের মধ্যে বড্ড সেণ্টিমেণ্টাল, একটুতেই সুইসাইড করে।

boiRboi.net

—হারিকিরি। রেবা বলে।

—হারিকিরি নয়। মনু বলে—হারাকিরি!

এইরকম সব কথা।

রান্নার লোকটা নিঃশব্দে ঘরের একধারে দাঁড়িয়ে ছিল। রোজই থাকে। চমৎকার রাঁধে সে। কোনো ভুল হয় না।

আজ হঠাৎ চাইনীজ চপ সুয়ের একচামচ মুখে তুলেই রেবা চেঁচিয়ে বলে—চিত্ত আজ এটাতে নুন দাওনি!

চিত্ত শশব্যস্তে বলে—দিয়েছিলাম তো!

—দাওনি! রেবা জোর গলায় বলে।

মনু একটু মুখে দিয়ে—দিয়েছে। তবে কম হয়েছে।

শচীন বললে—টেস্ট কিন্তু দারুণ।

রেবা বিরক্ত হয়ে তার বাবার দিকে নুনের কৌটো এগিয়ে দেয়। কী ভেবে নিজেই নুন ছড়িয়ে দেয়। মনুর প্লেটেও দেয়।

তার পরই হঠাৎ তৃণার দিকে ফিরে বলে—মা তোমাকে…ওঃ তুমি তো এখনো খাওয়া শুরুই করোনি!

তৃণা ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না যে রেবা তাকে মা বলে ডাকছে। গত একবছর একবারও ডাকেনি। তার কানমুখ ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে রক্তের জোয়ারে। বুক ভেসে যায় হৃদয় ক্ষরিত হয়। বহুকাল বাদে স্তনের ভিতরে যেন ঠেলে আসে দুধ। অস্থির তৃণা চেয়ারের হাতল চেপে ধরে। আনন্দ! আনন্দ! এত আনন্দ সে বুঝি জীবনে একবারও আর ভোগ করেনি।

কেউ তার অবস্থা লক্ষ্য করছে না। ভাগ্যিস শচীন ওদের বিদেশের একটা অভিজ্ঞতার গল্প করছে। ওরা কি জানে তৃণার ভিতরে একটা ট্যাপ কে যেন খুলে দিয়েছে! অবিরল নির্ঝরিণী বয়ে চলেছে তার শরীর দিয়ে। সেই স্রোত তার চারধারে সব কিছুকেই অবগাহন করাচ্ছে। শব্দটা কান পেতে শোনে তৃণা স্রোতের শব্দ।

পরদিন সকালে কবিতার খাতা নিয়ে বসল।

আজও দেবাশিস আসবে। বিকেলবেলায়। বাসস্টপে।

নয়

সারা বাড়িতে আজ চন্দনার ভূত ঘুরে বেড়াচ্ছে!

দেবাশিস একা সিগারেট খেল অনেকক্ষণ। আবার উঠল। জানালাটা দিয়ে ঝুঁকে পড়ল রাস্তার ওপর। বহু নীচে ফুটপাথ! মাঝখানে নিরাবলম্ব শূন্যতা! চন্দনা কি করে অত সাহস পেল?

দেবাশিস তো পারে না। চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে কলকাতা। ঘর সাজাবে বলে, ফুলশয্যা বলে ফুল এনেছিল সে। এখন এই নিশুত রাতে সেই ফুল গন্ধ ছড়াচ্ছে। কী গভীর সুগন্ধ! সুগন্ধটা টেনে রাখে তাকে।

boiboi.net

দেবাশিস প্রেতের মতো একা এসে বসে সোফায়। মাথার চুল মুঠো করে ধরে! রবি নেই। রবি এখন মণিকার বুক ঘেঁসে অঘোরে ঘুমোচ্ছে!

একবার রবির ঘরে এল দেবাশিস। রোজ রাতেই আসে। ছোট ছোট শ্বাস ফেলে রবি ঘুমোয়। চেয়ে দেখে। পাশ ফিরিয়ে দিয়ে যায়। আজ রবির ছোট্ট বিছানাটা ফাঁকা পড়ে আছে।

আজকের দিনটা ভাল নয়। তৃণা বলেছিল। সত্যিই। আজকের দিনটা কেমন যেন! হাতের মুঠো থেকে পয়সা হারিয়ে গেলে শিশু যেমন অবাক হয় তেমনি লাগছিল দেবাশিসের।

রবি নেই! তৃণা নেই।

ভালই। এ একরকমের ভালই।

প্রেতের মতো ভয়ঙ্কর শুকনো একটা হাসি হাসল দেবাশিস।

বুকের এখনো যেন রবির খেলনা পিস্তলের মিথ্যে গুলি বিঁধে আছে। বড় যন্ত্রণা।

অস্ফুট শব্দ করল দেবাশিস; যন্ত্রণাটার অর্থ বুঝতে পারল না।

কালই ইনডেক-এর একটা মস্ত কণ্ট্রাক্ট শুরু হচ্ছে আসানসোলে। সকালের গাড়িতেই চলে যেতে হবে।

দেবাশিস শুল। ঘুম আসছে ভারী ক্লান্তির মতো। ঘুমচোখে মনে পড়ল, ভুল করে কাল বিকেলে বাসস্টপে আসতে বলেছে তৃণাকে। এসে ফিরে যাবে।

ফোন করবে? থাকগে! আজ একটা ভুলের দিন গেল। আজ আর ভুলগুলোকে ঠিক করার চেষ্টা করবে না। থাক। ভুলের দিনটা কেটে যাক।

boiRboi.net

boiRboi.net

নয়ন শ্যামা

boiRboi.net

boiRboi.net

বাস থেকে নেমেই শ্যামা নয়নকে দেখতে পেয়েছিল।

বাস যেখানে থেমেছে, সেখানে জাতীয় সড়কের ধারেই হাট বসেছে। ছোট হাট, তবু সেখানে ব্যাপারীর ভীড়, ক্রেতাদের আনাগোনা। মুর্গীর ঝাঁপি সাজিয়ে একজন দোকানী বসে আছে। তার পাশেই একজন বুড়ো চাষী একটা হাড়-বের-করা গরু নিয়ে দাঁড়িয়ে। এটা গো-হাটা নয়। তবু বুড়ো কি ভেবে তার গরু নিয়ে এসেছে কে জানে! সেই মুর্গীর ব্যাপারী আর গরু-অলা বুড়োর মাঝ বরাবর নিতান্ত বেমানান পাকা জলপাই রঙের দামী প্যাণ্ট আর গাঢ় হলুদ জামা গায়ে নয়ন দাঁড়িয়ে ছিল। চোখে উগ্র জ্বালা, ঠোঁটে সিগারেট।

বাস থেকে প্রথমেই শ্যামা নামল, তারপর বাবা আর মা। শ্যামা নামতে নামতেই নয়নকে দেখতে পেল, ভীড়ের মধ্যেও। একপলক দেখা। বুকটা চমকে উঠেছিল শ্যামার। পরমুহূর্তেই অবশ্য নয়ন গা-ঢাকা দিল ভীড়ের মধ্যে। শ্যামা পলকে চোখ ঘুরিয়ে বাবা মার মুখ দেখে নিল। বাবা মার মুখ দেখে বোঝা যায় যে তারা নয়নকে দেখে নি।

অনেকদিন ধরেই নয়ন পিছু নিয়ে আছে। সব জায়গাতেই পিছু নেয়। কিন্তু এতটা আসবে, আগে ভাগে এসে অপেক্ষা করবে তা কল্পনা করে নি। তার ভিতরটায় এতক্ষণ নতুন একটা জায়গায় বেড়াতে আসার যে আনন্দটা ছিল তা হঠাৎ কেটে গিয়ে ভিতরটা হঠাৎ পোড়ো বাড়ির মতো ভয় ভয় ভাবে ছেয়ে গেল। ভয়টা নয়নের জন্যে। যদি বাবা মা টের পায় নয়ন এখানে এসেছে তবে কী যে হবে!

হেমন্তকাল। কলকাতায় এসময়ে শীত নেই। দুপুরে এখন পাখা চলে। শ্যামা গরম জামা কিছু আনে নি। কিন্তু সড়কে পা দিয়েই সে বাতাসে চোরা শীতের টান টের পেল। উঁচু জাতীয় সড়কে দিগন্তের হাওয়া এসে লাগছে। ভিতরটা কেঁপে ওঠে শ্যামার। ভয়ে, শীতে।

কাঁধের শালটা বাবা ভাল করে গলায় জড়িয়ে নিয়ে মার দিকে ফিরে বলল—বলি নি তোমাকে মফঃস্বলে এসময়েই শীত পড়ে যায়।

—তাই তো দেখছি। ভর দুপুরেও বেশ বাতাস! এই বলে মা ভেলভেটের খাটো স্টোলটা জড়িয়ে নেয়।

বাবা শ্যামার দিকে ফিরে বলে—তুই তো কিছুই আনলি না। ফেরার সময়ে ঠাণ্ডা লাগিয়ে বসবি। একেই পাকা টনসিল তোর, আমারই শালটা নে বরং।

—আমার তো গরম লাগছে।

বাবা একটু হাসে—ওসব কম বয়সের কথা। গরম নেই।

মা বলল—আঁচলটা জড়িয়ে নে গলায়।

শ্যামা তাই নেয়। তার শীত করছে ঠিকই। একটু আগে বাসে গাদাই ভীড়ে বসে সে ঘামছিল। মানুষের গায়ের ভাপে একটা গরম আছে তো। এখন খোলা

BoiRboi.net

বাতাস বলে, নাকি নয়নকে দেখেছে বলে কেন যেন তার শীত করছে, কাঁটা দিচ্ছে গায়ে।

—এইখানে দিব্যি হাট বসেছে দেখছি।

বাবা একটুক্ষণ নাবালের হাটটার দিকে চেয়ে দেখে। ততক্ষণ প্রায় শ্বাস বন্ধ করে থাকে শ্যামা। বাবা চোখ ফিরিয়ে বলে—ফ্রেশ ডিম-টিম, মুর্গী শাকপাতা পাওয়া যায়, ফুলকপি-টপিও উঠেছে বোধহয়। ফেরার সময়ে যদি হাতে সময় থাকে তো দেখা যাবে।

—থলে টলে তো আন নি। মা বলে।

—রুমাল আছে, শ্যামার ভ্যানিটি ব্যাগটাও বড়-সড়—

শ্যামা এতক্ষণে একটু হাসে—আমার ব্যাগে শাকপাতা ঢোকাবে নাকি ?

—শাকপাতা না হোক, ডজনখানেক ডিম এঁটে যাবে। আঁটবে না ?

—যদি ডিম ভাঙে তো ব্যাগের দফা শেষ। তখন আর একটা কিনে দেবে তো ?

অফিস থেকে রিটায়ারমেণ্টের সময়ে ফেয়াওয়েলে পাওয়া চমৎকার বেনারসী লাঠিখানা একবার ওপরে তুলে আবার নামিয়ে বাবা বলে—ওরে ভাবিস না, হাট যখন একটা থলেও ওখানে কিনতে পাওয়া যাবে।

—বাবা, সব জায়গায় তোমার কেবল খাই-খাই।

বাবা একটু হাসে, বলে—খেতে আর তোরা দিস্ কোথায় ! নুন বারণ, ফ্যাট বারণ, এত সব বারণে আর খাওয়ার থাকে কি ?

—ব্লাডপ্রেসার দুশোর কাছাকাছি ওঠে কেন ? তুমি প্রেসার ঠিক রাখ আমরা সব বারণ তুলে নেব।

—আর কমেছে। এটাই শেষ রোগ। একটা তো হয়ে গেছে, আর দুটো স্ট্রোক মোটে পাওনা।

শুনে শ্যামা চুপ করে থাকে। চোখ ছল্ ছল্ করে। মা ধমক দিয়ে বলে —সব সময়ে তোমার অকথা কুকথা। যে কোন ভাল কথার মাঝখানেও তুমি কেবল তোমার রোগ-ভোগের কথা তুলে ফেল। ওটা ভাল নয়।

জাতীয় সড়ক ধরে একটু এগোলেই ঝক্‌ঝকে নতুন একটা কংক্রিটের পোল। নিচে ছোট্ট একটা নদী তর তর করে বয়ে যাচ্ছে। পোল পেরোলেই বাঁ ধারে একটা বিরাট আমবাগান। জাতীয় সড়ক থেকে একটা মেটে রাস্তা নেমে আমবাগানে ঢুকে গেছে।

পোলের ওপর দাঁড়িয়ে বাবা তার নকশাকাটা সুন্দর লাঠিগাছ তুলে মেটে রাস্তাটা দেখিয়ে বলে—ঐ হচ্ছে রাস্তা। এখান থেকে মাইলখানেক যেতে হবে।

শ্যামা পোলের রেলিং ধরে ঝুঁকে নদীটা একটু দেখে। জল বড় পরিষ্কার। সেই জলে তার ছায়া পড়ে। চারটে নৌকো পাড়ে বাঁধা। জলের নিচে মাছের চলাফেরা দেখা যাচ্ছে। জল থেকে চোখ তুলে শ্যামা একবার হাটের দিকে তাকায়। কিছুই বোঝা যায় না। কয়েকটা গরুর গাড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, চালাঘরের নিচে দোকানে দোকানে মানুষ। রঙচঙে জামাকাপড় ঝুলছে এধার ওধার। হলুদ জামা আর জলপাই-রঙা প্যাণ্ট পরা নয়ন কোথাও নেই। শ্যামা একটু স্বস্তির শ্বাস ফেলে, শুনতে পায় মা বলছে—রাস্তা তুমি ভারী চেন কি না।

বাবা বিরক্ত হয়ে বলে—চেনার কি ? এসব গাঁ-গঞ্জ জায়গা, কলকাতার গোলক-ধাঁধা তো নয় ! বাসে তিনজনকে জিজ্ঞেস করে সিওর হয়ে নিয়েছি।

—তা হোক। তবু এখানকার কাউকে জিজ্ঞেস করে নাও। সেবার তুমি দেওঘরে বেড়াতে বেরিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলে, মনে নেই ! বুড়ো বয়সে কী কাণ্ড।

—আরে, সে তো কানাওলায় ধরেছিল বলে। নিজের বাসার সামনে দিয়ে যাচ্ছি অথচ বাসা চিনতে পারছি না। কানাওলা হচ্ছে একরকমের স্পিরিট।

—তা হোক, তবু জেনেশুনে রাস্তায় নামা ভাল।

হাতে একটা ছোট্ট শোলমাছ নিয়ে এক গেঁয়ো হাটুরে হাট সেরে ফিরে যাচ্ছে, বাবা তাকে জিজ্ঞেস করে—মায়ের ইচ্ছা কালীবাড়ির রাস্তা তো ঐটে, না ?

—ঐটেই। আমবাগানের ভিতর দিয়ে চলে যান। মোনা ঠাকুরের কাছে যাবেন তো ! এখান থেকে মাইলখানেক।

—আপনিও ওদিকে যাবেন নাকি ?

—না। আমি যাব বামুনগাছি। সোজা কোশখানেক গিয়ে ডানহাতি ?

—ঐ দিকটায় লোক চলাচল নেই ?

—আছে, তবে কম। মোনা ঠাকুরের জন্যেই আজকাল লোকজন যায়। হাট ফুরোলে কিছু লোক ফিরবে। কিন্তু একা হলেও ভয় নেই। রাস্তা নিরাপদ।

—সাপখোপ ?

লোকটা একটু হাসে—দিনের আলো রয়েছে, ভয় কি। লাঠিটা একটু ঠুকে ঠুকে চলবেন। সাড়া পেলে ওরা রাস্তা ছেড়ে দেয়। মানুষকে সবাই ডরায়। চলে যান, ভয় নেই।

শ্যামা নয়নকে আর দেখতে পেল না বটে, কিন্তু বুকের ভিতরটা খিঁচ ধরে রইল। নয়ন খামোকা এতদূর আসে নি। এসেছে যখন কাছে আসার চেষ্টাও নিশ্চয়ই করবে। ও এখন মরীয়া। ওর প্রাণের ভয় নেই।

বাবা একবার গলা খাঁকারি দিয়ে লাঠিটা বার কয়েক রাস্তায় ঠুকে নিল। বলল—চল।

বড় রাস্তা ছেড়ে তারা মেটে রাস্তায় নামল। তারপরই আমবাগানে ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেল জাতীয় সড়ক, ওপারের হাট, নয়ন। গো-গাড়ির চাকায় রাস্তা এমনভাবে ভেঙে দুধারে বসে গেছে যে পাশাপাশি হাঁটা যায় না। আপনা থেকেই তারা আগুপিছু হয়ে গেল। সামনে বাবা, তারপর মা, সবশেষে শ্যামা।

বাবা হাতঘড়ি দেখে বলল—মোটে পৌনে দুটো। আমরা আস্তে হাঁটলেও গিয়ে ফিরে আসতে ঘণ্টা তিনেকের বেশী লাগবে না। সন্ধ্যের আগেই বাস ধরতে হবে।

মা একটু বিরক্ত হয়ে বলে—মঠে মন্দিরে যাওয়ার সময়ে অত ফেরার তাড়া থাকলে হয় না। তুমি বাপু বড্ড ঘরকুনো হয়েছো আজকাল।

বাবা একটু থতিয়ে গিয়ে বলল—তা নয়। আসলে দিনকাল তো ভাল না, তোমাদের গায়ে সোনার গয়না-টয়না রয়েছে।

—লোকটা তো বলল ভয়ের কিছু নেই।

—ওসব লোকের কথা কি ধরতে হয় ? বলে দিল ভয় নেই, তা বলেই কি ভয়

boiRboi.net

নেই ? দেশে আনএমপ্লয়মেন্ট, খরা, বন্যা চারদিকে উপোসী অভাবী লোক। এ সময়ে চোর, গুন্ডা, বদমাশ দেশে বাড়েই।

তারের যন্ত্র যেমন বাজে তেমনি তীব্র স্বরে গাছে গাছে পাখিদের ডাক বেজে যাচ্ছে। শুকনো পাতা ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে পায়ের তলায়। শ্যামার বুক কাঁপছে। একটা পাখির শিস্ কানে এল। উৎকণ্ঠ হয়ে শুনল শ্যামা। নয়ন নানারকমের শিস্ দিতে পারে।

বাবা যেতে যেতে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে বলে—কি ঠাণ্ডা সুন্দর নির্জন জায়গা এসব। কলকাতায় আমরা যে কি নরকে থাকি। শব্দ আর শব্দ।

মা বলে—গাঁ-গঞ্জ তো ঠাণ্ডা হবেই।

বাবা আবার হাঁটতে হাঁটতে উদাস গলায় বলে—কলকাতার জমিটা বেচে দিয়ে এসব দিকে চলে এলে কেমন হয়। ফ্রেশ বাতাশ, ভাল তরিতরকারী, ডিম-দুধ মাছ—

মা বলে—ও তোমাদের মুখের কথা। কলকাতা তোমাদের বশীকরণ করে রেখেছে। সেবার দেওঘরে গিয়ে একমাসও থাকি নি, তুমি কি হুড়োহুড়ি শুরু করলে—এখানে সিগারেটের টোবাকো পাওয়া যায় না, এ নেই, সে নেই—কুড়ি দিনের মাথায় ফিরে আসতে হয় তোমার জন্যেই তো! তুমি আবার থাকবে গাঁয়ে।

বাবা হাসে, বলে—সে অবশ্য ঠিক। এক সময়ে যখন মফঃস্বলে চাকরী করতাম তখন কলকাতার নামে ভয় ভয় করত। তারপর কলকাতায় একটা বড় সময়ে থেকে কলকাতার সুবিধেগুলোয় এমন অভ্যাস হয়ে গেল, আর কোথাও সে আরামটা পাই না। ধর গ্রীষ্মকালে যদি কখনও ফুলকপি খেতে ইচ্ছে করে, কিংবা অসময়ে গলদা চিংড়ি—সে কেবল ওখানেই পাবে। অন্য কোথাও—

শ্যামা হাসে—বাবা, আবার ?

চারদিকে গভীর অরণ্য-ছায়ার কোথা থেকে আবার সেই শিস্‌টা শোনা যায়। পাখির ডাকের মত, কিন্তু পাখির ডাক কিনা, তা শ্যামা বুঝতে পারে না ঠিক। উৎকর্ণ হয়ে শোনে। তার মুখের হাসিটা মিলিয়ে যায়।

রাস্তার ওপর গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ঝিরঝিরে রোদ এসে পড়েছে। দুলছে আলো-ছায়া, দোলে রহস্য। বিচিত্র অচেনা পাখিরা ডাকে। কে জানে সেইসব অচেনা পাখিদের একজন হয়ে নয়ন ডাকে কিনা। পিছন ফিরে একবার তাকায় শ্যামা। সঙ্গে সঙ্গে হোঁচট খায়।

—সাবধানে আয়। মা হাত বাড়িয়ে বলে।

—ঠিক আছে মা।

—কদ্‌বেলের গন্ধ পাচ্ছ ? বাবা জিজ্ঞেস করে।

মা বাতাস শুঁকে বলে—কি একটা গন্ধ যেন চামসে মতন।

বাবা শ্বাস ফেলে বলে—বাঁদরলাঠি, সেই যে লম্বা লম্বা, সেগুলো ভাঙলেও এরকম গন্ধ বেরোয়।

বুনো কুলের ঝোপ পেরোবার সময়ে বাবা শ্যামাকে ডেকে দেখায়—এই কুল দেখ, বড় পুঁতির মত হয়, পাকলে ভারী মিষ্টি, মাণিকপুরের জঙ্গলে কত খেয়েছি।

বাতাস এখানে ভারী পরিষ্কার, সতেজ, বাতাসে বন্য গন্ধ, ভেজা মাটির সোঁদা

boiRboi.net

মিষ্টি গন্ধটি। ছায়ায় কেমন শীত শীত করে। শ্যামা তার আঁচল গায়ে জড়ায়। ভীতু খরগোশের মত চারদিকে চায়। টুপ টুপ পাতা এসে পড়ছে গাছ থেকে। জলের ফোঁটার মত টুক্ করে একটু শব্দ হয় কি হয় না। এই ছায়াটি, এই নির্জনতা, এই অচেনা জায়গার সৌন্দর্য কী নিবিড় সুন্দর বলে মনে হত হেমন্তের এই গড়ানে দুপুরে! শ্যামার চোখে যদি নয়নের হলুদ জামা আর জলপাই-রঙা প্যাণ্টটা না ছায়া ফেলত।

আগাছা রাস্তার মাঝখানে হাত বাড়িয়ে রেখেছে। আঁচলে টান পড়তেই শ্যামা কেঁপে ওঠে, তারপর লজ্জিত মুখে গাছের কাঁটা থেকে তাড়াতাড়ি আঁচল ছাড়ায়। জোরে হাঁটা বাবার বহুকালের অভ্যাস। স্বভাবতই বাবা এগিয়ে যায়, দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে তার আর মার জন্য। আগু-পিছু তারা চলে।

—তোমার ইচ্ছের জন্যই আসা। কিন্তু আমার মন বলে, তন্ত্রে মন্ত্রে কিছু হবে না। বাবা উদাস গলায় বলে।

মা চুপ করে থাকে। তাদের মাঝখানে একটা নিস্তব্ধতা নেমে আসে।

শ্যামা স্তিমিত, নরম গলায় বলে—মোনা ঠাকুরের খুব নাম-ডাক।

—শুনেছি। কিন্তু আমরা হচ্ছি ঘরপোড়া গরু। বুকের মধ্যে ভয়টা সব সময়ে থম্ ধরে থাকে। তাকে শেষবার দেখা গিয়েছিল বেরিলিতে, তাও পাঁচ বছর হয়ে গেছে। পাঁচ বছরে কত কী হয়ে যায় মানুষের, তার ওপর পাগল মানুষ। বলে বাবা বড় করে শ্বাস ছাড়ে।

মার পা ধীর হয়ে আসে। তারপর একটু ধরা গলায় বলে—যা হবার তা হয়েছে, তুমিও তো আর জ্যোতিষ নও।

—সন্ন্যাসী-ফকিরের পিছনে তো কম ঘোরা হল না।

—যতদিন বেঁচে আছি ততদিন ঘুরব। আমরা চোখ বুজলে তখন তার যা হওয়ার হোক।

বাবা মাথা নেড়ে বলে—আমার মনে হয় না যে সে বেঁচে আছে।

বে-ফাঁস কথা। এ কথাটা মা কোনদিন সহ্য করতে পারে না। দাঁড়িয়ে পড়ে মা হাঁফাতে থাকে। তীব্র স্বরে বলে—তোমার কেবল ঐ কথা। কিন্তু সে গেছে বলে যতদিন না জানতে পারছি ততদিন তোমাকেও ঘুরতে হবে। আমাকেও। মার কাছে ছেলে যে কী তা কোনদিন বাবা বুঝতে পারে না।

বাবা সঙ্গে সঙ্গে নরম হয়ে গিয়ে বলে—আমি তো ঘুরিই। ঘুরি না? বল!

আবার তারা হাঁটতে থাকে। আগু-পিছু হয়ে। অচেনা পাখিরা ডাকে। গাছের ছায়ায় শীত জমে ওঠে। ঠাণ্ডা মাটি থেকে শীতলতা উঠে আসে। চারদিকে রহস্যময় আলো-আঁধারি। এর মধ্যেই কোথাও অলক্ষ্যে নয়নও চলেছে সঙ্গ দিয়ে। হয়তো পাখি হয়ে। হয়তো গাছের ছায়া হয়ে। শ্যামার বড় ভয় করে।

এখানকার তাড়িটা ভালই। নয়ন ঠোঁটের ফেনা মুছে নেয়। এখন ঠিক এই সময়ে তাড়ি খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না তার। অনেক কাল নেশা-ভাঙ করে নি সে। ছেড়েই দিয়েছে। কিন্তু কে জানত যে এখানে কলকাতা থেকে মাত্র চল্লিশ কি পঞ্চাশ মাইল দূরে, ভর দুপুরে এমন শীত করবে! নেশাটা সেই জন্যই করা। তবু, যাকে ঠিক নেশা বলে তা হয় নি।

তাড়িটা কিন্তু ভালই। খারাপ কিছু মেশায় নি। পরিষ্কার গন্ধ, চন্‌চনে স্বাদ। শীত ভাবটা কেটে গেল। ভাঁড়টা ফেলে দিয়ে বলল—তোমাদের এখানে এত শীত কেন হে?

—শীত হয় না এ সময়ে। ক'দিন বৃষ্টি গেল পরের পর। আজ দুদিন টেনে হাওয়া দিচ্ছে দেখছি। তাড়িওয়ালা যুবকটি বলল।

একটু আগে শ্যামা তার মা বাবার সঙ্গে নেমেছে। কোথায় যাবে তা নয়ন জানে। তাই পিছু নেয় নি, হাট পেরিয়ে দক্ষিণে গেলে একটা বাঁশের সাঁকো আছে। সেইটে দিয়ে পেরিয়ে নয়ন সর্টকাট্-এ আমবাগানের গহীন জায়গাটায় পৌঁছে যাবে। তাড়া নেই। ওরা যে জোরে হাঁটবে না—এ তো জানা কথা।

নয়ন হাই তুলে জিজ্ঞেস করে—চাষবাস কর?

—আজ্ঞে না। বাবা করে একটু আধটু, বছরের চালটা উঠে আসে। আমার একটা চায়ের দোকান আছে বল্লভপুরে।

—তালগাছ কটা?

—অনেক। ঐটাই তো বাঁচিয়ে রেখেছে। বলে হাসে তাড়িওয়ালা।

—ঝাণ্ডাওয়ালারা গাঁয়ে আসে না?

—আসে।

—কোন্ ঝাণ্ডা বেশী আসে?

—সব রকমই। সবাই ভাল ভাল কথা বলে।

—তোমরা কোনু ঝাণ্ডার দলের?

—সে কি বলা যায়? আমরা এখন চালাক হয়ে গেছি!

—ভোট-টোট দাও?

—দিই মাঝে মাঝে।

নয়ন হাসে। বলে—খুব চালাক হয়ে গেছ তোমরা। ফসল-টসল কেমন হয়?

—হয়। এদিকটায় বৃষ্টি বেশ। আমনের ফসল ভাল এবার।

—ফসল রাখতে পার? কেটে নিয়ে যায় না?

—নেয়, আবার রাখিও। যে যেমন পারে।

নয়ন লোকটার চোখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। লোকটা চোখ নামিয়ে নেয়। নয়ন হেসে বলে—তোমরা খুব চালাক হয়ে গেছ।

চন্‌চনে খিদে পেয়েছে। নয়ন মাটিতে বসে ছিল, এবার উঠল। উঠতেই টের

boiRboi.net

পেল প্যান্টের পিছন দিকটা ভেজা-ভেজা। বৃষ্টি হয়ে গেছে খুব। মাটির ভিতরে চোরা জল। রসস্থ মাটি। নয়ন কয়েক পা জুতোর হিল চেপে হেঁটে দেখল নরম মাটিতে জুতো বসে যাচ্ছে।

পাশেই তেলেভাজার দোকান। সেখানে বেশ ভীড়। গন্ধটাও ছেড়েছে ভাল। কিন্তু যে লোকটা ভাজছে তার কব্জির কাছে একটা শ্বেতীর মত দাগ দেখে নয়ন আর তেলেভাজা কিনল না। তিনটে কাঁচা মুরগীর ডিম কিনে চায়ের একটা স্টলে গিয়ে দু কাপ চা খেল পর পর। তারপর বাচ্চা ছেলেটাকে ডিম তিনটে দিয়ে খুব অবহেলায় বলল—সেদ্ধ করে দে।

ছেলেটা একপলক নয়নের চোখে চোখ রাখল। তারপর চায়ের কেটলির পাশেই উনুনের ওপর একটা মগে সেদ্ধ চাপিয়ে দিল।

তিনটে সেদ্ধ ডিমের প্রথমটা খেতেই বিস্বাদে ভরে গেল নয়নের মুখ। নেশার মুখে সেদ্ধ ডিম বড়ই পানসে। কোনক্রমে আঁশটে গন্ধের দলাটা গিলে সে দুটো ডিম পকেটে রাখল। তারপর ফিরে এল তাড়িওলার কাছে।

—আর এক ভাঁড়।

তাড়িওলা ভাঁড় হাতে দিয়ে বলে—নির্ভয়ে খান। এর নেশা খুব পাতলা। বাবু, আপনার কোন্ ঝাণ্ডা?

নয়ন ভাঁড় মুখে দিয়ে কুলকুচো করে মুখের বিস্বাদ তাড়িয়ে বলে—জানলে যদি প্যাঁদাও বাপু!

লোকটা হেসে বলে—ওরে শ্বাস্ রে। কলকাতার বাবু আপনারা, ধমক দিলে হেগে মুতে ফেলি।

—খুব চালাক, না? আমার ঝাণ্ডা লাল, বুঝলে? তবে লালটা অনেকটা রক্তের মত, অন্য সব ঝাণ্ডার সঙ্গে মেলে না। আমার নিজের ঝাণ্ডার রঙকে আমি নিজেই ভয় পাই।

লোকটা হেঁয়ালি শুনে চেয়ে থাকে।

নয়ন দাঁড়ায় না। এবার রওনা হওয়া উচিত। শ্যামা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। নয়ন হাঁটতে থাকে। দু পকেটে দুটো ডিম ফুলে থাকে। নয়ন গ্রাহ্য করে না। লম্বা পায়ে হাটটা পেরিয়ে সে একটা ঢিবির ওপর উঠে আসে। দক্ষিণে সাঁকো, সঠিক জায়গাটা চেনে না নয়ন। এগিয়ে বাঁশঝাড়টা পেরোলে বোঝা যাবে। নয়ন হাঁটতে থাকে। হেমন্তের দুপুরকে শূন্য করে দিয়ে হু-হু করে একটা কোকিল ক্ষণেক ডেকে উঠেই চুপ করে যায়। নয়ন ঢিবির উৎরাইটা দৌড়ে নামতে নামতে অবিকল কোকিলের ডাকটা ডাকতে থাকে। কুহু-কুহু-কুহু…

শ্যামা যতক্ষণ পৃথিবীতে আছে ততক্ষণ ক্লান্তি নেই। সে এখানে এসেছে শ্যামারা আসবার তিন চার ঘণ্টা আগে। নয়নের হাতে ঘড়ি নেই। থাকলে ঠিক সময়টা বোঝা যেত। ঘড়িটা ইচ্ছে করেই পরে নি নয়ন। যখন শ্যামার জন্য সে কোথাও যায় তখন সে সময়ের পরোয়া করে না। তখন তার কাছে জীবনটাই একটা অখণ্ড, অনন্ত সময়। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, কতদূর যেতে হবে তার কোন ঠিক থাকে না। তবে সবটুকু সময় দেওয়ার জন্য সে প্রস্তুত থাকে। যখন নয়ন

boiRboi.net

এখানে এসেছে তখন হাটটা ভাল করে জমে নি। ব্যাপারীরা আসছে সবে, চত্বরটায় তখনও বিশৃংখলা। জিনিসপত্রের টাল জমছে, চায়ের দোকানের উনুনে তখনও আঁচ পড়ে নি। গত তিন চার ঘণ্টা ধরে নয়ন হাটটাকে জমে উঠতে দেখেছে।

কিংবা বলা যায় নয়ন কিছুই দেখে নি। তার চারধারে পৃথিবীর কিছু অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় মানুষেরা অকারণে ভীড় জমিয়েছে—এটুকুই মাত্র সে টের পেয়েছে। শ্যামা যতক্ষণ আসে নি ততক্ষণ এ জায়গাটার কোন সৌন্দর্য ছিল না, তাৎপর্য নয়। ততক্ষণ সে অদূরে তাড়ির কলসীটাও লক্ষ্য করে নি। শ্যামাকে বাস থেকে নামতে দেখে লুকোবার সময়ে সে গিয়ে প্রায় তাড়িওয়ালার গায়ে হোঁচট খেল। তখনই টের পেল। উত্তুরে হাওয়া দিচ্ছে, এ জায়গাটায় শীত পড়েছে বেশ।

বাঁশ-ঝাড়ের পাশ দিয়ে পায়ের রাস্তটা ঘুরে গেছে। ঝরা বাঁশপাতায় পুরু গালচের মত হয়ে গেছে রাস্তা, পা রাখলে নরম লাগে। আরও দুবার কোকিলের ডাক ডাকল নয়ন।

বাঁশ-ঝাড়টা পেরলেই দেখা যায় শ্মশান। চাতালটা খাঁ খাঁ করছে। গত রাতে কারা মড়া পুড়িয়ে গেছে, কালো আংরার দাগ ছড়িয়ে আছে, ইতস্তত কাঠকয়লা। ওদের ঘর অনতিদূরে। খোড়ো ঘরের সামনে বসে এক মধ্যবয়সী মেয়েছেলে নিজের রুক্ষ চুলে আঙুল ডুবিয়ে উকুন খুঁজছে।

—এ ধারে নদীর ওপর একটা বাঁশের সাঁকো আছে না? নয়ন তাকে জিজ্ঞেস করে।

মেয়েছেলেটা তাকে চোখ ছোট করে একপলক দেখে নিয়ে বলে—সে তো ভেঙে গেছে প্রায়। আরো দক্ষিণে।

—পেরোন যাবে না?

মেয়েছেলেটা উদাস গলায় বলে—কে জানে! লোকে তো এখনও পার হয়।

গত তিন চার ঘণ্টা উগ্র উত্তেজনায় শ্যামার জন্য অপেক্ষা করছে নয়ন। কিছু খায় নি। চনচনে খিদের মুখে পাতলা তাড়িটা তাকে ধরেছে ভাল। গা জবালা করছে। ঘামে ভিজে যাচ্ছে ভিতরের গেঞ্জি। গলা বুক শুকিয়ে আসছে। কিন্তু এগুলো কিছুই গ্রাহ্য করার মত ব্যাপার নয়। খিদে-তেষ্টা, শীত-গ্রীষ্ম কোথায় যে উড়ে যায় এসব সময়ে! চারদিকটা নির্জন হয়ে যায় যেন। কেবল নয়ন থাকে, থাকে শ্যামা।

নয়ন জানে, শ্যামা তাকে দেখেছে। দেখে নিশ্চয়ই সাবধান হয়ে গেছে সে। ঐ আমবাগানে আবার তাকে পিছু নিতে দেখলে শ্যামা কি করবে? সেবার পিকনিক গার্ডেনসে তার কলেজের বান্ধবী আর বন্ধুদের সঙ্গে যখন গিয়েছিল শ্যামা তখনও এইরকম ভাবে দেখা হয়েছিল। শ্যামা তাকে দেখেছিল কিন্তু কিছু করে নি। যদি ইচ্ছে করত শ্যামা, যদি নয়নের সেই পিছু-নেওয়ার কথা বলে দিত তার বন্ধুদের তবে সেইসব বন্ধুরা পিষে ফেলতে পারত নয়নকে। কিন্তু শ্যামা অতটা করে নি। শ্যামা সে রকম মেয়ে নয়। নিষ্ঠুরতা তার স্বভাবে নেই। আবার শ্যামার মত নিষ্ঠুরও হয় না।

বাঁশঝাড়, কাঁটাঝোপ, বন-করমচার ভিতর দিয়ে উঁচু নিচু পায়ের রাস্তা চলে গেছে। জঙ্গুলে জায়গা, ঘরবাড়ী বড় একটা দেখা যায় না। বাঁ ধারে আবাদ দেখা যায়

গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে। সিকি মাইল গিয়ে নয়ন বাঁশের সাঁকোটা দেখতে পেল। চারদিকে হেমন্তের পাতাঝরা গাছ। নির্জন শীতলতা। সেই নিঝুমতায় বাঁশের সাঁকোটা বুড়ো জীর্ণ হয়ে ঝুলছে। জলে ছায়া দেখছে নিজের। কাছে গিয়ে নয়ন দেখে, পা রাখার জন্য একটি মাত্র বাঁশ অবশিষ্ট আছে, আর দু ধারে ধরার বাঁশ নেই। পার হওয়া বেশ শক্ত। কিন্তু ওপাড়ে শ্যামা আছে, নয়নের কিছুই তেমন শক্ত মনে হয় না।

বার বার পা পিছলে গেল, ভারসাম্য হারিয়ে পড়তে পড়তে ঝুলে আবার উঠতে হল, তবু হামাগুড়ি দিয়ে সাঁকোটা ঠিকই পার হয়ে গেল নয়ন। তারপর নিবিড় ছায়ায় আচ্ছন্ন বনভূমিতে ঢুকল। তারপর কেবল পাখির ডাক, আর ঝিঁঝির শব্দ এবং বন্য গাছের আর ভেজা মাটির গন্ধ। আগাছা, ঝোপ আর ছায়ার ভিতর দিয়ে রাস্তাটা গেছে। কিন্তু এ রাস্তায় যে লোক চলাচল খুব কম তা রাস্তার অস্পষ্ট চিহ্ন দেখলেই বোঝা যায়। পায়ে হাঁটা রাস্তার মাঝখানে ঘাস উঠেছে।

পাখির ডাক নকল করতে করতে নয়ন হাঁটে। যত বিচিত্র ডাক শোনে ততই বিচিত্র ডাক সে হুবহু নকল করে। ভর-দুপরে খিদে পেটে তাড়িটা গেঁজে উঠছে। নয়নের চোখের পাতা ভারী ভারী, শরীরের ভিতরটা ঘুম ঘুম। হাই উঠছে। কোন গাছের ছায়ায় শরীরটা একবার পেতে দিলে দিনটা নিঃসাড়ে কেটে যাবে। কিন্তু সে কথা নয়ন ভাবতেই পারে না। সে এগুচ্ছে পশ্চিম দিক থেকে পুবে। শ্যামা এই বনভূমিরই উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে আসছে। রাস্তায় তাদের দেখা হবে। এখন এই আমবাগানের বাতাসে শ্যামার গন্ধ আছে, স্পর্শ আছে। নয়নের হাজার বছর ধরে জেগে থাকতে ইচ্ছে করে।

কিছুদূরে গিয়েই নয়ন ভগ্নস্তূপটা দেখতে পায়। বিশাল বাড়ি ছিল কোনকালে। অনেকটা জায়গা জুড়ে ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে। মাঝখানে বাড়িটার দেয়ালগুলো দাঁড়িয়ে আছে। ইঁটের ভিতর থেকে, মেঝে থেকে বড় বড় গাছ উঠেছে। চারদিকেই ছড়ান ইঁট—পুরোনো শ্যাওলায় কালো। পায়ে-হাঁটা পথটা ভগ্নস্তূপটা এড়িয়ে ঘুরে গিয়ে অদূরে রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। কিন্তু সে পথে যায় না নয়ন। গেলে রাস্তা থেকে তাকে স্পষ্ট দেখা যাবে। সে রাস্তা ছেড়ে ধ্বংসস্তূপটার ভিতরে উঠে যেতে থাকে।

যেখানে ইঁট সেখানেই সাপ। পুরোনো বাড়ি, ইটের খাঁজ, এ হচ্ছে সাপের প্রিয় আস্তানা। নয়ন তা জানে, তবু সাপের কথা তার মনেই আসে না। আকীর্ণ শ্যাওলায় পিছল ইঁটের খাঁজে খাঁজে পা রেখে, হোঁচট খেয়ে, তাল সামলে সে বাড়িটার দিকে উঠে যায়। ঐ বাড়ির উঁচু ভিত থেকে রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যাবে। দেখা যাবে শ্যামাকেও। দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখবে নয়ন। বিপদআপদের কথা তার মনেও থাকে না।

ওরা আসছে ঘুর রাস্তায়, আস্তে হেঁটে। নয়ন এসেছে চোরা পথে, অনেক তাড়াতাড়ি। তবু নয়নের হঠাৎ ভয় হয় শ্যামা জায়গাটা পেরিয়ে যায় নি তো! তাড়ির ঘোরে তার হয়তো সময় জ্ঞান নষ্ট হয়ে গেছে। সে হয়তো খুব আস্তে হেঁটেছে।

মোটা মোটা কয়েকটা থাম দাঁড়িয়ে আছে। বেশ পুরু দেয়াল। এখন কোথাও

boiRboi.net

কোথাও দেয়ালে পঙ্খের কাজের চিহ্ন দেখা যায়। থামের শীর্ষে কিছু কারুকাজ। একটা লোহার বরগা আড়াআড়ি মাথার ওপর রয়ে গেছে আজও। আগাছা ভেদ করে নয়ম ক্রমে বাড়ির ভিতের ওপর উঠে আসে। চারিদিকে রহস্যময় ফাটল, ভিতের ভিতরে হাঁ করা জায়গাগুলোতে পাতালের অন্ধকার। চারদিকেই কাঁকড়া বিছেদের আস্তানা। একটা পিপাসা, একটা শিরা ছিঁড়ে যাওয়া প্রতীক্ষায় তার শরীরটা টান টান। বুকের ভিতরটা ধক্ ধক্ করে, চোখ জ্বলে, ঠোঁট শুকিয়ে আসে, জ্বর জ্বর লাগে শরীর। তাড়িটা না খেলেই পারত সে। শরীরটা এখন কেমন কাঁপছে। খিদে মরে গিয়ে দুর্বল লাগে হাত পা। ঘুম পায়।

নয়ন জানলা দরজাহীন দেয়ালগুলোর ভিতর দিয়ে এদিকে ওদিকে একটু ঘুরে দেখে। চারদিকে স্তূপ হয়ে ইঁট, বালি আর রাবিশ পড়ে আছে। ঘুরে ঘুরে সে আসে সামনের দিকটায়। একটা প্রকাণ্ড থাম দেখতে পেয়ে দাঁড়ায়। একটু বসতে ইচ্ছে করে তার। কিন্তু বসে না। হাত বাড়িয়ে থামের গায়ে ভর দেয়। পরমুহূর্তেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে ওঠে। তার মনে হয়, ভর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই থামটা একটু দুলে উঠল। সে সভয়ে প্রকাণ্ড উঁচু থামের দিকে চায়। তারপর হাসে। ভয়টা কেটে যায়। হয়তো তাড়ির নেশায় ভুল বুঝেছে ভেবে আবার থামটার গায়ে ভর রাখে, আবার মনে হয়—থামটা দুলে উঠল। কিন্তু এবার আর চমকে সরে গেল না নয়ন। ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে অন্যমনে নির্জন রাস্তাটার দিকে চেয়ে রইল। ভাঙা চোরা রাস্তা, দু ধারে গরুর গাড়ির চাকার খাদ, সেই খাদে কাদা জমে আছে। সারা বছর ওই কাদা কমই শুকোয়। চারদিকে পাখি ডাকে। কেবল পাখি ডাকে। অন্যমনে বে-খেয়ালে নয়নও ডাকতে থাকে। প্রথমে দোয়েলের মত, তারপর কুবো পাখির শব্দ করে, তারপর কোকিলের মত ডাকে।

তারপর ক্লান্তি লাগে। হরবোলা হয়ে থেকে কোন লাভ নেই। চাই নিজস্ব একটি শব্দ, নিজস্ব ডাক। নিজের শব্দটা কোনদিনই খুঁজে পায় না নয়ন। চব্বিশ বছর বয়স হয়ে গেল। ক্লান্তি লাগে, তবু অভ্যাসবশত সে ডাকে। প্রায় সমস্ত শ্রুত শব্দই হুবহু গলায় তুলে আনতে পারে সে। পাখপাখালীর বিচিত্র ডাক, চাঁদের দিকে চেয়ে কুকুরের কান্না, বেড়ালের বিবাদ, ইঞ্জিনের হুইশ্‌ল, কিংবা এরকম অনেক কিছু। কিন্তু হরবোলা হয়ে থাকার ক্লান্তি বড় ভীষণ। সে তো ওইসব শব্দের কোনটারই মূল উৎস নয়! সে পাখি নয়, শেয়াল কুকুর বা রেলইঞ্জিনও নয়। সে নয়ন রায়। তার নিজস্ব শব্দ কোন্‌টা? কোথায় তার নিজের ডাক? যে ডাক শুনলে শ্যামা সাড়া দেবে?

দূর থেকে একটা মেয়েলী গলার অস্পষ্ট স্বর শুনতে পেল নয়ন। উৎকর্ণ হয়ে রইল। তার গায়ে দিল কাঁটা। একটু শুনেই বুঝল এ শ্যামা বা তার মায়ের গলা নয়। বোধহয় একটা বাচ্চা ছেলে তার বাবাকে ডেকে কিছু বলল, একটা পুরুষের গলা উত্তর দিল। ভগ্নস্তূপের দক্ষিণে বনের মধ্যে তারা কিছু খুঁজছে। গাঁ-গঞ্জের লোকেরাই হবে। নয়ন গা করল না। হাত বাড়িয়ে বুক-সমান আগাছার জঙ্গল থেকে একটা ডাল ভেঙে দাঁতে চিবোতে লাগল। তিতকুটে স্বাদ, গন্ধও বিচ্ছিরি। কিন্তু সেসব তেমন খেয়াল করে না সে। অন্যমনে ডালটা চিবোতে থাকে।

boiRboi.net

—কোনও সুখই কখনও পরিপূর্ণ নয়, বুঝলে! আমাকেই দেখ, চিরকাল ভাল চাকরি করেছি, পয়সা যথেষ্ট পেয়েছি। ছেলেমেয়ের দিক থেকেও সুখীই ছিলাম। একটা ছেলে একটা মেয়ে—সুস্থ সবল। কোথা থেকে কি হয়ে গেল—

—তুমি রাস্তা দেখে চল। হোঁচট খাচ্ছ।

বাবা রাস্তা দেখতে গিয়ে ঝুঁকে লাঠিটা বার কয়েক ঠোকে। তারপর একটা 'হু-উম' শব্দ করে আপনমনেই বলে—কোন সুখই চিরস্থায়ী নয়।

অদূরে একটা শেয়ালের হাসি শোনা যায়। পরমুহূর্তেই একটা কোকিল হু-হু করে ডেকে উঠেই স্তব্ধ হয়। বাবা থমকে দাঁড়িয়ে বলে—শেয়াল ডাকছে।

মা বলে—তাতে কি। এসব জায়গায় শেয়াল তো থাকবেই।

বাবা চিন্তিত মুখখানা ফিরিয়ে বলে—সে কথা বলছি না। দিনের বেলা শেয়াল বড় একটা ডাকে না।

—তোমার বাপু বড় ভয়।

বাবা ভ্রূ কুঁচকে বলে—কোকিলটাই বা হঠাৎ ডেকে উঠে থেমে গেল কেন?

—তাতেই বা কি?

—কিছু না।

শ্যামার বুকটা খামচে ধরে এক ভয়। শেয়ালের ডাক নয়ন হুবহু ডাকতে পারে, তা শুনলে কারও অন্যরকম সন্দেহই হবে না। কিন্তু এ ডাকটা যেন শেয়ালের ডাকের মধ্যে একটু বিদ্রূপ মিশিয়ে দেওয়া। নয়ন কি তাই করছে? কোকিলের ডাক ডেকেই সে চুপ করে গেল কেন? সে কি শ্যামাকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য যে, সে এখানে আছে, অদূরে?

হরবোলা নয়নকে বাবা তো জানে। যদি নয়ন ডাকগুলো ঠিকমত না ডাকে তবে বাবা বুঝতে পেরে যাবে। বুঝলে কী হবে তা শ্যামা ভেবে পায় না।

একটা বুনো ঝোপের পাশ দিয়ে রাস্তাটা বেঁকে গেছে। সেই বাঁকটা ঘুরতেই বাবা বাহারী লাঠিগাছ তুলে হেঁকে বলল—ঐ দেখ, কোন রাজারাজড়ার বাড়ির ধ্বংসাবশেষ। কি বিরাট বাড়ি ছিল, অ্যাঁ!

—দেখছি।

শ্যামাও দেখল। বাঁ ধারে, রাস্তা থেকে দূরে নয়, কয়েকটা থাম গম্বুজ পুরু দেয়াল মিলিয়ে বিশাল এক বাড়ি। তাতে অশ্বত্থ, বট, আগাছার জঙ্গল। কিছু একটা আন্দাজ করে শ্যামা চেয়ে ছিল। হঠাৎ সে দেখল কিংবা তার চোখের ভুলও হতে পারে—বিশাল ভারী একটা থাম যেন খুব সামান্য একটু দুলে গেল। পলকে মুখ সাদা হয়ে গেল শ্যামার। সে কোথাও কাউকে দেখে নি, কিন্তু হঠাৎ খুব নিশ্চিতভাবে তার মনে হল, নয়ন ঐখানে আছে। ওই থামটার আড়ালে। ওইখান থেকেই সে শ্যামকে উদ্দেশ্য করে বিদ্রূপ মেশান শেয়ালের ডাক ডেকেছিল, কোকিল ডেকে থেমে গিয়েছিল। থামটা কি নড়ল সত্যিই? যা পুরোনো বাড়ি নড়তেও পারে।

boiRboi.net

যদি থামটা ভেঙ্গে পড়ে এখন, যদি চাপা পড়ে মরে যায় নয়ন, তবে কি শ্যামা দুঃখ পাবে! ঠিক বুঝতে পারে না শ্যামা।

অনেক নীল আর বেগুনে বুনো ফুল ফুটে আছে।

—মা, আমি কয়েকটা ফুল তুলি। কি সুন্দর ফুল! শ্যামা বলে।

—এসব জঙ্গলে সাপখোপ আছে।

—কিছু হবে না। কয়েকটা তুলব।

মা বাবা দুজনেই অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। দাদার কথা উঠলেই তাদের এরকম হয়।

—আমরা দাঁড়াই, তুই তোল। মা বলে।

শ্যামা মাথা নাড়ে—দাঁড়াবে কেন? তোমরা এগোও না। খা আস্তে হাঁট তোমরা, আমি ঠিক পা চালিয়ে ধরে ফেলব।

—দেরি করিস্ না কিন্তু! এই বলে ব্যাপারটায় আর গুরুত্ব না দিয়ে বাবা আর মা হাঁটতে থাকে। দুজনে এখন দাদার কথা বলবে, শ্যামার জন্য দুশ্চিন্তা এখন অবান্তর।

শ্যামা তাই চায়। তার ধারণা, ওই পুরোনো ভেঙ্গে-পড়া বাড়ির কোন ঘুপচিতে ঠিক নয়ন আছে। কোন যাদুবলে নয়ন ঠিক তাদের আগে আগে এসেছে, অপেক্ষা করছে। এটা ভাল নয়। শ্যামা একবার নয়নের মুখোমুখি হতে চায়। এই নির্জন জায়গায় বিপজ্জনকভাবে পিছু নিয়েছে নয়ন? ঠিক ধরা পড়ে যাবে। বাবা যদি দেখতে পায় নয়নকে। গত মাসেও একবার বাবার প্রেসার দুশো ছাড়িয়ে গিয়েছিল। একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। দরকার হলে শ্যামা নয়নের পায়ে ধরে বলবে—ফিরে যাও। শ্যামা তাই বাবা মাকে এগিয়ে দিতে চায়। এখন একা এই বনভূমিতে বেরিয়ে আসুক নয়ন। শ্যামা মুখোমুখি হবে।

বাবা আর মা এগিয়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে চলে গেল। কিছুক্ষণ তাদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল দূর থেকে। শ্যামা একটু অপেক্ষা করে রাস্তা ছেড়ে বুনো ঝোপগুলোর কাছে এসে দু একটা ফুল তুলল অন্যমনস্কভাবে। ফুলের প্রতি তার তেমন কোন মোহ নেই। গন্ধহীন এইসব বুনো ফুল দিয়ে কী করবে শ্যামা!

শ্যামা কেবল বারবার প্রকাণ্ড ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকায় আর অপেক্ষা করে। নয়ন সমস্ত ব্যাপারটাই দেখেছে। দেখেছে শ্যামার মা বাবা এগিয়ে গেল শ্যামাকে একা রেখে। দেখেছে, শ্যামা এখন একা। এরকম সুযোগ নয়ন ছাড়বে না নিশ্চয়ই?

কিন্তু অপেক্ষা করে লাভ হল না—সমস্ত বনভূমি নির্জন। কোথাও নয়নের সাড়াশব্দ নেই। তবে কি সত্যিকারের শেয়ালই ওরকম ডেকেছিল? নয়ন নয়? শ্যামা একটু দ্বিধায় পড়ে যায়। বনভূমির কোন গভীর থেকে দুটো অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনতে পায় শ্যামা। কে যেন কাকে ডাকছে। চারদিকে নির্জন, গভীর ছায়া, শ্যামার গা ছম ছম করে। বাতাস দেয়, শীত করে শ্যামার। একটু পিপাসা, জ্বরভাব, একটু ভয়—এইসব মিলে এমন সুন্দর ছায়ায় ঢাকা দুপুরটা অস্বস্তিকর লাগে শ্যামার কাছে।

অনেকটা জমি ফাঁকা ফাঁকা। কয়েকটা বুনো ফুল আর কাঁটাঝোপ ছাড়া

বাড়িটার সামনের জমিতে কিছু নেই। চারদিকে একসময়ে উঁচুঘেরা-পাঁচিল ছিল। সেই পাঁচিল ভেঙ্গে পড়ে গেছে। কোথাও কোথাও শুধু কয়েকটা অদ্ভুত চেহারার ইঁটের গাঁথনি দাঁড়িয়ে আছে। ভাল করে দেখার জন্য শ্যামা কয়েক পা এগিয়ে গেল। তারপর ডাকল নয়ন! নয়ন…

কেউ সাড়া দিল না। কিন্তু একটু দূরে থেকে একটা ঘুঘু পাখির ডাক শোনা গেল। শ্যামা উৎকর্ণ হয়ে শুনল। কিন্তু কিছু বোঝবার উপায় নেই। নয়ন সব ডাকই হুবহু ডাকতে পারে। যখন ডাকে তখন নয়ন সত্যি সত্যই পাখি হয়ে যায়, কিংবা জীবজন্তু। মানুষ থাকে না। নয়নের ওই রহস্যময়তা মাঝে মাঝে শ্যামার বুকে ভয় হয়ে থাবা গেড়ে বসে।

চারদিক আকীর্ণ পুরোনো বাড়িটার ভেঙে-পড়া ইট, কাঠ আর আবর্জনার ভিতরে শ্যামা নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে রইল। ছায়া দোলে, একটা পাথরের ফোয়ারার চারধারে গোল জলাধার দেখা যায়। জল নেই, গাছ গজিয়েছে। ফোয়ারার মুখ কাৎ হয়ে পড়ে আছে মাটিতে। তার পাশেই একটা গোলাপ গাছ। একটা লাল গোলাপ ফুটে আছে একা। শ্যামা একটু এগিয়ে গোলাপটা তুলে নিল। তারপর ফিরে এল রাস্তায়। আপাদমস্তক শিউরে উঠে দেখল, নয়ন তার মুখোমুখি রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে হাসি। কোমরে হাত।

ধক্ ধক্ করে শ্যামার বুকের ভিতরটা নড়ে গেল। সে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল নয়নের দিকে। হলুদ জামা আর পাকা জলপাই-রঙের প্যান্ট নয়নকে তেমন কিছু ভয়ংকর দেখাচ্ছে না। নয়নের উচ্চতা স্বাভাবিক, স্বাস্থ্য মাঝারি, মুখখানা একটু ভাঙাচোরা হলেও কমবয়সের লাবণ্য আছে! গালের দাড়ি এখনও নরম। গোঁফ জোড়া ছাঁটে নি বলে অনেক বড় হয়ে গাল পর্যন্ত পেঁচেছে। গায়ের রং না-ফর্সা, না-কালো। একনজরে দেখলে নয়নের ভিতরে দেখবার কিছু নেই। ঘেন্না বা উপেক্ষারও কিছু নেই। বড় বড় চুলে ঘেরা মুখখানায় কেবল চোখ-জোড়াই যা একটু অন্যরকম। শ্যামার দাদার অনেকটা এরকম চোখ ছিল। নয়নের চোখজোড়া খুব নিষ্ঠুর। তাতে সহজে পলক পড়ে না। চোখের তারায় একটু কটা ভাব। মণির মাঝখানে দুটো ছ্যাদা দূর থেকেও দেখা যায়। শ্যামার দাদা বিবেকানন্দর ভক্ত ছিল। খুব ধর্মের বই পড়ত। একা একা ধ্যান করত অনেক রাত পর্যন্ত ঘরে। সাদা দেয়ালে একটা ছোট্ট ফোঁটা বা চিহ্ন দিয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকত। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, কলিযুগেও মানুষ ইচ্ছে করলে তিন দিনে ব্রহ্মজ্ঞানী হতে পারে। দাদা একবার চেষ্টা করেছিল তিন দিনে ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়ার। একদিন সেই চেষ্টায় সকাল থেকে খিল দিয়ে বসল, বহু ডাকাডাকিতেও সাড়া দিল না, দরজা খুলল না। দ্বিতীয় দিনও না। সেদিন পাড়ার লোক জড় হয়ে গেল বাড়িতে, মা কাঁদতে শুরু করে, বাবা অফিসের কাজে বাইরে মফঃস্বলে গিয়েছিল, ফিরে এসে রাগারাগি শুরু করে। দ্বিতীয় দিন রাত্রে দরজা ভেঙে যখন দাদাকে বের করা হয় তখন তার চোখ ঘোলাটে লাল, মুখে রক্ত ফেটে পড়ছে, ভুল বকছে। সেই ভুল বকা চলতেই থাকল। বড় ডাক্তার দেখে বলল—পাগলামি শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই, আপনারা টের পান নি। অনেক পাগল এরকম থাকে, বোঝা যায় না। মানুষের নিষ্ঠুরতার শেষ নেই। যখন বাড়িতে

একমাত্র ছেলের জন্য উদ্বেগে দুশ্চিন্তায় সকলের খাওয়া ঘুম ছুটে যাচ্ছে, তখন অন্যধারে পাড়ার ছেলেরা দাদাকে দেখতে পেলেই 'ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রহ্মজ্ঞানী' বলে চীৎকার করে ক্ষ্যাপাত। ব্রহ্মজ্ঞানী শব্দটা শুনলেই চন্‌মন্‌ করত দাদা, বড় বড় চোখে চারদিকে তাকাতো। অবিরল কথা বলতে থাকত। অর্থহীন কথা। বোঝা যেত, সে যা বলতে চায় তা বাক্য হয়ে বেরোচ্ছে না। কিন্তু সে একটা বিশেষ কথা বলতে চায়। তার কিছু বলার আছে। সেই সময়ে দাদার চোখ ছিল অনেকটা নয়নেরই মত। শ্যামার মাঝে মাঝে নয়নকে ডাক্তারের সেই কথাটা বলতে ইচ্ছে করে—তোমার পাগলামীর শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই, তা বুঝতে পারছ না নয়ন। কিন্তু তা বলে না শ্যামা। বললে নয়ন বুঝি সত্যিকারের পাগলই হয়ে যাবে।

নয়ন দু পা এগিয়ে এসে বলে—কার জন্য গোলাপ ?

শ্যামা কিছুক্ষণ তার দিকে স্থির তাকিয়ে থেকে বলে—তুমি কেন এসেছ নয়ন ?

—আগে বল গোলাপ কার জন্য ?

শ্যামা শ্বাস ছেড়ে বলে—নয়ন, তোমাকে দেখলে বাবা কি রকম ক্ষেপে যায় জান তো ! গত মাসেও একবার প্রেসার দুশো ছাড়িয়ে গিয়েছিল। উত্তেজনা বাবার পক্ষে ভাল নয়। তোমাকে কতবার বলেছি !

নয়ন তার অকপট মুখে হেসে বলে—যখন গোলাপটা তুলছিলে তখন কার কথা তোমার মনে পড়েছিল শ্যামা ?

—আমার বাবার জন্য তোমার কোন সিমপ্যাথি নেই। শ্যামা রেগে গিয়ে বলে—কোনদিন তুমি অন্যের কথা ভাব না। তুমি খুব বাজে হয়ে গেছ, দিন দিন আরো বাজে হয়ে যাচ্ছ।

কপালের ওপর এসে-পড়া ঝুরো চুলের একটা গুছি টেনে নিয়ে আঙুলে জড়াতে জড়াতে গম্ভীর হয়ে নয়ন বলে—আমি কেবল গোলাপটার কথা জানতে চাইছি শ্যামা। কার জন্য ওটা তুলেছ ?

—তুমি ফিরে যাও।

—শ্যামা, তোমার বাবা আমাকে দেখতে পাবে না, ভয় নেই। আমি তোমাদের রাস্তায় যাব না। আমি যাব জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, ছায়ার মত। পাখির ডাক ডাকতে ডাকতে যাব, তুমি ছাড়া কেউ বুঝবেই না যে আমি আছি।

বলে নয়ন সেই অকপট হাসি হাসে।

শ্যামা রেগে গিয়ে বলে—আমিও তো তোমাকে চাইছি না নয়ন। তোমার একটুও আত্মসম্মানবোধ নেই কেন ?.

নয়ন অবাক হওয়ার ভান করে বলে—আমাকে চাইছ না। তবে গোলাপটা কার জন্যে ?

—তুমি নও, সে তুমি নও।

সেই রকম অবাক হওয়ার ভান করে নয়ন বলে—নই ? আমি নই ? কেন নই শ্যামা ?

—তোমার কথা আমার মনেই থাকে না।

—খুব থাকে। বলে নয়ন হাসে—তুমি আমাকে ভয় পাও।

boiRboi.net

—তুমি ফিরে যাবে না ?

—তুমি আমাকে ভয় পাও কেন ? তোমার অতগুলো পুরুষ বন্ধুর কাউকে তো তুমি ভয় পাও না।

—তোমাকেও পাই না।

—পাও, আমি জানি।

শ্যামা স্তব্ধ হয়ে নয়নের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর বলে—ভয় পেলে তোমার জন্য একা দাঁড়িয়ে থাকতাম না।

নয়ন ভ্রূ তুলে চোখ বড় করে বলে—আমার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলে! তবে ফুলটা তুলবার সময়ে আমার মুখ তোমার মনে ছিল শ্যামা ?

—ইয়ার্কি কোরো না নয়ন। আমি সিরিয়াস্‌লি বলছি, আমার মন ভাল নেই।

—কেন ?

—তুমি সব সময় কেন আমার পিছু নাও ? তুমি তো জান কোনও লাভ নেই! কায়স্থের সঙ্গে আমার বাবা বিয়ে দেবেন না। তোমাকে দেখলে বাবার প্রেসার বেড়ে যায়।

নয়ন তেমনি অকপট হাসিমুখে বলে—তোমার বাবা জাত মানলেও তো তুমি আর মান না শ্যামা! তোমার বাবা আর কদিন ? ততদিন বরং অপেক্ষা করব।

শ্যামা মুখ নামিয়ে অসহায় ভাবে বলে—নয়ন, তুমি বয়সে আমার ছোট।

—ছোট!

শ্যামা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে—তুমি চলে যাও!

—আগে বল।

—বলব না।

—মেয়েরা বয়স লুকোয় অন্যের কাছে আকর্ষণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে। আমার কাছে তো তোমার সে ভয় নেই! তুমি তো আমাকে আকর্ষণ করতে চাও না! আমাকে তোমার ডেট অফ্ বার্থ বলতে ভয় কি ?

অনেকক্ষণ পরে শ্যামা এই প্রথম হাসল, বলল—নয়ন, স্কুল ফাইন্যাল সার্টিফিকেট অনুযায়ী আমার বয়স চব্বিশ।

নয়ন গম্ভীর মুখে বলে—আমারও তাই।

শ্যামা হেসে বলে—না, তোমার আরও কম। তাছাড়া সার্টিফিকেটে আমার বয়স আরও দু বছর কমানো আছে। আমার এখন ছাব্বিশ।

নয়ন হাসে—আমারও কমানো আছে, তিন বছর। আমার এখন সাতাশ।

—না! তোমার এখন বাইশ কি তেইশ।

—সাতাশ। বলে নয়ন হাসে। তারপর আস্তে আস্তে গম্ভীর হয়ে যায়। ব্যথিত মুখে বলে—জাত বা বয়স কিংবা তোমার বাবার মতামত এর কোনটাই তোমার প্রবলেম নয় শ্যামা, আমি জানি। তোমার আসল প্রবলেম কি ?

শ্যামা ভ্রূ কুঁচকে একটু চেয়ে থাকে, তারপর বলে—তুমিই আমার চারদিকে প্রবলেম তৈরি করছ। তুমি ছাড়া আমার আর কোন প্রবলেম নেই। তুমি দয়া করে

boiRboi.net

চলে যাও।

নয়ন তার সরল হাসিটি হেসে, শ্যামার রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে বলে—শ্যামা আমি ব্রাহ্মণ, আমার বয়স সাতাশ।

—তার মানে?

নয়ন শ্যামার মুখখানা তার কটাসে চোখে পান করতে করতে বলে—জাত বা বয়স দুটোই হচ্ছে ইমাজিনেশন, বেহেড কল্পনা। এক সময়ে সমাজের প্রয়োজনে জাত ভাগ করা হয়েছিল। সেটা ছিল একটা আইডিয়া, সেই সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয়। এখন সমাজ বদল হয়েছে, সেই প্রয়োজন আর নেই। রক্তের বিশুদ্ধতাও আর টিকছে না শ্যামা। মেডিকেল কলেজে যাও, দেখবে, কত কায়স্থ বৈশ্য শূদ্রের রক্ত কত ব্রাহ্মণের শরীরে ঢুকে যাচ্ছে। জাত-ফাত একাকার হয়ে যাচ্ছে।

—আমি তোমার মত ডাক্তারী পড়ি নি নয়ন। ওসব জানি না। আমার বাবা—

নয়ন সে কথায় কান না দিয়ে বলে—আর বয়স শ্যামা? বয়স আর একটা ইমাজিনেশন। মানুষের যে রূপান্তর হয়, পৃথিবীর যে পরিবর্তন হয় সেটা দেখেই মানুষ সময় নামে এক আপেক্ষিক কল্পনাকে আবিষ্কার করে। নইলে, সময় বলে যে সত্যিই কিছু আছে, তার কোনও প্রমাণ নেই। ঘড়ির কাঁটার অবস্থানের রূপান্তরই হচ্ছে সময়। যদি রূপান্তরকেই সময় বলে ধর, যদি পরিবর্তন বা অভিজ্ঞতাই বয়স হয় তবে বলি, আমার পরিবর্তন হয়েছে, অনেক অভিজ্ঞতা, বিপুল—সে হিসেবে আমার বয়স বোধহয় পঞ্চাশ ষাট।

—অত কথা শোনার সময় আমার নেই নয়ন, বাবা মা আমাকে না দেখে এক্ষুনি অস্থির হবে, হয়তো ফিরে আসবে।

সে কথাতেও কান দেয় না নয়ন। শ্যামার রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে থেকে বলে—সেবার যখন কয়েকজন শুয়োরের বাচ্চা আমাকে ইউনিভার্সিটির পাশের গলিতে ছোরা মারে তখন মেডিকেল কলেজে আমার শরীরে যারা রক্ত দিয়েছিল—আমার সেই চারজন বন্ধুই ছিল ব্রাহ্মণ। আমার শরীরের অর্ধেক রক্তই তাদের দেওয়া। সে হিসেবে আমি ব্রাহ্মণ হয়ে গেছি।

—নয়ন, আমাকে যেতে দাও, তুমি চলে যাও।

—শ্যামা, আমি ব্রাহ্মণ। আমার বয়স তোমার চেয়ে বেশী। এ কথা তুমি তোমার বাবাকে বলো।

—ওটা তোমার কথা নয়ন, আমার কথা নয়। আমি বাবাকে বলব কেন?

নয়ন একটু হেসে বলে—ঠিক আছে, তবে বলো না। কিন্তু অপেক্ষা কর শ্যামা, তোমার বাবা বেশীদিন নিশ্চয়ই বাঁচবে না; তারপর—

শ্যামার কান মুখ ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে, রাগে ঘেন্নায় সে প্রায় চেঁচিয়ে বলে—বার বার তুমি বাবার মরার কথা তোল কেন? নিজের ওপর তোমার ঘেন্না হয় না?

এক পা পিছিয়ে যায় নয়ন, তারপর তার অনাবিল হাসিটি হাসে। বলে—কেউ কি চিরকাল বেঁচে থাকে?

রাগে দুঃখে শ্যামার চোখ ছল্ ছল্ করে। অনেকক্ষণ সে চুপ করে চেয়ে থাকে নয়নের দিকে। গলার কান্না সামলায়, ঠোঁটের কেঁপে ওঠা থামায়। তারপর ধীর

গলায় বলে—কবে তোমার এই পাগলামী বন্ধ হবে নয়ন ?

—যে দিন আমার লাশ পড়ে যাবে।

কথাটা শ্যামাকে চমকে দেয়। আস্তে আস্তে বলে—ফিরে যাও নয়ন ফিরে যাও।

—আমার কি ফিরে যাওয়ার জায়গা আছে শ্যামা ? আমি তো সব ছেড়ে বেরিয়েছি। যে জায়গা থেকে রওনা হই সে জায়গায় কদাচিৎ ফিরে যাই। তুমি আমাকে চলে যেতে বলতে পার, ফিরে যেতে নয়।

—তাই যাও নয়ন চলে যাও।

নয়ন বলে—শ্যামা, তুমি খুব দুশ্চিন্তা কোরো না। আজ হোক, কাল হোক আমার লাশ একদিন পড়বেই। নিশ্চিত। তখন আর নয়ন তোমার পিছু নেবে না। কিন্তু যতদিন বেঁচে আছি শ্যামা, ততদিন আমি তোমার পিছু নেবই।

—কেন নয়ন ?

—কি জানি কেন ! তুমি এমন কিছু সুন্দর নও শ্যামা। তোমার রঙ শ্যামলা, নাক চাপা, খুঁজলে আরও কিছু ডিফেক্ট বেরবে, তা ছাড়া তোমার স্ট্যাটার অনেক। তোমার লাবণ্য থাকতে পারে, কিন্তু সে সব আমি লক্ষ্যই করি না। তুমি যা তোমাকে তার চতুর্গুণ করে দেখতে পাই। যেদিন আমাকে ওরা স্ট্যাব করে, সেদিন অনেকক্ষণ আমি হিন্দু হস্টেলের গেট থেকে কয়েক গজ দূরে গাছতলায় পড়ে ছিলাম। জ্ঞান ছিল, কিন্তু ডিলিরিয়ামের মতো অবস্থা। চারদিকে স্বপ্নের মত অদ্ভুত দৃশ্য দেখছি, অ্যান্ড ব্লাড ড্রিপিং আউট। টিপ্ টিপ্ করে রক্ত পড়ছে তো পড়ছেই। শরীর থেকে নদীর মতো বয়ে যাচ্ছে রক্ত। তার কুলকুল শব্দ পাচ্ছি। সেই সময়েও, সেই আশ্চর্য রকমের ভয় আর বিকারের মধ্যেও তোমাকেই দেখতে পাচ্ছিলাম। দেখছিলাম, একটা নির্জন মেঠো রাস্তা দিয়ে তুমি হেঁটে যাচ্ছ, কিংবা জানালার কাছে বসে চেয়ে আছ বাইরের এক মেঘলা আকাশের দিকে। সব ঠিক মনে নেই, কিন্তু বার বার তোমাকেই দেখছিলাম, মনে আছে। আতঙ্কে চীৎকার করে বলতে চেষ্টা করেছিলাম—শ্যামা তুমি সাবধানে থেকো, ভীষণ বিপদ, তোমাকে যেন ওরা না পায়। আবার কখন হয়তো বলছিলাম—শ্যামা, আমি মরে যাচ্ছি, তুমি বিধবা হবে তো ?

নয়ন তেমনি অনাবিল হাসি হাসে।

শ্যামা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে—এ সব আমাকে বোল না নয়ন, আমার ভাল লাগে না।

—তুমি গোলাপটা কার জন্য তুলেছ ?

—নয়ন, রাস্তা ছাড়, আমি অনেক পিছিয়ে পড়েছি। মা বাবা নিশ্চয়ই আছেন। এক্ষুনি খুঁজতে আসবেন। তুমি চলে যাও। পিছু নিও না।

—আমি ছায়া হয়ে যাব শ্যামা, পাখি হয়ে যাব।

—দয়া কর নয়ন, তুমি যাও।

দূরে থেকে বাবার ডাক শোনা যায়—শ্যামা-আ—

নয়ন রাস্তা ছাড়ে না।

শ্যামা হাতের গোলাপটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে—এটা তুমি নেবে ? নাও।

নয়ন হাত বাড়ায় না, বলে—নেব কেন—আগে বল, কার মুখ ভেবে তুলেছিলে,

boiRboi.net

কার নাম ভেবে !

—তুমি নাও।

—কেন নেব ?

—নাও। দিচ্ছি।

—এই দেয়ার মধ্যে কোন ইঙ্গিত নেই শ্যামা ?

—না।

—তাহলে নিয়ে কী হবে !

—রাস্তা ছাড়।

—দাঁড়াও। তোমাকেও তাহলে একটা জিনিস প্রেজেণ্ট করি। বলে পকেট থেকে ডিম দুটো বের করে নয়ন।

শ্যামা অবাক হয়ে বলে—ডিম ? ও দিয়ে আমি কি করব ?

—খাও।

—ডিম খাব কেন ?

—খাব বলে কিনেছিলাম, খেতে পারছি না। খালি পেটে খানিকটা তাড়ি খেয়ে খিদে মরে গেল। তুমি অনেকটা রাস্তা হেঁটে এসেছ, তোমার খিদে পেয়েছে।

শ্যামা কুঁকড়ে গিয়ে বলে—না। ডিম নেব কেন ? ডিম কেউ কাউকে প্রেজেণ্ট করে নাকি ? আমার খিদে পায় নি।

নয়ন একটু স্থির চোখে শ্যামার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে—এই ডিম দুটো দিলে এখনও এই দেশে কোথাও কোথাও রাতভর একটা আস্ত মেয়েমানুষের শরীর পাওয়া যায়, জান ?

শ্যামা লাল হয়ে বলে—তুমি—তোমার মুখে কিছুই আটকায় না নয়ন ?

নয়ন ধীর স্বরে বলে—মিথ্যে কথা নয় শ্যামা, এই ডিম দুটোর যা দাম তা অনেকের কাছে অনেকগুলো পয়সা। আমি দেখেছি। আমার অভিজ্ঞতার বয়স অনেক।

—তুমি বরং মেয়েমানুষের শরীর কিনো নয়ন, আমার পথ ছাড়, বাবা এসে পড়বে।

—রাগ কোরো না শ্যামা, আমি শুধু ডিম দুটোর আপেক্ষিক দাম বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম। দামটা একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার যা অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। এ ডিম দুটোর দাম অনেকের কাছে অনেক, আবার কারও কাছে কিছুই নয়।

শ্যামা হেসে বলে—ফুলের বদলে ডিম ?

নয়নও হাসে—ফুলের তুলনায় ডিম অনেক সলিড জিনিস শ্যামা। তুমি জিতে যাচ্ছ। নাও।

শ্যামা একটু ইতস্তত করে। কিন্তু সে জানে, নয়ন বড় দুরন্ত। বাবা এগিয়ে গিয়ে নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে আছে, তাকে না দেখে ফিরে আসবে। এসে যদি নয়নকে দেখতে পায় বাবা, তাহলে কী হবে। ইতস্তত করেও তাই ডিম দুটো নেয় শ্যামা। ব্যাগে ভরে রাখে। যদি এতে রাস্তা ছাড়ে নয়ন, যদি শ্যামাকে ছেড়ে দেয় !

ফুলটার জন্য হাত বাড়িয়েছিল নয়ন। নির্দোষ হাত, শ্যামা সন্দেহ করে নি কিছু। বাড়ানো হাতে ফুলসুদ্ধ শ্যামাকে ঘাড় কাৎ করে দেখতে দেখতে বোধ হয়

নয়নের ভিতরে কিছু ফুঁসে উঠল। এক পলকে শ্যামার ফুলসুদ্ধ হাত ধরে তাকে টেনে নিল সে। শেকড় সমেত উপড়ে গেল শ্যামা। চারদিকটা যেন ঝোড়ো বাতাসে আবছা ধুলোটে হয়ে গেল, কিংবা একটা কুয়াশা ঘিরে ফেলল তাদের—এরকমই মনে হল তার। পরমুহূর্তেই সে নয়নের বিশুষ্ক ঠোঁট তার ঠোঁটে গালে টের পেল। নয়নের গালের দাড়ি ঘষা খেল তার গালে, পরমুহূর্তে ঝুরো চুলওলা নয়নের মাথা তার কাঁধ থেকে গলার কাছে আশ্লেষে ডুব দিতে থাকে। তাড়ির ঝাঁঝাল গন্ধ পায় শ্যামা, সেই সঙ্গে বহুকাল ধরে রোদে পোড়া চামড়ার উষ্ণ গন্ধ, জামা কাপড়ে ঘাম আর ধুলোর সোঁদা গন্ধ। এমনটা এই প্রথম নয়। অন্তত তিন চার জন পুরুষ তাকে ইতিপূর্বে আক্রমণ করেছে। নয়নও। তবু এই ঝড় ঠেকানোর কৌশল আজও শ্যামা সঠিক জানে না। মেয়েরা বড় অসহায়। তবু দু হাতে সে নয়নকে প্রাণপণে রুখবার চেষ্টা করে। চেঁচায়। মারে।

নয়ন সহজে থামত না। কিন্তু সেই মুহূর্তে একটা বাচ্চা ছেলে খুব কাছ থেকেই চেঁচিয়ে বলে ওঠে—বাবা, দেখ—

নয়ন শ্যামাকে ছেড়ে দিয়ে বিদ্যুৎবেগে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ায়। মারকুটে হিংস্র ভঙ্গীতে। মিথুনের সময়ে বাধাপ্রাপ্ত সাপের মত। নয়নের সেই সাপের মত ভঙ্গী দেখে চোখ ফেরাতেই একটা সত্যিকারের সাপ দেখতে পায় শ্যামা।

দৃশ্যটা ভারী অদ্ভুত। ভাঙা, পোড়ো বাড়িটার আগাছার জঙ্গল ভেদ করে দুজন ভাঙা পাঁচিলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। একজন একটা বছর সাত আটেকের বাচ্চা ছেলে, অন্যজন ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের একজন গ্রাম্য চেহারার লোক। হাবার মত দাঁড়িয়ে। ছেলেটার চোখের পলক পড়ছিল না। লোকটারও তাই। অদ্ভুত এই যে, লোকটার ডান হাতে লম্বা একটা জ্যান্ত সাপ। সাপের গলার কাছটা মুঠোয় ধরা, সেটা লোকটার হাতে দুটো প্যাঁচ খেয়ে ঝুলছে। আস্ত গোখরো।

শ্যামার বমি পাচ্ছিল হঠাৎ! লজ্জা লজ্জা! বাচ্চা ছেলেটা ঐ কাণ্ড দেখেছে, লোকটাও! মথিত গোলাপটা পড়ে আছে রাস্তায়। একপলক দেখল শ্যামা। তারপরই গোলাপটাকে লাফিয়ে পার হয়ে ছুটল সে।

নয়নের মাথার ঠিক ছিল না। যে মুহূর্তে সে শ্যামাকে দু হাতের ভিতরে পেয়েছে সেই মুহূর্তেই এই বাধা। কত কষ্টে তাকে শ্যামার এত কাছাকাছি আসার সুযোগ করে নিতে হয়। তাই প্রথমটায় রাগে তার ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছিল। হয়তো ছুটে যেত সে, লোকটাকে লাথি মারত, ছেলেটাকে থাপ্পড়, যা নয়নের স্বভাব। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই সে লোকটার হাতে ধরা জ্যান্ত গোখরোটাকে দেখে।

নয়নের ভিতরে একটা অদ্ভুত স্বভাব আছে। যা কিছুর ভিতরে ভয়ংকরতা হিংস্রতা আছে তা সে ভালবাসে। যার মধ্যে বীরত্ব বা বেপরোয়া কিছু আছে সে নয়নকে মুহূর্তের মধ্যে টানে। লোকটার হাতে সাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে একটা খুব অনায়াস দক্ষ সাহসীর ভাব ছিল। নয়নের রাগ বাতাসে উড়ে গেল, ফুলের

মত ঝরে গেল। একটু আগে শ্যামার দেহস্পর্শের আগুন নিভে গেল ভিতরে। সে শ্যামার হাত থেকে স্খলিত ফুলটার দিকে চেয়েও দেখল না। যে শ্যামার জন্য সে এত দূর এসে রোদে দাঁড়িয়ে তীব্র পিপাসায় অপেক্ষা করেছে তার কথা ভুলেই গেল প্রায়। গালের একটা জায়গায় শ্যামার বাঁ হাতের লম্বা নখের একটা আঁচড় পড়েছে বুঝি! সেই জায়গাটা কেবল জ্বালা করছে।

গালে একবার হাত বুলিয়ে এক পা দু পা করে লোকটার দিকে হেঁটে গেল নয়ন। লোকটার ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা এখনও যায় নি। ছেলেটা এখনও হাঁ করে আছে। কৃতকর্মের জন্য তবু একটুও লজ্জা পায় না নয়ন। কোন জবাবদিহি করারও চেষ্টা করে না। তার গলার স্বরও ঠিক থাকে।

একটু হেসে সে জিজ্ঞেস করে—সাপটা ধরলেন?

লোকটা মাথা নেড়ে বলে—হ্যাঁ।

—কোথায় ছিল?

লোকটা পোড়ো বাড়িটার দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে—এখানে। এখনও বিস্তর আছে!

—কামিয়েছেন?

—না। সদ্য ধরলাম তো।

—জাত গোখরো। দেখি—

লোকটা সাপটাকে তুলে দেখায়। নয়ন ঝুঁকে খুব কাছ থেকে দেখে। গভীর শ্বাসের শব্দ করে সাপটা। না এখনও কামান হয় নি। দুটি সূক্ষ্ম দাঁত ঝিকিয়ে ওঠে। নয়ন হাসে।

—বিষের থলি মনে হয় ভর-ভরন্ত! নয়ন বলে।

—আজ্ঞে।

—এটাকে নিয়ে কি করবেন?

লোকটা একটু হাসে। ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে। নিজের ছেলের দিকে একটু চেয়ে দেখে। তারপর বলে—ছেড়ে দেব।

—না কামিয়ে? বলে ভ্রূ ওপরে তোলে নয়ন।

—না কামিয়ে ছাড়লে ব্যাটা রুখে আসবে। কামিয়েই ছাড়ব। তার আগে ক'ফোঁটা বিষ ঢেলে নেব।

সঙ্গে সঙ্গে তীব্র কৌতূহল বোধ করে নয়ন। বলে—দেখি, কী করে নেন!

লোকটা নয়নের দিকে চেয়ে বলে—কিন্তু আপনার দেরি হয়ে যাবে না? উনি তো এগিয়ে গেলেন!

—কে? নয়ন বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে।

লোকটা চোখের পাতা নামিয়ে বলে—ঐ উনি, যিনি আপনার সঙ্গে ছিলেন!

শ্যামার কথা মনে পড়ে নয়নের। বিদ্যুৎচমকের মত। কিন্তু এতক্ষণ মনেই ছিল না। একটু হাসে নয়ন। তারপর বলে—এগিয়ে যাক না। ঠিক ধরে ফেলব পা চালিয়ে। মোনা ঠাকুরের কাছে যাবে, বেশি দূর তো নয়।

—ও। মনস্কামনা আছে বুঝি!

—আছে।

লোকটা উদাস গলায় বলে—অনেকে আসে। মোনা ঠাকুরের খুব বাড়বাড়ন্ত এখন।

—চেনেন?

—না চিনবার কি? আমি তো কল্পতরু মন্দিরের পাশেই থাকি।

—কি করেন? সাপ খেলান?

লোকটা হাসে—না। সাপ ধরা শিখেছি অনেক কষ্টে। এ আমার শখ। মাঝে-মধ্যে বিষ বেচি, ওষুধ কোম্পানিগুলো কেনে। বলে ছেলের দিকে চেয়ে বলে—সুকুল, কৌটো-বাউটো বের কর।

ছেলেটার কাঁধে একটা ঝোলা। তা থেকে বড় মুখওয়ালা একটা শিশি বের করে আনে। শিশির মুখে পাতলা বেলুন বা ঐ জাতীয় কিছুর একটা রবারের ঢাকনা সুতো দিয়ে টান করে বাঁধা। শিশিটা বাঁ হাতে ধরে লোকটা নয়নের দিকে চেয়ে হেসে বলে—তেমন কিছু কাণ্ড না। দেখুন।

সাপটা হাঁ করেই ছিল, মুখের কাছে শিশিটা আনতেই নড়ে উঠল। দাঁতের কাছে বিষ ঢালার মত কিছু একটা সে এখন চায়। রাগে আক্রোশে লেজের ঝাপটা মারে। কী সুন্দর সরু ভয়ংকর দাঁত, কী দক্ষতা তার দাঁতে! পাতলা রবার নিঃশব্দে ভেদ করল দাঁত দুটো। লোকটা শিশি সমেত সাপটাকে উঁচু করে দেখাল। নয়ন দেখে, শিশির মধ্যে হাল্কা রঙের দুটি ফোঁটা পড়ল। লোকটা শিশিটা ছাড়িয়ে নিয়ে নয়নকে দেখায়। বলে—অয়েল প্রোটিন।

নয়ন ঐ শব্দ দুটো শুনে বড় চোখে চায়। বলে—আপনি অনেক জানেন দেখছি।

—কিছুই না। ও সবাই জানে।

লোকটার হাতে ছেলেটা একটা চাকু ধরিয়ে দেয়। যেভাবে ছেলেরা পেন্সিল কাটে সেরকম অনায়াসে মুখের কাছে সাপের মাথাটা তুলে লোকটা দুটো মোচড়ে দাঁত উপড়ে আনে। ছোট্ট দুটি দাঁত, উপড়ে আনার পর কেমন নিরীহ দেখায়। সুকুল নামে ছেলেটি একটা কাগজে দাঁত দুটো সাবধানে মুড়ে ঝোলায় রাখে। সাপটা ছট্‌ফট্ করে। লোকটা নয়নের দিকে চেয়ে একটু হাসে। বলে—ওদের দাঁত ওপড়ালে ব্যথা যেমন পায়, আরামও পায় তেমনি। দাঁত দুটো টন্ টন্ করে তো! যত বিষ ওদের দাঁতে। মানুষের কোথায় বলুন তো!

নয়ন উত্তর দেয় না! চেয়ে থাকে।

লোকটা সাপের লেজ আর মাথা দুহাতে চেপে ধরে কী একটু বিড় বিড় করে বলে। তারপর আচমকা ঝাঁকুনি দিয়ে সাপটাকে ঘাসের ওপর ছেড়ে দেয়। প্রাণ পেয়েই যেন বিশাল লক্‌লকে গোখরো ফুঁসে উঠে ঘাসময় তার কিলবিলে ভয়ংকর গতি ছড়িয়ে দিয়ে একবার ফণা তোলে। নয়ন এক লাফে পিছিয়ে আসে। লোকটা সাপটার দিকে স্থির তাকিয়ে থাকে। সাপটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফণা নামিয়ে নেয়, তারপর মাটি শুঁকতে শুঁকতে চলে যায়, স্বচ্ছন্দে পার হয় দেয়াল, লম্বা দুর্বাঘাস আর আগাছার জঙ্গলে ঢেকে যায়।

নিঃসাড়ে সাপটাকে দেখছিল নয়ন। চোখ তুলতেই লোকটার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। সাপটা হাতে ছিল বলেই এতক্ষণ লোকটাকে ভাল করে দেখা হয় নি।

এখন চেয়ে দেখল নয়ন, পরনে মোটা কাপড় খাটো করে পরা, গায়ে হাফ-হাতা শার্ট, খালি পা, মাথার চুল যাত্রাওয়ালাদের মত ঘাড় পর্যন্ত লম্বা। মুখখানা চৌকো, ভাঙা, কিন্তু তা রুগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য নয়। যারা শরীর খাটায় তাদের শরীরে একরকম মেদহীন রুক্ষতা থাকে। এ লোকটারও তাই। নয়নের তুলনায় লোকটা লম্বা, ঘাড়টা মোটা, হাত দুখানায় শিরা আর পেশী কিলবিল করছে। চওড়া কাঁধ। কিন্তু চোখ দুখানা বড় নিরীহ, মায়াময়। এতটা স্বাস্থ্য থাকলে মানুষ এমনিতেই একটু মারমুখো হয়। কিন্তু লোকটা তা নয়।

একটুক্ষণ চোখে চোখে চেয়ে রইল নয়ন। কবে যেন নয়নের চোখ ছিল সাধারণ, তাতে আগুন খেলা করত না, তাতে ভাবালুতা ছিল, স্বপ্ন দেখা ছিল, সেই চোখে মায়া মমতাভরে চারদিককে দেখার প্রবণতা ছিল তার। কিন্তু সে যেন এক দূর অতীতের কথা। মাত্র চব্বিশ কি তারও কম বয়সে নয়নের কত রূপান্তর হয়ে গেছে। এখন নয়ন জানে, তার চোখে কেউই খুব বেশীক্ষণ চোখ রাখতে পারে না। আয়নায় নিজের মুখ অনেক দেখেছে সে কিন্তু পরিবর্তনটা কিছুতেই কখনও সে ধরতে পারে না। কিন্তু জানে, জেনে গেছে, তার চোখে একটা বিপুল পরিবর্তন এসে গেছে। তার মনের ছায়া চোখে পড়ে। সেখানে আগুন খেলা করে এখন। লোকটা কিন্তু চোখ সরিয়ে নিল না। চেয়ে রইল। মনে মনে নয়ন লোকটাকে বলল—সাবাস! প্রায় বিশ্বরেকর্ড ভেঙেছো হে বাপু, নয়নের চোখে এতক্ষণ কেউ চোখ রাখে না।

মুখে খুব সাধারণ পথ-চলতি কথার মত জিজ্ঞেস করল—কি করেন?

লোকটা উদাস গলায় বলে—চাষবাস, বললাম তো! আর মাঝে মাঝে সাপ ধরি। বুনো পাতা থেকে ওষুধ তৈরী করি নানারকম। আর, ছেলের সঙ্গে খেলা করি। এই যে সুকুল, এ আমার ছেলে।

শেষ কথাটা বেশ জোর দিয়ে বলে লোকটা, যেন ছেলের পরিচয়টা দেওয়া সবচেয়ে বেশী জরুরী। মানুষের নানা দুর্বলতা থাকে। নয়ন বলল—আপনাদের এ জায়গাটা বেশ।

—গাঁ-গঞ্জ জায়গা, ভদ্রলোকের উপযোগী নয়। বেশ আর কী।

—ইলেকট্রিক নেই এদিকে?

—কি যে বলেন!

—অনেক গাঁয়ে আছে।

—এদিকে নেই।

—বি ডি ও অফিস?

—সে অনেক দূর। তিন মাইল পূবে চকখালি, সেইখানে।

—থানা?

লোকটা নয়নের দিকে একটু চেয়ে থেকে হেসে বলে—সেও দূর!

—এ দিকটায় তবে আছে কি?

—আছে মোনা ঠাকুরের জাগ্রত কালী—যা দেখতে বহু লোক আসে। আর আছি আমরা, জঙ্গল আছে, সাপ আছে, আর কী থাকবে গাঁয়ে-গঞ্জে। চলুন দেখে আসবেন, বেশী দূর নয়। আপনার লোকও তো এগিয়ে গেল।

boiRboi.net

অন্যমনস্ক নয়ন জবাব দিল—হুঁ।

—কে হয় আপনার ?

—কার কথা বলছেন ? নয়ন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

—ঐ যে উনি, যিনি সঙ্গে ছিল আপনার !

—হয় কিছু। বলে নয়ন একটু হাসে।

কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে লোকটা বলে—উনি ফুলটা ফেলে গেছেন। কুড়িয়ে নেবেন না ?

নয়ন রাস্তার ওপর পড়ে থাকা ফুলটাকে একটা লাথি মেরে বলে—ফুলের অভাব নেই দেশে।

লোকটা একটা শ্বাস ছেড়ে বলে—ঠিক কথা, তা ছাড়া ফুলের তেমন বাসও নেই। লতানে গাছের ফুল তো।

নয়ন গম্ভীর হয়ে বলে—হুঁ।

লোকটা বলে—বর্ষাকালের ফুল ফল সবই কেমন ম্যাড়ম্যাড়ে, জলঢোপা।

—এদিকটায় থাকার জায়গা পাওয়া যায় ?

—যাবে না কেন ? মোনা ঠাকুরের কল্পতরুর মন্দিরে অনেক জায়গা। যেখানে সেখানে পড়ে থাকা যায়। থাকবেন ?

নয়ন মুখ তুলে বলে—ভাবছি থাকলে কেমন হয়।

লোকটা হেসে বলে—আপনারা শহর বন্দরের মানুষ, থাকতে পারবেন না। ওদিকটায় ভদ্রলোকের বাস নেই।

—ভদ্রলোকদের মুখে পেচ্ছাপ করি।

ছেলেটা নয়নের কথা শুনে হি হি করে হেসে ওঠে।

—কী হল স্কুল ? লোকটা তার ছেলের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

—পেচ্ছাপ করবে বলছে। মুখে ! হ্যাঁ বাবা ! ছেলে হেসে কুটিপাটি।

—তুমি পা চালিয়ে চল তো। আমরা পেছু পেছু যাচ্ছি, দম ধরে তুমি খানিক দৌড়ও। লোকটা তার ছেলের পিঠে আলতো চাপড় মেরে এগিয়ে দিতে চেষ্টা করে।

—আমি তোমাদের কথা শুনব।

—তার চেয়ে দৌড়লে কাজ দেবে। বড়দের সব কথায় কান দিতে নেই।

—মুখে কি করে পেচ্ছাপ করবে বাবা, অ্যাঁ ?

নয়ন ছেলেটার দিকে ঝুঁকে বলে—ভদ্রলোকদের মুখে কি করে পেচ্ছাপ করতে হয় তা আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব। তার বদলে তোমার বাবা আমাকে সাপ ধরতে শেখাবেন।

তারা খানিক চুপচাপ হাঁটে। লোকটা একবার নয়নকে সতর্ক করে দেওয়ার ইংগিত করে বলে—স্কুল কিন্তু আমার ছেলে। ওর সামনে—

কথাটা লোকটা শেষ করে না। নয়ন একটু হাসে। তারপর বলে—আমি ভদ্রলোক নই।

—নন ?

—না।

boiRboi.net

—কেন নন ?

—পোষায় না।

—কিন্তু আপনি তো ভদ্রলোকের মতই দেখতে, শহরের বাবুভেয়েরা যেমনটি হয়।

—সে পোশাকে। ভিতরে আমি অন্য মানুষ।

—কলকাতা থেকে আসছেন তো ?

নয়ন একটা শ্বাস ছেড়ে বলে—আসছি। কিন্তু সে আমার আগের সাকিন। আসলে আমার জীবন কাটে গাঁ-গঞ্জেই। কলকাতার লোক মাত্রই ভদ্রলোক নাকি!

লোকটা একটু ভেবে বলে—তা অবশ্য নয়। কিন্তু ভদ্রলোকরা যেখানেই থাকুন তাদের জাত যে আলাদা তা দেখলেই বোঝা যায়। সে জাত তো আপনার ঘোচে নি।

—ও হচ্ছে গায়ের ঘেমো-গন্ধের মত, সহজে যায় না।

লোকটা হাসে! ছেলেটাও খি-খি করে হাসে, বলে—ঘেমো-গন্ধ বাবা, কি বলছে দ্যাখো!

—আমাকে সাপ ধরা শিখিয়ে দেবেন ?

লোকটা উদাস গলায় বলে—শিখে কি করবেন ?

—শিখে রাখি। কখনও কাজে লেগে যেতে পারে।

—কিছুই কাজে আসে না। আমি শিখেছি বিস্তর কষ্ট করে। সাপুড়েরা তাদের মন্ত্রগুপ্তি নিজেদের মধ্যে ধরে রাখে। আমি এক ওস্তাদের পিছনে বছরখানেক ঘুরে শিখেছি। কিন্তু ব্যাপারটা এত সোজা যে অত কষ্টে শিখবার দরকারই নেই।

—কৌশলটা কি ?

—সাপ কোথায় থাকে তার আন্দাজ যে করতে পারে তার অর্ধেক শেখা হয়ে গেল। তার পরেরটুকু হচ্ছে সাপ সম্বন্ধে ভয়টাকে উড়িয়ে দিয়ে একটু সাহস করা। আর ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় হাতের তেলোয় চেপে ধরা। কৈ মাছ ধরার মতই সোজা। সাপের দাঁত তার মুখে, সারা শরীরে তো নয়!

—আমাকে শেখাবেন ?

—শেখাতে পারি।

—আমার কিন্তু পয়সা নেই।

লোকটা হাসে, বলে—আমার খাওয়ার সংস্থান আছে, সর্বকিছু বেচি না।

—যদি শেখান তো এদিকটায় কদিন থেকে যাই।

—সঙ্গের লোকেরা ?

—ওরা আমার কেউ না।

লোকটা একটু থমকে যায়। কি যেন বলি বলি করেও বলে না। সুকুল চলতে চলতে অজান্তে নয়নের কাছে ঘেঁষে আসে। নয়ন তার দিকে একবার মিটিমিটি করে চায়। তারপর বাপ-ব্যাটাকে চমকে দিয়ে হঠাৎ কোকিল-ডাক ডেকে ওঠে। কুহু-কুহু করে তার অবিরল এবং অবিকল মিষ্টি ডাকটি উঠে উঠে নেমে আসে হঠাৎ। স্তম্ভিত বিস্ময়ে ছেলেটা দাঁড়িয়ে পড়ে! লোকটা মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

—আরে বাঃ। লোকটা বলে।

—আমাকে শিখিয়ে দেবে ? ছেলেটা জিজ্ঞেস করে।

—দেব। তার বদলে তোমরা যদি আমাকে থাকতে দাও।

—দেব। আমাদের বাড়িতে অনেক জায়গা। ছেলেটা লাফিয়ে গিয়ে তার বাবার হাত ধরে ঝুলে পড়ে—অনেক জায়গা, না বাবা ?

ওরা বাপ-ব্যাটা সামনে হাঁটছে, নয়ন পিছনে। লোকটা মুখ ঘুরিয়ে একবার নয়নকে দেখে নিয়ে বলল—এখানে থাকতে চান কেন ?

—এমনিই। জায়গাটা ভাল লেগে গেছে।

—কাজকর্ম কিছু করেন না ?

—না। ডাক্তারী পড়তাম, ছেড়ে দিয়েছি।

—ছাড়লেন কেন ?

—পোষাল না।

—এখন তবে কি করে চলে ?

—চলে যায়। ওসব নিয়ে ভাবি না।

লোকটা একটু ভেবে বলে—এদিকে এসেছিলেন কেন ?

—চলে এলাম।

—ঐ মেয়েটা কে ?

—ও শ্যামা, আমার বহুকালের চেনা। আগে একই বাড়িতে ভাড়া থাকতাম। এখন দূরে চলে গেছে ওরা। আমি ওকে বিয়ে করতে চাই।

লোকটা তার ছেলের পিঠে হাত রেখে বলে—সুকুল বাবা, তুমি আগে আগে হাঁট।

সুকুল অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগিয়ে হাঁটে। লোকটা নয়নের পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলে—তাই জঙ্গলের মধ্যে জাপটে ধরেছিলেন ?

সে কথার উত্তর না দিয়ে নয়ন জিজ্ঞেস করে—মোনা ঠাকুরের ওখানে বশীকরণ-টশীকরণ হয় ?

লোকটা হেসে বলে—হয়।

—বশীকরণ করতে কত টাকা লাগে ?

—ঠিক জানি না।

নয়ন সন্দেহের চোখে চেয়ে বলে—বশীকরণে কাজ হয় তো ? না হলে কিন্তু মোনা ঠাকুরের মন্দির আমি ভেঙে দিয়ে যাব।

লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—মোনা ঠাকুরের মন্দির ভাঙা যায় না!

—কেন ?

—আমি যেমন সাপ ধরি, মোনা ঠাকুর তেমনি মানুষ ধরে। আমি যেমন বিষ নিংড়ে দাঁত ভেঙে ছেড়ে দিই, তেমনি তিনিও মানুষের বিষদাঁত তুলে নেন।

—হিপনোটিজম্, না ?

—কে জানে!

—আমি নয়ন রায়। মোনা ঠাকুরদের মন্দির ভাঙতেই আমার জন্ম। বলে নয়ন একটু আত্মবিশ্বাসের হাসি হাসে।

লোকটা বলে—আর যদি মোনা ঠাকুরের বশীকরণে কাজ হয়, যদি মেয়েটাকে বশ করতে পারেন তো কি করবেন ?

—তাহলেও ভাঙবো।

—কেন ?

নয়ন একটু হেসে বলে—শ্যামাকে বশ করতে যেমন চাই, তেমনি মোনা ঠাকুরদেরও উচ্ছেদ করতে চাই।

লোকটা একটু হেসে বলে—যদি দুনিয়া থেকে সব মোনা ঠাকুরের উচ্ছেদ করে দেন তাহলে আবার কাউকে বশীকরণ করার দরকার হলে মোনা ঠাকুরকে পাবেন কোথায় ?

—মোনা ঠাকুররা না থাকলে পৃথিবীর কোন ক্ষতি হবে না। থাকলেই বরং ক্ষতি।

—তাহলে শ্যামার কি হবে ?

—কি হবে ?

—শ্যামাকে বশীকরণ করবে কে ?

—কেউ করবে না। তার দরকার হবে না। শ্যামাকে কেড়ে নেওয়ার মত জোর আমার আছে।

—তবে বশীকরণের কথা ভাবছেন কেন ?

খুব চিন্তান্বিত মুখে নয়ন বলে—ও এমনিই। মোনা ঠাকুরদের ক্ষমতা কতদূর তা একবার নিজের চোখে দেখতে চাই।

লোকটা হেসে বলে—কিছু ক্ষমতা আছে নিশ্চয়ই। উনি বান মারেন, মারণ উচাটন জানেন, বশীকরণ জানেন, কত জজ-ম্যাজিস্ট্রেট এনে ধুলোয় গড়ায়। মাটি থেকে আধ হাত উঁচুতে উঠে শূন্যে বসে জপতপ করেন তিনি। বলে লোকটা নয়নের দিকে হাসিমুখে চেয়ে থাকে।

নয়ন ভ্রূ কুঁচকে সামনের দিকে চেয়ে থাকে। চিন্তাকুটিল মুখ, খুব অন্যমনস্ক। লোকটার কথা তার কানে গেছে বলে মনে হয় না।

জঙ্গল ক্রমে শেষ হয়ে আসে। আমবাগানের শেষে একটা মাঠ কোণাকুণি পার হয়ে, একটা বড় পুরনো দীঘির কালো জলে নিজেদের ছায়া ফেলে, উত্তরে কয়েকটা ঢিবি, গড়খাইয়ের মত জায়গা পেরিয়ে সুপুরি বাগান পায় তারা। সেই বাগান পেরলে একটা শ্যাওলা ধরা পুরোনো মন্দির দেখা যায়।

লোকটা নয়নের দিকে ঝুঁকে বলে—দেখেছেন ! ঐ হচ্ছে মোনা ঠাকুরের আস্তানা।

নয়ন গম্ভীরভাবে বলে—হুঁ।

boiRboi.net

—লোকে কয় মাটির পুতুলা। কালী আমার মাটির পুতুলা। ট্যাস্ করে ফেলে দ্যান জলে, ভুস্ করে ডুবে যাবে। তো সব ঠিক। কিন্তু মায়ের গলার মালাখানা মোর ঘোরে কেন রে ? বন বন করে ঘোরে কেন মালাখানা ? হঁ্যা ? বলে মোনা ঠাকুর একটু হাসে।

মন্দিরের পাশে চৌকো ঘরখানা। সামনে বাঁধান চাতাল। সেখানে কয়েক জোড়া

ছাড়া জুতো। চাতালের ওপাশে বয়ঃসন্ধির মেয়েদের মতো হিল্ হিলে শরীরের সুপুরিগাছের সারি। ঘেঁটুবন, আশশ্যাওড়া আর ভাটগাছের জঙ্গল। চারদিক কেমন ঠাণ্ডা, নিঝুম। শ্যামা আঁচলখানা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে বসে।

বাঁশের বেড়ার ওপর মাটির আস্তরণ, তাতে চুনকাম করে ঘরের দেয়াল তৈরী হয়েছে। ওপরে টিনের চাল, মেঝে বাঁধানো। ছেঁড়াখোড়া শতরঞ্চি পাতা। কয়েকটা পাটির আসন। শতরঞ্চিতে মোনা ঠাকুর বসে আছে। গায়ের রঙ তামাটে, বড় বড় চুল, গালে ছাঁটা দাড়ি, তাতে সাদা ছোপ ধরে এসেছে। মুখখানা লম্বাটে, ভাঙা, কিন্তু তার একটা কমনীয় সৌন্দর্য আছে। হাসলে মোনা ঠাকুরকে খুব সরল মনের লোক মনে হয়, গম্ভীর হলে মনে হয় চিন্তাশীল। খালি গায়ে পৈতেটা খুব সাদা দেখায়। বুকে, হাতে, কাঁধে, কানে, নাকে প্রচুর লোম। শরীরের বাঁধুনি কৃশ, কিন্তু শক্ত। পরনে পরিষ্কার একখানা ধুতি। পাশে বিড়ির বাণ্ডিল আর দেশলাই। মোনা ঠাকুরের মুখে বিড়ি নেভে না। একটা ফেলেই আর একটা ধরায়।

মোনা ঠাকুরের একেবারে সামনে দুটো পাটিতে বাবা আর মা বসে আছে। আশে-পাশে আরও দু'চারজন গাঁইয়া লোক। তাদের মুখ চোখ হাবাগোবা; চোখে ভয় আর ভক্তি।

দরজার পাশে একটা পাটিতে বসে ছিল শ্যামা। তার মন ভাল নেই। একটু অন্যমনস্ক হয়ে সে মোনা ঠাকুরের দিকে চেয়ে ছিল।

মোনা ঠাকুর একটু দুলে বলে—লোকে বলে মাটির পুতুল। তো তাই। তবু কালী আমার হাঁটে চলে, খায়-দায়, চুল ফেরায়, চান করে, আমার কালীর মন খারাপ হয়, কাঁদে হাসে। পাগ্লি।

বাইরে একটা মেঘের ছায়া পড়েছে। চাপ বাঁধা গাছপালা আর জঙ্গল। দিনের বেলায়ও প্রবল ঝিঁঝি ডাকছে। গাছপালাগুলো অন্ধকার সব ছায়া ফেলেছে। ঐ আলো-আঁধারির কোথাও নয়ন লুকিয়ে আছে। সারা রাস্তা যত পাখির ডাক শুনেছে শ্যামা, যত দূরাগত শব্দ শুনেছে তত সে চমকে চমকে উঠেছে। মনে হয়েছে, পাখি নয় নয়ন। সব শব্দই করছে নয়ন। সেই হরবোলা তার বিচিত্র সব শব্দ তুলে শ্যামার চারদিকে একটা জাল তৈরী করছে। শ্যামার মন ভাল লাগে না।

মোনা ঠাকুর বাবার দিকে চেয়ে বলে—বাবুমশায়, আপনি কি ছেলের খবরের জন্য এসেছেন ?

একটু চমকে ওঠে শ্যামা। লোকটা জানল কি করে ? তারা যে দাদার খবরের জন্য এসেছে তা তো বলে নি।

বাবা একটু স্তব্ধ হয়ে তারপর ধরা গলায় বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ ঠাকুরমশাই। আপনি তো অন্তর্যামী।

মোনা ঠাকুর মাথা নেড়ে বলে—অষ্টসিদ্ধির দুটো সিদ্ধি হলেই এসব বলা যায়। কিছু না বাবুমশাই। লোকের চোখে মুখে সমিস্যের কথা লেখাই থাকে। সেটা পড়ার মত অক্ষরজ্ঞান থাকলেই হল। ওই মেয়েটি কি আপনারই ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

মোনা ঠাকুর হেসে বলে—তা মেয়ের মুখ অত ভার কেন ? এ জায়গা ভাল

boiRboi.net

লাগছে না মা ? ভয় করছে ?

শ্যামা মাথা নেড়ে জানায়, না। তারপর একটু হাসে।

—ভয় নেই মা, আমার কালীমায়ের আওতায় বিপদ-আপদ নেই। সাপখোপের মুখে আপনা থেকেই বন্ধন পড়ে যায়, চোর বদমাশরা অসাড় হয়। যাও মা, ঘুরে টুরে জায়গাটা দেখে এস। পশ্চিমে একটা সুড়ঙ্গ আছে, অনেকটা যাওয়া যায় ভিতরে, দক্ষিণে শিবমন্দির আছে। দাঁড়াও, সঙ্গে লোক দিচ্ছি। বলে মোনা ঠাকুর ভিতর বাড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকে—তারা, ওরে তারা—

ডাক শুনে ঊনিশ বছরের একটা লালপেড়ে শাড়িপরা লাজুক মেয়ে এসে ভিতরের দরজায় দাঁড়ায়।

—এই মাকে নিয়ে যা তো, সব দেখিয়ে আন। যাও মা, ঐ আমার মেয়ের সঙ্গে যাও। কোন ভয় নেই।

শ্যামা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। উঠে পড়ে। অনেকক্ষণ ধরে তার মন থম ধরে আছে। মুখে কতকগুলি উষ্ণ স্পর্শ এখনও ফোস্কার মত লেগে আছে। মন ভাল নেই।

কোথায় একটা বেড়াল কাঁদছে। মেয়েটির সঙ্গে বাইরে যাবে বলে পা বাড়িয়েও থেমে গেল শ্যামা। নয়ন! নয়ন নয় তো ? আতঙ্কিত মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল—ওটা কি ডাকছে ?

মেয়েটি মুগ্ধ চোখে তাকে দেখছিল, হেসে বলল—বেড়াল। আমাদের বেড়ালটার বাচ্চা হারিয়ে গেছে, কাঁদছে কাল থেকে।

চাতালে পা দিতেই বাতাস লাগল। বাতাসটা হিম। চারদিকে বেশী গাছপালার জন্যই বোধ হয়।

শ্যামা বলল—তবে যে শুনলাম, মোনা ঠাকুর বললেন, এখানে কোন অমঙ্গল হয় না! বেড়ালটার বাচ্চা তাহলে চুরি গেল কেন ?

মেয়েটি খুবই সাধারণ। গিন্নি-বান্নির মতো ঢিলে করে ফেরতা ঘুরিয়ে শাড়ি পরেছে। কপালে তেল সিঁদুরের বড় একটা টিপ। সিঁথি সাদা। মুখে সরলতা আর বিস্ময়। শ্যামার সাজগোজ দেখছে বার বার। প্রশ্ন শুনে চোখ দুটো বড় করে বলে—মানুষকে সাহস দেওয়ার জন্য বাবা অনেক সময় ওরকম সব কথা বলেন। নইলে এখানেও কত ঘটনা হয়। আমারই এক ভাই তো চার বছর আগে কলেরায় মারা গেছে।

—তাহলে কি ওসব মিথ্যে কথা ?

মেয়েটা ঠিক-ঠাক জবাব দিতে পারে না। কিন্তু সরল মুখে সে খুব হাসে। তারপর বলে—না, বাবা ঠিক মিথ্যে কথাও বলে না। যার বিশ্বাস আছে তার অমঙ্গল হয় না।

—তবে আপনার ভাই মারা গেল কেন ? মোনা ঠাকুরের তো বিশ্বাস আছে।

মেয়েটা হেসেই বলে—ওসব আমি ঠিক বুঝি না। বাবা আমাদের সঙ্গে তো বেশী কথা বলে না। কি করে জানব বলুন! আমরা শুধু জানি, বাবার কাছে অনেক লোক আসে, বাবা তাদের অনেক সমস্যার সমাধান করে দেয়।

boiRboi.net

শ্যামা চাতালের সিঁড়িতে পা দিয়ে বলে—কালীর গলার মালা সত্যিই ঘোরে ?

মেয়েটা বলে—আমরা তো ওসব দেখতে পাই না। বাবা যখন পুজো করে তখন মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকে। আপনি কিন্তু খুব সুন্দর।

—যাঃ, আমি তো কালো।

—খুব কালো না। তবে ফর্সা হলে আপনি ঠিক রাণীর মত হতেন। আজকাল কলকাতায় গয়না পরার চল নেই, না ?

—কেন ?

—আপনি তো পরেন নি।

—আমার বেশী গয়নাই নেই। তাছাড়া দিনকাল তো ভালো না, গয়না পরলে যদি চোর-ডাকাত পিছু নেয় ?

—আপনি যা সুন্দর! চোর-ডাকাত না হোক ছেলে-ছোকরা পিছু নেবেই।

শ্যামা একটু গম্ভীর হয়ে যায়।

—আপনি এটা কি শাড়ি পরেছেন ? শিফন ?

—না, এটা কমদামী শাড়ি। রাসো।

মেয়েটার হাসি তার চোখেও উপচে পড়ে। সে মিটমিটে হাসিচোখে চেয়ে বলে—আমাদের কিন্তু ওসব জোটে না। পুজোর শাড়িই পরি আমরা। এই দেখুন না পরে আছি, লালপেড়ে। তার ওপর আবার খাটো।

বলে খুব হাসে। শ্যামার তক্ষুনি মেয়েটাকে ভাল লাগতে থাকে। সে সমবেদনার গলায় জিজ্ঞেস করে—কেন, ভাল শাড়ি আপনার পরতে নেই ?

—বাবা পরতে দেয় না, কিনে দেওয়ার ও লোক নেই।

—গ্রামদেশে ভাল শাড়ি পাওয়া যায় না ?

মেয়েটা মাথা হেলিয়ে বলে—খুব যায়। কলকাতায় নতুন শাড়ি বেরোলে তিনদিনের মধ্যেই এদিকে চলে আসে। গাঁয়ের মেয়েরা সবাই পরে। আমরা ঠাকুরবাড়ির মেয়ে তো, আমাদেরই জোটে না।

—মন খারাপ লাগে, না ?

—লাগবে না ? সাজগোজ করার বয়সই তো এটা, নয় ?

শ্যামা একটু হেসে বলে—বিয়ে হলে পরবেন, তখন তো আর বাধা থাকবে না।

—বিয়ে কে দিচ্ছে!

—কেন ?

—বাবা তার কালী ছাড়া কিছু বোঝেই না। আমি কত বড়টা হয়ে যাচ্ছি কে খেয়াল রাখে! মা ভয়ে বিয়ের কথা তোলে না। এই করেই আমার দিদি একটা বাজে ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেল।

শ্যামা একটু থমকে গিয়ে বলে—সে কী!

—সত্যিই।

শ্যামা একটু হেসে বলে—তবে তো মোনা ঠাকুরেরই সমস্যা অনেক!

মেয়েটা মাথা নেড়ে বলে—না। বাবার কোন সমস্যা নেই।

—এগুলোই তো সমস্যা। যার বেড়ালের বাচ্চা মরে যায়, মেয়ে পালিয়ে যায়,

boiRboi.net

সেই তো সত্যিকারের দুঃখী লোক। সে কি করে অন্যের ভাল করবে?

মেয়েটা একটু উদাস গলায় বলে—কিন্তু তবু বাবার কোনও সমস্যা নেই।

—কেন?

মেয়েটা মুখে আঁচল দিয়ে হেসে বলে—আসলে আমরা তিন বোন, আমার মা, আমাদের মরা ভাইটা, আমাদের বেড়াল—এরা বাবার কেউ না। বাবা হচ্ছেন মোনা ঠাকুর—মস্ত ভক্ত সাধু। আর আমরা, তার পরিবারের লোকেরা হচ্ছি এই আপনাদের মতই বাইরের লোক, বদ্ধ জীব। বাবার কাছে আপন পর বলে ভেদ নেই। যেদিন আমার ভাই মারা যায় সেদিন বাবার পায়ে একটা কাঁটা ফুটেছিল। বাবা ঐ চাতালে বসে লেবুকাঁটা দিয়ে সেই কাঁটা তুলছিল। দৌড়ে গিয়ে যখন বাবাকে খবর দিলাম তখনও কাঁটা তোলা হয় নি। বাবা খবরটা শুনল, তারপর আস্তে আস্তে খুঁটে কাঁটা তুলল, তারপর ভিতর বাড়িতে গেল।

শ্যামা বলে—সে কী!

মেয়েটা হাসে, বলে—সত্যি বলছি। বাবার কোন সমস্যা নেই। আপনাদের সঙ্গে যেমন সুরে কথা বলেন, আমাদের সঙ্গেও তেমন করেই কথা বলেন। আমরা বাবাকে মোনা ঠাকুর বলেই চিনি, বাবা বলে নয়।

চাতাল পেরিয়ে একটা মঠ মত। দক্ষিণে দ্বাদশ শিবের মন্দিরের গা ভেদ করে অশ্বত্থ গাছ গজিয়েছে। মন্দিরের গায়ে শ্যাওলা।

—এসব মন্দির কি বহু দিনের পুরোনো?

—কয়েক শো বছর বোধ হয়। শিব মন্দিরে তক্ষক ডাকে। মেয়েটা হেসেই বলে।

—সুড়ঙ্গটা কোন্ দিকে?

—পশ্চিম দিকে। দেখবেন? নাকি এমনি বেড়াবেন?

শ্যামা মেয়েটির দিকে চায়। সরল সোজা মুখ, অকপট চোখ। কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু টের পাওয়া যায়, এই মন্দির, মোনা ঠাকুর, এ সবের ওপর মেয়েটির কোন টান নেই। মেয়েটা এই মন্দিরের দেবতা বা তার পুজারীকে গ্রহণ করে নি।

শ্যামা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে—আপনি আপনার বাবার সবকিছু বিশ্বাস করেন না?

মেয়েটা চোখ বড় করে হেসে বলে—করব না কেন? আপনাদের যেমন বিশ্বাস আমাদেরও তেমনই বিশ্বাস। তবে—মেয়েটা চুপ করে থাকে।

—তবে কি?

—বলছিলাম, আমার ভাই মরে যাওয়ার দিন ঐ যে বাবাকে পায়ের কাঁটা তুলতে দেখেছিলাম ওটা কখনো ভুলতে পারি না। একজন মরে যাচ্ছে, আর বাবা কাঁটা তুলছে, কেমন যেন মনে হয়। ঠিক যেন সংসারের একটা কাঁটা বাবা তুলে ফেলছে। এরকম করে ভাবলে ভয় করে।

শ্যামার বুকের ভিতরটা গুড় গুড় করে। সে আস্তে করে বলে—কিন্তু বাবার মুখ দেখে উনি কিন্তু ঠিকই বলেছিলেন আমরা কার খোঁজে এসেছি।

মেয়েটা কিন্তু কোন কৌতূহল দেখায় না। কেবল বলে—বাবা তো সবই ঠিক বলে। আমরা জানি। নইলে লোকে আসবে কেন?

—অনেক লোক আসে?

boiRboi.net

—অনেক। ছুটির দিন হলে এ সময়টায় লোক গিজ গিজ করে। কলকাতা থেকেই বেশি আসে।

শ্যামা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—আমার এক দাদা পাঁচ বছর হল হারিয়ে গেছে।

মেয়েটা উত্তর দেয় না। মাথা নিচু করে হাঁটে। শ্যামার তখন মনে পড়ে, এ মেয়েটার ভাই মরে গেছে, একটা মাত্র ভাই। এর দুঃখ আরও বেশি হওয়ার কথা। তার দাদা বেঁচে থাকলেও থাকতে পারে। এ মেয়েটার ভাই নিশ্চিত ভাবে মারা গেছে।

শিব মন্দিরের পাশে একটা টিউবওয়েল দেখে শ্যামার তেষ্টা পায়। বলে—একটু জল খাব।

—আমি বাড়ি থেকে এনে দেব ?

—না, না। ঐ তো টিউবওয়েল।

—আঁজলা করে খেতে অসুবিধে হবে না ?

—দূর।

—তবে চলুন আমি কল টিপে দিই। এখানকার জল খুব মিষ্টি।

জল খাওয়ার সময়ে নিচু হয়ে শ্যামা হঠাৎ শুনতে পেল, কোকিল ডাকছে। সারা গায়ে কাঁটা দিল তার। মুখ তুলে বলল—কি ডাকছে ?

—ওমা ! কোকিল। মেয়েটা হেসে গড়িয়ে পড়ে।

শ্যামা স্থির হতে পারে না ! প্রশ্ন করে—সত্যিকারের কোকিল।

—তা নয় তো কি ?

—অনেক সময়ে মানুষ কোকিলের মত ডাকতে পারে।

মেয়েটা মুখে আঁচল তুলে বলে—এখানে কে আবার মানুষ কোকিল ডাকতে আসবে ? আমি জন্ম থেকে কোকিলের ডাক শুনছি। এ সত্যিকারের কোকিলের ডাক।

শ্যামা জল খেয়ে আঁচলে মুখ মুছে বলে—আমি একজনকে জানি যে হুবহু কোকিলের মত ডাকে। ধরা যায় না যে মানুষ ডাকছে।

মেয়েটা শ্যামার দিকে চেয়ে বলে—কিন্তু এ মানুষের ডাক নয়। ঐ শিমুল গাছে কোকিল বসেছে। সারা দিনই ডাকে। আমি চিনি ঐ ডাক।

চারদিকে ঝোপ-ঝাড় আর গাছে বাতাস বয়ে যাওয়ার শব্দ হয়। রোদের মুখ থেকে মেঘ সরে গেছে। তবু এইখানে রৌদ্রের ততদূর উজ্জ্বলতা নেই। গাছের ছায়ারা পড়ে আছে। শ্যামা তার মুখে গালে নয়নের স্পর্শ ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করে।

—সুড়ঙ্গটা দেখবেন ? মেয়েটা জিজ্ঞেস করে।

—চলুন, দেখি। কখনো দেখিনি।

—দেখার কিছু নেই। মেয়েটা উদাসভাবে বলে—আমরা তো জন্ম থেকে দেখছি।

—এ সবই কি আপনাদের সম্পত্তি ?

—না। দেবত্র। এক জমিদার দেবত্র করেছিল। তার আর বংশ নেই।

BoiRboi.net

আমাদের কিছু ব্রহ্মত্র জমি আছে। আমরা এই মন্দিরের চার পুরুষের পুরুত।

—এখানেই জন্মেছেন ?

মেয়েটা হেসে বলে—তবে আর কোথায় ?

—ভাল লাগে এ জায়গা ?

মেয়েটা মাথা নেড়ে বলে—একদম না। অন্য কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করে। কেউ যদি নিয়ে যেতে চায় চলে যাব।

শ্যামা হেসে ফেলে। বলে—এ জায়গার ওপর আপনার এত রাগ কেন ?

মেয়েটা হেসে বলল—আপনার মত একটা রঙীন সুন্দর শাড়ি পরতে ভীষণ ইচ্ছে হয়, জানেন!

শ্যামা একটা শ্বাস ফেলে। তারা নরম ঘাসের ওপর দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে হাঁটে।

মেয়েটা বলে—খুব সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করে। বাসে-ট্রামে-মোটরগাড়িতে চড়তে ইচ্ছে করে, রেডিও শুনতে ইচ্ছে করে।

—এখানে কিছু নেই ?

মেয়েটা অন্যমনস্ক ভাবে বলে—মাঝে মাঝে অমাবস্যার পুজোয় এই মাঠে সিনেমা দেখান হয়। যাত্রাওলারা আসে। অনেক বছর আগে একটা সার্কাসও এসেছিল। সেই সার্কাসের একটা লোক খেলা দেখাত, তাকে সিংহ থাবা দেয়। সার্কাসের লোকেরা তাকে এইখানেই ফেলে গেল। সে এখনও আছে। ঐ দিকে মন্দিরের উত্তরে বাঁশ-ঝাড়টার পিছনে থাকে। বাবা দেখতে পারে না।

—কেন পারে না ?

—এই গাঁয়ের সে-ই একমাত্র লোক যে এ মন্দিরে আসে না।

—কেন ?

মেয়েটা ম্লান একটু হাসে। বলে,—তার একটা ছেলে আছে। তার বৌ ছেলের জন্ম দিয়েই মারা যায়। বাবা বলে, ছেলেটা ঐ লোকটার নয়! কী ঘেন্নার কথা বলুন! কিন্তু লোকটা বলে যে ছেলেটা তারই। এই নিয়ে ঝগড়া। বলে মেয়েটা আবার হাসে মুখে আঁচল দিয়ে।

তারপর আবার বলে—এখানে কিছু নেই। কেবলই মনে হয়, আমাদের একটা আদ্যিকালের পোড়ো অন্ধকার জায়গায় ফেলে রেখে চারদিকে পৃথিবীটা এগিয়ে যাচ্ছে। কলকাতা থেকে কত লোক আসে, তাদের যত দেখি তত ঐ কথা মনে হয়। বাবা তাদের দুঃখের কথা শোনে, আর আমি দেখি তাদের পরনে কত রঙীন কাপড়ের পোশাক, কী রকম ঝলমলে মুখ চোখ, কেমন দূর মাখানো তাদের চেহারায়!

শ্যামা হাসি চেপে বলে—কিন্তু এ তো কলকাতা থেকে খুব দূর নয়।

মেয়েটা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে—দূর কেন হবে! কত লোক এখান থেকেও চাকরি করতে যায় রোজ, কিংবা সিনেমা দেখে আসে, কেনাকাটা করতেও যায়। কাছেই একটা দুটো শহরও তো আছে। কিন্তু আমরা ঠাকুরবাড়ির মেয়ে বলেই কোথাও যাওয়া হয় না।

মেয়েটা থেমে গিয়ে বলে—ঐ হচ্ছে সুড়ঙ্গের রাস্তা।

একটা উঁচু বেদীর মতো বাঁধানো জায়গা! চারটে থাম, ওপরে সুন্দর একটা চূড়োওয়ালা ছাদ। ছাদের নিচে একটা ছোট্ট ঘর, তার দরজাটা খোলা। মেয়েটা সেদিকে চেয়ে বিস্বাদ মুখে বলে—ঐ। যাবেন?

—কতদূর গেছে সুড়ঙ্গটা?

—বেশি দূর নয়। একটু গিয়েই দেখবেন ছাদ ভেঙে পড়েছে, ইঁটের ডাঁই, আর আগাছা। বাঁশবেড়ের হংসেশ্বরীর মন্দিরে এরকম সুড়ঙ্গ আছে, শুনেছি।

—সাপখোপ নেই তো।

মেয়েটা মুখে আঁচল তুলে হেসে বলে—কত কী আছে! আমরা ছেলেবেলায় চোর-চোর খেলতে যেতাম ওর ভিতরে। বড় হয়ে আর যাই না। অনেকে গুপ্তধনের লোভে খুব খোঁড়াখুঁড়ি করত একসময়ে। কেউ কিছু পায় নি।

শ্যামা হেসে বলে—আমরা যদি কিছু পেয়ে যাই?

মেয়েটা হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ে।

ঘরে ঢুকে প্রথম সিঁড়িতে পা দিয়েই শ্যামা থেমে পড়ে। সামনে গভীর অন্ধকারে নেমে গেছে সিঁড়ি। একটা চামচিকে ডেকে ওঠে।

—অন্ধকার যে!

—কোন ভয় নেই। আমি আগে যাচ্ছি।

মেয়েটা শ্যামাকে পেরিয়ে আগে নামে। শ্যামা পিছনে। আবার হঠাৎ চামচিকে ডেকে ওঠে। এবার একটু দূর থেকে।

মেয়েটা থমকে মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে—আপনার নাম কি?

—শ্যামা।

মেয়েটা হাসে, বলে—আমার নাম তারা।

—জানি।

—আমাদের নামের একই অর্থ।

শ্যামা মাথা নাড়ে। হাসে।

—শ্যামার মন্দিরেই আপনি এসেছেন। অন্ধকারকে কি খুব ভয় শ্যামাদি?

শ্যামা অপ্রতিভ ভাবে হেসে বলে—আমরা তো ভাই শহরের মানুষ, অন্ধকারকে একটু ভয় পাই।

—তবে থাক, গিয়ে কাজ নেই।

—কেন?

—আমার কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে। অনেকদিন নামি নি কিনা।

গভীর অন্ধকার তলদেশ থেকে হঠাৎ একটা টিকটিকি ডেকে ওঠে। শ্যামা উৎকর্ণ হয়ে শোনে।

তিন চার ধাপ সিঁড়ি নেমে গলা পর্যন্ত অন্ধকারে দুজনে একটু দাঁড়িয়ে রইল। সামনে তারা, পিছনে শ্যামা।

তারা একটা শ্বাস ফেলে বলল—আপনার কি নামতে খুব ইচ্ছে করছে?

শ্যামা মাথা নেড়ে বলল—না। বলে সে উঠতে লাগল।

ওপরে এসে, ফাঁকা জায়গায় এবং আলোতে মেয়েটাকে বিমর্ষ দেখাল। শ্যামার

boiRboi.net

দিকে চেয়ে সে বলল—জানেন, আমার সেই ভাইটা মরে যাওয়ার পর থেকেই আমি কেমন যেন ভয়-ভয় পাই। নির্জনে বা অন্ধকারে থাকতে পারি না, কিছু মনে করলেন না তো শ্যামাদি? সুড়ঙ্গটা দেখার খুব ইচ্ছে ছিল আপনার।

শ্যামা অন্যমনস্ক ছিল। খুব অন্যমনস্ক। আসল ডাক আর নকল ডাকের পার্থক্য বোঝা যে কী মুশকিল! সে তারার কথার উত্তর দিল না।

এখনও বেলা আছে। সূর্যের আলো আরও কিছুক্ষণ থাকবে। কেবল পশ্চিমের আকাশে একটা ধোঁয়াটে অস্বচ্ছতা ঘুলিয়ে উঠছে। নিবিড় গাছপালার ওপর দিয়ে একটা বিবর্ণ আকাশ দেখা যায়। এই ঋতুতে এ রকম হয়। মাটির তাপ ওঠে, কুয়াশা জমে স্থির বাতাসে ধুলো ভেসে থাকে। সেই অস্বচ্ছতার আড়ালে সূর্যকে পরিষ্কার গোল চাঁদের মতো দেখা যায়। উজ্জ্বলতা নেই তার। চারপাশে আকাশের সেই অস্বচ্ছতা এক রকম ছায়া ফেলেছে।

মোনা ঠাকুর তার আসন ছেড়ে উঠে গেছে! মা আঁচলে চোখ মুছছে। বাবা স্তব্ধ হয়ে বসে। শ্যামা গিয়ে তার মায়ের পাশে বসল।

—কি হল মা?

মা বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে ধরল তাকে—যদি সত্যি হয় শ্যামা, তবে আমি কালীর সোনার চোখ গড়িয়ে দেব।

—কী হয়েছে বল না!

মা মোনা ঠাকুরের শূন্য আসনটার দিকে চেয়ে ধরা গলায় বলে—ও নাকি বেঁচে আছে। হৃষীকেশ বা হরিদ্বারের দিকে আছে। সন্ন্যাসী হয়েছে, মাথার অসুখ নেই।

বাবা একটা শ্বাস ফেলে বলে—আমি ডেফিনিট্ হতে পারছি না!

মা চোখ থেকে আঁচল সরিয়ে ঝেঁঝে উঠে বলে—আমরা কিছু বলার আগেই উনি কি করে বুঝলেন যে আমরা ছেলের কথা জানতে এসেছি। তুমি তোমার ডেফিনিট্ নিয়ে থাকো গে। আমি হৃষিকেশ যাবো।

বাবা মৃদুস্বরে বলে—এসব বিষয়ে সিওর হওয়া যে কী মুশকিল তা তুমি পুরুষ হলে বুঝতে। এত বছর অপেক্ষা করার পর আশা করতে ভরসা পাই না।

মা বলে—তুমি না পাও আমি পাচ্ছি।

বাবা চুপ করে থাকে।

শ্যামার ভিতরটা মুচড়ে ওঠে ব্যথায়। আবার আনন্দেও। দাদা কি আবার ফিরে আসবে। দাদা কি আর বেঁচে আছে! আবার ফিরে যদি আসে, যদি আবার প্যাণ্ট-শার্ট পরে, আড্ডা মারতে বেরোয়, যদি আবার খাওয়া নিয়ে মার সঙ্গে ঝগড়া করে! যদি আবার আগের মত তারা চারজন রাতের খাওয়ার পর লুডো বা তাস নিয়ে বসে! কত চাল চুরি করত দাদা, মা দেখেও দেখত না। আবার কি সে সব হবে ঠিক আগেকার মত। ঠিক বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। শ্যামা মনে মনে ধরেই নিয়েছিল, দাদা নেই। কোন নদীর পাড়ে বা রেললাইনের ধারে, কিংবা বড় মাঠের মধ্যে সেই পাগল মানুষটা শেষ হয়ে পড়ে আছে—এ রকমটাই মনে হত

তার, মাঝরাতে ঘুম ভেঙে ধক্ করে কেঁপে উঠত বুক। বাবা প্রায় সময়েই বলত—দ্যাখো গে, কোথাও ভিক্ষে-টিক্ষে করছে বোধ হয়। মার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, দাদা সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। মায়ের কথা, বাড়ির কথা সে ভুলে গেছে বলেই আসছে না। একদিন ঠিক ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মতো ফিরে আসবে। আবার 'মা' বলে ডাকবে, বিয়ে করবে, চাকরি করবে ..। শ্যামার ঠিক বিশ্বাস হয় না। এ সব তো সিনেমায় হয়, গল্পে হয়, কিন্তু তার দাদার বেলায় হবে কি?

তাকে কাছে টেনে, আদর করে, কপালের চুল সরিয়ে দিয়ে গাঢ় আনন্দের স্বরে মা বলল—শ্যামা, একটু পরেই সন্ধ্যে লেগে যাবে মা, আমরা আরতিটা দেখে যাব।

—দেরি হয়ে যাবে না?

—হোক গে। এ বড় জাগ্রত দেবতার স্থান! একটু থাকি।

বাবা বিড় বিড় করে বলে—দিনকাল ভাল নয়।

মা বড় চোখে বাবার দিকে চায়। বাবা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

উদাস একখানা মাঠ। শেষ বেলার বালিরঙের আলো পড়ে আছে। একখানা টিনের দোচালার দাওয়ায় বসে বাপ-ব্যাটা।

ছেলে মুখ তুলে বলে—বাবা, দাদুবুড়ো কেমন করে হাঁটে।

—দাদুবুড়োর কোমর বাঁকা, কুঁজো হয়ে মাজায় হাত রেখে হাঁটে।

—কামড়ায় না।

—কামড়ায়।

—কেমম লাগে?

—লাগে না। দাদুবুড়োর দাঁত নেই তো, কেবল মাড়ি! কামড়ালে কাতুকুতু লাগে।

সুকুল হেসে গড়িয়ে পড়ে। তার বাবা হাসতে গিয়ে দেখে, কোণাকুণি মাঠ পার হয়ে নয়ন আসছে। কোকিল ডাক। কোকিলের ডাকই নয়নের বেশি প্রিয়।

সে কাছে আসতেই ছেলের বাপ হাসে, বলে—শ্যামাপাখির ডাক পারেন না?

নয়ন খুব গম্ভীর। মাথা নাড়ে। না।

—কি হল ওখানে?

—কিছু না। এখানে আরতি হবে।

—বসুন।

নয়ন দাওয়ার একধারে বসে। সুকুল উঠে তার দিকে চায়।

—কোথায় গিয়েছিলে?

—কল্পতরুর মন্দিরে।

—মোনা ঠাকুর ভীষণ রাগী। কামড়ায়।

নয়ন কেবল মৃদু একটু হাসে।

—তুমি আমাকে কখন পাখীর ডাক শেখাবে?

boiRboi.net

—কাল থেকে শেখাব।

—আমি ঘুমোলে চলে যাবে না তো?

—না।

সুকুল নিশ্চিন্ত মনে তার বাবার দিকে চেয়ে বলে—বাবা, সিংহটা তোমাকে কেমন করে থাবা দিয়ে মেরেছিল বল।

লোকটা নয়নের দিকে চেয়ে হাসে। বলে—এই গল্প ও কতবার শুনেছে, তবু রোজ শুনবে।

নয়ন ঝুঁকে বলে—কি গল্প?

—গল্প না। একটা ঘটনা।

—আপনাকে সিংহ থাবা দিয়েছিল?

লোকটা উদাস গলায় বলে—সিংহ কি না কে জানে। আদুবুড়ো বলত, সেটা কেশরী বাঘ।

—সেটা কি?

—সিংহই আসলে। তবে গাউস সাহেবের গরিব সার্কাসে আর কত বড় সিংহ হবে! আদুবুড়ো বলত—আসল সিংহ হয় গহীন জঙ্গলে, সেখানে মানুষ যেতে পারে না। গাউস একটা কেশরী বাঘ ধরে এনে সিংহ বলে চালাচ্ছে। আমাদেরও সেই ধারণাই ছিল।

—আপনি সার্কাসে ছিলেন? খেলা দেখাতেন?

—দেখাতাম। প্রথম প্রথম। চুল দিয়ে লোহা তুলতাম, কিলিয়ে পাথর ফাটাতাম। গায়ের জোর ছিল খুব। একদিন তাঁবুর দড়ি খাটাতে গিয়ে পড়ে যাই। মাজা ভেঙে শেষ হয়ে গেলাম। গাউস অবশ্য লোক খারাপ ছিল না। দলে রেখে দিল। ফাই-ফরমাস তামিল করতাম, বাঘ সিংহকে খাবার দিতাম. হাতীর জন্য কলাগাছ কেটে আনতাম। এই সামনের মাঠে একবার গাউস সাহেব তাঁবু ফেলল। নির্জন জায়গা বাঘ সিংহের ডাকে কেঁপে উঠল। তা এইখানেই সেই ঘটনাটা ঘটে। দুপুরবেলা খাবার দিতে সিংহের খাঁচায় নেমেছি। বুড়ো আধমরা সিংহ, নড়াচড়া করত না বড় একটা, খাঁচায় ঢুকলে হাই তুলে নিরীহ চোখে চাইত। দেখেশুনে মনে হত, আদুবুড়োর কথাই ঠিক। এটা সিংহ নয় বটে, কেশরী বাঘই হবে। সেদিন কী খেয়াল হল, মাংসের একটা বড় টুকরো সিংহের নাকের সামনে নেড়ে সরিয়ে নিচ্ছিলাম। দেখি ব্যাটা করে কী। এইরকম পাঁচ-সাতবার করবার পরও সে ব্যাটা কেবল হাই তুলল, আর চোখ পিট পিট করল। মজা পেয়ে আবার তার নাকের সামনে মাংস দুলিয়ে সরিয়ে নিই। ঠিক বুঝতে পারি নি। হঠাৎ বেমক্কা সব আল্‌সেমি ঝেড়ে ফেলে সিংহটা লাফিয়ে উঠল। সে কী ডাক। ভিতরটা আমার ফেটে গেল যেন। সেই ডাক সামলাবার আগেই উপর্যুপরি কয়েকটা থাবা। তারপর এক ঝটকায় আমাকে পেড়ে ফেলে আমার পিঠের ওপর দাঁড়াল সে। পাঁজরার একটা হাড় গেল মট্ করে ভেঙে। সময়মত গাউস্ সাহেব চাবুকের শব্দ না করলে আজ আর আমাকে সুকুলের বাবা হতে হত না। বলে লোকটা তার ছেলের দিকে ঝুঁকে পড়ে হাসতে থাকে।

সুকুল বলে—দেখি দাগ।

লোকটা জামা সরিয়ে পিঠ দেখায়। নয়ন দেখে, সেখানে গভীর এবং লম্বা ক্ষতের চিহ্ন। সে জিজ্ঞেস করে—তারপর কি হল ?

—কি আবার হবে ! একটু দূরে মহকুমার হাসপাতালে মাস চারেক পড়ে রইলাম। ততদিনে গাউস পাততাড়ি গুটোল। আমারও সার্কাস ভাল লাগছিল না বলে পিছু নিলাম না। এই গাঁয়ের একজন লোক তখন আমাকে ধরেছিল তার মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য। বিয়ে করলে বিশ বিঘে জমি দেবে, ঘর দেবে, নগদ বিদায়ও দেবে কিছু। মেয়েটাও মন্দ ছিল না। বিয়ে করে থেকে গেলাম। সেই মেয়েই সুকুলের মা। বেশিদিন বাঁচে নি।

লোকটা চুপ করে মাঠের বালিরঙের আলোর দিকে চেয়ে রইল। একটু অন্যমনস্ক। কী যেন ভাবল। তারপর হঠাৎ সম্বিৎ পেয়ে বলল—বাবা সুকুল, তুমি বই নিয়ে একটু বস। আমি রান্না চাপাই। ঘরে অতিথি আছে।

ঘরে সবকিছুই সাজানো। একদিকে বাপ ব্যাটার খাট, অন্যধারে একটা ন্যাংটো চৌকি। চতুর্দিকেই সুকুলের খেলনা। চাল থেকে বেলুন ঝুলছে, দেয়ালে পেরেকে লটকানো ঘুড়ি লাটাই, কাচের আলমারি বোঝাই পুতুল, খেলনা-পিস্তল, ভেঁপু, লাট্টু, কলের ঘোড়া। আলনায় সুকুলেরই রঙ-বেরঙের জামাকাপড়। একধারে সুকুলের পড়ার টেবিল, তাতে পড়ার বইয়ের পাশে রাজ্যের ছবির বই। পরিষ্কার করে মোছা একটা ঝকঝকে লণ্ঠন রাখা।

লোকটা নয়নকে ঘরটা দেখিয়ে বলে—এ হচ্ছে সুকুলেরই ঘর। সুকুল যখন বড় হবে, তখন ওর বিয়ে দিয়ে আমি চলে যাব।

সুকুল ঝাঁপিয়ে গিয়ে বাবাকে ধরে, কিল মারে নীরবে।

লোকটা হাসে, ছেলেকে সামলাতে সামলাতে বলে—আচ্ছা, আচ্ছা, যাব না। তুমি বই খুলে বস। আমি ভিতরের বারান্দায় বসে রান্না করি।

ভিতরে অন্ধকার উঠোন। তাতে জোনাকি পোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। নয়ন চুপ করে বসে চেয়ে ছিল। দূরে আরতির ঘণ্টা বাজছে। তার কান সেইদিকে।

লোকটা ভাত চাপিয়ে এসে পাশে বসে বিড়ি ধরায়।

—কিছু হল ?

—না।

—সুড়ঙ্গে নেমেছিলেন নাকি ? মাথার চুলে ঝুল লেগে আছে।

—নেমেছিলাম। কিন্তু ও নামে নি।

—নামল না কেন ?

নয়ন ঠোঁট উল্টে বলে—কী জানি। বোধ হয় আপনাদের মোনা ঠাকুর আগেভাগে সব জেনে ওকে সাবধান করে দিয়েছে।

—ঠাকুরকে দেখলেন ?

নয়ন মাথা নেড়ে বলে—দেখেছি। দূর থেকে।

boiboi.net

—কেমন মনে হল ?

—যেমন হয়।

—পারবেন ?

—কি ?

—উচ্ছেদ করতে ?

নয়ন একটু হাসে। তারপর আস্তে করে বলে - একটা বোমা মারলেই উড়ে যায়।

লোকটা ধীরে ধীরে বিড়িটা টানে। তারপর চিন্তা করে বলে—শত্রুকে দুর্বল ভাবতে নেই।

নয়ন একটু নড়ে। গালে একটা মশা মারে ঠাস করে। পায়ের পাতা খস্ খস্ করে চুলকোয়। কান খাড়া করে আরতির ঘণ্টা শোনে। হঠাৎ বলে—আপনার টর্চ আছে ?

—আছে একটা। আমার নয় সুকুলের। ছোট্ট টর্চ, তেমন জোরাল নয়।

—দিন তো। বলেই উঠে দাঁড়ায়।

—চললেন কোথায় ?

—ওদের এগিয়ে দিয়ে আসি।

—চিনতে পারবে না ?

—না। অন্ধকার আছে। টর্চটা নিচু করে ফেলব।

—গলার স্বর ?

নয়ন হেসে বলে—আমি হরবোলা।

লোকটা নিঃশব্দে উঠে গিয়ে ছোট্ট টর্চটা এনে দেয়। নয়ন কয়েকবার চারদিকে আলো ফেলে দেখে নেয়। বলে—চলবে।

ঘর দিয়ে বাইরে যাওয়ার সময়ে সুকুল তাকে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে—এ কি চলে যাচ্ছ ?

—না সুকুল। ফিরব।

—কখন ?

– তুমি একটু জেগে থাক। তোমার ঘুমোবার আগেই ফিরব।

—যদি না ফের ?

নয়ন টর্চটা উঁচু করে দেখিয়ে বলে—তোমার বাতি নিয়ে যাচ্ছি তো, এটা ফেরত দিতেও ফিরব।

—ফিরো কিন্তু। কাল থেকে ডাক শিখব।

আরতির ঘণ্টা এখনও বাজছে। মাঠটা কোণাকুণি দ্রুত পার হতে থাকে নয়ন। জোনাকি পোকার মতো আলো জ্বালে আর আলো নেভায়।

boiRboi.net

মোনা ঠাকুরের শরীর ছন্দে দুলে যায়। কী সুন্দর তার শরীরের কারুকাজ। যে কোন নর্তকের চেয়ে নমনীয় তার শরীর—বেতের মত। কখনো পিছনে হেলে, কখনও সামনে ঝুঁকে নাচে। আলোয় দেখা যায়, মোনা ঠাকুরের মুখে এক বিহ্বল হাসি, চোখে জল, দৃষ্টি সম্মোহিতের মত মোহাচ্ছন্ন। তার প্রকাণ্ড ছায়া দেয়াল জুড়ে, এক অপ্রাকৃত ছায়ার সঞ্চার করে। সেই দৃশ্য দেখে শ্যামার ভয় করে! এ যেন এক অন্য জগতে চলে এসেছে সে। ধুনো আর গুগ্‌গুলের গন্ধের সঙ্গে ঘষা চন্দন আর ফুলের গন্ধ মিশে গেছে। মন্দিরের বন্ধ বাতাসে শতাব্দী ধরে সঞ্চিত শীতলতা! এ যেন এই জগৎ নয়।

মা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। বাবা চোখের জল মোছে। শ্যামার হাত পা আড়ষ্ট লাগে, পিপাসা পায়। তার মাথা ঝিম্-ঝিম্ করে। মনে হয়, সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। সে স্পষ্ট দেখতে পায় আরতির ঘণ্টার সঙ্গে নাচতে নাচতে, কেঁদে হেসে মোনা ঠাকুর কালীর সঙ্গে কথা বলছে। বিপুল কালীমূর্তির দুই চোখে ভয়াল দৃষ্টি, লোল জিহ্বায় আলো পড়ে ঝিকিয়ে ওঠে হিংস্রতা। ঘাম তেল গড়িয়ে নামছে মুখ বেয়ে। শ্যামা চোখ ফিরিয়ে নেয়। অনেকক্ষণ অসাড় লাগে তার মন। মনে হয়, মোনা ঠাকুরের কথার উত্তরে ঐ মূর্তি এক্ষুনি হেসে উঠবে, কথা বলবে।

আরতি শেষ হতে হতে সাড়ে সাতটা বেজে গেল। তখনও মোনা ঠাকুর মাটিতে পড়ে আছে। কাঁদছে। তারপর অসাড় হয়ে গেল। মোনা ঠাকুরের রোজ আরতির শেষে ভর হয়।

দৃশ্যটা দেখে বাবা স্তব্ধ হয়ে থাকে! মা শব্দ করে কাঁদে। শ্যামার শরীরে ঘাম দেয়।

ঘোর ঘোর একটা মানসিক অবস্থা বহু দূর পর্যন্ত তাদের সঙ্গে সঙ্গে যায়। রওনা হতে হতে পৌনে আট। রাস্তা অন্ধকার। গাঁয়ের লোকেরা কিছুদূর সঙ্গে সঙ্গে এল, তারপর তারা তিন জন। আর কেউ নেই। কেউ কথা বলতে পারছে না এখনও।

আমবাগানের সামনে এসে বাবা থমকে দাঁড়ায়, মুখ ফিরিয়ে বলে—এ যে ভীষণ অন্ধকার! কি করে যাবে?

মার এখনও সঠিক জ্ঞান ফেরে নি যেন। মা কাঁদছে এখনও। ধরা গলায় বলে—ভয় কি! চল ঠিক চলে যাব।

—যেতে তো হবেই। কিন্তু এই অন্ধকারে খুব রিস্কি। বেলাবেলি চলে গেলে কোন ঝামেলা ছিল না।

—তোমার কেবল পিছু টান। কোথাও তোমার সঙ্গে গিয়ে শান্তি নেই। ঠাকুর দেবতার ব্যাপার, সেখানে দু দণ্ড মনটাকে রাখতে হয়, ঘরের চিন্তা করলে কি চলে?

বাবা বিড় বিড় করে বলে—সাপখোপ কত কী আছে হয়ত।

boiboi.net

তবু যেতেই হবে। বাবা শ্যামাকে ডেকে বলে—তোকে নিয়েই ভয়, আমরা দুনিয়ার বার। তুই মাঝখানে থাক, সামনে আমি পিছনে তোর মা। বলে বাবা গলা খাঁকারি দেয়। দু তিনবার হাতে তালি বাজিয়ে শব্দ করে।

শ্যামা এই সময়েও ঐ কাণ্ড দেখে হেসে ফেলে বলে—ও কি করছ?

—দেশ-গাঁয়ে অন্ধকারে এভাবে শব্দ করে হাঁটতাম। জীবজন্তু সব শব্দ পেয়ে সরে যায়।

বাবা বার বার গলা খাঁকারি দিয়ে হাঁটে। সামনের পথ খুবই আবছা। রাস্তা উঁচুনিচু। বার বার পায়ে ঠক্কর লাগে। কয়েক পা হেঁটেই বাবা বলে—কি করে যাবে? হাঁটাই যাচ্ছে না।

—চল তো, যা হবার হবে। মা কালী আমাদের দেখবেন। মা ধমকে বলে।

তবু বাবা সাহস পায় না। সাবধানে হাঁটে। পা দিয়ে রাস্তা হাতড়ে।

নয়ন কি চলে গেছে। শ্যামা উৎকর্ণ হয়ে চারদিককার শব্দ শুনবার চেষ্টা করে। ঝিঁঝির শব্দ ছাড়া কোন শব্দ নেই। এক-আধটা প্যাঁচার ডাক দূর থেকে শোনা যায়। ঐ কি নয়ন? কে জানে।

—এদিকে রাতে লোক চলাচল নেই দেখছি! বাবা চিন্তিত গলায় বলে।

মা ঝংকার দিয়ে বলে—তোমার অত ভয় থাকলে তুমি পিছনে এসো। আমি সামনে যাচ্ছি।

বাবা একটু রেগে গিয়ে বলে—তুমি বড় সাহসী কিনা! মেয়েছেলের এগারো হাতে কাছা হয় না. বড় বড় কথা।

—তোমাদেরই কাছা দেওয়া উচিত নয়। ঘোমটা দাও। তখন থেকে কেবল চোর-ডাকাত সাপ-খোপের কথা বলে যাচ্ছ।

—তোমাদের আর কি? সঙ্গে পুরুষ মানুষ রয়েছে। সব হ্যাপা সে সামলাবে। তোমাদে গা আলগা দিয়ে থাকলেই হল।

কথা বেশিদূর গড়াল না। সামনের অন্ধকারে জোনাকি পোকা জ্বলছিল। তার মধ্যে একটা জোনাকি যেন একটু বড়। একবার অনেকক্ষণ জ্বলে নিভে গেল। লক্ষ্য করে শ্যামা বাবাকে ডেকে বলে—বাবা, সামনে টর্চ হাতে কেউ যাচ্ছে। দ্যাখো।

বাবাও দেখল। বলল—মনে হচ্ছে। তোরা পা চালিয়ে আয় তো!

মা ঝংকার দেয়—কী বুদ্ধি! যদি ছেলে-ছোকরা হয় তবে কি আমরা হেঁটে তাকে ধরতে পারব? ডাকো না লোকটাকে, দাঁড়াতে বল।

বাবা বিড় বিড় করে একবার বলে—কেমন লোক কে জানে। তারপরই গলা ছেড়ে ডাকাডাকি শুরু করে—ও মশাই, শুনছেন, এই যে—

সামনের বাতিটা থামে। একটা টর্চের মুখ চক্ চক্ করে ওঠে। তারা এগোয়।

লোকটাকে দেখা যায় না। টর্চটা নিচু করে ধরা। একটু মোটা ভাঙা গলার লোকটা বলে—কিছু বলছিলেন আজ্ঞে?

বাবা বলে—কোন্ দিকে যাবেন? বড় রাস্তা পর্যন্ত?

boiboi.net

—ওদিকেই।

—আমরাও যাব। অন্ধকারে বড় বিপদে পড়েছি।

—চলুন না, আমার সঙ্গে চলুন। কোথায় এসেছিলেন, কল্পতরু মন্দিরে নাকি ?

—হ্যাঁ। বড় জাগ্রত দেবতা। যা দেখে গেলাম ভোলবার নয়। আপনি কি এদিককার লোক ? বাবা জিজ্ঞেস করে।

—পাশের গাঁ। মোনা ঠাকুরকে ছেলেবেলা থেকে দেখছি।

—কেমন লোক ?

—কী আর বলি বলুন। তবে উনি আমাদের এই এলাকার গৌরব।

শ্যামা টর্চের আলোর আভায় প্রথমে প্যান্টের রঙটা চিনতে পারে। তারপর হলুদ শার্টটার আভাস পায়। গায়ে কাঁটা দেয় তার। শীত করে। নয়ন আড়ালে থাকলে যত ভয়, কাছে এলে এত ভয় করে না শ্যামার। কিন্তু বাবা মার সামনে এভাবে আসা ভীষণ বিপদজনক! যদি ধরা পড়ে যায় নয়ন! হাত পা শিরশির করতে থাকে তার।

তারা হাঁটে। আগে নয়ন, তার পিছনে তারা তিনজন সারিবদ্ধ।

বাবা নানা কথা বলতে থাকে। নয়ন মোটা ভাঙা গলায় উত্তর দেয়।

—এদিকের কোন ডেভেলপমেন্ট হয় নি, না ? বাবা বলে।

—কোন্ দিকটারই বা হয়েছে বলুন ?

—রাস্তাঘাট কেমন এখানে ?

—যেমন দেখছেন। এই সব রাস্তায় হেঁটেই আমরা বড় হলাম।

—বিপদ আপদ ?

—সাপখোপ আছে।

—চোর ডাকাত ?

—শুনি না তো বড় একটা।

বাবা একটু গম্ভীর থেকে বলে—চোর ডাকাত না থাক, অভাব তো আছে। অভাবী মানুষ, দুঃখী মানুষ যত বাড়বে ততই অমঙ্গল। সেই সব মানুষই রঙ পাল্টে চোর ডাকাত হয় কিনা! তা ছাড়া লাশ-ফেলা পলিটিক্স আছে। কাজেই ভয়-ভীতি এখন সর্বত্র।

—তা অবিশ্যি ঠিক। তবে এদিকে কখনও কিছু হয়নি। তবে হবে।

—কি করে বুঝলেন ?

—দেশের অবস্থা দেখে বুঝছি। শিগ্গিরই দেখবেন, এদিকেও লাশ পড়ছে।

শ্যামা অন্ধকারে আপন মনে একটু হাসে। কোথায় যেন বুনো ফুল ফুটেছে। তার গন্ধ পায় শ্যামা। মনটা চনচন করে ওঠে। ভাল লাগে। ঐ তো টর্চ হাতে নয়ন সামনে চলেছে। এখন আর কোন ভয় নেই। তারা ঠিক বাস-রাস্তায় পৌঁছে যাবে।

boiRboi.net

একটা আলু টপ্‌কে দিলেই মোনা ঠাকুর ফিনিশ। তার মা কালীর পায়ের তলায় শুয়ে রক্ত-বমি করতে করতে চোখের পটল ওল্টাবে। নয়ন সব জানে। তবে কিনা নয়নের সঙ্গে মোনা ঠাকুরের কোন ঝগড়া নেই। কিন্তু লেগে যাবে একদিন।

মন্দিরের আরতি হয়ে গেছে। শিকের দরজা পড়ে গেছে মন্দিরে। শিকের ফাঁক দিয়ে বিগ্রহ দেখা যায়। কালীমূর্তি বাঙালীমাত্রেরই আজন্ম চেনা। সেই জিভ-বের-করা আধ-ন্যাংটো নৃমুণ্ডমালিনী। কোন ভক্ত যেন সোনার চোখ গড়ে দিয়েছিল, সেই সোনালী চোখে প্রদীপের আলো ঝলসাচ্ছে, আর গায়ের ঘাম তেল। নয়নের কোন আগ্রহ ছিল না, কেবলমাত্র মন্দিরটার কারুকাজ আর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কিছু কৌতূহলবশতঃ সে জুতো ছেড়ে মন্দিরের বারান্দায় উঠে এল। ফুল বেলপাতা ধুনো গুগ্‌গুল এসব গন্ধ তো আছেই, কিন্তু সব ছাপিয়ে ওঠে এক-দেড়শো বছরের ছায়ায় ঢাকা শ্যাওলা-পড়া সেঁতসেঁতে গন্ধ। মন্দিরের বারান্দাটা ঠাণ্ডা হিম। চামচিকে আর কবুতরের শব্দ পাওয়া যায়। কেউ কোথাও নেই। নয়ন ঝুলন্ত ঘণ্টাটায় একবার টং শব্দ করে, তারপর শিকের দরজাটা নেড়ে দেখে। তালা দেওয়া বারান্দার দিকে দু পাট ভারী, লোহার গুল মারা দরজা খোলা রয়েছে, সে দুটো আরও রাতে বন্ধ করে দেওয়া হবে। দুটো শিক দু হাতে ধরে নয়ন মন্দিরের আধ-অন্ধকার ঘরখানা দেখল। এই ঘরে মোনা ঠাকুরের ভর হয়, দৈববাণীও হয় নাকি। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে ভূতের গায়ের গন্ধে ম ম করে চারদিক। দুটো শিক দু হাতে চেপে নয়ন কালীর সোনার দুটো চোখের দিকে স্থির চেয়ে রইল একটুক্ষণ। এই চোখে প্রাণসঞ্চার হতে কেউ কেউ দেখেছে। নয়ন চেয়ে থাকে। আলো-আঁধারির ভিতর থেকে দুখানা নিষ্প্রাণ সোনার চোখও চেয়ে থাকে তার দিকে। কালীর গায়ে কিছু খাঁটি, নিরেট সোনার গয়না লক্ষ্য করে নয়ন। বিগ্রহের বেদী পুরোটা রুপো দিয়ে মোড়া। এই হচ্ছে মোনাঠাকুরের স্টেজ। সঠিক আলো গন্ধে শব্দে রহস্যময় আবহ, দর্শকরা নিরক্ষর গরীব ভবিষ্যৎ-ভীরু মানুষ, এই মঞ্চে মোনা ঠাকুর ভর হওয়া রামকৃষ্ণের অভিনয় করে। দর্শকরা রোমাঞ্চিত হয়। চোখের জল ফেলে। তবু মোনা ঠাকুরের ওপর কোন আক্রোশ ছিল না নয়নের। কারণ এ অঞ্চলে সে আজই প্রথম এসেছে। এসেছিল শ্যামার পিছু নিয়ে। শ্যামা কোনদিনই পাত্তা দিল না তাকে। নয়ন সবই বোঝে। তবু ছাড়তে পারে না। শ্যামা তাকে ভালবাসে না হয়ত। তাতে নয়নের খুব বেশী কিছু যায় আসে না। হৃদয়ের খেলা পৃথিবীতে শেষ হয়ে গেছে। এটা প্রয়োজনের যুগ। কাউকে কাউকে কারও প্রয়োজন হয় মাত্র। যেমন, নয়নের প্রয়োজন শ্যামাকে। যদি সারা জীবনের জন্য নাও হয় ক্ষতি নেই, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য শ্যামাকে তার পেতেই হবে।

ঘটনাটা ঘটেছিল এইভাবে। শ্যামা আজ তার মা বাবার সঙ্গে এইখানে মোনা ঠাকুরের মন্দিরে আসবে এই খবরটা নয়ন শ্যামাদের বাচ্চা চাকরটার কাছে আজ সকালেই পেয়ে যায়। সময়টা জানা ছিল না। তবু অনেক সকালেই সে জাতীয়

সড়কের ধারে বাস থেকে নেমে গাঁয়ের হাটে অপেক্ষা করছিল। তখনই হাটের লোকজনের কাছে সে মোনা ঠাকুরের সব কাহিনী জেনে নেয়। শ্যামারা এসেছিল হেমন্তের বিকেল যখন মানুষজনের ছায়া দীর্ঘতর করেছে, ধানের রূপসী মুখে কনে দেখা আলো তখন। শ্যামাকে সে একবার দেখেছিল মাত্র, তারপরই ভীড়ে ডুব দেয়। কারণ শ্যামার বাবা মার তাকে দেখলে স্ট্রোক হওয়ার ভয় আছে। নয়ন জানত, শ্যামারা যাবে আমবাগানের ভিতর দিয়ে। সেটা দীর্ঘ পথ। নয়ন হাটের লোকজনের কাছে জেনে নিয়েছিল, মোনা ঠাকুরের কালী মন্দিরে যাওয়ার একটা জঙ্গুলে ছোট পথ আছে। ভাঙা বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে যাওয়া যায়। খানিকটা তাড়ি গিলেছিল সে তারপর। যখন হাঁটা দিয়েছে তখনই মাথাটা এলোমেলো, ঠিক মনে নেই, আবছা মনে পড়ে, একটা ভাঙা বিপজ্জনক সাঁকো বুকে হেঁটে পেরিয়ে জঙ্গল ভেদ করে আমবাগানের ভিতর একটা ভাঙা বাড়িতে শ্যামার পথ চেয়েছিল সে। পেয়েও ছিল শ্যামাকে। কি সব উল্টোপাল্টা কাণ্ড করেছিল যে! শ্যামার বাবা মা একটু এগিয়ে গেছে তখন, আর শ্যামা পোড়া বাড়িটার হাতায় ভাঙা ফোয়ারার পাশে একটা লতানে গোলাপ গাছ থেকে একটি গোলাপ তুলছিল। সে সময় নয়ন তাকে আক্রমণ করে। উল্টোপাল্টা কী সব বলেছিল যেন, বিয়ে করতে চেয়েছিল শ্যামাকে। তারপর জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করেছিল। সবটাই তাড়ির ঘোরে। নইলে অতটা হয়ত করত না। ঠিক সেই সময়ে একটা লোক তার বাচ্চা ছেলেকে এক হাতে ধরে, অন্যহাতে একটা জীবন্ত গোখরো সাপ নিয়ে তাদের পথে এসে পড়েছিল। ছেলেটা চীৎকার করে ওঠায় তার ঐ উন্মত্ত আবেগ কেটে গিয়েছিল।

নয়নের একটা দোষ এই যে কোন একটা ব্যাপারে তার মন বেশীক্ষণ লেগে থাকতে পারে না। তার মনটা টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সুইচবোর্ডের মত। মুহুর্মুহু লাইন পাল্টে কানেকশন নেয়। লোকটার হাতে ঐ সাপ দেখে সে শ্যামাকে ভুলে লোকটার পিছু নেয়।

এই জায়গার কিছুই নয়ন চেনে না। শ্যামারা শেষ বাসে চলে গেল। শ্যামার বাবা মা টের পায়নি যে নয়ন এতদূর এসেছিল। সবই ঠিক আছে। কিন্তু এখন বড় একা লাগছে তার। নিঃসঙ্গ অবসাদগ্রস্ত।

কালীর সোনার চোখের দিকে চেয়ে সে খুব গভীরভাবে শ্বাস নিল। দেড়শো বছরের পুরোনো একটা গন্ধে ভরে গেল বুক। তাড়ির কিছু নেশা এখনও তার মাথার মধ্যে রয়ে গেছে। টলমল করছে মাথা। ঠিকমত চিন্তাশক্তি এখনও ফিরে আসছে না। হরবোলা নয়ন দুটো শিস দিল। অবিকল তিতিরের মত। তারপর পুরোনো মন্দিরের গাছ শুঁকে শুঁকে বারান্দায় ঘুরে বেড়াল খানিকটা। অন্ধকার চারদিকে। মোনা ঠাকুরের বাড়ির বাইরের ঘরে লণ্ঠনের আলো দেখা যায়। সে শুনেছে আরতির পর ঐ ঘরে একটা ধর্মসভা হয়। গাঁয়ের চাষীরা আসে, সাধারণ মানুষেরা আসে, বুড়ো-বৌ-বাচ্চারা ঘিরে বসে। মোনা ঠাকুর তাদের ধর্মের কথা শোনায়। শ্যামারা এখানে কেন এসেছিল তা ঠিক জানে না নয়ন। তবে আন্দাজ করতে পারে, শ্যামার দাদা বছর পাঁচেক আগে পাগল হয়ে নিরুদ্দেশ হয়। বহুকাল

ধরেই শ্যামাদের পরিবারের ঐ একটা দুঃখ, বহু সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে ওরা যায় পাগল ছেলের খোঁজ পাওয়ার জন্য। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে শ্যামা নিজেই। রঙটাই যা ময়লা শ্যামার, নইলে শ্যামায় চটক আছে। ঐ কালো রঙ উপেক্ষা করে পুরুষেরা ওর জন্য পাগল। তাদের কাউকে বেছে নেওয়ার ক্ষমতা শ্যামার নেই। সর্বোপরি রাহুর মত নয়ন লেগে আছে পিছনে। শ্যামাকে নিয়েও ওদের ভয় কম নয়। কে যেন কবে টান দিয়ে শ্যামাকে নিয়ে যায়! তার সঙ্গে কবে শ্যামার বিয়ে হবে এটা জানাও ওদের দরকার। সেই কারণেই মোনা ঠাকুরের কাছে আসা।

মোনা ঠাকুরকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাববে কি না ঠিক বুঝতে পারে না নয়ন। প্রতিদ্বন্দ্বী তার অনেক, প্রতিদিনই এক-আধজন বেড়ে যায়। মন্দিরের ঘণ্টায় আর একবার টং করে শব্দ করে সে অন্যমনস্কভাবে। মোনা ঠাকুরেরর বাইরের ঘর থেকে একটা লোক লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে দূর থেকেই প্রশ্ন করে—কে ?

নয়ন উত্তর দেয় না, লোকটা এগিয়ে আসে, জবুথবু বুড়ো একটা লোক। হেমন্তের শীতেই মাথা-মুখ ঢেকে চাদর জড়িয়েছে। কুঁজো হয়ে মাঠটা পেরিয়ে এসে লণ্ঠনটা তুলে ধরে বলে—কে আজ্ঞে ?

—কেউ না। মন্দির দেখতে এসেছি। আমাকে চিনবেন না।

লোকটা গলায় কফের শব্দ করে বলে—এত রাতে কোথা থেকে এলেন আজ্ঞে ?

—যেখান থেকেই আসি না, আপনার কি ?

লোকটা স্তম্ভিত, এবং ভীত মুখে চেয়ে থাকে একটুক্ষণ। নয়ন একটা সিগারেট ধরায়, মন্দিরের বারন্দায় দাঁড়িয়েই লোকটা লণ্ঠন তুলে ধরে আছে। নয়ন লোকটার মুখ দেখে। সর্বভারতীয় মুখ একখানা, পথে-ঘাটে বাজারে হাটে গঞ্জে এরকম একই রকম বৈশিষ্ট্যহীন মুখ যে নয়ন কত দেখেছে। এসব মানুষকে একজনের থেকে আর একজনকে আলাদা করে চেনাই মুশকিল।

লোকটা লণ্ঠন নামিয়ে নিয়ে বলে—দেখুন আজ্ঞে। মন্দির দেখতে বাধা কি ? মায়ের মূর্তিখানা বুক ভরে, নয়ন ভরে দেখে নিন। তবে কিনা দিনকাল খারাপ।

নয়ন ঝেঁঝেঁ উঠে বলে—কিসের খারাপ ?

লোকটা নরম সুরেই বলে—গাঁয়ে অচেনা লোক এলে মানুষের একটু ধন্ধ লাগে। ছেলে-ছোকরারাও সজাগ। গাঁ চৌকী দেয়। আপনি নতুন নাকি আজ্ঞে ?

—তা দিয়ে আপনার কি ?

—জিজ্ঞেস করি আর কি! এত রাতে নতুন লোক বলেই বলছি। অচেনা জায়গা।

নয়ন একটু হাসে—তা মায়ের স্থান যখন, ভয় কি ?

লোকটা কিছু বলে না। চেয়ে থাকে একটু। তারপর বলে—ঠাকুর তো আসরে বসে গেছেন। যদি যেতে চান তো চলে আসুন।

চকিত একটা লাফ দিয়ে নয়ন উঁচু বারান্দা থেকে বেড়ালের মত নিঃশব্দে মাঠে নামে। লোকটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে—ঠাকুর কে ?

—মোনা ঠাকুর আজ্ঞে আর কে হবেন! মনোময় দেবশর্মা তিন পুরুষে এই মন্দিরের পূজারী। ওঁর ঠাকুর্দা নরবলি দিতেন। দু হাতের দশ আঙুলে ওঁদের

boiRboi.net

যা শক্তি তা দিয়ে গ্রহ-নক্ষত্র এধার ওধার করে দেন। নাম শোনেন নি ?

তাড়ির নেশাটা এখনও ফিকে হয়ে লেগে আছে। নয়ন নইলে একটা উত্তর দিত ঠিক। দিল না। কেবল একটু হাসল। অবশ্য উত্তর দিলেও লাভ ছিল না। এরা যা একবার বোঝে তা সহজে ভোলে না। সে শুধু বলল—মোনা ঠাকুরের কাছে গেলে বশীকরণ করবে না তো ?

—কি বললেন ?

—বলি ভেড়া বানিয়ে রাখবে না তো ?

লোকটা হাসে—ঠাকুর কত কী করে তার আমরা কী জানি। তবে ভয় পাই না। উনি কাউকে ভয় দেখান না বড় একটা। ক্ষতিও করেন না।

—আপনি যান। আমি সময় হলে যাব।

লোকটা বিনীত ভাবে বলে—রাতে ঘণ্টার শব্দ করলে মায়ের বিশ্রাম ভেঙে যায়। মায়ের শয়ন হয়ে গেছে।

নয়ন চুপ করে থাকে। লোকটা তেমনি কোলকুঁজো হয়ে অন্ধকারে ফিরে যায় লণ্ঠন হাতে।

পকেট থেকে সুকুলের দেওয়া টর্চটা বের করে কুয়াশামাখা অন্ধকারে এধারে ওধারে ফেলে নয়ন। মন্দিরের ওপাশে একটা পুরোনো সুড়ঙ্গ আছে। বেশীদূর যাওয়া যায় না। রাস্তা বুজে গেছে। প্রাচীন কালে মানুষেরা সুড়ঙ্গ তৈরী করত। সব প্রাচীন সুড়ঙ্গই বোধ হয় এখন বন্ধ হয়ে গেছে। প্রাচীন সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে একদিন। নয়ন তা জানে। একটা আলু টপ্‌কালে কোথায় যাবে মোনা ঠাকুর !

কিন্তু মোনা ঠাকুরের ওপর তেমন কোন রাগ নেই তার। বলতে কী একজন মোনা ঠাকুর এখানে আছে বলেই শ্যামারা এইখানে এসেছিল আর এসেছিল বলেই আমবাগানে একপলকের জন্য শ্যামার দেহের স্বাদ পেয়েছিল সে। অবশ্য মোনা ঠাকুরের সঙ্গে একটা লড়াই শেষ পর্যন্ত তাকে লড়তেই হবে। ধর্মকে উচ্ছেদ করাই হবে শেষ কাজ। মন্দির ভেঙে চৌরস করে যাবে রাজপথ, মসজিদ-গীর্জা ভেঙে তৈরী হবে ক্ষেত। তাতে সোনার ধানে ঢেউ খেলবে, কিংবা তৈরী হবে শিশুদের জন্য বাগান, যুবক-যুবতীদের মিলন-ক্ষেত্র। কী যে হবে তা নয়ন জানে না। কিছু একটা হবেই। হয়ত সেই সুদিন দেখার জন্য সে বেঁচে থাকবে না।

নয়ন বারান্দাটায় আবার ওঠে। উঁচু হয়ে বসে সিগারেটে শেষ কয়েকটা টান দেয়। তার আজকাল কেন যেন মনে হয়, আর খুব বেশীদিন সে পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে না। তার দিন ফুরিয়ে এসেছে।

উত্তুরে একটা বাতাস এল হঠাৎ। নয়নের শীত করে ওঠে। সে জবুথবু হয়ে বসে। চারদিকের নিস্তব্ধ শীতলতা অনুভব করে। আর শ্যামার কথা ভাবে। কালো, সুন্দর এবং দুর্লভ শ্যামার কথা। এই মন্দিরে আজ শ্যামা এইখানে এসেছিল।

থুতু ফেলে নয়ন উঠল। গায়ের পাতলা শার্টটা ভেদ করে বাতাস লাগছে। শ্যামার পিছু পিছু ফিরে যায় নি নয়ন। যায় নি ঐ সাপওলা লোকটার জন্য, হয়ত মোনা

ঠাকুরের জন্যও। শ্যামাকে ঠিকই পেয়ে যাবে নয়ন, চিন্তা নেই। আপাতত মোনা ঠাকুর আর সাপওলা লোকটার রহস্য ভেদ করে যাওয়াটাই তার কাছে দরকার।

মোনা ঠাকুরের বাইরের ঘরে কয়েকটা ঝক্ঝকে লণ্ঠন জ্বলছে। কয়েকজন লোক এধার ওধার বসে আছে। দেয়ালে পিঠ দিয়ে মোনা ঠাকুর। তেমন কিছু চেহারা নয়। শরীরটা মেদহীন ঝরঝরে, গায়ের রঙ তামাটে, শুধু চোখ খুব উজ্জ্বল। খালি গায়ে একটা সাদা উড়ুনী মাত্র জড়ান। হাঁটু দুটো বুকের কাছে তোলা। পাশে বিড়ির বাণ্ডিল, দেশলাই।

নয়ন খোলা দরজায় দাঁড়াতে মোনা ঠাকুরই তার দিকে প্রথম তাকাল, সেই তাকানোর মধ্যে কোন বিস্ময় বা কৌতূহল নেই। প্রতিদিনই বহু মানুষ আসে তার কাছে, সুতরাং মোনা ঠাকুর আর বিস্মিত হয় না। কেবল ঘরের অন্য লোকেরা ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। বুড়োটা এসে বোধ হয় তার কথা আগে ভাগে বলে রেখেছে।

—আসতে পারি? নয়ন জিজ্ঞেস করে।

মোনা ঠাকুর ঘাড় নাড়ল উত্তর দিল না।

নয়ন ঘরে ঢুকে চারদিকে একবার তাকায়। তার ভাবভঙ্গী সহজ এবং উদ্ধত। এই লোকগুলোর চেয়ে যে সে সব বিষয়ে উন্নত, এরকম একটা তাচ্ছিল্যের ভাব সে ইচ্ছে করেই ফুটিয়ে তোলে। চারদিকে কয়েকটা ছোট পাটির আসন পাতা। সে একটু পিছনের দিকে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল। ঘরে কোন কথা নেই। সবাই চুপ। যেন তার উপস্থিতিই ঘরের আবহাওয়াকে অস্বাভাবিক করে দিয়েছে। কেউ কথা বলছে না, সবাই অলক্ষ্যে নিঃশব্দে তার দিকে লক্ষ্য রাখছে। যেন এক্ষুনি কিছু একটা ঘটাবে নয়ন, কিছু অদ্ভুত কথা বলবে। সবাই তাই অপেক্ষা করছে।

মোনা ঠাকুর আস্ত একটা বিড়ি শেষ করে ফেলল। ততক্ষণ কেউ কথা বলল না। নয়ন দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে বসে চেয়ে আছে। আক্রমণ ইচ্ছে করলেই সে করতে পারে, কিন্তু মুড নেই। আপাতত, সে কেবল দেখে নিচ্ছে। হাটে মানুষজনের কাছে সে শুনেছে মোনা ঠাকুর এ অঞ্চলের প্রধান মানুষ। কয়েকটা গাঁ জুড়ে অখণ্ড রাজত্ব। হাত দেখা, কোষ্ঠী বিচার, সাপের বিষ নামান, মারণ বশীকরণ সবই মোনা ঠাকুরের হাতের পাঁচ। সম্মোহন বিদ্যায় ওস্তাদ। কলকাতা থেকেও ছুটির দিনে বিস্তর মানুষ আসে তার কাছে।

এরকম কোন মানুষের কথা শুনলেই নয়ন ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পাড়ার গুণ্ডা কিংবা রাজনৈতিক নেতা কিংবা যে কোন লাইনেই কেউ প্রধান হয়েছে শুনলে নয়নের ভিতর একটা স্বাভাবিক আক্রমণ করার ইচ্ছে জেগে ওঠে। হাত বাড়িয়ে লোকটাকে তার জায়গা থেকে ছিঁড়ে এনে ধুলোয় পিষে দিতে ইচ্ছে করে। এই পৃথিবীতে তার তুল্য বা তার চেয়ে বড় কেউ আছে, এই চিন্তাটাই সে সহ্য করতে পারে না।

বিড়িটা শেষ করে মোনা ঠাকুর তার দিকে তাকায়। নয়ন একদৃষ্টে চেয়ে ছিল।

চাখাচোখি তাকিয়ে মোনা ঠাকুর নরম গলায় জিজ্ঞেস করে—বাবুমশাই, জায়গাটা কেমন লাগল ?

নয়ন ঘাড়টা পিছনে হেলিয়ে অবহেলায় বলল—খারাপ কি ?

—এদিকেই কি ক'দিন থাকার ইচ্ছে ?

—থাকতে পারি। ঠিক নেই।

—জায়গাটা ভালই। তবে কিনা আপনারা শহর-গঞ্জের মানুষ।

—আমি শহর-গঞ্জের মানুষ একথা কে বলল ?

—নন ?

নয়ন একটু হেসে বলে—না। আমি সব জায়গার মানুষ। গ্রামেরও।

মোনা ঠাকুর একটু চুপ করে থাকে। অনেক্ষণ পরে বলে—আসলে গাঁ আর শহর জুড়েই তো মানুষের জীবন। কোন্ ঠাঁইয়ে তার বাস তা থেকে বিচার হয় না। তা এখানে উঠেছেন কোথায় ?

—সাপওলা একটা লোক আছে, তার বাড়িতে রাতটা থাকব।

সাপওলা লোক শুনে আবার সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখে।

মোনা ঠাকুরের মুখে কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না, সাধারণ গলায় বলে—সাপওলা লোক তো একমাত্র জগদীশ। তা তার সঙ্গে আত্মীয়তা আছে না কি ?

—থাকলেই কি ?

—কিছু না। জিজ্ঞেস করলাম। মানুষজনের পরিচয় জেনে রাখাটা আমাদের অভ্যাস। তাহলে আপনি তার আত্মীয় নন ?

নয়ন দেয়ালে মাথাটা হেলিয়ে অবহেলায় বলল—না। আমি একটা মেয়ের পিছু নিয়ে এখানে এসে পড়েছিলাম। পথে সাপওলা জগদীশের সঙ্গে আলাপ।

মেয়ের পিছু নেওয়ার কথা শুনে দু-একজন তার দিকে তাকাল। মোনা ঠাকুরের মুখ তেমনই ভাবলেশহীন। নয়ন গ্রাহ্য করল না।

—থাকবেন ?

—দেখি। আমার কিছু ঠিক নেই।

মোনা ঠাকুর কথার মাঝখানে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। হাতড়ে বিড়ির বাণ্ডিল থেকে একটা বিড়ি নিয়ে ধরায়। তারপর হঠাৎ একটু হাসে। নয়নের দিকে চেয়ে বলে—সে আমাকে দেখতে পারে না।

—কে ?

—জগদীশ।

নয়ন চুপ করে থাকে।

মোনা ঠাকুর নিজেই বলে—জগদীশ এ গাঁয়ে আসে সার্কাসওয়ালাদের সঙ্গে। তোমার মনে আছে হরিপদ, সিংহের থাবা খেয়ে জগদীশের সেই যে পাঁজর ভেঙেছিল ?

লণ্ঠনওলা লোকটা বোধহয় আফিং খায়। উড়ুনী জড়িয়ে উবু হয়ে মাথা ঝুলিয়ে বসে আছে। নিজের নাম শুনে মুখটা তুলে গলায় কফের ঘড়ঘড়ে একটা শব্দ করল মাত্র।

boiboi.net

মোনা ঠাকুর নয়নের দিকে চেয়ে বলে—জগদীশ বড় কালীভক্ত ছিল। মায়ের থানে রোজ আসত। আমি একদিন তাকে বলি যে আমি কালীটালী কিছু জানি না। আমি গুরু জানি। আমার পুজো হচ্ছে আসলে গুরুর পুজো। সে তখন উল্টে বলল—তাহলে আপনি ভণ্ড, কালী মানেন না তো পুজো করেন কেন? আমি উল্টে বললাম—তো রামকৃষ্ণদেব পুজো করত কেন? বেদান্ত মানলে তো মূর্তি পুজো চলে না। রামকৃষ্ণ ঠাকুরও আসলে যার পুজো করত সে দক্ষিণা কালী নয় গো, সে হচ্ছে গুরু। ঠাকুর নিজেই বলেছেন—মেয়েরা ততদিনই পুতুল খেলে যতদিন তাদের বে না হয়। সেই থেকে জগদীশের সঙ্গে আমার বখেরা। তা বাবুমশাই, বলেন তো কোন্‌টা ঠিক! এই মূর্তিপুজো না গুরুপুজো?

নয়ন ঠিকমত শুনছিল না। শুধু বলল—কে জানে! মানুষের কত বাতিক থাকে!

—আপনি গুরু মানেন না?

—না!

মোনা ঠাকুর একটু, খুব সামান্য মাত্র, একপর্দা উত্তেজিত গলায় বলে—আপনি কখনও কারও কাছ থেকে কিছু শেখেন নি? এমন কি অ-আ-ক-খ ও নয়?

নয়ন বিরক্ত হয়ে বলে—শিখব না কেন?

—তবে?

—তবে কি? কারও কাছ থেকে কিছু শিখলেই সে গুরু হয়ে যায় না কি?

—না মানলে হয় না, মানলে হয়।

—তাহলে তো আমার গুরু অনেক। যার কাছে যা শিখেছি, সবাই গুরু!

—তাই তো। আপনার চেয়ে যার জ্ঞান-গুণের ওজন বেশী সে-ই গুরু। ওজনওলা লোক চাই। যার যেমন ওজন সে তেমন গুরু। আপনার গুরুদের মধ্যে কার ওজন সবচেয়ে বেশী বাবুমশাই?

নয়ন একটু হাসে! তারপর বলে—কার্লমার্ক‌স্‌।

মোনা ঠাকুর একটুও চমকায় না। বলে—তো সে-ই আপনার সবচেয়ে বড় গুরু।

—আপনি মূর্তি মানেন না? তবে যে হাটে শুনলাম আপনার কালীমূর্তি নড়ে-চড়ে, কথা কয়?

মোনা ঠাকুর নিভন্ত বিড়িটায় আর একবার আগুন দেয়। নয়নের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর বলে—বাবুমশাই, মেয়েটা কে?

নয়ন উদাস গলায় বলে—ওই মেয়েটিকে আমি বিয়ে করব।

শুনে লোকজন নড়ে চড়ে বসে। লণ্ঠনওলা লোকটারও ঝিমুনি চোট খায়।

মোনা ঠাকুর ঠাণ্ডা গলাতে বলে—ও, তারপর একটু চুপ থাকে, তারপর ধীরে বলে—একটা মেয়ে তার বাপ মার সঙ্গে এসেছিল বটে আজ বিকেলে। শ্যামলা রঙ, মুখে চোখে শ্রী আছে। সে-ই কি?

—সে-ই। ওরা আপনাকে কি বলেছে?

মোনা ঠাকুর একটু অন্যমনস্ক চোখে শূন্যে চেয়ে থাকে। তারপর বলে—ঐ মেয়েটার বড় ভাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করেছিল। সে বছর পাঁচেক ধরে নিরুদ্দেশ।

boighar.net

মোনা ঠাকুর আবার বিড়ি ধরায়, তারপর বলে—এমনিতে তো সংসারটা সুখেরই হওয়ার কথা ছিল। বুড়ো-বুড়ি, একটা ছেলে, আর একটা মেয়ে, ঝুট-ঝামেলা কিছু নেই। তবু একটা গাঁট পড়ে গেল। ভারী দুঃখ ওদের।

নয়ন অধৈর্যের গলায় বলে—শুধু ওদের ছেলের কথা জিজ্ঞেস করল? আর কিছু না?

মোনা ঠাকুরের মুখে একটা কুটিল হাসি ফুটে ওঠে, বলে,—আর তো মনে পড়ছে না। হাসিটা ঠোঁটে রেখেই মোনা ঠাকুর তার দিকে চেয়ে থাকে একটুক্ষণ, তারপর বলে—তা পাত্রী তো ভালই বাবুমশাই। লেগে যান।

বিদ্রূপটা ধরতে কষ্ট হয় না তার। ভিতরটায় দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে। কিন্তু তবু বাইরে সে শান্তই থাকে। স্থির ও কঠিন চোখে মোনা ঠাকুরের দিকে চেয়ে সে বলে—আমাদের বিয়ে কোন শালা আটকাতে পারবে না।

মোনা ঠাকুর একটু নরম, যেন বা সান্ত্বনার সুরে বলে—আটকানোর কি। করবেন বিয়ে। গরীব-গুর্বো, কুঠে-ভিখিরিও বিয়ে করে। ও আঁর এমন কি? করলেই হয়।

—তার মানে?

—বললাম বিয়ে তো আখছারই হয়। অঘোন পড়ল তো শানাই ধরল পোঁ। কান ঝালাপালা, বিয়ের মাসে এই মায়ের থানেই কত নতুন বর-বৌ আসে। বিয়ে সবাই করতে পারে। কলকাতার ফুটপাতে ভিখিরিদের বিয়ে দেখেন নি?

নয়নের ভ্রূ কুঁচকে আসে, ভ্রূর তলা দিয়ে সে মোনা ঠাকুরকে নিরীক্ষণ করে বলে—বিয়ে যে হয় তা আমিও জানি। কিন্তু বিশেষ একজনের সঙ্গে বিশেষ আর একজনের বিয়ে হয় কি না সেটাই সমস্যা।

—আপনার বাধা কি?

—আমরা তেলী, ওরা বামুন। ওর বাবা মা এ বিয়ে চাইছে না।

মোনা ঠাকুর সকৌতুকে তার দিকে চেয়ে বলে—আর মেয়েটা?

—সে ও চাইছে না। কিন্তু জাতের জন্য নয়, বাবা মার জন্য। কিংবা অন্য কারণ থাকতে পারে।

—তাহলে?

—তাহলেও কিছু যায়-আসে না। আমি ওকে জোর করে কেড়ে আনব। কোন শালা কিছু করতে পারবে না।

—কে কি করবে বাবুমশাই?

নয়ন স্থির দৃষ্টিতে মোনা ঠাকুরের দিকে চেয়ে বলল—ওরা ওদের ছেলের কথা ছাড়া আর কিছু বলে নি?

—কি বলবে?

—আমার কথা? বলে নি যে নয়ন নামে একটা লকড় ছেলে শ্যামার পিছনে ছায়ার মত ঘোরে? বলে নি সেই ছেলেটার জ্বালায় ওদের মেয়ে রাস্তায় হাঁটতে পারে না?

মোনা ঠাকুর মাথা নেড়ে বলে—না।

boiRboi.net

নয়ন একটু হাসে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করে—আপনি বাণ মারতে পারেন?

মোনা ঠাকুর নয়নের চোখে চোখে চায়। তারপর মাথা নেড়ে বলে—ওসব আমি জানি না।

নয়ন অবাক গলায় বলে—জানেন না? কিন্তু লোকে বলে, আপনার বিজনেস-ই হচ্ছে বাণ মারা। সেই যে মাটিতে ছবি এঁকে ছোরা বসিয়ে দিলে যার ছবি আঁকা হয়েছে সে মুখে রক্ত তুলে, পা ছুঁড়ে দাপিয়ে মরে যায়? ওরা আপনাকে বলে নি নয়ন রায়কে বাণ মারতে হবে?

মোনা ঠাকুর দুঃখিত মুখ করে বলে—না বাবুমশাই।

নয়ন একটা কৃত্রিম স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলে—যাক, বাঁচা গেল।

মোনা ঠাকুর তার দিকে মিট মিট করে চেয়ে থেকে বলে—বাণ মারার চিন্তা করে খুব কি ভয় পেয়েছিলেন বাবুমশাই?

নয়ন কৃত্রিম গাম্ভীর্যে বলে—ভীষণ।

—আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হয় না।

—কি মনে হয় না?

—যে আপনার ভয়-ডর আছে।

নয়ন একটু হাসে। তারপর শান্ত বিদ্রূপের গলায় বলে—আপনি তো ছবিতে বাণ মারেন! কিছু লোক আছে যারা সত্যিকারের মানুষটাকেই বাণ মারে, সামনা-সামনি। আপনার বাণের চেয়ে এই বাণ আরও বিপজ্জনক। দেখবেন? বলে নয়ন তার শার্টটা কোমরের কাছ থেকে টেনে তোলে, তারপর হাত দিয়ে পেট আর তলপেটের মাঝামাঝি দু-আড়াই ইঞ্চি একটা গভীর ক্ষত দেখায়। কয়েকজন লণ্ঠন তুলে ঝুঁকে পড়ে। দেখে। মোনা ঠাকুর উদাস মুখে বসে থাকে।

বছর চল্লিশ বয়সের ধূর্ত চেহারার একটি লোক ঝুঁকে দাগটা দেখে মুখে চুক্ চুক্ শব্দ করে বলে—কি হয়েছিল?

—স্ট্যাব্। ঠান্ডা গলায় বলে নয়ন।

—জোর বেঁচে গেছেন, ছোরাটা ঠিকমত টানতে পারে নি। পারলে বাঁচতেন না।

মোনা ঠাকুরের দিকে চেয়ে নয়ন বলে—যারা আমাকে হিন্দু হোস্টেলের পাশের গলিতে এক রাতে টেনে নিয়ে গিয়েছিল তারা আপনার চেয়ে অনেক ভাল বাণ মারতে পারে। তাদের বাণে ভুলচুক হয় না। কলকাতায় এবং অন্য জায়গায় এরকম বিস্তর লোক নয়ন রায়কে বাণ মারার সুযোগ খুঁজছে। ভয় পেলে আমার চলে না মোনা ঠাকুর।

মোনা ঠাকুর উত্তর দেয় না। চিন্তিত মুখে অন্যমনস্ক হাতে হাতড়ে বিড়ির বাণ্ডিলটা খোঁজে। নয়ন তার চারদিকে চায়। লণ্ঠনওলা বুড়োর ঝিমুনি পুরোপুরি কেটে গেছে, হাঁ করে চেয়ে আছে নয়নের দিকে, গলায় অবিরল কফের শব্দ হচ্ছে ঘড়্ ঘড়্। একজন প্রৌঢ় মানুষ নস্যি রঙের খদ্দরের চাদর গায়ে সামনে বসে আছে, কালো হাতে সাদা একটা ঘড়ি, চোখে চশমা, বোধহয় গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টার, নাড়ুগোপালের মত থল্ থলে মুখ। লোকটা মোনা ঠাকুরের দিক থেকে

ইতিমধ্যেই অর্ধেক ঘুরে বসেছে নয়নের দিকে। মুখে একটা বিস্মিত বোকা হাসি। চল্লিশ বছরের ধূর্ত চেহারার লোকটা নিশ্চিত পঞ্চায়েতের লোক, রোগা রোগা হাত-পা, মাথার চুলে প্রচুর তেল, গায়ে বিয়ের শালটা আধময়লা ধুতির ওপর বেমানান। লোকটা অনেকখানি ঘেঁষে নয়নের কাছাকাছি এসে গেছে। তার চোখে-মুখে চঞ্চল কৌতূহল। মোনা ঠাকুরের বাঁ ধারে আরও দুজন লোক বসে আছে। তারা চাষী-বাসী শ্রেণীর, ভাবলেশহীন এবড়ো-খেবড়ো মুখ। চোখে নির্বুদ্ধিতার নিষ্প্রভতা। তারা নয়ন আর মোনা ঠাকুরের চাপান-ওতরটা ঠিকমত বুঝতে পারছিল না এতক্ষণ। ছুরি-ছোরার কথায় একটু চাঙ্গা হয়ে চেয়ে দেখছে নয়নকে। খুন-খারাপী যে তারা কিছু না দেখেছে এমন নয়, তবে নয়নের চোটপাটের কথাবার্তা যে তারা পছন্দ করছে তা তাদের মুখে সম্ভ্রমের ভাব দেখেই বোঝা যায়। মোনা ঠাকুরের ডান ধারে পুঁটুলির মত তিন চার জন মেয়েছেলে। তাদের রি-অ্যাকশন নয়ন এই অল্প আলোতে ঠিক বুঝতে পারল না। তবে এটা ঠিক, মোনা ঠাকুরের দিক থেকে সকলে মনোযোগ নিজের দিকে এনে ফেলেছে। সেটা পেরেছে বলে একটু তৃপ্তি বোধ করে নয়ন। এখন ইচ্ছে করলেই সে মোনা ঠাকুরের আসনটিকে একটি ধাক্কা দিতে পারে, কিন্তু তা দেবে না নয়ন। সময়ের অপেক্ষা করা ভাল। তাছাড়া, মোনা ঠাকুরের ওপর নয়নের যথেষ্ট রাগ হচ্ছে না।

অনেকক্ষণ বাদে মোনা ঠাকুর একটা শ্বাস ফেলে। নয়নের দিকে চায়। তারপর জিজ্ঞেস করে—আপনার কি অনেক শত্রু?

নয়ন আত্মবিশ্বাসের হাসি হেসে বলে—অনেক।

—কেন বাবুমশাই?

সে কথার উত্তর না দিয়ে নয়ন হঠাৎ বলে—আপনি আমাকে বাবুমশাই-বাবুমশাই বলছেন কেন?

—শহরের মানুষ আপনারা, সম্‌-সম্মান করা ভাল।

—শহরের মানুষ কি আলাদা কিছু? আমি শহর-গ্রাম আলাদা করে বুঝি না। এই যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা যেমন, আমিও তেমনি।

—তাই কি হয়। জায়গা বুঝে আমরা মানুষ চিনি।

—শহরের মানুষকে আপনারা বেশী সম্মান করেন কেন?

—তারা যে তাই চায়। গাঁয়ের লোকেরা তাদের সমকক্ষ তো নয়।

—ওটা ছেঁদো কথা। আসলে আপনারা নিজেদের খাটো ভাবেন।

—তা হোক বাবুমশাই, তা হোক। লোককে শ্রদ্ধা-সম্মান করার শিক্ষা ভালই। ওতে ক্ষতি হয় না।

নয়ন ধরতে পারে কথাটার দ্বিতীয় অর্থ আছে, যা তাকেই বলা। নয়ন গায়ে মাখল না। কেবল বলল—আমার—আমার শত্রুর কথা জিজ্ঞেস করছিলেন না?

—আজ্ঞে।

—ঐ যে যেমন আমি ঐ মেয়েটাকেই চাই বলে ওর মা-বাপ আমার শত্রু, তেমনি আমি আরও অনেক কিছু চাই বলে আরও অনেকে আমার শত্রু।

মোনা ঠাকুর চুপ করে বিড়িতে টান দেয়। বিড়ি খাওয়ার একটা নিজস্ব ধরন

আছে তার। যেন ধোঁয়া তার বুক পর্যন্ত পেঁছয় না, গলা থেকেই ফিরে আসে। দু একবার ছোট্ট টান দিয়ে বলে—মেয়েমানুষের ক্ষমতা অনেক। মা হয়ে, বৌ হয়ে, মেয়ে হয়ে কত খেলা যে দেখায়। পুরুষের জান লবেজান। তা মেয়েমানুষ বাদে আপনি আর কি চান?

নয়ন মাথা নেড়ে বলে—মেয়েমানুষ চাই বটে, তবে ঐ মেয়েটিকেও চাই। ওকে না পেলে আমার ক্ষিদে মিটবে না।

কথাটার নির্লজ্জতা সবাইকে স্পর্শ করে। এই নির্লজ্জতারও একটা স্বীকারোক্তির মত আকুলতা আছে। এর সাহস সবাইকে আকর্ষণও করে। ল্যাংটো কথার জোর বেশী।

নয়ন বলে—আর যা চাই তা হচ্ছে ক্ষমতা মোনা ঠাকুর। এই জায়গায় আপনার যেমন ক্ষমতা, দেশ জুড়ে তেমনি ক্ষমতা চাই। ক্ষমতা পেলে কী করব তার কি কোন ঠিক আছে? তবে হয়ত আপনাকে এবং আপনার মত লোকদের উচ্ছেদ করব। মন্দির-মসজিদ-গীর্জা ভেঙে তৈরী করব রাস্তা, ক্ষেত, শিশুদের জন্য বাগান। বড়লোকদের ধরে চাবকাব তারা বড়লোক বলে, গরীবদের ধরে চাবকাবো তারা গরীব বলে। অলস আর চোরদের তাড়িয়ে দেব। কত কী প্ল্যান আছে আমার! দেখবেন।

মোনা ঠাকুর একটু হেসে বলে—মেয়েমানুষদের ধরে চাবকাবেন তারা মেয়েমানুষ বলে আর পুরুষদের তারা পুরুষ বলে।

—তা কেন? আমি কি পাগল? মেয়েমানুষ আর পুরুষমানুষ দুটো দুরকম প্রাকৃতিক সৃষ্টি। সেটা তাদের দোষ নয়।

—তো গরীব বা বড়লোক হওয়াটা কি দোষের?

—নিশ্চয়ই। যে বড়লোক সে পাঁচজনেরটা একা ভোগ করে বলে দোষী, যে গরীব সে নিজের স্বার্থ বজায় রাখতে পারে না বলে দোষী।

এটা যুক্তি নয়, নয়ন জানে। কিন্তু কুযুক্তির মধ্যেও জোর প্রকাশ করাটা তার স্বভাব। তাতে কাজ হয়।

সবাই চুপচাপ তার দিকে চেয়ে আছে। আত্মতৃপ্তিতে তার ভিতরটা টুল্‌ টুল্‌ করে। নয়ন বাঁ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরায়। হেডমাস্টার আর গ্রাম-পঞ্চায়েতের লোক দুজন কথা বলছে গুন গুন করে। লণ্ঠনওলা বুড়ো স্খলিত চাদরটা দিয়ে মুড়িসুড়ি দিয়ে বসেছে। বাইরে অবিরল ঝিঁঝির ডাক। দূরে একঝাঁক শেয়াল চীৎকার করে। কুকুর কাঁদে। জ্যোৎস্না ফুটেছে নাকি। কুয়াশায় মাখা জ্যেৎস্নার দৃশ্য নয়নের বড় প্রিয়। মলিন পৃথিবীর গায়ে কে যেন ছবি এঁকে দেয়। অলৌকিক ছবি।

উঠে পড়তে যাচ্ছিল নয়ন। ঠিক সেই সময়ে সে মেয়েটিকে দেখল। ভিতরের দরজায় কপাটের আড়ালে ছায়ায় মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। বিকেলেও দেখেছিল, শ্যামার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে মন্দিরের মাঠে। মোনা ঠাকুরের মেয়ে। মুখ চোখ খারাপ না। শরীরটাও ভালই। ভোগের চাল-কলা খেয়ে দিব্যি আছে। এমনিতে মেয়েটির প্রতি নয়নের কোন আকর্ষণ বোধ করার কথা নয়। কিন্তু শ্যামা ক্রমশঃ

boiRboi.net

দূরে চলে যাচ্ছে, তার নাগালের বাইরে, এই চিন্তাটা তার ভিতরে একটা আক্রোশ জাগিয়ে তোলে। শোধ নিতে ইচ্ছে হয়। ভীষণ ক্ষিদে জেগে ওঠে। এই মেয়েটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেললে এক ধরনের তৃপ্তিকর অবসাদ আসত তার। ভিতরটা তার কখনও জুড়ায় না। কখনও না। কেবল যখনই সে কোন মেয়েকে আক্রমণ করে, উন্মোচন করে ফেলে তার সবকিছু, নিংড়ে নেয় দেহ, কেবল তখনই একটা অবসাদের প্রলেপ পড়ে ভিতরটায়। নইলে সে জ্বলছে, জ্বলছে।

কপাটের ছায়া থেকে মেয়েটির চোখ তারই চোখে পড়ে আছে। সে তা স্পষ্ট অনুভব করে। নির্লজ্জের মত তাকিয়ে থাকে। হেডমাস্টার একবার গলা খাঁকারি দেয়, পঞ্চায়েতের লোক নড়ে চড়ে নয়নের আরও কাছে আসে, নয়ন সে সব খেয়ালই করে না। তাকিয়ে থাকে।

মোনা ঠাকুর হয়ত নয়নকে তাকিয়ে থাকতে লক্ষ্য করেই অনুচ্চস্বরে বলে—কপাটের আড়ালে কে রে? তারা?

মেয়েটি আলোর মধ্যে আসে। হাতে চাবি। বলে—বাবা মন্দিরের কপাটে তালা দেব?

—দে। উদাস গলায় বলে মোনা ঠাকুর।

পরনে পুজোর খাটো কাপড়, খোলা এলো চুল, মাজা পরিষ্কার শরীর, সতেজ দাঁত। সাজগোজ নেই বলে মেয়েটার সুস্বাদ শরীর তাকে আরও আকর্ষণ করে। তক্ষুনি উত্তেজিত হয়ে ওঠে নয়ন, হাত-পা নিশপিশ করতে থাকে তার। দাঁতে দাঁত চাপে সে। চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে মেয়েটা এক ঝলক চোখ তাকে দিয়ে যায়। আত্মবিস্মৃতের মত মেয়েটার পিছু নেওয়ার জন্য নয়ন উঠে দাঁড়ায়। সে ইঙ্গিত বোঝে, সে নিমন্ত্রণ পেয়ে গেছে।

—দাদা কি চললেন? উলতে বলতে পঞ্চায়েতের লোকটা তার সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়, বলে—আমিও জগদীশের বাড়ির দিকেই থাকি, কুমোরপাড়া, চলুন এগিয়ে দিই।

—আমার সঙ্গী দরকার হয় না।

—দু চারটে কথাও বলব খন, চলুন না।

—'শুয়োরের বাচ্চা'। মনে মনে গালি দিল নয়ন। তার ভিতরটা ঝিমিয়ে এল।

বাইরে জ্যোৎস্না ফুটেছে ঠিকই। কুয়াশার পাতলা আবরণ চারদিকে। একমাত্র এই হেমন্তেই এরকম অপার্থিব ব্যাপারটা দেখা যায়। দরজা থেকে দৃশ্যটা দেখে নিয়ে সে মুখ ফিরিয়ে মোনা ঠাকুরকে বলে—চলি।

মোনা ঠাকুর ঘাড় নাড়ে, তারপর বলে—বাবুমশাই, আজ সারা বিকেল এ অঞ্চলে খুব কোকিল ডেকেছে, তিতির পাখী ডেকেছে, আরও কত কী পাখী। পাখীর ভাষা যারা বোঝে তারা জানে ওসব আসল পাখী নয়। নকল।

নয়ন একটু হাসে। তারপর বলে— আপনি পাখীর ভাষা জানেন?

মোনা ঠাকুর মাথা নেড়ে জানায় যে সে জানে না। মুখে বলে—কিন্তু কেউ কেউ জানে।

boiboi.net

লোকজন একটু অবাক হয়ে দুজনকে দেখছিল, সেই হেডমাস্টার লোকটা বলে উঠল—বাস্তবিক ঠাকুরমশাই, আজ কোকিলের ডাক খুব শুনেছি বটে। এ সময়ে এত ডাকে না তো!

নয়ন বা মোনা ঠাকুর কেউ কোন উত্তর দিল না লোকটার কথায়। কেবল নয়ন বলল—মোনা ঠাকুর, মনে হচ্ছে আপনি পাখীর ভাষা জানেন। নইলে ওটা যে নকল ডাক তা আজ পর্যন্ত কেউ ধরতে পরে নি।

মোনা ঠাকুর চুপ করে থাকে।

নয়ন হঠাৎ বলল—কিন্তু মোনা ঠাকুর, মানুষের মানব-কথা যখন পাখীর ডাক হয়ে যায় তখন সে ভাষা বুঝবার ক্ষমতা আপনার নেই। ঐ নকল ডাকেও কিছু কথা বলা ছিল।

মাঠের রাস্তাটা মন্দির ঘুরে নাবালে নেমে গেছে। মন্দিরের দরজা বন্ধ করে মেয়েটা সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে। অক্ষম আক্রোশে দৃশ্যটা দেখলে নয়ন। এমন নির্জনে, একাকী ব্যাধ ও হরিণ। পঞ্চায়েতের লোকটা ভালুকের মত তার গায়ে গা ঘষড়াচ্ছে। কিছু বলছে। নয়ন শুনছে না। মেয়েটার পা সিঁড়িতে ধীর হয়ে এল। শেষ দুটো সিঁড়িতে দুটো পা রেখে মেয়েটা জ্যোৎস্নায় চেয়ে আছে তার দিকে। তারই দিকে। এসব সময়ে কোন ভাষা ব্যবহারের দরকার হয় না, শরীরই তো কথা, শরীর-গন্ধে শরীর চলে আসে কাছে। বৃথা তখন ভাষার ব্যবহার। নয়ন জ্বলে। হাত মুঠো পাকায়।

পঞ্চায়েতের লোকটা বলে—বুঝলেন?

মাঠ ঘুরে তারা নাবালে নেমেছে। মেঠো পথে একটা মাটির ঢেলায় হোঁচট খেয়ে সামলে নয়ন জিজ্ঞেস করে—কি?

—লোকটা সিদ্ধ পুরুষ।

—কে?

—মোনা ঠাকুর।

—ও।

—তবে ওঁর ঠাকুর্দার আরও ক্ষমতা ছিল। শুনেছি তাঁর চোখের দিকে তাকান যেত না।

—ও।

—জগদীশের সঙ্গে আপনার আগে চেনাশুনা ছিল না?

—না।

—লোকটা বড্ড গোঁয়ার।

নয়ন চুপ করে থাকে। হুঁ-হাঁ কিছুই করে না। তবু লোকটা বলে—কি হয়েছিল জানেন? জগদীশ এসেছিল এক সার্কাসওলার সঙ্গে। খেলা-টেলা দেখাত না বড় একটা, বাঘ-সিংহীকে খাবার দিত। একদিন খাবার দিতে গিয়ে সিংহ ক্ষেপে

boiRboi.net

থাবা মারে। পাঁজর ভেঙে হাসপাতালে পড়ে রইল আট ন মাস। সেই সময়ে তার খুব দেখাশোনা করেছিল হারাধন বারিক। জগদীশকে সেই-ই তার মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। বেশ কয়েক বিঘে জমি, নগদ টাকা এসব পেয়ে বিয়ে করে এই গাঁয়েই জমে গেল জগদীশ। বিয়ের সাত মাস বাদে তার ছেলে হল, বুঝলেন? বলে লোকটা খিক খিক করে একটু হাসে।

অন্যমনস্ক নয়ন বলে—বুঝেছি।

—কি বুঝলেন?

—বিয়ের পর জগদীশের ছেলে হল তো। সকলেরই হয়।

—দূর মশাই! ছেলে ঠিক সময়ে হলে তো দশ মাস লাগার কথা। এ তো হল সাত মাসে। কিছু বুঝলেন না! আরও দেখুন, জগদীশের চালচুলো নেই, ভিনদেশী, কেউ চেনেও না তাকে, তবু হারাধনদা তার সঙ্গেই বিয়ে দিল কেন! দুহাজার নগদ, দশবিঘে জমিও তো সোজা কথা নয়! গাঁয়েও সুপাত্রের অভাব ছিল না। সব যোগাযোগ করে দেখলেই ব্যাপারটা বুঝে যাবেন।

জ্যোৎস্না! জ্যোৎস্না! অপার্থিব ছবি মলিন পৃথিবীর গায়ে। এই সময়ে কোন আবর্জনা চোখে পড়ে না নয়নের। সে মুগ্ধ এবং সম্মোহিতের মত হাঁটতে হাঁটতে বলে—ও।

—হারাধনদার মেয়েটা ছেলের জন্ম দিয়ে মরে গেল। বেঁচেই গেল বলা যায়। সত্যিকারের বেঁচে থাকলে পাড়াগাঁ দেশে বিস্তর কথা শুনতে হত তাকে।

—হুঁ।

লোকটা খিক্ খিক্ করে একটু হেসে বলে—কিন্তু জগদীশের বিশ্বাস ঐ ছেলে তারই। বুকের পাঁজর করে রেখেছে। ছেলের কোষ্ঠী করতে এসেছিল মোনা ঠাকুরের কাছে। ঠাকুরমশাই কোষ্ঠী করলেন বটে, কিন্তু ছেলের বাপের নাম কোষ্ঠীতে লিখলেন না। জগদীশের সঙ্গে ঠাকুরমশাইয়ের ঝগড়া তখন থেকেই। জগদীশ বলে, আমিই ওর বাপ। মোনা ঠাকুর মাথা নেড়ে বলে, এর ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম। বুঝলেন মশাই, আমাদের মুখ থেকে এসব কথা বেরোলে তা আন-কথা কান-কথা, লোকে দোষ ধরে, বলে কুচ্ছো গাইছি। কিন্তু ঠাকুরমশাইয়ের কথা তো আর ফেলবার নয়! ও তো বাকসিদ্ধের কথা। মোনা ঠাকুরের মুখ থেকে কথাটা বেরোতেই লোকের স্থির বিশ্বাস হয়ে গেল! গাঁয়ে রটে গেল সব ব্যাপার-স্যাপার, যারা বিশ্বাস করত না তারাও বিশ্বাস করতে লাগল। জগদীশ সেই থেকে নিজে নিজে একঘরে। পাছে ছেলের কানে কথাটা যায় সেই ভয়ে সে কারও সঙ্গে মেশে না, কারও বাড়ি যায় না, শ্বশুরবাড়ির ছায়াও মাড়ায় না। চাষ-বাস করে, বনে-বাদাড়ে সাপ ধরে বেড়ায়। বলে—আমিই গাঁয়ের লোকদের একঘরে করে দিয়েছি। বুঝুন আস্পর্দ্দা!

গাছের ছায়ায় জ্যোৎস্নার আঁকিবুকি। কোন গেরস্তর উঠোন তারা পেরিয়ে যাচ্ছিল। একটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে উঠল। এ দেশের কুকুরগুলো পর্যন্ত কাজের নয়—ভাবল নয়ন। মানুষগুলোর মতই অপদার্থ। উল্টাবাগে দুটো লোক হেঁটে আসছে, একজন বলে—কে, দিগিন নাকি?

—হয়।

—কাল তো সাক্ষী দিতে সদরে যাচ্ছ!

—যাব।

—আমার ফর্মটা এনো। সঙ্গে কে?

—আনব। ইনি জগদীশের বাড়ি এসেছেন।

লোকটা দাঁড়িয়ে যায়—কোন্ জগদীশ? সাপওলা?

—হুঁ।

—তার আবার কে এল? তিন কুলে তো তার…

লোকটার কথার উত্তর না দিয়ে তারা হেঁটে যায়। একটা ভেজা উদ্ভিদের গন্ধ উঠে আসছে আশপাশ থেকে। হাওয়া ঝলক দেয় মাঝে মাঝে। এদিকটায় বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। খেজুর গাছের গলায় কলসী। পায়ের পাতা ঘাসে পড়লে টপ্ টপ্ জল ঝরছে ঘাসের গা বেয়ে। শুকনো পাতা খসছে গাছের। শীতে নাকে জল সরছে। নয়ন দুটো হাত বুকে চেপে ধরে।

—আপনার কথাগুলি কিন্তু বেশ পষ্ট পষ্ট।

নয়ন উত্তর দেয় না।

লোকটা সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করে—মশাই কি পলিটিক্স-টলিটিক্স করেন না কি?

—কেন?

—জিজ্ঞেস করছি। কার্ল মার্কসের কথা বললেন কিনা!

—ও এমনিই।

—লাল-ঝাণ্ডার লোক এদিকেও আছে অনেক। তবে গাঁ-দেশের মানুষ তো সব, ঠিক ঠিক কিছু বোঝে না। আবছা আবছা ধরে নেয় ঠিক বিশ্বাসও করে না।

—কেন?

—সবাই তো গাঁয়ের লোকের ভালই করতে চায় মশাই, কিন্তু একদলের ভালর সঙ্গে আর একদলের ভাল যে বনে না। চাষী-বাসী গেঁয়ো লোকের মাথাও তো তেমন শার্প নয়, সব দলের ভাল ভাল কথা তো সেই সব ভোঁতা মাথায় সেঁদোচ্ছে। শেষে মাথার ভিতরে সব ভাল কথা খটাখটি লাগিয়ে তালগোল পাকায়। তখন আবার কথাগুলো ঝেড়ে ফেলতে তারা মায়ের থানে একটা ঢিপ্ করে নিয়ে যে যার কাজে লেগে যায়।

বলে লোকটা খিক্ খিক্ করে হাসে।

নয়ন উত্তর দেয় না।

লোকটা গতি ধীর করে বলে—আমি বাঁ ধারে যাব।

—আচ্ছা।

লোকটা গাছের ছায়ায় একটা শুঁড়ি-পথে ঢুকে যায়।

সুকুল জেগেই ছিল। আবজানো দরজা ঠেলে সে ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই সুকুল মশারি তুলে বাইরে আসে। উত্তেজিত গলায় বলে—তুমি শেয়াল ডাক

boiRboi.net

ডাকছিলে?

—না তো!

—তবে যে শেয়ালের ডাক শুনলাম এইমাত্র!

—সে সত্যিকারের শেয়াল সুকুল।

সুকুল বলে—একবার ডাক না।

চিন্তান্বিত মুখে নয়ন বলে—এখন শুয়ে পড়। কাল সকালে তোমাকে অনেক ডাক শেখাব।

ভিতরের বারান্দায় রান্না করছিল জগদীশ। সাড়া পেয়ে ভিতরে এল। দুর্দান্ত স্বাস্থ্য আর চাষাড়ে চেহারার জগদীশ। কিন্তু তার মুখে নির্বুদ্ধিতা নেই। একটু হয়তো ভালমানুষী আছে, কিন্তু উজ্জ্বল চোখজোড়ার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখে বোঝা যায় যে চোখ দুখানা অনেক কিছু লক্ষ্য করে।

জগদীশ সতর্ক চোখে তাকে লক্ষ্য করে হঠাৎ চাপা গলায় বলল—অনেক দেরি হল আপনার।

নয়ন জামাটা খুলে কাঠের চেয়ারের পিঠে রেখে বলে—মোনা ঠাকুরের একটা ইণ্টারভিউ নিলাম।

—কী মনে হয়?

—কিছু না ফাঁকা আওয়াজ। একটা আলু টপকালেই····

জগদীশ মাথা নাড়ল, বলল—মোনা ঠাকুর শক্তিমান লোক।

—কিসের শক্তি?

জগদীশ একটুক্ষণ ভেবে বলে—কারও প্রতি খুব ভালবাসা থাকলে মানুষ একরকমের শক্তি পায়। এই যেমন সুকুলকে ভালবাসি বলে আমি অনেক কিছু উপেক্ষা করতে পারি, অনেক সইতে পারি। ঠিক সেই রকম। মোনা ঠাকুরের ভালবাসা তার গুরুর ওপর। ঐখানে মোনা ঠাকুরের ফাঁকি বড় একটা নেই। শক্তিও সেখানে। আপনি বিশ্বাস করেন না?

নয়ন অন্যমনস্ক ছিল, তার চোখের সামনে শ্যামার মুখ। সে বলল—করি।

—যদিও মোনা ঠাকুরের সঙ্গে আমার সদ্ভাব নেই।

—কেন?

জগদীশ একটু ম্লান হাসে, তারপর বলে—কিছু শোনেন নি? গাঁয়ের সবাই তো জানে, আর বলাবলিও করে।

নয়নের খুব খারাপ লাগল হঠাৎ। সুকুল মশারির বাইরে বসে চৌকি থেকে পা দোলাচ্ছে। মুখখানায় শৈশবের সুন্দর হাবলা ভাব। একটু হাঁ-মুখ, চোখে অপার কৌতূহল। মাথার চুল অনেককাল কাটা হয় নি বলে চুলের চালচিত্তির মুখখানাকে ঘিরে ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। অবাক চোখে নয়নকে দেখছে সুকুল। ভাবছে, এ লোকটা কী করে অমন পাখীর ডাক ডাকে! ইস, ঠিক তো পাখীর মতই!

রাতকানা একটা গুবরে পোকা ভোঁ চক্কর দিচ্ছে। দেয়ালে দেয়ালে ঠোক্কর খাচ্ছে। সুকুল মুখ তুলে পোকাটা দেখে বলে—বাবা, দ্যাখো এরোপ্লেনপোকা।

boiboi.net

নয়ন সুকুলের সুন্দর মুখখানা থেকে চোখ সরিয়ে নেয়।

জগদীশ বলল—যে যাই বলুক, সুকুল আমারই।

সুকুল তার বাবার দিকে চাইল। বড় বড় দুখানা চোখে একটা স্বাভাবিক কাজলটানা ভাব আছে। বিষণ্ণ চোখ। জগদীশের দিকে ওর তাকানোর ভঙ্গী এমন আকুল যে নয়নের আবার একটা শ্বাসকষ্টের মত হয়। সে মুখটা ফিরিয়ে জগদীশকে বলে—ওসব আমি পাত্তা দিই না।

গুবরে পোকাটা চক্কর তো দিচ্ছেই। দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে নেমে আসছে। সুকুলের মাথা ছুঁয়ে গেল বুঝি। জগদীশ তড়িৎ পায়ে গিয়ে একটা ঝাপটা মারল। কোন কোণে কোথায় ছিটকে পড়ল পোকাটা।

নয়ন বলল—ও পোকা কামড়ায় না।

—জানি। তবু সতর্ক থাকা ভাল।

সতর্কতার কথা শুনে নয়ন একটু হাসে। বলল—আপনি যদি অত সাবধানী, তো ছেলেকে নিয়ে সাপ ধরতে যান কেন?

জগদীশ গিয়ে সুকুলের পাশে বসে। বসতেই ওর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল সুকুল। শুয়ে নয়নের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। জগদীশ বলে - ভয়ঙ্করদের নির্বিষ করার শিক্ষা থাকা ভাল। একদিন তো সুকুলকে নিজে নিজেই চলতে হবে। ওকে তাই তৈরী করে দিচ্ছি।

সুকুল হাই তোলে। জগদীশ আলতো হাতে ওকে চাপড়ায়। মায়ের মত।

নয়নের দিকে চেয়ে বলে—বারান্দায় বালতিতে জল তোলা আছে হাত-মুখ ধুয়ে নিন।

নয়ন বাধ্য ছেলের মত ওঠে।

দরজার পাশেই দড়ির দোলনায় দুটো বেঁটে সাপের ঝাঁপি ঝুলছে। তার পাশে একটা স্ট্যাণ্ডের ওপর কাচের বাক্স। নয়ন দাঁড়ায়। কাচের বাক্সটার মধ্যে দুটো কেউটে। মাথায় রুইতনের চিহ্ন। শরীর পাক খেয়ে আছে। নিঃসাড়, ঘুমন্ত যেন। ঝুড়ি দুটোর গায়ে একবার হাত রাখল নয়ন। নিস্তব্ধ। একটু হাসল। মুখ ফিরিয়ে দেখল, জগদীশ মন্ত্রমুগ্ধের মত তার কোলে আধ-ঘুমন্ত সুকুলের মুখের দিকে চেয়ে আছে। মৃদুস্বরে গল্প বলছে। বাইরের কুকুর কাঁদছে চাঁদের দিকে চেয়ে।

হাত-মুখ ধুয়ে নয়ন এসে দেখে সুকুল ঘুমিয়ে পড়েছে। তার চার-ধারে যত্নে মশারি গুঁজে দিয়ে জগদীশ একটা বিড়ি ধরিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে বসে অছে কাঠের চেয়ারটায়। দুটো চোখ শূন্য। হ্যারিকেনের মৃদু আলোয় তার আধখানা মুখ আলোকিত, বাকি আধখানা আবছায়। মুখের রেখাগুলো পাথরের মূর্তির মত স্থির। নয়নের হঠাৎ মনে হয় দুঃখচাপা জগদীশকে যে-রকম ভালমানুষ আর নির্বিষ মনে হয় ততটা সে নয়। খোঁচা খেলে ওর ভিতর থেকে প্রবল হিংস্রতা আর সিংহনাদ বেরিয়ে আসতে পারে।

কাচের বাক্সটার সামনে দাঁড়ায় নয়ন। মৃদু আবছা আলোয় তাদের দেখা যায়। সাপ আর সাপিনী। আবছা সরীসৃপ শরীর দুটো বালুর ওপর অনেক রেখা

এঁকেছে। তীব্র আগ্রহে নয়ন দেখে। তার শ্বাস গভীর ও দ্রুত হয়। হাত দুটো নিশপিশ করে। কেমন ফুল তোলার মত অনায়াসে জগদীশ বন-জঙ্গল থেকে তাদের গোপন শরীর তুলে আনে।

হ্যারিকেনটা তুলে আনে নয়ন। কাঁচের বাক্সটার ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখে। কী চমৎকার সতেজ কালচে শরীর! যখন ছোবল তোলে তখন কী মারাত্মক আকর্ষণকারী সেই আক্রমণের ভঙ্গী। বিষ! বিষ! আর চিন্তাশূন্য আক্রমণ।

বাক্সটার গায়ে ছোট্ট দুটো টোকা দেয় নয়ন। তারপর দুটো জোরে টোকা দেয়।

জগদীশ পিছন থেকে বলে—কী করছেন! ও দুটোর আবার বিষদাঁত উঠেছে, কামাতে হবে। চলে আসুন।

—আমি দেখব।

—কী?

—ওদের··· কথাটা শেষ না করে হাসে নয়ন। বিলোল হাসি

—কী বলছেন? জগদীশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

একটা হতাশার শ্বাস ফেলে নয়ন বলে—কিছু না। চলুন খেয়ে নিই।

জগদীশ বলে—চলুন।

বলে ওঠে।

রাত খুব বেশী হয় নি। কিন্তু পাড়াগাঁ বলে অনেক রাত মনে হয়।

খেতে বসে জগদীশ হঠাৎ বলে—মানুষ কোন কোন ব্যাপারে নিয়ম মানে না। কিন্তু জীবজন্তুরও একটা নিয়ম আছে।

—কী রকম?

জগদীশ একটু হেসে বলে—আপনি ঐ সাপ দুটোর কী অবস্থা দেখতে চেয়েছিলেন?

নয়নের মুখটা লাল হয়ে যায়, সে তরল ভাবে হাসতে থাকে। বলে—ভালবাসা।

জগদীশ মাথা নেড়ে বলে—বুঝেছি। তাই বলছিলাম যে মানুষ সময় মানে না, দিনক্ষণ মানে না। এ এক আশ্চর্য। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাত সবচেয়ে বেশী প্রকৃতির নিয়ম ভাঙে। সাপ কুকুর বেড়ালও মানুষের মত এত নির্লজ্জ নয়। তারা নিয়ম মেনে চলে। একজোড়া সাপ আর সাপিনী এক জায়গায় আছে বলেই যে তারা যা-খুশী করবে এমনটা দেখা যায় না। ঠিক সময়টি এলে, ক্ষিদে জাগবে, আর তখনই মাত্র আপনি যা দেখতে চাইছেন দেখতে পাবেন। নইলে শতবার ঐ বাক্সটা নাড়ালেও লাভ হবে না।

বলে জগদীশ হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলে—মানুষের মত বেলাজা কেউ নয়। ক্ষিদে না পেলেও খাবে। খাওয়া, ভোগ এসবই তার সর্বস্ব।

খেয়ে উঠে জগদীশ সুকুলের বিছানায় শুতে গেল। পাশের ঘরে নয়নের বিছানা। সুন্দর পরিপাটি মশারি টাঙানো, জলের গেলাসটি ঢাকা দেওয়া, কোথাও খুঁত নেই। ঠিক যেন মেয়েলী হাতের কাজ। কার যে কোথায় ভাত মাপা থাকে। নইলে নয়ন তো আজ বিকেল অবধি লোকটাকে চিনতই না এখনও যে চেনে

তা নয়। শুধু জানে লোকটা সাপ ধরে, ছেলেকে (সে নিজের হোক আর অন্যেরই হোক) বড্ড ভালবাসে। আর জানে, লোকটা গৃহকর্মে নিপুণ।

ছাঁচবেড়ার ঘর। ফুটো ফাটা আছে। হেমন্তের গড়ানে রাত। টেনে বাতাস দিয়েছে একটা। শুকনো পাতার শব্দ পাওয়া যায়। দুদ্দাড় শেয়াল বা কুকুর দৌড়ে গেল উঠোন ভেঙে। বাতাসের শিস্ শোনা যায় বেড়ার ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে। এতে কোন অসুবিধে হয় না তার। গত একবছর তার জীবন এরকমই কেটেছে। সেবার বুড়ি ঝি সুখীয়ার চোখে ছানি পড়লে সে দেশে গেল। বাড়িতে লোক ছিল না। তখন সুন্দরবনের দিকে বান ডেকেছিল বলে কলকাতার ফুটপাত ভরে উঠেছিল জোয়ানমন্দ মেয়ে-পুরুষে। কালো কালো চেহারার হাবা মানুষ সব. দিনমানে ভিক্ষে করে, রাতে চুরি। ফুটপাথে ছেঁড়া কাঁথার সংসার বিছিয়ে ছানা-পানা জাবড়া-জাবড়ি করে বসে। ঝাঁকড়া চুলের উকুন মারে, গালাগাল দিয়ে পরস্পর ঝগড়া করে। গা-ছাড়া ভাব। বান হয়েছে তো করব কী. এই রকম গা-সওয়া নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে দিনের পর দিন বসে থাকে কলকাতার রাস্তায়। গাছতলায় বেলাশেষে কুড়োন কাঠ কাগজ ঠেসে ইঁটের উনুন জেলে মেটে-হাঁড়িতে নাড়ি-ভুঁড়ি, তরকারীর খোসা, গরম ভুষি, খুনসেদ্ধ চাপায়। তারই মধ্যে আবার পাথরের টুকরো ফুটপাথে ঘষে মশলা বাটে। সেই সব আধা-মানুষের সমাজ থেকে একটা নোনা মেয়েমানুষ তুলে আনল বড় জামাইবাবু। শাশুড়ি ঠাকরুণের কষ্ট বুঝে ঝি ঠিক করে দিয়ে গেল। নোনা মেয়েছেলেটার গা-গতর যে ভাল তা দিন সাতেক খাওয়া-দাওয়া করার পরই বোঝা গেল। কোল-পোঁছা একটা ছেলে, স্বামী হাজত খাটছে কার বাজারের থলে টেনে দৌড়েছিল বলে। ঝাড়া হাত পা সেই মেয়েটিকে নয়ন লক্ষ্য করেছে কখনও-সখনও। লক্ষ্য একবার করলে নয়নের দেরী সয় না। সন্ধ্যের ঘোরেই বাড়ি নিঝুম। বাবা উকিল মানুষ, বাইরের ঘরে মক্কেল ঠাসা, দম ফেলার সময় নেই। মা হাই ব্লাডপ্রেসার নিয়ে সন্ধ্যের পরই মশারির নীচে চলে যায়, হাতপাখা নাড়ে। ঠাকুর রান্নাঘরে। মেয়েছেলেটা সিঁড়ির নীচে ছেলে ঘুম পাড়াতে গেছে। সেই সময়ে নয়ন গিয়ে তাকে ঠেসে ধরে। চালটায় ভুল ছিল। চেঁচানিতে মক্কেল সুদ্ধ বাবা চলে এসেছিল। বেড়ালের মত ছুটেছিল নয়ন। কিন্তু মক্কেলদের মধ্যে একজন ছিল দৌড়ের চ্যাম্পিয়ন। সদরে তাকে জাপটে ধরে ফেলল। পরে অবশ্য উকিলবাবুর ছেলে শুনে সে খুবই ম্রিয়মান হয়ে পড়ে, কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে। সেই রাতেই বাবা তাকে বের করে দেয়। সেই মেয়েমানুষটাকেও। সেই থেকে বাইরে বাইরেই কাটে নয়নের। কোন কিছুর ঠিক থাকে না। খাওয়া, শোওয়া এইসব অবশ্য ভাববার ফুরসৎই পায় না সে। তারটা দশজনই ভেবে আসছে একবছর ধরে। নয়ন কেবল শ্যামার কথা ভাবে, বা আর কিছু। বাড়ির সদর বন্ধ হলেও মায়ের জন্য খিড়কীটা এখনও বন্ধ হয়নি। কলকাতায় ফিরলে সে বাড়িতেই থাকে। একটু বেশী রাত করে ঢুকতে হয়, এই যা। বাবা টের পায় হয়ত, দেখি না দেখি না করে এড়িয়ে যায়।

কাজেই এই সুন্দর পরিপাটি বিছানাটিতে তার ঘুম না হওয়ার কারণ নেই। বলতে কী, জগদীশের আশ্রয় না জুটলে হয়ত বা মোনা ঠাকুরের মন্দিরের বারান্দায়

পড়ে থাকতে হত। এই শীতে, খোলা হাওয়ায়, গেঞ্জির ওপর একটামাত্র শার্ট সম্বল করে।

ঘুম তবু আসছে না। মাথাটা বড্ড গরম। শরীরও। মোন্য ঠাকুরের মন্দিরের কথা ভাবতে গিয়েই হঠাৎ সে জেগেই এক মায়া দেখল। কুয়াশায় মাখা সেই অলৌকিক জ্যোৎস্না, মন্দিরের প্রাচীন সাদা সিঁড়ির শেষ দুটো ধাপে বঙ্কিম সুন্দর ভঙ্গীতে শরীর ভেঙে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। জ্যোৎস্নাতেও দেখা যায়, তার চোখ চেয়ে আছে নয়নের দিকে। বিভ্রম? না। মাথা নাড়ে নয়ন। একথা ঠিক, সে মেয়েদের এখনও চেনে না। চিনবার বয়সও নয়। সে মাত্র চব্বিশ পেরোল। মেয়েদের বুঝতে বয়সও চাই। সে তো এখনও জানে না কেন শ্যামা খেলা করে তাকে নিয়ে, কেন বা সেই সুন্দরবনের নোনা মেয়েমানুষটিকে চেঁচিয়ে বলেছিল—হারামীর বাচ্চা! মেয়েদের না চিনেও নয়নের মনে হয়, ঐ মেয়েটি মন্দিরের শেষ দুটো সিঁড়ির ধাপে পা রেখে ঘাটের পৈঠায় স্নানের আগে মেয়েরা যেমন দাঁড়িয়ে জলে নিজের ছায়া দেখে, তেমনি ছায়া দেখতে চেয়েছিল নয়নের চোখে।

ঘুম হবে না। নয়ন মশারির মধ্যেই চিৎপাত হয়ে শুয়ে থেকে একটা সিগারেট ধরায়। ধোঁয়ায় মশারির ভিতরটা ভরে ওঠে। হ্যারিকেনের গন্ধ পায় সে। উঠে বাইরে আসে। পায়চারী করে। শরীর। শরীরই সব। জগদীশ কী একটা তত্ত্বকথা বলছিল! ক্ষিদে, ভোগ এ হচ্ছে মানুষের সর্বস্ব। জীবজন্তুরা মানুষের মত নির্লজ্জ নয়।

নয়ন একটু থমকে দাঁড়ায়। অথচ মানুষ ছাড়া আর কেউ পোশাক পরে না। পোশাক পরে কেন? মানুষ কি জানে না যে পোশাকের ভিতরে তার শরীরটা ন্যাংটো! সব মানুষই জানে মেয়েমানুষের শরীরে কি আছে, কিংবা কেমন করে সেই শরীর ব্যবহার করা যায়। তবে কেন মানুষ পোশাক পরে।

নয়ন একটু হাসে আপনমনে। ক্ষমতা হাতে পেলে সে নিয়ম করবে, পোশাক পরা চলবে না। বেহায়া, নির্লজ্জ, সবই তো জানো তোমরা, তবে কেন ঐ পোশাক? ছেড়ে ফেল, ছেড়ে ফেল, উদোম হও, লজ্জার কি আছে? পরস্পরের ন্যাংটো শরীর দেখ, লজ্জা জুড়িয়ে যাবে হে!

সাপদুটো এখন কী করছে? এই মায়াবী জ্যোৎস্নার শীত রাত্রিটি, এই তো সময়। এখনও কি নিস্পৃহ দড়ির মত শুয়ে আছে? যখন একটি মেয়ে শরীরের অভাবে নয়নের চোখে ঘুম নেই।

দরজাটা ঠেলতেই খুলে যায়। হ্যারিকেনের পলতে নামানো। মৃদু দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ আসে জগদীশের বিছানা থেকে। নিঃসাড়ে ঘুমোলে সুস্থ মানুষের শ্বাস ওরকম দ্রুত হয়। তা ছাড়া গাঁয়ের মানুষ, ঘুমটা গাঢ় হওয়ারই কথা।

নয়ন নিঃশব্দে হ্যারিকেনের কল ঘুরিয়ে আলোটা উস্কে দিল। আলো হাতে কাচের বাক্সটায় ঝুঁকে দেখল, যেমন দেখেছিল খানিক আগে তেমনি দুটো পড়ে আছে। ন্যাংটো কালো শরীর। শীতল। নিস্পৃহ। খুব মৃদু দুটো টোকা

boiboi.net

দিল নয়ন। তারা নড়ল না।

এভাবে ওদের উত্তেজিত করা যাবে না। শব্দ করলে জগদীশ জেগে যাবে। নয়ন বাক্সটা ভাল করে দেখে। সাধারণ বাক্স। একটা কবজায় পঁাচকে তালা ঝুলছে। পকেট থেকে ভাঁজ করা ছুরিটা বের করে নয়ন। ফলাটা তালার ভিতর ঢুকিয়ে একটু চাপ দিতেই আলগা হয়ে গেল। গা-টা একটু শির শির করে তার। সাপদুটো নড়লও না।

নিঃশব্দে ডালাটা তুলে ফেলল সে। বাক্সের ভিতর থেকে একটা ভ্যাপসা পচা গন্ধ নাকে আসে। সম্ভবত ইঁদুর বা ব্যাঙ খেতে দেওয়া হয়েছিল ওদের, তারই কোন টুকরো-টাকরা পড়ে পচছে। একটু দূর থেকে সাবধানে উঁকি দেয় নয়ন। ভয়ের কিছু নেই। যদি মাথা তোলে ছপ করে ডালাটা ফেলে দিলেই হবে। আপাততঃ ওদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা জাগিয়ে দেওয়া দরকার। নয়ন কখনও সাপদের মিলন দেখে নি। না-ঘুমোন সময়টাও কেটে যাবে অন্যমনস্কতায়।

বিছানা ঝাড়ার ঝাঁটাটা ঘরের কোণে। একটা শলা খুলে নয়ন সাবধানে বাক্সের ভিতরে একটা খোঁচা দেয়। গায়ে লাগে না। বালিতে গেঁথে যায়। অনভ্যাসের হাত। আবার খোঁচা দেয়। এবার কোণের বিড়ে-পাকানো সাপটার গায়ে লাগে ঠিকই। কিন্তু সে নড়ে না। কোন্‌টা মাদী, কোন্‌টা মদ্দা তা অবশ্য সে চেনে না। তবু ওটাকে তার মদ্দা বলেই মনে হয়। মেয়েমানুষের রাগ বেশী।

দুটো তিনটে খোঁচা বৃথা গেল। সাপটা কেবল মাথাটা একটু সরিয়ে নিল, শরীর নাড়ল! নয়ন ডালাটা প্রায় বন্ধ করে ধরে রইল। সাপটা আবার ঝিমিয়ে পড়তেই ডালাটা আবার সাবধানে তুলে ফেলল সে। আবার কাঠিটা স্পর্শ করল শরীরে....

কালো-বিদ্যুৎ কখনও দেখে নি নয়ন। দেখল। বিশ্বাস হয় না, এত দ্রুত ঘুম থেকে খাড়া দাঁড়িয়ে যেতে পারে কেউ। একটা প্রবল শ্বাসের শব্দ হল কেবল। একপলকের মুগ্ধতায় আর একটু হলেই হাতটা সরিয়ে নিতে ভুলে গিয়েছিল সে।

ডালাটা খাড়া তোলা ছিল, কোন্‌দিকে পড়বে সেটা সিদ্ধান্ত নিতে একটুক্ষণ খাড়া দাঁড়িয়ে থেকে ডালাটা আর একটু হলে বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু তার আগেই একটা মসৃণ ছোবল খেয়ে সাপটা বাক্সের কার্নিশ বেয়ে ঝুলে পড়েছে। কিছু করার নেই।

কালো একটা স্রোতের মত নেমে আসছে। নেমেই আসছে সরীসৃপ চিকণ শরীরখানা। ডালাটা পড়েছে কিন্তু হাল্কা ডালাখানা তাকে চেপে রাখতে পারছে না। স্বচ্ছন্দ শরীরটা বেয়ে আসছে সুন্দর মুক্তির দিকে, প্রতিশোধের দিকে।

নয়ন হ্যারিকেনটা ফেলে এক লাফে পিছিয়ে আসে। পাগলের মত চেঁচায়—জগদীগবাবু...জগদীশবাবু...

চোখের পলকে মশারি প্রায় ছিঁড়ে জগদীশ বেরিয়ে আসে। হ্যারিকেনটা কাৎ হয়ে দপ্ দপ্ করছে, তেল পড়ছে গড়িয়ে। এক্ষুনি অন্ধকার হয়ে যাবে সব। কালো অন্ধকারে সাপের কালো শরীরটা জগদীশও খুঁজে পাবে না।

—কী? কী? বলে জগদীশ গর্জন করে। ঘুম-লাগা চোখে মাথায় কিছু

বুঝতে পারে না।

নয়ন কেবল 'সাপ' কথাটা উচ্চারণ করতে পারল।

জগদীশ এক ঝটকায় আগে হ্যারিকেনটা সোজা করল। সেটা নিভল না। কিন্তু আলো ঘুলিয়ে ধোঁয়াটে হয়ে গেছে। সাপটাকে দেখতে পেল নয়ন। দরজার দিক থেকে ঘুরে মুখটা তুলেছে। চোখে জ্বালা, মুখে শ্বাস।

জগদীশ মুহূর্তের মধ্যে সাপুড়ে হয়ে গেল। কুঁজো হয়ে দুটি সতর্ক জাগ্রত হাত উদ্যত করে এগিয়ে যাচ্ছে এক পা এক পা করে। মুখোমুখি। নয়ন মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখে।

মানুষের ছোবল কত সুন্দর হয় তা দেখল নয়ন। এত সুন্দর কিছু সে কখনও দেখে নি। জগদীশ ঢেউ হয়ে গেল যেন। চকিতে শরীর ঝুঁকল। হাত প্রসারিত হল। এত দ্রুত যে বিশ্বাস হয় না। বাঁ হাতে সাপটাকে ফুলের মত যেন গাছ থেকে তুলে নিল সে। এত অনায়াসে, যেন যে-কেউ করতে পারে।

ডালাটা খুলে, জগদীশ সাপটাকে ভিতরে ছেড়ে দেয়। সেটা আবার শরীরটাকে পাকে পাকে জড়ায়। মাথা কোলে নিয়ে ঝিমিয়ে পড়ে।

জগদীশ নয়নের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে রুক্ষ স্বরে বলে—এটা কী হল ?

নয়ন সামান্য একটু হাসবার চেষ্টা করে বলে—ঘুম আসছিল না।

—কী দেখতে চেয়েছিলেন ?

—ঐ, সেটা।

দাঁতে দাঁত ঘষল জগদীশ। অস্বাভাবিক ধীর গলায় বলল—এই ঘরে সুকুল আছে, আপনি জানেন না ? যদি সুকুলের কিছু হত।

—ওটা বেরিয়ে আসবে বুঝতে পারি নি।

—কিন্তু যদি বিছানায় যেত সাপটা ? ওখানে আমার সুকুল আছে।

নয়ন বুঝতে পারে, তার অনুমানই ঠিক। বাইরে ঐ বিষণ্ণ ভালমানুষীর আড়ালে তীব্র হিংস্রতা রয়ে গেছে জগদীশের। রাগে চাপা গলা। সমস্ত শরীরে টান, রগ, শিরা-উপশিরা এই ম্লান আলোতেও দেখা যাচ্ছে।

—মজা, না ? বলেই জগদীশ আচমকা তার চাষাড়ে হাতে একটা থাপ্পড় কষায়। নয়ন ভাবতেও পারে নি। চড়টা বোমার মত ফাটল তার কান, গলা, কণ্ঠা জুড়ে। মাথার মধ্যে সাইরেনের শব্দ বেজে উঠল হঠাৎ।

পড়ে গিয়েও টাল সামলে নিল সে। হাত বাড়িয়ে কাঠের চেয়ারটা ধরে দম নিল।

—বেইমান। জগদীশ বলে।

মার কিছু কম খায় নি নয়ন। কিন্তু মার দেখলে সে পালায়ওনি কখনও। এ তার জল-ভাত। যেখানে মার সেখানে উল্টে মার দেওয়ার জন্যই সে জন্মেছে। চড়টা সামলেই দুটো হাত তার আপনা থেকেই মুঠো পাকিয়ে গেল।

কিন্তু একটা বিশাল গাছের মত জগদীশ দাঁড়িয়ে আছে। পা দুটো মাটিতে পোঁতা, দুখানা চাষাড়ে হাত তাকে বলের মত ছুঁড়ে লুফে নিতে পারে।

মুঠো শিথিল করে শরীরের ভর চেয়ারের হাতলে ছেড়ে নয়ন জগদীশকে একটু

BoiRboi.net

দেখল, বলল—অতিথি নারায়ণ।

বলে হাসল।

জগদীশ গম্ভীর ভাবে বলল—অতিথির ভেক ধরে চোর ডাকাত এলে সে তখন নারায়ণ থাকে না। গিয়ে শুয়ে পড়ুন, আমি দরজার বাঠাম দিয়ে দিচ্ছি। ফের কোন বাঁদরামী করলে ঘাড় ধরে বের করে দেব।

নয়ন একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। লোকটাকে তার দারুণ ভাল লাগছে এখন। দারুণ।

মসজিদ বাড়ির বাইরের ঘেরা-দেয়ালটায় নোনা ধরেছে। গেটটা পাল্লা হারিয়ে হাঁ করে আছে। ভিতরে একটা চমৎকার মাঠ। নির্জন। মসজিদের গায়ে একটা মোটা লতা উঠেছে, অশ্বত্থ গজিয়েছে। ভিতরের মাঠের একটেরে একটা কাঠচাঁপা গাছ। খুব ফুল এসেছে। তলায় বিছিয়ে আছে ফুল। এই ফুলটার তেমন আদর নেই। কেউ কুড়োয় না, ঘর সাজায় না। ফুলের দোকানে এই ফুল বিক্রি হতেও দেখেনি শ্যামা। কিন্তু হলদেটে সাদা রঙের এই ফুলটার চাপা গন্ধ শ্যামার বড় ভাল লাগে। সে একবার চারধারে দেখল। কেউ নেই রাস্তায়, দু চারজন সাধারণ চেহারার মানুষ ছাড়া। মসজিদের ভিতরেও লোকজন বড় একটা দেখা যায় না আজকাল। এই অঞ্চলটায় মুসলমানরা বড় একটা থাকে না এখন। আজান-ধ্বনি শোনা যায় না। আগে যেত, যখন সে খুব ছোট ছিল। তখন একটা পেয়ারাগাছ ছিল এখানে, আর ছিলেন হাজিসাহেব। বদনার জলে ওজু করতে করতে তাদের দুই ভাই বোনের গাছে চড়া দেখতেন। নমাজের সময়ে বাচ্চারা ছোটাছুটি করলে অসুবিধে হবে বলে ছোকরা মোল্লা কি বুড়ো মৌলভী তেড়ে এলে তিনি আটকাতেন। তাদের ডেকে বলতেন—শব্দ করো না। পেয়ারা পাড়। যটা খেতে পার ততটা। নষ্ট করো না।

হাজিসাহেব নেই। কেউই নেই। নিস্তব্ধতা আছে। দু একজন কেয়ারটেকার থাকে হয়ত বা। মানুষ যে কোথায় চলে যায়! বড় হয়ে অবধি বাড়ি থেকে দু পা দূরে মসজিদের মাঠে কখনও আর আসে নি শ্যামা, ভুলে গিয়েছিল।

আজ বহুকাল বাদে সে নির্জন মাঠটায় ঢুকে পড়ল। সকালের রোদ এখন ঈষদুষ্ণ। ভালই লাগে। বাতাস দিচ্ছে। 'কিরিচ' শব্দ করে চুল ঘেঁষে চড়াই উড়ে যায়। কী সুন্দর নিস্তব্ধতা! আর গাছগাছালির ছায়া!

কাঠচাঁপা ফুল কয়েকটা কুড়োল শ্যামা। স্কার্ফের আঁচলে তুলল। একটু ঘুরে দেখল চারদিকে। মসজিদের চাতাল ঝাঁট দেওয়া। মেঝে পরিষ্কার। বাতাসে ধূপগন্ধ। মেহেদীর ঝোপে পাখীর হুড়োহুড়ি।

হঠাৎ কোকিল ডাকে। চমকে ওঠে সে। কোকিল। না নয়ন?

স্খলিত আঁচল থেকে দু একটা ফুল পড়ে যায়।

সেই যে মোনা ঠাকুরের মন্দিরে যেতে আমবাগানে দেখা হয়েছিল, তারপর আর

তাকে দেখেনি সে। ফিরেছে কি নয়ন ? কে জানে !

নিমগাছ থেকে একটা সত্যিকারের কোকিল উড়ে গেল। তবে নয়ন নয়, কোকিলটাই ডেকেছিল। শ্যামা নিশ্চিন্তে একটু হাসে। একটা ফুল তুলে গন্ধ শুঁকল। মৃদু গন্ধই তার প্রিয়। বুক ভরে ওঠে না গন্ধে, কেবল স্মৃতির মত, গত রাত্রির স্বপ্নের রেশের মত অস্পষ্ট গন্ধ।

গত রাতেও দুঃস্বপ্ন দেখেছে সে। প্রায়ই দেখে। সকাল থেকে মনটা ভার হয়ে আছে। বাবার জন্য একটা ফুল-হাতা, উঁচু গলার সোয়েটার বুনতে শুরু করেছিল। পান্নাদির বাড়িতে গিয়েছিল প্যাটার্ন তুলতে। আসলে প্যাটার্ন তোলাটা ছল। ঘরে থাকতে তার ভাল লাগছিল না। হরিদ্বার যাওয়ার গোছগাছ শুরু হয়েছে, মা বাবা যাবেই। মোনা ঠাকুর বলেছে, ঐ দিকেই কোথাও দাদা আছে সন্ন্যাসী হয়ে। পূর্বস্মৃতি নেই বলে ফিরতে পারছে না। শ্যামার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু আশা হয়।

হরিদ্বার কি কোথাও যেতে শ্যামার ইচ্ছে করছিল না এখন। বাবার শরীর ভাল না। মাঝে মাঝে প্রেসার দুশো ছাড়িয়ে যায়। বিদেশ-বিভূঁয়ে তারা মা আর মেয়ে বাবাকে নিয়ে কোন্ আতান্তরে পড়ে কে জানে! কিন্তু মা বাবাকে ঠেকানো যাচ্ছে না, অনেক বুঝিয়েছে সে, বেশী বোঝাতে গেলে ঝগড়া হয়ে যায়।

বাবা হরিদ্বারে গিয়ে মারা গেছে—এ রকমই একটা দুঃস্বপ্ন সে দেখেছিল কাল। সকালটা তাই মনের অন্ধকার নিয়ে কাটছিল। পান্নাদির বাড়িতেও প্যাটার্ন তোলা হল না। আজ ছুটির দিন, ওরা পিকনিকে যাচ্ছে কল্যাণীতে। বলল—চল্ না, মাসীমাকে বলে তোকে নিয়ে নিই। শ্যামা রাজী হয় নি।

রাজী হয় নি অভিমানে। তার কোন আনন্দ করতে নেই। বাড়িতে অবিরল শোক লেগে আছে গত পাঁচ বছর ধরে। বিরাম নেই। দীর্ঘশ্বাসে বাসার বাতাস ভারী। মাত্র তিনটি প্রাণী তারা। পরিবারটা বড় হলে হয়ত একজনের শোক ভুলে থাকা যেত। মোটে তিনজন বলেই হারিয়ে যাওয়া চতুর্থ জনের কথা ভোলা যায় না। চার পায়া একটা আসবাবের একটা পা ভেঙে গেলে সেই পায়ার দিকেই যেমন ঝুঁকে থাকে আসবাব, তেমনি হারানো দাদার স্মৃতিতে ঝুঁকে আছে তারা। খেতে বসতে কাজ করতে দাদার কথা এসে পড়ে। মা কাঁদে, বাবা সান্ত্বনা দেয়, তারপর নিজে কাঁদে। শ্যামার চোখে তখন জল আসেই, তাই তাদের আনন্দ নেই। গত পাঁচ বছরে বাবা শ্যামার বিয়ের চেষ্টাই করেন নি। প্রসঙ্গ উঠলেই বলেন—ছেলেটা নেই, ঐ মেয়েটা মাত্র আমাদের সম্বল। অন্ধের নড়ি। ও গেলে থাকব কি করে ?

তবু গত পাঁচ বছরে দু তিনটে পাত্রপক্ষ দেখেছে শ্যামাকে, পছন্দও হয়েছে। বিয়ে হয় নি বাবা মার গরজের অভাবে। পাত্রদের মধ্যে একজনকে খুব পছন্দ ছিল শ্যামার। স্নিগ্ধ চেহারার দীর্ঘ ছেলেটি। মুখখানা গম্ভীর। বিলেত ফেরত ডাক্তার। প্র্যাকটিশ যখন সবে জমে উঠেছে সেই সময়ে লোকটাকে হঠাৎ অল্প বয়সেই ধর্মে পায়। ব্যাপারটা ঘটেছিল এই রকম। বিলেত থেকে ঘুরে আসার পর ছেলেটির একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হল। দিন-ক্ষণ সব ঠিক।

boiRboi.net

বিয়ের দিন গায়ে-হলুদের স্নান করতে গিয়ে মেয়েটির কেঁপে জ্বর আসে। ধুম জ্বরে উঠতে না উঠতেই গায়ে মায়ের দয়া বেরোয়! ঝেঁপে গুটি উঠেছিল। বিয়ে পিছিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বোকা মেয়েটা যখন বুঝতে পারল যে তার মুখখানার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে তখন তার প্রাণের চেয়ে শরীরের মায়া বেশী হল, প্রায়ই কাঁদতো—ও মা গো, এই মুখে তাঁর ঘর করতে যাব? রোগ সারার মুখে মেয়েটা টিক বিশ খেয়ে বাঙুর হাসপাতালে মারা যায়। ছেলেটি সেই থেকে পাগলের মত ঘুরে বেড়াত। কী যেন খুঁজত, কাকে যেন। তারপর দেওঘরের এক আশ্রমে থেকে যায়।

আশ্রমবাসী সেই বিলেত ফেরত ডাক্তারের মা বাবা হাল ছাড়েন নি। তাঁরা সেই আশ্রমে গিয়ে পড়ে রইলেন। ছেলে গুরুদেব বললেন—বিয়ে করবে না কেন? বিয়ে কর। বনের চেয়ে ঘরের সন্ন্যাসীই পাগল বেশী। বনের সন্ন্যাসী দিয়ে কী হয় রে? কাম দমন করতে চাস না কি। ওসব জোর করে করতে গেলে মাথার দফা শেষ হয়ে যাবে। পরমপিতাই কাম দিয়েছেন, সে তো এমনি নয়, তারও কিছু প্রয়োজন আছে বলেই দিয়েছেন। ওর দমন ওভাবে হয় না, জোর করতে গেলে উল্টো বিপত্তি। সুষ্ঠু ব্যবহার কর, স্ত্রীর প্রতি কামভাবেই কেবল ভাবিত হয়ো না, তাহলেই হবে। ভাল ঘর দেখে জাতে কাটে কর।

সেই ডাক্তার নিজেই এসেছিল দেখতে? হাফ-হাতা পাঞ্জাবি পরা, ধুতি, লম্বা, কৃশ কালো চেহারাটি। ভারী বীর। গম্ভীর। ঘরে ঢুকলে ঘরটা থম থম করে। বুকের মধ্যে গুরু গুরু ডাক ওঠে। বাবা কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি এই অল্প বয়সেই কেন সন্ন্যাসী বাবা?

সে উত্তর দিয়েছিল—সন্ন্যাসী কোথায়? আমি তো সংসারীই। কেবল সংসারের পরিধি বাড়ানোর চেষ্টা করছি।

—সেটা কেমন?

ছেলেটা একটু ভেবে বলল—আপনার ঘরের পাশে যদি আবর্জনা থাকে তবে মশা মাছি জীবাণুর উৎপাত বাড়ে। বাড়ে না? নিরাপদে থাকতে গেলে তাই আপনার ঘরের মতই ঐ বাইরের ময়লাও পরিষ্কার করা দরকার। তেমনি নিজের পরিবার সংসারের ভালর জন্যই চারপাশটাকে ভাল রাখা দরকার। এই ভাল রাখতে গেলেই সংসারের পরিধি বেড়ে যায়। কেবল নিজের ভালর জন্য করলেই ভাল থাকা যায় না।

বাবা উত্তরে বলেছিল—তো তার জন্য আশ্রম কেন? ঘরে থেকেও তো হয়।

—আশ্রম মানে যেখানে শ্রম করে কাজগুলো হাতে-কলমে শিখতে হয়। শেখা হলেই সংসারে ফিরে আসা। সেকালের ব্রহ্মচারীরা ভাল গৃহী হওয়ার জন্যই ব্রহ্মচর্য করে মনটাকে উদার, শান্ত ও আনন্দিত ও স্থির করে নিত। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বিস্তার, ব্রহ্মচারী মানে বিস্তারে বাস করা। চারপাশটাকে জেনে নেওয়া। এই জানা সংসারে তাকে সাহায্য করে। আমি সংসার বিমুখ নই।

ধীর স্থির কথা। বিনীত এবং অকপট স্বর।

বাবা তবু মনস্থির করতে পারছিল না। অস্বস্তি বোধ করছিল।

বলল—তুমি কেন গেলে ?

ছেলেটা বিষন্ন একটু হাসল। কী মায়াময় হাসিটি! অনেকক্ষণ উত্তর দিল না। তারপর আস্তে করে বলল—আর একবার আমার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। তা কি শুনেছেন ?

—শুনেছি।

ছেলেটা আবার মাথা নীচু করে চুপ হয়ে রইল। অনেকক্ষণ বাদে বলল—মেয়েটির যখন বসন্ত হয়েছিল তখন আমি মাঝে মাঝে তাকে দেখতে যেতাম। ডাক্তার হিসেবেই যেতাম। মেয়েটির সঙ্গে আমার কোন পূর্ব পরিচয় ছিল না, এই যেমন আজ এসেছি আপনার বাড়িতে সেরকমই উপলক্ষে মেয়ে দেখতে গিয়ে তাকে দেখা, সে খুবই সুন্দরী ছিল। বসন্ত হওয়ার পর তার সেই সৌন্দর্য যে কোথায় গেল! একটি সুন্দরী মেয়ের বসন্ত হলে ডাক্তারের খুব একটা প্রতিক্রিয়া হয় না। কিন্তু রুগী দেখা এক কথা, আর নিজের ভাবী স্ত্রীকে ঐ অবস্থায় দেখা আর এক কথা। আমার মন খারাপ হয়ে যেত। তবু মনকে আমি স্থিরই রেখেছিলাম। ঐ মেয়েকেই বিয়ে করব। আমি তাকে তাই প্রায়ই দেখতে যেতাম। সে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখত, কথাবার্তাও বলত না। চুপচাপ তার বিছানার পাশে বসে থেকে চলে আসতাম। একদিন গ্রীষ্মের বিকেলে দেখতে গেছি। পশ্চিমের জানালা খোলা ছিল। তাতে নিমডাল বাঁধা, ঘরে আবছা আলো পড়ছে। মেয়েটি শুয়ে ছিল দেয়ালের দিকে মুখ করে। আমি চেয়ারে বসা। মশারিটা তুলে দেওয়া হয়েছে যাতে আমি তাকে দেখতে পাই। তিনদিকে মশারি ফেলা, একদিকের মশারি তোলা। ফলে দেখাচ্ছিল ঠিক যেন থিয়েটারের স্টেজ-এর মত। সে শুয়ে আছে, শরীরের যেটুকু দেখা যাচ্ছে তা লালচে মারাত্মক গোটায় ভরা। গোটা গলে পুঁজ আর রস চাপটা বাঁধছে। এলো চুল বালিশে ছড়ান, দৃশ্যটা করুণ, ভয়ঙ্কর। দেখছিলাম। পশ্চিমের জানালার নিমডালের ফাঁক দিয়ে লালচে আলোর কুচি এসে বিছানায় পড়েছে। চৌখুপী আলো কাঁপছে, দুলছে। কোনদিন সেই যা করে না, সেই সময়ে সে হঠাৎ মুখ ফেরাল। বস্তুত রোগ হওয়ার পর তার মুখ ওরকম স্পষ্টভাবে সে কখনও আমাকে দেখায় নি। মুখখানা ফুলে-টুলে বিশ্রী দেখতে হয়েছে। কিন্তু তাতে চমকাবার কিছু নেই। আমার মন তো প্রস্তুতই ছিল। কিন্তু হঠাৎ তার চোখ দুখানার দৃষ্টি দেখে আমার কেমন লাগল। মানুষের খুব অভিমান হলে চোখে যেমন একটা আলগা আলো আসে ঠিক সেরকম কিছু ছিল তার চোখে। জলভরা, লালচে এবং আগুনের মত যা এসে ছোঁয়। তক্ষুনি মনে হল, একে পাহারায় রাখা দরকার। চোখে চোখে না রাখলে এ মরবে, এর মরার ইচ্ছে জেগেছে। কিন্তু এরকম মনে হওয়াগুলো কোন বৈজ্ঞানিক সত্য নয়, আমাদের কত সময়ে কতকিছু মনে হয়। তার ওপর ঘরটার আলো স্পষ্ট নয়, মশারির মধ্যে একটা ধোঁয়াটে ভাব, আর সেই আলোর চৌখুপী-গুলো, সেগুলোর কোন ছিটেফোঁটা তার চোখে পড়ে ওরকম দেখাচ্ছিল কি না—এ সবই আমি ভাবতে লাগলাম। সেই সময়ে আমি হঠাৎ খেয়াল করি, ঘরে একটা জার্মিসাইডিসের চেনা গন্ধ। আর পোকামারা বিষের গন্ধ। সেই গন্ধ আমার নিত্যসঙ্গী। তবু হঠাৎ সেদিন সেই গন্ধ বুকের মধ্যে ঘুলিয়ে উঠে একটা আকুল

boiRboi.net

ইঙ্গিত করছিল। ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, কেন আমার মন একটা অস্পষ্ট কিছু বলতে চাইছে। উঠে আসবার সময়ে দেখি, কে যেন পোকামারা বিষের শিশিটা ছোট্ট আলমারির মাথায় রেখে গেছে। চলে আসতে গিয়েও থমকে শিশিটা দেখলাম। একবার হাত বাড়িয়ে ধরলামও, ভাবলাম কাউকে বলি শিশিটা সরিয়ে নিতে। তারপর সচেতন মনে ভাবলাম, থাকগে। কি হবে!

ছেলেটা চুপ করে আবার একটু ভাবল। তারপর ম্লান এবং সুন্দর হাসিটি হেসে বলল—এই হচ্ছে গল্প। মেয়েটা মারা গেল। হাসপাতালে নিয়ে অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তার মরার ইচ্ছেটাই ছিল প্রবল। সেটা নিয়ে ভাববার কিছু নেই। চুকে টুকে গেছে। কিন্তু তারপর থেকেই আমার মনে একটা প্রশ্ন এল। প্রশ্ন এই—আমি কেন সেই ইঙ্গিত পেয়েছিলাম? আর কেন তা উপেক্ষা করেছি? আমি যদি এতই আনাড়ী যে বুঝতে পেরেও সাবধান হতে জানি না তবে তো একদিন আমার অতীত বিদ্যাও সঠিক প্রয়োগ করতে পারব না! সংকট যখন আসে তখন মানুষের সবচেয়ে বড় বিদ্যার পরিচয় হচ্ছে সিদ্ধান্ত নেওয়া, স্থিরভাবে জোরের সঙ্গে যে সিদ্ধান্ত নিতে জানে না, কোন্ সিদ্ধান্ত সঠিক এ বিষয়ে যার দ্বিধা থাকে সে অবিশ্বস্ত। চিন্তা করতে করতে আমি দেখলাম, মানুষ যত তুচ্ছ ভুলই করুক, তুচ্ছাতিতুচ্ছ ভুলের পিছনে থাকে তার জীবনের যত কাজকর্ম, যত অভ্যাস, যত আচরণ। জল খেয়ে কাচের গেলাসটি টেবিলের ধারে রাখতে গিয়ে ভাবলাম—এখানে রাখছি কারও ধাক্কা লেগে পড়ে ভেঙে যাবে হয়ত। ভাবলাম, তবু আবার রেখেও দিলাম। ভাবলাম—থাকগে, এক্ষুণি ভিতরবাড়ি থেকে লোক এসে নিয়ে যাবে। তখন পাশের ঘরে টেলিফোন বাজছে। তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে হাঁটু লেগে টেবিলটা নড়ল। গেলাসটা নড়ে উঠে আবার স্থির হল। ভাবলাম —গেলাসটা পড়ে যাবে। টেলিফোন বাজছে, দৌড়ে গিয়ে ধরি। কে একজন ফোন করে একটা ঠিকানা দিল লিখে রাখতে। টেলিফোন রেখে তাড়াতাড়ি এসে ঠিকানাটা লিখে রাখতে যাচ্ছি। ডায়েরীটা খুঁজছি। তখন গেলাসটার কথা ভুলে গেছি। জরুরী ঠিকানাটা লিখে রাখা দরকার, ডায়েরীটা কোথা? ফাইলের তলায় চাপা ডায়েরীটা পেয়ে 'ইউরেকা' বলে টেনে বার করতে গেছি, তখন হঠাৎ কনুই লেগে ফটাস্ করে পড়ে ভাঙল, ওটা কি? সেই গেলাস!

ছেলেটা বাবার মুখের দিকে ক্লান্ত চোখ দুটো পরিপূর্ণ মেলে দিয়ে বলল—তুচ্ছ একটা ভুল। কিন্তু ভেবে দেখলে এর পিছনে আমার সমস্ত জীবনটাই কাজ করছে। ঐ দীর্ঘকালের অভ্যাসজনিত আলস্য। কাজ ফেলে রাখা, অন্যে এসে নিয়ে যাবে— এই পরনির্ভরতা, দুর্ঘটনার আশংকা করেও উপেক্ষার সর্বনাশা শিথিলতা। জরুরী কাজের সময়ে বিশৃংখলা। সবকিছুকে একযোগে দেখার ক্ষমতা, আর সব মিলিয়ে একটা সাময়িক অন্ধত্ব। যে এরকম ছোট্ট ছোট্ট ভুল করে তার জন্য বড় বড় ভুল অপেক্ষা করে থাকে। মেয়েটি মরে যাওয়ার পর নিজের এই অন্ধত্ব এবং সিদ্ধান্তের অভাব আমাকে পাগল করে দিল। আমার কেবলই মনে হতে লাগল আমি রুগীদের সঠিক রোগ নির্ণয় করতে পারব না, ভুল ওষুধ দেব হয়ত, অপারেশন করতে হাত কাঁপবে এবং কোন মানুষের মুখ দেখে তার সম্বন্ধে কেবলই উল্টোপাল্টা

ভেবে যাব। নিজের সম্পর্কে এই বিশ্বাসের অভাব মানুষের মস্ত এক শত্রু। তখনই ঠিক করি ডাক্তারীর চেয়ে বড় কিছু শিক্ষা আমার দরকার। সেই শিক্ষা জীবন যাপনের। ক্ষুদ্র চোখে আমরা যা দেখি তা যথেষ্ট নয়, চাই ব্যাপক দৃষ্টি। কোন কিছু দেখলে তার সবটা দেখা চাই, কোন কিছু জানলে তার সবটা জানা চাই। কে শেখাবে আমাকে?

ছেলেটি মাথা নীচু করে মৃদু স্বরে বলল—আমি তখন গুরুর সন্ধানে বেরোই। সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য নয়, সংসারী হওয়ার জন্যই। কিন্তু এমন সংসারী যার ইন্দ্রিয়গুলি ত্রুটিমুক্ত। যে স্থির, আত্মবিশ্বাসী, যে ভুল করে না।

বাবা খুশী হয়েছিল হয়ত। অনেকক্ষণ আলাপ করেছিল ছেলেটির সঙ্গে। ছেলেটি এক পলকমাত্র দেখেছিল শ্যামাকে। দ্বিতীয়বার চোখ তোলে নি। কিছু জিজ্ঞেস করে নি। তবু শ্যামা জানত, সে শ্যামাকে পছন্দ করেছিল।

বাবা কেবলই দ্বিধা করতে লাগল। সন্ন্যাসী ছেলে, আশ্রমে থাকে, নিরামিষ খায়। শ্যামা কি পারবে? কয়েকবার শ্যামাকে ডেকে ওই কথা জিজ্ঞেস করেছিল বাবা। শ্যামা উত্তর দেয় নি। মনে মনে সে উন্মুখ ছিল সেই পুরুষটির জন্য। প্রস্তুত ছিল। তার মনের ভিতরে শাঁখ, উলুধ্বনি বেজেছিল ঠিকই। কেউ শোনে নি।

বাবার উত্তর না পেয়ে তারা আর আসে নি। কী হল সেই ছেলেটির কে জানে! মানুষ যে কোথায় যায়।

নির্জন মসজিদের চত্বরে শ্যামা কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ায়। মনে এক অভিমান। কার ওপর কে জানে। হয়ত দাদার ওপর! কেন তুই পাগল হয়ে চলে গেলি? দ্যাখ তো, আমাদের কী করে রেখে গেছিস। ফিরে আয় লক্ষ্মী দাদা আমার, একটা ঝুঁকে-পড়া দিক তুলে ধর। আমরা চারজন হলে সংসারটার দাঁড়ানো হয়। কেন যে চলে যাস তোরা! কেন যে চলে যায় মানুষ। দূরে যায়! মরে যায়! হারিয়ে যায়! কেন রে! কোথায় গেল মেহেদীরঙা দাড়িওলা হাজিসাহেব? কোথায় সেই কাশীর পেয়রাগাছ? আর সেই মসজিদের পিছনে দেয়াল ঘেঁষে সারি সারি দোলনচাঁপা? কি সুন্দর গন্ধ তার! কিছু নেই দ্যাখ। কেন রে হারিয়ে যায় মানুষ? গাছপালা!

মাঝে মঝে তার অভিমান হয় মা বাবার ওপরেও! কেন তোমাদের অত শোক? উৎসবের মত শোক তোমাদের। মন খুঁড়ে তোমরা দুঃখ তুলে আন রোজ। দুঃখই তোমাদের ভাল লাগে। নইলে কেন ভুলতে পার না? পাছে ভুলে যাও সেই ভয়ে রাত জেগে তোমরা ছেলের কথা বল, অবসর সময়ে বসে ভাব ধ্যান কর। কেন? ভাল লাগে বলে? ঘরের বাতাস তোমাদের সেই দুঃখের ভার নিয়ে ভারি হয়ে থাকে। এক কলি গান গাইতে পারি না আমি, মনে হয় বুঝি গান গাইলে বাড়ির ভিতরে দুঃখের পবিত্র মূর্তিটি—যা তোমরা রচনা করেছ, তা বুঝি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে! আয়নায় মুখ দেখতে যাই, অমনি মনে হয়—আয়নায় মুখ দেখছিস মুখপুড়ি, তোর না দাদা নেই? যে ছিল তোর খেলার সাথী, প্রিয়জন—সে না নেই!

অভিমান তার নিজের ওপরেও। কেন যে বড় হতে গেলাম! কেন যে বুঝতে শিখলাম, ভাবতে শিখলাম, টের পেতে শিখলাম! কী দরকার ছিল এ সবের? তার চেয়ে জন্মে শিশু হয়ে থাকলাম না কেন? সেই তো ভাল হত সবচেয়ে! অবোধ শিশু হয়ে চেয়ে থাকা! কেবল বিস্ময় আর আনন্দ। খিদে মিটলেই ঘুম! আর আহ্লাদ!

অভিমান আরও অনেক শ্যামার। বুক টৈ-টুম্বুর করে। এমনই কপাল তার! দেয়াল টপকে নয়ন এসে চিঠি রেখে যায় ঠিক। ভোরবেলা প্রায়ই চিঠি পায় সে। তাদের বাসার দুটো ঘর। সামনের ঘরে বাবা মা, পিছনের ঘরে সে। তার শিয়রের জানালার পাশ দিয়ে মেথর বা কয়লাওলা আসার একটা গলিপথ। গলিটা বাড়িরই অংশ, উঁচু দেয়াল, সামনে দরজা। কড়াক্কড় করে শিয়রের জানালা বন্ধ করে শোয় শ্যামা। তবু সকালে উঠে যখনই জানালা খোলে, ভোরের প্রথম আলোটি, কি শীতের কুয়াশা কিংবা রুপোলী বৃষ্টি দেখে দিনটা সুন্দর লাগে, মনটা ভাল হয়ে যায়, তখনই দেখতে পায়, জানালার খাঁজে নীল খাম, কিংবা ভাঁজ করা চিঠি। সব চিঠিতেই সেই এক কথা—'বিয়ে কর, না হলে মরব।' কিংবা—'মেরে ফেলব শ্যামা, জান তো আমি খুনে।' চিঠি দেখে মনটা ঝাঁৎ করে ডুবে যায়। মা বাবা দেখার আগেই সে চিঠি নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে, উনুনে দেয়। চোখে জল আসে। বাইরে কোকিল ডাকলে, মাটির বেহালা বাজলে, বৌ-কথাকও কথা বললে, শ্যামা চমকে ওঠে। নয়ন নয় তো! কপাল!

ইচ্ছে করলেই পিকনিক যেতে পারত সে। হৈ-হুল্লোড় করে কাটিয়ে আসত। কিন্তু সব ঘটনা মিলে-মিশে একটা গভীর অভিমান বুকে থম্ ধরে থাকে। নিজেকে শাস্তি দিতে ইচ্ছে হয়। কষ্ট পা শ্যামা, আরও কষ্ট পা। গান গাস নে, কোথাও যাস নে, মুখ দেখিস নে আয়নায়। তোর আনন্দ পেতে নেই!

গাছের ছায়ায় শিশির এখনও শুকোয় নি! পায়ে পায়ে জল ঝরে পড়ছে। হাঁটতে শ্যামার ভালই লাগে। একা। মসজিদ বাড়ির এই পোড়ো ভাবটা তার সঙ্গে মিলে যায়। এখানে সে দাদার সঙ্গে কত খেলেছে। কিছুই ভোলে নি সে। এখানে সে এবার থেকে আসবে। রোজ। বসে থাকবে একা একা।

অভিমানটা বিকেল পর্যন্ত রইল।

পাঁচটা নাগাদ তার পিসতুত দিদি কমলা আর তার স্বামী শঙ্কর ট্যাক্সিতে এসে হাজির। ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে ভিতরে ঢুকেই হাঁক-ডাক শুরু করল শঙ্করদা—শ্যামা, শীগগীর সাজপোশাক করে নাও, সিনেমায় যাচ্ছি। তোমার টিকিট কাটা আছে।

ওর ঐরকম। আগে থেকে খবর দেবে না, হঠাৎ এসে হুড়ো দেবে।

—বুঝেছি, কারও টিকিট বাড়তি হয়েছে, তাই আমাকে নিতে এসেছেন! শ্যামার গলায় সকলের অভিমানের রেশ এখনও।

—মাইরি না, তোমার মুখখানা মনে করেই কেটেছি।

—যদি এসে আমাকে না পেতেন?

—তাহলে বেচে দিতাম। হিট ছবি, বেচলে দু'চার আনা বেশীই পেতাম। জলদি কর।

—আমি যাব না।

কমলা মাকে জড়িয়ে ধরে বলে—যাবি না কী? তোর ইচ্ছেয় না কী। পুজোয় যে পিওর সিল্কটা মামা দিয়েছে সেটা পর আজ। কি যে করিস ভাল শাড়িগুলো দিয়ে। সব জমিয়ে রাখছিস বাক্সে।

—ইচ্ছে করছে না রে কমলাদি। মন ভাল নেই।

—ওমা। সে আর নতুন কথা কী। তোর আবার কবে মন ভাল থাকে?

—যাঃ। কবে মন খারাপ দেখেছ?

শঙ্করদা বলে—ওটা ওর ব্যক্তিত্ব কমলা। অনেক মেয়ে আছে যাদের মন খারাপ থাকলে ভাল দেখায়।

—ইয়ার্কি হচ্ছে? শ্যামা হাসে।

—মাইরি না, তোমার চোখ দুখান যা ঢুলুঢুলু, ওতে হাসি ছ্যাবলামি ভাল খেলে না। মন খারাপ তোমার থাক শ্যামা, কেবল মাঝে মাঝে একটু মুখোশ খুলো, বাব্বাঃ, মেয়েরা সুন্দর দেখাবার জন্য যে কত কষ্ট করতে পারে! একটা মেয়ে ছিল যাকে বাঁ দিক থেকে বেশী সুন্দর দেখাত, সেই থেকে তার অভ্যাসই হয়ে গেল লোকের সঙ্গে কথা বলবার সময়ে বাঁ দিকে ফিরে থাকা, ঐ ভাবে মেয়েটার একটা দোষ দাঁড়িয়ে গেল, সোজা হয়ে কথা বলতে পারে না, তাকাতে পারে না, বাঁ দিকে কেতরে তাকায়, কথা বলে। ঘাড়ে ক্র্যাম্প হয়ে গিয়েছিল। কী জ্বালা!

—আমি সেরকম নই মোটেই।

—তোমাদের সেই সন্নিসি ডাক্তার আমাকে বলেছিল—মেয়েটি ভারী দুঃখী মনে হয়। দুঃখীরাই ভাল, তারা ঈশ্বর সকাশে তাড়াতাড়ি যেতে পারে।

—কোন্ সন্নিসি ডাক্তারের কথা বলছ? কমলা জিজ্ঞেস করে।

—ঐ যে অরিন্দম ব্যানার্জি এম-আর-সি-পি, দেওঘরের আশ্রমে যে আছে সে-ই। আমি তো ঐ একটা সম্বন্ধই এনেছিলাম শ্যামার। সবই ফার্স্ট ক্লাস ছিল, একটু ডিফেক্ট ঐ সন্ন্যাসটা। ওটা না হলে....

শ্যামা কথা বলল না, বুকটা একটু চমকাল মাত্র।

ট্যাক্সিতে শ্যামা আর শঙ্কর দুধারে বসেছে, মাঝখানে কমলা। পাড়ার মোড়টা পেরোতে গিয়ে একটা চায়ের স্টল আর রক দেখিয়ে শঙ্করদা বলে—শ্যামা, এ সব অঞ্চলের ছেলে-ছোকরাগুলো গেল কোথায়! দিন-রাত আড্ডা দিত, চুরি-ছিনতাই করত, টিটকিরি দিত। সব হাপিস হয়ে গেল না কি?

—কী জানি। দেখছি না তো! পাড়াতেও ঘোরে না।

জিভ দিয়ে একটা চুক চুক শব্দ করে শঙ্করদা বলে—হাপিসই হয়ে যাচ্ছে শ্যামা। খুব ধরপাকড় হচ্ছে তো! কিছু পুলিস নিয়ে গেছে, কিছু মরেছে নিজেদের হাতেই, কিছু পালিয়েছে। সব পাড়াতেই ছেলে-ছোকরা কমে যাচ্ছে। আফশোসের কথা।

শ্যামা হাসে—কেন?

—তোমাদের খাঁটি অ্যাডমায়ারার তো এরাই ছিল।

কমলা ধমক দেয়—থাম তো।

—থামবার কী। আমার তো মনে হয় তোমার সবচেয়ে বড় অ্যাডমায়ারার ছিল কাবুল, ভুল বানানে প্রেমপত্র লিখত, কিন্তু কী ভালবাসা। তোমার বিয়ের পরই কাবুল নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল না।

—ওকে অ্যাডমায়ারার বলে না।

—ওরাই খাঁটি অ্যাডমায়ারার। শ্যামা, তোমারও একজন আছে না? নয়ন না কি যেন নাম!

শ্যামা মুখটা ফিরিয়ে নিল।

—সে এখনও বেঁচে-বর্তে আছে তো? না কি হাপিস হয়ে গেছে?

শ্যামা মুখটা ফিরিয়ে বলল—শঙ্করদা, ওকে কিছু করতে পারেন না? বড্ড জ্বালায়।

—রিসেণ্টলি কিছু করেছে না কি?

—করেছে।

—কী?

—বাবা মার সঙ্গে কদিন আগে একটা মন্দিরে গিয়েছিলাম না। সেইখানেও পিছু নিয়েছিল। একটা মস্ত আমবাগান পেরিয়ে যেতে হয়। বাবা মা একটু এগিয়ে গিয়েছিল, আমি বুনো ফুল তুলতে দাঁড়িয়েছি, সেই সময়ে আমার রাস্তা আটকেছিল। সাহস বড় বেড়ে গেছে।

—কাছে আসার চেষ্টা করেছিল না কি?

—হুঁ!

শঙ্করদা একটু চুপ করে থাকে। কমলা বলে—ভাবিস না। ওরা ঐরকম। কাবুল আমাকে কম জ্বালায় নি।

—ও মাঝে মাঝে আমাকে খুন করবে বলে শাসায়। শাসানিটা মিথ্যে নয়, ও পারে। বলল শ্যামা।

শঙ্করদা চিন্তিত মুখে চুপ করে থাকে একটু। বলে—কী করব শ্যামা, এদের মুকাবেলা করতে হলে একটা প্রস্তুতি দরকার। দুঃখের বিষয় আমার তা নেই। ভদ্রলোক হয়েই গেলাম। দেখি যদি কিছু করা যায়।

উদ্বেগ নিয়ে কমলা বলে—তুমি আবার কী করবে? নয়নকে আমি চিনি। রাসবিহারীতে যারা একজন এস্-আইকে মেরেছিল ও তাদের দলে ছিল। ওসব এলিমেণ্টের সঙ্গে খবরদার লাগতে যেও না। শ্যামার পিছনে ঘুরছে ঘুরুক। শ্যামার একটা বিয়ে দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।

—সন্ন্যাসিঠাকুরকে ফিরিয়ে দিয়ে তোমরা ভাল কর নি শ্যামা। মানুষটার মধ্যে একটা ভারী সৎ ব্যাপার ছিল। শঙ্করদা বলে।

শ্যামা মৃদু শ্বাসের স্বরে বলে—আমি কী করব?

কমলাও বলে—ও কী করবে? ওর মতামতের কোন দাম আছে না কি। মামা আর মামী কেবল ছেলে-ছেলে করে ক্ষেপে থাকলে ওর কোনদিন বিয়ে হবে না। ওঁদের

BoiRboi.net

মতামত ছেড়ে দিয়ে এবার আমাদেরই কিছু করতে হবে। হ্যাঁরে শ্যামা, নয়ন কি বাড়াবাড়ি করছে খুব? আগে তো কেবল চিঠিটিঠি দিত, আর কোকিল ডাকতে ডাকতে যেত?

থমথমে মুখে শ্যামা বলে—এখনও যায়। আমার কিছু ভাল লাগে না কমলাদি।

কমলা মুখ ফিরিয়ে শঙ্করদার দিকে চেয়ে বলে—তোমার খোঁজে আর ছেলে নেই? কত তো আড্ডা দাও বন্ধুদের সঙ্গে, তাদের মধ্যে কাউকে পাও না? আমি কালই একবার উমার বাসায় যাব তো, আই-সি-আই-এর একজন এঞ্জিনীয়ার ছেলে আছে ওর পাশের ফ্ল্যাটে, দুবার বিলেত গেছে ...

—ওসব বিলেতবাজ পাত্র ছাড়ো। খাঁটি দিশি ছেলে দেখ।

—আহা, তোমার সন্নিসিঠাকুরও তো বিলেত-ফেরত।

—সে লোকটা বিলেতের গন্ধ মুছে ফেলেছে।

—বিলেতের দোষ কী। তোমার যত...

—কিছুই না। কিন্তু কমলা ইংরেজ আমলেও বিলেত-ফেরতের এত কদর ছিল না এখন যতটা হয়েছে। বিলেত-ফেরত নিয়ে এখন হাই কম্পিটিশন, সুবিধে হবে না। তার চেয়ে দিশি পাত্র যোগাড় করা সোজা।

—তাই দেখ না। তাড়াতাড়ি বিয়েটা হয়ে যাওয়া দরকার। মামা-মামীর উদাসীন ভাব আমার ভাল লাগে না। শেষে দেখ আইবুড়ো থেকে থেকে লাবণ্য ঝরে যাবে, গালে মেচেতা ধরবে, তখন যার-তার সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। শ্যামা, তুই ভাবিস না রে, কাল থেকেই আমি লাগছি।

শ্যামা ম্লান হাসে।

বিকেলটা তবু ভালই কাটল। সিনেমার পর রেস্টুরেন্টে খুব খাওয়াল শঙ্করদা। শ্যামার ইচ্ছে হচ্ছিল জিজ্ঞেস করে, সেই ছেলেটার কি বিয়ে হয়ে গেছে? তোমরা অন্য পাত্র খুঁজবে কেন। সেই তো বেশ ছিল। কিন্তু শ্যামার বড় লজ্জা করে।

শঙ্করদা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল—শ্যামা, কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়লে সব মেয়েরই কিছু সুট্যার জোটে। তোমার তেমন কেউ নেই? আমি শুনেছি, তোমার অনেক সুটার।

শ্যামা চায়ের কাপে মাথা নীচু করে বলে—ছিল তো।

—তাদের কাউকে পাত্তা দাও নি, না?

শ্যামা মাথা নেড়ে বলে—না। তারপর হাসতে থাকে।

—তোমার সবই ভাল, কেবল ঐ একটাই ডিফেক্ট। তুমি ভারী ভীতু আর আনস্মার্ট।

কমলাদি ঝঙ্কার দিয়ে বলে—আর স্মার্ট হয়ে কাজ নেই। যা আছে বেশ আছে। যারা নিজে বর খুঁজে বিয়ে করেছে তারা কিছু বেশী সুখে নেই।

—তুমি বড্ড সেকেলে। শ্যামা, তোমার মত কী?

—শঙ্করদা, আমি কিছু বুঝি না।

—কেমন পুরুষ তোমার পছন্দ সে সম্পর্কে কখনও কোন আইডিয়া কর নি?

—আইডিয়া কি ধরা-ছোঁয়া যায়? আইডিয়া আইডিয়াই থাকে।

boiRboi.net

—তবু বল না।

কমলা রাগ করে বলে—বলে কী হবে। কোন মেয়েই সেরকম পুরুষ পায় না ঠিক যেমনটি সে চায়, আবার যাকে পায় তাকে নিয়েও তার চলে যায়। ভাবে, আমি এরকমটিই চেয়েছিলাম।

কমলাদি বেশ গম্ভীর মুখে বলছিল। শুনে শঙ্কর এক চোখে হেসে বলে—তা তুমি কেমন চেয়েছিলে?

কপট শ্বাস ফেলে কমলাদি বলে—তার সঙ্গে তোমার তুলনা হয় না।

—যাকে পেয়েছ তাকে নিয়ে চলছে তো?

—নিজে বুঝে দেখ।

—বুঝেছি।

—শ্যামাকে জ্বালিও না। ওকে ছেলেবেলা থেকে দেখছি, ওর তেমন কোন পছন্দ অপছন্দ নেই। ও সত্যিকারের ভাল মেয়ে।

শঙ্করদা শ্যামার দিকে চেয়ে বলে—সত্যি? কখনও ভাবী স্বামীর কথা ভাব না? কখনও না?

শ্যামা একটু হাসে। ম্লান সেই হাসিটি তার। বলে—ভেবেছি।

আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করে শঙ্কর—কেমন?

শ্যামা চোখটা একটু বোজে। শীর্ণ, কালো, দীর্ঘ একটি আবছা চেহারা দেখতে পায়। চোখ দুখানা উজ্জ্বল এবং আবিলতাহীন। আস্তে করে বলে—তেমনি পুরুষ যে খুব ভালবাসে। খুব। কখনও দোষ ধরবে না আমার। আর সে নিজে খুব ভাল হবে। আর কিছু না।

শঙ্করদা হতাশ হয়ে পিছনে হেলান দিয়ে বলে—দূর! ও থেকে কিছু কি বোঝা যায়। ভাবলাম কী না জানি সব স্পেসিফিকেশন শুনব। যাঃ। এই বেয়ারা, বিল!

—হতাশ হলেন?

—হব না? ডাক্তার, এঞ্জিনীয়ার কিংবা স্মার্ট কিংবা সুন্দর—কত কী স্পেসিফিকেশন ছিল। তুমি সত্যিকারের ভাল মানুষ শ্যামা। ভাল মানুষকে আজকাল কী বলে জান তো?

—কী?

—লেদ্রু। তুমি পারফেক্ট লেদ্রু।

কমলাদি বলে—ও ঠিক বলেছে। মেয়েদের পছন্দসই পুরুষ হওয়া অত সোজা নয়। ন্যাং ন্যাং করে অনেকেই ঘোরে পেছনে, জোর করে ভালবাসা আদায় করে। কিন্তু পছন্দসই পুরুষ খুব রেয়ার।

শ্যামা কমলাদিকে ঠেলা দিয়ে বলে—কী যা তা বকছ কমলাদি! শঙ্করদাও তো বলতে পারে পুরুষদের পছন্দসই মেয়েও আমরা কেউ নই।

কমলাদির চোখ মুখ সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ হয়ে যায়, স্বামীর দিকে তীব্র চোখে চেয়ে বলে—বলুক না! বলে দেখুক!

সিগারেট মুখে শঙ্করদা হেসে হাতজোড় করে বলে—আমি বলি নি। বলছি না।

আমি যেমনটি চেয়েছি তেমনটিই পেয়েছি। শ্যামা, তোমার কমলাদিকে যৌবনের কাননদেবীর মত দেখতে নয়?

—আমি তো দেখি নি। তবে অনেকটা সেইরকম মনে হয়। বলে হাসে শ্যামা।

—দেখ নি! বলে ভারী অবাক হয় শংকরদা—দেখ নি কানন দেবীর ছবি?

—কী করে দেখব? আমাদের সময়ে সে সব ছবি তো দেখান হয় না।

একটু গুম হয়ে থেকে শংকরদা বলে—বাস্তবিক আমাদের কত বয়স হয়ে গেল! আমরা কৈশোরকালে কাননদেবীর গান গাইতাম, ছবি দেখতাম। তোমাদের সঙ্গে আমাদের জেনারেশন গ্যাপ বোধহয় এইটাই। আমাদের সময়কার ক্রেজ্ তোমাদের সময়কার বিস্মৃতি। আরে বাঃ!

কমলাদি বলে—ওঠ, আর কথা বাড়াতে হবে না। আমি আমার মত দেখতে। কারও কৈশোরের হিরোইন হতে চাই না, আমি যেমন ঠিক তেমনি।

—সবাই তাই কমলা। কিন্তু শ্যামা, তোমাকে ঠিক বোঝা গেল না। কমলাদির সামনে লজ্জা পাচ্ছ বলতে, বুঝতে পারছি। একদিন না হয় আমাকে গোপনে তোমার স্পেসিফিকেশনটা জানিয়ে দিও।

ফেরার সময়ে ট্যাক্সিতেও একবার শ্যামার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়েছিল, সেই লোকটা এখন কোথায়! জিজ্ঞেস করল না।

শংকরদা কমলাদির ওপাশ থেকে ঝুঁকে বলল—শ্যামা তোমার জন্য কিছু করতে পারলে খুশী হব। তোমার স্পেসিফিকেশন থাকলে বল, বিশেষ কাউকে পছন্দ থাকলে তাও বল, নেগোশিয়েট করব।

শ্যামা একটা শ্বাস ফেলে কেবল। বলে—বিয়ের চেয়েও আমার একটা চাকরি বেশী দরকার।

—কেন?

—বাবার একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। আর একটাও বোধ হয় শীগ্গীরই হবে, দাদার জন্য এত উদ্বেগ ইদানীং, মোনা ঠাকুর বলেছে হরিদ্বার বা হৃষীকেশ কোথাও সন্ন্যাসী হয়ে দাদা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তো আমরাও চললাম বুনো মোষ তাড়াতে। এই শরীরে বাবার ঐ-সব দূর দেশে, পাহাড় টাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে কী যে হবে! আমার সব সময়ে বাবার জন্য ভয়। কাল রাতেও স্বপ্ন দেখেছি। বিশ্রী স্বপ্ন।

—ভেব না শ্যামা।

—ভাবনা কি কারও পোষ মানে? ভাবি, বাবার কিছু যদি হয় তবে আমাদের কী হবে। একটা চাকরি থাকলে তবু ভরসা থাকে।

কমলাদি মাথা নেড়ে বলে—চাকরি দিয়ে কি হবে রে মুখপুড়ি! মামার টাকা কিছু কম নেই। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আর গ্র্যাচুইটির অ্যাতো টাকা রয়েছে ব্যাঙ্কে, বাড়িটাও তো অনেকটা হয়ে গেছে। তোর চিন্তা কী?

—আমার বিয়ে দিতেও তো খরচ আছে।

—ওমা! খরচ তো ঐ একটাই। মামা-মামীর মত এমন লাইট ফ্যামিলি কটা আছে! চাকরির চিন্তা ছাড়, তোর বিয়ে দিয়েও মামার অনেক থাকবে। মামা খুব

কেম্পন ছিল, জমিয়েছে অনেক।

—যাঃ!

—যাঃ বলিস না শ্যামা। মামার সারা জীবনের সবচেয়ে বড় খরচ ছিল খাওয়ার। খাওয়া-খাওয়া করে চিরকাল পাগল। আমকাতল, চিতলপেটি, ইলিশ ভাপে, মুড়োর ডাল—এইসব নিয়ে সারাটা জীবন খরচ করল, মামীর গায়ে একটা গয়না বা দামী শাড়ি দেখলুম না। কেম্পন বলব না তো কী? তোর বিয়েটাই বা মামা দেব-দিচ্ছি করে দিল না কেন? কত ভাল সব সম্বন্ধ এসেছিল! খরচের ভয় না তো কি?

—কী সব বলছ? বলে ধমক দেয় শঙ্করদা।

—ঠিকই বলছি। পাগলের কি চিকিৎসা নেই? দিলীপ তেমন পাগল তো ছিল না! একটু আনব্যালান্সড্ ছিল, তা রাঁচী বা লুম্বিনিতে রাখলে ভাল হয়ে যেত না? মামা গেল কবিরাজী আর হোমিওপ্যাথী করতে। মামী কত দুঃখ করেছে। শ্যামা, কিছু মনে করিস না, দিলীপকে খুঁজে পেতে এখন যে খরচ হবে তার অর্ধেক খরচে দিলীপের চিকিৎসা করে ওকে ভাল করা যেত। খাওয়ার খরচ ছাড়া মামা আর কোন্ খরচটা করেছে! নইলে বাড়িটা........

শঙ্করদা ব্যাগ্রভাবে প্রসঙ্গটা ঘোরায়—খাওয়া ছাড়া বাঙালী যে কিছু বোঝেই না। রোজ ট্রামে-বাসে রাস্তায়-অফিসে যত আলোচনা শুনি সবটাই খাওয়ার। পলিটিক্সের কথা, দর্শনের কথা, সব কথার মধ্যেই বাঙালী ঠিক খাওয়ার কথা তুলে ফেলবে। বাঙালী খাওয়ার চিন্তা নিয়ে ঘুম থেকে ওঠে, খাওয়ার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমোতে যায়। মামার দোষ কী?

—কথা ঘুরিও না। আমার রাগ হয়।

শঙ্করদা সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করে—কার ওপর?

—পুরুষ জাতটার ওপর। ভারী নিমকহারাম। আর স্বার্থপর।

শঙ্করদা শ্বাস ফেলে চুপ করে থাকে।

ওদের বিয়েটা ভালবাসার নয়। কিন্তু ভালবাসাটা ক্রমে জন্ম নিচ্ছে। ওদের কাছে গেলে সেই চাপা স্রোতস্বিনীর কুলু কুলু শব্দ পাওয়া যায়। ওরা গতিময়, বহমান। শ্যামার মন চনমন করে। আলোকলতার শরীরে যখন আঁকশি জন্মায়, ছোট্ট ছোট্ট কোঁকড়ান বাহুর মত শূন্যে প্রসারিত হয়ে অবলম্বন ধরতে চায়। তেমনি শূন্যতার মধ্যে শ্যামা একজনকে খোঁজে। প্রকাণ্ড গাছের মত সে। ঝড়ে-ঝাপটায় স্থির।

দিনটা ভালই কেটে গেল শ্যামার। আবার কাটলও না। সারাটা রাত বুকের এক ধারটা, মনের এক ধারটা ফাঁকা লাগল। আজ রাতে সে স্বপ্ন দেখল না, কিন্তু ঘুমটাও তেমন হল না গভীর। সকালে খানিকটা বেলায় উঠে তার ক্লান্তি লাগল খুব। শিয়রের জানালা খুলতেই দেখল রোদ আজ বড় তেজী। ফটফটে। জানালার খাঁজ শূন্য। নয়ন বেশ কিছুদিন হল চিঠি রেখে যাচ্ছে না। নয়নের হল কী?

boiRboi.net

কাকভোর। পাখীর ডাক সদ্য শোনা যায়। শিশির ভেজা মাটির গন্ধ এখন বাইরে। উঠোনে হলুদ-গাঁদা আলো করে ফুটেছে। শিউলি জমেছে গাছের তলায়। দিনের আলো সব মানুষকেই বাইরে ডাকে।

অবিকল মুর্গীর ডাক শুনে সুকুলের ঘুম ভাঙল। তড়বড় করে উঠে বসে সে। বাবাকে নেড়ে উত্তেজিত গলায় বলে—বাবা ঘরের ভিতরে মুর্গী ডাকছে গো।

জগদীশ পাশ ফিরে ঘুমচোখে সুকুলের দিকে চায়। সুকুলের চোখে-মুখে সব সময়ে একটা অবাক ভাব। নতুন মেলায় গেলে কচি-কাচাদের যেমন হয় যতই দেখে মেলার বাহার ততই বাক্য হরে চেয়ে থাকে, তেমনই সুকুলের চার ধারে দুনিয়ার মেলা লেগেই আছে। তার বিস্ময় ফুরোয় না। ছেলেটি জগদীশেরই। আর কার? যারা বলে যে তা নয়, তারা মিথ্যেবাদী। এই ভোরে বন্ধ ঘরের ভিতরে আবছায়ায় সুকুলের সরল মুখশ্রী দেখলে বুকের ভিতরে যেন ধূপগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। আর সব ভুল পড়ে যায়।

জগদীশ মৃদু গলায় বলে—মুর্গী নয় বাবা, ও নয়নখুড়ো।

সুকুলের গালের এক ধারে এঁড়ানীর দাগ, চোখ দুটো ফোলা ফোলা। চুল হামলে পড়েছে কপালে, কিছু উঁচিয়ে আছে, ভেঙে পড়েছে কান ঢেকে। সব মিলিয়ে এক যশোদাদুলালের ছবি।

—নয়নখুড়ো? দেখি তো!

বলে মশারি তুলে লাফিয়ে নামে সুকুল!

এই ভোরে নয়নের ওঠার কথা নয়। বহুকাল ধরেই ঘুমহীনতার রোগ তার। মাঝে-মধ্যে সে ওষুধ খেয়ে ঘুমোয়। তার প্রিয় বড়ি সোনেরিল। ক্রমশঃ বড়ির মাত্রা বেড়ে এখন একসঙ্গে তিনটে চারটে খায়, কখনও বা তারও বেশী। তারপর এক ধরনের আচ্ছন্নতা নিয়ে পড়ে থাকে। খুব দুস্বপ্ন দেখে। ঘুমের মধ্যেও হিজিবিজি চিন্তা করে। কখনও সে ডাক্তার দেখায় নি।

জগদীশ সেই রাতের ঘটনার পর মাঝখানের দরজা বন্ধ রাখে। কেউটে দুটোর বিষদাঁতও কামিয়ে ফেলেছে। কিছু দেখার নেই। সারা রাত বিছানায় শুয়ে বসে, ঘরে পায়চারী করে আর সিগারেট খেয়ে কাটায় সে। মাথা অসম্ভব গরম হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। তখন দরজা খুলে উঠোনে যায়। তারা-ভরা আকাশ থেকে হিম ঝরে পড়ে, টুপটাপ পাতা খসার শব্দ। গাছেরা অলক্ষ্যে নিষ্পত্র হয়ে যাচ্ছে। আজকাল দু তিনটে দমকা বাতাসে গাছ ন্যাড়া হয়ে যায়। গভীর রাতে তারের যন্ত্রের মত ডাকে ঝিঁ ঝিঁ, কাঁদে শেয়াল-কুকুর, বাদুড় ডানা ঝাপটায়। জ্যোৎস্নায় ভোরের স্বপ্ন দেখে ভুল করে জাগবার ডাক দিয়ে ককিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে পাখী। তখন আকাশের পশ্চিম প্রান্তসীমায় চাঁদ নেমে ঝুলে আছে। নিষ্পত্র গাছের শেষ হলুদ পাতাটির মত দুলে দুলে করছে ক্ষয়া ভাঙা চাঁদ, ভোরের প্রথম বাতাসেই খসে পড়ে যাবে। নিঃঝুম দৃশ্যটির দিকে চেয়ে থেকে নয়নের আচমকা মনে হয়—এখানে কেন

পড়ে আছি? কী চাই আমি?

উত্তর তার জানা নেই। সে এমন অনেক কাজ করে যা কেন করে তা তার জানা থাকে না। এক রকম নেশারু ঘোরের মধ্যে সে চলে। রেগে যায়, উত্তেজিত হয়। কামুক হয়ে পড়ে। এক সময়ে মনে হয় শ্যামাকে ছাড়া সে আর একদিনও বাঁচবে না। পরমুহূর্তেই মনে হয়, শ্যামাকে দিয়ে কী হবে? তার কাছে চারদিক সব সময়েই আলো আঁধারি। যেন বা তার জীবনযাত্রা কেবলই এক বনভূমির ছায়ায় ঢাকা আবছায়া পথটি বেয়ে। দিনের আলো আছে, আবার নেইও। কিছুই স্পষ্ট নয় সেখানে। এই অনন্ত বনভূমিটি কোনদিন ফুরোবে না, মনে হয়।

ভোরের প্রথম পাখীটি যখন ডাকল তখন পূবের আকাশ ছাইরঙা। একা ভূতের মত নয়ন উঠোনে দাঁড়িয়ে। স্থির ও একাকী। পাখীরা ক্রমে তার চারধারে ডাকতে থাকে। তারপর ওড়ে। দূরে ব্রাহ্মসময় ঘোষণা করে মুর্গীর ডাক। সারা ভোর জুড়ে নানা শব্দের আজান ধ্বনিত হয়। তখন হিমে ভিজে গেছে নয়নের চুল, তার গা বরফ, চোখে শীতের অশ্রুবিন্দু। শরীরের বোধ তার নেই। সংবিৎ ফিরে পেয়ে নির্ঘুম, জ্বালা-ধরা চোখ সে একবার হাতের পিঠে মুছে নেয়।

ভোরে এই যে চতুর্দিকে জেগে ওঠা এটা টের পেয়ে নয়নের বুকের ভিতরটা হঠাৎ ধক্ করে নড়ে যায়। যার ঘুম নেই, তার জেগে ওঠাও নেই। এই সুন্দর ভোর-বেলাটির সঙ্গে নয়নের নিজস্ব চেয়ে থাকার কোন মিল নেই। ভারী একা লাগে তার। ভয় করে সে কেন ঘুমোয় না?

ঘরে এসে নয়ন তার পার্স'টা আর একবার খোঁজে। কোণায় কি খাঁজে যদি এক আধটা বড়িও খুঁজে পাওয়া যায়। নেই। সে জানে। কাল রাতেও খুঁজেছে। হতাশ নয়ন আবার পায়চারী করে কিছুক্ষণ।

বিছানার চাদরটা টেনে নিয়ে গায়ে জড়ায় নয়ন, র‍্যাপারের মত। দরজা টেনে শিকলি দিয়ে বেরোবার আগে অবিকল মুর্গীর মত একবার দুবার ডাক দেয়। পাশের ঘরে সুকুলের গলার স্বর পায়। বাবাকে ডেকে কী যেন জিজ্ঞেস করছে সুকুল। জগদীশ উত্তর দিল।

উঠোনটা পার হয়ে সে রাস্তা ধরে। ঝোপঝাড়ের পাশে রাস্তাটা আঁকাবাঁকা কেমন পড়ে আছে। সাদা হাড়ের মত রঙ। আবছায়া এখনও। পূবে কেবল ফ্যাকাসে রঙের ওপর লাল একটা ছোপ ধরেছে। গাছপালায় ঝুলে আছে অন্ধকার। পরিষ্কার ঠাণ্ডা বাতাস শ্বাসে ঢুকে বুক চিরে দিচ্ছে।

কোথাও যাওয়ার নেই। তার পথ সর্বদিকে খোলা। দূর থেকেই মোনা ঠাকুরের পুরোনো মন্দিরের ওপর জাপানী ছবির মত একটা অশ্বত্থচারাকে আকাশের গায়ে আঁকা দেখা যায়। পৃথিবীর সব মন্দিরের গায়েই বোধহয় অলক্ষ্যে অশ্বত্থচারা জন্মেছে এখন। গভীর শিকড় নেমে যাচ্ছে মন্দিরের অভ্যন্তরে নালী ঘায়ের মত। মোনা ঠাকুরদের দিনকাল শেষ হয়ে এল। খামোখা আল টপকাবার পরিশ্রম দরকার নেই। অশ্বত্থের চারাটি মুখ উঁচিয়ে তো বলেই দিচ্ছে, শেষ শুরু হয়ে গেছে। দেরী নেই।

নয়ন নাবাল মাঠটি থেকে মন্দিরের চত্বরে উঠে আসে। নির্জন। কেবল পাখীর ডাক, আর পতনশীল পাতার শব্দ। একবার সে মন্দিরটার মুখোমুখি দাঁড়ায়। লোহার গুল বসানো ভারী দুটো কাঠের পাল্লা বন্ধ। প্রকাণ্ড তালা ঝুলছে।

মাটিতে পড়া ফুলে পুজো হয় না। রাতে তাই শিউলিতলায় কাপড় বিছিয়ে রাখে তারা। সকালে কুড়িয়ে নেয় রাশি ফুল। শিউলিতেই ভরে যায় সাজি। তারপর স্থলপদ্ম আর জবা।

স্থলপদ্ম এ সময়টায় রাশি রাশি ফোটে। নীচু ডালগুলো শেষ করে তারা আঁকশি দিয়ে উঁচু একটা ডাল নুইয়ে আনছে। ফুলটা এসেও গেছে আঙুলের ছোঁয়ায়! আর একটু…একটু…। টুপ করে একফোঁটা হিম শিশিরের জল তার গালে পড়ল। হাসল তারা। ডালটা ছেড়ে দিয়ে আঁচলে গাল মুছল। শীত করে তার। বড্ড শীত করে। পদ্মটা পাড়ল না তারা। থাক একটা দুটো পদ্ম। গাছের ফুল গাছে থাক।

কুয়োর পাড়ে জবাগাছটা ভিজে শরীরে দাঁড়িয়ে। ঝুপসী। ফুল তুলবার আগে তারা এই আবছায়া ভোরের আলোতে কুয়োয় ঝুঁকে জল দেখল। জল নীচে নেমে গেছে অনেক। সেই কোন্ পাতালে একটা গোল আয়না বসানো, তাতে ফিকে ফিরোজা রঙ। স্থির জলে তারা নিজের ছায়া দেখল। কিছু বোঝা যায় না। না রঙ, না মুখ-চোখ। একটা ভুত যেন সে। এই ভোরবেলা ঘুম থেকে সদ্য উঠে তাকে কেমন দেখাচ্ছে? কে জানে। তাদের ঘরে একটা বড় আয়নাও নেই যে দেখবে। কাঠের আয়না, তাতে আবার ঝাঁপ ফেলার বন্দোবস্ত আছে। সেই ঢাকনার ওপর ফুল পাতা পাখী আঁকা, লেখা—সুখে থাক। মরি মরি, কে যে আয়নাটা কিনে এনেছিল! সেই সুখের আয়নার ঢাকনা খুললে ঢেউখেলান কাচে নিজের মুখখানা দেখে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে। আজ পর্যন্ত কম দিনই সে নিজের কোমর পর্যন্ত প্রতিবিম্ব দেখেছে। যদি কখনও দিন পায় সে, একটা বড় আয়না কিনবে। নিজের দিকে চেয়ে বসে থাকবে। নিজের কত কী দেখার থাকে, কেউ বোঝে না।

সবার আগে বাবার গুরুপুজো, চক্রের দিকে চেয়ে ধ্যান, জপ তারপর বিনীত প্রার্থনা। ততক্ষণ বাবা এদিকে আসবে না। তারা নিশ্চিন্তে আবছায়া ছায়াটির দিকে চেয়ে থাকে। ছায়ার পিছনে আকাশ কী উঁচুতে! সে কি খুব রোগা? ছিপছিপে, না রোগা? কোন্‌টা বলবে তাকে মানুষ? কালো, না শ্যামবর্ণ? মুখখানা কেমন তার?

অনেক পাখী-পক্ষী আর মুর্গীর ডাক সে শুনছিল এতক্ষণ। এ সময়ে ওরা তো ডাকবেই। চমকায় নি। হঠাৎ শুনতে পেল, মন্দিরের চাতালে, কি বারান্দায়, কোথায় যেন খুব কাছেই একটা মোরগ ডাকছে।

ডাকার কথা নয়। কাছাকাছি মোরগ পোষে না কেউ। পুষলেও মন্দিরে আসতে পারে বলে ছাড়ে না, বাবা শুনলে…

তারা দুই হাতে তালি দিয়ে বলল—হুশ্।

আবার মুর্গী ডাকল। পরিষ্কার ডাক। মন্দিরের বারান্দাতেই উঠে এল বুঝি! তারা গাছপালার ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেল। ফুলকপি উঁকি মারছে সদ্য, ক্ষেতের

ঢিবিগুলো পেরিয়ে বেড়ার ধারে এল। বলল—হুশ্।

দেখা গেল না। মন্দিরের চাতাল ফাঁকা, বারান্দা শূন্য।

আড়াল থেকে আবার মুর্গী ডাকে। আনন্দিত ডাক।

তারা বেড়াটা টপকে পার হয়। পাখীর মত উড়ে আসে মন্দিরের বারান্দায়। হাততালি দিয়ে 'হুশ্ হুশ্' শব্দ করে ছোটে। প্রথমটায় দেখতে পায় না কিছু। কিন্তু মনে হয় গোল বারান্দাটা দিয়ে একটা পায়ের শব্দ মন্দিরের দেয়ালের আড়ালে আড়ালে চলে যাচ্ছে।

হঠাৎ একটা হলুদ জামার অংশ চকিতে দেখা গেল। মিলিয়ে গেল দেয়ালের ওপাশে।

তারা দাঁড়িয়ে সতর্ক গলায় বলে—কে?

উত্তর নেই।

—আমি কিন্তু লোক ডাকব।

নয়ন বারান্দাটা থেকে লাফ দিয়ে ঘাসে নামে। অন্ধকার আর নেই। উঁচু গাছের মগডালে প্রথম আলোর লাল কণাটি এসে পড়েছে। আলো ফুটবার সময়টি বড় সুন্দর। ফুল যেমন ফোটে। তারপর থেকে শুরু হয় দিন। দিন তারার ভাল লাগে না। মানুষ জেগে উঠলেই পৃথিবীটা নোংরা হয়ে যায়।

নয়ন উঁচু বারান্দার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। মেয়েটার পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। শ্বাসের শব্দ। নয়ন অপেক্ষা করে। পিছনে তাকায় না। উদাস চোখে পুব দিকে চেয়ে থাকে। তার শরীরে ঘুমহীনতার জ্বালা। শরীর বুঝি বা একটু ক্লান্ত। তার খোলা শরীরের ওপর দিয়ে শীত গ্রীষ্ম চলে যায়, চলে যায় দিন রাত। তবু একটুও ঘুম আসে না। সোনেরিল ফুরিয়ে গেছে। আনা হয় নি। ধুৎ তেরী!

মেয়েটা এগিয়ে আসে। থমকায়।

একটু চুপ। নয়ন ফিরে তাকায় না।

—কে দাঁড়িয়ে ওখানে?

সিগারেটের একটা গোল ধোঁয়া জট খুলতে খুলতে নিথর বাতাস বেয়ে উঠে আসে।

তারা ভয় পায়। কে?

নয়ন ফিরে তাকিয়ে একটু হাসল। তেলহীন মুখ চোখ তার, রাতে ঘুমোয় নি বলে শরীরের রস টেনে গেছে। হাসতে গিয়ে নিচের ঠোঁটটা চড়াৎ করে ফেটে গেল। জিভে রক্তের নোনা স্বাদ পায় নয়ন। তার চুল রুক্ষ, চোখের কোলে কালি। মেয়েটার ভয় পাওয়ারই কথা।

সে বলে—আমি নয়ন রায়। সুকুলদের বাড়িতে—

—ও। তা এখানে কেন?

—মায়ের স্থান। আসতে তো বাধা নেই।

তারা কি বলবে ভেবে পায় না। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থেকে বলে—একটা মুর্গী ডাকছিল এদিকে, সে কি আপনি?

boiRboi.net

নয়ন মাথা নাড়ে।

—কেন ডাকছিলেন ওরকম? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে তারা।

—এমনিই। খেয়াল হল।

তারা একটু চেয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ আঁচল মুখে তুলে 'খুক' করে হেসে ফেলে। সামলে বলে—কাল সুকুল বলছিল বটে একজন হরবোলা এসেছে তাদের বাড়িতে। এতক্ষণে বুঝলাম সে আপনিই তবে।

—আমিই।

সকালের আলোতে মেয়েটাকে সাদাসিধে দেখাচ্ছে। তেমন কিছু দেখার নেই। তবে কিনা যৌবনে কুক্কুরী ধন্যা। তাই মেয়েটির শরীর লাউডগার মত ডাঁটো, চামড়ায় ঘামতেলের মত চিকচিক। সবচেয়ে সুন্দর তার দীর্ঘ চুল। মস্ত একটা এলোখোঁপায় বেঁধে রেখেছে। নয়ন উর্ধ্বমুখে মেয়েটিকে ক্ষুধার্ত চোখে একটু দেখল, বলল—আমি অনেক ডাক ডাকতে পারি।

তারা শ্বাস ফেলল। বলল, ওসব ডেকে কী হয়।

—মানুষ চমকে যায়। এই কথা বলে, একটু অর্থপূর্ণ হাসে।

তারা অস্বস্তি বোধ করে বলে—বাবা এক্ষুনি আসবে।

—আসুক না।

তারা আবার কথা হারিয়ে ফেলে। বিস্ময়ে চেয়ে থাকে একটু। তারপর মুখ ফিরিয়ে বলে—ফুলের সাজি কুয়োপাড়ে ফেলে এসেছি। ঐ যাঃ! যদি কাকপক্ষী ছুঁয়ে দেয়!

বলে আবার পাখীর মত উড়ে যায় সে। পালায়।

নয়ন বারান্দায় তেমনি ঠেস দিয়ে সিগারেটটা শেষ করে। বাগানে মেয়েটি এখন একা। চারদিকে ঝোপ ঝাড়, নির্জনতা। ইচ্ছে করলেই পিছু নিতে পারে নয়ন। কেউ লক্ষ্য করবে না। লক্ষ্য করলেই বা কী? নয়ন গ্রাহ্য করে না। শীতের সুন্দর বাগানে মেয়েটিকে জ্বালানো যেত। কিন্তু আজ তার সেরকম কোন ইচ্ছে নেই। কোনদিন ঘুমের জন্য দুঃখ করে না সে। না ঘুমোন তার অভ্যাস। কিন্তু আজ হঠাৎ একটু ঘুমের জন্য তার বড় তেষ্টা পায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ঘুমের কথা ভাবে। তার কেন ঘুম নেই?

লোকটা চাষা না ভদ্রলোক বোঝা যায় না। মাল দিয়ে কাপড় পরে খালি গায়ে কেমন মাটি কোপাচ্ছে দেখ। কী তেজ শরীরে, বাঁট পর্যন্ত কোদাল গেঁথে যাচ্ছে মাটিতে। হুবহু চাষার মত মুখে নাকে হুমুস শব্দে শ্বাস ছেড়ে উল্টে দিচ্ছে গভীর চাপড়া। রোদ এখন তেজী। শরীরটার থাকে থাকে পেশী সেই রোদে ঝলসায়। উত্তুরে ঠাণ্ডা হাওয়া ছেড়েছে, বেলা বাড়ল। লোকটার গায়ে ঘাম, থুতনীর কাছে একটা ফোঁটা দুল দুল করছে। মাটির চাপড়াগুলো রোগা হাতে একটা ঘুরপী দিয়ে ঠুকঠুক করে ভাঙছে সুকুল। তার গায়ে পুরোহাতা হলুদ সোয়েটার।

মেহেদীর নীচু বেড়াটা ডিঙিয়ে নয়ন জমিতে নেমে আসে। একটু দূর থেকে দেখে। সুকুলের রঙ ফর্সা, নরম-সরম গা, মুখখানা লম্বাটে ছাঁদের, চোখ দুটো দীঘল।

জগদীশের সঙ্গে কোন মিল নেই। জগদীশের শরীর চৌকো, মুখ চৌকো, চোখ গর্তে, গায়ের রঙ কালোই, তবে মিশমিশে নয়। সুকুল হয়ত তার মায়ের চেহারা পেয়েছে। যদি পেয়ে থাকে তবে বলতে হবে, ওর মা সুন্দরীই ছিল।

নয়নের দীর্ঘ ছায়াটা সুকুলের গা ছুঁতেই সুকুল মুখ ফিরিয়ে চেঁচাল —নয়নখুড়ো।

—উম্।

—সকালে তুমি মুর্গীর ডাক ডেকেছিলে?

—হুঁ!

—আমাকে শিখিয়ে দাও।

—দেব।

—বেড়ালের ঝগড়াটা শিখিয়ে দাও নি কিন্তু। ঐ যে দুটো বেড়ালে যখন ঝগড়া হয়, যখন গায়ে জলের ছিটে দিলে একজন আর একজনকে বলে—তুই আমার গায়ে মুতলি, অন্যটা বলে—তুই আমার গায়ে মুতলি, কি রকম করে বলে যেন? ফ্যাঁ-ও-ফ্যাঁ-অ্যা-ফ্যাঁস ফ্যাঁস—বলো না।

জগদীশ একবার তাকিয়ে তার কাজ করে যায়। কথা বলে না। কেবল সুকুলকে ধমক দেয় একটা—আমার কোপানো হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু, তোমার চাপড়া ভাঙা পড়ে রইছে। থাক তবে তোমার পালা রোয়া হবে না—

সুকুল তাড়াতাড়ি চাপড়া ভাঙতে ভাঙতে হি হি করে হাসে। বলে—পোড়েলদের বুড়ো কাল বলছিল—কী কাণ্ড বাবু, এই দিনে এমন কোকিল ডাকে কেন রে? এত কোকিলের মচ্ছব লাগল কেন। কী জানি বাবু, কোন অলক্ষুণে ব্যাপার। জানে না তো, যে তুমি ডাক।

জামগাছটার গোড়ায় কিছু ঘাস। গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে নয়ন। একটু অন্যমনস্ক। রোদে পাথুরে লোকটা মাটি উল্টে দিচ্ছে। ও রাতে কী নিঃসাড় ঘুমোয়! তবে কি পরিশ্রমই ঘুমের ওষুধ? না কি পুত্রস্নেহ? স্বাস্থ্য নয় তো? একটা শ্বাস ফেলে নয়ন। কী ভাবছে আবোল তাবোল! সবাই-ই তো ঘুমোয়। ঘুম আসে বলে। তার আসে না।

পলকের মধ্যে কাঠা দেড়েক ক্ষেত কুপিয়ে ফেলে জগদীশ। এখন ক্ষেতের শেষে দাঁড়িয়ে গামছায় ঘাম মুছছে। পায়ের কাছে দাঁড়ানো কোদালখানা। হেসে বলল—হেরে গেলি সুকুল! ঠুক ঠুক করে এখন সারাদিন লেগে যাবে তোর।

গামছায় গা মুছতে মুছতে জগদীশ এসে পাশে বসল। কোমর থেকে বিড়ির বাণ্ডিল বের করল। আর লাইটার। বলল—কোথায় গিছিলেন?

—ঘুরে এলাম।

—আলায় বালায় ঘুরলেন তো অনেক। কী খুঁজছেন আসলে?

নয়ন বলল—আমাকে সাপ ধরা শিখিয়ে দেওয়ার কথা ছিল আপনার!

জগদীশ চুপ করে থাকে। সে রাতে নয়নকে চড় মারার পর থেকেই বোধ হয় তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে। নয়নের সব কথার উত্তর সে দিচ্ছে না দুদিন। বিড়িটা ধরিয়ে খুব আরামে দীর্ঘ টান দিয়ে ঘন ধোয়া আস্তে ছেড়ে দিল। আরামের কাশি

boiRboi.net

কাশল খ্ক্ খ্ক্ করে।

—শিখবেন ?

—নিশ্চয়ই।

—তবে গুরু বলে মানুন।

নয়ন একটু তাকায়—মানে ?

জগদীশ হাসে—এসব গুপ্তবিদ্যা, কাউকে শেখানো যায় না অমনি। যদি শিষ্য হয় তবে শেখানো চলে।

নয়ন একটু হেসে বলে—আপনারা সবাই এত গুরু গুরু করেন কেন ? মোনা ঠাকুরও গুচ্ছের গুরুতত্ত্ব কথা বলে গেল সেদিন। ব্যাপারটা কী !

জগদীশ দূরের দিকে চেয়ে বিড়িটা শেষ করে। তারপর হঠাৎ একটা শ্বাস ফেলে বলে—শহরের মানুষ গুরুর মর্ম কমই বোঝে। সেখানে সবাই গুরু। গাঁ-গঞ্জের লোকেরা গুরু মানে, কারণ, তারা প্রকৃতির নিয়ম জানে। নিয়মই বলে দেয়, গুরু ছাড়া কিছু হয় না। উটকো লোককে কেউ কিছু শেখায় না। একটা আধবুড়ো নোংরা অশিক্ষিত লোককে গুরু মেনে, একবছর তার পদসেবা করে তবে আমি শিখেছিলাম। সে ভারী কষ্ট। লোকটাকে ঘেন্নাও হত। হেগে কাপড় ছাড়ত না, দাঁত মাজত না, গায়ে চিমসে গন্ধ, চোখে কেতুর, কথায় কথায় মেজাজ নিত, জাতেও জলচল না। তবু লোকটার পিছনে ঘুরতাম নেশাখোরের মত। মাঠে-ঘাটে ছিল তার সাপের বাগান, যেতে যেতে ফুল তোলার মত বিষধরদের টুকটাক তুলে নিত ঝাঁপিতে। না-কামানো সাপ বের করে সকাল বিকেল একা একা খেলত। তার সেই কাণ্ড দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। হ্যাঁ, গুরু বটে। লোকটার ইন্তেকাল হয়ে গেছে। তবু আমি মাঝে মাঝে পাথরঘাটায় তার কবরের কাছে যাই সুকুলকে নিয়ে। বসে থাকি কবরটার পাশে। বেশ লাগে।

নয়ন চুপ করে থাকে।

জগদীশ একটু হেসে বলল—গুরু মানতে বলায় রাগ করলেন ?

নয়ন মাথা নেড়ে বলল—না। তবে আমার গুরু-ফুরুতে বিশ্বাস নেই।

জগদীশ বলে—তাহলে শেখানো চলে না।

—কেন ?

—গুরু না মানলে বিদ্যেটা একদিন অবিদ্যে হয়ে দাঁড়াবে। গুরু যেন রক্ষাকবচ, সে না থাকলে একদিন বিষধরই খাবে আপনাকে। গুরুর দেওয়া নিষেধ বারণ আছে, সে-সবও শ্রদ্ধার সঙ্গে মানতে হবে। নইলে বিদ্যে কিছু না। আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি নিয়ম ভাঙতেই জন্মেছেন। আপনি বিদ্যে নিয়ে বিপদ করবেন।

নয়ন একটু হাসে। বলে—তাহলে শেখাবেন না ?

জগদীশ মাথা নাড়ে—না। বললাম তো আপনাকে কিছু শেখানো বড় বিপদ। রাতবিরেতে উঠে যদি সাপ-সাপিনীর হরগৌরী দেখতে চান তাহলেই হয়ে গেল।

নয়ন একটা ঢিল ছুঁড়ে বলে—ঠিক আছে। আমি নিজেই শিখে নেব।

জগদীশ অবাক হয়—নিজে শিখবেন ! কী করে !

নয়ন হাসে—কায়দাটা খানিকটা বুঝে গেছি। একটু প্র্যাকটিস দরকার। ও হয়ে

যাবে।

জগদীশ গম্ভীর গলায় সতর্ক করে দেয়—ও কাজও করতে যাবেন না। ও বড় হীন জীব। ওস্তাদ ছাড়া আর সবাই তার বধ্য। এ কেবল একটা দুটো কায়দা নয়, এ হচ্ছে একটা শাস্ত্র। সর্পচরিত্র জানা কি শুধু একটা দুটো সাপ ধরতে দেখেই হয়ে যায়?

—দেখা যাক।

জগদীশ মাথা নাড়ে—ও হয় না। আপনি না শিখে ধরতে গেলে হয় নিজে মরবেন, নয়তো সাপকে মারবেন। দুটোই খারাপ।

—আপনি সাপ মারেন না?

—উরে শ্বাস রে! মারতে পারি।

—কেন, মারলে কী হয়?

—যারা শাস্ত্র জানে তারাই জানে মারতে নাই কেন? প্রকৃতির কোন জীব ফেলনা নয়। মারতে শুরু করলে তো সবই মেরে ফেলতে পারি, তখন মাথায় রক্তক্ষরণের ওষুধ আসবে কোত্থেকে?

—ওটা যুক্তি নয়। সংস্কার।

—তা হবে। আমি অত ভাবি না। গুরুর নিষেধ আছে, তাই যথেষ্ট। জলে ডাঙায় অন্তরীক্ষে জীব চলে-ফিরে বেড়ায় গুরুর দয়ায়। বেড়াক।

—তবে ধরেন কেন?

—ধরি তাকে জানবার জন্য। চেনা জানা কি পাপ? যেমন মানুষ চিনি, তেমনি সাপও চিনি, পাখী-পক্ষী চিনি। কত কী জানার আছে পৃথিবীতে। স্বকুলবাবা, তোমার কি হাত ব্যথা করছে?

চিকন গলায় স্বকুল উত্তর দেয়—না তো।

—চলে এসো বরং। বাকীটা বিকেলে কোরো। তোমার তো নরম-সরম হাত পা, সইবে না। রোদটাও তেজালো।

স্বকুলের সুন্দর মুখখানা তেতে লাল, মুখে হাসি, হাতের চেটোয় রোদ থেকে চোখ আড়াল করে চেয়ে বলল—দাঁড়াও না, কামিনী গাছটা অবধি করি, তারপর এসে নয়ন-খুড়োর কাছে ডাক শিখব।

জগদীশ মুখটা ফিরিয়ে নয়নকে বলে—শুনছেন?

—কী?

—ও ডাক শিখবার জন্য আপনাকে গুরু বলে মেনেছে। আপনি কিন্তু সাপ ধরতে শেখার জন্য গুরু মানছেন না।

নয়ন হাল্কা গলায় বলে—কাউকে গুরু মানা আমার গুরুর নিষেধ।

—কে গুরু?

—কার্ল মার্কস।

জগদীশ একটু গম্ভীর হয়ে থাকে। তারপর আস্তে করে বলে—নামটা চেনা-চেনা লাগছে। শহরে যখন বসত ছিল এক সময়ে তখন শুনতাম বটে নামটা। অনেকদিন শুনিনি।

ঠাট্টা কি না ধরবার জন্য নয়ন জগদীশের মুখটা দেখল। তার ভাঙা চোকো মুখে

boiRboi.net

সেখানে তার প্রকাশ পায় না। একটা ভালমানুষী বা বোকামী সেখানে স্থায়ী বাসা নিয়েছে। জগদীশ একটা শ্বাস ফেলে বলল—তাঁর চেলা একসময়ে আমিও ছিলাম। বঙ্গবাসীতে ছাত্র ফেডারেশন করতে বছরখানেক তাঁরও চেলা ছিলাম। তারপর শরীর ডাক দিল। তখন কোঁৎ পেড়ে বিশাল ওজন তুলতাম, বানরের মত রিং-এ ঘুরতাম, অনায়াসে করতাম গ্রেট সার্কেল, উঁচু-নীচু প্যারালাল বার, রোমান রিং, ভল্টিং বক্স—কত কী করতাম! ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন লাহিড়ীদা। গুরু। তিনি ডেকে বললেন—তোমার হবে হে। সব ছেড়ে-ছুড়ে লেগে পড়। কাছের গুরু দূরের গুরুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল আমাকে। নইলে মার্কস সাহেবকে নিয়ে একটা তোলপাড় করার ইচ্ছে ছিল আমার।

নয়ন শান্ত গলায় বলে—আমার ইচ্ছেটা এখনও আছে।

—ভাল। বিশ্বাস থাকলেই ইচ্ছে জোর পায়। লেগে থাকুন। সাপখোপ নিয়ে ভাববেন না।

নয়ন ঠাণ্ডা কৌতুকের গলায় বলে—আপনি আমাকে ভয় পান!

জগদীশ অবাক গলায় বলে—ভয় পাই?

নয়ন আস্তে হাত বাড়িয়ে জগদীশের মাংসল প্রকাণ্ড কাঁধে রাখে, পেশী-বহুল হাতখানায় হাত বুলিয়ে বলে—এই বিশাল শরীর, শাবলের মত হাত, তবু আমাকে আপনার ভয় কেন? সেই রাতে চড় কষালেন, আমি জবাবী কিছু করি নি, চড়টা মেনেই নিয়েছি। আপনিও জানেন আমাকে ঐ দুহাতে পিষে মেরে ফেলা যায়, তবু আমাকে আপনার ভয় কেন?

প্রকাণ্ড চেহারার জগদীশ কথাটা শুনে কেমন একটু কুঁকড়ে যায়, তার চোখে মুখে অস্বস্তি স্পষ্ট লক্ষ্য করা গেল। বিড়িটা নিভে গিয়েছিল, আবার ধরিয়ে বলল—কিসে বুঝলেন?

নয়ন এক ধরনের ঠাণ্ডা হাসি হাসে। বলে—জগদীশবাবু, আপনিও জানেন, আমিও জানি। আপনি চড়টা মারলেও ভয়টা আপনার উড়ে যায় নি।

জগদীশের বিড়িটা ধরে নি। দু একবার টিপে-টুপে সেটা ফেলে দিল সে। বলল—ঘরের দরজা বন্ধ রাখি বলে বলছেন? তা আপনার বিদ্ঘুটে কাণ্ড-কারখানাকে ভয় পেতেই হয়। পাগলে কাণ্ডকে কে না ভয় করে?

নয়ন মাথা নেড়ে বলে—আর কোন ভয় নেই?

—আবার ভয় কিসের?

—ভয় যে কিসের তা কি আমি জানি? তবে লোকে ভয় পায় দেখেছি।

—ওটা বাড়িয়ে বলছেন।

—হবে। নয়ন উদাস গলায় বলে। তারপর হঠাৎ জগদীশের দিকে চেয়ে বলে—আপনার কাছে ঘুমের ওষুধ আছে?

—না। কেন?

—আমার খুব ঘুমোতে ইচ্ছে করে। কতদিন যে ঘুমোই নি!

—ঘুমোন নি কেন?

—ঘুম আসে না। এদিকে তো কোথাও সোনেরিল বড়িও পাওয়া যাবে না।

boiboi.net

—বকখালিতে ওষুধের বড় দোকান আছে। দেড় ক্রোশ। ওষুধ ছাড়া ঘুম আসে না ?

—না। ঘুমোতে পারি না। ইচ্ছে করে পড়ে কাঠ হয়ে ঘুমোই। স্বপ্ন দেখব না, চিন্তা করব না, একবার ওরকম ঘুম ঘুমোতে পারলে একটানা কয়েকদিন পড়ে থাকতাম।

জগদীশ একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, তারপর বলে—ঘুমোন না বটে। তাই সারারাত পাশের ঘরে মাঝে-মধ্যে পায়ের শব্দ শুনি। জেগে থেকে করেন কী ? শরীরে আবল্যি আসে না ?

—আসে। সারা রাত কী যে যন্ত্রণা! বড় একা লাগে। একটা ভয়ংকর কিছু করতে ইচ্ছে করে। রেগে যাই। তাড়ি, বাংলা, সব খেয়ে দেখেছি। ঝিমুনী আসে। কিন্তু সে ঠিক ঘুম না।

—আমার কাছে মোদক আছে। খেয়ে দেখবেন ?

—দেখেছি। যত নেশা সব করেছি। কিন্তু নেশা তো ঘুম নয়।

—ভারী মুশকিল দেখছি।

—আগে কষ্ট হত না। আজকাল হয়।

দুপুরে অনেকক্ষণ ডাক শিখল সুকুল। বারান্দায় বসে। ক্লান্তিকর, তবু অনেক রকম ডাক ডাকল নয়ন। কুকুর শেয়াল বেড়াল পক্ষী। নানাজনের গলার স্বর নকল করল। সুকুলের চোখ চক চক করল, মুখে চোখে ভীষণ কৌতূহল।

—আরও ডাক। সে বলল।

—সুকুল, একদিনে সব শিখতে নেই।

সুকুল জেদ ধরে—ডাক না, শুনি।

—এ সব শিখে কী হয় ?

—আমি শিখব। আমি হরবোলা হয়ে যাব।

—কেন ?

—রাস্তা দিয়ে অনেক ডাক ডাকতে ডাকতে যাব, তুমি যেমন যাও। লোক বুঝতেই পারবে না যে সুকুল যাচ্ছে। চমকে উঠবে।

—লোকে চমকাতে ভালবাসে না সুকুল। দেখ, আমাকেও কেউ ঐ জন্যই ভালবাসে না।

—আমি বাসি। খু-উ-ব।

নয়ন হাসে। হাসতে তার কষ্ট হয়। ঠোঁটে রক্ত জমে আছে। চোখে জ্বালা। সকালে একহাঁড়ি খেজুর রস নামিয়েছিল জগদীশ। অনেকটা খেয়েছে সে। শরীর ঠাণ্ডা হয় নি। জ্বরের মত লাগে। খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে সে একটু চোখ বোজে।

—এই নয়নখুড়ো, ঘুমোচ্ছ যে! চোখ খোল—বলে সুকুল তার চোখে আঙুল ঢোকাতে চেষ্টা করে। চোখের পাতা ধরে টানে।

নয়নের চোখ খুলতে ইচ্ছে হয় না। বাইরে একটা সাদা চাদরের মত রোদ আজ। চেয়ে থাকলে চোখ জলে ভরে আসতে চায়।

boiRboi.net

'সুকুল' বলে বেড়ার আগলের ধার থেকে কে ডাকল। মেয়ে গলা। সুকুল টপ করে উঠে দুদ্দাড় দৌড়ে গেল।

বেড়ার ওপাশে তারা দাঁড়িয়ে। হাতে কলাপাতায় ঢাকা একটা কাঁসার বাটি। স্নানের পর এখন চুল এলো। পরনে একটা লাল টুকটুকে শাড়ি। মোম মাজা শরীর। বোধহয় কোথাও কোন ব্রণ বা গোট নেই। দাঁতগুলো বড় ঝকঝকে। কপালে একটা তেলসিঁদুরের বড় টিপ। চোখে কাজল দিয়ে থাকতে পারে, চোখ দুটো বড় ডাগর দেখাচ্ছে দূর থেকেও।

তারা দাঁড়াল না। সুকুলের হাতে বাটিটা দিয়ে বলল—একসময়ে চুপ করে যেয়ে বাটিটা দিয়ে আসিস।

চলে যাওয়ার আগে একবার সজল বিদ্যুৎ হেনে গেল নয়নের দিকে। এক পলক মাত্র। তারপরই পিছন ফিরে বাঁশঝাড়ের আড়াল হয়ে গেল।

—কী সুকুল? নয়ন জিজ্ঞেস করে।

সুকুল বাটিটা নাকের কাছে তুলে গন্ধ নেয়।

—নতুন গুড় গো! দেখ, এখনও গরম। জ্বাল দিচ্ছিল সকাল থেকে। খাবে?

—না, তুমি খাও। মেয়েটা মোনা ঠাকুরের মেয়ে না?

সুকুল মাথা নাড়ে—তারা-মা।

—মা কেন?

—আমি মা ডাকি। তারা-মা ডাকতে শিখিয়েছে। সকলের সামনে ডাকি না তো, আড়ালে ডাকি।

—কেন মা ডাকতে শিখিয়েছে সুকুল?

—ইচ্ছে। দেখ, তারা-মা কাল পিঠে পায়েস দিয়ে যাবে। যা হয় ওদের সব দিয়ে যায় চুপি চুপি।

—কেন?

—আমাকে ভালবাসে তো! পাঁচজনের সামনে দিলে নিন্দে হবে।

—নিন্দে হবে কেন?

—কী জানি! লোকে বলে বাবা নাকি তারা-মাকে বিয়ে করবে। ধ্যাৎ, বাজে কথা। বাবা বিয়ে করবেই না।

নয়ন একটু হাসে। অন্ধি-সন্ধি একটু-আধটু বুঝতে পারে সে। কোথাও একটা ঘোঁট পাকাচ্ছে। যেখানে মানুষ সেখানেই ঘোঁট।

ভুঁইচাষ বড় প্রিয় জগদীশের। এ সময়টায় রবিশস্যের চাষ। তা থেকেও কিছু আয় হয়।

চক্ষুলজ্জা বড় জিনিস। সে চাষা নয়, জমির মালিক। আধা ভদ্রলোক। কাজেই, অতএব বর্গাদার রাখতে হয়েছে। ছাতা মাথায় পিছু পিছু ঘুরছে সে।

চাষীটা রোগা-ভোগা বটে। ফাল তেমন গভীরে ঢুকছে না। এই যে ওপরের মাটি এ হল গে একশো বছরের পুরোনো। ওপরে হাত-তিনেক পুরু জমি উল্টে-পাল্টে আবহমান চাষ চলে আসছে। এই পুরু আস্তর সরালে নীচে আছে সেই

boiRboi.net

কুমারী। ওপরের এই বুড়ী-বিয়োনী জমি দিয়ে আর কতকাল চলবে! অনাবাদী ফেলে রেখে আর কেমিক্যাল সারে এ জমি পানসে হয়ে আসছে। ফসলের ঢল নেই। গভীর গর্ত খুঁড়ে সেই অনূঢ়া ভুঁইয়ের রূপ দেখতে ইচ্ছে করে তার। উঠে এস গো কুমারী, দেখি তোমার কালচে সোনা রঙ, লাঙলের ফালে ফালে ঘুচে যাক লজ্জা, ঢল দাও ফসলের। তার ইচ্ছে করে পৃথিবীর ওপর থেকে ঐ পুরু বুড়ী-বিয়োনী আস্তরটা তুলে ফেলে। কিন্তু তা হয় না। তত জোর লাঙলের ফালে নাই।

চাষীটা মরকুটে শরীর ভর দিয়ে ঠিকমত গাঁথতে পারছে না। চাঙড় উপড়ে গভীর ক্ষতচিহ্ন হচ্ছে না।

—তামাক খাওগে। বুঝলে! জিরিয়ে ঠাণ্ডা হও, আমি দেখছি। বলে হাঁক দেয় সে। গায়ের পিরাণটা খুলে ফেলে, মাল দিয়ে কাপড়টা পরে নেয়, গামছা বাঁধে কপালে। জমিতে নেমে যায়।

জিনিসটা বড় ভাল লাগে তার। লাঙলটা যখন সে মাটিতে গাঁথে তখনই সে মাটির গভীর নরম মায়া টের পায়। ঠিক যেন মেয়েমানুষের শরীর। পায়ের আঙুলে উঠে দুখানা লোহা-হাতে সে চেপে ধরে হাতল। রি রি করে কেঁপে ওঠে মাটি। আনন্দে, যন্ত্রণায়। উপড়ে আসে গভীর শীতল কালচে-সোনা মাটি। ভারী এক রকমের তৃপ্তি পায় সে। 'অ-ড়-ড়-ড়' করে বলদ দুটোকে তাড়া করে। তার হুঁ-হুংকারে বলদ দুটো নিষ্পেষিত ঘাড়ে ছোটে।

—মেল ছেড়েছে গো! রোগা-ভোগা চাষীটা গাছতলা থেকে হেঁকে বলে। হাসে খুব। জগদীশের গায়ের জোর এ অঞ্চলে বিখ্যাত।

ঘাম ফুটে উঠতে থাকে। শরীরে ছলাৎ ছল রক্তের শব্দ। দাঁতে দাঁত। লড়াই। উঠে এসো গো কুমারী মা, উঠে এসো। মাটি ওল্টায়, তবু জগদীশের মন ভরে না। গভীর, আরও গভীর মাটি চাই, যে মাটিতে মানুষের হাল পড়ে নি কখনও। গুপ্তধনের মত সেই মাটি কোথায় কোন্ পাতালে এখন? ভারী লাঙলটা একবার তোল্লা দিয়ে ঝাঁকিয়ে বসায় সে। র-য়ে র-য়ে ফেটে যাচ্ছে ভুঁই, চৌচির হয়ে যাচ্ছে, নানা ঢঙের ঢেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। পায়ে মাটির স্বাদ, দু হাতে মাটির কাঁপন উঠে আসে লাঙল বেয়ে। সুখ। তার সুখ এরকমই। চাষাড়ে।

দূরে মাথা তোলা দিয়ে আছে মোনা ঠাকুরের মন্দিরের চূড়োর কলস। তার ওপর একটা লাল নিশেন ছিল, এখন নেই। নিশেনের বদলে গজিয়েছে দুরন্ত অশ্বত্থ। বহু দূর থেকেই দেখা যায়। উত্তর দিকে চষবার সময়ে মন্দিরটা চোখে পড়ে। উল্টোবাগে ঘুরলে দেখা যায় পৃথিবীর সীমা। সেখানে ছায়ার মত গাছপালা, শিমুলের বীজ কেটে তুলো যেমন ওড়ে তেমনই উড়ে যাচ্ছে হালকা আঁশমেঘ। ঘুরলে আবার মোনা ঠাকুরের মন্দির। বাঁশবন আর আমবাগানের মাথার ওপর উঁচিয়ে আছে। মোনা ঠাকুর নিজেও ওরকমই উঁচানো। সবার ওপর মাথা তুলতে চায়।

মাথাটা নামিয়ে নিয়ে মাটির গভীর খালগুলো দেখে জগদীশ। বিড় বিড় করে কথা বলে—সুকুল আমার ছেলে নয়, সে কি আমি জানি না? হায় গো, এসব তো বাচ্চা ছেলেও বুঝতে পারে। বৌটার ওপর রাগ করতাম। সে পা চেপে ধরত। সুকুলের বাপের নাম সে কখনও বলে নি। কী করব। পেলে তার বুকে এমনি লাঙল

চেপে দু ভাগ করে দিতাম না।

গভীর গভীরতর ডুবে যেতে থাকে লাঙল। অবিশ্বাস্য চাষ দেখে আধবুড়ো চাষী চেঁচিয়ে বলে—মাটিকে যে জল করে ফেলা হল! আরে বাঃ! বসুন্ধরা গলে যায় যে! বাঃ বাঃ!

চাষের বাহার সে বোঝে। মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে।

মাটির গভীর খাঁজে খাঁজে অন্ধকার। জগদীশ চেয়ে থাকে। নোনা ঘাম নেমে আসে ভুরু বেয়ে, চোখের কোণ বেয়ে। থুতনী বেয়ে। বিড় বিড় করে বলে সে—বাপ কে? অ্যাঁ! কে বাপ তবে আমার সুকুলের? এ বড় আশ্চর্য কাণ্ড! সুকুল আমার, বাপ ভিন্ন। অ্যাঁ! আশ্চর্য কাণ্ড! সুকুলের জাত কী বল তো ঠাকুর! পারবে না। কে জানে! কত খুঁজেছি আড়ালে-আবডালে! যে-ই হোক। ছেলে আমার। খর্বদার কোন শালা যদি ফের কথা তোলে! সুকুল বড় হচ্ছে, বুঝতে শিখছে। বড় ভয়। যদি জানতে পারে? কী লজ্জা! খবর্দার তোমরা সব, খবর্দার, কথা ওর কানে তোলে যদি কেউ চোয়াল খসিয়ে দেব, জিভ উপড়ে দেব সকলের। সার্কাসে আমি পাঁচ মণ লোহা তুলতাম, মনে থাকে যেন!

লেবুকাঁটা দিয়ে চমৎকার একখানা টিপ পরে তারা। সস্তা কুমকুম বড্ড জেবড়ে যায়। লেবুকাঁটা দিয়ে পরলে বড় টিপটার চারধারে ফুটকিগুলো ভারী বাহার দেয়। ঢাকনা-খোলা আয়নাটা একটু দূরে ধরল তারা। আয়নার ছায়ায় ঢেউ খেলছে। খেলুক। তবু বোঝা যায়, এ মেয়ের এখন যৌবনকাল। পোকামাকড় ভীড় করবার সময়। মুখ টিপে সে হাসে। পরমুহূর্তেই এক দুঃখ খেলা করে যায় বুকে। পাউডার নেই, ঠোঁটের রঙ না, কিছু না। প্রদীপের শিষে কাজললতা উল্টে কালি ফেলে একটু কাজল চোখে দেওয়া, তাও চুরি করে দিতে হয়। বাবা দেখলে ঠাণ্ডা গলায় বলে—কালি কি সাজ! চোখে লোভ আসে। উত্তেজক।

ঢাকনায় লেখা—সুখে থাক! মরি মরি! কি বা লেখার ছিরি! সুখে থাক বললেই সুখে থাকে লোক? তারার সুখ নেই। রঙীন শাড়ি, ভাল আয়না, সাজগোজ, সিনেমা-থিয়েটার, রেডিওর গান, পুরুষ সঙ্গী…কত কী চায় মেয়েরা।

পশ্চিমের জানালায় রোদ সরে এল। নিমগাছের ছায়াটা উঁকি দিচ্ছে মেঝেয়। ঐ ছায়াটা হুশ করে অন্ধকার হয়ে যায়। শীতের বেলা বড্ড তাড়াতাড়ি যায়।

সুকুলের বাবা আজ চাষে গেছে। এই তার ফেরার সময়। নাবাল মাঠটা দিয়ে হন্ হন্ করে হেঁটে আসে বিশাল মূর্তি, মাঠের মাঝখানটিতে একবার থমকে দাঁড়ায়। দূর থেকে কালীমায়ের মন্দিরের দিকে একবার হাতজোড় করে মাথায় ঠেকিয়ে চলে যায়। মন্দিরে আসে না। তারার বাবা সুকুলের কোষ্ঠীতে বাপের নামের জায়গাটা খালি রেখেছিল। সেই থেকে রাগ।

কামিনী গাছটার ঝুপসী ছায়ায় নিজেকে আড়াল করে জগদীশকে প্রায়ই দেখে নেয় তারা। জগদীশ তা জানে। এক-আধদিন দেখাও হয়ে যায় এধারে ওধারে। জগদীশ গা করে না। তারা কি সুন্দর নয়? নাই হল, সুন্দরী ছাড়া কারও দিকে

boiRboi.net

তাকাতে নেই ? তারার কিছুই কি দেখার নেই জগদীশের ? পাথর ! পাথর ! ছেলের জন্য এত ভালবাসা কোথা থেকে আসে ? ঐ বুকটা থেকেই তো ! একই বুক একজনের জন্য গলে ঘি, অন্যজনের বেলায় পাথর ! ভারী আশ্চর্য !

শোন সবাই, তারা ঠিক করে রেখেছে একদিন গলায় দড়ি দেবে। সেদিন খুব খাবে তারা। মাছের মুড়ো, পাঁঠার ঠ্যাং, পিঠে পায়েস, চালতার অম্বল। সাজবে খুব। যে বাসন্তী রঙের চকরা বকরা শাড়িটা দিদি লুকিয়ে দিয়ে গেছে, সেইটে পরবে সেদিন। খোঁপায় ফুল গুঁজবে। চন্দনের ফোঁটা পরবে মুখে। বিয়ের কনেটি সেজে অনেকক্ষণ আয়নায় দেখবে মুখ। সেদিন খুব জ্যোৎস্না ফুটবে। ঋতুটি হবে বসন্ত। দক্ষিণের পোয়ারা গাছটার ডালে ঝুলন ঝোলাবে সে। একা একা রাধা। কৃষ্ণবিরহিনী। সেদিন বিরহই তার মিতা। মরার সময়ে লোকে চিঠি লিখে রেখে যায়, বলে যায়, সে নিজেই মরছে। তারা লিখবে না কিছু। হঠাৎ মরে যাবে। এবার তোমরা খুঁজে বের কর—কেন তারা মরেছে ! জগদীশ, স্কুলের বাপ কে এটা খুঁজে খুঁজে হয়রান ! তোমাকে আর একটি হয়রানী দিয়ে যাব জন্মের শোধ ! তারা কেন মরল ! খুঁজে খুঁজে বের কর সারা জীবন ধরে। বেশ হবে ! জন্মের শোধ।

কামানোর পর সাপদুটো ঝিমিয়ে গেছে। কাল ওদের দুটো ব্যাঙ দিয়েছিল জগদীশ। গিলেছে ! দুটোরই পেট ফুলে আছে ! ঢিপির মত একটা জায়গায়। নিম-খোরাকি ! একবার খেলে বহুদিন আর কিছু খায় না। ঝিম মেরে পড়ে থাকে। নয়ন কাচের ভিতর দিয়ে উগ্র চোখে চেয়ে থাকে। লক্ষ্য রাখে ! কিন্তু না, ওদের পরস্পরের শরীরের প্রতি বড় নিস্পৃহতা। এ বড় অদ্ভুত। এরকম একটা বাক্সে নয়ন আর শ্যামা থাকলে ?

নয়ন একটু হাসে।

এ জীবনে নয়ন আর কোনদিন ঘুমোবে কি ? আশ্চর্য, ঘুমের জন্য তার কোন চিন্তা ছিল না; কোনদিন। হঠাৎ আজকাল মাঝে মাঝে ঘুমের কথা তার মনে হয় কেন ? এক দেড় প্যাকেট সিগারেট, দু এক ঢোঁক বাংলা, আর চিন্তা—এই নিয়েই তো দিব্যি রাত কেটে যেত ! আজ কেন ঘুমের চিন্তা ? কে তাকে ঘুম পাড়াবে ? শ্যামা ? শ্যামা ! চোখ জ্বলে যায় তার।

দুটো ঝাঁপি দড়িতে ঝোলানো। ওপরেরটায় হাত দিয়ে স্পর্শ করে নয়ন। ভিতর থেকে একটা শ্বাসের শব্দ আসে। এই ঝাঁপি দুটোয় দুজন গোখরো আছেন। ঠাণ্ডা মেজাজ। চট করে কামড়ান না। কামানো, নিরাপদ। ঢাকনা খুললে যখন তারা মাথা তুলবে তখন পারবে কি নয়ন সাহস রাখতে ? তেমন শক্ত নয়। জগদীশকে দেখেছে মুখের সামনে হাত নেড়ে সরিয়ে নেয়। মাথাটা তখন একটু নীচে ঝুঁকে পড়ে। জগদীশের বাঁ হাত তখন টপ্ করে পিছন দিক থেকে ধরে মাথাটা। অনেক সময়ে লেজ ধরে ঝাঁকুনী দিয়ে তুলে ফেলে। নীচু মাথা আর তুলতে পারে না। শক্ত নয়। পারবে নয়ন।

ভেবে দেখলে শ্যামাকে তার কিছুই দেখানোর নেই। কত কিছু দেখাতে সাধ

যায়! কি ভালবাস শ্যামা? মানুষ খুন? সুন্দর পোশাক? বিনীত ব্যবহার? নাকি গান শুনতে চাও? উপহার ভালবাসা? অপহৃত হতে চাও? কি শ্যামা? তোমার জন্য আমি ফুটবল খেলোয়াড়ও হতে পারি। কিংবা গায়ক। অভিনেতা। যা চাও তাই হব।

ঝাঁপিটার গায়ে আর একবার আলতো হাতে চাপড় দেয় সে। ভিতরে এবার দুটো দ্রুত তীক্ষ্ন শ্বাসের শব্দ হয়। বিরক্ত হচ্ছে, রেগে যাচ্ছে। শোন শ্যামা, কিরকম শব্দ হয়। বিরক্ত হচ্ছে, রেগে যাচ্ছে। শোন শ্যামা, কিরকম শব্দ! ঝাঁপি খুললেই কপিশ বিদ্যুৎ চমকে উঠে দাঁড়াবে। বিদ্রোহী। মুক্তিকামী। কী ভয়ংকর! সম্মোহনের হাত বাড়িয়ে আমি ধরে নেব তাকে। কত খেলা দেখাব। দেখ।

সুকুল জামতলায় খেলছে। অনেক সংগী জুটেছে তার। জগদীশ একঘরে, কিন্তু সুকুল নয়। গাদীর কোট পড়েছে মাঠে। সুকুল পাকা ঘুঁটি। চেঁচিয়ে বলছে—আমার কোটে আসিস না, আমি পাকা। দান কেটে যাবে।

খেলা খুব জমে গেছে। সুকুল এখন আসবে না।

ওপরের ঝাঁপিটা সাবধানে দড়ির দোলনা থেকে তুলে আনে নয়ন! বেশ ভারী। সাপ যে এত ভারী হয় তা জানত না। বয়ে নিতে কষ্ট হবে। হোক!

বিছানার পাতলা চাদরটা দিয়ে ঝাঁপিটাকে বাঁধে সে। একটা ঝোলার মত করে নেয়। ঝাঁপির ভিতর অবিরাম পাক খোলা আর শ্বাসের শব্দ হয়। নয়ন দাঁত টিপে হাসে। না সাপ, না শ্যামা, কাউকে বিশ্বাস নেই। কিন্তু কী করে তাদের ধরতে হয় তা শিখে যাবে নয়ন।

ঝোলা হাতে নয়ন নিঃসাড়ে মেহেদীর বেড়া ডিঙিয়ে জঙ্গুলে জায়গায় ঢুকে পড়ল। রাস্তা দিয়ে যাবে না। গাছের আড়াল-আবডালে গেলেও সে ঠিকই পৌঁছবে। জায়গাটা চেনা হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ শরীর আছড়ে সাপটা এখন নিশ্চুপ। বোঝাটা হাত বদল করে বাঁশঝাড় পেরিয়ে বুকসমান কসাড় জঙ্গল ভেদ করে মোনা ঠাকুরের মন্দিরের পিছনটায় উঠে আসে। মোনা ঠাকুরের বাগান। এটা ঘুরে সে আমবাগানে গিয়ে পড়বে! বাগানের বেড়া ঘেঁষে সে হাঁটে।

মন্দিরটার ডগায় অশ্বত্থচারাটি চোখ তুলে দেখে নয়ন! একটু হোঁচট খায়! গরুর দড়ি বাঁধার খুঁটি কে যেন উপড়ে নেয়নি! বোঝাটা আবার হাতবদল করে নেয় সে!

নাবাল মাঠটায় আলো ফিকে। পশ্চিমে একটা কুয়াশার আস্তরণ পড়েছে। সূর্যটা ঘোলাটে। জগদীশ এখুনি ফিরবে। সে ফিরবে মাঠ দিয়ে, ততক্ষণে আমবাগানে ঢুকে যাবে নয়ন। দেখা হবে না। নয়ন একটা শিস দিল। অবিকল দোয়েলের মত। বড় মিষ্টি ডাক পাখিটার। পরমুহূর্তে শ্বাস আটকে আটকে, পেটে খাঁজ ফেলে, কুঁজো হয়ে সে একবার দুবার কোকিল ডাকল। তার বড় প্রিয় ডাক।

মোনা ঠাকুরের বাগানের শেষে একটা ঝুপসী কামিনী গাছ ঝুঁকে তার ছায়া

ফেলেছে নীচের নাবাল মাঠটিতে। ছায়াটা অনেক লম্বা হয়ে গেছে।

ঐ মাঠ পেরিয়ে সেই আশ্চর্য চাষাটি আসবে। কামিনী ঝোপটার আড়াল থেকে রোজই তাকে দেখে তারা। তারা যে দেখে তা কি ও জানে না? জানে। জেনেও পাথর। পুরুষ নও নাকি? শরীরে তো মাংসের বাহার, মন কোথা? বাসনা কোথা? পুরুষ হবে পুরুষের মত, গনগনে আঁচ থাকবে তার, থাকবে কামনা। তা নয়, এ হচ্ছে গিয়ে মুক্তপুরুষ। ছেলে থাকলে আর জমি থাকলেই কি হল? মেয়েমানুষ চাই না? বাপু, তুমি হচ্ছ হিজড়ে।

একটু আগেই আজ এসে পড়েছে তারা। বেলা আছে। পশ্চিমে একটু ঘোলাটে ভাব বলে বেলা আন্দাজ পায়নি। কামিনী ঝোপটার আড়ালে দাঁড়িয়ে সে প্রজাপতিদের ওড়াউড়ি দেখে। ডাঁস, মশা আর আলোর পোকা উড়ে যাচ্ছে। ঝাঁক বেঁধে পিন্ পিন্ করে মশা মাথার ওপরে। কুয়ো থেকে কে জল তুলছে। ভরা বালতি থেকে ছলাৎ করে জল উপচে জলে পড়ল। পিছনে গাছের আড়াল আছে। তবু একটু সেঁটে দাঁড়ায় সে। বুকটা একটু একটু কাঁপে। কিশোরীর হৃদয় কাঁপবেই। মুখে একটু শোষভাব। কণ্ঠমণি ওঠানামা করছে। এই উত্তেজনাটুকু তার ভালই লাগে। নাবালের মাঠ দিয়ে মাটিমাখা প্রকাণ্ড মানুষটা রোজ যায়। হাত দশেক তফাত থাকে তারার শরীর থেকে। সেই দশহাত শূন্যতা জুড়ে কত ইচ্ছার ঢেউ তারা বইয়ে দেয় রোজ। সে কখনও ফিরেও দেখে না।

দোয়েলের একটা শিস্। তারা চমকায়! এত জোর ডাকল, কাছেই! পরমুহূর্তে তার কানের পর্দা ফাটিয়ে একটা কোকিল কাঁদে। ডাক নয়, যেন কান্না। বড্ড বুক-ভাঙা ডাক। মিতা বুঝি উড়ে গেছে কোথা!

ঝোপের ভিতর থেকে আস্তে মুখ বাড়ায় তারা।

লাফ দিয়ে একটা খন্দ পেরিয়ে হলুদ জামা পরা ছোকরাটা সামনে এল! লুকোবার সময় পেল না তারা! মুখটা টেনে নিল আড়ালে, কিন্তু ও দেখছে ঠিক। দাঁড়িয়ে গেল।

বোঝাটা হাতবদল করে ঝোপের ওপাশে একটু দাঁড়াল। তারার বুক ঢিপ ঢিপ করে!

একটা শ্বাস ফেলল ছেলেটা। তারপর চলে যাবে বলে পা বাড়িয়েও আবার ফিরে এল! বলল—দেখে ফেলেছি!

তারা চুপ!

—কী হচ্ছে এখানে?

—কিছু না! বাগানে দাঁড়িয়ে আছি! তারা অস্ফুট স্বরে বলে।

ছোকরাটা হাসে! বিচ্ছিরি হাসি ওর! বোঝাটা মাটিতে রেখে হাল্কা পায়ে বেড়ার কাছে আসে! তারা শ্বাস বন্ধ করে থাকে!

—বাগানে দাঁড়িয়ে থাকা, না আর কিছু?

—আর কী!

আচমকা ছেলেটা লাফ দিয়ে বেড়াটা পার হয়ে আসে! চেঁচাতে গিয়েও চেঁচাল না তারা। কী সাহস ওর।

boiRboi.net

ছেলেটার পায়ের শব্দ হয় না! বাতাসের ওপর চলে-ফেরে যেন! ঝোপটা ঘুরে মুখোমুখি চলে এল! মুখখানা দেখে আপনা থেকেই একটা ভয়ের চীৎকার গলায় উঠে আসছিল! সেটা সামলাল তারা! পেটের ভিতরটা গুর-গুর করে উঠল!

ছোকরাটার পিঙলে চুল বাতাসে উড়ো-খুড়ো হয়ে আছে। চোখের নীচে বসা কালি, কাটা ফাটা ঠোঁট, ভাঙা চোয়ালে রগ ফুটে আছে। চোখ দুটো লালচে, জ্বলজ্বলে। ওপরের পাতাটা আধবোজা। হঠাৎ বুক চমকে ওঠে দেখলে।

তারা এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলে—কী চান আপনি?

—সুকুল তোমাকে মা ডাকে কেন?

তারা ঢোঁক গিলল। কারও জানার কথা নয়। কেবল সুকুল জানে আর সে নিজে। আড়ালে সুকুলকে 'তারা-মা' ডাকতে শিখিয়েছে সে। বোকা ছেলেটা, পেটে কথা রাখতে পারে নি।

তারা বলল—কৈ না তো!

ছোকরাটা ঠোঁটে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব করে বলে—তোমরা মেয়েরা মিথ্যেবাদী। তুমি সুকুলকে মা ডাকতে শিখিয়েছ কেন?

—শেখাই নি, ও নিজেই ডাকে। তারা ভীষণ ভয় পেয়ে বলে।

—মিথ্যেবাদী। চাপা স্বরে বলে ছোকরাটা।

—না।

বাবা শুনলে হেঁটোকাঁটা ওপরকাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেলবে। তারা তাই কেবল বাতাস গিলল। ছেলেটার পিঙলে চুল ফণা ধরে আছে। মুখে না খেতে পাওয়া ভাব। শরীরটার তামাটে রঙ থেকে রাগের তাপ আসছে।

—সেজে-গুজে কার জন্য দাঁড়িয়ে আছ? জগদীশ?

তারা মাথা নাড়ে। কানের পুঁতির ঝুমকো দুটো গালে এসে ঝাপটা মারে। সে মাথা নেড়ে জানায়—না।

ছোকরাটা একটু হাসে। তারপর ঠান্ডা গলায় বলে—আমি জানি।

—কী জানেন?

—সব। যদি মোনা ঠাকুরকে বলে দিই তবে জগদীশ উচ্ছেদ হয়ে যাবে।

—যা জানেন তা ঠিক নয়।

—তোমরা মিথ্যেবাদী। মোনা ঠাকুর যখন বাণ মারে তখন কী হয় জান তো? মুখে রক্ত তুলে, দাপিয়ে মরে যায় তরতাজা মানুষ। জান?

তারা মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে থাকে।

—জগদীশেরও তাই হবে। ছোকরাটা হাল্কা স্বরে বলে।

—না।

—কী না? বলে এগিয়ে আসে ছোকরাটা।

বড়দি পালিয়ে গিয়েছিল একটা চামচিকের সঙ্গে। মোনা ঠাকুর হৈ-চৈ করে নি, পুলিশে খবর দেয় নি, খোঁজে নি। বিয়ের দু মাসের মাথায় মুখে রক্ত উঠে সেই চামচিকেটা মরেছিল। সবাই বলে, মোনা ঠাকুর বাণ মেরেছে। সেটা মিথ্যেও নয়। বাবা ঠিক বাবা নয় তারার কাছে। অন্য সকলের কাছে যেমন 'মোনা ঠাকুর' তার

boiRboi.net

কাছেও তেমনি। রহস্যময় এক শক্তির অধিকারী ভয়ংকর পুরোহিত। চতুর্দিকে বিস্তৃত তার সম্মোহন আকাশে বাতাসে জাল ছড়িয়ে রেখেছে। অদৃশ্য চক্ষু লক্ষ্য রাখছে সব দিকে। তারা নিথর হয়ে চেয়ে থাকে। বুকটা জ্বলে যায়। কোনদিকে পথ খোলা নেই।

ছোকরাটার শ্বাস মুখে পড়তেই চকিতে চট্‌কা ভেঙে মুখ তোলে তারা। কত কাছে এসে গেছে দেখ! মাগো! তারা পিছোতে যাবে ছেলেটা হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরল।

—পালাচ্ছ?

—এটা কী? ছাড়ুন। তারা ছটফট করে।

—আমি মোনা ঠাকুরকে বলে দেব।

—না।

ছোকরাটা হাসে। তারার হাতখানা নাকের কাছে তুলে গন্ধ শুঁকে বলে—তোমার গা পরিষ্কার, কোন গোটা নেই, মোলায়েম!

ঝট্‌কা দেয় তারা। কিন্তু হাত খসে না। সাঁড়াশীর মত ধরে রেখেছে।

ছোকরাটা আপন মনে বলে—প্রচুর ক্লোরোফিল তোমার শরীরে। তাজা ভিটামিন, আর ক্যালসিয়াম। দুরন্ত লিভার, আর হার্ট। তোমার কোন অসুখ নেই।

—ছাড়ুন। আমি চেঁচাব।

—না, চেঁচাবে না। খুন করে ফেলব। বলতেই তার চোখ ঝলসে ওঠে। স্তিমিত গলায় আবার বলে—তোমাকেও। জগদীশকেও! মোনা ঠাকুরের বাণে অনেক সময় কাজ হয় না। কিন্তু আমার বাণে হয়। আমি মানুষ মেরেছি তারা।

তারার চোখে পলক পড়ে না। দুরন্ত মুহূর্তগুলি কেটে যাচ্ছে। শরীরে একটা রক্তের হল্‌কা বয়ে যাচ্ছে।

ছোকরাটা হাতখানার গন্ধ আর একবার শুঁকল। তারপর বলল—তোমাকে আজ আমার একটা গোপন কথা বলে দিলাম। মানুষ মারার কথা। আজ অবধি আর কাউকে বলি নি।

পশ্চিম দিগন্তে একটা মলিন সূর্য ঝুলে আছে। ডুবে যাচ্ছে না। বাতাস বন্ধ। পৃথিবীতে সময় থেমে গেছে হঠাৎ। ছোকরাটা মুখ নামিয়ে আনে কাছে, চাপা গলায় বলে—যাকে একবার গোপন কথা বলে দেওয়া যায় তাকে আর বিশ্বাস করা চলে না। তোমাকে বিশ্বাস করি না আর। বুঝেছ?

আবার সোজা হয়ে দাঁড়ায় ছোকরাটা। কাঁধে ঝাঁকি দেয়। কাঁপনটা নিজের শরীরেও টের পেল তারা।

—আমি আবার আসব। হঠাৎ আসব। তোমাকে পাহারা দিতে। আমার গোপন কথাটা কাউকে বলেছ কিনা দেখতে আসব। বার বার। তোমাকে শান্তিতে থাকতে দেব না। আমি একবার যার পিছু নিই তার শান্তি থাকে না। বলে সে হাসে।

তারা অনেক কষ্টে অস্ফুট গলায় বলে—কী সব বলছেন!

সে কথায় কান না দিয়ে ছেলেটা পৃথিবীর রাজার মত গলায় বলে—আবার যখন

boiRboi.net

আসব তখন তোমার কাছে একটা জিনিস চাই।

—কী? ভয়ার্ত তারা জিজ্ঞেস করে।

—ক্লোরোফিল, কিংবা ক্যালসিয়াম, ভিটামিন কিছু একটা। ঠিক জানি না। অনেকদিন আগে আমি ডাক্তারী পড়তাম, সেকেন্ড ইয়ারে ছেড়ে দিই। সব ভুলে গেছি। কিছু একটা চাই যা আমাকে ঘুম পাড়াবে। বুঝেছ?

তারা কিছু বোঝে নি। তবু ছাড়া পাওয়ার জন্য মাথা নাড়ল।

—আজ আর সময় নেই। বলে হঠাৎ নিস্পৃহভাবে তারার হাতটা ছেড়ে দিল নয়ন। বলল—জগদীশ আমাকে চড় মেরেছিল একদিন, বুঝলে। আমাকে চড় মেরেছিল। যে আমাকে মারে তার ছাড় নেই! আমি ফিরব! বুঝলে! ফিরব।

ছোকরাটা ঘুরে চটপটে পায়ে আবার বেড়াটা ডিঙিয়ে গেল। ঝোলাটা তুলে নিল হাতে। একবারও ফিরে না তাকিয়ে জঙ্গল ভেঙে মিলিয়ে গেল।

তারা নিঝুম হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার নরম হাতখানায় পাঁচ আঙুল বসে যাওয়ার লালচে দাগ। ব্যথা করছে। চোখ ভরে টলটলে জল এল তার। তারপর হঠাৎ সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

দরগার পিছনের ঢিবিটা পেরোলে একটা বাঁশঝাড়। সেটা ডাইনে রেখে দু-কদম হাঁটলেই নাবাল মাঠটা দেখা যায়। বাঁয় উঁচুতে মোনা ঠাকুরের মন্দির। মাঠের শেষে রাস্তাটা ঘুরে গেছে।

দূর থেকেই দেখা যায়, রাস্তার বাঁকটাতে সুকুল দাঁড়িয়ে। এত বড় মাঠটা সামনে বলে সুকুলটাকে যে কী ছোট্ট আর একা দেখায়। শেষবেলার আলোয় এখন কুয়াশার ভাব। মাটি থেকে ধুলোটে অস্বচ্ছতা উঠে আসে। বড় আবছা চারদিক। বড় মায়াময়। এ সময়টায় আলো ক্ষয়ে গিয়ে পৃথিবীর ওপর একটা স্বপ্নের সর পড়ে। সত্যি নয় কিছু। আলো ক্ষয় হয় এ সময়ে। দূর থেকে সুকুলকে মনে হয় মাঠের ওপর একটা দাগ মাত্র। বুকটা ফাঁকা লাগে জগদীশের।

মাঠের মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে রোজ জগদীশ মন্দিরের দিকে হাতজোড় করে একটা প্রণাম ছুঁড়ে দিয়ে যায়। আজ দূর থেকে সুকুলকে দেখে বুকটা কেমন করল। মাঠখানা বুকে নিয়ে ছোট্ট সুকুল দাঁড়িয়ে। একা। বাবার জন্য চেয়ে আছে। মিথ্যে। বাবা কোথায় সুকুলের? তবে কি সবই এরকম? সাঁঝবেলায় সন্ধ্যের ঝুঁঝকো আঁধার যেমন স্বপ্নের সর তেমনি? বুকটা কেমন করল। জগদীশ আজ মাঠের মাঝখানে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল—কাছে যাই না মা, দোষ নিও না। তোমার মন্দিরের চারধারে লোকনিন্দের কাঁটাবেড়া। আমার যা হোক তা হোক, সুকুলকে দেখো। দেখ না, অভাগা ছেলেটা পৃথিবীতে কী রকম একা। মাঠ বুকে করে পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তো ওর কেউ না। জানে না তাই। এই মোহ চিরকাল রেখ মা। জগৎসংসারে মোহ ছাড়া মোয়া বাঁধে না।

কামিনী ঝোপটার আড়াল থেকে সাজপরা একখানা মুখ রোজই চেয়ে থাকে। লক্ষ্য করেছে জগদীশ। আজও করল। দেখি না-দেখি না করে রোজ পেরিয়ে যায় জায়গাটা যেমন পোড়ো জায়গা রামনাম করতে করতে পেরোয় ভীতু মানুষেরা।

জগদীশও পেরোয়। বন্ধনকে তার বড় ভয়। বাঁধা বাউণ্ডুলে ছিল সে। গাউস সাহেবের দলের সঙ্গে উজেন ভাঁটেন বয়ে যেত দেশ-দেশান্তরে। সেই জগদীশ এখন শিকড় ছেড়েছে মাটিতে। ভুঁই, ঘর, ছেলে। তবু কিছুই তার নয়, সে জানে। সুকুল একটু বড় হোক, হাত-পা ঝেড়ে আবার সে বেরিয়ে পড়বে। সংসারে তার এই স্থিতি বড় অদ্ভুত। ভাবলে রাতের ঘুম চটে যায়। চোখে জল আসে। জগদীশ এই স্থিতি চায় না। সংসারে থিতোবার লোক আছে, সে সেই লোক নয়।

পেরিয়েই যেত জগদীশ। কিন্তু বাগড়া দিল কান্নার শব্দটা। তারা কাঁদছে। জগদীশ একটা শ্বাস ফেলে। সুকুলকে গোপনে 'তারা-মা' ডাকতে শিখিয়েছে মেয়েটা। বোঝে জগদীশ সবই।

কী ভেবে দাঁড়িয়ে গেল জগদীশ। কান্না ব্যাপারটা ভাল না। বাড়াবাড়ি হচ্ছে। ঝোপের পাশে অবিরল ফোঁপানি। হেঁচকীর মত শব্দ হচ্ছে।

জগদীশ আস্তে করে বলল—ঠাকুর এসব দেখলে বড় রাগ করে। এ ভাল নয়।

ওপাশটা চুপ। ভীতু খসখসে একটা শব্দ হয়। শ্বাস চাপবার চেষ্টা হচ্ছে। তারপর হঠাৎ ছোট্ট একটা প্রশ্ন উড়ে আসে—কেন ?

জগদীশ বলে—মন চাইলেই কি সব হয় ?

—কেন হয় না ? আবার প্রশ্ন উড়ে আসে।

জগদীশ বিষণ্ণ ভাবে মাথা নেড়ে বলে—হয় না। মোনা ঠাকুরকে জিজ্ঞেস কর, তিনিই বলবেন—হয় না।

ওপাশটা একটু চুপ করে থাকে, কী যেন ভাবে। তারপর হঠাৎ ভারী ছেলেমানুষের মত প্রশ্ন করে—আপনি ব্রাহ্মণ না ?

জগদীশ হাসে—বামুন ঠিকই। হালদার বংশ। উপনয়নও হয়েছিল। শরীর খেলাতে গিয়ে সেই যে পৈতে ছেড়েছি, আর নেওয়া হয় নি।

—তবে বাধা কী ?

জগদীশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—বাধা অনেক। নীচু জাতে বিয়ে করেছিলাম বলে ব্রাত্যদোষ। তাছাড়া—

—তাছাড়া কী ?

—সুকুলের বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে। সতর্ক এবং বেদনার গলায় বলে জগদীশ। স্বরটা খুব নীচে নেমে আসে। তারপর মুখ তুলে বলে—ঐ সন্দেহ নিয়ে যে-ই আমার ঘর করতে আসুক, আমি তাকে সইতে পারব না।

—আমি কিছু ভাবি না।

জগদীশ তবু মাথা নাড়ে—গাঁয়ে পাঁচটা কথা উঠবে। লোকে ঘোঁট পাকাবে। গোলমাল হবে। মোনা ঠাকুর খুশী হবে না—

—আপনি বাবাকে ভয় পান ?

জগদীশ শ্বাস ছাড়ে, বলে—কে না পায় ?

—তবে কী উপায় হবে ?

—উপায় দেখছি না। বেঁচে থাকতে গেলে কিছু ছেড়ে কেটেই থাকতে হয়। অবস্থাটা মেনে নেওয়াই ভাল।

boiRboi.net

—যদি কলকাতায় পালিয়ে যাওয়া যায় ?

—উরেব্বাস !

—কেন, সর্বনাশ হয়ে যাবে নাকি ?

—হবে। মাটির গন্ধ না পেলে আমি থাকতে পারব না। মাটির বড় মায়া।

—আপনার আবার মায়া-দয়া !

একটা দীর্ঘশ্বাস উড়ে আসে।

সুকুল এতক্ষণে বাপকে নিরিখ করেছে। কোণাকুণি ছুটে আসছে এঞ্জিনের মত। জগদীশ বলল—যাই।

—আচ্ছা।

—এ রকম ভাবে থেক না। লোকে দেখলে কী বলবে ?

—আমি থাকব। রোজ। আমার ইচ্ছে।

জগদীশ মাঠের শূন্যতায় এগিয়ে গেল। দু-হাত বাড়ানো। শূন্যতাকে ভরে দিয়ে সুকুল আসছে। আসছে।

ভারী সাপটাকে বয়ে আনতে কষ্ট গেছে খুব। পাকা সাপ, থলথলে চর্বি বোধ হয় গায়ে। নয়ন ঝাঁপি খুলে দেখে নি। কিন্তু মাঝে মাঝে ঝাঁকুনী দিয়েছে। অমনি ভিতর থেকে প্রবল শ্বাসের শব্দ পেয়েছে। দাঁতে দাঁত টিপে এক ধরনের হাসি হেসেছে সে। ভীতু একটা জ্বালাময় আনন্দ।

সন্ধ্যের বাসটা পেল নয়ন। পায়ের কাছে সারাক্ষণ ঝাঁপিটা সতর্ক পাহারা দিল, যেন পাহারা না দিলে মূল্যবান ঝাঁপিটা কেউ চুরি করে নেবে। মাঝে মাঝে ঝুড়িটায় লাথি মারল। শ্বাসের শব্দ পেল। পাশে বসা একটা মানুষ একবার জিজ্ঞেস করল—কী আছে ওটাতে ?

নির্বিকার গলায় নয়ন জবাব দিল—একটা গোখরো সাপ।

—সাপ ! লোকটা চমকে উঠে পড়ে, বলে—কী সাংঘাতিক !

মানুষজন তার দিকে কৌতূহলে তাকায়। ঝুড়িটা অনেকে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করে।

দূর-পাল্লার বাস বলে সিগারেট ধরালে কেউ কিছু বলে না। নয়ন কাউকে গ্রাহ্য না করে বাইরের দিকে চেয়ে সিগারেট ধরায়। তারপর একমনে সিগারেট টেনে যায়। বাইরে ভিতরে একটা তীব্র ছটফটানি তার। হাত-পা একভাবে রাখতে পারে না। এ পাশ ও পাশ হয়। বিড় বিড় করে নিজেকে বলে—সব প্রতিশোধ নেওয়া হয়ে গেলে ঘুম আসবে। ঠিক ঘুম আসবে।

বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গেল। সদর বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু সেটা কোন বাধা নয়। সদর দিয়ে সে কদাচিৎ বাড়িতে ঢোকে। আজও ঢুকল না। গলির দরজা টপকে ঢুকল। ঝাঁপিটার জন্য কষ্ট হল খুব। ঝাঁকুনি খেয়ে ব্যাটা ভিতরে গজরাচ্ছে। কর্কশ দেওয়ালের ঘষাটায় কনুইটা ছড়ে গেল অনেকটা। কিছুই গ্রাহ্য করল না সে। ভিতরের দরজা খুলে দিল রাঁধুনি লোকটা। দরজা খুলে তাকে দেখেই সন্ত্রস্ত ভাবে সরে গেল। গলাখাঁকারী দিয়ে বলল—বাবুর বড় অসুখ।

boiRboi.net

—কার ?

—বড়বাবুর।

—ও। বলে নির্বিকারভাবে নিজের ঘরে গেল সে। সে থাক বা না-থাক তার বিছানা পরিপাটি পাতা থাকে রোজ। খাওয়ার ঘরে খাবার ঢাকা থাকে। এই নিয়ম করে রেখেছে মা। বেশী রাতে ফিরলেও কোন অসুবিধে হয় না।

ঘরে ঢুকে ঝাঁপিটা যত্নে খাটের তলায় রেখে জামাটা খুলে শুয়ে সে সিগারেট ধরাল। কার অসুখ যেন বলছিল লোকটা!

উঠে আবার খাওয়ার ঘরে এল। বারান্দায় জল আর ঝাঁটার শব্দ হচ্ছে!

—কার অসুখ বললে ?

—বড়বাবুর।

—কী হয়েছে ?

—কী জানি! অজ্ঞান মত হয়ে আছেন কাল থেকে। মা বলেছে আপনি এলেই খবর দিতে।

দোতলায় সিঁড়ির তলায় একবার দাঁড়াল নয়ন। সিঁড়ির বাতি নেভানো। ওপরটা নিস্তব্ধ। সিঁড়ি ভাঙতে তার ইচ্ছে করছিল না। বাবার জন্য তেমন কিছু উদ্বেগও বোধ করল না সে। কোন দিনই করে না।

সিঁড়িতে গোটা দুই বেড়াল শুয়ে। একটুক্ষণ বেড়ালের ঘুম দেখল সে। বাবা এই রাতে মারা গেলে শ্মশান-ফশানে যাওয়ার ঝামেলা অনেক। ভেবে সে একটু বিরক্ত হল। মরেফরে যাওয়াটা যে সংসারে কেন আছে! এগুলো উঠে গেলেই ভাল।

আবার ঘরে এসে সে বাতি নিভিয়ে শুয়ে জেগে থাকে। তারপর হঠাৎ উঠে বাতিটা জেবলে ঝাঁপিটা বের করে।

একটা কপিশ শরীর পাকে পাকে জড়িয়ে আছে। দেখলে গা শির শির করে। নিঝুম হয়ে পড়ে আছে সাপটা। হাতটা একবার বাড়াল নয়ন, তার হাতের ছায়া পড়ল সাপটার মুখে। সাহস পেল না সে, হাতটা আবার সরিয়ে আনল।

একটা স্কুটার ছিল নয়নের। স্কুলের শেষ পরীক্ষায় খুব ভাল রেজাল্ট্ করেছিল বলে বাবা কিনে দিয়েছিল। সেই স্কুটারটা নয়ন চালাত ঝড়ের মত। হাল্কা জিনিস, চীৎপুরে একবার রাস্তার গর্তে ঝাঁকুনি খেয়ে নিয়ে ওল্টায়। দ্বিতীয়বার একটা ট্রামকে টপকে যেতে গিয়ে ভবানীপুরে একটা স্টেটবাসের পিছনে ভিড়িয়ে দেয় নয়ন। তিন-বারের বার বর্ষাকালের জলে-ডোবা লাইব্রেরী রোডে সেটা পড়ে যায় আধখোলা ম্যানহোলের ভিতরে। জখমটা গুরুতর হয়েছিল। কালীঘাটের একটা গ্যারেজে দিয়েছিল, সেখানে আজও পড়ে আছে। আনা হয় নি। স্কুটার আর ভাল লাগে না নয়নের। যদি কখনও কেনে একটা স্পোর্টস্ কারই কিনবে নয়ন। বাবা মরে গেলে কিনতে কোন ঝামেলা হবে না। একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড এম-জি স্পোর্টস্ কার দেখেও রেখেছে নয়ন।

স্কুটার যখন চালাত তখনকার একজোড়া চামড়ার দস্তানা আর গগল্স্ আলমারিতে পড়ে আছে। নয়ন উঠে গিয়ে আলমারি খুলে দস্তানা জোড়া বের করে আনল। দস্তানাটা পুরু, দু পাল্লা চামড়ার মাঝখানে তুলোর গজ ভরা। সে দুটো হাতে পরে

নিল সে। তারপর সাপের ঝুড়িটার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসল। তেমনি নিঝুম পড়ে আছে সাপটা। মাথাটা ছোট্ট দেখাচ্ছে। কী করে ফণাটা মুহূর্তের মধ্যে অতটা চওড়া করে ফেলে!

নয়ন হাতটা বাড়াল। মাথাটার এক বিঘৎ দূরে হাতটা নিয়ে গেল সে। হাতের ছায়াটা নাড়তে লাগল সাপের মুখের ওপর। তারপর চকিতে আঙুল বাড়িয়ে একটা খোঁচা দিল সে। সাপটা নড়ল না। নড়লে কী হবে তা নয়ন ভাবে না। কাছাকাছি জগদীশ নেই, সে একা। তবু নয়ন আবার আঙুলের খোঁচা দিল। আবার।

চমকে মুখ তোলে সাপ। ছোট্ট মাথাটার দু পাশে ছড়িয়ে যায় হাতের পাতার মত ফণা। শেকড়ের মত ছোট্ট জিবটা বেরিয়ে আসে। বারবার। ঘন শ্বাসের শব্দ। একটু দোলে। ছোবল দেবে নাকি?

সাপটার উদ্ধত আক্রমণাত্মক ভঙ্গীটা দেখে নয়ন। চোখ ভরে দেখে। যা কিছুটা ভয়ংকর তা-ই তার প্রিয়। দস্তানা পরা হাতটা সন্তর্পণে বাড়ায় সে। কিছু বুঝবার আগেই সাপটা চাবুকের মত মুখটা আছড়ে ফেলে নয়নের হাতের ওপর। দস্তানা পরা হাত, তাই কিছুই টের পেল না নয়ন। কিন্তু খুব চমকে গেল। সাপ যে কতটা গতিময়, কী মারাত্মক তার চকিত আক্রমণ তা টের পায়, এই গতিটাই নয়নকে ভারী অবাক করে। জগদীশ এর চেয়েও দ্রুতবেগে হাত বাড়ায়, এবং হাত সরিয়ে নেয়। নয়নকে শিখতেই হবে।

কিন্তু সাপটা আর ছোবল দেয় না। সে হয়তো নিজের বিষদাঁতহীন অক্ষমতা বুঝতে পারে। তাই মাথাটা নামিয়ে শরীরটাকে জলধারার মত স্বচ্ছন্দে ঝুড়ির কানার ওপা দিয়ে টেনে মেঝের ওপর দিয়ে আঁকা-বাঁকা হয়ে চলতে থাকে। সাপটা যে কত বড় তা এই প্রথম বুঝতে পারে নয়ন, ফলে তার গায়ে কাঁটা দেয়।

সাপটা নয়নের দিকে ফিরেও তাকায় না। প্রথমে আলনার তলা, তারপর আবার ঘুরে খাটের নীচের অন্ধকারে যেতে থাকে। নয়ন একটু স্তব্ধ থাকে। তারপরই দাঁতে দাঁত টিপে নিজের কাঁপা শরীরকে সামলে হাত বাড়িয়ে খাটের তলার অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে এগোয়। সাপটা অবার পাকে পাকে শরীর জড়াচ্ছে। সন্তর্পণে নয়ন হাত বাড়ায়। সাপটা মুখ তোলে, শ্বাস ফেলার মত শব্দ করে নয়নকে সতর্ক করে দেয়। নয়ন থেমে যায়। ওর দ্রুতবেগটাকেই নয়নের ভয়।

উদ্যত হাতটা বাড়িয়ে রেখেই নয়ন খর চোখে সাপটাকে দেখে। সাদা বুকটা তুলে, ফণা মেলে সাপটাও দেখে নয়নকে। নয়ন হাসে। তারপর নয়নের হাতটাই সাপটাকে অবিকল সাপের মত ছোবল দেয়। গলার নীচে চেপে ধরে সাপটাকে হিঁচড়ে নিয়ে আসে সে। ছট্‌ফট্‌ করে সাপটা, সমস্ত শরীর আছড়ায়। নয়নের হাতটা পাকে পাকে জড়াতে থাকে।

হঠাৎ সমস্ত বুক পেট জুড়ে একটা বমির ভাব আসে নয়নের। ঘেন্নায় শরীর রী রী করে। সাপের ঠাণ্ডা শরীরের স্পর্শ তার হাতটাকে হিম করে দেয়। পাগলের মত সে হাত ছুঁড়ে, ঝাঁকুনি দিয়ে ঝেড়ে ফেলে দেয় ওটাকে, তারপর হাঁফাতে থাকে।

সাপটা মেঝেময় ছড়িয়ে কিলবিল করে। তারপর আবার ঝাঁপিটার পাশ দিয়ে খাটের তলায় চলে যেতে থাকে।

boiRboi.net

নয়ন দৌড়ে বাথরুমে গিয়ে ঢোকে, দস্তানা খুলে গলায় আঙ্গুল দেয়। বেসিনে উপুড় হয়ে হড় হড় করে বমি করে। টক-তেতো স্বাদ, শরীরটা কাঁপতে থাকে।

মুখে চোখে জল দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই সে টের পেল, মাথায় ভয়ংকর যন্ত্রণা হচ্ছে। চোখ খুলতে কষ্ট হচ্ছে ভীষণ। শরীরটা যেন বাতাস দিয়ে তৈরী, এমন হাল্কা লাগে।

দেয়াল ধরে ধরে ঘরে এল নয়ন। টেবিল হাতড়ে সোনেরিলের কৌটোটা বের করল। একসঙ্গে তিনটে কি চারটে—না গুণে মুখে নিয়ে জল দিয়ে গিলল। সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় আধশোয়া হয়ে কিছুক্ষণ সিগারেট খেল।

একটা ঝিমুনির ভাব আসছে। একটু পরেই সে ঘুমিয়ে পড়বে। এক আধবার সাপটার কথা মনে হয় নয়নের। ভাবে উঠে গিয়ে ওটাকে ঝুড়িতে ভরে রাখা উচিত। কিন্তু শ্লেটের ওপর লেখা যেমন মুছে যায় তেমনি নানা হিজিবিজি চিন্তা স্বপ্নের মত চোখের সামনে এসে যায়। সাপটার কথা খেয়াল থাকে না। হাতটা বিছানার বাইরে এলিয়ে পড়ে আছে, দু আঙ্গুলে ধরা সিগারেটটার ছাই লম্বা হয়ে ঝুলে আছে, মাথা ভর্তি স্বপ্ন, চোখ জুড়ে আসছে······

ঘুমিয়েই পড়ত নয়ন। দরজার মৃদু শব্দ শুনে চোখ কষ্টে খোলে সে।

—কে রে ?

নতুন চাকরটা ঘরে উঁকি দেয়—দাদাবাবু বড়বাবুর অবস্থা খারাপ। মা আপনাকে ওপরে ডাকছেন।

নয়ন প্রথমটায় বুঝতে পারে না, জিজ্ঞেস করে—কার অবস্থা খারাপ বল্‌ছিস ?

—বড়বাবুর, আপনার বাবা মশাইয়ের।

—ও, মাথাটা একটু ঝাঁকায় নয়ন। তারপর উঠে বসে বলে—কী হয়েছে ?

—কী জানি, অবস্থা কাল থেকেই খারাপ যাচ্ছে। খুব অসুখ। নয়ন উঠল। খুবই ক্লান্ত লাগছে তার। সোনেরিল খাওয়ার পর শরীরটা একরকম নেশায় ভরে ওঠে। নড়া চড়া ভাল লাগে না। তবু সিঁড়ি ভেঙে ওপরে বাবার ঘরে এল সে।

খুব মৃদু নীল ঘুম-আলো জ্বলছে ঘরে। প্রকাণ্ড মেহগিনির পালঙ্কের ধারে টেবিল, তাতে ওষুধপত্র রাখা। পালঙ্কের নীচে সাদা বেডপ্যান, জলের বালতি। ঘরে ওষুধের গন্ধ। উঁচু বালিশে মাথা রেখে নয়নের বাবা শুয়ে। শরীরটা স্থির নয়। ডান পাটা ক্রমাগত নড়ছে, ডান হাতটা কপালের কাছে উঠে যাচ্ছে বার বার।

নয়ন দরজা থেকে তিন চার পা হেঁটে বাবার বিছানার কাছে দাঁড়াল। শিয়রের কাছে মা বসে আছে। মা জিজ্ঞেস করল—খেয়েছিস ?

গলাটা ভাঙা। বোধ হয় খুব কেঁদেছে মা, নয় তো ঠাণ্ডা লাগিয়েছে, মার কথার জবাব না দিয়ে নয়ন জিজ্ঞেস করে—কী হয়েছে ?

—কী জানি, পরশু রাতে খাওয়ার আগে বাথরুমে গিয়েছিল, হঠাৎ দৌড়ে ফিরে এল, কী যেন সব আবোল তাবোল বলল, শুয়ে পড়ল হঠাৎ। ডাক্তাররা তো স্পষ্ট করে কিছু বলে না। তবে শিরা থেকে রক্ত নিয়ে গেছে পরীক্ষা করতে।

নয়ন বলল—জ্ঞান নেই ?

—না তো। কোন সাড়া দিচ্ছে না।

boiRboi.net

নয়ন ভীত চোখে চেয়ে বলে—তবে ডান পাটা নড়ছে কেন ?

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—কে জানে ! ক্রমাগত নড়ছে। দিনরাত কামাই নেই। কী যে হবে। তুই খাস নি ?

—না।

—খেয়ে নে।

—নিচ্ছি, রাতে তুমি জাগবে নাকি।

—না, নার্স রাখা হয়েছে। এক্ষুণি এসে পড়বে। তুই খেয়ে নে যা। ঘুম থেকে উঠে কোথাও যাস না সকালে, কখন কী হয়।

নয়ন বাবার দিকে একটু চেয়ে রইল। জ্ঞান নেই, সাড়া নেই, তবু দুটো অঙ্গ নড়ছে। ডান পা, ডান হাত, লক্ষণটা একটু চেনে নয়ন।

হঠাৎ জিজ্ঞেস করল—পিত্তের বমি হয়েছিল ?

মা একটু থমকে গিয়ে বলে—হয়েছিল।

—কখন ?

—একটু আগে। কেন ?

নয়ন মার দিকে একটু চেয়ে রইল। আবছা আলোয় ভাল দেখা যায় না। শিয়রের কাছে খাটের বাজুতে পিছনে হেলে বসে আছে মা। শরীরটা মোটা, নড়াচড়া করতে কষ্ট হয়। তার ওপর মোটা, ভারী সব গয়না, আঁচলে আধকেজি ওজনের এক থোলা চাবি। এসব নিয়েই একটু পরে গড়াগড়ি খেয়ে কাঁদতে হবে। পরণে চওড়া পাড়ের শাড়ি, সিঁথেয় সিঁদুরের দাগে ঘা···নয়ন বাবার দিকে চেয়ে মনে মনে বলে—গুডবাই স্যার, আর দেখা হচ্ছে না তাহলে !

—যাচ্ছি।

মা জিজ্ঞেস করে—ঐ বমি হলে কী হয় ?

—কী আবার হবে ?

—তবে জিজ্ঞেস করলি কেন ?

—এমনিই।

—তুই তো ডাক্তারী একটু শিখেছিলি, বুঝিস না অবস্থাটা ?

—আমার বোঝাবুঝি দিয়ে কী হবে, বড় ডাক্তার দেখছে যখন !

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর বলে—যা খেয়ে নে।

নয়ন নেমে আসে। রাঁধুনি খাওয়ার ঘরে অপেক্ষা করছে। খাওয়ার টেবিলে আরো একজন বসে খাচ্ছে। কালোমত একটি মেয়ে। খুব সাধারণ চেহারা, রোগা, না তাকালে কিছু এসে যায় না। মেয়েটা তাড়াহুড়ো করে শেষ কয়েকটি গ্রাস খাচ্ছিল।

নয়ন মুখোমুখি বসল। বলল—ব্যস্ত হবেন না, আস্তে খান।

মেয়েটা মুখ তুলে অপ্রতিভ গলায় বলে—আমি গেলে আপনার মা শুতে যাবেন। ওঁরও শরীরটা···

নয়ন একটু হাসে—শুয়ে আর কী হবে ? রাত পোয়াবে না। নার্স মেয়েটা চুপ করে থাকে

boiRboi.net

—খান।

মেয়েটা খায়!

রাঁধুনি প্লেটে খাবার সাজিয়ে আনে নয়নের জন্য। নয়ন একটু নাড়াচাড়া করে। দু একগ্রাস খায়, মেয়েটা উঠে যাওয়ার আগে একবার সন্তপর্ণে নয়নের দিকে তাকাল। নয়ন একটু হাসল। বন্ধুত্বের হাসি!

আঁচিয়ে ঘরে এসে আরো দুটো সোনেরিল গেলে নয়ন। সিগারেট ধরায়। বিছানার দিকে যেতে গিয়ে হঠাৎ তার সাপটার কথা মনে পড়ে। নীচু হয়ে খাটের তলাটা দেখে সে। নিঝুম হয়ে খাটের নীচের আবছায়ায় পড়ে আছে লক্ষ্মীছেলের মত। নড়ে নি।

নয়ন একটা হাই সামলায়! দস্তানা জোড়া খুঁজে হাতে পরে নেয়। তারপর খাটের তলায় হাত বাড়ায়।

বিরক্ত হয়ে ছিটকে ওঠে সাপটা। কিন্তু নির্বিষ অক্ষম তার আক্রোশ। মুহুর্মুহু কয়েকবার সে নয়নের হাতে মাথা কোটে। চুম্বনের মত তা নয়নের হাত ছুঁয়ে যায়। নয়ন আর ভয় পায় না। দ্বিধা বোধ করে না। হিংস্রতরতায় দুটি হাতে সে গলা টিপে সাপটাকে টেনে এনে মেঝেতে ছেড়ে দেয়।

সাপটা তার ফণা তোলে। নয়নের কোমর সমান সমান বা তার চেয়েও উঁচুতে। নয়ন সেই উদ্যত মুখে ঠাস করে একটা চড় মাড়ে। সাপটা ঢলে পড়ে আবার চিতিয়ে ওঠে। আক্রোশে রাগে হিংস্রতায় তাকে পর পর কয়েকটা চড় দেয় নয়ন। বলে—শুয়োরের বাচ্চা, ঢোক্ ঝাঁপিতে, ঢোক্…তোর বাবা ঢুকবে…

বলে মাথাটা চেপে ধরে নয়ন মেঝেতে ঠুকে দেয়। লেজ ধরে তুলে প্রায় আছাড় মারে। কেন যে এই আক্রোশ তা বুজতে পারে না সে, কিন্তু তীব্র জ্বালাময় আনন্দ বোধ করে। সাপটা কী বোঝে কে জানে! অবশেষে তাকে ঝাঁপিতে পাকিয়ে রাখে নয়ন। তার শ্বাস, জিব, চোখ—কোন কিছুকেই গ্রাহ্য করে না।

ঝাঁপিটা বন্ধ করে দড়ি দিয়ে বাঁধে। তারপর খাটের তলায় সেটা ঠেলে দিয়ে বিছানায় বসে। সিগারেটটা আড় করে খাটের রেলিঙে রেখে দিয়েছিল। সেটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে কাঠ ধরে ফেলেছে। রেলিঙের কাঠ জ্বলে গেছে অনেকখানি, ধোঁয়াচ্ছে। সিগারেটটা তুলে নিয়ে খাটের পোড়া জায়গাটায় একবার আঙুল ঘষল নয়ন। আধশোয়া হয়ে সিগারেট টানতে লাগল। শরীর জুড়ে ক্লান্তি নেমে আসছে অন্ধকারের মত।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে নয়নের চোখে স্বপ্ন ভেসে বেড়ায়। সে জগদীশকে দেখতে পায়। একটা প্রকাণ্ড বাগানে ফুল তুলছে। বাঁ হাতে একটা সাজি। ফুল তুলে সাজিতে রাখছে জগদীশ। কিন্তু সাজিতে রাখা ফুল সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাচ্ছে সাপ। সাজি থেকে অজস্র সাপের ফণা উঁচু হয়ে আছে। দেখতে দেখতে অন্ধকারটা চলে এল। সোনেরিলের ঘুম।

boiRboi.net

বিকেলে বেরোবার মুখে শ্যামার বাবা ধুতি পাঞ্জাবীর ওপর শালটা ঘাড়ে নিয়ে, হাতে চমৎকার লাঠিগাছটা একবার নামিয়ে বেরোতে যাচ্ছে সেই সময়ে কাণ্ডটা ঘটল।

বাইরের সিঁড়িতে পা রেখেছে মাত্র, সেই সময়ে দেখা গেল একটা লোক সিঁড়ির মুখেই ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে হাফশার্ট আপ পরণে খাকী প্যাণ্ট, পায়ে কেড্‌স্‌। চোখমুখ ফোলা ফোলা, চোখ লাল, মাথাটা জুতোমারা মাথার মত উলোঝুলো, ধুলোটে। চুর-চুর মাতাল লোকটা শ্যামার কাকা তড়িৎ চৌধুরী। বংশের কুলাঙ্গার। পরিবারে এমন কেউ নেই যে তাকে না সমঝে চলে।

শ্যামার বাবা ভূত দেখার মত চমকে সিঁড়ি থেকে পা তুলে নিল। মাতাল অবস্থায় না থাকলে তড়িৎ চৌধুরীকে ভয়ের কিছু নেই, কিন্তু এই অবস্থায় তার ভিতরকার সব জমে থাকা কথা ওগড়ায়। শ্যামার বাবা বুঝল তার ভাই এখন ওগড়াবে। সিঁড়ি থেকে পা তুলে ভিতরে চলে এল, সদরটা বন্ধ করতে করতে টের পেল, তার হাত কাঁপছে, বুকে বেড়ে যাচ্ছে রক্তচাপ, মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌। দরজা বন্ধ করতে করতেই শুনল মাতাল হারামজাদা চেঁচিয়ে বলছে—ঐ যে শালা সরিৎ চৌধুরী দরজা দিচ্ছে, ঐ যে শালা বেওয়া বিধবার জমি খাস দখল করেছে যে ব্যাটা···

চেঁচামেচিটা শুনতে পেল শ্যামাও। সোয়েটারটার শেষ কয়েকটা কাঁটা বোনা এখন বাকী। দিনরাত কদিন ধরে বুনছে শ্যামা। ফুলহাতা সোয়েটার, উঁচু গলা, তার ওপর প্যাটার্নটাও গোলমেলে—বড্ড পরিশ্রম গেছে। পিঠ টন্‌টন্‌ করে, চোখে ঝাপসা দেখে, মাথা টিপ্‌টিপ ব্যথা করে। তবু শেষ হয়ে আসছে বলে হাত থামায় নি শ্যামা। আজ রাতে বাবাকে পরিয়ে দেখবে। দেয়ালে হেলান দিয়ে নিজের বিছানায় বসে সে বুনতে বুনতে হঠাৎ চীৎকারটা শুনতে পেল। হাত কেঁপে একটা ঘর গেল পড়ে। কাকার গলা। মাসে দু মাসে এক একদিন কাকা এরকম মাতাল হয়ে আসে, বাইরে দাঁড়িয়ে চেঁচায়, রাস্তার লোক পাড়ার লোক জড়ো করে গালমন্দ পাড়ে। সেইসব গালমন্দের কোন মানে হয় না। কাকা লোকটা হাইকোর্টে ফোলিও টাইপ করে। বাঁধা মাইনে নয়। ফোলিওর ওপর কমিশন পায়। তার বৌ থাকে বাপের বাড়িতে, কাকার বিধবা শাশুড়ি মেয়েকে নিজের বাড়িতে একখানা বারান্দা সমেত ঘর লিখে দিয়েছেন, পাছে সেটা ভাইরা বেহাত করে সেই ভয়ে। তা ছাড়া কাকার সঙ্গেও বনিবনা নেই, সেই বৌ স্কুলে চাকরি করে দুটো ছেলেমেয়েকে খাওয়ায়। কাকা গলা পর্যন্ত মদ গিলে যখন দুঃখবোধ করে তখন দাদার বাড়ির সামনে বা শ্বশুর বাড়ির সামনে গিয়ে চেঁচায়; শ্যামার বাবার অপরাধ টালিগঞ্জে যে জমিটায় বাড়ি তুলছে সেটা কাকার শাশুড়ির কাছ থেকে সস্তায় কেনা। খাটাল ছিল, সেটা তুলে দিয়েছে শ্যামার বাবা। কাকার বিশ্বাস জমিটা বাবা না কিনলে শাশুড়ি সেটা কাকার নামে লিখে দিত। এক কময়ে কাকার সঙ্গে একান্নবর্তী পরিবারে থাকত শ্যামারা, নয়নদের পাড়ায়। সে সময়ে কাকার সঙ্গে নয়নের খুব ভাব ছিল। আজও আছে কিনা কে জানে! শ্যামা পরিষ্কার শুনতে পায় কাকা চীৎকার করে বলছে—আমার

বৌকে কানমন্তর দিয়ে ভেন্ন করেছে কোন্ শালা ঐ সরিৎ চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করুন আপনারা। বুকে হাত দিয়ে বলুক ঐ ব্যাটা আমার বৌকে বলেছে কিনা—বৌমা, মাতালটার ঘর কোরো না তুমি! বলেছে কিনা…! পাপ করেছে বলেই ওর ছেলে পাগল হয়ে বেরিয়ে গেছে, ওর শান্তি আছে? শালা সাধু-তান্ত্রিকের পেছনে পয়সা ঢালে, মায়ের পেটের ভাই আমি পেটে আলসার হাতে বাত নিয়ে নুলো হয়ে যাচ্ছি, আমাকে একটা পয়সাও ছোঁয়ায় না…

পড়ে-যাওয়া ঘরটা সাবধানে কাঁটায় ফের তুলল শ্যামা। এখন আর বোনাটা এগোবে না। কাঁটা মুড়ে রেখে ওঠে শ্যামা। বাইরের ঘরে বাবা চেয়ারে বসে ঘামছে, পাশে দাঁড়িয়ে মা। পাখাটা পুরো জোরে ঘুরছে। রক্তচাপটা বিপজ্জনক সীমানাতেই ঘোরাফেরা করে বাবার। কখন যে সীমাটা ছাড়িয়ে যায় শ্যামার সেই ভয়!

শ্যামা একটু হেসে বলে—বাবা, অমন করছ কেন? কাল তো আমরা মুর্গী খাচ্ছিই।

কাকা যেদিন গালমন্দ করে তার পরদিন সকালে মুর্গী হাতে এসে বাবার পায়ে পড়ে। তারপর কেটেকুটে বাড়ির পাশের গলিটায় স্টোভ জেলে নিজেই রান্না করে। নুন ছাড়া খানিকটা তুলে রাখে বাবার জন্য! মা খায় না, বাকীটা কাকা আর শ্যামা খায়। এটাও নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। কাকা গাল দিলে পরদিন মুর্গী হবেই।

—আর মুর্গী! বাবা, অসহায় ভাবে মুখখানা তুলে বলে। শ্বাস ছেড়ে বলে—কী পাপে যে ওর শাশুড়ির জমিটা কিনেছিলাম!

মা ঝাঁঝ দিয়ে বলে—কেন কিনে দোষটা কী করেছে শুনি! ঠাকুরপোর শাশুড়ি জমিটা তো বেচতই।

বাবা লালচে মুখখানা তুলে বলে—বেচত তো বেচত! আমি নিমিত্তের ভাগী না হলেই হত। ভেবে দেখ, আমার বাড়ি করার তো কোন অর্থ নেই। আমরা বুড়োবুড়ি চোখ বুজলে ও বাড়িতে থাকবে কে?

মা হঠাৎ চুপ করে বাবার দিকে সোজা একটু চেয়ে থাকে, তারপর জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে চোখ, খ্যাপাটে গলায় বলে—বাড়িতে থাকবে কে! কেন আমার টোকন ফিরবে না ভেবেছ? তোমার ধারণা কি যে আমার টোকন নেই? অ্যাঁ!

বাবা ইতস্তত করে বলে—সে কথা বলি নি। আঃ, তুমি বড্ড কথা ঘোরাও, বলছিলাম কি—

—তোমার কথা আমি সব বুঝি।

শ্যামা নিঃশব্দে গিয়ে সদরের ছিটকিনিটা খুলল! মা বাবা ঝগড়া করছে, তাই লক্ষ্য করল না।

রাস্তায় বিকেলের ভরভরন্ত আলো। কাকা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে, তার চারধারে লোক জমেছে। ওধারের পার্কে খেলা হচ্ছিল, খেলা ভেঙে এসেছে কয়েকটা ছেলে, জুটেছে কিছু ভবঘুরে, কিছু ঝি-চাকর শ্রেণীর লোক। কাকা শ্রোতা পেয়ে ডিঙ মেরে যতদূর সম্ভব উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে বুক চিতিয়ে বলছে—শালা আমার বৌকে যেমন ভেন্ন করেছে তেমনি ওর বৌ-মেয়েও ভেন্ন হবে। আমার শাশুড়িকে ভজিয়ে যে জমি দখল

boiRboi.net

করে বাড়ি তুলছে সেখানে ইঁদুর বাদুড় ঘুরবে, শকুন পড়বে···

কাকা যখন এরকম অবস্থায় এসে চেঁচায় তখন শ্যামাদের বাড়ির কেউই বাইরে বেরোয় না। তাদের ভয় করে। তবু বাবার প্রেসারের কথা ভেবে ক্ষণেকের জন্য শ্যামা ভয় ভুলে গেল। বারান্দার রেলিঙ থেকে ঝুঁকে ডাকল—কাকা।

কাকা তখন স্বরচিত একটা ছড়ার মতো অনর্গল বকে যাচ্ছে—এই আমি তড়িৎ চৌধুরী ঐ শালার মায়ের পেটের ভাই, কিন্তু আমার শালা গো-ভাগাড়ে ঠাঁই। আই হ্যাভ এ পুওর বেলী, মনের দুঃখে মদ গিলি। মশাইরা···বলতে বলতে শ্যামার ডাক শুনে তড়িৎ চৌধুরী ব্রেক কষে তাকাল। তাকিয়েই রইল শ্যামার দিকে, মুখখানা একটু হাঁ করে। তারপর বলল—কী বলছিস ?

—ভিতরে এস।

—না।

—না কেন ? যা বলার বাবাকে মুখোমুখী বল। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ?

—আলবৎ চেঁচাব। তোর বাবাকে বেরিয়ে আসতে বল। বলে তড়িৎ চৌধুরী শ্যামার দিকে পিছন ফিরে আবার চেঁচাতে শুরু করে—মশাইরা শুনন···ঐ যে আমার ভাইঝি শ্যামা···ও নয়ন নামে একটা ছেলেকে ভালবাসে···ডীপ লাভ, ভেরী ডীপ লাভ···কিন্তু চামার সরিৎ চৌধুরী তবু বিয়ে দেবে না। কারণ কি জানেন ? ছেলেটা তেলী···হা হা···তেলী ! তেলী আবার কী মশাইরা, অ্যাঁ ! মানুষ মানুষ, তার আবার তেলী বামুন কিছু আছে নাকি আজকাল ? মেয়েটা ভিতরে ভিতরে শুকিয়ে একদিন মরবে, ছেলেটা আত্মহত্যা করবে দেখবেন। ঐ যে আমার ভাইঝি, ঐ শ্যামা, ওটার বিয়ে হবে না···

রাস্তার লোকেরা শ্যামার দিকে চেয়ে আছে। সচেতন হয়ে শ্যামা সেটা বুঝতে পারে। লজ্জায় অপমানে ঝাঁ ঝাঁ করে তার মুখ। দেওয়ালের আড়ালে সরে আসে শ্যামা। মুখ লুকিয়ে পালিয়ে আসে ঘরে। থরথর করে তার শরীর কাঁপে।

আধঘণ্টাটাক চেঁচিয়ে কাকা চলে গেল। নিঃঝুম হয়ে লেল বাড়িটা। রাতে তারা কেউ ভাল করে খেতে পারল না। ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করতে বাবা জিজ্ঞেস করে—তড়িৎ নয়নের কথা কী বলছিল রে ?

শ্যামা মাথা নত করে বলে—কী জানি।

বাবা চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে—নয়ন ওকে মদ টদ খাওয়াচ্ছে হয়তো। শ্যামা, খুব সাবধানে থাকিস। আমি শীগ্‌গিরই তোর বিয়ে দিয়ে দেব।

মা ঝংকার দেয়, পাত্র কোথায় যে বিয়ে দেবে ?

—আমি সেই ডাক্তার ছেলেটার কথা ভাবছিলাম। বাবা বলে—ছেলেটা বড় ভাল ছিল।

আশায় আনন্দে হঠাৎ ভিতরে ভিতরে শিউরে ওঠে শ্যামা।

মা মুখখানা পাথরের মত করে বলে—সন্নিসি-টন্নিসির সঙ্গে আমি মেয়ের বিয়ে দেব না।

শ্যামার বুকটা অন্ধকার হয়ে যায়।

বাবা মিনমিন করে বলে—নয়ন যদি তড়িৎকে হাত করে থাকে তবে বড় ভয়ের

boiRboi.net

কথা। তড়িৎ মদ খেলে তো যা তা বলে, শ্যামার নামেও বলবে এর পর থেকে। তাই ভাবছি—

—তাই বলে যার তার হাতে মেয়ে গছিয়ে দিতে হবে নাকি!

—যে সে তো নয়। বিলেতফেরত বড় ডাক্তার, মতি ফিরলে একদিন লাখ টাকা কামাবে—

—কামাক। তবু বলব, ও ছেলে অপয়া। যে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিকঠাক ছিল সে মেয়েটা দুম করে মরে গেল, সেটা ভুলো না। তার ওপর ভাবের পাগল লোক, ওদের কি বিশ্বাস আছে?

—তবে তুমি কী করতে বল?

মা একটা শ্বাস ছেড়ে বলে—কী বলব? আমার কি মাথার ঠিক আছে! এ সময়ে টোকনটা কাছে থাকলে আমি এত ভাবতাম না। বলে মা চোখে একটু আঁচল চাপা দেয়। অনেকক্ষণ পর বলে—যার তার হাতেই যদি মেয়ে দেবে তো বরং নয়নের হাতেই দাও না কেন!

—কী বলছ এ সব?

—ঠিকই বলছি। অনেক ভেবে দেখেছি। জাতে ছোট তাতে আর আজকাল তো কিছু আটকায় না। মেয়ে নিজে থেকে ছোট জাতে রেজিস্ট্রী করে এলে কী করতে? ফেলে দিতে? তাই বলছি, নয়ন তো উকিলবাবুর এক ছেলে, বিস্তর টাকা পয়সা। ছেলেটা শ্যামার জন্যই কেমন বাউণ্ডুলে হয়ে গেল, নইলে সেও তো ছাত্র ভালই ছিল, ডাক্তারী সেও পড়ত। বিয়ে না দিলে সে ছেলে হাঙ্গামা করবে না? হয়তো বোম কি ছোরা মারবে, কি আরও কত কাণ্ড করতে পারে—তাই বলছিলাম, মেয়ের বিয়ে দিয়ে চল আমরা নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়ি টোকনকে খুঁজতে—

শ্যামা পাত ছেড়ে উঠে যায়।

মায়ের কাছে টোকনই সব, শ্যামা কেউ না—এই সত্যটা ভাবতে ভাবতে শ্যামা রাতে বিছানায় অন্ধকার মশারির বাইরে মশার শব্দ শুনতে শুনতে খানিকক্ষণ জেগে রইল। খুব দূরের একজন মানুষ শ্যামার স্মৃতিতে ক্রমে আবছা হয়ে আসছে। সেই মানুষটির জন্য এক উন্মুখ পিপাসা আজও আছে। থাকবে কি?

শ্যামা পাশ ফিরে শোয়। ফাঁকা বিছানার একটা ধারে একদিন একজন মানুষ জায়গা নেবে। কে সে? নয়ন? নয়নের কথা ভাবতেই শ্যামার শরীরটা কেমন কুঁকড়ে যায় অনিচ্ছায়। তবু যদি নয়নই হয়? হায় ঈশ্বর! শ্যামার ভিতরে এক প্রকৃতিদত্ত প্রতিরোধ আর অনিচ্ছা নয়নের প্রতি ফণা তুলে আছে। মায়ের কথাটা ভাবে শ্যামা। অভিমানে চোখে জল চলে আসে।

ভোর রাতে শ্যামা শুনতে পায়, বাইরে একটা ময়না পাখি ডাকছে। চমৎকার কথা বলে পাখিটা। প্রথমে 'রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ' বলে ডাকল, তারপর বলল, 'ওঠ, ওঠ, চোর এসেছে', আধঘুমের মধ্যে আলস্যভরে শুনছিল শ্যামা। চমৎকার ডাক শিখেছে পাখিটা। তারপরই ভয়ংকর চমকে ওঠে সে। শুনতে পায়। পাখিটা তার জানালার কাছ ঘেঁষে ডাকছে—'শ্যামা, শ্যা—মা তোমার চিঠি, তোমার চিঠি…' তারপর পাখিটা চুপ করে যায়।

boiRboi.net

নয়নপাখি !

শ্যামা উঠল না, কিন্তু সম্পূর্ণ জেগে শুয়ে রইল।

সকালবেলায় শ্যামা নয়নের চিঠিটা পেল শিয়রের জানালা খুলে। জানালার বাইরের খাঁজে সাদা খামের চিঠিটা পড়ে আছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে শ্যামা চিঠিটা হাতে নিল। নয়ন যতক্ষণ বেঁচে আছে, মুক্তি নেই।

চিঠিতে লেখা—চৌরাস্তায় একবার এস। না এলে সারাদিন বসে থাকব। মনে রেখ। সারাদিন।

শ্যামা চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলল।

সময় নিল শ্যামা। অনেকক্ষণ। ভাবল খানিক। তারপর বেলা বাড়লে তাঁতের সাদা খোলের একটা শাড়ি পরে, চুলটা আঁচড়ে চটি পায়ে বেরিয়ে পড়ল।

চৌরাস্তায় গাছতলার পশ্চিমার চায়ের দোকানটার পাশে নয়ন দাঁড়িয়ে। হাতে চায়ের ভাঁড়। শ্যামাকে দেখে ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে হাসল দূর থেকেই।

ওর ঝাকড়-মাকড় চুলে একটা সবুজ পাতা খসে পড়েছে। আটকে আছে পাতাটা। অদ্ভুত দেখাচ্ছে নয়নকে। তীব্র, তীক্ষ্ন, জ্বালাধরা চেহারা। সুন্দর নয়, কিন্তু ওর দিকে দুবার তাকাতে হয়। চলন্ত রাস্তা ওর পিছনে, মানুষজন ব্যস্ত ভাবে যাচ্ছে, একটা ট্যাক্সি উড়ে গেল, বাস দাঁড়াল। সেই চলন্ত দৃশ্যকে পিছনে রেখে নয়ন দাঁড়িয়ে। চুলে সবুজ একটা পাতা। গা-টা শির শির করে শ্যামার। ভয় ? হবেও বা।

—কী চাও নয়ন ?

নয়ন মাটিতে রাখা একটা ঝোলা বাঁ হাতে তুলে নিল। বলল—ওদিকে একটা কবরখানা আছে না ?

—মসজিদ।

—মসজিদই হবে। সেখানে মাঠটা নির্জন। চল।

—কেন ?

—কথা আছে।

—কথা শেষ হয়ে গেছে নয়ন।

নয়ন অকপট হাসি হাসে। বলে—দূর, কথা কি শেষ হয় ? শোনো শ্যামা, আমার খুব একটা সময় নেই। বাবা বোধ হয় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারা যাবে। মারা গেলে অনেক ঝামেলা। আমাকে দেরী করিও না। বলে নিই। চল।

শ্যামা মুখ ফিরিয়ে নেয়। নয়ন হাঁটতে থাকে।

শ্যাম্যা তার পিছনে।

মাঠটা আজও ফাঁকা। রোদ পড়ে আছে।

—তোমার বাবার কী হয়েছে নয়ন ?

—সেরিব্র্যাল থ্রম্বসিস। আশা নেই।

—তাহলে তুমি এখানে কেন ? এখন তো তোমার বাড়িতে থাকাই উচিত।

—উচিত ! ঠিকই তো। কিন্তু তোমার জন্য একটা জিনিস বয়ে এনেছি

boiRboi.net

অতদূরে থেকে, না দেখিয়ে যাই কী করে ? তা ছাড়া, লাভ কী ? বাবার জ্ঞান নেই ! জ্ঞান থাকলেও আমাকে তার কিছু বলার ছিল না, বা আমার কিছু শোনার ছিল না। আমরা এক বাড়িতে থাকতাম, এইমাত্র।

—তবু তুমি যাও। তোমার মায়েরও তো একজন সহায় চাই এ সময়ে !

—তুমি আমাকে যা হোক বলে তাড়াতে চাইছ শ্যামা। আমি তো বলছি, কাজ হলে যাব। আমার বাবার জন্য দুঃখ পেও না শ্যামা, আমি পাই না। যারা মরবার জন্য সব সময়ে প্রস্তুত থাকে তারা কাউকে মরতে দেখলেও স্থির থাকে। স্বাভাবিক কাজকর্ম করে যায়।

শ্যামা শ্বাস ফেলে বলে—এ তো যে কেউ নয়। তোমার বাবা।

নয়ন একটু বিরক্ত হয়ে বলে—তুমি বড় সেকেলে শ্যামা। বাবা বাবা বাবা ! বাবা তো কী ? বাবা তো একটা লোকের সঙ্গে সম্পর্ক চিহ্নিতকরণের অভিধা মাত্র। তার বেশী কিছু নয়। তাই কেউ বাবা তুলে গাল দিলে আমার কোন রি-অ্যাকশন হয় না।

নয়ন নীচু হয়ে চাদরের গিঁট খুলল। ঝাঁপিটা বের করে ঘাসের উপর রাখল সযত্নে। শ্যামার দিকে চেয়ে হাসল।

শ্যামা ঝাঁপিটা দেখে। অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। নয়ন পকেট থেকে চামড়ার দস্তানা বের করে দু হাতে পরে নিল।

—ওটাতে কী আছে নয়ন ?

নয়ন খুব খুশীর হাসি হাসল—সাপ। একটা গোখরো সাপ শ্যামা।

বলেই চকিতে ঝাঁপির ঢাকনাটা তুলে নিল।

কপিশ একটা শরীর পাকে পাকে জড়িয়ে আছে। গায়ের ঝকঝকে আঁশে রোদ চলকে ওঠে।

শ্যামা দু পা পিছিয়ে আসে—নয়ন। বলে আর্তস্বরে ডাকে।

—ভয় নেই শ্যামা।

শ্যামা এক অদ্ভুত চোখে নয়নের দিকে তাকায়। পরমুহূর্তে সাপটার দিকে।

—তুমি পাগল।

সাপটা একটু অনড় রইল। তারপর আস্তে তার পিচ্ছিল শরীর পাক ছাড়তে থাকে। ঝাঁপির কাণার ওপর দিয়ে মুখ বের করে। তারপর হড় হড় করে নেমে আসতে থাকে ঘাসে, মাটিতে। আসছে তো আসছেই, শরীরের যেন তার শেষ নেই।

শ্যামা একটা চাপা চীৎকার করে প্রথমটায় মুখ ঢাকল, তারপর হঠাৎ ঘুরে দৌড়তে লাগল। কিন্তু পারল না। অভ্যেস নেই তার ওপর শাড়ি জড়িয়ে যাচ্ছে পায়ে।

নয়ন দৌড়ে এসে তার বাঁ হাত চেপে ধরে বলে—দোহাই, ভয় পেও না। আমি তো আছি। দেখ—

বলে তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে নয়ন দৌড়ে ফিরে গেল। সাপটা ততক্ষণে সর সর করে দেয়ালের ইঁটের খাঁজের দিকে অনেকটা চলে গেছে। নয়ন দৌড়ে গিয়ে দস্তানা পরা আনাড়ী হাতে সাপটার ঘাড় চেপে তুলে আনল। লকলকে সাপটা মুহূর্তে মুখ

boiboi.net

ঘুরিয়ে ছোবল দিতে চেষ্টা করে। একটুর জন্য পারল না। নয়ন ঝাঁকি দিয়ে সেটাকে নির্জীব করে দিয়েছে।

শ্যামার দিকে চেয়ে নয়ন হাসে—বিষদাঁত নেই।

শ্যামা বিশাল চোখে চেয়ে থাকে।

আর সেই চোখ দুখানা মুগ্ধ হয়ে দেখে নয়ন। ঠিক এরকমটাই সে চেয়ে এসেছে এতকাল। এরকম বিস্ময় মাখানো মুগ্ধ চোখে শ্যামা তাকে চেয়ে দেখবে।

ঝাঁপির ভিতরে মুখটা ঢোকাতেই সাপটা আপনা থেকেই অভ্যস্থ পাকে জড়িয়ে নিঃঝুম হয়ে যায়। ঝাঁপিটার ঢাকানা বন্ধ করে দিল নয়ন।

—কাল সারা রাত ধরে ওটাকে নিয়ে প্র্যাকটিশ করেছি। শিখে যাব শ্যামা।

শ্যামা অনেকক্ষণ কথা বলতে পারে না। তারপর জিজ্ঞেস করে—কী শিখে যাবে?

—ধরা। কিছু না। জগদীশ খুব চাল নিল বটে, কিন্তু ব্যাপারটা একদম সোজা।

—জগদীশ কে?

—একজন। সাপ ধরে। ওস্তাদ লোক, কিন্তু শেখাতে চায় না।

—তুমি সাপ ধরতে শিখছ? কেন?

—তোমার জন্য।

শ্যামা বিস্ময়ে চোখ বড় করে বলে—আমার জন্য?

—তোমার জন্যই। তোমাকে চমকে দেব বলে। দিই নি!

শ্যামা শ্বাস ছেড়ে বলল—দিয়েছ। অনেকদিন আমি এমন চমকাই নি।

শিশুর মত খুশীতে হাসে নয়ন। ওর রগ-ওঠা, চোখ-বসা মুখখানা স্নিগ্ধ হয়ে যায়। তার মাথার চুলে এখনও সবুজ পাতাটা লেগে আছে। সে আস্তে করে বলে—শ্যামা, আমি সব পারি। সব।

—নয়ন, তুমি বাড়ি যাও।

—কেন?

—তোমার বাবার কাছে যাও।

নয়ন একটু চমকে বলে—ওঃ ভুলেই গিয়েছিলাম। যাচ্ছি শ্যামা।

বলে তাড়াতাড়ি চাদরটা দিয়ে ঝাঁপি বাঁধে নয়ন। বাঁধতে বাঁধতেই মুখটা তুলে বলে—শ্যামা, তুমি ঠিক যেমন চাও আমি ঠিক তেমনটি হব। দেখে নিও। আমাকে সময় দাও শুধু।

শ্যামার একটু মায়া হয়। আবার ভয়ও। সেই পুরোনো কথা নয়ন আজও বলে যাচ্ছে।

—সাপটাকে কোথাও ছেড়ে দিও নয়ন।

নয়ন একটু হাসে—কেন শ্যামা? আমার জন্য ভয় পাচ্ছ?

—পাচ্ছি।

—ওটার বিষদাঁত নেই।

—গজাবে।

নয়ন একটু ভ্রু কুঁচকে ভাবে, তারপর বলে—তখন দেখা যাবে।

boiRboi.net

শ্যামা আস্তে করে বলে—নয়ন, এরকম পাগলামী করছ কেন? আমাকে চমকে দেওয়ার জন্য এতটা করার কোন মানে হয় না।

নয়ন হি-হি করে হাসে—এবার যদি আমাকে বিয়ে না কর শ্যামা, তবে একদিন তোমার ঘরে এটা চুপ করে ছেড়ে দিয়ে আসব।

—তা হয় না নয়ন।

—কী হয় না?

—তোমার সঙ্গে বিয়ে।

—কেন?

—আমি তোমাকে ভালবাসি না।

—সে কথা অনেকবার শুনেছি। কিন্তু তোমাকে বাসতেই হবে।

—কাঙালপনা করতে তোমার ঘেন্না হয় না?

তারপর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে শ্যামা মনস্থির করে বলে—নয়ন, আমি আর একজনকে ভালবাসি।

নয়ন চমকে যায়। চেয়ে থাকে। শ্যামা অস্বস্তি বোধ করে চোখ সরিয়ে নেয়।

নয়ন অবাক গলায় বলে—শ্যামা, এরকম কথা আগে কখনও বল নি। তোমার অনেক ফ্যান, বহু ছেলে ঘুরেছে তোমার পিছনে, কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে।

—নয়ন, আমি সত্যি বলছি।

—লোকটা কে?

—তুমি চিনবে না, সে দূরের লোক।

—তবু শুনি। কী করে সে?

—ডাক্তার।

—ডাক্তার? নয়ন শুকনো জিব ঠোঁট দিয়ে চাটে। তারপর আকুল গলায় বলে—কয়েকটা বছর সময় আমাকে দাও শ্যামা, আমি ডাক্তারী পাস করব। দিনরাত পড়ব।

—আমি ডাক্তারটাকে ভালবাসি না। মানুষটাকে।

—সে কেমন মানুষ বল। আমি হুবহু তার মত হব।

শ্যামা ম্লান একটু হাসে। বলে—বাড়ি যাও নয়ন। বাবার কাছে যাও। সাপের ঝাঁপিটা হাতে নয়ন দাঁড়িয়ে আছে, দৃশ্যটা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় শ্যামা। তারপর ঝাঁপিটার ভিতরে মৃদু একটা শ্বাসের শব্দ হয়।

boiRboi.net

উকিলবাবুর জ্ঞান আর ফেরে নি।

সাপের ঝুড়ি ঝোলায় নিয়ে যখন ফিরল নয়ন তখন বেলা এগারোটা। বাড়ির সামনে কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ফুল এবং মালা হাতে কয়েকজনকে দেখা গেল। বাড়িটা খুব নিস্তব্ধ। কেবল ওপরতলায় মা শ্বাসকষ্টের সঙ্গে লড়াই করে একরকম কান্নার শব্দ বের করছে মাঝে মাঝে।

নয়ন শান্তভাবে তার ঘরে চলে গেল। সাপের ঝুড়িটা সাবধানে রাখল খাটের নীচে, একটা সিগারেট ধরিয়ে চুপ করে বিছানায় পড়ে রইল একটুক্ষণ। কিছুক্ষণ সে তার বাবার মুখটা ভাববার চেষ্টা করল। পারল না। হাল ছেড়ে সে শ্যামার মুখটা ভাববার চেষ্টা করল। আশ্চর্য, তাও পরিষ্কার মনে পড়ল না। শ্যামার বদলে নার্স মেয়েটির মুখখানা ভেসে উঠল চোখে। একটু হাসে নয়ন। ঘুমহীন চোখজোড়া জ্বালা করে। সিগারেটের ধোঁয়া উড়ে আসে চোখে। চোখ বোজে। তারপর ক্লান্তিহর ঘুমের কথা ভাবে কাঙাল নয়ন। সে কবে একটু ঘুমোবে সোনেরিল না খেয়ে?

চাকরবাকররা উঁকি দিচ্ছে। ডাকতে সাহস পায় না কেউ। নয়ন আধবোজা চোখে দরজার পর্দায় কয়েকটা ছায়ার আনাগোনা দেখল। তারপর উঠল ধীরে-সুস্থে। একবার ওপরে যাওয়া দরকার। শ্মশানেও যেতে হবে। এ সময়টায় সে কলকাতায় না থাকলেই ভাল হত।

ঠাকুরটা ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে। খবরটা নয়নকে দেওয়ার জন্য চোখমুখ উদগ্রীব। সব মানুষেরই এই একটা দুর্বলতা থাকে, খবরটা ভাল হোক বা মন্দ হোক, সবার আগে সে খবরটা পেঁছে দিয়ে সে একধরনের তৃপ্তি বোধ করে। যেন একটা কম্পিটিশনে জিতে গেছে। ঠাকুরটার মুখে চোখেও সেইরকম উত্তেজিত ভাব। নয়ন বেরোতেই সে কাছে এসে বলে—বাবু, বড়বাবু নেই—

নয়ন একটু বিস্ময়ের ভান করে বলে—নেই? কোথায় বেরিয়েছে? এত বেলায়?

চাকরটা খাওয়ার টেবিলে ন্যাতা বোলাচ্ছিল। আসলে ন্যাতা বোলানোটা কাজ নয়, নিজেকে মোতায়েন রেখেছে ঐখানে, নয়ন বেরোলে খবরটা দেবে, কিন্তু নয়নের কথা শুনে চালাক চাকরটা ফিক করে একটু হেসে সামলে গেল, বলল—বেরোন নি। মারা গেলেন একটু আগে।

নয়ন গম্ভীর চোখে চাকরটাকে একটু দেখল। ভয়ে সিঁটিয়ে গেল চাকরটা।

নয়ন ঠাকুরকে ডেকে বলে দিল—আমার ঘরে এর মধ্যে কেউ যেন ঝাঁট ফাঁট দিতে না যায়, দেখিস। ঘরে আমি একটা গোখরো সাপ পুষছি। কেউ যদি ঢোকে টের পাই তবে জুতিয়ে কিন্তু বাড়ি থেকে বের করে দেব।

ঠাকুরটা সভয়ে ঘাড় নাড়ে।

নয়ন সিঁড়ি বেয়ে ওঠে। অনেক লোক জমেছে ওপরতলায়। বার লাইব্রেরী থেকে তার বাবার বন্ধুরা এসেছে, মক্কেল এসেছে, আর আত্মীয়-স্বজন। ফুল আর ধূপকাঠির গন্ধে টেঁকা যায় না। নয়নকে দেখে মা আর একবার শ্বাসকষ্ট চেপে কাঁদবার চেষ্ট করে। কিন্তু তেমন কোন শব্দ হয় না। দু একজন বুড়ো বয়স্ক আত্মীয় নয়নকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসে অনিচ্ছার সঙ্গে। তারা নয়কে চেনে। দু একটা কথা বলে তারা চুপ করে যায়, বৃথা জেনে।

কিন্তু নয়নের মুখে একটা বিষাদের ভাব ফুটে ছিল ঠিকই, সে তার ক্লান্তির জন্য। ঘুমহীন জ্বালাধরা চোখের কোলে কালি, ভাঙা মুখে শিরা-উপশিরা, পিঙ্গল এলোমেলো ধুলোটে চুল। নার্স মেয়েটা খাটে শোয়ানো দেহটার মাথা এবং বুক জুড়ে বার লাইব্রেরী থেকে পাঠানো একটা প্রকাণ্ড ফুলের মালা সাজিয়ে রেখে নয়নের কাছে

এগিয়ে এল। বলল—আপনি খুব ভেঙে পড়েছেন।

নয়ন একটু হাসতে গিয়ে হাসল না। বলল—মাথাটা বড্ড ধরেছে। আপনার কাছে অ্যাসপিরিন বা ঐরকম কিছু আছে?

—না। আমি ওসব রাখি না।

—তবে কী আছে?

মেয়েটা একটু ইতস্ততঃ করে বলে—কী চাই বলুন, কাউকে ডেকে আনিয়ে দিই।

নয়ন একঘর লোকের চোখের সামনেই মেয়েটির দিকে স্থির তাকিয়ে থেকে বলল—অ্যাসপিরিন না থাকে, ক্লোরোফিল বা ক্যালসিয়াম বা ভিটামিন, কিছু নেই? নাথিং?

মেয়েটা বোবার মত ঘাড় নাড়ে।

নয়ন দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেলে বলে—শ্মশান পর্যন্ত হেঁটে যেতে আমার খুব কষ্ট হবে।

মেয়েটা চুপ করে থাকে।

নয়ন নির্ভাবনায় বলে—কেন কষ্ট হবে জানেন? শ্মশানে যাওয়ার সময়ে কেউ আজ কথা বলবে না। একটা ট্র্যাজিক ব্যাপার তো। কিন্তু অতদূরে রাস্তা চুপ করে মুখ বুজে যাওয়া ভারী কষ্টের। আমি এখন অনেক কথা বলতে চাই।

মেয়েটার চোখে মুখে ক্রমশঃ একটা ভয়ের ভাব ফুটে ওঠে। নয়ন তা লক্ষ্য করে। আস্তে করে বলে—আপনি যাবেন না শ্মশানে?

—আমি! আমি কেন যাব?

—গেলে দোষ কী? আমি বরং একটা গাড়ির বন্দোবস্ত করি। ডেডবডি নিয়ে শ্মশানবন্ধুরা যাবে। আমরা ঘুর পথে অন্য রাস্তায় গাড়ি নিয়ে যাব। শ্মশানে যাচ্ছি বলে মনেও হবে না, গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। চলুন না।

—না। মেয়েটা মাথা নাড়ল। তারপর খাটের কাছে ফিরে গেল আবার।

ফ্ল্যাশলাইট লাগানো ক্যামেরা হাতে দুজন লোককে ঘরে ঢুকতে দেখে বিরক্ত হয়ে নয়ন বারান্দায় বেরিয়ে এল। মরেই গেছে লোকটা, তবু তার ছবি কেন যে তুলে রাখে মানুষ! মরা মানুষের ছবিতে মানুষটা চিরকাল মৃতই থেকে যাবে।

বারান্দায় বাতাস আর রোদ খেলা করছে। রেলিঙে দুটো চড়াই। 'কিচিক কিচিক' শব্দ করে লাফিয়ে তারা পরস্পরের কাছে আসছে। খেলছে। অন্যমনেই নয়ন আপনা থেকেই শব্দটা গলায় তুলে আনল। ডাকতে লাগল '—কিচিক্—চি-র্-র্-র্—কিচিক্—'

শ্মশান থেকে ফিরতে রাত হয়ে গেল। নয়ন স্নান করে নি। আদিগঙ্গার এক হাঁটু কাদায় নেমে এক কোষ ময়লা জল তুলে মাথায় চাপিয়েছিল। ফেরার সময়ে ইচ্ছে করেই দলছুট হয়ে একা একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে এক কাপ চা আর গোটা কয় সিঙ্গাড়া খেল। তাতেই বুক জুড়ে অম্বল উঠল ঠেলে। শরীরটায় একটা জ্বালাভাব। সারাটা দিনের রোদ, চিতার আঁচ, ধোঁয়া—সব মিলিয়ে চড়চড় করছে গায়ের চামড়া।

বাড়িতে ফিরে অনেকক্ষণ ধরে ঠাণ্ডা জলে স্নান করে নয়ন। কোরা কাপড় পরে

খাওয়ার ঘরে এসে দেখে নার্স মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। হাতে ক্যাম্বিসের একটা ব্যাগ, চুল আঁচড়ানো, পায়ে চটি।

—চলে যাচ্ছেন? নয়ন জিজ্ঞেস করে।

মেয়েটি সামান্য একটু হাসে, বলে—যাচ্ছি। তবে আপনার মায়েরও নার্সিং দরকার. তাই কাল সকালে আবার আসব।

নয়ন হাই তুলে বলে—রাতে নার্সিংয়ের দরকার হয় না বুঝি?

—হবে না কেন? রাতের শিফটের নার্স এসে গেছে। বলে মেয়েটি হাসল, তারপর নয়নকে ভীষণ চমকে দিয়ে বলল—এই নার্সটি কিন্তু বেশ সুন্দর দেখতে।

নয়ন একটু বোকা বনে গিয়েছিল। এতটা আশা করে নি। একটু থমকে গিয়ে বলে—আচ্ছা!

মেয়েটা চলে যায়।

ঘরে এসে নয়ন কয়েকটা ঘুমের বড়ি গিলে পড়ে থাকে।

তার বাবা কত টাকা রেখে গেছে তার হিসেব নয়ন রাখে না। তবে, অনেক টাকা, অনেক। নয়নের বাকী জীবনটা কিছু না করলেও এসে যাবে না। তার বাবা ছিলেন উকিল মানুষ। আয়কর ফাঁকি দিতে ওস্তাদ লোক। ব্যাঙ্কের লকার, মায়ের গয়না, লুকোন টাকা—সব কিছুর হিসেব নয়ন বোধ হয় কোনদিনই বের করতে পারবে না। কলকাতায় আরো একটা বাড়ি আছে তাদের, হাজারখানেক টাকা ভাড়া পাওয়া যায়। বাবা মাঝে মাঝে শাসিয়ে বলত বটে, সব সম্পত্তি উইল করে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘকে দিয়ে যাবে, কিন্তু বাস্তবিক সেটা করার মত যথেষ্ট মানসিক জোর তার ছিল না। নয়ন জানে, তার বাবা তাকেই সব দিয়ে গেছে। তার এক দাদা আছে। দীর্ঘকাল আগে সেই দাদা আপন পিসতুতো বোনকে বিয়ে করেছিল ভালবেসে, বাবা তাই তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিল। সেই দাদা বাইরে ভাল চাকরি করে। তাকেও শেষ পর্যন্ত বাবা কিছু দিয়ে গেছে কিনা কে জানে। সেই দাদা হয়তো কিছু দাবী-দাওয়া করতে পারে। করুক নয়নের তাতে কিছু যায় আসে না, সে যে নিজে বেশ কিছু টাকা পয়সা হাতে পাবে, এই খবরটাই যথেষ্ট।

ভাবতে ভাবতে সোনেরিলের আচ্ছন্নতায় ডুবে যায় নয়ন। তারপর স্বপ্ন দেখে। মোনা ঠাকুরের কালীমূর্তি জ্যান্ত হয়ে ছুঁচে সুতো পরাচ্ছে। জগদীশকেও দেখা যায়, মাফলারের বদলে গলায় এক গাদা সাপ জড়িয়ে খুব কাশছে। এমনি পাগলাটে খ্যাপাটে সব স্বপন।

সোনেরিলের ঘুম নয়নের বেশীক্ষণ থাকে না। ওষুধটা তাকে আজকাল আর তেমন ধরছে না। রোজ খায় বলেই বোধ হয়। মাঝরাতে নয়নের ঘুম ভাঙল। ঘরের বাতিটা জ্বলছে, পায়ের দিককার জানালা খোলা। ভীষণ ঠাণ্ডা আসছে। বিছানার চাদর তুলে নয়ন মুড়ি দিয়ে বসে সিগারেট খেল। রাতটাই অসহ্য, কিছু করার থাকে না।

জানালাটা বন্ধ করে নয়ন সাপের ঝুঁড়িটা বের করে। দুহাতে চামড়ার দস্তানা পরে ঢাকনাটা খোলে। সাপটা ঘুমোচ্ছে। দেখে নয়ন ভারী হিংসে বোধ করে। সাপটাকে খোঁচাতে আঙুল উঁচিয়েছিল নয়ন। তারপর আবার সাবধানে ঢাকনাটা

boiRboi.net

চাপা দিয়ে ঝুড়িটা খাটের তলায় ঢুকিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পায়চারী করল। তারপর একঘেয়ে এই জেগে থাকা থেকে মুক্তি পেতে সোনেরিলের কৌটোটা টেবিলের ওপর খুঁজতে লাগল। আর হঠাৎ তখনই মনে পড়ল, নার্স মেয়েটি বলে গিয়েছিল, রাতের শিফটের নার্স দেখতে সুন্দর। মনে পড়তেই নয়ন আপনমনে একটু হাসে।

সিঁড়ি বেয়ে বেড়ালের মতই নিঃশব্দে উঠে আসে নয়ন। মায়ের ঘরের দরজা বন্ধ। সে মৃদু টোকা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে মিহি মেয়ে গলার প্রশ্ন আসে—কে?

—দরজাটা খুলুন।

পায়ের শব্দ ভিতরে দরজার কাছে আসে। নয়ন উত্তেজনা বোধ করে।

—আপনি কে? প্রশ্ন আসে।

—আমি নয়ন।

—নয়ন কে, আমি চিনি না।

—এ বাড়ির ছেলে। আমার মাকে দেখতে এসেছি।

—ও!

পরমুহূর্তেই ছিটকিনির শব্দ। দরজা খুলে যায়।

সুন্দর! না, মোটেই না। ভারী হতাশ হয় নয়ন। বড্ড রোগা মেয়েটি। গায়ের রং ফ্যাকাশে। দেখলেই বোঝা যায়, মেয়েলী রোগে ভোগে। ম্যালনিউট্রিশন। ক্যালোরি খায় না। প্রোটীন নেই। ভিটামিন সি-এর অভাব। তবু মেয়ে।

মেয়েটি দরজা ছেড়ে দিয়ে বলে—উনি ঘুমোচ্ছেন।

—কে? নয়ন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে।

—আপনার মা। আপনি তো মাকে দেখতেই এসেছেন।

—ওঃ, হ্যাঁ। থাক, ঘুমোচ্ছে যখন ঘুমোক।

—চিন্তা নেই। উনি সামলে উঠেছেন।

নয়ন হাসল। বলল—আসলে আমার বাবা আর মার মধ্যে রিলেশনটা তেমন ভাল ছিল না। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারত না।

মেয়েটা কথা বলল না। অপ্রস্তুতভাবে চুপ করে রইল।

নয়ন জিজ্ঞেস করে—আপনি কী করছেন?

—তেমন কিছু না। অ্যালার্ট থাকছি, যদি কিছু দরকার হয়।

—বোরিং লাগছে না?

—আমার অভ্যাস আছে।

—তা তো আছেই। তবু বড় একঘেয়ে। আমারও ভীষণ ইনসোমনিয়া। একা জেগে থাকতে যে কী কষ্ট!

মেয়েটা চুপ করে থাকে।

নয়ন বলে—চা খাবেন?

—চা?

—চা। আমি নিজে করব, তারপর দুজনে গল্প করতে করতে খাব। আসুন

boiRboi.net

না নীচের খাওয়ার ঘরে।

মেয়েটা ইতস্ততঃ করে।

নয়ন মৃদুস্বরে বলে—মা নিশ্চয়ই ট্র্যাংকুইলাইজার খেয়ে ঘুমোচ্ছে?

—না। ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়েছি।

—তবে জাগবে না। নিশ্চিন্তে আসুন।

নয়ন পিছু ফিরে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চটপট সিঁড়ি ভেঙে নীচে আসে। চায়ের সরঞ্জাম সাজানোই থাকে খাওয়ার ঘরে নয়নের জন্য। ঘুমহীন রাতে সে উঠে কখন কখন চা করে খায়। দু কাপ জল চাপিয়ে নয়ন খাওয়ার টেবিলে এসে বসতে না বসতেই মেয়েটি এল। মায়ের ঘরের অল্প আলোতে স্পষ্ট দেখা যায় নি। এখন দেখল নয়ন, মেয়েটির মুখশ্রী খুব খারাপ নয়। দাঁতগুলো একটু উঁচু, নাক ভোঁতা, তবে চোখ দুখানা ভালই। সিঁথিটায় সিঁদুর থাকতে পারে, নয়ন সেটা নিয়ে মাথা ঘামায় না। মেয়েটি অবাক চোখে নয়নকে দেখছে। হয়তো ভয়ও পাচ্ছে। যে লোকটার বাবা আজ সকালে মারা গেছে তার এমন সহজ ভাব দেখেই হয়তো বিস্ময়।

নয়ন চায়ে চামচ নাড়তে নাড়তে মেয়েটির দিকে ঘাড় ফিরিয়ে হাসে, বলে—বাবার সঙ্গে আমার রিলেশনও ভাল ছিল না। উই ওয়্যার মিউচুয়াল এনিমিজ্।

মেয়েটা চুপ করে থাকে। কী বলবে ভেবে ঠিক করতে পারে না।

নয়ন বলে—কিন্তু তবু বাবার কয়েক লাখ টাকা আমিই পাব।

মেয়েটা ভ্রূ তুলে সামান্য কৌতূহলের গলায় বলে—কয় লাখ?

নয়ন ঠোঁট ওল্টায়—কে জানে। বিশ ত্রিশ লাখ হতে পারে। দশ বারো লাখও হতে পারে। বাবার অঢেল ব্ল্যাক মানি ছিল।

—টাকাটা পেয়ে কী করবেন? নয়ন চায়ের কাপ নিয়ে মুখোমুখী বসতেই মেয়েটি জিজ্ঞেস করল।

—কী করব! কী আবার, ওড়াব।

—ওড়াবেন মানে? ওড়াবেন কেন?

—অত টাকা নিয়ে আর কী করা যায়। চাকরি করব না, ব্যবসা করব না, কিছু করার দরকার হবে না। ব্যক্তিগতভাবে আমার বেকার সমস্যা নেই। আমার সমস্যা সময় নিয়ে। আয়ুর লম্বা সময় জেগে থেকে কাটিয়ে দিতে হলে টাকা ওড়ানো ছাড়া কী করা যাবে!

মেয়েটা ঠিক বুঝল না, একটু সময় নিয়ে বলল—জেগে থেকে কেন বলছেন?

—আমার ইনসোম্নিয়া। বড্ড কষ্ট। ঘুম হয় না। সেই নির্ঘুম সময়টায় আমি চলে যাব রাতের ক্লাবে—যেখানে সারা রাত নাচ গান হয়। একটা গাড়ি কিনে সারা রাত ধরে চালাব রাস্তায় রাস্তায়। মাইনে করা লোক রাখব যারা সারা রাত আমার সঙ্গে জেগে থেকে তাস দাবা খেলবে, গল্প করবে। একটা প্রোজেক্টার মেশিন কিনে সারারাত ফিল্ম্ ঘুরিয়ে ছবি দেখব। সোনেরিলে আজকাল আর ঘুম তেমন হয় না। সব ওষুধেরই ইম্যুনিটি আছে। ভয় হয়, এর পর আর ঘুমের ওষুধে কাজই হবে না। সারাটা জীবন জেগে থাকতে হবে।

মেয়েটা ডান গালে একটা আঙুল ছুঁইয়ে বসে তাকিয়ে আছে। খুব অবাক দৃষ্টি। একটুও ঠাট্টার ভাব নেই মুখে। সিরিয়াস ধরনের মেয়ে। অনেকক্ষণ ধরে ভেবে বলল—অনেক সময় সেরেও যায়।

—কি রকম? নয়ন কৃত্রিম আগ্রহ দেখায়।

—একটা মেয়েকে চিনতাম যে ঘুমোত না বলে তার স্বামী তাকে সেতার কিনে দেয়। সারা রাত ধরে মেয়েটা আলাদা একটা ঘরে বসে সেতার বাজিয়ে সময় কাটাত। প্রথমে টুংটাং করতে করতে আস্তে আস্তে সে সুর বুঝতে শেখে। সেতারের প্রাণটাও সে একদিন ধরতে পারে। সারা রাত ধরে সে সেতারে ডুবে থাকতে শিখল। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে সে সেতারের শব্দ পার হয়ে সুরের নিস্তব্ধ জগতে পৌঁছে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে সে সেতার থামিয়ে চুপ করে ঝুম্ হয়ে বসে থাকত। সে আমাকে বলছিল, ঐ ভাবে বসে থেকে সে এক নিস্তব্ধতার সুর শুনতে পেত। শুনতে শুনতে সে অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

নয়ন হাসল—এ তো গল্প।

—গল্প নয়। তবে গল্পের মতই। মেয়েটা সেরে গেছে।

—সত্যি?

—সত্যি।

টেবিলের ওপরের মসৃণ খয়েরী সানমাইকায় ধীর গতিতে নয়নের হাতটা এগিয়ে যায়। নয়ন লোল হেসে বলে—আমি যাকে বিয়ে করব তার সঙ্গে আমার একটা শর্ত হবে।

—কী শর্ত?

—সারা রাত তাকে জেগে থাকতে হবে। দিনের বেলায় সে যত খুশী ঘুমিয়ে নিক, কিন্তু রাতে, রোজ রাতে আমাদের বাসর জাগা। কেউ বোধ হয় রাজী হবে না। না?

—হাতে পারে।

—কে হবে! আমি জানি, মেয়েরা রাত বারোটার বেশী জাগতে ভালবাসে না। তারা বড় ঘুমকাতুরে।

বলতে বলতে নয়ন হাত বাড়ায়। মেয়েটা একটা হাতে মাথার ভর রেখে হেলে বসেছে। নয়ন ভঙ্গীটা দেখল। চওড়া টেবিল প্রায় অতিক্রম করেছে তার হাত। সে হাতখানা তোলে ফণার মত।

—আপনি পারবে না?

—কী? মেয়েটা চমকে উঠে বলে।

ঝপ করে ছোবল দেয় নয়নের হাত। উত্তপ্ত ব্যাকুল হাতে মুঠো করে ধরে একরাশ বকুলের নরম করতাল। পিষে ফেলে নির্যাস নিংড়ে নিতে নিতে বিকৃত ভয়াল গলায় বলে—আমার সঙ্গে জেগে থাকতে। রোজ। পারবেন না?

লক্ষপতির সঙ্গে জেগে থাকতে কোন মেয়ে রাজী নয়? এ মেয়েটিও হয়তো রাজী হত। কিন্তু নয়নেরই দোষ। সে যা চায় তার জন্য সময় দেয় না। মেয়েটা 'ছাড়ুন ছাড়ুন' বলে চাপা গলায় চীৎকার করে হাত ছাড়িয়ে নেয়। হাঁফায়। চেয়ার

boiRboi.net

টেবিলের ঘোর শব্দ ওঠে নিশুত রাতে। চাকর বাকর জেগে যাবে। তাই নয়ন-আর চেষ্টা করে না। মেয়েটা দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায়।

নয়ন ঘরে গিয়ে সাপের ঝুড়িটা টেনে আনে। ঝাঁপি খুলে দস্তানা পরা হাত এগিয়ে টেনে তোলে সাপটাকে। মুখোমুখী ভয়ংকর দুজন দুজনের দিকে তাকায়। তারপর শুরু হল আক্রমণ। এবং প্রতি আক্রমণ। রাত ভোর হয়ে আসে।

দিনের বেলায় আবার চমৎকার বোধ করে নয়ন। ঘুমের জন্য তার একটুও দুঃখ হয় না। শরীরটা হাল্কা লাগে। চায়ের সঙ্গে গোটা দুই অ্যাসপিরিন গিলবার পনেরো মিনিট পর আধকপালে মাথা ধরাটাও ছেড়ে গেল।

খবরের কাগজ অনেকদিন দেখা হয় নি। আজ খাওয়ার টেবিলের ওপর কাগজটা পড়ে আছে দেখে তুলে নিল। বরাবর সে খেলার পাতাটা আগে দেখে। খুলে দেখল, দলীপ ট্রফির একটা আঞ্চলিক খেলা চলছে ইডেনে। আজ দ্বিতীয় দিন।

কিছু না ভেবেই নয়ন পোশাক পাল্টাল। জলপাই রঙের প্যাণ্ট, লাল জামা, গলায় রঙীন সিল্কের মাফলার, চওড়া বেল্ট, চোখে রোদ-চশমা। বেরিয়ে সে মোড়ের দোকান থেকে সিগারেট কিনল। দোকানের আয়নায় নিজের ধারাল চেহারাটা দেখল একটু। দেখতে দেখতে শিস্ দিল। দুহাতে চুলগুলো চেপে ঠিক করেনিচ্ছিল. সে সময়ে লক্ষ্য করল দোকানদার মহাদেব তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তেই মহাদেব বলল—বাবু, কাল তো বড়বাবু মারা গেলেন।

—হ্যাঁ মহাদেব। আফশোষের ব্যাপার। নয়ন গলায় যথেষ্ট দুঃখ ফোটাতে চেষ্টা করে!

—তো ইটা আপনার কী পোশাক হল? ই সময়ে কেউ প্যাণ্ট শার্ট পরে? নোত্তুন কাপড় পরে তো!

ঝাঁৎ করে ভুলটা ধরতে পারে নয়ন। কখন যে বে-খেয়ালে কোরা কাপড়টা ছেড়ে অভ্যাসবশতঃ রোজকার মত প্যাণ্ট শার্ট পরেছে তা বুঝতেই পারে নি। ভুল হয়ে গেছে বড়। পাড়ার চেনা লোকেরা অবশ্যই দেখেছে নয়নকে এই পোশাকে! নয়ন জিভ কাটল।

ভুলটা শোধরাতে নয়ন তাড়াতাড়ি পাড়ার রাস্তাটা হেঁটে পার হয়ে আসে। অচেনা মানুষজনের মধ্যে এসে স্বস্তি বোধ করে। ট্যাক্সি ধরে বড় রাস্তায়। শোকের পোশাকটা ভুল করে ছেড়ে ফেলেছে ঠিকই। তবু ট্যাক্সিতে বসে ভুলটার জন্য আবার ভালই বোধ করতে থাকে সে। একজনের মৃত্যুর ঘটনা আর একজনের পোশাকে বিজ্ঞাপনের মত ঝুলিয়ে রাখার মানে হয় না। নয়নের মুখে তো লেখা নেই যে গতকাল তার বাবা মারা গেছে! স্বাভাবিক পোশাকে সে বরং বেশ সহজ বোধ করতে থাকে।

মাঠে সে সাইট স্ক্রীনের পাশে গ্যালারিতে উঠে বসে। বেশ ভীড়। ভীড়ে কেউ কারও চেনা নয়। নয়ন অলস ভঙ্গীতে বসে খেলা দেখে।

ইষ্ট্ জোন্-এর সাত নম্বর খেলোয়াড় সেঞ্চুরী করবে বলে কেউ ভাবে নি।— কিন্তু সারাটা সকাল ঠুকে ঠুকে খেলে ছেলেটা নব্বুইয়ে যখন পেঁছে গেল তখন প্রথম খেলাটায় কিছু উত্তেজনা বোধ করে নয়ন। একটু ঝুঁকে বসে। ছেলেটা একটা ওভার

মেডেন দিল। তারপর পর পর দুটো চার মেরে এবং একটা রান নিয়ে পেঁছোল নিরানব্বইয়ে। সারা মাঠে উত্তেজনা, চীৎকার। শক্ত পাল্লার সাউথ জোনের সঙ্গে এমন হাড্ডাহাড্ডি ব্যাটিং কেউ আশা করে নি। নয়ন উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে চেঁচিয়ে বলল—রান—ওঃ একটা রান—

—বসে পড়ুন—পেছন থেকে কে চেঁচাল। তারপর জামা ধরে টানল নয়নের। নয়ন শুধু গায়ে পড়া আরশোলা ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গীতে পিছনে হাত নিয়ে অচেনা হাতটা ঝেড়ে ফেলল।

লাঞ্চের আগে শেষ ওভার। পাঁচটা বল পাঁচটা বোমার মত। সাত নম্বর ব্যাটসম্যান মাঠের চীৎকার শুনে ঘাবড়ে গেছে। স্কোরবোর্ডটা দেখে নিয়ে পর পর পাঁচটা বল ঠেকিয়ে দিল আড়ষ্ট ভঙ্গীতে। খেলছে না। পারছে না।

—ওঃ, একটা রান! নয়ন চেঁচায়। তার দেখাদেখি আশপাশের হাজার হাজার জন গ্যালারীতে উঠে দাঁড়াতে থাকে! 'বসে পড়ুন' চীৎকার করতে করতে বসা লোকেরা দাঁড়িয়ে ওঠে। মাঠের মাঝখানে একটা রানের জন্য প্রার্থনারত ছেলেটা ছয় নম্বর বলটা খেলতে পারল না। বোল্ড।

—খানকীর বাচ্চা! শালা! পাগলের মত চেঁচাল নয়ন মাথার চুল চেপে ধরে! তারপর আবার চেঁচাল—'ইয়ে' করগে বাঞ্চোৎ—

বাচ্চা একটা ছেলেকে নিয়ে এক বাবা সামনের বেঞ্চে বসে। ভদ্রলোক নয়নের দিকে বিরক্ত হয়ে তাকায়। নয়ন সঙ্গে সঙ্গে লোকটার চোখে তার নিজের চোখ ফেরত দেয়। লোকটা আস্তে আস্তে মাথা ঘুরিয়ে তার টিফিনের বাক্স খোলে।

লাঞ্চ।

নয়ন গ্যালারী থেকে অনেকটা নিচুতে চ্যানেলে লাফ দিয়ে নামে। আধকপালে মাথাধরাটা আবার শুরু হয়েছে! সারাক্ষণ মুখে রোদ, মাথায় উত্তেজনা, নাকে ধুলো। মাথা ধরতেই পারে।

গ্যালারির নিচে ছায়া। বাঁশের বেড়া দেওয়া খাবারের দোকানে ভীড়। এক কাপ চায়ের জন্য নয়ন একটু ঘোরাঘুরি করল। কিন্তু শান্তভাবে, ঠেলাঠেলি না করে কোথাও চা পাওয়ার উপায় নেই। ক্ষিদে-তেষ্টায় পাগল হয়ে মানুষেরা হামলে পড়ছে।

কিন্তু নয়নের একটু চা বড় দরকার।

বাঁশের চৌখুপী ঘেরা দোকানটার কাছে গেল নয়ন। গায়ে গায়ে লোক দাঁড়িয়ে। হাজারটা হাত দোকানীর দিকে বাড়ানো। 'এই আমারটা—আমার এক কাপ চা, দুটো কাটলেট' এই সব চীৎকারে একটা দাঙ্গার মত ভাব। মানুষেরা ক্ষেপে আছে। তপ্ত, শুষ্ক মানুষ। এক্ষুনি ফাটবে। বাইরের দোকানের চেয়ে দ্বিগুণ দামের খাবার। আর চা—পয়সা বাড়িয়েও পাওয়া যাচ্ছে না। তিনটে পশ্চিমা দোকানদার নাজেহাল হচ্ছে। দিশেহারার মত সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে।

নয়ন শান্তভাবে কনুই দিয়ে একটা মাড়োয়ারীকে সরিয়ে বাঁশের বেড়ার ধার ঘেঁষে দাঁড়াল। উঁচু কিন্তু ঠাণ্ডা গলায় বলল—এক ভাঁড় চা—

কথাটা কোথাও পেঁছোল না, যে লোকটা প্রকান্ড কেটলী থেকে চা ঢালছে

সে নয়নের কাছ থেকে দু বিঘৎ দূরে মাত্র। নয়ন আবার আগের মতই চেঁচিয়ে বলল—চা—

লোকটা শুনল না। পিছন থেকে মাড়োয়ারীটা নয়নকে সরানোর চেষ্টা করছে শরীরটা ঠেলে সামনে এগিয়ে দিয়ে। নয়নের গলার স্বর ডুবে যাচ্ছে চারদিকের চীৎকারে।

নয়ন তৃতীয়বার বলল—চা—আ—আ—

তার বাড়ানো হাত শূন্যে রইল। মাথা ধরাটা ফিরে আসছে। বাড়ছে। মাথার ভিতরে চমকে উঠেছে রগ।

অনেক দিন আগে শিয়ালদায় বিনা টিকিটের যাত্রী বলে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের একটি ছাত্র ধরা পড়েছিল। সেই থেকে একটা ছাত্র হাঙ্গামার সূত্রপাত। নয়ন তখন হিন্দু স্কুলে শেষ ক্লাসে পড়ে। হাঙ্গামা শুনে বেরিয়ে এসেছিল। শিয়ালদার কাছে ছাত্ররা রাস্তা আটকে ট্রামে বাসে আগুন দিচ্ছে তখন। পুলিশ ছিল না। নয়ন তখন একদল ছাত্রের সঙ্গে ভিড়ে গেল। এগারটা ট্রাম সরাসরি দাঁড়িয়ে। তার শেষ দুটোতে আগুন দিয়েছিল নয়ন। একাই লাফিয়ে উঠেছিল ট্রামে, যাত্রীদের শাসিয়ে নেমে যেতে বলেছিল। একভীড় লোক মেড়ার মত সুড় সুড় করে নেমে গেল। আর নয়ন ব্লেড দিয়ে সীটের খোসা ছাড়িয়ে ছোবড়া বের করে কেরোসিন ঢেলে দেশলাই জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তারপর বেনেটোলা লেনের মুখে দাঁড়িয়ে দেখেছিল—শিয়ালদার আকাশ কালো ধোঁয়ায় ঢেকে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুড়ে যাচ্ছে এগারোটা ট্রামগাড়ি।

সেই দৃশ্যটা হঠাৎ দেখতে পেল নয়ন।

আর একবার একটা ফিলমের রিলিজের দিন ভারতীতে হাউসফুল। লবীতে বহু লোক দাঁড়িতে আছে টিকিট না পেয়ে। যদি কেউ বাড়তি টিকিট বিক্রী করে এই আশায়। সেই সময় একটি চশমাপরা ভালমানুষ মেয়ে টিকিট ফেরত দিতে এলে একরাশ লোক মেয়েটাকে ছেঁকে ধরে। প্রায় ত্রিশজনের ভীড়ের মধ্যে মেয়েটি দুটো টিকিট মুঠোয় ধরে কান চেপে দাঁড়িয়ে অসহায় চোখে চেয়ে ছিল। কাকে টিকিট দেবে ঠিক করা তখন তার পক্ষে অসম্ভব। বহু লোক পাঁচ দশটাকার নোট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে চীৎকার করছিল—'আমি দশ দেব,' 'আমি পাঁচ,' 'আমি আগে ওকে ধরেছি'। নয়ন দূর থেকে দৃশ্যটা দেখে এগিয়ে যায়। দু-চারজনকে হিঁচড়ে সরিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে আড়াল করে দাঁড়ায়। তারপর একপলক চিন্তা না করে বিনা দ্বিধায় মেয়েটির কনুই চেপে ধরে একটু জোরের সঙ্গে ভীড়টা কেটে বেরিয়ে আসে। বিশ ত্রিশজন বোকার মত চেয়ে দেখে। নয়ন লবীর এক কোণে মেয়েটিকে নিয়ে গিয়ে যথার্থ দামে টিকিট দুটো নিয়ে মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়েছিল। কেউ একটিও কথা বলে নি। বরং দু একজন শ্রদ্ধা প্রশংসার চোখে তার দিকে চেয়ে দেখেছিল।

নয়ন আর চেঁচাল না। চেঁচিয়ে লাভ নেই। চা-ওলা লোকটা এই ভীড়ে নয়নকে আলাদা করে চিনবে না। চেনাতে হলে কিছু করতে হবে। ভীড় ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে নয়ন জানে।

বাঁশের বেড়াটা কেউ ডিঙোয়নি ভদ্রতাবশতঃ। নয়ন এক পলকও দ্বিধা না করে

বেড়াটা ডিঙিয়ে গেল। চোখের নিমেষে চা-ওলার হাত থেকে কেটলীটা কেড়ে নিল। ঝুড়ি থেকে একটা ভাঁড় তুলে চা ঢালতে লাগল।

বাইরে লোকেরা একটু সময় নিল ব্যাপারটা বুঝতে। তারপর বুঝল, অরাজকতার ইংগিত, লুটের গন্ধ। পরমুহূর্তেই হাজারটা মানুষ পার হয়ে আসতে লাগল বাঁশের বেড়া। মড় মড় করে বাঁশের বেড়া ভেঙে পড়ার শব্দ। দৌড় পায়ের আওয়াজ, লাফিয়ে পড়ার শব্দ। ইতর একপাল ছেলে কাটলেটের থালাটা কয়েকটা থাবায় উড়িয়ে নিল, চপের ঝুড়ি থেকে কে একমুঠো ছুঁড়ে দিল শূন্যে। কেকের বয়ামটার দিকে বাড়ানো হাতগুলো খাবলা মেরে দলা পাকানো কেক তুলে নিচ্ছে মুঠো ভরে। কে একজন চেঁচিয়ে বলছে, 'শালা হারামীরা তিনগুন দাম নেয়। লোটো শালাদের। মেরে তক্তা করে দে।' তিনটে পশ্চিমা বাঁশের বেড়া ডিঙিয়ে পালিয়ে গেল। তারপর লুট আর লুট।

নয়ন ভীড় ছেড়ে কষ্টে বাইরে এল। এক ভাঁড় চায়ের অর্ধেক তখনও তার হাতে ধরা। একটু দূরে থেকে সে লুটের দৃশ্যটা দেখল দাঁড়িয়ে। তারপর ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে গ্যালারীর ছায়া পার হয়ে মাঠের বাইরে বেরিয়ে এল। খেলা দেখতে আর ইচ্ছে করছিল না তার।

কাকা মুর্গী নিয়ে এল ঠিকই, তবে পরদিন নয়। এল দিন পনেরো পর। হাতে প্রকাণ্ড পা-বাঁধা লাল মুর্গী, অন্ততঃ এক কেজি মাংস হবে, অন্যহাতে মিষ্টির বড় বাক্স। সঙ্গে ঝাঁকামুটের মাথায় প্রকাণ্ড ঝুড়িতে আনাজপাতি। মহার্ঘ নতুন ফুলকপি, বড় বেগুন থেকে শুরু করে ঘিয়ের কৌটো পর্যন্ত। কাকার পরনে ফিনফিনে ধুতী, পাঞ্জাবী। একেবারে বরকর্তা। মুখে অপরাধী হাসি।

বাইরের ঘরে শ্যামার বাবা বসেছিল। রবিবারের সকাল দশটা। শ্যামার বাবার হাতে খবরের কাগজ, পাশে চা। ছোটভাইকে ঢুকতে দেখে একটু তাকাল। জিনিসপত্র দেখে অবাক হয়ে একবার বলল—এত সব! কী ব্যাপার? আর কোন কথা হল না। কোনদিনই কথাবার্তা তেমন হয় না। হলেও কাকার মাতলামীর প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যায় বাবা। আজও ব্যাপার দেখে আবার খবরের কাগজে চোখ নামিয়ে নিল।

জিনিসপত্র রান্নাঘরের দরজায় নামিয়ে কাকা মাকে বলল—বৌদি, একটা কথা আছে।

—কী কথা?

—বলছি। বলে কাকা এসে শ্যামার ঘরে উঁকি মারে।

মুখ বাড়িয়ে বলে—উনুনটা ধরা তো শ্যামা।

ঘর গোছাচ্ছিল শ্যামা, মুখ ফিরিয়ে কাকাকে দেখে একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বলল—কেন?

—তুই ধরা তো। কেন, সে খাওয়ার সময়ে বুঝবি।

শ্যামা মুখখানা ভার রেখেই বলল—এত সব কিনে এনেছ কেন? এমনিতে তো বল তোমার পয়সা নেই।

boiRboi.net

কাকা একটু বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে বলে—নেই তো নেই, তা বলে মাঝে-মধ্যে একটু খাওয়া-দাওয়া করব না। গরীবেরা তো খেয়েই মরে।

শ্যামা একটু খর গলায় বলে—পয়সা পাও কোথায়?

কাকা একটু থমকে যায়। সকলেই জানে, শ্যামা নরম মেয়ে। তার গলায় ঝাঁঝ খুব কম শোনা যায়।

কাকা থমকে থামে একটু, তারপর হঠাৎ রেগে গিয়ে বলে—যেখান থেকেই পাই তাতে তোর কী? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।

—কোথা থেকে পয়সা পাও সেটা আগে বল, নইলে ওসব ফিরিয়ে নিয়ে যাও, আমরা খাব না।

—তুই না খাস খাওয়ার লোক আছে, চেঁচাস না।

—আমি চেঁচাব। ওসব এ বাড়িতে কেউ খাবে না, তোমার লজ্জা করে না, নিজের দাদা ভাইঝি সবাইকে জড়িয়ে চেঁচিয়ে পাড়ার লোকের কাছে যা তা বলে যাও! নিজেকে কী ভাব তুমি? তোমাকে বাবা মা ভয় পেতে পারে, আমি পাই না। তুমি ওসব নিয়ে চলে যাও।

—কী বললি! বলে কাকা তড়পাতে চেষ্টা করে, কিন্তু সুস্থ অবস্থায় তড়িৎ চৌধুরীর মুখটা তেমন খোলে না। কথা হারিয়ে যায়। মদ খেলে হুড় হুড় করে কথা আসে। তবু কাকা তোতলাতে তোতলাতে বলে—তোর বাড়ি যে বের করে দিবি? আমার দাদার বাড়ি—

রান্নাঘর থেকে মা উঠে এসে দুজনের মাঝখানে পড়ে। তড়িৎ চৌধুরীর পিঠে হাত রেখে বলে—এস ঠাকুরপো, আমি তোলা উনুন ধরিয়ে দিচ্ছি। শ্যামা, তোর না আজ কমলাদের বাসায় যাওয়ার কথা! যা, ঘুরে আয়।

—যখন সময় হবে যাব। তুমি কাকাকে চলে যেতে বল।

—ছিঃ, কী সব বলছিস!

তড়িৎ চৌধুরী স্তিমিত গলায় বলে—শুনছেন বৌদি, শ্যামার কথা! সেই ছোট্ট নরম সরস শ্যামা আর নেই। আজকাল ভোটটোট দেয়, বয়স্থা হয়েছে—বলে একটু ম্লান হাসবার চেষ্টা করে কাকা।

—হয়েছিই তো। বেঁচে থাকলে সকলেরই বয়স হয়। একমাত্র তোমারই বয়সবুদ্ধি হয় না। কোন আক্কেলে তুমি রাস্তার লোকের কাছে নয়নের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে কথা বললে? আমি তোমার ভাইঝি না? ও বুদ্ধি তোমাকে কে দিয়েছে, কে বলেছে তোমাকে যে নয়নের সঙ্গে আমার ভাব?

—চুপ কর শ্যামা! মা ধমক দেয়।

কিন্তু শ্যামার চুপ করার মত অবস্থা নয়। তার নাকের পাটা ফুলে উঠেছে, চোখ বিস্ফারিত, ঠোঁট কাঁপছে। জ্বলজ্বলে চোখে সে মার দিকে চেয়ে বলে—তুমি জানো না, এ সবই নয়নের কারসাজি। এত জিনিসপত্র এ সবই নয়ন পাঠিয়েছে। জিজ্ঞেস কর।

—নয়ন! ভারী অবাক হয় কাকা—নয়নের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী? কী যা তা বলছিস!

boiRboi.net

—ঠিকই বলছি। তুমি চলে যাও।

মা কাকার পিঠে হাত রেখে ঠেলে রান্নাঘরের দিকে নিয়ে যেতে যেতে বলে —ও পাগল মেয়ে! তুমি চল তো ঠাকুরপো, কী কথা বলবে বলছিলে যে!

একা ঘরে শ্যামা দাঁড়িয়ে থাকে। নিঃঝুম।

গোলমাল শুনে বাবা উঠে এসেছিলো। আবার ফিরে গিয়ে একটা প্রেসারের ট্যাবলেট খেয়ে খবরের কাগজ নিয়ে বসল। বাড়িটা আবার চুপচাপ হয়ে যায়। যেন কিছুই হয়নি, সব ঠিক আছে।

শ্যামার জানালার পাশেই বাড়িতে মেথর আসবার গলি। সেইখানে বসে কাকা মুর্গী কাটল। ধুতী পাঞ্জাবি ছেড়ে গামছা পরে নিয়েছে। মুর্গীটার 'কঁ'-কঁ' ডাক, তারপরই ডানা ঝাপটানোর শব্দ পায় শ্যামা।

গলিমুখো রান্নাঘরের জানালা দিয়ে মা কাকার সঙ্গে কথা বলছে।

—শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকতে তো দেরী আছে? মা জিজ্ঞেস করে।

—দেরী কি! আজকাল একমাস অশৌচ আর কে মানছে? গতকালই শ্রাদ্ধ চুকে গেল। পনেরো দিনে।

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—তা উকিলবাবু রেখে-টেখে গেল কেমন?

—পাঁচ সাত লাখ তো শুনছি সাদা টাকাই। পাঁচটা ইন্সিওরেন্স থেকে আরো লাখ দুই পাওয়া যাবে। ব্যাঙ্কের লকার-টকার তো এখনও খোলাই হয় নি, বাড়িতে স্টীলের আলমারিতেও না হোক আরো দু আড়াই লাখ পড়ে আছে। দুঁদে উকিল ছিল, দুহাতে লুটেছে। দুখানা বাড়ি—

এরপর মার গলার স্বরটা হঠাৎ নেমে যায়।

চোখে জ্বালা। বুকে একটা ভয় বেড়ালের থাবার মতো আলতো বসে আছে। শ্যামা সামান্য সেজে বেরিয়ে পড়ল। বাইরের ঘরে অন্যমনস্কভাবে বসে থাকা বাবাকে কেবল বলে গেল—বাবা, কমলাদির বাড়ি যাচ্ছি! এবেলা ফিরব না।

—হুঁ।

বাইরে আজ শীতের বাতাস দিচ্ছে। তার সঙ্গে নরম রোদ। পার্কটা হেঁটে পার হতে ভারী ভাল লাগছিল শ্যামার। বড় রাস্তায় এসে ফাঁকা ট্রামে উঠে বসল।

কমলাদি দরজা খুলেই বলে—কত দেরী করলি। সকালে আসার কথা ছিল। তোর শঙ্করদা তোর জন্যে বসে থেকে থেকে এইমাত্র আড্ডা দিতে বেরোল। আয়।

রান্নাঘরে গ্যাসের উনুনে চাপানো প্রেসার কুকার। মাংসের গন্ধে ভুর-ভুর করছে চারদিক। ঘরের মধ্যে একটু ঘুরে ঘুরে দেখে শ্যামা। খাট পালং, আলমারী, টেলিফোন সব সুন্দর সাজানো। বেশ আছে ওরা! বাড়িটা ঠান্ডা, শান্ত, ভালবাসার চিহ্নগুলি চারদিকে ছড়ানো।

—শ্যামা, মাংসটা চেখে যা! কমলাদি ডাকে।

—যাই।

রান্নাঘরের দরজায় মোড়া পেতে বসে শ্যামা। টুকটাক নানা কথা হতে থাকে।

—ঝাল বড্ড কম দিয়েছ। পানসে!

—কী করি বল! ওর যে গ্যাসট্রিক। অনেকটা আদাবাটা দিয়েছি।

boiRboi.net

—তোমাদের বড্ড সাহেবী রান্না।

—ওর তো এরকমই পছন্দ, সেদ্ধ, নিঝাল। আমি মাঝে মাঝে আলাদা ঝাল গড়গড়ে করে রেঁধে নিই। কিন্তু রোজ তো ইচ্ছে করে না, তাই আমারও কেমন এইসব বিস্বাদ রান্নাই অভ্যেস হয়ে যাচ্ছে। বিয়ে করলে পার্সোনালিটি থাকে না, জানিস। কর বিয়ে, বুঝবি।

শ্যামা ঠোঁট ওল্টায়—বয়ে গেছে বিয়ে করতে। চাকরি খুঁজছি।

—খোঁজ। চাকরি করলে আরো ভাল বিয়ে হবে। আজকাল সবাই চাকুরে মেয়ে চায়।

—ইস, বিয়ে করলে চাকরি করতে বয়ে গেছে।

—ও কথা বলিস না। আজকাল একজনের রোজগারে সংসার চলে নাকি। চললেও শখ-শৌখিনতা কিছু করা যায় না। আমারই মাঝে মাঝে চাকরি করতে ইচ্ছে করে।

—আমার ভাল লাগে না। বিয়ে করলে হাত পা ছড়িয়ে সংসার করব—সেই ভাল। বৌকে সুখে রাখতে পারে না যে মানুষ, তাকে বিয়েই করব না।

কমলাদি কপির ডাঁটার চচ্চড়ি বসিয়ে বলে—ভাগ্যিস তোর তবে সেই ডাক্তারের সঙ্গে বিয়ে হয়নি। শুনেছি লোকের দানে তার দিন চলে। কী অবস্থা হত তোর।

শ্যামার বুকের ভিতর কোথায় যেন যন্ত্রপাতি নড়াচড়া শুরু করে। শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। ভারী ঝামেলা। কিছুতেই নিজেকে স্থির রাখতে পারে না সে। উঠে গিয়ে বেসিনে হাত মুখ ধোয়।

শঙ্করদা দুপুর পার করে ফিরল। হাসি ঠাট্টায় খাওয়ার পাট চুকতে গড়িয়ে গেল বেলা। তিন জনে ফিস খেলল খানিকক্ষণ। তারপর গড়াল। খাটে কমলাদি আর শ্যামা, ইজিচেয়ারে শঙ্করদা।

—শ্যামা চোখ বুজে শুয়ে ছিল। সেই অবস্থাতেই বলে—শঙ্করদা।

—উঁ।

—আমার একটা চাকরি দরকার।

—কেন?

—খুব দরকার।

সিগারেটের প্যাকেটের ওপর একটা সিগারেট লম্বালম্বি ঠুকতে ঠুকতে শঙ্করদা বলে—বিয়ের পর চাকরি কোরো, ডেগমাস্টারী।

—বিয়ে করব না।

—কে বলল করবে না।

—আমিই বলছি।

—কিন্তু তোমার জন্য একটা পাত্র যে প্রায় ঠিক করে ফেলেছি, আজকালের মধ্যেই কথাটা পাড়তে তোমাদের বাসায় আমার যাওয়ার কথা।

শ্যামা একটু হাসে, চোখ দুটো দুই আঙুলে চেপে রেখে বলে—এক পাত্রপক্ষের প্রস্তাব নিয়ে সকালেই কাকা এসেছে।

—পাত্র কী করে?

শ্যামা শ্বাস ছেড়ে বলে—কিছু করে না। বাপ বড়লোক ছিল, মরেছে, ফলে

boiRboi.net

ছেলে এখন বড়লোক হয়েছে। বয়েসে ছোট, জাতও এক নয়।

—সে কী! শঙ্করদা চমকে বলে, এ কেমন বিয়ের প্রস্তাব তোমার কাকা আনলেন?

কমলাদি ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর পিঠের তলা থেকে নিজের আঁচলটা ছাড়িয়ে এনে শ্যামা পাশ ফিরে বলে—আপনার পাত্রটি কেমন শুনি।

শঙ্করদা শ্যামার দিকে সন্দেহের চোখে তাকায়, বলে—এ পাত্র ভালই। আমাদের বন্ধুর মত, তবে আমার চেয়ে বয়সে ছোট। ইঞ্জিনীয়ার। মুস্কিল হচ্ছে কিছু দাবী-দাওয়া করবে। হাজার তিনেক নগদ।

শ্যামা চোখ বুজে নিঃঝুম পড়ে থাকে একটুক্ষণ। তারপর বলে—তার চেয়ে চাকরিটাই ভাল লাগবে আমার।' বিয়েটা থাক।

শঙ্করদা অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে, মাথা হেলিয়ে শ্যামার দিকে চেয়ে। তারপর বলে—শ্যামা।

—উঁ।

—একটা সত্যিকথা বলবে?

—কী?

—তুমি কাউকে ভালবাস?

—দূর।

—বাস, কিন্তু কোন কারণে তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হচ্ছে না। হয়তো সে তোমাকে ফাঁকি দিয়েছে। সত্যি কিনা বল।

—না।

—তবে ফ্যাক্টটা কী?

—কিছু না।

—সেই সন্ন্যাসী ডাক্তারকেই তোমার পছন্দ নয় তো শ্যামা? ভেবে দেখ।

আবার সেই যন্ত্রপাতির নড়াচড়া। তার শরীরের ভিতরে একটা লিভার ওঠে নামে, হুইল ঘোরে, ধক্ ধক্ করে স্টার্ট নেয় ইঞ্জিন। শ্যামা তার কেঁপে-ওঠা হাত আঁচলে ঢাকে, বালিশে মুখ লুকোয়।

—কী হল?

—কিছু না।

শঙ্করদা নীরবে সিগারেট খায়। অনেকক্ষণ বাদে বলে—আমি এর মধ্যে আরো ভাল করে খোঁজ নিয়েছি শ্যামা। খোঁজ নিয়ে দেখেছি, তুমি সেই সন্ন্যাসীর ঘর করতে পারবে না সত্যিই।

শ্যামা চুপ করে থাকে।

শঙ্করদা বলে—তার বাঁধা মাইনের চাকরি নয়। লোকের দেওয়া জিনিসে তার সংসার চলবে, তার ধারণা লোকের সেবা করে মানুষের অযাচিত দান পাওয়াই শ্রেষ্ঠ বৃত্তি, ব্রাহ্মণোচিত। সে তোমাকে সুখে রাখার চেষ্টাও করবে না। প্রতিদিন তোমার রাত ভোর হবে হাঁড়ির চিন্তায়, ভিক্ষায় চলবে পেট। স্বামীর সঙ্গও পাবে না তুমি। সে লোকটা উদয়াস্ত যাজন করে বেড়ায়, ছমাস নমাস বাইরে বাইরে ঘোরে। বৌয়ের দিকে তাকিয়ে দেখবে একটু—এমন স্বভাব নয়। তার জীবনে উন্নতি নেই, প্রমোশন নেই, ইন্সিওরেন্স, ব্যাংক ব্যালান্স, ব্ল্যাক মানি—কিচ্ছু নেই। তার কাছে

boiboi.net

থেকে কোনও উপহারও কোনদিন পাবে কিনা সন্দেহ। ফুল্লরার বারোমাসের গীত হবে তোমার শ্লোগান। পারবে শ্যামা?

শ্যামার চোখভরে জল আসে। কিছু বলে না।

শংকরদা মাথা নেড়ে বলে—পারবে না। ওরকম জীবন স্বেচ্ছায় বেছে নেবে কে? যার গতি হয় না সে হয়তো নেবে, কিন্তু তুমি নেবে কেন? আজকালকার মেয়ে তুমি, তোমার এতটা সেন্টিমেন্ট থাকার কথা নয়। থাকলে বুঝব তুমি বোকা।

হৃৎপিণ্ড একটা পাম্প মেসিনের মত ঝলকে ঝলকে জল তুলে আনছে চোখে। বুকটা ব্যথা করে। আস্তে আস্তে কান্নায় শরীরটা কেঁপে ওঠে। পারবে না শ্যামা। জানে, পারবে না। ঐ জীবন তার নয়। তবু সেই দূরবর্তী মানুষটার ছবি কেন ছুঁয়ে থাকে তাকে।

শংকরদা মৃদু গলায় বলে—আমি অনেক ভেবেছি। মানুষটাকে আমারও বড় ভাল লাগে শ্যামা। লোকটা আমাকে এতদূর প্রভাবিত করেছিল যে আমি এক সময়ে ওর ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিতেও রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু কমলা দিল না। বলল—যদি ওর মতই তোমারও অবস্থা হয়। সেটা অবশ্য হত না। ওদের আশ্রমের অনেক লোকই ভাল কাজকর্ম করে, বড় চাকরি করে, সংসারও করে। দীক্ষা নিতে ভয় পেলাম। তুমি কেঁদ না, সব শুনে যদি রাজি থাক, তবে বল ওর সঙ্গেই বিয়ের ব্যবস্থা করি।

শ্যামা সময় নিয়ে সামলে উঠে বসল। তারপর মাথা নেড়ে বলে—না শংকরদা। ঐ জীবন আমি পারব না।

—আমিও তাই বলি। তাহলে ইঞ্জিনিয়ারের এ সম্বন্ধটা করব কি শ্যামা? তুমি মত দিলে সামনের রবিবার তোমাকে ওরা দেখতে যাবে।

শ্যামা নিজের কোলে মুখ নামিয়ে বসে রইল।

বিকেলের দিকে কমলাদিকে ঠেলে তোলে শংকরদা—এই, চা করবে না?

—আমি করছি। বলে শ্যামা উঠে গেল রান্নাঘরে। চায়ের সরঞ্জাম গোছাচ্ছিল যখন তখনই টেলিফোনের রিং শুনতে পেল। সারাদিন আজ টেলিফোনটা বাজে নি। শব্দটা তাই নতুন লাগল শ্যামার কাছে। হঠাৎ দমকলের আওয়াজের মত। নিশুতরাতে বুক কেঁপে ওঠে।

শংকরদা চেঁচিয়ে বলল—শ্যামা, তোমার ফোন।

একটু চমকায় শ্যামা। নয়ন নয় তো।

নয়নই। টেলিফোন তুলেই শ্যামা মিষ্টি একটা পাখীর ডাক শোনে। তারপরই নয়ন বলে—শ্যামা!

—বলছি।

—কী করছ?

—কিছু না।

—একটা জিনিস শোন।

boiRboi.net

—কী ?

—শোন না। কান পেতে থাক।

শ্যামা কান পাতল। প্রথমটায় কিছু বুঝতে পারল না তারপর একটা শ্বাস ছাড়ার মত বাতাসের শব্দ হয়।

—শুনেছ ?

—কিসের শব্দ ?

—সেই সাপটা।

শ্যামা হিম হয়ে যায়।

—শ্যামা!

—বল।

—সাপটার দাঁত উঠেছে। আজ সকালে দেখলাম, ছোট্ট হুলের মত দেখা যাচ্ছে।

শ্যামা নিঃশ্বাস ফেলে বলে—সেটা আমাকে বলে কী হবে ?

—ইনফর্মেশনটা দিয়ে রাখলাম।

—আচ্ছা ছেড়ে দিচ্ছি—

—ছেড় না। তাহলে আবার ফোন করব! তোমার দিদি জামাইবাবুর কাছে তোমার তাহলে প্রেস্টিজ থাকবে না।

—কী বলতে চাও বল।

—আমার বাঁ হাতে টেলিফোন, ডান হাতে সাপের গলা ধরে আছি। ওটা বিড়ে প্যাকিয়ে আমার কোলে পড়ে আছে। খুব রেগে আছে ইদানীং। দিনরাত আমি ঘুম থেকে টেনে তুলি। খেলা করি! কাজেই সুযোগ পাওয়ামাত্র ও আমাকে কামড়াবে। এক্ষুনি কামড়াতে পারে। পাকা ম্যাচিওরড্ গোখরো। বিষের থলি ভরভরন্ত—বুঝলে ?

শ্যামার হাত কাঁপতে থাকে। বলে—বুঝেছি।

নয়ন বলল—তোমার কাকা একটা খবর দিয়ে গেল এই মাত্র।

—কী খবর ?

—তোমার মা বাবা রাজি। কাকা রাজি করিয়েছে। তাকে পাঁচশো টাকা দিয়েছিলাম।

শ্যামা আস্তে করে বলে—তাতে কী হল ?

—কিছুই না শ্যামা, তুমি রাজি না হলে কিছুই না। আমি জানি। তবে তোমার বাবার মত পাওয়া গেছে—সেটাও কম কথা নয়। তুমি ভয় পেয়েছিলে!

—আমি রাজি নই।

—তোমাকে রাজি করানোর জন্যই এই টেলিফোন। শ্যামা, তুমি রাজি না হলে আমি আমার ডান হাতের মুঠোটা আলগা করে দেব। সাপটা তৈরী আছে। এখন ভেবেচিন্তে বল। আমি ইয়ার্কি করছি না।

—নয়ন! আত্মবিস্মৃতের মত নামটা উচ্চারণ করে শ্যামা। এতক্ষণ নামটা উচ্চারণ করে নি পাছে কমলাদি আর শঙ্করদা জেনে ফেলে।

boiRboi.net

নয়ন ধীর গলায় বলে—বল শ্যামা, শুনছি।

—তুমি কি পাগল?

—হতেও পারি। আমি যে কী তা ভেবে পাই না। তবে তোমাকে বিয়ে করার জন্য আমি এত তাড়াহুড়ো করতাম না শ্যামা, অপেক্ষা করতাম। কিন্তু তুমি সেদিন একজন ডাক্তারের কথা বলেছিলে, সেই থেকে আমার মাথার ঠিক নেই। আমি এক্ষুনি জানতে চাই। বল।

—তা হয় না।

—তবে ছেড়ে দিই?

—আঃ নয়ন।

ওপাশে একটা আর্ত চীৎকার শোনা গেল। তারপর রিসিভার পড়ে যাওয়ার শব্দ।

শ্যামা খুব সাবধানে টেলিফোনটা রাখল। তারপর টেবিলটায় ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল।

—কী হয়েছে রে? বিছানা ছেড়ে কমলাদি উঠে আসে।

—ওকে বোধ হয় সাপে কামড়াল। উদ্‌ভ্রান্তের মত বলে শ্যামা।

—কাকে?

—নয়নকে।

—সে কী! কী বলছিস যা তা?

—কী জানি। শ্যামা মাথা ঠিক রাখতে না পেরে চারদিকে টালুমালু চেয়ে বলে—ইয়ার্কীও হতে পারে!

—তুই এদিকে আয় তো, বিছানায় বোস। ওগো, তুমি পাখাটা আস্তে করে ছেড়ে দাও তো!

ইয়ার্কীই। সাপের শব্দটা টেলিফোনে হুবহু নকল করেছিল নয়ন। শ্যামাকে টেলিফোন করার সময়ে সাপটা তার কাছে ছিলই না।

গতরাতে নয়ন দশটা সোনেরিল খেয়েছিল গুনে গুনে। ঘুম আসে নি। ইমুমিউনিটি এসে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। পৃথিবীর সব ঘুমের ওষুধের প্রতিক্রিয়া একদিন নষ্ট হয়ে যাবে। সেদিন অবিরল জেগে থাকবে নয়ন, একটা অস্পষ্ট ভয় বুকের মধ্যে ঘনিয়ে ওঠে।

কাল রাতে একটা ব্যাঙকে ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জের ছুঁচের খোঁচায় আধমরা করে সাপটাকে খেতে দিয়েছিল নয়ন। খুব খিদে ছিল ওটার। যখন মুখটা তুলে ব্যাঙটাকে ধরল, তখনই নয়ন লক্ষ্য করে সাপটার সামনের দুটো দাঁত হুলের মত জেগে উঠেছে। আগে লক্ষ্য করে নি সে। লক্ষ্য করে গাটা একটু শিরশির করেছিল তার। নয়নের সব অত্যাচারের কথা ও কি মনে রেখেছে? কে জানে! ঝাঁপিটা সাবধানে আবার চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছে সে। খোলে নি।

শ্যামা রাজি হল না। হবে না। জানত নয়ন। দিন আর রাতের দুজন নার্স মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগ রাখে নয়ন। উপহার দেয়। সুন্দর সব

কথা বলে। ভাড়াটে মেয়েদের কাছেও ঘুরে এসেছে সে এর মধ্যে কয়েকবার। কিন্তু জুড়োয় না। কিছুতেই জুড়োয় না নয়ন। শরীরের মধ্যে কী একটা তার নেই! সে কি ক্লোরোফিল? ভিটামিন? ক্যালসিয়াম? ফেলে-রাখা মেটেরিয়ামেডিকা, অ্যানাটমির বই খুলে খুলে রাত জেগে দেখে সে। কিছু বুঝতে পারে না।

মাঝে মাঝে ভাবে, সে আমেরিকা, ফ্রান্স বা মোনাকোতে চলে যাবে। সেখানে সারারাত ফুর্তি করার অঢেল জায়গা। মদ খাবে, নাচবে, জুয়া খেলবে, মেয়েছেলে পাল্টে দেখবে রোজ। বিদেশে সারারাত শহর জেগে থাকে। কিন্তু কিছু স্থির করতে পারে না সে।

কয়েকদিন বাইরে ঘুরে আসে সে। তার ঘরে এসে এক গভীর রাতে সাপের ঝাঁড়ির ঢাকনাটা খোলে।

প্রস্তুত ছিল না নয়ন। অপ্রত্যাশিত সাপটা ঝাঁপির ঢাকনা খোলা মাত্র লক্ লক্ করে জেগে ওঠে। ও বুঝতে পেরেছে কি যে ও এখন সশস্ত্র! একটা চকিত লাফে সরে যায় নয়ন। সাপটা শরীর ক্রমশঃ উঁচু থেকে উঁচুতে তুলে ধরতে থাকে। নয়নের বুক সমান উঁচু তার তীব্র ফণা। মিটমিটে চোখে নয়নের চোখ আটকে রাখে মায়াবী সম্মোহনে কিছুক্ষণ। তার শিকরের মত চেরা জিভ দ্রুত নড়তে থাকে। অসম্ভব ফোঁসফোঁসানীতে ভরে যায় ঘর। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে নয়ন। তারপর ধীরে ধীরে সাহসভরে অভ্যাসবশতঃ সে তার দস্তানা-পরা হাতটা এগিয়ে দেয়।

আক্রমণ। প্রতি আক্রমণ। নয়নই জেতে। এক সময়ে ছোবল দেওয়ার মুখে ধরে ফেলে ঘাড়। তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে হাসে। ধীরে ধীরে ঝাঁপির ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় সাপটাকে। দস্তানা খুলে সিগারেট ধরায়। বিছানায় বসে থাকে জেগে। সারা রাত। কখনও বা মুঠো মুঠো সোনেরিল খেয়ে দেখে। বৃথা।

একদিন শ্যামার কাকা হন্তদন্ত হয়ে এসে খবর দিল—নয়ন, শ্যামার বিয়ের কথা চলছে।

নয়ন উদাস গলায় বলে—কার সঙ্গে?

—খবর পাই নি। তবে এক পার্টি ওকে দেখে পছন্দ করে গেছে।

নয়ন চুপ করে থাকে। কিছু একটা করা উচিত, তার মনে হয়। কিন্তু বড় গভীর ক্লান্তি তার আজকাল।

মাঝে মাঝে এমন হয়, পুরানো ব্রাণ্ডের সিগারেটটা বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়। তখন মানুষ বিরক্ত হয়ে ব্র্যাণ্ডটা পাল্টে নেয়। তেমনই কিছু একটা ভাবল নয়ন, ব্র্যাণ্ডটা পাল্টে নেবে কিনা। তারপর আর সেই ভাবনাটাও রইল না। সম্পূর্ণ শূন্য মাথায় সে বসে রইল।

সে বুঝতে পারে, শ্যামা নয়, কিছু নয়, একটু ঘুম ছাড়া সে আর কিছু চায় না।

সাপটাকে জগদীশের কাছে দিয়ে আসবে, ভেবেছিল। কিন্তু দিল না নয়ন। রেখে দিল। থাক। সে আজকাল ইঞ্জেকশন নেয় নিজে নিজে। তারপর ঘুমোয়। একদিন যখন ইঞ্জেকশনের ক্রিয়াও কমে আসবে তখন ভয়ঙ্কর ঐ দাঁতওলা সাপটাকেই জাগাবে সে।

কে জানে ওর দাঁতেই শেষ ঘুমের ওষুধটা রয়ে গেছে কিনা।

boiRboi.net

ভুল সত্য

boiRboi.net

boiRboi.net

দিগিন বসে আছেন ইজিচেয়ারে। সামনে উঁচু টুলের ওপর পা দুখানা তোলা। দুপায়ের পাতার ফাঁক দিয়ে শরৎকালীন পরিষ্কার আকাশে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার কোলে একটু মেঘ। দিগিন দুপায়ের ফাঁক দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে একটু বিরক্তির সঙ্গে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর বাঁ হাতের কাছে ছোট টেবিলের ওপর একটা দামী ট্রানজিস্টার রেডিও। রেডিওর সামনে চায়ের খালি কাপ, কাপের পাশে মাদ্রাজী চুরুটের বাক্স দেশলাই। কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে রোদের ঠিক্‌রে আসা আলো চোখে কট কট করে লাগে। পায়ের পাতা জড়ো করে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে ঢেকে দেন তিনি।

একটু আগে খবর হচ্ছিল রেডিওতে। তিনি খবরটায় মনঃসংযোগ করার চেষ্টা করছিলেন। সংবাদ-পাঠক বলে যাচ্ছিল, গতকাল ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর একটি জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, উভয়পক্ষই একটি করে গোল দেওয়ায় খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। আজ আবার বৈঠক বসবে। ইত্যাদি। দিগিন তখন থেকেই নিজের ওপর এবং কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর একটু বিরক্ত হয়ে আছেন। রেডিওটা বন্ধ করে দিলেন। অমনি নিচের তলা থেকে সরোজিনীর গান ভেসে আসে—এ প্রকাণ্ড জগতের মাঝে, যত মিষ্টি যেথা আছে, সব দিলাম মা তোমার ভোগে, রোগ সারা মা, রোগ সারা······সরোজিনী, দিগিনের বোন। এ সব গান সরোজিনী নিজেই বানায়, সুর দেয় আর গায়। সরোজিনীর স্বামী আজ বছর দুই বিছানায় শোয়া। তার রাজ্যের অসুখ, মাঝে মাঝে ওঠা-হাঁটা করে, আবার বিছানা নেয় দুদিন পর। সরোজিনী একটু পাগলী আছে। রামপ্রসাদী সুরে সারাদিনই গান গায়। ওর স্বামী হরিপদ মাঝে মধ্যে বিরক্ত হয়ে ধমকায়, চড়-চাপড়ও দেয়। কিন্তু তাতে সরোজিনীর কিছু পরিবর্তন হয় না।

দিগিন উভয়পক্ষের একটি করে গোল দেওয়ার রহস্যটা চোখ বুজে মনে মনে ভেদ করার চেষ্টা করছিলেন। কাল রাতে ভালই ঘুম হয়েছে তাঁর। মাঝরাতে একবার ঘুম ভেঙেছিল কুকুরের কান্না শুনে। মোদকের নেশায় ঘুম, সহজে ভাঙার নয়, তবু ভেঙেছিল। উঠে বাথরুম সেরে আবার শুতে যাওয়ার আগে কয়েক মিনিট বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কাঠের খুঁটির ওপর টংগী ঘর। বারান্দা থেকে অনেকদূর দেখা যায়। খুব বেশী গাছপালা থাকায় কুকুরটাকে দেখা গেল না। আকাশে মস্ত চাঁদ উঠেছে কৃষ্ণপক্ষের। মাঝরাতে এইসব চাঁদ-ফাঁদ দেখলে কুকুর-বিড়াল কাঁদবেই। এই সময়টায় ওদের বোধহয় পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে। আবার শুলে শেষ রাতে তেমন ভাল ঘুম হবে না মনে করে দিগিন একটা ঘুমের বড়ি খানিকটা বীয়ার দিয়ে গিলে ফেলেন। বীয়ারের বোতলটা খুলে ফেলেছেন—তাই কী আর করেন, পুরো বোতলটাই সাফ করে শুয়ে পড়েন আবার। ঘুমের বড়িটা বেশ কড়া ধাতের, তার ওপর বীয়ার থাকায় কী একটা গোলমাল হয়ে গেল শরীরের মধ্যে। আজ সকাল পর্যন্ত মাঝে মধ্যে সেই গোলমালটা টের পাচ্ছেন, 'কান' শুনতে 'ধান' শুনছেন। ভারত আর সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে তো ফুটবল খেলা হয় নি যে গোল হবে।

কাঠের সিঁড়িতে ঝোড়ো বেগে পায়ের শব্দ তুলে কে উঠে আসছে। শানু। শানু ছাড়া কারো এত তাড়া থাকে না। দিগিন ভারী বিরক্তি বোধ করে চোখ বুজে ঘুমের

ভান করলেন। চুরুটটা জ্বলে জ্বলে ছোট হয়ে এসেছে, আঙুলে তাপ লাগছে।

শানু ঘরে ঢুকেই ডাকে—ছোটকাকা।

দিগিন উত্তর দেন না।

শানু কাছে আসে, ইজিচেয়ারের ওপর ঝুঁকে বলে—ও কাকা।

দিগিন চুরুটটা মুখে তুলে চোখ না খুলেই বলেন—হুঁ।

—ঘুমোচ্ছ?

—শরীরটা ভাল নেই।

—কেন?

—সোপস্টোনের সেই ডিপোজিটটা ভুটান গভর্নমেণ্ট আমাদের ইজারা দিতে রাজী হয়েছে, কিন্তু অনেক টাকা চাইছে।

—কত?

—পরিষ্কার করে কিছু বলে নি। শান্তি আজ আবার যাবে কথাবার্তা বলতে।

দিগিন চোখ খোলেন না। বলেন—খামোখা।

—এত খরচা করলাম, এখন পিছিয়ে যাবো?

—গেলেই ভাল। নইলে আরো টাকা ক্ষতি হবে। মোট কত খরচ হয়েছে?

—হিসেব তো এখনো শেষ করি নি। খরচ তো এখনো হচ্ছে। তবে হাজার তিরিশেক বেরিয়ে গেছে।

—আরো যাবে।

—লস্ হবে বলছ?

—হবে।

—কেন?

—ডিপোজিট কতটা আছে পরীক্ষা করিয়েছ?

—করিয়েছি।

—কী বলে সার্ভেয়াররা?

—কিছু বলতে পারছে না, ওপরের দিকের পাথরের কোয়ালিটি ভাল নয়। নিচের দিকে ভাল জিনিস থাকতে পারে। ঠিক কতটা ডিপোজিট আছে বলতে পারল না, বলা নাকি সম্ভব নয়।

—হুঁ। দিগিন বলেন।

—কী করব?

—যা বলবার তা তো বহুকাল আগেই বলে দিয়েছি। এখনো অল্প ক্ষতির ওপর ছেড়ে দাও।

—কিন্তু কলকাতায় যে নমুনা পাঠিয়েছিলাম তাতে অনেক ভাল খদ্দের ইণ্টারেস্ট দেখিয়েছে। দরও ভালই পাবো।

দিগিন চোখটা খুললেন। পায়ের পাতা সরে গেছে, কাঞ্চনজঙ্ঘার গা থেকে ঠিকরে আসা রোদ আবার চোখে কটাশ করে লাগে। চোখটা বুজে ফেলে বলেন—যা ভাল বোঝ করো।

শানু অধৈর্য হয়ে কাঠের পাটাতনে জুতো ঠুকে বলে—তুমি একদম অ্যাডভাইস

boiRboi.net

দিচ্ছ না। গত দু'বছর চারটে লোককে দৈনিক চুক্তিতে লাগিয়ে রেখেছি। তারা দিনরাত খুঁজে খুঁজে বহু কষ্টে শেষ পর্যন্ত যাও বা ডিপোজিটটা খুঁজে পেল তাও এখন যদি কাজে লাগাতে না পারি তাহলে আমার মনের অবস্থাটা কী হয় একবার ভেবে দেখেছ? কত টাকা জলে যাবে।

—সোপস্টোন তো আর হীরে-জহরৎ নয়। ওর পিছনে দু'বছর অত টাকা ঢালা বোকামী হয়েছে। আগেই তোমার ভেবে দেখা উচিত ছিল।

শানু রেগে গিয়ে বলে—কিন্তু ভুটান গভর্নমেণ্ট অত টাকা চাইবে কেন? ডিপোজিটটার খোঁজও তো ওরা রাখে না, আমরা খুঁজে পেয়েছি। সুতরাং রাইট তো আমাদের। ওদের উচিত নমিনাল একটা টাকা নিয়ে খনিটা ছেড়ে দেওয়া।

দিগিন হাসলেন। বললেন—তা তো দেবেই না, বরং ওরা তোমাদের হটিয়ে নিজেরাই সোপস্টোনটা তুলে ব্যবসা করবে।

—কিন্তু আমরা যে ওটা খুঁজতে বিস্তর টাকা ঢাললাম, সেটা কে দেবে? ওরা দেবে?

—খোঁজার সময়ে তো ওদের পরামর্শ নাও নি। ঘরের টাকা ঢেলে বরং ওদের জায়গাটা দেখিয়ে দিয়েছ। ওরা দেবে কেন?

—কিন্তু দেওয়া তো উচিত।

—ওদের সেটা বোঝাও গিয়ে।

শানু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর একটা শ্বাস ফেলে বলে—আমি লাভ চাইছি না। খরচটা যদি উঠে আসত।

—উঠবে না। বরং আরো টাকা বেরিয়ে যাবে। কোথায় কোন জয়ন্তীয়ায় নদীর ধারে একটা সোপস্টোনের টুকরো খুঁজে পেয়ে কে একজন এসে তোমাকে খবর দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তধন পাওয়ার মতো নেচে উঠলে। দুনিয়ায় যদি এত সহজেই সব পাওয়া যেত!

কাঠের মেঝেয় শানু পায়চারি করতে থাকে। দিগিন চোখ দুটো অল্প একটু খুলে ভাইপোকে দেখেন। বংশটাতেই পাগলের বীজ আছে। জয়ন্তীয়ার নদীর ধারে সোপস্টোনটা খুঁজে পেয়েছিল শান্তি পাল নামে একজন ভবঘুরে। সে কেমন করে শানুকে বশ করে বুঝিয়েছিল—কাছে-পিঠেই সোপস্টোনের মস্ত কোনো খনি আছে। শানুও নিশ্চিত হয়ে লোকটাকে খোঁজার কাজে লাগায়। লোকটা দিনে বারো টাকা নিত, সঙ্গে আরো তিনজন হা-ঘরেকে জুটিয়ে নিল, তারা পেত দিনে আট টাকা। এ ছাড়া ছিল আনুষঙ্গিক খরচ-খরচা, ত্রিশ হাজারের বেশীই বেরিয়ে গেছে। পায়ের পাতায় আবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ঢাকা দেন দিগিন। চোখ বোজেন এবং উভয়পক্ষের একটি করে গোল দেওয়ার বিষয়টা ভাবতে থাকেন।

শানু আবার সামনে এসে দাঁড়ায়। ধৈর্যহীন, চঞ্চল, ক্ষুব্ধ।

—ছোটকাকা।

—হুঁ।

—অনেক লস হয়ে গেল!

—বুঝতে তো পারছি।

boiRboi.net

—বুঝতে পেরে চুপচাপ বসে আছ কী করে!

—কী করব ?

—কিছু একটা করা তো দরকার।

—দু'বছর ধরে চারটে লোকের কর্মসংস্থান করেছ—এতো ভালই। তোমার লাভ যদি লবডংকাও হয়, তবু ঐ চারটি লোকের অনেক আশীর্বাদ তোমার পক্ষে জমা হয়েছে। সেইটাই স্যাটিসফ্যাকশন।

শানু কোমরে হাত দিয়ে ঋজু দাঁড়িয়ে তার অকৃতদার, বিচক্ষণ এবং দার্শনিক কাকাটিকে ভ্রূ কুঁচকে দেখে বলে—তুমি একদম ফিলজফার হয়ে যাচ্ছ।

—যাচ্ছি না। গেছি। বলে আর একটা সরু মাদ্রাজী চুরুট সযত্নে ধরিয়ে নেন দিগিন। সোয়া আটটা বাজে, এক্ষুনি তাঁর তৃতীয় কাপ চা আসবে। ত্রিশ টাকা কিলোর চা, গন্ধে ঘর মাৎ হয়ে যায়। সম্ভাব্য চায়ের কথা ভাবতে তিনি স্ফূর্তিযুক্ত হয়ে বলেন—যা গেছে গেছে। ছেড়ে দাও। ঐটাই শেষ পর্যন্ত টিকবে।

—যে টাকাটা লস হল তাতে তোমারও শেয়ার আছে, ভুলে যেও না।

—ভুলি নি বলেই তো বলছি। আরো যা লস্ হবে তাতেও আমার শেয়ার থাকবে। বিপদে পণ্ডিতরা অর্ধেক ত্যাগ করেন।

শানু একটা বড় শ্বাস ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সে যেতে না যেতেই পুন্নি চা নিয়ে আসে।

—ছোটমামা।

—হুঁ।

—চা।

—হুঁ।

ঠক্ করে চা টেবিলে রেখে পুন্নি বলে—কারা যেন আসছে আজকে আবার।

দিগিন অবাক হয়ে বলেন—কারা ?

—কী জানি! পুন্নি ঠোঁট উল্টে বলে—শুনছি কারা যেন আসবে।

—কত কে আসে। দিগিন দার্শনিকের মতো বলেন—কার কথা বলছিস ?

—তুমি বুঝি জানো না ? কে এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বাবা আসবে, সবাই বলছে।

—ও। বলে দিগিন সুগন্ধী চায়ে চুমুক দেন। আগুন গরম চা। গরম ছাড়া খেতে পারেন না দিগিন। দোতলায় উঠতে উঠতে ঠাণ্ডা মেরে যায় বলে দোতলায় পাশের ঘরেই চায়ের সরঞ্জাম রাখেন দিগিন। পুন্নি ঠিক সময়ে আসে, নিঃশব্দে চা করে দিয়ে যায়। ওর হাতে চামচ নাড়ার বা কেটলির হাতলের কোনো শব্দ হয় না। ভারী লক্ষ্মী মেয়ে।

—তা কী করবে ? পুন্নি জিজ্ঞেস করে।

—কী করব ? এলে আসবে।

—আমি সামনে যাবো না।

—সামনে যাওয়ার জন্য যাবি কেন। চা-টা দিয়ে আসবি। কিছু জিজ্ঞেস করলে জবাবটা দিবি। তার বেশি কিছু করতে হবে না।

—আমি সামনেই যাবো না।

—কেন?

—আমার ভাল লাগে না।

—ও। বলে দিগিন হাত বাড়িয়ে রেডিওটা চালিয়ে দেন। লোকগীতি হচ্ছে। লোকগীতি মানেই দমের খেলা। দিগিন রেডিও বন্ধ করে দেন। পায়ের পাতায় ওপাশে কাঞ্চনজঙ্ঘা মেঘে ঢাকা পড়েছে।

—ছোটমামা।

—হুঁ।

—আমি যা বলেছি শুনেছ তো।

—শুনলাম।

—আমি সামনে যাবো না।

—আচ্ছা।

—আচ্ছা বললে হবে না। তখন মা চেঁচাবে, বাবা বকবে, বড়মামা আর মেজমামা তম্বি করবে, তা হবে না। আমি তোমাকে বলে রাখলাম, তোমাকে সামলাতে হবে সব দিক।

দিগিন 'হুঁ' দেন।

—ঠিক তো? পুন্নি সন্দেহে জিজ্ঞেস করে।

—হুঁ।

—কী করবে?

—তোর বদলে দক্‌লীকে দেখিয়ে দেবো।

—টের পাবে না?

—টের পাবে কেন? এতো বড় সংসারে কত মেয়ে, কারটা দেখে যাচ্ছে তার ঠিক কী? দক্‌লীও তো আমাদের ভাগনীই। তোর চিন্তা নেই।

পুন্নি মুখ বেঁকায়। বলে—আহা।

দিগিন বলেন—কী হল?

পুন্নি শ্বাস ফেলে বলে—দক্‌লী ঠিক ধরা পড়ে যাবে।

—ধরা পড়ার কী? চুরি করছে নাকি? তুই বিকেলের দিকটায় বরং বাড়িতে থাকিস না।

পুন্নি উত্তর না দিয়ে জোরে পা ফেলে হেঁটে যায়।

বহুকাল আগে দিগিন একবার একটা কাণ্ড করেছিলেন। কয়েকজন ডাকসাইটে মাতালকে নেমন্তন্ন করেছিলেন সেবার। তার আগের দিন একটা প্রকাণ্ড তরমুজ কিনে এনে তার একদিকে ফুটো করে সব শাঁস বের করে ফেলেন, তারপর সেটাতে ধেনো, হুইস্কি, ব্র্যাণ্ডি, রাম, জিন ইত্যাদি ভরে ফুটোটা বন্ধ করে দেন। একটা ছোট ভাইপোকে ডেকে এনে ঘরের একধারে তাকে বসিয়ে অন্য ধারে নিজে বসেন। তরমুজ-টাকে একবার ভাইপোর দিকে গড়িয়ে দেন, ভাইপো আবার তাঁর দিকে গড়িয়ে দেয়। এইভাবে ঘণ্টাকয়েক গড়াগড়ি খেয়ে তরমুজটা কী মারাত্মক অ্যাটম বোম্‌ তৈরী করে রেখেছিল পেটের মধ্যে; তার কোনো ধারণা ছিল না দিগিনের। পরদিন বন্ধুদের

boiRboi.net

এসে পৌঁছুনোর আগেই তিনি জিনিসটা একটু গেলাসে ঢেলে চাখতে গিয়ে সেই যে দুনিয়ার বার হয়ে গেলেন, ফিরে আসতে আসতে পরদিন সকাল। বন্ধুরা যথাসময়ে এসেছিল। কিন্তু মাতাল হলেও তারা মৃত্যুশীল এবং সকলেরই কিছু প্রাণের মায়া কম নয়। দিগিনের অবস্থা দেখে ঐ তরমুজের ধারে কাছেও তারা ঘেঁষে নি। দিগিনের আজও মনে পড়ে সেই মারাত্মক নেশার পর শরীরের মধ্যে যে গোলমাল হয়ে গিয়েছিল, কাল রাতে বীয়ার দিয়ে ঘুমের বড়ি খাওয়াতেও তেমনি কিছু গোলমাল হয়ে গেছে। তবে জীবনটাকে নানা এক্সপেরিমেণ্টের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়াটাই আসলে জীবন। আলো যেমন প্রতিহত না হলে আলো বলে মনে হয় না, জীবনটাও কি তাই নয়?

ব্রিটিশ আমলের শেষদিকে দিগিন যখন ভাগ্যান্বেষণে এই শিলিগুড়িতে আসেন তখন শিলিগুড়ি ছিল ছোট গঞ্জ শহর। একমাত্র স্টেশনটাই ছিল রমরমা। দার্জিলিংয়ের যাত্রীরা ব্রডগেজ থেকে নেমে ন্যারোগেজের খেলনা গাড়িতে ওঠার আগে এখানে ব্রেকফাস্ট সারত। যাত্রীদের মধ্যে তখন অধিকাংশ দাপুটে লালমুখো সাহেব। এ ছাড়া শহরটা ছিল ঘুমন্ত, জনবিরল। তখনই এখানে কিছু ঠিকাদারীর কাজ পেলেন দিগিন, কাঠের কারবারে নামলেন, কমলালেবু আর চায়ের ব্যবসাতেও হাত দিয়েছিলেন। সেই সময়ে কাঠের টংগী ঘর সমেত হাকিমপাড়ার এই জমিটা তাঁর হাতে আসে। একা থাকতেন, রান্নাবান্নার একটা লোক ছিল। দিব্যি জমে গেলেন এইখানে। তখন থেকেই বারান্দায় বা ঘরে বসে টেবিলে ঠ্যাং তুলে মেঘহীন দিনে নিজের পায়ের পাতার ফাঁক দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা তাঁর অভ্যাস। আর একা-বোকা থেকে থেকেই তাঁর নানা নেশার পত্তন হয়। পচাই দিয়ে শুরু, গাঁজা, গুলি, মোদক কিছুই বাদ রাখেন নি। এখনো তাঁর নেশার কিছু ঠিক নেই। যখন যেটা ইচ্ছে হয় খান। বাঁধা-ধরা জীবন ভাল লাগে না।

দেশ-ভাগের পর হুড়মুড় করে বড় দুই ভাই, তাদের বৌ, দুই বোন, স্বামী, বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে বিশাল এক দঙ্গল এসে পড়ল। একাকীত্বটা সেই চলে গেল দেশছাড়া হয়ে। টংগী ঘরটার আশেপাশে আরো দুখানা বাড়ি উঠল। অবশ্য একান্নবর্তিতা তাঁদের ভাঙে নি। বড় পাকশালে সকলের রান্না হয়। বড়দা উকিল, মেজ জনের ওষুধের স্টেশনারী, বড় ভগ্নীপতি কয়লার ব্যবসা করে, ছোট ভগ্নীপতি অসুখে ভোগে বলে শালাদের ঘাড়ে পড়ে আছে। চাকরি তাকে করতেও দেওয়া হয় না।

সকালে সেবক রোডের মোড়ে কাঞ্চনের সঙ্গে দেখা। কাঞ্চনকুমার লালোয়ানি। মোটরসাইকেলটা থামিয়ে দিগিন ডাকলেন—কাঞ্চন।

কাঞ্চন তার ভোকসওয়াগন থামিয়ে পান খেতে নেমেছিল মোড়ের দোকানটায়। পরনে খুব দামী একটা বিলিতি সিন্থেটিক ফেব্রিকের লাল গেঞ্জি, সাদা প্যারালেল ছাঁটের প্যাণ্ট, পায়ে চপ্পল, চোখে বড় মাপের রোদ-চশমা। জুলপী চুল সব হালফ্যাশনের। পিছু ফিরে দিগিনকে দেখেই দুখিলি পান তাড়াহুড়ো করে মুখে পুরে এগিয়ে আসে।

boiRboi.net

—আরে দিগিনদাদা !

—যাচ্ছিস কোথায় ?

—কাল রাতে জোর ধস্ নেমেছে তিনধারিয়ার কাছে। বাবাজী তো খার্শাংয়ে আট্কা পড়ে আছেন। আজ সুবায় ফিরবার কথা। যাচ্ছি ধসের সাইটে, যদি পায়দল এপারে আসতে পারে তো নিয়ে আসবো।

দিগিন বলল—ধস্ ? কৈ আমি তো শুনি নি।

—শুনবেন কী করে ? আজকাল তো ঘরের বাইরে আসেনই না। দুনিয়ায় কত কিছু হয়ে যাচ্ছে। বুড়ো হয়ে গেলেন নাকি ?

সাজগোজ যাই করুক কাঞ্চনের বয়স পঁয়তাল্লিশ পেরিয়েছে। হিলকার্ট রোডে একটা প্রকাণ্ড কাপড়ের দোকান দিয়েছে সম্প্রতি। আর আছে মদের দোকান, মোটর পার্টসের বিশাল প্রতিষ্ঠান। একসময়ে ওর মোটর পার্টসের কারবারে কিছু টাকা লগ্নী করেছিলেন দিগিন। কিন্তু সংসারের চাপে, দুঃসময়ে টাকাটা তুলে নিতে হয়েছিল। রাখতে পারলে আজ ভাল আয় হত।

দিগিন বলেন—বের হয়ে হবে কী ? কাজ কারবার কিছু নেই।

—কাজ নেই কে বলে ? অনেক কাজ পড়ে আছে। আসেন না একদিন গরীবের বাড়িতে। ডিস্কাস্ করা যাবে।

দিগিন লক্ষ্য করেন, কাঞ্চনের জুল্পীর চুলে কলপ দেওয়া। কয়েকটা সাদা দেখা যেত আগে, এখন নেই। দিগিন বলেন—আসব'খন। শানুটার জন্য বড় চিন্তা হয়। সোপস্টোনের পিছনে বহুত গচ্চা দিয়েছে।

কাঞ্চন হাসে, বলে—শানুর মাথায় পোকা। সোপস্টোনের কারবার কিছু প্রফিটেবল হলে শিলিগুড়ির মার্চেণ্ট আর ঠিকাদাররা বসে আছে কেন ? আমি তো আগেই জানি, টাকা জলে যাচ্ছে। দেখা হলে আমি তো বলি শানুকে, শানু রেগে যায়।

ঝকঝকে সবুজ ভোকসওয়াগনটার দিকে চেয়ে দিগিন বলেন—বেশ আছিস কাঞ্চন।

—হাঁ দাদা, ভাল আছি। তবে ভাল আর থাকা যাবে না।

—ও কথা সবাই বলে।

—জোর কম্পিটিশন। এখন সকলের হাতে টাকা, বাজার স্যাচুরেটেড।

গিমিক। দিগিন জানেন। গত সাতাশ বছরে শিলিগুড়ির বাতাসে টাকা কম ওড়ে নি। তাঁর চোখের সামনেই শিলিগুড়ি উত্তর বাংলার সবচেয়ে বড় ব্যবসাকেন্দ্র হয়ে উঠল, কিন্তু তাঁদের পরিবার পুরনো ঠিকাদারীর ব্যবসা ছাড়া আর কিছু ধরতে পারল না। বড়দা অবশ্য ব্যবসাতে নেই, ওকালতী করে তার একরকম চলে যায়। মেজ জন পুরনো বাজারে একটা স্টেশনারী দোকান দিয়ে বসে আছে বহুকাল। তেমন কিছু লাভ হয় না। শানু আর দু'জন ভাইপোকে নিজের ঠিকাদারীতে নামাতে পেরেছেন দিগিন। ওরা যত লোভী তত চালাক নয়। রাতারাতি বড়লোক হওয়ার আশায় ওরা বিচিত্র সব কারবারে নাক গলাতে যায়। চোট হয়ে অবশ্য ফিরে আসে। দিগিনের অবশ্য এখন আর তাতে কিছু যায়-আসে না। আটান্ন বছর বয়স, কিছু থোক টাকা আছে—চলে যাবে। কিন্তু ভাইপোদের জন্য একরকম দুশ্চিন্তা রয়েই

গেল। কাঞ্চনকে তাই একটু ভাল করে দেখে নেন দিগিন। ছোকরা বেশ দাঁড়িয়েছে।

দিগিন বলেন—শান্টাকে ব্যবসাতে নামিয়ে নিবি কাঞ্চন?

কাঞ্চন জর্দা-পানের পিক ফেলে বলে—শানু নামবে না।

দিগিন সেটা জানেন। একটু শ্বাস ফেলে মোটরসাইকেলের স্টার্টারে একটা লাথি মেরে বলেন—তোর সঙ্গে একদিন বসব।

—আচ্ছা।

কাঞ্চন তার ভোকসওয়াগনে উঠল। দিগিন হিলকার্ট রোড ধরে ব্যাঙ্কে এলেন।

সোমবার। বড্ড ভিড়। চেকটা জমা দিয়ে এজেন্টের ঘরে ঢুকে গেলেন। এজেন্ট ভটচায বুড়ো হয়ে এসেছেন। মাস দুয়ের মধ্যেই রিটায়ার করে চলে যাবেন। ভটচাযের বুড়োটে ভাবটা অবশ্য বয়সের জন্য নয়। দিগিনেরও ঐরকমই বয়স। ভটচায বুড়িয়ে গেছেন পেটের অসুখে আর হাঁপানীতে। শিলিগুড়ির ওয়েদারকে গালাগাল দেওয়া হচ্ছে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বিষয়।

—কী খবর দিগিনবাবু?

কাঞ্চনের সাফল্যের ছবিটা চোখের সামনে জ্বলছে, দিগিন তাই বিষণ্ণ গলায় বলেন —এই তো।

ভটচায দিগিনের অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করলেন। কিন্তু বেশী কথার মধ্যে গেলেন না। তিনজন লোক ঘরে বসে আছে, কর্মচারীরা ব্যস্ত হয়ে আসছে কাগজপত্র সই করাতে। ব্যস্ত ভটচায শুধু বললেন—এবার পুজোয় চলে যাচ্ছি, বুঝলেন?

—হুঁ।

—আপনাদের শিলিগুড়ি ছাড়ছি শেষ পর্যন্ত।

বলে ভটচায ব্যস্ত রইলেন কিছুক্ষণ। মিনিট কুড়ি পর একটু ফাঁক পেলেন। সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—একটা খান। চুরুট খেয়ে বুক তো পুড়িয়ে ফেলেছেন।

দিগিন মাথা নাড়লেন। নিজের সরু মাদ্রাজী চুরুট ছাড়া অন্য কিছু তেমন ভাল লাগে না। ফস্‌ফসে ধোঁয়ায় ভারী বিরক্তি আসে।

ভটচায বলেন—নেশাটেশা করেন বটে, কিন্তু চেহারাটা এখনো কিন্তু ঠিক রেখেছেন। এখানকার জল-হাওয়ায় কী করে ফিট্ থাকেন মশাই।

—ফিট্ থাকি নেশা করি বলেই।

—সব নেশাখোরই ও কথা বলে।

—মাইরি। মদ শরীরের সব জীবাণু নষ্ট করে দেয়।

—কিন্তু মদটা তো থাকে পেটে।

—হ্যাঁ। লিভারের বারোটা বাজায় আস্তে আস্তে। তবে মদ খেলে মদের এফেক্ট ছাড়া অন্য কোনো রোগ বড় একটা হয় না।

ভটচায একটু আগ্রহ দেখিয়ে বলেন—সত্যি?

দিগিন চুরুটটা আরামে টেনে হেসে বলেন—কোনো মাতালের ছোটখাটো অসুখ দেখেছেন কখনো? জেনুইন মাতালের ওসব হয় না। মদ খুব বড় জীবাণুনাশক।

—দূর।

—মদে ভিজিয়ে রাখলে কোনো জিনিস সহজে নষ্ট হয় না জানেন? তাই ওষুধে অ্যালকোহল থাকে প্রিজারভার হিসেবে।

ভটচায চিন্তিত মুখে বলেন—তা বটে।

—তবেই দেখুন। স্টমাকটাকে মদে ডুবিয়ে রাখলে তার প্রিজারভেশনের ক্ষমতা বাড়ে কিনা।

—আফিং খেলে পেটের রোগ সারে শুনেছি।

—তাও খেতে পারেন। তবে ও হচ্ছে ঝিমুনী নেশা।

—না না, নেশার জন্য নয়। ওষুধ হিসেবে।

দিগিন মৃদু হেসে বলে—অ্যালকোহল আরো ভাল। আজ রাতে আসুন আমার ওখানে, একটা মজার জিনিস খাওয়াবো। দেশী জিনিস, সঙ্গে একটা পাতার রস মিশিয়ে দেবো। দেখবেন, কাল সকালে কেমন ফাইন হাগা হয়।

দিগিনকে সঠিক বিশ্বাস করতে পারেন না ভটচায। সন্দেহের চোখে চেয়ে থাকেন। বলেন—আমাকে গিনিপিগ বানিয়ে কোনো এক্সপেরিমেণ্ট করবেন না তো?

—গিনিপিগ। বলে হা হা করে হাসেন দিগিন। মাথা নেড়ে বলেন—আরে না না।

ঘরে আবার লোকজন ঢুকে পড়ে। ভটচায ব্যস্ত হয়ে পড়েন। দিগিন আপন মনে হাত দুখানা টিপে-টুপে পরীক্ষা করে দেখেন। হাওয়াই শার্টের হাতা গুটিয়ে বাইসেপটা টেপেন একটু। না, আটান্নতেও তার মাংসপেশী বেশ শক্ত আছে। ঝুলে যায় নি। বুড়ো বয়সটা একটা ধারণা মাত্র। অত্যাচার এই বয়সেও তিনি কিছু কম করেন না। তবু শরীরটা টান-টান, হাঁটা-চলা-পরিশ্রম কোনো যুবকের চেয়ে কিছু কম পারেন না।

ভটচায আবার একটু ফাঁক পেয়ে বলেন—শেষ পর্যন্ত আমাকে বুড়ো বয়সে নেশাভাঙ্ ধরাবেন না তো মশাই।

দিগিন ভট্চাযের সন্দেহকুটিল মুখখানা একটুক্ষণ দেখে নিয়ে বলেন—জীবনের একটা দিক একেবারে না জানা থাকা কি ভাল? নেশার চোখে দুনিয়াটা কেমন দেখায় তা দেখে রাখা ভাল। নইলে যখন ওপারে যাবেন, যখন যম জিজ্ঞেস করবে, বাপু হে, দুনিয়াটায় কি কি রকম সব অভিজ্ঞতা হল—তখন তো ব্যাঙ্কিং ছাড়া আর কিছু বলার থাকবে না।

ভটচায মুখখানা স্মিতহাসিতে ভরিয়ে তুলে বলেন—বয়সকালে রোজগারপাতির সময়টায় নেশাভাঙের পয়সা একরকম জোটানো যায়। আমার তো তা নয়। এই তো পারমানেণ্টলি বসে যাচ্ছি, রিটায়ারের পর নেশার পয়সা যোগাবে কে?

—ভূতে, নেশারু লোকের ও ঠিক জুটে যায়।

—না মাশাই, আমার ওসব দরকার নেই।

—আচ্ছা, না হয় নেশা নাই করলেন, একদিন একটু চাখলেই কি আর নেশা হয়ে যায়? নেশা করারও একটা প্রসেস আছে। চলে আসবেন আজকে, অন্তত একদিনের জন্য আপনার পেটের গোলমাল মেরামত করে দেবো। ঐ সঙ্গে রাতের খাওয়াটাও সেরে যাবেন, নেমন্তন্ন রইল।

boiRboi.net

বলে দিগিন ওঠেন।

—আচ্ছা যাবো, ভটচায হাসলেন।

ক্যাশ থেকে টাকা নিয়ে দিগিন আবার মোটরসাইকেলে ওঠেন। আজকাল আর তার একাউন্টে টাকা বড় একটা জমা পড়ে না। বরং প্রতিমাসেই চার-পাঁচটা উইথড্রয়াল হয় কমপক্ষে, তাঁর নিজস্ব সংসার নয়, দাদারাও রোজগেরে, তবু কি কারণে যেন সংসারের খরচের সিংহ ভাগ তাঁকেই দিয়ে আসতে হচ্ছে বরাবর।

মোটরসাইকেলটা নিয়ে ইতঃস্তত একটু ঘুরে বেড়ান তিনি, এম-ই-এস-এর একটা কনস্ট্রাকশন চলছে বাগডোগরায়, ভাবলেন সাইটটা একটু দেখে আসবেন। কিন্তু মহানন্দা ব্রীজ পেরিয়েই তাঁর দীর্ঘ রাস্তাটা ভেবে ক্লান্তি লাগল। থাকগে, ঠিকাদারীটা যখন শানুই দেখছে তখন আর তাঁর মাথা ঘামানোর কী আছে। সারাটা জীবন তো এই কর্মই করলেন।

বাইকটা ঘুরিয়ে নিলেন, শিলিগুড়ি যদিও তাঁর হাতের তেলোটার মতোই চেনা, তবু মাঝে তিনি কোথাও যাওয়ার জায়গা খুঁজে পান না। ভালও লাগে না। তাই খানিকক্ষণ এলোমেলা বাইকটা চালান দিগিন, শিলিগুড়ির শতকরা পঁচাত্তর ভাগ লোকই তাঁর চেনা। বাইক থামিয়ে দু-চারজনের সঙ্গে কথা বলেন, কয়েকটা চেনা জায়গায় উঁকি দিয়ে ফেরেন, কয়েকটা দোকান থেকে টুকটাক কেনাকাটা করে নিলেন। তবু সময় ফুরোলো না। বেলা এগারোটাই পেরোতে চায় না সহজে। শরৎকালটা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ঋতু। সেবক রোড ধরে একটু এগোলে মহানন্দার অববাহিকায় উপত্যকার মতো বিশাল নীচু মাঠ আর বালিয়াড়ি দেখা যায়। বাইক থামিয়ে চেয়ে রইলেন সেই দিকে। মুঠোভর একটা মেঘ সকাল থেকে চেষ্টা করে করে এতক্ষণে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে ঢেকে ফেলেছে। উজ্জ্বল রোদে তিনধারিয়ার বিন্দু বিন্দু বাড়িঘর নজরে আসে।

বহুকাল শালুগাড়ার বার্কাসিদ্ধাইয়ের কাছে যাওয়া হয় না। রেডিও স্টেশন পেরিয়ে খানিকদূর এগিয়ে বড় রাস্তা ছেড়ে ঢালুতে নামিয়ে বাইকটা রাখেন দিগিন। তারপর সরু পথ ধরে বাঁ ধারে নেমে যান। বড় রাস্তায় এক আধটা মিলিটারী জীপ দাঁড়িয়ে আছে। তার মানে বার্কাসিদ্ধাইয়ের কাছে মিলিটারীর লোক এসেছে। ভিড় অবশ্য সারাদিনই থাকে।

আটমাইলটাক হেঁটে গাছপালায় আচ্ছন্ন শান্ত জায়গায় পেঁাছে যান তিনি! অনেককাল আসা হয় নি। অবাক হয়ে দেখেন, এদের বাড়ি-ঘরের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। সচ্ছলতার চিহ্নগুলি দেখলেই বোঝা যায়। কেবলমাত্র লোকের ভবিষ্যৎ বলে দিয়ে উইদাউট ক্যাপিট্যালে বেশ দাঁড়িয়েছে এরা।

বাইরে খোলা একটা ঘর। আনাড়ি মিস্ত্রীর তৈরি দু-চারখানা বেঞ্চি পাতা। মিলিটারী, মেয়েছেলে, বুড়ো, বাচ্চা, জনা পঁচিশ লোক বসে আছে। অল্প বয়সী বার্কাসিদ্ধাই মেয়েটি হাতে সেই পুরনো একটা শিবলিঙ্গের মতো পাথরের দিকে চেয়ে কথা বলছে। দিগিনের কানে এরকম একটু সংলাপ ভেসে আসে—

মহিলাকণ্ঠ—সে কেমন দেখতে?

বার্কাসিদ্ধাই—রোগা, ফর্সা, চোখে চশমা।

মহিলাকণ্ঠ—আমার ছেলের সঙ্গে মানায় ?

বাকসিদ্ধাই—মানায়।

—জাত ?

—স্বঘর।

মহিলাকণ্ঠ স্বনিশ্বাসে বলে, বিয়েটা হবে ?

—হবে।

দিগিন ঘরটায় না ঢুকে এগিয়ে যান। উত্তর দিকে বাঁশঝাড়ে আচ্ছন্ন ছায়ায় ঢাকা পথে কতগুলো বাচ্চা খেলছে। উত্তরপ্রান্তে ক্ষেত। উদাস মাঠ, তার ওপাশে কালো মেঘের মতো হিমালয় ঘনিয়ে উঠেছে উত্তরের আকাশে। গত সাতাশ বছর ধরে দেখছেন দিগিন। দাঁড়িয়ে একটা মাদ্রাজী চুরুট শেষ করেন তিনি।

আবার যখন এসে খোলা ঘরখানায় উঁকি দিলেন তখন ভিড় অনেক পাতলা হয়েছে। অবাঙালী কাঠখোদ্রা এক মিলিটারী সওয়াল জবাব করছে। তার ঘর থেকে চিঠি এসেছে, ছেলের অসুখ। সিদ্ধাই মাথা নেড়ে জানায়, সেরে যাবে। চিনিপড়া নিয়ে যায় যেন।

পিছনের একটা বেঞ্চে একা বসে দিগিন চুরুট টানেন। সিদ্ধাই তাঁকে চেনে। একবার মুখ তুলে দেখে হাসল।

ভিড় পাতলা হলে সিদ্ধাই মুখ তুলে বলে—ভাল তো ?

দিগিন মাথা নেড়ে জানালেন—না।

—কী হয়েছে ?

—আমার ভাইপো—বলতে গিয়ে ক্লান্তি বোধ করে থেমে যান দিগিন। এসব প্রশ্নের কোনো মানে নেই। সোপস্টোন চুলোয় যাক, পুন্নির বিয়ে নিয়েও প্রশ্ন করার প্রবৃত্তি হয় না তাঁর।

চুরুটটা মুখ থেকে নামিয়ে দিগিন চোখ বুজে বলেন—মা, আমার মরণ কবে ?

সিদ্ধাই হাতের পাথরটার দিকে ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে থাকে অনেকক্ষণ। তারপর বলে—সে দেরি আছে।

—কত দেরি ?

—অনেক দেরি, তবে একটা ডাঙর মেয়েছেলে ক্ষতি করবে।

—ডাঙর মেয়েছেলে ? সে কে ?

—ফর্সা, লম্বা মেয়েছেলে একজন, পাহাড়ী মেয়েছেলে।

দিগিন হাসেন, ময়নার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা কে না জানে। ময়না এক সময়ে বিখ্যাত ছিল। সবাই তার চেহারাটা জানে। দিগিন একটু শ্বাস ফেলে বলেন—কীরকম ক্ষতি ?

—পয়সাকড়ি আর নাম-যশের ক্ষতি।

—বিষ-টিষ খাওয়াবে না তো ?

সিদ্ধাই ইতস্তত করে বলেন—সাবধানে থাকবেন; তবে আপনার এখনো অনেক আয়ু আছে।

দিগিনের ক্লান্তি লাগে। একটা পাঁচটাকার নোট এগিয়ে দেন। সিদ্ধাইয়ের

boiRboi.net

বুড়ো বাপ বসে আছে পিছনে, টাকাটা সে নেয়। বলে—আর কিছু জানবেন না?

—না। আটান্ন বছর বয়সে আর কী জানবার আছে, আমার তো কোনো ভবিষ্যৎ নেই!

বুড়ো মাথা নাড়ে।

সিদ্ধাই মেয়েটি তার কমনীয় মুখশ্রী তুলে বলে—শরীরে একরকম জ্বালা রোগ হবে। জল পড়ে দেবো, নিয়ে যাবেন।

দিগিন অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়েন। জ্বালা রোগ হওয়ার বাধা কি? যত অ্যালকোহল রক্তে জমা হয়েছে তাতে অনেক কিছু হতে পারে।

দুপুরে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। পুন্নি এসে যখন ডেকে তুলল তখন সাড়ে তিনটে। চারটের আগে তিনি ওঠেন না বড় একটা, ঘড়িটা দেখে বিরক্ত হলেন। বললেন—কী রে?

—ওঠো, তোমার চা হয়ে গেছে।

—চা, তার এত তাড়া কী?

—বাঃ, আজ কে সব আসবে বিকেলে। বেলা পর্যন্ত ঘুমোলে চলবে কী করে।

দিগিন হাসলেন। ত্রিশ টাকা কিলোর চায়ের গন্ধে ঘর ম ম করে। বলেন—যার আসবার আসবে। তোর অত মাথাব্যথার কী? আমি তো দক্‌লীকে বলে রেখেছি, সে রাজীও হয়েছে।

পুন্নি বলে—ঠিক আছে।

কিন্তু পুন্নির মুখে রাগ।

দিগিন কিছু বলেন না, পুন্নিই গজগজ করে—রোজ সং সেজে অচেনা মানুষের সামনে গিয়ে বসা কার ভাল লাগে।

—তোকে বসতে কেউ বলেছে?

—না বসলে তোমাদের প্রেস্টিজ থাকবে নাকি?

—ও। তা সেই কথা ভেবেই বুঝি হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিয়েছিস?!

—হুড়োহুড়ি আবার কী! পুন্নি ভ্রূ কুঁচকে বিরক্তির সঙ্গে বলে—চা-টা খেয়ে নাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

পুন্নি চলে গেলে উত্তরমুখো ইজিচেয়ারটায় আবার বসেন দিগিন। টুলের ওপর পা তুলে দেন। হিমালয় সারাদিন লুকোচুরি খেলে এই শরৎকালে। বরফে ঢাকা দূরের পাহাড়গুলি ঢেকে গেছে কুয়াশার মতো ভাপে। দেখা যায় শুধু নীল পাহাড়ের সারি। দিগিন দেখেন, দেখতে কখনো ক্লান্তি লাগে না। অবসরপ্রাপ্তের মতো বসে থেকে সময় বইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু সময় ঠিক হিমালয়ের মতো পাথর হয়ে জমে আছে। এভাবে কর্মহীন এবং অবসরপ্রাপ্ত হওয়ার কথা তাঁর নয়। বয়স মাত্র আটান্ন, শরীরটাও যথেষ্ট মজবুত; তবু মনে মনে একরকম কর্মত্যাগ এবং বৈরাগ্য এসে গেছে।

শিলিগুড়িতে যখন তিনি প্রথম এসেছিলেন তখন এটা ছিল গঞ্জ মতো জায়গা।

বাগরাকোটে কয়লাখনির সন্ধান, সিকিমের কমলালেবুর চালান, কাঠের ব্যবসা, চা-বাগানের মালিকানা কোনো চেষ্টাই তাঁর কম ছিল না। অবশেষে বংশগত পাগলামীর খেয়ালবশে একবার মধ্যপ্রদেশও চলে যান হীরের সন্ধান পেয়ে। সে ভীষণ কষ্ট গেছে। তাঁবুতে থাকতেন, খাদ্যাখাদ্যের বিচার ছিল না, হাতখানেক দাড়ি-গোঁফ গজিয়ে গেল, তবু হীরের নেশায় পাগল ছিলেন কিছুকাল। হীরে পান নি তা নয়। ছোট ছোট কমদামী কয়েকটা পেয়েছিলেন, তাতে খরচটা কোনোক্রমে উঠেছিল হয়তো। কিন্তু সবচেয়ে ক্ষতি হয়ে গেল শরীরের। জণ্ডিস ধরল, মাস ছয়েক সেই রোগে শয্যাশায়ী রইলেন প্রায়। লিভারটা সেই থেকে খারাপ হয়ে গেল। ডাক্তাররা তাঁর নেশাভাঙ একদম বারণ করে দিলেন। কিছুকাল সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়েওছিলেন। কিন্তু তারপর একদিন মনে হল—একা মানুষ, শরীর বাঁচিয়ে রেখে কী হবে! বয়সের সঙ্গে সঙ্গে গভীর একাকীত্ব একটা কালো কম্বলের মতো যেন চেপে ধরে। লিভারটা জখম আছে আজও—তবু দিগিন কিছু মানেন না।

ঘুম স্টেশনের স্টেশনমাস্টার ছিলেন হরেন বোস। সে লোকটা বড় ভালবাসতেন দিগিনকে। প্রায়ই বলতেন—বিয়ে না করে একরকম ভালই আছ হে দিগিন, কিন্তু চল্লিশের পর ভুগবে। সাহেবরা চল্লিশ পর্যন্ত একা থাকে, ফুর্তি লোটে, ফুর্তির অভাবও ওদেশে নেই, কিন্তু চল্লিশের পর ঠিক টুক করে বিয়েটি করে ফেলে। কারণ মানুষ ঐ বয়স থেকেই লোনলি হতে শুরু করে।

অক্টোবর বা নভেম্বরের শীতে ঘুম একটা সৃষ্টিছাড়া জায়গা। দিগিন কার্যব্যাপদেশে পাহাড় লাইনে গিয়ে ঘুমে একটা দুটো দিন কাটাতেন। চারধারে জন-মনিষ্যি নেই, পাতলা বরফের আস্তরণ পড়ত কোনো কোনো বছর শীতকালে। ওয়েটিংরুমে আগুন জেলে বোতল নিয়ে বসতেন দুজনে। কথা হত।

হরেন বোস একদিন তাঁর শালীর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দেন। মুশকিল হল হরেন বোসের বৌ ছিল নেপালী। যখন প্রথম ব্যাচেলার হরেন বোস ঘুমে আসেন তখন বয়স-টয়স কম। নেপালী ঝি ঘরের কাজকর্ম করত। দীর্ঘ শীতকালে, একাকীত্বে যখন মানুষকে কর্মনাশা ভূতে পায়, তেমনি একটা দুর্বল সময়ে তিনি সেই মেয়েটিকে উপভোগ করেন। মেয়েটা অরাজী ছিল না। কিন্তু তারপর তার বাড়ির লোকজন এসে হরেনকে ধরে, বিয়ে করতে হবে। করতে হল। গোটা দুই ছেলেমেয়েও হল তাদের। সেই বৌয়ের একটা বোন ছিল। মনাস্টারীতে যাওয়ার রাস্তাটা হিলকার্ট রোডের যে জায়গা থেকে শুরু হয়েছে সেই মোড়ে একটা খুপরীতে পারিবারিক সবজীর দোকানে বসত মেয়েটি। পনেরো-ষোলোর বেশী বয়স নয়—দীনদরিদ্র পোশাক পরে দুগালে রক্তিমাভা আর সুন্দর মুখশ্রী নিয়ে বসে থাকত। সামনে সবুজ স্কোয়াস, বাঁধাকপি, বীন, শুঁটি, ফুলকপি সাজানো। তার মাঝখানে তাকে বেশ দেখাত। সেই দোকানের সামনে ছোকরা নেপালী কয়েকজন গাঁদা ফুল পায়ের আঘাতে শূন্যে তুলে তুলে চুঙ্গি খেলত খুব। মেয়েটি সব বুঝে হাসত। হরেন বোস প্রস্তাব দিয়ে বলেন—আত্মীয় যখন হয়ে গেছে তখন ফেলতে পারি না। ওদের সম্প্রদায়ে উপযুক্ত ছেলে বড় কম, বিয়ে যদি করেও তো রোজগার করাবে। বিয়ে না দিলে নষ্ট হয়ে যাবে। পয়সার লালচ তো বড় কম নয়। দোকানে বসে থাকে বলে লোকে নীচু

নজরে দেখে, কু-প্রস্তাব দেয়, পয়সা দেখায়। তোমারও উদ্যোগ করে বিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। মেয়েটা কাঁচ আছে, শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে পারবে।

দিগিন রাজী হলেন।

সেই মেয়েটিই ময়না।

দিগিন সেবার পুজোর পর এক ভোররাতে টাইগার হিলে গেলেন সূর্যোদয় দেখতে। বহুবার দেখেছেন, তবু গেলেন। সঙ্গে ময়না ছিল। টাইগার হিলে ওঠবার একটা খাড়া এবং শর্টকাট রাস্তা আছে। সেটা দিগিন চিনতেন না, ময়না চিনত। সেই রাস্তা ধরে উঠতে দিগিনের হাঁফ ধরে যায়। মাঝে মাঝে বসেন, ময়নার সঙ্গে কথা বলেন, মাতৃভাষার মতো নেপালী ভাষা বলতে পারেন দিগিন, ময়না জানে ভাল বাংলা কথা। কথাবার্তার কোনো অসুবিধে হয় নি। আকাশে তখন ময়ূরকণ্ঠী রং ধরেছে। পাল্টে যাচ্ছে রং। শেষরাতে সূর্য ওঠার অনেক আগেই আকাশের ঐ বর্ণালী দেখা যায়। কিন্তু সে সৌন্দর্য বড় একটা খেয়াল না করে দিগিন বলেন—থাকতে পারবে তো আমার সঙ্গে ?

দিগিনের বয়স তখন বত্রিশ, ময়নার মেরে-কেটে ষোলো, রাজী হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ঘুমের শীতের দেশে নিরন্তর দারিদ্র্য আর স্থবিরতা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার প্রবল ইচ্ছে তখন মেয়েটির। সে বলল—যদি আমাকে কলকাতা শহর দেখাবে বলো, তাহলে থাকব।

—থাকা মানে কী, জানো তো ?

মেয়েটি চেয়ে থাকল।

দিগিন অবশ্য ব্যাখ্যা করলেন না। তিনি জানতেন, বিয়ে করার কোনো পদ্ধতি না মানলে ক্ষতি নেই। যে-কোনো রকম একটু অনুষ্ঠান করলেই চলবে। এবং সেটাই নিরাপদ। তাঁর সন্দেহ ছিল, এই নিতান্ত অশিক্ষিত অভিজ্ঞতাহীন মেয়েটির সঙ্গে তাঁদের বংশগত যেটুকু আভিজাত্য আছে তা শেষ পর্যন্ত মিলবে কিনা। দিগিনের একটা সুবিধে, তিনিও লেখাপড়া বিশেষ করেন নি। ক্লাস এইট পর্যন্ত উঠে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন। পড়াশুনো সেইখানেই শেষ হয়। অতঃপর ব্যাপক জীবন-যাপন থেকেই তিনি তার স্বাভাবিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ভেবে দেখেছিলেন, মেয়েটির কাছ থেকে একমাত্র শরীর আর কিছু সেবা তিনি পেতে পারেন। তার বেশী কিছু দেওয়ার সাধ্য মেয়েটির নেই।

দিগিন টাইগার হিলে ওঠার মাঝপথে মেয়েটিকে সেই গভীর শীতার্ত পরিবেশে একটি চুমু খান। বলেন—তোমাকে কলকাতা দেখাবো।

সেই যে টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয় দেখতে গেলেন, সেখান থেকে আর ঘুমে ফিরে এলেন না দিগিন। এক ছোকরার জীপে ফিরলেন দার্জিলিং। সেখান থেকে আবার জীপ ভাড়া করে ময়নাকে নিয়ে টানা নেমে এলেন শিলিগুড়িতে। বত্রিশ বছর বয়সে বিয়ের ঝামেলায় যেতে তাঁর ভরসা হল না। ময়নার বয়স তখন নিতান্ত কম। তাকে যা-তা বুঝিয়েছিলেন। ময়না তখন ঘুম ছাড়ার জন্য ব্যগ্র। তা ছাড়া সে জানত যে এই লোকটাই তার হবু স্বামী, তাই আপত্তি করে নি।

টংগী ঘরটায় ময়নাকে নিয়ে থাকার বিপদ ছিল। আস্তানাটা সবাই চেনে, হরেন

বোস বা মেয়েটির আত্মীয়স্বজন সেখানে যে-কোনো সময়ে হাজির হতে পারে। পুলিস লেলিয়ে দিতে পারে। তবু দিগিন ময়নাকে নিয়ে উঠলেন সেখানেই।

তিনদিন পর হরেন বোস হাজির হলেন এসে।

—কী খবর ভায়া?

—ভালই।

—ময়না?

—আছে।

হরেন বোস মাথা নেড়ে বললেন—জানতাম। বলে একটু শ্বাস ছাড়লেন।

ময়নাকে অবশ্য তখন চেনার উপায় নেই। নেপালী পোশাক ছেড়ে সে তখন চমৎকার সব ছাপা শাড়ি পরে। সাবান দিয়ে স্নানের পর গা ঝকঝকে পরিষ্কার। সিঁথেয় সিঁদুর, একবেণীতে বাঁধা চুল, খুশীতে ফেটে পড়ছে। হরেন বোস দেখে খুশী হলেন। বললেন—ভয় নেই, ওর পরিবার থেকে ঝামেলা হবে না, তবে কাজটা পাকা করলেই পারতে।

দিগিন বত্রিশ বছরে মাথা তখন কম পাকান নি। বলেন—তা হয় না। আপনার মতো বাঁধা পড়ে যেতে আমি রাজী নই।

—কিন্তু বদনাম? সিকিউরিটি?

—ওসব ছাড়ুন। ওর পরিবারকে আমি হাজার টাকা দিচ্ছি কন্যাপক্ষ হিসেবে।

—ময়না এরকম সম্পর্ক মানবে?

—মানবে আবার কী। মেনে তো নিয়েছে।

—না, মানে নি। বয়স কম বলে বুঝতে পারছে না যে তুমি ওকে রেখেছ মাত্র, বিয়ে করো নি। বয়স হলে বুঝবে।

—ও একরকম বিয়েই, কালীবাড়িতে নিয়ে গিয়ে মায়ের পায়ের সিঁদুর ছুঁইয়ে দিয়েছি!

বিচক্ষণ হরেন বোস গম্ভীরভাবে বললেন—ঠিক আছে। বিয়ে তো আসলে পরস্পরকে স্বামী বা স্ত্রী বলে স্বীকার করা। ও হলেই হল। টাকাটা দিয়ে এসো।

—দিয়ে দিচ্ছি।

বলে দিগিন নগদ হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছিলেন।

হরেন বোস মুখটা গম্ভীর করে রাখলেও মনে মনে খুশিই হয়েছিলেন দিগিনের বিচক্ষণতায়, অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে দিগিনের সিকিমী 'রাম'-এর বোতল খালি করলেন। বললেন—তাহলে টাইগার হিল থেকেই তোমার অধঃপতন শুরু হল?

দিগিন হাসলেন, উত্তর দিলেন না।

হরেন বোস বললেন—হঠাৎ এরকম ধারা করতে গেলে কেন?

দিগিন একটু ভেবে বলেন—আসলে কী জানেন দাদা, যখন টাইগার হিলে উঠছিলাম তখনো ঠিক করি নি যে, মেয়েটাকে নিয়ে পালাবো। ভেবেছিলাম আমার বাউণ্ডুলে জীবন, দায়দায়িত্ব নেই, মেয়েটাকে পাকাপাকি বিয়েই করে ফেলি। কিন্তু টাইগার হিলেই গোলমালটা হয়ে গেল, একদম শেষ চড়াইটা বেয়ে যখন পাহাড়ের ছাদে চড়েছি, তখন দেখি সামনে অন্ধকারের এক মহাসমুদ্র। নিচে গভীর উপত্যকায় যেন

কত হাজার বছরের অন্ধকার জমেছে। বাঁদিকে উত্তরে ব্রোঞ্জের মতো কাঞ্চনজঙ্ঘার আবছা চেহারা, পাশে পাশে আরো সব ব্রোঞ্জের পাহাড়। এ তো কতবার দেখেছি, নতুন কিছু নয়। সূর্য উঠবার আগেই প্রথম সূর্যের আলো এভারেস্টের ডগা ছুঁতেই যেন আগুন জ্বলে গেল বরফে, আশেপাশে আবছায়ায় বিস্তর লোক দাঁড়িয়ে দেখছে। ঐ রকম খোলা জায়গায়, ঐ অন্ধকারের গভীর বিশাল অন্ধকারের সমুদ্র আর পাহাড়-টাহাড় দেখে মনে হল, জগতে বাঁধা পড়ার মতো বোকামী আর নেই। যার একটা শেকড় গজায় সে বাকী দুনিয়া থেকে উৎখাত হয়ে যায়। টাইগার হিলে সানরাইজ দেখতে দেখতেই ঠিক করলাম যে হাওয়া বাতাসের মতো একটা সম্পর্ক থাকাই ভাল।

হরেন বোস মাথা নেড়ে বললেন—বুঝেছি। তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ নেশা করে বললেন—আমি তোমার চেয়ে অনেক বোকা।

দিগিন উত্তর দিলেন না।

হরেন বোস ময়নার ভেজে আনা ফুলুরীতে কামড় বসিয়ে বললেন—তুমি সুখী হবে।

ময়না ঘরে আসতে জিজ্ঞেস করলেন—কেমন লাগছে রে? রামরও?

ময়না লজ্জার হাসি হাসে। মাথা নামায়।

হরেন বোস সস্নেহে একটু চেয়ে থেকে বলেন—মেয়েটা ভাল, দেখো দিগিন।

—চিন্তা করবেন না, সব ঠিক আছে।

কিন্তু তবু সব ঠিক থাকে নি।

বছর দুই বাদে সমস্যা দেখা দিতে থাকে। বুদ্ধিমান দিগিন তার বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন না। তবে দু'চারখানা চিঠিপত্র বছরে দিতে হত, দায়ে দফায় টাকা-পয়সা পাঠিয়েছেন, কিন্তু ময়নার খবর তিনি কখনো দেন নি। তখন প্রাচীনপন্থী মা বাপ বেঁচে, পুরনো প্রথাও মরে যায় নি পরিবারে। ভেবেছিলেন ব্যাপারটা চেপে রাখতে পারবেন।

কিন্তু দেশ-ভাগের পর পরই চিঠি এল, বাড়ির সবাই চলে আসছে। তাদের থাকার বন্দোবস্ত যেন করা হয়। দিগিন মুশকিলে পড়লেন। ময়না খুব বোকা ছিল না, দু বছরে তার বয়স আর অভিজ্ঞতাও বেড়েছে। দিগিনের সঙ্গে তার সম্পর্কটাও ছিল অদ্ভুত। দিগিন ময়নাকে বিয়ে করা বৌ বলে কখনো মনে করেন নি। তাই মনে মনে নিজেকে ব্যাচেলার ভেবে যেমন খুশী নিজস্ব জীবন যাপন করতেন। পাহাড়ে ডুয়ার্সের জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন ব্যবসার ধান্দায়। ঘরে একটা মেয়েছেলে আছে—সে ঝি বা রক্ষিতা, এর বেশী কিছু ভাবতেন না, ময়না সেটা বুঝতে পারত। উপায় নেই বলে মেনে নিত দিগিনকে। ঝগড়াঝাটি কিছু করত না তা নয়, তবে করেও লাভ ছিল না।

বাড়ির লোক আসছে, বহুকাল বাদে তাদের সঙ্গে দেখা হবে। মা-বাপ তখনো বেঁচে আছেন। দিগিন তাই গুরুং বস্তিতে ময়নার জন্য ভাল ঘর ভাড়া করলেন। খুব বেশী বোঝাতে হল না ময়নাকে। দু'এক কথাতে সে রাজী হয়ে গেল। ময়নাকে গুরুংদের বস্তিতে পাঠিয়ে ঘদোর সাফ করলেন দিগিন। তাঁর কিছু মনে হল না, কোনো অভাব টের পেলেন না।

অবশ্য সম্পর্কটা ছিঁড়েও ফেললেন না। বাড়ির লোকজনকে এড়িয়ে রোজই যেতেন ময়নার কাছে। মাসোহারা তো দিতেনই, সব খরচ বহন করতেন ময়নার। ময়নাও অখুশী ছিল না। বাড়ির লোক ব্যাপারটা টের পেলেও কেউ উচ্চবাচ্য করে নি। বয়সের ছেলের রোজগার যদি ভাল হয় তো তার দু একটা স্বভাবদোষ মানতে কারো আপত্তি হয় না। ছেলে হল সোনার আংটি, বাঁকা হলেও দাম কমে না।

সেই ময়না এখনও দিগিনেরই আছে, তবে পুরোটা নয়। দিগিনের আটান্ন হলে ময়নার না হোক বিয়াল্লিশ বছর বয়স তো হলই। গুরুং বস্তি ছেড়ে বর্ধমান রোডে ছোট একটু বাড়িতে উঠে গেছে ময়না। বাড়ি করে দিয়েছেন নিজেই। ময়না যৌবনকালটা বড় চঞ্চলতা করেছে। গুরুং বস্তিতে উঠে যাওয়ার পর থেকেই সে দিগিনকে পছন্দ করতে পারত না। বার দুই পালিয়েও গেছে একটা অপদার্থ জাত-ভাইয়ের সঙ্গে। পোষায় নি বলে ফিরে এসেছে। লটঘট করেছিল নির্মল সিংয়ের ছোটছেলে অবতার সিংয়ের সঙ্গে। দিগিন শাসন করেছেন, বিয়ে করা বৌ নয় বলে ক্ষমাও করে দিয়েছেন।

ছেলেমেয়ে হয় নি, বাঁজা ময়না এখনো নিঃসঙ্গ পড়ে থাকে ছোট বাড়িটায়। ঘুম থেকে তার এক ভাইঝি আসে, কিছুদিন থেকে যায়। হরেন বোস রিটায়ার করে বাড়ি করেছিলেন দার্জিলিঙে। কিছুদিন আগে মারা গেছেন। তার বৌ বা ছেলে-পুলেরাও আসে মাঝে মাঝে, ময়নাও যায়। কিন্তু তবু ময়না একা। বড় একা।

পুন্নিকে দেখতে এলেন একজন। রিক্‌শা থেকে বুড়ো মানুষটি যখন নামছিলেন তখনই তাঁর ফর্সা টুকটুকে নাদুসনুদুস চেহারাটা দেখে সকলের ভাল লেগে গেল। পুন্নির বাপ আবেগে দিগিনকে বলে ফেললেন—দেখেন, যেন ঠিক পাক্‌না শসা।

তা পাকা শসার মতোই চেহারা বটে। মুখে অবশ্য হাসি নেই। গম্ভীর হয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বাপ এসে বসলেন। চারধারে একটু চেয়ে দেখলেন। কথা কম হলেও বেরসিক নন। জলখাবারের প্লেটটা আসতে দেখে বললেন—সেই লৌকিকতা।

—না না, কিছু নয়। বলে পুন্নির বাপ—একটু মিষ্টিমুখ আর কি।

—রক্তে চিনি একশ কুড়ি। আপনার মেয়ের মুখশ্রী যদি মিষ্টি হয় তাহলেই হবে, আলাদা মিষ্টির দরকার নেই।

ভারী ম্লান হয়ে গেল পুন্নির বাপ। পুন্নির মুখশ্রী তেমন মিষ্টি নয়, সবাই জানে। তবু পুন্নিকে আনা হল। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বাপ অবশ্য পুন্নির দিকে একপলকের বেশী চেয়ে দেখলেন না। চিনি ছাড়া চা তৈরী করে দিতে হয়েছিল নতুন করে, সেইটে চুমুক দিতে দিতে বললেন—যেতে পারো মা। তোমার গার্জিয়ানদের সঙ্গে কথা বলি বরং।

পুন্নি চলে যেতেই দিগিনের উকিল দাদা জিজ্ঞেস করেন—কেমন দেখলেন? চলবে?

ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন—রং তো কালই, মুখশ্রী ঐ চলনসৈ।

পুন্নির বাবা বলতে গেল—কিন্তু কাজকর্ম—

ভদ্রলোক হাত তুলে বলেন—ও তো সবাই জানে। ঘরের কাজকর্ম তো আর জজিয়তি ব্যারিস্টারী নয়।

দিগিনের দিকে চাইলেন ভদ্রলোক। বললেন—কী দেবেন আপনারা?

—যা চান। দিগিন গম্ভীর হয়ে বলেন।

—চাওয়ার কী। আপনাদের বাজেটটা না জেনে বলি কী করে?

—যা সবাই দেয়। আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, ফার্নিচার, খাট, গয়না, ছেলের আংটি, ঘড়ি।

—হুঁ। বলে গম্ভীরভাবে আবার চা খেলেন, বললেন—আলমারি তো গোদরেজের?

—তাই হবে।

—গয়না?

—চৌদ্দ-পনেরো ভরি।

—ঘড়িটা?

—রোলেক্স।

ভদ্রলোক শ্বাস ফেললেন। তারপর বলেন—আমি কি পাবো?

—মানে?

—ছেলে আর ছেলের বৌ তো এসব পাবে। আমার পাওনা কী?

—কী চান?

—নগদ।

—বলুন কত?

—আমি বলব না। শুনব!

তখন সবাই পীড়াপীড়ি করতে থাকে ভদ্রলোককে কিছু একটা বলার জন্য। ভদ্রলোক কেবলই হাত জোড় করে বলেন—আমি কিছু বলব না, আরো চার জায়গায় মেয়ে দেখেছি। সকলেরই টাকার অঙ্ক পেয়েছি। সব লিখে জামসেদপুরে জানাব আমার স্ত্রীকে। তিনি সব বিচার করে যেখানে মত দেন সেখানেই হবে। আমি দূত মাত্র, আপনারা সবাই বরং পাশের ঘর থেকে টাকার ব্যাপারটা পরামর্শ করে ঠিক করে আসুন।

বোঝা গেল, লোকটা স্বাভাবিকভাবেই একজন ডিকটেটার। সব জায়গায় কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা রাখে। দিগিনের দাদারা আর দুই ভগ্নীপতি পাশের ঘরে চলে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। বড়দা ডেকে গেলেন—দিগিন।

দিগিন গেলেন না। মাদ্রাজী চুরুট ধরিয়ে ঠায় বসে রইলেন লোকটার দিকে চেয়ে।

একটু পরে ওঁরা ফিরে এলে বড়দা বললেন—আমরা দুই হাজার নগদ দেবো।

—দুই? ভদ্রলোক নির্বিকারভাবে উচ্চারণ করেন।

দিগিন লোকটার দিকে চেয়ে রইলেন মাদ্রাজী চুরুটের ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে।

তারপর হঠাৎ বললেন—দশ।

boiRboi.net

—অ্যাঁ। ভদ্রলোক তাকালেন।

—দশহাজার দেবো। নগদ।

ভদ্রলোক হাঁ করে চেয়ে থাকেন। বাক্যহারা দুই দাদা আর দুই ভগ্নীপতি সন্দেহের চোখে দেখেন। কিছু বুঝতে পারেন না।

ভদ্রলোক একটা শ্বাস ফেলে বলেন—আচ্ছা।

—আচ্ছা নয়, দশহাজার নগদ দেবো। বিয়ের পাকা কথা দয়া করে আজই বলে যান। নইলে আমরা অন্য পাত্র দেখি।

ভদ্রলোক ইতস্তত করতে থাকেন। দিগিন গিনিপিগ দেখার মতো করে কৌতূহলী চোখে ভদ্রলোককে দেখেন। মানুষ-গিনিপিগের মধ্যে কোন্ কথায় বা কোন অবস্থায় কীরকম প্রতিক্রিয়া হয় সেটা লক্ষ্য করা দিগিনের এক প্রিয় অভ্যাস।

ভদ্রলোকের নির্লিপ্ত ভাবটা ঝরে যায়। ফর্সা মুখখানায় একটু লাল আভা ফুটে ওঠে।

দিগিন মৃদুস্বরে বলেন—আমার বড় আদরের ভাগ্নী। মনে মনে বহুদিনের ইচ্ছে ওর একটা ভাল বিয়ে দিই। কাজেই পুন্নির জন্য আমি আলাদা খরচ করব। আপনি চিন্তা করবেন না।

—কিন্তু আমার স্ত্রীর সঙ্গে একটু পরামর্শ—কথাটা শেষ করতে পারেন না ভদ্রলোক।

দিগিন বলেন—সে আপনার ইচ্ছে। কিন্তু আমরা দেরি করতে পারব না। আমার দাদাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ চাকরির ছেলে পছন্দ নইলে একটি ব্রিলিয়াণ্ট এঞ্জিনীয়র ছেলে আমার হাতেই ছিল। আপনি যদি আজ স্পষ্ট মতামত না দেন তাহলে আমরা তো দেরি করতে পারি না।

ভদ্রলোকের কঠিন ব্যক্তিত্বের এবং কর্তৃত্বের ভাবটা খসে গেছে, লাল মুখখানা রুমালে ঘষে আর একটু লাল করে তুললেন। আধ-খাওয়া জলের গ্লাসটায় একবার চুমুক দিলেন।

তারপর বললেন—আলমারিটা গোদরেজের তো?

—নিশ্চয়ই।

—সোনা যদি আর একটু বাড়াতেন।

দিগিন চুরুট মুখে নিয়ে বলেন—পনেরো ভরি তো দেওয়াই হচ্ছে আমাদের ফ্যামিলি থেকে। আমি নিজে একটা পাঁচ ভরির নেকলেস দেবো। আর প্রত্যেকটা এক ভরি ওজনের ছ গাছা চুড়ি।

—আমার ছেলে কী পাবে? এতো মেয়ের কথা হল, ভালই—

—একটা স্কুটার দেবো, একটা ফ্রিজ।

ভদ্রলোক ঠিক বিশ্বাস করতে পারেন না। দিগিনের দিকে সন্দেহের চোখে তাকান আবার অবিশ্বাসও করতে পারেন না। দিগিন শিলিগুড়ির নামজাদা লোকদের একজন। তার প্রভাবপ্রতিপত্তি ও কথার দাম আছে। কিন্তু এত লোভানী কেন, মেয়ের কোনো গুপ্ত খুঁত আছে কিনা এই নিয়েই বোধহয় দ্বিধায় পড়েন ভদ্রলোক।

সেটা দিগিন আন্দাজ করে বলেন—আমাদের মেয়ে যা পাচ্ছেন তেমন স্বভাবের

মেয়ে পাওয়া যায় না। আপনি পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে খোঁজ নিতে পারেন।

—না, না, তার কী দরকার?

—খোঁজ নেওয়া ভাল, সন্দেহের দরকার কী?

বড়দা ভ্রূ কুঁচকে দিগিনের চুরুটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন মুখখানা দেখছিলেন। তিনি স্বভাবতই বিরক্ত। তাঁর বড় দুই মেয়ের বিয়েতে দিগিন এত খরচ করেন নি। মেজদাও খুশী নন। পুন্নির বাপ একটু ঘাবড়ে গিয়ে তাড়তাড়ি দিগিনের একটা চুরুট ধরিয়ে নিয়ে বলে—তাহলে পাকা কথা আজই হয়ে যাক। বলে সমর্থনের জন্য চারদিকে তাকাল। তাঁর দুই সম্বন্ধী শ্বাস ফেলেন।

বড়দা বললেন—সব তো শুনলেন। সন্তুষ্ট তো?

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বলেন—মন্দ কী?

—তাহলে? দিগিন জিজ্ঞেস করেন।

ভদ্রলোক একটু করুণ সুরে বলেন—ছেলে একবার নিজের চোখে দেখবে না?

কেউ কিছু বলার আগেই দিগিন দৃঢ়স্বরে বলেন—না। আমাদের পরিবারে পাত্রকে মেয়ে দেখানোর নিয়ম নেই।

কথাটা ডাহা মিথ্যে। সবাই দিগিনের দিকে চেয়ে থাকেন। এই ঘরে যে সব ঘটনা ঘটছে তার কর্তৃত্ব নিশ্চিত ভাবে এখন দিগিনের হাতে। তাই কেউ কিছু বলতে সাহস পান না।

ভদ্রলোক অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন—মেয়েটিকে আর একবার ডাকুন।

পুন্নি আবার আসে। তার চোখে-মুখে একটা ভয়ার্ত ভাব। বহু টাকায় ছোটমামা তার জন্য ডেপুটি ম্যাজিস্টেট কিনেছে, এ কথা ভিতরবাড়িতে ছড়িয়ে গেছে ইতিমধ্যে। সে এতটা কল্পনাও করে নি। তাই তার মুখে ভয়, লজ্জা, সংকোচ।

ভদ্রলোক পুন্নির দিকে চেয়ে বলেন—মা, এই বুড়ো ছেলেটার বায়না-টায়না একটু রাখতে পারবে তো? আমার বড়বৌমা হবে তুমি তা রান্না-টান্না কি বুড়োর একটু সেবা-টেবা—এসব পারবে তো?

পুন্নি মৃদু হেসে মাথা নত করে নিয়ম মাফিক। স্নেহভরে চেয়ে থাকেন দিগিন। এর আগে তিনবার পুন্নিকে নাকচ করে গেছে তিনটি ছেলেপক্ষ। তাই ও আর পাত্রপক্ষের সামনে বেরোতে চায় না, সে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিলেন দিগিন। বিয়েটা যে হবে, বোঝাই যাচ্ছে।

ভদ্রলোক দিগিনের দিকে চেয়ে একটু হেসে বলেন—মেয়ে তো অপছন্দের নয়। আমার পছন্দই হয়েছে।

—কথা দিচ্ছেন তাহলে?

ভদ্রলোক একরকমের হাঁফধরা হাসি হেসে বললেন—ঐ দেওয়াই হল।

—আমরা খুব বেশী দেরি করতে পারব না।

—দেরি করে আমাদেরই লাভ কী?

—তাহলে অগ্রহায়ণে দিন ঠিক করি?

—করুন। আমি এ সপ্তাহেই আবার আসব। আমার স্ত্রীকে একটু খবর দেওয়া নিতান্ত দরকার। আমার একার কথায় কিছু হবে না।

boiRboi.net

—স্ত্রীকে সব টার্ম'স অ্যান্ড কণ্ডিশন জানিয়ে দিন। ছেলেরও মত নিন। কিন্তু সেগুলো সেকেন্ডারী ব্যাপার। আপনার মত থাকলে কেউই আপত্তি করবে না।

মানি-সেণ্ট্রিক লোকটি মাথা নাড়েন। সম্বন্ধটা হাতছাড়া যে তিনি নিজের স্বার্থেই করবেন না তা বোঝাই যাচ্ছিল। বললেন—তাহলে কথাটা ফাইনাল বলেই ধরে নিন।

দিগিন মাথা নেড়ে বললেন—ধরে নিচ্ছি। আমরা আর সেই এঞ্জিনীয়ার ছেলেটির গার্জিয়ানদের সঙ্গে কথা বলব না।

ভদ্রলোক হাঁফ ছাড়লেন।

মনে মনে হাঁফ ছাড়লেন দিগিনও। পুন্নির একসময়ে বোধহয় ধারণা ছিল যে, যেহেতু তারা মামাবাড়িতে আশ্রিত সেইজন্যই তার ভাল বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা নেই। দেখতেও সে তেমন কিছু নয়, মামারাও খরচ করবেন না। হয়তো আদপে বিয়েই হবে না তার। সেই কারণেই বোধহয় পুন্নি শান্ত এবং ভাল মেয়ে হয়েও একদা একটি ছেলের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। ছেলেটা পাড়ার বখাটেদের একজন। লেখাপড়া করে নি, জাতে নিচু, গুণের মধ্যে ভাল গোলকীপার ছিল। কবে কখন প্রেম হয়েছিল কে জানে। কিন্তু বাড়িতে কথাটা জানাজানি যখন হয় তখন ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়ে গেছে। সারারাত্রি ধরে একটা ফাংশন হয়েছিল তিলক ময়দানে, সেখানে যাওয়ার নাম করে একবার গিয়েছিল পুন্নি। সকালে ফিরেও এল। কিন্তু ওর বন্ধুদের মধ্যে কে যেন বাড়িতে বলে দিয়েছিল যে পুন্নি ফাংশনে একটুক্ষণ থেকেই শান্তনুর সঙ্গে কেটে পড়েছিল। শিলিগুড়ি কলকাতার মতো বড় জায়গা নয়, এখানে সবাই সকলের খোঁজখবর রাখে। পুন্নির ব্যাপারটাও অনেকেই জেনে গেল। কিন্তু পুন্নির মা-বাবা মেয়েকে শাসন করেন নি। বড়দার কানে যেতেই উনি মত দিলেন—ওসব জাত-ফাত, শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে কী হবে। বিয়ে দিয়ে দাও। মেজদারও তাই মত ছিল। এবং বিয়ের প্রস্তাব পাঠানোর উদ্যোগও চলছিল। ব্যাপারটা দিগিন জানতে পারেন সবার শেষে।

দিগিন জাত-টাত বড় একটা মানতেন না, তাঁর নিজের শিক্ষাও বেশীদূর নয়। বিয়েটাতে মতও তিনি হয়তো দিতেন। কিন্তু তাঁর মনে হয়েছিল, পুন্নির ভালবাসাটা খাঁটি নয় এবং বাড়ির লোক বোঝা নামাতে চাইছে। প্রচণ্ড অর্থনৈতিক চাপে সংসারটার নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। পুন্নিকে ডেকে নিভৃতে প্রশ্ন করতেই সে কেঁদে ফেলল। প্রথমে বলল যে সে সত্যিই ছেলেটাকে ভালবাসে। ওকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না। তারপর দিগিন তার কাছ থেকে আস্তে আস্তে সব খবরই বের করে নেন। পুন্নি ছেলেটার সঙ্গে রাত কাটিয়েছে, পিকনিকে গেছে, চিঠি লিখেছে পরস্পরকে। পুন্নি যে ফাঁদে পড়ে গেছে সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। রাত কাটানোর ব্যাপারটা ছেলেটাই রটায়। এবং এমনই তার সাহস যে পুন্নির লেখা কিছু চিঠি সে এসে বড়দা আর পুন্নির বাবাকে দেখিয়েও যায়। ওসব দেখে ভয় পেয়ে সবাই বিয়ের উদ্যোগ করে।

দিগিন বুঝতে পারেন, ছেলেটাকে ভয় দেখিয়ে বা পুন্নিকে চোখ রাঙিয়ে কোনো লাভ নেই। কিন্তু অত সহজে তিনি বাড়ির লোকের মতে মত দিতে পারলেন না।

ছেলেটার দুঃসাহস এবং দুষ্টুবুদ্ধি তাঁর ভিতরটাকে শক্ত করে তুলল। কিন্তু মুখে তিনি কিছু বললেন না, মতামত দিলেন না। শুধু একদিন অমলকে ডেকে গোপনে বললেন—আমার ভাগ্নীর সঙ্গে তোমার ভাব শুনেছি, ঠিক নাকি?

ছেলেটা মাথা নিচু করে বলে—আজ্ঞা হ্যাঁ।

—বিয়ে তো করবে, কিন্তু কাজ-টাজ কিছু করছ?

—চেষ্টা করছি।

—চেষ্টায় কী হবে? ধরা-করার কেউ আছে?

—না।

—ঠিক আছে, সে ভার আমি নিচ্ছি। তবে একটা কথা, চাকরি পাকা হওয়ার আগে বিয়ে-টিয়ে হবে না কিন্তু।

ছেলেটা চাকরির কথায় যথেষ্ট শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠেছিল দিগিনের প্রতি। বলল—আজ্ঞে না।

এম-ই-এস-এর প্রায় সব হর্তা-কর্তাকেই চেনেন দিগিন। তাঁদের কাছে নিয়ে গেলেন। ক্লাস ফোর স্টাফ হিসেবে তার চাকরি হয় এবং চাকরি হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই আসামের নেফায় তাকে বদলী করা হয়। সমস্ত ব্যাপারটাই দিগিন খুব নিপুণভাবে করেছিলেন। কেউ কিছু টের পায় নি। সবাই জেনেছিল হবু জামাইকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই দিগিনের এই চেষ্টা। পুন্নিও বোধহয় খুশী হয়েছিল। অমল নেফায় যাওয়ার আগেই একদিন পুন্নিকে ডেকে দিগিন বললেন—ওর কাছ থেকে তোর চিঠিগুলি চেয়ে নিবি।

—কেন ছোটমামা?

—মিলিটারীর সঙ্গে থাকবে, আজ এ জায়গায় কাল সে জায়গায়, ওগুলো হারিয়ে যদি ফেলে, আর অন্য কারো হাতে যদি পড়ে তো লজ্জার ব্যাপার।

পুন্নি লজ্জা পেয়ে বলে—আচ্ছা।

—সব ক'টা চেয়ে নিবি, নইলে কিন্তু ছাড়বি না।

—যদি দিতে না চায়?

—দেবে, বলিস না দিলে ছোটমামা রাগ করবে। চিঠিপত্র ছোটমামা পছন্দ করে না। কে কোথায় দেখে ফেলবে।

চিঠি ফেরত দিয়েছিল অমল। নেফা থেকে কয়েকখানা চিঠি লিখে থাকবে। বছরে এক আধবার আসে, দেখাসাক্ষাৎও বোধহয় করে পুন্নির সঙ্গে। কিন্তু পুন্নির প্রেমের দুধ কেটে ছানা হয়ে গেছে, এ সত্য পুন্নির মুখ দেখলেই আজকাল বোঝা যায়। সঙ্গ বন্ধ করে দিলে যে কত ফলস প্রেম নাকচ হয়ে যায়।

অমল ক'দিন আগেই এসে ঘুরে গেছে। শীগগীর আর আসবে না। এই ফাঁকে পুন্নিকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের ঘরে পাচার করতে পারলে ভয়ের কিছু থাকবে না। প্রেমের তেজটাও কমজোরী হয়ে এসেছে। বাড়ির লোকও ব্যাপারটা ভুলে গেছে। কেবল দিগিন ভোলেন নি। দুটো গিনিপিগের ওপর তার প্রেম-বিষয়ক পরীক্ষাটা তিনি চালিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তার ফলাফলটা দেখবেন বলেই ভোলেন নি।

কয়েকদিন পরে এসে পাটিপত্র করে যাবেন বলে কথা দিয়ে ভদ্রলোক উঠলেন।

এর আগে পন্নির দুটো সম্বন্ধ ভেঙে গিয়েছিল উড়ো চিঠির জন্য। কে বা কারা উড়ো চিঠি দিয়েছিল কে জানে।

তবে দিগিনের পরিবারের শত্রু কেউ কেউ থাকাই সম্ভব। পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যেও কি নেই মাৎসর্যে আক্রান্ত লোক। এবার নিশ্চতভাবে পাত্রটিকে কিনে নিলেন দিগিন, উড়োচিঠিতে বোধহয় আর কাজ হবে না।

ভদ্রলোক চলে যেতে দিগিন নিজের টংগী ঘরখানায় এসে বসেন। মনটা ভাল নেই। উত্তরে মেঘপুঞ্জ জমে উঠছে। বেলা পড়ে এল। একটু শীত বাতাস বয় আজকাল, দিগিন ইজিচেয়ারে বসে টুলের ওপর পা তুলে দেন। পন্নির বিয়ে হয়ে গেলে তাঁর একটু একা লাগবে। পন্নিটা খুব সেবা করত।

পন্নির কথা ভাবতে ভাবতেই পন্নি উঠে এল নিচে থেকে।

—ছোটমামা।'

—হুঁ।

—তুমি কী কাণ্ডটা করলে শুনি।

—কী?

—অত টাকা খরচ করে বিয়ে দেবে?

—না হয় দিলাম।

—ছি ছি, লোকে কী বলবে?

—কী বলবে?

—ভাল বলবে না। আমারও বিশ্রী লাগবে। বড়মামা, মেজমামা মেসোমশাই কেউ খুশী হয় নি।

—কেন, কেউ কিছু বলেছে নাকি?

—বলেছে।

—কী?

—কী আবার। পাত্র আন্দাজে দেওয়া-থোওয়া বড্ড বেশী হয়ে গেছে।

—সে আমি বুঝব। তোর পাকামীর দরকার কী? যা, চা করে আন।

পন্নি রাগ করে বলে—আমি এ বিয়ে করব না।

—না করিস না করবি। আমি ঠিক দকলীর সঙ্গে সম্বন্ধ করে দেবো।

—তুমি অত টাকা খরচ করবে কেন? ওতে আমার সম্মান থাকে না।

—সে আমি বুঝব। সম্মান নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না।

পন্নি চা করতে যায়।

বড়বৌদি এসে ডাকেন—দিগিন ভাই।

—হুঁ।

—তাজ্জব। পন্নির কি টাকার সঙ্গে সম্বন্ধ করলে?

—করলাম।

—এত কিছুতে রাজী হলে কেন? কী এমন পাত্র?

—পাত্র খারাপ না।

—তা হলেই বা। নগদ দশ হাজার, স্কুটার, ফ্রিজ, সোনা—তুমি কী ভেবেছ বল

boiRboi.net

দেখি। ওরা তো অত পাওনার কথা স্বপ্নেও ভাবে নি। তুমি আগ বাড়িয়ে বললে কেন?

—মুখ বন্ধ করে দিলাম। আর টুঁ শব্দও করতে পারবে না।

—কেন? আরো অনেক কমেই তো হত। দশ হাজার নগদ শুনেই তো কাৎ হয়ে পড়েছিল।

দিগিন হাসেন। তিনি আসলে একটি সুন্দর বৃদ্ধের আকৃতির গিনিপিগকেই লক্ষ্য করেছিলেন সারাক্ষণ। যখন বুঝলেন ভদ্রলোকের টাকা-কেন্দ্রিক মন, তখন তিনি তাকে লোভানীর পর লোভানীতে উস্কে তুলেছিলেন। লোকটার নির্বিকার ব্যক্তিত্ব, ঠাণ্ডা মেজাজ ঝরে গেল, কর্তৃত্বের ভাবটা পড়ল খসে। মানুষ-গিনিপিগের বেশী কিছু নয়।

বৌদির দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—ঠাকরোন, আজ ভাল করে শুঁটকী মাছ রাঁধো তো।

—কেন কেউ খাবে নাকি?

—হুঁ।

—কে?

—ভটচায, আমার ব্যাঙ্কের এজেন্ট।

—মাইফেল বসবে, না?

দিগিন হেসে বলেন—ঠাকরোন, তুমি মাইফেলের মানেই জানো না।

—বয়স হল, এখন ওসব ছাড়ো না।

—ছেড়ে ধরবটা কী?

—সবই তোমার অদ্ভুত। শুধু শুঁটকী হলেই হবে নাকি?

—না। ঐ সঙ্গে একটু ফ্রায়েড রাইস মাংস আর মাছও কোরো। চাটের জন্য আলুর বড়া কোরো। মেটে চচ্চড়ি তো আছেই। ভটচায মদ-টদ খায় না, একটু চাখবে মাত্র। তাই খাবারটা দিয়ে পুষিয়ে দেওয়া যাবে।

বৌদি চলে যাওয়ার আগে বলেন—টাকাটা কিন্তু একদম ভস্মে ঘী ঢালা হল। পারলে পাটিপত্রের দিন একটু কাটছাঁট কোরো।

—তাই কখনো হয়। কথা হচ্ছে কথা। কিছু কাটছাঁট হবে না।

—তোমার দাদা বলছিলেন এত টাকা বেরিয়ে গেল, শানুটাও লস্ দিচ্ছে, ব্যবসাপত্রের না ক্ষতি হয়।

দিগিন একটা হাসি লুকোলেন, বললেন—ক্ষতি হবে তো বটেই। সোপস্টোনটা ডোবাবে, তবে ঠিকেদারী তো আছেই। চিন্তা কী?

বৌদি একটু দাঁড়িয়ে থাকেন।

দিগিন বলেন—পুন্নির বিয়ে দেওয়ার পর আমি গরিব হয়ে যাবো না ঠাকরোন, ভয় নেই।

বৌদি শ্বাস ফেলে বলেন—তোমরাই বোঝো। আমি মেয়েমানুষ আমার এসব কথায় থাকার কী?

—মেয়েমানুষই তো কথায় থাকে। নইলে সংসারটা ব্যাক্যহারা হয়ে যেত।

boiRboi.net

বৌদি বলেন—তবু তো মেয়েমানুষের পদতল ছাড়া গতি নেই।

বৌদি চলে যান। পুনি চা নিয়ে আসে। সন্ধ্যে হয়। হিমালয় ঢেকে যায়। তিনধারিয়ার আলোর মালা জেগে ওঠে। ডাউহিলের ডগায় বিন্দু বিন্দু আলো জ্বলে। দার্জিলিঙের রাস্তায় ক্রমান্বয়ে মোড় নিয়ে যে সব গাড়ি উঠছে বা নামছে তাদের হেডলাইট মাঝে মাঝে ঝলসে উঠছে।

সন্ধ্যের মুখে দিগিন পোশাক করে মোটরসাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। বাড়িতে বলে যান, ভটচায এলে যেন বসানো হয়।

এই শরৎকালে শিলিগুড়ির মতো এমন সুন্দর জায়গা আর হয় না। আবহাওয়াটি বড় মনোরম। ঘাসে গাছপালার একটা ভেজা গন্ধ ওঠে। শিশির পড়ে, চারধারে একটা নিঃশব্দ উৎসব লেগে যায়।

নিউমার্কেটে আলো ঝলসাচ্ছে দোকানপাট। হিলকার্ট রোড এখন কলকাতাকে টেক্কা দেয় আলোর বাহারে। চারধারে আলোয় আলোময়।

দিগিন বাইকটা আস্তে চালিয়ে সেবক রোডের মোড় পেরিয়ে মহানন্দার পুলের কাছে এসে ট্যাঙ্কে পেট্রোল ভরে নেন। পাম্পের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেন। তারপর বর্ধমান রোড ধরেন। ফাঁকা রাস্তা, ঝড়ের বেগে চলে আসেন ময়নার বাড়ির কাছে।

উঁচু রাস্তা থেকে একটা শুঁড়িপথ নেমে গেছে। বড় রাস্তায় বাইকটা দাঁড় করিয়ে অন্ধকার রাস্তাটা ধরে নেমে যান। ড্রেনের ওপর কংক্রীটের স্ল্যাব পাতা, তারপর, ঝুমকোলতার চালচিত্রওলা লোহার গেট। একটু ছোট বাগান। শিউলির গন্ধে ম ম করছে। কাঁচা মাটির গন্ধ পান। সেইসঙ্গে ধূপকাঠির একটা মিষ্টি গন্ধ।

ছোট হলেও বাড়িটা খারাপ না। দুখানা ঘর, বাগান, কুয়ো সবই আছে। বাছাই ভাল কাঠের দরজা-জানালা, বারান্দায় গ্রীল। একটা রাগী ভুটিয়া কুকুর আছে পাহারাদার। আর আছে একজন নেপালী ঝি। ময়না কিছু কষ্টে নেই। দিগিন মাঝে মাঝে রাতে থেকেও যান। প্রায়দিনই দেখা করতে আসেন, যথেষ্ট টাকাপয়সা দেন। ময়নার খারাপ থাকার কথা নয়। গত বাইশ-তেইশ বছর তো এভাবেই কেটেছে।

ধূপকাঠির গন্ধটা উন্মুখ হয়ে শুঁকতে শুঁকতে বারান্দায় উঠে আসতেই একটা অস্ফুট আহ্লাদের আওয়াজ করে কুকুরটা এসে লুটিয়ে পড়ে। বারংবার লাফ দিয়ে গায়ে ওঠে, প্রবল আবেগে পায়ে মুখ ঘষে। দিগিন তার মাথায় চাপড় মেরে আদর করেন। ঘরে টিউবলাইট জ্বলছে, নীল পর্দা ফেলা। পুরুষকণ্ঠে ভিতর থেকে প্রশ্ন আসে—কে?

দিগিন উত্তর দেন না। কণ্ঠস্বরটা তিনি চেনেন। কাটিহারের ফকির সাহেব। মাঝে মধ্যে এদিকে আসেন।

বাইরের ঘরে একটা চৌকী আছে, গোটা দুই বেতের চেয়ার। চৌকীতে ফকির সাহেব বসে। লম্বা চুল পরনে আলখাল্লা, চোখে সুর্মা, মুখে পান। দাড়িটা ট্রিম করে কামানো। চোখের দৃষ্টিতে একটা জ্বলজ্বলে তীব্রতা আছে। লোকে বলে ফকির সাহেবের বয়স একশো। সেটা বোধহয় বাড়িয়ে বলা। দেখে পঞ্চাশের বেশী মনে হয় না।

দিগিন পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন।

ফকির সাহেব মৃদু হেসে বলেন—আও বেটা।

—কখন এসেছেন?

—বিকালে। রাতের গাড়িতে ফিরে যাচ্ছি, তো ভাবলাম ময়না বিটির সঙ্গে দেখা করে যাই।

—আমাদের ওখানে গেলেন না তো?

—যাবো। ফি হপ্তা তো আসছিই।

ধূপকাঠির সুন্দর সুবাস আবার বুক ভরে টানেন দিগিন।

ময়নার ঝি উঁকি দিয়ে দেখে যায়। একটু পরেই ময়না আসে।

পরনে একটা চওড়া লালপাড়ের সাদা খোলের শাড়ি। বিয়াল্লিশ বছরের কিছু মেদ ও মেচেতা শরীর আর মুখকে শ্রীহীন করেছে বটে, কিন্তু এখনো দীর্ঘ শরীরে যথেষ্ট যৌবন রয়ে গেছে। মাথায় এলো-খোঁপা, কপালে চন্দনের টিপ। নাকটা একটু ছোটো হলেও ময়নার চোখ ছোট নয়। বেশ বড়বড় দুটি চোখ। মুখে কিছু ক্লান্তি, কিছু গাম্ভীর্য। ময়না আজকাল নেপালী ভাষায় কখনো কথা বলে না। এমন কি সে তার ঝিয়ের সঙ্গে পর্যন্ত বিশুদ্ধ বাংলায় কথা বলে।

দিগিনকে দেখেই মুখটা অন্য ধারে ফিরিয়ে নিয়ে বলল—ফকির সাহেবের জন্য রান্না করছি, তুমিও খেয়ে যেও।

দিগিন মাথা নাড়েন। বলেন—বাসায় আজ এক বন্ধু খাবে।

—ও। ময়না বলে।

দিগিন বেতের চেয়ারে বসেন। একটা চুরুট ধরান। বিশ্বের এমন কোন মানুষ নেই যার সামনে দিগিন চুরুট না খান।

ফকির সাহেব তাঁর পোঁটলা থেকে একটা কৌটো বের করে পান খেলেন, একগাদা দোক্তা মুখে দিয়ে ঝিম হয়ে বসে রইলেন একটু। পিক-টিক ফেলেন না। বার দুই তিন হেঁচকী তুলে দোক্তার ধাক্কা সামলে নিয়ে বললেন—কি খবর-টবর?

—ভালই।

—বহোৎ আচ্ছা। বন্নোরহো।

—আমার হাতটা একটু দেখবেন ফকির সাহেব?

—দিনের বেলা।

—আগেও তো দেখেছেন।

—জরুর।

—আমার মরণ কবে?

ফকির সাহেব মজবুত দাঁত দেখিয়ে হাসলেন, বললেন—ওই সব জেনে কি হয় রে বেটা?

ময়না দাঁতে ঠোঁটে কামড়ে একটু অসহায়ভাবে চেয়ে থাকে দিগিনের দিকে। কথা বলে না।

দিগিন নীরবে চুরুট খেয়ে গেলেন কিছুক্ষণ। অন্যমনস্ক। একটা শ্বাস ফেলে বললেন—মানুষ জন্মায় কেন ফকির সাহেব?

boiRboi.net

—খোদায় মালুম। ফকির সাহেব উদাস উত্তর দেন। পানটা মজে এসেছে। নিমীলিত চোখে সেই স্বাদটা উপভোগ করতে করতে আস্তে করে বলেন—কৌন জানে। পয়দা বেফয়দা। তব ভি কুছ হ্যায় জরুর।

দিগিন হাসলেন। ফকির সাহেব তাত্ত্বিক নন, দার্শনিক কথাবার্তা আসে না, এমন অনেক কথা বলে ফেলেন যা ধর্মবিরুদ্ধ।

ষোল বছরের সেই কিশোরীটি কত বড় হয়ে বুড়ো হতে চল্ল। কিন্তু কেন? আটান্ন বছর বয়সে এসব প্রশ্ন নিতান্ত জরুরী বলে মনে হয়।

ফকির সাহেব একটা মস্ত বোতল পোঁটলা থেকে বের করে ময়নার হাতে দিলেন। বললেন—রাখ্। এক মাহিনা আওর খেয়ে দেখ।

ওষুধটা বাচ্চা হওয়ার জন্য খায় ময়না। দিগিন জানেন। গত তিন চার মাস ধরে খাচ্ছে।

ময়না বোতলটা নিয়ে একবার দিগিনের দিকে তাকায়। চোখে একটা শূন্যভাব। বহুবছর ধরেই কি ময়না তার শূন্যচোখে চেয়ে আছে দিগিনের দিকে? দিগিন ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেন না। একটা বাচ্চা ময়নাকে তিনি দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। সেটা হয়তো ময়নারই দোষ। কারণ, ময়না তো একা দিগিনের সঙ্গ করে নি। কাজেই দিগিন নিজেকে দায়ী করতে পারেন না। ময়নাও বাচ্চার জন্য তেমন ভিখিরিপনা করে নি কখনো। আজকাল কান্নাকাটি করে। দিগিন বিরক্ত হন। ময়না আজকাল কেবল একরকম ভাষাহীন চোখে চাইতে শিখছে। দিগিন সেটা সহ্য করতে পারেন না। ময়নাকে তিনি যতদূর সম্ভব সুখে রেখেছেন, কখনো বিশ্বাসের ভঙ্গ হয় নি। বৌয়ের চেয়ে কিছু কম তো নয়ই, বরং বেশী সুখেই আছে ময়না। মর্যাদা হয়তো নেই। কিন্তু মর্যাদা না পেলেই বা ঘুমের তরকারীর দোকানের সেই অশিক্ষিত মেয়েটির কী যায়-আসে। বরং উল্টোদিক থেকে দেখলে ময়নাই দিগিনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে নি। অবাধে মেলামেশা করেছে ছোকরাদের সঙ্গে। পয়সা রোজগারের জন্য নয়, কিংবা কেবল যৌন-কাতরতার জন্যও নয়। সে বোধহয় দিগিন নামের একটা পাথর ভাঙতে পারে নি বলেই পুরুষের বুক চিরে চিরে একটা নিরন্তর প্রবহমান ফল্গুধারাকে খুঁজেছে। পায়নি। দিগিনের কাছ থেকে চলে যেতে চেয়েও যেতে পারে নি ময়না। দাঁড়ের পোষা ময়না, যেতে পারে না। দিগিন ওর দিকে চেয়ে এক গিনিপিগকেই দেখতে পান। ময়নাকে তেমন শাসন কখনো করেন নি দিগিন, কর্তৃত্ব নয়, দাবি-দাওয়াও নয়। হাওয়া-বাতাসের মতো সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। কেউ কারো বাঁধা নয়। তবু কেন বাঁধা আছে ময়না তা ভাবেন দিগিন, অনেক চুরুট পুড়ে যায়, তবু সমাধান খুঁজে পান নি পঁচিশ বছর ধরে।

ময়না ভিতর-বাড়িতে চোখের ইশারায় ডাকে। দিগিন উঠে যান। ধূপকাঠির গন্ধ ছাপিয়ে উঠেছে মাংস রান্নার গন্ধ। প্রেশার কুকারের তীব্র হুইশল্ বেজে উঠল।

ভিতরের ঘরে ময়না শোয়। একটা খাট পাতা, একটা, ড্রেসিং টেবিল, কাঠের কাচ-বসানো আলমারি আলনা। দিগিন বিছানায় পা তুলে বসেন, ময়না মোড়া টেনে মুখোমুখি বসে।

—ফকির সাহেবের ওষুধের টাকাটা দিয়ে দিতে হবে। ময়না বলে।

—কত?

—বিয়াল্লিশ টাকা। আমি দিয়ে দিচ্ছি আজ।

—আমার কাছে আছে, দিয়ে দেব'খন যাওয়ার সময়।

ময়না চুপ করে থাকে একটুক্ষণ। হঠাৎ মুখ তুলে বলে—মরার কথা জিজ্ঞেস করছিলে কেন?

—এমনিই।

—আমিও জিজ্ঞেস করেছি।

—কী?

—বলেছি, বাঁচতে ইচ্ছে করে না।

—ও।

—ফকির সাহেব বললেন যে বাচ্চা হলে বাঁচতে ইচ্ছে করবে।

—তাই নাকি।

ময়না দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—একা বেঁচে থাকা কত কষ্টের।

—কষ্ট কী? দুনিয়ায় সবাই একা।

ময়না এসব কথা ভাল বোঝে না। কিন্তু শুনলেই আজকাল ওর চোখ ভরে জল আসে। এখনো এল। চোখ মুছল নীরবে।

ময়না বলল—আমি কোথাও ঠিক চলে যাবো।

দিগিন চুপ করে রইলেন।

ময়না বলে—শুনছ?

—শুনেছি।

—আমি কোথাও চলে যাবো।

—যেও, আমি তো কখনো বারন করি নি।

একটু তীব্রস্বরে ময়না বলে—কেন বারন করো নি?

—কেন করব?

ময়না কথা খুঁজে পায় না। আসলে সে বাঙালী মেয়েদের মতো কথার ওস্তাদ নয়। তার ওপর সে নানারকম পাপ-বোধে ভোগে। সে জানে, দিগিনের প্রতি সে তেমন বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয় নি।

প্রেশার কুকারের আর একটা হুইশল্ বেজে ওঠে। শিউলির গন্ধের সঙ্গে মাংসের গন্ধ মিশে যায়। ময়নার ঝি কফি নিয়ে আসে।

দিগিন উঠে বসেন। বাঁ হাতের পাঁচ আঙুলের ওপর কাপসুদ্ধ প্লেটটা ধরে রেখে তিনি নিচে বসা ময়নার দিকে তাকান। দাঁড়ের ময়না। গিনিপিগ। বলেন—আজ সকালে শালুগাড়ার সিদ্ধাইয়ের কাছে গিয়েছিলাম।

ময়না চেয়ে থাকে।

দিগিন কফিতে চুমুক দিয়ে বলেন—সিদ্ধাই বলল, একজন ফর্সা আর লম্বা মেয়েছেলে আমার খুব ক্ষতি করবে।

—মেয়েছেলেটা কে?

boiRboi.net

—তা বলে নি।
—ফর্সা আর লম্বা ?
—হ্যাঁ।
ময়না দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—সে কি আমি ?
—কী করে বলি ?
—কীরকম ক্ষতি ?
—তাও স্পষ্ট করে বলে নি।
ময়না চেয়ে থাকে। হঠাৎ মাথাটা নোয়ায়।
দিগিন হেসে বলেন—বোগাস! আসলে সবাই তোমাকে চেনে। আমাদের সম্পর্ক জানে, তাই ওসব বলে।
—তুমি তো বিশ্বাস করো!
—না, করি না।
—তবে গিয়েছিলে কেন ?
—গিনিপিগ দেখতে।
গিনিপিগের ব্যাপারটা ময়না জানে। তাই বুঝল।
—আমি তোমার আর কী ক্ষতি করতে পারি ? যদি ক্ষতি করি তো আমারই ক্ষতি। তুমি ভাল না থাকলে আমার ভাত-কাপড় জুটবে কী করে ?
—সেই জন্যই তো বলছি, সব বোগাস।
ময়না হঠাৎ মুখখানা তুলে বলল—ক'দিন আগে একদিন সকালে শানু এসেছিল।
—শানু ? চমকে ওঠেন দিগিন, কেন ?
—তেমন কোনো কারণ তো বলে নি। একটা স্কুটার হাঁকিয়ে এল।
—কী বলল ?
—বলল, কাকীমা কিছু টাকা দাও, খুব লস্ যাচ্ছে।
দিগিন অবাক হন, বলেন—কাকীমা বলে ডাকল ?
ময়নার চোখে আবার জল। কথা ফুটল না, মাথা নাড়ল কেবল।
—টাকা দিলে ?
—দিই নি। বললাম, দেবো।
—কত ?
—খুব বেশী নয়। দু'হাজার, তোমাকে বলতে বারন করেছিল।
—কেন ?
—ও একটা হিসেব মেলাতে পারছে না। তোমাকে ভয় পাচ্ছে। বলল, কাকাকে ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই। টাকাটা ক্যাশে দেখাতে হবে।
দিগিন আগুন গরম কফি শেষ করেন। চুরুট ধরিয়ে নেন। ছড়ানো ঠ্যাং দুটো নাড়তে নাড়তে বলেন—ডোবাবে।
—কী ?
—ঐ ছেলেটাই ডোবাবে। বংশের কুড়াল।
—এমন সুন্দর করে ডাকল। তোমাদের বাড়ির কেউ তো আমাকে ওরকম করে

boiRboi.net

ডাকে নি কখনো। আমার কথা মুখেই আনে না কেউ। কখনো আনতে হলে নাম ধরে ময়না বলে। ছোট বড় সবাই।

দিগিন উঠতে উঠতে বলেন—টাকাটা ওকে দিও না।

—কথা দিলাম যে!

দিগিন নিশ্বাস ফেলে বলেন—তাতে ওর ক্ষতি হবে। যতদূর জানি ও জুয়া-টুয়া খেলছে, ফাটকায় টাকা ঢালছে। রাতারাতি বড়লোক হতে চায়।

—চা'ক। ছেলেমানুষ।

দিগিন অবাক হয়ে ময়নার দিকে চেয়ে থাকেন একটু। মা হতে না পারা ময়না ভিখারিনীর মতো চেয়ে আছে। দিগিন শ্বাস ফেলে বলেন—ইচ্ছে হলে দিও। কিন্তু ও টাকাটা বাজে ব্যাপারে নষ্ট করেছে। তাছাড়া তোমার কাছে টাকা চাইবে কেন? ওর লজ্জা থাকা উচিত।

ময়না তার বড় দুখানা চোখ পরিপূর্ণ মেলে দেয় দিগিনের মুখের ওপর। বলে—আপন মনে করে চেয়েছে। ওকে বোকো না। আমার ছেলে থাকলে সে যদি টাকা নষ্ট করত তাহলে কী করতে?

—শাসন করতাম।

—বেশী দোর করলে শাসন করা যায়। ও তো মোটে একবারে চেয়েছে। টাকাটা কিন্তু আমি দেবো। তুমি কিছু বোলো না।

দিগিন অন্যমনস্কভাবে বলেন—সোপস্টোনের পিছনে বহু টাকা নষ্ট করেছে। কিছু বলি নি। কিন্তু এ সবের একটা শেষ থাকা উচিত।

—তুমিওতো টাকা কম নষ্ট করো না।

—সে করি রোজগার করে। ওর তো এসব রোজগারের টাকা নয়। ব্যবসাতে আমি ওকে নিয়েছি বিশ্বাস করে, ভালবেসে, বিশ্বাস রাখতে না পারলে ছাড়িয়ে দেবো।

—সবাইকেই তো ছাড়িয়ে দিয়েছো, কাকে নিয়ে থাকবে?

—আমার কাউকে দরকার হয় না।

ময়না সে সত্যটা জানে! তাই চুপ করে থাকে। অনেকক্ষণ বাদে হঠাৎ বলে—শানু বিয়ে করবে।

দিগিন চমকে ওঠেন—কী বললে?

—শানু বিয়ে করবে।

—কাকে?

—পছন্দ করা মেয়েকে।

—তোমাকে কে বলল?

—শানু নিজেই বলে গেছে। কালিম্পঙের মেয়ে। বিয়ে করে আমার কাছে এনে তুলবে বলেছে।

দিগিন চেয়ে থাকেন। ঠিক বুঝতে পারেন না।

ময়না নিজেই বলে—মেয়েটা বিধবা, তোমরা নাকি ঘরে নেবে না, তাই আমার কাছে রাখবে।

দিগিন একটা হাই চাপলেন! বললেন—ও।

boiRboi.net

—আমি কী করব ?

—শানুকে বলে দিও যে এ বাড়িটাও আমার, আর যে ঠিকাদারী ব্যবসার জোরে বাজারে ও নিজে চালু আছে সেটাও আমার। কাজেই ইচ্ছে করলেই ও যা খুশী করতে পারবে না।

ময়না হঠাৎ আস্তে করে বলে—আমি কি তোমার বৌ ?

দিগিন ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে বলেন—এসব কথা তো অনেক হয়েছে, আবার কেন ?

—ধরো যদি শানুও তোমার মতোই কাজ করে তবে দোষের কী! আমার মতো কাউকে বৌ করে এনে যদি বাঁধা মেয়েমানুষের মতো রেখে দেয় তো তুমি কি তাকে শাসন করতে পারো ?

—পারি। দিগিন শান্ত গলায় বলেন।

—কেন পারো ?

—কারণ আমি টাকা রোজগার করে নিজের পয়সায় সব করেছি। ওর মাজায় সে জোর নেই। ওর আছে বারফাট্টাই। ফকির সাহেব একা বসে আছেন, তুমি তার কাছে যাও। শানুর চিন্তা আমি করব।

ময়না শ্বাস ফেলে উঠে যায়। এ পাথর সে ভাঙতে পারবে না।

ভটচায আয়োজন দেখে খুব খুশী। পেটের রোগ আর প্রেশারের জন্য বাড়িতে খাওয়ার বড় ধরা-করা। কিন্তু লোকটা খাইয়ে মানুষ।

মদের গেলাসটা সরিয়ে রেখে মেটুলীর চাটটা টেনে নিয়ে বললেন—বড় খাওয়ার আগে আবার এই ছোটো খাওয়ার ব্যাপারটা কেন মশাই ?

দিগিন হেসে বললেন—এ ছোটো খাওয়া নয়, এ হল চাট, মদের মুখে একটু একটু খেতে হয়। নুন আর ঝাল স্বাদে তেষ্টা বাড়ে, তাতে মদটা খেয়ে আরাম।

কিন্তু ভটচায মদের মোটে স্বাদ পান না। দু-এক চুমুক কষ্টে খেয়ে বলেন—এ মশাই চলবে না। বড্ড লাউড জিনিস।

—তাহলে চাটটাও খাবেন না। খামোখা ক্ষিদে নষ্ট হবে। বলে দিগিন জলপান করার মতো দিশী মদ গলায় ঢালেন।

—শুঁটকী মাছ আমি বড় ভালবাসি।

—একটু মাল টেনে নিন, আরো ভাল লাগবে।

ভটচায কষ্টেসৃষ্টে আরো দু-এক চুমুক খান। বলেন—মাথা ঝিমঝিম্ করছে।

—তাহলে আর একটু চালান। ঝিমুনীটা কেটে ফুর্তি লাগবে।

ভটচায খেতে চেষ্টা করেন।

দিগিন উঠে গিয়ে পোর্টের একটা বোতল আনেন আলমারি থেকে। আলাদা গেলাসে ঢেলে দিয়ে বলেন—এটা খান। এটার স্বাদ ভাল।

পোর্ট ভটচাযের ভালই লাগে। অনেকখানি খেয়ে নেন একবারে। বলেন, হ্যাঁ, এটা বেশ।

—আর একটু দিই ?

BoiRboi.net

—দিন।

দিগিন মৃদু হেসে বলেন—খুব দামী জিনিস। এই বোতলটা একশো টাকা।

—বলেন কী! থাক থাক আর দেবেন না।

—খান না মশাই, দামকে ভয় কী?

—দামের জন্য নয়, নেশা হয়ে যাবে।

বোতলটা ভটচাযের হাতের নাগালে রেখে দিলেন, বুঝতে পারেন 'দামী জিনিস' কথাটাই ভটচাযকে কাত করবে।

করলও। ভটচায গেলাস শেষ করে বোতলটা হাত বাড়িয়ে নিলেন, বললেন—দিগিনবাবু, এর জোরেই না এখনো ফিট আছেন। নইলে এখানকার জলহাওয়া সহ্য করেন কী করে?

—একজ্যাক্টলি।

ভটচায কথা বলতে থাকেন। প্রথমে চাকরির কথা। তারপর ঘর-সংসারের কথা। কী একটু দুঃখের কথা বলে দু ফোঁটা চোখের জল ফেলেন। দিগিন চোখ ছোটো করে চেয়ে গিনিপিগ দেখতে থাকেন। আজকাল তার বড় একটা নেশা হতে চায় না। কাল রাতে যেমন ঘুমের বড়ি খেয়েছিলেন তেমনি আজও একবার খাবেন নাকি!

ভটচায হেঁচকি তুলে বলেন—শুঁটকী মাছ!

—আসছে।

—খুব ভাল জিনিস।

—খুব।

—বহুকাল খাইনি, আমার বাসায় ওর পাট নেই। ছেলেবেলায় খুব খেয়েছি। আপনার বাসায় রেগুলার হয়?

—হয়।

—সবাই খায়?

—না। আমি খাই আর বড়বৌদি। আর কেউ না।

—বৌ থাকলে সে যদি না খেত তবে আপনারও খাওয়া হত না।

দিগিন হাসেন।

ভটচায হঠাৎ সংবিৎ পেয়ে বলেন—কিন্তু লোকে বলে আপনার কে একজন আছে!

দিগিন গম্ভীর হয়ে বলেন—কে থাকবে?

—একজন মেয়েছেলে!

দিগিন হেসে বলেন—সে তো সবার থাকে।

—সবার থাকে? ভটচায হেঁচকী তোলেন।

—বিয়ে করলেই থাকে।

—না না, বিয়ে করা বৌয়ের কথা নয়।

—তবু কথা একই, বিয়ে করা বা না করা সবই এক কথা।

ভটচায অনেক ভেবে-চিন্তে মাথা নেড়ে বলেন—তা বটে। তাহলে আপনার একজন আছে?

—একজন না, কয়েকজন।

boiRboi.net

—কয়েকজন ? ভটচায চোখ বড় করে তাকাল।

—লোকে বলে না সে কথা ?

—না তো ! একজনের কথাই শুনেছি।

—লোকে কমিয়ে বলেছে !

—রাখেন কী করে ? একজনেরই যা খরচ।

—রোজগার করি। রাখি !

—বেশ খরচা পড়ে, না ?

—তা পড়ে, ফুর্তিটাও তো কম নয়। মেয়েছেলে, কিন্তু বৌ নয়, এর মধ্যে কি কম ফুর্তি নাকি।

ভটচায মাত্রাহীন টানতে থাকেন পোর্ট। বলেন—বাড়িতে বসে এসব খান, কেউ কিছু বলে না ?

—কী বলবে ?

—আপত্তি করে না ?

—বাড়িটা তো আমার।

—তবু ফ্যামিলিতে কি এসব চলে ?

দিগিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন—অত ভাবতে গেলে ফুর্তিই তো ফিকে হয়ে যায়।

—তা বটে।

—ভাববেন না। কেউ কিছু বলে তো বলুক। আপনার কাজ আপনি করে যাবেন।

—কী করব ?

—ফুর্তি।

—এই বুড়ো বয়েসে ?

—ফুর্তির আবার বয়স কী ? তাছাড়া সারাজীবন যদি ফুর্তি না করে থাকেন তো এই শেষ বয়সেই তা পুষিয়ে নেওয়া উচিত। আর তো বেশী সময় নেই। আপনি কিন্তু একটু বেশী খাচ্ছেন।

—না, আর খাবো না।

—খান। ক্ষতি নেই। তবে আর বেশী টানলে খাবার খেতে পারবেন না।

—দাঁড়ান। আর দুই চুমুক। আবার অনেকটা খেয়ে ভটচায একটা প্রকাণ্ড ঢেকুর তুলে বললেন—ঐ ! গ্যাসটা বেরিয়ে গেল ! পেটটা হাল্কা লাগছে।

—লাগবেই তো। দেশীটা খেলে আরো বেরিয়ে যেত।

—হ্যাঁ, ফুর্তির কথা কী যেন বলছিলেন ?

—এইটাই ফুর্তির বয়স। মরার পর ওপারে গেলে স্বয়ং যম যখন সওয়াল করবে—বাপু, পৃথিবীর কী কী অভিজ্ঞতা হয়েছে তোমার, কী কী ভোগ করে এলে—তখন কী বলবেন ? বলার কিছু আছে ? ঘ্যানঘ্যান প্যানপ্যান করে নাকি সুরে তখন পেটের রোগ, বৌয়ের মেজাজ, প্রোমোশনের দেরি, ডেবিট, ক্রেডিট—এসবই বলতে হবে। যম তখন ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে, বলবে—যাও, দুনিয়াটা আবার দেখে এসো, কিছুই দেখ নি।

boiRboi.net

ভটচাযের চোখে দুখানা রক্তাভ। সেই চোখে দিগিনের দিকে চেয়ে বলেন—শুঁটকী মাছ?

—হবে। আর একটু খিদেটা চাগিয়ে নিন।

ভটচায মদে সম্পূর্ণ ভেসে যাওয়ার আগে আবেগ-স্খলিত কণ্ঠে বলেন—বাড়িতে বড় ধরাকাটা! কিছু খেতে-টেতে দেয় না মনের মতো। বহুকাল ধরে ডিপ্রেসনে আছি। যদি পেটটা ঠিক থাকত, যদি প্রেশারটা উৎপাত না করত।

খাবার দিয়ে গেল চাকর। ভটচায দু চামচ ফ্রাইড রাইস খেলেন, একটুকরো মাংস, শুঁটকী মাছের চচ্চড়িটা মুখে তুললেন মাত্র, খেতে পারলেন না। পোর্টের গেলাস মুখে তুলে চকচকে চোখে চেয়ে দেখলেন দিগিনের দিকে! তারপরেই গেলাস রেখে চেয়ারে এলিয়ে বসে চোখ বুজলেন। আস্তে করে বললেন—বৌ বাচ্চা সব পাঠিয়ে দিয়েছি কোন্নগর। সেখানে আমার বাড়ি হচ্ছে। যে কদিন আছি রোজ আসব, বুঝলেন?

—নিশ্চয়ই। দিগিন বলেন।

একটা রিক্‌শা ডেকে ভটচাযকে তুলে দিতে রাত হয়ে গেল।

ভিতর-বাড়িতে ফিরে আসবার সময়ে দেখলেন, শানুর ঘরে আলো জ্বলছে। বন্ধ দরজার সামনে একটু দাঁড়ালেন। ঘরটা নিঃশব্দ। আস্তে টোকা দিলেন দরজায়।

—কে?

—আমি।

—ছোটকাকা।

—হুঁ্যা।

শানু উঠে এসে দরজা খোলে। এ সময়টায় দিগিনকে সবাই সমঝে চলে। কারণ প্রায়দিনই সন্ধ্যের পর দিগিন নেশা করেন।

কিন্তু আজ তাঁর নেশা হয় নি। যথেষ্ট পরিষ্কার আছে মাথা। চিন্তাশক্তি চমৎকার কাজ করছে।

শানু সপ্রশ্ন চোখে চেয়ে বলে—কিছু বলবে?

—হুঁ, বলে দিগিন শানুর ঘরে ঢোকেন।

ঘরটা ভাল। বারো বাই বারো মাপের ঘর। ফোম রবারের গদি পাতা খাট, সেক্রেটারিয়েট টেবিল, গদি আঁটা চেয়ার, টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। শানু একটু শৌখিন মানুষ। অন্তত দশ জোড়া জুতো র‍্যাকে সাজানো। ওয়ার্ডরোবটা বেশ বড়সড়। তাতে প্রয়োজনের অনেক বেশী জামাকাপড় ঠাসা আছে।

সেক্রেটারিয়েটের সামনের চেয়ারটায় বসেন দিগিন। কথা বলেন না।

শানু বিছানায় বসে। চেয়ে থাকে।

—শানু।

—বলো।

—ময়নার কাছে কেন গিয়েছিলি?

শানু স্মার্ট ছেলে। ঘাবড়াল না, একটু হাসল। বলল—তুমি চিরটা কাল কাকীমাকে বড় হেলাফেলা করেছ।

boiRboi.net

—কাকীমা !

—নয় ?

দিগিন শ্বাস ফেললেন।

শানু বলে—মানুষ যাই বলে বলুক, আমি জানি কাকীমা বলেই।

একটু কর্কশ স্বরে দিগিন বলেন—বুঝলাম, কিন্তু গিয়েছিলি কেন ?

—সম্পর্কটা সহজ করতে !

—সেটা নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কেন ?

শানু গম্ভীর হয়ে বলে—ছোটকাকা, একটা মানুষের প্রতি সারাটা জীবন কেন অন্যায় করে যাচ্ছ ?

—অন্যায় ?

—অন্যায় ছাড়া কী ? ভাত-কাপড়ের চেয়ে দামী জিনিস হচ্ছে মর্যাদা—

—থাক। টাকা চেয়েছিলি কেন ?

—চেয়েছি ধার হিসেবে।

—কেন ?

—সব টাকা লিকুইডেটেড হয়ে গেছে।

—সেটা আমাকে বলিস নি কেন ?

—বললে তো বকতে।

—এখন কি বকব না ?

শানু শ্বাস ফেলে বলল—সোপস্টোনের লস্টা হিসেব করছিলাম। তোমাকে যা বলেছি তার চেয়ে বেশী লস্ হবে। বাজারে ধারকর্জ একটু বেশী হয়ে গেছে। জলঢাকায় যে ইরেকশনের কাজটা অর্ধেক বন্ধ রাখতে হয়েছে সেটার বিল আটকে দিয়েছে, লেবাররা ক্ষেপে আছে, যাওয়া যাচ্ছে না।

নিজের দুখানা হাতের দিকে অন্যমনে একটু চেয়ে থাকেন দিগিন, শানুর কোনো কথাই তাঁকে স্পর্শ করে না। জলঢাকা এম-ই-এস, সোপস্টোন, টাকা, বিল, এসব কথা একটা জীবনে তিনি অনেক ভেবেছেন। এখন আর ভাবতে ভাল লাগে না। জীবনে সব কিছুরই একটা কোটা থাকে। তাঁর কোটা ফুরিয়েছে। আর কিছু করার নেই বোধহয়।

দিগিন তাঁর চিন্তান্বিত মুখখানা তুলে বলেন—আমার অনেক দোষ ছিল। ছিল কেন বলি, এখনো আছে। লোকে বলে, আমার হৃদয় বলে বস্তু নেই। কিন্তু আমার সদ্গুণেরও কিছু অভাব ছিল না। আমি সেই জোরেই দুহাতে টাকা রোজগার করেছি। রাতারাতি বড়লোক হওয়ার কোনো শর্টকাট রাস্তা আমার জানা নেই। বাজে ফাটকায় বা অনিশ্চিত ব্যাপারে আমিও কিছু ক্ষতি স্বীকার করেছি, কিন্তু কোনো ব্যাপারেই আমার ফাঁকির ফিকির ছিল না। তাই আজও আমি টাকার ওপরে বসে আছি। তোমাদের আমলে তোমারা এই টাকার পাহাড় ধসিয়ে দেবে।

শানু মাথা নিচু করে থাকে। তারপর আস্তে করে বলে—চেষ্টা তো আমিও কিছু কম করি না।

—কালিম্পঙে তোমার এখন কী কাজ হচ্ছে ?

boiRboi.net

—একটা ব্রীজ কনস্ট্রাকশন, তুমি তো জানোই।

—জানি। কিন্তু সে বাবদে তোমার সেখানে গিয়ে পড়ে থাকার মানে হয় না। কাল আমি নিজে সেখানে যাবো। তুমি জলঢাকায় যাবে। ইরেকশনের কাজটা শেষ করতেই হবে, মনে রেখো।

—লেবারারেরা ছেড়ে দেবে না। ওদের অনেক টাকা বাকী পড়ে গেছে।

—সেজন্য কে দায়ী?

—আমরা নই। ইরেকশনের ভুলটা ডিটেকটেড হয়েছে অনেক পরে। এখন নতুন করে করতে গেলে খরচ দ্বিগুণ হত। তাই আমরা ছেড়ে এসেছি।

—খরচের ভয় পেলে চলবে কেন? আমার নাম কোম্পানীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তার গুডউইল নষ্ট করার তুমি কে? কালই তুমি জলঢাকা যাবে।

শানু চুপ করে থাকে।

দিগিন বলেন—বুঝেছ?

শানু মাথা নাড়ল।

—কালিম্পঙে তোমাকে আর যেতে হবে না।

শানু মাথা তুলে বলে—জলঢাকায় কাজটা আবার হাতে নিলে আমরা সর্বস্বান্ত হয়ে যাবো।

—হলে হবো। তোমাকে ভাবতে হবে না।

—ছোটকাকা।

—বলো।

—আর একটু ভেবে দেখো।

—ভাববার কিছু নেই। কাজটা করতে হবে।

—একটা পয়সাও আসবে না, ঘরের টাকা চলে যাবে।

—জানি। আমি বোকা নই।

—তবু যেতে বলছ?

দিগিন রাগের গলায় বলেন—শুনতেই তো পাচ্ছ।

—ঠিক আছে।

—যদি লেবারারেরা গোলমাল করতে চায় তাহলে কী করবে?

—কিছু ঠিক করতে পারছি না।

—ব্যাঙ্ক আওয়ার্সের পরে রওনা হয়ো। টাকা নিয়ে গিয়ে প্রথম লেবার পেমেণ্ট করবে। আমাদের ওয়ার্ক অর্ডার এখনো ক্যানসেল করে নি, সুতরাং বাকীটা করতে ঝামেলা হবে না। আমি চেক লিখে রাখছি।

শানু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে—আচ্ছা।

—মনে রেখো লেবার পেমেণ্ট সবার আগে।

—আচ্ছা।

—আর সোপস্টোনের ব্যাপারটা তোমাকে ছেড়ে দিতে বলেছি। তুমি কিছু ভেবেছ?

—অনেক টাকা ইনভেস্ট করেছি।

boiRboi.net

—তবু ছেড়ে দাও।

—এটাতে তোমার টাকা ছাড়াও পার্টনারদের টাকা আছে। তারা কী বলবে?

—কী বলবে? যদি সন্দেহ করে তবে পার্টনাররা ইনিশিয়েটিভ নিক। তুমি ওটাতে আর টাকা ঢেলো না। ভুটান গভর্নমেণ্ট দর কমাবে না।

—ভেবে দেখি।

—দেখ! আর শোনো, যদি ময়নাকে তোমার কাকীমা বলে ডাকতে ইচ্ছে হয় তো ডেকো। কিন্তু ওকে তোমার স্বার্থে জড়িও না।

শানু মুখটা তুলেই নামিয়ে নেয়।

দিগিন বলেন—বুঝেছ?

শানু মাথা নাড়ল। বুঝেছে।

—ময়না আমাকে সবই বলেছে। কিছু গোপন করে নি।

দিগিন উঠে দরজার দিকে যেতে যেতে একবার থমকে দাঁড়ালেন। শানুর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—কিছু বলার আছে?

শানু তার ছোটকাকাকে চেনে। ভালমানুষ, স্নেহশীল, কিন্তু তবু ছোটকাকা যা চায় সংসারে তাই শেষ পর্যন্ত হয়। কখনো ঈশ্বর, কখনো শয়তান এই মানুষটাকে শানু খুব ভাল করে চেনে, আবার আদৌ চেনেও না। শানু তাই স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর হঠাৎ বলে—তুমি যা চাও তাই তো হয় ছোটকাকা।

—তাই হবে।

শানু শ্বাস ফেলে বলে—আমি প্রতিবাদ করছি না।

—আমিও অবিহিত কিছু করছি না।

—কালিম্পঙে আমার যাওয়াটা তুমি বন্ধ করতে চাও কেন?

দিগিন ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন। বললেন—বুঝে দেখ।

—আমি খারাপ কিছু করছি না।

—তবে ময়নার আশ্রয় চেয়েছ কেন? সেখানে আমি তো যাই। আমার চোখ এড়াবে কী করে?

শানু চুপ করে থাকে।

দিগিন শান্ত গলায় বলেন—তুমি ভেবেছিলে তোমার ছোটকাকা যখন ময়নার সঙ্গে একটা অবৈধ সম্পর্ক রেখেছে তখন নিজের দুর্বলতাবশতঃ তোমার যে কোনো ভাগিয়ে আনা মেয়েকেও সহ্য করবে?

শানু চুপ।

—বলো, তাই ভেবেছিলে?

—না।

—তবে ময়নার কাছে তাকে রাখতে চেয়েছিলে কোন্ সাহসে?

—আমি তোমাকে যথাসময়ে বলতাম।

—না বললেও আমি জেনেছি। বলে রাখছি, তা হবে না।

—ঠিক আছে। বলে শানু মুখ ফিরিয়ে নেয়।

দিগিন বলেন—কী ঠিক আছে? স্পষ্ট করে বলো।

boighoi.net

—আমি কাকীমার কাছে ওকে রাখবো না।

—তাহলে কোথায় রাখবে?

—অন্য কোথাও।

—রাখবেই?

শানু চুপ করে থাকে।

দিগিন আস্তে করে বলেন—না।

শানু তাকায়, বলে—উপায় নেই ছোটকাকা।

দিগিন উত্তেজনাটা রাশ টেনে ধরেন। বলেন—তুমি কাল যাচ্ছ কিনা?

—যাচ্ছি তো বললাম।

দিগিন মাথা নাড়েন। বলেন—কালিম্পঙ আর এম-ই-এস-এর কাজ আমি দেখব। ঠিক আছে?

শানু মৃদুস্বরে বলে—কিন্তু কালিম্পঙে তুমি যে জন্যে যাচ্ছ তা হবে না।

—কী জন্য যাচ্ছি তা বুঝলে কী করে?

—বুঝেছি। তুমি গোলমাল কোরো না। লাভ হবে না।

দিগিন হাসেন, বলেন—শানু, দিগিন চ্যাটার্জি এখনো বহুকাল বাঁচবে।

শানু উত্তর দিল না।

দিগিন ধীরে ধীরে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে তাঁর ঘরে চলে আসেন। একটু ঠাণ্ডা পড়েছে আজ। একটা চাদর নিয়ে বিছানায় যাওয়ার আগে বীয়ার দিয়ে দুটো ঘুমের বড়ি খেলেন। বাতি নিভিয়ে কাচের শার্শি দিয়ে চেয়ে রইলেন উত্তরদিকে। পাহাড় মুছে গেছে। একটা অদ্ভুত জ্যোৎস্না উঠেছে। কুয়াশার আবছায় ডুবে আছে শহর। নেশাটা আজ ধরছে না তেমন। তবু হাই উঠছে। ঘুম পাচ্ছে। তবু ঘুমোতে ইচ্ছে করে না। সংসারে কিছুই তাঁর নয়। তবু সবই তাঁকে কেন যে ভাবতে হয়।

ঘুম চোখেই দুটো চেক লিখলেন দিগিন। একটা পুন্নির বাবার নামে। অন্যটা চ্যাটার্জি কনস্ট্রাকশনের শান্তি চ্যাটার্জির নামে। চেক দুটো সই করে রেখে দিলেন টেবিলে।

শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ভোরবেলা একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন তিনি। সেবকের করোনেশন ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। পায়ের নিচে, বহু নিচে তিস্তা। তিস্তার দুধারে খাড়া পাহাড় দুটোকে আঁকড়ে ধরে ঝুলছে বিখ্যাত করোনেশন ব্রীজ। হঠাৎ দেখেন একটু দূরে দুই পাহাড় থেকে কে যেন একটা দোলনা দুলিয়েছে। সেই দোলনায় ঝুল খাচ্ছে একটা লোক। লোকটা চেনা। বহুকাল আগে শিলিগুড়িতে যখন প্রথম এসেছিলেন তখনকার চেনা। ফটিক লাহিড়ি। লাহিড়ি দোল খাচ্ছে, আর ভয়ে চীৎকার করছে। দিগিন হাতের রাইফেল তুলে লাহিড়িকে একবার নিশানা করে গুলি করলেন। ফসকাল, দিগিন আবার নিশানা স্থির করেন···পর পর কয়েকটা গুলি করেন দিগিন। লাগল না, কিন্তু লাহিড়ি চীৎকার করতে লাগল।

ঘুম ভেঙে যায় অস্বস্তির সঙ্গে। শুনতে পান দক্ষীর মা চেঁচিয়ে সুর করে

গাইছে, ও স্বামী তুই মর, ও স্বামী তুই মর। বোধহয় মাথাটা আবার গরম হয়েছে। সারাদিনই হাসে, কাঁদে, গায়। দক্ষীর বাপ চীৎকার করে ধমকায়। অশান্তি। সংসার জিনিসটার রহস্য কখনো বোঝেন নি দিগিন। ঘুমভাঙা চোখে তিনি একটু অবাক হয়ে হঠাৎ ফটিক লাহিড়ির কথা ভাবলেন। লাহিড়িকে স্বপ্ন দেখার কোনো মানেই হয় না। বহুকাল আগে লাহিড়ি মারা গেছে, গুলি খেয়ে নয়, সাধারণ কতগুলো রোগে ভুগে। তাকে এতকাল পরে স্বপ্নে দেখার মানে কী?

রাতে ভাল ঘুম হয় নি। সেই যে লাহিড়িকে স্বপ্নে দেখে ঘুম ভাঙল তারপর থেকে দিগিন জেগেই ছিলেন।

সকালে পুন্নি যখন চা করতে এল তখন দিগিন উত্তরমুখো ইজিচেয়ারে বসে নিজের পায়ের পাতার ফাঁক দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখছেন। চোখে কটকট করে আলো লাগছে।

পায়ের পাতায় কাঞ্চনজঙ্ঘা ঢেকে দিগিন বলেন—আমার চায়ে দুধ-চিনি দিস না।

—কেন?

—লিকার খাবো।

পুন্নি তাই এনে দেয়।

দিগিন চায়ের লিকারে খানিকটা হুইস্কি মিশিয়ে খেলেন। চুরুট ধরিয়ে নিলেন। শরীরটা ভাল নেই। কালিম্পঙ যেতে তাঁর মোটেই ইচ্ছে করছে না। কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না।

কুণ্ঠিত পায়ে শানু এল। পরনে বাইরে যাওয়ার পোশাক। মুখটা একটু শুকনো।

—ছোটকাকা।

—উঁ।

—ঘুমোচ্ছ?

—না।

—আমি জলঢাকা যাচ্ছি।

—কেন?

—তুমি বললে যে।

—ও।

—যাচ্ছি।

—যাবে? যাও।

—চেকটা লিখে রেখেছ?

—হ্যাঁ। টেবিলের ওপর আছে। নিয়ে নাও।

শানু টেবিলের কাছে যায়। চেকটা নেয়। দিগিন ক্লান্তভাবে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে চেয়ে থাকেন। চেকটা আজ ক্যাশ হয়ে যাবে, তারপর যা থাকবে তা ক্যাশ করে নেবে পুন্নির বাবা। তারপরও কিছু থাকবে। কিন্তু সে খুব বেশী কিছু নয়।

—সেভিংস অ্যাকাউন্টের চেক! এত টাকার চেক কি বিনা নোটিসে ক্যাশ করবে?

boiRboi.net

শানু জিজ্ঞেস করে।

দিগিন বুঝতে পারেন ভুল করে সেভিংসের চেক সই করেছেন কাল, আজকাল বড় ভুলভাল হচ্ছে।

ভ্রু কুঁচকে বললেন—করবে। ভটচাযকে একটা পার্সোনাল চিঠি লিখে দিচ্ছি। প্যাডটা দে আর কলমটা।

শানু প্যাড এনে দেয়। দিগিন খস্‌খস্‌ করে দুলাইন লিখে দেন। শানু চলে যেতেই আবার ক্লান্তভাবে বসে থাকেন। সামনে আজ স্পষ্ট ও পরিষ্কার কাঞ্চনজঙ্ঘা। বরফাচ্ছন্ন, নিঃশব্দ, ভয়াল, ভয়ঙ্কর। দিগিন চেয়েই থাকেন। কত বছর ধরে তিনি হিমালয়কে দেখেছেন আর দেখেছেন। ঐ নিস্তব্ধতা কতবার তাঁকে কাছে টেনেছে। আজ যেন হিমালয় ছেড়ে তাঁর কাছেই চলে আসছে তুষারশুভ্র নিস্তব্ধতা। তিনি অপলক চেয়ে থাকেন পাহারের দিকে।

কাল রাতে কেন ফটিক লাহিড়িকে স্বপ্ন দেখলেন তিনি? কোনো মাথামুণ্ডু নেই। তাঁর জীবনের সঙ্গে ফটিক লাহিড়ির কোনো যোগাযোগই নেই।

পুন্নির বাপকে ডেকে পাঠালেন।

পুন্নির বাবা এসে দাঁড়াতে তেমনি ভটচাযকে দুলাইনের চিঠি সমেত চেকটা দিয়ে বললেন—এটা আজই ক্যাশ করবেন।

চেকটা দেখে পুন্নির বাবা অবাক হয়ে বলেন—এখনই কেন?

—আমি কালিম্পঙ যাচ্ছি আজই। বেশ কিছুদিন থাকব না। যদি ছেলের বাবা আসে তবে টাকাটা যে কোনো অজুহাতে শো করবেন।

পুন্নির বাবা মাথা চুলকোন। অনিচ্ছুকভাবে বলেন—আচ্ছা।

দিগিন আর কোনো দিকে মনোযোগ দেন না। বেশ কিছুদিন থাকব না—এ কথাটা তিনি কেন বললেন? কালিম্পঙে তাঁর তো থাকার কথা নয়! পুন্নির বাবা চলে যান। দিগিন সবিস্ময়ে আবার কাঞ্চনজঙ্ঘার নিস্তব্ধতার দিকে চেয়ে থাকেন। কালিম্পঙে যদি যেতে হয় তবে এক্ষুনি তোড়জোড় করা দরকার। জিনিসপত্র গোছাতে হবে, জীপটা রেডি রাখতে হবে, দুচার জায়গায় দেখা করেও যেতে হবে। কিন্তু সেসব জরুরী কাজ পড়ে থাকে। দিগিন পুন্নিকে ডেকে এক কাপ চা করতে বলে বসে থাকেন চুপচাপ। ফটিক লাহিড়ির কথা অকারণে কেন যে মনে হচ্ছে! সরু মাদ্রাজী চুরুটের ধোঁয়ার গন্ধের মধ্যে বসে থাকেন দিগিন। সামনে সোনালী-সাদা কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর নীল আকাশ।

boiRboi.net

টাকা—এই শব্দটাই অদ্ভুত। মানুষের ভিতরে ঐ শব্দটা ঢুকে গেলেই টরেটক্কা বেজে উঠতে থাকে, মানুষ আর মানুষ থাকে না।

মোটরসাইকেলটার একটা পিন ভেঙেছে। পাঁচ দশ টাকার মামলা। অমর সিংয়ের গ্যারেজে সারাতে দিয়ে দিগিন রাস্তায় পায়চারি করেন। মিস্ত্রীটা উঠে এসে বলল—একটু সময় লাগবে। আপনি চলে যান না, সারিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দিগিন লোক চেনেন। চোখের আড়াল হলেই ওদের জো। তখন পিন-এর সঙ্গে

এটা ভেঙেছে, ওটা পুরোনো হয়েছে, সেটা পাল্টানো দরকার বলে নানারকম সারাইয়ের ফিরিস্তি দিয়ে বিল পাঠাবে বাড়িতে।

দিগিন মাথা নেড়ে বললেন—না রে, জেলখানায় ঢালাইয়ের কাজ হবে, এক্ষুনি যাওয়া দরকার।

উত্তর দিকে চেয়ে একটু দাঁড়িয়ে থাকেন দিগিন, শরতের মেঘ কাটা আকাশ। বর্ষার জলে বাতাসের ধুলোকণা ধুয়ে গেছে। পরিষ্কার আকাশ দেখা যায়, আর ঝকঝকে পাহাড়। সামনের পাহাড়ের রঙ মোষের গায়ের মতো ভুষকো, তার পিছনে রুপোর কাঞ্চনজঙ্ঘা। ডানদিকে আরো কয়েকটা রুপোলী চূড়া, কত বছর ধরে দেখছেন, তবু পুরোনো হয় না।

উত্তর বাংলার কিছুই পুরোনো হয় না। তবু কিছু কিছু হারিয়ে গেছে, মানুষেরই অবিমৃষ্যকারিতায়, ন্যারোগেজের একটা লাইন ছিল কালিম্পঙের দিকে, নদীর ধার দিয়ে, পাহাড়ের কোলে কোলে যেত ছোট্ট রেলগাড়ি গেইলখোলা পর্যন্ত। দার্জিলিঙের মতো অত চড়াই-উৎরাই ছিল না, ছিল না অত রিভার্স আর লুপ। মায়াবী মাঠ প্রান্তর, ছোটো ছোটো কুয়াশায় ঢাকা পাহাড়, নদীর খাত বেয়ে সেই ছোটো ট্রেন বয়ে আনত সিকিমের কমলালেবু, কাঠ, আপেল। সেই লাইন নাকি তেমন লাভজনক হচ্ছিল না, তাই রেলকোম্পানী লাইন তুলে দিল। ঐ স্বপ্নের রেলগাড়ি উঠে যাওয়ার পর বহুকাল দিগিনের মন খারাপ ছিল। মংপু বা কালিম্পঙ যেতে হলে বরাবর ঐ ট্রেনে চেপে যেতেন দিগিন। রিয়াত স্টেশন থেকে একটা রোপওয়ে ছিল। সেই রোপওয়ে দিয়ে মাল এবং মানুষ দুইই যেত। দিগিনও গেছেন। আর যাওয়া যেত খচ্চরের পিঠে। তখনো কালিম্পঙে মোটরগাড়ির রাস্তা হয় নি। কিছুক্ষণ যেন রূপকথার রাজ্যে থেকে আসতেন। মাঝপথে একটা স্টেশন ছিল—নামটা মনে পড়ছে না—বহুকাল হয় উঠে গেছে। এক দুপুরে গাড়িটা দাঁড়িয়ে দম নিচ্ছে, দিগিন চা খেতে নামলেন। তখন যৌবন বয়স। প্ল্যাটফরমের গায়ে প্রচণ্ড কৃষ্ণচূড়া ফুটেছে। ছোট্ট কাঠের স্টেশন ঘর, চারদিকে খেলনা-খেলনা ভাব, ছোটো লাইন, ছোটো সিগন্যাল, ছোটো নিচু প্ল্যাটফর্ম। তাঁর চারদিকে সেই খেলাঘরের স্টেশন, ডানদিকে নদীর খাত, দুধারে পাহাড়ের বিশাল ঢাল। দিগিন চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন, দেখলেন কৃষ্ণচূড়া গাছটার নিচে একটা বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে। আড়াই কি তিন বছর বয়স, গোলগাল চেহারা, শীতের চিমটিতে গালদুটো লাল, ফাটা গা। শীতের সোয়েটার গায়ে, পরনে প্যান্ট। কিন্তু দুষ্টু ছেলে সোয়েটার টেনে তুলে ফেলেছে বুকের ওপর, পেটটা উদোম। দু মুঠিতে কিছু কাঁকর আর ধুলো কুড়িয়ে নিয়েছিল। তারপর হঠাৎ খেলা ভুলে চেয়ে আছে দূরের দিকে। দুই পাহাড়ের মাঝখানের খাত বেয়ে গর্জে চলেছে দুরন্ত ফেনিল তিস্তা, তার দুরন্ত শব্দ গমগম করে প্রতিধ্বনি হয়ে আসছে। কাজলপরা দুই চোখে শিশু হাঁ করে দেখছে, কতকাল আগেকার সেই দৃশ্য, আজও ভোলেন নি দিগিন। বড় মায়া ঘনিয়ে উঠেছিল বুকে। সেই শিশুটির ধারে কাছে কেউ ছিল না। একা। খেলতে খেলতে খেলা ভুলে একা মুগ্ধ-বিস্মিত চোখে চেয়ে দেখছে। দিগিন হাতের কাপে চুমুক দিতে ভুলে গেলেন, গাড়ির হুইশল যতক্ষণ না বাজল ততক্ষণ ভিখিরির মতো, কাঙালচোখে চেয়ে রইলেন।

তার দিকে। কোলে নেন নি, আদর করেন নি। কিন্তু আজও এত বছর পরেও প্রায়ই যখন মনে পড়ে, তখন কত আদর যে করেন। সে কতো বড় হয়েছে এখন, সংসারীও হয় নি কি! কিন্তু সেসব মনে হয় না। কেবল দিগিনের মনের মধ্যে শিশুটি আজও অবিকল ঐ কয়েক মুহূর্তের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে, দুহাতে দুমুঠো ধুলো, আদুড় পেট, চোখে লেপটানো কাজল, আর তার চারধারে বিশাল পাহাড়, গতিময় প্রচণ্ড নদী, তার শব্দ, একা সে দাঁড়িয়ে।

চোখে কেন জল আসে! দৃশ্যটা ভাবলেই আসে, অথচ করুণ দৃশ্য তো নয়! তবে বুঝি সৌন্দর্য জিনিসটাই ওরকম, বুক ব্যথিয়ে তোলে! নাকি, শিশুটি নাড়া দেয় এক অক্ষম পিতৃত্বকে? কী হয়, কে জানে! একটা কিছু হয়। নিজের সঙ্গে মিল খুঁজে পান নাকি। পৃথিবীর অঢেল সম্পদ নিজের জন্যে খেলার ছলে আহরণ করতে করতে তিনি নিজেও কি মাঝে মাঝে খেলা ভুলে চেয়ে থাকেন না কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে!

সেই লাইন নেই, গাড়ি চলে না, স্টেশন কবে উঠে গেছে। তবু রয়ে গেছে একটি বীজ! কবে যেন অতীতের বাতাসে খসে পড়েছিল দিগিনের হৃদয়ে। আজ বয়সের বর্ষা পেয়ে ডালপালা ছড়িয়েছে, দৃশ্যটা ভোলেন নি দিগিন।

দিগিনের পাশ দিয়ে একটা জীপগাড়ি চলে যেতে যেতে থামল। দিগিন মুখ তুলে দেখলেন, তাঁরই জীপ, শানুই এখন এটা ব্যবহার করে। ড্রাইভার রমণীমোহন গাড়িটা সাইড করিয়ে রাখল। জীপের পিছন থেকে কপিল নেমে এল।

কালো বেঁটে এবং মজবুত চেহারা কপিলের, চোখে ধূর্তামী, মুখে একটু নির্বিকার শয়তানীর ভাব, বহুকাল কপিল দিগিনের কারবারে আছে।

কপিল দিগিনকে জানে। দিগিনও কপিলকে জানেন। এই জানাজানির ব্যাপারটা বহুকাল ধরে হয়ে আসছে। আজও শেষ হয় নি।

শিলিগুড়ির তল্লাটে কপিলের নাম কীর্তনিয়া বলে। ভালই গায়। বিভোরতা আছে, ভক্তিভাব আছে। অবরে সবরে গাঁ গঞ্জ থানা থেকে তার ডাক আসে। ছোটো মাপে সেও নামজাদা লোক। নিজের সেই মর্যাদা সম্পর্কে সে সচেতনও! মুখখানা সবসময়েই গম্ভীর হাসিহীন। কথা-টথা কমই বলে। একমাত্র দিগিন ছাড়া সে আর কারও বড় বাধ্য নয়। শানু ওকে সামলাতে পারে না, প্রায়ই দিগিনকে এসে বলে—তোমার কপিলকে নিয়ে আর পারা যায় না, ওকে তাড়াও।

দিগিন তাড়ান না।

সে আজকের কথা তো নয়। তখন সাহেবদের আমল। শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে পুরোনো আমলের ব্রডগেজের দার্জিলিং মেল এসে থামত সকালবেলায়। সাহেবদের বড় প্রিয় ছিল দার্জিলিং। ফার্স্টক্লাস বোঝাই লাল রাঙা সাহেবরা নামত কুকুর, মেমসাহেব আর নধর বাচ্চাদের নিয়ে। সরাবজীর জাল-ঢাকা চমৎকার রেস্টুরেণ্টে বসে ব্রেকফাস্ট খেত। তারপর দার্জিলিঙের ছোটো গাড়িতে উঠত। টাউন স্টেশন তখন ঝকঝক করত। এখনকার মতো পাঁজরা সার হায়-হতভাগা চেহারা ছিল না। কপিল ছিল সেই সময়কার টি-আই সাহেবের সেলুন বেয়ারা। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান টি-আই সাহেব লোক খারাপ ছিল না, কিন্তু কপিলটা ছিল হাড় হারামজাদা।

boiragi.net

সরাব্‌জী থেকে সাহেবের নাম করে দু-বোতল বিলিতি হুইস্কি হাতিয়েছিল, তাই চাকরি যায়। চাকরি যাওয়ার পর কিছুকাল বড় কষ্টে গেছে। সেই কষ্টের দিনে একটামাত্র মেয়ে মল্লিকাকে রেখে কপিলের বৌ মরল। মল্লিকা তখন দু আড়াই বছরের, মা মরা, একলা। কপিল সেই মেয়ে রেখে কোথাও যেতে পারত না। পায়খানা পেচ্ছাপের সময়েও মেয়েকে কোলে নিয়ে গিয়ে বসত। আবার বিয়ে করবে তেমন মুরোদ নেই, নিজেরই তখন প্রায় ভিক্ষে-সিক্ষে করে চলছে।

তখন দিগিনের বাড়ি আসত। ঘরদোর সাফ-সুতরো করত, পয়সাকড়ি হাতাত, ফাঁক পেলে চুরি করে দিগিনের বোতল ফাঁক করত। এখন দিগিনের বাড়িতে যেখানে বড়দাদা পাকা বাড়ি তুলেছে সেখানে কপিল একদা চমৎকার একটা বাগান করেছিল, মল্লিকাফুল যে আসলে বেলফুল তা কপিলই শিখিয়েছিল দিগিনকে। কপিলের জন্য দিগিনের মায়াদয়া তেমন ছিল না, ছিল ঐ মেয়েটার জন্য। ট্যাপাটোপা দেখতে ছিল মেয়েটা, বাপ দিগিনের বাগান করত, মেয়েটা বাপের কোপানো জমির মাটির ঢেলা ছোটো দুই হাতে চৌরস করত দিনভর রোদে বসে। বাপ ঘর ঝাঁট দিচ্ছে তো সেও একটা ন্যাতো বুলিয়ে কাঠের মেঝে মুছতে লাগত নিজের মতো করে। বদলে বাপ-বেটিতে পেটভর ভাত খেত দুপুরে, রাতের ভাত গামছায় বেঁধে নিয়ে যেত। তখন মাঝে মাঝে রাঁধতও কপিল, মুর্গীর ঝোল, ডিমের ডালনা, খিচুড়ি।

মেয়েটাই ছিল কপিলের জীবনসর্বস্ব। মেয়ে কাঁধে সর্বত্র চলে যেত সে। কাছ ছাড়া করত না। গ্রামে গঞ্জে মেয়ে সঙ্গে করেই কীর্তন করে বেড়াত। বাপের গায়ের গন্ধে, শরীরের ছায়ায় মেয়েটা পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত বেড়ে উঠল। তারপর ধরল ম্যালেরিয়ায়। ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার এক ধাক্কায় নিভে গেল মেয়েটা। মেয়েহারা বাপ সকালবেলায় কারো কাছে না গিয়ে খবরটা দিতে এল দিগিনকে। ডাকে নি, শব্দ করে নি। দিগিন তখনো ওঠেন নি ঘুম থেকে, শেষরাতে এসে ঠায় দাঁড়িয়েছিল টংগী ঘরের বারান্দায়। শিলিগুড়ির সেই দুর্দান্ত শীতে গায়ে গেঞ্জীর ওপর কেবলমাত্র চ্যাটার্জি সাহেবের বুড়ি পিসি কীর্তন শুনে মরার আগে যে নামাবলীটা দান করে গিয়েছিলেন কপিলকে, সেইটে জড়ানো। দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে। বাক্যহারা, বোধবুদ্ধি নেই, কেবল ঢোঁক গিলছে আর থুথু ফেলছে। পাড়াপ্রতিবেশীরা আর কীর্তনের দলের বন্ধুরা মেয়েটাকে নিয়ে গেছে শ্মশানে। এই সময়টায় সারা দুনিয়ার মধ্যে কপিল কেবল দিগিনকে মনে রেখে তারই কাছে চলে এসেছিল।

আজও কপিলের দিকে তাকালে সেই কপিলকে দেখতে পান দিগিন। শানু তাড়াতে বলে। তাড়ানো কি সোজা? সেই মেয়েহারা বাপটিকে আজও দিগিন মনের কপাট খুললেই দেখতে পান যে।

দিগিন জানেন, কপিল লোক ভাল নয়। চুরি-চামারি তো আছেই, চরিত্রের অন্য দোষও আছে। মেয়ে মরার পর কপিলকে নিজের কারবারে রাখলেন দিগিন। নানা-রকম কনস্ট্রাকশনের কাজে বহু হাজার টাকার মালপত্র এখানে সেখানে পড়ে থাকে। সেসব পাহারা দেওয়ার জন্য চৌকিদার রাখতে হয়। সে আমলে নেপালীরাই এই কাজ করে বেড়াত। দিগিনেরও কয়েকজন নেপালী চৌকিদার ছিল। তাদের দলে কপিলকে ভিড়িয়ে নিলেন, কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখিয়ে দেওয়া হল। কৃতজ্ঞতাবোধ

কিছু কমই ছিল কপিলের। রড, সিমেন্ট, কাঠ, রং, সে কিছু কম চুরি করে নি। তবু দিগিনের প্রতি তার একরকম আনুগত্য আর ভালবাসা আছে। জিনিস না বেচলে তার চলত না। ধরলে টপ করে স্বীকার করত।

নেপালী আর ভুটিয়ার মিশ্রণে দো-আঁশলা একটা লোক একবার একটা চায়ের দোকান করেছিল মহানন্দা ব্রীজের উত্তরে। খুবই রহস্যময় দোকান। লোকটার এক ছুকরি বৌ ছিল, নাম ছিপ্‌কি। দু গালে অজস্র ব্রণ, রোগাটে চেহারা। অনাহার এবং অর্ধাহারের গভীর চিহ্ন ছিল চোখের কোলে, গালে। রহস্যময় সেই দোকানের সামনের দিকে সেই দো-আঁশলা লোকটা রুটি, চা, বিস্কুট এবং ডিম বেচত। আর পিছনের খুপরিতে বিক্রি হত ছিপ্‌কি, আর চোলাই। সঙ্গে মেটে চচ্চড়ি কি তেলেভাজা। একটু নীচু শ্রেণীর মানুষেরাই ছিল সেই দোকানের খদ্দের। সন্ধ্যেবেলা বেশ ভিড় হত। ছিপ্‌কি তার স্বামীর সঙ্গে সামনের দোকান সামলাত, চোখে কাজল, চুল খোঁপা করে বাঁধা, হাতে কাচের চুড়ি, রঙীন সস্তা শাড়ি পরনে, খুব হাসত আর চোখ হানত। ভিতরের ঘর থেকে মাতালদের স্খলিত গলার নানান শব্দ আসত। ছিপ্‌কির স্বামী মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে নোংরা পর্দার আড়ালে চোলাইয়ের খদ্দেরদের পরিচর্যা করে আসত। লোকটা ছিল আধবুড়ো, খুব গম্ভীর, দার্শনিকের মতো মস্ত কপাল ছিল তার। এক সময়ে মিলিটারির ল্যান্স নায়েক ছিল বলে শোনা যায়। মিলিটারির মতোই আবেগহীন স্বভাব ছিল তার। পরনে চাপা পাজামা, গায়ে কোমরের বহু ভাঁজের কাপড়ের বন্ধনীতে গোঁজা থাকত কুক্‌রি। নেপালীরা কোমরে যে চওড়া করে কাপড়ের বন্ধনী বাঁধে তার একটা কারণ পেটটাকে গরম রাখা। পাহাড়ী অঞ্চলে পেটে ঠাণ্ডা লেগে এক রকমের হিল-ডায়েরিয়া হয়, সহজে সারে না। দিগিনও পাহাড়ে গেলে কোমরে পেট ঢাকা কাপড় বাঁধতেন নেপালীদের দেখাদেখি।

মাতাল আর চা-পিপাসুদের সকলেই ছিপ্‌কিকে চাইত। কিন্তু সকলের পকেটে তো পয়সা নেই। যাদের আছে তারা একটু বেশী রাতের দিকে ছিপ্‌কির স্বামীর সঙ্গে দরদস্তুর ঠিক করে নিত। পিছনের খুপরিতে চলে যেত ছিপকিকে নিয়ে। সামনের দোকানটায় লোকটা নির্বিকার বসে থাকত, তার সামনে উনুনে চায়ের জল ফুটছে, একটা ঘেয়ো কুকুর বসে আছে দোরগোড়ায়। সামনে অন্ধকার, নদীর জল ছুঁয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে। এই রকমই ছিল লোকটা।

কপিল সেখান থেকে গরমী রোগ নিয়ে আসে। দিগিন তাকে দুবার চিকিৎসা করে ভাল করলেন। অবশ্য চিকিৎসার খুব সুবিধে হয়ে গেছে আজকাল। সিফিলিসের অমোঘ ওষুধ পেনিসিলিনে বাজার ছাওয়া। কিন্তু দিগিন সেটুকু করে ক্ষান্ত হন নি। মহানন্দা পুলের কাছে ঐ দোকানটা যেতে আসতে চোখে পড়ত, ভিড় দেখতেন, ছিপ্‌কিকেও দুচারবার লক্ষ্য করেছেন, কপিলকে সেখানে প্রায়ই দেখা যেত।

একদিন শীতকালে শালবাড়ি থেকে ফেরার পথে জীপ থামালেন। হাড় ভেঙে যাচ্ছে উত্তুরে বাতাসে। অন্তত চার পাঁচ পেগ নীট হুইস্কি ছিল পেটে। মেজাজটা দুরন্ত ছিল। সোজা দোকানে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন—কী পাওয়া যায়?

সে রাতে ছিপ্‌কির বোধহয় খদ্দের জোটে নি। সাজগোজ করে একটা ভুটিয়া ফুলহাতা মেয়েলী সোয়েটার পরে ঘোমটায় কান মুখ ঢেকে আগুন পোহাচ্ছিল।

লোকটা একটা ছুরি দিয়ে পেঁয়াজ কুঁচিয়ে রাখছে। দুচার জন চায়ের খদ্দের বসে হাঁ করে ছিপ্‌কিকে দেখছিল, বিনা পয়সায় বিনা বাধায় যতটা দেখা যায়। ইয়ার্কি-টিয়ার্কিও বোধহয় করছিল, কারণ দিগিন যখন ঢোকেন তখন ছিপ্‌কি একজনের দিকে চেয়ে হাসছিল। দিগিন দেখলেন মেয়েটির হাসি বড় চমৎকার। মুখটা পাল্টে যায়। কিশোরীর মতো সরলহৃদয়া হয়ে ওঠে। দিগিনকে অনেকে চেনে, দোকানে ঢোকা মাত্র খদ্দেরদের কয়েকজন পয়সা দিয়ে পালিয়ে গেল। এক আধজন যারা বসে ছিল তারাও গরম চা হুস্‌ হাস করে মেরে দিয়ে উঠে গেলে ছিপ্‌কির চোখে একটু বিস্ময় ফুটে উঠেছিল, সামনে জীপ্‌ দাঁড়িয়ে, দিগিনের মতো সুপুরুষ চেহারার মানুষ, লোকটার চারদিকে যেন টাকা আলো দিচ্ছে, এ মানুষ এখানে কেন?

ছিপ্‌কির স্বামীর সেসব নেই। দিগিন জিজ্ঞেস করলেন দ্বিতীয়বার—কী পাওয়া যায় এখানে?

লোকটা উনুন থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে নির্বিকার গলায় বলে—চা, রুটি, ডিম।

—আর কিছু না?

লোকটা দিগিনের দিকে তাকাল না। মাথা নাড়ল। না।

দিগেনের পেটে হুইস্কিটা তখন কাজ করছে, হাতের দস্তানা দুটো খুলে রেখে বেঞ্চে বসে বললেন—মাংস পাওয়া যায় না? মেয়েমানুষের মাংস?

লোকটা ভয় খেয়েছিল ঠিকই। জীপটা দাঁড়িয়ে, দিগিনের চেহারাটাও তার ভাল ঠেকছিল না। তবু বিনয়হীন গলায় বলে—ওসব এখানে হয় না।

দিগিন ছিপ্‌কির দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার জিজ্ঞেস করলেন—দর কত?

ছিপ্‌কি একটু দিশাহারা হয়ে গেল। তার জীবনে এত বড় খদ্দের সে কখনো পায় নি। তাই স্বামীর দিকে চেয়ে নেপালীতে বলল— লোকটা কী বলছে শুনছো?

দিগিন দস্তানাটা টেবিলের ওপর ফটাস করে একবার আছড়ে বললেন—কুড়ি টাকা?

তখন টাকার দাম যথেষ্ট। অত টাকা কেউ দেয় না ছিপ্‌কিকে। মেয়েটা দিগিনের দিকে একবার চেয়ে স্বামীর কাছে গিয়ে নীচু স্বরে কী বলল।

দিগিন গরম খেয়ে বললেন—পঞ্চাশ টাকা!

বলেই কোটের ভিতর পকেট থেকে অন্তত সাত আটশো টাকার একটা গোছা বের করে প্রকাশ্যে পাঁচখানা দশটকার নোট গুণে বের করে নিলেন। লোকটা আড়চোখে দেখল, ছিপ্‌কি তার কাঁধ খামচে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে অস্ফুট গলায় কী যেন বলে। এত টাকা দেখে সে পাগল হয়ে গেছে। ছোটলোক, দুর্গন্ধযুক্ত, মাতাল এবং নীচ স্বভাবের লোকদের সঙ্গ করে সে ক্লান্ত। সেই মুহূর্তেই সে যেন সেই ক্লান্তিটা টের পেল। নতুন লোকটা তার কাছে শীতরাতে যেন স্বর্গ থেকে খসে-পড়া দেবদূত।

লোকটা উঠে গিয়ে ভিতরের ঘরের নোংরা পর্দাটা কেবল তুলে বোবা হয়ে রইল। এক হাতে পর্দা ধরা, অন্য হাতটা বাড়ানো। সেই বাড়ানো হাতে দিগিন টাকার নোটগুলো গুঁজে দিলেন।

ভিতরের খুপরিতে লণ্ঠন জ্বালা আলোয় ছিপ্‌কির দিকে তাকিয়ে তার প্রথম

যে কথাটা মনে হল, এ হচ্ছে কাঁপলের মেয়েছেলে। চোর, হাভাতে ছোটলোক কাঁপল।

দিগিন বিছানায় বসে ছিলেন, গা ঘেঁষে ছিপ্‌কি, কাঁধে হাত। মুখে অদ্ভুত উত্তেজিত হাসি। সে জানে তার বাজার ভাল। কিন্তু এতটা ভাল তা সে কল্পনা করে নি। সে মুগ্ধ চোখে চেয়ে দিগিনের মুখের ওপরেই শ্বাস ফেলল। নিজের গালে আঙুল বুলিয়ে বলল—এসব কিন্তু গরমী নয়। ব্রণ। আমি খারাপ লোকের সঙ্গে দোস্তি করি না।

দিগিন ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে চুরুট টানছিলেন। মেয়েটা ঘাড়ের ওপর হামলে পড়ে আছে। পঞ্চাশ টাকায় কেনা মেয়েছেলে, যা খুশী করতে পারেন। তবু এই মেয়েটা কাঁপলের এঁটো, কিংবা কাঁপলই এই মেয়েটার উচ্ছিষ্ট?

মেয়েটাকে এক ঝটকায় টেনে সামনে দাঁড় করালেন দিগিন। লণ্ঠনের আলোয় চেয়ে রইলেন ওর দিকে। শরীরে সীমাবন্ধ মেয়েমানুষ। নদীর মতো, সবাই স্নান করে যায়। গহীন চুলের মস্ত খোঁপা, রোগা চেহারা, সর্বশরীরে চামড়ার ওপর খসখসে ভাব। গলার চামড়ার ভাঁজে ময়লা বা পাউডার জমে আছে।

নেপালীতে বললেন—ও লোকটা তোর কে হয়?

মেয়েটা লাজুক হেসে বলল—সঙ্গে থাকে।

—স্বামী?

ছিপ্‌কি মুখ ভ্যাঙাল।

—দেখি তোর হাত। বলে দিগিন ওর হাত টেনে নিবিষ্টমনে ওর হস্তরেখা দেখলেন। ভ্রূ কুঁচকে, কপালে ভাঁজ ফেলে অনেকক্ষণ ধরে দেখে-টেখে বললেন—দূর! তুই এখানে পড়ে আছিস কেন? তোর ভাগ্য তো খুব ভাল। এখন বয়স কত?

মেয়েটা হিসেব জানে না। অবাক হয়ে বলল—কত জানি না।

দিগিন বললেন—বাইশ তেইশ হবে। আর এক বছরের মধ্যে তোর ভাগ্য ফিরে যাবে।

সকলেরই এই দুর্বলতা থাকে, ভাগ্য বিষয়ক। মেয়েটা মাতাল দিগিনকে সঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না, মাতালরা কত কাণ্ড করে। তবু হাতটা চেপে ধরে বলল—কী হবে?

—তোর বাড়ি হবে, গাড়ি হবে, হাতে সব লেখা আছে। এ লোকটার সঙ্গে পড়ে আছিস কেন? পালা।

এই বলে দিগিন উঠে পড়লেন। দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—তোর সঙ্গে সময় কাটাতে এসেছিলাম, কিন্তু ভয় পেয়ে গেলাম রে। তুই একদিন খুব বড় হবি তো, তাই ভয় লাগল।

দিগিন বিদায় নেওয়ার আগে আরো পঞ্চাশটা টাকা ছিপ্‌কির হাতে গোপনে দিয়ে বললেন—তোর স্বামী তোর কষ্টের টাকা সব মেরে দেয় জানি। এটা রাখ। জানি তুই যখন বড় হবি তখন এসব দশবিশ পঞ্চাশ টাকা ভিখিরিকে দিয়ে দিবি। ভাল চাস তো কালই পালিয়ে যা।

boiRboi.net

—কোথায় যাবো ?

—কোথায় যাবি !

দিগিন একটু ভাববার ভান করেন। শেষে আবার দশটা টাকা বের করে ওর হাতে দিয়ে বলেন—শালবাড়িতে চ্যাটার্জির কাঠগোলায় চলে যাস। শনিবার মঙ্গলবার থাকি। কলকাতায় পাঠিয়ে দেবো। ফিলমে নামবি ? আমার দোস্ত আছে।

ছিপ্‌কির চোখমুখ কী রকম যে উজ্জ্বল হয়েছিল ফিল্মের নামে ! অনেকখানি ঘাড় হেলাল, আর ছুটে এসে বুকে পড়ে একটু আদর করেছিল দিগিনকে।

মেয়েটা বোধহয় পালিয়ে যাওয়ারই চেষ্টা করেছিল। কয়েকদিন পর তার শরীরটা এক সকালে পাওয়া গেল মহানন্দার বিশুষ্ক নদীর খাতে। একটু একটু জল চুঁইয়ে বয়ে যাচ্ছে নালার মতো শীতের পাহাড়ে নদী। তারই জল ছুঁয়ে একবুক রক্ত ঢেলেছে ছিপ্‌কি। কুক্‌রিতে পেটটা হাঁ হয়ে আছে।

লোকটা একমাস পরে ধরা পড়ল মাদারিহাটে। দোকানটা তার আগেই উঠে গেছে।

তখন এরকম মহানন্দার পাড়ে হামেশা লাশ পাওয়া যেত। চাটাইয়ে বেঁধে ধাঙড়রা নিয়ে আসত হাসপাতালের মর্গে। দুচার ঘা ছুরি চালিয়ে ডাক্তাররা রিপোর্ট দিত। ধাঙড়রা ফের চাটাইবাঁধা মড়া নিয়ে হয় পোড়াত, নয়তো পুঁততো। ছিপ্‌কির জন্য এখনো একটা কষ্ট হয় দিগিনের। পালাতে গেলেই যে খুন হবে, সেটা ভেবে দেখেন নি দিগিন। চালের ভুল। তা হোক, তবু দোকানটা ওঠানো গেছে। কপিল কিছুদিন খুব মনমরা হয়ে ছিল।

এখন কপিলকে দেখে একটু ভ্রূ কোঁচকালেন দিগিন ! রূঢ় মুখভাব করে একটু চেয়ে রইলেন। কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার একটু কর্কশ। মুখভাবে তিনি কাউকেই প্রশ্রয় দেন না।

কপিল কখনো দিগিনের চোখে তাকায় না। নানা পাপ জমে আছে ভিতরে। তাকাতে পারে না। একবার মুখের দিকে চেয়েই চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল—আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম। কাল রাতে শাটারিংয়ের কাঠ কারা খুলে নিয়ে গেছে। আজ ঢালাই হওয়ার কথা।

দিগিন অবাক হন। বলেন—জেলখানার ঢালাইয়ের ?

কপিল মাথা নাড়ল—কয়েকটা শালখুঁটিও উপড়ে নিয়েছে। লোহার রডও।

দিগিন একটা বিরক্তির শব্দ করে বললেন—চৌকিদার কে ছিল ?

—কেউ ছিল না। শানুবাবু তিন দিন আগে আমাকে জেলখানার ক্যাম্প থেকে সরিয়ে চালসার রোড কনস্ট্রাকশনের কাজে পাঠিয়ে দেন। বলছিলেন, জেলখানার কাজ, মালপত্র পুলিশেরাই দেখতে পারবে। তবে দাজুকে শানুবাবু দেখতে বলেছিল, সে কাল থেকে মাল খেয়ে কোথায় পড়ে আছে।

দিগিন শানুর বুদ্ধি দেখে অবাক হন। চৌকিদার হিসেবে কপিল ভাল নয় ঠিকই, মাল কিছু সরাবেই। কিন্তু কপিল কখনো কাজ নষ্ট করবে না। তাকে সরিয়ে দাজুর ভরসায় এত মালপত্র ফেলে রাখতে কে ওকে বলেছিল ? দাজু কোনো-

boiboi.net

কালে সন্ধ্যার পর স্বাভাবিক থাকে না।

দিগিন বললেন—চালসায় তোর কী কাজ ছিল ?

—কিছু না। একটা কালভার্ট হয়েছিল, সেটা ভেঙে পড়েছে প্রথম লরীটা পাস করতেই। ইঞ্জিনীয়ার সাহেব ডেকে শানুবাবুকে খুব গরম খেয়েছেন। সেইটে ফের করে দিতে হচ্ছে, নইলে কেস করবে গভর্নমেন্ট। সেই কাজ সত্যেনবাবু দেখছেন, আমি গিয়ে ভেরেন্ডা ভেজে এলাম।

ভিতরে ভিতরে আগুন হয়ে যান দিগিন। সোপস্টোন মায়ামৃগের মতো মিলিয়ে গেছে, ঠিকাদারীও যাবে। চ্যাটার্জি কনস্ট্রাকশনের যে সুনাম আছে তা উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে যাবে শানু। একটা কালভার্ট করতে গিয়েও বেশী লাভ খাবে, প্রথম লরীটাও নিরাপদে পেরোতে পারবে না! আবার তৈরী করতে ডবল গচ্চা যাচ্ছে। শানু আজকাল কিছু খুলে বলে না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ব্যবসাটার মধ্যে উইয়ের মতো গর্ত খুঁড়ে ঝুরঝুর করে দিচ্ছে।

দিগিন মিস্তিরিকে ডেকে বললেন—কতক্ষণ লাগাবি ?

—আপনি কাজ থাকলে চলে যান না। পিন আনতে লোক পাঠিয়েছি, ঠিকঠাক করে পাঠিয়ে দেবোখ'ন।

দিগিন চিন্তিতভাবে জীপে উঠলেন, রমণীমোহন গাড়ি ছাড়ল, মুখটা ঘুরিয়ে নিল জেলখানার দিকে। পিছনের সীটে বসা কপিল একটু কেশে বলল—ঢালাইয়ের দিন মিস্তিরিদের ভরপেট মিষ্টি খাওয়ানোর নিয়ম, তা সেটা শানুবাবু তুলে দিয়েছেন। বললে বলেন—রোজ ঢালাইয়ের কাজ হবে আর রোজ মিষ্টি খাওয়াতে হবে এ নিয়ম চলবে না।

দিগিন গম্ভীর গলায় বললেন—হুঁ।

চুপ করে রইলেন। শানুর ওপর কেউ খুশী নয়। সবাই যেন পাকেপ্রকারে, নানা আকারে ইঙ্গিতে বলতে চাইছে, শানুকে সরিয়ে দিয়ে এবার দিগিন হাল ধরুন। দিগিনের আজকাল আর ইচ্ছে করে না।

নতুন জেলখানা পুরোনো বাজার ছাড়িয়ে, জলপাইগুড়ির বাস যেখানে দাঁড়ায় তারও খানিকটা পশ্চিমে! গাড়িটা জেলখানায় ঢুকতেই দূর থেকে দেখেন, শানু কালো চশমা চোখে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে নেপাল থেকে চোরাপথে আনানো বিদেশী স্ট্রেচ প্যান্ট, গায়ে একটা মার্কিন ব্যানলনের গেঞ্জী। নীল প্যান্ট, আর হাল্কা হলুদ গেঞ্জীতে খুবই ভাল দেখাচ্ছে। বেশ লম্বাটে, সাহেবী ধরনের চেহারা। কলকাতায় লেখাপড়া শিখতে গিয়েছিল, তখন একবার সিনেমাতেও নেমেছিল। সেই থেকে শিলিগুড়িতে ওকে সবাই গুরু বলে ডাকে।

জীপ থামাতেই শানু দৌড়ে এল।

—কাকা, জলঢাকা যাওয়া হয় নি। ঝামেলা পাকিয়ে গেল।

দিগিন তাকালেন। বললেন—কত টাকার মাল গেছে ?

—তিন চার হাজার টাকার তো বটেই। ছোটো কাজ ছিল, বেশী মার্জিন থাকত না।

দিগিন মাথা নেড়ে বললেন—শাটারিংয়ের কাঠ আনতে লোক পাঠিয়েছো ?

boiRboi.net

শান্ একটু যেন অবাক হয়ে বলে—না, এখনি আবার শাটারিংয়ের কাঠ কিনব কেন? যতদূর মনে হচ্ছে পুলিশের লোকই সরিয়েছে। কিছু সি-আর-পি আছে, বড্ড পাজি। দেখি যদি বের করতে পারি।

দিগিন বিরক্ত হয়ে বলেন—সে তুমি দেখগে। তা বলে ঢালাইয়ের কাজ তো বন্ধ রাখা যাবে না। কাঠ কিনতে লোক পাঠাও, আর গোডাউনে কিছু রড আছে, আনিয়ে নাও।

শানু তেমনি বিস্ময়ের সঙ্গে বলল—সময় তো আছে, এত তাড়ার কিছু নেই। আর সাতদিন দেরি করলেও কিছু হবে না। তাছাড়া মিস্তিরিরা আজই শাটারিং করে ঢালাই করতে কি পারবে?

দিগিন গম্ভীর হয়ে বললেন—পারতেই হবে। মিস্তিরীদের ডাকো। আমি কথা বলে যাবো, তুমি একটা জীপ ভাড়া করে জলঢাকা চলে যাও আজই।

হেডমিস্ত্রি দিগিনের হাতের লোক। সে এসে দিগিন কিছু বলার আগেই বলল—আজই ঢালাই করে দেবো। আপনি যান।

জীপ থেকে দিগিন আর নামলেন না, জীপ ছাড়তে ইঙ্গিত করলেন রমণীমোহনকে। একবার চেয়ে দেখলেন, শানুর মুখ খুব গম্ভীর, প্রেস্টিজে লেগেছে বোধহয়। কর্মচারীদের সামনে দিগিন ওকে পাত্তা দিলেন না তেমন। তার ওপর জলঢাকা যেতে হচ্ছে।

রমণীমোহন জীপ ছাড়ল। কপিল দৌড়ে এল জীপের সঙ্গে, কী যেন বলবার জন্য মুখটা উন্মুখ, দিগিন চোখের ইশারা করলেন, কপিল জীপের পিছনে উঠে পড়ল।

বাসার দিকেই মুখ ঘোরাল জীপ। দিগিন চুপ করে বসেছিলেন। হঠাৎ বললেন—কপিল।

—আজ্ঞে।

—শালখুঁটিগুলো কাকে বেচেছিস?

একটু চুপ করে থেকে কপিল বলল—অনাদিবাবুর গোলায়।

—কখন?

—ভোর রাতে। একটা সাপ্লাইয়েরের লরী এসেছিল, তাদের ভজিয়ে মাল তুলে দিয়েছি।

—কততে বেচলি?

বিনা দ্বিধায় এবং সম্পূর্ণ অকপটে কপিল বলল—শানুবাবুর কথা ধরবেন না। তিনচার হাজার টাকার মাল ছিল না। মেরে কেটে হাজার খানেকের মতো হবে। আমি তিন শো পেয়েছি।

দিগিন একটু হাসলেন। কপিলকে তিনি চেনেন, এমন প্রতিশোধস্পৃহা খুব কম লোকেরই থাকে, প্রতিশোধ নেয়ও খুব কূটকৌশলে।

পিছন থেকে কপিলের হাতটা এগিয়ে এল। তাতে একশ টাকার তিনটে নোট, ভাঁজকরা, দিগিন নিয়ে বুক পকেটে রাখলেন। রমণীমোহনকে বললেন—সেবক রোড ধরে চল।

বিনা উত্তরে নিউমার্কেটের রাস্তা ধরে সেবক রোডে গাড়ি উঠিয়ে আনল রমণী—

boiRboi.net

মোহন, পিছনে কপিল চুপ করে বসে আছে। সে লজ্জিতও নয়, দুঃখিতও নয়, নির্বিকার। মল্লিকা মরে যাওয়ার পর থেকেই ওরকম। ওর ভালবাসার, স্নেহের কোনো কেন্দ্রবিন্দু নেই। এখনো অবসর সময়ে কীর্তন করে। কীর্তন করতে করতে যদি কৃষ্ণভক্তি আসে কখনো, তো ভাল, না এলে একদিন বুড়ো হয়ে এমনিই মরে যাবে। কেউ কাঁদার নেই।

টাকা—এই কথাটা আবার মনে পড়ল। টাকা।

টাউন স্টেশনের স্টেশনমাস্টার ছিলেন মদন চৌধুরী। তেল চুকচুকে শরীরখানি। মুখভাবে আহ্লাদে ভরা, পান খেতেন, বিলোতেন। স্টেশনমাস্টার হিসেবে খারাপ ছিলেন না, মানুষটাও ভাল। তার দুই মেয়ে ছিল, নমিতা আর প্রণতি। প্রণতি ছোটো, দীঘল কালো চেহারা। কিন্তু কালো রঙে অমন রূপবতী সে আমলে দেখেন নি দিগিন। ভারী লোভ হত। দিগিনের বয়স তখন কিছু না। ওদের বাড়িতে যেতেন টেতেন। প্রণতি অবশ্য খুব একটা সামনে আসত না। তবু পাশের ঘরে তার পায়ের শব্দ, গলার আওয়াজ শুনতেন। পর্দার ফাঁক ফোকর দিয়ে দেখা যেত। মদন চৌধুরীরা বারেন্দ্রশ্রেণী, আর সে সম্পর্কে খুব সচেতন ছিলেন। প্রায়ই বলতেন—ভাল দুটো বারেন্দ্রশ্রেণীর পাত্র খুঁজবেন তো চাটুজ্জে। এসব পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ স্যালের কথা। তখনো ময়নাকে আনেন নি দিগিন।

একবার কলকাতা যাবেন। চৌধুরী এসে বললেন—আমার বাড়ির ওরাও যাবে। আমি বলি কি আপনার সঙ্গে চলে যাক।

কে কে যাবে তা জিজ্ঞেস করলেন না দিগিন। কিন্তু উচাটন হয়ে রইলেন। প্রণতি যাবে!

যাওয়ার দিন স্টেশনে গিয়ে দেখেন প্লেস করা গাড়ির একটা ইণ্টার ক্লাস কামরায় চৌধুরীর দুই মেয়ে, বৌ, আর ছেলে বসে আছে। বুকখানা নড়ে উঠল দিগিনের। ভিড়ের গাড়ি নয়, তখন অফ সিজিন চলছে। ফাঁকা কামরাটায় তারা মাত্র কজন। সে যে বয়ঃসন্ধির আশা-নিরাশার কী গভীর উদ্বেগের দিন গেছে সব! নিজেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে মনে হয়, কখনো মনে হয় সবচেয়ে আহাম্মক বোকা। তখন গেরস্ত ঘরের মেয়েরা সহজলভ্যা ছিল না। তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে বুকের পাটা লাগত।

প্রণতি গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বসে রইল তো রইলই। চৌধুরীর বৌ আর ছেলে দিগিনকে খুব খাতির করতে থাকে। চৌধুরী গিন্নি টিফিন ক্যারিয়ার খুলে অনেক খাবার খাওয়াল, পান খাওয়াল। বাড়ি ঘরের খোঁজখবর নিল। দিগিন আড়চোখে প্রণতিকে দেখে নিয়ে কিছু বাড়িয়েই বললেন। বয়সের মেয়ের সামনে দুচারটে গুলচাল না ঝাড়ে কে!

রাতের গাড়ি। ছাড়তে না ছাড়তেই ঢুলুনী পেয়ে গেল সবার। খাওয়ার পর একে একে সবাই শুয়ে পড়ছে। দিগিন বাঙ্কে শুয়ে একটা বাসী প্রবাসী খুলে পড়বার চেষ্টা করছেন। আসলে সেটা ভান। প্রথমত দিগিন বই-টই পড়তে ভালবাসেন না। দ্বিতীয়ত গাড়ির ঝাঁকুনিতে পড়া যাচ্ছিলও না।

চৌধুরীগিন্নী আর ছেলে একটা সীটে দুধারে মাথা রেখে শুলেন। অন্যটায় নমিতা আর প্রণতি। নমিতা শুল, কিন্তু প্রণতি ঠায় বসে রইল।

তার মা ডাকে—ও প্রণতি শুবি না!

সে মাথা নাড়ে। শোবে না।

—কেন?

—ঘুম আসছে না। বিরক্ত হয়ে প্রণতি বলে।

জামদানী শাড়িপরা নিশ্চল মূর্তি বসেই রইল। একবারও মুখ ফেরাল না ভিতরবাগে। সবাই যখন খাচ্ছিল তখনো ঐ ভাবে ছিল। খায় নি! তার নাকি খিদে নেই। মেয়েটা অদ্ভুত। দিগিন বুঝতে পারছিলেন, তিনি কামরায় আছেন বলেই মেয়েটার ঐ কাঠ-কাঠ ভাব। তবে কি মেয়েটা তাকে অপছন্দ করছে? দিগিন কি বিশ্রী দেখতে? মেয়েটা কি রোগা মানুষ পছন্দ করে? নাকি, দিগিনের গুল-চালগুলো সব ধরে ফেলেছে মেয়েটা। বরাবরই কি দিগিনের প্রতি ঘৃণা পুষে এসেছে মনে মনে?

খুবই তুচ্ছ কিন্তু জরুরী প্রশ্ন সব।

অন্য বাঙ্কে শেষ সময়ে এক বুড়ো পশ্চিমা উঠে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। তার নাকের ডাক শোনা যাচ্ছিল। ক্রমে সকলেই গভীর বা হাল্কা ঘুমে ঢলে পড়ছিল, চৌধুরী গিন্নী ঘুমগলায় একবার বললেন—জানালাটা বন্ধ করে বোস, ঠাণ্ডা লাগবে।

—না। আমার মাথা ধরেছে।

—গলার হার-টার যদি কেউ টেনে নেয়! দেখিস।

—উঃ, তুমি ঘুমোও না!

—কিছু তো খেলি না। বলে চৌধুরীগিন্নী পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

দিগিনের মাথা তখন আগুন। ঐ রোগা একরত্তি মেয়েটার অত দেমাক কিসের? না হয় দিগিন তেমন লেখাপড়া জানেন না, না হয় একটু জংলা চেহারা, তাই কি? পুরুষ, আস্ত একটা জলজ্যান্ত পুরুষ কাছে থাকলে একবার ফিরে তাকাতে নেই?

ধৈর্য ধরে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন দিগিন। না। অবস্থার কোনো পরিবর্তন নাই। শুধুমাত্র শরতের ঠাণ্ডা থেকে গলা বাঁচানোর জন্য আঁচলটা জড়িয়ে নিয়েছে গলায়। আর, বোধহয় একটু হেলে বসেছে জানালার কাঠে ভর দিয়ে।

উপেক্ষা কোনদিনই সহ্য করতে পারেন না দিগিন। অনেক ভেবেচিন্তে একটা উপায় বের করলেন। কামরার আলোগুলি ধু-ধু করে জ্বলছিল। দিগিন হঠাৎ ঝুঁকে বললেন—আলোগুলো কি নিভিয়ে দেবো? সবাই ঘুমোচ্ছে তো, আলো থাকলে অসুবিধে।

মেয়েটা শুনল কি না বোঝা গেল না। বসেই রইল।

—শুনছেন! দিগিন ডাকেন।

মেয়েটা একটু নড়ল, বা কাঁপল।

ক্ষীণ গলায় উত্তর এল—দিন।

—আপনার অসুবিধে হবে না তো?

boiRboi.net

মেয়েটা ফেরানো মাথাটাই নাড়ল একটু। ঘাড় ফেরাল না।

দিগিন শব্দসাড়া করে বাথরুম সেরে এসে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন।

কী অদ্ভুত দৃশ্য তখন! সেদিন পূর্ণিমা ছিল বোধহয়। কী জ্যোৎস্নার আলো এসে ভরে দিল কামরা। আর সেই জ্যোৎস্নায় মাখা কালো পরীর মতো, রূপসী জীনের মতো জানালায় বসে আছে প্রণতি।

ঘুম কি হয় দিগিনের। কামস্পৃহা নয়। নারীপ্রেমও নয়, সে এক অলৌকিকের অনুভূতি। জীবনের সব চাওয়া যেন ঐ মূর্তিটায় গিয়ে জমাট বেঁধেছে। কী জ্যোৎস্না! আর কী প্রস্তরীভূত সেই দেহখানি।

সজাগ দিগিন আর চোখ ফেরাতে পারেন না। পাশ ফিরে চেয়ে রইলেন।

অনেক অনেকক্ষণ বাদে মেয়েটার বুঝি মনে হল যে এবার সবাই ঘুমিয়েছে! চকিতে একবার চাইল ভিতরের দিকে। সবার আগে তাকাল দিগিনের দিকে। সে দিগিনের মুখ দেখতে পাবে না জেনেও দিগিন চোখ বুজে নিথর হয়ে ঘুমের ভান করলেন।

মেয়েটা উঠল। বাথরুমের দিকে গেল পথ হাতড়ে।

খুটখাট একটু শব্দ হল বুঝি। বাথরুমের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

কী সতর্ক মায়েদের মন। ঐ যে একটু খুটখাট শব্দ হল তাইতেই চৌধরীগিন্নী উঠে বসলেন। প্রণতির শূন্য আসন দেখলেন। বাথরুমের দরজার ঘষা কাচে আলো দেখলেন। সন্দেহ হল। চকিতে একবার মুখ উঁচু করে দেখে নিলেন, দিগিন তার জায়গায় আছেন কিনা।

দিগিন মনে মনে হাসেন আজও। কত কূট হয় মানুষের মন! কত সন্দেহ আসে!

বাথরুম থেকে এসে আর কাঠ হয়ে থাকল না প্রণতি। সহজ হয়ে বসল। চুলটা ঠিক করল খানিক, বেণীর শেষমাথায় রিবনের ফাঁস খুলে গিয়েছিল, সেটা বাঁধল। জলের বোতল থেকে জল খেল। এবং বারংবার তাকাল দিগিনের অন্ধকার বাঙ্কের দিকে। দিগিন মনে মনে হাসলেন।

খুব মাঝরাত তখন। প্রণতি অবশেষে শুয়েছে। দিগিনের ঘুম এল না। একবারে প্রথম রাতে না ঘুমোলে তাঁর ঘুম কেটে যায়। শুয়ে থেকে কাঁহাতক আর সময় কাটাবেন। সে আমলের ক্যাভেন্ডার সিগারেট একটা বের করে ধরিয়ে শুয়ে শুয়ে টানছেন। সব জানালা বন্ধ। ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। কেবল দরজায় কাচ ফেলা বলে একটু ঘষা আলো দেখা যাচ্ছে। চাঁদের মুখে মেঘ জমেছে নিশ্চয়। ট্রেনটা থেমে আছে কোথাও সিগন্যাল না পেয়ে। বাইরে জলা-জমি থেকে ব্যাঙের ডাক আসছে। তখন পৃথিবীতে মানুষ কম ছিল, নির্জনতা ছিল। ট্রেন যেত বিজনের ভিতর দিয়ে। অনেকদূর পর্যন্ত লোকবসতি ছিল না উত্তরবাংলায়। ভুতুড়ে মাঠেঘাটে অলৌকিক জ্যোৎস্না খেলা করত। জীন ছিল, পরী ছিল।

সেই খুব আবছা অন্ধকার থেকে একটা অশরীরী স্বর এল—ক'টা বাজে?

দিগিন প্রথমটায় চমকে উঠলেন। এত ক্ষীণ স্বর যে প্রথমটায় বুঝতে পারলেন না ভুল শুনেছেন কিনা। তারপর বুঝলেন প্রণতি।

খুব সন্তর্পণে সিগারেটের আলোয় ঘড়ি দেখে বললেন—একটা।

তারপর সব চুপ।

খুব সাহস করে দিগিন আস্তে বাতাসে কথা ক'টা ছাড়লেন—তুমি ঘুমোও নি।

—না। ঘুম আসছে না। যেন কথা নয়, বাতাসের শব্দ—এত ক্ষীণ আর নরম গলা।

—আমিও না। দিগিন ঝুঁকে বললেন। তারপর আবার একটু চুপ করে থেকে বুকের কাঁপুনীটা সামলালেন। বললেন—তুমি কিছু খেলে না।

—আমার খিদে পায় না।

—কেন?

—এমনিই।

এত আস্তে কথা হচ্ছিল যে পরস্পরও শোনবার কথা নয়। সে যেন দূর থেকে কানে-কোন বলা। তবু কি আশ্চর্য তাঁরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলেন। ভালবাসা বুঝি এমনিই। ইন্দ্রিয়ের শক্তি বাড়িয়ে দেয়!

—কলকাতায় ক'দিন থাকবে?

—বেশীদিন না।

—বেড়াতে যাচ্ছো?

—হুঁ। মামার বাড়ি।

—আমি সাতদিন পরে ফিরব। তোমরা?

—একমাস।

আর কি তেমন কোনো কথা হয়েছিল? ঠিকঠাক আজ আর মনে পড়ে না। তবে হলেও এর চেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ কিছু নয়।

সকালে দিগিন ঘুমহীন রাত শেষে উঠলেন। আবার জানালার দিকে মুখ করে বসে আছে প্রণতি। ফিরে তাকায় না।

বড্ড জ্বালিয়েছিল সেবার মেয়েটা। বুকে এমন একটা ঢেউ তুলে দিয়েছিল। দিগিনকে প্রায় গহীন সমুদ্রে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেই ঢেউ। তখনো প্রণতি কিশোরী মাত্র।

তখন প্রেম এটুকুই মাত্র ছিল। তবুও এটুকুও কম নয়।

কপাল। সেবার কলকাতা গিয়ে একমাসের নাম করে বহুকাল থেকে গেল প্রণতিরা। শিলিগুড়িতে ভাল ইস্কুল ছিল না, কলেজ তখনো হয় নি। মামারা বড় লোক। তারা ভাগ্নে-ভাগ্নীদের সেখানেই রেখে দিল। বহুকাল আর ওরা আসে নি। চৌধুরীগিন্নি অবশ্য এসে থাকতেন প্রায়ই।

প্রেমটা কেটে যাচ্ছিল কি! কে জানে। ঘটনাটা কেন আজও অত হুবহু মনে আছে?

কয়েক বছর বাদে ভারত সরকার আর পূর্বপাকিস্তান সরকারের মধ্যে একটা চুক্তি হয়। সেই তিপ্পান্ন চুয়ান্ন সালের কথা, চুক্তি হল ভারতের মালপত্র নিয়ে ব্রডগেজের গাড়ি পূর্বপাকিস্তানের ভিতর দিয়ে আসবে, তাতে দূরত্ব কমবে, সময়ও বাঁচবে। তখন এ অঞ্চলে ব্রডগেজ লাইন উঠে গিয়ে মিটার গেজ হয়ে গেছে। তাই ঠিক হল পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে ব্রডগেজের গাড়ি হলদিবাড়ি পর্যন্ত আসবে। সেখানে ট্র্যানশিপমেণ্ট হয়ে মিটারগেজে উঠে চালান হবে উত্তরবাংলায় আর আসামে। এই চুক্তি হওয়ার সঙ্গে

boiRboi.net

সঙ্গে হলদিবাড়ি স্টেশনের দাম বেড়ে গেল রাতারাতি, সবাই হলদিবাড়িতে পোস্টিং চায়। ট্র্যানশিপমেণ্ট মানেই টাকা, আর হলদিবাড়িতে যে বিপুল মাল এ গাড়ি থেকে ও গাড়িতে উঠবে তাতে বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা খেলা করবে। স্টেশন-মাস্টাররা ট্র্যানশিপমেণ্টের জন্য রেলওয়ের কাছে থেকে চুক্তিমতো টাকা পায়, আর কুলির সর্দারদের সঙ্গে তারা আর একরকম চুক্তি করে নেয়। এই দুই চুক্তির মধ্যে ফারাক থাকে অনেক। ফলে ভাল স্টেশনের মাস্টারদের ঘরে লক্ষ্মী ঝাঁপি উপুড় করে দেন।

হলদিবাড়ির খবর হতেই চারদিকে স্টেশনমাস্টাররা আনচান করে উঠলেন। দৌড়োদৌড়ি শুরু হল, অফিসারদের বাংলোয় ভেটের ছড়াছড়ি হতে লাগল। শিলিগুড়ির এ-টি-এস সাহেব তখন বাঙালি, সজ্জন লোক, ঘুষটুষ খেতেন না। মদন চৌধুরী তাঁর মাকে না ডেকে, সপরিবারে নেমন্তন্ন খাইয়ে এমন আত্মীয়তা গড়ে তোলেন যে সাহেব মদন চৌধুরীকে পোস্টিং দিয়ে দিলেন।

একমাসে মদন চৌধুরীর চেহারা এবং স্বভাব পাল্টে গেল, একটা ওপেন ডেলিভারী নিতে হলদিবাড়ি গিয়েছিলেন দিগিন। দেখেন চৌধুরীর মুখে চোখে একটা উদভ্রান্ত ভাব, চেহারার সেই স্নিগ্ধতা নেই, দিনরাত স্টেশনে পড়ে থাকেন। চোখদুটো চকচকে, সবসময়ে চতুর্দিকে ঘুরছে। দিগিনকে দেখে বললেন—চাটুজ্জে, আপনার তো অনেক জানা-শুনো, জলপাইগুড়ির কমিশনার সাহেবকে বলে আমাকে একটা রিভলভারের লাইসেন্স বের করে দিন।

দিগিন অবাক হয়ে বলেন—রিভলভার দিয়ে কী হবে ?

চৌধুরী তেমনি উদ্‌ভ্রান্তভাবে অসংলগ্ন কথা বলেন—এত টাকা ; কখন কি হয় !

চৌধুরীর বাড়ির চেহারাও, পাল্টেছে, বড় ছেলে বাদে আর ছেলেমেয়েরা স্থায়ীভাবে কলকাতায় থাকে। বেশীর ভাগ জিনিসপত্রও কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছেন চৌধুরী, স্ত্রীও গেছেন। সেখানে চৌধুরীর বাড়ি হচ্ছে, দুটো বাড়ি একটা বৌয়ের নামে, অন্যটা বিধবা বোনের নামে। রেলের কোয়ার্টারে দুটো ঘর। ভিতরের ঘরটায় সব সময়ে তালাবন্ধ, বাইরের ঘরটায় দুটো ক্যাম্প খাটে বাপ ব্যাটা শোয়। ঝি চাকর কাউকে রাখেন নি। ছেলেই রান্না করে।

দিগিন বুঝলেন কাঁচা টাকার স্রোতে চৌধুরী ডুবছেন।

দিগিন অবশ্য চৌধুরীকে রিভলভারের লাইসেন্স বের করে দিয়েছিলেন। সেই রিভলভার শিয়রে নিয়ে শুতেন আর দুঃস্বপ্ন দেখতেন চৌধুরী। মানুষটার জন্য তখন কষ্ট হত। হাভাতের হঠাৎ বিপুল টাকা হলে তার বড় একটা সুখ হয় না, অসুখ উপস্থিত হয়।

চৌধুরীরও হল, পোস্টিং পাওয়ার বছরখানেকের মধ্যে প্রথম স্ট্রোক। কিন্তু চৌধুরী সিক-লীভ নেবেন না, ঐ অবস্থাতেই কাজ করার জন্য ব্যস্ত। বহু বলে কয়ে তাকে হাসপাতালে দেওয়া হল। কলকাতা থেকে কেউ এল না, এলে নাকি বাড়ির কাজে ব্যাঘাত হবে।

সে যাত্রা বেঁচে গেলেন চৌধুরী। রাশি রাশি টাকা কলকাতায় পাঠান, বড় ছেলে আনাগোনা করে, স্টেশনের অন্যান্য স্টাফ খুব অসন্তুষ্ট, তারা নাকি ভাগ পায় না। চৌধুরী এখন টাকা চিনেছেন, টাকা ছাড়া মুখে কথা নেই, কিন্তু চেহারাটায় একটা

boiRboi.net

রুগ্ন খাড়ি ওঠা ভাব, চোখে ক্ষয়রোগীর চোখের মতো অসুস্থ উজ্জ্বলতা।

এ সময়ে খবর এল, বোনের ছেলেরা বাড়ি দখল করেছে, তারা ভাড়াটে বসাতে দেবে না। বলছে—আমাদের মায়ের নামে বাড়ি, আমাদের ইচ্ছেমতো হবে।

চৌধুরী ছুটে গেলেন কলকাতায়, ভাগ্নেদের হাতে পায়ে ধরলেন। বোন বললেন—দাদা, আমি কী করব! ছেলেরা আমার কথা শোনে না।

ভগ্নমনোরথ চৌধুরী ফিরে এলেন একা। মাথায় টাক পড়ে গেছে, কদিনে চোখের কোলে কালি, অসুস্থ-অস্বাভাবিক চেহারা।

রিভলভারটা সেইসময়েই প্রথম কাজে লাগল। রিটায়ারমেন্টের সময় হয়ে এসেছিল, মোটে আর মাসখানেক আছে। তারপরই পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে গিয়ে কলকাতায় হাজির হবেন, সেখানে বাড়িঘর, ছেলে মেয়ে বৌ, সংসার। একটা মাস কাটিয়ে যেতে পারলেই হত। কিন্তু ঐ বাড়ির শোকটাই সামালাতে পারলেন না। রিভলভারটা কপালে ঠেকিয়ে ঘোড়া টেনে দিলেন এক নিশুতরাতে।

দিগিন হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠলেন আপনমনে। ঘটনাটা মনে পড়লেই দুঃখের বদলে তার প্রবল হাসি পায়। চৌধুরী বেশ ছিল শিলিগুড়ির মাস্টার হয়ে। কিছু অভাব ছিল না, তারপর হলদিবাড়ি গিয়ে খুব বড়লোক হল, সেও ভালই, কিন্তু সেই বড়লোকীর একটু লোকসান, বিধবা বোনের নামের একটা বাড়ি হাতছাড়া হয়ে গেল, সেটুকু সহ্য করতে পারল না। বাড়িটা গেছে তো যাক না, তবু তো তোমার অনেক থাকছে। তুমি তো শিলিগুড়ির মাস্টার থাকা অবস্থায় ফিরে যাচ্ছ না। তবু মানুষের ওইরকম হয়। গরীব থেকে বড়লোক হলে ফের একটু গরীব হওয়া তার সহ্য হয় না।

জুয়াড়ি নির্মল গাঙ্গুলি তিনতাস খেলেই বড়লোক হয়েছিল। তার একটা পেটেন্ট কথা ছিল—এমনি লস্ সহ্য হয় ভাই। কিন্তু লভ্যাংশের লস্ সহ্য হয় না। গাঙ্গুলি যেদিন হারত সেদিন স্পোর্টসম্যানের মতো হারত। কিন্তু যেদিন প্রথমে জিতে পরে হারত সেদিন বড় মনমরা থাকত। বলত—ঈশ্বর আমাদের সহ্যশক্তি বড় কম দিয়েছেন। ক্ষতি সহ্য হয়, কিন্তু লাভের ক্ষতি সহ্য হয় না। ছেলেবেলায় একটা হাবা ছেলেকে সবাই ক্ষেপাতাম। সে বড় পয়সা ভালবাসত। সবাই তাকে বলত পয়সা নিবি? অমনি সে হাত পাতে। আমিও বলতাম। সে হাত পাতত। পয়সা দিয়ে ফের নিয়ে নিতাম, আবার দিতাম, ফের নিয়ে নিতাম। শেষবারটা মজা করার জন্য পয়সাটা নিয়ে নিতাম, দিতাম না। সে ক্ষেপে গিয়ে বলে বেড়াত—নেম্মলটা খচ্চড়। দে'লে নে'লে, দে'লে, নে'লে, ফের দে'লে, ফের নে'লে। নেলে তো নে'লে, আর দে'লে না।

জীবনটা ঐরকম। মাঝে মাঝে সব নিয়ে নেয়। আর কিছু দেয় না।

সেবক স্টেশনের কাছে লেভেল ক্রসিং পার হয়ে জীপ উঠে এল কালিম্পঙের পাহাড়ী রাস্তায়। দূরে দুই পাহাড়ের কোলে করোনেশন ব্রীজের আর্চ দেখা যাচ্ছে। নিচে তিস্তা। শরতের নদীটা এখনো বর্ষার ঢল নিয়ে নেমে যাচ্ছে। সাদা, সফেন জল, সেই জলের প্রবল শব্দ। তিস্তার দুধারে বালির বিছানা। বাঁ পাশের তীর ধরে ছিল রেললাইন। ছোট্ট ছোট্ট সব স্টেশন। নিরিবিলি, নিঃঝুম। এখন আর কিছু নেই। স্টেশনের ঘরগুলো পর্যন্ত না। দিগিন ঝুঁকে দেখতে লাগলেন।

যে-খেয়ালে গরমজামা আনেন নি। হঠাৎ চলে এসেছেন খেয়াল খুশীমতো।

রমণীমোহন আর কপিলেরও গরমজামা নেই। শরৎকাল। পাহাড়ে এ সময়ে শীত পড়ে যায়। কিন্তু রমণীমোহন বা কপিল তার জন্য দিগিনকে কিছু বলবে না। দিগিনকে তারা জানে। কখনো তাঁর কোনো কাজে তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত ঢোকায় নি।

এখন আর কিছু করার নেই। দিগিন তবু বললেন—কপিল, গরমজামা আনার কথা খেয়াল হয় নি রে। তোদের কষ্ট হবে।

রমণীমোহন স্থির চোখে চেয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে বলল—কালিম্পঙ যাবেন তো ?

—তাই তো যাচ্ছি।

—দুপুর দুপুর কাজ সারতে পারলে ফিরে আসতে কষ্ট হবে না। রোদ থাকবে ততক্ষণ। বেলা পড়ে গেলে ঠাণ্ডা লাগবে।

কাজ! কাজের কথা খেয়াল ছিল না। মনেও পড়ল না। চারধারে চেনা পাহাড়, বনস্থলী, নদী, কত পুরোনো স্মৃতির ভূত ঘুরে বেড়াচ্ছে চারধারে। সম্মোহিত দিগিন জানেন, এই হল কাজ। সেই পুরোনো রেললাইন খুঁজতে খুঁজতে, সেই পুরোনো স্টেশনের চিহ্ন ধরে ধরে আবার অতীতে ফিরে যাওয়া, যেখানে আজও এক অলীক স্টেশনে দুমুঠো ধুলো হাতে করে মুগ্ধ এক শিশু দাঁড়িয়ে আছে। আর কিছু কাজ নেই।

ডাকলেন—কপিল।

—আজ্ঞে।

—ঠিকাদারের চৌকিদারী তোর কাজ নয়। তোর আসল কাজ কি কপিল ?

কপিল চুপ করে থাকে।

দিগিন বললেন—তোকে একটা বাগান বানাতে দেবো। শালবাড়িতে জমিটা পড়ে আছে, গেছিস তো !

কপিল হুঁ দিল।

—ওখানে একটা বাগান বানাবি, পলাশ লাগাবি, শিউলি, বেলফুল…

—মল্লিকা। কপিল বাধা দিয়ে বলল। দিগিন ভুলে গিয়েছিলেন, বেলফুলই মল্লিকাফুল।

দিগিন একবার ফিরে দেখলেন, কপিলের চোখদুটো ভীষণ চকচক করছে। মুখখানা লোভাতুর। বাগান! বাগান! এ পৃথিবীতে একমনে একখানা বাগান বানানোর মতো গভীর কাজ আর কি আছে ? সে আর কিছু চায় না। একখানা বাগানমাত্র।

দিগিন অনেকক্ষণ কপিলের মুখের দিকে পিছু ফিরে চেয়ে দেখেন। কপিলের মুখটা পাল্টে যাচ্ছে। চতুর, ধূর্ত মুখখানা কতগুলো লাবণ্যের রেখায় ডুবে গেল। খুব তৃপ্তি পেলেন দিগিন। গাঢ়স্বরে বললেন—পারবি না ?

—খুব।

—কাল চলে যাস শালবাড়িতে। কাল থেকেই লেগে যা।

আবেগে কপিল বুঝি কথা বলতে পারল না। চোখটা মুছল। মল্লিকা! মেয়েটা! জীপগাড়ি না হলে এখন সে দিগিনের পায়ে মুখ ঘষত। পলাশ লাগাবে, শিউলি

লাগাবে, আর সেই সঙ্গে গ্রীষ্মের মল্লিকাফুল, সাদা, ঘ্রাণে ভরা। মেয়েটার কথা মনে পড়বে। এই মাটিতেই তো মিশে আছে মেয়েটা।

গাড়ি চড়াই ভাঙছে। পাহাড়ী গরুর একটা পাল রাস্তা পার হয়ে নেমে যাচ্ছে বনভূমিতে। তাদের গলার ঘণ্টার শব্দ। রোদ লেগে বনভূমি মথিত হয়, গভীর উদ্ভিদজগতের নেশারু গন্ধ আসে। এক পাহাড়ের ঢালের ছায়ায় গভীর শীতল রাস্তা। ওপরে আকাশে আর তিস্তার ওপারে রোদ ঝলসাচ্ছে। টিপ টিপ করে চুঁইয়ে নামছে একটা জলধারা, পাহাড়ের গা বেয়ে, তার ওপর একটুখানি কালভার্ট। জীপটা গুমগুম শব্দ করে কালভার্ট পার হয়ে গেল। শীত বাড়ছে, শার্টের বোতামটা এঁটে নিলেন, বুকে হাত জড়ো করে বসলেন দিগিন।

কালিম্পঙের দিকে বাঁক নিচ্ছে গাড়ি। বেশী দেরি নেই, জাগ্রত চোখে চেয়ে আছেন দিগিন। বহুকাল আসেন না। যা দেখছেন তাই যেন ভিতরটাকে নেড়ে দিচ্ছে। ঘুলিয়ে উঠছে সব। স্মৃতি আর বর্তমান হয়ে যাচ্ছে একাকার।

নড়ে বসলেন দিগিন। হাই উঠছে। ঐ দেখা যাচ্ছে কালিম্পঙের ঢাল। ধানক্ষেত। ধান চাষ বা আবাদ পাহাড়ী জায়গায় বড় একটা দেখা যায় না। কালিম্পঙ ব্যতিক্রম। এইজন্যই দিগিনের কালিম্পঙের প্রতি কিছু পক্ষপাত আছে।

রবীন্দ্রনাথের বাড়ি চিত্রভানুর সামনে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে নামলেন। বাগানে সেই শ্বেতপাথরের কেদারা। আর একটা শ্বেতপাথরের ট্যাবলেটে কালিম্পঙ নিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের কবিতাটার ওপর দুপুরের রোদ পড়েছে। সেই যখন রবিবাবু আসতেন তখন এসে তাঁকে এইখানে দেখে গেছেন দিগিন। ঐ শ্বেতপাথরের কেদারায় গদী পেতে বসতেন। আদিগন্ত প্রকৃতির বিস্তার থাকত সামনে। প্রতিমা দেবীকে দেখেছেন। ঐ কেদারার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন কখনো। কী সুন্দর, আর করুণ মুখশ্রী?

সেই রবীন্দ্রনাথের সেণ্টেনারী হয়ে গেল। সময় কত তাড়াতাড়ি যায়! বাগানে কেউ নেই। চমৎকার বাড়িটায় একটু বয়সের দাগ পড়েছে। মনে হচ্ছে, এক্ষুনি লম্বা দাড়িওলা জোব্বা পরা মূর্তি ধীর গম্ভীর রাজার মতো বেরিয়ে আসবেন।

দিগিন জীপে উঠলেন এসে। ডাকলেন—রমণী!

—আজ্ঞে।

—শানু এখানে কোথায় আসে রে?

রমণীমোহন চুপ করে থাকে।

—সেখানে চল। বলে দিগিন হেলান দিয়ে বসে চোখ বোজেন। রমণীমোহন স্টার্টারে চাপ দেয়। গাড়ি কেঁপে ওঠে।

হঠাৎ দিগিনের খেয়াল হয়, বলেন—তোরা কিছু খাস নি?

রমণী মাথা চুলকে বলে—আপনারও হয় নি।

দিগিন হাসলেন। বললেন—বুড়ো হয়ে যাচ্ছি নাকি রে? খাওয়ার কথা মনে থাকে না! চল।

ভাল হোটেলে তিনজন বয়স্যের মতো সমান সমানে বসে খেলেন। দিগিন

boiRboi.net

সামান্যই খান। কিন্তু রমণী আর কপিল দু পাশে পাহাড় পর্বত গিলে ফেলতে লাগল। এই খিদেটা চেপে ছিল ওরা এতক্ষণ। বেলা একটা বাজতে চলল। ওরা কিছু বলতে জানে না। চিরকালই ওদের ঐরকম সব সম্পর্ক দিগিনের সঙ্গে। কর্মচারী, তবু কিছু বেশী। চাকর, তবু যেন অন্যরকম। শেষ পর্যন্ত সম্পর্কটা তালিয়ে দেখেন নি দিগিন। গোলমেলে। একটা জিনিস জানেন ওরা তাকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করে।

ফের জীপে উঠে রমণীমোহন দিগিনের দিকে তাকিয়ে বলে—সেই খানে তো ?

কোথায় যাওয়ার কথা তা খেয়াল ছিল না দিগিনের। বড় রাস্তার ধারেই একটা নানারী। খুব বড় বড় পাইন আর দেবদারু গাছের ছায়ায় টালির চালওলা বাড়ি। বহুকাল আগে এক ফরাসী বুড়ি নানের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তখনকার এ-টি-এস সাহেব পেরেরা। বুড়ির কিছু মাল চুরি গিয়েছিল কলকাতা থেকে আসবার সময়ে ট্রেনে। বুড়ি রিপোর্ট করে। সাধারণত ট্রেন থেকে যাত্রীদের মাল চুরি গেলে রেল ক্ষতিপূরণ দেয় না। কিন্তু বুড়ি বিদেশী বলে, আর নান বলেই বোধহয় দিয়েছিল। পেরেরা সাহেবের দেহরক্ষী হয়ে রাইফেল হাতে দিগিন এসেছিলেন। সেই ফরাসী সন্ন্যাসিনীর অনাবিল হাসি আজও বুকে লেগে আছে, ত্রিশ বছর পরেও। ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে করা কেক আর কফি খাইয়েছিল বুড়ি। অনেক আশীর্বাদ করেছিল।

অন্যমনস্কতা থেকে দিগিন ফিরে এসে বলেন—কোথায় ?

—সেই মিসট্রেসের বাড়ি! রমণী বলে।

—কোন মিসট্রেস ?

—যেখানে শানুবাবু আসেন!

—ওঃ। দিগিন বুঝতে পেরে বলেন—মেয়েটা মিসট্রেস্ বুঝি ?

—না। মেয়েটা মিসট্রেসের মেয়ে। বিধবা।

দিগিন বিস্বাদ মুখে বলেন—শানু প্রায়ই আসে।

—সপ্তাহে দু তিনবার।

—বিধবা। তাহলে বয়স কত ? বেশী ?

—না। কম।

—বাচ্চা-কাচ্চা নেই ?

—না। বালবিধবা।

—এ যুগে বালবিধবা হয় নাকি ?

—এ হয়েছে। নিখিল ব্যানার্জির মেয়ে।

—নিখিল ব্যানার্জি! সে কে ?

—আপনার চেনা ছিল। মনীষা দিদিমণির বর। দিদিমণিকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে যে।

দিগিনের মনে পড়ল। উত্তর বাংলার প্রায় সব মানুষকেই চেনেন দিগিন। নিখিলকেও চিনলেন। খুব সুপুরুষ, খুব শিক্ষিত মানুষটা। কিন্তু চাকরি হয় জোটে নি, নয় তো করত না। মনীষা নামে মেয়েটি তার প্রেমে পড়েছিল। কলকাতা

boiRboi.net

থেকে দুজন পালিয়ে আসে এই জঙ্গুলে দেশে। শিলিগুড়ি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নেমে দুজন হাবাগোবা হয়ে বসে আছে, জায়গা অচেনা, প্রেম পাংচার হয়ে বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে, দায়দায়িত্বের চাপে চাকা বসে যাচ্ছে মাটিতে। নির্মল গাঙ্গুলি তার বাড়িতে নিয়ে তুলল সে অবস্থায়। পরের বাড়িতে নবদম্পতির প্রথম ফুলশয্যা হল। সেইখানে থাকতে থাকতেই দুজনের রোজ খিটিমিটি বাঁধত। গাঙ্গুলি অতিষ্ঠ হয়ে এসে বলত—মাইরি, কাদের জোটালুম।

প্রেম করে পালানো সে যুগে বিরল ঘটনা ছিল। গাঙ্গুলি এ ব্যাপারটার প্রতি আকৃষ্ট হয়েই ওদের আশ্রয় দেয়। কিন্তু ওদের বনিবনার অভাব দেখে বিগড়ে যায়। মনীষা নাকি খুব বড়লোকের মেয়ে, আর নিখিল বেকার, মধ্যবিত্ত। সে-সময়ে সেই দুঃসাহসী আর দুঃসাহসিনীকে দেখার জন্য প্রায়ই দিগিন গেছেন ও বাড়ি। খুব স্মার্ট দম্পতি। দিব্যি কথাটথা বলত, কলকাত্তাই গুলচালও দিত। মাস দুই পর মনীষা চাকরি পেয়ে গেল কালিম্পঙে। বেকার স্বামীকে ঘাড়ে করে চলে গেল।

সুন্দর চেহারা ছাড়া, আর একটা ইস্‌লামিক হিস্ট্রির এম-এ ডিগ্রি ছাড়া নিখিলের আর কিছু ছিল না। চাকরির উৎসাহ ছিল খুব কম। বসে খেত। বৌ চাকরি করত। বছর সাতেক ধরে ওদের দুজনের ঝগড়া হল। প্রেম কতদূর হয়েছিল কে জানে? তবে কালিম্পঙ থেকে যারা আসত তাদের কাছে মনীষা আর নিখিলের ঝগড়ার খবরই শোনা যেত। তারপর নিখিল এক আসামী মেয়ের সঙ্গে গৌহাটি পালিয়ে গেল। সেখানে নাকি সুখেই আছে তারা। নতুন শ্বশুরের সম্পত্তি পেয়েছে। নিখিলের মেয়ের খবর অবশ্য রাখতেন না দিগিন।

—শানু এখানে জুটল কি করে?

রমণীমোহন একটা ঢেঁকুর তুলে বলল—সাইটের কাছেই বাড়ি। ও বাড়িতে জলটল খেতে যেতেন। তার পরই চেনা জানা।

—কে কাকে ভজাল জানিস?

রমণীমোহন একবার আড়চোখে দিগিনের দিকে চেয়ে বলে—শানুবাবুর দোষ নেই। মেয়েটা দেখতে ভাল। নিখিল ব্যানার্জির মতো।

গাড়িটা একটা পাক খাইয়ে টিলার মাঝ বরাবর তুলে দাঁড় করাল রমণী। বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে বলল—এই বাড়ি।

দিগিন দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে নামলেন।

জীপ-এর শব্দ শুনে কেউ উঁকি দিয়েছিল বোধহয় জানালা দিয়ে। দিগিন মাথা নীচু করে ঢালু পথটা বেয়ে উঠছেন। এখনো লম্বাটে, টান চেহারা, দূর থেকে দেখলে শানু বলেও ভুল হতে পারে। মাথায় একটা টুপি ছিল, চোখে কালো চশমা।

বাড়ির কাছে যেতে না যেতেই দরজা খুলে চমৎকার একখানা মুখ উঁকি দিল। মুখে একটু হাসি একখানা আয়ুহীন প্রজাপতির মতো থিরথির করে কাঁপছে।

দিগিন মুখ তুলতেই সেই প্রজাপতিটা মরে গেল ঝুপ্‌ করে। মেয়েটা মুখ নামিয়ে সরে দাঁড়াল একটু।

দিগিন বললেন—মনীষা আছে ?

মেয়েটা মাথা নাড়ল—নেই। এ সময়ে স্কুলে থাকে।

—আমি শান্তি চ্যাটার্জির কাকা।

মেয়েটার মুখে এক অসম্ভব আতঙ্কের ছায়া খেলা করে গেল। এমনভাবে তাকাল যেন দিগিন যমপুরী থেকে পরোয়ানা নিয়ে এসেছেন। ব্যাধভীতা হরিণীর মতো পলকে সরে গেল ভিতরে।

দিগিন ক্লান্ত বোধ করলেন। বহু দিনকার পুরোনো বকেয়া ক্লান্তির বোঝা। শ্লথ পায়ে দরজার চৌকাঠে উঠে দাঁড়ালেন।

ভিতর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে মেয়েটি বলল—আপনি বসুন। মা এখুনি আসবেন।

দিগিন পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। ছোট্ট বসার ঘর, কাঠের মেঝে, কাঠের দেওয়াল, ওপরে টিন, বসবার ঘরে ছোট্ট ছোট্ট সোফাসেট, বইয়ের র‍্যাক, মেঝেয় সিকিমের কার্পেট পাতা! ফুলদানীতে ফুল। কেউ নেই।

দিগিন বসলেন, হাই তুললেন, কী করবেন তা এখনো ভাল করে জানেন না। একটা চুরুট ধরিয়ে ঠ্যাংদুটো ছড়িয়ে দিলেন সামনে। মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে রইলেন খানিক। চোখ বুজেই টের পেলেন, তাকে কেউ দেখছে। অত্যন্ত মনোযোগে, অতি সাবধানে, দেখছে।

চোখ না খুলেই বললেন—এসো মা, তোমার সঙ্গেই দুটো কথা বলি।

পর্দার আড়ালে ভিতরের ঘর থেকে একটা অস্ফুট ভয়ার্ত শব্দ হল। তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর আস্তে একখানা সুন্দর ফর্সা হাত পর্দাটা সরাল। রঙীন ছাপা শাড়ি পরা, ভীত সন্ত্রস্ত মেয়েটি ঘরের মধ্যে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

দিগিন চুরুটের ঘন ধোঁয়া ছাড়লেন। অল্প একটু কাশি এল। সামলে নিয়ে বললেন—নামটি কি ?

—অধরা ব্যানার্জি।

দিগিন ভ্রূ কোঁচকালেন। চুরুটের দিকে চেয়ে বললেন—তোমার কি স্বগোত্রে বিয়ে হয়েছিল ?

আবার একটা অস্ফুট কাতর শব্দ, ভয়ের। ধরা পড়ার। মেয়েটি তার সুন্দর মুখটি নত করে দুধারে দুবার ফেরাল। অর্থাৎ না।

—তোমার স্বামীর পদবী কী ছিল ? দিগিন জিজ্ঞেস করলেন।

—ভট্টাচার্য। ক্ষীণ কণ্ঠের উত্তর এল।

—তাহলে ব্যানার্জি বললে কেন ? ইচ্ছে করলেই কি পদবী বদলানো যায় ?

বলে চেয়ে রইলেন দিগিন। বয়স কম। বোধহয় বাইশের বেশী কিছুতেই নয়। সাদা ধপধপে সিঁথি। কুমারীর মতো!

—কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল ?

—ষোলো। তেমনি ক্ষীণ উত্তর।

—এখন কত বয়স ?

—একুশ।

—বিয়ের কদিন পর স্বামী মারা যায় ?

boiRboi.net

কাঠ-কাঠ প্রশ্ন, পুরুষ গলায়। মেয়েটা একবার করুণাভিক্ষু চোখ দুটো তুলে তাকাল। পরমুহূর্তে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল—ছ মাস।

—কী হয়েছিল ?

মেয়েটি বাঁ হাতটি তুলে চোখ মুছল। মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বলল—আসাম অ্যাট্রোসাইটিসের সময়ে খুন হয়, তেজপুরে।

—ও! বলে দিগিন চুপ করে রইলেন। তারপর মুখ তুলে বললেন—তার কথা তোমার মনে পড়ে ?

মেয়েটা উত্তর দিল না। চুপ করে নতমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, দরজার একটা কাঠে ঠেস দিয়ে, যেন কোর্টে দাঁড়িয়ে জেরার উত্তর দিচ্ছে।

—মনে পড়ে না ? দিগিন প্রায় ধমকালেন।

মেয়েটি তার সজল চোখ দুখানা তুলে তাকাল। কী মায়া থাকে চোখে! কী বিপুল ফাঁদ। দিগিনের বরফ গলতে শুরু করে।

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলে—না।

—এত অল্পবয়সে তোমার বিয়ে দিল কে ? কেনই বা !

—আমার দাদামশাই। আমার বাবা চলে যাওয়ার পর···বলে মেয়েটি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে থামল। পারিবারিক ব্যাপার এ লোকটাকে বলা ঠিক হবে কিনা তা বুঝতে পারছিল না বোধহয়।

দিগিন বললেন—আমি তোমার মা বাবার সব ঘটনা জানি। বলো।

—বাবা চলে যাওয়ার পর দাদামশাই আমাদের ভার নেন। অবশ্য আমরা তাঁর বাড়িতে যাই নি। কিন্তু তাঁর কথামতো আমরা চলতাম। তিনি আমাকে বিয়ে দিয়েছিলেন। গৌরীদান করারই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু মা দেন নি। তবু অল্পবয়সে বিয়ে হয়েছিল।

দিগিন একটা শ্বাস ফেলে বললেন—যাও, কফি করে আনো।

মেয়েটা চলে গেল। পরিপূর্ণ গৃহকর্তার মতো বসে রইলেন দিগিন। শীতটা বাড়ছে। ফেরার সময় একটু মাল টেনে নেবেন। এসব রাতে আজকাল খুব জ্যোৎস্না ফুটছে। বহুকাল জঙ্গলে পাহাড়ে জ্যোৎস্না দেখেন নি।

মেয়েটি কফি নিয়ে এল। দিগিন কাপটা হাতে নিয়ে তাপ দেখলেন, আগুন-গরম। খুব গরম ছাড়া খেতে পারেন না। খুশী হলেন।

নিঃশব্দে কফিটা খেয়ে উঠলেন। সকালে রাজমিস্ত্রির সঙ্গে যেভাবে কাজের কথা বলেছেন অবিকল সেই স্বরে বললেন—কোথাও পালিয়ে-টালিয়ে যেও না, ওতে লাভ হয় না। আমার বাসাতেই তোমার জায়গা হবে। শানু এলে বোলো।

একটু চুপ করে থেকে বললেন—বিয়ের আগে শানুর সঙ্গে বেশী মিশো না, বুঝলে ?

মেয়েটি লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। কিন্তু সেই অপরূপ লজ্জার দৃশ্যটি দাঁড়িয়ে দেখলেন না দিগিন। কে যেন তাকে জ্যোৎস্নায় ডাকছে। জঙ্গলে, পাহাড়ে, নিশুত রাতে।

বাইরে অবশ্য এখনো শেষ দুপুরের রক্তাভ রোদ।

boiRboi.net

জীপে উঠে দিগিন আর একটা চুরুট ধরালেন। বললেন—চালাও। মেহের সিংয়ের দোকানে একটু থামাস।

কালিম্পঙের কনস্ট্রাকশনের কাজটা দেখার কথা তার মনে পড়ল না। সিংয়ের দোকান থেকে একটা বড় পাঁইট কিনলেন দিগিন, আর দুটো ছোটো। তারপর ফেরার পথে মাঝরাস্তায় জীপ দাঁড় করিয়ে ভ্রূ কুঁচকে একটু কাঁপিল আর রমণীর দিকে তাকালেন। তারা ইঙ্গিত বুঝল। বড্ড শীত পড়েছে। ছোটো পাঁইট দুটো তুলে নিয়ে দুজনে জীপের পিছন দিকে চলে গেল। মালিকের সামনে খায় না।

কয়েকদিন পর। শালবাড়িতে আজ খুব জ্যোৎস্না ফুটেছে। প্রচণ্ড জ্যোৎস্না।

মোটর সাইকেলটা খামারবাড়ির সামনে থামোলেন দিগিন। পিছনের সীট থেকে ময়না নামল। তার গায়ে শাল, মুখ ঘোমটায় ঢাকা।

এখানেও প্ল্যাংকিং করা পুরানো ঘর একটা। কেউ থাকত না। এখন কাঁপিল থাকে। খামারবাড়ির চারধারে জমি সদ্য কোপানো। কয়েকদিনে দু'বিঘেটাক জমি কুপিয়ে ফেলেছে কাঁপিল। আরো দু'বিঘে কোপাবে। জমিটা ছাড়া হয়ে পড়ে ছিল।

নিস্তব্ধ খামারবাড়ির গভীর থেকে একটা খঞ্জনীর শব্দ আসছে। মৃদু কান্নার সুরে কাঁপিল 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে…' গাইছে। একদম একা। পরিপূর্ণ সুখী।

ময়না ঘোমটা ফেলে দিয়ে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার প্লাবনে স্নান করে বলল—এখানে আনলে যে!

দিগিন ভ্রূকুটি করলেন, বললেন—কেন, খারাপ লাগছে?

ময়না মাথা নাড়ল, বলল—ভাবছি, আমার এত ভাগ্য!

দিগিন এ কথায় সাড়া দিলেন না।

পিছনে গভীর শালবন। বর্ষা পেয়ে আগাছা জন্মেছে খুব। সেদিকে চেয়ে বললেন—যাবে ওখানে?

ময়না বলল—তুমি গেলে যাবো না কেন?

—এসো।

বলে দিগিন হাঁটতে লাগলেন। শালবন খুবই গভীর। জ্যোৎস্না পেঁছোয় নি ভিতরে। স্বপ্নময় অন্ধকার। জোনাকি জ্বলছে, ঝিঁঝি ডাকছে। পেঁচার শব্দ আসছে। পাখির ডানার শব্দ।

দিগিন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে লাগলেন। পিছনে ময়না। ময়না পিছন থেকে দিগিনের একটা হাত ধরে বলল—আর যেও না।

—কেন?

—সাপখোপ আছে।

দিগিন হাত ছাড়িয়ে নিলেন। বললেন—তুমি কাঁপিলকে ডাকো, দরজা খুলে দেবে। ঘরে বসে থাকো গিয়ে। আমি আসছি।

ময়না অসহায়ের মতো বলল—যদি না আসো?

boiRboi.net

দিগিন ভ্রূ তুলে বললেন—আসব না কেন ?

ময়না লজ্জা পেয়ে বলে—তুমি তো অদ্ভুত। তোমার সম্বন্ধে কোনো কথাই নিশ্চয় করে বলা যায় না।

—ও। বলে দিগিন ভাবলেন, বললেন—যদি না আসি তবে কাপিল তোমাকে পৌঁছে দেবে।

ময়না দ্বিধাগ্রস্তের মতো শালবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে রইল। ফিরে গেল না। এলও না সঙ্গে।

মানুষ ঐরকম। অনেকদূর পর্যন্ত সঙ্গে আসে, কিন্তু সবটা পথ আসে না। জীবন থেকে তাই মানুষ খসতে থাকে, একটা বয়সের পর। দিগিন কোমর সমান আগাছা ভেদ করে এগোতে লাগলেন।

সংসারের কিছুই তাকে টানছে না। কেবল যেন এক মহা পর্বত, মহা আকাশ, মহা বৃক্ষ তাকে টানে।

হেমন্তের হিমে পাতা খসছে। কী সুন্দর এই পাতা খসে পড়ার শব্দ। ঘুড়ির মতো মস্ত শালপাতা খসে পড়ছে। কুয়াশামাখা অন্ধকার-আক্রান্ত জ্যোৎস্নায় চারদিকে ভুতুড়ে ছায়া। শীত। একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে রইলেন দিগিন। চুরুট ধরালেন। সাপখোপের কথা তার মনেও আসে না। কেবল মনে হয় সব কাজ সারা হয়েছে। অনেকদিন ঘুমোন নি, বিশ্রাম নেন নি। অনেকদিন যেন আবার কোনো শক্ত কাজও করেন নি।

হঠাৎ চমকে উঠলেন। একটা স্পর্শ পেলেন কাঁধে। প্রথমটায় ভয় হল, সাপ ? ভুত ? শত্রু ?

মুখ তুলে দেখলেন, ময়না। ঘোমটা খসিয়ে ফেলা মুখ খুব আবছা দেখা যাচ্ছে। চোখ দুটো মস্ত বড় করে চেয়ে আছে।

—তোমার পায়ের শব্দ পাই নি তো। বললেন দিগিন।

—তুমি কি সজ্ঞানে ছিলে ?

ময়না পাশে বসল। ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের একটা বাংলা সংস্করণ ছিল বাড়িতে। তাতে ঠিক এই ভঙ্গীতে সাকীর একটা ছবি ছিল। ওমরের হাঁটুতে হাত রেখে উন্মুখ হয়ে বসে আছে।

দিগিন ময়নাকে টেনে নিলেন বুকের কাছে। অনেক বয়স হয়ে গেছে। তবু দুরন্ত ঠোঁটে দীর্ঘস্থায়ী একটি চুম্বন করলেন। কোনো কামবোধ নেই। কেবলই একটি গভীর ভালবাসা থেকে উৎসারিত চুম্বন যেন। ময়নাও বোধহয় তা বুঝল। বলল—এমন সুন্দর আদর আর হয় না। এসো, আমিও তোমাকে একটা চুমু দিই।

ঠোঁট বাড়িয়ে দিলেন দিগিন। অনেকক্ষণ ধরে আকুল চুমু দিল ময়না। চারদিকে ঘুড়ির মতো বড় বড় পাতা খসে পড়ছে তো পড়ছেই। শীত। কুয়াশা। জ্যোৎস্না।

কয়েকদিন পর। সকালবেলায় ঘরে ইজিচেয়ারে বসে আছেন দিগিন। উত্তরের দিকে চোখ। তেমনি পা দুখানা সামনে তোলা। কাঞ্চনজঙ্ঘার শিরা-উপশিরা এবং ক্ষতচিহ্ন সবই আজ সকালের রোদে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বিশাল একটা ঢালের ছায়া পড়েছে বুকে। পাহাড়টা যত সুন্দর ততই কুৎসিত। সাদা হাহাকারে ভরা

একাকীত্ব। ওখানে তুষার ঝরছে, বয়ে যাচ্ছে মৃত্যুহিম বাতাস, একটিও গাছ নেই, পতঙ্গ নেই, প্রাণ নেই। ওরই পায়ের কাছে কোন দুজ্ঞের্য় দুর্গম নির্জনতায় সৃষ্টি হচ্ছে তুষার নদী, পৃথিবীর প্রাণস্পন্দনের বীজকে অঙ্কুরিত করবে বলে সৃষ্টি হচ্ছে হ্রদ—নদীর উৎস। ওকে ঘিরে আছে নিস্তব্ধতা, কেবলই নিস্তব্ধতা।

কেউ ডাকে নি, তবু দিগিন ঠিকই শুনতে পেলেন ডাক। বহুকাল আগে ফটিক লাহিড়ি একটা সবুজ রঙের পুরনো হারকিউলিস সাইকেল চালাত। ফুলপ্যান্টে ক্লীপ আঁটা, মাথায় হ্যাট, সাইকেল করে শিলিগুড়ির রাস্তা তৈরির কাজ দেখে বেড়াত। সেই সাইকেলটা কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। আজ আবার তার ঘণ্টি বাজল হঠাৎ। দিগিন ঠিকই শুনতে পেলেন। চমকালেন না। যেন ঘণ্টি বাজবার কথাই ছিল।

বারান্দা দিয়ে ঝুঁকে তিনি দেখলেন, ফটিক লাহিড়ি বিশ বছর আগেকার সেই চেহারায় দাঁড়িয়ে। ফুলপ্যান্টে ক্লীপ আঁটা, মাথায় হ্যাট।

—আসছি। বললেন দিগিন, তারপর কাউকে কিছু না বলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন।

সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসে বললেন—টানতে পারবে তো লাহিড়ি?

—পারবো।

দিগিন একটা শ্বাস ফেলেন।

লাহিড়ি সাইকেলটা চালাতে থাকে উত্তরের দিকে। রাস্তা ক্রমে চড়াইয়ে ওঠে। ছোট ছোট পাহাড় ডিঙিয়ে যায়। ক্রমে চারধারে সাদা তুষার জেগে ওঠে। কেবল তার মধ্যে সাইকেলের চেন ঘোরাবার একটা মিহি শব্দ হয়। কাঞ্চনজঙ্ঘার গা বেয়ে ক্রমশ ওপরে উঠতে থাকে লাহিড়ির সাইকেল।

—পারবে তো লাহিড়ি? দিগিন জিজ্ঞেস করেন।

লাহিড়ি হাঁফ-ধরা গলায় বলে—পারবো, পারতেই হবে।

—বরং তুমি ক্যারিয়ারে বোসো, আমি চালাই।

—না হে, তোমাকেও তো এরকম ট্রিপ মারতেই হবে। প্রথম দিনটা আমিই তোমাকে নিয়ে যাবো।

—আচ্ছা।

দিগিন আর কথা বলেন না। লাহিড়িও না। চারদিকে কেবল এক সাদা, শীতল অন্ধকার জমে। আর কিছুই দেখা যায় না। না পাহাড়, না আকাশ, না পথ। সাইকেলের শব্দটাও শেষ হয়। দিগিন হাতটা বাড়ান। বিড়বিড় করে ডাকেন—লাহিড়ি।

কেউ উত্তর দেয় না।

দিগিন জানতেন এরকমই হবে। বিড়বিড় করে বলেন—সাদা অন্ধকার। অদ্ভুত সাদা এক অন্ধকার।

পুনি চা নিয়ে এল।

কিন্তু দিগিন তা হাত বাড়িয়ে কোনোদিনই আর নিলেন না।

boiRboi.net

জীবন-পাত্র

boiRboi.net

boiRboi.net

নরেনবাবু লোকটিকে আমার পছন্দ হচ্ছিল না। লোকটা জ্যোতিষবিদ্যা জানুক, আর না-ই জানুক তার মধ্যে বেশ একটা নিরীহ ভাব আছে। আর খুব একটা ব্যবসাবুদ্ধি নেই।

আমার কোষ্ঠীর ছকটা গত পনেরো বছর ধরে আমার মুখস্থ আছে। কেউ জ্যোতিষ জানে শুনলেই সট সট করে কাগজে ছকটা এঁকে সামনে এগিয়ে দিই। বহুলোক আমাকে বহু রকম কথা বলেছে। নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক সময়ে আমি আশার আলো দেখেছি, কখনো বা নিভে গেছি। দীর্ঘদিন পর আবার জ্যোতিষীর দ্বারস্থ হয়ে আমি সামান্য কিছু উত্তেজনা বোধ করেছিলাম।

নরেনবাবু একটু আগে অফিস থেকে ফিরেছেন। গ্রীষ্মকাল শেষ হয়ে মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছে আজকাল। বাইরে এখন মেঘের হাঁক-ডাক শোনা যাচ্ছে। ঘরে গুমোট। বাতাস থমু ধরা। গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন-এর ভিতরদিকে গলির ধাঁধার মধ্যে একটা অদ্ভুত আলো-বাতাসহীন ঘর। জানালা দরজা সবই আছে, তবু আলো বা বাতাস কিছুই আসে না। একটা হলুদে বালবের আলো বোধহয় সারাদিনই জ্বলে। বহু আদ্যিকালের একটা পাখা ঘুরছে ওপরে। তার বিষণ্ণ শব্দ হচ্ছে ঘটাং ঘটাং। দেয়ালে পোঁতা গজালের সঙ্গে তার দিয়ে বাঁধা কয়েকটা কাঠের তক্তায় বিস্তর পুরোনো পঞ্জিকা জমা হয়ে আছে, বেশ কিছু সংস্কৃত আর বাংলা জ্যোতিষের বই, কয়েকখানা ইংরেজী বইও। পুরোনো একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপরে অসম্পূর্ণ একটা কোষ্ঠীপত্র পড়ে আছে, দোয়াতদান, কলম, ডটপেন, লাল, নীল আর কালো কালির দোয়াত, চশমার খাপ, কোষ্ঠীর তুলোট কাগজ, নোট বই, চিঠি গেঁথে রাখবার কাঠের তলাওলা শিক, তাতে বিস্তর পুরোনো চিঠি। এ সবের মধ্যে নরেনবাবু বেশ মানানসই। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, গোলগাল চেহারা, চোখেমুখে একটু বেশী লেখাপড়া করলে যেমন অন্যমনস্কতার দাগ পড়ে, তেমন আছে। খুব একটা হাসেন না, তবে মুখে একটু স্মিতভাব। আমার কোষ্ঠীর ছক আঁকা কাগজটা দেখছিলেন বাইফোকাল চশমা দিয়ে। মাথাটা নীচু, টাকের ওপর কয়েকটা চুল পাখার হাওয়ায় ঢেউ দিচ্ছে।

একটা বছর আট নয়েকের ছেলে বুঝি টেবিল থেকে নরেনবাবুর অজান্তে একটা ডট পেন নিয়ে গিয়েছিল, সেটা ফেরত দিতে এসে সুট করে টেবিলের ওপর পেনটা ফেলে দিয়েই দেখিনা-দেখিনা ভাব করে চলে যাচ্ছিল। নরেনবাবু গম্ভীর মুখটা তুলে বললেন—এই শোন। ছেলেটা একটু ভয়ে ভয়ে কাছে আসতেই বাঁ হাতটা দিয়ে কষিয়ে একটা চড় দিলেন গালে। বললেন—কতদিন বারণ করেছি, আমার টেবিলে জরুরী সব জিনিস থাকে, হাত দিবি না। অ্যাঁ, কতদিন বারণ করেছি?

চড় খেয়ে ছেলেটার বোধহয় মগজ নড়ে গিয়েছিল, কথা বলতে পারল না।

ভ্যাবলার মতো কিছুক্ষণ চেয়ে হাত মুঠো করে চোখ রগড়াতে রগড়াত ভিতর দিকের দরজার কেলেকিষ্টি নোংরা পর্দাটা সরিয়ে চলে গেল। নরেনবাবু নির্বিকারভাবে আবার আমার ছক দেখতে লাগলেন। না, খুব নির্বিকারভাবে নয়, মাঝে মাঝে দেখছিলাম তিনি আড়চোখে ভিতর বাড়ির দরজাটার দিকে তাকাচ্ছেন। ওদিক থেকে কিছু একটা প্রত্যাশা করছিলেন বোধহয়। ছেলেকে চড় মারাটা বোধহয় তাঁর ভুলই হয়েছে।

ভুল যে হয়েছে সেটা বোঝা গেল কয়েক সেকেণ্ড বাদেই। পর্দার ওপাশ থেকে আচমকা এক বিদ্রোহী গলা অত্যন্ত থমথমে স্বরে বলে উঠল—ব্যাপার কি, দাসুকে মেরেছো কেন? গালে গলায় পাঁচ আঙুলের দাগ ফুটে উঠেছে।

নরেনবাবুর বাইফোকাল ঝলসে উঠল, গম্ভীর গলায় বললেন—শাসন করার দরকার ছিল, করেছি। তার জন্যে জবাবদিহি করতে হবে নাকি! যাও, ভিতরে যাও।

—ইঃ, শাসন! সংসারের কুটোগাছটি নাড়ো না, ছেলেপুলে কোনটা পড়ল, কোনটা কাঁদল তার হদিস জানো না, শাসনের সময় যত বাপগিরি!

বাইফোকালটা পর্দার দিকেই ফোকাস করে মন দিয়ে কথাগুলো শুনছিলেন নরেনবাবু। আমি বাইরের লোক, তবু আমার সামনেই ঘটনাটা ঘটছে বলেও তিনি খুব একটা সংকোচ বোধ করছেন, এমন মনে হল না। গলা ঝেড়ে নিয়ে বললেন—আমার টেবিলের জিনিস তোমাদের কতদিন হাত দিতে বারণ করেছি। এর একটা কাগজপত্র হারালে কি ক্ষতি হবে তা মুখ্যুরা বোঝে না। ফের যদি কখনো কেউ হাত দেয় তো হাত ভেঙে দেবো।

—ইঃ, মুরোদ কত! গায়ে হাত দিয়ে দেখো ফের, ও সব ভণ্ডামির জিনিস নুড়ো জেলে পোড়াবো। হাবাগোবা সব লোক ধরে এনে দিনমান ধরে কুষ্ঠী না কপাল দেখে ঝুড়ি ঝুড়ি বানানো কথা বলে যাচ্ছে। জ্যোতিষ! ক'পয়সা আসে শুনি! বেশীর ভাগ লোকই তো ছোলাগাছি দেখিয়ে সরে পড়ে। কবে থেকে বলছি, মহিন্দির বুড়ো হয়ে দেশে চলে যাচ্ছে, তার কয়লার দোকানটা ধরে নাও, কানু পানু বসে আছে, তারা দেখবে'খন। তা সংসারের যাতে সুসার হয় তাতে আবার কবে উনি গা করলেন! আছেন কেবল তেজ দেখাতে।

বাইফোকালটা খুব হতাশভাবে নেমে পড়ল টেবিলে। নরেনবাবু শুধু বললেন—মেয়েমানুষ যদি সব বুঝত তাহলে দুনিয়াটা অনেক সুস্থ থাকত। বোকা মেয়েছেলে নিয়ে ঘর করার মতো অভিশাপ আর হয় না, যাও, তুমি ভিতরে যাও।

—আর তুমি বুঝি বুদ্ধির পাইকিরি নিয়ে বসে আছো! সংসারে মাসান্তে ক'টা টাকা ফেলে দিয়ে অমন ফুল-ফুল বাবুগিরি করে বেড়াতে পারলেই খুব বুদ্ধি হল, না! বোকা মেয়েছেলে! বোকা বলেই তোমার মতো আহাম্মকের ঘর করতে হয়। বুদ্ধিমতী হলে তিন লাথি মেরে সংসার ভেঙে চলে যেত।

বাইফোকালটা আরো নত হয়ে যেত পড়ে। নরেনবাবুর এই বিনয় দেখে আমি মুগ্ধ হই।

পর্দার ওপাশ থেকে বিদ্রোহী কণ্ঠস্বর সরে গেল। গৃহকর্ম রয়েছে। নরেনবাবু

ছক থেকে মাথা তুলে আমাকে বললেন—রবিটা নিচস্থ রয়েছে। মঙ্গলটা পড়ল তৃতীয়ে। একমাত্র শনিটাই যা স্বক্ষেত্রে পঞ্চমে।

বলে একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

এ সবই আমার জানা কথা। রবি নিচস্থ, শনি পঞ্চমে।

নরেনবাবু বললেন—কেতুটাই ডোবাচ্ছে। বাঁদিকের ঘরে পড়ল কিনা। বাঁদিকে কেতু ভাল নয়।

আমি হতাশ বোধ করতে থাকি।

উনি মাথা নেড়ে বললেন—কার্তিক মাসে জন্ম হলে বড় মুশকিল। আমারও তাই। রবিটা নিচে পড়ে থাকলে কি করে কি হবে।

—কিছু হবে না ?

নরেনবাবু গম্ভীর মুখে বলেন—এখনই সব যাবে না। আগে নবাংশটা দেখি। সময় লাগবে। আপনি বরং ও হপ্তায় আসুন। ততদিনে করে রাখবো। তবে বিদেশ যাত্রার একটা যোগ আছে। নবাংশটা না করলে বোঝা যাবে না। পাঁচুবাবু আপনার কে হন ?

—খুব দূর সম্পর্কের দাদা।

নরেনবাবু গম্ভীর গলায় বললেন—অনেককাল দেখি না পাঁচুবাবুকে। আগে খুব আসতেন। উনি আমার প্রথম দিককার ক্লায়েন্ট।

—উনিই আপনার কথা বলেছিলেন আমাকে। বলতে গেলে উনিই পাঠিয়েছেন আমাকে।

নরেনবাবু মাথা নেড়ে বলেন—বরাবর উনি লোক ধরে নিয়ে আসতেন আমার কাছে। ও'র ধারণা ছিল, আমি খুব বড় জ্যোতিষী হবো। জ্যোতিষীর যে ধৈর্য স্থৈর্য দরকার, আর হিসেবের মাথা, সে সব আমার ছিলও। কিন্তু নিজের কোষ্ঠী বিচার করে দেখেছিলাম, আমার দাম্পত্য জীবনটা ভাল হবে না। হলও না। পুরুষ-মানুষের বৌ যদি ঠিক না হয় তো তার সব ভণ্ডুল হয়ে যায়। এই যে রাস্তায় ঘাটে অতি সাধারণ সব মানুষকে দেখেন তাদের মধ্যে অনেকের ছক বিচার করলে দেখবেন, অনেকেরই বড় বড় সব মানুষ হওয়ার কথা। কেউ নেতা, কেউ বৈজ্ঞানিক, কেউ সাহিত্যিক। বেশীরভাগেরই হয় না কেবল ঐ বৌয়ের জন্যই। বৌ বড় সাংঘাতিক জিনিস। পাঁচুবাবুরও খুব আশা ছিল আমার ওপর। এই সংসারের জন্যই হল না। তা পাঁচুবাবু আজকাল আর আসেন না কেন ?

আমি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলি—তাঁর আর ভবিষ্যৎ কিছু নেই। হাসপাতালে পড়ে আছেন। মৃত্যুশয্যা।

নরেনবাবু বাইফোকাল খুলে রেখে চোখ দুটো ধুতির খুঁটে মুছলেন। আবার বাইফোকাল পরে নিয়ে বললেন—বয়সও হল। সত্তর পঁচাত্তর তো হবেই।

—তা হবে।

—কোন হাসপাতালে ?

—কবিরাজী হাসপাতাল, শ্যামবাজারে।

নরেনবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন—চিনি।

boiRboi.net

আমি বলি—যাবেন নাকি একদিন দেখতে? খুব খুশী হবেন তাহলে। ওঁর তো কেউ নেই। চেনা লোক কেউ গেলে খুব খুশী হন।

নরেনবাবু উদাস হয়ে বলেন— আমার সময় কোথায়!

বলে একটু চুপ করে থাকেন উনি। তারপর টেবিলের ওপর সেই অসম্পূর্ণ কোষ্ঠীপত্রটা পেতে ঝুঁকে পড়ে বললেন—গিয়েই বা হবে কি? মরুণে মানুষকে দেখতে আমার ভাল লাগে না, মন খারাপ হয়। অনেককাল দেখিনি, ওঁকে খামোখা এখন দেখে মন খারাপ করার মানে হয় না। তার চেয়ে চোখের আড়ালে যা হয় হোক। সেই ভাল। হয়েছে কি?

আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম—বুড়ো বয়সের নানা রোগ। ভীষণ খেতে ভালবাসতেন, সেই থেকে ডায়াবেটিস হয়েছিল। এখন শোনা যাচ্ছে, ক্যানসারও দেখা দিয়েছে। বাঁচবেন না, তবে এখনো বেশ হাসিখুশী আছেন।

নরেনবাবু এই প্রথম একটু হাসলেন—পাঁচুবাবু বরাবরই সদানন্দ পুরুষ ছিলেন। ভাগ্যবান। মরাটা নিয়েই আমি ভাবি। কবে, কোথায়, খাবি খেতে খেতে মরব। পাঁচুবাবুর মতো আমি তো আর সদানন্দ পুরুষ নই। একবার এই গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন থেকে আমাকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলেন শোভাবাজার অবধি নিখুঁতি খাওয়াবেন বলে। অমন নিখুঁতি নাকি কোথাও হয় না। চাচার হোটেলে বহুবার মাংস খাইয়েছেন। নানান শখ শৌখিনতা ছিল তাঁর যা দেখে বোঝা যেত ভিতরটা সব সময়ে রসে ডগমগ। প্রায়ই বলতেন, আশি বছর বয়সের পর ধর্মকর্মে মন দেব। খুব বাঁচার ইচ্ছে ছিল, আবার মরতেও খুব পরোয়া ছিল না। প্রায়ই কেওড়াতলা নিমতলা সব ঘুরে বেড়াতেন। কত সাধুসঙ্গ করেছেন, সারা ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে টাকা খরচ করতেন। সেই পাঁচুবাবু মৃত্যুশয্যায়। এ কি ভাবা যায়?

পাঁচুদার কথায় আমিও দুঃখিত হয়ে পড়ি। বলতে কি, কলকাতা শহরটা পাঁচুদাই আমাকে চিনিয়েছিলেন। সদানন্দ মানুষ, সংসারে কারো পরোয়া ছিল না। রাইটার্স বিল্ডিংসের ল্যান্ড রেভিনিউতে ভাল চাকরি করতেন। তাঁর যৌবনে এবং প্রৌঢ়ত্বে বাজার ছিল সস্তাগণ্ডা। পয়সার তাঁর ছড়াছড়ি যেত। মনে পড়ল, গতকালও পাঁচুদা একটু তেলমুড়ি খাওয়ার বায়না করেছিলেন। সেটা যে খাওয়া বারণ তা নয়। তাঁর স্টেজ-এ কিছুই বারণ নয় আর। যা খুশী খেতে পারেন। ডাক্তাররা অবস্থা বুঝে সব বারণ তুলে দেয়। কিন্তু পাঁচুদার তেলমুড়ি খাওয়ার পয়সা নেই এখন আর।

নরেনবাবু ফের বাইফোকালটা খুলে চোখ মুছে বললেন—নবাংশটা করে রাখব'খন। কিন্তু আমি বলি কি, আপনি বরং এখন থেকেই বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা দেখুন। এক ঝলক বিচার করে যা দেখেছি, হয়ে যাবে।

একটু শিউরে উঠে বলি—বলছেন?

—বলছি।

একটা ছোটো শ্বাস ফেলে উঠে আসি।

বস্তুতঃ সদ্য সদ্য জীবনের দশ দশটা বছর কষ্ট করে আমি এই সেদিন সুইজারল্যান্ড থেকে ফিরেছি। কিন্তু সে কথা নরেনবাবুকে বলার কোনো মানে

boiRboi.net

হয় না। বিদেশে যাওয়াটাই যাদের জীবনের চরম লক্ষ্য আমি তাদের দলে নই।

খুব অল্প বয়সেই আমার জ্ঞানচক্ষু ফুটেছিল। ভিখিরির ছেলে অল্প বয়সেই নিজের রক্ষণাবেক্ষণ করতে শেখে। কারণ তাকে কেউ রক্ষণাবেক্ষণ করে না। লক্ষ্য করে দেখেছি, শীতে বর্ষায় কাঙাল গরীবের শিশু জল নিয়ে খেলা করে, ধুলো বালিতে গড়ায়, অখাদ্য খায়, অসম্ভব নিষ্ঠুরতায় মারপিট করে। সেসবের প্রতিরোধশক্তি ওদের মধ্যে আপনা থেকেই তৈরি হয়ে যায়। নিদারুণ অভাব ওদের চারপাশের রুক্ষতাকে প্রেমহীন ভালোবাসাহীনভাবে গ্রহণ করতে শিখিয়ে দেয়, অল্প বয়সেই তারা তাদের পরিবেশ সম্পর্কে বিজ্ঞ হয়ে ওঠে। ধুলো-খেলা করতে করতে উঠে গিয়ে ভিক্ষের হাত পাতে, বিয়েবাড়ির ফুটপাতে রাস্তার কুকুর তাড়িয়ে খাবার খুঁটে আনে, দুধের শিশু মাকে ছেড়ে সারাদিন একা পড়ে থাকে, কাঁদে না। ঐ তাদের খেলা ও জীবন। মা-বাবা মরলে ছেলেমেয়ে কদাচিৎ কাঁদে, সন্তান মারা গেলে মায়ের শোক দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অকারণ মায়া তাদের জীবনকে ভারাক্রান্ত করে না কখনো।

ভিখিরিদের সম্বন্ধে এত কথা বললাম, তার মানে এই যে, আমাদের জীবনযাপন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে তৈরি করে দেয়। শৈশবে আমার চেতনা হওয়ার পর থেকেই আমি স্বাভাবিকভাবেই জানতে পেরেছিলাম যে খিদে পেলেই খাবার এসে হাজির হয় না। এও জানতাম, ছোটখাটো ব্যথা বেদনা, খিদে বা মারধরে কাঁদতে নেই। কান্না বৃথা, কেউ সেই কান্না ভোলাতে আসে না। এও জানতাম, আমার বাবার থাপ্পড়ের জোর খুব বেশী, মার নিস্পৃহতা ছিল পাহাড়ের মতো অটল। উনিশশো সাত-চল্লিশের দেশ বিভাগের পরই ঢাকা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা আমাদের পরিবারে জনসংখ্যা খুব কম ছিল না। ঐ অত লোকের মধ্যে থেকে থেকে আমাদের আত্ম-সচেতনতাও অনেক কমে গিয়েছিল। রাণাঘাটের কাছে এক ক্যাম্পে তখন থাকি, অনেক উদ্‌ভ্রান্ত লোক চারিদিকে, খাওয়া পরার কোনো ঠিক নেই। মচ্ছবের মতো দু বেলা কারা যেন খিচুড়ি খাওয়াতে আসে। খাওয়া বলতে ঐটুকুই। সারাদিনে বহুবার খিদে পেত খিদে মরে যেত। প্রথমে কাঁদতাম খুব কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে বুঝতে পারতাম কান্নার মূল্য দেওয়ার কেউ নেই। বাবার এক খুড়ী ছিল দলে, খুনখুনে বুড়ি, সেই ঠাকুমা মাঝে মাঝে কাছে ডেকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেন, কাঁপা কাঁপা স্বরে কিছু বলতে চেষ্টা করতেন। তাঁর চোখের কোল ছিল ফোলা, চোখ ঘোলাটে, চোখের দোষেই সব সময়ে অশ্রুপাত করতেন, সেটা কান্না ছিল না। সেই ঠাকুমা ছাড়া আর কেউ বড় একটা পাত্তা দিত না। দরমার বেড়া দেওয়া দমবন্ধ সেই ঘরে আমরা অবশ্য বেশীক্ষণ থাকতামও না। অনেক আমাদের বয়সী ছেলেমেয়ে জুটেছিলাম সেইখানে। ক্রমে খিদে ভুলে খেলায় মেতে থাকতে শিখেছিলাম। মার্বেল নেই, লাট্টু নেই, ঘুড়ি লাটাই জোটে না, তবু কত রকম তুচ্ছাতিতুচ্ছ খেলা আমরা তৈরি করে নিতাম। মাটির চাড়া ছুড়ে সিগারেটের খালি প্যাকেট জিতে নেওয়ার খেলা, দাড়িয়াবান্ধা, দড়ি পাকিয়ে বল তৈরি করে তাই দিয়ে ফুটবল। দেশের বাড়িতে আমরা নাকি তিনবার ভাত খেতাম, তা ছাড়া সারাদিন ধরে মুড়ি মুড়কি, আমটা জামটা তো ছিলই। সেই সব ভুলতে শিশুদের দেরি হয়নি।

আমরা খুব চট করে জীবনের রুক্ষতাকে টের পেয়ে তা গ্রহণ করতে শিখেছিলাম। রাণাঘাটে আমরা অবশ্য খুব বেশীদিন থাকিনি। সেখান থেকে হাবড়া, ব্যাণ্ডেল, গোসাবা হয়ে আমরা অবশেষে কলকাতায় আসি। বাবা পূর্ববঙ্গে জমির আয় থেকে সংসার নির্বাহ করতেন, খুব বেশী লেখাপড়া বা বৃত্তিগত শিক্ষা তাঁর ছিল না। চাকরি-বাকরি পাওয়ার প্রশ্ন ছিল না, উদ্যোগের অভাব, আত্মবিশ্বাসহীনতা এবং উদ্বেগে তিনি আরো অপদার্থ হয়ে যাচ্ছিলেন। সহ-উদ্বাস্তুদের সঙ্গে সারাদিন কাজকর্মের চেষ্টায় ঘুরে বেড়াতেন, আর বাড়ি ফিরে কেবলই ফিসফাস করে পরামর্শ করতেন সকলের সঙ্গে। পরামর্শের শেষ ছিল না। কার্যকর কিছুই হত না। আমরা কাছাকাছি বয়সের চার ভাই, আর তিন বোন মিলে সাতজন, মা বাবা ঠাকুমা, এক কাকা কাকীমা আর তাদের তিন ছেলেমেয়ে, আবার এক ছোট কাকা—এই বিশাল পরিবার বিনা টিকেটে ট্রেনে, হাঁটাপথে, কিংবা যেমন তেমন ভাবে এখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে হয়রান। কলকাতায় আমরা দমদমের কাছে এক খোলা মাঠে জড়ো হয়েছিলাম। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। বাবা-কাকাদের মধ্যে খুব ভালবাসা ছিল, ছাড়াছাড়ি হওয়ার কথা কেউ ভাবেনি। কিন্তু বোঝা গিয়েছিল, ওইভাবে যৌথ পরিবার রক্ষার চেষ্টা করলে আরো মুশকিলে পড়তে হবে। মেজোকাকা তার পরিবার নিয়ে একদিন ভিন্ন হয়ে গেলেন। শোনা গেল, আদি সপ্তগ্রামে তাঁর এক খুড়শ্বশুরের জমিজমা আর কলাবাগান আছে, তদুপরি তিনি একটি মাত্র সন্তানকে হারিয়ে খুব নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন। কাকাকে তিনি জমি বাগান তদারকির কাজ দিয়েছেন। কাকা সপরিবারে চলে গেলে পরিবারে লোকের চাপ কিছু কমল। যেখানে যাই সেখানেই আমাদের বয়সী কাঙাল ছেলেপুলে জুটে যায়। আমরা খুব খেলি। বলতে কি, সেই সময়ে একটা বড়সড় ছেলে আমাদের ভিক্ষে চাইতে শিখিয়েছিল। ক্যাম্প থেকে অনেক দূরে চলে গিয়ে আমরা বড় রাস্তায়, বাজারে এবং রেল স্টেশনে বহুবার ভিক্ষে করেছি। তবে কারো বাড়িতে গিয়ে ভিক্ষে চাইতে লজ্জা করত। আমরা বড়জোর পথচলতি মানুষের কাছে হাত পেতে বলতে পারতাম —দুটো পয়সা দেবেন ? পয়সা পেলে নানা কুপথ্য কিনে খেতাম। ছোটখাটো চুরি করতাম কখনো সখনো। লাউটা, মুলোটা, ঘটি কি বাটি পেলে বেচে দিতাম। রেলের কামরায় উঠে খুঁজতাম যাত্রীদের ফেলে যাওয়া জিনিস। আমাদের বখে যাওয়ার ব্যাপারটা মা-বাবা কদাচিৎ লক্ষ্য করেছেন। মা দু দুটো কোলের মেয়েকে সামলাতে ব্যস্ত, বাবা অভাবে পাগল, ছোটকাকা সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিষণ্ণ। তিনি মানুষটা ছিলেন বড় ভাল, বুদ্ধিমান এবং মেধাবী। নীরবে তিনি তাঁর সঙ্গে আনা কিছু পুরোনো পড়ার বই বারবার পড়তেন। তাঁর তাড়া খেয়ে আমরা চার ভাই কিছু কিছু লেখাপড়া শিখেছিলাম। লেখাপড়া আমার খুব খারাপ লাগত না, অক্ষর চেনা রিডিং পড়া যোগ বিয়োগ ইত্যাদির মধ্যে আমি কিছু নতুন রকম খেলার রহস্য টের পেয়েছিলাম। ছোটকাকার বিষণ্ণতার গভীরতা আমরা টের পাইনি, যখন পেলাম তখন সেই আত্মহননকারীর দেহটি এক শীতের ভোরে দমদম জংশনের কাছে রেল লাইনে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে ছিল। ছোটকাকার মৃত্যুর পর আমাদের পরিবারে জনসংখ্যা কমল, আরো কমল যখন আমার বড় দুই

ভাই পর পর টাইফয়েড আর উদরীতে মারা যায়। এইসব মৃত্যু খুবই শোকাবহ বটে কিন্তু তবু বলি স্বাভাবিক নিশ্চিন্ত জীবনে এই রকম শোক যতখানি ধাক্কা দিতে পারত ততটা হয়নি। ক্যাম্পে মৃত্যু দেখে আমরা অভ্যস্ত। শুধু সেই খুনখুনে বুড়িঠাকুমা চোখের দোষেই হোক আর শোকেই হোক অবিরল অশ্রুপাত করে বিলাপ করতেন। মা বাবা অচিরে সামলে উঠলেন। শোকের সময় কই?

শুনতে পেলাম, বাবা কন্ট্রোলের কাপড়ের একটা ব্যবসা পেয়েছেন। সেটা ভাল না খারাপ এসব বিচার তখন মাথায় আসে না। একটা কিছু পাওয়া গেছে, একমাত্র সংবাদ। কয়েকদিনের মধ্যেই হঠাৎ আমাদের বাড়িতে বেশ কয়েকপদ রান্না হয়, একটু নতুন জামাকাপড়ের মুখ দেখি। বাবা একটা হাতঘড়ি পর্যন্ত কিনে ফেললেন। অতিলোভে বোধহয় তাঁতি নষ্ট হল। সে ব্যবসা বাবার চেয়ে বিচক্ষণতর লোকেরা হাতিয়ে নেয়। একটা রেশনের দোকানে বাবা কিছুকাল চাকরি করলেন। অভিজ্ঞতা বাড়ছিল। এর পরই বাবা এক বড় উকিলের মুহুরি হলেন। তার পরের পর্যায়ে বাবা স্বাধীনভাবে শিয়ালদা কোর্টে বসে কোর্ট ফি পেতে লাগলেন, দলিল তৈরি, রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদির দালালি করে তাঁর জীবনের চূড়ান্ত সার্থকতায় পৌঁছে গেলেন। অর্থাৎ আমরা অত্যন্ত দীন দরিদ্রের মতো, খুবই সামান্য খাওয়া-পরার মধ্যে একরকমের নিশ্চয়তা পেয়ে গেলাম। এক সেই বুড়ি ঠাকুমার অনুল্লেখ্য মৃত্যু ছাড়া আর তেমন অঘটন কিছু ঘটেনি। আমি ছোটকাকার কাছে শেখা সামান্য লেখাপড়ার ব্যাপারটি ভুলিনি। তিনি মারা গেলে তাঁর বইগুলো আমার দখলে আসে। সেগুলো নিয়েই আমার অনেক সময় কাটত। বাবা কোর্টের কাজ পাওয়ার পর, প্রায় দশ বছর বয়সে আমি দমদমের একটা ওঁছা ইস্কুলে ভর্তি হতে যাই। সেই স্কুলে যে যায় তাকেই ভর্তি করা হয়, যে ক্লাসে যার খুশী। নামকোবাস্তে একটা ভর্তির পরীক্ষা নেওয়া হয় মাত্র। আমি যেতেই তাঁরা জিজ্ঞেস করেন, আমি কোন ক্লাসে ভর্তি হতে চাই। আমি বললাম—সিক্সে। তাঁরা কয়েকটা ট্রানশ্লেশন জিজ্ঞেস করলে আমি চটপট বলে দিই। একজন মাস্টারমশাই বললেন—বাঃ, ভেরী ইন্টেলিজেন্ট। আমি ভর্তি হয়ে গেলাম। পরের পরীক্ষা থেকেই আমি প্রথম স্থান অধিকার করতে থাকি। স্কুলটা যথার্থ খারাপ বলেই আমার মত মাঝারি ছাত্রের পক্ষে ফার্স্ট হওয়া কঠিন ছিল না। কিন্তু তাতে একটা সুবিধে হয়েছিল, এভাবে আমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যেতে থাকে। প্রায় দিনই টিফিনের পর স্কুল ছুটি হয়ে যেত। ক্লাস প্রায়ই ফাঁকা পড়ে থাকত মাস্টারমশাইয়ের অভাবে। পড়ানো ছিল খুবই দায়সারা গোছের। আমি তাই বাড়িতে পড়তাম। দমদমের কাছে আমাদের কলোনীর পরিবেশ ছিল খুবই খারাপ। চুরি, গুণ্ডামি, মারপিট জবর দখল, চরিত্রহীনতা, অশ্লীল ঝগড়া এ সব ছিল আমাদের জলভাত। এই পরিবেশ সহ্য করতে পারতেন না আমার ছোটকাকা। তা ছাড়া জীবনের হতাশার দিকটাও তাঁর সহ্য হয়নি, তাই তাঁকে মরতে হয়েছিল। আশ্চর্য এই, তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই তাঁকে আমার বড় বেশী মনে পড়তে থাকে এবং আমার জীবনে তিনিই সবচেয়ে স্থায়ী প্রভাব ফেলেছিলেন। সেই উদ্বাস্তু পল্লীর সবচেয়ে অশ্লীল-গালিগালাজ আমার একসময় ঠোঁটস্থ ছিল, বখামির চূড়ান্ত একসময়ে আমি করেছি। কিন্তু ক্রমে আমার এই পল্লীর কুশ্রীতা থেকে মানসিক মুক্তি ঘটে। আমি

আমার আর তিন ভাই বোনকেও প্রাণপণে এই অসুস্থ পরিবেশ থেকে আড়াল করতে চেষ্টা করতাম। বাবাকে বলতাম—চলুন, আমরা অন্য কোথাও বাসা করি। বাবা খুব বিরক্ত হয়ে বলতেন—তোমার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে লেখাপড়া করে। আর কিছু-দিনের মধ্যেই জমির স্বত্ব আমরা পেয়ে যাবো। মাগনা জায়গা ছেড়ে আহাম্মক ছাড়া কেউ যেতে চায়?

আমি বাবার মতো করে বুঝতে শিখিনি। জমির জন্য তো মানুষ নয়। মানুষের জন্যই জমি। সেই মানুষই যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, মানুষকেই যদি নীতিহীনতায় পশুত্বে নেমে যেতে হয় তো জমিটুকু আমাদের কতটুকু অস্তিত্বের আশ্রয় হতে পারে? অবশ্য বাবা একটা যুক্তিসিদ্ধ কথাও বলতেন—দেখ, পরিবেশ থেকে পালানোর চেষ্টা কোরো না। সর্বত্রই পরিবেশ একই রকম। যদি পারো, যদি সাধ্য থাকে তো পরিবেশকে শুদ্ধ করে নাও।

আমি তখন ছেলেমানুষ, আদর্শের কথা ভিতরে সাঁ করে ঢুকে তীরের মতো গেঁথে যেত। তার থরথরানি থাকত অনেকক্ষণ। বুঝতাম, সত্যিই কোথায় যাবো? বেলঘরিয়া থেকে গড়িয়া পর্যন্ত সর্বত্র ঘুরে এর চেয়ে ভাল বা সুস্থ পরিবেশ খুব একটা নজরে আসেনি তো? আমাদের কলোনীতে দু-চারজন ভাল লোক ছিলেন ঠিকই। তাঁরা দশের ভাল করতেন, উপকার করে বেড়াতেন, ঝগড়া কাজিয়া মেটাতেন, তা সত্ত্বেও বলতে পারি তাঁরা আমাদের মধ্যে এমন কিছুর সঞ্চার করতে পারেননি যার দ্বারা আমরা উদ্বুদ্ধ হই, সংবর্ধিত হই। এ বাড়ির মেয়ে পালিয়ে যায়, ও বাড়ির ছেলে কালোবাজারী করে, অমুকের বৌ পরপুরুষের সঙ্গ করে—এই ছিল আমাদের নিত্যকার ঘটনা। প্রচণ্ড অভাবের চাপে মানুষ কত কি করে! এই সব মরীয়া ও নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে-যাওয়া মানুষের কাছে ধরবার ছোঁবার মতো কোনো বাস্তব আদর্শ কেউ দিতে পারেনি। ভাল কথা সবাই বলছে, দেশ জুড়ে বক্তৃতার অভাব নেই, কিন্তু কেউ জানে না কোন পথে, কোন আদর্শে মানুষকে তার লক্ষ্যে পেঁৗছে দেওয়া সম্ভব। তার ওপর নানা বিরুদ্ধ মতেরও জন্ম হচ্ছে রোজ। সেই মতা-মতের ঝড়ে আমরা আরো উদ্‌ভ্রান্ত। কোন দিকে গেলে ঠিক হয় তা বুঝতে পারি না। তবু দল বেঁধে বক্তৃতা শুনতে যাই। এর বক্তৃতাতেও হাততালি দিই, ওর বক্তৃতাতেও হাততালি দিই। কে কেমন বলল সেইটে নিয়ে মাথা ঘামাই। এদিকে দরমার বেড়া বা চালের টিন পাল্টাতে আমাদের জেরবার হয়ে যায়, পুজোর জামা-কাপড়ের জন্য বাবাকে প্রচণ্ড চিন্তিত হয়ে পড়তে দেখি। পুজো উপলক্ষে জামাকাপড় কেনা হয় বটে, কিন্তু বছরে ঐ একবারই আমাদের যা কিছু কেনা হয়। সেটা না হলে লজ্জা নিবারণের সমস্যা। আমরা এ সব নিয়ে ব্যস্ত; এর চেয়ে দূরের বস্তু, অর্থাৎ পুরো দেশ কিংবা মানুষের ভবিষ্যৎ—এ সব আমাদের ভাববার সময় নেই।

প্রথম বিভাগে স্কুল ফাইন্যাল পাস করা গেল। আমাদের পরিবারে এ নিয়ে খুব একটা হৈ-চৈ করার অবস্থা আমাদের নয়। বাতাসা লুট দেওয়া হল মাত্র। বাবা কিছু বেসামাল রইলেন কয়েকদিন। তাঁর মেজো ছেলে মানুষ হচ্ছে, এরকম একটা বিশ্বাস তাঁর হয়ে থাকবে। তখন তিনি প্রায়ই আমায় ছোটকাকার সঙ্গে তুলনা করে বলতেন—প্রভাসটা ঠিক ছানুর মতো হয়েছে। ছানুও বেঁচে থাকলে

আজ কত বড় মানুষ হত। এই তুলনায় কেন জানি না আমি অত্যন্ত আহ্লাদ বোধ করতাম। কৈশোরোত্তীর্ণ ছোটকাকা কবে মরে গেছেন, তবু আমার ভিতরে ঐ মানুষটি এক বিগ্রহের মতো স্থির হয়ে থাকে। ঐ সৎ, নিরীহ, মেধাবী মানুষটিকে ভালবাসা আমার শেষ হয়নি। আমার হতভাগ্য পরিবেশে যত মানুষ দেখেছি তার মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে কোমল। চোখ বুজলেই দেখতে পাই, একটা জীর্ণ হলুদ চাদরে খালি গা ঢেকে খুপরির মধ্যে জানালার ফুটোর ধারে একমনে গণিতের বই খুলে বসে আছেন। মেয়েদের দিকে তাকাতেন না, খিদের কথা বলতেন না, কখনো কোনো অসুবিধে বা অভাবের অভিযোগ ছিল না। অল্প কথা বলতেন। কখনো কখনো আমাদের পড়ানোর পর গল্প শোনাতেন, কিংবা চুপ করে আমাদের নিয়ে বসে থাকতেন। শুনতে এইটুকু। কিন্তু আমার জীবনে কোনো মানুষই তাঁর মতো অত অল্প আচরণের ভিতর দিয়ে অত বেশী শেখাতে পারেনি।

বি, এস-সি পর্যন্ত পাস করতে আমার খুব একটা কষ্ট হয়নি। ফিজিক্সে অনার্স নিয়েছিলাম, পরীক্ষার আগে সেটা ছেড়ে দিতে হয়। তার কারণ আমরা ভাই-বোনেরা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের চাহিদা বাড়ছে, বাবার রোজগার বাড়ছে না। ফলে আমাকে বেশ কয়েকটা টিউশানী নিতে হয়। অপুষ্টির ফলে আমার শরীর ভাল ছিল না, চোখের দোষে মাথা ধরত, লো প্রেশার ছিল, বেশী রাত জেগে পড়াশুনো করতে গিয়ে স্নায়ুর দোষেই বুঝি খুব খিটখিটে আর অধৈর্য হয়ে পড়েছিলাম। মাসান্তে আমার রোজগারের টাকা তখন সংসারের পক্ষে অপরিহার্য। কম বয়সে এসব দায়িত্ব নিয়ে বেশ বুড়িয়ে গেছি অল্প বয়সেই। সে এক রাহুগ্রস্ত যৌবন। ছোটভাইটা বড় হতেই বুঝলাম তার লেখাপড়ার মাথা নেই। বোন দুটোরও প্রায় একই দশা। টেনেটুনে স্কুল ফাইন্যালটাও যদি পাস করানো যায় এই ভরসায় আমি ছোটভাইটার পিছনে খুব খাটতাম। সে বখাটে ছেলে ছিল না, আমাকে ভয়ও পেত। কিন্তু তার মাথা পড়াশুনো নিতে পারত না। অবোধ শিশুর মতো সে চেয়ে থাকত আমার দিকে। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড মারতাম তাকে। মনে হত, এই নির্বোধদের ভরণপোষণ করাই বুঝি হবে আমার একমাত্র কাজ সারাজীবন। তাই ঐ রাগ ও বিরক্তি। মন ভাল থাকত না। আই, এস-সি-র রেজাল্ট খারাপ ছিল না আমার। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অ্যাডমিশন টেস্টের লিস্টে নাম উঠেছিল। কিন্তু সেই ব্যয়সাপেক্ষ পড়াশুনোর অবস্থা নয় বলে পড়িনি। বি. এস-সি-র অনার্সটাই ছিল আশা-ভরসা। কিন্তু ফাইন্যালের আগে বুঝতে পারলাম, হবে না। আমার মনঃসংযোগ নেই, ধৈর্য নেই, শরীরেও সয় না। অনার্স ছেড়ে বিষণ্ণ চিত্তে পরীক্ষা দিয়ে দেদার নম্বর পেয়ে ডিস্টিংশনে পাস করলাম। এম, এস-সি পড়া হল না। একটা চাকরি পেয়ে গেলাম ডবলিউ; বি, সি, এস পরীক্ষা দিয়ে। তুমুল আনন্দিত হল আমার পরিবার। ইঞ্জিনীয়ারিং পড়া হয় নি, ফিজিক্সের অনার্সটাও হল না, জীবনের অনেক বড় সার্থকতা আমার হাতের নাগাল দিয়ে পালিয়ে গেছে। সেই তুলনায় সরকারী চাকরিটুকু আমাকে কি আর দিতে পারে? তাই তখন আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বড় বেশী প্রবল হয়ে উঠেছিল। নিজের পরিবারের প্রতি এক প্রচণ্ড আক্রোশও তখন থেকে জন্ম নেয়।

এরা আমাকে এদের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আটকে রেখেছে। আমাকে বড় হতে দিচ্ছে না, আমার অন্তর্নিহিত গুণগুলির বিকাশ ঘটতে দিচ্ছে না।

এই নির্মম আক্রোশ থেকেই তলায় তলায় আমি গোপনে বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকি। জানতাম, আমি চলে গেলে এদের সাঙ্ঘাতিক বিপদ ঘটবে, সরকারী চাকরির নিশ্চিত আয় এদের আশ্রয় দেবে না। তবু আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাকে বড় বেশী নিষ্ঠুর করে তুলেছিল। জার্মানীতে প্রথম একটি চাকরি পেয়ে যাই, তারা যেতে লিখল। গোপনে পাসপোর্ট করলাম, ভিসার আবেদন জমা দিলাম। বাড়ির কেউ জানল না। কিছু টাকা জমানো ছিল দু বছর চাকরির। সেই টাকা দিয়ে জাহাজের টিকিট কেটে বাড়িতে খবর দিলাম। এক নিস্তব্ধতা নেমে এল বাড়িতে। সকলেই এক অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে দেখেছিল আমাকে। তারা যতদূর সাফল্যের কথা ভাবতে পারে, আমি তো ততদূর সফলতা অর্জন করেছি। কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে অফিসারের সরকারী চাকরি করি। গেজেটে নাম ওঠে, আমার জন্য সচ্ছল পরিবার থেকে পাত্রীর খবর আসছে। মা বাবাও উদ্যোগ করছেন। এর মধ্যে এ কি! তারা আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। আমি এতদূর হৃদয়হীন হতে পারি তাদের ধারণা ছিল না। অবশ্য কেউ কোনো জোরালো আপত্তি তুলল না। আমি অবশ্য তাদের বোঝালাম, আমার এবং সকলের ভবিষ্যতের জন্য এটা দরকার। বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন। মা তৎক্ষণাৎ কাঁদতে শুরু করে। বোনেরাও খুশী হয় নি। কেবল ভাইটা খুব খুশী হয়েছিল, দাদা না থাকলে তাকে আর ওরকম প্রচণ্ড মারধর বকুনি সহ্য করতে হবে না।

জার্মানীতে চলে গিয়েছিলাম দশ বছর আগে। তারা আমাকে শ্রমিকের চাকরি করাত। বহু কষ্টে, অনেক চেষ্টায় আমি গেলাম অ্যামেরিকায়। মোটামুটি ভাল খেতাম, পরতাম, মাঝারি চাকরি জুটেছিল। কিন্তু আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা? তার কি হবে? কেবল ভাল খাওয়া-পরার জন্য তো আমি এতদূর আসিনি। কিছু একটা শিখে, জেনে যেতে হবে যা আমাকে অনেক উঁচুতে তুলে দেবে। অত্যন্ত দ্রুতবেগসম্পন্ন পাশ্চাত্য জীবনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে গিয়েই আমার সময় ফুরিয়ে যেত। উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ হল না। কমপ্রেসর মেশিন সম্পর্কে শিখবার জন্য অবশেষে আমি চলে আসি সুইজ্যারল্যাণ্ডে। ব্যল শহরে দীর্ঘকাল লেগে থাকলাম একটা কারখানায়। বেতনের প্রচণ্ড অসাম্য। জার্মান, ইটালিয়ান শ্রমিকেরা বেশী অঙ্কের পে-প্যাকেট পায়, আমরা অনেক কম। তবু প্রচণ্ড পরিশ্রম করতাম। কিন্তু অতবড় কম্প্রেসর তৈরির কারখানার কাজ আমি একা শিখব কি করে। আমার মৌলিক কারিগরিবিদ্যা নেই, পরিকল্পিতভাবে আমি আসিওনি। কেবল ভসভসে আবেগ সম্বল করে এসে চাকরিতে ঢুকেছি। বুঝেছি কেবল চাকরিই সার হল। এই হতাশা কাটাতে আমি এক জার্মান মেয়েকে দুবছর বাদে বিয়ে করি। তার দেড় বছর বাদে সে ছেড়ে চলে যায়। আর ততদিনে দশ দশটা বছর পার হয়ে গেল। খবর পেয়েছি, বাবা মা এখনো কোনক্রমে বেঁচে আছে, ভাই রেলের পোর্টার, বোনেরা যে যার রাস্তা দেখেছে। হতাশায় ভরে আমি একদিন ফেরবার প্লেনে চাপলাম।

অলকা

ভোরের প্রথম আলোটি পূবের জানালা দিয়ে এসে আমার জয়পুরী ফুলদানীটার ওপর পড়েছে। ফুলদানীতে কাল সন্ধ্যের রজনীগন্ধা একগোছা। ফুল এখনো সতেজ। কালকের কয়েকটা কুঁড়ি আজ ফুটেছে। সাদা ফুলের ওপর ভোরের রাঙা আলো এসে পড়েছে, জয়পুরী ফুলদানীটার গায়ে চিকমিক করে আলো। ড্রেসিং টেবিলের ওপরেই ফুলদানী, তাই আয়না থেকেও আলোর আভা এসে ওকে সম্পূর্ণ আলোকিত করেছে। তিন আয়নার ড্রেসিং টেবিল ফুলদানী আর ফুলের তিনটে প্রতিবিম্ব বুকে ধরে আছে। একগোছা রজনীগন্ধা চারগোছা হয়ে কি যে সুন্দর দেখাচ্ছে।

আমার বদ অভ্যাস, খুব ভোরে আমি উঠতে পারি না। আমার বাপের বাড়ির দিকে সকলেরই এই এক অভ্যাস। কেউ ভোরে ওঠে না। আমাদের বাপের বাড়িতে সবার আগে উঠত আমার বুড়ি ঠাকুমা। ভোরে চারটেয় উঠে খুটুর-খাটুর করত, জপতপ করত। আর তারপর সাড়ে সাতটা বা আটটা নাগাদ আর সবাই। এ আমাদের ছেলেবেলার অভ্যাস। বিয়ে হওয়ার পর এই বদ অভ্যাস নিয়ে অনেক ঝামেলায় পড়তে হয়েছে আমাকে। আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সব রাত থাকতে উঠে ঘর গেরস্থালীর কাজ শুরু করে দিত। প্রথম প্রথম নতুন বৌ-পনা দেখিয়ে আমিও ভোরে উঠতাম, কিন্তু তাতে শরীর বড় খারাপ হত। সারাদিন গা ম্যাজ-ম্যাজ, ঘুম-ঘুম, অস্বস্তি। কপালক্রমে আমার বিয়ে হয়েছিল এক ধার্মিক পরিবারে। ধর্ম ব্যাপারটা আমি দুচোখে দেখতে পারি না। আমার বাপের বাড়িতে অবশ্য একটু লক্ষ্মীর পট, কালীর ছবি, বালগোপাল বা শিবলিঙ্গ দিয়ে একটা কাঠের ছোট্ট ঠাকুরের সিংহাসন ছিল, এবং তার সামনে ঠাকুমা রোজ একটু ফুল জল বাতাসাও দিত। কিন্তু ঐটুকুই। আমাদের আর কারো ধর্মীয় ব্যাপারে কোনো উৎসাহ ছিল না। বড় জোর বৃহস্পতিবার পাঁচালী পড়ত মা, শনিবারে কোনো কোনোদিন লুট দেওয়া হত। কিন্তু এ সবই ছিল দায়সারা। আমাদের ঠাকুরঘরটাই ছিল শোওয়ার ঘর। সেই ঘরে সবাই জুতো পরেই ঢুকতো আর ঠাকুরের সিংহাসনের বাঁ দিকে যে আলনা ছিল তার নিচের তাকে জুতো রাখত সবাই। বাবার গলায় পৈতা বলে কোনো বস্তু ছিল না, আমার দাদা বা ভাইদের কারোই পৈতে টৈতে হয়নি। আমাদের কুলগুরু বংশের শেষ গুরু ছিল কেশব ভট্টাচার্য। আমার বয়স যখন তের তখন কেশবের বয়স হবে বড় জোর পঁচিশ ছাব্বিশ। সে লোকটা ছিল ডাকপিওন। মাঝে মধ্যে সে আমাদের বাড়ি এলে আমরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করতাম। সে কুলগুরুর তোলা আদায় করতে বেরোতো। যদিও তার শাস্ত্রজ্ঞান ছিল না, তার কাছে ঠাকুমার পর আর কেউ মন্ত্র নেয়নি। কিন্তু ঠাকুমা তাকে ভীষণ শ্রদ্ধাভক্তি করত, ঐ পুঁচকে কেশবের পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে অনেকক্ষণ ধরে পায়ের

ধুলো নিত, নিজে উপোস থেকে সারাদিন রান্নাবান্না করে কেশবকে খাওয়াত, মোটা দক্ষিণা দিত, পালে পার্বণে ধুতি চাদর দেওয়া তো ছিলই। বলতে কি, কেশব বেশ সুপুরুষ ছিল। নাদুস নুদুস চেহারা, ফর্সা রঙ, চোখদুটো খুব বড় বড়। কিন্তু সে সাজতে জানত না, সাদামাটা ধুতি, ময়লা পিরান, খোঁচা দাড়ি নিয়ে আসত। সে এসে খুব তাকিয়ে দেখত আমাকে। আমরা যদিও তাকে নিয়ে হাসাহাসি করতাম, সে কিছু মনে করত না। মান-অপমান বোধ তার খুবই কম ছিল। বরং সে মাঝে মাঝে ভ্যাবলার মতো হাসত। ধর্মের কথা সে জানতও না, বলতও না। সে এলেই আমার দাদা অভিজিৎ চেঁচিয়ে বলত—ঐ কেশবশালা এসেছে মাসকাবারী নিতে। ও কেশব, আজ আমাদের জামাকাপড় কেচে দিয়ে যাবি, বাসন মেজে দিয়ে যাবি। শুনলে ঠাকুমা রাগারাগি করত, কিন্তু কেশব নির্বিকার। সে বরং কখনো সখনো এমন কথাও বলত—দূর শালা, গুরুগিরির বড় ঝামেলা। সব জায়গায় লোক হুড়ো দেয়।

আমি বাসি কাপড় ছাড়তাম না, পায়খানার কাপড় পালটাতাম না, এঁটোর বিচার ছিল না। ভাত খেতে বসে আমরা সবাই বরাবর বাঁ হাতে জল খেয়েছি। বাবা শুয়োর গরুর মাংস খেতেন, হুইস্কি টুইস্কি তো ছিলই। আমরা এই পরিবেশে মানুষ হয়েছি। শ্রীরামপুরে গঙ্গার ধারে আমাদের আদি বনেদী বাড়ি। সেইখানে জন্মে আমরা বড় হয়েছি। কোনদিন অভাব টের পাইনি। যদিও আমাদের বংশগৌরব আর উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পত্তি সবই শেষ হয়ে গিয়েছিল, তবু আমাদের অসুবিধে ছিল না। বাবা ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন, অনেক টাকা সাধু ও অসাধু উপায়ে আয় করতেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ মানতেন না।

আমাদের পুরোনো বাড়িটার নাম আমরা দিয়েছিলাম 'বার্ড'স হাউস'। প্রকাণ্ড এজমালি বাড়িটায় যে আমাদের কত দূর ও নিকট সম্পর্কের শরিকেরা বাস করতেন তার আদমসুমারি হয়নি। সারাদিন অত লোকের আর মেয়েছেলের চেঁচামেচিতে বাড়ি থাকত সরগরম। শরিকের ঝগড়া তো ছিলই। কার ভেজা কাপড় কার গায়ে লাগল, কে তার সামনের বারান্দায় টিন দিয়ে ঘিরে নতুন ঘর তুলবার চেষ্টা করছে, কে তার ভাগের জায়গায় বাচ্চাকে হিসি করিয়েছে—এই সব সমস্যা অহরহ সকলের মাথা গরম করে রাখত।

শোনা যায়, আমার বাবা যৌবন বয়সে খ্রীস্টান হয়েছিল। কিন্তু গোটা ধর্মের প্রতি তাঁর এমন বিরাগ ছিল যে শেষ পর্যন্ত খ্রীস্ট ভজনাও তাঁর হয়ে ওঠেনি। আমাদের সেই বিশাল এজমালি বাড়িতে আমরা মোটামুটি একঘরে হয়েই ছিলাম, অন্য সবাই আমাদের ম্লেচ্ছ বলে এড়িয়ে চলত।

'আমার একুশ বছর বয়সের সময় বিয়ে হয়। বিয়ে হল এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে। তাঁরা শ্রীহট্ট জেলার লোক, চৈতন্যদেবের ভক্ত। আমার স্বামী যদিও খুব বড় চাকরি করতেন না, তবু তাঁদের পরিবারটা বেশ সচ্ছল ছিল। আমার স্বামী জয়দেব চক্রবর্তী স্মল স্কেল এণ্ড কটেজ ইণ্ডাস্ট্রীর অফিসার ছিলেন। ছোটোখাটো চেহারা, বেজায় ভালোমানুষ, তবে কখনো কখনো তাঁকে বদরাগী বলে মনে হত। স্বামী সম্পর্কে 'আপনি' 'আজ্ঞে' করে বলছি, সেটা খুব ভাল লাগছে

boiRboi.net

না। বরং বলি জয়দেব লোকটা ভালই ছিল। কিন্তু সে যতখানি সুপাত্র ছিল, তার চেয়ে বোধহয় তুলনামূলকভাবে আমি আরো ভাল পাত্রী ছিলাম। চেহারার জন্য আমার খ্যাতি ছিল সর্বত্র। লোরেটো স্কুলে আমি কিছুকাল পড়েছি। কিন্তু আমার চরিত্রের সুনাম ছিল না বলে সেই স্কুল ছাড়তে হয়। পরে আমি একটা সাদামাটা স্কুল থেকে পাশ করি। তাহলেও আমি গড়গড় করে ইংরিজি বলতে পারতাম, নাচে গানে ছিলাম চমৎকার, অভিনয়ে সুনাম ছিল। সোজা কথায়, গৃহকর্ম করে জীবন কাটানোর জন্য আমি তৈরি হইনি। তেরো চৌদ্দ বছর বয়স থেকেই আমার নানারকম লঘু যৌন অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এবং লোরেটোতে পড়বার সময়ে আমি যখন ক্রীক রোতে এক মাসীর বাড়িতে থাকতাম তখনই আমার কয়েকবার সম্পূর্ণ যৌন অভিজ্ঞতা ঘটে যায়। আর, এজন্য কখনোই আমার কোন অনুশোচনা বা প্রতিক্রিয়া হয়নি, কারণ ছেলেবেলা থেকেই আমাদের পরিবারের ঢিলাঢালা নৈতিক পরিবেশে আমি মানুষ। আমার মা খুব উঁচু সমাজের মেয়ে, বাবাও উচ্চাভিলাষী এবং নৈতিক আদর্শবোধ থেকে মুক্ত ছিলেন। কাজেই আমরা শরীরকে শরীর ভাবতেই শিখেছি, তার সঙ্গে, মন বা বিবেককে মেশাইনি। এমন কি আমার যৌবন প্রাপ্তির পর বাবাও অনেক সময়ে আমাকে ফচ্‌কেমি করে জিজ্ঞেস করেছেন—কি রে মেয়ে, কটা ছেলের বুকে ছুরি মেরেছিস? অর্থাৎ আমরা খুবই উদার পরিবেশে বড় হয়েছি। আমার বড় দাদা, বাবা এবং মার সামনেই সিগারেট খেত। সে কিছু রোগা ছিল বলে প্রায়ই তাকে বলতেন—তুই মাঝে মাঝে বীয়ার খাস, তাতে শরীরটা অনেক ফিট থাকবে। উত্তরে আমার দাদা অভিজিৎ বলত—দূর, বীয়ার আমার পোষায় না, আমার প্রিয় ড্রিঙ্ক হচ্ছে হুইস্কি।

আমি সুন্দরী ছিলাম, নইলে ঐ গোঁড়া পরিবারে আমার বিয়ে হত না। কিন্তু বিয়েটা যে কেন হয়েছিল সেটা আমি আজও ভেবে পাই না। প্রথম কথা, ওর চেয়ে ঢের ভাল বিয়ে আমার হওয়ার কথা। দ্বিতীয়তঃ আমাদের দুই পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গীর এত পার্থক্য যে বিয়ের প্রস্তাবই উঠতে পারে না। তবু হয়েছিল। একদিন কলকাতা থেকে বোধহয় কিছু মার্কেটিং করে দাদার সঙ্গে লোকাল ট্রেনে ফিরছিলাম, তখন বেলা এগারোটা হবে। ট্রেন ফাঁকা, আর একটা ফাঁকা কামরায় জয়দেবের বাড়ির লোকজন—মা, পিসি, জ্যাঠা গোছের সবাই যাচ্ছে তারকেশ্বরে। আমি তাদের পাশেই বসেছিলাম। বিধবা পিসি আমার দিকে কয়েকবার তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন—আহা মা, বড় সুন্দর দেখতে গো তুমি? কোথায় থাকো বাছা?

এইভাবে পরিচয়। তারপর বলতে কি তাদের বাড়ি থেকেই লোকজন এসে খোঁজখবর করল, বিয়ের প্রস্তাব দিল। ভাংচি দেওয়ার লোকও ছিল এজমালি বাড়ির শরিকদের মধ্যে। তারা গিয়ে পাত্রপক্ষকে গোপনে জানিয়ে এল যে বাবা খ্রীস্টান, আচার বিচার মানে না, আমাদের চরিত্র খারাপ। কিন্তু তাতে আটকাল না। আমাকে তাদের বড় বেশী পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। বিয়েটা ভেঙে গেলে অবশ্য ভালই হত। আমার মায়ের অনিচ্ছা ছিল, শুনেছি জয়দেবের বাবারও আপত্তি ছিল। জয়দেবের বাবা গুজবগুলিকে উড়িয়ে দিতে পারছিলেন না। কিন্তু তাঁর বোন,

অর্থাৎ জয়দেবের পিসিই তাঁকে বুঝিয়ে রাজি করিয়েছিলেন। অন্য দিকে আমার বাবা হঠাৎ তাঁর হিসেবীবুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে নীতিহীনতা ও অনাদর্শ দিয়ে তিনি তাঁর মেয়েকে মানুষ করেছেন সেগুলি মেয়ের বিয়ের সময়ে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়াবে। বিশেষতঃ, আমাদের তো শত্রুর অভাব নেই। তাই বাবা হঠাৎ বিয়ের প্রস্তাব পাওয়ার পর থেকেই তাঁর স্বভাববিরুদ্ধভাবে আমাকে বিয়েতে রাজী করালেন, দীর্ঘ আলোচনার পর। মায়েরও মত হল। এবং সে সময়েই মা আমাকে গোপনে জিজ্ঞেস করে জেনে নেন যে আমি সত্যিকারের কুমারী আছি কিনা। তাঁর কোনো কারণে সন্দেহ হয়ে থাকবে। আমি অবশ্য স্পষ্ট জবাব দিইনি। কিন্তু মায়েরা তো বোঝে।

জয়দেবকে আমি খুব নিরাসক্তভাবে বিয়ে করি। পাত্র আমার পছন্দ ছিল না। ছোটোখাটো চেহারার পুরুষ এমনিতেই আমি দেখতে পারি না, তার ওপর তার আবার নানারকম নৈতিক গোঁড়ামি ছিল। সেগুলো আরো অসহ্য। যেমন, বিয়ের কয়েকদিনের মধ্যে সে শারীরিক দিক দিয়ে আমার সঙ্গে মিলিত হয়নি। যেদিন হল, সেদিন মিলনের আগে সে আমার কুমারীত্ব পরীক্ষার চেষ্টা করেছিল। অবশ্য কিভাবে পরীক্ষাটা করেছিল তা আমি বুঝতে পারিনি তখন, পরে বুঝেছিলাম। কিন্তু এটা কোন মেয়ে আজকাল সহ্য করবে?

পরীক্ষা করে অবশ্য সে বুঝতে পেরেছিল যে আমি কুমারী নই। আর আমিও তার বাতিক দেখে বুঝতে পেরেছিলাম যে এ লোকটা স্বামী হওয়ার উপযুক্তই নয়। কি করে যে ও আমার সঙ্গে, আর আমি ওর সঙ্গে ঘর করব সেটা বিয়ের পরেই আমাদের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

শ্বশুর বাড়িতে আমার নতুন নামকরণ হল, লতিকা। এটা ওদের বাড়ির নিয়ম, নতুন বৌ এলে ওরা তার নাম পাল্টে নতুন নাম রাখে। এতে আমার আপত্তি ছিল। হুট বলতে কোন যে কেউ আমার জন্মাবধি নিজস্ব নামটা বাতিল করে দেবে। আমি যে নিজেকে বরাবর অলকা বলে জানি। অচেনা লতিকা আমি হতে যাবো কোন দুঃখে? আমি খুব লাজুক মেয়ে নই, ভীতুও নই, তাই শ্বশুরবাড়ির নিয়মকানুনগুলোর বিরুদ্ধে কিছু মতামত প্রকাশ করেছিলাম। এটা ওরা ভাল চোখে দেখেনি। জয়দেবকে নাম বদলানোর ব্যাপারটা বলতেই ও খুব বিরস মুখে বলল—তোমার নামধাম বদলে ফেলাই ভাল।

—কেন? আমি চমকে উঠে প্রশ্ন করলাম।

—তোমার অতীতটা খুব ভাল নয় তো, তাই।

আমি স্তম্ভিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—আমার অতীত কি খারাপ?

—খুব।

—কি করে বুঝলে?

জয়দেব তার বোকা এবং ভাবলেশহীন চোখে চেয়ে বলল—যারা বোঝে তারা ঠিক বোঝে।

আমি কি বলব ওকে, কি বললে ওর চূড়ান্ত অপমান হয় তাই ভাবছিলাম। ও আমাকে বলল—কেন, তুমি কি জানো না?

boiRboi.net

—কি জানার কথা বলছ ?

—তুমি যে খারাপ !

সাধারণ বাঙালী মেয়েদের মতো আমার হুট্ করে চোখের জল আসে না। বরং সে সব পরিস্থিতিতে আমার একরকমের পুরুষের রাগের মতো রাগ হয়, থাপ্পড় কষাতে ইচ্ছা করে।

অবশ্য জয়দেবকে আমি থাপ্পড় কষাইনি, শুধু বলেছি—না, আমি খারাপ বলে নিজেকে জানি না। বরং মানুষকে যারা সাদা মনে গ্রহণ করতে পারে না তাদেরই খারাপ বলে জানি।

জয়দেব গম্ভীর হয়ে বলল—মানুষকে সাদা মনে গ্রহণ করব ! কেন ?

—কেন করবে না ?

—কেন করব ? মানুষ নিজের সম্পর্কে যা বলে তা কি সব সময়ে সত্যি হয় ?

—নাই হল। ভালমন্দ মিশিয়েই মানুষ, মানুষ হওয়াটাই তার যোগ্যতা।

জয়দেব একটু হাসল। কিন্তু সে ঠিক হাসি নয়। বরং হাসির মুখোশে ঢাকা নিষ্ঠুরতা।

সে বলল—এই যে তুমি, তোমার কথাই যদি ধরা যায়, নিজের সম্পর্কে বলছ যে তুমি খারাপ নও। কিন্তু তোমার শরীর বলছে যে তা নয়।

—আমার শরীর কি বলেছে তোমার কানে কানে ?

—বলেছে যে বিয়ের সময় তুমি কুমারী ছিলে না।

এই প্রথম, বিয়ের এক মাসের মধ্যেই ও স্বীকার করল যে ও আমাকে পরীক্ষা করেছে। শুনে আমি তো ভীষণ অবাক। এসব যে বোঝা যায় তা আমার জানা ছিল না।

বললাম—গাধার মতো কথা বলো না, তোমার মতো সন্দেহবাতিক যাদের তারা বিয়ে করে কোন মুখে ?

জয়দেব মুখ কঠিন করে বলে—যাদের বাতিক নেই তারাই বোকা, যারা মানুষকে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করে তারাই অবিবেচক।

—তুমি কি করে বুঝলে যে আমি কুমারী ছিলাম না। তুমি কি ডাক্তার না হঠযোগী ?

জয়দেব বলে—ডাক্তার বা হঠযোগী হওয়ার দরকার হয় না। একটু সন্ধিৎসু হলেই চলে, আর একটু বুদ্ধিমান হলেই হয়। কেন, তুমি কি অস্বীকার করতে চাও ?

—নিশ্চয়ই। তুমি পিশাচের মতো কথা বলছ।

—না। শোনো, শরীর পরীক্ষা করে সবই বোঝা যায়। তুমি হয়তো জানো না, আমি জানি।

—তুমি ছাই জানো। তুমি পাগল, তোমার বাড়িসুদ্ধ পাগল। আমার খুব ভুল বিয়ে হয়েছে, বুঝতে পারছি।

জয়দেব রেগে গেল না। খুব রাগী মানুষ জয়দেব ছিলও না। ওর রাগ খুব ঠাণ্ডা আর দৃঢ়।

boiRboi.net

ও বলল—বিয়ে যে ভুল হয়েছে তাতে সন্দেহ কি। পিসিমার জন্যই হল। কিন্তু হয়ে যখন গেছেই তখন এটাকে যতদূর সাকসেসফুল করা যায় সেটা দেখাই আমার লক্ষ্য।

আমি মাথা নেড়ে বললাম—না, সন্দেহ দিয়ে শুরু হলে বিয়ে সাকসেসফুল হয় না। তার চেয়ে সম্পর্ক ভেঙে ফেলাই ভাল।

জয়দেব এই প্রথম একটু ভয় পেল যেন, একটু চঞ্চল হয়ে বলল—এ তো সাহেব রাজত্ব নয় যে যখন তখন বিয়ে ভাঙা যাবে!

—সে তোমরা বুঝবে না।

জয়দেব আমার দিকে চিন্তিতভাবে চেয়ে বলল—শোনো, সাহেবদের দেশে একটা মানুষের সঙ্গে একটা মেয়েমানুষের বিয়ে হয়, বিয়েটা সেখানে ব্যক্তিগত ঘটনা, তার সঙ্গে পরিবার বা সমাজের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের দেশে তো তা নয়।

—তত্ত্বকথা শুনতে আমার ভাল লাগে না। তুমি যদি অত বড় অপমানটা আমাকে না করতে তাও না হয় হত। আমি ওসব বুঝি না, বুঝবোও না।

—তোমাকে একটু বুঝতেই হবে যে। বলতে গিয়ে জয়দেবের স্বর যথেষ্ট নরম হয়ে এল। তার মুখচোখে ভীতু-ভাবও একটু ফুটে উঠল কি?

আমি শুনতে চাইছিলাম না। উঠে চলে আসছি, জয়দেব তাড়াতাড়ি এসে আমার হাত ধরে ফেলল। ঝনাৎ করে নতুন চুরি শাঁখায় ভরা হাতটা শব্দ করে উঠল। আমি হাত টেনে বললাম—ছেড়ে দাও।

সেও হাত ধরে রেখে বলল—একটু শোনো, দুটো কথা......

ও ছোটোখাটো মানুষ, আমার হাত ধরে আটকে রাখার মতো যথেষ্ট গায়ের জোরই ওর নেই। নেচে কুঁদে বরং আমার গায়েই সেই আধা পুরুষটা দুহাতে আমার কোমর জাপটে ঝুলে পড়ল, বলল—যেও না। শুনে যাও।

ওর পা থেকে কোমর অবধি মেঝেয় লুটোচ্ছে, ঊর্ধ্ব অঙ্গ ঝুলছে আমার কোমর ধরে, হাস্যকর দৃশ্য। কিন্তু আমার হাসি পায়নি। ওর ঐ সর্বস্ব দিয়ে ঝুলে থাকা টানে হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে যেতে যেতে আমি ওর মুখে থাবড়া দিলাম কয়েকটা। ও তবু ছাড়ল না। আমি টাল সামলাতে না পেরে থপ্ করে বসে পড়লাম মেঝেতে। দরজা অবশ্য বন্ধ ছিল, তখন ছুটির দিনের দুপুরবেলায় বাড়ির বেশীর ভাগ লোকই ঘুমোচ্ছে, তাই কথাবার্তা শুনে কেউ কৌতূহলী হতে পারে তো! বিশেষ করে জয়দেব এসব ব্যাপারে খুব খুঁতখুঁতে ছিল। দিনের বেলায় সকলের সামনে আমার সঙ্গে কখনো কথা বলত না। বিয়ের একমাসের মধ্যেও দুপুরবেলা কখনো শারীরিক ভাবে মিলিত হয় নি। সে নাকি শাস্ত্রে বারণ আছে। অসহ্য। অবশ্য মিলিত হয়েও সে যে আমাকে সুখী করতে পারত এমন নয়।

যাই হোক, দুজনে এক অস্বাভাবিক কুস্তির প্যাঁচ কষে যখন বসে বা শুয়ে আছি তখন জয়দেব আমাকে এইভাবে ধরে থেকে বলল—রাগ করে বুদ্ধি হারিও না। বিয়ে ব্যাপারটাকে আমরা সামাজিক কর্তব্য হিসেবে মনে করি, তাতে দুই পরিবারের মান মর্যাদাও জড়িত। তাই বলি হঠাৎ ডিভোর্সের কথা চিন্তা করে সব ভণ্ডুল

কোরো না।

—আমাকে চিন্তা করতেই হবে। আর চিন্তাই বা কি, আমি ঠিক করে ফেলেছি।

জয়দেব কোমর ধরে পড়ে আছে। সুযোগ বুঝে সে হঠাৎ আমার কোলের মধ্যে মাথা গুঁজে দিয়ে বলল—তাতে তোমার আমার কারো সম্মান বাড়বে না। লোকে ছি ছি করবে।

সেই মুহূর্তে জয়দেবকে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলাম। লোকটার কিছু দুর্জয়, কুসংস্কার আর লোকলজ্জা আছে, যার জন্য ও আমার সব কলঙ্ককেও হজম করে যাবে। এটা বুঝে আমি আর একটু চাপ সৃষ্টি করার জন্য বললাম—তাহলে বলো, কি করে বুঝলে যে আমি কুমারী নই।

জয়দেব ভীত চোখে চেয়ে রইল একটুক্ষণ, তারপর আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে থেকেই হঠাৎ চোখ বুজে বলল—আমার ভুল হতে পারে অলকা।

—তার মানে?

—তার মানে কুমারীত্ব পরীক্ষার কোনো নিশ্চিত উপায় নেই।

—তবে বললে কেন?

—দেখলাম, তুমি স্বীকার করো কিনা।

আমি মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের জন্মগত কিছু বুদ্ধি তো থাকেই। এই বোকাটা কি করে ভাবল যে আমি স্বীকার করব? আমি বললাম—কি স্বীকার করব?

জয়দেব হঠাৎ খুব বদলে গিয়ে বলল—আমাকে ক্ষমা করো।

বলতে নেই, সেই ক্ষমা প্রার্থনার কারণটা ছিল প্রবল কামেচ্ছা। হঠাৎ ঐ রাগারাগি থেকে শারীরিক টানাটানির ফলে পরস্পরের নৈকট্য, ঘন শ্বাস, দেহগন্ধ, স্পর্শবিদ্যুৎ—সব মিলেমিশে এক প্রবল চুম্বকের ক্ষেত্র তৈরি করে দিল। দেহ-অভিজ্ঞতা তো তখনো আমাদের নতুন, তাই সামলাতে পারল না জয়দেব। ঝগড়াটা শরীরের মিলন দিয়ে শেষ হল।

আবার হলও না।

প্রভাসরঞ্জন

সুইস এয়ারের যে উড়োজাহাজে আমি ফিরছিলাম তাতে খুব একটা ভীড় ছিল না। জানালার ধারে এক জার্মান বুড়ি, তার পাশে এক বুড়ো, পরের সীটটায় আমি। বুড়োর হাতে আর্থরাইটিসের ব্যথা, তাই বুড়ি বুড়োকে কফি কাপ ধরে ধরে খাইয়ে দিচ্ছিল, খাবার মুখে তুলে দিচ্ছিল। বুড়োর মুখেও বোধহয় প্যারালাইসিসের ছোঁয়া আছে। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে সুপ গড়িয়ে পড়ে, মাংসের টুকরো হড়াৎ করে কোলের ওপর পড়ে যায়। ন্যাপকিন তুলে বুড়ি বার বার মুখ মুছিয়ে দেয়, আর আমার দিকে অপ্রতিভ হাসি হেসে চেয়ে কেবলই ক্ষমা চায়। বুড়োর কাঠামোটা বিশাল, এক সময়ে যৌবনকালে দাঙ্গাহাঙ্গামা করত বোধহয়। এখন বয়সে বড় জব্দ। কথা জড়িয়ে জড়িয়ে যায়, খুব জোরে শিস দেওয়ার মতো শব্দ করে শ্বাস ছাড়ে। অনবরত সেই

শব্দে প্রেসারাইজড আবহাওয়ার উড়োজাহাজের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে পড়তেও আমি জেগে উঠি। বিরক্ত হই। বুড়ো আমার দিকে একটু একটু অপরাধবোধ নিয়ে তাকায়। বুড়ো বুড়িকে আমার খারাপ লাগছিল না। বেশ ভালবাসা দুজনের। আমার জার্মান বৌ সিসি আমাকে খুব ভালবাসত, যদি বিয়েটা টিঁকত আর আমরা এরকম বুড়ো হতাম, তবে কি তখনো আমার জন্য এতটা করত সে ?

সিসির কথা একটু একটু ভাবছিলাম। ফ্রাংকফর্টে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। জার্মান মেয়েদের মতো গায়ে গতরে বিশাল ছিল না, বেশ একটু নরম-সরম ছোটো মাপের চেহারা। রোগাটে, সাদাটে, ভাবালু। খুব ভুলো মন ছিল তার। সেই সব দেখে আমি ঝপাং করে তার প্রেমে পড়ে গেলাম। সে তো পড়লই, যৌবনকালে ওরা বড় বেশী প্রেমে পড়ে। পরিচয়ের পর প্রেম হওয়ারও আগে আমরা এক বিছানায় বিস্তর শুয়েছি। যাকে ফুর্তিবাজ বলে আমি ঠিক তা নই। বিদেশে মেয়েদের গা-দেখানো এবং গায়ে পড়ার প্রবণতা এত বেশী ছিল যে সেখানে তাদের জলের মতো ভোগ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমারও এরকম অভিজ্ঞতা কিছু ঘটেছিল। সিসি তাদের মধ্যেই একজন। একসঙ্গে কিছুদিন থাকার জন্য ভূমিকা-টুমিকা করতে হয়নি। এবং কিছুকাল থেকে সরে পড়াতেও বাধা ছিল না। ফ্রাংকফর্টে আমার পনেরো দিনের ভ্রমণ শেষ করে দেশে ফেরবার আগের দিন অবধি আমি সিসির এক ঘরের ছোট্ট বাসায় ছিলাম। থাকার খরচটা আমার বেঁচে যাচ্ছিল। ওকে আমার পছন্দও হচ্ছিল খুব। আসার দিন সকালে ঘুম থেকে ভাল করে ওঠার আগে বিছানাতেই ওকে আমি বিয়ের প্রস্তাব দিই। ও খুব হেসে বলল—ঠিক এরকম ভঙ্গীতে আর কেউ কাউকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে বলে আমি জানি না। সিসি কিন্তু প্রস্তাব পেয়ে ভীষণ খুশী। ওর জীবনে সেটাই প্রথম প্রস্তাব। সেই দিনই রেজিস্ট্রি করে আমি ব্যলে চলে আসি। দেড় মাস পর সিসিও এল, আমরা দুজনে বেশ একটু কষ্ট করে থাকতাম। কারণ, ও এসে প্রথম প্রথম চাকরি পায় নি। তার ওপর গর্ভবতী। চাকরি পেলেও করতে পারত না। ও তখন রক্তাল্পতায় ভুগছে, সঙ্গে আনুসঙ্গিক নানা অসুস্থতা। আমার বেতন খুব বেশী ছিল না, সিসির চিকিৎসা আর যত্নের জন্য পুরো টাকাটা বেরিয়ে যেত। মাস চারেক পর একটু সুস্থ হয়ে সে ফিরে গেল ফ্রাংকফর্টে, আবার কদিন পর এল। আমিও যেতাম। ব্যলেই অবশেষে সে চাকরি পায় আমার কোম্পানীতেই। যথাসময়ে আমাদের এক পুত্রসন্তান হয়। তার গায়ের রঙটা আমার রঙ ঘেঁষা বটে কিন্তু দুরন্ত ইউরোপীয় রক্ত শরীরে বইছে, বিশাল ছেলেটা জন্মেই জার্মানদের মতো গাঁক গাঁক চিৎকার করে কাঁদতে থাকে।

ছেলেটা যখন মাস চার পাঁচেকের হল তখন সে আমার অতি আদরের ধন। বড়সড় চেহারা, কান্নাকাটি নেই, আমার কোলে উঠলে খুব চেঁচাত আনন্দে। অবিকল কাকাতুয়ার মত শব্দ করত সে উত্তেজনার সময়ে। টি ভি দেখতে খুব পছন্দ করত, কি কারণে জানি না লাইটার বা দেশলাই জ্বাললে খুব ভয় পেত। এরোপ্লেনের আওয়াজ শুনলেই কাঁদো কাঁদো মুখ হয়ে যেত। তার চার মাস বয়সে রঙ অনেক ময়লা হয়ে গেল, দাঁত উঠবার সময়ে বেশ রোগাও হয়ে গেল সে। তার প্রিয় খাবার ছিল মিষ্টি, চকোলেট বা ক্যান্ডি পেলে মুখের নাল দিয়ে মাখামাখি করে ঘোঁৎ ঘোঁৎ

করে চুষতে ভালবাসত। সে বেশ বড়সড় বাচ্চা ছিল, তবু তাকে দেখলেই বোঝা যেত যে সে ভারতীয়ের সন্তান, মুখে সিসির আদল থাকা সত্ত্বেও।

তার যখন পাঁচ মাস বয়স তখনই সিসি আর আমি আলাদা হওয়ার মনস্থ করি। আমার দিক থেকে ব্যাপারটা ছিল মর্মান্তিক, বাচ্চাটাকে ছেড়ে কি করে থাকব! সিসিও জার্মানীতে ফিরে যাওয়ার জন্য এবং ভিন্ন জীবনের জন্য খুবই উদ্‌গ্রীব। আমার মতো নিস্পৃহ এবং কম আমুদে লোককে সে সহ্য করতে পারত না! যেমন আমি পারতাম না তার অতি উচ্ছল ও খানিকটা নীতিবিগর্হিত চলা ফেরা। আমার ভিতরে এক তেমাথাওলা ভারতীয় গেঁয়ো বুড়োর বাস। সে কেবলই সতী-অসতী, ভাল-মন্দ, নীতি-অনীতি বিচার করে যায়। কতবার তার মুখে হাতচাপা দিতে গেছি, থামাতে পারিনি। অশান্তির শুরু সেখানেই! এক সময়ে আমার এও মনে হয়েছিল, সিসি চলে গেলেই বাঁচি, দেশে ফিরে একজন বাঙালী মেয়ে বিয়ে করে সুখে থাকব।

কিন্তু ছেলেটাই মস্ত বাধা।

আমার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না, আগেই বলেছি। সেটাও এই বিচ্ছেদের আর একটা কারণ। উপরন্তু সিসির বাবা মা বার্লিন থেকে তাকে ক্রমাগত চিঠি দিচ্ছিল ফিরে যাওয়ার জন্য। সিসি একটা মস্ত ভুল করেছে, তাদের ধারণা। সব মিলিয়ে একটা ঘোঁট পাকাল।

তারপর বিচ্ছেদ। ছেলের নাম রেখেছিলাম নীলাদ্রি। পরে সেই নাম সিসি বদলে দিয়েছিল কিনা জানি না। নীলুর জন্য আজও আমার মন বড় কেমন করে।

নীলু তার মার সঙ্গে জার্মানীতে ফিরে গেছে, আর আমার সঙ্গে তার দেখা হবে না! দেখলে চিনবেও না তেমন করে। এতকাল ইউরোপে তবু তার কাছাকাছি ছিলাম। উড়োজাহাজ যখন উড়িয়ে আনছিল আমাকে পুবের দিকে তখন কেবল মনে হচ্ছিল, নীলুর কাছ থেকে কত দূরে সরে যাচ্ছি।

পাশের বুড়োটা আমার হাঁটুতে হাত রাখল হঠাৎ। তন্দ্রা ভেঙে চমকে উঠি। তাকাতেই বুড়ো নাকের বাঁশি বাজিয়ে জড়ানো গলায় কি যেন বলে। আমি অস্পষ্ট শুনতে পাই—হাইজ্যাক!

ততক্ষণে বুড়িও সটান উঠে বসেছে। বুড়িও বলল—হাইজ্যাকারস্!

আন্তর্জাতিক বিমানে আজকাল সবসময়েই হাইজ্যাকের ভয়। বিমানের দুর্ঘটনার ভয়ের চেয়ে এই ভয় কিছুমাত্র কম নয়। কোথায় কোন গেরিলা বা লিবারেশন আন্দোলনের বিপ্লবী পিস্তল-বোমা নিয়ে উঠে বসে আছে কে জানে! মধ্যপ্রাচ্যে, আফ্রিকায়, ল্যাটিন আমেরিকায় সর্বত্রই গভীর অসন্তোষ। দেশপ্রেমিক বা ভাড়াটে গেরিলা সর্বত্রই বিরাজ করছে। কখন কোন বিমানকে ভয় দেখিয়ে তারা অজানা ঠিকানায় উড়িয়ে নিয়ে যায়, মুক্তিপণ হিসাবে কতকজনকে আটকে রাখে বা হত্যা করে তার কোনো ঠিক নেই। তাই আজকাল আন্তর্জাতিক বিমানে উঠলে অনেকেরই বুক একটু ধুকপুক করে।

তাই বুড়ো বুড়ির চাপা আর্তনাদ শুনে চমকে উঠে তাকিয়ে সামনের তিন সারি দূরত্বে একজন আরবকে দেখতে পাই। অবশ্য সে আরব কিনা তা বলা খুবই মুশকিল, তবে সে যে মধ্যপ্রাচ্যের লোক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গাল ও থুতনি জুড়ে চাপা

দাড়ি। চমৎকার মোটা গোঁফ। বাচ্চা একটা হাতির মতো তার বিশাল চেহারা। তাকে কয়েকবারই টয়লেটের দিকে যেতে দেখেছি উড়োজাহাজে ওঠার পর থেকে। পেটের রোগ, বহুমূত্র বা বাতিক না থাকলে অতবার কেউ বাথরুমে যায় না। কিন্তু তখন তাকে সন্দেহ হয়নি। এখন দেখি, কাঁধে একটা এয়ার ব্যাগ নিয়ে সে দাঁড়িয়ে পিছু ফিরে এক দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার কাঁধ থেকে স্ট্র্যাপে এয়ার ব্যাগটা ঝুলছে, ব্যাগের চেন খোলা, তার বাঁ হাতটা ব্যাগের মধ্যে ঢোকানো। খুবই সম্ভব, সে ব্যাগের মধ্যে গুপ্ত গ্রেনেড বা পিস্তল ছুঁয়ে আছে, এবং পিছনের দিকে তার কোনো সহ-গেরিলার দিকে তাকিয়ে নিচ্ছে—সব প্রস্তুত কিনা।

একটু আগেই নীলুর কথা ভেবে আমার চোখে জল আসছিল। ছেলেকে ইউরোপে রেখে আমি চলে যাচ্ছি। তার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না, আমার পরিচয় তার জীবন থেকে মুছে যাবে, আমরা সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়ে যাবো পরস্পরের কাছে। অথচ সে আমারই বীজ, আমার শরীর থেকে তার অস্তিত্বের জন্ম। এতখানি আমাদের আত্মিক সম্পর্ক, তবু সে আজ আমার কেউ না। খুবই শিশু অবস্থায় সে আমার কাছ থেকে চলে গিয়েছিল, সেই বয়স পর্যন্ত তার হাবভাব, হাসা-কাঁদা, অবোধ শব্দ সবই আমার ভিতরে টেপ রেকর্ড করা আছে। স্মৃতির বোতাম টিপে দিলেই টেপ রেকর্ড বাজতে থাকে। সবই মনে পড়ে। আমার মাথার ভিতর থেকে একটা প্রোজেকটার মেশিন চোখের পর্দার ওপরে তার সব চলচ্চিত্র ফেলতে থাকে। ছেলেটাকে কিছুতেই ভুলতে পারি না, অধিকারবোধ ছাড়তে চায় না। নীলু আমার ছেলে—এই বাক্যটা ধ্রুবপদের মতো মনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ফেরে। একটা অসহায় ভালবাসা বাৎসল্য আমাকে খুবই উত্তেজিত এবং অবসন্ন করে দেয়। দেশে ফিরে যাচ্ছি, সেখানেও আমার জন্য কোল পেতে কেউ বসে নেই। আদরে আহ্লাদে আমার দুঃখ ভুলিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। ছেলেবেলা থেকেই আমাদের পরিবারে ভালবাসার চাষ কম দেখেছি। দুঃখে দারিদ্র্য হতাশায় আধমরা মানুষ ছিলাম আমরা, পেটের ভাতই ছিল তখন ভালবাসার চরম নিদর্শন।

বাবা মা বুড়ো হয়েছেন। সংসার প্রায় অচল। প্রথম প্রথম আমি টাকা পাঠিয়েছি। বিয়ে করার পর তাও পাঠাতে পারিনি। কিভাবে সংসার চলে তা আমার জানা নেই, জানতেও চাইনি। ওসব জানতে গেলে মন ভারাক্রান্ত হয়। তাই না জানারই চেষ্টা করেছি। বাবার চিঠিতে যে অংশে সংসারের দুঃখের বিবরণ থাকত সেই অংশ আমি বাদ দিয়ে পড়তাম। জানতাম, তাদের জন্য আমার আর কিছু করার নেই, খামোখা তবে তাদের দুঃখের কথা জেনে কি হবে!

এরোপ্লেনে বসে আমি সারাক্ষণ আমার দুটো জীবনের কথা ভাবছিলাম। স্বদেশে আমার দারিদ্র্যপীড়িত জীবন, বিদেশে আমার নানা আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতা। এর ওপর নীলুর স্মৃতি! বিদেশীর মধ্যে এত বেশী সন্তানস্নেহ বোধহয় নেই। অন্তত আমার মত পিপাসার্ত পিতৃহৃদয় আমি কারো দেখিনি। নিজের বাপ মায়ের মধ্যেও পুত্রস্নেহের কোনো বাহুল্য প্রকাশ পেত না। তাহলে আমার এই প্রবল স্নেহ এল কোত্থেকে?

পরে আমি অনেক ভেবে এর একটা উত্তর খুঁজে পাই। আসলে স্বদেশে যারা

আমার আপনজন তাদের কোনোদিনই আপন বলে মনে হয়নি। একমাত্র ছোটকাকাকে মনে হত। কেন মনে হত তা ব্যাখ্যা করা মুশকিল। কিন্তু যেই তাকে সত্যিকারের ভালবাসতে শুরু করি সেই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আবার বিদেশেও তাই। আমার ছেলেটিকে বুকে চেপে যখনই ভাবতে শুরু করি এই আমার নিজস্ব সন্তান, তখনই তার ছেড়ে যাওয়ার সময় হল।

আশ্চর্য এই, নীলাদ্রির মুখে আমার ছোটকাকার মুখের ছাপ ছিল। এও হতে পারে, স্নেহের দুর্বলতা থেকেই আমি তার মুখে কাকার আদল দেখতাম। পৃথিবীতে আমার প্রিয়জনের সংখ্যা খুব কম। বাবা মার প্রতি আমার দুর্বলতা বা শ্রদ্ধা খুব বেশী থাকার কথা নয়। শিশুকাল থেকে অভাব, আর সংসারের ভার কাঁধে বয়ে তাঁদের ওপর আমার বীতশ্রদ্ধা এসে গিয়েছিল। মনে হত, আমার কোমরে শেকল দিয়ে সংসারটা কে যেন বেঁধে দিয়েছে, যার জন্য আমার ইঞ্জিনীয়ারিং পড়া হয়নি, অনার্স ছাড়তে হয়েছিল, জীবনের অনেক সার্থকতা আমাকে বরণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু লগ্ন পার হয়ে গেল। তাই নিজের আত্মীয় স্বজনদের প্রতি আমার এক বিরূপ মনোভাবের জন্ম হয়। যখন বিদেশে সিসিকে বিয়ে করলাম তখন সাময়িকভাবে মনে হয়েছিল, এই বুঝি ভালবাসার আশ্রয় পেলাম। ভুল, খুবই ভুল সেটা। যে ভালবাসার শুরু দেহের প্রেম দিয়ে তার বিয়ে কতদূর নিয়ে যেতে পারে আমাদের! শরীর জুড়োলো তো ভালবাসা ফুরোলো। আমরা কেবল শরীর দিয়ে পরস্পরকে ভালবাসার চেষ্টা করেছি। পরস্পরের সান্নিধ্য রাখা ছিল সামাজিক কর্তব্যের মতো। সেখানে বিশাল ও ব্যাপ্ত কর্মময় জীবনে সিসিও যেমন ব্যস্ত, আমিও তেমন, তাই আমাদের পরস্পরের ওপর নির্ভরতা কমে গিয়েছিল। ভারতীয় সংস্কারবশতঃ আমি তার স্বাধীন চলাফেরা বা বহির্মুখীনতা খুব বেশী পছন্দ করতে পারতাম না। তাই সিসি নয়, কিন্তু নীলুই ছিল আমার একমাত্র অবলম্বন। তার মুখের দিকে তাকালে আমার বুক ঠাণ্ডা হয়ে যেত। তাই নীলু চলে গেলে সারা পৃথিবীতে আমার আর কেউ রইল না।

না বিদেশে, না স্বদেশে, কোথাও আমার কেউ নেই—এরকম একটা বোধ আমার বুকে পাথরের মতো জমে আছে। বিদেশে থাকার আনন্দ নেই, স্বদেশে ফেরার আনন্দ নেই। আমার মতো এমন উদ্বাস্তু কে আছে কোথায়! এরকম মনের অবস্থায় মাঝে মাঝে আমার মরতে ইচ্ছে করত। কিন্তু মরাটা জীবনে একবারই ঘটে, তাই সেই নিশ্চিত অভিজ্ঞতাটিকে আমি কিছু বিলম্বিত করছিলাম। দেখা যাক, মরবার আগে কোথাও কোনো ভালবাসা বা প্রিয়ত্বের আলো চিড়িক দেয় কিনা। তারপর আমার হাতের মুঠোয় মৃত্যু তো আছেই। এরকম মানসিকতা থেকে আমার মৃত্যুভয় কেটে গিয়েছিল। অন্ততঃ কেটে গেছে বলেই ধারণা ছিল আমার।

আরব লোকটা যখন ঐরকম একটা অদ্ভুত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে ঘুরে তার সঙ্গীকে দেখছে আর আমার পাশের বুড়োটার একটা প্রকাণ্ড কাঁপা-কাঁপা ঘামে ভেজা হাত এসে আমার কব্জি পাকড়ে ধরল, আর বাঁশির মতো শ্বাস ফেলতে ফেলতে যখন সে বারবার বলতে থাকল—'আইজ্যাক, অ্যাইজ্যাক', তখন অন্য অনেক যাত্রীও তন্দ্রা ভেঙে সচকিত হয়ে বসে পরিস্থিতি লক্ষ্য করেছে, তাদের অনেকের মুখেই ভয়ের পাঁসুটে ভাব, তখন

আমিও হঠাৎ টের পেলাম, বাস্তবিক আমি আন্তরিক ভাবে কোনদিন মরতে চাইনি। মনে হল, জীবন কত সুন্দর ও বিশাল ছিল আমার। বয়স পড়ে আছে অঢেল। এখনো চেষ্টা করলে জীবনে কত কি করতে পারি।

আরব লোকটা তার প্রচণ্ড ঘন ভ্রূ দিয়ে ভ্রূকুটি করে 'আলিজা' কিংবা অনুরূপ একটা চাপা ধ্বনি করল। সম্ভবতঃ কারো নাম। ভয়ে আমি কাঠ হয়ে গেলাম। একটু আগেই ডিনার হয়ে গেছে, সেই অতি সুস্বাদু খাবারের স্বাদ এখনো জড়িয়ে আছে জিভে। সামান্য একটু মদ খেয়েছিলাম, তার রিমঝিম নেশা এখনো মাথায় রয়ে গেছে। সুন্দর একটা শারীরিক তৃপ্তির পর একটু আগে কফি শেষ করে সিগারেট খেয়েছি। সেইটাই কি জীবনের শেষ পানভোজন ? কে জানে, কে বলবে ?

ও পাশের বুড়িটা একটা ফোঁপানীর শব্দ করল। সাহেব মেমরা কম কাঁদে। প্রকাশ্যে তো কখনোই কাউকে কাঁদতে দেখিনি। কিন্তু বয়সের দোষে এবং ভয়বশতঃ বুড়ি কাঁদছিল। কথাপ্রসঙ্গে জেনেছিলাম, তাদের ছেলেপুলে নেই, দুজনেরই আগে একবার করে বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু তাদের পরস্পরের এই বিয়েটা অনেকদিন স্থায়ী হয়েছে, মৃত্যুর আগে তাদের ছাড়াছাড়ি হবে না—বলেছিল বুড়ি। বুড়োর গা একটা কম্বলে ভাল করে ঢেকে-ঢুকে দিচ্ছিল একটু আগে তাতে আমিও সাহায্য করেছি। আমার জীবনে ভালবাসা নেই বলেই বোধহয় তাদের ঐ ভালবাসা আমার খুব ভাল লেগেছিল। এই তো এরা দুনিয়ার আর কারো পরোয়া করে না, পরস্পরকে নিয়ে কেমন মেতে আছে। প্রিয়জনের ভিতর দিয়ে ছাড়া কিছুতেই তো এই পৃথিবী আর জীবনকে উপভোগ করা সম্ভব নয়। জীবনের একেবারে শেষভাগেও এই দুই অথর্ব স্বামী-স্ত্রী নিজেদের বেঁচে থাকাকে একরকম করে উপভোগ করেছে দেখে আমার একটু ঈর্ষা মেশানো আনন্দ হচ্ছিল।

আরব লোকটা কাকে ডাকল কে জানে। কিন্তু পেছন থেকে কোনো উত্তর এল না। আরবটা তখন তার সীট থেকে বেরিয়ে মাঝখানের প্যাসেজটায় দাঁড়াল, তখন ব্যাগের মধ্যে হাত। খুব সম্ভবত সেই লুকানো হাতটা গ্রেনেডের সেফটি ফিউজ আলগা করছে আস্তে আস্তে। প্যাসেজে দাঁড়াতেই তার বিশাল চেহারাটা আরো বিশাল নজরে পড়ল। তার বাহুর ঘের বোধ হয় আমার বুকের সমান হবে। বুকটা মাঠের মতো ধু ধু করা বিরাট। ইচ্ছে করলে ও বোধহয় ঘুষি মেরেই পলকা প্লেনটাকে তুবড়ে দিতে পারে। কিন্তু আপাততঃ সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চোখে ভ্রূকুটি। ডান হাতটা মুঠো পাকিয়ে খানিকটা আছে। যাত্রীরা সবাই দৃশ্যটা দেখছে, কিন্তু কেউ নড়ছে না। কিন্তু অস্ফুট 'হাইজ্যাক' শব্দটা চারপাশ থেকে শুনতে পাচ্ছি। ফিসফাশ শব্দ হচ্ছে। একটা বছর ছয়েকের বাচ্চা প্লেনের পিছন দিকে রয়েছে, তার পরিষ্কার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, পরিষ্কার ইতালীয়ান ভাষায় সে তার মাকে জিজ্ঞেস করছে—মরে গেলে আমাদের কি রোমে ফিরতে দেরি হবে ?

আমাদের দমদমের বাড়িতে একদিন একটা কাক ডানা ভেঙে পড়ে গিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে মারা যায়, আর তাকে ঘিরে সারাদিন হাজারটা কাক চেঁচামেচি করেছিল। আমার ছোটো ভাই দৃশ্যটা খুব করুণ চোখে দেখেছিল। পরদিন যখন আবার এঁটো কাঁটা কাক খেতে এসে উঠোনে নামছে তখন সে আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে

একটা কাককে দেখিয়ে বলল—দাদা, ঐ কাকটা কাল মরে গিয়েছিল না রে ?

সেই স্মৃতিটা মনে আসতেই এক ঘোর মায়ায় আমার বুক ভরে গেল। শিশুরা তো মৃত্যুকে জানে না! ঐ মেয়েটির কণ্ঠস্বর আমাকে যেন চাবুক মারল। নীলুর কথা মনে এল, ছোটো ভাইটার কথা মনে এল। স্নেহ মায়ায় বুক ভরে গেল। আর ঐ তীব্র চেহারার আরব লোকটির দিকে স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে আমার ভিতরে মৃত্যুভয়ে একটা বিস্ফোরণ ঘটালো যেন।

আরবটা এক পা, এক পা করে কয়েক পা এগিয়ে এল। দাঁড়াল। আবার এগোলো। দাঁড়ালো। সেই একই ভঙ্গীতে তার ডান হাত মুঠো পাকানো। বাঁ হাত ব্যাগের মধ্যে ভরা। একটু বাদেই কিছু একটা ঘটবে। লোকটার মুখে চোখে এক কঠিন আত্মপ্রত্যয়। মৃত্যুর প্রতি সে নির্মমভাবে উদাসীন। সব রকম বিপদকে নিয়েই সে বেঁচে আছে।

আর তখন হঠাৎ আমার মানসিক একটা বিকলতা ঘটে গেল। হঠাৎ যেন এরোপ্লেনের মৃদু চাপা শব্দ, আর অতি ক্ষীণ থরথরানী থেমে গেল। আর আমি এক স্বপ্নময় দৃশ্যের মধ্যে চলে পড়লাম।

সেই দৃশ্যটা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবতাবর্জিত।

দেখি একটা বিচিত্র দেশে আমি পেঁৗছে গেছি। এখানে মাটির রঙ নীল, তার ওপর হলুদ সবুজ লাল গোলাপী, হরেক রকমের ঘন ঘাস গজিয়ে চারধারে যেন এক বিভিন্ন রঙের দাবার ছক তৈরী করে রেখেছে। এইসব রঙীন ঘাসের নিখুঁত চৌখুপীর ধারে ধারে নাতিদীর্ঘ গাছে সম্পূর্ণ গোল রামধনু। ছবিতে যেমন সব কাল্পনিক পাখি দেখা যায়, তেমনই সব পাখি উড়ছে চারধারে। আকাশের রঙ উজ্জ্বল নীল, তাতে গোল গোল সুন্দর নানাবর্ণের মেঘ। তারাগুলো অনেক কাছে কাছে ফুটে আছে। আর প্রতিটি তারার মধ্যেই নাক মুখ চোখ আঁকা। আকাশের একধারে এত বড় একটা চাঁদ দেখা যাচ্ছে যে মনে হয় দিগন্তের প্রায় বারো আনা অংশ জুড়ে আছে। চারধারে ছোটো ছোটো ঢিলা রঙীন কাঁচ আর কাঠ দিয়ে তৈরি বাড়ি। রাস্তা দিয়ে পুতুলেরা হেঁটে যাচ্ছে। দুটো কুকুর অবিকল মানুষের ভাষায় কথা বলছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। পসারী শপ-এর সামনে একটা টেকো পুতুল একটা পাখির সঙ্গে তার স্বরে ঝগড়া করছে। তিনজন পরী উড়ে উড়ে রামধনুগুলোয় আরো ভাল করে রঙ দিয়ে দিচ্ছে। একটা খেলনা মোটরগাড়ি মোরগের ডাকের মতো ভেঁপু বাজিয়ে চলে গেল। চারধারে কি এক অপরিসীম শান্তি, এক মৃত্যুহীন নিরাপদ শাশ্বত জগৎ।

পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম, নীলুর জন্য যে সব ছবির বই কিনে দিয়েছিলাম আমি, তারই কোনোটার মধ্যে এই ছবিটা ছিল। আমি সেই রকমই একটা ছবির মধ্যে ঢুকে পড়েছি।

আমি হঠাৎ ডুকরে বলে উঠলাম—নীলু!

আরব লোকটা সেই মুহূর্তেই আবার ডাকল—আলিজা!

এবার পিছন থেকে একটা শব্দ এল। তারপর একটা লম্বা, সুন্দরপানা মেয়ে উঠে এল কোথা থেকে। তারও অবিকল মধ্যপ্রাচ্যের চেহারা। সে এসে এই বিশাল

boiRboi.net

লোকটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় খুব উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে লাগল। এই মেয়েটাই কি ওর সহ-গেরিলা ?

আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম।

অলকা

এই সকালবেলায় আমার ঘরখানা চমৎকার দেখাচ্ছে। সারা দিনের মধ্যে আমার সবচেয়ে পছন্দের সময় হল সকালবেলা। আমি খুব ভোরে উঠতে পারি না বলে আমার একরকম দুঃখ আছে। তবে মাঝে মাঝে বেশ ভোরে ঘুম ভেঙে গেলে ঘরময় সকালের রোদ দেখি। কি সুন্দর যে লাগে ভোরের একটা আলাদা গন্ধ। লক্ষ্য করে দেখেছি, সকালে ঘুম থেকে উঠলেই মানুষকে সবচেয়ে ভাল দেখায়।

পার্ক সার্কাসের এই ফ্ল্যাটটা প্রথমে ভাড়া করেছিল আমার এক মাসতুতো দাদা। আমার বিয়ের ছ মাস পর আমি আর জয়দেব হানিমুন করতে যাই শিলঙে। বুদ্ধিটা কার ছিল কে জানে। জয়দেবদের পরিবারে হানিমুনের চল ছিল না। কিন্তু আজকাল বাঙালী সমাজে হানিমুনের চল হয়েছে। আমার মনে হয় জয়দেবই আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য পরিবার থেকে কিছুদিন আমাকে নিয়ে আলাদা হতে চেয়েছিল। সেইটেই হল কাল।

শিলঙে আমরা একটি হোটেলের ঘরে দুটো ঝগড়াটে বেড়ালের মতো দিনরাত ফোঁসফোঁস করতাম। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারতাম না।

জয়দেব হয়তো বলল—এক গ্লাস জল দাও তো!

আমার প্রেস্টিজে লাগল, বললাম—গড়িয়ে খাও, নয়তো বেয়ারাকে বলো।

—তুমি তো আমার বৌ, এটুকু করলে তো দোষ হয় না।

—বৌ মানে তো ঝি নয়।

একদিন একটা মেয়েকে দেখে জয়দেব বলল—দেখ, মেয়েটি কি সুন্দর!

স্বামী কোনো যুবতীকে সুন্দর দেখলে স্ত্রীর একটু হিংসে হওয়ার কথা, আমার হল না। বললাম—বেশ সুন্দর!

—আলাপ করব ?

—করো না! তবে তুমি তো তেমন স্মার্ট নও, ভাল করে ভেবে-চিন্তে কথা বলো।

জয়দেব অবশ্য গেল না কথা বলতে। চেরাপুঞ্জী দেখতে গিয়েও খুব তুচ্ছ কারণে একচোট ঝগড়া হল। জয়দেব বলল—চেরাপুঞ্জীতে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী বৃষ্টি হয় এটা কিন্তু সত্যি নয়। আমি রিসেন্টলি একটা বিদেশী ম্যাগাজিনে পড়েছি আর একটা কোন জায়গায় যেন এর চেয়ে বেশী বৃষ্টি হয়।

চেরাপুঞ্জীতে না হয়ে অন্য কোথাও পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী বৃষ্টি হলেই বা আমার ক্ষতি কি ? কিন্তু যেহেতু জয়দেব বলছে সেই হেতু আমার কথাটা ভাল লাগেনি, মনে হয়েছিল ও একটু পাণ্ডিত্য দেখানোর চেষ্টা করছে।

আমি বললাম—আন্দাজে বোলো না।

—না অলকা, আমি পড়েছি।

—মিথ্যে কথা। চেরাপুঞ্জীতেই বেশী বৃষ্টি হয়।

জয়দেব রেগে বলে—আমি বলছি আমি পড়েছি।

—পড়লেও ভুল পড়েছো। আমরা ছেলেবেলা থেকেই চেরাপুঞ্জীতে সবচেয়ে বেশী বৃষ্টির জায়গা বলে জানি।

—ভুল জানো।

—তুমি ভুল পড়েছো।

এইভাবেও আমাদের ঝগড়া হত।

শিলং বা চেরাপুঞ্জীর দোষ নেই, ভূগোল বই বা বিদেশী ম্যাগাজিনও দায়ী নয়। আমরা দুজনেই টেলিফোনে দুটো-রং নাম্বার পেয়ে অচেনা লোককে চেনা ঠাওরাবার অভিনয় করছি।

শিলং থেকে দুজনেই কিছু রোগা হয়ে ফিরে এলাম। শ্বশুরবাড়িতে কিছুকাল থেকে শরীর আরো খারাপ হল। লোকে ভাবল বোধহয় মা হতে চলেছি। ডাক্তার দেখে বলল—না, পেটে ফাংগাস হয়েছে।

শরীর সারাতে বাপের বাড়ি গেলাম। মাসখানেক পর জয়দেব নিতে এল। গেলাম না। জয়দেব তখন গ্রামে গ্রামে ঘুরে কটেজ আর স্মল স্কেল ইণ্ডাস্ট্রিজ-এর জন্য কি সব কাজ করে বেড়ায়। বাড়িতে খুব একটা থাকে না। শুনলাম, প্রাচীন মন্দিরের ওপর থিসিস লিখছে ডক্টরেট করার জন্য। আমি শ্বশুরবাড়ি যেতে চাই না শুনে রাগ করে বলল—আমি কুড়ি দিন বাইরে বাইরে ঘুরে ফিরলাম, তুমি এ সময়ে যাবে না আমার কাছে?

আমি প্লেটে করে আচার খাচ্ছিলাম, জিভে টকাস টকাস শব্দ করে বললাম—আমাকে দিয়ে তোমার কি হবে? বৌ-গিরি করতে আমার ভাল লাগে না।

জয়দেব আমার আচার খাওয়া দেখছিল। ঐ সিরিয়াস অবস্থাতেও ওর মুখ রসস্থ হয়ে গিয়েছিল, মুখের ঝোল টেনে বলল—বৌ-গিরি কথাটা কি ভাল?

আমি হেসে ফেললাম। বললাম—ভাল না মন্দ কে জানে! আমার তো তাই মনে হয়।

জয়দেব হাল না ছেড়ে বলল—তুমি কি আমাকে একটুও সহ্য করতে পারো না?

—পারতে পারি। যদি তুমি আলাদা থাকো।

—আলাদা থাকলে কি হবে?

—আমি আলাদা বাসায় স্বাধীনভাবে থাকতে পারি। তোমাদের বাড়ির অত লোকের মধ্যে থাকতে আমার ভাল লাগে না। তুমি আলাদা বাসা করে খবর দিও। যাবো।

—এই কি শেষ কথা?

—হ্যাঁ।

—আমার বাড়ির লোক তোমার কি ক্ষতি করেছে?

—তা জানি না। তবে যদি আমাকে চাও তো বাড়ি ছাড়তে হবে।

boiRboi.net

জয়দেব ভাবল। ফিরে গেল। মনে হল, কথটা সে ভেবে দেখবে।

কিন্তু জয়দেবকে আমি তখনো ঠিক চিনতে পারিনি। বাড়ি ছাড়বার ছেলে জয়দেব ছিল না। কদিন পর তার একটা পরিষ্কার চিঠি এল। বাঁকুড়ার এক গ্রাম থেকে লিখে পাঠিয়েছে—অলকা, বিয়ে ভাঙার জন্য যা করতে হয় তা তুমি করতে পারো। আমি ইনিশিয়েটিভ নেবো না। বিয়ে ভাঙা আমি পাপ বলে মনে করি। কিন্তু তুমি যদি চাও তো দাবি ছেড়ে দেবো।

চিঠিটা পেয়ে যে খুব উল্লসিত হয়েছিলাম তা নয়। কোথায় যেন আমার মেয়েমানুষী অহংকারে একটু ঘা লাগল। যত যাই হোক, একবার বিয়ে হয়ে গেলেই তো মেয়েরা আর কুমারী রইল না। এই বাংলাদেশে কুমারী যে নয়, সে একা হলে বড় মুশকিল।

এই চিঠি এলে আমাদের পরিবারেও হুলুস্থুল পড়ে গেল। বাবা যত প্রগতিপন্থী হোন, মা যত আধুনিকা হোন, মেয়ে বিয়ে ভেঙে স্বামী ছেড়ে চলে আসবে এটা তাঁরা সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি।

বাবা উত্তেজিত হয়ে বললেন—চল অলকা, আজই তোকে তোর শ্বশুরবাড়িতে দিয়ে আসি।

মাও বাবার সঙ্গে একমত। আমার ঠাকুমা ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করলেন। দাদাও খুশী নয়।

অথচ আমিই বা কেন শ্বশুরবাড়ি যাবো?

বাড়ির লোকজনের সঙ্গে আমার তুমুল ঝগড়া লাগল। আমি স্পষ্ট বললাম, যদি জয়দেব বাড়ি থেকে আলাদা হয় একমাত্র তবেই আমি ফিরে যেতে পারি।

বাড়ির লোকজন আমার মতে মত দিল না। জোর করতে লাগল। আমি প্রায় একবস্ত্রে মাসীর বাড়ি চলে এলাম।

মাসীও বাঙালী হিন্দু ঘরের মেয়ে। আমাকে চূড়ান্ত প্রশ্রয় দিয়েছে এক-সময়ে। সব রকম আধুনিকতায় শিক্ষিত করেছে, তবু দেখা গেল আমার এই বিয়ে-ভাঙার ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখছে না। বলল—দূর মুখপুড়ি, স্বামীর সঙ্গে যত ঝগড়াই করিস, বিয়ে ভাঙতে যাস না। এ দেশে যারা বিয়ে ভাঙে তাদের ভবিষ্যৎ নেই। ভেবে-চিন্তে কাজ করতে হয় হুট করে এই কম বয়সে ও সব করিস না।

মাসীর সঙ্গেও বনল না। অথচ কেন জানি না মনটা বড্ড আড় হয়ে আছে, জয়দেব বা তার পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারি না।

আমার আর এক মাসীর ছেলে অসীমদা তখন বিলেত যাচ্ছে। বৌ-বাচ্চা নিয়েই চলে যাবে। পাঁচ-সাত বছর ফিরবে না। তার পার্ক সার্কাসের ফ্ল্যাটটা তালাবন্ধ থাকবে এমন কথা হচ্ছিল। কলকাতায় বাসা পাওয়া প্রচণ্ড সমস্যা বলে তারা ফ্ল্যাটটা ছাড়তে চাইছিল না। তখন আমি অসীমদাকে বললাম—ফ্ল্যাটটায় আমাকে থাকতে দাও।

অসীমদা খুশী হয়ে বলল—তবে তো ভালই হল। কতগুলো দামী ফার্নিচার রয়েছে, তুই আর জয়দেব থাকলে ভালই হবে।

জয়দেব থাকবে না, আমি একা থাকব—এটা আর অসীমদার কাছে ভাঙলাম না।

boiRboi.net

ওরা যেদিন রওনা হয়ে গেল সেদিন বিকেলে গিয়ে ফ্ল্যাটটা দখল করলাম। জীবনে এই প্রথম একা থাকা। একদম একা। একটু ভয়-ভয় করছিল ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা প্রচণ্ড আনন্দও হচ্ছিল। একা আর স্বাধীন হওয়ার মধ্যে কি যে আনন্দ!

বাড়ি থেকে মা বাবা আত্মীয় স্বজনরা এসে ফিরে যাওয়ার জন্য অনেক জ্বালাতন করল, আমি জেদবশতঃ গেলাম না। বাড়িতে ফিরে গেলেই ক্রমাগত আমার ওপর নানাদিক থেকে চাপ সৃষ্টি হবে। অনেক ঠেস-দেওয়া বাঁকা কথা, অনেক চোরা-চাউনি আর মুচকি হাসি সইতে হবে। তার চেয়ে বেশ আছি। ফিরে গেলাম না বলে সকলেরই রাগ, মা তো মুখের ওপরে বলেই গেল—তুমি বদমাশ হয়ে গেছ। নষ্টামি করার জন্যেই একা ফ্ল্যাটে থাকবার অত শখ।

ব্যাপারটা তা নয়। বিয়ের আগে যা হওয়ার তা হয়েছে। কিন্তু বিয়ের পর থেকে আমার মনের কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। পুরুষদের প্রতি আমার এক-ধরনের অনাগ্রহ, উদাসীনতা, কেন জানি না, জন্মেছে।

একা ফ্ল্যাটে থাকতে হলে চাকরি চাই। কলকাতায় চাকরির বাজার তো তেমন সুখের নয়। তবু চেষ্টা-চরিত্র করে এক চেনা সূত্র ধরে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের এক অধ্যাপকের বাড়িতে বাচ্চা রাখার কাজ পেলাম। ইংরিজিতে বলে বেবী সীটার। ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকরি করে। স্ত্রী ডাক্তার। তারা মানুষ বেশ ভাল। বালীগঞ্জ প্লেসে তাদের বাড়িতে সকাল আটটা থেকে বিকেল ছ'টা পর্যন্ত সাত আর তিন বছরের দুটো ছেলেমেয়েকে সামলে রাখতাম। দুপুরের খাবার দিত আর দুশো টাকা মাইনে। সাত বছরের ছেলেটা কনভেন্টে পড়তে যেত। তাই তাকে বেশী আগলাবার দরকার পড়ত না। তিন বছরের মেয়েটাকে সারাদিন ঘড়ি ধরে সাজাতাম, খাওয়াতাম, গল্প বলে ঘুম পাড়াতাম। বেশ লাগত। অসম্ভব মিষ্টি আর দুষ্টু মেয়েটা, সাতদিনেই সে আমার বড় বেশী ন্যাওটা হয়ে গেল। তার কচি মুখের দিকে চেয়ে বুকের মধ্যে ঢেউ দিত একটা কথা—আমার যদি এ রকম একটা মেয়ে থাকত!

যে সব বাচ্চার মা চাকরি করে তাদের যে কী দুরবস্থা হয় তা এই দুটো বাচ্চাকে দেখেই বুঝতাম। দুজনেই কিছু অস্বাভাবিক রকমের চঞ্চল, অভিমানী, আর কিছু নিষ্ঠুরও ছিল। প্রথমে গিয়েই আমি বাচ্চাদুটোর মধ্যে কেমন ভয়-মেশানো, সন্দেহ-মেশানো এক রকমের দৃষ্টি দেখেছিলাম চোখে। সারাদিন ওরা মায়ের জন্য অপেক্ষা করত মনে মনে। ডাক্তার মায়ের ফিরতে রাত হত। তখন মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়েও জেগে জেগে 'মা' বলে ডেকে ফের ঘুমোতো। অন্য কোনো বাচ্চা দেখলেই মেয়েটা তাকে গিয়ে মারত, খিমচে দিত, চোখে খোঁচা দেওয়ার চেষ্টা করত। সব সময়ে সে যেন তার প্রতি এক অজানা অন্যায়ের শোধ নেওয়ার চেষ্টা করত। বড় কষ্ট হত আমার।

মাস তিনেকের মধ্যেই আমি বাচ্চা দুটোর আসল মা হয়ে উঠলাম। সারাদিন আমি তাদের নিয়ে থাকি। আমার নিজের ছেলেমেয়ে হলে তাদের নিয়ে কী করতাম সেই ভেবে মায়ের মতো সব হাবভাব করি, বায়না রাখি, শাসন করি। ওরা তাই আমার মধ্যে হারানো মা কিংবা নতুন মা খুঁজে পেল। নিজেদের মার জন্য খুব বেশী অস্থির হত না। বরং আমি সন্ধ্যেবেলা চলে আসবার জন্য তৈরি হলে মেয়েটা

boiRboi.net

ভয়ংকর কান্নাকাটি করত। তাকে ঘুম না পাড়িয়ে আসা মুশকিল হয়ে উঠল। এইভাবেই জড়িয়ে পড়লাম ওদের সঙ্গে। কিন্তু বাচ্চাদের বাবা রোহিতাশ্ব চৌধুরী একদিন আমাকে বললেন—অলকা, আপনি তো খুবই শিক্ষিতা এবং ভদ্রঘরের মেয়ে, এ কাজ আপনার উপযুক্ত নয়। যদি বলেন তো আপনার জন্য একটা ভদ্রগোছের চাকরি দেখি।

তাই হল। এ কথার মাস দুয়েকের মধ্যে আমি একটা বাঙালী বড় ফার্মে টাইপিস্ট-ক্লার্কের চাকরি পেলাম। বাচ্চাদের জন্য মনটা খুব ফাঁকা লাগত। ওরা আর একজন বেবী সীটার রেখেছে জেনে মনটাও খারাপ হয়ে গেল। মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসি ওদের, এটা সেটা কিনে দিই। কিন্তু মাতৃত্বের এক অসম্ভব ক্ষুধা বুকের মধ্যে কেবলই ছটফট করে।

জয়দেবের সঙ্গে আমার বিবাহবিচ্ছেদের কোনো সক্রিয় চেষ্টা আমি করিনি। সে বড় হাঙ্গামা। উকিলের কাছে যাও, সাক্ষী যোগাড় কর। তা ছাড়া আমার অভিযোগ বা কি হবে জয়দেবের বিরুদ্ধে? তাই ও সব নিয়ে মাথা ঘামাইনি। আলাদা আছি বেশ চলে যাচ্ছে, আর কেন মামলার হাঙ্গামায় যাওয়া? জয়দেব তো আমাকে চিমটি দিচ্ছে না!

যুবতী মেয়ে। একা থাকি। আমার কি কোনো বিপদ হয়নি?

হয়েছিল। কিন্তু সে তেমন কিছু নয়। অসীমার ফ্ল্যাটে একটা ফোন ছিল, তাতে প্রথম কিছুদিন একটি ভীতু ছোকরা আমার সঙ্গে প্রেমালাপ করার চেষ্টা করে। আমি ফোন তুলেই গলা চিনেই ফোন ছেড়ে দিতাম। তিন মাস পর সে হাল ছেড়ে দেয়। ওপরতলার এক মহিলার ফ্ল্যাটে মদ আর জুয়ার আড্ডা বসত। একবার সেখানকার এক মাতাল আমার ঘরের কড়া নেড়েছিল, আমি দরজা খুললে সে আমাকে ধরবারও চেষ্টা করে। কিন্তু সেটা মাতলামি। পরে সে ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছিল।

এ রকম দু একটি ছোটখাটো ঘটনা বাদ দিলে আমার জীবন ছিল বেশ নিরাপদ। আমি একা থাকি না দোকা থাকি সেটাও তো সবাই জানত না। কলকাতায় কে কাকে চেনে!

তবে আমি যে ফার্মে চাকরি করতাম সেই ফার্মের একটি উজ্জ্বল সুপুরুষ আর স্মার্ট ছেলে আমার প্রতি কিছু দুর্বল হয়ে পড়ে। তার সঙ্গে দু একবার রেস্টুরেণ্টে গেছি, বেড়িয়েছি এদিক ওদিক। কিন্তু কি জানি তার প্রতি আমার কখনো কেন আগ্রহ জাগল না।

তবে সে একবার আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়।

boiRboi.net

প্রভাসরঞ্জন

আমার জীবন শুরু হয়েছে কয়েকবার। শৈশবে যে জীবন শুরু করেছিলাম দেশভাগের পর তা শেষ হয়ে যায়। নতুন এক রুক্ষ ভিখিরির স্নেহহীন জীবন শুরু করেছিলাম। মধ্যে যৌবনে বিদেশে গেলাম নতুন আর একরকম জীবন শুরু করতে।

কতবার কতভাবে শুরু হল, আবার শেষও হয়ে গেল। এখনো আয়ু অনেকটা পড়ে আছে, কতবার আরো নিজের জন্ম ও মৃত্যু দেখতে হবে কে জানে ?

ফেরার সময়ে সেই এরোপ্লেনেই যেমন, গেরিলারা যদি প্লেন হাইজ্যাক করে নিয়ে যেত, যদি মুক্তিপণ হিসেবে বন্দী করত আমাদের এবং যদি প্রতি ছ ঘণ্টা অন্তর এক একজন যাত্রীকে গুলি করে মেরে ফেলত তাদের দাবির বিজ্ঞপ্তি হিসেবে ? না, সে সব কিছুই হয়নি। না হলেও সেই কয়েকটা মুহূর্তের আকণ্ঠ মৃত্যুভয় আমাকে একেবারে শেষ করে ফেলল।

সেই রূপসী তরুণীটি দৈত্যাকার লোকটির সঙ্গে দুর্বোধ্য ভাষায় চেঁচিয়ে কি বলছিল তা বোঝার সাধ্য আমার ছিল না। চোখের পলক না ফেলে হা করে চেয়ে দেখছি দৃশ্যটা, আমার পাশে বসা বুড়োর নাকে বাঁশির শব্দ হচ্ছে, বুড়ি অস্পষ্ট স্বরে কেঁদে কি যেন বলছে বুড়োকে। প্লেনসুদ্ধ যাত্রীরা আতংকে চেয়ে আছে দৃশ্যটার দিকে।

মেয়েটা কথা বলতে বলতে এক পা দু পা করে এগিয়ে গেল লোকটার দিকে। লোকটা পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে, চোখ দুখানায় বাদামী আগুন ঝলসাচ্ছে। তারা দুজন চারদিকের যাত্রীদের চোখকে গ্রাহ্য করছে না, যেন আর কেউ যে উপস্থিত আছে এ তারা জানেই না।

মেয়েটা খুব কাছাকাছি এগিয়ে গেলে দৈত্য লোকটার চোখ মুখ হঠাৎ খুব নরম হয়ে গেল। দুটো প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ির মতো হাতে লোকটা সেই পলকা মেয়েটাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল। তারপর চকাস্ চকাস্ করে চুমু খেতে লাগল।

ঠিক এরকমটার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। ডানদিকে একটা লোক হেসে উঠল। পাশের বুড়ি বুড়োকে বলছে—ও গড, হি উইল ব্রেক দ্য গার্লস ব্যাক। পিছন থেকে একটা হাততালির শব্দ আসে। একজন বলে ওঠে—হ্যাপী এণ্ডিং। পিছনের ইটালিয়ান বাচ্চাটা বিস্মিত স্বরে বলে ওঠে—ওরা কখন মারবে ? চুমু খাওয়ার পর ?

দুজন সুন্দরী হোসটেস এতক্ষণ সামনের দিকে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিল এদিকে চেয়ে। এবার তারা প্রাণ পেয়ে হাসিমুখে হঠাৎ এগিয়ে আসে। দৈত্যটির পিঠে টোকা দিয়ে একজন জার্মান ভাষায় বলে—ইচ্ছে হলে আপনি আপনার বান্ধবীকে নিয়ে আলাদা বসতে পারেন। সামনের দিকে একটা টুইন সীট আছে।

লোকটা মেয়েটাকে খানিক নিস্পিষ্ট করে মুখ তুলে বলে—ড্রিংক আনো, আমার তেষ্টা পেয়েছে।

পিছনে যেখানে আলিজা বসেছিল তার পাশের সীটে একজন দীর্ঘকায় সুপুরুষ মধ্যপ্রাচ্যের তরুণ ছিল। তাকে কেউ লক্ষ্য করিনি এতক্ষণ। সবাই ঘাড় ঘোরাচ্ছে দেখে আমিও পিছু ফিরে ছেলেটাকে দেখতে পাই। একটা বাদামী শার্ট গায়ে, গলার টাইটা আলগা, মুখটা অসম্ভব লাল, দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল, সে এই প্রেমের দৃশ্যটা সহ্য করতে পারছে না, অসম্ভব রেগে গেছে এবং এক্ষুনি সে একটা কিছু করবে।

কি সে করত জানি না, তবে দৈত্যকায় লোকটির বুকে সেঁটে থেকেই মেয়েটা

একবার পিছু ফিরে চেয়ে চোখের একটা ইশারা করল তাকে। সে বসে পড়ল ধীরে ধীরে।

দৈত্য লোকটা সেই মেয়েটিকে নিয়ে আরো সামনের দিকে কোথাও গিয়ে বসল।

আমি হোসটেসকে ডেকে একটু ড্রিংকস্ চাইলাম। আর সেটি পরিবেশনের সময়ে জিজ্ঞেস করতেই, সুন্দরী হোসটেসটি মৃদু স্বরে বলল—লাভ ট্রাংগল।

কিন্তু একটু বাদে পিছনের ছেলেটি হোসটেসকে ডেকে নীচু স্বরে কি যেন বলল অনেকটা সময় ধরে। তারপর দেখি, তরুণী হোসটেস ছাইরঙা এক আতংকিত মুখে খুব তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে বেতার ঘরের দিকে। কিছু বুঝতে পারছিলাম না। হোসটেসের মুখের ভাব অনেকেই লক্ষ্য করেনি। তাই বেশীর ভাগ লোক নিশ্চিন্তে বসে আছে। আমি স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।

বেইরুটে প্লেন থামতে দরজা খুলে কয়েকজন বিশালদেহী যাত্রী উঠল। তাদের চেহারা হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর। উঠে মুহূর্তের মধ্যে তারা প্লেনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। চোখের পলকে দেখি তাদের হাতে হাত উঠে এসেছে এল, এম, জি, কারবাইন, থম্প্সন অটোমেটিক। চারজন সেই দৈত্যের মতো লোকটা আর তার বিস্মিত বান্ধবীকে ঘিরে ফেলল। দুজন গিয়ে ধরল পিছনের ছেলেটিকে।

বাচ্চা হাতির মতো লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে পিছু ফিরে চাইল। রাগে তার মুখ টকটকে লাল। চেঁচিয়ে সে তার দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন গালাগাল করছিল পিছনের ছেলেটিকে। আর সেই ছেলেটিও কি যেন জবাব দিচ্ছে বেপরোয়া মুখে।

ছদ্মবেশী আর্মড গার্ড, তিনজনকেই নামিয়ে নিয়ে গেল মেশিনগান আর অটো-মেটিকের নল গায়ে ঠেকিয়ে। তারপর ঘণ্টাখানেক ধরে সার্চ করা হল প্লেন। গুঞ্জন শোনা গেল, ঐ তিনজনই ছিল গেরিলা। বেইরুটের পর তারা প্লেন হাইজাক করত। প্রেমের ত্রিকোণ বাধা হয়ে না দাঁড়ালে কি হত বলা মুশকিল। প্রেমে ব্যর্থ পিছনের ছেলেটি হোসটেসকে ডেকে তাদের সব গুপ্তকথা বলে দিয়েছিল।

গেরিলাদের ক্ষেত্রে এরকম বড় একটা হয় না, আমি জানি। সর্বত্রই আমি মৃত্যুপণ গেরিলাদের লক্ষ্য করে দেখেছি। প্রেম তাদের কাছে কোনো সমস্যাই নয়। আমার এখনো মনে হয়, ওরা গেরিলা ছিল না। পিছনের ছেলেটি নিজেদের গেরিলা বলে পরিচয় দিয়ে ইচ্ছে করেই গণ্ডগোল পাকিয়েছিল। কিন্তু সত্যিকারের ঘটনা কি তা আমি আজও জানি না। কিন্তু প্লেন বেইরুট থেকে উড়লে মনে হয়েছিল, আমরা আবার জীবন ফিরে পেলাম। আমি যে জীবন ফিরে পেলাম সেটা কেমন? সে জীবন শেষ হলেই বা কি ক্ষতি ছিল?

দমদমের দরিদ্র বাড়িটিতে এসে যখন পেঁছোলাম তখন আমার বাবা, মা যথাসাধ্য আনন্দ প্রকাশ করলেন। ইতিমধ্যে আমার ছোট ভাই একটা বিয়ে করেছে। আমার ভাই, ভ্রাতৃবধূও যথাসাধ্য খুশীর ভাব দেখাল। ভাইয়ের সদ্য একটি ছেলে হয়েছে। আমি বিদেশ থেকে কিছু লোভনীয় জিনিস এনেছিলাম। সেগুলো বাড়ির লোকদের বিলিয়ে দিলাম। সবাই অসম্ভব খুশী হল তাতে। একেই তার ভাল জিনিস চোখে দেখেছে কম, তার উপর এত সব হরেক রকম মহার্ঘ দ্রব্য দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

এই উত্তেজনা বাড়াতে আমার বোনেরা তাদের বাচ্চা কাচ্চা আর স্বামী নিয়ে চলে

boiRboi.net

এল বেড়াতে। খুবই হতাশ হই তাদের দেখে। দুই ভগ্নীপতির মধ্যে একজনকে দেখলেই মনে হয় লোফার। অন্যজন কিছুটা ভদ্রলোক আর সুপুরুষ হলেও নির্বোধ। কারোরই সংসারের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। মা আমাকে চুপি চুপি জানাল, ছোটো জামাই নাকি গুণ্ডামি, চুরি, ছিনতাই করে। বড়জন একটা প্রাইভেট ফার্মে কেয়ারটেকার।

এরা সব এক জায়গায় জুটতে খুব হট্টগোল হল। ঝগড়াঝাঁটিও প্রায়ই লেগে যায় দেখলাম। একদিন বাবা খুব গম্ভীরভাবে আমাকে গোপনে ডেকে নিয়ে বললেন—শোনো বাবা প্রভাস, তোমার ছোট ভাই আর তার বৌ এখন চায় আমি আর তোমার মা আলাদা হয়ে অন্যত্র গিয়ে থাকি।

আমি অবাক হয়ে বললাম—আপনি আর মা যাবেন কেন? এ বাড়ি তো আপনার, দরকার হলে ওরা চলে যাবে।

—সে সব আইনের কথা শুনছে কে? আমাদের বুড়ো বয়সে আর তেমন তেজ নেই যে গলাবাজি করে গায়ের জোরে দখল রাখবো। তার উপর নিজের সন্তান যদি শত্রুতা করে, তবে আর কি করার আছে? ওরা দুজনে মিলে আমাদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলছে দিন রাত। তোমার মা অবশ্য ওদের দিকে টেনে চলেন, কিন্তু তাতেও সুরাহা হবার নয়। যদিও বা তোমার মাকে ওরা আশ্রয় দেয় আমাকে থাকতে দেবে না।

কথাটা শুনে আমি ভয়ংকর রেগে যেতে পারি না। হঠাৎ কেন যেন নিজের ছেলেবেলার কথা আদ্যন্ত মনে পড়ে! ভাবি, আমাদের নিষ্ঠুর ছেলেবেলা আমাদের স্বার্থপরতা ছাড়া আর কি শেখাবে! আমার ভাই তার নিজের জীবন ও পরিবেশ থেকে সেই শিক্ষাটাই নিয়েছে। ওর বৌও খুব উঁচু পরিবারের মেয়ে নয়। কথায় কথায় মা একদিন বলে ফেলেছিলেন। বৌমার মা নাকি ঝিগিরি করত। তবে আগে ওরা ভদ্রলোক ছিল, অবস্থার ফেরে এই দশা। সে যাই হোক, আমার ভাইয়ের বৌ নিমি খুব খোঁপায় চোপায় মেয়ে। টকাটক কথা বলে, মেজাজ দেখাতে ভয় পায় না, কাউকে তোয়াক্কার ভাব নেই। এ ধরনের মেয়েরা সহজেই স্বামীকে বশ করতে পারে। মা বাবাকে আলাদা করার প্রস্তাবটি হয়তো তার মাথাতেই প্রথম এসে থাকবে। যথাসময়ে আবার ভাই সেই ভাবনায় ভাবিত হয়েছে।

বাবাকে বললাম—বোঝাপড়া করে নিন। আমিও বলব'খন।

বাবা বললেন—এ বাড়ির অর্ধেক স্বত্ব তোমারও। আমি বলি কি, তুমি যখন এসেই গেছ ভাল সময়ে, তখন বাড়িটা ভাগ করে নাও। আমি তোমার ভাগে থাকব, তোমার মা না হয় তাঁর ছোট ছেলের কাছে ইচ্ছে হলে থাকবেন।

শুনেই আমার গা রি-রি করে ওঠে। এই ঘিঞ্জি কলোনীর তিন কাঠা জায়গায় দীনদরিদ্র একটুখানি দরমার বাড়ি—এর আবার ভাগ-বাঁটোয়ারা! তার উপর এখানে স্থায়ীভাবে থাকার ইচ্ছেও আমার কখনোই হয়নি, নিজের আত্মীয়স্বজন আমার এখন আর সহ্য হয় না।

আমি বললাম—ভাগ-বাঁটোয়ারা করার ইচ্ছে হয় না। এইটুকু জায়গা ভাগ করলে থাকবে কি?

বাবা বলেন—তবে বাবা, তুমি আলাদা কোথাও বাড়ি কর, বুড়ো বয়সে আমি গিয়ে তোমার কাছে শান্তিতে মরি।

আমি সামান্য ক্রুদ্ধ হয়ে বলি—বরাবরই কি আপনাদের বোঝা আমাকে বইতে হবে নাকি? একটা জীবন সংসারের পিছনে অপচয় করেছি। এখনো কি আমাকে স্বাধীনভাবে থাকতে দেবেন না?

বাবা খুব অবাক হয়ে বললেন—তোমাকে কোন কাজে কবে বাধা দিলাম বলো তো! ঠিক কথা তোমার ইঞ্জিনীয়ারিং পড়া হয়নি, কিন্তু অত ভাল সরকারী চাকরী ছেড়ে বিদেশে গেলে, আমরা তো বাধা দিইনি। এত বছর তো আমরা তোমার গলগ্রহ হয়ে থাকিনি। এই বুড়ো বয়সে এখন আর তোমরা ছাড়া আমাদের অভিভাবক কে আছে।

আমার নিষ্ঠুর মন এখন আর সহজে গলে না। খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম—আচ্ছা, সুহাসের সঙ্গে কথা বলে বাড়ি ভাগ করে দেবো, আপনারা আমার ভাগেই থাকবেন। কিন্তু আমি এ বাড়িতে থাকবো না।

বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন।

বাসায় খুব একটা ভাল লাগে না। কারণ, এখানে আমার আপনজন বলতে কেউ নেই, সারা পৃথিবীতে কেউ নেই, একমাত্র নীলু ছাড়া। বোন ভগ্নীপতিরা চলে গেল, তবু বাড়িতে গণ্ডগোল থামে না। প্রায় সারাদিনই সুহাসের বৌ নিমি মা বাবাকে বকাবকি করে। মা খুব একটা পাল্টা ঝগড়া করে না, কিন্তু ছেড়েও দেয় না। বাবা মাঝে মাঝে লাঠি হাতে তেড়ে ছেলের বৌকে মারতে যায়। অমনি নিমি বেরিয়ে এসে কোমরে হাত রেখে—ই-ইঃ মারবে! মারুক তো দেখি! বাবা ভয়ে পিছিয়ে আসে, আর নিমি তখন এক নাগাড়ে যাচ্ছেতাই বলে যায়। আমি যে বিদেশ-ফেরতা ভাশুর বাড়িতে আছি তা গ্রাহ্য করে না। ঝিয়ের মেয়েই বটে। সুহাস কোথায় কাজ করে তা আমি এখনো ভাল জানি না, তবে যা-ই করে, তা যে খুব উঁচু ধরনের কাজ নয় তা ওর আচার আচরণ থেকেই বোঝা যায়। ওর সহকর্মীরা যে নীচুতলার লোক তা সুহাসের কথা শুনলেও টের পাই। কথায় কথায় মুখ খারাপ করে ফেলে। একটু আড়াল হয়ে বিড়ি টানে দেখি। বৌকে নিয়ে সপ্তাহে দুবার নাইট শো দেখতে যায়।

বাড়ির খাওয়া-দাওয়া অত্যন্ত নীচু মানের। আমি এসে অবধি বাড়িতে বেশ কিছু সংসার খরচ দিয়েছি, তবু খাওয়ার মান ওঠেনি তেমন। তবে মাঝে মাঝে আমার মুখরক্ষা করতে মুর্গী রান্না হয়। প্রথম দিন আমাকে খাওয়ার সময়ে কাঁটা চামচ দেওয়া হয়েছিল দেখে হেসে ফেলেছিলাম।

বাড়িতে বেশীক্ষণ থাকতে পারিনি। বাইরে বাইরে খামোখা ঘুরে ঘুরে বেড়াই। কোথাও যাওয়ার ঠিক থাকে না। চাকরি-বাকরি করবো না ব্যবসা করব, তা নিয়ে ভাবি না। বেশ একটা ছুটি-ছুটি মনের ভাব নিয়ে আছি।

বিদেশে আমার যে টাকা জমেছিল তা নেহাত কম নয়। এ দেশের মুদ্রামানে প্রায় হাজার চল্লিশ টাকা। তাই এখনই চাকরির জন্য ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই।

পাঁচুদার সঙ্গে খুব খাতির ছিল। তার খোঁজ করতে গিয়ে শুনলাম ভদ্রলোক মরতে চলেছেন।

উঠে পড়লাম।

বেশ বেলা হয়ে গেছে। ঝি সরস্বতী আজ আসবে কিনা বুঝতে পারছি না। এত বেলা তো সে কখনো করে না। আসতেও পারে, নাও আসতে পারে। এক রিকশাওলার সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে। আমার কাছে একশটা টাকা চেয়েছিল। দেবে কোত্থেকে? আমার বাড়তি টাকা যা আছে তা বড় অল্পে অল্পে জমানো। দিই কি করে?

দাঁত মেজে এক কাপ চা করে খেলাম। বিছানা তুলতে ইচ্ছে করছে না। থাকগে, কে-ই বা আসছে দেখতে! সরস্বতী যদি আসে তো তুলবে'খন। সকালের চা করা, বিছানা তোলা এসব ও-ই করে।

আমি খবরের কাগজ রাখি না। ছোট্ট একটুখানি একটা ট্রানজিস্টার রেডিও আছে। সেটাই আমার সঙ্গী। অবশ্য এ ফ্লাটে মস্ত একটা রেডিওগ্রাম আছে অসীমদার, কিন্তু সেটার যন্ত্রপাতিতে মর্চে ধরেছে, চলে না। আমার ট্রানজিস্টার সেট-টারও ব্যাটারি ডাউন। চেরা আওয়াজ আসে। রেডিওটা চালিয়ে একটা ফ্যাসফেসে কথিকা হচ্ছে, শুনে বন্ধ করে দিলাম।

আজ ছুটি। কিন্তু ছুটির দিনগুলোই আমার অসহ্য। সময় কাটতে চায় না। শ্রীরামপুরের বাড়িতে চলে যেতে ইচ্ছে হয় মাঝে মাঝে, কিন্তু গেলেই অশান্তি। মাসীর বাড়িতেও যাওয়া হয় না। রোহিতাশ্ব চৌধুরীর বাড়িতে যেতে কেমন যেন লজ্জা করে আজকাল, ওদের বাড়িতে বেবীসীটারের চাকরি করেছি বলেই বুঝি এক হীনমন্যতা কাজ করে।

মুশকিল হল আমার বাসাতেও কেউ আসে না। আজ রোববারে কেউ কি আসবে? আসবে না, তার কারণ আমাকে কেউ ভাল চোখে দেখে না। আমার তেমন বন্ধু-বান্ধবও নেই। মাঝে মাঝে খুব কথা বলতে ইচ্ছে করে।

এখনো বর্ষা নামেনি এ বছর। গরমকালটা বড় বেশীদিন চলছে। এইসব ভয়ংকর রোদের দিনে ঘরের বাইরে যাওয়ার ইচ্ছেও হতে চায় না। একা ঘরে সারা-দিনটা কাটাবোই বা কি করে?

জানালা দরজা খোলা। আলোয় আলোয় ভেসে যাচ্ছে ঘর। আমি বাথরুমে ঘুরে এসে আয়নার সামনে বসে একটু ফিটফাট করে নিই নিজেকে। চুল আঁচড়াই, মুখে অল্প একটু পাউডার মাখি, কপালের একটা ব্রণ টিপে শাঁস বের করি। বেশ চেহারাটা আমার। লম্বা টান সতেজ শরীর, গায়ে চর্বি খুব সামান্য, মুখখানা লম্বা ধাঁচের, পুরু কিন্তু ভরন্ত ঠোঁট, দীর্ঘ চোখ। নাকটা একটু ছোটো কিন্তু তাতে কিছু ক্ষতি হয়নি। গায়ের রঙে জেল্লা আছে।

অনেককাল নাচি না। আজ একটু ইচ্ছে হল। কোমরে আঁচল জড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অল্প একটু পা কাঁপিয়ে নিলাম। তারপর কয়েকটা সহজ মুদ্রা করে নিয়ে

ধীরে ধীরে নাচতে থাকি। কিন্তু বুঝতে পারি শরীর আর আগের মতো হালকা নেই। বেশ কষ্ট হয় শরীর ভাঙতে, দমও টপ করে ফুরিয়ে গেল। হাঁপিয়ে বসে পড়লাম। তাতেও হল না। পাখা চালিয়ে শুয়ে রইলাম মেঝেয়। ঠান্ডা মেঝে, বুক জুড়িয়ে গেল। শুয়ে থেকে হঠাৎ মনে হল—আজ কেউ আসবে। অনেককাল কেউ আসে না। আজ আসবে। ভাবতে ভাবতে ঝিমধরা মাথায় কখন যে তন্দ্রা এল। সরস্বতী আসেনি, হরিণঘাটার ডিপো থেকে দুধের বোতল আনা হল না। একটু আনাজপাতি মাছ বা ডিম কিছু আনিয়ে রাখা দরকার ছিল। তাও হল না। সকালের জলখাবার বলতে কিছু খাইনি এখনো, খিদে পেয়েছে। এ সব ভাবতে ভাবতেও তন্দ্রা এল। কি আলিস্যি আর অবসাদ যে শরীরটার মধ্যে! বয়স হচ্ছে নাকি! মাগো!

খুব বেশীক্ষণ মটকা মেরে পড়ে থাকা হল না। পিয়ানোর হালকা শব্দ তুলে কলিং বেল পিং আওয়াজ করলো। সদর দরজাটা ভেজানো আছে, সরস্বতী হলে বেল না বাজিয়ে হুড়ুম হুড়ুম করে ঢুকে পড়তো। এ সরস্বতী নয়, অন্য কেউ!

দরজা খুলে একটু খুশীই হই। আমার অফিসের সেই স্মার্ট ও সুপুরুষ যুবক সুকুমার দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে। যদিও সুকুমারকে আমি সেই অর্থে ভালবাসি না, তবু ওর সঙ্গ তো খারাপ নয়। জানি না বাপু আমাদের মনের মধ্যে কি পাপ আছে। পাপ একটু আধটু আছে নিশ্চয়ই। নইলে সুকুমারের ঐ দুর্দান্ত বিশাল জোয়ান চেহারা আর হাসির জবাব রঙ্গ রসিকতায় ভরা কথাবার্তা আমার এত ভাল লাগে কেন। আমরা পরস্পরকে 'তুমি' করে বলি, সেটাও পাঁচজনের সামনে নয়, দুজনে একা হলে তবেই। তাহলে নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটু পাপ-টাপের গন্ধ পাওয়া যাবে।

বাইরের ঘরে বসে ও তেমনি হাসি মুখে বলল—তোমাকে একটু বিরহী বিরহী দেখাচ্ছে অলি।

ওর হাসিটা যেন একটু কেমন। মানুষ খুব নার্ভাস হয়ে পড়লে মাঝে মাঝে ও রকম হাসি হাসে। ওর মতো চটপটে বুদ্ধিমান ছেলের নার্ভাস হওয়ার কথা নয়।

আমি বললাম—বিরহ নয় বিরাগ। বোসো, আজ আমার ঝি আসেনি, নিজেকেই চা করতে হবে।

ও বিরস মুখ করে বলে—ও আমি ভেবেছিলাম তোমার বাসায় আজ ভাত খাবো দুপুরে। কিন্তু ঝি যখন আসেনি—

কথাটা আমার কানে ভালো শোনাল না। ভাত খাবে কেন? এ প্রস্তাবটা কি একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না?

আমি বললাম—আমি নিজে কতদিন না রেঁধে শুকনো খাবার খেয়ে কাটিয়ে দিই! আজও অরন্ধন।

সুকুমার নড়ে চড়ে বসে বলল—এসে তোমার ডিসটার্ব করছি না তো!

—মোটেই নয়। আজ আমার খুব একা লাগছিল।

—আমারও।

—মনে হচ্ছিল কেউ আসবে।

boiRboi.net

সুকুমারের মুখ হঠাৎ খুব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ও বলে—কে আসবে বলে ভেবেছিলে? আমি?

—না। বিশেষ কারো কথা নয়। যে কেউ।

—আমার কথা তুমি ভাবো না অলি?

পুরুষমানুষদের এই এক দোষ। তারা চায় মেয়েরা সব সময় তাদের কথা ভাবুক। বড় জ্বালা। জয়দেবও বোধহয় তাই চাইত।

আমি একটু হেসে বললাম—ভাবব না কেন? তবে আমার ভাবনা খুব ভাসা ভাসা। গভীর নয়।

সুকুমারের স্মার্টনেস আজ যে কোথায় গেল? সে আজ একদম বেকুব বনে গেছে। মুখের রঙ অন্যরকম, চোখ অন্যরকম। আমি বাতাসে একটা বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।

আজ সুকুমার খুব ভাল পোশাক পরে এসেছে। সাদা রঙের ওপর নীল রঙের নক্শা করা পাতলা টেরিভয়েলের ছ্যাঁদাওয়ালা জামা, খুব সুন্দর ধূসর রঙের প্যাণ্ট পরা, পায়ে ঝকঝকে মোকাসিন। হাতে এই ছুটির দিনেও একটা পাতলা ভি আই পি স্যুটকেশ। রুমালে মুখ মুছে বলল—অলি, হঠাৎ এলাম বলে কিছু মনে করো না।

আমি হেসে বললাম—তুমি এর আগেও একবার এসেছিলে, তখনও কিছু মনে করার ছিল না। মনে করব কেন?

সুকুমার ভাল করে কথা বলতে পারছে না আজ। আমার দিকে ভাল করে তাকাচ্ছেও না। বলল—ভীষণ খারাপ সময় যাচ্ছে আমার।

—কেন, খারাপের কি? সদ্য একটা লিফ্‌ট্ পেয়েছো?

সুকুমার ব্যথিত হয়ে বলে—সবসময়ে টাকার পয়েণ্টে লোকের ভাল মন্দ বিচার করা যায় না। সেসব নয়। আমার মনটা ভাল নেই।

—কেন?

—তোমার সেটা বোঝা উচিত।

আমি এ ব্যাপারে খানিকটা নিষ্ঠুর। সুকুমার কি বলতে চায় তা আমার বুঝতে দেরি হয়নি। কিন্তু এ সব প্রস্তাবকে গ্রহণ বা গ্রাহ্য করা আমার সম্ভব নয়। বললাম—তোমার প্রবলেম নিয়ে আমি চিন্তা করব কেন? আমার ভাববার মতো নিজস্ব প্রবলেম অনেক আছে।

—অলি, তুমি কিন্তু সেল্‌ফ সেণ্টারর্ড।

—সবাই তাই। তুমিও কি নিজের স্বার্থ থেকেই সব বিচার কর না?

সুকুমার সিগারেট খেল কিছুক্ষণ। ওর হাত বশে নেই। বলল—সেটা ঠিকই। কিন্তু তুমি যে হ্যাপী নও এটা নিয়েও আমি ভাবি।

আমি হেসে বললাম—সেটা ভাবতে না যদি আমার ওপর তোমার লোভ না থাকতো।

—লোভ! বলে আঁতকে উঠল সুকুমার। বলল—লোভ অলি? লোভ কথাটা কত অশ্লীল তুমি জান? লোভের কথা বললে কেন?

boiRboi.net

—তবে কি বলব, প্রেম ? ভালবাসা ?

সুকুমার অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বলে—আমি তো তাই ভাবতাম।

মাথা নেড়ে বললাম—পুরুষমানুষ আমি কম দেখিনি। লোভ কথাটাই তাদের সম্বন্ধে ঠিক কথা। পুরুষেরা মেয়েদের চায় বটে, কিন্তু সে চাওয়া খিদের খাবার বা নেশার সিগারেটের মতো।

—তুমি বড্ড ঠোঁটকাটা। বলে সুকুমার হাসে একটু। বলে—সে থাকগে। তর্ক করে কি কিছু প্রমাণ করা যায় ? বরং যদি আমাকে একটা চান্স্ দিতে অলি, দেখতে মিথ্যে বলিনি

—চা করে আনব ?

—আনো।

চা খেয়ে সুকুমার নিজের হাতের তেলোর দিকে নতমুখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

আমার একটু মায়া হল। ও আমাকে ভয় পাচ্ছে। এত বড় চেহারা, এত ভাল দেখতে, তবু একটা মেয়েকে অত ভয় কেন পুরুষমানুষের ?

নরম গলায় বললাম—কি বলবে বল।

—কি বলব, বলার নেই।

—শুধু বসে থাকবে ?

—না, উঠে যাবো এক্ষুনি।

—সে তো যাবেই জানি। কিন্তু মনে হচ্ছিল, আজ তুমি কি একটা বলতে এসেছিলে।

সুকুমার হঠাৎ তার যাবতীয় নার্ভাসনেস ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে মরীয়া হয়ে খাড়া হয়ে বসল। আমার দিকে সোজা অপকট চোখে চেয়ে বলল—শোন অলি, তোমাকে আমি ছাড়তে পারব না। অনেক চেষ্টা করেছি মনে মনে, পারিনি।

এসব কথা শুনলে আমার হাই ওঠে। অবাস্তব কথা সব, একবিন্দু বিষয়বুদ্ধি নেই এসব আবেগের মধ্যে। আমি এঁটো কাপ তুলে নিয়ে চলে আসি। বেসিনে রেখে ট্যাপ খুলে দিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম একা ভাল লাগে না।

হঠাৎ সুকুমার ঘরের বাইরের থেকে ভিতরে চলে এল, খুব কাছে পিছনের দিকে দাঁড়িয়ে আমার দু কাঁধ আলতো হাতে ধরে অল্প কাঁপা গলায় আর গরম শ্বাসের সঙ্গে বলল—অলি, এর চেয়ে সত্যি কথা জীবনে বলিনি কাউকে। গত তিন রাত ঘুমোতে পারিনি। কিছুই ভাল লাগছে না, তাই আজ দীঘা যাওয়ার টিকিট কেটে এনেছি।

—যাও ঘুরে এসো। সমুদ্রের হাওয়ায় অনেক রোগ সেরে যায় এটাও হয়তো যাবে।

—রোগ ! কিসের রোগ ! আমার কোন রোগ নেই।

কলের জল পড়ে যাচ্ছে হিলহিল করে। সেই দিকে চেয়ে থেকে বললাম—কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নাও, তোমার হাত ভীষণ গরম।

এসব সময় যা হয়, তাই হল। অপমানিত পুরুষ যেমন জোর খাটায়, তেমনি সুকুমারও আমাকে জড়িয়ে ধরল হঠাৎ। একটা বিরক্তিকর অবস্থা।

হঠাৎ সরস্বতীর ভৌতিক গলা চেঁচিয়ে উঠল—উরেশ্বাস, এ কি গো !

boiboi.net

সুকুমার প্রায় স্ট্রোকের মুরগীর মতো অবশ হয়ে টলতে টলতে সরে গেল। সরস্বতী দরজায় দাঁড়িয়ে!

লজ্জায় মরে গিয়ে বললাম—এই হচ্ছে তোমার দাদাবাবু। ফেরাতে এসেছে।

জয়দেব আর আমার বিয়ে ভাঙার ব্যাপারটা সরস্বতী জানে। তাই সে বুঝল সুকুমারই হচ্ছে সেই জয়দেব। খুব হাসি মুখে বলল—তাহলে এতদিনে বাবুর মতি ফিরেছে, ভূত নেমেছে ঘাড় থেকে!

আমি কথাটা চাপা দেওয়ার জন্য বললাম—দেরি করলে যে বড়। সারা সকাল আমি কিছু খাইনি জানো!

—কি করব দিদি, টাকার জোগাড় করতে সেই মোমিনপুর গিয়েছিলাম কুসমীর কাকার কাছে। সে পানের দোকান করে। পয়সা আছে। দয়া-ভিক্ষে করতে পাঁচশটা টাকা দেবে বলেছে।

আমি বললাম—কাজকর্ম তাড়াতাড়ি সারো তো। বোকো না।

—দাদাবাবুর জন্য মিষ্টি-টিষ্টি এনে দেবো নাকি? দাও তাহলে পয়সা। চায়ের জল চড়িয়ে দোকান থেকে আসি।

কঠিন গলায় বললাম—না।

বসবার ঘরের ঠিক মাঝখানটায় সম্পূর্ণ গাড়লের মতো দাঁড়িয়ে ছিল সুকুমার। ভাল পোশাক, চমৎকার চেহারা তবু কি অসহায় আর বোকা যে দেখাচ্ছে!

আমি হেসেই বললাম—মাথা ঠাণ্ডা রেখো, বুঝলে! আমারও তো কিছু নিজস্ব পছন্দ অপছন্দ থাকতে পারে।

—সে জানি।

—ছাই জানো। আমার স্বামী লোকটা খুব খারাপ নয়। অন্ততঃ লোকে তাকে খারাপ বলে না। তবু তাকে আমার পছন্দ হয়নি বলেই তার সঙ্গে থাকিনি। তুমি কি ভাবো আমি একা থাকি বলে খুব সহজে বশ করে নেওয়া যাবে আমাকে?

—তুমি কখনোই আমাকে বুঝলে না অলি। বোধহয় ভালবাসা তুমি বুঝতেই পারো না। থাকগে যা হয়েছে তার জন্য ক্ষমা করে দিও।

সুকুমার চলে যাচ্ছিল। আমি বললাম—এখন কি সোজা দীঘায় যাবে?

সুকুমার হতাশ গলায় বলল—দীঘায় একা যাওয়ার প্রোগ্রাম তো ছিল না।

—তাহলে?

—ইচ্ছে ছিল তোমাকেও নিয়ে যাবো। দুটো কটেজ বুক করে রেখেছি, বম্বে এক্সপ্রেসে দুটো ফার্স্ট ক্লাস টিকিট কেটে রেখেছি। কিন্তু সে সব ক্যানসেল করতে হবে।

ওর দুঃসাহস দেখে আমি হতবাক। বলে কি! আমাকে নিয়ে দীঘা যেতে চেয়েছিল?

কিন্তু এ বিস্ময়টা আমার বেশীক্ষণ থাকলো না। ও রকম পাগলামির অবস্থায় মানুষ অনেক বেহিসেবী কাজ করে। বললাম—আমাকে দীঘায় নিয়ে কি করতে তুমি?

সুকুমার মনোরঙ্গীর মতো হাসল একটু। বলল—আমাকে বিশ্বাস কোরো না

boiRboi.net

অলি ? আমার মাথার ঠিক নেই। কত কি ভেবে রেখেছি কত কি করতে পারি এখনো।

আমি মাথা নেড়ে বললাম—এ সব ভাল নয়। তুমি আমার ক্ষতি ছাড়া কিছু করতে পারো না আর।

—বোধহয় তুমি ঠিকই বলেছো। আমি নিজেকেও আর বিশ্বাস করি না।

আমি বললাম—দাঁড়াও এক্ষুণি চলে যেও না।

—কেন ?

—মনে হচ্ছে, তুমি একটা বিপদ করবে। বসে একটু বিশ্রাম করো। আজ বরং দুপুরে এখানেই খেয়ে যাও।

সুকুমার বসল।

সুকুমার প্রায়ই এর ওর হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলে। আসলে ও হাত দেখার কিছুই জানে না, কেবল ব্লাফ্ মারে। কিন্তু ভবিষ্যৎবাণীগুলো বানায় বেশ চমৎকার। নতুন ধরনের কথা বলে। কাউকে হয়তো বলে শীতকালটায় আপনি খুব বিষণ্ণ থাকেন। আমাদের অফিসের বড় কর্তাকে একবার বলেছিল—সামনের মাসে আপনাকে চশমার পাওয়ার পালটাতে হবে, একটা দাঁত তোলাবেন ফেব্রুয়ারী মাসে। এই রকম সব। অফিসের মেয়েদের হাত দেখে এমন সব কথা বলে যে মেয়েরা পালাতে পারলে বাঁচে। একবার আমার হাত দেখে সুকুমার বলেছিল—শুনুন মহিলা, আপনার একটা মুশকিল হল আপনি সকলের সঙ্গে বেশ সহৃদয় ব্যবহার করতে ভালবাসেন। স্নেহ-মায়া আপনার কিছু বেশী। কিন্তু তার ফলে লোকের সব সময়ে মনে হয় যে আপনি তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন বা প্রেমে পড়েছেন। একটু রূঢ় ব্যবহার করতে শিখুন, ভাল থাকবেন।

কি ভীষণ মিথ্যে কথা, আবার কি ভীষণ সত্যিও। সুকুমারের ঐ ভুয়ো ভবিষ্যৎ-বাণী তার নিজের সম্পর্কেই কেমন খেটে গেল।

স্নেহবশে মায়ায় ওকে আমি দুপুরে খেয়ে যেতে বললাম। আসলে ঐ ছুতোয় ওকে একটুক্ষণ আটকে রাখার জন্যই। নইলে ওর যে রকম মনের অবস্থা দেখছি, হয়তো রাস্তায় গিয়ে গাড়ি চাপা পড়বে। আর সেই আটকে রাখাটাই বুঝি ভুল হল। সুকুমার ভাবল, আমার মানসিক প্রতিরোধ ভেঙে পড়ছে, আমি ওকে প্রশ্রয় দিতে শুরু করেছি।

দুপুরের খাওয়া শেষ করে সুকুমার বাইরের ঘরে বসে সিগারেট ধরাল। সরস্বতী চলে গেছে, কাল সকালে ফের আসবে। যাওয়ার আগে সে সুকুমারের সঙ্গে কিছু তরল রসিকতাও করে গেল আমাকে নিয়ে।

আমি মনে মনে চাইছিলাম সুকুমার এখন চলে যাক। সুকুমার গেল না। সারা বেলা আমাদের খুব একটা কথা হয়নি। আমি রান্নাঘরে রেঁধেছি, সুকুমার বাইরের ঘরে বসে বইপত্র পড়েছে।

দুপুরে রোদ আর গরমের ঝাঁঝ আসে বলে দরজা জানলা সরস্বতী যাওয়ার আগেই বন্ধ করে দিয়ে যায়। বেশ অন্ধকার আবছায়ায় সুকুমারের সিগারেট জ্বলছে। আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। ছুটির দিনে আত্মীয়-স্বজন কেউ যদি হুট করে চলে আসে, তো

boiRboi.net

আমার কোনো সাফাই কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু সুকুমারকে কি করে চলে যেতে বলি ?

মুখোমুখী বসেছিলাম। বললাম—তুমি কি বিশ্রাম করবে, না যাবে এক্ষুনি ?

সুকুমার আয়েসের স্বরে বলল—এই গরমে বের করে দেবে নাকি ?

—তা বলিনি—বলে অস্বস্তিতে চুপ করে থাকি। ভেবে চিন্তে বললাম—তাহলে এ ঘরে বিশ্রাম নাও। আমি ওঘরে যাই।

শোওয়ার ঘরে এসে কাঁটা হয়ে একটু শুতে না শুতেই আবছা একটা মূর্তি এসে হঠাৎ জাপটে ধরল আমাকে। সুকুমার। আমি প্রতিমুহূর্তে এই ভয় পাচ্ছিলাম। ওর শ্বাস গরম, গা গরম, উন্মাদের মতো আশ্লেষ। ও খুনে গলায় বলল—তোমাকে মেরে ফেলব অলি, যদি রাজি না হও আমাকে বিয়ে করতে।

আমার কোনো কথাই ও শুনতে পাচ্ছে না। গ্রাহ্য করছে না আমার কিল, ঘুষি, আঁচড়, কামড়।

হঠাৎ বহুকাল নিস্তব্ধতার পর বিপদসংকেতের মতো টেলিফোনটা বেজে উঠল। সেই শব্দে চমকে সুকুমার একটু থমকাল। আমি নিজেকে সামলে গিয়ে টেলিফোন তুলে বললাম—হ্যালো।

একটা গম্ভীর গলা বলল—আপনার ঘরে কে রয়েছে ?

এত ভয় পেয়েছিলাম যে রিসিভার হাত থেকে ঘসে পড়ে যাচ্ছিল প্রায়, ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম—আপনি কে বলছেন ?

উত্তর এল—ঐ লোকটাকে ঘর থেকে বের করে দিন।

টেলিফোনটা কেটে গেল আচমকা।

প্রভাস রঞ্জন

সকাল থেকেই আজ মেজাজে আছি। কোনো খুশখবর নেই, মন ভাল থাকার কোনো কারণও দেখছি না, তবু কেন মনটা নবাবী করছে ?

ঐ রকম হয় মাঝে মাঝে। বেঁচে থাকাটাকে যখন শবদেহ বহনের মতো কষ্টকর লাগে সব সময়ে তখন মাঝে মধ্যে বুঝি প্রাকৃতিক নিয়মে মরবার আগে হঠাৎ সুস্থ হয়ে ওঠার ছদ্ম লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঈশ্বর করুণাপরবশ হয়ে এক বিন্দু খুশী মিশিয়ে দেন জীবনে। তখন বুঝতে হয় যে কঠিন দিন আসছে।

সে যাকগে। অতীতের চিন্তা আর ভবিষ্যতের ভাবনা দিয়ে এখানকার খুশীর মেজাজটাকে নষ্ট করার মানেই হয় না। দীর্ঘদিন ইউরোপে থেকে শিখেছি, বর্তমানটাকে যতদূর সম্ভব উপভোগ করাটাই আসল। যে সময় চলে গেছে বা যে সময় আসেনি, তার কথা চিন্তা করা এক মস্ত অসুখের কারণ। যদি আমুদে হতে চাও তো সে চিন্তা ছাড়ো।

প্রায় এক মাস হয়ে গেল দমদমের বাড়ি ছেড়ে পার্ক সার্কাসে চলে এসেছি। স্থায়ীভাবে এসেছি এ কথা বলা যায় না। মা বাবাকে সে রকম কিছু বলে আসিনি।

তবে দমদমে বাড়িতে আর ফিরে যাওয়ার ইচ্ছেও নেই। সেখানে বড্ড বেশী অশান্তি। আমার ভাদ্রবধূটি বাড়িটাকে নরক করে তুলেছে।

একদিন বীভৎস ঝগড়ার পর আমি ভাইকে ডেকে বললাম—পাড়ার পাঁচজনকে ডাকো, বাড়ি ভাগ হোক।

তাতে সুহাসের আপত্তি। সে বলে—ভাগাভাগি কিসের!

আমি গম্ভীর হয়ে বলি—বাবা চাইছেন তোমার আমার মধ্যে ভাগ করে দিতে।

সে বলল—তুমি তো আর এখানে থাকবে না! চলেই যাবে অন্য কোথাও তবে ভাগ করব কেন?

সুহাসের বৌও তেড়ে এল—আপনার কোনো দাবি নেই। আপনি তো বাইরের লোক হয়ে গেছেন। আমরা থাকি, বাড়িতে আমাদের স্বত্ব বেশী।

কথাটা অযৌক্তিক, কিন্তু এত জোর দিয়ে বলল যে আমি খুব অসহায় বোধ করতে লাগলাম। আমার মাও, কেন জানি না, বাড়ি ভাগাভাগির বিরুদ্ধে। কেবল বাবা ভাগাভাগি চাইছেন, এবং খুব মরীয়া হয়ে চাইছেন। কাজেই ফের ঝগড়া লেগে গেল।

নিমি আমাকে স্পষ্ট বলল—আপনার তো চরিত্র খারাপ। বিদেশে কি সব করে বেড়িয়েছেন তা কি আমরা টের পাইনি।

সুহাস নিমির পক্ষ নিয়ে বলে—তোমাকে তো ওদেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাই এসে ঘাড়ে পড়েছো। বেশী স্বত্ব টত্ব দেখিও না, খারাপ হয়ে যাবে। এ পাড়ায় এখনো আমার এক ডাকে দুশো লোক চলে আসবে।

সুহাসের কথা শুনে খুব অবাক হই না। এ রকমটাই আশা করছিলাম এতদিন। আর ও কথাটা ঠিক, এ পাড়ায় ওর বেশ হাঁক-ডাক আছে।

এ রকম কুৎসিত পরিস্থিতিতেই ছেলেবেলায় মানুষ হয়েছি। ঝগড়া, মারামারি, পৃথিবীর সবচেয়ে নোংরা গালাগালি এ সবই আমাকে গঙ্গাজলে শুদ্ধ করেছে বহুবার।

ভয়টয়ও বড় একটা হল না। শুধু ঠাণ্ডা গলায় সুহাসকে বললাম—বাড়ি ভাগ ঠেকাতে পারবে না। দরকার হলে আমি পুলিশকে খবর দেবো, বলবো যে তুমি আমাকে ওয়ার্নিং দিয়েছো।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! সুহাস আর তার বৌ ঝগড়ার চোটে প্রায় নাচতে লাগল। সুহাস তড়পায়, পেছন থেকে নিমি তাকে সাহস দেয়। শক্তিদায়িনী নারী কাকে বলে জানলাম! দুজনেই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য, কাপড়-চোপড় গা থেকে খসে পড়ছে প্রায়।

এ বাড়ি ভাগ করা যে আমার কর্ম নয় তা বুঝলাম। ভীমরুল চাক বেঁধেছে, ঢিল মারলে রক্ষে নেই। বাবাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললাম—দেখছেন তো ওদের অ্যাটিচুড। বাড়ি ভাগ কি করে হবে?

বাবা অসহায়ভাবে বললেন—তুমি আলাদা বাসা করো।

সেই পুরানো কথা। বিরক্ত হয়ে বলি—সেটা সম্ভব নয়। আলাদা বাসা করলেও আমি আপনাদের সঙ্গে থাকব না। আমার একা থাকা দরকার।

বাবা চুপ করে রইলেন। অনেকক্ষণ বাদে বললেন—বাবা প্রভাস, আমি সারা

boiRboi.net

জীবন কখনো সুখে থাকিনি। গত জন্মের দোষ ছিল বোধহয়। তা এখন কি করতে বলো আমাকে? গলায় দড়ি দেবো?

আমি কিছু লজ্জা পেয়ে চুপ করে থাকি।

বাবা বললেন—তুমি বিদেশ থেকে ফিরে এসেছো দেখে বড় আশায় বুক বেঁধেছিলাম। বিশ্বাস ছিল, তুমি আমাকে ফেলবে না। কিন্তু এখন—

আমি বললাম—তার চেয়ে কোনো হস্টেলে গিয়ে—

বলতে বলতে বুঝতে পারি, বিদেশের মতো তো আর এখানে বুড়ো বুড়ির জন্য হস্টেল নেই। বাবা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম—কোনো আশ্রম-টাশ্রমে যদি বন্দোবস্ত হয় তাহলে?

বাবা মাথা নাড়লেন। চোখে বুঝি জল এসেছিল, সেটা মুছে নিয়ে বললেন—বুঝেছি। আপত্তি কি? তাই না হয় দেখ।

বাবাকে ভরসা দিয়ে বললাম—টাকা যা লাগে আমি কষ্ট করে হলেও দেবো'খন।

—সে জানি। দিও। তোমরা না দিলে গতি কি?

যোগাযোগ করে নানা মরুব্বি ধরে বাবার জন্য কাশীতে একটা বন্দোবস্ত হল। মাসখানেক আগে বাবা একখানা তোরঙ্গ আর শতরঞ্জিতে বাঁধা বিছানা নিয়ে ট্রেনে চাপলেন।

মার জন্য খুব চিন্তা নেই। মা যেন কি ভাবে এই সংসার প্রোথিত বৃক্ষের মতো রয়েই গেল। সাধারণত শাশুড়ির সঙ্গে বৌদের অবনিবনা দেখা যায়। আমাদের বাড়িতে উল্টো নিয়ম দেখি। তার মানে এই নয় যে নিমিতে আর মাতে ঝগড়া হয় না। বরং খুবই হয়। কিন্তু সুহাসের বুঝি মায়ের প্রতি একটু টান আছে। বাড়িতে ঢুকেই বিকট একটা 'মা' ডাক দেয় রোজ। আর একটা ব্যাপার হল, এ সংসারে হাজারো কাজে মা জান বেটে দেয়। বিনি মাগনা কেবল খোরাকী দিয়ে এমন বিশ্বস্ত ঝি-ই বা নিমি কোথায় পাবে। তাই ঝগড়াঝাঁটি হলে, মাকে ফেলতে চায় না। মায়েরও আবার সুহাসের ওপর টান বেশী। এ সব টানের কোনো ব্যাখ্যা হয় না। সবচেয়ে অপদার্থ ছেলেটাকেই মা কেন ভালবাসে তা বিশ্লেষণ করা বৃথা।

বাড়ির এই পরিস্থিতিতে যখন আমি বাড়ি ছাড়বো-ছাড়বো ভাবছি, সেই সময়ে মুমূর্ষু পাঁচুদা একদিন আমাকে বললেন—তোর যখন বনছে না তখন আমার বাসাটায় গিয়ে থাক না কদিন। তালাবন্ধ পড়ে আছে।

বাঁচলাম হাঁপ ছেড়ে। শোনার পর আর অপেক্ষা করিনি। সে রাতটা ভাল করে ভোর হওয়ার আগেই পাঁচুদার পার্ক সার্কাসের ফ্ল্যাটে এসে উঠেছি।

ব্যাচেলার মানুষ পাঁচুদা। ঘরে রান্নাবান্নার সব বন্দোবস্ত রয়েছে। আসবাবপত্রও কিছু কম নেই। সারাজীবন নিজের শখ শৌখিনতার পিছনে অজস্র টাকা পয়সা ঢেলে গেছেন। টাকা পয়সা জমাননি বড় একটা। ঠকবাজেরাও লুটেপুটে নিয়েছে। ফ্ল্যাটে এসে শুনলাম ছ'মাসের ভাড়া বাকি পড়ে আছে। অথচ বাথরুমে গীজার, ঘরের মেঝেয় কার্পেট, রান্নাঘরে মিনি রেফ্রিজারেটার—কি নেই?

হাসপাতালে দেখা করতে গেলে পাঁচুদা বললেন—যদি আমি বেঁচে যাই তো আলাদা কথা, নইলে ঐ ফ্ল্যাট তোকেই দিয়ে গেলাম। সব জিনিসপত্র শুদ্ধু।

আমি বললাম—অত কিছু বলার দরকার নেই পাঁচুদা। আপনি মরছেন না শীগগীর। আপাতত কিছুদিন থাকার জায়গা পেলেই আমার যথেষ্ট।

বাড়িওলাকে ছ'মাসের ভাড়া আমাকে শোধ করতে হল। লোকটা গণ্ডগোল শুরু করেছিল। টাকা পয়সা খরচ হল বটে, কিন্তু মোটামুটি একটা থাকার জায়গা পেয়ে বড় খুশী লাগল। দমদমের নরক থেকে তো দূরে আছি।

জ্যোতিষ নরেনবাবু কিন্তু মাস দুয়েক আগে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন মাসখানেকের মধ্যে বাসস্থানের পরিবর্তন।

লোকটার ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে যায়।

সারাদিন প্রায়ই কাজ থাকে না। রান্নাবান্না করি, খাই। দুপুরে একটু ঘুম। বিকেলের দিকে নরেনবাবু কিংবা পাঁচুদার ওখানে যাই। বন্ধু বান্ধব কেউ নেই। নিরালা, নির্জন সময় কাটে। বেঁচে থাকার অর্থ নেই।

এ বাড়ির দোতলা থেকে প্রায়ই একটা মেয়েকে নামতে উঠতে দেখি। চেহারাটা বেশ। বিয়ের বয়স হয়েছে তো বটেই, একটু বেশীই হয়েছে বুঝি। মাথায় সিঁদুর দেখি না। খুব সাজগোজ করে অফিসে যায়। তার বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনও কেউ আসে না বড় একটা। মেয়েটা আমার মতোই একা কি?

ভেবে ভেবে একটু কেমন হয়ে গেল মনটা, দীর্ঘদিন বিদেশে থেকে আমার মেয়েদের সম্পর্কে বাঙালীসুলভ লজ্জা সংকোচ হয় না। আবার কাউকে দুদিন দেখলেই প্রেমে পড়ে যাওয়ার মতো দুর্বলতাও নেই আমার। বরং মেয়েদের ব্যাপারে আমি এখন অতিশয় হিসেবী।

নিচের তলায় পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোক বড় একটা ইংরেজি কাগজের রিপোর্টার। অল্প ক'দিনেই আমার সঙ্গে বেশ খাতির হয়ে গেছে। তাঁর বৌকে বৌদি বলে ডাকি। মাঝে মধ্যে মাংস বা মাছ পাঠিয়ে দেন, কফি করে ডেকে নিয়ে খাওয়ান। দুজনেরই বয়স চল্লিশের ওপরে। রিপোর্টার ভদ্রলোকের নাম মধু মল্লিক। নিজের কাজে তাঁর বেশ সুনাম আছে। ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান অনেকবার ঘুরে এসেছেন। নিজের কাজকে প্রাণাধিক ভালবাসেন। আর সেই কারণেই তাঁকে অনবরত বাইরে ঘুরে বেড়াতে হয়। গত কয়েকমাসে দেখলাম, মধু মল্লিক একবার দিল্লি-বম্বে, একবার অরুণাচল প্রদেশ, একবার ওড়িশা ঘুরে এলেন। তা ছাড়া দিন রাত অফিসের গাড়িতে শহর চক্কর মারা তো আছেই। বলেন—ভাই, এই চাকরি করতে করতে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে দুদিন ঘরে থাকতে হলে হাঁপিয়ে পড়ি। তাই ভয় হয়, রিটায়ার করলে এক হপ্তাও বাঁচব না।

বৌদি সারাদিনই প্রায় একা। তিনটে ছেলে মেয়ে আছে যথাক্রমে চৌদ্দ, বারো আর তিন বছরের। ছোটোটি ছেলে, বড় দুটি মেয়ে। মেয়ে দুজন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে মডার্ন স্কুলে। নাচ গান শেখে, একজন ওরিগামী শেখে, অন্যজন ল্যাংগুয়েজ ক্লাশ করতে রামকৃষ্ণ মিশনে যায়। বেশ ব্যস্ত তারা। ছোট ছেলেটিকে নিয়ে বৌদি খানিকটা নিঃসঙ্গ। আমাকে ডেকে নিয়ে গল্প করতে বসেন। বেশ একটা মা-মা ভাব তার মধ্যে। মোটাসোটা গিন্নিবান্নি চেহারা। মুখে সর্বদা পান আর হাসি।

সে যাকগে। বৌদির একটা সময় কাটানোর শখ আছে। স্বামী খবরের কাগজের

রিপেটোর, বৌ পাড়ার যাবতীয় খবরের সংবাদ সংস্থা। পরিচয় হওয়ার সাত দিনের মধ্যে আমি এ পাড়ার যাবতীয় খবর জেনে গেছি। তার মধ্যে একটা খবরই কেবল বৌদি ভাল করে জানেন না। সে হল ওপর তলার ওই মেয়েটির খবর।

দুঃখ করে বললেন—অলকার বড্ড ডাঁট, বুঝলেন। অসীমবাবুরা যেমন সোশ্যাল মানুষ ছিলেন, বোনটি ঠিক তেমন আনসোশ্যাল। কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলে না, নিজেকে নিয়ে ও রকম থাকে কি করে?

আমি বললাম—নিশ্চয়ই একা থাকতে ভালবাসে। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই।

বৌদি হেসে বলেন—আপনি বিদেশে ছিলেন বলেই মেয়েদের একা থাকায় দোষ দেখেন না।

সে অবশ্য ঠিক। আমাকে স্বীকার করতে হয়।

বৌদি বললেন—একা কি আর সাধ করে আছে! স্বামী নেয় না, সে এক কথা। আবার শুনি মা বাপের সঙ্গেও বনিবনা নেই।

—দেখতে কিন্তু বেশ।

—হ্যাঁ। কিন্তু নাকটা চাপা। রঙও এমন কিছু ফর্সা নয়।

হাসলাম। মেয়েদের ঐ এক দোষ। কাউকে সুন্দর দেখতে চায় না। একটু না একটু খুঁত বের করবেই।

বৌদি বললেন—ওকে যে কেন সবাই এত সুন্দর দেখে বুঝি না। আমাদের কর্তাটিও প্রথম প্রথম ওকে দেখে মূর্ছা যেতেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—মেয়েটি কেমন?

বৌদি ভ্রূ কুঁচকে বললেন—ভাল আর কি! এ সব মেয়েরা আর কত ভাল হবে? তবু মিথ্যে কথা বলব না। এ বাড়িতে তেমন কিছু দেখিনি ওর। একা একা চুপচাপ থাকে। কারো দিকে লক্ষ্য করে না। বরং তিনতলার অবাঙালি পরিবারটা ভীষণ বাজে।

তবু অলকা সম্পর্কে খুব বেশী জানা গেল না। ওর স্বামী কে, কেন তার সঙ্গে ওর বনিবনা নেই, সে সব জানা থাকলে বেশ হত।

মধু মল্লিক একদিন জিজ্ঞেস করেন—ও মশাই, চাকরি বাকরি চান নাকি কিছু? আপনার তো বিদেশের টেকনোলজি জানা আছে।

আমি বললাম—কলকারখানার চাকরি করা আর পোষাবে না। ব্যবসা কিছু করতে পারি।

উনি তখন বললেন—জার্নালিজম করবেন? আপাততঃ একটা ফিচার লেখার বন্দোবস্ত করে দিতে পারি।

রাজি হলাম। টাকার জন্য নয়, সময় কাটানোর জন্য। গোটা দুই ফিচার লেখার বরাত পেয়ে ক'দিন বেশ ছোটাছুটি আর ব্যস্ততার মধ্যে কেটে গেল। প্রথম ফিচারটা ছিল কলকাতার হোটেলের ব্যবসার ওপর, দ্বিতীয় ফিচার ছিল যে সব ইণ্ডাস্ট্রি এদেশে নেই সেগুলোর ওপর।

প্রথম ফিচারটির মাল মশলা সংগ্রহ করতে সারা কলকাতা চার পাঁচদিন দাবড়ে

boiRboi.net

বেড়াতে হল। তারপর একদিন বসে মধু মল্লিকের টাইপরাইটার নিয়ে এসে লেখা শুরু করলাম। গরম পড়েছে বড্ড। পাখা চালিয়ে ঘরের দরজা খুলে হাট করে বসে কাজ করছি, এমন সময়ে একজন বেশ লম্বা চওড়া লোককে ওপরতলায় উঠতে দেখলাম। প্রথমটায় কিছু সন্দেহ হয়নি, কিন্তু একটু বাদেই বৌদি এসে এক কাপ চা রেখে বললেন—ভাই প্রভাসবাবু, একটু আগে একটা লোক—বেশ সুন্দর চেহারা অলকার ঘরে ঢুকেছে।

আমি বললাম—ভাই-টাই কেউ হবে।

—না মশাই, ভাই-টাই নয়।

—তবে ?

—সেইটেই রহস্য।

—ওর স্বামী নয় তো !

—না না স্বামীদের হাভভাব অন্যরকম। এ লোকটাকে বেশ নার্ভাস দেখাচ্ছিল। প্রেমে পড়েছে এমন চেহারা।

—যে খুশী হোগ গে। আমি অবহেলাভরে বললাম।

বৌদি বিরসমুখে বললেন—ভাবসাব ভাল নয়। একা অসহায় পেয়ে মেয়েটাকে যদি কিছু করে! আমাদের কর্তা থাকলে ঠিক ইন্টারফিয়ার করত। ওর খুব সাহস।

আমি পাত্তা দিলাম না। বৌদি চলে গেলেন। অনেকক্ষণ ধরে মন দিয়ে লেখাটা তৈরি করছিলাম। প্রথম ফিচার বেরোবে খবরের কাগজে, একটু যত্ন নিয়ে কাজ করাই ভাল।

দুপুরবেলায় যখন খাচ্ছি, তখন বৌদি এসে শেষতম বুলেটিন দিলেন—লোকটা এখনো নীচে নামেনি।

আমি অবাক হয়ে বললাম—তাতে কি ?

বৌদি হঠাৎ লাজুক স্বরে বললেন—ওপরতলায় একটা হুটোপাটির আওয়াজও পাচ্ছি।

আমি টেলিফোন তুলে নম্বরটা ডায়াল করলাম। বৌদি অবাক হয়ে দেখছিলেন। তারপর হেসে কুটিপাটি।

অলকা

boiRboi.net

লন্ড্রীওয়ালা আমার একটি শাড়ি হারিয়েছে। মনটা ভীষণ খারাপ। লন্ড্রীওয়ালা অবশ্য বলেছে—পাওয়া যাবে, ভাববেন না। কিন্তু আমার ভরসা নেই। আজ সকালে গিয়ে লোকটাকে খুব বকাবকি করেছিলাম। প্রথমটা তেমন রা করেনি। তারপর হঠাৎ কথার পিঠে কথা বলতে শুরু করল। বলল—সব লন্ড্রীতেই ওরকম হয়। আমাদের নিয়ম যা আছে ওয়াশিং চার্জের দশগুণ ক্ষতিপূরণ নিয়ে যেতে পারেন।

আমি অবাক, বলে কি ? ধোলাই তো মোটে তিন টাকার, তার দশগুণ হয় ত্রিশ

টাকা। কিন্তু আমার চাঁদেরী শাড়িটার দাম পড়েছিল একশ নব্বই, জয়দেব একটা একজিবিশন থেকে কিনে দেয়। খুব বেশী শাড়ি টাড়ি জয়দেব আমাকে কিনে দেয়নি ঠিকই, কিন্তু যে ক'খানা কিনে দিয়েছিল তার কোনটাই খেলো ছিল না। এসব ব্যাপারে ওর রুচিবোধ ছিল দারুণ ভাল।

শাড়িটার জন্য রাগে দুঃখে আমি পাগল পাগল। বললাম—ইয়ার্কি করছেন নাকি? দুশো টাকার শাড়ির ক্ষতিপূরণ ত্রিশ টাকা? আমি ক্ষতিপূরণ চাই না, শাড়ি খুঁজে দিন।

লণ্ড্রীওয়ালাও মেজাজ দেখাল—হারানো শাড়ির দাম সবাই বাড়িয়ে বলে। ও সব আমাদের জানা আছে। যা নিয়ম আছে সেই অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ নিতে পারেন, শাড়ি পাওয়া যাবে না। যা করবার করতে পারেন, যান।

শেষের ঐ 'যান' কথাটাই আমাকে ভীষণ অবাক আর কাহিল করে দিল। লণ্ড্রী-ওয়ালা লোকটার চেহারা ভীষণ লম্বা, কালো, গুণ্ডার মতো, বয়সেও ছোকরা। কয়েকদিন কাচিয়েছি এ দোকানে, খুব একটা খারাপ ব্যবহার করেনি। আজ হঠাৎ মনে হল, এই ইতর লোকটাই বুঝি দুনিয়ার সেরা শয়তান। আমারই বা কি করার আছে? কি অসহায় আমরা! 'যান' বলে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

রাগে দুঃখে ফেটে পড়ে আমি বললাম—যান মানে? কেন যাবো? আপনি যে কাপড়টা চুরি করে নেননি তার প্রমাণ কি? ওয়াশিং চার্জের দশগুণ ক্ষতিপূরণ দিলেই যদি অমন দামী একখানা কাপড় হাতিয়ে নেওয়া যায়—!

লোকটা বুক চিতিয়ে বলল—অ্যাঃ, দামী কাপড়! আমরা ভদ্রলোকের ছেলে বুঝলেন! দামী জিনিস অনেক দেখেছি, ফালতু পার্টি নই।

দোকানের দু একজন কর্মচারী মালিকের পক্ষে সায় দিয়ে কথা বলছে। খুব অসহায় লাগছিল আমার। এ সময় একজন জোরালো পুরুষ সঙ্গীর বড় দরকার হয় মেয়েদের।

একথা ভাবতে না ভাবতেই হঠাৎ যেন দৈববলে একজন ভদ্রলোক রাস্তা থেকে উঠে এলেন দোকানে। বেশ ভদ্র চেহারা, তবে কিছু রোগাভোগা। চোখেমুখেও বেশ দুঃখী বিনয়ী ভাব।

লোকটা দোকানে ঢুকে কয়েক পলক আমাকে দেখে নিয়ে মাথা নীচু করে বলল—ট্রাবলটা কি?

শোনাবার লোক পেয়ে আমি বেঁচে গেলাম। অবিরল ধারায় কথা বেরিয়ে আসছিল মুখ থেকে।

লোকটা শুনল। কথার মাঝখানে মাথাও নাড়ল। দোকানদার বাধা দিয়ে নিজের কথা বলতে চাইছিল, কিন্তু লোকটা তাকে পাত্তা দিল না। সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনে টুনে একটা বড় শ্বাস ফেলে বলল—হুঃ।

লোকটাকে আমার চেনা-চেনা ঠেকছিল প্রথম থেকেই। কোথায় যেন দেখেছি। কিন্তু তখন শাড়ি হারানোর দুঃখ আর লণ্ড্রীওয়ালার অপমানে মাথাটা গুলিয়ে ছিল বলে ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

লোকটা লণ্ড্রীওয়ালার দিকে একটু ঝুঁকে খুব আস্তে, প্রায় ফিস ফিস করে কি যেন

বলল। লণ্ড্রীওয়ালা সম্মতির ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল, দেখলাম।

আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছি। কিছু শুনতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছিল লোকটা যেন লণ্ড্রীওয়ালার বন্ধু, আবার আমারও শুভানুধ্যায়ী।

খানিকক্ষণ ঐসব ফিসফাস কথাবার্তার পর হঠাৎ লণ্ড্রীওয়ালা আমার দিকে তাকিয়ে বলল—দিদি, একটা শেষ কথা বলে দেবো? আমি একশটা টাকা দিতে পারি খুব জোর।

আমি ভীষণ অবাক হয়ে যাই। যদিও আমার শাড়িটার দাম অনেক বেশী, তাহলেও সেটা তো অনেকদিন পরেছি। তা ছাড়া ত্রিশ টাকার জায়গায় একশ টাকা শুনে একটা চমক লেগে গেল। তবু বেজার মুখ করে বললাম—তাও অনেক কম। তবু ঠিক আছে।

লণ্ড্রীওয়ালা টাকা নিয়ে কোন গোলমাল করল না, সঙ্গে সঙ্গে একটা ড্রয়ার টেনে টাকা বের করে দিল। রসিদ সই করে দিলে লণ্ড্রীওয়ালা লোকটিকে বলল—প্রভাসবাবু, আপনিও সাক্ষী হিসেবে একটা সই করে দিন।

লোকটা সই করলে আমি নামটা দেখলাম। প্রভাসরঞ্জন। কোনো পদবী লিখল না।

বেরিয়ে আসার সময় প্রভাসরঞ্জনও এল সঙ্গে সঙ্গে। রাস্তায় কাঠফাটা রোদ। এই সকালের দিকেই সারা দিনের অসহনীয় গরমের আন্দাজ দিচ্ছে। আমি ব্যাগ থেকে সানগ্লাস বের করে পরে নিলাম। এখন অফিস যাবো, তাই ট্রাম রাস্তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাওয়ার আগে প্রভাসবাবুকে বললাম—আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি না এলে লোকটা টাকাটা দিত না।

প্রভাসবাবু মৃদু হেসে বললেন—আপনি কি টাকাটা পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন?

আমার ভ্রূ কুঁচকে গেল। প্রশ্নটার মধ্যে একটু যেন খোঁচা আছে। বললাম—না। কেন বলুন তো!

—একটা শাড়ির সঙ্গে কত কি স্মৃতি জড়িয়ে থাকে। শাড়ির দামটা তো বড় নয়।

আমি মৃদু হেসে বললাম—তাই। তা ছাড়া শাড়িটাও বড় ভাল ছিল।

প্রভাস মাথা নেড়ে বলেন—বুঝেছি। ও টাকা দিয়ে কি আর একটা ওরকম শাড়ি কিনবেন?

—কিনতে পারি। কিন্তু একরকম শাড়ি তো আর পাওয়া যায় না। দেখা যাক।

প্রভাসরঞ্জন আমার সঙ্গে ট্রাম রাস্তার দিকে হাঁটতে হাঁটতে বললেন—শাড়িটা আপনাকে কে দিয়েছিল।

এবার আমি একটু বিরক্ত হই। গায়েপড়া লোক আমার দুচোখের বিষ। বললাম —ওটা আমার খুব পারসোনাল ব্যাপার।

প্রভাসরঞ্জন আমার দিকে এক পলক তাকিয়েই চোখ সরিয়ে বললেন—আমি অবশ্য আন্দাজ করতে পারি।

করেছিস না হয় একটু উপকার, তা বলে পিছু নেওয়ার কি? পুরুষগুলো এমন বোকা হয়, কি বলব! তবু ভদ্রতা তো আর আমাদের ছাড়ে না। আমার আবার ঐ

boiRboi.net

এক দোষ, সকলের সঙ্গে প্রশ্রয়ের একটু সুরে কথা বলে ফেলি। তা ছাড়া, লোকটার কথা শুনে মনে হচ্ছে ওর আন্দাজটা সত্যিই হতে পারে বা।

বললাম—কি আন্দাজ করলেন?

প্রভাসরঞ্জন মৃদু স্বরে বললেন—আপনার স্বামী।

আমি একটু কেঁপে উঠলাম মনে মনে। কপালে বা সিঁথিতে আমি সিঁদুর দিই না। সম্পূর্ণ কুমারীর চেহারা আমার। তা ছাড়া যে এলাকায় আছি সেখানকার কেউ আমাকে চেনে না। এ লোকটা জানল কি করে যে আমার একজন স্বামী আছে?

এবার একটু কঠিন স্বরে কথা বলাটা একান্ত দরকার। লোকটা বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলছে।

বললাম—আমার স্বামীর খবর আপনাকে কে দিল? আমার স্বামী টামী কেউ নেই।

লোকটা অবাক হয়ে বলে—নেই। তাহলে তো আমার আন্দাজ ভুল হয়ে গেছে!

—হ্যাঁ! এ রকম অকারণ আন্দাজ করে করে আর সময় নষ্ট করবেন না। পুরুষমানুষদের কত কাজ থাকে। পরের ব্যাপার নিয়ে মেয়েরা মাথা ঘামায়!

প্রভাসরঞ্জন কিন্তু অপমান বোধ করলেন না। বড্ড গরম আর রোদে ভদ্রলোক ঘেমে নেয়ে যাচ্ছেন। একটা টার্কিশ রুমালে ঘাড় গলা মুছলেন। পরনে একটা পাজামা আর নীল শার্ট। শার্টের কাটছাঁট বিদেশী। বাঁ হাতে বড়সড় দামী ঘড়ি। চেহারা দেখে স্বচ্ছল মনে হয়।

অপমান গায়ে না মেখে প্রভাসরঞ্জন বললেন—আমি আপনার ফ্ল্যাটের নীচের তলায় থাকি। আপনি তো ঠিক চিনবেন না আমাকে। পাঁচুবাবু নামে যে বুড়ো ভদ্রলোক হাসপাতালে গেছেন আমি তাঁরই ফ্ল্যাটে—

আমি হাসলাম। বললাম—ও, ভালই তো। আমি অবশ্য ও বাড়ির কারো সঙ্গে বড় একটা মিশি না।

—ভুল করেন।

—কেন?

—মেশেন না বলেই আপনাকে নিয়ে লোক খুব চিন্তা ভাবনা করে নানা গুজব রটায়।

আমি তা জানি। রটারেই, বাঙালীর স্বভাব যাবে কোথায়? বললাম—আমি ভুল করি না, ঠিকই করি। ওদের সঙ্গে মিশতে আমার রুচিতে বাধে।

প্রভাসরঞ্জন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন—সেটা হয়তো ঠিকই। তবে আমি অন্য ধাতুতে গড়া, সব রকম মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।

উনি কার সঙ্গে মিশেছেন, কেন মিশেছেন সে সম্পর্কে আমার কৌতূহল নেই। পার্ক সার্কাসের ট্রামস্টপে দাঁড়িয়ে আমি সানগ্লাসের ভিতর দিয়ে পার্কের দিকে চেয়ে থাকি। একটা কাক বুঝি ডানা ভেঙে কোন খন্দে পড়েছে, তাকে ঘিরে হাজারটা কাকের চেঁচামেচি। কান ঝালাপালা করে দিল। তবু কাকের মতো এত সামাজিক পাখি আমি আর দেখিনি। ওদের একজনের কিছু হলে সবাই দল বেঁধে দুঃখ জানাতে আসে। মানুষের মধ্যে কাকের এই ভালটুকুও নেই।

ট্রামের কোনো শব্দ পাচ্ছি না। বললাম—তাই নাকি?

এই 'তাই নাকি' কথাটা এত দেরী করে বললাম যে প্রভাসরঞ্জন একটু অবাক হয়ে বললেন—কিছু বললেন?

আমি বললাম—কিছু না।

প্রভাসরঞ্জন আমার কাছেই দাঁড়িয়ে রইলেন চুপচাপ। রোদ গরম, সব উপেক্ষা করে। আজকাল প্রায়ই পুরুষেরা আমার প্রেমে পড়ে যায়। এঁর সম্পর্কেও আমার সেই ভয় হচ্ছে। বেচারা।

একটু ভদ্রতা করে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বললাম—লণ্ড্রীওয়ালা কি আপনার চেনা?

—না তো! বলে ফের বিস্ময় দেখালেন উনি।

আমি বলি—আপনার কথায় লোকটা তাহলে ম্যাজিকের মতো পাল্টে গেল কেন?

—ওঃ! সেও এক মজা। ওর দোকানে আমিও কাচাতে-টাচাতে দিই, সেই সুবাদে একটু চেনা। একবার একটি প্যাণ্টের পকেটে ভুলে আমার পাসপোর্টটা চলে গিয়েছিল। সেইটে দেখে ও হঠাৎ আমাকে সমীহ করতে শুরু করে।

—পাসপোর্ট! আপনি বিদেশে ছিলেন নাকি?

—এখনো কি নেই? গোটা পৃথিবীটাই আমার বিদেশ।

ট্রাম কেন এখনো আসছে না এই ভেবে আমি কিছু অস্থির হয়ে পড়লাম। কারণ, আমার মনে হচ্ছিল, এ লোকটা পাগল। এর সঙ্গে আমি এক বাড়িতে থাকি ভাবতেও খুব স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।

প্রভাসরঞ্জন হাতের মস্ত ঘড়িটা দেখে কিছু উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন—আপনার ট্রাম তো এখনো এল না। অফিস ক'টায়?

আমি বললাম—দশটায়। তবে দশ পনেরো মিনিট দেরি করলে কিছু হবে না।

ব্যথিত হয়ে প্রভাসরঞ্জন বললো—ওটা ঠিক নয়। দশ পনেরো মিনিট দেরি যে কী ভীষণ হতে পারে।

আমি হেসে বললাম—কী আর হবে! সকলেরই একটু দেরি হয়। ট্রাম বাসে সময়মতো ওঠাও তো মুশকিল।

—হুঁ! প্রভাসরঞ্জন বললেন,—তার মানে কোথাও কেউ একজন দেরি করছে, সেই থেকেই দেরিটা সকলের মধ্যে চারিয়ে যাচ্ছে। ধরুন একজন স্টার্টার বাস ছাড়তে দেরি করল, ড্রাইভারও একটা পান খেতে গিয়ে দু মিনিট পিছোলো, বাস দেরি করে ছাড়ল, সেই বাস ভর্তি অফিসের লোকেরও হয়ে গেল দেরি। এই রকম আর কি। একজনের দেরি দেখেই অন্যেরা দেরি করা শিখে নেয়।

আমি হাসছিলাম।

উনি বললেন—কি করে অবস্থাটা পাল্টে দেওয়া যায় বলুন তো!

—পাল্টানো যায় না। ঐ বুঝি আমার ট্রাম এল—

—হ্যাঁ। কিন্তু খুব ভিড়, উঠতে পারবেন না।

ভিড় ঠিকই। ট্রাম বাসের একটু দেরি হলেই প্রচণ্ড ভিড় হয়। তবে আমার অভ্যাস আছে।

boiRboi.net

—চলি। বলেই ট্রামের দিকে এগোই।

প্রভাসরঞ্জন হঠাৎ আমার পিছন থেকে অনুচ্চ স্বরে বললেন—সেদিন দুপুরে কে একটা লোক আপনার ঘরে ঢুকেছিল বলুন তো, আপনার স্বামী?

কথাটা শুনে আমি আর ঘাড় ফেরালাম না; শুনিনি ভান করে ভিড়ের ট্রামে ধাক্কাধাক্কি করে উঠে গেলাম ঠিক।

আমার কোনোদিনই তেমন ঘাম হয় না, ইসিনোফিলিয়া আছে বলে প্রায় সময়ই বরং আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ শীত করে ওঠে। কিন্তু আজ আমি অবিরল ঘামছিলাম। সারাদিন বড় বেশী অন্যমনস্কও রইলাম আমি। মনে হচ্ছে, লণ্ড্রীতে ওই লোকটার আসা, গায়ে পড়ে উপকার করা আর তার পরের এত সব সংলাপ এ সবই আগে থেকে প্ল্যান করে করা। এতদিন আমার জীবনটা যত নিরাপদ আর নির্বিঘ্ন ছিল এখন যে আর ততটা নয় তা বুঝতে পেরে মনটা খারাপ হয়ে গেল। এরা বা এই লোকটা অন্তত আমার বিয়ের খবর রাখে।

সাত দিন কেটে গেছে, প্রভাসরঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়নি। তবে সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় বা নামবার মুখে পাঁচুবাবুর বাইরের ঘর থেকে খুব টাইপ রাইটারের আওয়াজ পাই। দরজা ভেজানো থাকে, কাউকে দেখা যায় না। আমিও তো আমার সিঁড়ির গোড়ায় বেশীক্ষণ থাকি না। বরং ভুতের ভয়ে কোনো জায়গা দিয়ে যেতে যেমন গা ছমছম্ করে, তেমনি একটা ভাব টের পাই। তাই সিঁড়ির মুখটা খুব হালকা দ্রুত পায়ে পেরিয়ে পক্ষিণীর মতো উড়ে যাই।

আমি খুব সাবধান হয়ে গেছি আজকাল। বাইরের দরজাটায় সব সময় ল্যাচ্‌কীতে চাবি দিয়ে রাখি। স্পাই হোল দিয়ে না দেখে আর নাম ধাম জিজ্ঞেস না করে বড় একটা দরজা খুলি না। অবশ্য আমার ঘরে আসবেই বা কে? শুধু কি আসে।

একদিন আমার দাদা অভিজিৎ এল। সে বরাবর রোগা দুর্বল যুবক, শীত গ্রীষ্মে গলায় একটা সুতীর কম্ফর্টার থাকবেই। ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে পারে না, সারাবছর তার সর্দি থাকে। ডাক্তার বলেছে এ রোগ সারার নয়।

সকালবেলায় দাদা এসে ঘরে পা দিয়েই ঝগড়া শুরু করল—এ তুই শুরু করেছিস কি বল তো! আমাদের পরিবারটা মডার্ন বটে কিন্তু তুই যে সব লিমিট ছাড়িয়ে গেলি!

রাগ করে বললাম—ও কথা বলছিস কেন? একা থাকি বলে যত খারাপ সন্দেহ, না?

—বটেই তো। জয়দেবের সঙ্গে না থাকিস আমরা তো রয়েছি। এ দেশের সমাজে একা থাকে কোন মেয়ে?

—আমি থাকব।

—না, থাকবি না। তোর ঝাটি-পাটি যা আছে গুছিয়ে নে, আমি ট্যাকসি ডাকি।

নিজের বাড়ির কোনো লোককেই আজকাল আমার সহ্য হয় না। ওরা আমাকে স্বাভাবিক জীবন গ্রহণ করতে শেখায়নি। সেটা আজকাল আমি বড় টের পাই। চারি-

boiRboi.net

দিকে যখন স্বামী-স্ত্রীর বসবাস দেখি তখনই আমার মনে হয়, আমারই যেন কি একটা ছিল না, হয়তো সইবার শক্তি বহনের ক্ষমতা, যা না থাকলে বিবাহিত জীবন বলে কিছু হয় না।

আমি দাদার জন্য চা করতে গিয়ে মনটাকে শক্ত করলাম খুব।

ফিরে এসে বললাম—জয়দেব বা আর কারো সঙ্গে আমি থাকবো না।

—জয়দেবেরই বা দোষটা কি ?

—যাই হোক। সব কি তোকে বলতে হবে নাকি ?

কথায় কথায় ঝগড়া লেগে গেল। দাদা খুব জোরে চেঁচিয়ে কথা বলছিল। এই সময় ফোনটা আবার বাজল। দৌড়ে গিয়ে রিসিভার কানে তুলতেই সেই ধীর গম্ভীর গলায় বলল—আপনার ঘরে লোকটা কে ?

আমি ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে বললাম—আসুন না প্রভাসবাবু একটু হেল্প করবেন। এ লোকটা আমার দাদা, বাসায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে।

টেলিফোনে গলাটা শুনেই আজ আমি লোকটাকে চিনে ফেলেছি। কথা কটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ওপাশে হাসি শোনা গেল। প্রভাসরঞ্জন বললেন—বড্ড মুশকিল হল দেখছি। চিনে ফেললেন! দাদা কি বলছেন ?

—ফিরে যেতে।

—তাই যান না।

—আমি যাবো না।

—জয়দেববাবুর তো কোনো দোষ নেই।

—আপনি সেটা জানলেন কি করে ?

—খোঁজ নিয়েছি। ইন ফ্যাক্ট আমি জয়দেববাবুর সংগেও দেখাও করেছি ক'দিন আগে।

—মিথ্যে কথা।

—না, মিথ্যে নয়। আমি এখন একটা ডেইলী নিউজ পেপারের স্পেশাল রিপোর্টার। মধু মল্লিক যে কাগজে কাজ করেন।

—তাতে কি ?

—সেই কাগজের তরফ থেকে স্মল স্কেল আর কটেজ ইণ্ডাস্ট্রির একটা সারভে করেছিলাম। জয়দেববাবু ইণ্টারভিউ দিয়েছিলেন। খুব পণ্ডিত লোক।

—আমার কথা উঠল কি করে ?

—উঠে পড়ল কথায় কথায়।

দাদা এসে এ ঘরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে ফোনের কথা শুনছে। একবার চোখের ইশারা করে জিজ্ঞেস করল—কে ?

আমি হাত তুলে ওকে চুপ থাকতে ইঙ্গিত করে ফোনে বললাম—না, আপনিই আমার কথা তুলেছিলেন।

—তাই না হয় হল, ক্ষতি কি ?

—ক্ষতি অনেক। তার আগে বলুন, আপনার এ ব্যাপারে এত ইণ্টারেস্ট কেন ?

প্রভাসরঞ্জন কিছু গাঢ় গলায় ইংরিজিতে বললেন— বিকজ আই হ্যাভ অলসো লস্ট

boiRboi.net

সাম অফ মাই হিউম্যান পজেসনস।

ফোন কেটে গেল।

দাদা বলল—কে রে?

—একজন চেনা লোক।

দাদা গম্ভীর হয়ে বলল—চেনা লোক! বাঃ বেশ। চেনার পরিধি এখন পুরুষ মহলে বাড়ছে তাহলে।

আমি ছোট্ট করে বললাম—বাড়লে তোর কি?

—আমার অনেক কিছু। সে থাকগে, এ লোকটা তোকে কি বলছিল?

আমি হঠাৎ আক্রোশে রাগে প্রায় ফেটে পড়ে বললাম—তোরা কেউ কি আমাকে শান্তিতে থাকতে দিবি না!

দরজার কাছ থেকে প্রভাসরঞ্জন বললেন—শান্তিতে কি এখনই আছেন? যান তো, একটু চা করে এনে খাওয়ান।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম লোকটার সাহস দেখে।

প্রভাসরঞ্জন

পাঁচুদাকে দেখেই বুঝি যে লোকটার হয়ে গেছে। ব্যাচেলার মানুষ আত্মীয়স্বজন বলতেও কাছের জন কেউ নেই, মরলে কেউ বুক চাপড়াবে না, অনাথা বা অনাথ হবে না কেউ। সেই একটা সান্ত্বনা। তবু একটা মানুষ ছিল, আর থাকবে না, এটা আমার সহ্য হচ্ছিল না। বলতে কি পাঁচুদার জন্য বেশ দুঃখিত হয়ে পড়েছিলাম।

ব্যাচেলারদের বেশী বয়সে কিছু না কিছু বাতিক হয়ই। সম্ভবত কামের অচরিতার্থতা, নিঃসঙ্গতা ইত্যাদি মিলেমিশে তাদের বায়ুগ্রস্ত করে তোলে। পাঁচুদারও তাই হয়েছিল। চিরকাল তাঁর দূর সম্পর্কের যত আত্মীয়স্বজন তাঁর কাছ থেকে পয়সা-কড়ি বা জিনিসপত্র হাতিয়েছে। ভণ্ড সাধু সন্ন্যাসী জ্যোতিষেরাও কাজ গুছিয়েছে কম নয়। পাঁচুদা কয়েকবারই জোচ্চোরদের পাল্লায় পড়ে ব্যবসাতে নেমে ঠকে এসেছেন। তাঁর বাপের কিছু টাকাও তিনি পেয়েছিলেন, চাকরির বেতনতো ছিলই, সব মিলেই বেশ শাঁসালো খদ্দের। লোকে ঠকাবে না কেন? প্রতি বছর মাসখানেক ধরে তীর্থ ভ্রমণ করতেন। ভারতবর্ষের এমন জায়গা নেই যেখানে যাননি। শেষ বয়সটায় বেশ কষ্ট পেলেন।

আমার মধ্যে একটা পাপবোধ ছিল। আমাদের ছেলেবেলায় যখন প্রচণ্ড অভাবের সময় চলছিল তখন এই পাঁচুদা বেশ কয়েকবার আমাদের অনাহার থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকেই তাঁর প্রতি আমাদের একটা মতলববাজ মনোভাব জন্মায়। পাঁচুদা মানেই হচ্ছে আদায়ের জায়গা। তাই পাঁচুদা আমাদের বাড়িতে এলেই আমরা খুশী হতাম, যখন তখন তাঁর বাসা বা অফিসে গিয়ে নানা কাঁদুনি গেয়ে পয়সা আদায় করেছি। আমার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ফী তিনিই দেন। আর, আমি তাঁর একটা সোনার বোতাম চুরি করেছিলাম।

boiRboi.net

এ সব কথা তাঁকে আর বলার মানে হয় না। তবু যখন শ্যামবাজারের আয়ুর্বেদীয় হাসপাতালে তাঁকে দেখতে গিয়ে এক কংকালসার চেহারাকে দেখি তখনই সেই সব পাপের কথা মনের মধ্যে জেগে ওঠে। নিজেকেই বলি—প্রভাসরঞ্জন, পাপের কথা স্বীকার করে নাও, খৃষ্টানরা যেমন যাজকদের কাছে করে।

আমার কথা শুনে পাঁচুদা হেসে বললেন—যা যা জ্যাঠা ছেলে, চুরি করেছিস বেশ করেছিস। সেই চুরির বোতাম আজ তোকে দান করে দিলাম, যা।

ক্যানসারের কষ্ট তো কম নয়। শরীর শুষে ছিবড়ে করে ফেলেছে প্রতিনিয়ত। কিছু খেতে পারেন না। যা খান তা উঠে আসে ভেতর থেকে। ক্রমশ শরীর ছেড়ে যাচ্ছে তাঁর সব শক্তি। এখন কংকালসার হাতখানা তুলতেও তাঁর বড় কষ্ট। মাঝে মাঝে দেখি বুকের কম্বলটা টেনে মুখ ঢাকা দিয়ে কাঁদেন। সে কান্নাও অতি ক্ষীণ। যেমন পাঁজরের খাঁচা থেকে এক বন্দী ভোমরার গুঞ্জনধ্বনি উঠে আসে।

পত্রিকা অফিস থেকে আজকাল প্রায়ই নানা জায়গায় পাঠায়। আর দু এক মাসের মধ্যেই আমাকে পাকা চাকরিতে নেওয়া হবে। সাংবাদিকের এই চাকরি আমার খুব খারাপ লাগছে না। কিন্তু সব সময়ে একটা এই দুঃখ, আমি নানা দেশ ঘুরে যে প্রযুক্তি শিখেছি তা কোনো কাজে লাগল না। জীবনের দশ দশটা বছর আমি বৃথা অন্বেষণে কাটিয়ে এসেছি। আয়ুক্ষয়।

সুইজারল্যান্ডে আমাদের কারখানা দেখতে সেবার এক জাপানী প্রতিনিধি দল এল। বেঁটে বেঁটে চেহারার হাস্যমুখ, বুদ্ধির আলোজ্বলা ছোটো ছোটো চোখের মানুষ। প্রত্যেকেই বড় বড় ইঞ্জিনীয়ার তাদের দেশে। কারখানা দেখার অনুমতি চাইল। ওপরওয়ালা আমাকে এবং আরো কয়েকজনকে ডেকে ওদের কারখানা দেখাতে বলে দিলেন। অনুমতি পেয়ে জাপানীদের চেহারা ধাঁ করে পাল্টে গেল। পরনের স্যুট খুলে ওভারঅল পরে নিল সবাই, খাতা-পেনসিল-পেন-কম্পাস সাজিয়ে নিল। তারপর প্রতিটি যন্ত্র আর যন্ত্রাংশের মধ্যে ওরা কালি ঝুলি মেখে ঢুকে যেতে লাগল। ভাল করে লাঞ্চ পর্যন্ত করল না। ভূতের মতো শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে যন্ত্রের সমস্ত রহস্য জেনে নিতে লাগল। পর পর সাত দিন এক নাগাড়ে তারা কারখানাটিকে জরীপ করতে লাগল। শেষ দিকে ওদের চলাফেরা যন্ত্রের ব্যবহার এবং কথাবার্তায় হঠাৎ বুঝতে পারলাম, আমি এ কারখানায় এতকাল থেকেও যে সব রহস্য জানি না ওরা অল্প দিনেই তা সব জেনে গেছে।

জাপানীরা দেশে ফিরে যাওয়ার দু বছরের মধ্যে জাপান থেকেই বিশ্বের বাজারে কম্প্রেসর মেশিন ছাড়া হল। সুইস কম্প্রেসরের চেয়ে তা কোনো অংশে খারাপ তো নয়ই, বরং দামে অনেক সস্তা। এমন কি ওরা সুইস যন্ত্রের নকল করেছে বলেও মনে করবার কারণ নেই। যন্ত্রের মৌল রহস্যটা জেনে গিয়ে ওরা ওদের মতো যন্ত্র বানিয়েছে।

এ ঘটনার বছর খানেকের মধ্যেই একটি ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ্যার দল সুইজারল্যান্ডে যায়। ব্যল-এ এসে তারা আমাদের কারখানাতেও হানা দিয়েছিল। স্মিড সাহেব আমাকে ডেকে বললেন—তোমার দেশের লোকদের তুমিই এসকর্ট করে নিয়ে কারখানা দেখাও।

boirboi.net

ভারতের লোক এসেছে শুনে আমি খুবই উৎসাহ বোধ করি। দলে একজন বাঙালিও ছিলেন, আমি তাঁর সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে তিনি একটু অবাক হলেন। কিন্তু তিনি দেশে খুব বড় চাকরি করেন, আর আমি এ কারখানার একজন স্কিল্ড লেবারার মাত্র। তাই তিনি আমার সঙ্গে বিশেষ মাখামাখি করলেন না, একটু আল্‌গো আল্‌গো ভালবাসা দেখালেন।

মোট ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে তাঁরা অত বড় কারখানাটার হাজারো যন্ত্রপাতি দেখে ফেললেন। যাই দেখাই তাই দেখেই বলেন—ওঃ, ভেরি গুড। হাউ নাইস! ইজ ইট! যন্ত্রপাতি তাঁরা ছুঁয়েও দেখলেন না। তারপর ম্যানেজারের ঘরে বসে কফি খেয়ে চলে গেলেন। পরে স্মিড সাহেব আমাকে ডেকে বললেন—তোমার দেশের লোকেরা এত অল্প সময়ে এতবড় প্রোজেক্টের সব বুঝে ফেলল?

তখন আমি ঠিক করেছিলাম এরা যা করেনি তা আমাকেই করতে হবে। তারপর কিছুদিন আমি একা একা পুরো যন্ত্রপাতির নকশা কপি করতে শুরু করি। এমনিতেই ভূতের মত খাটুনি ছিল, তার ওপর বাড়তি খাটুনি যোগ হল। হয়তো পেরেও যেতাম। কিন্তু ঠিক সেই সময় বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় আমার ভিতরকার সব উৎসাহ নিভে যায়। তবু যা শিখেছিলাম, যা কপি করেছিলাম তাও বড় কম নয়। যে কোনো ইঞ্জিনীয়ারের চেয়ে আমার প্রযুক্তির ধারণা অনেক প্রাঞ্জল এবং বাস্তব। আমি হাতে-কলমে যন্ত্র চালিয়েছি। যন্ত্রের সব চরিত্রই আমার জানা। এখনো ভারী কম্প্রেসর মেশিনের যে কোনো কারখানায় আমার অভিজ্ঞতা অসম্ভব রকমের কার্যকরী হতে পারে।

কিন্তু তা হল না। আমি এখন নানা চটুল বা রাশভারী বিষয় নিয়ে খবরের কাগজে ফিচার লিখছি। লিখতে আমার খারাপ লাগে না ঠিকই, কিন্তু সব সময়েই আমার অধীত বিদ্যার অপচয়ের জন্য কষ্ট হয়। যা কষ্ট করে শিখে এসেছি তা এ দেশে কাজে লাগল না। অবশ্য আমি এখানকার কলকারখানায় চাকরি করতে আর উৎসাহীও নই। আমি চেয়েছিলাম নিজেই একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করব।

এখন টাইপ রাইটারের খটখটানির মধ্যে এক রকমের নতুন জীবনের খবর পেয়ে যাচ্ছি। মধু মল্লিক এসে প্রায়ই খবর দেন, আমার ফিচারগুলো কাজের হচ্ছে।

মধু মল্লিক একদিন এসে বললেন—কস্ট অফ প্রোডাকশন কমিয়ে আনার ব্যাপারে আপনার ফিচারটা সাংঘাতিক হয়েছে। কিন্তু প্রভাসবাবু, আমাদের সবচেয়ে বেশী দরকার কটেজ আর স্মল স্কেল। শুধু হেভী ইণ্ডাস্ট্রি দিয়ে এদেশের ইনকাম স্টেবল্ করা যাবে না। আপনি কি এ কথা মানেন?

আমি মানি। মধু মল্লিকও মানেন দেখে খুব খুশী হলাম। বললাম—কটেজ বা স্মল স্কেল না থাকলে দেশের প্রাণ নষ্ট হয়ে যায়। এ আমি স্বীকার করি তা ছাড়া এদেশে লক্ষ লক্ষ লোক ঐ সব নিয়ে আছে। কৃষিভিত্তিক সমাজকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে ওটার খুবই দরকার।

—লিখুন না এবার স্মল আর কটেজ নিয়ে। মধু মল্লিক বললেন। কাজ সহজ নয় তবে আমার অফিস থেকে প্রচুর সাহায্য করা হল এ ব্যাপারে। কুটিরে এবং ছোট ছোট শিল্পের ওপর পত্রিকা চারটে সিরিয়াল ছাপাবে। আমাকে সে জন্য গোটা

পশ্চিমবাংলার গাঁয়ে গঞ্জে চলে যেতে হল। সরকারী লোকদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখা সাক্ষাৎও করতে হল মেলা।

এই করতে গিয়েই জয়দেবের সঙ্গে দেখা বাঁকুড়ায়। ভারী দুঃখী চেহারার লোক এবং খুবই ভালমানুষ! ডক্টরেট হয়েছেন সম্প্রতি, জানেনও বিস্তর। একখানা নতুন বই লিখেছেন ফোক আর্ট সম্পর্কে। কথায় কথায় বিয়ের কথা উঠতে আমি বলেছিলাম —আমার বৌ-ছেলে সব পর হয়ে গেছে। সেই ভ্যাকুয়ামটা পূর্ণ করতে এখন আমার অনেক কাজ চাই। নইলে একা হলেই ভূতে পায়।

জয়দেব আমার হাত চেপে ধরে বললেন—আমার কেসও আপনার মতো। আমার ছেলেপুলে নেই, কিন্তু বৌ ছিল। প্রায় বিনা কারণে সে আমাকে ছেড়ে গেছে।

যোগাযোগটা খুবই অদ্ভুত। অলকার স্বামীকে যে এত সহজে দুম করে খুঁজে পাব কখনো ভাবিনি। পরিচয় বেরিয়ে পড়তে যখন অলকার খবর দিলাম তখন জয়দেব হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে জিজ্ঞেস করল—ও কি আবার বিয়ে করবে ?

—না, না।

—ওকে বলবেন, মেয়েদের দুবার বিয়ে হতে নেই। সেটা খুব খারাপ। ও আমাকে ছেড়ে যাওয়ায় আমাদের পরিবারের মস্ত ঝড়ের ধাক্কা গেছে। এখনকার ছেলেমেয়েরা তো কখনো সমাজ বা পরিবারের পারস্পেকটিভে দাম্পত্য জীবনের কথা ভাবে না। যদি ভাবত তাহলে অলকা অত সহজে ছেড়ে যেতে পারত না। অপছন্দের স্বামীকেও মানিয়ে নিত। আর এও তো সত্যি যে, আজকের অপছন্দের লোক কালই প্রিয়জন হয়ে উঠতে পারে, যেমন আজকের প্রিয়জন হয়ে যায় কাল দু'চোখের বিষ!

সত্যি কথা। সহ্য করা বা বহন করা আজকের মানুষের ধাতে নেই। অপছন্দের জিনিস তারা খুব তাড়াতাড়ি বাতিল করে দেয়। নতুন জিনিস নিয়ে আসে। আর এইভাবেই তাদের স্বভাব হয়ে উঠেছে পিছল ও বিপজ্জনক।

আমি বললাম—আপনি কি এখনো অলকাকে ভালবাসেন ?

কেমন একরকম লোভী শিশুর মতো তাকাল জয়দেব। অনেকক্ষণ বাদে মাথা নেড়ে বলল—তাতে কি যায় আসে! ও তো আর আমাকে ভালবাসে না!

আমি চিন্তা করে বললাম—দেখুন, ভালবাসাটা সব সময়েই তো আর হুস্ করে মাটি ফুঁড়ে ফোয়ারার মতো বেরোয় না। ওটা একটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার। ভালবাসার চেষ্টা থেকেই ভালবাসা আসে।

—সে হতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেই চেষ্টারও অভাব রয়েছে। তিলমাত্র মমতা থাকলে তাকে বাড়িয়ে বিরাট ভালবাসা জন্মাতে পারে। কিন্তু যেখানে সেই তিলমাত্রও নেই।

আমি ভাবিত হয়ে পড়ি। এবং ফিরে আসি।

কলকাতায় এসেই একটু ঝামেলায় পড়ে গেলাম।

একদিন অনেক রাত অবধি টাইপ মেশিন চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েছি। ভোর রাতে এসে ঘুম ভাঙাল সুহাস।

দরজা খুলে তাকে দেখে খুব খুশী হই না, বললাম—কি রে, কি চাস ?

—মার খুব অসুখ। এখন-তখন। কি করব ?

boiRboi.net

শরীরে একটা ধনুকের টংকার বেজে উঠল। মা!

কথা আসছিল না মুখে। অবশ হয়ে চেয়েছিলাম, সুহাস বলল—কিছু টাকা দাও।

—টাকা দেবো? অবাক হয়ে বলি—টাকা দেবো সেটা বড় কথা কি! আগে গিয়ে মাকে একটু দেখি! তুই ট্যাক্সি ডাক তো—

বলে আমি ঘরে গিয়ে জামাকাপড় পরছিলাম। সুহাস ট্যাক্সি আনতে যায়নি, দরজার কাছে দোনো মোনো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে পড়তে বলল—তুমি বিশ্রাম নাও না। এক্ষুনি যাওয়ার দরকার নেই খুব একটা। অবস্থা যতটা খারাপ হয়েছিল ততটা এখন নয়। তুমি ব্যস্ত মানুষ, দু'চারদিন পরে যেও।

ওর কথা বুঝতে পারছিলাম না একদম। কি আবোল-তাবোল বকছে? এই বলল খারাপ অবস্থা, আবার বলছে তত খারাপ নন। কেমন একটু সন্দেহ হল মনে। বললাম—তোর মুখে সত্যি কথা-টথা আসে তো ঠিক?

—বাঃ, মিথ্যে বলছি নাকি?

—মার অসুখ, তা আমাকে যেতে বারণ করছিস কেন?

—তোমার অসুবিধের কথা ভেবেই বলেছি। যাবে তো চলো।

—ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আয়, আমি যাবো।

দমদমের বাসার কাছে এসে যখন ট্যাক্সির ভাড়া মেটাচ্ছি তখন সুহাস 'এই একটু আসছি' বলে কোথায় কেটে পড়ল। বাড়িতে ঢুকে দেখি মা পিছনের বারান্দায় বসে কুলোয় রেশনের চাল বাছছে।

আমি গিয়ে মার কাছে বসতেই মা কুলো ফেলে আমাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে বলল—ওরা বলে তুই নাকি খুব খারাপ হয়ে গেছিস্! কোন এক বিধবা না সধবার সঙ্গে নাকি তোর বিয়ে সব ঠিক?

আমি স্তম্ভিত হয়ে মাকে দেখি। অনেকক্ষণ বাদে বলি—তোমার কি হয়েছে? শুনলাম তোমার খুব অসুখ!

—হলে বাঁচি বাবা। সে অসুখ যেন আর ভাল না হয়। কিন্তু গতরে তো অসুখও একটা ধরে না তেমন।

—সুহাস আজ সকালে গিয়ে তোমার অসুখের নাম করে টাকা চেয়েছিল।

মা হাঁ করে একটু চেয়ে থেকে বলে—ওর অবস্থা খুব খারাপ বাবা, নুন আনতে পান্তা ফুরায়। তাই বোধহয় একটা ফিকির করেছিল।

রান্নাঘর থেকে নিমি খুব হাসিমুখে এককাপ চা নিয়ে বেরিয়ে এসে বলল—দাদাকে কতদিন বাদে দেখলাম! খুব ব্যস্ত শুনি!

আমি গম্ভীর হয়ে বলি—সুহাস কোথায় গেল বৌমা?

—এসে পড়বে এক্ষুণি। বসুন না।

আমি মাথা নেড়ে বললাম—ও আসবে না, আমি জানি। বৌমা তুমি মার কাপড়-চোপর যা আছে গুছিয়ে দাও। আমি মাকে নিয়ে যাবো।

মা শুনে কেমন ধারা হয়ে গিয়ে বলল—সে কি কথা বলিস! এখন আমি কোথায় যাবো?

boiRboi.net

আমি চড়া গলায় বললাম—যেতেই হবে। এখানে তোমার গুণের ছেলে তোমাকে ভাঙিয়ে ব্যবসা শুরু করতে চলেছে যে! কত বড় সাহস দেখেছো!

অমনি নিমি ঘর থেক তেড়ে এসে বলল—বেশী বড় বড় কথা বলবেন না বলে দিচ্ছি। আপনার কীর্তিও অনেক জানি!

দুচার কথায় প্রচণ্ড ঝগড়া লেগে গেল। পাড়ার লোক এসে জুটতে লাগল চারদিকে।

আমি মাকে বললাম—মা, তোমাকে যেতেই হবে। এ নরকে আর নয়।

বোধহয় আমাকে ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচাতেই মা উঠে গিয়ে একটা টিনের তরঙ্গ গুছিয়ে নিল। আমি মাকে নিয়ে চলে এলাম।

কয়েকদিন মন্দ গেল না। মা রান্না-বান্না করে, আমি কাজে যাই। মধু মল্লিকের সবাই মার দেখাশুনা করে। এমন কি অলকা পর্যন্ত খোঁজ-খবর নিয়ে যায়। কিন্তু এতসব ভদ্রলোক এবং লেখাপড়া জানা পরিবেশে থেকে মার অভ্যাস নেই। সব সময় তটস্থ ভাব, মাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় অবশ্য আমার ছিল না, দিনরাত ঘুরি, রাত জেগে ফিচার টাইপ করি।

দিন পনেরো পরে মা একদিন মিনমিন করে বলল—প্রভাস, একবার বরং দমদম থেকে ঘুরে আসি।

গম্ভীর হয়ে বলি—কেন?

মা ভয় খেয়ে বলে—সুহাস আর নিমি যেমনই হোক ওদের ছেলে-মেয়েগুলো আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না।

আমি বললাম—মা, সুহাস আর নিমি তোমার ওপর কেমন নির্যাতন করে বল তো! মারে না কি?

মা শ্বাস ফেলে বলে—অমানুষের সব দোষ থাকে বাবা। মাকে মারবে সে আর বেশী কথা কি?

—তবু যেতে চাও?

—ওদের কাছে যেতে চাইছি নাকি! ঐ যে ছেলেমেয়েগুলো, ওরা যে মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে আমার জন্য কাঁদে।

—কাঁদবে না, অভ্যাস হয়ে যাবে।

মা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—তুই একটা বিয়ে কর। তখন এসে পাকাপাকিভাবে তোর কাছে থাকব।

আমি বললাম—বাবার কাছে যাবে মা? চাও তো বন্দোবস্ত করে দিই!

—যাবো বই কি! যাবোখন। শীতটা আসুক।

বুঝলাম এ জন্মের মতো সুহাসের হাত থেকে মার মুক্তি নেই। সুহাস যেমনই হোক, তার বংশধরেরা মার রক্তের স্রোত নিজের দিকে টেনে নিয়েছে! আর ফেরানো যাবে না।

মাকে একদিন ফের গিয়ে দমদমের বাড়িতে রেখে এলাম।

এই ঝামেলায় আর জয়দেবের কথা তেমন মনে ছিল না কাজের চাপও ক্রমশঃ বাড়ছে।

হঠাৎ একদিন সাত সকালে জয়দেব নিজেই এসে হাজির।

মেঘেমে'দ্রুস্বরম। কাল রাত থেকে বৃষ্টি ছাড়েনি। যেমন ভয়ংকর তেজে কাল রাত ন'টায় বৃষ্টি এল প্রায় ঠিক তেমনি তেজে সারা রাত ধরে বৃষ্টি পড়লো। ঘুমের মধ্যেই মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, কলকাতা ভেসে যাবে।

একটা গোটা ফ্ল্যাটে সম্পূর্ণ একা থাকতে আমার যে ভয় ভয় করে তা মিথ্যে নয়। শোয়ার আগে বার বার দরজা জানালার ছিটকিনি দেখি, খাটের তলা, আলমারির পেছনে এবং আর যে সব জায়গায় চোর বদমাশ লুকিয়ে থাকতে পারে তা ভাল করে না দেখে শুই না। ভূতের ভয় ছেলেবেলা থেকেই ছিল না, তবে বড় হওয়ার পর কখনো কখনো কি যেন একটা ভুত ভুত ভয়ের ভাব হয়। বিশেষ করে যেদিন বৃষ্টি নামে। কাল সারা রাতের অঝোর বৃষ্টিতে বার বার জানালার শার্শিতে টোকা পড়েছে বৃষ্টির আঙুলে, দরজা ঠেলেছে উন্মত্ত বাতাস। ঝোড়ো বৃষ্টিতে কলকাতার ট্রামবাস ডুবে গেল বুঝি! শহরটা বোধহয় একতলা সমান জলের তলায় নিস্তব্ধ হয়ে গেল। এমন বাদলা বহুকাল দেখিনি।

ঘুম ভেঙে একবার উঠে দেখি রাত দুটো। শীত-শীত করছিল। বাথরুমে গিয়ে হঠাৎ কেন গা ছমছম করল! একটু শিউরে উঠে প্রায় দৌড়ে এসে বাতি না নিভিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। বাতি জ্বালানো থাকায় ভয় ভয় ভাবটা কমল বটে, কিন্তু ঘুম আসে না। কোনোখানে মানুষের জেগে থাকার কোনো শব্দ হচ্ছে না। কুকুরের ডাক, বেড়ালের আওয়াজ কিছু নেই। ঘনঘোর মেঘ ডেকে ওঠে কেবল, বৃষ্টির জোর বেড়ে যায়, চারিদিক লণ্ডভণ্ড হতে থাকে। শুয়ে থেকে বুঝতে পারছিলাম, পৃথিবীতে একা হওয়ার মধ্যে কোনো সুখ নেই। একা মানুষ বড় নিস্তেজ, মিয়োনো।

নরম বালিশ বার বার মাথার তাপে গরম হয়ে যাচ্ছে। আমি বালিশ উল্টে দিচ্ছি বার বার। বর্ষাকালের সোঁদা স্যাঁতা এক গন্ধ উঠছে বিছানা থেকে। কিছুতেই রাত কাটছে না।

এইভাবে রাত আড়াইটেয় বড় অসহ্য হয়ে উঠে বসলাম। বুকের ভিতরটা ফাঁকা লাগছে। আমার ভীষণ ইচ্ছে করছিল কারো সঙ্গে একটু কথা বলতে, কারো কথা শুনতে। কিন্তু আমার তো তেমন কেউ নেই।

জানালার ধারে এসে দাঁড়ালাম। ব্যালকনির দিকে জানালায় শার্শির পাল্লা আছে, অন্যগুলোয় কাঠের পাল্লা। শার্শিতে চোখ রেখে দেখি ভূতের দেশের মতো অন্ধকার চারদিক। নিচের রাস্তায় পর পর আলোগুলোর মধ্যে দুটো মাত্র জ্বলছে এখনো। সেই আলোয় দেখা গেল, রাস্তায় হাঁটুজল। জলে প্রবল বৃষ্টির টগবগানী। আকাশ একবার দুবার চমকায়, গম্ভীর মেঘধ্বনি হয়। বড় একা লাগে।

আমার পরনে নিতান্তই সংক্ষিপ্ত পোশাক। গায়ে কেবল ব্লাউজ, পরনে সায়া। রাতে এত বেশী গায়ে রাখতে পারি না। ঘরের বাতি জ্বালা রেখে এ পোশাকে

জানালায় দাঁড়ানো বিপজ্জনক। কিন্তু ঐ নিশুত রাতে কে আর দেখবে। আর মনটাও বড় অস্থির তখন। ঠাণ্ডা শার্শিতে গাল চেপে ধরে বিবশার মতো বাইরে তাকিয়ে থেকে থেকে আস্তে আস্তে জগৎসংসারের ওপর এক গভীর অভিমান জেগে উঠল। কেবল মনে হতে লাগল—তোমাদের কাছে আমার আদর পাওনা ছিল। কেন তোমরা কেউ কখনো আমাকে ভালবাসলে না ? বলো কেন··· ?

কখন কেঁদেছি আপনভোলা হয়ে। কাঁদছি আর কাঁদছি। আর কাকে উদ্দেশ্য করে যেন বিড়বিড় করে বলছি—এবার একদিন বিষ খেয়ে মরব, দেখো।

এ কথা বিশেষ কারো উদ্দেশ্যে বলা নয়। কাকে উদ্দেশ্য করে বলা তা সঠিক আমিও জানি না। তবে এই প্রচণ্ড বৃষ্টির রাতে যখন চারদিকের সব নাগরিকতা মুছে গিয়ে অভ্যন্তরের বন্যতা বেরিয়ে আসে, যখন মনে হয় এইসব ঝড়বৃষ্টির মতো কোনো অঘটনের ভিতর দিয়েই আমাকে সৃষ্টি করেছিল কেউ, তখন আর কাউকে নয় কেবল এই জন্মের ওপরেই বড় অভিমান হয়।

একা, বড় একা।

শার্শির কাছ থেকে ঘরের মধ্যে ফিরে আসি। সাজানো ঘর-দোর ফেলে অসীমদা কোন বিদেশে চলে গেছে তার পরিবার নিয়ে। হয়তো ফিরবে, হয়তো কোনোদিনই ফিরবে না। এই যে আলমারি, খাটপালঙ্ক, রেডিওগ্রাম, নষ্ট ফ্রিজ, টেলিফোন, এরা কারো অপেক্ষায় নেই, এরা কারো নয়। তবু মানুষ কত যত্নে এইসব জমিয়ে তোলে। কান্না পাচ্ছিল। টেলিফোনের সামনে বসে বিড়বিড় করে বললাম—কোনো মানুষকে জাগানো দরকার, আমাকে ভূতে পেয়েছে আজ রাতে, আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে, আমি বড় একা।

টেলিফোন তুলে ডায়াল করতে থাকি। কোন বিশেষ নম্বর ধরে নয়, এমনি আবোল-তাবোল যে নম্বর মনে আসছে সেই ঘরে আঙুল দিয়ে ডিস্ক ঘুরিয়ে দিচ্ছিলাম।

প্রথমবার অনেকক্ষণ ধরে রিং হল, কেউ ধরল না। আমার ভয় করছিল শেষপর্যন্ত কেউ কি ফোন ধরবে না।

তৃতীয়বার রিং হতে দু মিনিট বাদে একটি মেয়ের ঘুম-গলা ভেসে এল—

—আমি অলকা।

—অলকা! কোন অলকা ? এটা ফোর সিক্স ডবল থ্রি···

আমি বললাম—শুনুন, রং নাম্বার হয়নি, আমি আপনাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

অবাক মেয়েটি বলল—কি কথা ?

আমি বললাম—আপনার কে কে আছে ? স্বামী ?

—আমার বিয়ে হয়নি।

—মা! বাবা ? ভাই বোন ?

—বাবা আছেন। এক ভাই। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো। এত রাতে এ সব কি প্রশ্ন ?

—আমার বড় একা লাগছে। ভয় করছে। আপনার নাম কি ?

boiRboi.net

ওপাশের মেয়েটি অবশ্যই খুব ভাল স্বভাবের মেয়ে। অন্য কেউ হলে ফোন রেখে দিত। এ কিন্তু জবাব দিল। বলল—আমার নাম মায়া দাস।

—কি করেন?

—কলেজে পড়াই। কিন্তু আমার এখন খুব টায়ার্ড লাগছে। আপনি কে বলুন তো!

—আমি অলকা। আমি একটা ফ্ল্যাটে একা থাকি। আজ রাতে বড় ঝড় বাদল, আমার ভাল লাগছে না।

—সেই জন্য? আমার ফোন নম্বর আপনি জানলেন কি করে?

—জানি না তো! এখনো জানি না। আন্দাজে ছ'টা নম্বর ডায়াল করেছিলাম, নম্বরগুলো মনেও নেই এখন। আপনি রাগ করলেন?

—না, রাগ নয়। আমাকে এখন অনেক খাতা দেখতে হচ্ছে। ভীষণ টায়ার্ড।

—তাহলে ঘুমোন।

—শুনুন, আপনি আমার চেনা কেউ নন ফোনে মজা করার জন্য পরিচয় গোপন রেখে···

—না না। সে সব নয়। আমি আসলে চাইছি, কিছু লোক আমার মতোই জেগে থাকুক আজকের রাতে। আমার কেবল মনে হচ্ছে আমি ছাড়া সারা কলকাতায় বুঝি আর কেউ জেগে নেই।

ওপাশে বোধহয় মেয়েটির বাবা জেগে গেছেন। এক গম্ভীর পুরুষের স্বর শুনতে পেলাম—কে রে মায়া? কোনো অ্যাকসিডেণ্ট নাকি?

মায়া বোধহয় মাউথপিসে হাত চাপা দিল। কিছুক্ষণ সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। তারপর মায়া বলল—আপনার নাম ঠিকানা কিছু বলবেন।

—কেন?

—বাবা বলছেন, আপনার কোন বিপদ ঘটে থাকলে আমরা হেল্প করার চেষ্টা করতে পারি।

—অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার বিপদ কিছু নেই। শুধু ভয় আছে। ঘুম ভাঙালাম বলে কিছু মনে করবেন না।

—আমার বাবা ডি এস পি। কোনো ভয় করবেন না।

ঠিক এই সময়ে মায়ার বাবা ফোন তুলে নিয়ে বললেন—হ্যালো আপনি কোথা থেকে ফোন করছেন?

—পার্ক সার্কাস। খুব অসহায় গলায় বললাম।

—বাড়িতে একা আছেন?

—হ্যাঁ।

—কেন বাড়ির লোকজন কোথায় গেল?

একটু চুপ করে থেকে বললাম—আমি একাই থাকি।

মায়ার বাবা একটু গলা ঝেড়ে বললেন—ও। বয়স কত?

—বেশী নয়। একুশ বাইশ।

—কি করেন?

boiRboi.net

—একটা প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকরি করি।

—ঠিকানাটা বলুন।

একটু দ্বিধায় পড়ে যাই। নার্ভাসও লাগছে খুব। এতটা নাটক না করলেও হত। ঠিকানা দিলে ডি এস পি সাহেব হয়তো থানায় ফোন করে দেবেন, পুলিশ খোঁজ নিতে আসবে। কত কি হতে পারে!

ঝুঁকি না নিয়ে বললাম—কাকাবাবু, মাপ করবেন। অনেক বিরক্ত করেছি।

উনি বললেন—শুনুন, আমার মনে হচ্ছে আপনি কোন বিপদে পড়েছেন, কিন্তু বলতে সংকোচ করছেন। আমি অ্যাকটিভ পুলিশের লোক, নিঃসংকোচে বলতে পারেন। আপনার প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করতে পারি।

ওঁর এই সহৃদয়তা আমার ভাল লাগছিল। কিন্তু কি করব, আমার যে পুলিশের কোনো দরকার নেই! এই বৃষ্টি বাদলার রাতে আমি কেবল মানুষের জেগে-থাকার শব্দ শুনতে চেয়েছিলাম মাত্র। হয়তো এটা ভীষণ ছেলেমানুষী। এইভাবে ফোন করে লোককে উদ্বিগ্ন ও বিরক্ত করা ঠিক হয়নি। তবু আর তো কোনো উপায় ছিল না।

ভদ্রলোক বার বার 'হ্যালো, হ্যালো' করছেন সাড়া না পেয়ে। আমার কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার যোগাড়। আস্তে করে বলতে হল—না কাকাবাবু, কোনো বিপদ নয়। কেবল ভয়। এখন ভয়টা কেটে গেছে। তারপর ফোনটা নামিয়ে রাখলাম।

বাকি রাতটা আধো-জাগা আধো-ঘুমের মধ্যে কাটিয়ে দিতে দিতে বার বার ডি এস পি ভদ্রলোকের সাহায্য করা, প্রোটেক্ট করার কথাটা মনে পড়ছিল। আমাকে কেউ রক্ষা করুক, ত্রাণ করুক এ আমার অসহ্য। আমি কি অসহায়, অবলা?

ঠিক এই কারণেই প্রভাসরঞ্জনবাবুকে আমি পছন্দ করতে পারি না। যেমন অপছন্দ আমার সুকুমারকে। এমন কি উপরওয়ালার ভূমিকা নেওয়ার একটা অস্পষ্ট চেষ্টা করেছিল বলেই বোধহয় জয়দেবকেও আমি নিতে পারিনি স্বামী হিসেবে। জয়দেবের অবশ্য আরো অনেকগুলো খাঁকতি ছিল।

সকালেও বৃষ্টি ছাড়েনি। এ বৃষ্টিতে ঝি আসবে না জানি। কাজেই সকালে উঠে ঘরদোর সারতে হল নিজেকেই। এক অসম্ভব একটানা প্রবল বৃষ্টি পড়েছে তো পড়ছেই। আমার ফ্ল্যাট থেকে রাস্তার কোনো গাড়ি ঘোড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। তবে, নিচের হাঁটুজলে কিছু গরীবঘরের ছেলে চেঁচাচ্ছে আর জল খেলছে। কয়েকবার রিকশার ঘণ্টির শব্দ হল। কাদের ঘর থেকে উনুনের ধোঁয়া আসছে ঘরে।

চালে জলে খিচুড়ি চাপিয়ে এক কাপ কফি নিয়ে জানালার ধারে বসি। আকাশের মেঘ পাতলা হয়ে আসছে। বৃষ্টির তেজ এইমাত্র খানিকটা কমে গেল। ধরবে। অফিসে যাওয়াটা কি আজ ঠিক হবে? না গেলেও ভাল লাগে না। একা ঘরে সারাদিন। কি করি?

বেলা নটায় উঠে স্নান সেরে নিলাম। ভেজা চুল আজ আর শুকাবে না। কিন্তু রাতে ঘুম হয়নি, স্নান না করলে সারাদিন ঘুমঘুম ভাব থাকত। কিন্তু স্নান করেই বুঝলাম, হুট করে ঠাণ্ডা লেগে গেল। গলাটা ভার, চোখে জল আসছে, নাকে সুড়সুড়, তালুটা শুকনো-শুকনো। ছাতা হাতে অফিসে বেরোলাম তবু শেষ পর্যন্ত।

সিঁড়ির নিচেই প্রভাসরঞ্জন দাঁড়িয়ে বাইরের রাস্তার জল দেখছিলেন। আমাকে দেখে হেসে বললেন—যাবেন কি করে? যা জল!

—যেতে হবে যেমন করে হোক।

—ট্রাম বাসও পাবেন না। দুটো একটা যা চলছে তাতে অসম্ভব ভিড়। আমি একটু আগে বেরিয়ে দেখে এসেছি।

একটু ইতস্তত করছিলাম। রাস্তায় বেরিয়ে যদি ফিরে আসতে হয় তো যাওয়াও হল না, জল ভেঙে ঠাণ্ডাও লেগে গেল হয়তো।

প্রভাসরঞ্জন বললেন—খুব জরুরী কাজ নাকি?

—জরুরীই। একটা ফাইল ক্যাবিনেটের চাবি আমার কাছে রয়ে গেছে।

—রেনি ডে-তে কি আর অফিসের কাজকর্ম হবে?

—হবে।

এই বলে রাস্তাঘাট একটু দেখে নিয়ে সত্যিই বেরিয়ে পড়ি। রাস্তায় পা দিতে না দিতেই একটা পাতলা মেঘের আস্তরণ কাটিয়ে রোদ দেখা দিল। কি মিষ্টি রোদ! গোড়ালিডুবু জল ভেঙে, শাড়ি সামলে কষ্টে এগোতে থাকি। ঠাণ্ডা জলে পা দিতেই শরীরে একটা শীতের কাঁপুনি দিচ্ছে। দিক। গোটা দুই ট্যাবলেট খেয়ে নেবো। ট্যাবলেট ক্যাপসুলের যুগে অত ভয়ের কিছু নেই।

ভাগ্য ভাল, ডিপোর কাছ বরাবর যেতে না যেতেই লেডীজ স্পেশাল পেয়ে গেলাম।

অফিসে এসেই বেয়ারাকে দিয়েই গোটা দশেক ট্যাবলেট আনিয়ে দুটো খেয়ে ফেললাম। তারপর চা। শরীরটা খারাপই লাগছে। সর্দি হবে।

গামবুট আর বর্ষাতিতে সেজে সুকুমার আজ বেশ দেরিতে অফিসে এল। ও আবার ম্যানেজমেণ্টকে বড় একটা তোয়াক্কা করে না। অফিসে ঢুকেই ধরাচুড়া ছেড়ে সোজা আমার টেবিলের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে বলল—দুটো সিনেমার টিকিট আছে। যাবে? ইংরিজি ছবি।

আমি ওর বিশাল স্বাস্থ্যের চেহারাটা দেখলাম খানিক। এর আগে ওর সঙ্গে কয়েকবারই সিনেমায় গেছি। তখন সংকোচ ছিল না। সেদিন আমার ফ্ল্যাটে সেই কাণ্ড ঘটানোর পর থেকে ও আর বড় একটা কাছে ঘেঁষেনি এতদিন। লজ্জায় লজ্জায় দূরে দূরে থাকত। আজ আবার মুখোমুখি হল।

বললাম—আজ শরীর ভাল নেই।

—কি হয়েছে?

—সর্দি।

—ওতে কিছু হবে না। চলো, ঠেসে মাংস খেয়ে নেবে। মাংস খেলে সর্দি জব্দ হয়ে যায়।

হঠাৎ মুখ ফসকে বলে ফেললাম—আর সুকুমার জব্দ হবে কিসে?

সুকুমার দু পলক আমাকে দেখে নিয়ে অত্যন্ত নির্লজ্জ গলায় বলল—মাংসে। যদি সেই সঙ্গে হৃদয় পাওয়া যায় তো আরো ভাল।

একবার আক্রান্ত হওয়ার পর আমার সাহস কিছু বেড়েছে। বললাম—এত দাবি-

boiRboi.net

দাওয়া কিসের বলো তো! বেশ তো আছি। তুমি তোমার মতো, আমি আমার মতো।

—আমি আমার মতো নেই।

এটা অফিস, এসব কথাও বিপদজ্জনক। তাই মুখ নিচু করে বললাম—এ সব কথা থাক সুকুমার।

—থাক। তবে এ সব কথা আবার উঠবে, মনে রেখো।

আমি ওর দিকে চেয়ে একটু হাসলাম। পুরুষেরা অসম্ভব দখলদার এক জাত।

দুটো সিনেমার লাল টিকিট বের করে সুকুমার আমার সামনেই ছি'ড়ল কুচিকুচি করে। আমার টেবিলের উপর ছে'ড়া টিকিটের টুকরো কাগজ জড়ো করে রেখে বলল—জানতাম তুমি যেতে চাইবে না। কিন্তু আমারও তো একটা সুযোগ দরকার।

অফিসে আজ কাজকর্মের মন্দা। লোকজন বেশী আসেনি। বেশ বেলা করে দু চারজন এসেছে বটে, তবু বড্ড ফাঁকা ঠেকছে অফিস। নিরিবিলিতে বসে কথা বলতে বাধা নেই। সত্যি বলতে কি, আমার কথা বলতে ইচ্ছেও করছিল।

বললাম—সুযোগ মানে কিন্তু দখল করা নয়। আমি কারো সম্পত্তি হতে পারিনি, কোনদিন পারবও না।

—তাহলে আমাকেই তোমার সম্পত্তি করে নাও না! চিরকাল তোমার হুকুম মতো চললেই তো হল!

হাসলাম। ছেলেমানুষ।

বললাম—ও রকম নেতানো নির্জীব পুরুষও মেয়েদের পছন্দ নয়।

—তাহলে কি হবে?

—কিছু হবে না।

—কিসের বাধা অলকা? তোমার স্বামীর কথা ভাবছো?

মাথা নেড়ে বলাম—না। তবে সেটাও ভাবা উচিত। এখনো তার সঙ্গে আমার ডিভোর্স হয়নি।

—করে নাও।

বড় করে একটা শ্বাস ফেলে বললাম—সে অনেক ঝামেলা, দরকারও দেখি না। কিছুদিন গেলেই সে নিজেই মামলা করবে। আমি কোর্টে যাবো না, এক্সপার্টি হয়ে ওকে ডিক্রি করে দেবো।

—সেটা অনিশ্চিত ব্যবস্থা অলকা। উনি যদি মামলা না করেন?

—বয়ে গেল।

সুকুমার মাথা নেড়ে বলে—তুমি অত আলগা থেকো না। কেন নিজেকে নষ্ট করছো? আমি যে শেষ হয়ে যাচ্ছি!

কি থেকে কি হয়ে গেল মনের মধ্যে।

মেঘভাঙা অপরূপ রোদের ঝরণা বয়ে যাচ্ছে চারদিকে। অফিস ঘরে গনগন করছে আলোর আভা। দুদিন মনমরা বৃষ্টির পর কি ভাল এই রোদ্দুর! কাল রাতের সেই একা থাকা ভয়ংকর ছবি মিথ্যে মনে হয়। আবার সেই বাসায় আজকেও আমাকে একা ফিরে যেতে হবে। যদি রাতে বৃষ্টি আসে ফের, তবে আবার ঘুম ভেঙে

boiRboi.net

ভূতে/পাওয়া মাথা নিয়ে বসে থাকবে।

হ্যাঁ ঠিক। প্রোটেক্টার না হোক, আমার একজন সঙ্গী চাই। কাউকে না হলে বাঁচব কি করে?

সুকুমার দেখতে বেশ। তাছাড়া বড় সরল, সোজা ছেলে! কখনো ওকে খারাপ লাগেনি। আজ অপরাহ্নের আলোয় অফিসঘরে বসে মুখোমুখী ওর দিকে চেয়ে হঠাৎ কি হয়ে গেল। ভাবলাম—কি হবে এত বাছবিচার করে! নিজেকে নিয়ে আর কত বেঁচে থাকা!

বললাম—শোন সুকুমার, আমি ডিভোর্স চাই।

—চাও? ও লাফিয়ে ওঠে।

—চাই। আমার স্বামীও চায়। হয়তো ডিভোর্স পেতে কিছু সময় লাগবে।

—তারপর কি করবে অলকা?

—তারপর করতে অনেক দেরি হয়ে যাবে সুকুমার। এক দুরন্ত অধৈর্য অনুভব করে বলি।

—অলকা, যদি আমরা এক্ষুনি বিয়ে করি তাহলে?

আমি ক্ষণকাল চুপ করে থাকি। বুকের মধ্যে নানা ভয়, দ্বিধা, সংস্কার ছায়া ফেলে যায়।

তারপর বলি—কয়েকটা দিন সময় দাও।

—দিলাম। ক'দিন বলো তো!

—দেখি।

একরকম কথা দেওয়াই হয়ে গেল সুকুমারকে! একটু হয়তো কিন্তু রইল, দ্বিধা রইল, তবু ওটুকু কিছু নয়। সে সব দ্বিধা, ভয় ভেঙে সুকুমার ঠিক সাঁতরে আসবে কাছে।

রাতটা মাসীর বাড়িতে গিয়ে কাটালাম। জ্বর এল রাতে। তিনটে দিন বাড়ির বার হওয়া গেল না। অল্প জ্বরেই কত যে ভুল বকলাম ঘোরের মধ্যে!

চার দিনের দিন ফের ফ্ল্যাটে ফিরে এলাম। মাসী আজকাল আর আটকে রাখে না, যেতে চাইলে এক কথায় ছেড়ে দেয়। ঢিলে বল্গা মেয়েকে সকলেরই ভয়।

দোতালার ফ্ল্যাটে ঢুকে দরজা জানালা হাট করে খুলে বন্ধ বাতাস তাড়াই। ধুলো-ময়লা পরিষ্কার করি। রবিবার। তাড়া নেই।

চায়ের জল চাপিয়ে এলোচুলের জট ছাড়াতে একটু ব্যালকনিতে দাঁড়াই।

কলিং বেল বাজল। এ সময়ে কেউ আসে না। একমাত্র সুকুমার আসতে পারে। তার তর সইছে না।

কাঁপা বুক নিয়ে গিয়ে দরজা খুলেই সাপ দেখে পিছিয়ে আসার অবস্থা। চৌকাঠের ওপারে জয়দেব দাঁড়িয়ে।

কিছুক্ষণ কথা ফোটে না কারো মুখে। জয়দেবের চেহারা রোদে পোড়া, তামাটে, কিছু রোগা হয়েছে। মাথার চুল এত ছোট যেন মনে হয় কদিন আগে ন্যাড়া হয়েছে। পরনে ধুতি আর ক্রীমরঙা সুতীর শার্ট। কিন্তু ধুতিটা এমনভাবে পরেছে যে মনে হয় পাশের ফ্ল্যাট থেকে এল। বাইরে বেরোবার পোশাক নয়।

boiRboi.net

চৌকাঠের বাইরে থেকে জয়দেব এক পাও ভিতরে আসার চেষ্টা করল না। দাঁড়িয়ে থেকে বলল—তুমি এখানে থাকো সে খবর সদ্য পেয়েছি।

—কি চাও?

খুব সাধারণ আলাপচারীর গলায় জয়দেব বলল—কিছু চাই না অলকা। তোমার কাছে ডিভোর্সে মত দিয়ে একটা চিঠি দিয়েছিলাম, তার কোনো উত্তর দাওনি। তোমার কি মত আছে?

একটু গম্ভীর হয়ে বলি—দরজার বাইরে থেকে অত জোরে ও সব কথা বলছো কেন? ভিতরে এসো।

জয়দেব এলো। কোনোদিকে তাকাল না, ঘরের আসবাবপত্র লক্ষ্য করল না। খুবই কুণ্ঠিত পায়ে এসে একটা চেয়ারে বসে বলল—আমি নিচের তলায় প্রভাসবাবুর বাসায় উঠেছি কাল এসে।

প্রভাসের সঙ্গে জয়দেবের চেনা আছে জানতাম। তাই চমকালাম না। দরজা বন্ধ করে এসে জয়দেবের মুখোমুখি বসে বললাম—আমি খুব তাড়াতাড়ি ডিভোর্স চাই।

জয়দেব মুখখানা করুণ করে বলল—তাড়াতাড়ি চাইলেই তো হয় না। কোর্ট থেকে এ সব কেসে বড় দেরি করে। তাড়াতাড়ি চাইলে আরো আগে জানালে না কেন? কবে কেস ফাইল করা যেতো!

আমি মাথা নিচু করে বলি—শোনো, ডিভোর্স পেতে দেরী হোক বা না হোক আমরা তো একটা অ্যাগ্রিমেণ্টে আসতে পারি!

—কি অ্যাগ্রিমেণ্ট?

—ধরো, আমরা কেউ কাউকে কোনো অবস্থাতেই দাবি করবো না! পরস্পরের কোনো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবো না!

—তার জন্য অ্যাগ্রিমেণ্ট লাগে না অলকা। জয়দেব বলল—আমরা সেই রকমই আছি।

কথার স্বর শুনেই বোঝা যায়, জয়দেবের মন এখন অনেক গভীর হয়েছে। জীবনে কোনো একটা সত্য বস্তুর সন্ধান না পেলে মানুষ এত গভীর থেকে কথা বলতে পারে না। তাই আমি ওর মুখের দিকে কয়েকবার তাকালাম। ও আমাকে দেখছিল না। চোখ তুলে দেওয়ালের মাঝারি উচ্চতায় চেয়েছিল। সেই অবস্থায় চেয়ে থেকেই বলল—তুমি একটি ছেলেকে পছন্দ কর শুনেছি। তাকে বিয়ে করার জন্যই কি এত তাড়া?

সত্যিকারের অবাক হয়ে বলি—না তো! আমি কাউকেই পছন্দ করি না।

—সুকুমার না কি যেন নাম, শুনেছিলাম। তোমার অফিসের!

—ওঃ! বাস্তবিক আমার সুকুমারের মুখটা এখন মনে পড়ল। বললাম—পছন্দ নয়। তবে ঐ এক রকম।

—ভাল।

—তুমি ডিভোর্স চাইছো কেন? বিয়ে করবে? বললাম।

ও অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল—বিয়ে আর না। মুক্ত হতে চাইছি, নইলে বড় কষ্ট হয়।

—কষ্ট কিসের?

—ঐ একটা অধিকারবোধ থাকে তো পুরুষের। সেইটে মাঝে মাঝে চাড়া দেয়। ডিভোর্স হয়ে গেলে এক রকম শান্তি।

—ও।

—আচ্ছা—বলে জয়দেব কুণ্ঠিত পায়ে উঠল। বলল—উকিলের চিঠি দেবো। তুমি কি অ্যালিমনি চাও?

—সেটা কি?

—খোরপোষ।

—না, না। চমকে উঠে বলি।

—আচ্ছা তাহলে—

—আচ্ছা। বললাম।

দরজা খুলে জয়দেব চলে গেল।

সিঁড়ি বেয়ে ওর পায়ের শব্দ যখন নামছে তখন আমি ঘরের মধ্যে চুলের জটে আঙুল ডুবিয়ে বসে আছি। ভাবছি। কত ভাবনা! সে যেন এক আলো-আঁধারের মধ্যে ডুবে বসে থাকা। উঠলাম না, রাঁধলাম না, খেলাম না। শুধু বসে রইলাম।

হঠাৎ এক ভয়ের আঙুল হৃৎপিণ্ডে টোকা মারল। নড়ে উঠল বুকের বাতাস। সচেতন ভীতগ্রস্ততায় টের পাই—আমি কাউকেই ভালবাসি না। কাউকে নয়। কেবলমাত্র নিজেকে। আমি কোনদিন কাউকে ভালবাসতে পারবও না।

কি করে বেঁচে থাকব আমি?

পৃথিবীতে কত দুর্যোগের বর্ষা নামবে কতবার! কত একা কাটবে দিন! কাউকে ভাল না বেসে আমি থাকব কি করে?

বিকেল কাটল। নিচের তলা থেকে অহংকারী জয়দেব একবারও এল না খোঁজ করতে। সুকুমার টেলিফোনও করল না। বড় অভিমানে ভরে গেল বুক। সারাদিন খাইনি, স্নান করিনি, কে তার খোঁজ রাখে!

সন্ধে হল, রাত গড়িয়ে গেল গভীরের দিকে।

শরীর দুর্বল। মাথা ফাঁকা। মনটায় তদগত একটা আচ্ছন্নতা। ভূতে পেয়েছে আমাকে। উঠে গিয়ে ছারপোকা মারবার অমোঘ ওষুধের শিশিটা হাতে নিয়ে টেবিলে বসলাম। চিরকুটে লিখে রাখলাম—আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।

লিখে বিছানায় শুয়ে আস্তে শিশির মুখ খুলে ঠোঁটের কাছে এনে পৃথিবীকে বললাম—ভালবাসা ছাড়া কি করে বাঁচি বলো! বাঁচা যায়? ক্ষমা করো।

ঠিক এ সময়ে টেলিফোন বেজে উঠল মৃদু সেতারের মতো। উঠলাম না। শিশিটা উপুড় করে দিলাম গলার মধ্যে।

হায়! ফাঁকা শিশি প্রেমহীন হৃদয়ের মতো চেয়ে রইল আমার শূন্য হৃদয়ের দিকে। এক ফোঁটা বিষও ঢালতে পারল না সে। অমৃতও না।

উঠে টেলিফোনটা যখন ধরছি তখন কেন যেন খুব ইচ্ছে করছিল, টেলিফোনে যেন জয়দেবের গলার স্বর শুনতে পাই।

—

BDeBoi.net

সুখের আড়াল

boiRboi.net

boiRboi.net

এক

শেষ ক্লাশটা সেরে জগন্নাথ করিডোর দিয়ে স্টাফ-রুমের দিকে ফিরছিল। দূর থেকেই দেখল বারান্দার রেলিঙে ঠেস দিয়ে এক অদ্ভুত মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। পরনে আধময়লা হ্যাণ্ডলুমের চেক শার্ট খাকি প্যাণ্ট, কাঁধে রুক-স্যাক্, একগাল দাড়ি। একটু কাছে আসতেই শ্লথ গতিতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাসল, বলল—হ্যালো। একটু চমকে গিয়েছিল সে, পরমুহূর্তেই হেসে ফেলল। বলল—অপদার্থ। কোথা থেকে ফিরলি ?

অরিজিৎ হাসিমুখে তাকিয়েছিল জগন্নাথের দিকে। একটু চুপ করে থেকে বলল—তোর জন্য প্রায় চল্লিশ মিনিট দাঁড়িয়ে আছি।

—দাঁড়িয়ে কেন ? জগন্নাথ ভ্রূ কুঁচকে বলে, স্টাফ-রুমে বসলেই তো পারতিস !

চোখ বিস্ফারিত করে নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে অরিজিৎ বলে—এই বেশে ?

ওর বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা টেনে নিয়ে সামান্য একটু চাপ দিয়েই ছেড়ে দেয় সে—আজই ফিরলি ?

—এইমাত্র। হাওড়া স্টেশন থেকে সোজা আসছি, মালপত্র স্টেশনে জমা রেখে। বলে হাসল অরিজিৎ—ফিরছি অমরনাথ থেকে।

একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল জগন্নাথকে, ভ্রূ সামান্য কোঁচকানো, বলল—বাড়ীতে যাসনি ?

—যাব। অরিজিৎ জগন্নাথের কাঁধের দিকে হাত বাড়িয়েছিল, কি ভেবে হাতটা টেনে নিয়ে বলল—অনেক কথা আছে। এখন আর ক্লাশ আছে তোর ?

—না। জগন্নাথ মাথা নাড়ে। অরিজিতের দিকে খানিকক্ষণ শূন্য চোখে চেয়ে থেকে হঠাৎ বলে—কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াস এখানে ? বয়স হয়নি তোর ?

—মা-মাসীর মতো কথা বলছিস ! একটু থেমে থেকে বলল—এখানে কথা হয় না। তোর ছাত্ররা ঘুরছে চারদিকে ; আমাকে বার বার ক'রে দেখে যাচ্ছিল সবাই। তার চেয়ে চল্ বেরিয়ে পড়ি।

—চল্। বলে একটু থমকে গেল জগন্নাথ—কিন্তু অতদূরে থেকে ফিরলি, তোর টায়ার্ড লাগছে না ?

—দূর্ ! আবার হাসল অরিজিৎ। দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। জগন্নাথ আগেও দেখেছে, এখনো লক্ষ্য করল অরিজিতের হাটার ধরনটা আলাদা। বেশ রোগা অরিজিৎ, মাথায় অনেকটা লম্বা, কোলকুঁজো। হাঁটার সময় আরো ঝুঁকে পড়ে দীর্ঘ পদক্ষেপে হাঁটে, প্রায় নিঃশব্দে খুব দ্রুতবেগে হাঁটতে পারে। সে সময়ে কেমন একটা আক্রোশ আর আক্রমণের ভঙ্গী ফুটে ওঠে ওর শরীরে। অনেকদিন ধরে হাঁটছে অরিজিৎ, ঘুরে বেড়াচ্ছে পাহাড়ে, সমুদ্রে, অরণ্যে। রোদে পুড়ে ওর মুখ আর হাতের চামড়ার রঙ বাদামী, কিন্তু জামা খুললে ওর শ্বেত পাথরের মতো শরীর দেখা যায়। কেমন পাকিয়ে গেছে শরীর, মুখ আরো শ্রীহীন হয়েছে, তবু জগন্নাথ জানে ওর শরীর পালকের মতো হাল্কা, চিতাবাঘের মতো ক্ষমতাসম্পন্ন, অসম্ভব সহনশীল।

boiRboi.net

নিঃশব্দে হেঁটে দুজনে কলেজের বাইরে বড় রাস্তায় এসে দাঁড়াল। হাওয়া দিচ্ছে খুব। জগন্নাথের পাঞ্জাবী ফুরফুর করে উড়ছিল। অরিজিৎ হাঁ করে বড় নিঃশ্বাস ফেলল—কলকাতায় এসে গরম লাগছে খুব। কোন দিকে যাওয়া যায় বল্ তো!

—সে তোকে ভাবতে হবে না। জগন্নাথ ভ্রু কুঁচকে বলল। খালি ট্যাক্সির জন্য রাস্তার এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল সে।

—কি খুঁজছিস? অরিজিৎ প্রশ্ন করে।

—ট্যাক্সি।

—কি হবে!

—যা চেহারা করেছ—জগন্নাথ দাঁতে দাঁত চেপে বলে—তোমার সঙ্গে ট্রামে বাসে ওঠা যায় না।

—ঠিক কথা। অরিজিৎ হাসে—কিন্তু নিয়ে যাবি কোথায়? তোর বাসায়?

—নয় কেন?

—দূর! অরিজিৎ চাপা গলায় বলে—তোর নতুন বৌ আমাকে দেখে ভয় পেয়ে যাবে। এ পোষাকে নয়, একটু ভদ্রস্থ হয়ে নি আগে, তারপর যাওয়া যাবে।

কথাটা ভেবে দেখল জগন্নাথ, তারপর হেসে ফেলে বলে—খুব মন্দ বলিসনি। আমিও প্রথমটায় ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তবু চল তো, তোকে দিয়ে একটা 'শক্' দেওয়া যাক ওকে।

—না ভাই। হাত জোড় করে অরিজিৎ, এ দানটা ছেড়ে দে।

ভ্রু কুঁচকে জগন্নাথ বলে—তবে কোন দিকে যাবি, অপদার্থ?

অরিজিৎ কপালের ঘাম হাত দিয়ে মুছে বলল—কোথাও গিয়ে বসা যাক।

—কোথায়! রেস্টুরেন্টে?

—দূর!

—তাহলে?

একটু ভেবে নিয়ে অরিজিৎ বলল—ময়দানের দিকে চল্। ফাঁকা মাঠ আছে, গাছতলায় বসলে গঙ্গার হাওয়া লাগবে।

জগন্নাথ অরিজিতের দিকে চোখ ছোট করে তাকাল—বাস্তবিক, এতদূর ট্রেন জার্নি করে টায়ার্ড লাগছে না তোর? আমার তো চারটে ক্লাশ করলে হাঁফ ধরে যায়।

—ট্রাম আসছে। এই বলে—অরিজিৎ লম্বা হাত বাড়িয়ে জগন্নাথের একটা হাত শক্ত করে ধরল—আয়। চমকে উঠল জগন্নাথ, অরিজিতের হাতটা থরথর করে কাঁপছে। পরমুহূর্তেই ছেড়ে দিল।

টার্মিনাসে ট্রাম থামতে নেমে পড়ল দু'জন। এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে, শরতের রোদ নিস্তেজ। ভাল লাগছিল জগন্নাথের। বলল—এমন হুট করে আসিস আর চলে যাস যে তোর তাল পাওয়া যায় না।

—এই তো ভাল। বলতে বলতে পকেট থেকে একটা রোদ-চশমা বের করে চোখে পরে নিল অরিজিৎ। সঙ্গে সঙ্গে ভুতুড়ে হয়ে গেল ওর মুখ। সম্পূর্ণ অচেনা। বলল—চোখটা ট্রাবল্ দিচ্ছে, বুঝলি! সন্দেহ হয়, বুড়ো হয়ে যাচ্ছি না তো! বলে হাসল।

boiRboi.net

বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, খোলা ময়দান, যতদূর চোখ যায় সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মানুষ। এখানে কি করছে এরা তা জগন্নাথ ভেবে পায় না। অভ্যাসবশতঃ জোরে হাঁটছিল অরিজিৎ, তাল রাখতে গিয়ে জগন্নাথ ক্রমশঃ অনুভব করে যে তার হাঁফ ধরে যাচ্ছে। তাই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে, অরিজিৎ এগিয়ে গিয়েছিল, মুখ ফিরিয়ে নিল—কি হল রে ?

—কিছু না। জগন্নাথ একটা শ্বাস ফেলে বলে—অত জোরে হাঁটছিস কেন ?

—অভ্যেস।

—আমি পারি না !

—তোমার সুখের শরীর। বলে হাসল অরিজিৎ—বিয়ে করে আরো ড্যাপসা হয়ে গেছিস। বলতে বলতে কাছে এসে দাঁড়িয়ে দু হাত হঠাৎ ওপরে ছুঁড়ে বলল—অনেকদিন পর বড় ভাল লাগছে।

—কি ?

—এই আকাশ, বাতাস, মাটি, মনুমেণ্ট—এই সব আর কি ! তোকেও।

জগন্নাথ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অরিজিতের মুখের দিকে চেয়ে। অস্পষ্টভাবে সে একটা কিছু টের পাচ্ছিল। এর আগেও বাইরে গেছে, ফিরে এসেছে অরিজিৎ, দেখা করেছে জগন্নাথের সঙ্গে। কিন্তু এখন সে কোথায় যেন অরিজিতের ভাঙচুরের আভাষ পাচ্ছিল। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু নিশ্চিত কোথাও অসঙ্গতি রয়েছে। জগন্নাথ আস্তে আস্তে বলল—কি কথা ছিল তোর যার জন্য এতদূর টেনে আনলি ?

—কথা ! স্নায়ুতন্ত্রীর বিকার থেকে যে ভাবে হাসে লোকে সেভাবে হঠাৎ হাসল অরিজিৎ, গভীর শ্বাস টেনে বলল—আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।

মরা আলোর পশ্চিম আকাশের দিকে পিছন ফিরে অরিজিৎ দাঁড়িয়েছিল। অদূরেই সূর্য অস্ত যাচ্ছে, এ পাশ থেকে ওর মুখ দেখাচ্ছিল কালো ব্রোঞ্জে গঠিত। কাঁধে রুক-স্যাক, পায়ে নোংরা বিবর্ণ হান্টিং বুট, কাপড় জামা ময়লা, গালে দাড়ি, বড়ো বড়ো চুল কপাল ছেয়ে পড়ে আছে—দীর্ঘ পথ অতিক্রমের সমস্ত চিহ্ন রয়েছে তার চেহারায়, তবু জগন্নাথের মনে হল সদ্য গ্রীণরুম থেকে বেরিয়ে এসেছে অরিজিৎ, খোলা মাঠে ভীড়ের মধ্যে হঠাৎ ভাঁড়ের মতো দেখাচ্ছে তাকে। জগন্নাথ আস্তে আস্তে বলল—তোমার বয়স তো দু বছর করে বাড়ছে না !

তেমনি নির্বিকার থেকেই যেন হাসল অরিজিৎ। একটা গোপন কিছু ঢাকা দেওয়ার জন্যই যেন তাড়াতাড়ি বলল—আমার নার্ভগুলো বোধ হয় নষ্ট হয়ে গেছে, অল্পেই শরীর মন কাঁপতে থাকে। বেনারসে একবার ভয়ংকর পেটের ব্যথায় পড়েছিলাম কিছুদিন। সেই থেকেই দেখছি—

জগন্নাথ হাসল, নিষ্প্রাণ হাসি। বলল—আর কোনো কথা ছিল না তোর।

মাথা নাড়ে অরিজিৎ। না। কিন্তু তার মুখ দেখে জগন্নাথের মনে হল ভয়ঙ্কর এক ধরনের অস্থিরতা চেপে রাখতে গিয়ে কষ্ট হচ্ছে ওর। বড় বেদনার্ত দেখাল ওর মুখ। একটু আগে যার সঙ্গে ট্রাম থেকে নামল এ সে অরিজিৎ নয়। জগন্নাথ বলল—আমার সঙ্গে আয়।

একটু ইতস্ততঃ করল অরিজিৎ, পরমুহূর্তেই মাথা নামিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে

boiRboi.net

হাঁটতে লাগল, জিজ্ঞেসও করল না কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাকে জগন্নাথ।

ফেরার সময় ট্যাক্সি ধরল জগন্নাথ। সারা রাস্তা দুজনেই নিঃশব্দে বাইরে চেয়ে রইল।

—আপনাকে দেখায় অনেকটা সোলজারের মতো। বলে বনলতা হাসছিল। টেবিলের ওপর একটিমাত্র টেবিল ল্যাম্প জ্বলছিল, সে আলোটাও অর্ধেক আড়াল করে টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল বনলতা। সারা ঘরে অন্ধকার ছড়িয়ে আছে।

—সোলজার? কথাটা বলে একটু ভাবতে থাকে অরিজিৎ।

—সোলজার। বনলতা বলল—ফ্রন্ট থেকে ফিরে আসবার পর অবশ্য।

খোলা গলায় হাসে অরিজিৎ—ফ্রন্ট থেকে মার খেয়ে হেরে ফিরে আসবার পর, না? কোণের চেয়ারে বসে জগন্নাথ অরিজিতকে দেখছিল। সারাদিন পর স্নান করেছে অরিজিৎ, বনলতা খাবার করে খাওয়াল। এখন তৃপ্ত ও খুশী দেখাচ্ছে অরিজিৎকে। স্মিত মুখে জগন্নাথ চেয়ে ছিল, কিন্তু অরিজিৎ যতদূর সম্ভব এড়িয়ে যাচ্ছে তার চোখ।

—মার খেয়েই তো! যা চেহারা করে এসেছিলেন, আমি ত প্রথমে চমকে উঠেছিলুম। বনলতা বলল।

মাথা নামিয়ে নিয়ে লাজুক গলায় বলে অরিজিৎ—আমার দোষ নেই। জগন্নাথকে জিজ্ঞেস করুন, আমি প্রথমটায় ঐ ভয়েই আসতে চাইনি।

—বাঃ! বনলতা খোঁপায় হাত তুলল—আমি চমকে যাবো বলে আপনি বন্ধুর বাসায় আসবেন না? দেখবেন না কেমন নতুন সংসার পেতেছে আপনার বন্ধু?

—দেখব না কেন? কিন্তু তার জন্য সময় নেওয়া উচিত ছিল। বলতে বলতে আবার একটু অস্থির বোধ করে অরিজিৎ—দেখুন কেমন জংলীর মতো এসেছি, প্রথম দেখা আপনার সঙ্গে অথচ একটা উপহারও নিয়ে আসিনি হাতে করে।

—তাতে কি? বনলতা ঠাট্টার ছলে যেন খেলছে অরিজিৎকে নিয়ে, পরে দেবেন। আমি খুব নির্লোভ নই, উপহার পেতে ভালবাসি।

—দেব। অবশ্যই দেব। নির্বোধের মতোই খানিকটা প্রতিজ্ঞা করার ভঙ্গীতে বিড় বিড় করল অরিজিৎ—ভাবছি কি দেওয়া যায়! কিসে মানায় আপনাকে!

একটু চাপা হাসি মুখে বনলতা তাকায় জগন্নাথের দিকে, হাল্কা গলায় অরিজিতকে বলে—যা খুশী। আপনার রুকস্যাকটাই দিয়ে যান না। আর সেই সঙ্গে কথা দিয়ে যান যে আর রুকস্যাক কাঁধে নেবেন না।

অরিজিৎ হাসে—কিন্তু তা হলে আপনাকেই রুকস্যাক কাঁধে নিতে হয়। চকিতে জগন্নাথের দিকে চেয়ে বলে—তাতে জগন্নাথের কি খুব সুবিধে হবে?

জগন্নাথ অরিজিৎকেই দেখছিল, সারাক্ষণ কথায় কথায় ওকে নাস্তানাবুদ করেছে বনলতা। অরিজিৎ হাসছে, কিংবা হাসি দিয়ে কিছু চাপা দিচ্ছে। চেয়ারের হাতলের ওপর ওর হাত দেখছিল জগন্নাথ, ওর তাকানোর ভঙ্গী দেখছিল, ওর গলার ঈষৎ কর্কশ স্বর মনোযোগ দিয়ে শুনছিল।

বনলতা অরিজিতের কথার উত্তরে বলছিল—রুকস্যাক আমি কাঁধে করলে ওর

boiRboi.net

কোনো ক্ষতি নেই, বৌ বাউণ্ডুলে বলে তাড়াতাড়ি ডিভোর্স পেয়ে যাবে। আমি নেবো কাঁধে, কিন্তু আপনাকেও রুকস্যাকের বদলে অন্য কিছু কাঁধে নিতে হবে।

—ও তো সেই পুরনো কথা—অরিজিৎ হাত তুলে থামাল বনলতাকে—ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি।

বনলতা একটু থমকে গেল। সামলে নিয়ে পরমুহূর্তেই হেসে বলল—আপনার ভ্রমণকাহিনী কিন্তু একটুও শুনলাম না। কেমন টুরিস্ট আপনি? লোকে লিলুয়া ঘুরে এসে কান ঝালাপালা করে দেয়!

অরিজিৎ হাসে—সেই ভয়েই ত বলি না। তারপর থেমে থেকে একটু গম্ভীর হয়ে গেল—একটানা গল্প বলে যেতে আমি পারিও না, বলতে বলতে সন্দেহ হয় বলাটা হয়তো ঠিকমতো হচ্ছে না, লোকে বোর হচ্ছে। পরমুহূর্তেই হেসে বলল—ওটা একটা আর্ট; লিলুয়া ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বলেও লোককে মুগ্ধ করে রাখা যায়।

বনলতা কি বলতে যাচ্ছিল জগন্নাথ বাধা দিয়ে বলল—ওকে এবার খাইয়ে দাও। অনেক দূর যাবে ও।

বনলতা চলে গেলে কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। তারপর প্রথম কথা বলল অরিজিৎ!

—উ!

—আমি আবার বেরিয়ে পড়ব। খুব শীগগীরই।

—হুঁ!

কিছুক্ষণ আবার চুপচাপ। অরিজিৎ কিছুক্ষণ চেয়ে সামনের দেয়ালে ক্যালেণ্ডারটা আবছা আলোতে দেখার চেষ্টা করল। তারপর হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বলল—তোর চেয়ে আমি চার বছরের বড়, তোর বোধহয় বত্রিশ চলছে, না?

—বোধহয়।

একটু শ্বাস ফেলল অরিজিৎ—বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।

—একই কথা বার বার বলছিস কেন? তোকে বুড়ো দেখায় না।

—না?

—না।

আবার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হয়, অরিজিৎ বলে—তবু বয়স তো হচ্ছে

—তাতে কি? নিস্পৃহ গলায় জগন্নাথ বলে।

অরিজিৎ হাসে, তেমনি স্নায়বিক বিকারের হাসি—একটু উঁচুগ্রামে বাঁধা। বলে—আমার কাছে এটাই সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর।

—কেন?

—মৃত্যুভয়! আবার হাসে অরিজিৎ—আমি নাটক করতে ভালবাসি না জগন্নাথ, তবু হয়ত খানিকটা নাটকীয় শোনাবে। আমি তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়েছি, আর প্রার্থনা করেছি।

—কিসের?

—যেন আমার মৃত্যু না হয়। অসুস্থতার হাসি হাসে অরিজিৎ—বিয়ে করিনি, হয়তো করবোও না। তবু যদি কখনো করি, তাই আগে থেকে প্রার্থনা করেছি যেন

boiRboi.net

আমার সেই স্ত্রীর মৃত্যু না হয়, অনাগত সন্তানের যাতে মৃত্যু না হয়।

—এর কোনো অর্থ নেই।

সে কথা শুনল না অরিজিৎ, এক গভীর স্বপ্নময়তার ভিতর থেকে বলল—আমি ভাগ্যবান যে প্রিয় আপনজন কেউ নেই। কলকাতার বাড়িটা ফাঁকা পড়ে আছে, এবার বিক্রী করে দেব। তারপর—আঃ! বলে মৃদু হাসি মুখে চেয়ারের পিছনে মাথা এলিয়ে দিল অরিজিৎ।

—কি বলছিস? জগন্নাথ আস্তে করে জিজ্ঞেস করে।

—যেন আমার মৃত্যু না হয়! অরিজিৎ অবহেলায় চেয়ে থাকে ঘরের সেই একটাই দেয়ালের দিকে যেটা তার সামনে রয়েছে, বলে—কিন্তু হবেই জগন্নাথ, কে ঠেকাবে তাকে?

—ঠেকানো যায় না। জগন্নাথ আস্তে বলল।

—সমস্ত অধিকার ছেড়ে দিলে শুনেছি মৃত্যু হয় না। যদি তাই দিই?

—কি পাগলের মতো যা তা বলছিস? জগন্নাথ স্পষ্ট বিরক্তির স্বরে বলে।

হাসল অরিজিৎ—কেন বলছি তা আমি জানি না। কিন্তু মনে হয়েছিল কাউকে বলা দরকার। না বললে মরে যাবো। বহুদূর থেকে ছুটতে ছুটতে এলাম তোর কাছে, স্টেশন থেকেই সোজা এলাম, যা কখনো করি না। কেমন অচেনা লাগছিল এই শহর, কেমন অচেনা লাগছিল তোকেও, প্রথমে তাই বলতে পারলাম না, কথা আছে বলে টেনে নিয়ে গেলাম ময়দানে!

একটা নিশ্বাস ফেলে জগন্নাথ বলল—চুপ কর।

ভ্রূ কুঁচকে অরিজিৎ তাকাল জগন্নাথের দিকে—তুই শুনতে চাস না?

—কি হবে শুনে? আমি তোর অনেক ব্যাপার বুঝি না।

—বুঝিস না?

—না।

কি বলতে গিয়েও বলল না অরিজিৎ। দরজায় অস্পষ্ট বনলতাকে দেখা গেল। হাসি মুখে ঢুকল সে—রেডি, আসুন।

তবু অরিজিৎ খানিকক্ষণ স্থির হয়ে রইল। তারপর হঠাৎ অনির্দিষ্ট গলায় প্রশ্ন করল—এখন কটা বাজে?

দুই

—কেমন দেখলেন আমাদের ঘর-সংসার, বললেন না তো?

—বেশ। রুকস্যাকের স্ট্র্যাপ বুকে এঁটে নিয়ে ম্লান হাসল অরিজিৎ—তবে বাইরে থেকে তো সব বোঝা যায় না।

বনলতা একটু গম্ভীর হয়ে পরমুহূর্তে হেসে বলল—তা হলে তো বুঝতে গেলে আড়ি পাততে হয়।

—ঠিক। অরিজিৎ হাসল না। সে চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিল, অন্যমনস্কভাবে একবার বনলতার মুখ দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল—জগন্নাথ প্রায়

boiRboi.net

ফুটপাথের জীবন থেকে উঠে এসেছে এতদূরে। বলোনি আপনাকে? ওর ধৈর্য আছে, আত্মবিশ্বাস আছে। হয়ত আরো ওপরে উঠবে ও। বলতে বলতে থামল অরিজিৎ, মাথা নেড়ে প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলল—কিন্তু বৃথা। সম্ভবতঃ ঈশ্বরেরও মৃত্যু আছে।

জগন্নাথ বনলতার দিকে চেয়ে চোখের ইশারা করল, তারপর কোমল একখানা হাত রাখল অরিজিতের পিঠে—যাবি না? রাত হয়ে যাচ্ছে।

—চলি। বনলতার দিকে চেয়ে বলে অরিজিৎ। হাত জোড় করে।

দু'জনে নিঃশব্দে পাশাপাশি হাঁটছিল, নিঃঝুম শহরতলীর ভিতরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল ওদের জুতোর মৃদু শব্দ। অরিজিৎ মুখ নামিয়ে হাঁটছিল, হঠাৎ বলল—তুই আবার এগিয়ে দিতে এলি কেন?

—ক্ষতি কি? বলল জগন্নাথ—তা ছাড়া একটা কথাও ছিল।

চকিতে একবার তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নেয় অরিজিৎ—কি?

—যা দেখতে এসেছিলি তা দেখা হয়েছে তোর?

আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ে অরিজিৎ—কি?

জগন্নাথ হাসল—আমাকে!

—মানে!

জগন্নাথ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—চল। রাত হয়ে যাচ্ছে।

লম্বা হাত বাড়িয়ে জগন্নাথের একটা হাত চেপে ধরল অরিজিৎ—কি বলছিস বুঝিয়ে বল।

—বললে তুই খুশী হবি না। জগন্নাথ ধীর গলায় বলে—এসব না বললেই ভাল ছিল।

—তবে শুরু করলি কেন?

আবার পাশাপাশি হাঁটছিল দু'জন। হাঁটতে হাঁটতে জগন্নাথ নরম গলায় বলল—প্রতিবার ফিরে এসে তুই আমাকে দেখতে আসিস। কেন?

—তুই-ই বল। অরিজিৎ গম্ভীর হয়ে বলল।

—বলব! জগন্নাথ অন্ধকারে ম্লান হাসে।—ছেলেবেলা থেকেই তুই আমাকে ঘেন্না করিস বলে।

অরিজিৎ উত্তর দেবার জন্য মুখ ফেরালে হাত তুলে জগন্নাথ তাকে চুপ থাকতে ইশারা করল। বলল—ফুটপাথের জীবন থেকে উঠে এসেছি আমি, তুই বললি, ঠিক কথা। খুব নীচু তলা থেকে আমি আস্তে আস্তে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করেছি। আমার ধৈর্য ছিল, সাধ ছিল, চেষ্টা ছিল। আর তোর সব ছিল, তবু তুই সব ছেড়ে ছুড়ে বাউণ্ডুলে হয়ে গেলি। কিন্তু তুই ভাবিস ঐখানে তোর জিৎ, তোর অহংকার। তুই হাফ সন্ন্যাসী, আমার মতো ছোটোখাটো চাওয়া নেই তোর, তোর অল্পে সুখম্ নাস্তি, ভূমৈব সুখম্।

অরিজিৎ দাঁড়াল হঠাৎ, হাসল—স্নায়ুবিকারের সেই হাসি, বলল—বলে যা।

—বলছি। জগন্নাথ হাসল না—আমার এই বড় হওয়ার চেষ্টা, বেঁচে থাকার চেষ্টাকে তুই ঘেন্না করিস, তোর অনুকম্পা হয় সংসারী প্রতিটি মানুষকে। যতবার

আসি ততবার আমাকে টেনে নিয়ে বেড়াস সারা কলকাতায়। কত অচেনা গলিঘুঁজি তুই আমাকে চিনিয়েছিস, নিয়ে গেছিস কত অচেনা পরিবেশে। সত্যিই তোর মতো করে আমিও দেখিনি এই শহর। এইটুকু জেনে তোর তৃপ্তি যে আমরা এখানে থেকেও নেই, অথচ না থেকেও তুই আছিস।

জগন্নাথ চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। ওরা বড় রাস্তায় এসে পড়েছিল। রাত এগারোটায় রাস্তা ফাঁকা। বাস স্টপে এসে দাঁড়াল ওরা। বাস এসে থামল, চলে গেল, অরিজিৎ ফিরেও তাকাল না সে দিকে। জগন্নাথ হাসল—তোর কথা বনলতাকে বলেছি, বন্ধুবান্ধবদের বলেছি, তোকে নিয়ে অহংকার ছিল আমার। তোকে না দেখেও তাই অনেকে তোকে শ্রদ্ধা করে। কেননা তুই কিছুই গ্রহণ করিস না, তুই পৈতৃক সম্পত্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছিস, তুই বয়সের ভার মানলি না, তুই ধার্মিক না হয়েও সন্ন্যাসী। আমিও চোখ বুজলে তোর একটা চেহারা দেখতে পাই—কাঁধে রুকস্যাক, পায়ে ময়লা হান্টিং বুট, নোংরা জামা-কাপড়, গালে দাড়ি—তুই চলেছিস। শুধু স্ফটিকের মতো পরিষ্কার তোর দুই চোখ—কেননা তোর চোখে কোনো ছোটখাটো কামনা-বাসনার বাস নেই, তোর চোখে পাহাড়, অরণ্য ও সমুদ্রেরা বাস করে। তাই না? আমি সে-কথাই বলে বেড়াই লোককে। কি একটা জায়গায় সন্দেহ থেকে গিয়েছিল। তুই বার বার ফিরে আসিস আর বার বার ঘুরে ফিরে আমাকে দেখে যাস। কেন?

—কেন? প্রায় হিংস্র গলায় অরিজিৎ প্রশ্ন করে।

—নিজেকে মনে পড়িয়ে দিতে! জগন্নাথ হাসল—যাতে তোকে ভুলে না যাই, যাতে তোর কথা আর কেউ ভুলে না যায়। তুই না থেকেও থাকতে চাস। তুই তোর বাউণ্ডুলে চেহারাটা একবার আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেই সরে পড়িস, যাতে আমরা নিজেদের জন্য দুঃখিত হয়ে পড়ি। মাথা নাড়ে জগন্নাথ—তোকে বলছি, বাস্তবিক যতবার তোর সঙ্গে দেখা হয়েছে ততবার আমি নিজের জন্য দুঃখিত হয়ে পড়েছি। বনলতার কাছে তোর গল্প করতে করতে কতবার ঘৃণ্য মনে হয়েছে নিজেকে! মনে হয়েছে সুখভোগের কণামাত্র অধিকার আমার নেই, তোর আছে—কেননা তুই সব ছেড়েছিস।

অরিজিৎ আস্তে আস্তে বলল—তুই আমাকে ঘেন্না করিস?

জগন্নাথ সে কথার উত্তর দিল না। আস্তে আস্তে বলল—এই বয়সেও তোর চেহারাটা চমৎকার, শক্তিমানের চেহারা! তোর শরীরে কোনো অসুখ আছে—বিশ্বাস হয় না! তবু তুই আজ দুপুরে ট্রামে ওঠার আগে যখন আমার হাত ধরেছিলি তখন তোর হাত কাঁপছিল। আমি চমকে উঠেছিলাম। সেই মুহূর্তে কেন জানি না আমার হঠাৎ মনে হয়েছিল তুই বড় পুরোনো হয়ে গেছিস। যখন ময়দানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম তোর সঙ্গে, তুই বলছিলি তোর বয়স হয়ে যাচ্ছে, তখন হঠাৎ মনে হয়েছিল তোর বাউণ্ডুলে স্বভাব আর নেই, এখন তুই কেবল বাউণ্ডুলে সেজে আছিস—তোর দৌড় সাজঘর থেকে স্টেজ পর্যন্ত। তোকে আর 'আইডল' না ভাবলেও চলে। একটু আগে তুই মৃত্যু-ভয়ের কথা বলছিলি, কথার ছলে এরকম কথা তুই আগেও বলেছিস। কিন্তু আজ আমার মনে হল তোর এই ভয় বড় 'জেনুইন'। জগন্নাথ দুঃখিতচিত্তে মাথা নাড়ল।

অরিজিৎ কথা বলল না। ল্যাম্পপোস্টের আলোয় তার ব্রোঞ্জ রঙের মুখে শুধু

কয়েকটা সর্পিল রেখা ফুটে রইল।

জগন্নাথ বলল—রাগ করিস না।

—না। অরিজিৎ আবেগহীন শব্দ করল।

—তোর আর অধিকার নেই। জগন্নাথ বলল।

—কিসের?

—নিশ্চিন্ত সুখের জীবনের। জগন্নাথ হাসে—আমার ঘরের দিকে, বনলতার দিকে তুই ভিখিরির মতো চেয়েছিলি! কিন্তু আমি জানি তোর ভিতরে এখনো সেই অহংকার রয়ে গেছে। তুই নিজেই মেরেছিস নিজেকে। জগন্নাথ একটু চুপ করে থাকে—তুই বলছিলি বেরিয়ে পড়বি। সেই ভাল, থেমে গেলে তুই বুড়ো হয়ে যাবি। তুই বরং বেরিয়ে পড়।

—যাব। বড় অন্যমনস্ক দেখাল অরিজিৎকে!

—তোর মৃত্যুভয়, ধ্বংসের ভয় কিন্তু আমার ভিতরে সঞ্চারিত হল না। হাসে জগন্নাথ—আজ তোর হার হল।

হঠাৎ তীব্র গতিতে ঘুরে দাঁড়াল অরিজিৎ—কিন্তু—!

—কি? ঠাণ্ডা গলায় বলে জগন্নাথ।

আস্তে আস্তে আবার স্তিমিত হয় অরিজিৎ, নীচু গলায় বলে—ভালবাসাই আমাদের দুঃখের কারণ, কেননা সব ভালবাসার জিনিসেরই মৃত্যু আছে।

—এত ঘুরে বেড়িয়ে তুই এইটুকু শিখলি? এ তো পুরোনো কথা। আমি জানি। মৃত্যুভয় আমার নেই। আকাশ বাতাস মাটি আমি নিয়েছি অনেক, সেটা শোধ করতে হবে।

ম্লান হাসল অরিজিৎ—তোর মতো কথা বলতে পারি না আমি। একটু শ্বাস ফেলে বলল—তুই ফিরে যা। রাত বাড়ছে।

—আর একটু থাকি। বাস আসুক।

অরিজিৎ লম্বা হাত বাড়িয়ে জগন্নাথের কাঁধ নেড়ে দেয়—না। তুই যা। তুই যতক্ষণ আছিস ততক্ষণ আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আজ তোর জিৎ।

ওর হাত ধরল জগন্নাথ—দুঃখিত অরিজিৎ। খুব দুঃখিত।

মাতালের মত হাসল অরিজিৎ—না। তুই যা, চলে যা, ঘরে যা।

—যাচ্ছি। তুই দাঁড়াবি তো বাসের জন্য?

মাথা নাড়ে অরিজিৎ—ঠিক নেই। হাত তুলে আকাশ দেখায় জগন্নাথকে—দেখ।

—কি?

হাসে অরিজিৎ—একটা মাঠ খুঁজে নেবো হয়ত। আমার জন্য পৃথিবী পড়ে আছে।

—সে হয় না অরিজিৎ—

—প্লীজ!

ফিরে আসতে আসতে জগন্নাথ একবার মুখ ফিরিয়ে দেখল বাস স্টপে দাঁড়িয়ে আছে অরিজিৎ—দু হাত সামনের দিকে বুকের ওপর জড়ো করা, আকাশের দিকে নিবদ্ধ মুখ। দীর্ঘ জীর্ণ শরীর অন্ধকারে নিষ্পত্র গাছের মতো দেখাচ্ছে।

boiRboi.net

তিন

যদিও অনেকক্ষণ হল সকাল হয়েছে তবু আলস্যবশতঃ বিছানা ছাড়েনি জগন্নাথ। বালিশে কনুই রেখে আধশোয়া হয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল। পড়তে পড়তেই হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে ডাকল—শোনো বনলতা !

দিনের মধ্যে একশবার করে ডাকে জগন্নাথ—খামোখা। বনলতা তখন ট্রাঙ্ক খুলে মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে একগাদা জামাকাপড় নামিয়ে আবার গুছিয়ে তুলছে। মুখ না ফিরিয়ে নিস্পৃহ গলায় বলল—কি হল ?

—দেখনা, এদিকে এসো।

—উঃ, যা বলবার ওখান থেকে বল, কাজ করছি। এই বলে বনলতা জগন্নাথের সদ্য ধোয়া পাঞ্জাবিটা তুলে নিয়ে দেখল তাতে একটাও বোতাম আস্ত রাখেনি অসভ্য ধোপাটা। জগন্নাথের দিকে মনোযোগ না দিয়ে সে উঠে পুরোনো একটা পাউডারের কৌটো খুলে ছুঁচ সুতো খুঁজতে যাচ্ছিল ! একহাতে জগন্নাথের পাটভাঙা পাঞ্জাবিটা ধরা—বোতাম বসাবে।

কাগজে মুখ আড়াল করে জগন্নাথ বলল—ব্যাপারটা কিন্তু সিরিয়াস।

—কি এমন !

একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে জগন্নাথ বলল—সেই ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোক যার সঙ্গে তোমার বিয়ের ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল, এখন মনের দুঃখে তিনি চললেন ইংলণ্ডে। কাগজে ছবি বেরিয়েছে—গোয়িং অ্যাব্রড ফর হায়ার স্টাডিজ।

পাউডারের কৌটোর ভিতর আপনিই থেমে গেল বনলতার আঙুল। কেমন একটু থমকে গেল সে। সঙ্গে সঙ্গেই হেসে বলল—মনের দুঃখে যাবে কেন, দুঃখ কিসের ! পড়তে যাচ্ছে তো !

—দুঃখ নয় ! জগন্নাথ বিচ্ছুর মতো হেসে মুখ ফেরাল—কেবল ভালবাসায় ভুলিয়ে নিলাম তোমাকে ! দুঃখ তোমারও হওয়া উচিত। ছবিটা দেখ, খবরের কাগজের ছবি ভাল ছাপা হয় না, তবু বোঝা যায় কী হ্যাণ্ডসাম !

পাউডারের কৌটোয় ছুঁচ খুঁজে পেল না বনলতা। নতুন সংসার—এখনো সব গোছানো হয়নি। কোন জায়গায় কী রেখেছে তা ভুল হয়ে যায়। একটু বিরক্ত হয়ে বলল—বক্ বক্ কোরো না।

—ছবিটা অন্ততঃ একবার দেখ।

এবার বনলতা হাসল—দেখব, কিন্তু তাতে কি ? সুন্দর চেহারা বা ইঞ্জিনীয়ার দেখলেই ঢলে পড়তে হবে নাকি ? তা ছাড়া তুমিই কি কিছু কম ?

—কম ? বিস্ময়ের ভান করে জগন্নাথ বলে—কম কেন হবো ? আমার বয়স বত্রিশ আর ভদ্রলোকের আঠাশ। বয়সেই তো মেরে দিয়েছে !

—কী যে বাজে বাজে কথা সব, মাথা মুণ্ডু নেই। বনলতা পাউডারের কৌটো ফেলে দিল টেবিলের ওপর। ভ্রূ কুঁচকে বলল, ওঠো না।

boiRboi.net

একটু হাসি তখনো লেগেছিল জগন্নাথের মুখে, কাগজটা ফেলে দিয়ে সে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। বলল—এত রাগ! এখনই পুরোনো হয়ে যাইনি তো!

—পুরোনোই তো! পুরোনো, বুড়ো, বাজে। রাগ করে হাতের পাঞ্জাবিটা জগন্নাথের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল বনলতা। পাঞ্জাবিটা জগন্নাথের মুখ চোখের ওপর পড়ল। জগন্নাথ হেসে উঠল। পর মুহূর্তেই চেঁচিয়ে বলল—এক কাপ চা দিও, আর দেশলাইটা—

—কাঁচকলা। বনলতার জবাব পাওয়া গেল।

মুখের ওপর থেকে পাঞ্জাবিটা সরায়নি জগন্নাথ, কাপড়ের সাদা মিহি বুনোটের ভিতর দিয়ে চেয়ে ছিল। সিলিং, দেয়াল, বইয়ের র‍্যাক, টেবিল, বুকের কাছেই হাঁ করে থাকা জানালা এইসব দেখছিল। শরতের সাদা মেঘ জানালা জুড়ে আছে। চকিতে সব কিছু স্বপ্নের মতো মনে হয়—অচেনা, চেয়ে থেকে থেকে আধঘুমে পেল জগন্নাথকে।

এখনো কিছুই গুছিয়ে তোলা হয়নি। ঘরের দিকে তাকালেই বোঝা যায়—অনভ্যস্ত হাত গুছিয়ে রাখার চেষ্টায় জিনিষপত্র সব এলোমেলো হয়ে আছে। একটু আগে ট্রাঙ্ক খুলেছিল বনলতা, আধখোলা সেই ট্রাঙ্ক ঘরের মাঝখানেই পড়ে আছে, বন্ধ করে যায় নি। প্রায়ই কাজের জিনিষ খুঁজে পায় না বনলতা। রাগ করে। অনভ্যাস জগন্নাথেরও। এত নতুনের মধ্যে তারা এসে পড়েছে হঠাৎ যে হাঁফ ধরে যায়। তবু এরই ভিতরে কোথাও রয়েছে বোকার মতো এক রকমের সুখ যা জগন্নাথ আগে কখনো উপভোগ করেনি। খুব নির্বোধের মতো, বুদ্ধিহীনের মতো এই তৃপ্তিদায়ক সুখ গ্রহণ করতে হয়। অযৌক্তিক। অলস, আধোঘুম চোখে পাঞ্জাবির মিহি বুনোটের ভিতর দিয়ে চেয়ে ছিল জগন্নাথ। চায়ের কাপ হাতে বনলতার ভারসাম্য রক্ষাকারী ছায়া-ছায়া ছবির মতো অবয়ব দেখা গেল দরজার কাছে। চৌকাঠে পা দিয়েই চেঁচিয়ে বলল—এই কি হচ্ছে! মুখ থেকে ওটা সরাও কিম্ভূত কোথাকার!

জগন্নাথ নড়ল না, তেমনিই শুয়ে রইল। সাদা, মিহি বুনোটের মসলিন ঘেরাটোপের ভিতরে সে বনলতার অসম্ভব সুন্দর মুখ দেখছিল। আবছা বলে আরো ত্রুটিহীন সেই মুখ। চায়ের কাপ এক হাতে, অন্য হাতে মস্ত খোঁপাটা সামলাতে সামলাতে কাছে আসছিল বনলতা, ডাকছিল—এই, ওগো—

তারপর ধীর হাতে পাঞ্জাবিটা মুখ থেকে তুলে নিয়ে নরম গলায় বলল—অসময়ে ঘুমোবার তাল, না?

জগন্নাথের মুখে তখনো সেই হাসি, যা অর্থহীন সুখের। উঠে বসে বলল—ভয় পেয়েছিলে?

—কিসের ভয়? বলে বিছানার ওপরেই চায়ের কাপ রাখে বনলতা, পর মুহূর্তেই জিব কেটে কাপ তুলে নেয়—কাগজটা পাতো না, কাপটা রাখব।

হাত বাড়িয়ে চা নেয় জগন্নাথ, বলে—রান্নাঘরে কি করছো?

—কি আবার! রান্নাঘরে যা করতে হয় তাই। আবার ভ্রূ কোঁচকায় বনলতা।

—একটু বোসো না।

—বড় জ্বালাও তুমি! বলতে বলতে বসল বনলতা, বসতে না বসতেই বালিশে মাথা রেখে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে ঝোলানো পা দোলাতে লাগল। নিশ্চিন্ত গলায়

বলল—তোমার না বারোটায় ক্লাস ! এখন এগারোটা বাজে কিন্তু।

—হবে। পত্রিকাটা আবার খুলবার চেষ্টা করে জগন্নাথ।

—ওটা রাখো না ! বসতে বললে কেন তবে ?

—তুমি তো এক্ষুনি পালাবে রান্নাঘরে।

—ততক্ষণ অন্তত রাখো।

জগন্নাথ কাগজটা ফেলে বড় বড় কয়েকটা চুমুকে গলা পুড়িয়ে চা গিলে ফেলে বনলতার পাশে গড়িয়ে পড়ে।

বনলতা—কী হচ্ছে ?

জগন্নাথ সে কথার উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন করে—বললে না তো ঘরে ঢুকে আমার মুখ ঢাকা দেখে ভয় পেয়েছিলে কি না !

—জানি না।

—তুমি ভীতু এক নম্বরের। জগন্নাথ হাসে।

—বাঃ, ভয় কিসের ! বনলতা নিস্পৃহ গলায় বলে।

—তবে বলব কিসের ভয় ! মানুষের মুখ কখন ঢেকে দেওয়া হয় জানো ?

ঢেউয়ের মতো বনলতা জগন্নাথের ওপর পড়ল। বালিশ, খবরের কাগজ, বিছানার চাদর, বনলতা ও জগন্নাথ একসঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। শ্বাসরোধকারী আলিঙ্গনে জগন্নাথের ঠোঁট থেকে ঠোঁট সরিয়ে নিয়ে বনলতা আচমকা বলে—তুমিও তো চলে যাবে !

—কোথায় ?

—বিলেতে !

—ওঃ ! জগন্নাথ হাসল—হয়তো যাব। কে জানে যাবই কিনা !

শিথিল হয়ে এসেছিল জগন্নাথের হাত, বনলতা উঠে বসে খোঁপা ঠিকঠাক করে নিচ্ছিল। বলল—এবার ওঠো।

—তোলো দেখি টেনে। হেসে হাতদুটো বাড়িয়ে দেয় জগন্নাথ।

হাসে বনলতা—আমি কি পারি ?

—চেষ্টা করে দেখ।

—দাঁড়াও। বলে কোমরে শাড়ির আঁচল জড়িয়ে জগন্নাথের হাত ধরে সে। টেনে তুলতে গিয়ে টের পায় তাকেই বিছানায় টেনে নিচ্ছে জগন্নাথ। হেসে বলে—এরকম কথা ছিল না তো !

—উঠতে ইচ্ছে করছে না। বলে জগন্নাথ হাই তোলে।

—বিছানার পোকা। এ ফ্ল্যাটটা আজ পর্যন্ত তুমি বোধ হয় সবটা ঘুরে দেখনি, ছাদে যাওনি।

—না হয় নাই গেলাম।

জগন্নাথের মাথার চুলে কাকের বাসা। বনলতা ওর ঝুঁটি ধরে নেড়ে দিয়ে বলল—এ পাড়ায় আমাদের একমাস থাকা হয়ে গেল, কিন্তু এখানকার একজন লোকও তোমায় চেনে না।

—আস্তে আস্তে চিনলে সেই চেনা অনেকদিন থাকে। সহজে ভুল পড়ে না।

boiRboi.net

—কুনো কোথাকার! আজ বাজারটাও করোনি। ঠিকে ঝি একগাদা শাকপাতা কিনে এনে ফেলে গেছে।

জগন্নাথ উঠে হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙে। অতিরিক্ত শুয়ে থেকে থেকে শরীরে এক ধরনের জ্বর জ্বর ভাব। আড়মোড়া ভাঙতে গিয়ে হাড়ের শব্দ ওঠে খটখট। হাই তুললে শরীর আরো শিথিল হয়ে আসে।

—এখন সাড়ে এগারোটা কিন্তু! বনলতা সতর্ক করে বলে—আজ আর হল তোমার কলেজে যাওয়া!

—অ্যাঁ! বোকার মতো নির্বোধ চোখে একটু চেয়ে থাকে জগন্নাথ, তার স্বয়ংক্রিয় হাত টেবিলের ওপর থেকে হাতঘড়ি তুলে নেয়। ঘড়ির কাঁটা দুটোর সঠিক সংস্থান বুঝতে একটু সময় লাগে তার। পরমুহূর্তেই ঘড়ি টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে বলে—ইচ্ছেও করছিল না যেতে। আজ একটা মোটে ক্লাস।

—বসে থেকে থেকে তোমার ভুঁড়ি বেড়ে যাচ্ছে।

—কলেজে যাব না বলে তুমি খুশী হলে না বনলতা?

বিয়ের পর আর কদিন কলেজ করেছো তুমি! কেবল কামাই, দেবে চাকরি থেকে নট্ করে। বলতে বলতে বনলতা উড়ে গেল লঘুপায়ে, চড়াই পাখীর মতো। জগন্নাথ একা দাঁড়িয়ে থাকে খানিকক্ষণ, কোনোই কাজ নেই হাতে। র‍্যাকে অগোছালো বই পড়ে আছে, অনেকদিন হাত দেওয়া হয়নি। পাতলা ধুলোর সাদা আস্তরণ পড়েছে। বইয়ের থাকের পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছে তার ছাতার বাঁকানো বাঁট। ওয়াটারপ্রুফ দিয়ে সযত্নে ঢাকা আছে শেলাইয়ের মেশিন। বনলতার অগোছালো স্বভাব। চারদিকটা দেখে সে ভ্রূ কুঁচকে রইল। তারপর চেঁচিয়ে ডাকল—এই, শুনে যাও।

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

সকালে দাঁত মাজেনি, মুখ বিস্বাদ হয়ে আছে! স্নান না করলে জ্বরভাব কাটবে না। বাথরুমে যাওয়ার সময়ে দেখল বইয়ের র‍্যাকের পিছনে নেম প্লেটটা পড়ে আছে! এসপ্ল্যানেড থেকে সস্তায় কালোর ওপর সাদ প্ল্যাস্টিকের অক্ষর লাগিয়ে তৈরী করা নেম-প্লেটটা কিনেছিল—লাগানো হয়নি। সেটা তুলে একটু দেখে নিয়ে আবার যেখানে ছিল সেখানেই ফেলে রেখে দিল। থাক্‌গে। বারান্দায় এসে একটু দাঁড়ায় জগন্নাথ। একতলার বারান্দা, তারপর একফালি ঘাসজমি, তারপরই চওড়া ফুটপাথ, বড় রাস্তা। এদিকটা নতুন হয়েছে। পাড়াটা খুব ছিমছাম, লোকজন বড় একটা দেখা যায় না, মাঝে মাঝে হুশ্ করে মোটর গাড়ি চলে যায়।

আবার ঘরের মধ্যে ফিরে আসে জগন্নাথ। কী করবে ভেবে পায় না। কলেজে গেল না, অঢেল সময় হাতে। রান্নাঘরে বনলতা আছে, সেদিকে পা বাড়িয়েও আবার ফিরে এল। এখনো অনভ্যাস রয়ে গেছে, বারবার বনলতার কাছে যেতে লজ্জা করে, কয়েকদিন আগেও বনলতার সামনে হুট্ করে গায়ের গেঞ্জীটা খুলতে তার বাধো বাধো ঠেকতো।

নেমপ্লেটটা তুলে জগন্নাথ প্লাস্টিকের ওপর লেখাটুকু পড়ে—প্রফেসর জে, বোস, এম-এ-ডি ফিল। একই সঙ্গে একধরনের গ্লানি ও অহঙ্কার অনুভব করে সে। বইগুলোর ওপর অন্যমনস্কভাবে কয়েকটি আঙুল রাখে। কিছুই করবার নেই আর। এক এক

boiRboi.net

সময়ে নিজেকে তৃপ্ত এবং কামনা বাসনা রহিত মনে হয়। অথচ ঠিক তা নয়…সে জানে। একটু কুঁজো হয়ে সে নিজের পেটটা টিপে দেখে। একটু চর্বি বোধ হয় বসেছে ঠিকই। ভাবল, এখন তার খুব কাজ করা দরকার। খুব ব্যস্ত থাকা দরকার। নইলে শরীরে মেদ নামবে। ক্রমশঃ উচ্চাশাগুলি হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে।

কলঘরে জল পড়ে ভেসে যাওয়ার শব্দ আসছে। রান্না ঘরের দিকে কোনো শব্দ নেই। কে জানে কোথায় গেল বনলতা! একটু অন্যমনস্ক জগন্নাথ নেমপ্লেটটা হাতে নিয়ে ঘরে ঘুরে ঘুরে পেরেক খুঁজতে লাগল। তবলা ঠোকার একটি ছোটো হাতুড়ি পাওয়া গেল পুরোনো খবরের কাগজের স্তূপের নীচে, বনলতার জিনিষপত্রের সঙ্গে কি করে এসে গেছে, পেরেক পাওয়া গেল না। খুঁজতে খুঁজতে রান্নাঘরে আসে জগন্নাথ। বনলতা নেই, উনুনের ওপর এক হাঁড়ি জল চাপানো আছে—কে জানে কোন কাজে বা অকাজে লাগবে! ভরসা ছিল না, তবু রান্নাঘরের ময়লা তাকে কয়েকটা জংধরা পেরেক পেয়ে গেল জগন্নাথ। ছোটো হাতুড়িটা সেই তাকে ফেলে রেখে শিল-নোড়ার নোড়াটা তুলে নিয়ে সদরে আসে জগন্নাথ। পেরেক ঠুকে ঠুকে নেমপ্লেটটা লাগাতে থাকে দরজায়, কলঘরে জলের শব্দ বন্ধ হয়ে যায়। বনলতার ক্ষীণ গলা ভেসে আসে—এই, কী হচ্ছে! বাড়িঘর ভেঙে ফেলছ নাকি?

—তুমি কোথায় লুকিয়ে আছো?

—আমার জায়গা আছে, বলব কেন?

হাসে জগন্নাথ—তবে কলঘরে কে?

একটু চুপচাপ। কিছুক্ষণ পরে ভিন্ন জায়গা থেকে বনলতার গলা আসে—কলঘরে খুঁজে দেখনা কে! কিন্তু কী হচ্ছে শুনি!

—এসে দেখে যাও।

—আমার বয়ে গেছে। বাড়িওয়ালা শব্দ শুনছে ঠিক, সেই আসবে দেখতে।

কাজ হয়ে গেলে জগন্নাথ দরজায় নিজের নামে ফলকের দিকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। হঠাৎ সম্পূর্ণ অচেনা মনে হয় প্রফেসর জে. বোস, এম-এ—ডি-ফিল।

ঘরে এসে নোড়াটা টেবিলের ওপর রাখতে যাচ্ছিল, তখন ভিতরে দরজা দিয়ে বনলতা ঘরে ঢোকে। ভেজা শরীর, পরণের শাড়ি খানিকটা কোমরে জড়ানো, বাদবাকীটা কাঁধের ওপর জড়ো করা, ভাল করে পড়েনি এখনো। শায়ার লেস বেরিয়ে আছে, চুলে জড়ানো গামছা নিংড়ে জল ফেলতে ফেলতে ঘরে ঢুকল। সাবানের স্নিগ্ধ গন্ধের সঙ্গে জলভেজা শরীরের গন্ধ, ঘরটা ভরে যায়। শ্বাস টেনে জগন্নাথ বলে—ইস্‌ বনলতা খুব জল ঢেলেছো, তোমার ঠোঁট ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

—আমার ঠোঁট নিয়ে ভাবতে হবে না। হোকগে ফ্যাকাসে। বলে পরমুহূর্তেই জগন্নাথের হাতের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলে—ইস্‌, আমার নোড়া! ওটা তুমি কোত্থেকে পেলে?

—যেখানে ছিল, রান্নাঘরে।

—তোমাকে নিয়ে পারি না, কি হচ্ছিল ওটা নিয়ে শুনি।

—বলছিলে পাড়ার লোকে চেনে না আমাকে, তাই নেমপ্লেটটা লাগিয়ে দিলাম, এবারে চিনবে।

boiRboi.net

—ছাই চিনবে। বনলতা হাত বাড়িয়ে বলল—নোড়াটা দাও তো। পেরেক ঠোকে কেউ ওটা দিয়ে? ইস্, যদি ভেঙে যেত।

জগন্নাথ দেখে বনলতাকে অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছে, রগড়ে রগড়ে গা মুছেছে বোধহয়—এখনো গাল, কানের লতি, চিবুক আর নাকের ডগা লাল হয়ে আছে, অবশ্য লালটা নতুন গামছার কাঁচা রঙটাও হতে পারে। ভেজা চুল মাথায় বসে যাওয়ায় ওর নিখুঁত গোল মাথার আকার বোঝা যায়। বনলতার সৌন্দর্য প্রায় ত্রুটিহীন।

নোড়াটা বাড়িয়ে জগন্নাথ বলে—নিয়ে যাও তোমার মূল্যবান নোড়া।

হাত বাড়িয়েও জগন্নাথের চোখে চোখ রেখে পিছিয়ে যায় বনলতা—না বাবা, কাছে গেলেই হুট করে একটা অসভ্যতা করে বসবে।

ভীষণ শব্দ করে নোড়াটা মেঝের ওপর পড়ল, চকিতে ঝুঁকে লাফ দিয়ে এগোলো জগন্নাথ কিন্তু ধরা গেল না। অসম্ভব দ্রুত লঘু পায়ে চরকির মতো বোঁ করে ঘুরে ঘরে গেল বনলতা। চেঁচিয়ে বলল—ছুঁয়ো না আমাকে, তুমি এখনো চান করোনি।

বাতাসে শূন্যতা আঁকড়ে জগন্নাথ ফিরে বলে—তাতে কি?

—ছুঁতে নেই, এখন আমি ঠাকুরকে জল দেবো। একটু দূরে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত মনে চুল থেকে লতানো গামছা আস্তে আস্তে খুলল বনলতা, নিস্পৃহ গলায় বলল—এত হৈ-চৈ করো তুমি আশেপাশের লোক টের পেয়ে যাবে।

—তোমার ভিতরে এখনো হাজারটা গোলমাল রয়ে গেছে।

—কিসের গোলমাল?

—নানা রকমের। ছোঁয়া-ছুঁয়ি ফ্রী-নেসের অভাব, লোকভয়—এই সব আর কি!

—আহা, থাকবে কেন?

জগন্নাথ বালিশের পাশ থেকে সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে দেশলাই খুঁজতে খুঁজতে বলে—তোমার তো ভাত মেরে দিয়েছি বামুনের মেয়ে।

বনলতা ম্লান একটু হাসল—খুব ক্রেডিট, না?

—নয়? ভ্রূ তুলে কপালে ভাঁজ ফেলে জগন্নাথ।

—ছাই। আমি রাজি না হলে তোমার সাধ্যি ছিল?

ঠোঁটে সিগারেট লাগিয়ে অসহায়ভাবে জগন্নাথ বলে—দেশলাইটা?

লঘু পায়ে কাছে এসে ঠোঁট থেকে সিগারেটটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে দেয় বনলতা, পরমুহূর্তেই তার ভেজা ঠোঁট জগন্নাথের ঠোঁটের সঙ্গে লিপ্ত হয়। দুটি ভেজা ঠাণ্ডা হাত জড়িয়ে ধরে জগন্নাথের গলা।

যেমন ধরেছিল, তেমনি হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে দ্রুত শ্বাসের সঙ্গে বনলতা বলে—হয়েছে তো! এবার যাও চান করতে।

চার

নেয়ে খেয়ে দুপুরবেলা আবার বিছানা নিয়েছে জগন্নাথ। খাওয়ার পর রান্নাঘর ধুয়েছে বনলতা। আরো দু'একটা কাজ সেরেছে ঘুরেঘুরে করে। তারপর এসে মেঝেতে

boiRboi.net

আসন-পিঁড়ি হয়ে বসেছে এখন—সামনে খোলা খবরের কাগজ। ঝুঁকে কি পড়ছিল, মুখ না তুলেই প্রশ্ন করে—এই, তুমি কখনো 'মাশরুম' খেয়েছ? হোটেলের বিজ্ঞাপনে রয়েছে।

জগন্নাথ কাৎ হয়ে শুয়ে ওর ঘন চুলের ভিতরে সাদা সিঁথি দেখছিল, মস্ত এলো-খোঁপা ভেঙে পড়েছে সাদা ঘাড়ের ওপর। অন্যমনস্কভাবে বলে—কী সেটা?

—জানো না?

—উঁহু।

—তবে কিসের বিদ্বান তুমি?

জগন্নাথের ঘুম পাচ্ছিল, কিন্তু ঘুমোতে পারছিল না। অলস ঘুম চোখে বনলতার দিকে চেয়ে থেকে তার সময় কেটে যাচ্ছিল। বড় বেশী সুন্দর বনলতা। এত সুন্দর যে মাঝে মাঝে এক ধরনের অস্বস্তি হয় জগন্নাথের। ছিপের মতো তেজী লঘু শরীর, অথচ হাত ছোঁয়ালে মনে হয় অল্প উত্তাপেই গলে যাবে। বনলতার মুখশ্রী এক এক সময়ে এক এক রকম। মুখোমুখী এবং পাশ থেকে দেখলে তাকে ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে হয় জগন্নাথের। যেদিক থেকেই দেখা যাক বনলতার মুখ একই রকম আকর্ষণ করে।

—বললে না! বনলতা মুখ তুলে তাকায়। এক পলকেই সে জগন্নাথের চোখ বুঝে ফেলে লজ্জায় চোখ নামিয়ে নেয়। প্রায় ফিস্-ফিস্ করে বলে—থন্নাগজ কোথাকার!

বিস্মিত জগন্নাথ প্রশ্ন করে—মানে!

—ও একটা গালাগাল। মুখ নীচু করে হাসে বনলতা।

—কি রকম গাল! কখনো শুনিনি তো!

মুখে আঁচল চেপে মেঝের ওপর খামোখা গড়িয়ে পড়ে বনলতা,—বলে তোমার নামটা উল্টে বললুম, সোজা নামটা তো মুখে আনতে নেই!

—অ্যাঁ!

বনলতা হাসতেই থাকে—যা বিচ্ছিরি নাম! মুখে আনতে হলে মরে যেতুম।

কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে একটু হেসে জগন্নাথ বলে—কৌশিক ব্যানার্জি নামটা কেমন?

হাসি থামল বনলতার। হাতের ওপর মাথা রেখে সে মেঝের ওপর কাত হল, বলল—মন্দ কি! তোমার চেয়ে ভাল।

—শুধু নাম! আর চেহারাটা? ছবিটা দেখ না সিক্সথ্ পেজ্-এ রয়েছে।

—দেখেছি। ভালই তো।

হতাশ ভঙ্গীতে হাত ওল্টাল জগন্নাথ—কী কল-কৌশল ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের। অতদূর থেকেও এখানকার একজনের হৃদয়ের কলকব্জা নেড়ে দিচ্ছেন।

বনলতা উত্তর দিল না। চোখ বুজে এলিয়ে থাকল। মুখে মৃদু একটু হাসি—সুখ ও তৃপ্তির ডাকটিকিটের মতো লেগে আছে।

জগন্নাথ চিৎ হয়ে শুয়ে সাদা সিলিং দেখল। দেখল, বাইরের শরতের গভীর নীল আকাশ, বহুদূর বিস্তৃত রয়েছে জগৎ ও নক্ষত্রমণ্ডলী। তাদের দুজনের সঙ্গে যোগসূত্র

boiRboi.net

ও পারম্পর্যহীন যা কিছু আছে তার আর আপাতত কোনো অর্থ নেই জগন্নাথের কাছে। অস্ফুট ভাবে কাকে যেন ধন্যবাদ দিল। কেন না এক গভীর স্বপ্নময় সুখবোধ তাকে আচ্ছন্ন করছিল। সে চোখ বুজে থাকল।

আস্তে আস্তে কড়া নাড়ার শব্দ হচ্ছিল। আচ্ছন্নতার ভিতরে থেকে প্রথমটা খেয়াল করেনি। আবার শব্দ হতেই ঘাড় তুলে জগন্নাথ দেখল, বনলতা ঘুম ভেঙ্গে চেয়ে আছে। অসময়ে কে আসবে! মাথাটা বালিশে আবার ফেলে দিয়ে জগন্নাথ বলল, দেখ তো কে এলো!

দরজা খুলে বনলতা দেখে দরজা ঘিরে চার পাঁচজন অল্পবয়সী ছেলে, কুড়ি-বাইশ বছরের। প্রথম যার ওপর চোখ পড়ল সে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল—বনলতা দরজা খোলার পর সে ধীরেসুস্থে চোখ থেকে গগল্‌স্ নামাল। চেহারাটা কর্কশ, মুখে বখাটে একটু হাসি। খুব অল্প সময়েই বনলতা টের পেল ছেলেটার তাকানোর ভঙ্গীটা ভাল নয়। প্রায় ভ্রু কুঁচকেই বনলতা জিজ্ঞেস করল—কাকে চাই?

—ডক্টর বোস বাড়িতে আছেন?

বনলতা সরতে পারলে বাঁচে, মাথা নেড়ে বলল—দাঁড়ান, ডেকে দিচ্ছি।

ততক্ষণে উঠে পড়েছে জগন্নাথ। কোমরে ধুতীটা ঠিকমতো জড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে বলল—কি ব্যাপার?

সেই ছেলেটা একটু হেসে বলল—আপনার কাছেই এসেছিলাম স্যার।

জগন্নাথের মনে পড়ল না এরা তার ছাত্র কিনা, বস্তুত ছাত্রদের মুখ খেয়াল থাকে না তার। জিজ্ঞেস করল—তোমরা আমার ছাত্র?

—না স্যার, আমরা কারুরই ছাত্র নই। ছেলেটা খুব উত্তাপহীন গলায় বলল। সঙ্গে সঙ্গে একটু চাপা হাসির শব্দ হয় তার দল থেকে।

একটু থমকে গিয়েই আবার সামলে নেয় জগন্নাথ, হাসিমুখে বলে—ও ভুল হয়েছিল, কি চাই, ভাই, আপনাদের?

—আপনার চাঁদাটা স্যার—হিপ পকেট থেকে বিল বই বের করতে করতে বলল—পাড়ার পুজো।

—ওঃ, একধরনের স্বস্তি পেল জগন্নাথ, কেন তা বুঝল না, বলল, এক মিনিট দাঁড়ান দিচ্ছি।

ঘরে এসে র‍্যাকেটে ঝোলানো পাঞ্জাবির পকেটে সে দেখে। বনলতা চুল আঁচড়াচ্ছে। জগন্নাথের দিকে চেয়ে চাপা গলায় বলে—কি চাও?

—চাঁদা।

—কি অভদ্র চোখ দেখেছ! বনলতা বিরক্তির সঙ্গে বলল দাঁতে ফিতে কামড়ে।

—আস্তে! জগন্নাথ সতর্ক করে দিয়ে হাসল, বলে—ওদের দোষ দেওয়া যায় না, যা রূপ!

দু'টাকার নোটটা নিয়ে আবার দরজার কাছে এসে দেখে ছেলেটা মুখ নীচু করে রসিদ লিখছে। লেখা হলে রসিদটা হাত বাড়িয়ে দিল ছেলেটা। জগন্নাথ রসিদটা আর দেখল না, কারণ ভয় হল দেখলে বিচ্ছিরি রকমের ভুল বানান চোখে পড়তে পারে।

boiRboi.net

ছেলেটা কিন্তু টাকা নিতে হাত বাড়িয়েই হাত টেনে নিল, ভ্রু কুঁচকে বলল —এ কী! দুটাকা!

কথার ধরনটা ভাল লাগল না জগন্নাথের। স্পষ্ট বিরক্তির ভাব। তবু হাসিটুকু লেগেই ছিল জগন্নাথের মুখে, সে বলল —কেন, এই তো যথেষ্ট!

—যথেষ্ট! ছেলেটা অল্পক্ষণ স্থির চোখে জগন্নাথকে দেখে নিয়ে বলল— রসিদটা দেখুন, আপনার নামে দশটাকা লেখা হয়েছে।

—দশটাকা! জগন্নাথ একটু চোখ বড় করে বলে – কেন?

—ওরকমই সকলে দেয় এখানে। শান্ত জবাব পাওয়া গেল।

পেছনে যারা ছিল তাদের মধ্যে একজন, যার রং ফর্সা এবং মুখশ্রী শান্ত, সে একটু হেসে বলল—আপনারা যদি একটু বেশী না দেন তাহলে—

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সামনের ছেলেটা ফিরে তার দিকে একটু তাকাল। কর্তৃত্বের ভঙ্গী। ছেলেটা চুপ করে গেল। সামনের ছেলেটির মুরুব্বিয়ানা যেন বড্ড বেশী। এতটা ভাল নয়। জগন্নাথের ভিতরে একটা ছোট্ট রাগ তৈরী হচ্ছিল। তবু শান্ত ভদ্র গলায় সে বলল—আমাকে কতটুকু জানেন আপনারা? দুটাকার বেশি দেওয়ার ক্ষমতা আমার নাও থাকতে পারে!

অন্য কেউ কোনো কথা বলল না, সামনের ছেলেটি আবার শান্তভাবে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রায় চুর গলায় বলে —চাঁদার রেট আমরা ঠিক করিনি। সকলের সুবিধার জন্য পাড়ার পাঁচজন ভদ্রলোক সেটা ঠিক করে দেন। আপনি এ পাড়ায় নতুন, হয়ত নিয়মটা জানেন না।

কথাগুলোর মধ্যে অযৌক্তিকতা কিছু ছিল না, কিন্তু ছেলেটি প্রায় অপমানসূচক হেলাফেলার ভঙ্গিতে বলল। জগন্নাথ যদিও এদের বয়সী ছেলেদের পড়ায়, তবু অমন কর্কশ চেহারার ছেলে কদাচিৎ দেখেছে। ক্রমশ রেগে গেলে তার মুখ থেকে হাসিটা লুপ্ত হয়েছিল,এবার একটু রাগের সঙ্গেই বলল—পাড়ার কাউকে আমি চিনি না। তা ছাড়া আমি কত চাঁদা দেবো তা তারা ঠিক করবেন কেন?

—ঠিক আছে। ছেলেটা রগওঠা, কেঠো একটা লম্বা হাত জগন্নাথের দিকে বাড়িয়ে, তেমনি শান্ত কিন্তু অন্তর্নিহিত রূঢ়তার সঙ্গে বলে—রসিদটা ফেরত দিন।

জগন্নাথ দ্রুত চিন্তা করছিল। প্রকৃতপক্ষে বিরোধীতা করার কোনো ইচ্ছেই তার ছিল না। সে হয়ত টাকাটা দিয়েই দিত। কিন্তু ছেলেটা এইমাত্র যা বলল তা ইচ্ছাকৃত অপমান! বিশেষতঃ সে স্পষ্টই টের পাচ্ছিল যে বনলতা ঠিক তার পেছনের দরজার আড়ালটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। সে মৃদু পাউডারের গন্ধ পাচ্ছিল। বনলতার সামনেই ঘটনাটা ঘটছে। সে তাই স্পষ্ট রাগের গলায় বলল—বেশ, এই নিন। বলে রসিদটা ছুঁড়ে দিল সামনে। হাওয়ায় কাগজের টুকরো উড়ে যাচ্ছিল।

ছেলেটা উড়ন্ত কাগজটাকে ধরে পলকে মুঠোয় দলা পাকিয়ে ফেলে সেটা জগন্নাথের পায়ের কাছে আক্রোশে ছুঁড়ে ফেলে চেঁচিয়ে বলল—আর উই বেগার্স?

সেই ফেটে পড়া চিৎকারটা জগন্নাথকে জোর ধাক্কা দিল একটা। ছেলেটার গলায়, মুখে ও হাতে জোঁকের মতো ফুলে উঠেছে শিরা। উপশিরা! তার বন্ধুরা তার কাঁধে হাত দিয়ে মৃদুস্বরে কি বলে তাকে সামলানোর চেষ্টা করছিল। কোনো কথাই জগন্নাথের

কানে গেল না। সে বুঝতেই পারল না ওর এত রাগ কেন। ভিতরের যাবতীয় তীব্রতা চোখে এনে ছেলেটা তার দিকেই তখনো চেয়ে ছিল, দাঁতে দাঁত চেপে বলল—বলুন এম, এ, ডি-ফিল, আমরা ভিক্ষে চাইতে এসেছিলাম ?

যা আগে কখনো হয়নি জগন্নাথের আজ তাই হচ্ছিল। সম্ভাব্য, দমকা একটা রাগ ঘূর্ণী ঝড়ের মতো উঠে আসছে শরীরের গভীর থেকে। সে প্রাণপণে বুদ্ধি স্থির রাখার চেষ্টা করেও বলল—ইতরের মতো চেঁচাবেন না। যা বলছেন তা চেঁচিয়ে বলার মতো কথা নয়। ইডিয়েট!

দু একটা দরজা জানালা আশেপাশে খুলে যাচ্ছে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে পায়ের শব্দ। ছেলেটাকে তখনো তার বন্ধুরা সামলানোর চেষ্টা করছে, তেমনি জেদী কুকুরের মতো দাঁড়িয়ে এক হাতে দরজার ওপর জোর চাপড় মেরে ছেলেটা চেঁচিয়ে বলল—ইডিয়েট! আপনি এ পাড়ার লোকদের চেনেন না, কিন্তু এ পাড়ায় আপনার চেয়ে ভদ্রলোকজন কিছু কম নেই এম, এ, ডি-ল। তাদের চিনে নেবেন।

—তুমি তো ভদ্রলোক নও। চাপা গলায় হিংস্র জগন্নাথ বলে।

ছেলেটা পলকে সামনে ঝুঁকে বলে—কী বললেন? তার মুখে লাল হয়ে ছিল কদর্য বাঁকা ঠোঁট, সমস্ত শরীরে সাপের মতো হিলহিলে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। সে আবার বলল—কী বললেন ?

বনলতার নরম হাত সেই মুহূর্তেই জগন্নাথের কনুই চেপে ধরল—এই, কী হচ্ছে? চলে এসো।

সেই স্পর্শে সমস্ত শরীর দাউ দাউ করে উঠল হঠাৎ। বুকের ভিতরে সুপ্ত এক দামামা বেজে উঠল। সে আঙুল ছেলেটার বুকের দিকে তুলে চিৎকার করে বলল—তুমি তো ভদ্রলোক নও, স্কাউণ্ড্রেল, তুমি তো ভদ্রলোক নও।

ছেলেটা পিচ্ছিল গতিতে এগিয়ে আসছিল, পেশাদারদের মতোই সহজ শীতল ভঙ্গিতে জগন্নাথ মার ঠেকানোর জন্য হাতও তুলেছিল। কিন্তু বন্ধুরা ঠিক সময়ে ধরে ফেলল ছেলেটাকে! পেটে বুকে কয়েকটা হাত বাড়িয়ে ধরে ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। সে মুখ ফিরিয়ে জগন্নাথকে বলল—জুতিয়ে তোমার মুখ ভেঙে দেবো। আজকের ব্যাপারটা মনে রেখো।

জগন্নাথ একটা লাফ দিয়ে এগোলো। ধরবে ছেলেটাকে। ছেড়ে দেবে না। লোক জমে গিয়েছিল বাইরে, বারান্দার নীচে, ফুটপাথেও। সকলের চোখের সামনেই দৌড়ে বেরিয়ে এসে পথ আটকাল বনলতা—ভিতরে চল।

—সরে যাও। জগন্নাথ চেঁচায়।

—ভিতরে চলো তো আগে। শান্ত গলায় বনলতা বলে। তার দুচোখে চিক চিক করছে জল। কান্নাটা গলার কাছে ফুলে ফুলে উঠছে। আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছিল বনলতাকে, বাইরের সবাই দেখল, জগন্নাথ দেখল না। দু হাতে হঠাৎ তীব্র আক্রোশে, সঙ্গমে বাধাপ্রাপ্ত সাপের মতো হিংস্রতায়, আত্মবিস্মৃতিতে বনলতার চুল টেনে ধরে সে বলল—ইউ বীচ! পরমুহূর্তেই ছেড়ে দিল।

বনলতা তবু সরে গেল না। দরজার ভিতরে ঠেলে আনল জগন্নাথকে। দরজা বন্ধ করে খিল তুলে দিয়ে বলল- ওদের সঙ্গে তুমি কি পারো ?

দু'হাতে মুখ থামচে বিছানায় বসে পড়ল জগন্নাথ। কিছুই করবার নেই তার। বাস্তবিক কিছুই করবার নেই। তার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছিল, যেন জ্বর আসছে ভয়ঙ্কর। বোধ ও চিন্তার শক্তি ধোঁয়াটে হয়ে গেছে। উষ্ণ রক্তস্রোত ছলাৎ ছল্ করে আছড়ে পড়ছে মাথায়, চোখে, কানে, বুকে, সে অসুস্থ বোধ করে। শ্বাসকষ্ট টের পায়।

বনলতা নিঃশব্দে ভিতরের দরজা দিয়ে ঘর ছেড়ে গেল—বোধ হয় রান্নাঘরে। কেউ কোনো কথা বলল না।

চুপ করে বসে ছিল জগন্নাথ কিন্তু গভীর জ্বর বিকারের মতো তার মাথার ভিতরে এলোমেলো কথা আসছিল। অসহায়ের মতো সে টের পেল, তার ঠোঁট নড়ছে, কিছু একটা বলছে সে, কিন্তু কী বলছে তা তার নিজের কাছেও অস্পষ্ট। অশ্লীল গালাগাল, সাঙ্ঘাতিক অপমানের কথা, কিংবা ঐরকম কিছু হাত মুঠো পাকিয়ে যাচ্ছে আপনা থেকেই। আর শরীর জুড়ে অবসাদ।

বনলতা অনেকক্ষণ এ ঘরে এল না।

ক্রমশঃ জগন্নাথ অনুভব করছিল শরীরের ভাঁটার টানের মতো একটা টান, রক্তের অস্বাভাবিক উত্তাপ নেমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। অবসাদ ভেঙ্গে আনছে তাকে। বোজা চোখ খুলে সে ঘরের দিকে তাকাল।—অচেনা ঘর। শরতের বেলা শেষ হয়ে ঘরে পাতলা অন্ধকার জমেছে, অথচ আলো জ্বালেনি কেউ। এই ভাল। অন্ধকারে জগন্নাথ চেয়ে রইল—ঘরের সব আসবাব জীবনধারনের সব উপকরণকেই হঠাৎ অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। সে এতকাল কতগুলো স্বভাবকে পুষেছে—সে ঘরকুনো, অতিরিক্ত প্রেমিক, বাইরের জগৎ সম্পর্কে উদাসীন, ঘর তার বরাবর প্রিয়, বাইরেটা অচেনা রেখে সে তৃপ্তই ছিল, কিন্তু ভুল হয়ে গেছে। বৃথাই জীবনধারণ করেছে এতকাল জগন্নাথ। সে বিষাদ বোধ করে মাথা নাড়ল। সে বুঝতে পারছে শুধু প্রাণধারণ করে থাকার মধ্যে, শুধু সুখে থাকার মধ্যে কিছু নেই। সুখের ঘর বারংবার আক্রান্ত হয়। এই ঘর সংসারের প্রতি তার একটা অনিচ্ছা জেগে উঠতে থাকে। সে কেন আর বনলতার চুম্বন গ্রহণ করবে! সর্বাঙ্গ রি রি করে ওঠে ঘৃণায়, গার্হস্থ্য ও সহবাস অকস্মাৎ অশুচি বলে মনে হয়। সমস্ত ঘরখানা, এই সংসার যেন বনলতার গলায় নিঃশব্দ এক চিৎকারে বলতে থাকে—ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না আমাকে। তুমি এখনো চান করোনি।

ভীষণ অস্থিরতা বোধ করে সে। উঠে দাঁড়িয়ে একটু পায়চারি করতে গিয়ে তার অনিচ্ছার সঙ্গে বসে পড়ে আবার। এই ঘর, গত মাসখানেক এই ঘরে বসবাসকালের মধ্যে কত তুচ্ছ ঘটনা ঘটেছে, যেগুলির এক একটা সুন্দর অর্থ ছিল তার কাছে। মনে পড়ল কিছুদিন আগেও এই ঘরে তার শিক্ষিত ও বিজ্ঞ বন্ধুদের সমাবেশ ঘটেছিল, যারা সুন্দর কথা সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলতে পারে। তারা বনলতার প্রশংসা করেছিল, জগন্নাথের। তারা ফ্ল্যাটটার প্রশংসা করেছিল, পাড়াটারও। এই ঘরে এসে গেছে বাউণ্ডুলে অরিজিৎ, যাকে অপমান করেই প্রায় বিদায় দিয়েছে জগন্নাথ।

চিন্তা করলে এতকাল কেবল সহৃদয় এবং সুন্দর পরিবেশই খুঁজে এসেছে জগন্নাথ। সহৃদয় বন্ধু, বাড়িওলা, ট্রামেবাসে সহৃদয় কণ্ডাক্টর, বাজারে সহৃদয় বিক্রেতা, কলেজে সহৃদয় ছাত্র ও সহকর্মী। সুন্দরী স্ত্রী, ছিমছাম, বড়লোকদের পাড়ায় সুন্দর ফ্ল্যাট—এতকাল এসবই কি চায়নি জগন্নাথ! কে না চায়? কিন্তু এখন তীব্র ও রহস্যময় এক

অনিচ্ছার ভিতর দিয়ে সে অনুভব করে যে, এই সবকিছু তার কাছে প্রয়োজন শূন্য হয়ে গেছে হঠাৎ। সে জানে এবং বোঝে আজকের বিকেলের এই ঘটনাটুকুও তার আয়ুষ্কালের তুলনায় অতি তুচ্ছ। একদিন সব কিছু ভুল পড়ে যাবে। তবু এর মধ্যেই কোথাও আবহমানকালের সত্যের চেহারা তার কাছে ধরা পড়ছিল।

অনেকক্ষণ আচ্ছন্নতার ভিতরে রইল সে। এক একবার চোখ বুজেই টের পেল বনলতা ঘরে এল, টুকটাক করে কী যেন করল, আবার চলে গেল। লজ্জায় চোখ খুলল না জগন্নাথ শুধু বনলতার শরীর থেকে ছড়িয়ে পড়া প্রসাধনের সৌরভ তার কাছে অস্বস্তিকর লাগছিল।

অবশেষে রাত্রিবেলা বনলতা খেতে ডাকলে কিছুক্ষণের জন্য বাস্তবতার মধ্যে ফিরে আসে সে। নিঃশব্দে খেতে বসল। খেল সামান্যই এবং বনলতা সেজন্য অনুযোগও করল না! হয়তো তার প্রতি একধরনের সাময়িক ঘৃণা এসেছে বনলতারও। ভেবে ভারী খুশী হল জগন্নাথ। বনলতার ঘৃণা যে এত উপাদেয় হতে পারে তা কখনো কল্পনা করেনি সে।

রাত্রে গভীর হলে বনলতার অসহনীয় নৈকট্যে শুয়েছিল জগন্নাথ। চোখ বুজে সে ঘোর-ঘোর দৃষ্টিতে দেখছিল ভীষণ অ্যাভালেন্স নামছে, দুরন্ত তুষার ঝড় দুর্নিরীক্ষ পাহাড়ের চূড়া—তবু কারা যেন চলেছে। নীচে নিরাপদ পৃথিবী, গৃহ ও প্রিয়জনের সঙ্গে যোগসূত্রহীন তাদের যাত্রা। সে দেখল প্রচণ্ড ঝড়ে সমুদ্রে চলেছে নৌকা, অর্ধনগ্ন কয়েকজন মানুষ মরণপণ চেপে ধরে আছে হাল, কূলকিনারাহীন সমুদ্রের শেষ দেখবে তারা। পৃথিবী জুড়ে চলেছে মানুষের লড়াই, সেইসব লড়িয়ে মানুষদের কর্কশ কণ্ঠস্বর তার ঘুমের মধ্যে ভেসে আসছে। তারা তার নেমপ্লেটে থুথু ছিটিয়ে দিচ্ছে, তার সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি ইঙ্গিত করে পরস্পর হাসছে, তারা তার মেদবহুল চেহারার দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে 'দুয়ো', গভীর ডিলিরিয়ামের ভিতরে থেকে নিজের উন্মত্ত রক্তস্রোতের ভিতর সে উচ্চারিত হতে শুনল—যেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত।

বনলতার একটা হাত কোমলভাবে তার বুকের ওপর এসে রইল—কী বলছ, এই! প্রশ্ন করে বনলতা।

আবার তীব্র অনিচ্ছা বোধ করে জগন্নাথ, বনলতার হাত সরিয়ে দিতেও তার প্রবৃত্তি হয় না।

বনলতা আস্তে বলল—দেখ, আজকের ঘটনাটা তো এখানেই শেষ হল না। ছেলেগুলো ভাল নয়, তার চেয়ে চলো আমরা অন্য কোথাও চলে যাই।

কিছুই উত্তর দিল না জগন্নাথ। সে নিজের গলায় অস্পষ্টস্বর শুনতে পেল—যাবদেতান্নিরীক্ষেহহং যদ্ধুকামানবস্থিতাম। পরমুহূর্তেই সে সজাগ হয়ে উঠে চোখে হাত চাপা দিল। কোথাও আলো ছিল না, শুধু বুকের কাছে হাঁ করে থাকা জানালা দিয়ে মশারির বাধা ভেদ করে আসছে আবহমানকালের নক্ষত্রমণ্ডলীর আলো। সে সহ্য করতে পারল না। এবার স্বেচ্ছায় সে উচ্চারণ করল—কৈর্ময়াসহ বোদ্ধব্যম্ অস্মিনরণসমুদ্যমে।

পাঁচ

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তেমন করে মনে নেই বনলতার। শুধু মনে আছে মাথায় বড় লম্বা ছিলেন ভদ্রলোক, বড় বেশী চওড়া ছিল কাঁধ। শুনেছিল ভাল স্পোর্টস্‌ম্যান। দেখেছিল একবার, যখন কনে দেখতে এসেছিলেন কৌশিক। সে সময়ে ভাল করে দেখবার ইচ্ছেও ছিল না বনলতার, কারণ সে জানত এ বিয়ে হবে না। শক্ত ঘাড়ে মাথা নামিয়ে বসে ছিল বনলতা—কোনো উত্তেজনা, হৃৎকম্প কিছুই ছিল না তার এবং ভাবতে আশ্চর্য লাগে লজ্জাও কিছুমাত্র বোধ করেনি সে। কৌতূহলবশতঃ একবার চোখ তুলেছিল—বিশাল দুই চোখ নজরে পড়েছিল। আর কিছু মনে নেই।

সকালেই বেরিয়ে গেছে জগন্নাথ। বলে গেল কাজে বেরোচ্ছে, সেখান থেকেই সোজা কলেজে যাবে, আজ খাবে না বাড়ীতে। খুব অন্যমনস্ক আর বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিল তাকে যখন সে বেরিয়ে যায়। দাড়ি কামায়নি, ভাল করে স্নান করেনি আজ। ভাল করে কথা বলছিল না কাল রাত থেকেই—কোথাও কিছু ঘটে থাকবে যা বনলতা জানে না। বিয়ের একমাসের মধ্যেই বিরক্তি ধরল কি জগন্নাথের। বনলতা বোঝে না।

জগন্নাথ বেরিয়ে গেলে কাজকর্মে অবসাদ আসে তার। নিজের জন্য কিছুই করতে ইচ্ছে করে না—স্নান খাওয়াটাকেও বাহুল্য বলে মনে হয়। ঘুরে ঘুরে সে তাই এক মাসের চেনা ফ্ল্যাটটাকেই দেখছিল। দরজায় নেমপ্লেট বসিয়েছে জগন্নাথ—প্রফেসর জে, বোস এম, এ, ডি, ফিল্‌। সে ফলকটার ওপর কয়েকটা আঙুল রাখল কিছুক্ষণের জন্য। একটু অহঙ্কারের হাসি মুখে ফুটে উঠল তার। কে বিশ্বাস করবে যে, সদর দরজা এঁটে দিলে ঘরের মধ্যে জগন্নাথ অতটা বিচ্ছু! বাইরে তেমনি স্মার্ট নয় জগন্নাথ, কথাবার্তায় পটু নয় তেমন, একটু গম্ভীর প্রকৃতির বলে মনে হয়। আসলে ঘরকুনো, অলস, আর বড় বেশী শান্তিপ্রিয়। বাইরে গাম্ভীর্য দিয়ে এই স্বভাব ঢেকে রাখে সে।

সদর দরজা বন্ধ করে ঘরে আসে বনলতা। সমস্ত শরীর অলস, ছেড়ে দেওয়া ভাল। গতকালের খবরের কাগজে কৌশিকের ছবি বেরিয়েছে—বিলেত চলে গেল। জগন্নাথ বলছিল মনের দুঃখে ভদ্রলোক চললেন ইংলণ্ডে। ছবিটা একবার দেখতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু লজ্জায় জগন্নাথের সামনে দেখেনি বনলতা—কাগজটা নিয়েও হেলাফেলার ভাব দেখিয়েছে। এখন কাগজটা খুঁজে দেখল পুরোনো খবরের কাগজের থাকে। নেই। বইয়ের র‍্যাক, র‍্যাকের পিছনে, কোণায় কোথাও নেই। মনে পড়ল ঠিকে ঝি উনুন ধরাতে কাগজ নিয়ে যায়, রান্নাঘরে কয়লার ঝুড়ির ওপর জমানো আছে কাগজ! সেখানেও খুঁজে দেখল বনলতা নেই। ভ্রূ কুঁচকে অন্যমনস্ক বনলতা রান্নাঘরেই দাঁড়িয়ে ছিল। কোথায় গেল কাগজটা! মঙ্গলা পুড়িয়ে ফেলে থাকবে হয়তো। একটু হতাস বোধ করে সে।

শ্বাস ফেলে আবার শোবার ঘরে আসে। রান্না-বান্না করবে না আজ। একার জন্য কে আর অতটা করে! কিছু একটা পড়লে সময় কেটে যেত, কিন্তু র‍্যাকের তাক ভরা জগন্নাথের ইংরিজি বই। কিছুদিন ফরাসী ভাষা শিখেছিল জগন্নাথ—সেই

সম্পূর্ণ অচেনা ভাষারও কয়েকখানা বই রয়েছে। বাংলা বই যে কখানা আছে তার সব কটা বনলতার অনেকবার করে পড়া।

র‍্যাক থেকে একটা ফরাসী বই-ই টেনে নিল সে। একটা বালিশ মেঝেতে ফেলে গড়িয়ে পড়ল। উপুর হয়ে বইটা খুলে ভ্রূ কোঁচকায় সে—এমন ভাষায় ফরাসীরাও বা কি করে কথা বলে! উল্টে পাল্টে সে বইটা দেখছিল—কয়েকটা ছবি রয়েছে, ফরাসী দেশের নিসর্গ ও নগরের দৃশ্য। অচেনা দেশ, ঘরবাড়ী, অচেনা মানুষ পথ দিয়ে হাঁটছে। দেখতে দেখতে দূরে চলে যাচ্ছিল তার চেতনা। কত দূরে দূরেও রয়েছে মানুষ যাদের সঙ্গে তার কোনো যোগসূত্র নেই। বনলতা নামে কেউ যে রয়েছে এখানে, কলকাতায়—কেউ কি জানে? ছোট্ট ফ্ল্যাট, ছোট্ট সংসার—সে জানে অল্প, চায় অল্প, খোঁজে অল্প। এত অল্পের মধ্যে রয়েছে অচেনা বনলতা—কেউ জানেও না। মৃদু হাসি লেগেছিল তার ঠোঁটে। বই পাশে রেখে দিয়ে কাৎ হয়ে শুয়ে থাকে সে। না, যা অচেনা, যা মহৎ, যা রহস্যময় তার কোনোটাই চায় না সে। ও সব কিছুই মানুষের অমোঘ নিয়তি থেকে যায়।

কৌশিক চলল বিলেতে। এতক্ষণে হয়তো তার উড়ো জাহাজ পেঁছে গেছে। মাত্র একদিনের দেখা সেই লোকটার জন্য হঠাৎ বুকের মধ্যে হু-হু করে ওঠে বনলতার। সে জানে জগন্নাথ স্কলারশিপ খুঁজছে, সুযোগ তৈরী করবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। একদিন সেও রওনা দেবে। কেন যায় অতদূরে মানুষ? তার মন খারাপ হয়ে যায় এমন বিচ্ছিরি আবেশ-প্রবণতা তার! ছেলেবেলায় স্টেশন থেকে গাড়ী ছেড়ে যেতে দেখলে কান্না পেতো, খুব বড় ফাঁকা মাঠ দেখলে, মেঘশূন্য প্রকাণ্ড আকাশ দেখলে, শবানুগমনের হরিধ্বনি শুনলে মন খারাপ হয়ে যায় আজো। ঠিক সেই রকম মন খারাপ হয়ে যায় দূর বিদেশে কেউ চলে যাচ্ছে শুনলে।

শুয়ে থেকে সে দেখতে পেল খাটের তলায় এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে খবরের কাগজ। জগন্নাথের কাণ্ড। সারাদিন যতক্ষণ থাকে বিছানায় হুলুস্থুল করে। দেয়াল আর খাটের ফাঁক দিয়ে কাগজটা পড়েছিল মেঝেতে—তাই বনলতা খুঁজে পায়নি। এটাই কিনা কে জানে! তবু কৌতূহলবশতঃ উঠে হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকে কাগজটার জন্য হাত বাড়াল। দেখতে পেল খাটের প্রায় অন্ধকার পায়ার কাছ থেকে একটা ইঁদুর তার দিকে চেয়ে আছে। বনলতা তার চোখে চোখ পড়তেই বলল 'টু—কি!' ইঁদুরটা লাফিয়ে পালায়। মুখে মৃদু হাসি, কাগজটা টেনে নিয়ে মেঝের উপর সেটার ধুলো ময়লা ঝেড়ে ফেলে দুয়ের পাতাটা খোলে সে। খবরের কাগজ থেকে কৌশিক বনলতার দিকে চেয়ে হেসে আছে। বনলতা ছবির দিকে চেয়ে রইল। বয়স সাতাশ-আঠাশের বেশী নয়, ছবিতে আরো ছেলেমানুষ দেখাচ্ছে। গলায় টাই বাঁধা, পরণে স্যুট—বাঙালী বলে চেনাই যায় না। শক্ত কাঠামোর ওপর প্রাণসার চেহারা—চোখের চাউনীতে হাসিটা ছড়িয়ে রয়েছে, তবু বোঝা যায় সহজে পোষ মানে না, যা চায় তা সহজে ছেড়েও দেয় না। ঠিক তার বাবার মতো। বাবার কথা মনে হলে সে একবার ভ্রূ কোঁচকালো, পর মুহূর্তেই ছবির দিকে চেয়ে মৃদু একটু হেসে বনলতা ফিস্‌ফিস্ করে বলল—'হাউ ডু ইউ ডু?'

তারপর হেসে গড়িয়ে পড়ল বালিশে। একরাশ এলোচুল ছড়িয়ে পড়ল চারধারে।

বুকের ওপর খোলা খবরের কাগজ মৃদু হাওয়ায় পাশ ফিরছে। ইঁদুর কাগজ কাটছে কোথাও—কুট্‌কুট্‌ শব্দ। সেই ইঁদুরটাই কি, যে বনলতাকে দেখছিল খবরের কাগজ তুলে নিতে? আর কোন শব্দ নেই, শহরতলীর ভিতরে ক্রমশ প্রবেশ করছে রিম্‌ঝিম্‌ দুপুর। স্নান করেনি বনলতা, খায়নি কিছু দুপুরে। সেই অবস্থাতেই ঘুম পাচ্ছিল। মেঝের নীচে মাটিতে গভীর থেকে উঠে আসছে শীতলতা, ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে। সে নিজের মাথার ভিতরে এক বিষণ্ণ উড়ো জাহাজের শব্দ শুনতে পায়। কে যেন কেবলই দূরে যাচ্ছে, সরে যাচ্ছে তাকে একা রেখে। মনের ভিতরে মাথার ভিতরে কোথায় যেন আড় হয়ে বসে আছে ছোট্ট একটি কাঁটা। কখনো কখনো ভুলে সে স্পর্শ করে কাঁটাটিকে। চিন্তার ভিতরে, কাজ ও অবসরের ভিতরে, ঘুমের ভিতরেও তাই হঠাৎ হঠাৎ কেঁপে ওঠে বনলতা।

জগন্নাথ কখন আসবে কে জানে। কলেজে বাঁধাধরা ছুটির সময় নেই, কখনো হুট্‌ করে চলে আসে, কখনো দেরী হয়। আজ হয়তো দেরী হবে। কলেজ থেকেই যে সোজা ফিরবে জগন্নাথ এমন কোনো কথা নেই। কাল থেকে দেখছে, জগন্নাথ বড় অন্যমনস্ক, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত! ওই ইতর ছেলেগুলোর সঙ্গে কেন যে ও ঝগড়া করতে গেল! কয়েকবার 'কী হয়েছে,' জিজ্ঞেস করে 'কিছু না' গোছের এড়িয়ে যাওয়া উত্তর পাওয়া গেছে। বেশী জানতে চাইতে লজ্জা করে তার। একমাস পুরো হয়নি, ভাদ্রের দু তারিখে কলেজে যেতে বই খাতা নিয়ে বেরিয়ে বিয়ে করতে গেল বনলতা, বুড়ো দাদুর মতো ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের সামনে দাঁড়িয়ে দু'জন গড় গড় করে সরকারী মন্ত্র পড়ল। স্নায়বিক উত্তেজনায় জগন্নাথের গলা কাঁপছিল, মুখচোখ কি সিরিয়াস দেখাচ্ছিল তার! ভাবতে হাসি পায় এখন। বিয়ে হয়ে গেলে নার্ভাস জগন্নাথ খামোখা হেঁট হয়ে রেজিস্টারের পায়ের ধুলো নিল, দেখাদেখি বনলতাও। কিন্তু সেই মুহূর্তে সে যে কেন হেসে ওঠেনি তা আজও বোঝে না। পাশাপাশি হেঁটে বেরিয়ে আসবার সময়ে সে ফিস্‌ ফিস্‌ করে জগন্নাথকে বলল—এটা বিয়ে নাকি! এটা কি বিয়ে? পিছনে ও সামনে সাক্ষ্যদানকারী বন্ধু ও বান্ধবীরা ছিল, তাই লজ্জিত জগন্নাথ তার প্রায় সাদা ঠোঁট নেড়ে আস্তে আস্তে জবাব দিল—আমারও ভাল লাগছে না। সেই থেকেই জগন্নাথকে খুব কাছে দেখছে—কখনো বিষণ্ণ, কখনো অতিরিক্ত প্রেমিক, কখনো দুশ্চিন্তায় কাঁটা হয়ে আছে। এখনে অনভ্যাস রয়ে গেছে বনলতার—এত কাছ থেকে চেনা ছিল না তো জগন্নাথকে। নতুন পাড়া, নতুন ফ্ল্যাট, অচেনা লোকজন। এ কোথায় এল সে! ভাবতে ভাবতে উঠে বসে বনলতা। বুঝতে পারে ঘুম আর হবে না আজ। এলো চুল মুঠোয় ধরে শূন্য চোখে চেয়ে থাকে। বুকের কাছেই রয়েছে অদেখা বিদেশ, আর বিদেশের ভয়।

একটু চা করবে কিনা ভাবতে ভাবতে উঠে এলোমেলো পায়ে ঘরটার চারধারে কিছুক্ষণ ঘুরঘুর করল সে। অচেনা ছায়া পড়ে থাকে ঘরের আনাচে কানাচে। বই থেকে মুখ তুলে, কিংবা আয়নায় নিজের মুখের পিছনে হঠাৎ তাকিয়ে, কিংবা রাতে ঘুম ভেঙে জলের গ্লাসের জন্য হাত বাড়িয়ে খুঁজতে গিয়ে কতবার চমকে ওঠে সে, অচেনা লম্বাটে ছায়া ধর্ষণকারী পুরুষের মত দাঁড়িয়ে আছে আলনার পিছনে, দরজার কপাটের সঙ্গে গা মিলিয়ে, টেবিলের তলায় নীচু হয়ে ঢুকে চেয়ে আছে তার দিকে। কেউ

জিজ্ঞেস করলে বনলতা এ সব অনুভূতির কথা ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবে না। শুধু নিজেকেই অথৈ রহস্যের মতো মনে হয় তার। এমন হ'ত না যতদিন বাবার কাছে ছিল।

আপন মনে হাসতে থাকে সে। দাঁড়িয়ে ঠিকঠাক করে এলো খোঁপা বেঁধে নেয়। রান্নাঘরে যাবে বলে ভিতরের দরজার চৌকাঠের কাছে এসেছিল সে। খুব জোরে কড়া নড়ে উঠল হঠাৎ। চমকে ওঠে বনলতা, জগন্নাথ নয়, এত জোরে সে কখনো শব্দ করে না। মুহূর্তেই জড়তার ভাব কেটে গেলে সে তাড়াতাড়ি শাড়িটা গুছিয়ে নিচ্ছিল। কড়া নাড়তেই থাকে, বনলতা সাড়া দিল—যাই।

দরজা খুলে দেখে হাতে সন্দেশের বাক্স আর একগাল সরল হাসি নিয়ে বিশু দাঁড়িয়ে আছে।

—ওমা! বনলতা চোখ কপালে তোলে—তুই!

—আমিই! হেসে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে—একটা প্রণাম করব?

তড়িতে পিছু সরে গিয়ে বনলতা চেঁচাল—এই, ভাগ!

ঘন নীল টেরিলিনের শার্ট গায়ে, পরণে চাপা সাদা জিন-এর প্যান্ট, বুকের বোতাম খোলা—সেই বে-পরোয়া বিশু। বিশুর মুখ থেকে কখনো হাসি যায় না। মাথা নেড়ে বলল—যা দেখালি কাণ্ডকারখানা একটু পায়ের ধুলো নিয়ে রাখা ভাল।

দরজা ছেড়ে দিয়ে মুখ টিপে হাসে বনলতা—ভেতরে আয়।

কতদিন আসে নি বিশু, খোঁজ নেয় নি তার! হঠাৎ কানায় কানায় ভরে উঠল বনলতার মন। বিশু ভেতরে এলে সদরে খিল দেয় বনলতা, সন্দেশের বাক্স দেখিয়ে বলে —এ সব আবার কবে শেখা হল শুনি!

—শিখছি। হাতের বাক্সটা বাড়িয়ে দেয় বিশু—নিয়ে নাও হে এই বেলা।

ভ্রূ কুঁচকে তাকাতে গিয়ে হেসে ফেলে বনলতা—টিকটিকি কোথাকার, এখানকার ঠিকানা পেলি কোথায়! বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে সন্দেশের বাক্সটা নেয়।

—পাই নি তো কোথাও! বিশু অবাক-গলায় বলে—রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, এ বাড়ির সদরে দেখি জমকালো নেমপ্লেট লাগানো। চেনা মানুষ ভেবে ঢুকে পড়েছি।

—বদমাশ! বনলতা হাসে—বোস না ঐ বিছানায়! এখনো সব গোছানো হয় নি রে, কিছু মনে করিস না।

কোথাও জড়তা নেই বিশুর হাব-ভাবে। জগন্নাথের ছেড়ে-ফেলা ধুতি গেঞ্জী বিছানার ওপর পড়ে ছিল। বিশু সেগুলো ছুঁড়ে বিছানার অন্যধারে পাঠিয়ে বসল। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বলল—কি খাওয়াবি শুনি!

বনলতা ঠোঁট ওলটায়—রান্নাই হয় নি আজ।

—কোনোদিন হয়?

—মানে!

বিশু একটা বালিশ টেনে নিয়ে কাৎ হয়ে পড়ে বলল—মানে একটা ধরে নে না যা সাজিয়ে গুছিয়ে আছিস...!

—এই তো বেশ। বনলতা হাসে—বললি না কি করে খোঁজ পেলি? আমরা ত পালিয়ে আছি।

boiRboi.net

—লোক লাগিয়েছিলাম। সে তোর হাজব্যাণ্ডকে কলেজ থেকে ফলো করেছিল বাসা পর্যন্ত।

—ওমা! বনলতা চমকে উঠে আবার হাসতে থাকে, মুখে আঁচল চাপা দেয়। পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে বলে—এতটা করতে গেলি কেন? আর তো কেউ খোঁজ নেয় না। তুই কেন এলি!

—তাই তো ভাবছি, কেন এলাম! বিশুকে গম্ভীর দেখায়। বনলতা বোঝে ভিতরে ভিতরে ও হাসছে। বিশু ঐ রকম, বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না তার। এমন কিছু বয়স নয়, চব্বিশ পঁচিশ হবে। এই বয়সেই রাণাঘাটের কাছে কোথায় যেন পোলট্রি করেছে। হাঁস মুর্গী নিয়েই মেতে আছে যে তা নয়, এটা ওর এক্সপেরিমেণ্ট। ভাল না লাগলে আবার ছেড়ে ছুড়ে দেবে। কত কিছুই শুরু করল বিশু, শেষ করল না।

—কেমন আছিস! বড় উদাস শোনাল বিশুর গলা!

—ভাল লাগে বুঝি! বনলতা এলোমেলো হাঁটতে হাঁটতে বলল—সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে এলাম, প্রায় এক বস্ত্রে!

বিশু হাসল, শব্দহীন হাসি। উদাস দেখাল তাকে।

—নাটক হয়ে গেল না রে? বনলতা হাঁটতে হাঁটতে ভিতরের দরজার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করে।

—একটু।

—তা হোক, বে করেছি। অস্থিরভাবে সে আবার টেবিলের কাছে আসে, জগন্নাথের টুথব্রাশটা খামোখা তুলে নিয়ে আবার শব্দ করে ফেলে দেয়, পরমুহূর্তে একটু লাজুক হেসে প্রায় ফিস ফিস করে বলে—একটা কথা জিজ্ঞেস করি?

—বল না।

—সত্যি করে বলবি কে পাঠিয়েছে তোকে?

বিশু আবার হাসে—যা ভাবছিস তা নয়।

—কি ভাবছি!

—যার কথা ভাবছিস সে পাঠায়নি আমাকে। বিশু মাথা নাড়ে—হি ইজ্ এ টাফ গাই।

—কার কথা ভাবছি কি করে বুঝলি?

—বোঝা যায়। বিশু বলে একজনের কথাই তুই ভাবতে পারিস।

বনলতা থমকে গেল। ক্রমশঃ মুখচোখ কোমল হয়ে এল। তার চোখের পাতা ভারী হয়ে নামল। প্রায় স্খলিত কণ্ঠে বলল—আমার আর কেউ নেই, সে তুমি জানো।

অন্যসময়ে হলে বনলতার এ কথা হাস্যকর শোনাত বিশুর কাছে। বলে ফেলেই বনলতার ভয় করছিল। কিন্তু বিশু হাসল না, স্বাভাবিক চপল গলাতে বলল—এখন আর একজন তো হয়েছে তোর। প্রফেসর জে, বোস, এম, এ, ডি, ফিল্।

—হয়েছেই তো! বনলতা গলা চড়াল।

—আরো হবে। আপনজন মানুষের বেড়েই যায়।

—থাক্। বনলতা বলল—একটু বোস, চা তৈরী করি।

—আমার জন্য কষ্ট করতে হবে না। চা ছেড়ে দিয়েছি, প্রায় দুধ খাই এখন—খাঁটি গরম দুধ।

—বনলতা ঠোঁট ওল্টাল—তোমার জন্যে চা করছি না, নিজের জন্যেই করতে যাচ্ছিলাম। আর দুধটুকু চেও না, ওসব কলকাতার ফ্যাশান নয়।

বনলতা চলে যাচ্ছিল। বিশুই ডাকল আবার—এই, শুনে যা!

—কি! ভিতরের দরজার চৌকাঠ থেকে মুখ ফেরাল বনলতা।

—কাছে আয়!

বনলতা আস্তে আস্তে ফিরে এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়ায়। তার বুক কাঁপছিল এবার, বিশুর গলা শুনে। প্রায় ফিস ফিস করে বলল—কি বলছিস!

—যার কথা ভাবছিস তার কথাই বলছিলাম। হঠাৎ গাম্ভীর্য ঝেড়ে ফেলল বিশু, হাসিমুখেই বলল—তোর বাবার কথা। আজ সকালে এসে দেখা করতে গেলাম। দেখি বারান্দায় মোড়া পেতে বসে ব্লেডে নখ কাটছেন। স্বাস্থ্য তেমনি সাংঘাতিক আছে, রঙ ফেটে পড়ছে গায়ে।

—ওঃ। একটু বিবর্ণ দেখাল বনলতাকে।

বিশু আঙুলে মাথায় চুল জড়াচ্ছিল, বলল—কই খুশী হলি না তো শুনে!

—ভালই তো। ভাল আছে যখন, আর চিন্তা কি? বনলতা বলল—দাঁড়া, আসছি।

—আর একটু দাঁড়া! হাসিমুখে বলল বিশু, বলছিলি সব ছেড়ে ছুড়ে একবস্ত্রে চলে এসেছিস। কিন্তু মনে হচ্ছে কিছুই ছাড়তে পারিসনি।

—কিই বা ছাড়ার আছে। ভ্রূ কুঁচকে বলল বনলতা, এখন বুঝতে পারছি ছেড়েই দিল সবাই।

বিশু তেমনিই হাসে, আঙুলে চুল জড়ায়। বলে—ঠিক।

—না। বিশ্বাস কর—তাড়াহুড়ো করে বলল বনলতা—আমি চাই না আমার জন্য কেউ আর ভাবুক।

—ডক্টর বোসও নয়?

বনলতা হেসে ফেলল—এত বোকা তুই যে সেই একটা নামই করলি?

বিশু এবারে হাসল—তোর বাবার কথা এখনো শেষ হয়নি। যতদূর জানি তুই চলে আসতে তিনি বিচলিত হননি, তোর বিয়ের পরদিনও অফিসে গেছেন।

বিরক্ত হয় বনলতা—তাতে কি হ'ল! আমারই বা কি বয়ে গেছে!

বিশু সহজ সুরে বলল—কিন্তু শুনলাম দিন কুড়ি আগে তোর বাবার একটা স্ট্রোক হয়—থ্রম্বসিস। বিচ্ছিরি অবস্থা হয়েছিল।

বনলতা উত্তর দিল না! যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই হঠাৎ হিম হয়ে জমে গেল তার পা। বিশু তাড়াতাড়ি উঠতে যাচ্ছিল, কি ভেবে আবার বসে পড়ল, বলল—ঘাবড়াসনি, এখন ঠিক আছে। তবে আমার মনে হয় তোরা একটু খোঁজখবর করলেও পারতিস। একেবারে ছেড়ে এলি কেন বুড়ো লোকটাকে?

বনলতা আস্তে আস্তে চোখের জল মুছল আঁচলে। বলল—তাতে লাভ ছিল না কিছুই; মেনে নিত না বাবা।

boiRboi.net

—মানবে না কেন? বোস খারাপ পাত্র নয়—আমিও খোঁজ নিয়েছি।

—সেটা আমি কম জানি না। কিন্তু বাবা মাত্র এইটুকুই সহ্য করতে পারে না যে জীবনে আমি একবারও জেদ রেখেছি, অবাধ্য হয়েছি তার। এখানে পাত্র বড় কথা নয়। কৌশিক ব্যানার্জিকে বাবার পছন্দ হয়েছিল, অথচ আমি জানি ওরকম একটা ছেলেকেও যদি আমি নিজের ইচ্ছেয় বেছে নিতুম, বাবা খুশী হ'ত না। বাবা ঐ রকম।

—যেখানেই হোক, যার কাছেই হোক সেই পোষ মানতেই তো হয়!

বোধ হয় চোখের জল গোপন করবার জন্যই বনলতা বিশুর দিকে পিঠ রেখে দাঁড়াল। ধরা গলায় বলল—কেন মানবো?

হঠাৎ শ্বাস ফেলে বিশু বলল—বুঝলাম।

—কি বুঝলি! বনলতা ম্লান হেসে মুখ ফেরায়—তোর তো চালচুলো নেই, আপনজন বলতে কেউ নেই। তুই কি করে বুঝবি?

বিশু একরকম হাসে—তা হলে বোধ হয় ঠিক বুঝিনি।

—মাঝে মাঝে মনে হয় একমাত্র সন্তান হওয়া ভাল নয়। তার ওপর মা মাসী পিসি গোছের কাউকে দেখিনি কখনো। সন্দেহ হয় আমার ভিতরে কিছু পুরুষালী স্বভাব রয়ে গেছে। তুই হয়তো ভাবছিস···বনলতা কথা শেষ করে না।

—কি ভাবছিস্?

তেমনি ম্লান হাসিটুকু মুখে মেখে বনলতা বলে—কি জানি! হয়তো ভাবছিস আমি হৃদয়হীন, বাবার স্ট্রোক হয়েছিল শুনেও কেমন আছি!

—না তো! তোকে স্বাভাবিক দেখাচ্ছে না। বিশু আস্তে করে বলে।

—কিন্তু আমি বেশ আছি। ভাল আছি। তুই বাবাকে বলিস। বনলতা প্রায় ক্রুদ্ধ গলায় বলে।

বিশু উত্তেজনাহীন হাসি হাসল—উনি তোর খবরের জন্য ব্যস্ত নন। আমিই বরং আজ জিজ্ঞেস করলাম তোর কথা, উনি শুধু বললেন যে, কোনো খবর রাখেন না। খুব স্বাভাবিক ভাবে বললেন। দীর্ঘশ্বাসও ফেললেন না, গম্ভীরও হয়ে গেলেন না।

হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল বনলতা, আঁচলে মুখ চেপে রুদ্ধশ্বাসে বলল —তবে তুই কেন এলি?

একটু চুপ করে থেকে বিশু বলল—কাঁদছিস কেন? যা করেছিস তা ভালই! অন্যায় তো কিছু নয়।

—বলছিস তুই! বনলতা তখনো কাঁদছিল—কিন্তু তুই বললে কি আসে যায়। তুই আমার কে?

—কেউ না। বিশু হাসল।

—ছেলেবেলায় জানতুম তুই আমার ভাই। বড় হয়ে ভুল ভাঙল, দেখি তুই আমার কেউ না, রক্তের সম্পর্ক নেই। ও রকম ভুল কেন শেখানো হয়েছিল তবে?

বিশু হাসে—কি সব বলছিস! অনেক সময় ভাল হবে ভেবেই লোকে ভুল শেখায়।

—হবে। বনলতা দুই লাল ছলছলে চোখ বিশুর চোখে রাখল, ধীর গলায় বলল—

boiRboi.net

কে জানে আরো কত কি ভুল শিখে বসে আছি! একদিন হয়তো জানব যাকে বাবা বলে জানি, কিংবা যাকে স্বামী বলে জানি তারা কেউই আমার কিছু নয়! দুম করে বোমা ফাটিয়ে কানের কাছে এসব কথা বলে যাবে কেউ।

বিশু হঠাৎ মাথা নামিয়ে ভিন্ন সুরে বলল—হ্যাঁরে, তোর কর্তা সিগারেট খায় না? আমার ভীষণ সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে। থাকে তো দে না।

বনলতা নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। বিশু বলে—চা করলি না। মাথা ধরে গেছে কিন্তু।

বনলতা হাসল, হঠাৎ তার দুই চোখ স্নেহে লেহন করল বিশুকে। ধরা গলায় বলল—তবু কেন যে তোকে এত ভালবাসি বুঝি না।

বিশু দুই হাত তুলে বলল—থাম্। স্পষ্টতই অস্থির দেখাল বিশুকে। গম্ভীর হয়ে বলল—তোর হয়তো মনে নেই, কিন্তু আমার আছে। ছেলেবেলায় যখন আমাদের প্রথম দেখা হয় তখন একবার তুই আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলি। আমি তোর বাবাকে বলে দেব বলে ভয় দেখিয়েছিলাম তোকে।

—যাঃ! খিলখিল্ করে হেসে ওঠে বনলতা, হাসতে হাসতে কোমর ভেঙে উপুড় হয়ে কাঁপতে থাকে। চেঁচিয়ে বলে—কে বলল মনে নেই! তারপর সামলে নিয়ে আবার দাঁড়ায় বনলতা, মুখে হাতচাপা দিয়ে স্মিত গলায় বলল—সে তখন বিয়ের মানে বুঝতুম না বলে।

—এখন বুঝিস্? বিশু স্নিগ্ধ গলায় বলে।

বনলতা কথা না ব'লে মাথা নাড়ল। হ্যাঁ।

—ছাই বুঝিস্। বিশু উদাস গলায় বলে।

—মানে?

—মানে বললে তুই খুশী হবি না।

বনলতা ভ্রূ কোঁচকায়—যেন কত খুশী হওয়ার মতো কথাবার্তা বলছে আজ।

—বলব? বিশু হেসে বলল—তুই বরাবর নাটক করতে ভালবাসিস। বোসকে বিয়ে করার জন্য ততটা নয়, যতটা নাটক করার জন্যই তুই হঠাৎ বিয়েটা করলি। নইলে একটা নেগোশিয়েট করার সুযোগ ছিল।

—ছাই। বনলতা থমথমে মুখে বলে—বাজে কথা বলিস না।

—হয়তো আমারই ভুল। বলে বিশু—এবারে একটু চা কর, বনা!

কি বলবে বলে একটু ইতস্তত করল বনলতা। তারপর ফিক্ করে হেসে বলল—একটা কিম্ভুত তুই। পর মুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে গেল।

—তোর কথা কিছুই শোনা হল না। কিছু বলছিস না কেন, এই! বিশুর হাতে চায়ের কাপ দিয়ে বলল বনলতা। তারপর বসল খাটের ওপর—পাশাপাশি—হেসে বলল—কোথায় যেন কি সব ছাইভস্ম করছিস! একদিন তো নিয়েও গেলি না দেখাতে।

বিশু বেদম জোরে চুমুক দেয় চায়ে। উত্তর দেয় না। বনলতা ওর চুলের মুঠি ধরে নেড়ে দিল—এই!

—কি বলব? বিশুর গলা উদাস।

boiboi.net

—তোর কথা বলা। কেমন আছিস ওখানে ?

—ভাল। চমৎকার !

—দুচোখের বিষ। বনলতা স্নিগ্ধ হাসে—মন কেমন করে না তোর !

—কেন করবে ? হঠাৎ বিশুর গলা খুব নরম শোনাল !

বিশুর চোখ টানা টানা নয়, তবু বনলতা দেখল কয়েক পলকের জন্য সেই চোখ স্বপ্নাতুর হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে দূরে গলায় বলল বিশু—জানিস, আমি একটা পুকুর কেটে মাছ ছেড়েছিলাম। এখন সেগুলো বড় হচ্ছে। আমাকে চিনছে ওরা, হাত থেকে খাবার ঠুকরে খেয়ে যায়, ভয় পায় না। আমার মুর্গীগুলো কাঁধে এসে বসে, মাথায় ঠুকরে দিয়ে চেঁচায়। হাঁসগুলোও এমন চিনেছে, আমার সাড়া পেলে জল থেকেও ছুটে আসবে।

কথা বলতে বলতে থেমে তেমনি চেয়ে ছিল বিশু। হাতের চা জুড়িয়ে যাচ্ছে খেয়াল ছিল না ওর। সামনের দেওয়ালের দিকে চোখ, অথচ দেয়ালেও নয়, কোথাও নয়। একটু অস্থির বোধ করে বনলতা—সেই অধিকার, সেই ভালবাসার কথা এখানেও। বিশু হঠাৎ হাসে, মুখ ফিরিয়ে বলে—যাবি একদিন ? চল্ না !

—যাব। বনলতা বলল—কিন্তু তোর মাছগুলো কি আমার হাত থেকে খাবে ! ভয় পাবে না !

বিশু ঠক্ করে চায়ের কাপ রেখে দিল। বলল—আজ ফিরে যাব। ট্রেন একটা রয়েছে এখন। হাত বাড়িয়ে বনলতার একটা হাত টেনে নিল—বেস্ট অব্ লাক্, বনা। চলি !

চোখে জল টলমল করছিল বনলতার, বলল—আবার কবে আসবি ? ছেড়ে দিবি না বল।

—দূর পাগল। প্রায়ই আসব। বিশু হাসে—আচ্ছা, বনা। হাত তুলল।

দরজা খুলে বারান্দায় নামল বিশু। তারপর রাস্তায়। ঘুরে তাকিয়ে হাসল। বনলতা দরজার কাছ থেকে হাত তুলল, ফিস্ ফিস্ করে বলল—আচ্ছা, বিশু।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল দরজায় !

দরজা বন্ধ করতেই গাল বেয়ে চোখের জলে বুক ভাসল বনলতার। অকারণ। আগে লক্ষ্য করেনি, কিন্তু এখন বুঝতে পারছে সমস্ত ঘর জুড়ে আছে শূন্যতা। সে যেন কূলে কিনারা পায় না। বনলতা হঠাৎ হাত জোড় করে বুকে রাখে। অনুভব করে বহু যোজন বিস্তৃত এক শূন্যতা রয়েছে চারিদিকে, যার হাতগুলি পড়ে আছে সারা পৃথিবীময়। কোথায় পালাবে বনলতা ! বড় অসহায় সে আর তার হৃদয়। শুধু বোঝে তাকে একবার স্পর্শ করবে বলে—সে যে দিকেই পা বাড়াক—সে দিকেই শূন্যতার সেই হাত অঞ্জলি পেতে আছে।

ছয়

শিয়ালদায় এসে বিশু দেখল তার ট্রেনটা মিনিট দুই আগে ছেড়ে গেছে। পরের ট্রেন ঘণ্টা দেড়েক পর। এটা তার অন্যমনস্কতার দোষ। বনলতার কাছ থেকে চলে

boiRboi.net

আসবার পথেই আস্তে আস্তে সে বিষণ্ণ আর অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। বাস স্টপের খুব কাছে এসে সে দেখতে পেল, একটা বাস এসে থামল। দৌড়োলে বা জোর কদমে হাঁটলে ধরা যেতো বাসটা। কিন্তু সে তা করেনি। বাসটা যে ধরা দরকার, নইলে যে ট্রেন পাওয়া যাবে না—এত কথা খেয়ালই হয়নি তার।

বারান্দা থেকে নেমে সে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে হাতটা তুলে বলেছিল,—আচ্ছা, বনা, চলি। দেখেছিল এত বড় বড় দুই চোখ ভরে জল টস্ টস্ করছে বনলতার। হাত তুলে ফিস্ ফিস্ করে বনলতা বলল—আচ্ছা, বিশু। অমনি টপ্ করে জল ঝরে পড়ল চোখ থেকে। কিন্তু আর ফিরে তাকায়নি। জানে বনলতা এখন কাঁদবে।

আজ বনলতার ঘর-সংসার দেখে এল বিশু। আর বনলতাকেও। খুব বেশী প্রশ্ন করেনি বিশু, খুব বেশী জানতে চায়নি। বরং চুপ করে থেকেছে, বনলতাকেই কথা বলতে দিয়েছে বেশী। ভাল করে লক্ষ্য করেছে, ঘরদোর আর সাজানো-গোছানো সামান্য আসবাবপত্র। দেখার বেশী কিছু ছিল না, মাত্র একমাসের পুরোনো ওদের সংসার। তবু বিশু কিছু একটা অনুভব করতে চাইছিল। চোখ কান দিয়ে যা বোঝা যায় তা নয়। তার চেয়ে কিছু বেশী। ঠাট্টা করে বিশু বলেছিল, কি খাওয়াবি বল! ঠোঁট উল্টে বনলতা বলল—রান্নাই হয়নি আজ। মনে মনে একটু চমকে গিয়েছিল বিশু। কোনোদিন একবেলা না খেয়ে থেকেছে—বনলতা—এমনটা মনে পড়ে না। মা নেই বনলতার ছেলেবেলা থেকেই। ওদের বাপ-বেটির সংসারে তাই লক্ষ্মীপুজো, শিবরাত্রি বা ব্রত-র উপোস বলে কিছু ছিল না। সরস্বতী পুজোর দিন অঞ্জলির দেরী হলে, কেঁদেছে সে অনেকবার। তাছাড়া বিশু জানে বনলতার সবচেয়ে প্রিয় খাবার ভাত। দিনে তিন চারবার সে ভাত খেতো। তাই রান্না হয়নি শুনে চমকে গিয়েছিল বিশু। তবু কোনো প্রশ্ন করেনি। যেন বনলতা না ভাবে যে বিশু গোয়েন্দাগিরি করছে। সে লক্ষ্য করল, বনলতার পরণে নোংরা বিশ্রী একটা শাড়ী খুব এলোমেলো করে পরা, চুল রুক্ষ—বোঝা যায় যে আজ চান করেনি। মেঝেতে একটা বালিশ আর খবরের কাগজ পড়ে ছিল। এখন গরমের সময় নয় যে মেঝেতে শুতে হবে। এই সব-গুলো মনে মনে যোগ করল বিশু। বনলতার জন্য বড় কষ্ট হচ্ছিল তার। যখন চা করতে গেল বনলতা তখন সামান্য কৌতূহলবশত মেঝে থেকে খবরের কাগজটা তুলে নিয়েছিল বিশু। একদিনের পুরোনো কাগজ। বিশু জানে, কালকের কাগজে কৌশিক ব্যানার্জীর একটা ছবি ছাপা হয়েছে। কৌশিক বিলেত চলে গেল এই খবরটা ছবিসহ ছাপা হয়েছে। বিশু দেখল, খোলা পাতায় কৌশিকের ছবিটাই রয়েছে। বনলতা এতক্ষণ এইটি দেখছিল।

না কৌশিকের সঙ্গে পরিচয়ও ছিল না বনলতার। শুধু একবার দেখা হয়েছিল যখন বনলতাকে দেখতে এসেছিলেন কৌশিক। কিন্তু সে সম্বন্ধ বনলতাই ভেঙে দিয়েছিল। তারপর মাসখানেক আগে সে জগন্নাথকে বিয়ে করল গোপনে, কাগজে সই করে। তারপর পালিয়ে এল। জগন্নাথকে কবে ভালবাসল বনলতা তা বিশু জানেই না। সে দেখেওনি ভদ্রলোককে। শুনেছে জগন্নাথ বোস অধ্যাপক, এম-এ ডি-ফিল।

তবে এখন দুপুরের নির্জন ঘরে পুরোনো খবরের কাগজ খুলে কৌশিকের ছবি কেন দেখছে বনলতা? সামান্য ভ্রু কুঁচকে কথাটা ভাবতে ভাবতে বিশু আবার যেমন

ছিল তেমনিভাবেই মেঝেতে রেখে দিল কাগজটা।

বনলতার ভাববাসার খবর বিশু রাখত না। সে জানে সহজে কাউকে ভালবাসার মেয়ে নয় বনলতা। সে শুনেছে জগন্নাথের সঙ্গে বনলতার পরিচয়ও খুব বেশী দিনের ছিল না। এত সহজে কি করে বিয়ে হয়ে গেল ভেবে পেল না বিশু। অনেক খুঁজে খুঁজে সে তাই ওদের ঠিকানা যোগাড় করেছিল। সময় বুঝে দুপুরবেলাতেই গিয়েছিল যাতে বনলতাকে একা পাওয়া যায় আর সারাক্ষণ চোখ-কান এবং চোখ-কানের অতীত একটা অনুভূতিকে সজাগ রেখে, বাইরে একটা হেলাফেলার লোকদেখানো ভঙ্গী করে বসে ছিল। খুব বেশীক্ষণ থাকেও নি সে। কিন্তু এখন দুপুরের প্রায় ফাঁকা শিয়ালদার প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাতে ধরাতে তার মন বলছিল কোথাও কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে। বিশুকে দেখে এমন আকুল কোনোদিন হয়নি বনলতা। ঠাট্টায় গাঁট্টায় তাদের সম্পর্ক ছিল। অথচ আজ চলে আসার আগে বনলতা তার দুই হাত ধরে বলল, 'আবার কবে আসবি? ছেড়ে দিবি না বল!' তখন থেকে কথাটা মাথায় ঘুরছে বিশুর। কেবলই মনে হয়, কথাটা এমন ভাবে বলেছিল, বনলতা যেন তার মধ্যে একটা নিহিত অর্থ আছে। আজ বড় অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিল বনলতাকে, বড় চঞ্চল অস্থির।

এটা সত্যিই ভালবাসা কিনা কে জানে! বিশুর সন্দেহ হয় এখন। এমন হতে পারে যে, এটা বনলতার অ্যাডভেঞ্চার। রাশভারী বাবার বিরুদ্ধে গিয়ে গোপনে অসবর্ণ বিয়ে করার মধ্যে একটু হয়তো উত্তেজনা আছে। তার বেশী কি কিছু ছিল? আজকালকার বাঙালী মেয়েরা অধিকাংশই এরকম বিয়ে করে। না বুঝে, না জেনে, কেবলমাত্র নাটকীয়তাটুকুর জন্য কখনো বা সাময়িক ভাবাবেগের জন্য। বনলতা অতটা হালকা নয়। তবু বিশুর সন্দেহ হতে থাকে। বনলতা অতিমাত্রায় সুন্দরী, ইচ্ছেমতো যাকে খুশী বিয়ে করার সুযোগ তার ছিল। কিন্তু বিয়েটা কি সত্যিই ভেবে করেছে বনলতা? সে ঠাট্টার ছলে আজ বনলতাকে বলেছে, 'আসলে তুই নাটক করতে ভালবাসিস। বোসকে বিয়ে করার জন্য ততটা নয়, যতটা নাটক করার জন্য তুই এটা করলি। নইলে নেগোশিয়েট করার সুযোগ ছিল।' শুনে খুশী হয়নি বনলতা।

প্ল্যাটফর্মে একটু পায়চারী করছিল বিশু। ঘড়িতে দেখল এখনো সোয়া এক ঘণ্টার ওপর দেরী আছে গাড়ির। সারাটা দিন তার কলকাতায় কাটল। এ শহরের ভীড় গণ্ডগোল এখন আর তার ভাল লাগে না। রাণাঘাটের কাছে তার ছোট্ট পোলাট্রিতে পোষা হাঁস মুর্গীগুলো তার অপেক্ষায় আছে। সে গেলেই ঝাঁপিয়ে আসবে, ঘিরে ধরে নিজেদের ভাষায় প্রশ্ন করবে তাকে—এতক্ষণ কোথায় ছিলে? দেরী করতে ইচ্ছে করছিল না তার। অস্থির লাগছিল। তবু এক সময়ে পায়চারী থামিয়ে সে প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে বসল। বনলতার জন্য তার অস্থিরতা আরো বেশী—এটা সে টের পাচ্ছিল।

অথচ ভেবে দেখতে গেলে বনলতা তার কেউ না। ছেলেবেলার বেশ দীর্ঘ একটা সময় সে বনলতাদের আশ্রয়ে ছিল। বনলতা জানত যে বিশু তার ভাই। বিশু জানত যে, তা নয়। বনলতার মা ছিল না, ভাইবোনও আর কেউ ছিল না, শূন্য ফাঁকা বড় বাড়িটায় একা একা তার দিন কাটত না। তাই বিশুকে এনে দেওয়া হল তার ভাই বলে। বড় হয়ে উঠে বনলতার সে ভুল ভেঙেছিল। কেঁদে সারা হয়েছিল সে।

তারপর বরং আরো গভীর হয়েছিল তাদের সম্পর্ক। বনলতা জানে, বিশু তার ভাইয়ের চেয়েও কিছু বেশী। বিশু জানে বনলতা তার বোনের চেয়েও কিছু বেশী। কিন্তু ঠিক সে কী তা কেউই জানে না। কিশোরী বয়সে একবার না বুঝে বনলতা বিশুকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'বিশু আমাকে বিয়ে করবি ?' সে কথা মনে পড়লে আজও হাসি পায় বিশুর। না, বনলতাকে কোনোদিনই বিয়ে করার কথা ভাবতে পারেনি বিশু। সে ছিল বনলতার খেলার পুতুল। বনলতা তাকে ঝিনুকে করে দুধ খাওয়ানোর নকল খেলা খেলেছে, ঘুম পাড়িয়েছে, কখনো বা পুতুলের মতো সাজিয়েছে তাকে। বনলতার সেই আদর মনে পড়লে আজো মাঝে মাঝে মন উদাস হয়ে যায় বিশুর। সে জানে যে, সে প্রায় কুড়িয়ে পাওয়া ছেলের মতোই নিরাশ্রয় ছিল, দেশভাগের পর সেই ভীষণ গণ্ডগোল, অনিশ্চয়তার দিশেহারা তার শিশুমনটি বনলতার কাছে এসে স্থির হয়েছিল। মাঝে মাঝে ভাবে বিশু একদিন যখন বনলতার সুখের সংসার ধনে জনে ভরে উঠবে তখন সে বনলতার কাছে গিয়ে বুড়ো বয়সে বলবে, 'বনা, একদিন আমি তোর ভাই ছিলুম, ছিলুম খেলার পুতুল, আজ তুই আমাকে তোর ছেলে করে নে। আমি তোর বুড়ো ছেলে বনা।' এসব কথা কখনো বনলতাকে বলেনি বিশু। শুনলে তেড়ে মারতে আসবে বনলতা। বনলতার বাইশ চলছে, আর তার সাতাশ।

তবু নিজের কাছে স্বীকার করতে বাধা নেই বিশুর যে সে বনলতাকে ঠিক অতটা ভালবাসে। সে জানে, অন্তর থেকে জানে যে, বোন বলেই হোক, মা বলেই হোক— বনলতার সঙ্গে আমৃত্যু তার একটা সম্পর্ক থাকবেই। পৃথিবীতে তার সবচেয়ে প্রিয়-গুলির মধ্যে একটি হচ্ছে বনলতা।

প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চে একা বসে থেকে অনেকক্ষণ কেবল সিগারেট খেয়ে গেল বিশু। তার মন ভার লাগছিল। বড় অসুখী লাগছিল নিজেকে। বিয়েটা করার আগে বনলতা যদি একবারও মনে করে তাকে ডাকত ! বিশু বনলতাকে কোনো ভুল করতে দিত না। অবশ্য বনলতা ভুল করেছে কিনা তা বিশু এখনো জানে না। জগন্নাথকে বিশু এখনো দেখেনি।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সোজা হয়ে বসল বিশু। তাই তো ! ইচ্ছে করলে জগন্নাথকে সে দেখে যেতেই পারে। দোষ কী ? লেখাপড়া বেশী শেখেনি বিশু, পণ্ডিত মানুষদের তাই সে এড়িয়ে চলে। তবু এখন সে সব সঙ্কোচ বড় একটা ভাবাল না বিশুকে। সিগারেটটা ছুঁড়ে দিয়ে সে উঠে পড়ল। গেট-এর টিকিট চেকারের বাড়ানো হাতখানা ঠেলে সরিয়ে সে তাড়িৎগতিতে বেরিয়ে এল। জগন্নাথের কলেজ খুব বেশী দূরে নয়। ইচ্ছে করলে সে পরের ট্রেনটায় যেতে পারে কিংবা রাতের যে কোনো ট্রেনে।

বড় রাস্তায় এসে বিশু ট্রাম ধরল। জগন্নাথের কাছে নিজের কী পরিচয় দেবে সেটাই একটু ভাবছিল সে। যদি বলে যে, সে ওদের আশ্রিত ছিল, তবে হয়তো জগন্নাথ তাকে পাত্তাই দেবে না। তাছাড়া বনলতার সঙ্গে তার যে সরল একটা সম্পর্ক রয়েছে, সেটাও বাঁকাভাবে বুঝতে কতক্ষণ। তাছাড়া জগন্নাথের কাছে গিয়ে কীই বা জানবে বিশু ! চেহারা দেখে আর দু-চারটে কথা বলে আর কতটুকু জানা যায় ? আর যদি সত্যিই দেখে জগন্নাথ বনলতার ঠিক স্বামী নয়, যদি দেখে জোর মেলেনি, তবে বিশুর আর কি করার থাকবে ? চিরকালের জন্য বনলতাকে অসুখী জেনে ফিরে আসবে কি সে ?

তবু তাও ভাল। রহস্য পরিষ্কার হয়ে যাক। তারপর না হয় সে তার পোলট্রির হাঁস-মুরগীর কাছেই পালিয়ে যাবে, আর আসবে না কখনো কলকাতায় কিংবা বনলতার মুখোমুখী হবে না কোনোদিন।

এক সময়ে তার এও মনে হল যে, সে অকারণ বাড়াবাড়ি করছে। আসলে পালিয়ে বিয়ে করার পর মনের অবস্থা এরকমই হয়। হয়তো বাবা বা বিশুর কাছ ছাড়া হয়ে থাকার প্রথম ধাক্কাটা লেগেছে বনলতার। আবার সামলে উঠবে। হয়তো জগন্নাথের সঙ্গে একটু মানঅভিমান চলছে তার। ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু আপনমনেই আবার মাথা নাড়ে বিশু। তা নয়। বনলতার নাড়ীনক্ষত্র তার জানা।

হু হু করে বয়ে যাচ্ছে ট্রাম গাড়ি। রড ধরে দাঁড়িয়ে একটু কুঁজো হয়ে বিশু তার স্টপ এল কিনা লক্ষ্য করছিল। ঘড়ি দেখল। তিনটে বেজে সাত মিনিট। এখনো জগন্নাথ কলেজে আছে কিনা কে জানে! যদি না থাকে, তবে বিশুকে আর একদিন আসতে হবে।

কলেজেই ছিল জগন্নাথ। ক্লাসে। একটু বসতে হল বিশুকে কমনরুমে। সে একটা সিগারেট ধরাল তারপর একটু ভেবেচিন্তে সেটা নিভিয়ে আবার পকেটে রেখে দিল। সামান্য স্নায়বিক উত্তেজনা বোধ করছিল সে। বনলতা আর জগন্নাথের ব্যাপারের মধ্যে সে একটু অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে। এতটা না করলেই বোধহয় ভাল হত। আবার পিছিয়ে যেতেও তার অনিচ্ছা। সে বার বার ঘড়ি দেখছিল। ক্লাস শেষ হতে এখনো মিনিট কুড়ি বাকী। সে খোঁজ নিয়ে জেনেছে যে, এটাই জগন্নাথের শেষ ক্লাশ। এরপর সে চলে যাবে। অল্পের জন্য সে জগন্নাথকে পেয়ে গেছে।

বসে বসে বনলতার কথাই ভাবছিল বিশু। কতভাবে জীবনকে এই অল্পবয়সেই দেখেছে বিশু। বনলনা দেখেনি। সে ছিল পুরুতের ছেলে। দেশভাগের পর এখানে এসে সে ফুটপাতে শুয়েছে, রাস্তায় কাগজ কুড়িয়েছে, চায়ের দোকানে বয়ের কাজ করেছে, কতরকমভাবে মার খেয়েছে লোকের কাছে। মাত্র সাত বছর বয়সেই তার বুড়োদের মতো পাকা মাথা তৈরী হয়ে গিয়েছিল প্রায়। সে জানে ক্রমে সে চোর-পকেটমারদের দলেও চলে যেতে পারত। অন্তত ঐ রকম উচ্চাশা ছিল তার। বনলতা কিছুই দেখেনি। আহা বনলতার জন্য তাই বড় মায়া বিশুর। এ জীবনের নোংরা বিশ্রী দিকটা সে কোনোদিন না দেখুক। কখনো সখনো বনলতার কাছে সে তার সাত বছরের অভিজ্ঞতার কথা বলেছে। বনলতা কাঁদতো, মেয়েলী স্বভাববশত তাকে আরো বেশী ভালবাসতো। বড় হয়ে বিশু আর বলত না। থাক বনলতা সুন্দর আর সুকুমার থাক। অত বুঝে তার কাজ নেই।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ চোখে জল আসছিল বিশুর। জাত-ধর্ম বনলতা বোঝে না। তাকে কেউ কখনো শেখায়নি। বিশু পুরুতের ছেলে। সে অনুলোম প্রতিলোম বোঝে। কিছুতেই তার সে সংস্কার যায় না। বোধহয় যাবেও না কোনোদিন। বামুনের মেয়ে হয়েও বনলতা জগন্নাথ বোসকে বিয়ে করেছে। প্রতিলোম। প্রতিলোমজাত সন্তানেরা বর্ণশঙ্কর, সমাজের ক্ষতিকারক। এই বিয়ে বিশ্বাসঘাতকদের জন্ম দেয়।

boiRboi.net

বনলতা এতসব জানেও না। বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে বিশুও মানে না এসব। আজ যে কথাটা হঠাৎ মনে পড়ল, তার কারণ বোধহয় বনলতার ওই অসহায় ভাব আর অস্থিরতা। কি জানি, প্রতিলোম বলেই বোধহয় বনলতা সুখী হচ্ছে না! খুব উত্তেজিত হয়ে বিশু ভাবছিল ভবিষ্যতে সে সম্ভব হলে প্রতিলোম বিয়ে বন্ধ করারই চেষ্টা করবে।

ঘণ্টা পড়তেই বিশু উঠে দাঁড়াল। যে লোকের কাছে শুনে জগন্নাথের আবছা একটা চেহারা মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল সে কমনরুমের বাইরে এসে দাঁড়াল।

জনা দুই বয়স্ক প্রফেসর ঘরে ঢুকে গেল। তৃতীয়জন লম্বা ফর্সা, চোখে কালো ফ্রেমের ভারী চশমা। সুন্দর কিন্তু একটু মেয়েলী কোমল মুখশ্রী। এই জগন্নাথ—বিশু চিনে নিল। তারপরই এক-পা এগিয়ে পথ আটকাল—আপনিই প্রফেসর বোস?

ভীষণ চমকে গেল জগন্নাথ। যতটা চমকাবার কথা তার চেয়ে বেশী। তাকে বিবর্ণ এবং খুব বিচলিত দেখাচ্ছিল। গভীর কালো কিন্তু দুর্বল এবং অস্থির দুটি চোখে বিশুকে দেখে অল্প মাথা ঝাঁকাল জগন্নাথ, হ্যাঁ আমিই—কিন্তু—

বিশু বুঝতে পারল জগন্নাথ শক্ত ধরনের পুরুষ নয়। এভাবে তার হঠাৎ পথ আটকানো ঠিক হয়নি। লজ্জা পেল বিশু। হাতজোড় করে বলল—আমাকে আপনি ঠিক চিনবেন না। আমি বিশু। আমি বনলতার ভাই।

তবু কিছুক্ষণ বুঝতে পারল না জগন্নাথ। বোকার মতো অসহায়ভাবে তার দিকে চেয়ে রইল। তারপর হঠাৎ তার মুখে বর্ণের পরিবর্তন দেখা দিল। সামান্য বেশী লাল হয়ে গেল তার মুখ। হাসল, ওঃ হোঃ বিশু আরে, আপনি তো আমার মস্ত কুটুম!

সামান্য ভড়কে গিয়েছিল বিশু প্রথমটায়। এখন জগন্নাথের ঠাট্টা শুনে হাঁফ ছেড়ে হাসল। বলল—বনার সঙ্গে দেখা করেই আসছি। আমি তো আর বিয়ের খবর পাইনি!

জগন্নাথ হঠাৎ চোখের একটু ইশারা করে বলল—বাইরে সব কথা হবে। ইঙ্গিতে কমনরুমটা দেখিয়ে বলল—এখনো সবাই ঠিক জানে না।

রেজিস্ট্রার খাতা দুটো কমনরুমের টেবিলে ফেলে দিয়েই বেরিয়ে এল জগন্নাথ। বলল—চলুন।

পাশাপাশি হেঁটে বেরিয়ে এল দুজনে। অনেকক্ষণ কথা বলল না জগন্নাথ। কলেজের এলাকা ছেড়ে যখন অনেকটা চলে এল দুজনে, যখন আর রাস্তায় ছাত্রদের দেখা যাচ্ছিল না, তখন থেমে একটা সিগারেট ধরাল জগন্নাথ। প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল—বলুন এবার।

বিশু বলল, আপনার সঙ্গে পরিচয় করতে এলাম।

—বেশ করেছেন। রাণাঘাটে আপনার পোলট্রির কথা আমি শুনেছি। একদিন যাওয়ার ইচ্ছে আছে। তারপরই একটু হেসে জগন্নাথ বলল—বনলতা অতিথি সৎকার ঠিকমতো করেছে তো।

বিশু হেসে মাথা নাড়ে—আমি আপনার অতিথি। বনার নই। আপনি থাকলে ঠিক ঠিক সৎকার হতে পারত।

এসব কথা বলার জন্যই বলছিল বিশু। কিন্তু সব সময়ে সে চোখের কোণ দিয়ে

boiboi.net

লক্ষ্য করছিল জগন্নাথকে। তার হাঁটার ভঙ্গী, কথা বলার সময়ে তার ঠোঁটের নড়াচড়া, তার চোখ। ঠিক কী সে দেখতে চায় বা কী খুঁজছে সে তা নিজেও জানে না ! সে অপেক্ষা করছিল। আরো একটু সময় লাগবে। সহজ ভদ্রতার কথাবার্তা বা লঘু ঠাট্টার ভিতর থেকে কিছুই বোঝা যাবে না। মানুষকে দেখতে হয় তার ঘটনার ভিতরে। ঘটনার প্রতিক্রিয়াই মানুষের চরিত্র ধরিয়ে দেয়। সে যখন প্রথম পথ আটকাল তখন কেবল এইটুকু বুঝতে পেরেছিল, যে লোকটা শক্ত স্নায়ুর লোক নয়। অকারণ দুশ্চিন্তায় ভোগে। এবার আরো একটু জানতে হবে তাকে।

বিশু বলল—চলুন কোথাও বসি।

একটু সঙ্কুচিত হল জগন্নাথ—কোথায় !

—যে কোনো রেস্টুরেন্টে।

অপ্রতিভভাবে জগন্নাথ হাসল একটু—এ-সব রেস্টুরেন্টগুলোতে আমার ছাত্ররা থাকে। ওদের সামনে—

বিশু হাসল—ছাত্রদের ভয় করলে চলবে কেন ! ওরা যখন প্রফেসরদের ভয় পায় না, তখন আপনার মাথাব্যথা কিসের ? চলুন—

সামনেই একটা চায়ের দোকান। বিশু জগন্নাথের হাতে একটু চাপ দিয়ে তাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল। মুখোমুখি বসল দুজনে। বিশু অনেক সহজ বোধ করছিল এখন, কিন্তু জগন্নাথকে কুণ্ঠিত এবং অপ্রতিভ দেখাচ্ছিল। মনে মনে বিশু স্পষ্টই বুঝতে পারছিল যে, সে জগন্নাথের ওপর এক ধরনের কর্তৃত্ব খুঁজে পাচ্ছে। বিশু একটু বেঁটে, মজবুত অ্যাথলীট ধরনের চেহারা, নিজের শরীরকে যেদিকে খুশী বাঁকাতে হেলাতে পারে বিশু, পরিশ্রম করার ক্ষমতাও তার প্রচুর। জগন্নাথ অনেকটা লম্বা। ঠিকমতো তৈরী হয়নি বলে অত লম্বা হওয়া সত্ত্বেও জগন্নাথের চেহারাটা মেদবহুল আর দুর্বল। শরীরের পরিশ্রম বোধহয় একেবারেই করে না জগন্নাথ। যখন রাস্তায় হাঁটছিল তখন বিশু দেখেছে জগন্নাথের পাঞ্জাবীর তলা থেকে পেটের চর্বি সামান্য ফুলে আছে।

এই লোকটাকে বনলতা ভালবাসে। ভাবতেই কেমন আশ্চর্য লাগছিল বিশুর। জগন্নাথের পাণ্ডিত্য কিংবা রুচি সব স্বীকার করে নিয়েও তার মনে কোথায় যেন বাধো-বাধো ঠেকছিল। নিজের সঙ্গে অকারণেই সে জগন্নাথকে মিলিয়ে দেখছিল। বনলতার বাবা, তার কাকাবাবুর কথাও ভেবে দেখল বিশু। এখনো এই বয়সেও সাংঘাতিক স্বাস্থ্য, রঙ ফেটে পড়ছে গায়ে, গমকী গলার স্বর। বাপের মতোই মুখশ্রী পেয়েছে বনলতা, সে রকমই রঙ। পিতৃমুখী মেয়ে বনলতার সুশ্রী হওয়ারই কথা ছিল। তার বাপকে দেখেছে বনলতা, বিশুকেও। স্বাভাবিক নিয়মে সে তার স্বামীর ভিতরেও তার বাবা কিংবা বিশুর মতোই কাউকে খুঁজতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। হতাশভাবে বিশু দেখে জগন্নাথের সঙ্গে তার কিংবা কাকাবাবুর এতটুকু মিল নেই। এ অন্য এক জগতের লোক। ভাল করে চোখে চোখ রেখে তাকাতে পারে না, গলার স্বর মিহি সুন্দর আর হাবেভাবে নিজের সম্পর্কে সিদ্ধান্তের বড় অভাব। এ লোককে বনলতা কি করে ভালবাসে ? হঠাৎ তার কৌশিক ব্যানার্জির কথা মনে পড়ল। ভাল স্পোর্টসম্যান ছিলেন কৌশিক। গতকালের কাগজে তার ছবি বেরিয়েছে, বনলতা সেই ছবিই

দেখছিল দুপুরে। একা একা। আস্তে আস্তে শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল বিশুর। বনলতা কেন কৌশিকের ছবি দেখছিল? কেন?

জগন্নাথ সামান্য অস্বস্তির হাসি হেসে বলল—ব্যাপারটা খুব হঠাৎ হয়ে গেল, না?

অন্যমনস্ক বিশু জিজ্ঞেস করল—কোন ব্যাপার?

লাজুক মুখে জগন্নাথ বলে—বিয়েটা?

—বিয়ে! বলে সকৌতুকে একটু চেয়ে রইল বিশু। লোকটাকে নিয়ে একটু খেলা করতেই ইচ্ছে করছিল তার। দুর্বল লোক দেখতে অপেক্ষাকৃত শক্তিমানদের যে মনোভাব হয় সেরকমই। নিজের ভিতর সামান্য একটু নিষ্ঠুরতাও অনুভব করছিল সে। বলল—হ্যাঁ। বড় হঠাৎ হয়ে গেল। আমরা টেরই পেলাম না। আমাদের ইচ্ছে ছিল বনার বিয়েটা খুব ঘটা করে দিই।

মাথা নাড়ল জগন্নাথ—জানি ও আপনাদের খুব আদরের ছিল।

হাসল বিশু—এখনো আছে।

আস্তে আস্তে জগন্নাথ বলল—শুনেছি ওর বাবা এখনো খুব রেগে আছেন। মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক মানছেন না।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে ডান হাতখানা বাড়িয়ে বিশু জগন্নাথের কাঁধ স্পর্শ করেই আবার হাতটা টেনে নিল, বলল—ওটা নিয়ে ভাববেন না। আপনারা সত্যিকারের সুখী হলে তিনিও একদিন মেনে নেবেন। এরকম তো আজকাল কতো হচ্ছে। তবে আমার মনে হয় আপনারা একবার গিয়ে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারতেন। তাতে ভাল হত।

—কি হত?

—তিনি একটু বুঝতে পারতেন যে তাঁকে একেবারে অস্বীকার করা হচ্ছে না।

হাসল জগন্নাথ—ওটা তো ফর্মালিটি। আপনার কি মনে হয় যে তিনি অনুমতি দিতেন এ বিয়ের?

—না। মাথা নাড়ল বিশু।

—তবে? বলল জগন্নাথ, তিনি রাগ করতে পারেন, কিন্তু আমরা যা করেছি তা ঠিকই করেছি।

বিশু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল—বনলতা আমাকে জানাতে পারত। আমি নেগোশিয়েট করার চেষ্টা করতাম।

—আপনাকে! বলে একটু দ্বিধায় পড়ে গেল জগন্নাথ। তার মুখভঙ্গী নিঃশব্দে বলে উঠল—আপনি কে? আপনাকে জানাবে কেন বনলতা! তারপরেই সামলে গেল জগন্নাথ—বলল, আপনাকে জানানো যেতো। কিন্তু সময় ছিল না।

সময় ছিল না! এত তাড়াহুড়ো! মনে মনে একটু উত্তাপ, একটু উষ্মা টের পাচ্ছিল বিশু। তবু চুপ করে রইল।

নিজেই আবার কথা বলল জগন্নাথ—তা ছাড়া ঝামেলার দরকার কী? এই তো বেশ সহজ সরলভাবে সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। একটু চুপ করে থেকে অনাবশ্যকভাবে যোগ করল—আমরা সুখী।

বিশু হাসল। সে জানে এটুকুই হয়তো জগন্নাথের দুর্বলতা। সে বিশুকে

জানাতে চায় যে তারা সুখী। নিছক কথা বলা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তার চোখ জগন্নাথের ওপর ঘুরছিল। সে সজাগ রেখেছে কান, আর চোখ কানের অতীত আর একটা অনুভূতি।

জগন্নাথকে সামান্য উত্তেজিত করে দিতে ইচ্ছে করছিল বিশুর। ঠাণ্ডা কথাবার্তা বলে গেলে কোনো লাভ নেই। তাই সে হঠাৎ হেসে দুম করে বলে ফেলল—দেখুন, বনলতা যদি আজ আর কারো সঙ্গে পালিয়ে যায় এবং গিয়ে আপনাকে জানায় যে তারা সুখী, তাহলে আপনার কেমন লাগবে?

কিছুটা হতভম্ভ হয়ে গেল জগন্নাথ। তার ফর্সা মুখ অল্প অল্প করে টকটকে লাল হয়ে উঠল। প্রথমে উত্তর দিতেই পারল না জগন্নাথ। তারপর হঠাৎ পিছনে হেলান দিয়ে হাসল, বলল—সেরকম সম্ভাবনা আছে নাকি?

এটা উত্তর নয়। বিশু দেখল যথেষ্ট উত্তেজিত হয়েছে জগন্নাথ। কিন্তু অসহায়ও বোধ করছে বড়। কিন্তু বলল—আপনারা যদি সুখী হয়েই থাকেন তাহলে সে সম্ভাবনা অবশ্যই নেই। কিন্তু যদি এরকম ঘটতই তাহলে আপনার সম্মানে কিংবা অধিকারবোধে আঘাত লাগত না?

উত্তেজিত জগন্নাথ মাথা নেড়ে বলল—বোধ হয়।

হাসল বিশু—বনলতার বাবার কয়েকদিন আগে একটা স্ট্রোক হয়। থ্রম্বসিস। বিচ্ছিরি অবস্থা হয়েছিল।

জগন্নাথ নিরুত্তাপভাবে শুনল।

তাদের দুজনেরই চা জুড়িয়ে এসেছিল। এখন জগন্নাথ সেই ঠাণ্ডা চায়ে লম্বা চুমুক দিয়ে মুখ তুলল, একটু ভেবে বলল—আমাকে আপনি কি করতে বলেন? তারপর বিশু কোনো কথা বলার আগেই বলল—কিন্তু আমি ওর কাছে যেতে পারব না। ক্ষমা টমার কথাও বলতে পারবে না। তবে বনলতাকে বলতে পারি যে সে যেন একবার তার বাবার কাছে যায়।

—তার দরকার নেই। বলে শব্দ করে হাসল বিশু, আর একটা কথা। বনলতাকে মেয়ে হিসেবে তিনি অস্বীকার করেন না, কিন্তু জামাই হিসেবে আপনাকে করেন।

জগন্নাথের ঠোঁট কাঁপছিল থরথর করে। তীব্র হয়ে উঠেছিল চোখের দৃষ্টি। প্রায় কাঁপা বিকৃত গলায় সে বলল—তাতে কিছু যায় আসে না। আই কেয়ার এ ফিগ ফর—

কথাটা জগন্নাথকে শেষ করতে দিল না বিশু। দু হাত তুলে বলল—আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি আপনার শ্বশুরের সঙ্গে আপনাদের মিলন ঘটাতে আসিনি।

কথা বলছিল না জগন্নাথ, কিন্তু তার দুই তীব্র চোখ বিশুকে নানা প্রশ্ন করছিল।

বিশু আস্তে আস্তে যেন বা জগন্নাথের ব্যথা বেদনার জায়গায় হাত বুলিয়ে দেওয়ার মতো নরম ভঙ্গীতে বলল—বরং আমি আপনাদের প্রেমের গল্পটাই শুনতে এসেছিলাম।

জগন্নাথ হাসল। কথা বলল না। বিশু বোঝে যে জগন্নাথ তাকে বিশ্বাস করছে না। সে তেমনি আস্তে করে বলল—বনলতার জন্য অনেক ভাল ছেলে পাওয়া গিয়েছিল। বনা কাউকে পছন্দ করেনি। আপনার মধ্যে বনলতা নিশ্চয়ই এমন কিছু পেয়েছে যা আর কারো ছিল না। আমি সেটাও দেখতে এসেছিলাম।

শুনে খুশী হল না জগন্নাথ বরং বিরস মুখে ঠোঁট উল্টে বলল—কি জানি! আপনাদের বনাকেই জিজ্ঞেস করবেন।

বলতে বলতেই উঠে দাঁড়াল জগন্নাথ। বিশু বোঝার আগেই কাউণ্টারে গিয়ে চায়ের দাম দিয়ে দিল।

দুজনেই বেরিয়ে এল রাস্তায়। অন্ধকার হয়ে এসেছে।

অনেকটা পথ চুপচাপ হাঁটল জগন্নাথ বিশুর পাশে পাশে। তারপর হঠাৎ এক সময়ে বলল—দেখুন, আমি কষ্ট করে মানুষ হয়েছি। আমার ডিগ্রী বা চাকরি অন্যের কাছে যত তুচ্ছই মনে হোক, এগুলোর জন্য কিন্তু আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। পার্টিশানের পর আমাদের আর কিছুই ছিল না, তারপর থেকে এক নাগাড়ে স্ট্রাগল। তাই নিজের কাছে বা নিজের পরিবারের কাছে আমি বড়ই, এতটা হওয়ারও কথা ছিল না আমার। কিন্তু বিয়ের পর থেকেই শুনছি আমি পাত্র হিসাবে ভাল না, আমি সুন্দরী বনলতার উপযুক্ত নই। আমার বাড়ি থেকেও অসবর্ণ প্রতিলোম না কি যেন ইত্যাদি আপত্তি করা হয়েছে। আলাদা ফ্ল্যাটবাড়িতে আছি বনলতার জন্যই, নইলে এভাবে থাকার ক্ষমতা আমার নেই। বাড়িতে বুড়ো মা-বাবা, ছোটো ভাইবোনকেও আমার দেখতে হয়! খরচ বেড়ে গেছে, আরো খাটছি, তবু কেবলই নিজের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। মনে হচ্ছে কেউই সুখী হচ্ছে না। না বনলতা, না আমার পরিবার না বনলতার পরিবার, না আমি। একটু চুপ থেকে আবার জগন্নাথ বলল—উপায় থাকলে আমি বলতাম আপনাদের সুন্দরী বনলতাকে নিয়ে যান। যার সঙ্গে খুশী বিয়ে দিন। আমার কিছু বলার নেই আর।

বিশু ভয়ঙ্কর চমকে উঠল। এত সহজে কথাটা বলবে জগন্নাথ তা সে ভাবেনি। দেখল জগন্নাথ রুমাল বের করে মুখ মুছবার ভান করে চশমার ফাঁকে চোখের কোল দুটিও মুছে নিল। বুকের ভিতরটা এলোপাথাড়ি কেঁপে উঠল বিশুর। একই সঙ্গে তীব্র একটা দুঃখ এবং সুখকেও টের পেল। সে মৃদু স্বরে বলল—কী সব বলছেন!

একটু ভারী গলায় জগন্নাথ উত্তর দিল—ঠিকই বলছি। আমি ভীষণ টায়ার্ড।

—একমাসের মধ্যেই!

—একমাস! জগন্নাথ যেন থমকে গেল, আমার তো মনে হচ্ছে দশ বছর কেটে গেল।

বিশু শান্ত গলায় বলার চেষ্টা করল—আপনার মন আজ ভাল নেই।

মাথা নাড়ল জগন্নাথ—মন ঠিক আছে। আমি ভেবেই বলছি।

রাস্তার মোড়ের কাছে এসে বিশু দাঁড়াল, বলল—আমি শিয়ালদার দিকে যাবো।

ক্লান্ত হাসি হাসল জগন্নাথ—আচ্ছা। আবার দেখা হবে।

তারপর আর ফিরেও তাকাল না।

boiRboi.net

একা হতেই নিজের কাছে ধরা পড়ল বিশু। স্পষ্টই সে বুঝতে পারল তার মন ভারমুক্ত, সে সুখ বোধ করছে। হয়তো বা এই সুখ অবৈধ। পরশ্রীকাতরতা থেকেই এরকম সুখ আসে।

আবার একটু দুঃখও বোধ করছিল বিশু জগন্নাথের জন্য। কিন্তু সে দুঃখটুকু তার মনের ভদ্রতাবোধ। তার বেশী কিছু নয়।

অন্য মনে শিয়ালদায় এসে রাণাঘাটের ট্রেন ধরল সে।

রাত্রে মস্ত চাঁদ উঠেছিল। মেঠো গ্রাম্য পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল বিশু। একটা ছোট্ট ঝিল-এর ধার দিয়ে রাস্তা বেঁকে গেছে। একটু দাঁড়িয়ে বিশু সিগারেটে আগুন ধরিয়ে নিচ্ছিল। জলে চিকমিক করে কাঁপছে জ্যোৎস্না। জলের ওধারে একটা খুঁটি, হঠাৎ দেখলে মনে হয় একটা মানুষ ঝুঁকে জলে নিজের ছায়া দেখছে। বিশুর মন বলছিল জগন্নাথের সঙ্গে বনলতার এ বিয়ে টিকবে না। ভাবতেই বুকের মধ্য দিয়ে তীব্র একটা আনন্দের স্রোত বয়ে গেল। তারপর কী হবে ভাবলই না।

গুণ গুণ করে গান গাইতে গাইতে সে তার পোলট্রির পোষা হাঁস মুর্গী আর জলার মাছগুলির কাছে ফিরে যাচ্ছিল।

সাত

আসলে নিজেকে বন্দিনীর মতোই লাগে বনলতার। যদিও তার এ বিয়ে ভালবাসার, স্বেচ্ছার, তবু ভেবে দেখলে সঠিক স্বয়ম্বরাও তো সে হয়নি। জগন্নাথ তাকে ক্ষ্যাপার মতো ভালবেসেছিল, আর সেই ভালবাসাই বনলতার বিচার-বুদ্ধিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তার বয়স কম, কারো পরামর্শ নেওয়ার কথা তার মনেই হয়নি। দু একজন বান্ধবীকে বলেছিল তার ভালবাসার কথা, তারা খুব উৎসাহ দিয়ে 'ইস, কী ভালো হবে' বলে তাকে উস্কে দিল। ওদেরও দোষ নেই, ওরাও বয়সের বুদ্ধিতে চলে। কিন্তু বিয়ের মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই বনলতা এখন টের পাচ্ছে—ভুল হয়ে গেল।

সারাদিন একা একা শহরতলীর এই ছোট্ট ফ্ল্যাটটাকে তার প্রকাণ্ড বলে মনে হয়। সে ঘুরে ঘুরে করে ঘুরে বেড়ায়, একা। বিষণ্ণ বোধগুলি তার অল্প বয়সকে আস্তে আস্তে বাড়িয়ে দেয়। অথচ কোথায় ভুল হল তার সঠিক কারণটাকে সে কিছুতেই ছুঁতে পারে না! কিন্তু কেবল মনে হয়—ভুল, বড় বেশী ভুল হয়ে গেছে বাবা, সারা পৃথিবীতে তার আত্মীয় বলতে একমাত্র বাবা, তাঁকে না জানিয়ে পালিয়ে বিয়ের জন্য যত কাণ্ড সে করল, সেই সব কাণ্ডকে এখন বড় হাস্যকর ছেলেমানুষী বলে মনে হয়। ছেলেবেলা থেকেই বিয়ে বলতে সে বোঝে শানাইয়ের আওয়াজ, সিঁথিমৌর, বেনারসী, ম্যারাপ, আলো, স্ত্রী আচার। তার বিয়েতে কিছুই হ'ল না, কাগজে সই করা আর হোটেলের পার্টিতে কিছু বন্ধু বান্ধবীর আগমন। কেউ জানলই না। অথচ অনুষ্ঠানহীন ভাবে সে জগন্নাথের বৌ হয়ে গেল। হয়ে গেল? নাকি হয়েও হল না?

হ্যাঁ বাইরে থেকে দেখলে সে জগন্নাথের বৌ। কিন্তু ভিতরে, মনের মধ্যে সে একা বনলতা। জেদী একগুঁয়ে, আদুরে বনলতা। সেখানে স্বামী বলে জগন্নাথকে মানে না।

জগন্নাথ লোক খারাপ নয়। বরং ভালোই। বয়সে বনলতার চেয়ে বছর আটেকের বড়, ভাল কলেজের অধ্যাপক, এম, এ, ডি ফিল। বিয়ের পর চেহারাটা চর্বি জমে একটু ভরভরাট হয়েছে। ভালই দেখায় জগন্নাথকে, যখন সে ঘি রঙের সিল্কের পাঞ্জাবী পরে কলেজে যায়। ধীর স্থির লোক, একটু অন্যমনস্ক, কুনো আর খুবই

ভাবপ্রবণ। মেয়েরা এমন ছেলেকে সহজেই দখল করতে চায়। এমন কি বনলতার একজন প্রতিদ্বন্দ্বীও ছিল। নীতা। মুখে তেমন কিছু বলত না জগন্নাথ, কিন্তু কখনো বিরক্তির সঙ্গে নীতার হ্যাংলাপনার উল্লেখ করে বলত—মেয়েটা যাচ্ছেতাই! দেখ আবার চিঠি দিয়েছে। বলে চিঠি দেখাতো বনলতাকে। বনলতা কৌতূহল নিয়ে পড়ত। খুব খারাপ কথা অনায়াসে লিখত নীতা, আর বার বার জগন্নাথের মহানুভবতা, উদারতা ইত্যাদির উল্লেখ করে তাকে গ্রহণ করতে সাধাসাধি করত। সরল জগন্নাথ আত্মরক্ষার জন্য বনলতার কাছে জমা দিত চিঠি। বলত—তুমিই উত্তর দিয়ে দিও।

উত্তর দেয়নি বনলতা, তবে তার রেজিস্ট্রেশনের পর দিন মেয়েটিকে এক লাইনে খবরটা জানিয়ে দিয়েছিল। ব্যাপারটা খুবেই নিষ্ঠুর হয়েছিল। খবরটা দেওয়ার সময়ে নিজের ভিতরে বনলতা সেই নিষ্ঠুরতার আনন্দকেও টের পেয়েছিল। নীতা নামে সেই অচেনা মেয়েটিকে এখনো মাঝে মাঝে ভাববার চেষ্টা করে সে। জগন্নাথ বলেছিল, নীতা দেখতে সুন্দর নয়, তার রঙ কালো, সামনের দাঁত সামান্য বড়, স্বাস্থ্য ভাল—সব মিলিয়ে খুবেই সাধারণ মেয়ে। তবে নীতার চোখ নাকি সুন্দর। বনলতা জানত তার আগুন চেহারার কাছে নীতা কিছুই না। তবু বিয়ের আগে সে নিতার কথা ভেবে কখনো কখনো অস্বস্তি বোধ করেছে—নীতার চোখ—সে কি খুবেই সুন্দর? বাজে মেয়েদের ভাল চোখ থাকলেই কি।

মাঝে মাঝে নীতা জগন্নাথের কলেজের সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে পাকড়াও করত জগন্নাথকে। বড় বিপদে পড়ত জগন্নাথ। বনলতার কাছে এসে বলত, বড় ভয় করে। মেয়েটা বেহেড হয়ে যদি একদিন হাতফাত ধরে চেঁচামেচি শুরু করে! আজকেও বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইছিল। কখনো কখনো সিনেমার টিকিট নিয়ে আসে, রেস্টুরেণ্টে নিয়ে যেতে চায়। কী যে কাণ্ড করে! ও বোধহয় ক্ষেপে গেছে। এ সব শুনে বনলতার ভিতরটা দপ করে জ্বলে উঠতো। নীতা নামে সেই অচেনা মেয়েটিই পরোক্ষভাবে জগন্নাথের প্রতি তার যুক্তিহীন আকর্ষণ তৈরী করছিল। জগন্নাথকে কে একটি মেয়ে পাওয়ার জন্য ক্ষেপে গেছে—এই চিন্তাই তাকে অস্থির রাখত। তার ভিতরে রেষারেষির ভাব এনে দিত। নইলে সাদা চোখে জগন্নাথকে বিচার করে দেখতে পারত বনলতা। না; জগন্নাথের মধ্যে বিমুখ হওয়ার মতো কিছু নেই, তবু বনলতা জানে যে বিমুখ না হওয়াই ভালবাসা নয়। অচেনা নীতার সঙ্গে পাল্লা না দিলে সে বুঝতে পারত নিজের অন্তরকে। আর একটু অপেক্ষা করতে পারত।

নীতা হেরেই গেছে। কিন্তু সেই হারিয়ে দেওয়ার আনন্দটা বড় ক্ষণস্থায়ী হয়েছে বনলতার মনে। এখন নীতার কথা মনে হলে আর তেমন ক্ষ্যাপাটে উত্তেজনা বোধ করে না সে। বরং মনে হয়—আহা নীতা হয়তো কেঁদেছিল। নিষ্ফল আক্রোশে হয়তো কত অভিশাপ দিয়েছে তাকে। সেই সব অভিশাপ ফলে যাচ্ছে কিনা কে জানে। কৈ, এত কাণ্ড করে সে যার বৌ হল, তাকে পেয়ে খুব একটা কিছু পেয়েছে বলে তার মনে হচ্ছে না তো। বরং মনে হচ্ছে জগন্নাথ অন্য কারো স্বামী হলে তার দুঃখের কিছুই থাকতো না। নীতা কি এখনো জগন্নাথের কথা ভাবে? কে জানে!

বিশু এসেছিল কয়েকদিন আগে। সেই আত্মীয়হীন বিশু, সে তাদের বাড়িতে

তার ভাইয়ের মতোই বেড়ে উঠেছিল। বেপরোয়া সাহসী, সদা হাস্যময় বিশু খুঁজে খুঁজে কোথা থেকে তার ঠিকানা বের করেছিল। জিজ্ঞাসা করায় বলেছিল—লোক লাগিয়েছিলুম। সে তোর হাজব্যাণ্ডকে কলেজ থেকে বাসা পর্যন্ত ফলো করেছিল। শুনে চমকে উঠেছিল বনলতা—ও মা! কিন্তু সে জানে যে বিশু সব পারে। হাসি-মুখে কথা বলল বিশু, বাবার কথা, বাসার কথা, বলে গেল বনলতা জগন্নাথকে বিয়ে করে ঠিকই করেছে। কিন্তু বিশুর চোখ সে কথা বলছিল না। বনলতা বুঝেছিল বিশু খুশী হয়নি। ও ঠিক খুঁজে খুঁজে জগন্নাথের কাছেও যাবে। আলাপ জমাবে। বিশুর মান অপমান বোধ নেই। অহংকারী জগন্নাথ বিশুকে পছন্দ করবে কি না কে জানে! জগন্নাথ অচেনা লোক দেখলে কখনো খুব খুশী হয় না। আত্মমগ্ন থাকতেই সে ভালবাসে।

বিশুর কথা, বাবার কথা মনে পড়ছিল বনলতার। বিশু রাণাঘাটের কাছে পোলট্রি করেছে, হাঁস মুরগী নিয়ে মেতে থাকে। বলল একদিন নিয়ে যাবে। কিন্তু কোনো-দিনই বোধহয় সেই নিয়ে যাওয়াটা আর হবে না বিশুর। বাবার স্ট্রোক হয়েছিল। বনলতার বিয়ের কয়েকদিন পরেই। ওইরকম সুন্দর স্বাস্থ্য বাবার, আর ওইরকম স্থির শক্ত লোক। বনলতা শুনেছে সে পালিয়ে আসার পরদিনও বাবা অফিসে গেছে। বাইরে একটুও চঞ্চল দেখায় নি তাকে। কিন্তু তার কয়েকদিন পরেই তার স্ট্রোক হয়। হয়তো এই বয়সে শোক-দুঃখ চেপে রাখতে নেই। রাখা যায়ও না। কিন্তু বাবার সঙ্গে কোনো মিটমাটই আর হবে না কোনোদিন।

বনলতা জানে বাবা কেমন। মরে গেলেও দুর্বল হয় না লোকটা। কিন্তু বনলতা মনে মনে মরে যাচ্ছে বাবার জন্য। এক একবার ইচ্ছে হয় পালিয়ে গিয়ে বাবাকে দেখে আসে, কিংবা টেলিফোন করে গলার স্বর একবার শুনে নেয়। কিন্তু সাহস হয় না। ভালবাসা—হায় এক সন্দেহজনক ভালবাসার জন্য তার সর্বস্ব চলে গেছে। বাবা ছিল একরকমের সঙ্গী, জগন্নাথ আর একরকমের। বাবা কথা বলত কম, কিন্তু হাবে ভাবে ফুটে উঠত মায়া, কোমলতা। কাছে গিয়ে বসলে বরাবর মনে হয়েছে যেন সে এক বিশাল গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। রুটিন বাঁধা চলাফেরা বাবার, কখনো বেচাল হয় না। পুরুষমানুষ কেমন হয় তা সে বাবাকে দেখে-চিনেছে। জগন্নাথ অন্যরকমের সঙ্গী। কিন্তু তবু বনলতার মনে হয় বাবার মতো কিছু কিছু গুণ জগন্নাথের থাকলে বড় ভাল হত। কখনো জগন্নাথকে তার নিজের চেয়ে বড়, শ্রেষ্ঠ বা উচ্চতর কিছু বলে মনে হয় না। বরং মনে হয় জগন্নাথ তার সমান সমান। এই সমান হওয়ার ভাবটা বনলতার কখনো ভাল লাগে না। কোনো মেয়ের লাগে কিনা কে জানে?

দুপুরে রান্নাঘরে বসে একা একা ভাত খাচ্ছিল বনলতা। সকালের রাঁধা ভাত, জগন্নাথ খেয়ে গেছে, সেই ভাত সারাদিনে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। গলা দিয়ে নামছিল না। কয়েক গ্রাস খেয়ে থালা সরিয়ে রাখল। শুধু শুধু মাছ খেল একটু। ভাল লাগল না! কাঁচা লঙ্কায় কামড় দিল, নুন মুখে দিয়ে শিষ্ তুলতে লাগল। বেলা গড়িয়ে গেছে অনেক। বোধহয় দেড়টা। এত বেলায় সে কোনোদিন খায় না। কোনোদিন জলটাও গড়িয়ে খায়নি বনলতা, আর এখন রান্না করতে হয়, জগন্নাথকে ভাত বেড়ে দিতে হয়। নিজে বেড়ে খেতে তার ভাল লাগে না। একা একা দুপুরে ভাতের থালার

সামনে বসে তার রোজ কান্না আসে। নুন মুখে দিয়ে লঙ্কা কামড়ে সে উদাসভাবে দেখল বাদামী রঙের বেড়ালটা তার মাছের বাকী অংশে মুখ দিয়েছে। থালার কানায় হাত চেঁচে নিয়ে সে চুপ করে তাকিয়ে রইল। দেয়ালে টিকটিকি ঘুরছে, মিটসেফের তলা থেকে একটা ইঁদুর দৌড়ে বেরিয়ে উনুনের পিছনে চলে গেল। শূন্য মনে চেয়ে রইল বনলতা। বেড়ালটা সমস্ত শরীরে ঢেউ তুলে মাছ খেতে খেতে তার দিকে চেয়ে দেখল। বনলতা হেসে বলল—খা। তারপর এলোচুল মুঠোয় ধরে উঠে পড়ল।

আঁচিয়ে ঘরে এসে রেডিও খুলল সে। কীর্তন হচ্ছে! বন্ধ করে দিল। ওপরের ফ্ল্যাটে কচি একটা বৌ থাকে। খুব পান খায় বৌটা। ঘরে পান নেই। ইচ্ছে হচ্ছিল একটা পান খেয়ে আসতে। একটু গল্পও করে আসা যেত। কয়েকদিন এরকম ভাবেই আলাপ হয়েছে বৌটার সঙ্গে। বিধবা শাশুড়ির শাসনে থাকে, কাজ করে, ডবলু বি সি এস স্বামীর জন্য গর্বে বুক ফুলে থাকে তার। বনলতার ভালই লাগে।

দরজা খুলে সিঁড়ির গোড়ায় এসে বনলতা ডাকল—অনিমা, ও অনিমা। সাড়া পাওয়া গেল না। হয়তো খাওয়ার পর দুপুরের ঘুমে ঢলে আছে। তাই আর ডাকল না বনলতা। আবার ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। শরৎকাল শেষ হয়ে এসেছে। বাতাসে শীতের আমেজ! মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে একটা বালিশ টেনে শুয়ে পড়ল বনলতা। নানারকম হিজিবিজি চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল তার মাথা। মাঝে মাঝে কৌশিক ব্যানার্জির মুখটা তার মনে পড়ে। কিছুদিন আগে কাগজে কৌশিকের ছবি বেরিয়েছিল—বিলেত-যাত্রী কৌশিক। বাবার খুব পছন্দ ছিল কৌশিককে। জাতে, গোত্রে, কোষ্ঠীতে মিল, তাছাড়াও ছেলেদের ঘর উঁচু, বাবার বিচারে এইগুলোই বড়। বাবা নিজে আজো ব্রাহ্মণের মতোই আচার আচরণ মেনে চলেন। তাঁর পৈতা কখনো ময়লা হয় না। বনলতা সব রকম আচার আচরণই শিখেছিল। কাজে লাগল না। ব্রাহ্মণের ঘর থেকে সে এসেছে বোসের ঘরে। জগন্নাথ বসু তার স্বামী—এটা ভাবতে তার ভাল লাগে না। ছেলেবেলার কী একটা সংস্কারে যেন ঘা লাগে। এ বিয়েকে বলে প্রতিলোম। সে জানে জগন্নাথ এসব বোঝে না। সে গোঁড়া অবিশ্বাসী। তবু তার বাড়িতেও এই বিয়ে নিয়ে হৈ চৈ হয়েছে। বামুনের মেয়েকে ছেলের বৌ হিসেবে ঘরে তোলেননি জগন্নাথের বাবা মা! তাই তারা আলাদা হয়ে রইল। হয়তো বরাবর এরকমই থাকতে হবে।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল বনলতা। ঘুম ভেঙে দেখল বেলা ফুরিয়ে এসেছে। কড়া নেড়ে ঝি ডাকছে। উঠে দরজা খুলে দিল সে। তারপর শাড়ি গুছিয়ে এলো চুল খোঁপায় বেঁধে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। শহরতলীর নির্জন রাস্তা-ঘাট, ফাঁকা জমি পড়ে রয়েছে অনেক। রাস্তার ওপাশে ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে। দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে ছিল। খেয়াল করেনি বড় রাস্তা থেকে নেমে সোজা তার দিকেই হেঁটে আসছে একটি মেয়ে। কাছাকাছি এসে মেয়েটি ছোট্ট একটু কাগজে লেখা ঠিকানার সঙ্গে বাড়ির নম্বর মেলাতে তাকে জিজ্ঞেস করল—জগন্নাথ বোস কি এখানে থাকেন? মাথা নাড়ল বনলতা—এই বাড়িই। মেয়েটি হাসল—উনি বাড়িতে নেই, না? বনলতা কথা না বলে আবার মাথা নাড়ে—না। মেয়েটিকে বেশ দেখতে। কালোর ওপর ছিপছিপে শরীর। লম্বাটে মুখ, টানা সুন্দর চোখ, হয়তো ওর বোন

চেনা কেউ হবে। বনলতা এবার জিজ্ঞেস করল—আপনি কোথা থেকে আসছেন ?

—অনেক দূর। সেই শিবপুর থেকে। আপনি বনলতা, না ?

—হ্যাঁ। হাসল বনলতা, আপনি কে ?

—আমি নীতা গুহ, বলে একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার কথা আপনার মনে না থাকারই কথা। আমাকে আপনি দেখেননি।

বনলতা মনে মনে চমকে উঠলেও বাইরে স্থির ছিল। মেয়েটাকে যথেষ্ট ক্লান্ত দেখাচ্ছে। বাসে ট্রামে এসেছে নিশ্চয়ই। দু'তিনবার বদল করে আসতে হয়েছে বোধ হয়! তবু এত কষ্ট করে কেন এসেছে মেয়েটা কে জানে! নীতাকে দেখে তার মনের ভিতরটা কিন্তু শক্ত হয় না। সামান্য হিংসের ভাবও এল না মনে। সে হেসে বলল—আপনার কথা শুনেছি ওঁর কাছে। আসুন ভাই, ভিতরে আসুন।

তার এ কথায় মেয়েটির মুখ আলোময় হয়ে গেল। যেন আশা করেনি এত ভাল ব্যবহার পাবে। বনলতার পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল—আপনি সত্যিই ভীষণ সুন্দর!

—খুব ভীষণ ? হাসল বনলতা।

—খুব। যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশী।

মেয়েটিকে চৌকীর ওপর বিছানায় বসিয়ে মেঝের মাদুর-টাদুর তুলল বনলতা, বলল—নতুন সংসার তাই একটু অগোছালো।

মেয়েটির চোখ আঠার মতো আটকে আছে তার মুখে। বসবার ভঙ্গীর মধ্যে জড়োসড়ো একটা ভয়ের ভাব, মুখে একটু অপ্রতিভ হাসির আভাস। বনলতা লক্ষ্য করে মনে মনে হাসল। কে জানে হয়তো নিজের সঙ্গে বনলতাকে মিলিয়ে দেখতে এসেছে মেয়েটা। তার মনে পড়ল আজকে একটু আগেই সে মেয়েটার কথাই ভাবছিল। চিঠি পড়ে মেয়েটাকে যেমন নির্লজ্জ বেহায়া উগ্র স্বভাবের বলে মনে হয়েছিল, মুখোমুখি একেবারেই সেরকম মনে হল না। বরং লাজুক ভীরু, শান্ত স্বভাবের সাধারণ একটি মেয়ে। একটা মানুষ সম্বন্ধে আর একটা মানুষ কত সময়েই কত ভুল ধারণা করে রাখে।

ঝিকে চায়ের জল চড়াতে বলে বনলতা মেয়েটির মুখোমুখি একটা মোড়া টেনে বসল, বলল—বলুন ভাই, আপনার কথা, একটু শুনি।

বাচ্চা মেয়ের মতো লজ্জার হাসি হাসল মেয়েটি। কাঁধ থেকে স্ট্রাপে ঝোলানো ভ্যানিটি ব্যাগটা নামিয়ে রাখল বিছানায়, তারপর একটু ইতস্তত করে ব্যাগটা খুলে একটা রুপোর গয়না বের করল। খোঁপায় গোঁজার কাঁটা, তাতে সুন্দর বড় একটা মিনে করা প্রজাপতি, হেসে বলল—আপনার জন্য এনেছি।

—ও মা! কেন ?

আবার লাজুক হাসি—কিছু একটু দিতে ইচ্ছে করছিল। গত কাল নিউমার্কেটে ঘুরে ঘুরে এটা কিনে আনলাম।

মনে মনে খুশী হল বনলতা—কেন কষ্ট করতে গেলেন ভাই!

—বাঃ, জিনিসটা খুব সুন্দর—আমি আপনার চুল বেঁধে পরিয়ে দিয়ে যাব।

—বেশ। আগে চা-টা খেয়ে নিন।

BoiRboi.net

মেয়েটি নীরবে ঘাড় নাড়ল। মুখে সেই লাজুক হাসিটি লেগে আছে। কিন্তু একটু উৎসাহ পেলে বোধহয় অনেক কথা বলতে পারে। বনলতার মধ্যে আপনা থেকেই একটা দিদি দিদি ভাব এল। বয়স অল্পই বোধ হয়, আঠার-উনিশ। মুখে চোখে এখনো সংসারের ছাপ পড়েনি। চোখ দেখে মনে হয় ঐ চোখে এখনো স্বপ্নের বাসা। বনলতা তার নিজের বুকে একটু দুঃখের ব্যথা টের পেল। আড়াল থেকে সে বড় নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতা করেছে মেয়েটির সঙ্গে। এখন মুখোমুখি তার মায়া হচ্ছে। ইচ্ছে করছে ওর থেকে কেড়ে নেওয়া জিনিস আবার ওকে ফিরিয়ে দেয়।

ঘরের চারিদিকে ডাগর চোখে চেয়ে দেখল নীতা। চাউনিতে পিপাসা ধরা পড়ে। বলল—কী সাজিয়েছেন সব। অথচ বলছিলেন সব অগোছালো।

—এখনো তো সাজান হয় নি।

নীতা প্রতিবাদ না ক'রে মিষ্টি হাসল, বলল—আমাদের বাড়ীতে এত সব জিনিস নেই।

বনলতা বুঝল সে যেটাকে অগোছালো বলছে সেটা অন্য অবস্থার মানুষের কাছে অগোছালো মনে নাও হতে পারে। বিয়ের পর জগন্নাথ টুক-টাক করে অনেক জিনিস এনেছে। আয়না বসানো লোহার আলমারি, সোফা কাম বেড, কিস্তিতে কেনা ফ্রিজ-ডেয়ার, ঘর সাজানোর জন্য প্ল্যাস্টারের তৈরী কয়েকটা ছবি, জানলা দরজায় হাল ফ্যাসানের কাঠের ফ্রেমে পর্দা। এত সব অনেকের ঘরেই থাকে না। বোধহয় বনলতা বড় ঘরের মেয়ে বলেই তাকে খুশী করার জন্য প্রাণপাত করে এত সব করেছে জগন্নাথ। যা ব'লে তাই এনে দেয়। বনলতার বাড়িতে এর চেয়ে ঢের বেশী জিনিস ছিল। তাই এত সব তার চোখেও পড়ে না। কিন্তু আজ এখন নীতা বলাতে তার চোখে পড়ল সত্যিই, কিছু কম সাজানো হয়নি। সে চোখ সরিয়ে নীতাকে আবার দেখল। যথাসাধ্য সেজেছে নীতা, তবু স্পষ্ট বোঝা যায় ও গরীবের সংসার থেকে এসেছে। দু'খানা হাতে সংসারের নানা কাজের ছাপ। বনলতার মনে হল জগন্নাথকে বিয়ে করে সে উঁচু থেকে কয়েক ধাপ নিচে নেমে এসেছে। কিন্তু নীতা যদি পারত জগন্নাথকে বিয়ে করতে তবে নীতা বরং কয়েক ধাপ উঁচুতে উঠে আসতে পারতো। সেইটেই সুন্দর হত। ভাল হত।

ঝি এসে বলল—চায়ের জল হয়ে গেছে দিদিমণি।

বনলতা নীতাকে বলল—আসছি ভাই চা-টা নিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল নীতা—আপনি একা যাবেন কেন। চলুন আমিও যাচ্ছি।

হাসল বনলতা—আসবে? এসো। বলেই জিব্ কাটল—এ মা তুমি বলে ফেললাম।

—বেশ করেছেন। আপনি দিদি না?

—তাই বুঝি! মনে মনে খুশী হল বনলতা। তার মনে দিদি ভাব এসে গিয়েছিল, চালাক মেয়েটি সেটা বুঝে গেছে।

রান্নাঘরে এসে নীতা বলল—চা-টা আমিই করি।

—করো। বলে বনলতা চা চিনি দুধ গুলিয়ে দিয়ে বলল—সাগুর পাপড় আছে খাবে?

boiRboi.net

—খেতে ইচ্ছে করছে না।

—একটু খাও। ভাল ঘিয়ে ভেজে দেবো।

মুখোমুখি বসে বনলতা দেখছিল কত নিপুণ হাতে মেয়েটি চা করল। বনলতা নিজেই কড়াইতে ঘি ঢেলে পাঁপড় ভাজতে যাচ্ছিল, মেয়েটি তার হাত থেকে খুন্তি কেড়ে নিয়ে নিজেই ভাজল। বলল—আপনার যে রান্নাবান্নার অভ্যেস নেই তা আমি জানি। আমাকে বাড়িতে সব কাজ করতে হয়।

—আমার অভ্যাস নেই কি করে বুঝলে?

—আপনি যা সুন্দর!

—কাজ না করলেই বুঝি সুন্দর হয়!

—তা নয়। মেয়েটি বিপদে পড়ে বাধো বাধো গলায় বলল—আপনাকে কাজকর্মে মানায় না। এত সুন্দর মানুষ কাজ করবে কেন?

বনলতা খুব হাসল। অনেক দিন পর তার মনটা হাল্কা লাগছে আজ। বলল—দাঁড়াও, জগন্নাথকে সব বলে দেবো আজ।

মেয়েটি এক পলকে থমকে গিয়ে বলল— আপনি ওঁকে নাম ধরে বলেন?

বনলতা দেখল জগন্নাথের নামে মেয়েটির চোখে শ্রদ্ধার ভাব। এ মেয়ে বিয়ে না হলেও জীবনে জগন্নাথকে বোধ হয় নাম ধরে বলবে না। বনলতা বলল—পতির নামে গতি হয়। জানো না? আমি সামনা সামনি ওকে জগন্নাথ বলি! যা বিচ্ছিরি নাম…

নীতা মাথা নিচু করে হাসল। বনলতা লক্ষ্য করে ওর শ্যামলা রঙের মুখমণ্ডলে রঙ এসে ভীড় করল। হাতের চায়ের কাপ চলকে গেল! আহা রে! মনে মনে বলল বনলতা।

চায়ের পর তার চুল নিয়ে পড়ল নীতা। চুলের গোছ হাতে ধরেই বলল—ইস, ভগবান আপনাকে সব দিক দিয়ে দিয়েছেন। অনেক সুন্দর মেয়েরই চুল থাকে না, আপনার তাও আছে অঢেল।

—নজর দিও না ভাই। বনলতা মুখটিপে হাসল।

—আমার চোখে বিষ নেই। সুন্দর দেখলে আমার বড় ভাল লাগে।

বনলতা সে প্রসঙ্গে না গিয়ে বলল—ভগবান আমাকে আর কি কি দিয়েছেন বল তো!

একটু চুপ করে থেকে নীতা বলল—সবই তো দিয়েছেন! যেমন চেয়েছিলেন।

—যেমন চেয়েছিলাম? গলাটা হঠাৎ থমথমে হয়ে আসছিল। হেসে সামলে নিল বনলতা।

একটু চুপ করে থেকে বনলতা বলল—জানো তো, অতি বড় সুন্দরী না পায়………

নীতা আকুল হয়ে বলল—যাঃ। আপনি ঐ শ্লোকটা বলবেন না। আপনাকে মানায় না।

—ইস, নীতা, তুমি যে কোনোখানেই আমাকে মানাতে পারছ না!

নীতার মুখ পিছনে। বনলতা দেখতে পাচ্ছে না। শুধু অনুভব করছে তার চুলের গোড়ায় একটুও ব্যথা না দিয়ে চমৎকার চুল বাঁধছে নীতা। বেশ একটুক্ষণ

boiboi.net

চুপ করে থেকে নীতা বলল—আপনি তো বর পেয়েছেন।

বনলতা চুপ করে রইল। একবার ইচ্ছে হচ্ছিল মাথা ঘুরিয়ে নীতার মুখখানা দেখে। কিন্তু ওর গলার স্বর একটু কেমন শোনালো যেন। হয়তো ওর চোখে তখন জল। তাই বনলতা মুখ ঘোরাল না। নীতা যদি আড়ালে একটু কাঁদে, তবে কাঁদুক। বনলতা চুপ করে রইল।

চুল বেঁধে সেই প্রজাপতি কাঁটাখানা গুঁজে দিয়ে নীতা বলল—ব্যাস এবার আপনি সিঁদুর পরুন।

—তুমিই পরিয়ে দাও।

—যাঃ কুমারী মেয়েরা পরায় না।

বনলতা হাসল।

আয়নার সামনে বসে সিঁদুর পরছিল বনলতা। হঠাৎ নিজের সুন্দর প্রতিবিম্বের পিছনে নীতার মুখখানা চোখে পড়ল। মগ্ন হয়ে চেয়ে আছে। খেয়ালই নেই যে আয়নায় ওর মুখ বনলতার চোখে পড়তে পারে। হাসি সামলে চোখ সরিয়ে নিল বনলতা। ভেবে দেখল—কত সুন্দর হত যদি আজ এ সময়ে এইখানে বসে একা একা নীতা এই সিঁদুর পরত! বনলতা অভ্যাসবশতঃ সিঁদুর পরে, দায় সেরে যায় মাত্র। কিন্তু নীতা হলে কত অহংকার আর যত্ন নিয়ে পরত! কত ভালবাসায়, মায়ায়, বিশ্বাসে! বনলতারই দোষ। সে জোর করে নীতার ঘরে ঢুকে বসে আছে। এ দখল করা মাত্র, পাওয়া তো নয়! কিন্তু নীতা হলে হায়! নীতা হলে—

ইচ্ছে করে নীতাকে ডেকে বলে—এসো তোমাকে বৌ সাজিয়ে দিই। খুব সেজেগুজে বৌ হয়ে বসে থাকো। এ ঘর সংসার তোমাকেই মানায়, যেহেতু ভালোবাসো। এসো, তোমাকে সাজিয়ে দিয়ে আমি বেরিয়ে পড়ি। জগন্নাথ তোমাকে দেখে চমকে যাবে, হয়তো গোলমাল করবে, তারপর আস্তে আস্তে বুঝবে তুমিই ওর ঠিক বৌ... এসো, নীতা

নীতা বলল—ইস্ কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে!

হাসল বনলতা—তোমার হাতের গুণ। যা সুন্দর খোঁপা বেঁধেছো।

—সেটাও আবার চুলের গুণ। নীতা লাজুক মুখে বলল। তারপর ঘড়ি দেখে উঠবার উপক্রম করে বলল—এবার কিন্তু আমাকে যেতে হবে।

—ওমা! ওর সঙ্গে দেখা করে যাবে না। ও তো একটু পরেই আসবে। এতক্ষণে এসে পড়বারই তো কথা! কেন যে দেরী করছে।

নীতা মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে বলল—আজ শুক্রবার, ওঁর বোধহয় আজ নাইট শিফ্‌টে ক্লাস আছে!

—ঠিক তো। বনলতা হাসে—আমি ভাই ওসব রুটিনটুটিন রাখতে পারি না। তুমি আর একটু বোসো না। এসে যাবে।

নীতা মৃদু গলায় বলে—আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলুম, উনি থাকলে আপনার সঙ্গে এমন ভালভাবে দেখা করতেই পারতুম না। তা ছাড়া, অনেক দূরে যাব। আজ আসি।

—যাবে?

boiRboi.net

—হুঁ।

—যাবে কেন? থাকো না। বলেই আত্মবিস্মৃত বনলতা হঠাৎ চমকে উঠল। সামলে নিয়ে বলল—আমি যে একা থাকবো!

ও'র ফিরতে অনেক দেরী হবে। বোধহয় সোয়া আটটায় ক্লাশ শেষ হবে। ততক্ষণ থাকতে গেলে..

বনলতা হাসল। বলতে পারল না যে জগন্নাথ ফিরে এলেও সে একাই থাকবে। একটা অন্যরকমের একাকীত্ব। নীতা এটা বুঝবে না। এটা খুবই স্পষ্ট যে নীতা জগন্নাথকে পাগলের মতো ভালবাসে। এই ঘরে, সংসারে নীতা কখনো কোনদিনই একা বোধ করত না। নীতা কী করে বুঝবে বনলতা কেন একা!

—আচ্ছা ভাই, এসো। আবার আসতে হবে কিন্তু!

—আসবো। বলে কাঁধের ব্যাগ তুলে নিল নীতা।

সদর পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিল বনলতা। সামনে খোলা জমি, তারপরে বড় রাস্তা। মৃদু কুয়াশা আর অন্ধকারে ঢাকা। নীতা পিছনে মুখ ফিরিয়ে হাসল, তারপর সেই রহস্যময় আলো আঁধারির মধ্যে তার আবছা ছায়া মিলিয়ে গেল।

বনলতা দরজা বন্ধ করে শূন্য ঘরটার দিকে চেয়ে দেখল। এ যেন তার নিজের ঘর নয় অন্য কার ঘরে ঢুকে সে বসে আছে।

আট

অরিজিতের বাড়িটা জগন্নাথ ভুলেই গেছে। আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়ে উত্তরমুখো গেলে বাঁ হাতে একটা গলির মধ্যে অরিজিতের বাড়িটা। সেখানে একটা সময়ে জগন্নাথ অনেকবার গেছে। তখনো অরিজিৎ বাউণ্ডুলে হয়ে যায় নি, তখনো তাকে ডাকেনি প্রবাস। সেটা প্রায় ছেলেবেলাই বলা যায়। কৈশোর যৌবনের সন্ধিসময়। আজকের বাঁধা বাউণ্ডুলে অরিজিৎকে দেখে সেই কিশোর যুবাকে কল্পনা করা কঠিন। দুটি কল্পনাময় চোখ ছিল তার। কবিতা লিখত, নরম নরম হাত পা, লাজুক মুখভাব। বড্ড ঘরকুনো আর মায়ের আঁচলধরা ছেলে! সে কখনো মোহনবাগানের খেলা, কাবুলিদের নাচ কিংবা দমকলের দুর্গাপুজো দেখতে যায় নি। অরিজিৎদের বাড়ির ভিতরের বারান্দায় ছিল পাখীর খাঁচা সারি সারি, ছিল রঙীন মাছের কাচ-বাক্স, ব্যাগাটেল, ক্যারম, গল্পের বই। অরিজিৎ ঘরেই থাকত। কলেজে পড়তে পড়তেই সে একটা বাজে মেয়ের প্রেমে পড়ে। কলেজের একটা ছেলে-মানুষী একজিবিশন, তাতে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রদর্শনীতে সেই মেয়েটি ভ্যানিশিং ক্রিম তৈরী করে দেখিয়েছিল। স্মার্ট মেয়ে, মুখচোখও ভাল, কিন্তু দুঃখের বিষয় মেয়েটিও তার নিজের বিষয়ে জানত। অরিজিৎ প্রদর্শনীর চারদিনই সেই ভ্যানিশিং দেখতে গিয়েছিল। তারপর প্রায় পাগল হয়ে গেল মেয়েটির জন্য। সকালে মেয়েদের কলেজ, দুপুরে ছেলেদের। অরিজিৎ সকালের কলেজে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকত, দুপুরের ক্লাশ ফাঁকি দিত। এইটুকু জানত জগন্নাথ। তারপর কী হয়েছিল তা শোনা কথা। তবে, খুবই সাধারণ ব্যাপার। মেয়েটার অন্য মানুষ ছিল, অরিজিৎকে দুচার দিন

নাচিয়ে ওর পয়সায় সিনেমা দেখে, রেস্তোরাঁয় খেয়ে ওকে ছেড়ে দেয়। অরিজিৎ অনেক-দিন ঠিক যেন বিশ্বাসই করতে পারেনি যে মেয়েটা ওকে ঠকিয়েছে। কুনো ছেলে বাইরের ঘা খেলে প্রথমটায় যা হয়। কলেজের শেষ ক্লাশটায় উঠে অরিজিৎ তীব্র বিষাদ রোগে আক্রান্ত হয়। কিছুদিন মেণ্টাল হোম্-এ ছিল। তারপর যখন বেরিয়ে এল তখন সে এক উদাসী মানুষ। কথা কম, চিন্তা বেশী। ওর মা মারা যাওয়ার পর একা হল অরিজিৎ, বাধাবন্ধনের দিক থেকে স্বাধীন। জগন্নাথ যে-বার এম-এ পাশ করেছে তিন চারটে টিউশানী সম্বল করে, সেবারই অরিজিৎ তার দোতলায় তালা ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ে। নিরুদ্দেশ যাত্রা নয়, সবাইকে জানিয়েই গিয়েছিল। মাস দুই ঘুরে ফিরে এল। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারল যথারীতি, সিনেমা-টিনেমাও দেখল। বলল—ট্রেনে বা বাসে ঘুরে লাভ নেই, ঘুরতে হয় তো পায়দল। এবার পায়ে হেঁটে বেরোচ্ছি, এনিবডি উইশ টু অ্যাকম্পানী ? কেউ রাজী হয়নি। জগন্নাথের তখন জীবন সংগ্রামের শেষ পর্যায়। দারিদ্র্যের তলা থেকে সদ্য-এম-এতে ফার্স্ট ক্লাশ পাওয়ার সৌভাগ্যের চড়ায় উঠেছে। আর নয়। এবার চাকরি, ভাল থাকা, দুবেলা পেটভরে খাওয়া। প্রথমে একটা স্কুলে, তিনমাস পর মফঃস্বল কলেজে, তার একবছর বাদে কলকাতার বড় কলেজে চলে এল জগন্নাথ। ততদিনে অরিজিৎ উত্তর দক্ষিণ পশ্চিম সব ভারতবর্ষ চষে ফেলেছে পায়ে হেঁটে। মাঝে মাঝে আসত, বলত তার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা। আবার একদিন বিদায় নিয়ে চলে যেত। প্রথমটায় হয় তো ঝোঁকের বশেই বেরিয়েছিল অরিজিৎ, কিন্তু পরে সেটাই তার পেশা হয়ে দাঁড়ায়, ক্রমে সেটা নেশার স্তর ছেড়ে অস্তিত্বের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। জগন্নাথ ততদিনে কয়েকটা ইনক্রিমেণ্ট, একটা পার্টটাইম লেকচারারশিপ, স্কুলফাইন্যালের হেড এগজামিনার হয়ে কিছু পয়সা করেছে। বনলতার সঙ্গে প্রেম সেরে একদা দুঃসাহস ভরে বনলতার ডাকসাইটে বাবার অমতে তাকে রেজিস্ট্রী করেছে। আলাদা বাসায় সংসার পেতেছে। আর তখন অরিজিৎ হয়তো বা হিমালয়ের গভীর খাঁজে পিঁপড়ের মতো বুকে হেঁটে চলেছে, চতুর্দিকে নির্জন তুষারপাত, সানুদেশে নদীর জন্ম, আকাশে দুর্যোগ।

সকলেরই বয়স হয়। অরিজিতের কি হয়নি ? তবু অরিজিৎ শিকড় ছাড়েনি এতদিন। এবারই জগন্নাথ দেখল অরিজিতের মেকআপ ধুয়ে গেছে, ছদ্মবেশের জীর্ণ ফাঁক ফোঁকর দিয়ে দেখা যাচ্ছে বুড়োটে ক্লান্ত মানুষটাকে। বড় কষ্ট হয় জগন্নাথের। সেদিন ওভাবে অরিজিৎকে না বললেও চলত।

কলেজ থেকে বেরিয়ে বাস ধরে শ্রীমানি বাজারের কাছে নেমে অনেকটা হেঁটে আমহার্স্ট স্ট্রীট। দু'চার বার গলি ভুল করে জগন্নাথ অবশেষে বাড়িটা খুঁজে পেল। নীচে থেকেই দেখল এতকালের অন্ধকারে পড়ে থাকা দোতলাটায় আলো জ্বলছে। অরিজিৎ আছে। জগন্নাথ সিঁড়ি বেয়ে ক্লান্ত পায়ে উঠতে লাগল।

সাড়া পেয়ে অরিজিৎ বেরিয়ে এল। এখন একটু হিমভাব বাতাসে, তবু ওর আদুর গা। সেই গায়ের চামড়া গজদন্তের মতো হলদেটে সাদা। মুখ আর হাতের রঙ তামাটে। রোদে জলে ঐ হয়েছে। প্রথমে একটু থমকে গিয়েছিল জগন্নাথকে দেখে, তারপর একটু হাসল।

জগন্নাথের বড্ড লজ্জা করছিল। বস্তুতঃ সে খুঁজে খুঁজে অরিজিতের কাছে

আজ কেন এসেছে তা ভেবে পাচ্ছিল না। একটু বিস্মিত গলায় বলল—তোর কাছে এলাম।

—আয়।

ঘরে ঢুকে জগন্নাথ দেখল, সেই পুরোন আমলের আসবাবে বোঝাই ঘরগুলো প্রায় তেমনই আছে। ছ কোণা কাঠের টেবিল, তার সর্বাঙ্গে খোদাইয়ের কাজ, দু'মানুষ সমান উঁচু বার্মা সেগুনের আলমারি, বেলজিয়াম আয়না লাগানো, আবলুশ কাঠের লেখার টেবিল, চেস্ট অব ড্রয়ার্স, হ্যাট্ স্ট্যান্ড—এসব আসবাব আজকাল আর দেখা যায় না। বিশাল মাঠের মতো বড় পালঙ্ক, হাতীর পায়ের মতো মোটা পায়াওলা। মেঝেয় বরফি কাটা পুরনো আমলের মোজেক, নতুন দুচারটে জিনিসের মধ্যে ঘরে টিউবলাইট এসেছে, একটা রেডিওগ্রাম, বুক কেস, বিছানায় একটা হাল আমলের বাটিকের কাজ করা বেডকভার। দেখেশুনে মনে হয় এবার বোধ হয় অরিজিৎ স্থিতু হবে।

রেডিওগ্রামে একটা রেকর্ড চাপানো ছিল। গান শেষ হয়ে খ্যাস্ খ্যাস্ শব্দ করছে, সেটা বন্ধ করল অরিজিৎ! প্রকাণ্ড একটা গদীওলা চেয়ারে বসে জগন্নাথ ক্লান্তিটাকে টের পেল। এ ঠিক শরীরের ক্লান্তি নয়। একটা মানুষ সব দিক থেকে ভেঙ্গে পড়লে যেমন হয় ঠিক তেমন ক্লান্তি। সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়ার মতো। জগন্নাথ চোখ বুজে বলল—তোর ঘরের বড় আলোটা নিভিয়ে দে, একটা ছোট্ট আলো জ্বাল।

অরিজিৎ টিউবলাইট নিভিয়ে টেবিল বাতিটা জ্বালল। কোনো প্রশ্ন করল না। তার আত্মীয়-হয়ে-যাওয়া চাকর সিধুকে ডেকে চায়ের কথা বলে দিল। তারপর মুখোমুখী আর একটা চেয়ারে বসে রইল।

জগন্নাথ চোখ সামান্য খুলে দেখে, অরিজিৎ তার দিকে চেয়ে আছে। কলকাতার মানুষেরা এখন আর কেউ কারো প্রতি তেমন কৌতূহল বোধ করে না, মানুষে মানুষে সম্পর্কের পচনশীলতা তাদের কৌতূহল ক্ষয় করে দিয়েছে। কিন্তু অরিজিতের চোখে এখনো সজীব উদ্ভিদের মতো, জীবনীশক্তির মতো এক আগ্রহ রয়ে গেছে। মানুষ সম্পর্কে এখনো ওর ক্লান্তি আসেনি। জগন্নাথ বুঝতে পারে, অরিজিতের কাছে সে বোধ হয় এই জন্যই এসেছে।

জগন্নাথ সিগারেট ধরাল। সারাদিনেই সে আজকাল অজস্র সিগারেট খায়। যত খায় তত তার স্নায়ু উত্তেজিত হয়, শরীর ক্লান্ত হয়। তবু খায়। সিগারেট ছাড়া থাকতে পারে না। সিগারেটের কোনো স্বাদ গন্ধ এখন আর সে বোধ করে না। জগন্নাথ বলল—অরিজিৎ, তুই আমার ওপর রাগ করিসনি তো?

—রাগ! রাগ করব কেন?

—সেদিন তোকে আমি যা তা বলেছি।

অরিজিৎ ব্যাপারটা উড়িয়ে দেয়—দূর পাগল! তুই কিছু খারাপ বলিসনি। আমার ভবঘুরেমীটা এখন একটা ছদ্মবেশ মাত্র। আমিও কি তা বুঝি না?

জগন্নাথ দুঃখিতভাবে বলে—আমি কিছু ভেবে বলিনি রে! তোকে বরাবর হিংসে করতাম, সেই হিংসে আজও রয়ে গেছে। আমরা যখন ঘরদোর গোছাচ্ছি তখন তুই দুনিয়ার মেলায় সাচ্চা হাটুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিস—এটা ঠিক আমার সহ্য হয় নি। তাই কমপ্লেক্স্ থেকে তোকে সেদিন খামোখা কতগুলো কথা শুনিয়েছি।

boiRboi.net

অরিজিৎ খুব মৃদু একটু হাসল, বলল—তোর কথা তুই ভাল জানিস। কিন্তু আমার মনে হয়, বারমুখো থেকে আমার কিছু লাভ হয় নি। সারা ভারতবর্ষ কমসে কম দশবার ঘুরেছি, তিব্বত, চীন, বার্মা এমন কি একবার পাকিস্তান পেরিয়ে মিড্‌ল ইষ্ট পর্যন্ত গিয়েছিলাম, ইউরোপের দরজা থেকে ঘুরে এসেছি। কয়েক লক্ষ মানুষ দেখেছি, কিন্তু তাতে হলটা কী? সংসারের জ্ঞান আমার কিছুই বাড়েনি। এখনো আমি মানুষ হিসাবে অপরিণত, বোধবুদ্ধি নাবালকের, গুছিয়ে কথা বলতে পারি না, তাই ভাবছি, এবার আমি —সংসারের সবই তো দেখা দরকার, যেমন বাইরেটা, তেমনি ভিতরটা কী বলিস?

সুগভীর ক্লান্তিতে জগন্নাথ মাথাটা পিছনে হেলিয়ে চেয়ে রইল। বিস্বাদ সিগারেট, ঠোঁটটা জ্বালা করছে। চেয়ে রইল অরিজিতের দিকে। তারপর করুণ হেসে বলে—দেখতে ইচ্ছে হয় তো দেখিস, আমি তো দেখছিই,বড্ড মাথা ধরেছে, তোর সিধুকে একটু তাড়াতাড়ি চা দিতে বল্, আর যদি পারে তো পানের দোকান থেকে দুটো মাথা ধরার ট্যাবলেট—

—তোর কী হয়েছে? শরীর খারাপ?

—সব খারাপ, শরীর, মন, কপাল সব।

বাইরে ফিকে অন্ধকার, বাতাসে হিমভাব, অল্প একটু কুয়াশার আস্তরণ, জানালার বাইরে আলোজ্বলা কলকাতার আকাশ আবছা দেখাচ্ছে।

অরিজিৎ উঠে ভিতর বাড়িতে সিধুকে বলতে গেল। ফিরে এসে আবার বসল মুখোমুখী। তারপর মৃদু গলায় বলল—সেদিনের চেয়ে আজ তোকে রোগা লাগছে। এত অল্পদিনে মানুষের চেহারা পাল্টায় না, একটা কিছু হচ্ছে জগন্নাথ!

—হয়েছে। তিক্ত গলায় জগন্নাথ উত্তর দেয়।

—কী?

—অরিজিৎ, আমি বড্ড ভয় পাই রে!

—কিসের ভয়?

—স্পষ্ট কোনো ভয় নয়। সেদিন কতকগুলো ছেলে চাঁদা চাইতে এসেছিল। ইতর টাইপের ছেলে, পাড়ার মস্তান টস্তান হবে। খামোখা চোখ গরম করে কথা বলছিল। তাদের সঙ্গে ছোট্ট একটা টাস্‌ল্ হয়ে গেল। বড্ড নার্ভাস লাগছিল সেই থেকে। কেবলই মনে হচ্ছে, ভদ্রলোক হয়ে থাকার মধ্যে অনেক ট্র্যাবল্ আছে! চারদিকে কত অ্যান্টি ফোর্স, এত বিরুদ্ধ শক্তি যে এর মধ্যে ভদ্রলোক থাকা বড্ড মুস্কিল। ছেলে-গুলো আমাকে অপমান করে গেল, কিছু করতে পারলাম না, মনে হচ্ছে কিছু করা উচিত ছিল। সেই থেকে মনটা বড্ড চঞ্চল। তার ওপর বনলতা—

বলে কিছুক্ষণ উদাস চোখে চেয়ে থাকে জগন্নাথ।

অরিজিৎ অপেক্ষা করে।

জগন্নাথ শ্বাস ফেলে বলে—যাক গে, মোটকথা, মনটা ভাল নেই। ইচ্ছে করছিল কোথাও গিয়ে দুদণ্ড শান্তিতে বসে থাকি, তোর কাছে চলে এলাম।

অরিজিৎ সমবেদনার গলায় বলে—বোস না তোর যতক্ষণ খুশী। কে তোকে ওঠাচ্ছে? তোর বাসায় ফোন থাকলে একটা ফোন করে দে, তারপর এখানেই আজ

amarboi.net

রাতে থেকে যা। সারা রাত জেগে দু'জনে গল্প করব।

জগন্নাথ মাথা নাড়ল—না রে, তা হয় না। বনলতা একা থাকবে।

অরিজিৎ চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর বলল—জগন্নাথ, সংসার করার ঐ একটা অসুবিধে।

—কী?

—ঐ যে বললি বনলতা একা থাকবে! কে একা থাকবে সেই চিন্তায় আমি আর কোথাও থাকতে পারব না, সংসারের এইটেই সবচেয়ে বড় অসুবিধে।

—তুই সেদিক দিয়ে সুখী অরিজিৎ। তোর কারও ভাবনা নেই।

অরিজিৎ হাসল—সেটাও অসুবিধে, আমার জন্য কেউ ভাবছে না, অপেক্ষা করছে না। আমার কেউ নেই—এই চিন্তাও বড় অসহ্য। বুঝলি জগন্নাথ, সুখ আসলে কোথাও নেই, সুখের চিন্তায় একমাত্র সুখ আছে।

—আমার তাও নেই। আমার সুখের চিন্তাও শেষ হয়ে গেছে।

—কেন রে?

—আমার আর কিছু হয়ে ওঠার নেই। আমি যা হয়েছি সেই পর্যন্তই আমার লিমিট। তার ওপর বিয়েটা করে ফেলেছি, মেয়েদের নিয়ে সুখের সংসারের ছবি দেখা ফিনিশ্‌। আর কী বাকী থাকল বল!

—সমস্ত পৃথিবীটাই তো বাকী থাকল রে। পুরো জীবনটা।

—সে সব তোর ব্যাপার। গোটা পৃথিবী বা পুরো জীবন নিয়ে আমার আর ভাবনার কিছু নেই। আমি ফাঁদে পড়া মানুষ, বয়স হয়ে গেছে, সব ছেড়ে ছুড়ে বেরিয়েও পড়তে পারব না। আমার জীবনে একটাই মাত্র জানালা খোলা আছে। আর বই। কেবল বই আর বইয়ের মধ্যে ডুবে যাওয়া ছাড়া কিছু করার নেই।

—তোর কী হয়েছে জগন্নাথ?

জন্নাথ সে কথার উত্তর দিল না। অন্যমনে বলল—কদিন আগে কলেজে একটা উটকো লোক এসে হাজির। বনলতাদের বাড়িতে এককালে আশ্রিত ছিল, এখন রাণাঘাটে পোলাট্রি করেছে। আমার ধারণা, ছেলেটা বনলতাদের বাসায় চাকর বাকরের কাজ করত। অবশ্য এখন ভদ্রলোক হয়ে গেছে। সে এসে আমাকে বিস্তর উপদেশ দিল, একটু চোখও রাঙাল। বনলতাকে বিয়ে করেছি বলে বিস্তর লোক আমার ওপর চটা।

অরিজিৎ উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করে—কেন?

জগন্নাথ ম্লান হাসে—কী জানি, ঠিকঠাক সব বলতে পারব না। তবে শেষ পর্যন্ত আমার বিয়েটা বোধহয় টিকবে না রে অরিজিৎ।

—কী সব বলছিস! বিয়ে তো সদ্য করেছিস!

জগন্নাথ নিথর বসে থাকল। চোখ বোজা। অসীম ক্লান্তি।

boiRboi.net

সিধু লুচি আলুরদম করে এনেছে। চা আর মাথা ধরার বড়ি। খাবারটা জগন্নাথ ছুঁলও না। চা দিয়ে বাড়ি দুটো গিলে ফেলল। চাটুকু খেল নিঃশেষে তারপর। আবার সিগারেট।

অরিজিৎ তার আগ্রহী এবং স্নেহশীল চোখ দুটো মেলে চেয়ে আছে কেবল। জগন্নাথের সমস্যা সে কিছুই জানে না। তবু তার আগ্রহ এবং উদ্বেগ দুই-ই তার চোখে ফুটে আছে। মানুষ সম্পর্কে এখনও তার ক্লান্তি আসেনি।

জগন্নাথ কপালটা ডানহাতে টিপে ধরে বলল—আমার প্রবলেমের কথা বলে কোনো লাভ নেই। প্রতিটা লোক প্রতিদিন একে অন্যকে নিজের দুঃখের কথা শোনাতে থাকে। ব্যাপারটাকে আমি ঘেন্না করি অরিজিৎ। আমি তোর কাছে কিছু বলতে আসিনি। শুধু তোর ঠাণ্ডা ঘরটায় নিঃঝুম একটু বসে থাকব কিছুক্ষণ।

অরিজিৎ জগন্নাথের মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিল। বলল—বাতিটা নিভিয়ে দিই, তুই বসে থাক। যতক্ষণ খুশী।

—না না। তুই বোস। আমি তোকে দেখব। অরিজিৎ, তুই ঠিক সংসারের মানুষ নোস বলেই আমি তোর কাছে এসেছি। এখনো তুই বেশ ফ্রেশ আছিস। তোর শরীরে আর মনে এখনো প্রচুর ক্যালসিয়াম ভিটামিন ক্লোরোফিল। তাজা ডাঁটো একটা গাছের মতো আছিস এখনো। তোর কাছে এলে এখনো রোদ বাতাস আর গাছপালার গন্ধ পাওয়া যায়। তুই বসে থাক আমার সামনে। আমার মতো তোকে এখনো শহুরে রোগ ধরেনি।

অরিজিৎ প্রথমটায় অবাক হয়েছিল, পরে হেসে ফেলল—কী আবোল তাবোল বকছিস? ক্যালসিয়াম ক্লোরোফিল ওসব আবার কী?

জগন্নাথ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—তুই ঠিক বুঝবি না। ভাবি, আমি যদি গেঁয়ো চাষা হতাম তাহলে আমার এতসব ছেঁদো সমস্যা থাকতো না। থাকগে। তুই হয়তো কী না কী ভাবছিস! তার চেয়ে তোর কথা বল। এত ঘুরে টুরে এলি, এখন কী করবি?

অরিজিৎ মাথা নাড়ল—কী করব? কিছু করার নেই, চাকরির বয়স পার হয়ে গেছে, কিছুই যেমন শিখিনি চাকরি পাওয়ার মতো।

—চলে যাবে। খাওয়া পরার তেমন ভাবনা নেই, বুঝলি। বাড়ির নীচের তলায় ভাড়াটে আছে, ব্যাঙ্কে কিছু টাকা সুদে বেড়েছে, একা মানুষ, চলে যাবে।

—একা? একাই থাকবি?

—তারও কিছু ঠিক নেই। মাঝে মাঝে ভাবি, একাই ভাল! আবার কখনো কখনো একা থাকতে ভারী ভয়ও করে। বন্ধুবান্ধবরা সব সংসারী হয়ে গেছে, আড্ডা মেরে সময় কাটানোরও উপায় নেই।

—বিয়ে করবি?

—ভাবছি।

জগন্নাথ চুপ করে রইল। এসব আলগা কথা। কোনো মানে নেই।

অরিজিৎ মুখ নীচু করে নিজের নখ দেখতে দেখতে বলল—একজন প্রকাশক ধরেছে একটা ভ্রমণ কাহিনী লিখে দিতে।

বলে মুখ তুলে হাসল।

—কী লিখে দিতে?

—ভ্রমণ কাহিনী। এখন নাকি বাজারে প্রচুর ডিম্যাণ্ড। শহুরে লোকেরা ঘরে বসে মানস-ভ্রমণ করতে ভালবাসে। কিন্তু আমার তো লেখাটেখা আসে না,

boiRboi.net

তাই গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছি কদিন ধরে, তবু এ একটা নতুন রকমের খেলা। রাজ্যের ভ্রমণ কাহিনী কিনে এনেছি, কয়েকটা ডিকশনারী আর কাগজপত্র। সারাদিন লিখি আর কাটি। মনের মতো হয় না।

জগন্নাথ অনেকক্ষণ বাদে হাসল, বলল—দ্যাখ, যদি লাগাতে পারিস।

অরিজিৎ উদাস হয়ে বলে—দূর, সব কি লেখা যায়? একটা সূর্য ডোবার যে রঙ তার সব সৌন্দর্য কি লেখায় আসে? লিখতে গিয়ে তাই বড্ড দুর্বল লাগে। দেখেছি, অনুভব করেছি, আনন্দিত হয়েছি। সেটা আর পাঁচজনকে বোঝাই কী করে? কেবল সুন্দর মনোহর, অতীব চমকপ্রদ—এ আর কত লেখা যায়?

জগন্নাথ হাসতেই থাকে।

অরিজিৎ হাসিটায় সংক্রামিত হয়ে হেসে বলে—মানুষের ভাষা বড় লিমিটেড। জগন্নাথ, তুই আমাকে একটু আধটু লিখতে শেখাবি?

জগন্নাথ নিজের এলোমেলো লম্বা চুল মুঠো করে ধরে থেকে বলল—আমিও ভাষার কিছু জানি না। জানিস, সেদিন ঐ ছেলেগুলোকে খুব অপমান করার ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু কী বললে অপমান করা যাবে সেই ল্যাংগুয়েজটা খুঁজেই পেলাম না। আমার স্টক অব্ ওয়ার্ডস্ বড্ড কম, ভেবে দেখেছি।

একটু চুপ করে থেকে জগন্নাথ একটু গাঢ়স্বরে আপন মনে বলল—ভাষা যে কী জিনিস অরিজিৎ, কী সাংঘাতিক! যে ভাষায় একদিন বনলতার সঙ্গে প্রেম করেছিলাম সে ভাষাটা কোথায় গেল? সেদিন ছেলেগুলোর দিকে যখন রুখে যাচ্ছিলাম সেদিন বনলতা পথ আটকে দাঁড়াল, আমি ওর চুল ধরে টেনে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে করতে ওকে গাল দিলাম—ইউ বিচ্। সেই থেকে আমাদের মধ্যে ফাটলটা বড্ড স্পষ্ট হয়ে গেল। ল্যাংগুয়েজের একটু গোলমালে কত কী হয়ে যায়?

অরিজিৎ একটু অবাক হয়ে বলে—বললি? ঐ কথা কেউ বৌকে বলে? এমন তো কিছু দোষ করেনি তোর বৌ!

জগন্নাথ জ্বালাধরা চোখে চেয়ে বলে—মানুষের যখন ভাষা পাল্টে যায় তখন আসলে ভিতরে ভিতরে মানুষটাও পাল্টায়। নইলে আমি ওকে ওকথা বলব কেন? আমি চিরকাল ভদ্রলোক। কিন্তু তবু কিছুতেই কথাটা আটকাতে পারলাম না। আনকনশাস্লি বেরিয়ে গেল। তখন খেয়াল করিনি কিন্তু, তারপর অনেকবার ভেবে দেখেছি কথাটা কি করে এল আমার জিভে। ভেবে পাইনি। নিজের ভাষাকে আমার বিশ্বাস নেই।

সতর্ক গলায় অরিজিৎ প্রশ্ন করল—তোদের প্রবলেমটা কী?

জগন্নাথ অসুস্থ একটা হাসি হেসে বলে—আমাদের কোনো প্রবলেম নেই। ভালবাসার বিয়ে, তারপর সুখে দিন যাচ্ছিল। অবশ্য আমরা জাতটা মানিনি, বনলতা বামুনের মেয়ে। সেইজন্য আমার পরিবার থেকে একটা আপত্তি উঠেছিল। মা একদম মানতে চায়নি, তার কেবল পাপের ভয়। বামুনরা যতই মুর্গী খাক ওদের এখনো বেশীর ভাগ লে-ম্যান ভয় খায়! প্রতিলোম বিয়ে তাই মা ভয়ে অস্থির। আমাকে তাই আলাদা হতে হল। বনলতার বাবা অবশ্য জাত ফাত মানেন কিনা

জানি না, কিন্তু গোলমালটা ওদিকেও দেখা দিয়েছে। ওর বাবা বড্ড রাশভারী বিশাল চেহারা, বিশাল চাকরি, বিশাল পার্সোনালিটি, বনলতা তার একমাত্র মা-মরা সন্তান। পাত্র হিসেবে আমাকে তিনি গণ্যই করেন না। তিনিও আমাকে অ্যাকসেপ্ট করেননি। কৌশিক ব্যানার্জি নামে একটি ছেলের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছিল, বনলতার বাবা পাকা কথাও বলেছিলেন! সেই সময়ে আমরা লুকিয়ে রেজিস্ট্রি করি। সেইজন্য বখেরা।

অরিজিৎ একটা শ্বাস চেপে রাখল। তার মুখটা ম্লান দেখাল। একটু সময় চুপ করে থেকে সে বলল—জগন্নাথ, কাজটা বোধ হয় তুই ভাল করিসনি।

জগন্নাথ মাথা ঝাঁকিয়ে বলে—করিনিই তো। তবু আমাদের দুজনের মধ্যে কোনো প্রবলেম ছিল না। উই বোথ ওয়্যার হ্যাপী। কিন্তু সেটা খুব অল্প সময়ের জন্য। এত লোককে অসন্তুষ্ট করে বোধ হয় সুখী হওয়া যায় না। তুই কি অভিশাপটাপ মানিস?

অরিজিৎ বলে—দূর!

—আমি আজকাল মানছি।

—কেন?

—অভিশাপ ছাড়া কী বল? দুটো নিষ্পাপ সুখী স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আচমকা এ কী গেরো? বাইরে থেকে দেখলে কোনো প্রবলেম নেই, তবু কেউ কারো শরীর ছুঁতে পারছি না, কথা বলার সময়ে সাবধান হয়ে যাচ্ছি। কী যে হচ্ছে বুঝতে পারছি না।

অরিজিৎ সান্ত্বনার কথা বলবে, আশা করেছিল জগন্নাথ। কিন্তু অরিজিৎ তা বলল না। অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক থেকে বলল—আমি বিস্তর ঘুরেছি জগন্নাথ, তার ফলে আমার কিছু প্রত্যক্ষ জ্ঞান বেড়েছে, আমি দেখেছি মানুষ বাই নেচার ক্লাসিফায়েড।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে সুস্পষ্ট শ্রেণীভেদ আছে। জাত মানিস বা না মানিস মানুষে মানুষে যে পার্থক্য আছে তা আমার অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য। বর্ণাশ্রম আমি মানি। মানুষের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাকে শ্রেণীভাগ করা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, অবশ্য তাকে ছেঁদো জাতিভেদে রূপান্তরিত করে নিলে অন্য কথা। কিন্তু এটা ঠিক, প্রকৃতিতে হুবহু, একরকমের একজাতের কোনো গাছ, পশু, পাখি নেই। মানুষেরও তাই।

—তাতে কী হল?

—এই পার্থক্য বর্ণাশ্রম।

—হোকগে। কিন্তু আমার প্রবলেমের সঙ্গে এর কী সম্পর্ক? গভীর ক্লান্তি আর হতাশার সঙ্গে জগন্নাথ বলে।

চুপ করে থাকল অরিজিৎ। তারপর আস্তে আস্তে বলল—হয়তো সেই। আমি স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক কীরকম হয় তা তো জানি না, তোদের প্রবলেমটাও খুলে বলিস নি। তবে হয়তো এটা তেমন গভীর বা জটিল কিছু নয়। মিটে যাবে।

boiRboi.net

কিন্তু তাহলেও বলি, এরকমটা না করলেও পারতিস। বহুদিনের পুরোনো একটা প্রথা, তার পিছনের কারণ বা উদ্দেশ্য না জেনে সেই প্রথাকে ভেঙে ভাল করিসনি।

বিরক্ত হল জগন্নাথ। আবার সিগারেট ধরাল। অরিজিতের শান্ত মুখচ্ছবির দিকে চেয়ে বলল—প্রথা ভেঙেছি বলেই কি অশান্তি?

—তা বলিনি।

জগন্নাথ একটু রাগের স্বরে বলে—অরিজিৎ, সংসারের সম্পর্ক গুলো অত সরল করে বোঝা যায় না। আমাদের প্রবলেমটা জটিল!

—জানি।

—কী জানিস?

অরিজিৎ লাজুক মুখভাব করে বলে—জানি বলাটা ভুল হল। জানলাম। তুই জানালি।

—কিছু জানিস না।

—তাহলে জানি না।

জগন্নাথ সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে পিষে ফেলে আবার একটা ধরাল। তারপর হঠাৎ বলল—নীতা নামে একটা মেয়ে ছিল, বুঝলি। আমারই ছাত্রী। মাঝে মাঝে ক্লাশের বাইরে আমার কাছে পড়া বুঝে নিতে আসত। আমার কোনো দুর্বলতা ছিল না, কিন্তু ওর ছিল। মেয়েটা বড্ড ভাল। খুব সুন্দর টুন্দর কিছু নয়, আটপৌরে কিন্তু স্বভাবটি ছিল ঠাণ্ডা, মনে হয় খুব একটা বুকছেঁড়া ভালবাসা ছিল তার আমার প্রতি, পাত্তা দিইনি। আজকাল সেই নীতার কথা খুব মনে পড়ে। মেয়েটা হয়তো এই জীবনে খুব সুখী হতে পারবে না।

জগন্নাথ একটা শ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল।

—চললি?

—যাই। তোর ঘরটা তেমন ঠাণ্ডা নেই, আগে যেমন ছিল। ভেবেছিলাম তোর এই ঘরটায় বসে পুরোনো কথা বলব খানিকক্ষণ, মনটা হালকা হয়ে যাবে। হল না। বয়েসটা নেই, মনটাও নেই।

অরিজিৎ কথা বলল না।

জগন্নাথ বলল—ভ্রমণকাহিনীটা লেখ। আমি গিয়ে আমার নিরানন্দ ঘরটিকে ফেস করি।

সিঁড়ি ভেঙে জগন্নাথ নেমে এল।

তার কেবলই মনে হয়, যেখানেই সে যাক কোথাও তার জন্য কোনো ঠাণ্ডা, নিঃঝুম একটা জায়গা নেই যেখানে সে দুদণ্ড বসে থাকবে।

কাল একবার ভিসাটার খোঁজ করতে যাবে সে।

boiRboi.net

নয়

রাতে ভাল ঘুম হয় না আজকাল।

এখন প্রথম শীত পড়েছে। তুলোর কম্বলে ওয়ার দিয়ে গায়ে দিয়ে পা তলা একটা ওম্ হয়। চড়াই পাখীর বুকের মতো। তাতে নিঃঝুম ঘুম হয়। কিন্তু বনলতার হয় না। মাথাটা বড্ড গরম হয়ে ওঠে। মাঝরাতে উঠে বাথরুমে যায়, হিম হয়ে থাকা জল কপালে, ঘাড়ে থাবড়ায়। আবার চুপ করে এসে শোয়। চোখ লেগে আসে। তখনই আবার দুঃস্বপ্ন দেখে। চমকে ঘুম ভেঙে যায়।

জগন্নাথ কি ঘুমোয়? বোধহয় না। মাঝেমধ্যে দেখেছে সে। জগন্নাথ উঠে সিগারেট খাচ্ছে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে। বনলতা চেয়ে থাকে। বড্ড কষ্ট হয়। এই লোকটাকে সে কত ভালবাসত কদিন আগেও! আজও কি বাসে না? কিন্তু ভালবাসা জিনিসটা সঠিক হিসেবে আসে না। সকলের ভালবাসা কি সকলের মাপ মতো হয়? বৃথা এক ভালবাসার রক্তস্রোত এক গোপন ক্ষতস্থান থেকে ড্রিপ ড্রিপ্ করে ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে যাচ্ছে। তার সামনে অঞ্জলি পেতে বসে কে ভিক্ষে করছে? কে পান করছে পিপাসার্তের মতো? কেউ না। রক্তক্ষরণ বৃথা হয়ে যায়।

সর্বক্ষণ বনলতা তার বাবার কথা ভাবে আজকাল, আর ঘুমের মধ্যেও শুনতে পায় একটা দূরে উড়োজাহাজের ম্লান কিন্তু অবিরল শব্দ। কলঘরে যখন কলের জল বয়ে যায় বেখেয়ালে, তেমনি এক উদাস করা শব্দ সেটা। উড়োজাহাজের কথা কেন বনলতার মনে আসে? সে তো কৌশিকের দিকে একবারের বেশী তাকিয়েও দেখেনি। একটা উড়োজাহাজ কোথায়, কত দূরে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে একটা অচেনা লোককে। আর এই এক ঘুমহীন অন্ধকারে নিজের হৃদয়ের ভিতরে সেই শব্দটাই বাগান থেকে উড়ে আসা বোকা ফরিঙের মতো উড়ে উড়ে বসে, পাখা কাঁপায়।

এও কি ভালবাসা? বনলতা আর এসব বিশ্বাস করে না। বড় খাট, তার একপাশে বনলতা, পড়ে থাকে। কদিন হল জগন্নাথ তার আলাদা বিছানা করেছে চৌকিতে। এক ঘরের দু পাশে দুজন। শরীর স্পর্শ হয় না। কথাবাত কমে গেছে ঢের। চোখাচোখি তারা এড়িয়ে চলে।

কিছু হয়নি। বাইরের কোনো কলহ নয়, অপমানও নয়। ভুল বোঝাবুঝি নয়। শুধু একদিন মারকুটে বাজে কতকগুলো ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাচ্ছিল বলে জগন্নাথকে আটকাতে গিয়েছিল সে। জগন্নাথ বনলতার অমন সুন্দর চিকন কেশরাশি দু হাতে মুঠো করে চেপে ধরে বলেছিল—ইউ বিচ! কেন বলেছিল? ভাবতে গেলে বনলতার দুটো চোখের কোল জুড়ে টলটলে জল জমে ওঠে, কেন

বলেছিল জগন্নাথ ? মুখ ফসকে যে কথা বেরোয় তার কি কোনো শিকড় থাকে না ? সে কি হঠাৎ উড়ে আসা কথা ? সে কি বাইরে থেকে আসে ?

তা নয়, বনলতা জানে একসময়ে বাবা তাকে শিখিয়েছিল মুখ ফস্‌কে কথা বলে কিছু নেই। কথার জন্ম মুখে হয় না। কথা জন্মায় মানুষের গহীন, অন্ধকার মনে। সেই মন কে কারটা দেখতে পাচ্ছে ? বনলতা জানে, জগন্নাথ কিছু সচেতনভাবে ভেবে বলেনি। ছেলেগুলোর ওপর বড্ড রেগে গিয়েছিল বলে তার মাথার ঠিক ছিল না, মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল। ওটুকুর জন্য ক্ষমাও করা যেত জগন্নাথকে। কিন্তু ক্ষমা জগন্নাথ চাইছে না। একবার, উন্মুখ জগন্নাথ বনলতার দিকে অকপটে তাকিয়ে যদি একবার ক্ষমা চাইত। বনলতা তাই জানে, কথাটা মুখ ফস্‌কে বেরোলেও মনে কখনো না কখনো তার জন্ম হয়েছিল, মানুষ এরকম আচমকা কখনো কখনো তার অন্ধকার মনটাকে প্রকাশ করে ফেলে।

বনলতার ঘুম আসে না। সারা রাত কেবলই পাশ ফেরে। পাশ বালিশ আঁকড়ে ধরে। বিছানাটা শরীরের তাপে গরম আর অসহ্য হয়ে যায়, আবার তখন পাশ ফিরে ঠান্ডা দিকে চলে যায় সে, বালিশ উলটে শোয়। ঘুমোয় একটু, স্বপ্ন দেখে, জেগেই থাকে বেশী।

সকাল বেলাটায় একরকম ভালই থাকে বনলতা, রান্নাঘরে তার তখন হাজার কাজ। কাজ অবশ্য যেটুকু তা বনলতার অগোছালো স্বভাব আর অনভ্যাসের জন্য হাজার গুণ বাড়ে। ডালের জল পড়ে উনুন নিভে যায়, তরকারী কাটতে বসে আঁচ বইয়ে দেয়, আবার কয়লা ঢেলে আঁচ করতে গিয়ে গুচ্ছের কয়লা নষ্ট, এরকম এত কী হয়। তবু সে সময়টুকু ব্যস্ত থেকে কিছুক্ষণ অন্ততঃ সে তার উড়োজাহাজের শব্দ আর গোপন রক্তক্ষরণের হাত থেকে রেহাই পায়। ততক্ষণ চোখের জলটুকুকে অন্ততঃ আটকাতে পারে।

জগন্নাথ আজকাল সকালে খবরের কাগজ মুখে দিয়েই কাটায়। চা চায় না। বনলতাই বার তিনেক চা দিয়ে যায়।

শিশিরে ভেজা কবোষ্ণ এই প্রথম শীতের সকালগুলো তাদের কত সুন্দর কাটতে পারত। বয়ে যায়, ঝরে যায়, নষ্ট হয়ে যায় তাদের সুন্দর সময়। অভিমানে ? না, তাও নয়। অভিমানের ভিতরেও একটা কিছু আছে যা ক্রমশঃই ভালবাসাকে নষ্ট করে দেয়। কিন্তু এ ঠিক অভিমানও নয়। এ হচ্ছে ব্যবধান।

সকালে আজ সেই ব্যবধানটাই টের পেল বনলতা।

ঠিকে ঝিটা বড্ড সেয়ানা। বনলতাদের রেশন কার্ড নেই, খোলা বাজার থেকে চাল চিনি কেনে তারা। ঠিকে ঝি কদিন হয় একটু সস্তায় তার নিজের রেশনের চিনি দেয় বনলতাকে। তাতে তার প্রতি কেজিতে দুটাকা লাভ থাকে। তবু পাঁচশো গ্রামের হরলিক্‌সের শিশি ভরে না কেন এই নিয়ে আজকাল একটা খুঁত খুঁত করতে শিখেছে বনলতা। আগে খেয়াল করত না, ঝিও সুযোগটা নিত। বনলতা সেয়ানা হচ্ছে দেখে ঝি আজকাল নতুন কায়দা করে ততক্ষণ বনলতাকে এ বাড়ি সে বাড়ির

গল্প শোনায়। খুব আন্তরিকভাবে বনলতার শরীরের খবর নেয়, সংসারের গল্প টল্প শুনতে চায়। কথা বলার লোক পেয়ে বনলতা প্রশ্রয়ও দেয় তাকে। চিনির মাপ নিয়ে কথাটা আর ওঠে না।

ঝি আজ সকালে চমৎকার একটা গল্প ফেঁদেছিল। একটা নতুন বৌ আর তার খিটখিটে শাশুড়ির ঝগড়ার কথা। শেষে একদিন বৌটার শান্তশিষ্ট বর কেমন করে আস্তে আস্তে মায়ের ওপর বিরক্ত হতে হতে গায়ে হাত তুলে ফেলল সেই গল্প। গল্পটার চূড়ান্ত জায়গায় এসে বনলতা শুনতে পেল সদরের কড়া নড়ছে। গা করল না। প্রায় সময়েই আজকাল জগন্নাথের ছাত্ররা নম্বর জানতে আসে। এসে এসে ফিরে যায়। পরীক্ষার খাতা ডাঁই হয়ে পড়ে আছে। জগন্নাথ ছোঁয়নি এখনো।

কিন্তু আজ কড়া নাড়ার শব্দ হতে না হতেই জগন্নাথ চীৎকার করে ডাকল—বনলতা, দেখে যাও—

সে ই ডাকে বনলতা কেঁপে উঠল না, চমকাল না, আনন্দিত হল না। গত প্রায় পনেরো দিনে যে জগন্নাথ একবারও তাকে এরকম ভাবে ডাকেনি সে কথাও মনে পড়ল না। নিরুত্তাপভাবে সে উঠল। বাইরের ঘরে এসে দেখল, খুব সাজ পোষাক পরা দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সঙ্গে একটি প্যাণ্ট পরা ছোকরা, ছোকরাটার চেহারায় জগন্নাথের ছাপ আছে।

দুজনের মধ্যে একজন মেয়ে সুন্দরী আর অহংকারী। সে নিষ্পলক এবং তীক্ষ্ন চোখে বনলতাকে দেখছিল। অন্য মেয়েটির বয়স সুন্দরজনের চেয়ে একটু বেশী, বাড়ন্ত মোটাসোটা আহ্লাদী চেহারা, কপালে সাদা টিপ, পরনে সাদা খোলের শাড়ি, মুখে হাসি, হাতে মিষ্টি টিষ্টির বাক্স, একটা শাড়ির প্যাকেটও।

সেই এগিয়ে এসে হঠাৎ প্রণাম করে বলল—বৌদি, আমাদের তো চেনোও না! আমরা তোমার দুই ননদিনী আর এটি তোমার দেওর। দেওরটি পেটুক। ননদিনীরা ঝগড়ুটে, খুব সাবধান!

বলে হাসল খুব। সুন্দরজন একবার হাসল।

—এসো। বনলতা নিরুত্তাপ গলায় বলল।

জগন্নাথের পরিবারের কাউকেই সে চেনে না। এই প্রথম সে ওর পরিবারের লোকজন দেখছে।

সঙ্গের ছেলেটি অর্থাৎ তার দেওর ভারী লাজুক। মুখখানি মিষ্টি, চোখ তুলে তাকায় না। সে প্রণাম করার পর সুন্দরজন যেন অনিচ্ছাসত্ত্বে এগিয়ে এল।

বনলতা বলল—থাক না ওসব।

—না, থাকবে কেন? সম্পর্কে তো তুমি বড়োই! সুন্দরজন বলল।

মোটা মেয়েটি বলল—আজ কিন্তু থাকছি আমরা, বুঝলে? সারাদিন! খাবো দাবো আর তোমার ঘর সংসার দেখব।

বনলতা আস্তে করে বলল—দেখো। এতদিনের মধ্যে বুঝি আসার সময় হয়নি?

—কী করে হবে? আমরা দু বোন এবার একসঙ্গে প্রিইউনিভার্সিটি দিলাম যে!

—ও!

boiRboi.net

—শাড়িটা দেখ তো বৌদি, পছন্দ না হলে দোকানদারকে বলা আছে বদলে দেবে।

—দেখব'খন, রান্নাঘরে যে আমার কড়াই পুড়ে গেল।

—যাক্‌গে। আগে দেখ। আর রান্না বান্নার চার্জ আজ আমরা নিচ্ছি। তুমি একটু সাজো তো নতুন বৌকে একটু দেখি কনের সাজে। তুমি আজ বিবি সেজে বসে থাকবে কিন্তু বৌদি, মাইরি বলছি।

জগন্নাথ আবার খবরের কাগজে মুখ ঢেকেছে, আড়চোখে দেখে নিল বনলতা। একটা দীর্ঘশ্বাস ভেঙে কয়েকটা দ্রুত শ্বাস ফেলে নিল সে। এরা সব জগন্নাথের বোন, ভাই, কিন্তু তার কে?

সুন্দর মেয়েটা কথা বলছে না, কিন্তু প্রায় এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। অহংকারী মুখচোখ, এবং চোখে একটা ঈর্ষার জ্বালাও আছে বুঝি। সুন্দরীদের এই এক মুশ্‌কিল, অন্য সুন্দরীর মুখোমুখী হলেই তারা বড্ড সচেতন হয়ে ওঠে। বনলতা নিজের চেহারা নিয়ে কতকাল ভাবে না।

—তুমি রেবা, না? বনলতা সুন্দরীজনের দিকে তাকিয়ে বলে।

—হুঁ। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে রেবা মুখটা ফিরিয়ে দেয়।

—কী সুন্দর তুমি!

—ছাই! তোমার কাছে কিচ্ছু না। সে বলল।

বনলতা একটু হাসল। ঠিকই, সে এখনো যা সুন্দর তার কাছে বহু সুন্দরই ম্লান হয়ে যায়। তবু সে বলল—আমার আর চেহারা কী! বিয়ের আগে যাও বা একটু ছিল, এখন সব গেছে।

মোটাজন খুব হাসতে থাকে, বলে—বৌদি ভাই, বিয়েটা কি তাহলে তোমার মনের মতো হয়নি?

বলেই দাদার দিকে চেয়ে তাড়াতাড়ি জিব কাটল। জগন্নাথ অবশ্য এসব লক্ষ্যও করছে না। খবরের কাগজে মুখ ঢেকে আছে। আড়াল থেকে সিগারেটের নীল ধোঁয়া প্যাকিয়ে প্যাকিয়ে উঠছে।

—চলো, তোমার রান্নাঘর দেখে আসি। বলে মোটাজন বনলতার কোমর ধরল অনায়াসে। চট্‌ করে আপন করতে পারে।

বামুনের মেয়ে বিয়ে করেছে বলে জগন্নাথের বাড়ি থেকে ব্যাপারটাকে কেউ অনুমোদন করেনি। প্রায় একঘরে অবস্থায় একা বিয়ে করেছিল জগন্নাথ। বিয়ে মানে রেজিস্ট্রেশন, গড়্‌গড় করে কতগুলো সরকারী মন্ত্র বলা, তার পরই তারা বর-বৌ হয়ে যায়। বুঝি তাই আজও বনলতা নিজেকে বৌ-বৌ ভাবতে পারে না ঠিকমতো। সিঁদুর পরে নামের শেষে 'বোস' লেখে, তবু যেন সে, সেই বনলতা লাহিড়িই রয়ে গেল আজও।

রান্নাঘরে এসে মোটাজন বলল—তুমি বুঝি আমার নাম জানো না? আমি দয়াময়ী, সবাই দয়া কিংবা দয়ী বলে ডাকে।

বনলতা হাসল—জানি।

—তরকারী টরকারী বের করো, কুটে দিই। ভাইকে পাঠাই ডিম আনতে, ডিমের ডালনা হোক। হোটেল টোটেল কাছাকাছি নেই?

—হোটেল দিয়ে কী হবে ?

দয়া মুখ টিপে হাসল—মুর্গীর মাংস আনবো।

—মাছ আছে, ডিম আনানো হবে, আবার মুর্গীও ?

—আজ ফিস্টি করতেই এলাম তো। বাবা টাকা দিয়ে দিয়েছে।

রেবা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। মুখের ভাব এখনো কাঠ-কাঠ। গোমরা মুখেই বলল—তোর কেবল খাওয়া দিদি! সেই জন্যই মুটিয়ে যাচ্ছিস।

দয়ার মুখের হাসি শুকোয় না, গলায় হাসির গুরগুর শব্দ তুলে বলে—মোটা মানুষদের ধাত ঠাণ্ডা। আমার তোর মতো মেজাজ খারাপ হয় না রেবা, নতুন বৌদিকে দেখতে এসেছিস, একটু হাসবি তো!

—হাসার কী ?

—তোর হাসি আসেই না। মোটারা হাসতে পারে। বলে বনলতার দিকে ফিরে বলল—এই বৌদি কাপড় টাপড় দাও! পোষাকী শাড়ি পরে তোমার রান্নাঘরের কালিঝুলি মাখবো নাকি ?

বনলতা দুবোনকে আটপৌরে শাড়ি বের করে দিল। সোমনাথ—জগন্নাথের ভাই গেল দোকানে ডিম, মাংস, দৈ কিনতে। কাপড় বদলে দুই বোন রান্নাঘরের দখল নিল।

বনলতার ক্লান্তি লাগছিল। জলচৌকির ওপর বসে সে দরজার পাটে মাথাটা হেলিয়ে রেখে বলল—তোমরা এ বাসায় প্রথম এলে, আজ না হয় আমিই রাঁধি।

দয়া মাথা নাড়ল—সে হবে না। আমরা জানি তুমি বড়লোকের আদুরে মেয়ে, সংসারে খাটাখাটনির অভ্যাস নেই। নতুন সংসারে এসে তোমাকে খুব খাটতে হচ্ছে। মা তাই পৈ পৈ করে বলে দিয়েছে আজ যেন নতুন বৌ রান্না না করে। বড়জোর পান টান সেজো, জল গড়িয়ে দিও কিংবা স্টোভে একটু চা করতে পারো।

জগন্নাথ নিজের পরিবারের গল্প কখনো বনলতার কাছে করে না, তবে বনলতা জানে, খুব গরীবঘরে জগন্নাথ মানুষ হয়েছে। পার্টিশনের পর তারা যখন এদেশে আসে তখন প্রায় ভিখিরিদশা। সেই থেকে আস্তে আস্তে তারা দাঁড়িয়েছে। জগন্নাথের বাবা একটা দোকান করে। জগন্নাথ তখনো তার মাইনের মোটা অংশ মাস পয়লায় গিয়ে বাবার হাতে দিয়ে আসে। এখনো কষ্টেই চলে জগন্নাথের সংসার।

দয়া সেই কথাই বলছিল—বৌদি, খরচ করাই দেখে ভেবো না যে আমরা বড়লোক। অনেক হিসেব টিসেব করে আমাদের চালাতে হয়।

বনলতা ক্লান্ত গলায় বলে—জানি দয়া।

রেবা আলুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে হঠাৎ আবেগহীন গলায় বলল—দাদা আলাদা হওয়াতেই যত গণ্ডগোল। নইলে আমরা ভালই ছিলাম।

বেফাঁস কথা। দয়া তাড়াতাড়ি বলল—বাঃ, আলাদা হবে না তো কী ? আমাদের একটুখানি বাসা।

রেবা তবু জেদী গলায় বলে—দাদার তো বিয়ে করার প্ল্যান ছিল না এখন।

boiRboi.net

সোমনাথ দাঁড়ালে তবে বিয়ে করার কথা। অন্তত একটা বোনের বিয়েও দেওয়া উচিত ছিল।

দয়া বলে—বাঃ, তা করতে গেলে বয়স বয়ে যাবে না ? পাকা চুলে টোপর পরবে নাকি ?

রেবা সোজা বনলতার দিকে তাকিয়ে বলল—কত কষ্ট করে আমাদের বিয়ের জন্য দাদা টাকা জমাচ্ছিল। হুট করে নিজেই বিয়ে করে বসল। দাদা কীরকম যেন হয়ে গেছে।

বনলতা জোর করে একটু হাসল। সংসার সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা কম, তবে সংসারে এসবই হয়। আঘাত প্রত্যাঘাত। সে জবাব দিল—মানুষ তো বদলায়।

—তাই দেখছি।

—আমি গুণ করেছি রেবা। বনলতা আবার বলল।

রেবা উত্তর দিল না। কিন্তু দয়া খুব হাসল। বলল—গুণ করবে না তো কী ? আমি আমার বরকে কেমন গুণ করি দেখো।

সে কথায় কেউ হাসল না।

রেবা বলল—আলাদা সংসারের খরচ কি কম ? এই ফ্ল্যাটটারই তো কত ভাড়া! তার ওপর নতুন সব ফার্ণিচার, বিছানা-বালিশ কাপড়-চোপড়—

দয়া বলে—তুই এত হিসেবী জানতাম না তো রেবী! তবে কেন তুই সিনেমা দেখিস, পুজোর সময়ে কেন গতবারে পিওর সিল্ক নিলি জোর করে ?

—তুই চুপ কর দিদি!

—ওর কথা তুমি ধোরো না বৌদি। ভীষণ ঝগড়াটে! বলে দয়া।

বনলতাকে কোনো আঘাতই তেমন আঘাত করে না। সে ক্লান্ত মাথাটা তেমনি দরজায় হেলিয়ে রেখে বলে—বিয়ের আগে তোমার দাদার এসব হিসেব করা উচিত ছিল।

—ছিলই তো। সেই জন্যই তো বললাম, দাদা কীরকম যেন হয়ে গেছে।

—তুই চুপ কর রেবী। অত চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলিস না। দাদা শুনলে কি ভাববে ?

—দাদার শোনাই উচিত!

বনলতা উঠে বলল—দয়া, আমি দশ মিনিট একটু শুয়ে থেকে আসি। বড্ড মাথা ধরেছে।

দয়া ব্যগ্র হয়ে বলে—আমি সঙ্গে আসবো, টিপে দেবো একটু মাথাটা ?

—না। একটু শুয়ে থাকলেই সেরে যাবে। কিছু দরকার হলে ডেকো।

—কিছু দরকার হবে না। আমরা সব খুঁজে পেতে নেবো। তুমি বরং মাথা ধরা সারলে নতুন শাড়িটা পোরো।

রেবা হঠাৎ মুখ তুলে বলে—বৌদি, শোওয়ার ঘরে আর একটা বিছানা কার ? কেউ এসেছে তোমাদের বাড়িতে ?

—না, বনলতা উত্তর দিল, আমরা আলাদা শুই।

boiRboi.net

—আলাদা শোও ? ভারী অবাক হয় রেবা।

দয়া বলে—আলাদা শোওয়াই আজকাল ফ্যাশান।

শোওয়ার ঘরে এসে বনলতা দেখল, জগন্নাথ তেমনি বসে আছে আধশোয়া হয়ে! খবরের কাগজ সামনে খোলা, কিন্তু সেদিকে মন নেই। অন্যমনস্ক ভাবে জানালার বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে মাথায় লম্বা অবিন্যস্ত চুলে আঙুল ডুবিয়ে বিলি কাটছে। বনলতার হাতের বাউটি দুটো বজ্র শব্দ করে, সেই শব্দে জগন্নাথ ফিরে তাকাল, চোখে চোখ।

—ওরা কি আজ থাকবে নাকি ? জগন্নাথ জিজ্ঞেস করে।

—হুঁ।

জগন্নাথ হঠাৎ ঝাঁঝাঁলো গলায় বলে—যত ঝামেলা! হঠাৎ এভাবে ওদের আসার কি দরকার ছিল ?

—তুমিই ওদের জিজ্ঞেস করো।

—কেন এসেছে তা তোমাকে বলেনি ?

—বলেছে, ফিষ্টি করতে এসেছে।

—কেন, এটা কি বোটানিক্যাল গার্ডেন নাকি যে ফিষ্টি করতে এসেছে ?

বনলতা একটু অবাক হয়ে যায়। জগন্নাথের সঙ্গে তার পরিবারের সম্পর্ক যে এতটা তেতো তা সে আন্দাজ করেনি। সেই তিক্ততার কারণ সে নিজেই কিনা তাই বা কে জানে। বনলতা কোনো উত্তর দিল না। খাটের বিছানায় বেডকভার পাতা। নির্ভাজ সুন্দর বিছানাটায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

জগন্নাথের দেশলাই জ্বালাবার শব্দ হয়। সিগারেটের সুন্দর গন্ধটি পায় বনলতা। উপুড় হয়ে শোয়া সে, দুহাতের মধ্যে ঢাকা তার মুখখানা। বনলতার চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে আপনা থেকেই।

জগন্নাথ অনেকক্ষণ বাদে বলল—ঐ যে ছোটোজন, রেবা, ও সব লক্ষ্য করে যাচ্ছে। গিয়ে মাকে লাগাবে। বিচ্ছু একটি।

বনলতা চুপ করে রইল। শোয়ার ঘরে দুটো আলাদা বিছানায় তারা দুজন আধাশোয়া হয়ে বা শুয়ে আছে। তবু মনে দুস্তর এক সামুদ্রিক জলরাশির দূরত্বে তারা দুই চলিষ্ণু জলযান, যাদের পথ বিপরীতমুখী। এখন এই বিছানা থেকে ইচ্ছে করলে রুমাল নেড়ে জগন্নাথকে বিদায় জানানো যেতে পারে।

একটি হাত নরমভাবে বনলতার মাথা স্পর্শ করে। একটু ঝিমু ধরে থাকে বনলতা। না, জগন্নাথ নয়। এতটা সাহস জগন্নাথের আর নেই।

—বৌদি!

কার গলা তা ঠিক বুঝতে পারে না বনলতা। তবে স্বরের নম্রতা আর আন্তরিকতা শুনে অনুমান করে দয়া।

—উম্—! উত্তর দেয় সে।

—কড়া করে চা করে এনেছি। খাও।

—খাবো না। চা আমি বেশী খাই না। বনলতা মাথা না তুলেই বলে।

—ওঠোনা বৌদি ভাই ! তুমি রাগ করেছো।

কারো সামনে চোখের জল মোছা বড্ড মুস্কিল। তাই সহসা বনলতা মুখ তুলতে পারছিল না।

—বৌদিভাই, ওঠো।

স্খলিত আঁচল চোখের কোলে চেপে জলটা মুছে বনলতা উঠে বসে। তারপর অবাক হয়। চা করে এনেছে, দয়া নয়, রেবা। মুখের রুক্ষ ভাবটা যেন বৃষ্টিতে ধুয়ে কমনীয় হয়ে গেছে মেয়েটার। অকপট চোখে বনলতার দিকে একটু চেয়ে থেকে হঠাৎ গলা নামিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলে—কাঁদছিলে ?

—না। ব্যথায় চোখে জল এসেছিল।

বনলতার হাতে চায়ের কাপটা দেয় রেবা। পাশে বসে। তারপর বনলতার বাঁ হাতখানা হাতে তুলে নিয়ে তেমনি চাপা গলায় বলে—আমার মাথার অনেক-গুলো স্ক্রু ঢিলে আছে। সবাই আমাকে পাগল বলে। আমার কথায় কেউ কিছু মনে করে না।

বলে হাসল। ওর সামনের দুই দাঁতের মাঝখানে একটু পোকায় খাওয়া কালো দাগ। তবু হাসিটি যে কত সুন্দর তা এই প্রথম বোঝা গেল। সে আবার ফিস্ ফিস্ করে বলল—আমাদের বাড়িতে একমাত্র বাবা ছাড়া কেউ আমাকে দেখতে পারে না।

—কেন ?

—ঐ যে, বড্ড কথা শোনাই সবাইকে। তেমনি ফিস্ ফিস্ করে বলে রেবা। বনলতার হাতখানা দুহাতে চেটোয় ময়দা মাখার মতো পিষতে পিষতে সে তেমনি চাপা গলায় বলল—আমার কথা ধরতে নেই বৌদিভাই। তুমি কেঁদেছো বলে আমারও কান্না পাচ্ছে। চলো তো বাইরের ঘরে যাই, এখানে কথা হয় না।

বনলতা চুপ করে থাকে। চায়ে চুমুক দিয়ে তেতো মিষ্টি স্বাদটা অনুভব করে। জগন্নাথ তেমনি পাথরের মতো বসে আছে। বাইরে চোখ। বনলতা আর জগন্নাথের সম্পর্কের ব্যবধান যে কোনো বাইরের লোক তাদের বসবার ভঙ্গী থেকেই ধরে ফেলতে পারে। বনলতা ওঠে, বলে—চলো।

তারা বাইরের ঘরে এসে বসে। বড় বেতের সোফায়, পাশাপাশি।

আর হাতটা ধরে থেকেই রেবা বলে—সামনের মাস থেকে তুমি কি আমাদের বাড়িতে থাকবে ?

বনলতা প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে বলে—তার মানে ?

—মানে আবার কী ! সামনের মাস থেকে তো তোমাকে কোথাও গিয়ে থাকতেই হবে ! হয় আমাদের বাড়ি, নয়তো তোমার বাপের বাড়ি।

—কেন ?

—বাঃ, তবে কি এ বাসায় তুমি একা থাকবে ? দাদা যে চলে যাচ্ছে !

বনলতার হঠাৎ শীত করে বুঝি !

প্রশ্ন করে—কোথায় ?

—তুমি আচ্ছা হাবা মেয়ে তো ! দাদা ভিসা পেয়ে গেছে, এখন চলে যাবে না বিলেতে !

boiRboi.net

—ভিসা পেয়ে গেছে ? বলে বনলতা একটু চেয়ে থাকে।

রেবা একটু সন্দেহের চোখে বনলতার দিকে চেয়ে থেকে বলে—কেন বৌদি, তুমি কিছু জানো না ?

বনলতা সামলানোর চেষ্টা করে। বলে—জানি।

—তবে ওরকম করছো কেন ? যেন কিছু জানো না !

বনলতা চুপ করে থাকে।

রেবা তেমনি তার হাতখানা নিয়ে খেলা করতে করতে বলে—তুমি যদি বাপের বাড়ি থাকতে চাও তো আলাদা কথা। কিন্তু আমাদের খুব ইচ্ছে, তুমি আমাদের কাছে থাকো। একটু অসুবিধে হবে তোমার, কিন্তু দেখো আমরা তোমাকে নিয়ে খুব হুল্লোড় করব। সময়টা কেটে যাবে হু-হু করে। আমাকে যতটা খারাপ ভাবছো ততটা নই গো। তোমাকে খুব ভালবাসবো। থাকবে আমাদের কাছে ?

বনলতা আস্তে ধীরে চা খেতে খেতে পা দোলায়। হঠাৎ তার ভার বুকখানা হালকা লাগতে থাকে। বন্ধ ঘরে হঠাৎ যেন হাওয়া বাতাস খেলা করে যায়। বনলতা টের পায়, অদূরে তার মুক্তি।

সে হেসে বলে—দেখি। এখনো কিছু ভাবিনি।

—তুমিও একটা পাগল। আমার মতো। তারপর গলাটা আরো নামিয়ে রেবা কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলে—কবে থেকে চলছে ?

—কী ?

—তোমাদের ঝগড়া !

—যাঃ, ঝগড়া কোথায় ?

—তোমরা বড্ড ছেলেমানুষ বৌদি, সকলেরই ঝগড়া হয় কিন্তু বাইরের লোক এলে তারা ঝগড়াটা ঢাকা দিয়ে রাখে। তোমাদের ঝগড়া একটা বাচ্চাও বুঝতে পারে। বলোনা কবে থেকে !

গা দোলাতে দোলাতেই বনলতা বলে—ঝগড়া নয় রেবা।

—গুল দিও না। নইলে ভিসার কথা তুমি জানো না কেন ?

—জানতাম। খেয়াল ছিল না।

রেবা হাসে—খেয়াল ছিল না ? বর তিনচার বছরের মেয়াদে পাঁচ হাজার মাইল দূরে চলে যাচ্ছে, আর তোমার খেয়াল ছিল না ! তাহলে বলো, তুমি আমার দাদাকে ভালবাসো না !

—কে জানে ভালবাসা-টাসা আমি বুঝি না।

—বোঝো না তো বিয়ে করেছিলে কেন ? ইয়ার্কি !

বনলতা হঠাৎ গলায় একটা গুড়গুড় শব্দ তুলে বাচ্চার মতো দুষ্টু হাসি হাসে। বলে—অ্যাডভেঞ্চার করে দেখলাম।

রেবা হাসছিল। ক্ষীণ হাসিটা হঠাৎ গিলে ফেলে খুব সীরিয়াস গলায় বলল—বৌদি, একটা কথা বলব ? কিছু মনে কোরো না।

—বলো না ! জগন্নাথ ভিসা পেয়েছে, সামনের মাসে চলে যাবে, এই সংবাদটাই যেন হঠাৎ বনলতার সব ক্লান্তি হরণ করে নেয়। মনটা ভারী ঝরঝরে লাগে। পা

boiRboi.net

দোলাতে দোলাতে সে উৎসুক চোখে রেবার দিকে চেয়ে থাকে।

রেবা নিবিড়ভাবে বনলতার মুখের দিকে চেয়ে ছিল। চোখ না সরিয়েই বলল—তুমি এত সুন্দর যে তোমাকে যেমন তেমন ঘরে একদম মানায় না।

—ওটা বাজে কথা। আমি তেমন সুন্দরই নই।

রেবা হাতখানা জোরে চেপে ধরে বলে—বাজে কথা বোলো না। তুমিও জানো তুমি কেমন সুন্দর। আমার দাদার কিছু গ্ল্যামার নেই। না চেহারায়, না চাকরিতে। উদ্বাস্তু কলোনীতে আমাদের বাড়ি। কী দেখে তুমি দাদার প্রেমে পড়লে বলো তো? আমি শুনেছি তোমার বাবা খুব বড়লোক! তোমার জন্য খুব ভাল পাত্রও পাওয়া গিয়েছিল। তুমি ফ্রাংকলি বলো তো, কেন দাদাকে বিয়ে করলে!

বনলতা তেমনি হাসতে থাকল।

রেবা ভ্রূ কুঁচকে বনলতার দিকে চেয়ে থেকে বলে—আমরা সবাই এই নিয়ে বাড়িতে আলোচনা করি। মা আর বাবা অবশ্য ভাবে, তাদের ছেলে মস্ত কেউকেটা, তাকে বিয়ে করে তুমি বর্তে গেছ। তাদের আপত্তি অবশ্য তুমি বামুনের মেয়ে বলে। সেই কারণেই তোমাকে মা ঘরে নিতে খুঁত খুঁত করে। বলে—বামুনের মেয়ের প্রণাম-টনাম নেওয়া যাবে না, এঁটো ছোঁয়া খাওয়ানো যাবে না, এমন বৌ বাড়িতে এলে বড্ড অস্বস্তি।

কোনো কথাই বনলতাকে স্পর্শ করে না। সে হাসে।

রেবা একটা শ্বাস ফেলে—আমরা কিন্তু মা বাবার মতো ভাবি না। আমরা আলোচনা করি। কী দেখে তুমি দাদাকে বিয়ে করলে! কিছুতেই আমাদের মাথায় আসে না! বলবে?

—বলবার মতো কিছু নয়। নিজেকে আমি তেমন কিছু ভাবি না।

রেবা বলে—তোমার মাইরি খুব বড়লোকের ঘরে বিয়ে হলেই মানায়। কেবল সাজগোজ, আয়নায় মুখ দেখা, নানা কসমেটিকস্, গাড়িতে করে মার্কেটিং—এই সবই তোমাকে মানায়। রান্নাঘরে বসে উনুন ধরানো, গেঞ্জী কাচা, ঝিয়ের সঙ্গে ক্যাচ্ ক্যাচ্ এসব তোমার কর্ম নয়।

বনলতা একটা চোরা শ্বাস টানল। বুকটা ফুলে উঠল অনেকটা।

রেবা মুখখানা গম্ভীর করে বলে—দাদা বড় হঠাৎ বিয়েটা করে ফেলল। ও যে কাউকে ভালবাসে তা কখনো টেরই পাইনি। মেয়েদের সঙ্গ পছন্দ করত না। একটা মেয়ে—বলেই সতর্ক হয়ে থেমে গেল রেবা।

বনলতা মাথা নেড়ে বলে—জানি। নীতা তো?

রেবা ঝুঁকে বলে—তুমি জানো?

—জানি। চিনিও। একদিন এসেছিল এখানে। বড় ভাল মেয়ে।

রেবা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—খুব ভাল। আমাদের সকলের পছন্দ ছিল ওকে, কেবল দাদারই ছিল না। দাদা বলত, ও হ্যাংলা মেয়ে। দাদার পিছনে লোভীর মতো ঘুরত, দাদার তাই রাগ।

বনলতা হাসে খুব, বলে তবে যে বলো তোমার দাদার কোনো গ্ল্যামার নেই! না থাকলে নীতা পিছু নিয়েছিল কেন?

boiRboi.net

—নীতা তো তোমার মতো নয়। সে সাধারণ ঘরের মেয়ে, তেমন সুন্দর টুন্দরও কিছু নয়। তার কাছে দাদা দেবতা। কিন্তু তুমি বৌদি, তোমার কথা আলাদা।

—ওসব কথা থাক রেবা, যা হওয়ার হয়ে গেছে।

রেবা বনলতার হাতখানা তখনো ধরে রেখেছে। বলল—আমি বড্ড বেশী কথা বলি। সেই জন্য বকাও খাই। কিন্তু যা মনে আসে তা বলে না ফেলেও পারি না। এসব কথা বলা কি অন্যায় হল বৌদি ?

—কী জানি ভাই! তবে প্রসঙ্গটা ভাল লাগে না।

—তবে বলো তোমাদের ঝগড়া হল কী নিয়ে ?

—ঝগড়া হয়নি, বিশ্বাস করো।

—তবে তোমরা দুজনে কেন গাল ফুলিয়ে আছো ? কেন আলাদা বিছানায় শোও ?

বনলতা একটু ইতস্তত করে বলল—সেটা হয়তো ভুল বোঝাবুঝি।

রেবা গম্ভীর মুখে বলে—আমার কি ভয় হয় জানো ?

—কী ?

—তোমাকে দেখে আমার কেবলই মনে হচ্ছে, এ যেন ঠিক জোড় মেলেনি। তোমাদের মধ্যে অনেক তফাৎ।

—হবে।

—বৌদি, তোমাদের খুব ভাব হোক, তোমরা দুজন দুজনকে খুব ভালবেসো।

বনলতা ম্লান মুখে একটু ঠাট্টার চেষ্টা করে—ভালবাসারই তো বিয়ে!

—তাই তো ভয়!

—তাই তো ভয় মানে ?

—ভালবাসার বিয়েকে আমি একদম বিশ্বাস করি না। ভালবাসাটা বড্ড পলকা জিনিস।

বনলতা রেবার গালে ঠোসা দিয়ে বলে—জানলে কী করে ?

—জানি। আজকাল সবাই সব জানে। আমি এ বয়সে দুটো লাভ অ্যাফেয়ার কাটিয়ে এসেছি।

—দুটো ?

—দুটো।

বনলতা হালকা গলায় বলে—আর আমি একটাই কাটিয়ে আসতে পারলাম না।

রেবা নিষ্পলক চোখে বনলতার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে—একটা ?

—একটা।

—ইস্, বৌদি, প্রেমের ব্যাপারে তোমার কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না, না ?

—না রেবা।

boiRboi.net

রেবা দুঃখিত মুখে আস্তে করে বলল—তাই।

—তাই কী ?

—তাই বেছে নেওয়ার সুযোগ পাওনি।

বনলতা হঠাৎ বলল—তোমার দাদার সম্পর্কে তুমি এত হতাশ কেন ?

—হতাশ ! না, হতাশ হবো কেন ? আমি শুধু দাদার স্ট্যাটাস আর পার্সোনালিটির তুলনা করছি তোমার সঙ্গে। মিলছে না।

বনলতা মনে মনে রেবাকে ভয় পাচ্ছিল। মেয়েটা গন্ধ পায়। বুদ্ধিও রাখে। হয়তো স্থির বুদ্ধি নয়, তবু ওর অনুভূতি প্রখর।

হঠাৎ রেবা বনলতার দিকে চেয়ে একটা পরিষ্কার স্বচ্ছ হাসি হাসল। ঐ হাসিটা এতক্ষণের সব কথাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল যেন। আচমকা রেবা বলল—এইজন্যই আমি জীবনে কখনো সুখী হতে পারবো না, জানো ?

—কি জন্য ?

—আমি ভীষণ খুঁতখুঁতে। আর আমার ভীষণ বুদ্ধি। দুয়ে মিলে আমি মেয়ে হিসেবে ভীষণ বেমানান। কোনো পুরুষই আমার মনের মতো হয় না। এত বেশী খুঁতখুঁতে হওয়া ভাল নয়। তা ছাড়া আমি অনেক কিছু টের পাই যা আমার মা-বাবা-দাদা-দিদি কেউ টের পায় না।

—কী টের পাও ?

রেবা গুচ্ছ হাসিটা মুখে রেখেই বলল—যেমন এখন টের পাচ্ছি, আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, তোমাকে বৌদি হিসেবে শেষ পর্যন্ত আমরা পাবো না। তুমি ঠিক তোমার জায়গায় ফিরে যাবে।

কেঁপে উঠল বনলতা ! মেয়েটা বড্ড রাক্ষুসে কথা বলে।

রেবা একটা শ্বাস ফেলল। বনলতার হাতটা খুব জোরে একবার চেপে ধরে ছেড়ে দিয়ে বলল—দাদা বিলেতে যাবে বলে তোমার একটুও দুঃখ হয়নি !

বনলতা অস্বস্তিতে উঠে দাঁড়িয়ে বলে—চলো রান্নাঘরে, দয়া একা পড়ে গেছে।

রেবা মুখ তুলে হাসল। হাসতেই থাকল।

দশ

দুদিন জোর বৃষ্টি নেমে শীত পড়ে গেল প্রায়। পুজোর এখনো বেশ দেরী, রানাঘাটের আশেপাশে কুয়াশা নামে, শিশির পড়ে !

বৃষ্টিতে এবার পুকুর ভরে বিশুর পোলট্রির ভিতরে জল এসে গেল। মুর্গীর মস্তো খাঁচাটার তলায় এক কি দুই ইঞ্চি নীচেই জল। বাগানের দিকটায় পাঁচ লরী মাটি ফেলেছিল সে, পুরোনো মাটির রস কষ শুকিয়ে গেছে। গাছপালা তেমন বাড়ে না। একটা কবিরাজী কোম্পানীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিল বিশু। কালমেঘ, কুলেখাড়া, বাসক, বুড়ো নিমের শেকড়, এমনি আরো নানা গাছগাছড়া

boiRboi.net

সাপ্লাই দেবে। ভেষজের গাছ করলে লাভ বেশী। জমিও আর একটু বাড়ানোর ইচ্ছে ছিল। পোলট্রির পিছন দিকটায় একটা মজে-আসা মস্ত পুকুর, সেটার মালিক মুর্শিদাবাদের এক মুসলমান লোক। এখানে থাকে না। ফলে পুকুরের ধারে ধারে মাটি ফেলে আশেপাশের লোকেরা একটু একটু করে এনক্রোচ করে নিচ্ছে। বিশুও করেছে খানিকটা। ভেষজ করতে গেলে এক লপ্তে অনেকটা জায়গা দরকার। বুড়ো মুসলমানটা মাঝে মাঝে তদারকীতে আসে, অসহায়ভাবে পুকুরটাকে ক্রমশঃ ছোটো হতে দেখা যায়। লোকে এমনিতেই জমি দখল করে নিচ্ছে, কাজেই কারো কেনার গরজ নেই। বুড়ো লোকটা বিক্রী করতে চেয়েছে অনেকবার পারেনি। বিশু ঠিক করেছিল, এবার বুড়ো এলে কিছু থোক টাকা ধরে দিয়ে দশকাঠার মতো জমি নিয়ে হাসিল করবে। পুকুর বলে সস্তাও হবে, বুড়ো ফাঁদে পড়ে ছেড়েও দেবে। কারণ এমনিতেই বেহাত হচ্ছে। বৃষ্টির পর সেই পুকুরের অবস্থা দেখে একটু দমে গেল বিশু। পাঁচ লরী মাটি বৃষ্টিতে ধুয়ে নিয়ে গেছে। পয়সাটা জলে গেল। মাছের চারা ছেড়েছিল কিছু, ভেসে গেছে।

সকালে বিশু মুনিষ জন নিয়ে পুকুরটার ভিতরে জলে একটা বাঁধ দেওয়ার চেষ্টা করছিল। জলে কাদায় মাখামাখি অবস্থা তার। বাঁধ না দিলে তার ঘরের ভিত ডুবে যাবে এর পর। চারিদিক থেকে পুকুরে মাটি পড়ে পড়ে জল ফুলে উঠেছে। পাম্প করে জলটা বের করে দেওয়ার কথা কেউ ভাবেনি, নালা-টালাও কেটে দেওয়া হয়নি। কাজেই পুকুরের জমা জল এখন বৃষ্টি পেলেই ফুলে উঠে চারিদিকে ভাসায়। এরকম চললে ভেষজের বাগান চুলোয় তো যাবেই, পোলট্রিও তুলে দিতে হবে।

সারা সকাল ভাঙা ইঁট, কাঠের কুঁদো, পুরোনো টিন এসব নানা জিনিস দিয়ে ভুস্‌ভুসে পচা কাদায় জলে একটা বাঁধ দেওয়ার বৃথা চেষ্টা করেছে সে। মুনিষরা হেসে আকুল। তারা বলে—পুরো পাড়টা বাঁধাবেন তবে তো। একটুখানি জায়গায় বাঁধ তুললে জল আটকাবে না।

কোনক্রমে বাঁশের খোটা পুঁতে ইট ফেলে, টিন খাড়া করে একটা কিম্ভূতাকার বাঁধ দাঁড় করিয়ে বিশু এসে হাত পা ধুচ্ছিল। দুটো মুর্গীকে ঝিমুনী ধরেছে। তাদের খাঁচা থেকে বের করে ফেলে রাখা হয়েছে চালা ঘরে। কেটে কুটে বাজারের হোটেলে পাঠিয়ে দেবে। আর কটা মুর্গীর ঝিমুনী লাগতে পারে সেটা চিন্তা করতে করতে বিশু ঘরে এসে গামছা নিয়ে স্নানে বেরোতে যাবে, ঠিক সে সময়ে দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল মেঘলা আকাশের নীচে ছাইরঙা আলোয় চালতাতলার রাস্তা দিয়ে একটি বাহারী মেয়ে আসছে। কমলা রঙের শাড়ি, গায়ে একটা বাটিকের কাজ করা খদ্দরের চাদর, হাতে বেঁটে ছাতা। গাছপালার ভিতরে মুখটা দেখা যায় না, কিন্তু গায়ের অসম্ভব ফর্সা রঙটা ঝিলিক দেয়।

বিশু এক লাফে বারান্দা থেকে নামল। সামনের ছোট্ট জমিটা পার হয়ে গেট খুলে দুহাত ওপরে তুলে চেঁচিয়ে বলল—বনা!

বনলতা চারদিকে চাইছিল, বিশুকে দেখে হাসল একটু।

—কর্তাকে নিয়ে এলি না?

boiRboi.net

বনলতা কাছাকাছি এসে ভ্রূ কুঁচকে একটু দেখেই বলল—একেবারে গাঁইয়া হয়ে গেছিস।

—একেবারে!

—তোর মাছ আর হাঁস মুর্গী দেখতে এলাম।

বিশুর মাথা থেকে তেল গড়িয়ে নামছে, গায়েও তেলমাখা হাতের থাবড়া দেখা যাচ্ছে, ডলা মারার সময় পায়নি। ঘরে এনে বিছানায় বনলতাকে বসিয়ে বলল—বোস, দুটো ডুব মেরে আসি।

বনলতা দম নিয়ে বলল—বিশু, তিনটে তিরিশের গাড়িতে তুই আমার সঙ্গে কলকাতায় যাবি।

—কেন?

—কাজ আছে।

—কী কাজ?

—স্নান করে খেয়ে নে তাড়াতাড়ি। বলছি।

বিশু বনলতার মুখখানা একপলক দেখে ঘাড় হেলিয়ে বলল—বনা, তোকে খুব হ্যাপী দেখাচ্ছে। কোনো খারাপ কিছু হয়নি যে সে সম্পর্কে আমি সিওর।

—খারাপ কী হবে?

একটু দোনোমোনো করে বিশু বলল—তোর সম্পর্কে কেবল খারাপ চিন্তা আসে। সেদিন তোর বাড়িতে গিয়ে তোকে ভাল দেখে আসিনি বনা।

বনলতা হাসছিল। বলল—খারাপের কী! ভালই আছি।

—না, তুই ভাল ছিলি না সেদিন, আজ তোকে ভাল দেখাচ্ছে।

—তুই ডুব দিয়ে আয়।

—তুই দুটো ভাত খাবি আমার সঙ্গে বনা? ডিমের ওমলেট করব, ভাল মাছ আছে খাবি?

বনলতা মাথা নাড়ে—না রে।

বিশু মায়াময় চোখে তাকিয়ে বলে—তুই বরাবর কম খাস, কিছু খেতে চাস না কখনো।

—তুই যা তো।

বিশু গেল। আনন্দে সে শিস দিচ্ছিল। তার পায়ে এক আনন্দিত চঞ্চলতা। পুকুরের বাঁধ বা মুর্গীর ঝিমুনী রোগের কথা সে একদম ভুলে গেল। বাচ্চা যে ছেলেটা বিশুর সব কাজকর্ম করে সে ছিপ নিয়ে বসে ছিল পুকুরের ধারে। তার পিঠে দুই থাবড়া মেরে বিশু তুলে দিল। বলল—দৌড়ে যা, ঘরে এক দিদিমনি বসে আছে দেখবি, আমার বোন হয়। তাকে এক কাপ দুধ গরম করে দিবি। দুধ খেতে না চাইলে চা করে দিবি। যা।

ছেলেটা দৌড়োলো।

বিশু ঝাঁপ দিল জলে।

তিনটে তিরিশের গাড়িটা পেয়ে গেল তারা। রাণাঘাট লোকাল প্রায় ফাঁকাই এ সময় বিশু বনলতাকে জানালার ধারে বসাল, চীনেবাদাম কিনে এনে দিল

boiRboi.net

একরাশ। স্টেশনে চেনা লোক অনেক। গাঁ গঞ্জের লোক সব, কৌতূহল চেপে রাখতে পারে না। জিজ্ঞেস করে—সঙ্গে উনি কে গো বিশুদা ?

বিশু তার গরবী মুখখানা তুলে বলে—বোন হয়।

—তোমার তো তিনকূলে কেউ—

কথা শেষ হয় না, বিশু প্রায় ধমকে বলে—এইটুকু বেলা থেকে আমরা একসঙ্গে মানুষ, রক্তের সম্পর্কের চেয়ে বড় সম্পর্ক।

তারপর চাপান সারের কথা আসে, পাম্পসেট ভাড়ার কথা আসে, অস্ট্রেলিয়ান গো-বীজের কথা উঠে পড়ে। নানাজনের সঙ্গে এরকম ইণ্টারভিউ দিতে দিতে গাড়ির ভো বাজে। বিশু লাফিয়ে গাড়িতে ওঠে। বনলতার পাশে বসতে বসতে তৃপ্ত মুখে বলে—সবাই চেনে আমাকে।

—তাই দেখছি। বলে বনলতা হাসে। চীনে বাদাম আঙুলের চাপে ভাঙতে পারে না বনলতা, দাঁতে কামড়ে ভাঙ্গে।

দেখে বিশু ভ্রূ কুঁচকে বলে—কত জীবানু থাকে খোসায়।

—তো তুই ভেঙ্গে দে।

বিশু খোসা ছাড়িয়ে দিতে থাকে। বনলতা সস্নেহে ওর দিকে চেয়ে থেকে বলে—গাঁইয়া কোথাকার !

—কী কথা বলবি বলছিলি যে !

বনলতা, এতক্ষণ সব ভুলে ছিল। এবার মনে পড়ে গেল—বনলতা, জগন্নাথ, বিয়ে। সব। একটা শ্বাস ফেলে বলল—তেমন কিছু না। তুই আজ একবার বাবার কাছে যা।

—গিয়ে ?

—তুই বলিস, বনলতা একবার দেখতে চায় আপনাকে। একবার একটুক্ষণের জন্য।

বিশু উদাস মুখ করে বসে রইল একটু।

তারপর বলল—বলার কী ! তুই সোজা বাড়িতে চল না। তাড়িয়ে তো দেবে না !

বনলতা মাথা নাড়ল—না। সে ভারী লজ্জা করবে আমার, তার ওপর প্রেশারের রুগী, হঠাৎ আমাকে দেখে যদি ব্যস্ত হয়ে পড়ে ?

—তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু তুই হঠাৎ বুড়োকে দেখতে চাস কেন ?

—এমনিই। প্রায় রাত্তিরে আমি বাবাকে নিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখি।

—স্বপ্ন স্বপ্নই।

বনলতা বাদাম খাওয়া বন্ধ করে বাইরের চলমান প্রকৃতির দিকে খানিক চেয়ে রইল। তারপর হাতের দলাপাকানো রুমাল তুলে চোখের ওপর চেপে ধরল একটু।

গলাটা ধরে গেছে, যখন কথা বলল তখন লক্ষ্য করল বিশু। বনলতা বলল—তা ছাড়া আমি বার্ণপুরে একটা মাস্টারী নিয়ে চলে যাচ্ছি। সামনের মাসে জয়নিং ডেট। কলকাতায় আর আসা হবে না।

বিশু চমকে বলে—কোথায় চলে যাচ্ছিস ?

boiboi.net

—বার্ণপুর।

—কেন বনা ?

—তোমাদের প্রফেসর বোস বিলেত চলে যাচ্ছে। একা আমি কোথায় থাকবো ? ওরা অবশ্য আমাকে শ্বশুর বাড়িতে নিয়ে যেতে চায়, গতকাল আমার শ্বশুর শাশুড়িও এসেছিল সেই কথা বলতে। কিন্তু আমি যাবো না।

—যাবি না কেন ?

—এমনিই। বড় সংসারে থাকতে আমার ভাল লাগবে না। তার চেয়ে বাইরে মাস্টারি নিয়ে থাকতে ভালই লাগবে। হস্টেলে ওরা জায়গা দেবে লিখেছে।

বিশু একটু ভেবে বলে—কাজটা ভেবেচিন্তে করেছিস তো ?

বনলতা আস্তে আস্তে বলল—ভাবনা চিন্তা করার মতো মাথার জোর আর আমার নেই। কী করছি, ভাল না মন্দ কে জানে! আমার হয়ে ভাববারও তো আর কেউ নেই। কাজেই, যা ভাল বুঝছি করছি। যা হওয়ার তা হবে।

বিশু হঠাৎ সচেতন হয়ে বলে—কাকাবাবুর কাছেই ফিরে যা না বনা।

—বাবা আমাকে আর নেবে না।

—কে বলল—আমি গিয়ে রাজি করাবো। আজই।

বনলতা ম্লান হাসে—আমি বাবারই মেয়ে বিশু। জেদ আমারও কিছু কম নয়। বাবার কাছে আমি থাকব না। শুধু বাবাকে একবার দেখতে চাই। বাড়িতে ঢুকবোও না। বাবা বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকবে, আমি নীচের রাস্তায় দাঁড়িয়ে দূর থেকে এক মিনিটের জন্য দেখে নেবো।

বিশুর চোখ ছলছল করছিল। সে বলল—কী সব বলছিস ? অত নাটক করার দরকার নেই। চল্ আজই তোকে কাকার কাছে নিয়ে যাই।

—দূর বোকা! এতক্ষণ তবে কী বললাম তোকে ? বাবা আমাকে দেখলেই উত্তেজনায় হঠাৎ একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসবে।

বলে বনলতা আবার চোখ চেপে ধরে রুমালে। কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে না।

বিশু অপেক্ষা করে।

—তারপর এক সময়ে বলে—বোস সাহেবের সঙ্গে তোর কিছু হয়নি তো ?

—কী হবে ? কিছু হয়নি।

—বোস সাহেবের জন্য একদিন সব ছেড়েছুড়ে এলি, কাকাবাবুর কথা তখন তো ভাবিসনি বনা! আজ আবার কাকাবাবুর জন্য অস্থির হয়েছিস। তার মানে যার মুখ দেখে সব ভুলে ছিলি, তার মুখ এখন আর তোকে ভুলিয়ে রাখতে পারছে না।

বনলতা তার লালচে চোখ করে বিশুর দিকে তাকায়। তারপর হঠাৎ একটু হাসে।

বলে—তোকে যতটা গাঁইয়া ভেবেছিলাম ততটা তুই নোস তো! কী সুন্দর সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলছিস!

BoiRboi.net

—ইয়াকী দিস না বনা। আমি সিরিয়াসলি বলছি। বোস সাহেবের সঙ্গে তোর কিছু হয়নি তো ?

—না রে। ভদ্রলোকদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হয় না। তাদের সম্পর্ক খুব ভদ্র থাকে, কেবল ভিতরে একটা সুইচ অফ্ হয়ে যায়। টেরও পাওয়া যায় না।

বিশু কথাটা না বুঝে তাকিয়ে রইল।

বনলতা জানালার ধারে মাথাটা হেলিয়ে বলে—অনেকটা ট্রেন জার্নি করেছি, আজ আর আমাকে বকাস না বিশু আমি একটু চোখ বুজে থাকি।

—থাক। বলে বিশু সাবধানে শাটার বন্ধ করে দিচ্ছিল।

—বন্ধ করছিস কেন ?

—এ লাইনে মাঝে মাঝে চাষার ছেলেরা গাড়িতে পাথর ছুঁড়ে মারে।

বনলতা স্নিগ্ধ হেসে চোখ বন্ধ করল।

শিয়ালদা থেকে দুজন আলাদা হয়ে গেল।

বিশু যাওয়ার সময়ে বলল—বড্ড নাটুকে ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে রে। কাকাবাবুকে ঐ বারান্দায় দাঁড়ানোর কথা বলাটা যে কী শক্ত কাজ !

বনলতা হাসল, বলল—শক্ত কাজ বলেই তো তুই পারবি। তুই সোজা কাজ কবে পেরেছিস ?

—তবু, বড্ড যাত্রার ঢঙের ব্যাপার হয়ে যাবে। বরং তুই একদিন বাড়িতে আসতে চাস, সেই কথা বলে আসবো।

—না বিশু, আমি বাড়িতে ঢুকবো না।

বিশু হাসল, বলল—পাগল !

শীতের বেলা ধপ করে ফুরিয়ে যায়। শিয়ালদার জ্যাম্ পার হতে হতেই বিশুর সন্ধে হয়ে গেল। যখন বনলতাদের বাড়ীতে পেঁছালো তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে।

সিঁড়ি ভেঙে ওপরতলায় এল। সদরটা খোলা। বোধহয় দরজা খুলে রেখে বাচ্চা চাকরটা কোথাও গেছে। ঘরে এল।

সামনের ঘর পার হয়ে বিশু ভিতর দিককার ঘরে এল।

জানালার কাছে ইজিচেয়ার। তাতে আধশোয়া বসে আছেন বনলতার বাবা। আবছা দেখা যায়, আঙুলের ফাঁকে অন্যমনে ধরে থাকা সিগারেট পুড়ে যাচ্ছে। পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়া।

বিশু ডাকল না। চেয়ে রইল। লোকটা এখন বনলতার কথা ভাবছে বোধহয় !

বিশু একটা দীর্ঘ শ্বাস খুব নিঃশব্দে ছাড়ল। দৃশ্যটা দেখতে তার খুবই ভাল লাগে। বড্ড করুণ আর সুন্দর। দৃশ্যটা ভেঙে দিতে ইচ্ছে হয় না।

কিন্তু বিশুকে ফিরতে হবে। রাত আটটার ট্রেনটা ধরতে না পারলে বড্ড অসুবিধে। ঝিমুনী লাগা মুর্গী দুটোর ব্যবস্থা করে আসেনি। অনেক কাজ পড়ে আছে।

boirboi.net

বিশু ইজিচেয়ারের পিছন দিকটায় হাত রেখে ডাকল—কাকাবাবু !

উনি চমকে মুখ ফেরালেন—কে ?

—আমি বিশু।

—ও। কী খবর ?

—ভালই। কেমন আছেন ?

—খারাপ কী ?

বিশু হাসল।

—আজ অফিসে যাননি ?

—গিয়েছিলাম। কামাই বড় একটা করি না।

বিশু আর কথা খুঁজে পেল না।

বনলতার বাবাই আবার বলেন—কাল বেরিয়ে পড়ছি

—কোথায় ? বিশু একটু অবাক হয়ে বলে।

—প্রথমে বেনারস। তারপর উত্তরে, হিমালয়ের দিকে। দিল্লী আগ্রা ঘুরে মাস দুই পরে ফিরবো, যদি বেঁচে থাকি।

—হঠাৎ বেরোচ্ছেন কেন !

—একা ভাল লাগে না।

—যাওয়ার আগে বনলতাকে একটা খবর দেবেন না ?

উনি মুখ তুলে অন্ধকারেই বিশুর দিকে তাকানোর চেষ্টা করে বললেন—তাকে জানানোর কী ? সে কি জানতে চায় ?

—চায় কাকাবাবু। বনলতা আপনার জন্য বড় কান্নাকাটি করে।

—তুই কি সেখানে যাস ?

—যাই।

—ঘরদোর কেমন দেখলি ? ভাল আছে ?

—আছে।

—তবে আর কী।

বলে উনি চুপ করে খানিকক্ষণ ভাবেন। তারপর মুখ তুলে বলেন—বিয়ের পর মেয়েরা যত তাড়াতাড়ি পর হয়ে যায় ততই ভাল। বাপের বাড়ির টান থাকলে মেয়েরা সুখী হয় না। বনার সঙ্গে কখনো দেখা হলে কথাটা আমি বলেছি বলে বলিস।

—বলব।

—সেই ছোকরাটা কি প্রফেসারী করে ? কেমন ছেলে ?

—ভালই।

—বনার সঙ্গে সম্পর্ক কেমন ?

—ভাল।

—তবে বনা কাঁদে কেন? কাঁদতে বারণ করিস। বেশী কান্নাকাটি করলে ছোকরাটা হয়তো ভাববে বনার বাপের বাড়ির টান বেশী রয়ে গেছে। পুরুষেরা চায় তাদের বৌ একেবারে তাদেরই হয়ে যাক।

—তাই কি হয় ? বনা আপনার কাছে একবার আসতে চায়।

boiRboi.net

—তার আর সময় কৈ—কাল বিকেলে আমার গাড়ি।

—যদি অনুমতি দেন তো কাল সকালে ওকে নিয়ে আসি। বাইরের রাস্তায় ও দাঁড়াবে, আপনি বারান্দা থেকে ওকে দেখা দেবেন।

উনি সবিস্ময়ে মুখ তুলে বলেন—বাড়িতে আসতে পারে। তবে কাল সারাদিন আমার অনেক কাজ। অফিসেও যেতে হবে।

—ওর বর বিলেত চলে যাচ্ছে! তিনচার বছরের জন্য।

—বিলেতে! কেন?

—ফর হায়ার স্টাডিজ।

উনি চুপ করে থাকেন। একটু পরে বলেন—বনা কোথায় থাকবে? শ্বশুর বাড়িতে? নাকি সেও সঙ্গে যাচ্ছে?

—না। বনা চাকরি নিয়েছে বার্ণপুরে, মাষ্টারি।

উনি আবার চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন—কৌশিকও বিলেতে গেছে।

—কে?

—কৌশিক। ছেলেটার কথা প্রায়ই মনে পড়ে। বড় ভাল ছেলে ছিল।

—জগন্নাথও ভাল ছেলে!

উনি শ্বাস ছেড়ে বলেন—হবে। আজকাল ভাল ছেলেতে দুনিয়া ভরে যাচ্ছে। সবাই ভাল।

—বনাকে কি কাল আনবো?

—না।

—কেন?

—আমার সুন্দর মেয়েটাকে যদি একটু রোগা বা একটু বিমর্ষ দেখি তবে আমার মাথায় আগুন জ্বলে যাবে। তার চেয়ে না দেখাই ভাল। কষ্টটা প্রায় সয়ে এসেছে। এটাকে আবার বাড়তে দেওয়া ঠিক হবে না।

—আপনি কি এখনো একটুও ক্ষমা করেননি?

উনি চুপ করে হাতের ওপর থুতনী রেখে সামনে চেয়ে রইলেন একটু। তারপর বললেন—আমি ক্ষমা করার কে? কামুন কায়েতে বিয়ের নিয়ম নেই, সেটা বহু যুগের প্রথা। সে বিয়ে ভাঙার অধিকার আমার নেই। কেউ যদি ভাঙে তাকে আমি ক্ষমা করার অধিকারীও নই। সে সমাজের কাছে অপরাধী। আমার ক্ষমায় কী যায় আসে?

—নিয়মটা আজকাল সবাই ভাঙছে, ঘরে ঘরে হচ্ছে।

—নিয়মটা লোকে ভাঙছে, তবু নিয়মটা কিছু আছেই। পাল্টে যায়নি। বিধান কি লোকের ইচ্ছেয় বদলায়?

—বনা যদি সুখী হয় তবে?

—বনাকে কি তুই সুখী দেখলি?

বিশু একটু ইতঃস্ত করে। বলে—সুখীই তো!

—তবে কাঁদে কেন?

—সে আপনার জন্য।

boiRboi.net

—আমার জন্যই বা কাঁদে কেন? বাপের বাড়ির জন্য কোন মেয়ে দিনের পর দিন কাঁদে? বরং বিয়ের পরই তারা কিছুদিন খুব সুখে থাকে, স্বামীর আদর-সোহাগ, নতুন সংসারে নতুন লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা—এসব তো বড় সুন্দর ব্যাপার। বনা তবে কাঁদে কেন?

বিশু চুপ করে থাকে।

উনি গম্ভীর গলায় বলেন—বনা সুখী নয়।

বিশু একটু চমকায়।

উনি আবার বলেন—কিন্তু সেটা আমার কাছ ছাড়া হয়ে আছে বলেও নয়। আমি সবই টের পাই।

বিশু মেঝের ওপর অনেকক্ষণ বসে রইল।

বাচ্চা চাকরটা ফিরে এসেছে। বাইরের ঘরের বাতি জ্বালল। রান্নাঘরের টুকটাক শব্দ আসছে। দরজা বরাবর ওঘর থেকে একটা বাঁকা চৌকো আলো এসে এ ঘরে পড়েছে। তার ক্ষীণ আলোর আভায় বিশু দেখে কাকাবাবুর মুখখানা বড় উদাসীন, যেন বা পৃথিবীর সব প্রিয়জনের মুখ ভুলে-যাওয়া এক বৈরাগ্য। প্রকৃত এক তীর্থযাত্রীর মতো দেখাচ্ছে তাঁকে।

বিশু আচমকা জিজ্ঞেস করে—বনার কী হবে—কাকাবাবু?

উনি তেমনি অচঞ্চল ভাবে বললেন—বিশু, বনা কখনো সুখী হবে না।

—কেন?

—ওর ভাগ্য। বড় বেশী আদরে মানুষ করেছি বলে ও একটু স্বেচ্ছাচারী হয়েছিল। এখন কর্মফল ভোগ করছে। আমিও করছি। তুই মাঝে মাঝে ওকে দেখতে যাস।

—যাবো।

বিশু উঠল। শরীরটা বড় ভার ভার লাগছে তার। মনটা অন্ধকার। একটু জ্বর জ্বর ভাব। বলল—চলি, কাকাবাবু।

—আয়।

বনলতাকে একবার খবর দিয়ে গেলে হত, একবার ভাবল। তারপর ভাবল—থাক, কিছুটা সময় বনলতা অপেক্ষাকৃত সুখে থাক। তারপর তো জানবেই।

BoiRboi.net

এগারো

ঘর ফাঁকা, গতকাল বনলতা বার্ণপুরে চলে গেছে।

আসবাবপত্রগুলো জলের দরে বেচে দিয়েছে জগন্নাথ। কিছু বাসনপত্র বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে। জগন্নাথ মেঝেতে বিছানা পেতে শোয়। তার সুটকেস ট্রাংকেস সব গোছানো হয়ে গেছে। পরশুদিন দমদম থেকে তার প্লেন ছাড়বে। অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। এ কয়দিন তাকে বাড়িতে থাকার জন্য মা বাবা

বারবার বলেছিল। জগন্নাথ রাজি হয়নি। তার আর বনলতার সম্পর্ক নিয়ে পাছে কোনো প্রশ্ন ওঠে।

বনলতার কথা দীর্ঘ সময় ধরে মনে পড়ে।

দুপুরে ঘুমিয়ে উঠে জগন্নাথ সিগরেট ধরিয়ে আধশোয়া হয়ে বসে ছিল। ফাঁকা ঘরটা কী ভীষণ বিষণ্ণ লাগছে। রোদ-মরা আলোয় ঘরটায় ঘুলিয়ে উঠছে অন্ধকার। জগন্নাথ চেয়ে থাকে। অনেকদিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল।

সেদিন তারা সদ্য এক ঘরে প্রথম থাকছে। এক বিছানায় দুজনের মধ্যে কোনো সংশয়ের লেশমাত্র ছিল না। কত এলোমেলো, পাগলাটে ভালবাসার কথা বলেছিল তারা। তারপর এসেছিল সেই সময় যখন তারা শরীরে শরীর দিয়েছিল। সেই প্রথম আনন্দময় উন্মোচনের মুহূর্তে, সুন্দর ক্ষণটিতে হঠাৎ বনলতা একটা অস্ফুট চীৎকার করেছিল, ঠেলে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল জগন্নাথকে। জগন্নাথ ঠিক বুঝতে পারেনি কী হয়েছিল। সে ছাড়েনি। আর তখন হঠাৎ জগন্নাথকে চমকে দিয়ে বনলতা তার কোমরে একটা লাথি মেরেছিল, বলেছিল—এত পশু কেন তুমি ?

বড্ড অপ্রস্তুত হয়েছিল জগন্নাথ, অপমানে লজ্জায় উঠে বসে সে তাড়াতাড়ি তার শরীর ঢেকে বসে রইল। অনেকক্ষণ ধরে হাঁফিয়েছিল বনলতা। ঘামা মুখে ফ্যানের তলায় বসে উদভ্রান্তের মতো চেয়ে রইল সামনের দেওয়ালে। তারপর জল খেয়ে শান্ত হয়ে বলল—আমার এসব করতে ঘেন্না হচ্ছে।

জগন্নাথ কথা বলেনি।

বনলতা হঠাৎ মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলে বলল—ভীষণ নোংরা লাগছে, বুঝলে !

জগন্নাথ ভেবেছিল, অভিজ্ঞতার অভাব আর শৈশব থেকে লালিত সংস্কারই এর কারণ। সে বলেছিল এটা স্বাভাবিক ব্যাপার, এতে নোংরামীর কিছু নেই বনলতা।

বনলতা অনেকক্ষণ কেঁদে বলল—জানি। আমার কোনো গোঁড়ামী নেই। কিন্তু হঠাৎ ঐ সময়টায় আমার ভিতরে কী যেন হচ্ছিল—

—কী ?

—ঠিক বোঝাতে পারব না। কী একটা যেন ভেঙেচুরে যাচ্ছে, কারা যেন আমার ভিতর থেকে চীৎকার করে বলছে—একাজ কোরো না, এ মহাপাপ।

জগন্নাথ একটু হেসে বলেছিল—ওসব ভিশন। তোমার কল্পনা।

তারপর ধীরে ধীরে তারা ব্যাপারটা স্বাভাবিক করে ফেলেছিল। বনলতা আর পাগলামী করত না।

কিন্তু বনলতার সেই লাথিটার কথা কোনোদিনই জগন্নাথ ভুলবে না।

আজ সেই ঘটনাটা বড্ড বড় হয়ে জগন্নাথের মনটাকে আচ্ছন্ন করল। সে ভাবতে লাগল, বনলতাকে সম্পূর্ণ পাওয়ার মুহূর্তে সেই রূঢ় প্রত্যাখ্যান। তারপর আবার তাকে নিয়েছিল বনলতা। নাকি সে ঠিক গ্রহণ নয় ? তবে কি প্রতিটি রতিক্রিয়াই ছিল বনলতার আত্মবিসর্জন ?

জগন্নাথ জেনে গেছে, বনলতার ঘরে তার আর ফেরা হবে না। ভাগ্য ভাল, বনলতা আজও সন্তানসম্ভবা হয়নি। হলে ঝামেলা হত। বনলতার সঙ্গে প্রায় অকারণেই বোধ হয় তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, জন্মের শোধ। কিংবা কঠি

boiRboi.net

অকারণেও নয়! গূঢ়নিহিত কোনো কারণ ছিলই যা বুঝতে অনেকদিন সময় লাগবে।

সহজে ফিরবে না জগন্নাথ। সে যাবে দূরে। আরো বহু দূরের নিকটে। সেই সংস্কৃত শ্লোকটা তার কেবলই মনে পড়ে। হে অচ্যুত, দুই দলের মাঝখানে আমার রথ স্থাপন কর, আমি দেখি কিভাবে যোদ্ধৃবৃন্দ অবস্থান করছে, আজকের সমুদ্যত রণে কার সঙ্গে আমার যুদ্ধ। অবশ্যম্ভাবী এই শ্লোকের সঙ্গে অরিজিতের মুখখানা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। গরঠিকানিয়া অরিজিৎ, ভবঘুরে, পৃথিবীর যুদ্ধক্ষেত্রে যে বেরিয়ে পড়েছিল।

জগন্নাথের সুখের আড়াল গেছে সরে। সামনে মস্ত পৃথিবী। অবারিত মানুষের সমাজ। ঘর ভাঙার দুঃখ থাকে থাক। জগন্নাথ একবার সেই যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়াবে। মৃত্যুর আগে অন্তত এক মুহূর্তের জন্যও সে নিজেকে সঠিক অনুভব করতে চায়।

সিগারেটটা ফেলে দিল জগন্নাথ। হাসল একা একা। বড় ভাবপ্রবণ হয়ে যাচ্ছে সে। বয়স হচ্ছে না তোমার, জগন্নাথ! যে বয়সে লোকে ঘরে ফেরে সেই বয়সে ঘর ছাড়ার কথা কেউ ভাবে?

অরিজিৎ একটি মেয়েকে পছন্দ করে এসেছে কল্যাণী থেকে। শীগগীরই বিয়ে। জগন্নাথ সাদা দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে রইল। মুখে একটু বিষণ্ণ হাসি। অরিজিৎ আর কখনো বেরিয়ে পড়বে না। কী আশ্চর্য! গৃহস্থ অরিজিতের কথা ভাবতে তার বড় হাসি পায়।

জগন্নাথ ভাবতে লাগল। কখনো হাসল, কখনো গম্ভীর আর বিষণ্ণ হয়ে গেল। তার মাথার ভিতর দিয়ে কখনো বনলতা কখনো অরিজিৎ, কখনো সেই ফটোতে দেখা কৌশিক এবং আরো কত মুখ ভেসে যেতে লাগল।

বারো

একটা উড়োজাহাজের শব্দ কেন যে বারবার শোনে বনলতা।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে উঠে বসে। ঠিক বুঝতে পারে না। কোথায় আছে! তাদের এনটালির বাড়িতে, না কি জগন্নাথের সঙ্গে পাইকপাড়ায়! ঝিমুনী কেটে গেলে খেয়াল হয়, এটা হস্টেল, এটা বার্ণপুর। বর্ধমান জেলা।

ছোট্ট ঘরে দুটো বেড। অন্যটায় আর একজন মিসট্রেস থাকে। তার বড় নিঃসাড় ঘুম।

উড়োজাহাজের শব্দটা ভাল করে শুনবার জন্য বনলতা জানলায় এসে দাঁড়ায়। বন্ধ পাল্লা দুটো খুলে শিকের ফাঁক দিয়ে মুখখানা বের করে দেয় যথাসম্ভব। শীত-হাওয়া এসে লাগে, ঠান্ডা লোহার শিক গালে লেগে গাল কন্ কন্ করে। চোখে জল আসে। তবু প্রাণপণে কুয়াশার ভিতরে চেয়ে থাকে বনলতা। একটা উড়োজাহাজ অবিরল উড়ে যাচ্ছে, দূর থেকে দূরে। কিন্তু সে মিলিয়ে যায় না।

boiRboi.net

া কল্পনায় থেকে যায়। থাকে হৃদয় জুড়ে।
কাছাকাছি কোনো নদী নেই। তবু বনলতা এই মাঝরাতে দোতলার জানালা
লে টের পায়, অদূরে এক নদী বয়ে যাচ্ছে। কী মিষ্টি তার ঝর্ণা-ঝরা শব্দ।
রে একটা অন্ধকার দূর পৃথিবী। বনলতা তার এই জীবনে যত মানুষকে
বেসেছিল সবাই সেই ওপারে রয়েছে। একটু দূরে। কিন্তু ঠিক কেউই হারিয়ে
ন। ততদিন হারাবে না যতদিন উড়োজাহাজের শব্দটা তার থাকবে। মস্ত
বটা তার প্রিয়জনদের টেনে নিয়ে গেছে।
বনলতা নিঃশব্দে সাবধানে আবার জানালা বন্ধ করে ফিরে আসে। শোয়।
র অবিরত জলধারায় ভাসে তার চোখ। উড়োজাহাজের ম্লান শব্দটাই তাকে
আস্তে আস্তে ঘুম পাড়াতে থাকে।

boiRboi.net

boiRboi.net

শূন্যের উদ্যান

boiRboi.net

boiRboi.net

গেরো। শালার মিছিল।

গৌরহরি ঘাড় ঘুরিয়ে বলল—এ রাস্তায় গাড়ি যাবে না দাদা।

পিছনের সীটে মুখে উদ্বেগ নিয়ে বসে আছে চশমা-পরা মোটাসোটা গোলগাল যুবকটি। মুখে ঘেমো ভাব। চশমাখানা পিছলে নাকের ডগার দিকে নেমে এসেছে। খুবই বোকাটে আর অসহায় দেখাচ্ছে তাকে। ফরসা মুখখানায় লালচে আভা। মানুষের যে কত রকমের বিপদ আছে! এ ছেলেটার কীরকম বিপদ কে জানে! গৌরহরি অতশত জানে না। জানার দরকারই বা কী! সব মানুষই চলেছে নিজের নিজের গলিপথে। সে সব প্রাইভেট গলিপথ। সব মানুষের জীবনই প্রাইভেট গলিপথ—সেখানে গৌরহরির ট্যাক্সি ঢোকে না।

ছেলেটা বলল—তাহলে কী হবে! আমার যে খুব তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার—

—দেখছেন তো মিছিল! এর ল্যাজা মুড়ো কোথায় কে জানে! সামনেটা হয়তো কলজে স্ট্রীট পেরোচ্ছে, পিছনটা বোধহয় শ্যামবাজারের পাঁচমাথা পেরোয় নি।

—কিন্তু আমার ভীষণ তাড়াতাড়ি দরকার—

গৌরহরি বিড়বিড় করে আপনমনে হিন্দীতে বলে—তব ক্যা করুঁ। উড়কে যাঁউ!

ছেলেটা অসহায়ভাবে বলে—দেখুন যদি গাড়িটা ঘোরাতে পারেন। সারকুলার রোড দিয়ে আরো নর্থে গেলে বোধহয় মিছিলটা এড়ানো যাবে।

গ্রে স্ট্রীটে এখন গায়ে গায়ে গাড়ি জমে আছে। ভিড়ের মধ্যে বদ ছোকরারা যেমন মেয়েদের গায়ে গা ঘষে সেরকমই গা ঘষটাচ্ছে গাড়ি। একটা লম্বা প্লিমাউথ গৌরহরির ট্যাক্সির ডানদিকে এসে দাঁড়াল, দরজা খোলারও জায়গা রইল না।

—এই প্রাইভেট। গৌরহরি চেঁচাল—এটা কী হচ্ছে অ্যাঁ! এটা কি ধরনের ইণ্টারফিয়ারেন্স!

ইংরিজি শব্দটা গৌরহরি উচ্চারণ করল ঠিক যেমন ঢাকার ইংলিশ স্কুল সেণ্ট অ্যাণ্টনিজ-এর ফাদার ইভান্স উচ্চারণ করত। আজও যখন গৌরহরি মাঝেমধ্যে এক আধটা ইংরিজি বলে তখন সমঝদার মানুষ তাকে একটু চেয়ে দেখে। এ সব উচ্চারণ সেই ইঞ্জলিশ স্কুলে শেখা, পাক্কা সাহেবদের কাছে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সেণ্ট অ্যাণ্টনিজ-এর শেষ ক্লাস পর্যন্ত পেঁছিয় নি গৌরহরি। পর পর দু'বছর টাইফয়েড আর পোলিও তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিল। টাইফয়েড নিয়েছিল গৌরহরির মগজটাকে, পোলিও নিল বাঁ-হাত আর বাঁ-পা। এখনো উত্তেজিত হলে গৌরহরির মাথার মধ্যে কেমন ঝম্ঝম্ একটা শব্দ হয়। পাগল পাগল লাগে। টাইফয়েডের পর সে যখনই বইপত্র নিয়ে পড়তে বসেছে, তখনই কিছুক্ষণ একটানা পড়ার পর মাথায় কোথাকার কোন সাজঘর থেকে দুখানা নূপুর-পরা পা তার মাথার মঞ্চে চলে আসত নাচতে নাচতে। কীরকম রিম্‌ঝিম্ শব্দ হতে থাকত। তখন গৌরহরি প্রায়ই সেই শব্দে সম্মোহিত হয়ে বসে থাকত, চোখের সামনের সব দৃশ্য মুছে গিয়ে ফুটে উঠত এক শূন্যতার দৃশ্য। আর কেবল সেই শব্দ আর শব্দ। রিম্‌ঝিম্—দুখানা নাচের পা

ঘুরেছে, উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম দিচ্ছে গুলিয়ে। সেই শব্দে তার সব বোধ ডুবে যেত। তার বাবা বগলাপতি ডাকসাইটে ব্যবসাদার, টিকাটুলিতে সাহেবের বাড়ির মতো বাড়ি করেছিলেন। সব ছেলেকে বিলেত ঘুরিয়ে আনবেন—এরকম সংকল্প ছিল তাঁর। বড় দুই ছেলে সেণ্ট অ্যান্টনিজ পার হল, কিন্তু গৌর পারল না। গিরিশ ডাক্তার, সাহেব ডাক্তার, কলকাতার স্পেসালিস্ট—কেউই সেই শব্দটাকে বন্ধ করতে পারল না। বগলাপতি আপনমনে অনেক গাল দিলেন ছেলেকে, ডাক্তারদের এবং নিজের ভাগ্যকে। অবশেষে স্কুল ছাড়িয়ে গৌরহরিকে অসাধ্যসাধন থেকে মুক্তি দিলেন। বাড়িতে মাস্টারের কাছে গৌর পড়ত একটু আধটু। পড়ার কোনো চাপ দেওয়া হত না। পরের বছরই পোলিও। আবার দীর্ঘকাল বিছানা নিতে হল তাকে। অনেক চিকিৎসার পর মেহের কালীবাড়ি থেকে এক তান্ত্রিক এসে বলল—সারিয়ে দিতে পারি, তবে খুঁত থেকে যাবে। থাক খুঁত, সারাও। কিসে সেরেছিল কে জানে। তবে সেরেছিল ঠিকই। কেবল বাঁ-হাত আর বাঁ-পা শুকিয়ে কাঠি হয়ে রইল। অবশ্য সে দুটো একেবারে অকেজো নয়। একটু কমজোরি, এই যা। নইলে গৌরহরি তাদের দিয়ে সব কাজই করিয়ে নেয়। মেয়েমানুষকে আদর করা পর্যন্ত।

গৌরহরির ইংরিজি কথাটা শুনে প্লিমাউথের জানালা দিয়ে কালো চশমা-পরা একজোড়া চোখ তাকে একটু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল। প্লিমাউথের জন্যই জ্যাম্ হয়ে গেল রাস্তাটা। ঘোরানোর জায়গা নেই। একটু পিছু হটবার চেষ্টা করল সে, পিঁ পিঁ করে। অমনি পিছন থেকে আর্তনাদ করল একটা ফিয়াট। গৌরহরি ঘাড় ঘুরিয়ে ছেলেটাকে বলল—দেখছেন তো গাড্ডা। ডানদিকের প্রাইভেটটাই ঝামেলা করেছে। এ জট্ ছাড়াতে এখন কত সময় লাগে কে জানে।

ছেলেটা চশমা-জোড়া ঠেলে তুলে চারদিকে চেয়ে দেখল টাল-মাটাল। বলল—নেমে যদি মিছিলটা ক্রস করে ওপাশ থেকে ট্যাক্সি ধরতে পারি তবে বোধহয়—

—তাই করুন।

—মিছিলটা কি খুব বড় মনে হচ্ছে ?

গৌরহরি হাসে—ভুখা মানুষ, বেকার মানুষ সমস্ত দেশে ভর্তি। তা মিছিল তো একটু বড় হবেই। এগিয়ে গিয়ে দেখে আসুন না, ল্যাজ দেখা যাচ্ছে কিনা।

ছেলেটা দরজা খুলে নেমে একটু এগিয়েই ফিরে এল—ও বাব্বাঃ, ওদিকটা লালে লাল। আরো মাইল খানেক আছে বোধহয়। এই বলে ছেলেটা মিটার দেখে পয়সা দিয়ে দেয়। গৌর বলে—মিছিল ক্রস করতে পারবেন তো ?

—বলে কয়ে চলে যাবো। আমার বড় জরুরী দরকার। ওরা দেবে না ক্রস করতে ?

—তাই দেয় ? পেরোতে গেলে ঝাড় লাগাবে।

ছেলেটা অসহায়ভাবে বলে—তাহলে ?

গৌর হাসে—লাইনে ঢুকে মিছিলে শামিল হয়ে যান। কয়েক পা হেঁটে দু-একটা স্লোগান ঝেড়ে লাইন পাল্টে ওপাশের লাইনে চলে যাবেন। আবার স্লোগান ঝাড়বেন কয়েকটা, তারপর টুক্ করে কেটে পড়বেন। মিছিল ক্রস করার ঐ হচ্ছে কায়দা—

boiRboi.net

ছেলেটা চলে গেল। ঐ রকম গোল চশমা-পরা মোটাসোটা বোকাটে ছেলে এ যুগে অচল। ভাবে গৌর, আর হাসে। বলতে কী, একসময়ে সবাই মনে করেছিল যে গৌরহরিও অচল। এ সংসারে দুটো শুখো হাত-পা আর মগজে নাচের শব্দ নিয়ে কিছুতেই বেশীদূর পর্যন্ত যাওয়া যায় না। বগলাপতি তাই ভাবতেন আর বিড়বিড় করে গাল দিতেন। মুখটা বড় খারাপ বগলাপতির। ছেলেদেরও শালা-শোরের বাচ্চা বলতে আটকায় না। তা গৌরহরি ছিল তাঁর ছেলেদের মধ্যে একেবারে অচল মুদ্রা। বড় দুই ছেলে ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে পাস করল, তারপর গেল কলকাতা, তারপর গেল বিলেত। তৃতীয় গৌরহরি হয়ে রইল অর্ধেক তৈরি করা পুতুলের মতো। যেন বা কোনো কারিগর গড়তে গড়তে হঠাৎ হাত থামিয়ে উঠে গেছে, তাই গৌরহরির মূর্তিখানা আর শেষ হয় নি।

বগলাপতি দেশভাগের সময়ে বিস্তর বুক চাপড়ে ভিতরে ভিতরে মাল পাচার করলেন কলকাতায়। তখনো দুই ছেলে বিলেত থেকে ফেরে নি। কেবল অপদার্থ গৌরহরি তাঁর সহায় সম্বল। বগলাপতি একা একাই অতবড় ব্যবসা গোটালেন বিড়বিড় করতে করতে। বৌ আর আধা-ফিনিশ ছেলেকে নিয়ে এলেন কলকাতায়। একটা বাড়ি কিনলেন বালীগঞ্জে গোপনে। আর প্রকাশ্যে খানিকটা জায়গা দখল করলেন যাদবপুর রিফিউজি কলোনীতে। সে সময়ে খবর এল, তাঁর বড় ছেলে মেম বিয়ে করেছে। সে আর ফিরবে না। বগলাপতি ভয়ঙ্কর ভেঙে পড়লেন। গৌরহরি তখন যুবাপুরুষ, কিন্তু অপদার্থ। তবু হাতের মুঠোর মধ্যে থাকা ছেলে। বগলাপতি বরাবরই গৌরকে একটু বেশী প্রশ্রয় দিতেন, সে অসুস্থ এবং নিরীহ বলে। বড় ছেলের খবর পেয়ে তিনি আরো আঁকড়ে ধরলেন গৌরকে। কিন্তু গৌর তো অপদার্থ, হাফ-ফিনিশ। চলে ফেরে, খায়-দায় কথা বলে—কিন্তু তাকে দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে তার দ্বারা কিছু হবে। বগলাপতিরও হল না। তিনি বড় ছেলেকে চিঠি লিখলেন—বিধিমতো মেমকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া আস। তোমার আবার বিবাহ দিব। উত্তরে ছেলে লিখল—তা সম্ভব নয়। আমার আশা ত্যাগ করুন। তখন থেকেই গৌর জানে, সে বাপের সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। বগলাপতি তাকে গড়িয়াহাটায় একটা দোকান করে বসিয়ে দিলেন। গৌরহরি দোকান করতে লাগল। বিক্রিবাটা মন্দ ছিল না। কিন্তু ঝামেলা হত দিনের শেষে, যখন দোকান বন্ধ করে গৌর হিসেব করতে বসত। হিসেবের অঙ্ক তার কাছে বরাবরই ভয়াবহ। কাজেই টাকা আনার হিসেব শুরু করলেই সে স্পষ্ট টের পেত তার মাথার মধ্যে সেই অনভিপ্রেত নর্তকী তার সাজঘর থেকে বেরিয়ে আসছে ঝম্‌ঝম্‌ করে, এক্ষুনি নাচ শুরু হবে। বগলাপতি আবার চিন্তায় পড়লেন। গৌরকে ডেকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতেন—কী করবি গোরা। কী করতে তোর ইচ্ছে করে? বসে বসে তো আর খেতে পারবি না, পাঁচভূতে লুটে খাবে। একটা কিছু কর।

গৌর খুব ভাবত। কিন্তু ভেবে কিছু পেত না। বস্তুত তার মাত্র দু'একটা বিষয়ই প্রিয় ছিল। ময়দানে ফুটবল খেলা দেখা, সিনেমা আর ঘুম। এইসব, আর চিন্তাভাবনাহীন, উদ্বেগহীন হাল্কা দিন-কাটানো। কোনো কাজের কথা ভাবলেই তার বুকের ভিতরটা দুরদুর করত—আমি ব্যাটা হাফ-ফিনিশ, ফিফটি পারসেণ্ট

মানুষ—আমি শালা কী করবো ?

কিন্তু তারপরও একটা কয়লার ডিপো তাকে দিয়ে চালানোর চেষ্টা করেছিলেন বগলাপতি। সেটা ফেল মারল তো নিজের সঙ্গে নিয়ে ঘুরলেন এদিক ওদিক। বগলাপতির ব্যবসা ছিল নানারকম জটিল কুটিল পথে, সেগুলো বোঝবার মতো চিন্তাশক্তি গৌরের ছিল না। বগলাপতি ক্রমেই হতাশ হতে হতে একদিন ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন—যাঃ শুয়োরের বাচ্চা, কিছুই যখন পারবি না, তখন যা, গিয়ে ড্রাইভারী শেখ। শিখে আমার গাড়ি চালাবি। প্রতিমাসে কেন পরের ছেলেকে দেড়শো টাকা করে ধরে দিই। অর্থাৎ সোজা কথা, বগলাপতি ছেলের বসে খাওয়া সইতে পারতেন না। কিছু না পারো তো বাপের সোফারী কর।

পুরোনো একখানা ডজ গাড়ি ছিল তাদের। সেটা চালাতো হরিপদ। রোগা-টোগা ভালমানুষ ছেলেটা। হাফ-ফিনিশ গৌরহরি গাড়ি চালানো শিখবে জেনে সেও খানিকটা হাঁ করে রইল। বলল—গাড়ির যে অনেক ব্যাপার রে, ক্লাচ, ব্রেক, অ্যাক্‌সেলেটার, গীয়ার, স্টিয়ারিং—তুই সব সামলাতে পারবি ?

গৌরহরি উদাস গলায় বলল—তা আমি কী করব ? আমি কি চেয়েছি শিখতে ? বগলু ছাড়ছে না যে !

আড়ালে আবডালে গৌরহরি বাপকে আদর করে বগলু বলে উল্লেখ করত। ফলে কতবার বকুনি খেয়েছে।

তারপর বগলাপতির ব্যাটা গৌরহরি, অর্থাৎ বগলুর পোলা গৌরা পুরোনো আমলের ডজ গাড়িতে ভালমানুষ হরিপদর পাশে বসে অবরে সবরে গাড়ি চালানো শিখত কলকাতার নির্জন রাস্তা-ঘাটে। আরে বাঃ প্রথম দিনেই ভাল লেগে গেল গৌরহরির। গাড়ির যন্ত্রপাতিগুলো খুব একটা জটিল না তো ! কিংবা হয়তো জটিলই, কিন্তু তার কাছে এই প্রথম একটা কাজ এল যে কাজ তার 'পারব না' বলে মনে হল না। ব্যাপারটা এরকমই হয়—দুনিয়ার সবচেয়ে অপদার্থ লোকটারও একটা না একটা বৈশিষ্ট্য মাফিক কাজ আছে সেটা খুঁজে পেলে বিস্তর বখেরা চুকে যায়। গৌরহরি তার দুটো রুখোশুখো হাত-পা আর মগজের ঝম্‌ঝম্‌ নিয়েও মোটরগাড়ির যন্ত্রপাতির মধ্যে সম্পূর্ণ সেঁধিয়ে গেল। কেমন যেন নেশা পেয়ে বসল তাকে। একমাসে সে গড় গড় করে গাড়ি চালাতে লাগল। পিছনের সীটে বসে তার কাণ্ড দেখে বগলাপতি হেসে খুন—আরে বাপোৎ, খুব শিখেছে তো ! অ্যাঁ ! আরে বাঃ ! এ যে মোলায়েম ব্রেক মারে ! ডাইনে বাঁয়ে হাত দেখিয়ে বাঁক নেয় ! অ্যাঁ ! এ যে দিব্যি স্পীডও মারছে !

বাবা আর মাকে কয়েকদিন সে দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় পানিহাটি ঘুরিয়ে আনল। মাস চারেক পর হরিপদকে বিদায় দেওয়া হল। যাওয়ার সময়ে হরিপদ আড়ালে ডেকে বলল—ছোটোবাবু, তুমি মাইরি এক নম্বরের টিকরমবাজ। আমি স্বপ্নেও ভাবি নি তোমার মতো হাফ-ফিনিশ লোক ব্যাপারটা কোনোকালে শিখতে পারবে। ভাবলে কী শেখাতুম ! ঠিক গোলেমালে হরিবোল করে দিতুম।

ডানদিকে প্লিমাউথ, পিছনে ফিয়াট, বাঁদিকে পার্ক করা কয়েকটা অ্যামবাসাডার, সামনে মিছিল, বিচিত্র গাড্ডা। ভিতরে বসে বাতাসহীনতায় ঘামতে লাগল গৌরহরি।

ছেলেটা নেমে যাওয়ার পর সে লাল শালুর টুকরোটা দিয়ে মিটার ঢেকেছে। এখন নো সোয়ারী বিজনেস্। বগলাপতির ছেলে গৌরহরি—অর্থাৎ কিনা বগলুর পোলা গৌরা কী কারো সার্ভেন্ট? ইজ হি? এই বলে গৌর গাড়ির ছোট চৌকো আয়নায় নিজের মুখখানা দেখল। সদ্বংশের ছেলেদের মুখে কিছু চিহ্ন থাকে। তার মুখেও আছে। এই যেমন তার কপালখানা—কেমন গড়ানে—মাঝখানে মাথার চুল ছুঁচোলো হয়ে নেমে এসেছে। কিংবা, যেমন তার দুখানা কান—বুদ্ধদেবের মূর্তির কানের মতো ভারী ভারী বড় লতিতে কানদুটো বাহারে দেখায়। নাকখানাও চোখা। আর কিছু লক্ষ্য করার মতো নেই অবশ্য। গাল ভাঙা চোয়াড়ে চেহারা, গালে কয়েকদিনের দাড়ি। রুখু চুল। একটু গোঁফ আছে গৌরের। সেখানে আজকাল চিকমিকে দু' একটা পাকা রোঁয়া মাঝে মাঝে দেখা যায়।

শালা প্রাইভেটটা যদি ডানদিকে না থাকত তবে এতক্ষণে দাশ কেবিনে গিয়ে টিফিন করত গৌরহরি। সে ঘড়ি দেখল। হ্যাঁ, এখন গৌরবাবুর টিফিন টাইম পেরিয়ে যাচ্ছে। গৌরবাবুর খিদে পেয়েছে আর এ শালারা রাস্তা আটকে এ সব কী টিকরমবাজী শুরু করেছে! অ্যাঁ! গৌরবাবুর খিদে পায় না নাকি! ডানদিকের ঐ শালা প্রাইভেটটা! কালো চমশা-পরা লোকটা থুতনিতে হাত দিয়ে ঝিমোচ্ছে। খিদে পেলে গৌরের ঘুম আসে। বাবুদের বাড়ির ছেলে—খিদে তেষ্টা সে একদম সইতে পারে না। সে হলগে টিকাটুলির ডাকসাঁইটে বগলাপতির ছেলে গৌরহরি—অর্থাৎ কিনা বগলুর পোলা গৌরা—খিদে তেষ্টা সইতে নারে-ছা-রা-রা-রা-রা-রা—গুন্‌গুন্ করে গান গাইল গৌর। আর মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে গাল দিল দুনিয়ার সব প্রাইভেটদের—আর মিছিল করা যাবতীয় ভুখ্‌খা পার্টির লোকদের। গৌরবাবুর গাড়ি আটকে শালাদের যত আশনাই।

একটা টেরিলিন পরা লোক জানালায় ঝুঁকে বলল—গাড়ি যাবে নাকি?

—কোথা দিয়ে যাবে দাদা? উড়ে?

—মিছিল তো শেষ হয়ে এল। রাধা সিনেমার কাছে পুলিসের গাড়ি দেখা যাচ্ছে—ঐ তো শেষ—

—গাড়ি যাবে না দাদা, আমার টিফিন হয় নি—

লোকটা একটু শ্বাস ফেলে বলে—আপনি মালিক, আপনার দয়া—বলে সরে গেল।

মালিক! আলবৎ মালিক। গৌরবাবুর টিফিন হয় নি আর গাড়ি যাবে বললেই যাবে। কে না জানে বিশ্বসংসারে, যে বিকেল সাড়ে চারটের চা না পেলে গৌরবাবুর ঘুম পায়! স্টিয়ারিঙের ওপর মাথা ঝুঁকে আসে! তখন নিজেকে কত কাকুতি মিনতি করে গৌর, ওঠো গৌরবাবু, ওঠো, অমন হেঁদিয়ে পড়লে কি চলে? ওঠো বাবা, গৌর, ওঠো—চোখ মেলে তাকাও তো বাপধন। নইলে যে কখন লাল আলো পেরিয়ে যাবে। কোন গাড়ির পিছনে ভিড়িয়ে দেবে, আর ধরবে এসে পুলুশবাবা। ওঠো হে বগলাপতির ব্যাটা গৌরহরি। জেগে থাকো হে বগলুর ছাওয়াল—

তবু শালার ঘুম পায়! আড়মোড়া আসে। দাশ কেবিনের চা কড়া—গৌরের চা আরো কড়া করে দেওয়া হয়। সঙ্গে থাকে বিস্তর কাঁচা লঙ্কার কুচি মেশানো

রগরগে গরম অমলেট, আর টোস্ট। শালার টোস্টে মাখনের বদলে লাড লাগানো। এইসব খায় গৌর, আর বলে—খেয়ে নে বাবা গৌর, এই শেষ খাওয়া রে। এই অমলেট ভেজেছে মবিল অয়েলে, পাঁউরুটিতে চর্বি, আর শুকনো চোতরা পাতার ক্কাথ দিয়ে হয়েছে এই চায়ের লিকার, আফিমের জল মিশিয়ে। খেয়ে নে বাবা গৌর, তোর শেষ খাওয়া—

তারপর রুমালে মুখ মুছে মৌরি চিবিয়ে আবার নিজেকে বলে—না বে মরবি না। তোর ঠাকুর্দা খেত মুক্তাভস্ম, তোর বাবা খেত স্বর্ণসিন্দুর, তোরা রুপোর গেলাসে জল খেয়ে বড় হয়েছিস। বেস্তর সোনারুপো মুক্তো হজম করা পেট তোর, সেই পেটের কী করবে রে শালার চোতরা পাতার ক্কাথ, কিংবা চর্বি, কিংবা মবিল অয়েল? সব হজ্‌মে দে শালা, সব হজ্‌মে দে—যা খাবি সব হজ্‌মে দিয়ে বসে থাকবি—কেউ যদি এসে 'বাতাপী' বলে ডাক দেয়—ঘাবড়াবার কিছু নেই, বাতাপী আর বেরোবে না—

মিছিলের লেজ ভেসে যাচ্ছে। পিছনে পুলিসের কালো গাড়ি। তারপর রাস্তা ক্লীয়ার। স্টার্ট, গৌরবাবু। মাথাটা সত্যিই ঘুমে ভরে আসছে। ঘুম যেন ঠিক জলের মতো—টল টল করে আর তার মধ্যে নানা টুকরো-টাকরা স্বপ্ন মাছের মতো ঘাই মারে। যখন এরকম হয় তখনই গৌরহরির সামনে উইন্ডস্ক্রীন জুড়ে নানা অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যেতে থাকে। গৌর দেখে সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ের মোড়ে ট্রাফিক পুলিসটা বুড়িগঙ্গার ধারের সেই কামানটার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কখনো বা হঠাৎ গৌর আচমকা ব্রেক চেপে ধরে বলে—আরে সাবাস, এখানকার রাস্তাটা কেটে কবে খাল বানিয়েছে শালারা! তারপর চোখ কচলে দেখে, কোথায় খাল, রাস্তাই তো! কিংবা কখনো বা দেখে সামনের রাস্তায় অনেক রঙীন বল ভাসছে, লোকজন উড়ে উড়ে যাচ্ছে। রাস্তাটা হঠাৎ যেতে যেতে আকাশমুখো খাড়া উঠে গেছে। ঘুম পেলে গৌরহরির এরকম সব হয়। তখনই দাশ কেবিনের সেই চোতরা-পাতার ক্কাথ না হলে—ওরা কি বাস্তবিক আফিঙের জল মেশায় নাকি! নইলে গৌরের এরকম হবে কেন। কলকাতার যেখানেই থাকুক গৌর, একটা না একটা সময়ে—প্রায়ই বিকেলের দিকে ঐ অদ্ভুত ঝিমুনি আসতে থাকে তার। আর এলেই—পাগলের মতো সে লাল কাপড়ে মিটার ঢাকে, তারপর ভোঁ ভোঁ করে চালিয়ে দেয় দাশ কেবিনের দিকে। পৃথিবীর এক এবং অদ্বিতীয় দাশ কেবিন।

—ও বাবা পুলুশ, ও পুলুশবাবা—গৌর নরম গলায় বিড়বিড় করে ডাকে—হাতটা একনাগাড়ে তুলে রাখলে যে ভেরে যাবে বাবা। হাতটা একটু নামাও আমরাও তো যাবো বলেই রাস্তায় বেরিয়েছি—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার পিছনখানা দেখলে তো চলবে না বাবা, গৌরবাবু যে এখনো চা খায়নি—তার যে টিফিনটাইম—রাস্তাটা একটু ছাড়ো বাবা পুলিশ—

অবশেষে ট্রাফিক পুলিশ হাত নামায়। ঘুরে দাঁড়িয়ে রাস্তা খুলে দেয়।

আই বাবা পুলুশ, তোমার পায়ে পায়ে দণ্ডবৎ। দরগায় সিন্নি, বাবার গির্জেয় মোমবাতি—এই মৌতাতটার সময়ে আর আটকে রেখে মেরো না।

—এই ট্যাক্সি!

গেরোর পর গেরো। শালা সার্জেণ্ট।

গৌর গাড়ি থামায়। কোমরে পিস্তল-ওলা সার্জেণ্টটা এগিয়ে আসে। খামোখা হাত বাড়িয়ে বলে—লাইসেন্স দেখি।

এসব ফাল্তু বদমাইশী।

—কী করতে হবে স্যার, বলুন না।

সার্জেণ্টটা ধমক দেয়—বদমাইশীর আর জায়গা পান না! শীগগীর ঐ লাল কাপড় খুলুন। এই ভদ্রলোক পঁয়তাল্লিশ মিনিট দাঁড়িয়ে আছেন ট্যাক্সির জন্য—শীগগীর খুলুন—

খুলছি পুলিশবাবা, খুলছি। কিন্তু, আমার যে টিফিন হয় নি। মিছিলের হুজ্জতে হড়কে গেছে টিফিন টাইম—গৌরবাবু যে হেঁদিয়ে পড়ছে বাবা পুলিশ! গৌর বিড়বিড় করে লাল কাপড় খুলে নেয়। বুড়োমতো লোকটা সবিনয়ে দরজা খুলে গাড়িতে ঢোকে। জানালা দিয়ে মুখ বার করে সার্জেণ্টকে বলে—ধন্যবাদ, আপনি না থাকলে কিছুতেই ট্যাক্সি পেতাম না। সবেতে লাল কাপড়। নয়তো মিটার ডাউন—আচ্ছা চলি—

সার্জেণ্টটা হাসে তৃপ্তির হাসি। জানালায় ঝুঁকে গৌরকে বলে—ঠিকমতো নিয়ে যাবেন। রাস্তায় যেন আবার ব্রেকডাউন না হয়—আমি কিন্তু নম্বর টুকে রেখেছি—

দরগায় সিন্নি, গির্জেয় মোমবাতি—শালার পুলিশ যেন না ছোঁয় গৌরবাবুকে। নিয়ে যাবে, পুলিশবাবা, ঠিক নিয়ে যাবে। কিন্তু এখন যেন কেমন রাস্তাগুলো খালের মতো লাগে, ঢাকার কামানটা এসে বসে থাকে চৌরাস্তায়, রঙীন বল ভাসে বাতাসে, মানুষগুলো উড়তে থাকে, রাস্তা উঠে যায় আকাশমুখো খাড়া হয়ে—গৌরবাবুর চায়ের টাইম যে হড়কে গেছে বাবা—

—কোথায় যাবেন?

—পি. জি.। বুড়োটা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে।

দরগায় সিন্নি, গির্জেয় মোমবাতি—তবু ভাল—দক্ষিণে। যদি উত্তরে হত। আর যদি দাশ কেবিন থেকে আরো দূরে কোনো গাড্ডায় বেঘোরে নিয়ে ফেলত বগলাপতির ব্যাটা গৌরহরিকে—বগলুর পোলা গৌরাকে—

রাস্তাগুলো এমন সব জলে ডোবা—আবছা আবছা—রঙীন রঙীন গোলার মতো বল ছুঁড়ে দিচ্ছে ঢাকার সেই কামান। চৌরঙ্গী ট্রাফিক পুলিস আড়বাঁশীতে পুরবী ধরেছে—দুটো পা কদমতলায় শ্রীকৃষ্ণের কায়দায় ক্রস করা—চারপাশে মুগ্ধ গাভীর মতো ভিড় করে এগিয়ে আসছে গাড়ির পর গাড়ি—গৌর চোখ মুছে নেয়। কোথায় যেন যাচ্ছে সে? ওঃ হ্যাঁ, পি. জি.! পিছনের সীটে বুড়োটা আছে তো ঠিকমতো? বুড়ো মানুষদের বিশ্বাস কী! কখন আছে, কখন নেই। সার্জেণ্টটা নম্বর টুকে রেখেছে—

গৌর ঘাড় ঘুরিয়ে বলে—আপনি ঠিক আছেন তো স্যার! কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো!

—অসুবিধে! বুড়োটা খ্যাঁক করে ওঠে—কিসের অসুবিধে!

গৌর ভারী মুশকিলে পড়ে। সত্যিই তো, অসুবিধে কিসের! ল্যাণ্ডমাস্টারের গভীর গদী। চারদিকে শরতের রোদ মজা বিউটিফুল বিকেল, চৌরঙ্গীর মতো জায়গা

boiRboi.net

দিয়ে যাচ্ছে গাড়ি—তবে আর অসুবিধে কিসের। অসুবিধে যা, তা তো গৌরের। এই শালা রিয়্যালিটির সঙ্গে কে যেন স্বপ্নের ভেজাল দিয়ে দিচ্ছে, চামচে নেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছে এমন যে আর আলাদা করা যাচ্ছে না—কোনটা শালার রিয়্যালিটি, আর কোনটা ড্রিম।

সে একটু আমতা আমতা করে বলে—অসুবিধে আর কি! আপনার বয়সটাই যা একটু গোলমেলে। এই বয়সে বুঝলেন, যখন তখন যা তা হয়ে যেতে পারে—

—কি রকম!

গৌর একটু ইতস্তত করে বলে—এই কয়দিন আগেও আপনার মতো এক বুড়ো মানুষকে তুলেছিলুম। মাঝ রাস্তায় ডাইরেকশন জিজ্ঞেস করতে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, ঘাড় লটকে নেতিয়ে আছে। থ্রম্বোসিস। তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে হল—তাই বলছিলুম কোনো অসুবিধে ফিল করলে বলবেন—

পিঁ—পিঁ—প্যাঁ—প্যাঁ গাভীর ডাক। চলো বাবা গৌর, পুলিশ-বাবা হাত দেখাচ্ছে। চোখে সবুজ মারছে ট্র্যাফিকের আলো। চলো হে বগলাপতির ব্যাটা—পি জি। মনে থাকে যেন সার্জেণ্ট শালা নম্বর টুকে রেখেছে, দেবে'খন ঠুকে—

—কোথায় যেন যাবেন স্যার!

—বললাম যে পি. জি!

আই। ঠিক। পি. জি.। চলো বাবা গৌর। বুড়োর গল্পটা সে সম্পূর্ণ বানিয়ে বলল। এমনিই। আসলে বুড়োটাকে সাবধান করে দিল, যেন তার গাড়িতে বসে হঠাৎ বুড়োর মরার শখ না হয়।

যখন কখনো গৌরহরি একা একা তার ট্যাক্সি নিয়ে বসে থাকে! প্রায়ই দুপুরের দিকে হঠাৎ হঠাৎ তার কেমন অদ্ভুত ব্যাপার সব মনে হয়। মনে হয় পিছনের সীটে একটা মৃতদেহ বসে আছে। মাঝে মধ্যে অনেক রাতে নাইটশোর ট্রিপ মেরে গ্যারাজ করার সময়ে তার সুস্পষ্ট মনে হয় রাস্তার টালে গাড়ি লাফিয়ে উঠতেই লাগেজ বুটে কী যেন নড়ল। সে যেন এক মৃত মানুষের শরীর। কে যেন কখন অলক্ষিতে মালটি তার ঘাড়ে পাচার করে গেছে। কত দিন এমন হয়েছে। গৌর গাড়ি থামিয়ে সত্যিই লাগেজ বুট খুলে দেশলাই জেলে খুঁজে দেখেছে। খুঁজেছে পিছনের সীটে, মেঝেয়। কোথাও কিছু নেই। তবু মাঝে মাঝে দুপুরে কি নিশুত রাত্রে গাড়ি চালাতে চালাতে তার এই রকম আজও মনে হয়। একটা মৃত লোক বসে আছে পিছনের সীটে ঘাড় লটকে—লট্‌পট্‌ করছে দুলুনিতে। কিংবা কারা লোড করে দিয়ে গেছে লাগেজ বুটে হাত পা বাঁধা 'ডেডবডি'। তখন যে মৌতাতের সময় তা নয়। এমনিতেই সহজ স্বাভাবিক ভাবেই মনে হয়েছে। গৌর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেছে পিছনের সীট। গাড়ি থামিয়ে খুঁজে এসেছে লাগেজ বুট।

তাই গাড়ি চালাতে মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে গৌর। বুড়োটা বসে আছে বাইরের দিকে চেয়ে। খুব বুড়ো নয় লোকটা—তবু মরার কি কোনো বয়স আছে? মরলেই হল।

গৌর মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে—পি. জি.-তে কী ব্যাপার স্যার! কারো অসুখ?

—আমার মেয়ে—ডেলিভারী কেস—

—বাঃ বাঃ। কী হল ! নাতি না নাতনী।

—হয় নি। আজ কালের মধ্যেই হওয়ার কথা। পেইন উঠেছে কাল বিকেল থেকে—

—আজকালকার বাচ্চা তো ! জন্মের আগে থেকেই জ্বালাতে শুরু করে, শেষ জীবন তক্ জ্বালায়—

আসলে এসব কথার কোনো মানে নেই। খামোখা বলে যাচ্ছে গৌরহরি। তার সন্দেহ বুড়ো মানুষটা যদি হঠাৎ টেঁসে যায় স্ট্রোক-ফোক্ হয়ে—আর সে হয়তো টেরও পেল না, ওদিকে সার্জেন্টের কাছে তার নম্বর টোকা—তাই কথায় কথায় সে বুড়ো মানুষটার বেঁচে থাকার প্রমাণ সংগ্রহ করতে থাকে।

গাড়িটা সে কিনেছিল এক পাঁইয়ার কাছ থেকে। সেই পাঁইয়ার কাছেই গাড়িটার দোষ ধরেছিল। কোনো অপঘাত ঘটেছিল গাড়ির মধ্যে। তারপর থেকেই এ গাড়িতে একটা ভৌতিক ব্যাপার চলেছে। কেবলই ঐ মৃতদেহ টের পায় গৌর। শালার পাঁইয়া পোড়ো গাড়ি ঠকিয়ে বেচে গেল ন' হাজারে, কিনল বগলুর পোলা গৌরা—

ডজটা পেলে এসব ঝামেলা হত না। সেটাতেই সে শিখেছিল গাড়ি চালানো।

হরিপদ চলে যাওয়ার পর বাবা বগলাপতি ছেলে গৌরহরিকে দেড়শ টাকায় সোফার রাখলেন ! গৌর আপত্তি করল—হরিপদ তো রাত্রে থাকত না। আর আমি চব্বিশ ঘণ্টার ড্রাইভার—

শালার টনটনে বুদ্ধি দেখ। আচ্ছা যা, একশ পঁচাত্তর পাবি, তার বেশী কিছুতেই না। বলেছিলেন বগলাপতি, বগলু, গৌরের বাবা। গৌর একশ পঁচাত্তর পেত, প্লাস খাওয়া-দাওয়া, জামা-কাপড়, ঘরদোর। মা কেবল দুঃখ করে বলত—এ রকম কাণ্ড জন্মে শুনি নি, ছেলে নাকি বাবার চাকরি করে !

বাবা বগলাপতি বলত—তবুও তো বাবার চাকরি করে। তাতে মানসম্মানের হানি হয় না। যা ছেলের সুরত তোমার, অন্য জায়গায় হলে কী কাণ্ড যে হত !

তা গৌর গাড়ি চালাত। বাবাকে নিয়ে যেত এখানে সেখানে। ব্যবসাপত্রের নানা ধান্ধায় ঘুরতেন বাবা। আস্তে আস্তে জমিয়ে নিচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে তাকে ডেকে বলতেন—তোর হাতে গাড়ি থাকলে আমার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু বেশ তো চালাস, রে ! অ্যাঁ ! বেশ তো হাত তোর ! দিব্যি চালিয়ে নিচ্ছিস কলকাতার রাস্তাঘাটে। অ্যাঁ ! পাকা হয় গেছিস বেশ।

এ সবই গ্যাস। গৌরহরি বুঝত। কেননা পিছনের সীটে বসে বাবা বিস্তর টাকা পয়সার লেনদেন করতেন নানা পার্টির সঙ্গে। গোছা গোছা নোট বেহাত হত। আসত তার বাবার পোর্টম্যান্টোতে। খুশী হত গৌর। বড়দা কেটেছে। এখন যা আসবে একদিন তার অর্ধেক বখরা পাবে সে, যদি না ইতিমধ্যে মেজদাও কাটে। গৌর সেইসব টাকাপয়সার হিসেব বুঝত না। কিন্তু ছোট্ট আয়নাটা দিয়ে টাকার ছবি সে দেখেছে বিস্তর। বাবা বগলাপতি সেটা বুঝতে পেরে গৌরকে অন্য কথায় ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু গৌর তখন টাকা চিনেছে। অঙ্কের হিসেব না বুঝলেও এটুকু জানা ছিল যে টাকা নিয়ে বিস্তর কাজ হয়। টাকার শক্তি অসম্ভব।

তাই সে মাঝে মাঝে বাপ বগলাপতির দিকে চেয়ে অদ্ভুতভাবে হাসত। একটু টেরছা হাসিটি, চোখ দুটি মিট্‌মিট্‌ করত, গরগরে একটা শব্দ হত গলায়। এইসব দেখে বগলাপতি সাবধান হয়ে যেতেন। বলতেন—এ সবই তো তোদের জন্য। বড়টা উচ্ছন্নে গেল, এখন তোদের দুটোকে যদি একটু রেখেটেকে যেতে পারি—

গভর্নমেন্টের কণ্ট্রাক্টর বগলাপতি তখন বিস্তর বালি মেশাচ্ছেন সিমেন্টে। না মিশিয়ে উপায়ও নেই ! গভর্নমেন্টের লোকেদের খাওয়াতে খাওয়াতে কিছুই থাকে না প্রায়। বগলাপতি ব্যবসা জানতেন হাতের উল্টোপিঠের মতো। কলকাতার বাজার ছিল নখ-দর্পণে। কোন মালের কত স্টক আছে বাজারে, কতদিনের মধ্যে সেই মালের চালান আর আসবে না এসবই প্রাচীন কবিরাজের নাড়ীজ্ঞানের মতো টনটনে ছিল তার। একবার ইচ্ছে করেই একটা মালের টেণ্ডারে উঁচু রেট দিলেন। তারপর বাজারের সব মাল কিনে মজুত করলেন গুদামে। তারপর মিটমিট হাসতে লাগলেন আপন মনে। আয়নায় গৌরহরি সেই হাসি দেখত। মাঝে মাঝে আপন মনে বলতেন—বুঝলি গৌর, মালটা বছরখানেকের মধ্যে আর আসছে না বাজারে ; গৌরকে সম্বোধন করে বলা, কিন্তু আসলে বলা নিজেকেই। টেণ্ডার বগলাপতি পেলেন না বলাই বাহুল্য। কিন্তু যে পেল সে বাজার ঘুরে মাথায় হাত দিয়ে বসল। গভর্নমেন্টের কণ্ট্রাক্ট, সিকিউরিটির টাকা জমা দেওয়া আছে—পিছোবার উপায় নেই, ওদিকে মাল নেই এক কণাও। মাল কোথায় ! মাল কোথায় ! লোকটা যখন পাগল পাগল ঠিক সেই সময়ে বগলাপতি তার কাঁধে হাত রাখলেন—আছে, মাল আছে। তবে লোকসান তো দিতে পারি না। এই আমার রেট—বলে রেট দেখালেন। লোকটা ডজ গাড়ির পিছনের সীটে বসে বগলাপতি পা জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে বলল, দাদা, আর একটু কমান। আমি যে গভর্নমেণ্টকে ওর চেয়ে চার আনা কম রেট দিয়েছি। লাখ লাখ টাকার কণ্ট্রাক্ট, এত লস হলে চিরকালের মতো শেষ হয়ে যাবো। বগলাপতি হাসেন—তবু তো জেল থেকে বাঁচবে ! অবশেষে রেট কমিয়েছিলেন। লোকটা প্রতি ইউনিটে দু'পয়সা ক্ষতি করে মাল নিল। বগলাপতি কয়েক লাখ কামালেন। একা একা পিছনের সীটে বসে গৌরকে ডেকে বললেন (আসলে নিজেকেই বলা)—বুঝলি গৌরা, বাঘকে যদি ধরতে না পারিস ঘোগকে ধরিস। বাজারটাকে হাতের মুঠোয় না রাখলে কি ব্যবসা চলে ?

গৌরের মাইনে বেড়ে দুশোয় দাঁড়াল। সে সারাদিন গাড়ি নিয়ে থাকত। ইঞ্জিনটা সে খুব ভাল চিনত, যেমন বাজার চিনতেন বগলাপতি। ইঞ্জিনের একটু সর্দি কাশি, একটু ফ্যাঁস্‌ শব্দ থেকেও গৌর তার গোলমাল বুঝে নিত। সারাদিন সে গাড়িখানার পিছনে খাটত। মাটিতে শুয়ে ইঞ্জিনের তদবির করত সারাদিন। গাড়ি ধোয়াতো, মুছত। ঝকঝকে রাখত সবকিছু, বগলাপতি দূরে দাঁড়িয়ে ঘাড় এধার ওধারে কাত করে পুরোনো গাড়িখানার শোভা দেখতেন। আর বলতেন, বাহাঃ রে গৌর, বাহাঃ। প্রশংসাটুকু খুব উপভোগ করত গৌরহরি। এতদিন বাদে সে এমন একটা কাজ পেয়েছে যে কাজ তার উপযুক্ত। যে-কাজ তাকে মানায়। সে তাই জান লড়িয়ে দিয়েছিল। ঐ গাড়িখানার যত চমক ঠমক ততটাই তার হাতযশ ততটাই তার গুণ। গৌরহরি পুরোনো ডজখানাকে জড়িয়ে ধরে লতিয়ে উঠেছিল। সে যখন

গাড়ি চালাত তখন মন প্রাণ দিয়ে। কোনোদিন তার হাতে গাড়ি ঘষাটাও খায় নি। স্টিয়ারিঙে বসলেই তার হাত পা মগজ চোখ সব ধীরে ধীরে অধিকার করে নিত গাড়ির যন্ত্রপাতি। সে হয়ে যেত গাড়িটা স্বয়ং। তখন গৌরহরি না গাড়ি তা বোঝাও যেত না।

তা গৌরহরি মাঝে মাঝে গাড়ি হয়ে যায়। তখন আর সে মানুষ থাকে না। ভুলেই যায় যে সে গৌরহরি, বগলাপতির ব্যাটা—অর্থাৎ কিনা বগলুর পোলা—।

বগলাপতি তখন স্টোরিং এজেন্ট। বিস্তর ঝামেলার কাজ। অনেক বখেরা। ঠিকমতো চালাতে পারলে লাভও বিস্তর। বগলাপতির তখন হাই-ব্লাডপ্রেসার। সহায় সম্বল বলতে হাফ-ফিনিশ গৌরহরি আর কর্মচারীরা। মেজো ছেলে রাখোহরি বিলেতে যা পড়তে গিয়েছিল তা শেষ না করে আর একটা কী পড়তে লেগেছে। আসলে পড়ার নাম করে বাপের পয়সায় ফাল্‌তু কিছুদিন বিলেতে থেকে যাওয়া। ইতিমধ্যেই সে টাকার বরাদ্দ কয়েকবার বাড়িয়ে নিয়েছে। ফুর্তি লুটছে খুব। বড় ছেলে থাকোহরি সে সব কথা মাঝে মাঝে জানাতো। সে নিজেও ফুর্তি লুটেছিল। তাই রেখে ঢেকে লিখত। যেটুকু লিখত না বুদ্ধিমান বগলাপতি আন্দাজ করে নিতে পারতেন। গভর্নমেন্টের স্টোরিং এজেন্সী পেয়ে বগলাপতি যখন ফ্যাসাদে পড়লেন তখন বিস্তর পয়সা খরচ করে তার করলেন মেজো ছেলেকে গৌরহরির নামে—ফাদার সিক, কাম শার্প।

রাখোহরি চলে এল। পুরোদস্তুর সাহেব। বিলেতে সে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট শিখেছে কয়েকবছর। পাস করে নি, কিন্তু যা পড়েছে তার দাপটেই ম্লান হয়ে গেলেন বগলাপতি। রাখোহরি বিশাল জাল ছড়াল চারদিকে। আসল জালটা টাকার। রাখোহরির বুদ্ধিটা যে খুব খারাপ ছিল তা নয়। অমনিতে সে ছিল মিষ্টভাষী. বিনয়ী এবং ছোটোখাটোর মধ্যে সুপুরুষ, নেভী ব্লু স্যুট আর বো পরলে তাকে বড় সুন্দর দেখাত। কতবার ফার্পো কি গ্র্যান্ডই কি মোকাম্বোর পার্টিতে ডজে চড়িয়ে তাকে নিয়ে গেছে গৌর। অল্প কদিনেই গৌর রাখোহরির ভক্ত হয়ে পড়েছিল। রাখোহরির যোগাযোগটা ছিল মিনিস্টার আর সেক্রেটারীদের লেভেল-এ। অল্প কয়েক দিনেই সে এজেন্সীর ব্যাপারে বিস্তর সুবিধে আদায় করে নিল। তার পক্ষে এবং পিছনে বড় বড় মহারথী দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু যাদের সঙ্গে দৈনিক কাজ কারবার সেইসব ইনস্পেক্টর. ঠিকাদার, দারোগা ইত্যাদিকে একদম গ্রাহ্য করত না সে। তাদের ওপর দিয়ে চলত, রাখোহরির বিশাল বিশাল লোকের সঙ্গে ভাব দেখে তারাও সহ্য করত মুখ বুজে। বগলাপতির আমলে তারা কিছু পয়সাকড়ি রোজগার করেছিল, রাখোহরির আমলে দেখা দিল উল্টে তাদের চাকরির ভয়। কিংবা বদলীর। বগলাপতি রাখোহরিকে বোঝানোর চেষ্টা করত, বাবা এরা সব খুদে দেবতা, এদেরই সঙ্গে কাজকারবার, এদের একেবারে পায়ে ঠেলো না। মিনিস্টার, সেক্রেটারীর বদল হয় কিন্তু এদের হয় না। কারবারে ঘুরেফিরে এদের সঙ্গেই দেখা হবে। ছোটো মানুষ সব, তেমোকে ভয়ও পায়, কিন্তু জোট বাঁধলে তোমাকে আমাকে দেশছাড়া করবে। রাখোহরি তখন গরম। বাপের টাকায় তখন ব্ল্যাঙ্ক চেক কেটে দেওয়া আছে তার নামে। স্টোরিঙে বিস্তর ডিমারেজ দেখিয়ে সে মাল পাচার করছে। ইনস্পেক্টর, ঠিকাদার, দারোগা সবাই

হাঁ করে দেখছে। সবাই ওরকম করে, কিন্তু তারা ভাগ পায়, রাখোহরির আমলে তাদের ভাগ নেই। রাখোহরি ফুড স্টোরিং-এর প্রায় একরারনামা পেয়ে গিয়েছিল। অ্যান্টিকরাপশান তার পিছনে ঘোরে, তার নামে রিপোর্টও যায়। কিন্তু তা সব চাপা পড়ে থাকে। বগলাপতি নীরবে একা ঘরে বুক চাপড়ান। রাতারাতি উন্নতি দেখে তিনি ভেঙে পড়েন, আর বলেন, বুঝলি গৌরা, ভিত না গেঁথে বাড়ি উঁচু করার অনেক বিপদ। ভিতটাই যে কাঁচা। এ ছেলেটা যে বোঝেই না দারোগাকে খাতির করা দরকার। ইনস্পেক্টরকেও পান-তামাক দিতে হয়—আমরা ছেলেবেলা থেকে এসব শিখেছিলাম। বিপদে-আপদে এরা যে কত কাজে আসে—

রাখোহরি তখন একটার পর একটা কণ্ট্রাক্ট নিচ্ছে। প্রায় সবই সরকারী। তখন আলাদা মেজাজে চলে। কিন্তু তখনও ডজ গাড়িটার বশংবদ ড্রাইভার হয়ে পরমানন্দে গাড়িখানা চালায় গৌরহরি। সে উন্নতি ভাল বোঝে না, কেবল আনন্দ বোঝে। রাখোহরি যখন মোকাম্বোর ভিতরে স্বপ্ন-আলোয় নাচে গায়, গ্র্যাণ্ডে পার্টি দেয়, তখন গৌরহরি সযত্নে পালকের ঝাড়নে ডজ গাড়িখানা বার বার মুছছে আর মুছছে। ঐ তার আনন্দ, সুখ, সম্পদ। অল্প একটু মাতাল হয়ে বেরিয়ে আসে রাখোহরি, ইংরিজিতে কথা বলে বড় বড় অফিসারদের সঙ্গে, বিদায় নেয়। গৌরহরি গাড়ির দরজা খুলে ধরে থাকে। সযত্নে গাড়ি চালিয়ে রাখোহরিকে নিয়ে আসে। বগলাপতি জেগে অপেক্ষা করে থাকেন। গৌরহরিকে ডেকে রাখোহরির গতিবিধির খবর নেন, ব্যবসাপত্রের অবস্থা বুঝবার চেষ্টা করেন। গৌরহরি বুঝতে পারে, একটা গোলমাল পাকাচ্ছে। কিন্তু সেটা কেমন গোলমাল তা তার মাথায় আসে না, সে যা দেখে তাই বলে দেয় বগলপতিকে। বগলাপতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকেন। মাঝে মাঝে বলেন—বড়গাছে নৌকো বাঁধবার চেষ্টা। গৌরা, এবার তোর জন্য আলাদা বন্দোবস্ত করতেই হচ্ছে। সবংশে রাখোহরি যদি ডোবায়—তুই কেন মরবি। তুই আলাদা ব্যবস্থা করে নে। তোর জন্যই রাতে আমার ঘুম নেই।

পি. জি-তে গাড়ি ঢোকাল না গৌর। বাইরেই ছেড়ে দিল বুড়ো লোকটাকে। লোকটা খুবই সাবধানী। ভিতরের পকেটে হাত চালিয়ে নোট বের করল, ঝুলে পকেট থেকে খুচরো। যা ভাড়া টায়ে টায়ে তাই দিল, খুচরো ফেরতের কোনো ঝামেলা রাখল না। এক্‌জ্যাক্ট ফেয়ার। বাহাঃ। রে বাহাঃ।

—স্যার, ঐ সার্জেন্ট কি আপনার কেউ হয়? হলে নম্বরটা কেটে দিতে বলবেন। আমি তো ঠিকমতোই পৌঁছে দিয়েছি আপনাকে! দিই নি!

বুড়োটা খ্যাঁক করে ওঠে—সার্জেন্ট আমার বাবাকেলে আত্মীয় হয় আর কি! নম্বর টুকেছে তো আমি কী করবো? তোমাদের বদমাইশী কে না জানে? দেয় যদি ঠুকে তো ঠিকই করবে। উচিত শিক্ষা হওয়া দরকার। লোকে বিপদের সময়ে ট্যাক্সি পায় না, আর তোমরা নানা কাজে ট্যাক্সি ভাড়া খাটাও—গভর্নমেন্টের পুষ্যিপুত্তুর সব—বুড়োটা বক্‌বক্‌ করতে করতে কাটল।

শালা! গৌরবাবুর টিফিন-টাইম হড়কে দিয়ে আবার গরম খাওয়া হচ্ছে!

শালার ঐ সার্জেন্ট না ধরলে গৌরবাবু কবে পিছলে বেরিয়ে যেত, তখন কী

করতে বাবা বুড়ো-মাল !

বিড়বিড় করতে করতে গৌরহরি আবার লাল কাপড়ে তার মিটার বাঁধে। একটা মেয়েছেলে দূর থেকে আঙুল দেখাচ্ছে—এই যে, এই ট্যাক্সি !

আর না বাবা। আর না। এবার দাশ কেবিন। সোজা নাক বরাবর। একচুল এধার ওধার হয়েছে তো গৌরহরির নামই গৌরহরি নয়। কারো সার্ভেণ্ট নাকি বগলাপতির ছেলে ? অ্যাঁ ! তোমাদের পকেট গরম বাবা, সে তো বুঝতেই পারছি মাসের প্রথম দিকটা তো—জানি। কিন্তু বাবা, আমি কারো পয়সার কেনা চাকর নই। এই ল্যাণ্ডমাস্টার এখন প্রাইভেট প্রপার্টি। বগলাপতির ডজ গাড়িটার মতো, হ্যাঁ, আলবৎ, লাল কাপড়ে মিটার ঢাকার পর এখন এই আমার প্রাইভেট। ফোটো সবাই, ফুটে যাও সব সোয়ারী। গৌরবাবুর টি-পার্টি আছে দাশ কেবিনে। ছাড়ো রাস্তা।

বদর-বদর। দরগায় সিন্নি, গির্জেয় মোমবাতি—বাবা পুলুশে যেন আর না ধরে। পুলুশে ধরলে আঠারো ঘা।···অই দ্যাখো, শালাদের কারবার। রসা রোডটা বেমালুম গায়েব করে দিয়ে নদী বানিয়েছে। কেমন ঢেউ দিচ্ছে দেখ। কেমন কুলকুল শব্দ ঢাকার বুড়িগঙ্গার মতো। দোতলা একতলা স্টিমলঞ্চ যাতায়াত করছে দিব্যি। বয়ার ওপরে দাঁড়িয়ে জল-পুলুশ। লাল নীল সবুজ বলগুলো উড়ে আসছে, উঠছে নামছে। দু'একটা এসে ধীরে ধীরে বসল গৌরবাবুর গাড়ির বনেটে। সেই বুড়ো লোকটা উড়ে আসছে পি. জি. হাসপাতালের দিক থেকে, চেঁচিয়ে বলছে —এই ট্যাক্সিওলা, আট আনা পয়সা বেশী চলে গেছে ভাড়ার সঙ্গে—পালিও না—নম্বর টোকা আছে, সাবধান—

গৌর চোখ কচলে নেয়, কেমন ঘুমের আঁশ জড়িয়ে আছে চোখে। মাথার মধ্যে রিম্‌ঝিম্‌ শব্দ। ঠাহর করে সে রাস্তাঘাট বুঝবার চেষ্টা করে। নাঃ, রসা রোড রসারোডের মতোই দেখাচ্ছে আবার। কেবল ঐ রঙীন বলগুলো ঝামেলা করছে। উড়ে উড়ে আড়াল করছে উইণ্ড স্ক্রীনটা. ঐ তো পুলুশটার কাঁধে একটা নীল বল চেপে বসল।

নাঃ, ওটা গ্রীন লাইট। চলো হে গৌরবাবু।

গৌর তার খুদে ল্যাণ্ডমাস্টার একটা ডবলডেকারের গা ঘেঁষে উড়িয়ে নিল। দাশ কেবিন। আফিঙ মেশানো চোতরা পাতার ক্বাথ না হলে আর এখন গৌরবাবুর নার্ভ কাজই করবে না, পুরোটা ব্রেক ডাউন হয়ে বডি পড়ে যাবে।

গৌর ওঠে। সত্যিই ওড়ে। তার স্পষ্টই মনে হয়, মাটির ছ' ইঞ্চি ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে তার গাড়ি, রাস্তার টালগুলো আর চাকায় লাগছে না। ভারী ভাল লাগে গৌরহরির। নিরন্তর রাস্তা আঁকড়ে চলতে কাঁহাতক ভাল লাগে রোজ। মাঝে মাঝে এই উড়ে যাওয়া কীরকম ভাল ! গৌর খুশীতে শিস দেয়। তার গাড়ি উঠছে, উঠে যাচ্ছে।

সামনের আয়নাটা ঠিক করে নেয় গৌর। পিছনের ফাঁকা সীটটা নজরে রাখে। শালার ডেডবডিটা আছে ওখানে ঠিকই। কেবল সব সময়ে ওটাকে ঠাহর করা যায় না এই যা। মগন সিং-এর কাছে যখন ছিল তখনই শালা কোনো হুজ্জতে গাড়িটার

boiRboi.net

গ্রহদোষ ঘটে গেছে। সেই অপঘাতের মড়া এখন সবসময় বসে আছে পিছনের সীটে। নয়তো নড়ছে লাগেজ বুটে। নড়বি তো নড় শালা, আমার কী! আমি তোরটা খাই, না পরি! আমি হচ্ছি গে বগলাপতির অর্থাৎ কিনা বগলুর ছেলে গৌরহরি—অর্থাৎ কিনা গৌরা—। আমি শালা কার সার্ভেন্ট! লাল কাপড়ে মিটার ঢাকলেই এ আমার প্রাইভেট প্রপার্টি। এই দেখ্, আমি গৌরা—নিজের প্রাইভেট গাড়িতে চলেছি দাশ কেবিনে। চা খাবো। তুই মরা মানুষ—মরা মানুষের মতো থাকবি—নো ইণ্টারফিয়ারেন্স। মড়াদের সঙ্গে জ্যান্তদের নো বিজনেস্। মাগনা ট্যাক্সি চড়ছিস—এই ঢের। খবরদার যদি গৌরবাবুকে কখনো ভয় দেখিয়েছিস্—

ভাবানীপুর, কালীঘাট পেরিয়ে গেলে দাশ কেবিন আর খুব দূরে নয়। তবু দেয়ার আর মোন এ স্লিপস্—। ফুটপাথে রঙ-বেরঙের মানুষের ভিড়। খালি ট্যাক্সি দেখলেই শালারা হাত ওঠায়। মোড়ে লাল বাতিতে দাঁড়িয়েছো কি—যেতে চাও বা না চাও—দরজা লক্ করা না থাকলে নিজেরাই খুলে ঢুকে পড়বে। একশো কারণ দেখালেও কাকুতি-মিনতি করতে থাকবে—বড় দরকার দাদা, একটু কাইন্ড হয়ে নিয়ে যান—বাড়তি পয়সা দেবো—দেখছেন তো সঙ্গে মেয়েছেলে রয়েছে। গৌর খেয়াল করে চলতি গাড়িতেই পিছনের দরজা দুটো হাত বাড়িয়ে লক্ করে দিল। এখন দাশ কেবিন ছাড়া কোথাও যাবে না গাড়ি। কেবল যদি ধরে বাবা পুলুশে তবে অন্য কথা। পুলিসকে বরাবর ডরায় গৌরহরি, যেমন ডরাতো তার বাবা বগলাপতি। কত দারোগা যে তাদের বাড়িতে পাঁঠা খেয়ে ঢেকুর তুলে আশীর্বাদ করে গেছে। গৃহদেবতার মতো তাদের খাতির ছিল। যেদিন দারোগা খেত, সেদিন বগলাপতির ছিল সকাল থেকে বাঁধা উপোস। সেই সব ভয় ভীতি থেকেই তাদের উন্নতি। সেটা কোনোকালে বুঝল না রাখোহরি। সে এসে দারোগাদের দাবড়াতে লাগল, ইনস্পেক্টরদের সঙ্গে চাকর-বাকরের মতো ছিল তার ব্যবহার। এই যেমন এখন গৌরহরির গাড়িখানা উড়ছে, ঠিক তেমনই উড়ত রাখোহরি। পুরোনো দারোগা সমাদ্দার মাঝে মাঝে বগলাপতির কাছে দুঃখ করে যেত—তোমার ছেলের কাছে আর আমাদের পদমর্যাদা বলে কিছু রইল না হে বগলা। বগলাপতি তাকে হাত কচলে বলতেন—ও আমার ছেলে না। আমার রক্তের ধাতই নয়। ও ব্যাটা পেয়েছে ওর মামাবাড়ির ধাত। আমার শ্বশুরবাড়িটার ঐ দোষেই কিছু হল না। ও শালা ওর মায়ের ছেলে, আমার না—

চুলকে ঘা করা। রাখোহরি তাই করেছিল। তার দূরের খুঁটির জোরে সে আশেপাশের সবাইকে মাটির ঢেলার শামিল করে দিয়েছিল। চুরি-চামারী যেমন চলছিল তেমনই চলতে লাগল। বাড়িতে এল রেডিওগ্রাম, রেফ্রিজারেটার, বগলাপতির ঘরে লাগানো হল এয়ারকুলার। তারপর ডজ গাড়িটা বেচতে চেষ্টা করতে লাগল রাখোহরি।

সেবারে উত্তর বাঙলায় বন্যার পর স্টোরিং এজেন্টদের খুব রবরবা দেখা দিল। হাজার হাজার টন খাদ্যশস্য মজুত হতে লাগল এজেন্টদের মারফত। রাখোহরির ছোটাছুটি গেল বেড়ে। সে কেবল গুদাম ভাড়া করে, আর মজুত করে মাল। লোডিং আনলোডিং-এর দরুন শস্যের যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তার একটা হিসাব ধরে

BoiRboi.net

শস্যের পরিমাণ বাদ দেয় সরকার। ধরে করে সেই পরিমাণটা বাড়িয়ে নিয়েছিল রাখোহরি। সেটা ছিল হাতের মুঠোর আইনসঙ্গত ইনকাম। তার ওপর কমিশন আর হ্যাণ্ডলিং। এইসব নিয়ে রাখোহরি যখন ভীষণ ব্যস্ত তখন একদিন বগলাপতি গৌরহরিকে ডেকে পুরোনো ডজ গাড়িটা বের করতে বললেন। তারপর সাজ-পোশাক পরে বেরোলেন। গৌরহরি গাড়ি চালিয়ে দিল। না, পুরোনো ব্যবসাপত্রের জায়গায় আর গেলেন না তিনি। তাঁর নির্দেশে গাড়ি এসে থামল মগন সিং-এর গ্যারেজে। সেইখানেই ল্যান্ডমাস্টারখানা ছিল। প্রথম দিককার মডেল, খুব চালু গাড়ি। বগলাপতি ন' হাজারে কিনলেন গাড়িখানা। গৌরকে ডেকে বললেন—বুঝলি গৌরা, তোকে যা দেবো ভেবেছিলাম তা আর বুঝি হল না। তা এই গাড়িখানা দেবোই, এটায় তোর সারা জীবন চলে যাবে হয়তো বা, যদি ভাগ্যে থাকে। রাখোহরি সর্বনাশ আনল বলে। তা তুই অবোধ প্রাণী, সে গর্দিশে তোর কষ্ট পাওয়ার দরকার কী? যার যেমন গুণ তার তেমনি প্রাপ্য হওয়া উচিত। তোকে লাখ টাকা দিলেও তো গুণে গেঁথে হিসেব করে চলতে পারবি না। ঐ রাখোহরিই তোর মাথায় হাত বুলিয়ে নিয়ে নেবে। তার চেয়ে এই ট্যাক্সিখানা চালা। চালাবিও ভাল, থাকবি আনন্দে, খেয়ে পরে। খুব বেশী লোভ-টোভ করিস না বাবা।

তারপর সেই গাড়ি সাদা-হলুদ রঙ করে, সীট-টীট পাল্টে, মেরামত করে, কালীঘাটে নিয়ে মায়ের পুজোর ফুল সিন্দুর ঠেকিয়ে, লাইসেন্স পারমিটের ঝামেলা মিটিয়ে একদিন ট্যাক্সি হয়ে রাস্তায় বেরোলো। মা দৃশ্য দেখে বুক চাপড়ালেন—ছেলেটাকে চাকরের অধম করেছো। এতদিন ছিল ড্রাইভার তাও না হয় বুঝতাম। এখন কিনা ট্যাক্সিওয়ালা!

দূরদর্শী বগলাপতি কপালে ভাঁজ ফেলে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে বললেন—লজ্জার কী! এখন ওর স্বাধীন ব্যবসা। ওর যা ক্ষমতা সেই অনুযায়ী ওকে স্বাধীন করে দিলাম। এখন ও নিজেকে চালিয়ে নিতে পারবে। ভাইদের হাতে তোলা হয়ে থাকলে আমাদের চোখ বুজবার পর ও সত্যিই চাকর-বাকর হয়ে যেত। বাপ মা মরলে ভাইতে আর তালুইতে তফাত কী?

মা তবু ঘ্যানঘ্যান করতে লাগলেন—তা দিলেই যদি তবে নতুন আর ভাল গাড়ি দিলে না একখানা। বিশ ত্রিশ হাজার টাকার দামী গাড়ি হলেও না হয় বুঝতাম।

দূরদর্শী বগলাপতি আবার কপালে ভাঁজ ফেলে কী একটু ভাবেন, তারপর বলেন—সামনে বড় দুর্দিন, বুঝলে বড় বৌ! সেই দুর্দিনে একখানা দামী গাড়ি যদি গৌরের কাছে থাকে তবে রাখোহরি কি ছেড়ে দেবে? সেটা একটা অ্যাসেট বলে কেড়ে নেবে হয়তো বা। তা নতুন ল্যাণ্ডমাস্টার একটা দিতে পারতাম বটে, কিন্তু তার জন্য বসে থাকতে হবে। এই বয়সে এখন আর আমার দেরি সইছে না। নতুন না হোক গৌরাই জানে যে গাড়িখানা খুব চালু, পচা মাল দিয়ে ওকে ঠকাই নি। আমারই তো ছেলে, ওর ভবিষ্যৎ ভেবেচিন্তে ঠিক জিনিসখানাই দিয়েছি, এখন ইবলিশের বাচ্চা নিজের কপাল যদি নিজে না ভাঙে তো সংসারে চালু থাকবে।

দক্ষিণের রাস্তাগুলোই ভাল। না আছে মিছিল, না জ্যাম। পুলিসও নয় নর্থের মতো টিকরমবাজ। গৌরহরি ট্যাক্সির মিটার ঢেকে এখন মালিকের মতো গাড়ি

চালাচ্ছে। মিটার খুললেই ট্যাক্সিওয়ালা। মিটার ঢাকলেই গৌরবাবু। তার ঘুমটা এখন মাথা থেকে বেরিয়ে একটা মাছির মতো চারধারে ভোঁ ভোঁ করে ঘুরছে। সুযোগ পেলেই আবার ঢুকে পড়বে মাথায়। অমনি আবার আবছা হয়ে যাবে রাস্তাঘাট—রিয়্যালিটির সঙ্গে ড্রিম মিশে যেতে থাকবে। ঢাকার বুড়িগঙ্গার তীরের সেই কামানখানা এখনও লাল নীল হলুদ বল ছুঁড়ে দিচ্ছে বাতাসে। সেইসব বল ওড়াউড়ি করছে। ধীর গতিতে গড়াচ্ছে, ভাসছে, এসে বসছে বনেটের ওপর। মাঝে মাঝে সামনের রাস্তা উঠে যাচ্ছে উঁচুতে। এক আধজন মানুষ চলতে চলতে হঠাৎ উড়ে যাচ্ছে কোথায়! ভুস্ করে। ঠিক থাকো গৌরবাবু, ঠিক থাকো। আর একটু দূরেই দাশ কেবিন। এই তো প্রায় এসে গেছি বাপধন। আর একটু, আর একটু মাথাখানা পরিষ্কার রাখো তো বগলুর ছাওয়াল—

পিছনের সীটে মচ করে একটা শব্দ হয়। পরিষ্কার শব্দ। কোনো ভুল নেই। গৌরহরি আয়নায় চোখ রাখে। ঐ শালা ডেডবডিটা। বস্তুত ডেডবডিটাকে দেখা যায় না কখনো। কিন্তু শালা আছে ঠিকই। যখনই গৌর গাড়িতে একা তখনই শালার নড়াচড়া শুরু হয়। বিনা পয়সার সোয়ারী শালা, ধরতে পারলে ঘাড় ধরে ঝাঁকার দিত গৌর। বগলুর ছাওয়ালের সঙ্গে চিটিংবাজি! শালা ডার্কটিকিটের মতো অন্যের জিনিসে সেঁটে থাকা! কিন্তু ঐ একটা অসুবিধে। জ্যান্তদের সঙ্গে তবু ট্যাক্‌ল্ করা যায়, যতই জাঁহাবাজ হোক। কিন্তু মড়াগুলোকে কিছুতেই কিছু করা যায় না। এই ডেডবডিটাকে আজ পর্যন্ত কিছু করতে পারল না গৌর। শালা বগলুর ব্যাটাকে ছোলাগাছি দেখিয়ে দিব্য ল্যান্ডমাস্টারখানা বিনিপয়সায় ভোগ করে যাচ্ছে। দেখছে কলকাতা। ফোর টুয়েন্টি কোথাকার!

বিস্তর দাঁত উঠছে ভিড় থেকে তার ল্যান্ডমাস্টার লক্ষ্য করে। লোকে চেঁচাচ্ছে—ট্যাক্সি—ই—ই—

মাছিটা ভোঁ ভোঁ করে উড়ছে মাথার আশে পাশে। এক্ষুনি নাক কি কানের ফুটো দিয়ে ভিতরে সেঁধিয়ে যাবে। গৌর বিড়বিড় করে—আর একটু বাবা গৌর, আর একটু—শালারা ভেবেছে ভাড়ার গাড়ি। দেখছে না শালা, যে লাল কাপড়ে মিটার ঢেকেছি! এখন শালা এ গাড়ি আমার প্রাইভেট। ঐ ডেডবডিটা ছাড়া আর কোনো সোয়ারী নেই। এখন আমি ফ্রি। এখন আমার টিফিন টাইম—

ফাদার ফ্রান্সিস যখন খেলা শেখাত তার সঙ্গে শেখাত উচ্চারণও। সেন্ট অ্যান্টনিজ-এর ঘেরা মাঠে ফাদার ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে ডাকত—হে গৌরআর, ফ্যাস্ দি বল্।

গৌর চেঁচিয়ে বলত—পাস দি বল—

—সে ফ্যাস্ ফ্যাস্—নট পাস—

গৌর হেসে কুটিপাটি—ফ্যাস্-ফ্যাস্—আই ওন্ট্ ফ্যাস্ দি বল ফাদার, আই উড লাইক টু পাস্—

—ডুষ্টু ছেলে গৌরআরি—অ্যাও, বালো ওবে না—

আই! অবিকল ফাদার ফ্রান্সিস লাল নীল বলগুলোকে ঠেলে দিচ্ছেন এধার ওধার। সারা চরাচর জুড়ে ভাসছে সেই সব রঙীন গোলা। ফাদার চেঁচিয়ে বলছেন—এই গৌরহরি, ফ্যাস্ ইট—ফ্যাস্ ইট—

boiRboi.net

—আই ফাদার—গৌরহরি বিড়বিড় করে—আই উড লাইক টু ফ্যাস ইট ফাদার—আই উড ভেরী মাচ লাইক টু—

ফাদার ফ্রান্সিস চরাচর জুড়ে খেলা করেন। তাঁর সঙ্গে খেলে স্বপ্নের শিশুরা। উড়ন্ত মানুষেরা বল ধরে এগিয়ে দিচ্ছে ফাদারের পায়ে। গৌরের গাড়ি আবার মাটি ছেড়ে উড়তে থাকে। গৌর জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা লাল বল ধরার চেষ্টা করে। পারে না। হেসে গড়িয়ে পড়েন ফাদার—গৌরঅরি—অ্যাণ্ড গৌড়অরি—গুড ফর নাথিং—

রাসবিহারীর মোড়ে তার গাড়ি আবার মাটিতে নামে ঝং শব্দ করে। গৌরহরি চমকে ওঠে। চমকায় পিছনের সেই ডেডবডি।

গৌরের জানালায় দুটো মুখ ঝুঁকে পড়ে, হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—যাবেন দাদা !! আমরা বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি—

—দেখছেন তো মিটার ঢাকা রয়েছে—

—একটু দয়া করুন—

দয়া ! কিসের দয়া ! কোন্ পুলিশটা দয়া করে বগলুর ব্যাটাকে ! কোন্ ম্যাজিস্ট্রেট ! কোন্ সোয়ারী কথা না শুনিয়ে ছাড়ে ! অ্যাঁ ! পুলিশ ডেকে যখন ট্যাক্সি ধরো তখন ! না, হবে না। কে বলেছে এটা ট্যাক্সি ? এটা গৌরবাবুর প্রাইভেট।

দাশ কেবিনে কি পৌঁছনো যাবে শেষ পর্যন্ত ? কে জানে ! রাস্তাটা যে অফুরান লাগছে গৌরহরির। এখনো মনে হচ্ছে হাজার হাজার মাইল রয়ে গেছে। মোড়ে জ্বলছে লালবাতি। বাবা লালবাতি, গৌর যে আর পারে না—বগলুর পোলার প্রাণটা যে গেল—দাশ কেবিনের সেই চোতরা পাতার ঘন ক্বাথটি—যার নাম কিনা চা—সেইটি সিস্টেমে না ঢাললে যে এখন ড্রিমে আর রিয়্যালিটিতে চামচে-নাড়া হয়ে যাচ্ছে—আমে দুধে মিশে যাচ্ছে বাবা—

মচ করে পিছন থেকে আবার শব্দ হয়।

—চোপ। বলে ধমক মারে গৌরহরি। শালা ডেডবডিটা—বিনিপয়সার পার্মানেণ্ট সোয়ারী ! হাফ-ফিনিশ ফিফ্‌টি পারসেন্ট গৌর না হলে শালা তোমার দম বের করে দিত।

গ্রীন লাইট।

গৌর শ্বাস ছেড়ে গাড়ি ছাড়ে।

দাশ কেবিন থেকে যখন বেরোলো গৌর, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলল সে। শরীরের ভিতরটায় বাতাস বইছে, চাঁদ উঠেছে সেখানে, বাগান আলো করে ফুল ফুটেছে। শরীরের ভিতর এইসব হচ্ছে এখন। গৌর মৌরি চিবোতে চিবোতে একটা শুখো আর একটা ভাল পায়ের ওপর একটু টেরছা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর শরীরের ভিতরকার সেই জ্যোৎস্না, সেই বাগান, সেই বাতাস অনুভব করল কিছুক্ষণ। গৌর কোনোদিনই কারও সার্ভেণ্ট নয়। ঐ সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার ল্যান্ডমাস্টার—মিটারে লাল কাপড় জড়ানো।

প্রাইভেট। গৌর যখন খুশী খুলবে কাপড়, যখন খুশী প্রাইভেটকে ভাড়াটে গাড়ি বানাবে। কোনো শালার কিছু বলার নেই। এখন দশ কোবিনের গরম অমলেট, চা আর টোস্ট তার পেটে গিস্‌গিস্‌ করছে। ঠিক যেন বাতাসে, চাঁদের আলোয় একখানা ফুল-ফোটা বাগান। ইচ্ছে করলে, যতক্ষণ খুশী শরীরের ভিতরকার সেই দৃশ্যটা উপভোগ করতে পারে বগলুর পোলা গৌরা—কোনো শালার কিছু বলার নেই। বাপ বগলাপতিই তাকে স্বাধীন করে দিয়ে গেছে। লোকটার ফোর-সাইট ছিল বটে।

স্টোরিং এজেন্সীটা যখন ফুলে ফেঁপে একটা বিশাল আকার নিয়েছে তখনই বলতে কী—রাখোহরি তার ভুল বুঝতে পারছিল। কারবারটা এত ছড়ানো তার ঠিক হয় নি। বিস্তর দৌড়ঝাঁপ এবং তদবির করতে হচ্ছিল। সামলাতে হচ্ছিল বিবিধ ফুটোফাটা। ওদিকে বড়কর্তাদের রদবদল শুরু হয়ে গেছে। পাল্টে গেছে মিনিস্টার। নতুন করে আবার কোমরে কাপড় বেঁধে রুই-কাৎলা ধরো। যাদের চিরকাল উপেক্ষা করে এসেছে রাখোহরি, তখন তাদের জো। তারা ওঁৎ পেতেই ছিল। কোনো গুদামেই মাপ মতো মাল থাকে না। এ কথা কে না জানে! রাতারাতি মাল এদিক ওদিক হয়, ওজন ম্যানেজ হয়, বড়কর্তারা পান-তামাক খেয়ে ব্যাপারটা চেপে যান। কিন্তু সেবার বড়কর্তাদের পান-তামাকের বন্দোবস্ত তখনো করে উঠতে পারে নি রাখোহরি। উত্তর বাংলার গর্দিশে আটকে গিয়েছিল। এক রাতে ইনস্পেক্টর আর দারোগা তার দুটো গুদাম দিল সীল করে! রাখোহরি প্রথমে চোখ রাঙাল, তারপর লোভ দেখাল, তারপর বসল মথায় হাত দিয়ে। ফুডের সেক্রেটারী রিটায়ার করেছে, মিনিস্টার পেয়েছে অন্য পোর্টফোলিও। রাখোহরি করে কী?

প্রথমে বগলাপতি ব্যাপারটা জানতেও পারে নি। একা একাই ম্যানেজ করার চেষ্টা করেছে রাখোহরি। অবশেষে বেগতিক দেখে এসে পড়ল বগলাপতির কোলে—বাবা, বাঁচাও।

বগলাপতি চুপ করে সব শুনলেন। বুঝলেন, শুধু দারোগা বা ইনস্পেক্টর নয় অন্য ব্যবসায়ীরাও আছে এই চক্রান্তে। প্রফেশনাল জেলাসী। বিলেতে ম্যানেজমেন্ট শেখা রাখোহরি মূলেই গণ্ডগোল করে বসে আছে। তবু বগলাপতি শেষ চেষ্টা করতে বেরোলেন। কিন্তু বৃথা। ব্যাপারটা নালী ঘায়ের মতো চাউর হয়ে গেছে তখন। পাবলিক গেছে ক্ষেপে। কাগজেও ছোট্ট করে খবর বেরিয়ে গেল। পাবলিকের দুর্ভিক্ষের খাবার নিয়ে কালোবাজার! দেশদ্রোহ, মানবতার শত্রুতা! তার ওপর রাখোহরি বোকার মতো নিজের দোষ ঢাকাতে সীল করা গুদামের টিন লোক লাগিয়ে রাতারাতি ফুটো করে চুরি দেখাতে চেয়েছিল। কিন্তু সেটা টিকল না। রাখোহরি আর বগলাপতি—দুজনকেই পুলিসে ধরল। বালীগঞ্জের বাড়িটাতে তখন মা আর হাফ-ফিনিশ গৌরা।

গৌরা অতশত বোঝে না। মা সারাদিন কান্নাকাটি করে। গৌরা সকালে ল্যাণ্ডমাস্টার নিয়ে বেরোয়। সারাদিন কলকাতার সোয়ারী এধার ওধার করে, রাতে টাকা আর খুচরো একগাদা নিয়ে এসে মায়ের কোঁচড়ে ফেলে। মা কেঁদে আকুল হয়—ও আমার গৌরা। শেষে তুই খাওয়াবি আমাকে, এ কথা কে ভেবেছিল বাপ

আমার? তোর যে বাঁচার আশা ছিল না। টিক টিক করে টিকে আছিস এই যে আমার ভাগ্যি।

ধীরে সুস্থে মিটারের লাল কাপড়টা খোলে গৌর। অমনি তৎক্ষণাৎ একজোড়া ছেলেমেয়ে এসে গাড়ির দরজার হাতল ছুঁয়ে বলে—আমরা একটু গঙ্গার ঘাটে যাবো।

—গঙ্গার ঘাট! মৃদু হাসে গৌর। মন্দ কী? দাশ কেবিনের পর এখন গঙ্গার ঘাট ভালই লাগবে গৌরের।

—চলুন। বলে সে লক খুলে দেয়।

ছেলেমেয়েদুটো কলকল করতে করতে পিছনে উঠে পড়ে।

তাদের কথার মাঝখানে মাঝখানে একটু আধটু ফিস্‌ফিসানি শুনতে পায় গৌর। মেয়েটা বলে—লোকটার একটা হাত দেখেছো। কেমন শুকনো কাঠের মতো?

ছেলেটা বলে—একটা পাও তাই।

—ওমা! তাই নাকি? কী করে তবে গাড়ি চালায় গো? অ্যাকসিডেণ্ট করবে না তো!

—দূর। গাড়ি তো অভ্যাসে চলে।

গৌর হাসে। আহা; বগলুর পোলা গৌরা—হাফ-ফিনিশ ফিফটি পারসেণ্ট—ছা-রা-রা-রা-রা—

জামিনে খালাস পেয়ে বগলাপতি যখন বেরোলেন তখন তার চেহারা রোঁয়া ওঠা কাকের বাচ্চার মতো। মুখের চামড়া কী এক রোগে কালো হয়ে গেছে অর্ধেক। চামড়া দুল্‌ দুল্‌ করে ঝোলে। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউণ্ট লালবাতি দেখাচ্ছে। বাড়ি মর্টগেজে। ডজ গাড়িটা ছ'হাজারে বিক্রি করেছে রাখোহরি। কেস্‌ চলতে লাগল। সে কী চলা। তার ব্রেক নেই, ইঞ্জিন গরম হয় না, ড্রাইভার টিফিন খায় না। কেস্‌ চলে তো চলেই। সেই কেস্‌ই আস্তে আস্তে শুষে নিল তাদের সংসার। বগলাপতি ঘন ঘন দুটো স্ট্রোক সামলালেন। তৃতীয় স্ট্রোকে হড়কে গেলেন দুনিয়া থেকে। তার দু'মাস পর মা। তখন বিলেত-ফেরত ম্যানেজমেণ্ট শেখা রাখোহরি লুঙ্গি পরে রকে বসে বিড়ি খায়। বিলেত থেকে ফিরে অনেক কাণ্ড করার পর বিয়ে করেছিল। গুষ্টি বেড়েছে। মাঝে মধ্যে গৌরের ল্যাণ্ডমাস্টারটার দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকে। জিজ্ঞেস করে, এটার যেন কত দাম পড়েছিল রে?

গৌরহরি সতর্ক হয়ে বলত—হাজার চারেক বোধহয়। এখন দু' হাজারেও বিকোবে না।

বিক্রি করতে করতে অস্থাবর সবকিছুই ফিনিশ করেছিল রাখোহরি। এক কথা ছাড়া তার আর কিছুই ছিল না। মাঝে মাঝেই ধার বলে পয়সা নিত গৌরের কাছ থেকে। বিনিপয়সায় তার ট্যাক্সিতে এধার ওধার যেত। বাপের যা ছিল তার এক পয়সাও ছোঁয়াল না গৌরকে। দূরদর্শী বগলাপতি তা জানতেন। ল্যাণ্ডমাস্টারখানা নিয়ে গৌর তাই সুখেই আছে।

তা গৌরা তেমন চিন্তা-ভাবনা করতে পারে না কোনোদিনই। করলেই মল-পরা দুটি পা মাথার মধ্যে চক্কর মারতে থাকে। সে এমন চক্কর যে গৌর ছোটাছুটি করে, শব্দ থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, গায়ে ঘাম দেয়, চোখ মুখ ফেটে পড়তে

BoiRboi.net

থাকে। কিন্তু সেই নাচুনে মাগীর নাচ আর শেষই হতে চায় না। শেষে সেই ঝম্‌ঝম্‌ মাথা থেকে তার সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। তার রক্ত, হাড় মজ্জা সব সেই, ঝম্‌ঝমের সঙ্গে তাল দেয়। বড় নেতিয়ে পড়ে গৌরহরি। তার বাহ্যজ্ঞান প্রায় লোপ পেয়ে যায়। বগলাপতি দুনিয়া থেকে হড়কে গেলে তার স্থাবর অস্থাবর সব যা ছিল, কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিল রাখোহরি। রিফিউজি কলোনীর বাড়িতে উঠে গিয়ে বালীগঞ্জের বাড়িতে ভাড়াটে বসাল। কেবল ছুল না কম্যাদামের ল্যাণ্ডমাস্টারটা। তার আর একটা কারণ বোধহয় এই যে গৌরহরির আয় থেকে সে নিয়মিত ভাগ বসাতে পারত। এই সব যে করল রাখোহরি, তার এত যে কায়দা কৌশল, এই সব গৌর-হরি বুঝতে পারত, কিন্তু বেশী বুঝতে গেলেই মাথার মধ্যে নানা জটিল চিন্তা দেখা দিত। আর তার সঙ্গে ঐ নাচুনে মাগীর বেহদ্দ নাচ। তাই চিন্তাভাবনা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে গৌর। কেবল মাঝে মাঝে ভাবে—আমি শালা গৌরহরি বগলাপতির ছাওয়াল—এই দুনিয়ায় আমি কি খুব ঠকে গেলুম! এই যে রুখো-শুখো দুটো হাত-পা, মগজে এই যে এত ঝম্‌ঝম্‌ এই সব নিয়ে আমি কতদূর কী করছি দুনিয়ায়? কী করার ছিল আমার? আর কী-ই বা করেছি? তবে কি আমার সারাজীবনের একমাত্র কাজ একখানা পুরোনো ল্যাণ্ডমাস্টারে সারা কলকাতা চষে এধারকার মানুষ ওধারে নেওয়া! এই করতে করতেই কি শালা কোনো মানুষ পারফেকশানে পেঁছাতে পারে! অ্যাঁ? বগলুর পোলার কপালে শেষে কি এইটুকু মাত্র পারফেকশান লেখা ছিল? বিলেত না, বিদেশ না, পয়সাকড়ি না, বৌ না, না ছেলেপুলে—কেবল একটা ভুতুড়ে ল্যাণ্ড-মাস্টার, আর দাশ কেবিনের চোতরাপাতার ক্বাথ—আর শালা পুলুশবাবা, লাল নীল আলো—ঝুটঝামেলা—গঙ্গার ঘাট থেকে পগেয়াপট্টি—টেরিটি-বাজার থেকে সাউথ সিঁথি—আর মাঝে মাঝে মৌতাতের সময় বয়ে গেলে ড্রিম আর রিয়্যালিটির অ্যাডমিকশ্চার?

একটা বাজে মেয়েমানুষ আছে চৌরঙ্গির। তাকে জুটিয়েছিল আর এক ট্যাক্সিওয়ালা মদনা। মদনাই ধরে দিয়েছিল তাকে মেয়েমানুষটা। সেই মেয়েমানুষটারও সোয়ারী জুটলে গৌরের ট্যাক্সি ডাকায়। ডাকিয়ে চক্কর দেওয়ায় ময়দানে। একটু অন্ধকার মতো হয়ে এলে গঙ্গার ঘাটে নির্জনে কোথাও গাড়ি দাঁড় করাতে বলে। গৌরহরি তখন নেমে গিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খায়, আর দেখে দূর থেকে—তার গাড়ির পিছনের কাচে দুটো ছায়া পরস্পর লেপ্টে গেল। তারপর আর তাদের দেখা যায় না। গৌরহরি চোখ ফিরিয়ে নেয় লজ্জায়। ঘন্টাখানেকের এইসব ব্যাপারের জন্য ত্রিশ চল্লিশ টাকা আয় হয় তার আর সেই সঙ্গে কখনো সেই মেয়েমানুষটার শরীর একটু আধটু ছোঁয়া যায়। সেটুকু ভাল লাগে না গৌরের। কেবল বদরক্ত বেরিয়ে যাওয়ার পর একটা রিম্‌ঝিমে ক্লান্তি আর ঘুম আসে। জীবন থেকে সে মাত্র এইটুকু পাচ্ছে, এইটুকু পারফেকশান। তার বাপের কিনে দেওয়া ল্যান্ডমাস্টারে এইসব পাপের কাজ হয় বলে মাঝে মাঝে মরমে মরে থাকে গৌরহরি। তার আর উন্নতি হয় না। সে যা ছিল তাই রয়ে গেছে।

রাখোহরির সংসার বিস্তর টেনেছিল গৌর। এক এক সময়ে মাসের পর মাস। কেস চলছিল। তিনটে কেস। কপাল ভালই রাখোহরির। একের পর এক কেস

জিতে গেল। কী করে জিতল, কোন গলিঘুঁজির পথে—কে জানে! তবে জিতল ঠিকই। ফিরে গেল বালীগঞ্জের বাড়িতে। আবার গাড়ি কিনল। দাবড়ে শুরু করল বাবা বগলাপতির ব্যবসা। রিফিউজি কলোনীর বাড়িটাতেই রয়ে গেল গৌর। তার আর উন্নতি হল না। রাখোহরি বগলাপতির কথার মতোই তখন তার তালুই।

বিচিত্র গাড্ডা। এ নিয়ে যে সে ভাববে তারও উপায় নেই। কোনো সুন্দর সকালে সে রাখোহরির কাছ থেকে বাবা বগলাপতির কিছু বিষয় সম্পত্তি ঝেঁকে আনবে এমনটা সে ভাবতেই পারে না। লড়াকু ছেলে রাখোহরি। বিপরীত ভাগ্যকে নিজের কোলে টেনে এনেছে আবার। মদনা গৌরকে পরামর্শ দিয়েছিল, মামলা কর।

আই বাপ। বাপের দেওয়া ল্যান্ডমাস্টারখানা আর রিফিউজি কলোনীর দুখানা টিনের ঘর ছাড়া তার কিছুই নেই। মামলার খুরে খুরে তাও চলে যাবে। তার ওপর রাখোহরির মতো লড়াকু।

গাড়িটা চমকাচ্ছে। ইঞ্জিন টানছে না তেমন। গৌর বিড়বিড় করে গাল দেয়—শালা, তুই কি হিউম্যান বিয়িং যে চমকাচ্ছিস্! আর একটু চল বাবা, গঙ্গার হাওয়া খাওয়াবো।

গাড়ির ভিতরের অন্ধকারে পিছনের সীটে ছেলেটা আর মেয়েটা বসে আছে। পিছনের আবছা কাচে তাদের ছায়াদুটোকে দেখা যায়, লেপ্টে আছে। একটু আগেও কলকলাচ্ছিল। এখন চুপ, চুমকুড়ি কাটছে বোধহয়। আঠা দেখ শালার। কাটে কাটুক। তাতে গৌরের কী! গৌর হাত বাড়িয়ে আয়নাটা ঘুরিয়ে দেয় একটু।

রেসকোর্সের গা ঘেঁষে চমৎকার একখানা বাঁকে গাড়িখানা উড়ে যাচ্ছে। গঙ্গার বাতাস ঝাপটা মারে। নিওনের আলোয় তারার গুঁড়ো ঝরে পড়ছে। ঐ দেখা যায় জাহাজের হলুদ মাস্তুল, জিরাফের মতো উঁচু গলার ক্রেন। আলোয় আলো বন্দর। চওড়া রাস্তায় ধুলোর কণা মেলে না প্রায়। যতবার এই ঘাটে এসেছে গৌর ততবার মনে হয়েছে—এই তো বিদেশ! এই তো শালার লণ্ডন, যেখানে একদা ল্যান্ড করেছিল তার দুই দাদা, রাখোহরি আর থাকোহরি। গৌরও করত। স্বভাবের নিয়মে সব চললে আজ তারও হতো মেম বৌ। বেগড়বাই বাঁধালো মগজের ঐ ঝম্ঝম্ শব্দ, আর দুটো রুখো-শুখো হাত-পা।

ভাবতে ভাবতে শ্বাস টানে গৌর। গঙ্গার বাতাসে তার ফুস্ফুস্ পালের মতো ফুলে ওঠে। কলকাতা পার হয়ে লন্ডনের ধার ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করায় গৌর।

—ওমা! এসে গেছি! মেয়েটা চমকে গিয়ে বলে।

আড়চোখে আয়নাটা দেখে গৌর। ছায়াদুটো আবার আলগা দিয়েছে। শালা ভুখ্খা পার্টি! ঘরদোরে জায়গা পায় না, তাই ট্যাক্সিতে চড়ে যত আশনাই। গৌরবাবুর ল্যান্ডমাস্টারখানাকে কী পেয়েছিস তোরা? ফুলশয্যার বিছানা, না হনিমুন কটেজ?

ছেলেটা নেমে মিটার দেখল না, জিজ্ঞেস করল—কত?

গৌরও মিটার দেখল না, কেবল একটু আলস্যের সঙ্গে বলল—চার টাকা দশ পয়সা।

ছেলেটা ভ্রূক্ষেপও করল না। দিয়ে দিল। তারপর ছেলেটা আর মেয়েটা গঙ্গার

boiRboi.net

ঝোড়ো বাতাসে এলোমেলো চুল হাতে সামলাতে সামলাতে আলো থেকে অন্ধকারে কোথায় চলে গেল।

গৌর নেমে মিটার ঘুরিয়ে দেয়। সত্যিকারের কত উঠেছিল তা দেখার চেষ্টাও করে না। সঙ্গে মেয়েছেলে থাকলে ডাঁটিয়াল ছেলেরা মিটার-ফিটার দেখার ঝামেলা করে না। গৌরেরই বা কী দায় পড়েছে। সেও আন্দাজী মারে। বগলুর পোলা গৌরা—প্রেস্টিজে সে কম যায় কিসে?

বনেটটা খুলে দেয় গৌর। খা বাবা ল্যান্ডমাস্টার, গঙ্গার হাওয়া খেয়ে লে। মিটারটা আবার লাল শালুতে ঢাকে গৌর।

তারপর বগলুর ব্যাটা গৌর গাড়ির গায়ে বসে পেচ্ছাপ করে, থুতু ফেলে। তারপর নির্জন ঘাটের কংক্রীটের রেলিং ধরে এসে দাঁড়ায়। সামনেই হলুদ একখানা জাহাজ। তার সর্বত্র উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। উঁচু মাস্তুল পর্যন্ত উজ্জ্বল আলোয় ধু-ধু করছে। জাহাজের বিশাল খোল দেখে গৌর, দেখে তার সাদা কেবিন, আর সুনসান ডেক। কোনোখানে কোনো মানুষ নেই। এমন নির্জন আলোকিত জাহাজ কখনো দেখে নি গৌর। সে হাঁ করে দেখে আর দেখে। জাহাজটা খুব ধীর লয়ে দোলে। কোন্ কোন্ মুলুকে চলে যাও হে জাহাজ-বাবা! বগলুর ছাওয়াল পড়ে আছে কোন্ গাড্ডায়! ফিফটি পারসেন্ট বলে গৌরার সব ফুর্তিই বিলা হয়ে গেল। নইলে বাবা জাহাজ, তোমার ঐ ডেকের রেলিং ধরে ঝুঁকে আমি সমুদ্র দেখতুম। অ্যালবাট্রসের ছায়া দেখতুম, আমার টাই ফুরফুর করে উড়ত হাওয়ায়। জাহাজবাবা, হাফ-ফিনিশ গৌরার লাইফটায় কী আছে বলো তো! ঐ ভুতুড়ে ল্যান্ডমাস্টার, দুটো রুখো-শুখো হাত-পা, মগজে এক বেহদ্দ নাচুনে মাগীর ঝমাঝম্। কলকাতার সওয়ারী এধার ওধার করে কেটে যাচ্ছে জীবন! বাবা জাহাজ সাত ঘাটের জল খাও তুমি। সমুদ্রের জলে তোমার ছায়া পড়ে, সেই ছায়ায় খেলা করে স্বপ্নের পৃথিবী। নোনা হাওয়ায় কোন কোন মুলুকের গন্ধ ভেসে আসে। আর গৌরা!

মার শালা ভুতুড়ে ল্যান্ডমাস্টারের মুখে তিন লাথি, তিন লাথি কলকাতার সওয়ারীদের, আর তিন লাথি লাগা গৌরার কপালটায়। ফিফটি পারসেন্ট, হাফ-ফিনিশ গৌরা এইসব ভাবে, আর বিভোর হয়ে দেখে হলুদ জাহাজখানা।

ল্যান্ডমাস্টারটা হাঁ করে হাওয়া খাচ্ছে, গাঁই গাঁই করে ডেকে বাতাস বইছে ঝড়ের মতো। গৌরার লম্বা চুল ওড়ে। বিদেশী বাতাসে ভরে ওঠে বুক। গৌরার ফিরতে ইচ্ছে করে না, জাহাজখানা দেখতে দেখতে গৌর এক অদ্ভুত ওয়্যারলেস শুনতে পায়। বাতাসের ডাকের মধ্যে অন্তর্নিহিত একটা ভাষা ভেসে আসে। জাহাজটা গৌরকে কী যেন বলে। আই। জাহাজখানা হাফ-ফিনিশ গৌরাকে ওয়্যারলেসে ডাকে, বলে—বুয়েনস এয়ারিসের মতো সুন্দর শহর বড় একটা নেই। আমি সেখান থেকে এলুম। যাচ্ছি টোকিও, ফিরবো লণ্ডনে, যতদিন চালু আছি ততদিনই জীবনটা সুন্দর। জল আর স্থলের জীবন দুরকম বাবা গৌর। যেমনই হোক, চালু থাকাটাই আসল কথা। জলে, স্থলে বা অন্তরীক্ষে চালু থাকো হে বগলাপতির ব্যাটা। বগলুর ছাওয়াল, সংসারে চালু থাকাটাই সাকসেস্।

অবিকল এইরকম কথা বলতেন বগলাপতিও। ইবলিশের বাচ্চা যদি নিজের কপাল না ভাঙে তবে এই ল্যাণ্ডমাস্টার টার জোরেই সংসারে চালু থাকবে। বগলুর ফোরসাইট ছিল বটে। আজো যে সংসারে চালু আছে গৌর তা ঐ ল্যান্ডমাস্টারটার জোরেই। ঐ যে শালা হাঁ করে গঙ্গার হাওয়া খাচ্ছে ঐ ভুতুড়ে ল্যান্ডমাস্টার—মগন সিং-এর গ্যারাজ থেকে যেটাকে ন' হাজারে কিনেছিলেন বগলাপতি। সেকেন্ডহ্যাণ্ড গাড়ি বলে রাখোহরি ছোঁয় নি ওটাকে। গৌর চালু আছে ল্যাণ্ডমাস্টারটার জোরে, তবু কখনো-সখনো গঙ্গার ঘাটে এলে নীল সাদা হলুদ জাহাজগুলো অনেকক্ষণ দেখে গৌর। তখন তার ইচ্ছে করে ভুতুড়ে ল্যান্ডমাস্টারটাকে তিন লাথি, তিন লাথি কলকাতা আর কলকাতার সওয়ারীদের আর তিন লাথি নিজের কপালাটয় মারতে।

জাহাজবাবা, আমার বাবা বগলুও বলত এরকম কথা তোমার মতো। সাংসারে চালু থাকাটাই আসল কথা। তবু মাঝে মাঝে জাহাজ কি উড়োজাহাজ দেখলে, কিংবা হাওড়া কি শেয়ালদা থেকে দূরের রেলগাড়ি ছাড়ার সময়ে হঠাৎ বুকে বঁড়শি বিঁধে যায়। কোন অচেনা দূর যেন আমায় কলকাতার ঘোলা জল থেকে টেনে তুলে নিয়ে যেতে চায় জাহাজ-বাবা। আমি তো জানি, আমি হচ্ছি গে ঢাকা টিকাটুলির বগলাপতির ব্যাটা—হাফ-ফিনিশ ফিফটি পারসেন্ট গৌরা—খুব বেশীদূর যাওয়া আমার নেই। কলকাতাই আমার লিমিট। ঘুরে ঘুরে সেই কলকাতা, ঘুরে ঘুরে ফের কলকাতা। বাবা হলদে জাহাজ. আমি যখন মুরগীহাটার সওয়ারী বাগবাজারে খালাস করি, তখন তুমি বুয়েনস এয়ারিস ছেড়ে চলেছে টোকিও. কিংবা ফিরতি পথে লণ্ডনে। নীল পাহাড়ের ওপর বাতিঘরের আলো দেখ তুমি. দেখ সমুদ্রের ঝড়। ইটালীর জলপাইয়ের বনের ঝড় এসে লাগে তোমার মাস্তুলে। বাবা জাহাজ, বুকের বঁড়শিটা মাঝে মাঝে জোর টান মারে। কলকাতার ঘোলা জলে গৌর চমকায়, ঠিক যেমন ইঞ্জিন গরম হলে মাঝে মাঝে চমকায় তার ল্যাণ্ডমাস্টার। হাফ-ফিনিশ বলে গৌরা যে কোনো কিছুই পায় নি জাহাজবাবা।

খুব জোর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে গৌর. সেই দীর্ঘশ্বাসের শব্দে সে নিজেই চমকে ওঠে। আই। বগলুর দুই ব্যাটা বিস্তর জাহাজ দেখেছিল. দেখেছিল সমুদ্র, বিদেশ, দেখেছিল বিস্তর মেয়েছেলে। কিন্তু বগলুর তিন নম্বর ব্যাটা আটকে গেছে এক ভুতুড়ে ল্যাণ্ডমাস্টারের বগলতলায়। ছাড় নেই। তাই দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গৌর আবার ল্যান্ডমাস্টারের কাছে ফিরে আসতে থাকে।

মিটারের লাল শালুটা অন্যমনস্কভাবে খোলে গৌর. বনেট বনন্ধ করে। ড্রাইভিং সীটে বসে চাবিটা বের করে. তারপর হঠাৎ আগাপাশতলা চমকে উঠে বুঝতে পারে, তার পিছনের সীটে কে যেন বসে আছে। আয়নায় দেখা যায় পিছনের কাচের গায়ে একটা মাথা একটু হেলে আছে। এলানো একটা শরীরের ছায়া দেখা যায়। দরজাটা ঠেলে এক লাফে বেরিয়ে আসে গৌর। শালা ডেডবডিটা!

কয়েক পা নেংচে নেংচে দৌড়ে যায় গৌরহরি। তারপর থামে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে নিজের ল্যাণ্ডমাস্টারটার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে। বাস্তবিক ল্যাণ্ডমাস্টারটা কোনোদিনই সেণ্ট পারসেণ্ট গৌরহরির না। ওর ফিফটি পারসেণ্ট ঐ শালা ডেড-বডিটার—এটা গৌর মাঝে মাঝে টের পেত। এখন ডেডবডিটার আবছা অবয়ব দেখে

গৌরহরি বুঝতে পারে—শালা ভূতেরাও দাবি-দাওয়া ছাড়ে না। কবে মরে-হেজে গেছিস—তবু একটা পুরোনো ল্যান্ডমাস্টারের মায়া কাটাতে পারলি না, বাবা ডেডবডি! মানুষের কত কিছু চলে যায়। আমার বাপ বগলু সাতটা জাহাজডুবির শোক পেয়েছিল। আর আমি সেই বগলুর তিন নম্বর ব্যাটা—দ্যাখ—এই হাফ-ফিনিশ আমার জীবনটা—টিকাটুলির ডাকসাইটে বগলাপতির ছাওয়াল আমি—তবু আমার কপালে কেবল অবশিষ্ট আছে ঐ ল্যান্ডমাস্টারটা—যার ফিফটি পার্সেন্ট ভূতের কবজায়। বাবা ডেডবডি, গৌর কি কখনো ইন্টারফিয়ার করেছে তোমাদের ব্যাপারে? তবে তুমি কেন বাবা, হাফ-ফিনিশ গৌরার ল্যান্ডমাস্টারে? ল্যান্ডমাস্টারটা ছাড়া গৌরের যে আর কিছুই নেই বাবা!

গৌর দূরে দাঁড়িয়ে তার ল্যান্ডমাস্টারটার দিকে অবাক চোখে চেয়ে থাকে, আর বিড়বিড় করে। তারপর চমকায়।

গাড়ির পিছনের জানালা দিয়ে আস্তে আস্তে একটা মাথা বেরিয়ে আসে। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে থাকে। তারপর হঠাৎ গৌরকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে বলে—হেই। কাম হিয়া—

অমনি গৌরের মাথায় ধোঁয়া কেটে যায়। গাড়ির দরজা লক করা ছিল না। মাতালের পো উঠে বসে আছে। ভারী রেগে যায় গৌরহরি। নেংচে নেংচে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেলে সেন্ট অ্যান্টনিজের পাক্কা ইংরিজিতে বলে—এখানে কি হচ্ছে! অ্যাঁ? বেরোও, বেরিয়ে যাও—

লোকটা তবু দিব্যি গা ছেড়ে বসে থাকে, মাথাটা পিছনে হেলানো। ডান হাতখানা মাছি তাড়ানোর ভঙ্গীতে নেড়ে গৌরের ধমক-ধামক উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বলে—টেক মি টু স্যু।

—স্যু ফু আমি জানি না। তুমি বেরিয়ে এসো—

মাতাল লোকটা তবু হাত নেড়ে বলে—দেন টেক মি টু এ গুড উম্যান মেট।

বগলাপতির ছাওয়াল কি মেয়েছেলের দালাল? ইজ হি? চোস্ত ইংরিজিতে গৌর বলে—মাতাল আর মেয়েছেলেদের আমি ঘেন্না করি। তুমি কেটে পড়ো—

গৌরের ইংরিজি শুনেই বোধহয় লোকটা একটু থমকে যায়। ইতস্তত করতে থাকে। গৌর লক্ষ্য করে, লোকটা বেঁটে-খাটো, বছর চল্লিশ পঁয়তাল্লিশের মতো বয়স। জুলপীতে পাক ধরে একগোছা চুল সাদা হয়ে আছে। গায়ের রঙ রোদে জলে খেয়ে গেছে বলে বোঝা যায় না কোন দিশি। তবে জাহাজী বলেই মনে হয়। বাতাস যদিও ওড়াচ্ছে সবকিছু তবু গৌর একঝলক মদের গন্ধ পায়। মাতালদের গাড়িতে তোলে না গৌর। শালাদের কখনো কখনো স্থির ডেস্টিনেশন থাকে না। তার ওপর মাঝে মাঝেই শরীরের ক্বাথ হড়হড় করে ঢেলে দেয় গাড়িতে। ধোয়ামোছা করতে গৌরের দম বেরোয়।

—নামবে কি না বাপু, না কি পুলিস ডাকবো? গৌর ইংরিজিতে বলে।

গৌরের সেন্ট অ্যান্টনিজের নির্ভুল ইংরিজি শুনে লোকটা সত্যি ভড়কে যায়। নামবে কিনা ইতস্তত করে, ঠোঁট চাটে, চুলে হাত বোলায়, উদ্‌ভ্রান্ত চোখে চারদিকে চায়।

উত্তেজনার মধ্যেও লোকটার হাব ভাব দেখে গৌর তৃপ্তি পায়। আই জাহাজীর পো, শুনে লে ইংরিজি কাকে বলে। বগলাপতির এক ব্যাটা বিলেতে রয়ে গেছে, আর এক ব্যাটা বিলেত ফেরত. তিন নম্বর যদিও হাফ-ফিনিশ তবু ইংরিজি শিখেছিল ফাদার ফ্রান্সিসের কাছে। শুনে লে বাবা জাহাজী।

লোকটা অসহায়ের মতো বিড়বিড় করে বলে—আমাকে স্যার কাছে যেতেই হবে। আমাকে পেঁছে দাও—দয়া করো—বলতে বলতে লোকটা একটু কাত হয়ে হিপ পকেট থেকে এক গোছা দশ টাকার নোট বের করে গৌরকে দেখায়, বলে—আমার টাকা আছে, চিন্তা নেই। একটু আগে আমি একটা ঘড়ি বিক্রি করেছি. আর একটা স্পাই ক্যামেরা। এই দেখ কত টাকা—

টাকা দেখাচ্ছে! টিকাটুলির বগলাপতির ব্যাটা গৌরহরি—যে কিনা ডজ গাড়িটার আয়না নিয়ে বিস্তর রাজার মাথা আর তিন সিংহের মূর্তির ছবি দেখেছে—তাকে কিনা টাকা দেখাচ্ছে ফুটো পকেটের জাহাজী! ভারী রেগে যায় সে। ভাল হতখানা বাড়িয়ে সে জাহাজীটার হাত ধরে টান মারে. চেঁচিয়ে বলে—নামো. নামো—টাকা বিস্তর দেখেছি—

গৌর টানে। লোকটা কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে ভিতরে সেঁধোতে থাকে। পা দুখানা সীটের ওপর তুলে গোঁজ হয়ে পুঁটুলি পাকিয়ে বসে. বলে—দয়া করো—

অসুবিধে এই যে গৌরের একটা হাত আর একটা পা কমজোরী। আর লোকটা সেন্ট পারসেন্ট হাত-পা-ওলা, গৌর সুবিধে করতে পারে না। যত টানে, তত লোকটা সীট আঁকড়ে শুয়ে পড়তে থাকে। গৌর রেগে বাংলায় বলে—ফোট্ শালা বেজম্মা। আজ তোরই একদিন কি আমারই—

শুনে, শুয়ে থেকেই জাহাজীটা বড় বড় চোখ করে চায়। বলে—আরে বাঃ, তুমি বাঙালী দেখছি।

লোকটাকে গৌর সাহেব ভেবেছিল অনেকক্ষণ ধরে। এখন তার মুখে পরিষ্কার বাংলা শুনে চমকাল খুব। হাঁ করে একটু চেয়ে থেকে বলল—তুমি সাহেব নও?

লোকটা সীট আঁকড়ে আধাশোয়া অবস্থাতেই বলে—আরে দূর! আমি তোমাকেই সাহেব ভেবেছিলাম। যা ইংরিজি বলছিলে! মাইরি. শিখলে কোত্থেকে অমন ইংরিজি?

গৌর একটু দম নিয়ে বলে—সেন্ট অ্যান্টনিজ, ঢাকা। তুমি কোত্থেকে শিখেছো?

লোকটা—যেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে এমনভাবে—সহজ ভঙ্গীতে উঠে বসে, হাত-টাত ঝেড়ে বলে—আমি শিখেছি জাহাজে. সাত ঘাটের জল খেয়ে।

গঙ্গার বাতাসে গৌরের রাগ উড়ে গেল। বাঙালীর মুখে ভাল ইংরিজি শুনলে গৌরের এরকম হয়। তবু সে বলে—আমার গাড়িটা মাতালদের জায়গা না—

লোকটা ভয়ে ভয়ে মিটমিট করে তাকায়, বলে—আমি শুধু একটু বীয়ার খেয়েছি। মুখ শুঁকে দেখ। হাই—

লোকটা হাঁ করে এগিয়ে আসে। গৌর পিছোয়। পিছিয়ে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে বলে—তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। গাড়ি খুলে আমি দেখি একটা ভূত বসে আছে।

লোকটা হাসে। একটা সোনালী দাঁত চিকমিক করে। পর-মুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে বলে—আজ বিকেল থেকেই আমার মনটা খুব খারাপ, বুঝলে! খুব খারাপ।

মাতালদের দুঃখের কথা সহজে শেষ হয় না। গৌর জানে। তাই সে একটা শ্বাস ছেড়ে বলে—বুঝেছি। এখন গাড়িটা ছাড়ো, আমার কাজ আছে—

লোকটা আতঙ্কিতভাবে দরজার হাতলটা আঁকড়ে ধরে ভয়ের চোখে গৌরের দিকে চায়।

তাকে ভয় পায় এমন লোক বড় একটা দেখে নি গৌর। বরং সারাটা দিন গৌরই বিস্তর লোককে ভয় পায়। কখন কোন পুলিশবাবা ধরে, কোন সওয়ারী কোন গাড্ডায় নিয়ে ফেলে, কখন ল্যাণ্ডমাস্টারের ভূতটা শব্দ করে ওঠে। সারা দিনটা ভয়ে ভয়েই কাটে গৌরের, তাই এখন একজন তাকে ভয় পাচ্ছে দেখে গৌরের একটু মায়া হয়। সে নরম গলায় বলে—তোমার মতলবখানা কী?

লোকটা মিনতি করে—আমাকে নামিয়ে দিও না। স্যুর কাছে পেঁছে দাও। আমি বড় দুঃখী লোক, বুঝলে—সারা সন্ধে একটাও ট্যাক্সি আমাকে নেয় নি—

বলতে বলতে লোকটা হেঁচকি তোলে। কাত হয়ে হিপ পকেট থেকে এক প্যাকেট রথম্যান সিগারেট বের করে গৌরের দিকে বাড়িয়ে দেয়—এই নাও সিগারেট—

গৌর মাথা নাড়ে—না।

লোকটা মিনতি করে—নাও মেট। খুব ভাল সিগারেট। পুরো প্যাকেটটাই তুমি নিয়ে নাও।

গৌর মাথা নাড়ে—না।

লোকটা করুণ চোখে চেয়ে বলে—আমার জাহাজের জাহাজীরা সব যে যার মেয়েমানুষের কাছে চলে গেছে, ফুর্তি লুটছে সবাই। আর আমি শেষ জাহাজীটা সারা সন্ধেবেলা চেষ্টা করছি, কোথাও যেতে পারছি না। মাইরি—

জাহাজীটা ওয়ার্নিং না দিয়ে হঠাৎ কাঁদতে সুরু করে। টপটপ করে চোখের জল পড়তে থাকে।

গঙ্গার এই হুড় বাতাসটাই খারাপ। গৌরের মনটাকে দুবলা বানিয়ে দিয়েছে। সে যথেষ্ট বদমেজাজী হওয়ার চেষ্টা করেও পারছে না। তার ওপর লোকটা কাঁদতে শুরু করতেই সে কেমন বদলে যায়। মায়েদের মতো 'ষাট ষাট' করতে ইচ্ছে করে।

তা না করে গৌর লোকটার সিগারেট নেয়।

বলে—স্যু কে?

লোকটা নীরবে খানিকটা চোখের জল মোক্ষণ করে রুমালে চোখ মোছে। একটু চুপ করে থেকে আবার দাঁত দেখায়। সোনালী দাঁতটা চিকমিক করে। সযত্নে সে একটা দামী গ্যাস লাইটার বের করে গঙ্গার বাতাস থেকে নিপুণ হাতের তেলোয় আড়াল করে আগুন জ্বালে। গৌরের সিগারেট ধরিয়ে দেয়, নিজে ধরায়। অন্ধকারে ভিতরে সরে গিয়ে গৌরের জন্য জায়গা করে দিয়ে বলে—বোসো—

বনেটটা আবার খুলে দেয় গৌর। গঙ্গার হাওয়া খেয়ে লে বাবা ল্যাণ্ডু। লাল শালুতে আবার মিটারখানা ঢাকা দেয় সে। এসে পিছনের সীটে বসে দরজাটা খোলা রেখে গঙ্গার হুড় বাতাস বিদেশের গন্ধ উড়িয়ে আনে। তছনছ করে দিয়ে যায় মানুষের মন।

লোকটা নরম গলায় বলে—দেশের মাটিতে যখন জাহাজ ভেড়ে তখন জাহাজীরা নামে লাফ দিয়ে, তারপর দৌড় লাগায়। আত্মীয় স্বজনকে আঁকড়ে ধরে, কত হাগিং কিসিং, কত আদর ভালবাসার কথা হয়—না? বুঝলে, আমারও ওরকম হত, কলকাতায় জাহাজ ভিড়লে। বাচ্চা বেলায় পালিয়ে গিয়ে জাহাজে চাকরি নিই। মা কান্নাকাটি করত, বাপ দুশ্চিন্তা করত, আমারও জাহাজে সময় কাটত না। কলকাতা-মুখো জাহাজ মুখ ফেরালে দুনিয়ার রঙ পাল্টে যেত। মা বাপ ছোট্ট ভাইটার জন্য আনতাম রাজ্যের জিনিস, কত আদর হত আমার, কলকাতায় কয়েকটা দিন উড়ে যেত ফুঁয়ে। তারপর বুড়ো হয়ে বাপ মরল, মা মরল। দুবার দুনিয়া চক্কর দিয়ে এসে দুটো সংবাদ পেয়ে মন ভেঙে গেল খুব। কলকাতার ওপর টান কমতে থাকল। ছোটো ভাইটা ছিল, তার কাছে আসতাম। কিন্তু সে ব্যাটা বড় হয়ে লেখাপড়া শিখে হল প্রফেসর, আর আমি লেখাপড়া শিখি নি—জাহাজের খালাসী। আমাকে ব্যাটা ভাল চোখে দেখত না। তাছাড়া বাপের কয়েক কাঠা জমি-বাড়ি সে ভোগদখল করছে। আমি এলে আমাকে সন্দেহের চোখে দেখত। তার বৌ বাচ্চা পর্যন্ত আমাকে পছন্দ করে না। এটা বুঝবার পরই হঠাৎ একদিন কলকাতার ওপর আমার টানটা ঝড়াৎ করে ছিঁড়ে গেল—জাহাজের টানে যেমন জেটির মোটা কাছি ছিঁড়ে যায়। তখন কলকাতা-মুখো জাহাজ চললেও মনে হত বিদেশেই যাচ্ছি, যেমন লণ্ডন বা টোকিওয় যাই। তা এই রকম যখন অবস্থা তখন একদিন চলন্ত জাহাজের ডেক-এ দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগলাম—আরে, আমার যে কোনো পিছুটান নেই! আমি যে কেবল যাই, কোথাও ফিরি না! অন্য জাহাজীরা দুনিয়ার সর্বত্র যায়, আবার দেশে ফেরে। আমার দেশ নেই বলে যে ফেরাও নেই! ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে গেল—বুঝলে! ছেলেবেলা থেকেই আমার ভাবনা-চিন্তার অভ্যাস নেই। বেশী চিন্তা করলে আমার মাথায় ঝাঁইঝাঁই শব্দ হত, ঐ শব্দের জন্যই আমার পড়াশুনো হয় নি।

গৌর চমকে জিজ্ঞেস করে—কেমন শব্দ বললে?

—ঝাঁইঝাঁই। অনেকটা বড় কত্তালের মতো।

গৌর শ্বাস ছাড়ে। বলে—আমার হত ঝম্‌ঝম্। অনেকটা নুপুরের মতো।

—আই। লোকটা বলে—তা চিন্তা-ভাবনা করতে করতে যখন মাথা ঝাঁইঝাঁই করতে শুরু করল তখন আর এক জাহাজী পরামর্শ দিল—বিয়ে কর। ঘরসংসার হলে তোমার ফেরার জায়গা হবে। তা আমি বিয়ে করলাম—সান ফ্রান্সিসকোতে। আমার বৌ বেশ সুন্দরীই ছিল—খুব আদুরে। তার আর আমার টাকা পয়সা যোগ করে আমরা তিন-চার মাসের লম্বা হানিমুন কাটালাম আমেরিকার নানা জায়গায়। সে কী ফুর্তি! কিন্তু সুখের দিন যায়। সেবার হানিমুনের শেষে অস্ট্রেলিয়া হয়ে জাপান যেতে হল—লম্বা ট্যুর। ফিরতে ফিরতে বছর গেল ঘুরে। শেষে ক মাস বৌয়ের চিঠি পাই নি। জাহাজ আমেরিকা-মুখো হতেই আমার মন আনন্দে হাততালি দিল—এতদিন বাদে আমি ফিরছি। আমার ফেরা আছে। জাহাজ ডাঙার দিকে এগোয় আর আমি উৎকণ্ঠায় সাত-আট ফুট লম্বা হয়ে তীর দেখার চেষ্টা করি। অবশেষে পৌঁছে দেখলাম বৌ জাহাজঘাটায় আসে নি। খানিক দূরে এক ছোট্ট টিলার নিচে

আমাদের বাসা ছিল, সেখানে গিয়ে দেখি, বাসায় অন্য লোক। বাড়িওলা বুড়ো অনেক কষ্টে চিনতে পেরে বলল—খুবই দুঃখের কথা, সে মেয়েটি তো আবার বিয়ে করে নিউইয়র্কে চলে গেছে। বুঝলাম, বৌ ভেগেছে। সেই দুঃখে জমি নিলাম। কিন্তু ভেবে দেখলে তার দোষ দেওয়া যায় না। মেমসাহেবরা বেশীদিন একা একা থাকতে পারে না। আমি আবার ভেসে পড়লাম, একা একা ফাঁকা ডেক-এ দাঁড়িয়ে থাকি বীয়ার খাই, দীর্ঘশ্বাস ফেলি। আমার কেবল যাওয়া আছে, ফেরা নেই। বয়স বাড়ল। বুড়ো হয়ে যাওয়ার ভয় ঢুকল মনে। সেবার অস্ট্রেলিয়ায় জাহাজ ভিড়লে আবার গাড্ডায় পড়লাম। আর একটি মেয়ে। আমাকে দুঃখী দেখে ভালবেসে ফেলল। বুঝলে, মেমসাহেবরা চট করে ভালবেসে ফেলে। আমারও বয়স বাড়ছে, মনে হাঁকুপাঁকু। তই প্রথম বিয়ের কথা গোপন করে বিয়ে করে ফেললাম আবার। আমার এ বৌ গরীব অরফ্যান। ভাবলাম, গরীবের মেয়ে হয়তো বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে। যথাসাধ্য টাকা-পয়সা খরচ করলাম তার জন্য, একটা বাসা করে দিলাম বন্দরের কাছাকাছি। মাস দুই হানিমুনে কাটালাম। তা আমার এ বৌ টিকল। কয়েকবার টুর সেরে তার কাছে ফিরেছি। ফিরে যত্ন আদর পেয়েছি। দেশে ফেরার অনেন্দ পেয়েছি। আস্তে আস্তে মন বসে যাচ্ছিল অস্ট্রেলিয়ায়, ভাবলাম, জাহাজের চাকরি ছেড়ে ওখানেই জমি জিরেত কিনে বসবাস করব। পোলট্রি, ফার্মিং করব। তা সেবার লম্বা টুরে বেরোনোর সময়ে মনে মনে ঠিক করলাম, এটাই শেষ টুর, আর জাহাজে না। হলদে জাহাজটায় বসবাস করতে করতে আমার মনে ন্যাবা ধরে যাচ্ছে। তা সেবার টুর-এ বছর দেড়েক লেগে গেল। বৌ মাঝে-মধ্যে অভাব দুঃখের কথা জনিয়ে টাকা-পয়সার জন্য লিখত। আমি গা করতাম না। মেয়েছেলেদের অভাব কে কবে মেটাতে পেরেছে বলো! দেড় দু'বছর বাদে ফিরে বাসায় ঢুকতেই মনে হল, এ বাসাটা যেন কেমন কেমন! ঠিক আগেকার মতো ঘরগেরস্থালির গন্ধ যেন পাচ্ছি না! বৌ কেমন চোর-চোখে চাইছে, হঠাৎ হঠাৎ কথার মধ্যে ঝাঁঝ দিচ্ছে! বিছানায় শুয়ে কেমন যেন অন্য পুরুষের গায়ের গন্ধ পেলাম। তারপর পাড়ায় ঘুরে এ-মুখ সে-মুখ থেকে যা খবর পেলাম তাতে আমি তাজ্জব। আমার বৌটা ভাড়াটে মেয়েমানুষ হয়ে গেছে। জাহাজীদের এন্টারটেন করে। ভীষণ রেগে যখন বৌয়ের ওপর চোটপাট করে কৈফিয়ত চাইলাম সে উল্টে ঝাড়ল আমাকে—তা কত টাকা-পয়সা আর সোনাদানা দিয়ে গেছ আমাকে? আমার পেট চলে কী করে? খুব ঝগড়া হল দুজনে—এক নাগাড়ে কয়েক ঘণ্টা। তারপর আমি বুঝতে পারলাম, ঝগড়া করে লাভ নেই। মেয়েমানুষটা সত্যিই বেশ্যা হয়ে গেছে। কোনো কোনো মেয়েমানুষের মধ্যে নষ্টামীর বীজ থাকে। বুঝলে! তারপরও তার কাছে তিন-চারদিন ছিলাম আমি। সেও রাগ-টাগ ঝেড়ে ফেলে আমাকে খুব খাতির যত্ন করল, অন্য কোনো পুরুষ সে কদিন ঘেঁষতে দিল না। কিন্তু আমি আর তাকে ঘরে তোলার চেষ্টা করলাম না। বাঁধা মেয়েমানুষের সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করে লোকে, সেরকমই ট্রিট করলাম তাকে। সে আপত্তি করল না। তারপর তাকে চিরদিনের মতো ছেড়ে দিয়ে ভেসে পড়লাম আবার। কিন্তু মুশকিল হল দুই বৌয়ের জন্য দুরকম দুঃখ মাঝে মাঝে বুকের দুধারে খামচে ধরে, মাথায় ঝাঁইঝাঁই শব্দ হতে থাকে। আর কেবলই মনে হয়, আমিই এক মাত্র জাহাজী—যার ফেরা নেই. কেবলমাত্র

যাওয়া আছে। জাহাজ ভোঁ দিলে আমার বুড়ো হয়ে যাওয়ার কথা মনে পড়ে, মরে যাওয়ার কথা মনে হয়। অবসর সময়ে মদ খেয়ে ঝুম হয়ে থাকি, আর তখন জাহাজের আনাচে-কানাচে ভূত দেখি। এরকম যখন মনের অবস্থা তখন একদিন কলকাতায় জাহাজ ভিড়ল। আমি পাগলের মতো 'মা' বলে ডাক দিয়ে জাহাজ থেকে লাফ দিয়ে নামলাম, দৌড় দিলাম গ্যাংওয়ে ধরে। ডাঙায় পা দিয়েই খেয়াল হল, মা তো নেই। অমনি আড়ষ্ট হয়ে গেল শরীর। কার কাছে যাবো? আবার ধীরে ধীরে গ্যাংওয়ে ধরে ফিরলাম জাহাজে। শূন্য জাহাজ, সব জাহাজী গেছে ফুর্তি লুটতে। আমি একা একা ভুতুড়ে জাহাজটার আনাচে কানাচে গিয়ে দাঁড়াই আর কাঁদি। কাঁদি মরা মা-বাপের জন্য, দুই বৌ আর না-হওয়া বাচ্চা-কাচ্চার জন্য, কাঁদি দেশের জন্য, কলকাতার জন্য। এইরকম অবস্থায় কয়েকদিন পর আর এক অভিজ্ঞ জাহাজী আমাকে ধরে নিয়ে গেল ওয়েসিস্ বার-এ। সু-র সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। মেয়েটা বাঙলা বলত, ইংরিজিও বলত। শাড়ি পরত, চেহারাটা ছিল সাদামাটা বাঙালী মেয়ের মতো। ভারী ভাল লেগে গেল তাকে, চোখ জুড়িয়ে গেল। বার থেকে সে আমাকে নিয়ে গেল তার ঘরে। ঘরে যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ মূর্তি ছিল, কালীর পটও ছিল। বিছানা পরিষ্কার, মাটির কুঁজোয় জল, হাতপাখা, সবই ছিল তার। ভারী আমুদে মেয়ে, বলল—তুমি এখানেই থাকো। থাকলাম। এক রাত্রে খুব জ্যোৎস্না ফুটল আকাশে। রাত তখন অনেক। ফট্‌ফটে জ্যোৎস্নায় আমাকে সু বের করে আনল। ট্যাক্সি করে এসে নামলাম ভিক্টোরিয়ার ধার ঘেঁষে। চারিদিক সুনসান, নির্জন। চুপি চুপি দেয়াল পার হয়ে বাগানে ঢুকলাম দুজনে। ঢুকেই দেখি পৃথিবী ছেড়ে আমরা এক গভীর মায়ার রাজ্যে চলে এসেছি। চারিদিকে মায়াবী ফুল, শিশিরের জল, জ্যোৎস্নার মোম, নরম জলের শব্দ, মাটির সুগন্ধ—ও রকম সুন্দর দৃশ্য জীবনে দেখি নি। সামান্য মদ ছিল দুজনেরই পেটে; ঝুমঝুমে মাতাল ছিলাম দুজনেই। আমরা আনন্দে ঘাসে গড়াগড়ি দিতে লাগলাম। হঠাৎ সু লাফিয়ে উঠে বলল—দেখ দেখ, কীরকম বৃষ্টির মতো জ্যোৎস্না পড়ছে! আঁজলা ভরে তুলে নাও। বলে দু'হাত ভরে জ্যোৎস্না খেতে লাগল। মাঝে মাঝে আমার দিকে মুখ তুলে বলে—ইস্ দেখ্ কীরকম হাত উপচে গড়িয়ে পড়ছে—আঠার মতো ঘন···কী মিষ্টি···কী স্বাদ···! দেখতে দেখতে আমি ঠিক তার মতো আঁজলা পেতে দিলাম শূন্য আকাশের তলায়। কী আশ্চর্য, অমনি টলটলে ঘন জ্যোৎস্নায় ভরে গেল আঁজলা, উপচে গড়িয়ে পড়তে লাগল। চুমুক দিয়ে দেখি—কী স্বাদ—কী গন্ধ! যত খাই, পিপাসা বেড়ে যায়, ক্ষুধা বাড়ে, শরীর তেজী ঘোড়ার মতো ফুঁসে ফুঁসে ওঠে। সেই জ্যোৎস্না দেখি, গড়িয়ে যাচ্ছে ঘাসের ওপর, মিশছে জলে, গাছ বেয়ে পড়ছে টুপটাপ। আমরা আঁজলা ভরে খেলাম, ঘাস থেকে চেটে নিলাম, জলে মুখ ডুবিয়ে খেলাম। জ্যোৎস্নায় স্নান করলাম দুজনে। যতক্ষণ জ্যোৎস্না ছিল ততক্ষণ এক মুহূর্ত আমরা জ্যোৎস্না খাওয়া ছাড়ি নি। সে এক অতি আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। তিন-চারদিন ছিলাম সুর কাছে। সারা দিনটা রাত্রির অপেক্ষায় কাটত। সন্ধেবেলা দুজনে হাল্কা মদ খেয়ে নেশা করে নিতাম। চোখে চোখে আমাদের গোপন বোঝাপড়া হত। রাত গভীর হলেই বেরোতাম জ্যোৎস্নায়। পার হতাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের নিচু দেওয়াল। শুরু হত জ্যোৎস্না খাওয়া—

boiRboi.net

আহা—

জাহাজীটা চুপ করে অতীতের কথা ভাবে একটু। লম্বা রথম্যান সিগারেট গৌরের আঙুলে ছ্যাঁকা দিচ্ছে ছোটো হয়ে। জাহাজীটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উদ্‌ভ্রান্তের মতো গৌরের দিকে চায়, বলে—এসব আড়াই তিন বছর আগেকার কথা, সেই শেষবার কলকাতায় এসেছিলাম। তারপর কত জায়গায় গেছি, কতবার জ্যোৎস্না রাতে মাতাল হয়ে জ্যোৎস্না খাওয়ার চেষ্টা করেছি কত মেয়ের সঙ্গে। কিন্তু খেতে গিয়ে দেখেছি আঁজলায় কিছু নেই। ফাঁকা। বুঝেছি, স্যু ছাড়া আর কেউ পারে না জ্যোৎস্না খাওয়াতে। সারা পৃথিবীতে একমাত্র স্যু পারে। খুব ভাগ্যবান কেউ কেউ স্যুর দেখা পায়। তারা জ্যোৎস্নার স্বাদ জেনে যায়। আর কেউ জানে না।

জাহাজীটা রথম্যানের প্যাকেটটা গৌরের ডান হাতে গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করে। বলে—বার ওয়েসিস্—স্যু—তাড়াতাড়ি পৌঁছে দাও—

গৌর একটু সময় নেয়। ব্যাপারটা তার এখনো হজম হয় নি।

জাহাজীটা মিনতি করে—দশটার পর স্যু থাকবে না, বার বন্ধ হয়ে যাবে, মেট। মেয়েমানুষের সঙ্গে পুরুষের যে ব্যাপার স্যুর সঙ্গে আমার তা নয়। আমি আর একবার সেই জ্যোৎস্না খাবো। তেষ্টায় বুক জ্বলে যাচ্ছে। গত তিনবছর ধরে আমি কলকাতায় আসার অপেক্ষায় ছিলাম। আজই জাহাজ ভিড়েছে। দুপুরে গড়িয়ে নামার পারমিশান পেয়েছি। অন্য জাহাজীরা পাছে স্যুর কথা জেনে যায় সেই ভয়ে আমি নেমেছি সবার পরে—এমনই কপাল—সব জাহাজী গাড়ি পেল—বাদে আমি। দু'ঘন্টা ধরে একটা ট্যাক্সি থামানোর চেষ্টা করেছি, একটাও থামে নি। সবশেষে তোমার ফাঁকা ট্যাক্সিটা দেখে উঠে বসে আছি—আমাকে ফেলে যেও না—সেই জ্যোৎস্না স্যু ছাড়া আর কেউ খাওয়াতে পারে না মেট। সে পৃথিবীর জিনিস না। সেই মায়াবী বাগান—জ্যোৎস্না—সেইসব ফুল—স্বপ্নের মতো মনে পড়ে—কী নেশা তার—বয়স কমে যায়—চোখের জ্যোতি বাড়ে—শরীর ফুঁসে ওঠে—আর একবার সেই জ্যোৎস্না খেতে পারলে আমি আর কোথাও যাবো না—মেট, তাড়াতাড়ি করো, স্যুকে যদি অন্য কেউ নিয়ে নেয়—

—ঠিক হয় তবে। গৌর বিড়বিড় করে তার মিটারের ঢাকা খোলে, বন্ধ করে গেট। বিড়বিড় করে বলে—দুনিয়ার যত মাতাল আর পাগল গৌরার গাড়ির জন্য রাস্তায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।—চল্ বাবা ল্যাণ্ডু, জাহাজীটাকে খালাস দিই—

গৌর গাড়ি ছাড়ে। পিছনের সীটে ঝিম্ মেরে থাকে জাহাজীটা। আয় বাবা ধরমতলা—বার ওয়েসিস,—জাহাজীটাকে ডেলিভারী দিই। গৌর বিড়বিড় করে। জ্যোৎস্না খাবে—মাইরি—জ্যোৎস্না খাবে! আই! গৌরের ব্যাপারটা হজম হয় না। সে আয়নায় দেখে, জাহাজীটা গম্ভীর স্থিরভাবে ঝিম্ মেরে আছে। আলোকিত এসপ্ল্যানেড গৌরের দিকে ছুটে আসতে থাকে।

বার ওয়েসিসের সামনে গাড়ি দাঁড় করায় গৌর। জ্যোৎস্না খাবে! মাইরি! গৌরের ধন্দ লেগে আছে এখনো। জাহাজীটা দরজা খোলার জন্য খুটখাট করে পারে না। গৌর হাত বাড়িয়ে খুলে দেয়। জাহাজীটা নামে, একটা দশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিয়ে বলে—কীপ ইট মেট। বলে হাত তুলে বিদায় জানায়। একটু

টলমলে পায়ে উজ্জ্বল শুঁড়িখানার দিকে চলে যেতে থাকে।

গৌর চেঁচিয়ে ডাকে—এই, চেঞ্জটা নিয়ে যাও—

জাহাজীটা শুনতেই পায় না।

ভারী অপমান লাগে গৌরের। বখশিশ-টখশিশ সে কখনো নেয় না, দরকার মতো মিটারের বেশী পয়সা নেয় নিজের ইচ্ছেমতো। টিকাটুলির বগলাপতির ব্যাটাকে কে দয়া করবে? কোন মালদার? বাপ বগলা তাকে স্বাধীন করে দিয়ে যাওয়ার পর থেকে সে কার দয়া ভিক্ষা করেছে।

গৌর মিটার দেখল। দেড় টাকা। ফেরত পয়সা গুণেগেঁথে হাতে নিল সে। ফুটো পয়সার জাহাজীটার দয়া গৌর রিটার্ন দেবে।

সাবধানে গাড়িটা লক করে গৌর নামে। লাল কাপড়ে মিটার ঢাকে, তারপর ধীরে সুস্থে ফুটপাথ পার হয়ে কাচের দরজা ঠেলে শুঁড়িখানাটায় ঢুকে পড়ে।

ভিতরে—শুঁড়িখানায় যেমন হয়—তেমনি নরম আলো-টালো, চেয়ার টেবিল, কয়েকজন গম্ভীর মাতাল। লম্বা কাউণ্টারের ওপাশে কাচের ঝিলিক, নানা রঙের বোতল চিকমিক করে। সেই কাউণ্টারে কনুইয়ের ভর রেখে তিন-চারজন মেয়েছেলে।

গৌর দরজার কাছে তার শুখো পায়ের ওপর তেরছা হয়ে দাঁড়ায়। চারদিক দেখে। জাহাজীটাকে নিম্‌-আলোয় ঠিক ঠাহর করতে পারে না। আরো দু-এক পা এগোয় গৌর। দু-একজন মুখ তুলে তার নেংচে-হাঁটা দেখে, একটা মেয়ে নিঃশব্দে হাসে, একজন বেয়ারা মাঝপথে থেমে তাকায়।

গৌর দেখতে পায় ছায়ার মতো জাহাজীটা সারা শুঁড়িখানা চক্কর দিয়ে দরজার দিকে আসছে।

গৌর হাত তুলে ডাকে—এই—

জাহাজীটা তার দিকে তাকায়, বিড়বিড় করে। এগিয়ে এসে গৌরের দু কাঁধ দু হাতে ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলে—নেই। এখানে নেই। আচ্ছা দাঁড়াও—বলে গৌরের হাত ধরে টানতে টানতে কাউণ্টারের দিকে এগোতে থাকে।

—কী হচ্ছে! ছেড়ে দাও—

জাহাজীটা কেবল চাপা গলায় বলে—কম্‌ অন্‌। স্যুকে এইখানে না পেলে অন্য জায়গায় খুঁজতে হবে। কম্‌ অন্‌।

কাউণ্টারের স্যুট-পরা লোকটা মুখ তোলে। জাহাজীটা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে চোস্ত জাহাজী ইংরিজিতে বলে—স্যু—শ্যামলা পাতলা চেহারা মিষ্টি মুখ—চোখের পাতা ভারী ভারী—খুব ফুর্তিবাজ—তিনবছর আগে এইখানে তাকে দেখেছিলাম—খোঁজ দিতে পারো?

লোকটা চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ে—না। ও নামে কাউকে চিনি না। তিন বছর লম্বা সময়—কত কী হয়ে যায়!

বলে লোকটা হাসে।

কাউণ্টারে দাঁড়ানো মেয়েদের সবচেয়ে কাছের জন জাহাজীটার পিঠ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। সে মুখ ঘুরিয়ে চাপা গলায় বাংলায় বলল—আমরা সবাই স্যু, কেউ কু নই গো!

বলে হেসে অন্য একটি মেয়ের কাঁধে শরীর ছেড়ে দিল।

জাহাজীটা গম্ভীর মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখে, তারপর হতাশ গলায় বলে —না, তোমরা নও। সন্ন্য অনেক জাদু জানত। সে আমাকে জ্যোৎস্না খাইয়েছিল।

—শোন লতিকা—বলে সেই মেয়েটি আবার আগের মেয়েটির কাঁধে হেসে গড়াল। দুজনেই হাসতে থাকে। গৌরের কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে। বগলুর পোলা গৌরা!—এ কোন্ গাড্ডায় এসে পড়েছে! জাহাজীটা ধরে আছে তার শুখো বাঁ-হাতখানা। কমজোরী হাতটা তার—ঝট্‌কা মেরে ছাড়িয়ে নেওয়ার উপায় নেই. চেঁচামেচিও করা যাচ্ছে না।

জাহাজীটা ঠোঁট চেটে বলে—বড় তেষ্টা। চলো একটু বীয়ার খাই।

গৌর মাথা নাড়ে—আমি না। চেঞ্জটা ফেরত নিয়ে আমাকে ছেড়ে দাও—

সে সব কথায় কানই দেয় না জাহাজী। বলে—তেমন কিছু না। একটু বীয়ার —এসো—

তার শুখো হাতখানা ধরে টেনে নেয় জাহাজী, এক টেবিলে পাশাপাশি বসে হাতখানা ধরে রাখে। ফিস্‌ফিস্ করে বলে—তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না মেট। কলকাতায় এক সন্ন্য ছাড়া তোমাকেই আমি চিনি। তুমি ভাল লোক—

দুটো বাহারী কাচের জগ-এ বীয়ার আসে। আসে সেঁকা পাঁপর, শসা আর পেঁয়াজের চাক। গৌর কিছু বুঝবার আগেই এসব ঘটে যায়। তখনো তার ডানহাতের মুঠোয় ফেরত পয়সা. বাঁ হাতখানা জাহাজীর কবজায়। ধন্দ ভাবটা গৌরের এখনো কাটে নি। মাথাটা ঝিম্‌ঝিম করে। সে একটু ভাববার চেষ্টা করে, এসব কী হচ্ছে। চোখ বন্ধ করে পুরো ব্যাপারটা ভাববার চেষ্টা করতে যাচ্ছিল গৌর. অমনি তার মাথার মধ্যে একখানা মল-পরা পা ঝম্ করে তাকে সতর্ক করে দিল। অমনি চোখ খোলে গৌর। মাথা নেড়ে ভাবনা-চিন্তা তাড়াবার চেষ্টা করে।

মদ সে কখনো খায় নি, এমন নয়। খেয়েছে শখে শখে, নেশা করে নি। কিন্তু নেশা করলেই বা কী? এ দুনিয়ায় গৌরের আর ক্ষতির ভয় কী? যদি সে নিজে টিঁকে থাকে, আর থাকে তার ল্যান্ডমাস্টারখানা—তো এই জীবনটা পিছলে বেরিয়ে যাবে গৌর।

বুক জুড়ে তেষ্টা ছিল। হাতটা ছাড়ানো গেল না। মাথার মধ্যে মল-পরা পা আর একবার ঝম্ করার জন্য ধীরে ধীরে উঠছে, টের পেল গৌর। এখনই নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া দরকার। সে ঠান্ডা জগটা ঠোঁটে তোলে। তারপর আকণ্ঠ ডুব দেয় একটা। জাহাজীটা এক চুমুকে সবটা টেনে নেয়। তারপর মুখ তুলে বলে—বড্ড তেষ্টা। বেয়ারা—

বেয়ারা বিনীতভাবে টেবিলে ছায়া ফেলে দাঁড়ায়।

—আরো।

বেয়ারা জগ ভরে দিয়ে যায়।

মেয়েছেলেগুলো ঘুরঘুর করে চারপাশে। একটুক্ষণ। তারপরই ঝুপ করে মুখোমুখী চেয়ারে বসে পড়ে দুজন। কাউন্টারে দাঁড়ানো সেই দুজনই।

—একটু খাওয়াও না গো! বড্ড তেষ্টা পেয়েছে! যে মেয়েটা হেসেছিল সে

boiRboi.net

বলে। তার চোখেমুখে সত্যিকারের তেষ্টা ফুটে আছে। কাছ থেকে এখন তার ভাঙা মুখ, মুখে ঘামে-ভাসা পাউডার, চোখের গাঢ় কাজল দেখা গেল। সিঁথির কাছে চুল পাতলা হয়ে প্রায় টাক দেখা যাচ্ছে।

তার সঙ্গিনী সেই লতিকা। একটু মোটাসোটা, কালো, পুরু ঠোঁট, বেশী বয়স। মুখখানা গোল, কপাল বেরিয়ে এসেছে ঝুল বারান্দার মতো। সে হাত বাড়িয়ে গৌরের জগটা ধরবার জন্য উদ্যত হয়েও ঠিক সাহস পায় না, হাতটা টেবিলের ওপর ঐভাবেই ফেলে রেখে বলে—নতুন পেগ না নাও, তোমাদের গেলাস থেকেই ঢেলে দাও একটু করে।

বলে সে টেবিলে উপুড় করে রাখা পাতলা গ্লাস উল্টে বাড়িয়ে ধরে—দাও।

এইসব মেয়েছেলেদের বিস্তর দেখেছে গৌর। প্রায় একই রকম শ্রীহীন চেহারা—কেউ একটু রোগা, কেউ মোটা। মুখে প্রচুর পাউডার, লিপস্টিক, চোখে কাজল, পরনে ঝলমলে শাড়ি। তার ল্যান্ডমাস্টারে মাঝে মাঝে এরকম মেয়েরা খদ্দেরের পয়সায় ফূর্তি লোটে। টের পেলে তোলে না গৌর, ভুল করে তুললে আয়নায় বিস্তর নির্বিবন্ধ দৃশ্য দেখা যায়।

স্বাভাবিক অবস্থায় হলে গৌর তাড়া দিত, কিন্তু বীয়ারের ঝাঁজটা তার পেট থেকে মগজে রিন্‌রিন্ করে ছড়িয়ে পড়ছে। যেমন ওজন নেওয়ার যন্ত্রে পয়সা ফেললে রিনরিন শব্দটা বহুদূর গভীরে গড়িয়ে যায়। গৌর তাই রাগ করে না। কেবল অবাক হয়ে বলে—এঁটো খাবে?

—এঁটো আবার কী গো! প্রথম মেয়েটা বড় চোখে চেয়ে হঠাৎ হেসে গড়িয়ে পড়ে। বলে—মুখের এঁটোকে এঁটো ধরলে আমরা তো পচে গেছি।

—আমাদের সবকিছু এঁটো—

বড় অশ্লীল কথা। অঙ্গভঙ্গীও ভাল না। গৌরের বড় ঘেন্না করে। সে অর্ধেক জগ মোটা মেয়েটার গ্লাসে ঢেলে দেয়, বাকী অর্ধেক টেনে নেয় নিজে। তারপর শ্বাস ছেড়ে মেয়ে দুটোকে বলে—এবার ফোটো। যথেষ্ট হয়েছে।

জাহাজীটা জগ-এ লম্বা ডুব মেরে মুখ তোলে। মেয়ে দুটোর দিকে তাকিয়ে মাতাল হাসি হাসে, বলে—আরো খাবে? খাও। বেয়ারা—

মেয়েদুটো আনন্দে, সুখে ভেসে যায়। বেয়ারা বিনীতভাবে দুটো জগ ভরে দিয়ে যায়।

—এবার বলো। জাহাজীটা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে।

—কী? মেয়েরা ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করে।

—সুর কথা।

মেয়েদুটো রুমালে মুখ চেপে হাসে।

—কেমন ছিল তোমার সু? রোগা জন জিজ্ঞেস করে।

—লম্বা। সোনালী চুল। নীল চোখ। খুব ফর্সা।

যদিও মাথাটা একটু গুলিয়ে যাচ্ছে তবু গৌর বোঝে জাহাজীটা ঠিক কথা বলছে না। সে মুখ ফিরিয়ে বলে—এই, তুমি যে একটু আগে বললে শ্যামলা রঙ, চোখের পাতা ভারী ভারী—

boiboi.net

লম্বা রথম্যান ধরিয়ে জাহাজীটা ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। ভাববার চেষ্টা করে বলে—বলেছি ?

—নিশ্চয়ই। গৌর ডান হাতে টেবিলে চাপড় মারে।

জাহাজীটা শ্বাস ছেড়ে বলে—তবে তাই।

মাতাল। গৌর হাসে।

জাহাজীটা প্রশ্ন করে—চেনো ?

মোটা মেয়েটা মাথা নাড়ে—না।

—সে আমাকে জ্যোৎস্না খাইয়েছিল।

রোগা মেয়েটা তার লম্বা দাঁতগুলো বের করে গরগরে হাসি হাসে—জ্যোৎস্না আমরাও খাওয়াতে পারি। চাঁদের আলো, ফুলের গন্ধ—কত কী খাওয়াই আমরা—

জাহাজীটা স্থিরভাবে মেয়েটিকে লক্ষ্য করে, তারপর গম্ভীর গলায় বলে—পৃথিবীর সাতঘাটের মেয়েমানুষ আমাকে ঐ কথা বলেছে। কেউ পারে নি। তিনবছর ধরে আমার বুক তেষ্টায় কাঠ হয়ে আছে।

গৌরকে একটা কনুইয়ের ঠেলা দিয়ে উঠে দাঁড়াল জাহাজী।

—চলো মেট—সময় নেই—

তারপর মেয়ে দুটোর দিকে চেয়ে বলল—তোমরা খাও। সবাইকে দিয়ে সব কাজ হয় না—তার জন্যে দুঃখ কোরো না। সময় বড় মূল্যবান, নইলে আমি তোমাদের সঙ্গে আর একটু সময় কাটাতাম।

জাহাজীটা বিল মেটায়। গৌরের হাত ধরে বেরিয়ে আসে।

গৌর চারদিকে একটা রিম্‌ঝিম্ আনন্দকে টের পাচ্ছিল। ঠিক নেশা নয়। কিন্তু রাস্তা দোকান সিনেমা হল-এর আলোগুলো আরো রঙীন, মানুষেরা ভারী আনন্দিত। চরাচর জুড়ে ফুর্তির বাতাস বয়ে যাচ্ছে। জাহাজীটাকে মনে হচ্ছে বহুকালের পুরোনো বন্ধু—মাঝখানে কেবল একশ বছর দেখা হয় নি।

দুজন সৈন্যের মতো পায়ে পা মিলিয়ে তারা পাশাপাশি হেঁটে ল্যাণ্ডমাস্টারের কাছে আসে।

—এবার কোথায় ?

জাহাজীটা চিন্তিত মুখে মাথা নাড়ে—সু যেখানে। খুঁজে বের করতে হবে—কাছাকাছি কোনো বার-এ সে আছে—

গৌরের এখনো যাকে নেশা বলে তা হয় নি ঠিক। গাড়িটা সে দিব্যি চালায়। জাহাজী তার বাঁ পাশে, মাঝখানে সীটের ওপর রথম্যানের প্যাকেটটা পড়ে আছে—সবই বুঝতে পারছে গৌর। না, নেশা হয় নি। গাড়িটা মাখনের মতো যাচ্ছে।

—ব্যস্ মেট—একবার এ জায়গাটা—

জাহাজী হাত বাড়িয়ে গৌরের হাত চেপে ধরে।

গৌর গাড়ি থামায়। বাঁ পাশে আর একটা বার। খুব বড় নয়, কিন্তু জায়গাটার বেশ ফুর্তিবাজ চেহারা। আলোয় আলোময়। দুঃখ কষ্টের কথা ভুল পড়ে যায় মানুষের।

জাহাজী হাত ছাড়ে না।

boiRboi.net

—নামো।

গৌর হাই তুলে বলে—আমি বরং বসে থাকি, তুমি খুঁজে এসো—

—না—আমি একা খুঁজে পাবো না—শহরটা বড় অচেনা লাগছে—নামো মেট—

গৌর নামে।

জায়গাটা ফুর্তিবাজ ঠিকই। ঢুকতেই আচমকা একটা মোলায়েম শীতভাব জড়িয়ে ধরে। গিজগিজ করছে লোকজন, কাউন্টারে বেয়ারাদের ভিড়। একধারে কাঠের পাটাতনে মাইক্রোফোনের মাউথপীস মুখের কাছে ধরে দরাজ গলায় গান গাইছে কালো চেহারার একটা লোক, বোঙ্গো বাজছে দমাদম্। লোকটা দুলে দুলে ঘুরে ঘুরে গায় হিন্দি বিষাদ সংগীত। তবু ফুর্তির জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর সুদিন এসে গেছে এইখানে। গান গাইছে টাবু। টাবু সিংগস্! আঙুরের রস তার গলা ছুঁয়ে ফোঁটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে মনের গেলাসে।

সিনেমার মতোই কাচ লাগানো একটা কাউন্টারের ওপাশে সাহেবী চেহারার দুজন লোক ভারী ব্যস্ত। টাকা-পয়সা গুণে নিচ্ছে। জাহাজীটা কাচের ওপর টোকা দিতে দুজন মুখ তোলে।

—সন্ন্যাসী নামে একটি মেয়ে—গায়ের রঙ শ্যামলা—বাদামী চুল—নীল চোখ—

মাতাল। গৌর হাসে। বলে—অ্যাই—গায়ের রঙ শ্যামলা হলে চোখ নীল হয় কী করে? অ্যাঁ!

—হয় না? ভারী অবাক হয় জাহাজী। বলে—তবে কী রকম চোখ ছিল তার?

গৌর একটু ভাববার চেষ্টা করে। মাথা ঝিমঝিম্ করে তার। তবু বুদ্ধি খাটিয়ে সে বলে—কালো।

—তো তাই।

জাহাজীটা আবার লোক দুটোর দিকে ঝুঁকে বলে—তার চোখ আর চুল কালো—খবর দিতে পারো?

লোক দুটো গম্ভীর বিনীত মুখে শোনে। একজন নরম গলায় বলে—দুঃখিত। আমাদের এখানে নেই।

—আমরা একটু ঘুরে দেখি জায়গাটা?

—অফ কোর্স। বেয়ারা নিয়ে যাবে তোমাদের।

আধবুড়ো ভদ্র এক বেয়ারা তাদের নিয়ে যায়। টাবুর গান থেকে দূরে ছায়াচ্ছন্ন কোণের টেবিলে বসিয়ে দিয়ে বলে—ড্রিংক্স্?

—হুইস্কি। বলে ক্লান্তিতে টেবিলে মাথা রাখে জাহাজী।

—এই—ডাক দেয় গৌর।

অনেকক্ষণ বাদে মাথা তোলে জাহাজী। চোখ রক্তজবা। গলায় টাবুর বিষাদ সংগীতের বিষাদ এসে বাসা নিয়েছে। বলে—এখানে সন্ন্যাসী নেই। এসব তার জায়গা নয়। আরো নিরিবিলি জায়গায় তার থাকার কথা।

বোঙ্গোর শব্দ মৃদু গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ছে। টাবু তার বিষাদ-সংগীতের করুণতম অংশে এসে গেছে। ঘুমপাড়ানীর মতো মৃদু, অশ্রুরুদ্ধ তার গলা। যেন বা এই রাত আর ভোর হবে না। মহাপ্লাবনে ভেসে যাবে পৃথিবী। টাবুর অনন্ত বিষাদ

boiRboi.net

বুকে নিয়ে সরে যাবে মানুষ। লোকে তাই শেষ আনন্দটুকু গেলাস থেকে তুলে নিক।

গৌর নিল। জাহাজীও।

—আমি জানি স্যু এখানে নেই। এখানে থাকলে তার গায়ের গন্ধ পেতাম। জাহাজীটা ফিসফিসিয়ে বলে।

গৌরেরও তাই মনে হয়। তার চোখে কোনো মেয়েছেলে পড়ে না। তবু সে একবার চারদিক চেয়ে দেখে। না, নেই।

হঠাৎ উদ্দাম হয়ে ওঠে বোঙ্গোর শব্দ। দুলে ওঠে টাবু। আশা নিরাশায় দোলে মানুষের মন।

—চলো মেট—

গেলাস শেষ করে গৌরও ওঠে। একটু দোলে তার শরীর। মাথা ফাঁকা লাগে। তবু বলে—চলো—

—কোথাও না কোথাও আছেই। জাহাজী আত্মবিশ্বাসে বলে।

গৌর তা বিশ্বাস করে। কলকাতার জ্ঞান তার নখে নখে। কোথায় যাবে জাহাজীর মেয়েছেলে স্যু? গৌর ঠিক বের করবে।

যদিও একটু দুলছে কলকাতার রাস্তাঘাট, তবু গৌর—বগলুর ছাওয়াল—যার হাতে গাড়ি কোনোদিন ঘষাটাও খায় নি—ঠিক গাড়িটা বের করে আনল চৌরঙ্গীর বড় রাস্তায়।

—ঐ যে দেখছ উঁচু মিনার—ঐ যে—

এই বলে জাহাজী গৌরকে কনুয়ে ঠেলা দিয়ে অদূরের মনুমেণ্টটা দেখায়। গৌর দেখে।

জাহাজী গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বলে—ঐ মিনারটা আমি আমার মায়ের চিতার ওপর তুলেছিলাম। ভাল হয় নি?

মনুমেণ্টটাকে আবার ভাল করে দেখে গৌর। দেখে-টেখে মাথা নেড়ে বলে—ভাল। দিব্যি উঁচু।

—আঃ। জাহাজী শ্বাস ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়।

পার্ক স্ট্রীটকে কখনো কলকাতা বলে মনে হয় না গৌরের। বীয়ারের মাথায় হুইস্কি বসে আছে পেটে। এখন তাই আরো মনে হয় না। স্পষ্টই যেন লণ্ঠনের এক রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করায় গৌর।

জাহাজী বলে—লণ্ডন হুবহু এরকম।

গৌর হাসে।

সামনেই একটা বিশাল রেস্তরাঁর চওড়া মুখ, সে মুখে হাসি।

গেট-এর কাছে দু'জন সাহেবী পোশাক পরে দাঁড়ানো। তারা সিঁড়িতে পা দিতেই দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল আপনা থেকেই। ভারী অবাক হয় গৌর। এরকম জাদুই দরজা সে আর দেখে নি। দরজাটা পরখ করার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছিল সে. জাহাজীটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে তাকে ভিতরে নিয়ে গেল।

—কম অন্—সময় নেই—এখনো আকাশে জ্যোৎস্না রয়েছে, দেখছ না—

boiboi.net

গৌর আকাশ দেখার জন্য মুখ তুলল। তুলে দেখল—সুন্দর সিলিং—তাতে নরম রঙের ওপর মানুষের কত কারুকাজ—কাচে ঢাকা আলো। জ্যোৎস্নার মতোই। কিংবা ঠিক জ্যোৎস্নার মতো নয়! কিন্তু সুন্দর।

তারা কার্পেটের ওপর দিয়ে হাঁটে। কী নরম। এরকম কার্পেটের ওপর হাঁটলে গৌরের শুখো পায়ে কোনো ব্যথা লাগে না। কার্পেটটা একবার ছুঁয়ে দেখার জন্য হাঁটু গেড়ে বসতে যাচ্ছিল গৌর। জাহাজী তাকে টেনে তুলল।

—সময় নেই মেট—

—ওঃ হ্যাঁ। ঠিক গৌর বুঝতে পারে।

এমন সুন্দর জায়গা তবু কেউ কোথাও তাদের পথ আটকায় না। বলে না ভিতরে যাওয়া বারণ। কেন বলে না? অ্যাঁ! গৌর বুঝতে পারে না। তার দাদা রাখোহরি যখন এসব জায়গায় আসত—গৌরিই পুরোনো ডজ গাড়িটায় নিয়ে আসত তাকে। স্যুট আর-বো পরা বিলেত ফেরত সুন্দর চেহারার রাখোহরি অনায়াসে ঢুকে যেত সব জায়গায়। পালকের ঝাড়নে ডজ গাড়িটার গা মুছতে মুছতে ভয়ের চোখে চেয়ে দেখত গৌর। তার ধারণা ছিল, হাফ-ফিনিশ গৌরার এসব জায়গায় অ্যাডমিশন নেই। সেই ধারণা নিয়েই সে এত বড়টা হল। অথচ আশ্চর্য! আশ্চর্য! সব দরজা খুলে যাচ্ছে আপনা থেকে—একটু নেংচে হাফ-ফিনিশ গৌরা—বগলুর ছাওয়াল—অর্থাৎ কিনা বগলাপতির তিন নম্বর—আজ যে সব জায়গায় চলে যেতে পারছে! কী হচ্ছে এসব! অ্যাঁ! এরকম আর দেখে নি গৌর। প্রজাপতি, রামধনু, সুন্দরীর চোখ এইসব জিনিস দিয়ে যেন তৈরি হয়েছে এই দোকান। এখানে দেয়াল নেই, কড়িকাঠ নেই, দরজা জানালা নেই—কেবল আলো আর রঙ, গন্ধ আর সুন্দর শব্দ—একটু স্বপ্ন আর কল্পনার মিশেল। পৃথিবীরই তবু ঠিক পৃথিবীতে নয়। একটু উঁচুতে—যেন বা বাতাসে ভর করে আছে জায়গাটা! বাতাসে ভর করে আছে? সত্যি? পরীক্ষা করে দেখার জন্য কয়েকটা লাফ দিল গৌর। দেখল দোলে কিনা! হ্যাঁ, দোলে। একটু একটু।

জাহাজী তাকে টেনে বসায়, গভীর পালকের মধ্যে ডুবে যেতে থাকে গৌর। টেবিলে কনুইয়ের ভর রেখে ডুবে যাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচায়।

কে যেন মুখের কাছে ভরা গেলাস রাখে। গৌর ঠোঁটে তোলে গেলাস। আনন্দে চোখের জল নেমে আসে।

একটা ভিতর প্রকোষ্ঠের দরজা নিঃশব্দে খোলে—উদ্দণ্ড ড্রামের শব্দ, সাপুড়ের বাঁশির শব্দ শোনা যায়—আবার দরজা বন্ধ হয়। শব্দটা ক্ষীণ হৃৎপিণ্ডের শব্দের মতো ঢিপঢিপ করে বাজে।

জাহাজীটা হঠাৎ চমকে উঠে দাঁড়ায়।

—চলো মেট—শীগগীর—

—কোথায়?

—ঐখানে—ভিতরে কোথাও নাচ হচ্ছে—একটা মেয়ে—সুন্য হতে পারে—

গৌর ওঠে।

সত্যিই একটা রঙীন দরজা রয়েছে। সামনে সতর্ক পাহারা। তারা দরজার সামনে দাঁড়াতেই একটা হাত এগিয়ে আসে।

boiRboi.net

—টিকিট ?

জাহাজী হিপ পকেট থেকে টাকার গোছাটা টেনে বের করে। অফুরন্ত টাকা। দরজা খুলে যায়।

লোলা নাচছে স্পটলাইটে। আলো থেকে অন্ধকারে চলে যায় লোলা। আলোটা ঘুরে ঘুরে তাকে খুঁজে বের করে। লোলার বাদামী শরীরের চামড়া যেন তেলমাখা। চামড়ার তলায় তার খেয়ালী নরম মাংসের ঢেউ। কোমরে জাফরান রঙের পুঁতির ছোট্ট ঘাগরা, বুকে জাফরানী পুঁতির কাঁচুলি, মাথার চারদিকে ঘিরে আছে এক সবুজ সাপ, চুলের চূড়ার ওপর তার ফণা। আলো থেকে অন্ধকারে—আবার আলোয়— মায়াবী যাতায়াত করে লোলা। পৃথিবীর পুরুষকে ডাকে দেয় তার পায়ের তলায়। নরমুণ্ড লুটিয়ে পড়ে পায়ে। লোলা অন্ধকারে—আবার আলোয়—আবার অন্ধকারে—তার জাদুকরী মুদ্রাগুলি ছিটিয়ে দেয়। আলো তাকে চঞ্চল হয়ে খোঁজে, খোঁজে অন্ধকার। চারদিকে অনেক মানুষ, কাউকে দেখা যায় না। কেবল অন্ধকারে সিগারেটের আগুন তীব্র হয়ে উঠে মিইয়ে যায়। শ্বাস পড়ে, শ্বাস ওঠে—কাউকে দেখা যায় না। চরম মুহূর্তের কাছে উঠে যায় ড্রামের অসহ্য আনন্দের শব্দ— লোলা-লোলা-লোলা—

হঠাৎ আলো নিভে যায়। গৌর টপ করে চোখ বুজে ফেলে। আজ পর্যন্ত সে কখনো ন্যাংটো মেয়েমানুষ দেখে নি।

অন্ধকারেই জাহাজী তার হাত চেপে ধরে—মেট, এ নয়—

—নয় ?

—নাঃ।

অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে তারা বেরিয়ে আসে। পিছন ফিরে তাকায় না। কিন্তু তখন লোলা তার ঘাগরা ছেড়েছে, কাঁচুলি দিয়েছে ফেলে। অন্ধকারে সে দাঁড়িয়ে। পাগলের মতো আলো তাকে খুঁজছে। লোলা দু'হাত বাড়িয়ে আলোকে বলছে। এসো—এসো—এইখানে পৃথিবীর প্রিয়তমা লোলা—

তবু সে স্যু নয়। হতাশ জাহাজীকে সে খাওয়ায় নি অলৌকিক জ্যোৎস্না। দুটি দুঃখী লোক তাকে অবহেলা করে চলে গেল।

দুটি মানুষের কাছে ব্যর্থ লোলার নগ্ন শরীরে তখন লাল নীল সবুজ আলোগুলো পাগলের মতো এসে আঘাত করছে, মাঝে মাঝে এগিয়ে যাচ্ছে—আর তখন গৌরের ল্যান্ডমাস্টার পার্কস্ট্রীট ছেড়ে উড়ে যেতে থাকে স্যু-র খোঁজে।

আই। গৌর টের পায়, গাড়িটা উড়ছে। উইণ্ডস্ক্রীন জুড়ে পার্ক স্ট্রীটের আলোর, ধাঁধা। গৌর চোখ কচলে নেয়। মোড়ের ট্র্যাফিক বাতি দেখতে পাচ্ছে না সে। দেখবার দরকারই বা কী। গাড়িটা উড়ছে যখন।

—মেট। জাহাজী মৃদুস্বরে বলে।

—উম্।

—নেশাটা কেটে যাচ্ছে। কলকাতার শুঁড়িরা মদে জল মেশায়।

হবেও বা। গৌর জানে না। সে ঝুঁকে রাস্তাটা দেখে। ফাঁকা হয়ে এসেছে রাস্তা। চোরাগলির অন্ধকার মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিচ্ছে। চলেছে মাতাল। ভিখিরি।

boiRboi.net

মতলববাজ লোক, এসবের ওপরে ঐ আকাশ। জ্যোৎস্না ক্রমে ম্লান হয়ে আসছে। ঐ আকাশে থাকেন ফাদার ফ্রান্সিস। তাঁকে ঘিরে থাকে স্বপ্নের শিশুরা। লাল নীল সবুজ বল গড়িয়ে সারা দিনমান শিশুদের সঙ্গে খেলা করেন ফাদার। পৃথিবীর ওপরে যে আকাশটা আছে সেটা মানুষের বাবার ভাগ্যি। গৌর মাঝে মাঝে তাই চোখ তুলে আকাশখানা দেখে। ভারী খুশি হয়। গাড়িটা আর একটু উঁচুতে উঠে যায়। ভাল লাগে গৌরের। সে মুখ ফিরিয়ে বলে—দেখ, কত উঁচুতে উঠছি।

জাহাজীটা গলা বাড়িয়ে নিচের দিকে চায়, তারপর বলে—আর একটু ওপরে ওঠো মেট। সত্য বোধহয় পৃথিবীতে নেই। এখানে বড় ধুলো ময়লা, নোংরা মানুষ। এ সব দেখে সে বোধহয় উঁচুতে উঠে গেছে।

মাতাল। গৌর আপনমনে হাসে। একটা লাল সিগন্যাল পেরিয়ে যায়। পুলিস নেই। কেউ তাকে থামায় না।

জাহাজীটা এলিয়ে পড়েছে সীটে। বিড়বিড় করে বকছে—বাড়ি বাড়ি খুঁজবো। ভিখিরিদের মুখ দেখে দেখে ফিরবো। প্রতিটি শুঁড়িখানায়, বেশ্যার ঘরে, দোকানে, অফিসে। কোথায় যাবে সত্য?

গৌর রাস্তাটা ভাল দেখতে পায় না। কুয়াশা হয়েছে নাকি? কিংবা স্বপ্ন দেখছে? সামনের রাস্তাটা জুড়ে পরী নামছে। শিশু-পরী সব। ন্যাংটো, ফর্সা, সুন্দর। দুটো করে ছোটো ডানা। গাছে গাছে ফলের মতো ঝুল খাচ্ছে। রাস্তায় খেলা করছে। ব্রেক কষে গৌর। চোখ মুছে নেয়। হর্ন দেয়। চাপা পড়বে যে বাবারা সব! ওড়ো, উড়ে যাও।

তারপরই হাসে গৌর। চাপা দেবে কী? উড়ন্ত গাড়ি কাউকে চাপা দেয় না। গৌর আবার গাড়ি ছাড়ে। আকাশে ফাদার ফ্রান্সিস রয়েছেন। শিশুদের তিনিই সরিয়ে নেবেন। ভয় নেই।

—কলকাতার শুঁড়িরা মদে জল মেশায়, বুঝলে মেট? ভীষণ জল মেশায়।

বলে হেঁচকি তোলে জাহাজী।

—গাড়িটা জোরে চালাও মেট। নইলে জমছে না। আমার নেশা কেটে যাচ্ছে।

—পাগলা! জোরে চালালে ওদের গায়ে ধাক্কা লেগে যাবে।

—কাদের? জাহাজী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

—ঐ যে, পরীরা নেমেছে সব। বাচ্চা পরী, ভাল উড়তে শেখে নি এখনো। জাহাজী ঝুঁকে রাস্তাঘাটে পরী দেখার চেষ্টা করে।

—কোথায় পরী?

শালা মাতাল। দেখতে পাচ্ছে না। গৌর হাসে।

—ঐ তো। সব জায়গায় রয়েছে। গাছে ঝুল খাচ্ছে, রাস্তায় খেলছে, আকাশে উড়ছে, কোথায় নেই? ঐ দেখ একজন আমার গাড়ির বনেটে বসল—ঐ আবার উড়ে গেল! নীল চোখ, কী সুন্দর নীল চোখ!

জাহাজী শ্বাস ফেলে বলে—দেখতে পাচ্ছি না। কলকাতার শুঁড়িরা বড্ড জল মেশায় মদে।

—কিন্তু পরীরা আছে ঠিক। সেণ্ট অ্যান্টনিজে এরকম পরীদের ছবি ঘরে ঘরে

boiRboi.net

ঝোলানো থাকত। সোনালী ডানা, লাল ঠোঁট, নীল চোখ······

জাহাজী বুক কাঁপিয়ে শ্বাস ফেলে—নীল চোখ! নীল চোখ! স্যুরেও ছিল ঐ নীল চোখ। ঠিক নীল নয়, একটু বাদামী। কিন্তু ওর গায়ের রঙ ছিল বডড কালো। যখন ঘরের আলো নিভিয়ে দিত—বুঝলে—যখন ঘরের আলো নিভিয়ে দিত তখন ওকে কিছুতেই খুঁজে পেতাম না। ওর ঐ কালো রঙের জন্যই। স্যুর বুক ভরা ছিল এক শ মজা। বাতি নিভিয়ে সে লুকোতো, আর আমি দু'হাত বাড়িয়ে তাকে খুঁজতে খুঁজতে কখনো দেয়ালে, কখনো ওয়াড্রোবে, কখনো খাটের বাজুতে ধাক্কা খেতাম। ও লুকোতো খাটের তলায়, আলমারির ভিতরে কিংবা ছেড়ে রাখা পোষাকের নিচে। একশ মজা ছিল ওর। বডড কালো ছিল বলে—

—কালো! গৌর ভারী অবাক হয়—কালো কোথায়! তুমি যে বললে, ফর্সা আর নীল চোখ।

—বলেছি?

—আলবাৎ!

—তবে তাই। জাহাজীটা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে—তবে তাই। কিন্তু তাহলে অন্ধকার ঘরে ওকে খুঁজে পেতাম না কেন?

গৌর হাসে—দূর। অন্ধকার ঘরে কালোই কী, ফর্সাই কী? সব সমান।

—না না। ঘরটা একদম অন্ধকার হত না, কখনো। বাইরে জানালার সোজাসুজি একটা নিওন সাইন ছিল। কী যেন সাইনটা! আঃ হাঃ কী যেন—ঠিক মনে পড়ছে না—কী যেন—

লিপ্‌টন? লুফ্‌টাহান্‌সা? গুডইয়ার? ক্যাপস্টান?

—নাঃ। ওসব নয়। কলকাতার শুঁড়িরা—জাহাজী হেঁচকি তোলে।

—যেতে দাও। গৌর বলে।

জাহাজীটা মাথা নাড়ে—না না। যেতে দেবো কেন? সেই নিওন সাইনটা ছিল খুব ইম্পর্ট্যান্ট। খুব। দাঁড়াও মনে করি।

জাহাজী মুখে আঙুল পুরে ভাবে। শিস্ দেয় মাঝে মাঝে। ওদিকে রাস্তায় পরীরা আরো নামছে। কলকাতা জুড়ে কেবলই পরী নেমে আসছে। দু-তিনজন গাড়ির জানালা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করছে। কাচ তোলা বলে পারছে না। আহা! গৌর হাত বাড়িয়ে পিছনের জানালার কাচ নামায়। বোসো বাবারা। বসে থাকো। আমি তোমাদের পুরো কলকাতা দেখিয়ে দেবো।

—ইয়াঃ। সেই নিওন সাইনে লেখা ছিল—ইউ ওয়াণ্ট লায়লাজ ব্রেড। তুমি চাও লায়লার রুটি। প্রথমে জ্বলত 'তুমি,' তারপর 'চাও,' তারপর 'লায়লার' সবশেষে 'রুটি,' চারটে শব্দ। 'তুমি' জ্বললে ঘরটায় স্বচ্ছ আলো আসত—সবুজ আলো। দ্বিতীয়টা ছিল 'চাও,' সেটা জ্বললে আরো একটু সবুজ আলো আসত। তারপর 'লায়লার থেকে রুটি পর্যন্ত চমৎকার আলো হত ঘরে। সবুজ আলোয় ভরে যেত ঘর। মনে হত, মাঠঘাট, সবুজ ঘাস—এই সবের মধ্যে রয়েছি। আবার হঠাৎ দপ করে নিভে যেত আলো, কী অন্ধকার এখন। ঘুটঘুট্টি। হঠাৎ আবার জ্বলে উঠত—'তুমি,' তারপর 'চাও,' তারপর—জাহাজীটা হেঁচকি তোলে

পিছনের জানালা গলে তিনটে পরী ঢোকে। গৌর আড়চোখে আয়নায় দেখে নেয়। ন্যাংটাপুঁটো, সাদা। মোটা মোটা থোরা, নধর হাত, নাদা পেট। সোনালী ডানাগুলো পাতলা ফিনফিনে—যেন বা মাকড়সার জালে তৈরি পাখাগুলো থিরথির করে কাঁপে।

—ই-ফ! জাহাজী আবার হেঁচকি গেলে।

—চোপ! ধমক মারে গৌর—হেঁচকি তুলো না। পরীরা ভয় পাবে।

জাহাজী অবাক হয় বলে—কারা বললে?

—পরীরা।

—কোথায়?

—পিছনের সীটে বসে আছে। তিনজন। এখন হেঁচকি তুলো না।

জাহাজী মুখ ফিরিয়ে দেখে। তারপর বলে—কোথায় কী?

—আছে। তাকিও না।

জাহাজী গম্ভীর হয়ে বলে—আসলে কলকাতার শুঁড়িরা—

বলে ঠোঁট চাটে জাহাজী। গৌর গাড়িখানা ফাঁকা রাস্তায় রাস্তায় ঘোরাতে থাকে। ড্যাশবোর্ডে তেলের কাঁটা নেমে যাচ্ছে। গৌর তা লক্ষ্য করে না। সে কেবল চরাচর জুড়ে পরীদের কাণ্ড দেখে।

জাহাজীটা বলে—আমরা জানালায় বসে সেই নিওন সাইনটা দেখতাম।

—কোন নিওন সাইন?

—সেই যে, তুমি চাও লায়লার রুটি। সবুজ রঙের নিওন সাইন। ঘরটা সবুজ আলোয় চমকাতো। আমি স্যুকে জিজ্ঞেস করতাম—স্যু, লায়লা কে? স্যুও আমাকে জিজ্ঞেস করত—লায়লা কে? আমরা কেউ বলতে পারতাম না। অথচ নিওন সাইনটা সন্ধে রাত্রি থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সবুজ আলো দিয়ে একই কথা বলত—তুমি চাও···তুমি চাও···তুমি চাও···লায়লার রুটি। আমি স্যুকে জিজ্ঞেস করতাম—স্যু, তুমি লায়লার রুটি চাও? সে বলত, চাই। ফের সে আমাকেও ঐ কথা জিজ্ঞেস করত, আমিও চাই কিনা, আমি বলতাম, চাই। কিন্তু মেট, খুঁজে দেখেছি, সেই রুটি পাওয়া যায় না।

—পাওয়া যায় না?

—না।

—সে কী? তাহলে নিওন সাইনটা ছিল কী করতে?

জাহাজীটা একটু ভেবে বলে—অবিশ্যি দিনের বেলা তো কখনো লায়লার রুটির খোঁজ করি নি! দিনের বেলা মনেই থাকত না। রাত্রি বেশী হলে যখন নিওন সাইনটা নজরে পড়ত, তখন আমরা খুঁজতে বেরোতাম। পাওয়া যেত না। মেট, সেই থেকে লায়লার রুটির জন্য আমি অস্থির হয়ে আছি। এখনো মাঝে মাঝে মাঝ-রাতে ঘুমে আমি স্বপ্ন দেখি, নিওন সাইন জ্বলে জ্বলে উঠছে—তুমি চাও···তুমি চাও···তুমি চাও···ভয় পেয়ে উঠে বসি, আর তখন বাদবাকীটা মনে পড়ে—লায়লার রুটি···লায়লার রুটি···লায়লার রুটি···

মাতাল। গৌর হাসে।

জাহাজীটা ঠোঁট চাটে। একটা রথম্যান ধরাবার চেষ্টা করে। দেশলাই জ্বালতেই গৌর ধমকায়—আলো জেবলো না।

—কেন?

—পরীরা পালাবে।

—অঃ। জাহাজী হতাশভাবে সিগারেট ফেলে দেয়। তারপর বলে—লায়লার রুটি। সবুজ আলো, স্যু, জ্যোৎস্না—মেট, এসব কোথায় গেল? কলকাতা একদম শুকিয়ে গেছে যে! কিছু নেই!

গাড়িটা আপনা থেকেই ঘুরেফিরে চলে যাচ্ছিল। গৌর দিক ঠিক করতে পারে না। আসল গাড়ি যখন মাটির ওপর দিয়ে যায় তখন রাস্তাঘাট ঠিকই চিনতে পারে গৌর—গৌরা—পগলাপাতির ব্যাটা। তখন তার সব ইন্দ্রিয় সজাগ থাকে। কিন্তু এখন—এই পরীদের রাজ্যে চলে এলে, মাঝরাতে দিক নির্ণয় করা ভারী মুশকিল। গাড়ি তখন নিজের থেকেই চলে। গৌর কেবল নিমিত্তমাত্র।

চাঁদ ঢলে পড়েছে। আকাশের একদিকটা কালিবর্ণ—বেশ্যার চোখের কাজলের মতো—সেই কালিবর্ণে ফ্যাকাশে শসার মতো চাঁদ ঢলে পড়ে যাচ্ছে। গৌর এই মর্মান্তিক দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

জাহাজী হঠাৎ আঁতকে উঠে বলে—এটা কোন্ জায়গা! অ্যাঁ! কোন জায়গা! থামো মেট।

গৌর থামে।

একটা পুরোনো প্রকান্ড বাড়ি বটগাছের মতো দাঁড়িয়ে। অন্ধকার। রাস্তাটা নিঝঝুম। চারদিকে সুনসান নির্জনতা। রাস্তায় সারি সারি গাছ। গাছের আড়ালে আড়ালে রাস্তার টিমটিমে আলো। হাওয়ায় গাছের পাতা নড়লে আলোগুলো দোল খেয়ে যেতে থাকে। গৌর রাস্তাটা ঠিকঠাক চিনতে পারে না। গম্ভীর গলায় বলে—কী জানি!

জাহাজীটা মুখ তুলে বাড়িটা দেখে।

—মেট।

—উম্।

—এই বাড়িটা আমার চেনা।

গৌরও বাড়িটা দেখে। কলকাতার প্রথম বয়সে তৈরি বাড়ি। পলেস্তারা খসে পড়ছে। বোধহয় কর্পোরেশনের নোটিশ পেয়েছে। ভেঙে ফেলা হবে। তাই সবাই ছেড়ে গেছে বাড়ি। একা অন্ধকার বাড়িটা আয়ুর শেষ কটা দিন নির্জনে ঝিমিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে।

গৌর হাই তোলে।

জাহাজী হঠাৎ গৌরের হাত চেপে ধরে বলে—বাড়িটা আমি চিনি মেট। এখানে আমি এসেছি।

—কার কাছে?

জাহাজী ফিস্‌ফিস্ করে বলে—স্যুর কাছে।

গৌর চমকে বলে—এই বাড়িটাই?

boiRboi.net

জাহাজী গম্ভীর হয়ে বলে—এই বাড়িটাই !

তারা নামে। আগে জাহাজী, পিছনে গৌর।

বাড়ির দরজাটা হাঁ হাঁ করছে খোলা। একটা পাল্লা বাতাসে নড়ে চামচিকের মতো শব্দ করছে। আরশোলার নাদির গন্ধ পাওয়া যায়। আর বহু পুরোনো এক বন্ধ বাতাসের ঘ্রাণ।

জাহাজী দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁ করে একটু তাকিয়ে থাকে। তারপর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে—এইটাই। সেটারও দরজা এরকম চামচিকের মতো শব্দ করত। জাহাজী শ্বাস ছাড়ে।

বলে—মেট, চলো। দেখা যাক।

দুজনে সিঁড়ি ভাঙতে থাকে। সিঁড়ি যতই ওপরে উঠছে ততই আরো অন্ধকার, পিছল পিছল, ধাপ তত উঁচু উঁচু। ক্রমান্বয়ে চুন-বালি খসে পড়ার একটা ঝিরঝির ঝুরঝুর শব্দ হতে থাকে। মুখে গায়ে ঝাপ্টা মেরে উড়ে যায় চামচিকে। টিকটিকি ডাকে।

—ক তলায় ? গৌর জিজ্ঞেস করে।

—দশ তলায়। আমার মনে আছে।

গৌর অবাক হয়ে বলে—কিন্তু এ বাড়িটা তো মোটে চার পাঁচ তলা !

—ঠিক বলছো ?

—ঠিক। এ কলকাতার পুরোনো বাড়ি, চুন সুরকির গাঁথুনি, এর ওপর দশতলা হয় না।

—তাহলে ! বলে জাহাজীটা নাক চুলকোতে চুলকোতে ভাবে। বলে—তাহলে ক তলায় ! ঠিক মনে পড়ছে না তো !

চারদিকে নিস্তব্ধতা। ঝিঁঝি হঠাৎ ডেকে উঠে আরো নিস্তব্ধ করে দিতে থাকে। চুনবালি খসছে তো খসছেই। ঝিরঝির ঝুরঝুর। বাইরে পরীরা নামছে এখন। কিন্তু এখানে, বাড়িটার ভিতরে কেবল হাজার বছরের অন্ধকার। হাজার বছরের জমে থাকা ধুলোর গন্ধ।

দুজন আবার সিঁড়ি ভাঙে। পলেস্তারা খসে, চুনবালি পড়ে সিঁড়িতে পুরু আস্তরণ। পায়ে লেগে ঢেলা গড়িয়ে পড়ে। ইঁদুরের নরম পা তাদের পায়ের পাতা ছুঁয়ে দৌড়ে যায়। মুখে গায়ে লেগে মাকড়সার জাল ছিঁড়ে যাচ্ছে। সারা বাড়ি জুড়ে সেই মিহিন পতনের শব্দ। ঝিরঝির ঝুরঝুর। আপনা থেকেই বাড়িটা অবিরল ক্ষয়ে যাচ্ছে। দরজা জানালা হাঁ-হাঁ করছে খোলা। বেশীর ভাগেরই পাল্লা নেই। দু-এক জায়গায় বাঁশের ঠেকনা দাঁড় করানো আছে। জাহাজীটা ভালুকের মতো ঘরে দোরে ঢুকে দেখে। চারদিক খুঁজে বেড়ায়। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে কুকুরের মতো মুখ তুলে বাতাস শোঁকে।

কোনো ঘরেই নেই খাট পালং, টেবিল চেয়ার, আলমারি। কিছু নেই। দু-একটা কৌটা-বাউটা পায়ে লেগে শব্দ করে গড়িয়ে যায়। একটা শিশি পড়ে ভেঙে গেল।

—মেট।

—উম্।

—এই বাড়িটাই। এইখানে স্যু থাকত। এইসব ঘর আমার চেনা।

আবার তারা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠে। ওপরে আবর্জনা বেশী। ইঁটের স্তূপ পড়ে আছে। ইঁদুর চামচিকে আরশোলা ঝিঁঝি অবিরল নানারকম শব্দ করতে থাকে। তারা এঘর থেকে ওঘরে যায়। ঘরের পর ঘর দেখতে থাকে। এক একবার এক একটা জানালা দিয়ে ঝুঁকে দেখে জাহাজী। মাথা নেড়ে বলে—এ ঘর নয়। এখান থেকে লায়লার রুটির বিজ্ঞাপন দেখা যায় না তো। অন্য ঘরে চলো মেট। যে-ঘর থেকে সবুজ নিওন সাইনে দেখা যাবে—তুমি চাও লায়লার রুটি—সেইটাই স্যুর ঘর। প্রথমে জ্বলবে 'তুমি' তারপর 'চাও,' তারপর 'লায়লার' সবশেষে 'রুটি'।

অন্ধকার ঘরে, প্যাসেজে, বারান্দায়, প্যার্নাট্রিতে তারা বার বার হোঁচট খায়। ডেব্রিসের ওপর হাঁটু ভেঙে যায়। আরো বাঁশের ঠেক্‌না ডেব্রিস, ইঁটের স্তূপ তারা চারদিকে টের পায়। বার বার দেশলাই জ্বালে জাহাজী। চারদিকে একটা প্রকাণ্ড বাড়ির জরা ম্লান ছবির মতো জেগে উঠে মিলিয়ে যায়। পোড়া কাঠি ছুঁড়ে ফেলে জাহাজী মাথা নাড়ে—না, এ ঘরটা নয়। কিন্তু এই বাড়িতেই ঘরটা আছে মেট। অনেকটা এইসব ঘরের মতোই। স্যু তো কালো ছিল, ভীষণ কালো। বাতি নিভিয়ে যখন সে লুকোতো তখন অন্ধকারে তাকে কোথাও খুঁজে পেতাম না। বাইরে তখন বার বার জ্বলে জ্বলে উঠত—তুমি চাও···তুমি চাও···তুমি চাও···লায়লা··· লায়লা···রুটি। সবুজ আলোয় ঝল্‌সে ঝল্‌সে উঠত ঘর, কিন্তু সেই আলোতে ঠিক গায়ের রঙ মিলিয়ে লুকিয়ে থাকত সে। কিন্তু তার গায়ে একটা সুগন্ধ ছিল। সেই গন্ধটা ঘর ভরে থাকত। আমি সেই গন্ধ শুঁকে শুঁকে চারধারে খুঁজতাম। ধরি ধরি করেও, কাছাকাছি গিয়েও ছুঁতে ধরতে পারতাম না। পালিয়ে যেত। তখন আবার পাগলের মতো খুঁজতাম। বাইরে তখন সবুজ আলো দপদপিয়ে উঠত—তুমি চাও··· তুমি চাও···তুমি চাও··· এইরকম—ঠিক এইরকম ঘরে সেইসব দারুণ ঘটনা ঘটত।

প্রকাণ্ড পাঁজর-কাঁপানো শ্বাস ছাড়ে জাহাজী। বলে—বুঝলে মেট, বডড কালো ছিল স্যু, কিন্তু মধুরঙের চুল ছিল তার। খয়েরী চোখ—

—খয়েরী? অবাক হয় গৌর।

—খয়েরী নয়?

—দূর! বাদামী তো।

—তবে তাই। জাহাজী সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়।

—আরে ফর্সা রঙ।

—ঠিক আছে।

—আর কালো চুল।

—আই। জাহাজী বলে। বলেই শ্বাস ছাড়ে। দেশলাইয়ের কাঠি ধরায়। সেটা নিভে যেতে হতাশভাবে আবার মাথা নাড়ে।

আবার পুরোনো পিছল অন্ধকার সিঁড়ি ভাঙে তারা। টের পায়, সেই অন্ধকারে এক আলাদা জগৎ রয়েছে। সে জগৎ মানুষের নয়। চামচিকে, আরশোলা, ইঁদুর, ঝিঁঝির। রয়েছে তাদের ভয়, খেলা, আত্মীয়তা। তারা নড়ে চড়ে, দৌড়ায়, ওড়ে, ডাকে। একটা রহু পুরোনো বাতাস বাড়িটার ভিতরে এখনো রয়ে গেছে। তাতে

boiRboi.net

একশো দুশো বছর আগেকার মানুষের শ্বাস মিশে আছে। অবিরল বাড়িটার বিন্দু বিন্দু গুঁড়ো গুঁড়ো পতনের মিহিন শব্দ হয়। ঝিরঝির ঝুরঝুর। ক্ষয়, অবিরল ক্ষয়।

অন্ধকারে জাহাজী হঠাৎ লাফ দিয়ে দুই ধাপ সিঁড়ি উঠে যায়।

কর্কশ চাপা গলায় বলে—মেট, এইখানে একটা বন্ধ দরজা।

—দরজা ?

—দরজা। দুটো পাল্লা বন্ধ।

অন্ধকারে গৌর কিছুই দেখে না। উঠে আসে। জাহাজী দেশলাই জ্বালতেই দেখা যায়, দুই মানুষ সমান উঁচু এক বিশাল, নীরেট, বিবর্ণ দরজা বন্ধ হয়ে আছে। জাহাজী হাতড়ে দরজাটা দেখে বলে—মেট, ভিতর থেকে বন্ধ।

—এইটাই কি সুয়ের ঘর ?

—মনে হচ্ছে।

জাহাজী সাবধানে দরজায় টোকা দিয়ে বলে—কে আছো ?

সাড়া নেই।

—কে আছো ?

সাড়া নেই।

জাহাজী ক্রমে ক্রমে জোরে, আরো জোরে কড়া নাড়তে থাকে।

—কে আছো ? কে আছো ? কে আছো ?

প্রকাণ্ড পুরোনো বাড়িটা তার স্বর শুষে নিয়ে আবার নিস্তব্ধ হয়ে যায়। কেবল চামচিকের ডানা নড়ে। টিকটিকি হঠাৎ ডেকে ওঠে। অলক্ষ্যে চুনবালি খসে পড়ার শব্দ হয়। ক্ষয়ের শব্দ। পতনের।

জাহাজী দরজায় কান পেতে ভিতরের শব্দ শোনার চেষ্টা করে। অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ ধরে শোনে। দেয়ালে হেলান দিয়ে গৌরহরি একটা রথম্যান ধরায়। ঘুমে চোখ ঢুলে আসে। চোখের সামনে রঙীন ডানাওয়ালা পরীরা ভেসে ওঠে। গৌর দাঁড়িয়ে ঢুলতে থাকে।

—মেট।

—উম্।

—ঘরের ভিতরে শ্বাস ফেলার শব্দ হচ্ছে।

—অ্যাঁ !

—কেউ আছে। শোনো।

গৌর কান পাতে। বহুকালের পুরোনো কাঠের দরজার গন্ধ পায় গৌর। ভারী কাঠের, পুরু পাল্লার দরজা। গৌর কোনো শব্দ পায় না। সে কান পেতে কেবল অবিরল বাড়িটার ক্ষয়ের শব্দ পায়। চামচিকের ডানা বাতাস কাটে। টিকটিকি ডাকে। আরশোলা ফরফর করে উড়ে যায়।

—কোথায় শব্দ ?

—মন দিয়ে শোনো। খুব লম্বা টানা শ্বাস। শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে। মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠে ভেঙে যাচ্ছে। বুকের একটা ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে। বড়

boiRboi.net

কষ্টের শ্বাস। শুনতে পাচ্ছো না?

—না।

জাহাজী আবার কান পেতে শোনে। তারপর অন্ধকারে তার অস্পষ্ট মুখখানা গৌরের মুখের কাছে এগিয়ে এনে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে—মেট, এই ঘরে কেউ মারা যাচ্ছে।

—অ্যাঁ?

—এই শব্দ আমি চিনি।

গৌরের নেশা ধাক্কা খায়। টলমল করে মাথা। সে হাত বাড়িয়ে দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে—কী বলছো?

—এখানে কেউ মারা যাচ্ছে। নিরিবিলি, নির্জন এইখানে একা একা একজন মারা যাচ্ছে। খুব কষ্টের শ্বাস। বুকের শব্দ। মরবার আগে ঠিক এইরকম শ্বাস ওঠে। উঠতে উঠতে ভেঙে ভেঙে যায়।

—তাহলে? গৌর তার রথম্যানে টান দেয়। তারপর কাশে।

—চুপ। জাহাজী ধমক দিয়ে চাপা গলায় বলে—ডিসটার্ব কোরো না।

—কাকে?

—যে মরছে, তাকে। সারাজীবন কত দুঃখকষ্ট মানুষের, কত খোঁজা, কত না-পাওয়া! বোধহয় অনেক শোকতাপ পেয়েছে! আহা! এতদিন একটু সময় পেয়েছে মরার। একা একা, অন্ধকারে, নির্জনে আরামে মরছে এখন। ডিসটার্ব কোরো না। অতিথি এসেছে বুঝতে পারলেও তার পক্ষে উঠে এসে দরজা খোলা ভারী বিশ্রী ব্যাপার। মরার সময়টায় কাউকে বিরক্ত করা ঠিক না।

তারা চুপ করে শোনার চেষ্টা করে। গৌর কেবল বাইরে বাতাসে শুকনো পাতা গড়িয়ে যাওয়ার শব্দ পায়। আর পোকা-মাকড় পাখিদের শব্দ। আর ক্ষয়ের শব্দ।

জাহাজী দেশলাই জ্বালে। সেই ম্লান আলোয় তার মুখখানা বড় বিবর্ণ দেখে গৌর। জাহাজী ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে—এই ঘরের জানালা থেকেই দেখা যাবে, 'তুমি চাও লায়লার রুটি'। এই ঘরেই মৃত্যু রয়েছে মেট।

গৌরের শিরদাঁড়া বেয়ে সাপ নেমে যায়। গায়ের রোমকূপ শিউরে ওঠে। শীত করে তার।

সে স্খলিত গলায় বলে—মৃত্যু?

—মৃত্যু।

জাহাজী আবার দেশলাই জ্বালে। আগুনটা জ্বলে উঠতেই জাহাজীর দিশেহারা মুখ দেখতে পায় গৌর। কাঠিটা কাঁপতে কাঁপতে জ্বলে। আস্তে আস্তে কালো হয়ে কুঁকড়ে আসতে থাকে। আগুন সরে এসে জাহাজীর আঙুল ছোঁয়। দিশেহারা মুখখানা আবার অন্ধকার গ্রাস করে নেয়। কোনোখানে আলো নেই। তবু গৌর মনশ্চক্ষে দেখে একটা সবুজ আলো দপ্‌ করে জ্বলে উঠল। তাতে লেখা—তুমি চাও···

প্রকাণ্ড, ভারী দরজায় হেলান দিয়ে জাহাজী দাঁড়িয়ে। গৌর হাত বাড়িয়ে তার কাঁধটা ধরে।

—কিন্তু সেই নিওন সাইনটা কোথায়? সেটা তো দেখা যাবে!

boiRboi.net

জাহাজী শ্বাস ছেড়ে বলে—কোথাও নেই। কেবল ঐ ঘর থেকে দেখা যায়। মাতাল। গৌর হাসে। বলে—চলো তো দেখি।

অন্ধকারে তারা দুজন হাতড়ে হাতড়ে ঘুরে বেড়ায়। পাশের ঘরগুলো অন্য সব ঘরের মতোই ফাঁকা, চুন সুরকির স্তূপ পড়ে আছে। বাঁশের ঠেকনা রুজু রুজু দাঁড়িয়ে। তার ভিতর দিয়ে পথ করে করে তারা এ জানালায় ও জানালায় উঁকি মেরে দেখে। গাছের ডাল, ল্যাম্প পোস্ট, ঘুমন্ত বাড়ি, নিঝঝুম রাস্তা দেখা যায়। কোথাও নেই 'তুমি চাও লায়লার রুটি'-র সেই সবুজ আলোর বিজ্ঞাপন। নেই, তবু গৌরের মনে হতে থাকে, আছে। বাস্তবিক, বাজারে লায়লার রুটি নামে কোনো রুটি পাওয়া যায় কিনা সে জানে না। ওরকম নিওন সাইনও তার চোখে পড়ে নি। তবু মনে হয়, আছে। সে দেখছে। বোধহয় স্বপ্নে। ঠিক ঐ রকম একের পর এক সবুজ আলোর বান—তুমি···চাও··· লালার···রুটি। ঐ কথা কটি যেন পৃথিবীর বাইরের কোনো জগৎ থেকে ভেসে আসে। লোভ দেখায়। স্বপ্নে জাগরণে কেবলই তার অলীক নিমন্ত্রণ। মানুষের ভিতরে কানায় কানায় উথাল-পাথাল ক্ষুধা জাগিয়ে তোলে লায়লার রুটি। মানুষ দু'হাত বাড়িয়ে চায়, তখন কোথায় মিলিয়ে যায় সবুজ অলৌকিক নিওন সাইন।

কষ্টেসৃষ্টে তারা আরো এক তলা ওঠে। সিঁড়ি কোথাও কোথাও ভাঙা, রেলিং ভেঙে পড়েছে, অন্ধকার। তবু তারা ওঠে। নিওন সাইনটা খোঁজার জন্য। আছে, কোথাও আছে ঠিক। কিন্তু উঠতে কষ্ট হয় খুব। আবর্জনার স্তূপ জমে আছে। কড়ি বরগা পড়ে আছে চারদিকে। আলটপকা বেরিয়ে থাকে লোহার শিক গায়ে খোঁচা মারে। বাঁশের ঠেকনোতে তারা ধাক্কা খায়।

ওপরে হাঁ হাঁ দরজার সব ঘর। আবর্জনা প্রচুর। পা দিতেই ধুলো ওড়ে। পা হড়কায়। ধুলোয় কোথাও বা পা ডুবে যায়। কিন্তু এখানে অন্ধকার তেমন জমাট নয়। ফিকে। একটা অপার্থিব হলুদ আলোর আভা চারদিকে, ভারী অবাক হয় তারা। হলুদ আলোয় নানারকম ছায়া পড়েছে। তারা আবর্জনার স্তূপ পার হয়ে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। জানালায় জানালায় লায়লার রুটির বিজ্ঞাপন খোঁজে, পায় না। হলুদ আলোয় নিজেদের মুখ দেখে তারা।

গৌর হঠাৎ মুখ তুলে ভারী চমকে যায়। কী সুন্দর ছাদ! কী প্রকাণ্ড! তাতে চুমকি বসানো। একটা হলুদ আলোর ডুম জ্বলছে একধারে। কারা যেন ডুমটাকে ভারী অদ্ভুতভাবে ফিট করেছে দেয়ালে। বড় ভাল লাগে গৌরের। আরে বাঃ! দিব্যি ঘর। জাহাজীও হাঁ করে ছাদটাকে অনেকক্ষণ দেখে।

কয়েক পলক সময় লাগে ব্যাপারটা বুঝতে।

—কী সুন্দর সিলিং! গৌর বলে।

—উম।

—ডুম জ্বলছে!

জাহাজী শ্বাস ফেলে বলে—ওটা সিলিং নয় মেট।

—তবে?

জাহাজী বিষন্ন গলায় বলে—ওটা আকাশ। ওর ওপর আর কোনো তলা নেই। গৌর তখন বুঝতে পারে। ঠিক। মাথার ওপর ওটা আকাশই বটে। ছাদটা

boiRboi.net

ভেঙে ফেলা হয়েছে। চারদিকে কড়ি বরগা শোয়ানো। বাড়িটা এখানেই শেষ।

চাঁদের আলোয় তারা ছাদহীন ঘরগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াতে থাকে। আকাশের একধারে বেশ্যার চোখের মতো কালি ঢালা গাঢ় কালোর মধ্যে বিবর্ণ মণির চোখ ঐ চাঁদ। শেষে জ্যোৎস্না ঢেলে দিচ্ছে। সোনার গুঁড়োর মতো চারদিকে জ্যোৎস্নার ধুলো ওড়ে। পরীদের আবার দেখতে পায় গৌর। ফিনফিনে শিফনের পাখায় উড়ে যাচ্ছে। তাদের ছায়া পড়ে না। জ্যোৎস্নাময় শরীর। 'ওড়া বাবারা ওড়ো'—সে বিড়বিড় করে বলে।

জাহাজী তার হাত ধরে—মেট, একমাত্র স্যুর ঘর থেকেই দেখা যায় লায়লার রুটির বিজ্ঞাপন। আর কোথাও ঐ বিজ্ঞাপন নেই। কিন্তু স্যুর ঘরে তো ঢোকা যাবে না। এখন, মরে যাওয়ার সুন্দর সময়ে সে কিছুতেই এসে দরজা খুলবে না। টু-নাইট শী উইল এন্টারটেন ওনলি ওয়ান গেস্ট। ডেথ।

বাড়িটা খুবই উঁচু। গাঁই গাঁই গঙ্গার হাওয়ায় দমকা ধুলোবালি উড়ে আসে। চোখ কিরকির করে, মাথার চুলে আটকে থাকে। হাওয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। বগলুর পোলা গৌরা—অর্থাৎ কিনা বগলাপতির ব্যাটা গৌরহরির দম আটকে আসতে থাকে। 'ডেথ' কথাটাই বাতাস হয়ে নাকের ফুটো দিয়ে ঢুকে ফুসফুস বেলুনের মতো ফুলিয়ে ফাটিয়ে দিতে চায়। কষ্ট হয় গৌরের। চাঁদের নিচে হঠাৎ মেঘ ডেকে ওঠে। বিদ্যুৎ চমকায়।

তারা বেভুল ঘুরতে ঘুরতে সিঁড়ির দরজায় আসে। তারপর অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নামতে থাকে। বন্ধ দরজার সামনে তারা একটু দাঁড়ায়। স্যুপ্পর ঘর। দরজা খুললেই একটা অন্য জগতে চলে যাওয়া যেত। যেখানে রয়েছে স্যু—জাহাজীকে যে একদিন অলৌকিক জ্যোৎস্না খাইয়েছিল। আর রয়েছে সবুজ আলোর অপার্থিব বিজ্ঞাপন—তুমি চাও লায়লার রুটি। পৃথিবীর আর কোনো ঘরের জানালা থেকে যা দেখা যাবে না। ঘরের মধ্যে স্যুর গায়ের সুগন্ধ। সেই সুগন্ধের রেশ ধরে এসেছে এক হিম বাতাস। ভাঙা দীর্ঘ কয়েকটি শ্বাস শেষবারের মতো টানছে স্যু, অন্ধকারে একা।

জাহাজী দরজায় একটুক্ষণ কান পাতে। তারপর শ্বাস ফেলে মাথা নাড়ে—বিরক্ত করা ঠিক হবে না। চলো মেট।

সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে তারা নামতে থাকে। অন্ধকার ধুলোর গন্ধ। চামচিকে, ঝিঁঝি, ইঁদুর, আরশোলার শব্দ। আর সব শব্দের আড়ালে অবিরল এক মিহিন পতনের শব্দ শোনে গৌর। ক্ষয়ের শব্দ ঝিরঝির ঝুরঝুর।

ফাঁকা কপাটহীন জানালা দরজা দিয়ে এক ঠান্ডা ঝোড়ো বাতাস হুড়দৌড় করে ঢোকে। ধুলো উড়তে থাকে। দুইজন দীর্ঘ অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে।

বাইরে এসে তারা দেখতে পায়, জলপ্রপাতের মতো বৃষ্টি পড়ছে। কী উল্লাস বৃষ্টির! চারদিকে জলে মাটিতে প্রবল ভালোবাসার শীৎকার ওঠে। জুড়িয়ে যাচ্ছে ভাপ। বৃষ্টি ভেদ করে ক্ষয়া চাঁদের আলো মেঘের ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে। চরাচর জুড়ে দৌড়াচ্ছে বৃষ্টির পা। অপার্থিব শিশু-পরীরা ধুয়ে মুছে গেছে। মেঘ ডাকে। পুরোনো বাড়ির ভিত কেঁপে ওঠে। গুরগুর করে বাড়িটার বুক। অন্ধকারে তার

অবিরল ক্ষয় চলেছে। মেঘের ডাকে তার আলগা পলেস্তারাগুলো খসে পড়ে। মৃত্যু-ভয়ে কেঁপে কেঁপে ওঠে সে।

তারা দুজন দরজায় দাঁড়িয়ে সেই জলপ্রপাতের মতো বৃষ্টি দেখে। তারপর জাহাজী হাত বাড়িয়ে গৌরের শুখো হাতখানা ধরে আত্মীয়ের মতো বলে—চলো মেট।

গৌর ঘাড় নাড়ে।

ল্যান্ডমাস্টারটা গাড়লের মতো দাঁড়িয়ে ভিজছে। লোকে যেমন গৃহপালিতের গায়ে হাত রাখে তেমনি আদরে গৌর ল্যান্ডমাস্টারের বনেটে একটা চাপড় দিয়ে বলে—চল্ বাবা ল্যান্ডু।

গভীর বৃষ্টির অভ্যন্তরে চলে যেতে থাকে তারা। রাস্তা কিছুই চেনা যায় না। পুরোনো কলকাতা ধুয়ে গলে গেছে। তার বদলে মাঝরাতের বৃষ্টির ঝরোখা ভেদ করে এক অপরূপ কল্পনার শহর ফুটে ওঠে উইন্ডস্ক্রীনে। চাঁদের হলুদ আলো. টিমটিমে ল্যাম্পপোস্ট, গাছের ছায়া, রাস্তার জল থেকে বিচ্ছুরিত আলো, বৃষ্টির ফোঁটায় আলোর বিন্দুর দ্রুত সরে যাওয়া। ঝিলমিলে অস্পষ্ট এক শহরের ভিতর দিয়ে জল ঠেলে চলে গৌরের ল্যান্ডমাস্টার, ওয়াইপারের কাঁটা দুটো পাগলের মতো নড়ে। তবু জলপ্রপাতের মতো বৃষ্টির তীব্র ফোঁটাগুলো গভীর আবেগে এসে ফাটে কাচের ওপর। গৌর চোখে তেমন দেখে না। দুজনের ভেজা শরীরে বাতাস লাগে। চুল থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে। গাড়ির কাচ তোলা, বন্ধ বাতাসে তাদের শ্বাসের ভাপ জমতে থাকে কাচের গায়ে।

গৌরের গাড়ি বড় আনন্দে অচেনা শহরটাকে ফাঁকা রাস্তায় চক্কর মেরে ফিরতে থাকে। কিন্তু ক্রমে শহরের বাড়িঘর ফুরিয়ে যেতে থাকে। গাড়িটা একটা ফাঁকা জায়গায় চলে আসে। সামনে বিপুল বিস্তৃত অন্ধকার। সেই অন্ধকারে ছোট্টো ছোট্টো ফুটোর মতো কয়েকটা আলো। বৃষ্টির তীব্র শব্দ উইন্ডস্ক্রীন ফাটিয়ে দেয়। গৌর হাত দিয়ে কাচ মুছে ভাল করে সামনেটা দেখে। ঠিক বুঝতে পারে না, এটা কোন জায়গা। মনে হয়, একটা বিশাল মাঠ সামনে।

ল্যান্ডমাস্টার ঘড়ঘড় করে। ভুড়ুক ভুড়ুক তামাক টানার মতো শব্দ হয়। তারপর কাশির শব্দ করে ল্যান্ডমাস্টার। গৌর একটু ঝুঁকে সামনে হঠাৎ দেখতে পায়, বিশাল সাদা একটা বাড়ি। চারদিকে ঘোর অন্ধকার। তবু বাড়িটা আবছায়ায় ঠিকই দেখতে পায় গৌর। বাড়ির চারদিকে বিরাট বাগান।

ল্যান্ডমাস্টারের সব শব্দ হঠাৎ থেমে যায়। নিঃশব্দে গাড়িটা গড়ায় খানিক।

—শালা! গৌর বলে।

—কী? জাহাজী ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে।

—শালার ল্যান্ডমাস্টারের তেল মরেছে।

জাহাজী উত্তর দেয় না। উইন্ডস্ক্রীনের ঝাপসা ভেদ করে প্রবল বৃষ্টির চিকের ভিতর দিয়ে সে সেই প্রকান্ড বাগান আর অস্পষ্ট বাড়িটা দেখছে।

—মেট, ঐ বাড়িটা আমার চেনা। আর ঐ বাগান।

—আমারও চেনা-চেনা লাগছে। কিন্তু ঠিক চিনতে পারছি না।

জাহাজী মুখ ফিরিয়ে বলে—ঐ তো সেই বাগান যেখানে সু আমাকে জ্যোৎস্না খাইয়েছিল।

boiboi.net

—অ্যাঁ !

জাহাজী মাথা নেড়ে বলে—ঐ সেই ভিক্টোরিয়ান বাগান। চারদিকে অন্ধকার, তবু দেখ ঐ বাগানে একটুখানি জ্যোৎস্না এখনো পড়ে আছে !

গৌর প্রাণপণে দেখার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই জ্যোৎস্না দেখতে পায় না। বলে—কোথায় জ্যোৎস্না ?

জাহাজী গম্ভীর গলায় বলে—আছে মেট। আমার জন্য এখনো একটু জ্যোৎস্না রয়েছে। সবাই সবকিছু দেখতে পায় না।

জাহাজী হাতড়ে দরজার হাতল খোঁজে।

—কোথায় যাবে ? গৌর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

জাহাজী বিড়বিড় করে বলে—ঐ বাগানে আর একবার আমি যাবো।

—পাগল ! যা বৃষ্টি !

জাহাজী মাথা দুলিয়ে বলে—জাহাজ ছেড়ে গেলে আর হয়তো ফেরা হবে না। পৃথিবী বড় বিশাল। হারিয়ে যাবো। আর এই বাগান, এই জ্যোৎস্নায় আসা হবে না মেট। আমাকে নামিয়ে দাও।

গৌর হাত বাড়িয়ে লক্ খুলে দেয়। বড় মায়া হত তার। আহা, দুঃখী জাহাজী যদি ঐ বৃষ্টির ফাঁকা বাগানে কিছু পেয়ে যায় তো যাক !

দরজা খুলতে খুলতে জাহাজী বিড়বিড় করে বলে—স্যু···জ্যোৎস্না···সবুজ আলো ···লায়লার রুটি···

বলতে বলতে নেমে যায় জাহাজী। মুহূর্তে বৃষ্টির ঝরোখা ঢেকে নেয় তাকে। অন্ধকার ডাকে। বিদ্যুতের চমক, বাতাস প্রকাণ্ড বাগানের বিস্তার ছোট্ট একা মানুষটাকে গ্রাস করে নেয়।

হুড় হাওয়া দেয়। উড়ে আসে তীব্র বৃষ্টির ফোঁটা। সব ওলটপালট করে দিয়ে যাচ্ছে। পাল্টে দিচ্ছে শহর, বদলে দিচ্ছে মানুষের মন। চেনা চারদিকে অচেনা জগতের ছবি ফুটিয়ে তুলছে। গৌর অস্পষ্ট চোখে এইসব দেখে। বিদ্যুৎ চমকায়। গৌর আবছায়া ভেদ করে ঘুমের আঁশ-জড়ানো চোখে, জাহাজী বেড়ালের মতো লাফ দিয়ে উঠে দেয়াল ডিঙিয়ে বাগানের ভিতরে নেমে গেল।

চারটে দরজাই ভাল করে লক্ করে গৌর। হাই তোলে। পরীদের আর দেখা যাচ্ছে না। গৌর সামনের সীটে তার দুটো রুখোশুখো হাত-পা গুটিয়ে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে আছে।

তারপর বগলুর তিন নম্বর, হাফ-ফিনিশ, ফিফটি পারসেণ্ট গৌর বড় আরামে ঘুমোতে থাকে।

boiRboi.net

দুই

পৃথিবীটা আবার বড় ম্লান, রঙচটা, ধুলোটে লাগে গৌরের। যখন চড়চড়ে রোদ দেয়, ঘামে আঠা-আঠা করে শরীরে, তখন কলকাতার এধারের সওয়ারী ওধারে করতে করতে গৌরের মাঝে মাঝে লায়লার রুটির কথা মনে পড়ে। সেই সবুজ ঘর, স্যু, জ্যোৎস্না, সেই জাহাজী। কিন্তু কিছুই সত্য বলে মনে হয় না। বগলুর তিন নম্বরের ঐটাই

মুশকিল। ড্রিম আর রিয়্যালিটির অ্যাডমিক্‌শ্চার। কোনটা ড্রিম, কোনটা রিয়্যালিটি তা ঠিকঠাক বুঝতে পারে না সে।

হাওড়া স্টেশনে ঢুকলে পুলিসের বিশ পয়সা। পুলিস হাতে নেয় না। ছোকরা আছে। ছোকরারা দাপটে পুলিসের বাবা। কাট মারার চেণ্টা করলে এক চোখ ছোটো করে আঙুল তুলে নম্বর ধরে ডাকে। বিশ পয়সার দশ পুলিসের, দশ ছোকরাদের। বে-লাইনে সওয়ারী নিলে একটাকা। হাওড়া স্টেশনের গণ্ডায় কখনো আসতে চায় না গৌর, ব্রীজ পার হওয়া বড় ঝামেলা। তার ওপর সওয়ারীর লাইন, পুলিস ছোকরা তারপর সবার বাবা জ্যাম। তবু আজ এসে যেতে হল। দুপুরে কালীঘাটের গলিতে পাঞ্জাবী হোটেলে খেয়েছে, শেষপাত টক দই। খেয়ে ঝিমোচ্ছিল গৌর। পাশেই একটা লটারীর গাড়ি মেলাই চিল্লাচ্ছিল। ওদের মাইক্রোফোনটা ঘ্যার-ঘ্যারে। ইউ-পি লটারীর শেষ তিনদিন নিয়ে বিস্তর কান্নাকাটি করল। সেই সময়ে ভাতঘুমে একটা ভাল স্বপ্ন দেখে উঠে গৌরের মনে হল, পৃথিবী জায়গাটা ভালই। সে তখন দরজা খুলে নেমে গিয়ে লটারীর গাড়িটার কাছ থেকে একটা টিকিট কেনে। হরিয়ানা এবার পনেরো লাখ দিচ্ছে। গাড়িতে বসে নিরিবিলিতে অনেকক্ষণ টিকিটের ছবি দেখেছিল গৌর—অর্থাৎ কিনা—গৌরহরি -বগলাপতির তিন নম্বর। সেকেণ্ড প্রাইজ মোটে এক লাখ। গৌর ঠোঁট বেঁকায়। পেলে ঐ পনেরো লাখ। পনেরো লাখে জাহাজ কেনা যায়। সেই তুলনায় এক লাখ বড়ই গরিবীয়ানা।

সেই লটারীর ছবি দেখার সময়েই একজোড়া বুড়োবুড়ি হামলে এসে পড়ল—ও বাবা, কোনো গাড়িই যে ইষ্টিশনে যাচ্ছে না! আর দেরি হলে যে আমরা কাটোয়ার গাড়ি ধরতে পারবো না।

—হাওড়া যাবে না গাড়ি।

বুড়িটাই উথলে ওঠে—ও বাবা, কলকাতা তো তোমাদেরই শহর। আমরা মফঃস্বলের লোক। রাস্তাটা পার করে দাও বাবা, তোমাদের ভাল হবে।

আড়চোখে গৌর দেখল, সঙ্গে নাতি, বুড়ো, আর বিস্তর পোঁটলা-পুঁটলি। দশ বারো বছরের নাতিটার হাতে একটা নতুন বালতি, আর তোলা উনুন। বুড়োর এক হাতে পেটা লোহার কড়াই, অন্য হাতে ডালের কাঁটা, খুন্তি, কুয়োর বালতি তোলার হুক। বুড়ির হাতে কয়েকটা পট, জাঁতা, নতুন বেডকভারের পুঁটুলি থেকে উঁকি দিচ্ছে গঙ্গাজলের বোতল। এই বয়সে নতুন সংসার পাতার কথা নয়। তাহলে বোধহয় কালীঘাটের জিনিস কিনে নিয়ে পাঁচজনকে দেখানো হবে। গৌর আবার টিকিট দেখে।

—ও বাবা, আমরা পয়সা দেবো। ফাঁকি যাবে না।

—ট্যাক্সির কী দরকার! বাস্‌-এ চলে যান।

—উঠতে দিচ্ছে না যে! যা ভিড়। বাবাগো, নিয়ে চল।

গাড্ডা। গৌর শ্বাস ফেলে দরজা খুলে দেয়। তিনজন ভারী খুশী হয়ে গাড়িতে ওঠে। গাড়ি ছাড়তে বুড়ি হাত বাড়িয়ে শালপাতার ঠোঙায় সিঁদুর মাখা প্যাঁড়া প্রসাদ দিয়েছে, জবাফুল, আর একটা কমলালেবু। সে সব এখনো গৌরের সীটে পড়ে

boiRboi.net

রয়েছে। কাটোয়ার গাড়ি পেয়ে গেছে ওরা।

বে-লাইনে গাড়ি ঢোকায় গৌর। একটা টাকার মামলা। বেরিয়ে এসে আড়মোড়া ভেঙে স্টেশনের ঘড়িটা দেখে। ফর্সা চাদরের মতো ধবধবে রোদ পড়ে আছে। ঘড়িতে মোটে একটা। বে-লাইনে আরো কয়েকটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। তার মধ্যে একটা গৌরের চেনা। গৌর একটু এগোতেই মলিনকে দেখতে পায়। সীটে দুই পা তোলা. ঠোঁটে ভেজা সিগারেট, হাতে বই—মলিন বসে আছে! কোনোদিকে খেয়াল নেই।

গৌর বলে—মামু?

মলিন মুখ তুলে হাসে—কী বে ত্রিভঙ্গমুরারী, কী খবর?

—খবর নেই। তোমার খবর বলো।

মলিন উদাস গলায় বলে—তোমার সাউথে গ্যারেজ, আরামে আছো।

—আরাম কিসের?

মলিন হাসে—বেশ্যা আর ব্যাপারীদের গা আর বগলের গন্ধ শুঁকতে হয় না আমার মতো। এই মাত্তর একবোঝা বিড়ির পাতা খালাস দিলাম। তোমার গাড়িতে যারা ওঠে তারা আতরের গন্ধ রেখে যায়।

গৌর হাসে—এখনো সোনাগাছিতে কমলার বাবু ধরে দিচ্ছো নাকি?

মলিন উদাস গলায় বলে—দিই। গাড়ির যেমন সওয়ারী দরকার তেমনি ওদেরও। নর্থের গলিঘুঁজিতে ঘুরলে না তো. তাই তোমার চুল পাকে নি। তা সাউথে বৃষ্টি-বাদলা কেমন? আর মেয়েমানুষ?

গৌর বলে—কী যে বলো!

মলিনের মুখের আটক কোনোকালে নেই। ওর ট্যাক্সিখানা গৌরের মতো হরবখৎ যেমন-তেমন পাবলিককে তোলে না। বেছে বেছে তোলে। দু'হাতে পুলিসকে পয়সা দেয় মলিন, আবার দু'হাতে লোটে। বলতে গেলে সারা দিনমান গাড়িখানা গ্যারেজেই থাকে, বেরোয় বিকেলের পর। জায়গা বেছে দাঁড়ায় বড় হোটেলের তলায়, মাতালদের পেঁ'ছে দেয়। শনিবারে বাঁধা রেসের ময়দান। সেখানে শেয়ারের পাণ্টারদের তোলে। মাসে তিরিশদিন পুলিস তার লাইসেন্স কেড়ে নেয়। তিরিশদিন ফেরত দেয়। হাড়-কাটার মতিয়া কখনো-সখনো মলিনের গাড়িখানা ভাড়া নেয় সারা বিকেলের জন্য। ময়দানের কাছাকাছি নির্জনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে মলিন নেমে গিয়ে ঘাসে শুয়ে থাকে। মলিনের গাড়ি তখন মতিয়ার ঘর হয়ে যায়। বাবু আর মতিয়া থাকে কেবল। আর থাকে গঙ্গার হাওয়া। থাকে জ্বালা যন্ত্রণা। টাকা ওড়ে।

মতিয়া বড় সুন্দর। এত সুন্দর গৌর কদাচিৎ দেখেছে। থোপা থোপা লালচে চুল, নরম মুখ, রোগাটে শরীর, আর কী গম্ভীর চোখ! তাকে একবার পেঁ'ছে দিয়েছিল গৌর। সেদিন মলিনের গাড়ি ছিল খারাপ। গৌরের বুক খুব কেঁপেছিল। মতিয়া কিন্তু একবারও দেখে নি কে গাড়ি চালাচ্ছে। একটা রুখো-শুখো হাত-পাওয়ালা দুঃখী লোক গৌর—গৌরা—বগলুর ছাওয়াল—সময়মতো পোলিও আর টাইফয়েড না ধরলে যে বিলেত চলে যেত—হয়তো বিয়ে করতো মেম। এতদিনে কত কী হয়ে যেত গৌর! মতিয়া সেই গৌরকে দেখেই নি। ট্যাক্সিওয়ালা ভেবে ভ্রূক্ষেপও না করে নেমে গেল হাড়কাটা গলির ভিতরে একবাড়ির সামনে। চাকর

এসে টাকা দিল। মতিয়ার সঙ্গে পাবলিকের কারবার নেই—গৌর জানে। মতিয়া দরজায় দাঁড়ায় না, ডাকে না, ইশারা করে না। তার ঘরে টেলিফোন আছে, সাদা শিশুকাঠের খাট আছে, ড্রেসিং টেবিল আছে, রেফ্রিজারেটারও। যেমন বাছাই তার জিনিসপত্র, তেমনি বাছাই তার পুরুষেরা। আজও গৌরের গাড়ির গদি শুঁকলে বোধহয় মতিয়ার সেই দুর্লভ গন্ধটুকু পাওয়া যাবে।

মতিয়ার কথা ভাবতে গিয়ে একটু অন্যমনস্কতা এসে গিয়েছিল গৌরের। মলিন ডেকে বলে—তোমার ফাৎনা নড়ছে গৌর, দেখ।

একটা লম্বা লোক কোলে একটা ফ্যাতফ্যাতে বাচ্চা, সঙ্গে ফর্সা বৌ। তারা গৌরের গাড়ির হাতলে লক করা বলে দরজা খুলতে পারে নি, নইলে উঠে বসত। ভুখখা পার্টি, বালী কি রিষড়ে থেকে এসেছে। সিনেমায় যাবে হয়তো, কিংবা যাদবপুর কি বেহালার আত্মীয়বাড়ি। মাসে এক দুই দিন বৌ নিয়ে বেরোয়, তখন ট্যাক্সি চড়ে।

গৌর এগোয় না। দূর থেকেই হেঁকে বলে—গাড়ি যাবে না দাদা।

লোকটা এক ভিড় মানুষের মধ্যে ট্যাক্সিওয়ালাকেই খুঁজছিল। এখন গৌরকে দেখে মুখ কাঁচুমাচু করে—কেন?

—গাড়ি খারাপ আছে। ইঞ্জিন গরম।

লোকটা কপালের ঘাম হাতে দিয়ে কাঁচিয়ে ফেলে। বৌটার মুখের পাউডার ঘামে গলে যাচ্ছে।

লোকটা একবার মুখ তুলে স্টেশনের ঘড়িটা দেখে গৌরকে ধমকাবে না কাকুতি মিনতি করবে তা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বলে—বড় বিপদ ভাই। সোয়া একটা বেজে গেছে, দুটোয় পেঁছোতেই হবে।

—লাইনে দাঁড়িয়ে যান না, পেয়ে যাবেন।

লোকটা শুকনো গলায় বলে—লাইনে দাঁড়ালে পঁচিশজনের পিছনে পড়ে যাবো। অন্ততঃ আধঘণ্টা—বড্ড বিপদ—

বিপদ! কার না বিপদ! কলকাতা-সুদ্ধু মানুষ রাস্তায় দুহাত তুলে দাঁড়িয়ে সারা দিনমান 'বিপদ' বিপদ' বলে চেঁচাচ্ছে। গৌরের গাড়ি কি দমকল না অ্যাম্বুলেন্স? তবু তো গৌর দাঁড়ায়, মলিন হলে? যেদিকে, যেখানে তার গাড়ি যাচ্ছে একমাত্র সেদিকের বা সেখানের সওয়ারী ছাড়া তুলবেই না। পুলিস ডাকো, তম্বী করো, মলিন উত্তর দেবে না। পুলিস লাইসেন্স কেড়ে নিলে শান্তভাবে দিয়ে দেবে। জানে লাইসেন্স তার পোষা পাখির মতো। লোক-দেখানোর জন্য উড়ে যায়, আবার চোরাপথে ফিরে আসে। কার কী বিপদ তা নিয়ে মলিন মাথা ঘামায় না, রেসের বইটি খুলে ক্লাসে-ফার্স্ট-হওয়া ছাত্রের মতো মনোযোগ দিয়ে বইখানায় ডুবে যাবে। আর তখন ভুখখা পার্টিদের পিঁজরাপোলে খুঁথা টক্কর মেরে গৌরের ল্যান্ডমাস্টারের আয়ুক্ষয় হয়। মতিয়ার গায়ের গন্ধটুকু লোকের গায়ের ঘষায় উঠে যাচ্ছে ক্রমে।

পারবে না গৌর। দূরে থেকেই খেঁকিয়ে বলে—বলছি তো গাড়ি খারাপ আছে।

লোকটা নিরীহ, ভীতু ধরনের, বৌটাও তাই। গৌরের ধমক খেয়ে এ ওর দিকে চায়। লোকটার গলা বেয়ে দারুণ ঘাম নামছে। বাচ্চাটা তার ছোট্ট মাথা তুলে

boiRboi.net

চারিদিকে চায়। রোদে লাল হয়ে গেছে মুখ।

গৌর মুখ ফিরিয়ে নেয়।

লোকটা দু'পা এগিয়ে এসে বলে—ঐ গাড়ি কি যাবে?

মলিন মাথা নাড়ে—না দাদা, আমার বিয়ের প্যার্টি আছে।

লোকটা চারদিকে চায়। বাসে লোক গাদাই হয়ে আছে। চারদিকে মেলার ভিড়। লোক যে কোথা থেকে আসে! কোথায় যায়!

কোনো দরকার ছিল না তবু মলিন জিজ্ঞেস করে—কোথায় যাবেন?

—পি জি হাসপাতালে। মেয়েটির পোলিও ভ্যাকসিনের ডেট আজ। সেকেন্ড ডোজ। দুটোয় বন্ধ হয়ে যায়। সময়মতো ভ্যাকসিনটা না পড়লে কী হয় না হয়—

মলিন মোলায়েম গলায় বলে—বাসে চলে যান না! এখনো পৌনে একঘণ্টা সময় আছে, পেঁছে যাবেন।

পোলিওর কথা শুনে গৌর থমকে গিয়েছিল। পোলিও! আই বাপ! ঐ জিনিস না হলে কবে কলকাতা থেকে পাখি হয়ে উড়ে যেত গৌর! প্রজাপতি হয়ে ঘুরে বেড়াত বিদেশের বাগানে। পোলিও না হলে গৌরের চারখানা পুরো হাত-পা, আর আত্মবিশ্বাস থাকত।। হত মেম-বৌ। বিলেতেই শিকড় চারিয়ে দিত সে। তার শিশুকালে দুনিয়ার নেমকহারাম মানুষেরা কেউ পোলিওর ভ্যাকসিন বের করে নি।

ঘড়িটা দেখে গৌর। মূল্যবান আরো পাঁচটা মিনিট কেটে গেছে। ব্রীজের শেষ মাথায়, বড়বাজারের গায়ে একটু জ্যাম আছে বটে। তবে ধীরে ধীরে চলছে গাড়ি। চল্লিশ মিনিট সময় আছে। পেঁছে দিতে পারবে।

সে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দেয়—উঠুন।

লোকটা বিশ্বাস করতে পারে না। বলে—উঠবো?

—বলছি তো।

তারা ওঠে। গঙ্গা পেরোতে বৌটা ভারী খুশী-গলায় বলে—কী সুন্দর গঙ্গার হাওয়া গো, কাচটা আর একটু নামিয়ে দাও না।

শালারা এতদিনে পোলিওর ভ্যাকসিন বের করেছে। গৌর একটা সিঙ্গাপুরী কলা-বোঝাই লরীর পেছনে প্যাঁপোর-পেঁা হর্ন মারে। কলার পাহাড়ের ওপর বসে দুটো কুলি অনিচ্ছেয় একটার পর একটা কলা খেয়ে যায়। গাড়িটা নড়ে না। হারামীর বাচ্চা—গাল দেয় গৌর। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।

এতদিনে পোলিওর ভ্যাকসিন বেরিয়েছে। তা এতদিন কী করছিল মানুষ? হোআট বিজনেস? গৌর ভারী বিরক্ত হয়। রুখো-শুখো দুটো হাত-পায়ের জন্য তার আবার দুঃখ হতে থাকে। একবার মুখ ফিরিয়ে বাচ্চাটাকে দেখে। টুলটুলে একটুখানি মুখ, ড্যাবা চোখে চারদিক দেখছে, মুখে আঙুল। থোপা থোপা চুল উড়ছে, নড়ছে হাওয়ায়। ভারী মায়া হয় গৌরের। বেঁচে থাকো। সব কটা হাত-পা নিয়ে, আস্ত মানুষ থাকো। পৃথিবীর অন্ধকার থেকে রোগ ভোগ হাত বাড়ায়। সাবধান।

কলার গাড়িটা থেকে একটা কলার খোসা উড়ে এসে বনেটের ওপর পড়ে পিছলে যায়। গৌর একবার মাথাটা বের করে। কুলিটা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

boipoka.net

অন্য সময় হলে গৌর অন্তত 'শুয়োরের বাচ্চা' বলতই। এখন বলল না। ইচ্ছে করল না, মুখটা আবার ঢুকিয়ে নিয়ে বিড়বিড় করে গৌর।

জ্যামটা আস্তে আস্তে নড়ে। হাত-পা শিরশির করে গৌরের। দেরি হয়ে যাচ্ছে। বড্ড বেশী দেরি।

কুড়ি মিনিট লাগল ব্র্যাবোর্ন রোডের মোড়ে পৌঁছোতে। তারপর ঝড়ের মতো গাড়ি ছাড়ে গৌর। টেম্পো, ঠেলা, লরী মুহুর্মুহু কাটিয়ে যায়। গাড়ি টাল খায়, পিছনের সওয়ারী এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে। গৌর সেসব খেয়াল করে না। গতির উত্তেজনায় বৌটা বাচ্চার ভ্যাকসিনের কথা ভুলে গিয়ে বরের হাত চেপে ধরে ভয় পাওয়া হাসি হেসে বলে—মাগো, কী জোর গাড়ি যাচ্ছে দেখ!

লোকটা কাঠ-কাঠ হাসে। শক্ত হয়ে বসে থাকে।

গৌর এক ঝটকায় ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট পেরোয়। তারপর ময়দানের ভিতর দিয়ে উড়িয়ে দেয় গাড়ি। উড়োজাহাজের মতো গোঁ-গোঁ শব্দ করে গাড়ি। ইঞ্জিন ধোঁয়ায়। গৌর দাঁতে দাঁত চেপে রাখে। জোরে গাড়ি ছাড়লে রাস্তাঘাট আপনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়। ময়দানে বড় খেলা আছে। বোধহয় মোহনবাগান আর মহামেডান। লোকজন রাস্তা পার হচ্ছে ময়দান-মুখো। গৌর ভ্রূক্ষেপ করে না। গাড়িটা মানুষজনের ওপর ছুঁড়ে মারে যেন। সটাসট সরে যায়। গৌর হাসে।

গাড়ি ওড়ে। উড়তে থাকে। পিছনের সওয়ারীরা নিশ্চুপ হয়ে গেছে। বিভোর হয়ে গেছে। ময়দানের হাওয়া বুক ঝাঁঝরা করে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। পোলিও! পোলিও! গৌর বিড়বিড় করে। গাড়িখানা বাঁকে ঘুরতে থাকে। একটুও গতি কমায় না গৌর! চালিয়ে দেয়।

ঘড়িতে তখনো দশ মিনিট বাকী, গৌর গাড়িখানা পি জি-র আউটডোরে ভিড়িয়ে দেয়। পয়সা দেওয়ার সময়ে ওরা স্বামী স্ত্রী অবাক চোখে গৌরকে দেখে কিছুক্ষণ। রুখো-শুখো হাত-পা-ওলা দুঃখী চেহারার লোকটা অত জোর গাড়ি চালাতে পারে! সম্ভবত তারা বহুকাল গৌরের গাড়িতে চড়ার রোমহর্ষক গল্প করবে মানুষের কাছে।

একা গাড়ি আর গৌর রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে হাওয়া খেতে থাকে। চারটে বাজলে দাশ কেবিন। দক্ষিণের সওয়ারী পেলে ভাল। নইলে মিটার রইল ঢাকা, বনেট তোলা রইল। ফোটো পাবলিক। গাড়ি দক্ষিণ-মুখো দাঁড় করিয়ে গৌর ঝিমোয়। পাইয়ার হোটেলের দই ভাতের আমেজ ফিরে আসতে থাকে।

কিন্তু গৌরের জীবনে শান্তি নেই। মল পরা একখানা পায়ের শব্দ ঝম্ করে বেজে ওঠে। মাইরি! একী! গৌর একটু চমকায়। খুব বেশী চিন্তা-ভাবনা করলে তবে মাগীটা তার বেহদ্দ নাচ শুরু করে বটে মাথার ভিতরে। তারপর নানা কায়দায় নানান তালে নাচে। গৌরের জীবন খাট্টা করে ছেড়ে দেয়। পাগল-পাগল লাগে। কিন্তু এখন তো কোনো চিন্তা করে নি গৌর। না রাখোহরির কথা না তার বাপ বগলুর কথা। তবে? গৌর আধখানা চোখ খোলে। পশ্চিমের রোদ কার্নিক মেরে চোখে আঙুল ঢোকায়। ঝলসানো হিজিবিজি দেখে সে। আবার চোখ বোজে। ঝমাঝম মলের শব্দ হয় আবার। গৌর আধা-জাগা অবস্থায় বড় করে

শ্বাস ফেলে। মাগীটা কেন যে নাচে, নেচে তার কী বেহদ্দ সুখ—গৌর তা আজও বুঝল না। টাইফয়েডেরও ওষুধ বেরিয়ে গেছে। সে আমলে টাইফয়েড হয় পুরো মানুষ নিত, নয়তো নিত হাত-পা-চোখ কিংবা ওরকম কিছু। গৌরের মাথা নিয়েছিল। সেই থেকে মাথায় বেহদ্দ মাগীটা ঢুকে বসে আছে। বেরোবার নাম নেই। টাইফয়েডটা যদি তার হাত-পা নিতে চাইত তবে অনায়াসে পোলিওয় শুকিয়ে যাওয়া ফালতু হাত-পা দেখিয়ে দিত গৌর, বলত—এই দুটো নাও, কাজে লাগে না তেমন, পড়ে আছে।

গৌর চোখ খোলার চেষ্টা করে। অমনি আবার ঝমঝম পায়ের শব্দ বাজে। বাজতে থাকে। কিছুই করার থাকে না গৌরের। হাসপাতালের বাড়ির হাত দুয়েক ওপরে সূর্য। আউটডোরের বাইরে একটা কল থেকে ফালতু জল পড়ে যাচ্ছে। কিলবিল করে মা-বাপ আর আয়ার সঙ্গে ঘুরছে রঙীন বাচ্চারা। খুব ভিড়। পোলিওর ভ্যাক্সিন দেওয়া শেষ হয়ে এল। একটা বাচ্চা মার হাত থেকে ছুটে ঐ কলের তলায় গিয়ে দাঁড়াল। সবই ঠিকঠাক দেখতে পায় গৌর। কোনোখানে গোলমাল নেই। তবু আবার ঝমঝম শব্দ হয়। চকিতে গৌর ঘাড় ঘোরায়।

চোখে ঘুমের আঁশ জড়ানো। পিছনের কাচে ধুলো পড়েছে। গৌর অস্পষ্ট দেখতে পায়, পিছনের কাচের ওপাশ থেকে একটা দেহাতী মেয়ের মুখ জ্বল্‌জ্বল্‌ করে তাকে দেখছে। তার পরনে বাহারী হলুদ শাড়ি, গায়ে রুপোর গয়না, নাকে বেসর। চোখে কাজল টেনেছে গভীর করে, চোখ দুখানা তাই বোধহয় অত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। ঘুম থেকে উঠে গৌরের অস্বচ্ছ চোখে, ধুলোটে কাচের ওপরে মেয়েটাকে স্বপ্নের মতোই মনে হয়। মেয়েটা কাচের ওপর একখানা হাত পেতে রাখল। গৌর সেই হাতে মেহেদীর নকশা দেখে।

—কী চাই? গৌর জিজ্ঞেস করে।

মেয়েটা এক-পা দু-পা এগোয়। মলের শব্দ হয় ঝমঝম।

—গাড়ি জায়েগী?

—কঁহা?

—পারক সারকাস।

গৌরের সন্দেহ হয়।

—কিরায়া কৌন দেখা?

মেয়েটা হাত তুলে দাঁতে আঙুল কামড়াল, তারপর মুখ ফিরিয়ে ফুটপাথের দিকটা দেখিয়ে বলল—উও। ভঙ্গীটা বড় ভাল লাগে গৌরের।

গৌর মুখ বাড়িয়ে দেখে, ফুটপাথে দেয়ালে ঢলে বসে আছে এক বুড়ি, তার সামনে রুপোর মোটা বালা-পরা হাত, বাসন্তী রঙের পাগড়ি মাথায় এক সুন্দর দেহাতী লোক বসে বুড়ির মুখে লোটা থেকে জল নিয়ে ঝাপটা দিচ্ছে।

—কী হয়েছে?

—বুড্‌ঢী গরম ছে, দাঁতি লাগী।

—ও তোমার কে হয়?

মেয়েটা উদাস মুখ করে বলে—শাস্।

—আর ঐ লোকটা?

তেমনি উদাস মুখে মেয়েটা বলে—আদমী।

মেয়েটার মনে যেন সুখ নেই। গায়ে হলুদ শাড়ি, চোখে কাজল, হাতে মেহেদীর রঙ, তবু তার কোথায় যেন রঙহীনতা ফুটে আছে। তার সুডৌল হাতে উল্কির ছাপ, কাচের চুড়ি, রুপোর গয়না, তবু হাত দুখানা বড় উদাস্যহীন। কপালে টিকলি পরেছে সে, লম্বা চুল বেণীতে বাঁধা—তবু সব সাজের ভিতর থেকে দেহাতের গমের ক্ষেতে গোধূলির গর্জন উদাসীন বৈরাগ্য ফুটে আছে।

গৌর জিজ্ঞেস করে—এখানে মরতে কী করছিলে?

মেয়েলী হিন্দিতে মেয়েটি বলে—ক্ষেতে ফসল হয় না। মাটি মরে গেছে। আমাদের ক্ষেতীও ছিল ছোটো। আদমীটা বাজী দেখাতে জানত। আমি নাচতাম। দেহাতে ওসবের পয়সা কেউ দেয় না। তাই আমরা শহরে চলে আসি। বাজী দেখাই। আমার আদমী লাঠি ঘোরায়, চারটে ছোরা শূন্যে ছুড়ে লুফে নেয়, লোহার গোলার খেলা দেখায়, কাঠির ওপর পিরিচ ঘোরায়, হেঁটমাথা হয়ে পায়ের ওপর ঢোল নাচায়—কত কী করে!

—আর তুমি?

মেয়েটি একটু হাসে—আমি নাচি। ঘাগরা দুলিয়ে, বেণী দুলিয়ে ঝমঝম করে। লোকে পয়সা দেয়।

এই বলে মেয়েটা কৌতূহলে গৌরকে দেখে। কী দেখে তা গৌর—অর্থাৎ বগলুর তিন নম্বর, জানে। টাইফয়েডের খাজনা দিতে শুকিয়ে যাওয়া হাতখানা, আর পা, আর চোয়াড়ে মুখ।

ভারী বিরক্ত হয় গৌর। মার শালা গৌরার কপালখানায় তিন লাথি। গৌরার যে আর দেখাবার কিছু নেই মাইরি!

পাখির স্বরে মেয়েটি জিজ্ঞেস করে—আমাদের নেবে না?

গাড্ডা। গৌরের ল্যান্ডমাস্টারে এখন এক দাঁতি-লাগা বুড়ি উঠবে। গৌরের সুখ নেই, তবু সে মাথা নেড়ে বলে—নেবো, নিয়ে এসো।

—কত নেবে?

—মিটারে যা ওঠে। বলে গৌর হাসে, তারপর চোখ ছোটো করে বলে—আর একদিন তোমার নাচ দেখিয়ে দিও।

মেয়েটা একপলক গৌরকে দেখে, তারপরই আবার দেহাতী উদাসীনতা মেখে নেয় মুখে। বলে—কত লোক তো দেখে! তুমিও কোথাও রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখে নিও।

বালা-পরা সুন্দর পুরুষটা মুখ ফিরিয়ে রাগের গলায় কী একটা নাম ধরে মেয়েটাকে ডাকে। গৌর নামটা ঠিক বুঝতে পারে না। মেয়েটা ঝুঁকে বলে—একটু দাঁড়াও, আমাদের পোঁটলা-পুঁটলি তুলতে হবে কিন্তু।

গৌর মাথা নেড়ে সিগারেট ধরায়।

বিস্তর পোঁটলা-পুঁটলি, লাঠি, কাটারি ওঠে ল্যান্ডমাস্টারের লাগেজ বুটটে।

boiRboi.net

ততক্ষণে মেয়েটার নাকের নিচে নিটোল ঘামের ফোঁটা জমে ওঠে। পুরু পুরু দুটি ঠোঁট ভিজে যায় জিভের লালায়। সুন্দর পুরুষটির মুখে জবজবে ঘাম, পাগড়ী শিথিল। তারা খুব অস্বস্তির সঙ্গে পিছনের সীটে বসে থাকে কাঠ হয়ে। মাঝখানে এলিয়ে আছে বুড়ি। তার চোখ বোজা।

দৃশ্যটা দেখে আয়না একটু ঘুরিয়ে দেয় গৌর। মেয়েটার মুখ ভেসে ওঠে। গভীর কাজলের ভিতর থেকে দুখানা চোখের উদাসীনতা দেখা যায়। আর ভয়। ক্ষুধা। ফিফটি পারসেণ্ট গৌরা মেয়েটার মুখে চোখ রেখে ল্যাণ্ডমাস্টার চালু করে।

খুব শীগগীর পৌঁছে যাওয়ার কথা। গৌর গাড়িও ছাড়ে জোরে। কিন্তু পৌঁছায় না। ময়দানের ফাঁকা রাস্তা দিয়ে অকারণ চক্কর দিতে থাকে। এ রাস্তা ও রাস্তা করে ভবানীপুরের দিকে চলে আসে। অলিগলিতে গাড়ি ঢুকিয়ে দেয়।

লোকটা নড়ে চড়ে বসে। মেয়েটা হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে—কোথায় যাচ্ছো? এ তো অন্য রাস্তা।

গৌর গম্ভীর গলায় বলে—সব রাস্তায় গাড়ি যায় না। ঘুরে যেতে হবে।

—তুমি ভুল রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছো আমাদের।

গৌর উদাস গলায় বলে—সন্দেহ হলে নেবে যাও।

পুরুষটা মেয়েটাকে ধমক দিয়ে বলে—চোপ। কলকাতার তুই কী জানিস?

মেয়েটা চোখের বিদ্যুৎ পলকে তার পুরুষকে স্পর্শ করে বলে—আমি জানি, ও ভুল রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছে।

—নিক। কত নেবে? রাস্তা ঠিক পেয়ে যাবো।

মেয়েটা দমে না। হাত বাড়িয়ে গৌরের শার্ট খামচে ধরে বলে—কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?

গৌর বিনীত স্বরে বলে—পেছন থেকে ছোরা বসিয়ে দাও না। কিংবা মারো লাঠি। পুলিসও ডাকতে পারো।

মেয়েটা জামা ছেড়ে দিয়ে হাসতে থাকে। আয়নায় গৌর দেখে, কী সুন্দর সাদা দাঁত! এমন ঝকঝকে সরল দাঁত সে কারো দেখে নি।

দেহাতী লোকটা দার্শনিক। ঠিক জানে তাদের বেশীদূর নিয়ে যেতে পারবে না। কলকাতার ঘূর্ণচক্করে ঘুরে খানিক মিটার উঠবে মাত্র। দেহাতী বোকাসোকা লোক, ঝগড়া করে পারবে না। মিটার যা ওঠে তা দিয়ে দেবে। রুখো-শুখো হাত-পা-ওলা আর মাথায় এক বেহদ্দ মাগীর পাগল নাচ নিয়ে গৌর কোনো শালার কিছুই আর কেড়ে নিতে পারে না। এইসব ভাবে গৌর আর গাড়িটাকে বেমক্কা ঘোরায়। যে রাস্তায় যায়, ঘুরেফিরে আবার সেই রাস্তায় আসে। কী যে সঠিক সে চায় তা বুঝতে পারে না।

আরে বাঃ! এতক্ষণ মেয়েটা আয়নাটা লক্ষ্য করে নি। এখন করেছে। গৌর চোখ তুলেই মেয়েটার চোখ দেখতে পায় একপলক। মেয়েটা স্থিরদৃষ্টিতে আয়নার দিকে চেয়ে আছে। চোখে প্রথমে ভয় তারপর কৌতূহল দেখা দেয়। গৌর চেয়ে থাকে। ল্যাণ্ডমাস্টার টাল খায়। কিন্তু বহুকালের পোষা গাড়ি বলে বে-জায়গায়

টক্কর খায় না। গৌর সামলে নেয়। আবার আয়নায় চোখ চলে যায়। মেয়েটা চেয়ে আছে। চোখ পড়তেই রহস্যময় হাসে। ঘোমটা তুলে আধখানা মুখ ঢাকে মেয়েটা, ঢাকে সেই দিকটা যে দিকে তার শাশুড়ী আর স্বামী রয়েছে। তারপর হঠাৎ চোখ ছোটো করে জিব বের করে গৌরকে ভেঙিয়ে দেয়। আরে বাঃ! খুব শিখেছে তো!

লোকটা গৌরের যথেচ্ছাচারে বাধা দেয় না। কেবল একবার বিরক্ত হয়ে ভীতু গলায় বলে—একটু আস্তে চলো না ভাই। আমার বুড়ি মার শরীর ভাল না, জোরে চললে বুড়িমার কষ্ট হবে।

গৌর একটু স্পীড কমায়, আবার বাড়ায়। ক্যাঁ-চ করে ব্রেক কষে। ঘাড়ের যে জায়গাটায় মেয়েটা শার্টের কলার চেপে ধরেছিল সে জায়গাটা একটু শিরশির করে। ল্যাণ্ডমাস্টারটা জলের মতো বয়ে যায়। তাতে অনেক মুখের ছায়া পড়ে, আঙুলে কেউ বা জলে ছবি এঁকে যায়। কিছুই থাকে না। ক্ষণস্থায়ী একটি দেহাতী মেয়ের মুখ গৌর তার আয়নায় কতক্ষণ বা ধরে রাখতে পারে!

ল্যাণ্ডমাস্টার গাঁই গাঁই করে ঘোরে। জলের মতো বয়ে যায়। মেয়েটা যেই কোণে বসে আছে সেই কোণে একটু হেলে আধবোজা চোখে বসে ছিল মতিয়া। বহুদিন হয়ে গেল, তবু গৌরের হুবহু মনে আছে, দুর্লভ আতরের গন্ধে ভরে গিয়েছিল ল্যাণ্ডমাস্টার, সবুজ কাচের মতো স্বচ্ছ ওড়নার সোনালী চুমকির পিছনে তার মুখ। চকমকে চুমকি জ্বলে জ্বলে উঠেছিল বার বার। ওড়না উড়ছিল হাওয়ায়। সিল্কের লাল শাড়ি, লাল ব্লাউজ পরে লাল রঙের সুন্দর মতিয়া আধশোয়া হয়ে পড়েছিল। সেইদিনই ল্যাণ্ডমাস্টারের দশ পারসেণ্ট আয়ু বেড়ে যায়।

কিন্তু কিছুই থাকে না। সেই আতরের সুগন্ধ লোকের গায়ে লেগে লেগে মুছে গেছে। ঘাসপাতার সুবাস-ওলা এই মেয়েটির সতেজ শরীর, একটু ঘামে-ভেজা গায়ের বোঁটকা গন্ধ ল্যাণ্ডমাস্টারের গদীর গায়ে কতক্ষণ লেগে থাকবে! ট্যাক্সি আসলে এক বহমান নদী। স্রোতে ছায়া পড়ে, ভেঙে যায়।

গৌর শ্বাস ফেলে গাড়ি আনে সহজ রাস্তায়। পার্ক সার্কাসের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়, মিটারে দেড়টাকার মতো বেশী উঠে গেছে, মৌতাতের সময়টা এগিয়ে আসছে ক্রমে।

চোখে ঘুমের আঁশ জড়িয়ে আসে। কোন শূন্য থেকে লাল নীল হলুদ বল নেমে আসে পৃথিবীতে। চরাচর জুড়ে রঙীন বলগুলো ওড়ে কেবল। ঢাকার কামান নিঃশব্দ গোলা ছোঁড়ে শূন্যে। মুহুর্মুহু দাগতে থাকে গোলা। গৌরের আয়নায় মেয়েটা ঘোমটায় আধোঢাকা মুখে আবার জিব ভেঙায়। তার খাঁদা নাকের নিচে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমেছে। দেহাতী শরীরের কাঁচা গন্ধ, তার সঙ্গে রোদ-মাটির সুবাস, গাছপালার ক্লোরোফিল সব ল্যাণ্ডমাস্টারের ভিতরকার চৌকোণা বাতাসকে টৈটুম্বুর করে দেয়। গৌর শ্বাস টানে। তবু সওয়ারী খালাস দিতে হবে বগলুর তিননম্বরকে। তারপর দাশ কেবিন। গৌরের সঙ্গে দুখানা রুখো-শুখো হাত-পায়ের মতোই সেঁটে গেছে ল্যাণ্ডমাস্টার। সেঁটে গেছে দাশ কেবিন। সেঁটে গেছে কলকাতার রাস্তাঘাট। মিউনিসিপ্যালিটির ম্যাপ। মিটারের পরিবর্তন-শীল সংখ্যা আর মিটার ঘোরানোর টুংটাং। মৌতাতের সময়ে ঢাকার কামান কোন দূর

থেকে ঠিক রঙীন বল ছুঁড়ে মারে আকাশে। রাস্তার ওপর দিকে উঠে যায়। কলকাতার মাঝখানে কারা যেন জলময় শহর বানিয়ে রেখে যায়। গাভীর ডাক শোনে গৌর। মোড়ের ট্রাফিক পুলিস হঠাৎ ছদ্মবেশ ঝেড়ে ফেলে কদমতলায় বাঁশের বাঁশিটি আড় করে ধরে পা দুটো ক্রশ করে কৃষ্ণের কায়দায় দাঁড়ায়। এ সব জিনিসই সেঁটে গেছে গৌরের সঙ্গে। এর কোনো পরিবর্তন নেই।

গৌর শেক্সপীয়ার সরণী পেয়ে যায়। লোকজন ভুসভাস উড়ে যাচ্ছে। ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি জোরে ছাড়ে গৌর। পিছনে বুড়িটা ককিয়ে ওঠে। অস্ফুট ভয়ের শব্দ করে পুরুষটা। মেয়েটা মুখ-ভেঙাতে গিয়ে হঠাৎ টের পায় বাতাসে ঘোমটা উড়ে গেছে, স্বামী চেয়ে আছে তার দিকে। লজ্জায় জিব কাটে সে। বাতাস তার বেণীতে বাঁধা চুল লুট করে এনে কপালে ঝাপটা মারে। গৌরের গাড়ি গতির যন্ত্রণায় গোঙায়। টায়ার রাস্তায় গভীর বসে যায় লাঙলের মতো। গাড়ির জোর টানে ল্যাণ্ডমাস্টারের গভীর গদীর মধ্যে দেহাতীরা সেঁধিয়ে যেতে থাকে, ডুবে যেতে থাকে।

কোথায় যেন! আঃ, পার্ক-সার্কাস। গৌরের মনে পড়ে। আবার ভুলে যায় গৌর। আবার মনে পড়ে। রাস্তাগুলো ঠিকঠাক চেনা লাগে না। আয়নায় দেহাতী মেয়েটার সুন্দর সরল মুখখানা ঝাপসা হয়ে যায়। একটা সবুজ নিওন সাইন দপদপিয়ে ওঠে। প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারে না গৌর। তারপর দেখে, সবুজ নিওন সাইন দপ্ করে জ্বলে ওঠে, বলে—তুমি···তুমি···চাও···চাও···লায়লার··· লায়লার···রুটি···রুটি···। আবার সব মুছে যায়। মেয়েটির মুখ দেখতে পায় গৌর। চোখে গমক্ষেতের ধূসর বৈরাগ্য, অবহেলা, আবার কৌতুকও। আবার মুখ মুছে গিয়ে হঠাৎ দেখতে পায় গৌর, ল্যাণ্ডমাস্টারের সামনে পার্ক স্ট্রীট, পিছনে এক দূর সমুদ্রের ছবি আয়নায় ফুটে উঠেছে। গভীর বিশাল সমুদ্রের মাঝখানে একটা হলদে জাহাজের মাস্তুল দেখা যায়। জল দোলে, মাস্তুল দোলে, মানুষের বুক দুলে দুলে ওঠে। গৌর আর গৌর থাকে না। তার ল্যাণ্ডমাস্টারও নিজেকে ভুলে যায়। গাড়ি জমি ছেড়ে হঠাৎ সমুদ্রে লাফ দেয়। তুলে দেয় মাস্তুল। গৌর হর্ন টেপে। অবিকল জাহাজের ভোঁ-ও-ও-ও শব্দ বেজে ওঠে। ল্যাণ্ডমাস্টার জাহাজ হয়ে চলতে থাকে। সমুদ্র পাড়ি দেয়। দূরে এবং বিদেশী বন্দরে আঙুরের লতার ছায়ায় থোপা থোপা সবুজ ফল ঝুলে আছে। ঝিরঝিরে নদী বয়ে যাচ্ছে। একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে জাহাজঘাটায়। উঁচু পারে দাঁড়িয়েছে বলে সমুদ্রের প্রবল বাতাসে চুল উড়ছে তার, উড়ছে ঘাগরা। পিছনে টিলার উপরে ছোট্ট বাসা। বাসা ঘিরে বাগান। কত ফুল ফুটে আছে। জাহাজ হওয়া ল্যাণ্ডমাস্টার থেকে সব দেখা যায়। জাহাজ মেয়েটির দিকে, বন্দরের দিকে এগোয় ধীরে ধীরে। ভোঁ দেয়। মেয়েটা একখানা হাত তোলে। কী আনন্দিত হাতখানা, সেই হাতে কী নিমন্ত্রণ। গৌর স্পষ্ট বুঝতে পারে ঐ হচ্ছে তার মেয়েমানুষ। ঐ টিলার ওপরকার রঙীন সুন্দর বাগান-ঘেরা বাড়িটা তার ডেরা। বহুকাল সমুদ্রযাত্রার শেষে সে ফিরে আসছে।

গৌরের মাথার ভিতরে কোথায় সবুজ আলোটা জ্বলে জ্বলে ওঠে—তুমি চাও··· তুমি চাও···তুমি চাও। কী যে চায় গৌর তা ঠিক-ঠাক বুঝতে পারে না। আয়নায়

একখানা উল্কিপরা হাত ঝলক দিয়ে কুয়াশায় মিলিয়ে যায়। ল্যান্ডমাস্টার—জাহাজ বিপুল জলরাশি ভেদ করে চলতে থাকে, দুলতে থাকে। আয়নায় বিচিত্র বিচিত্র সব ছায়া পড়ে। নিসর্গ ভেসে ওঠে। আঙুর ফলের গা বেয়ে টসটসে রস ঝরে পড়ে। মাতাল মৌমাছিদের অনন্ত পিপাসার শব্দ হয়। টিলার ওপর ছোট্ট বাড়ি, রঙীন ফুল, জাহাজঘাটায় একা একটি বাতিঘরের মতো মেয়ে—এই সবই কি গৌর চায়? লায়লার রুটির বিজ্ঞাপন তেমন স্পষ্ট করে কিছুই বলে না। শুধু বলে—তুমি চাও···তুমি চাও···তুমি চাও···

আঃ ই। আলবৎ গৌর চায়। গৌর চায় মেলা কিছু। কত কী যে চায় গৌর তার ঠিকঠিকানা নেই। এক একদিন তার মৌতাতে জমে উঠলে ল্যান্ডমাস্টারের মুখ ঘুরিয়ে কলকাতার জাঙ্গাল ভেঙে চলে যেতে ইচ্ছে করে। কোথায় যাবে ঠিক জানে না গৌর। তবে হয়তো যাবে, কোনো ডুবজল নদীর ধারে, গাছের ছায়ায় বসে স্বচ্ছ জলের নিচে মাছেদের খেলা দেখবে। দেখবে গমের ক্ষেতের পাড়ে সূর্যাস্ত। সমুদ্রের ভিতর থেকে দেখবে দূরে বিদেশী বন্দরে দাঁড়িয়ে তার মেয়েমানুষের হাতছানি। টিলার ওপর রঙীন ফুল-ঘেরা বাড়ি।

কিন্তু না। মাথা নাড়ে গৌর। যাওয়া যাবে না কখনো। তার সঙ্গে সেঁটে গেছে ল্যান্ডমাস্টার, ল্যান্ডমাস্টারের সঙ্গে সেঁটে গেছে কলকাতা, কলকাতার সঙ্গে সেঁটে গেছে বগলুর তিন নম্বরের কপাল।

আই বাপ্! আর একটু হলে ট্রামের পিছনে ল্যান্ডমাস্টারটাকে ভিড়িয়ে দিচ্ছিল বাবা! গৌর বিড়বিড় করে। এক ঝটকায় ট্রামটাকে পার হয়ে যায়। পিছন থেকে দেহাতী লোকটা চেঁচায়—রোখকে রোখকে, বাঁয়া তরফ।

গৌর থামে।

দেহাতীরা একে একে নেমে রাস্তায় দাঁড়ায়। লোকটা এগিয়ে এসে বলে—কিৎনা?

গৌর কষ্টে মিটারটা দেখার চেষ্টা করে। অনেকক্ষণের চেষ্টায় দেখতে পায় মিটারে পঞ্চাশ টাকা উঠেছে। যখনই মৌতাতের সময় এরকম অদ্ভুত সব সংখ্যা দেখে গৌর তখনই মনে মনে সংখ্যাটাকে দশ দিয়ে ভাগ করে নেয়। হিসেব ঠিকঠাক মিলে যায়।

—পাঁচ টাকা।

লোকটা টাকা দেয়। সভয়ে একটুক্ষণ গৌরকে দেখে। দেখে, এই রুখো-শুখো হাত-পায়ের লোকটা কেমন স্থলের গাড়ি জলে ভাসায়। আবার জলের জাহাজ আকাশে ওড়ায়। লোকটাকে দেখে রাখে দেহাতী। দেশে ফিরে গল্প করবে।

দেহাতীর কাঁধে একটা ভাগলপুরী চাদর। সেই চাদরের ওপর দিয়ে গৌর এক ঝলক মেয়েটাকে দেখে নেয়। গৌরের গাড়িতে চড়ার ক্ষণকালের উত্তেজনার শেষে মেয়েটি আবার উদাস হয়ে গেছে। কলকাতার কঠিন রাস্তায় এই দারুণ রোদে নাচতে নাচতে তার পায়ে ফোস্কা পড়েছে হয়তো। কতকাল সে গেহুঁর ক্ষেতী দেখে না, পোড়া পাতার সুঘ্রাণ নেয় না বুকের বাতাস ভরে। কতকাল নিজের আনন্দে নাচে নি সে। গৌর চোখ ফিরিয়ে নেয়। গাড়ি ছেড়ে দাশ কেবিন।

গৌরের পিছনের সীটে একটা রঙীন টিপ পড়ে থাকে। বাতাসে মেয়েটার কপাল থেকে খসে পড়েছিল। আবার কোনো সওয়ারীর গায়ে সেঁটে একদিন উঠে যাবে টিপটা। গৌর টেরও পাবে না।

তিন

দালানকোঠাই করতে চেয়েছিলেন বগলাপতি। কিন্তু জবরদখল জমিতে ছাদ দেওয়া বারণ। তাই ছাদটা হয় নি। পাকা ভিতের ওপর দেয়াল উঠেছে। ওপরে টিন। ঘর দুখানা। রাখোহরির পরিবারের সঙ্গে যখন এখানে প্রথম এসেছিল গৌর তখন বাড়িটা জম্‌জম্‌ করত। ওরা চলে যেতে আবার সব নেতিয়ে পড়েছে। যাওয়ার সময়ে আলমারি, বাক্স, চেয়ার, টেবিল সবই নিয়ে গেল রাখোহরি, ভাঙা-চোরা দু'একটা আসবাব, কম দামের তক্তপোশ, ছেঁড়া বই-কাগজ, সংসারের জমে ওঠা আবর্জনা আর গৌরহরিকে ফেলে রেখে গেল। সেই থেকে গৌর ভাবে, বাড়িটা তার নিজের হয়ে গেছে বুঝি। বগলাপতির সবই দখলে নিয়েছে রাখোহরি। এই হাফ-ফিনিশ বাড়িটার ওপর দাবি-দাওয়া বোধহয় ছেড়েই দেবে। দলিল দস্তাবেজ নেড়েচেড়ে দেখেছে গৌর, একে ওকে তাকে দেখিয়েছে। না, বাড়িটা পেলে পাবে তাদের তিন ভাই। কিন্তু গৌরের আশা, অত পেয়ে রাখোহরি বোধহয় আর এটা চাইবে না। কিন্তু কেবলই একটা আশা নিরাশার ভিতরে থাকে গৌর। ঠিক বুঝতে পারে না রাখোহরি কী চাইবে আর চাইবে না। যদি চায় তো কী করবে গৌর? গদির সামনে এসে দাঁড়ায় সুন্দর রাখোহরি, যদি লড়ে, যদি চায় তো দিয়েই দিতে হবে।

একটা ঘর ফাঁকা পড়ে থাকে। সেখানে পুরোনো ব্যাটারী, পুরোনো টায়ার, গাড়ি সারানোর কিছু যন্ত্রপাতি পড়ে থাকে। অন্য ঘরটায় একখানা তক্তপোশ, দুখানা সস্তা বেতের চেয়ার, দু-একটা ট্রাঙ্ক, বাক্স, একটা ফ্যান, দু-একটা থালা-বাসন। ব্যস আর কিছু নেই। ঘর দুখানা ঘিরে কাঠা চারেক জমি। উত্তরদিকে খানিকটা নন্দীরা সীমানা-দেওয়ার সময়ে দখল করে নিয়েছে। রাখোহরি থাকলে পারত না। নন্দীবাড়ির মেয়েটা সকালে বা বিকেলের দিকে গৌর বাড়ি থাকলে এক আধদিন কুচো নিমকি দিয়ে চা দিয়ে গেছে। ডাঁটো শরীরের মেয়ে, দুবার তাকাতে ইচ্ছে হয়। তার ওপর চা নিমকি! এসব গৌরের সামনে রেখে নন্দীরা তার নাকের ডগাতেই হাতখানেক ভিতরে দেয়ালের সুতো ধরল, গৌরকে ডেকে দেখাল—দেখ তো ঠিক আছে? গৌর নিঃশব্দে মাথা নেড়ে বলল—ঠিক আছে। দেয়াল উঠে গেল। গৌরের লজ্জায় কিছু বলা হল না। তা যাকগে এক হাত জমি। গিয়েও যা আছে তা গৌরের পক্ষে অনেকই। সামনের দিকে শখ করে বাগান করেছিলেন বগলাপতি। এখন বাগান হেজে মজে আগাছার জঙ্গল। একটু উঠোনমতো জায়গায় প্রকাণ্ড জামরুল গাছ ছায়া দেয়। মাঝে মাঝে গাছটা জামরুলে ছেয়ে যায়। গাছের গায়ে কাঠপিঁপড়ের বাসা। সেইসব পিঁপড়েদের তুচ্ছ করে কচিকাঁচা জামরুল পাড়ে বাচ্চা ছেলেরা। ডাল ভাঙে, পাতা ছড়ায়। গৌর কিছু বলে না। বাগানের বেড়াটা ভেঙে গেছে কবে। গৌর সারায় নি। গরু ঢুকে আগাছা খায় মট্‌মট্‌ করে। পিছনের দিকে ঘর থেকে দূরে সেপটিক ট্যাঙ্কওলা পায়খানা আর বাথরুম, টিউবওয়েল ফিট করেছিলেন বগলাপতি। সে সবই রঙচটা, পিছল, ভাঙা হয়ে পড়ে আছে। বাথরুমে যেতে বুকসমান জঙ্গল। কচুপাতা, বিছুটি বন, ভাট আর ভাঙ গাছে ছেয়ে আছে। তার পিছনে বারোয়ারী পুকুর। অনেক রাতে পুকুরের জলে মাছ ঘাই দেয়, ব্যাঙ লাফিয়ে পড়ে। দেশ-গাঁয়ের

শব্দের মতো সব শব্দ ওঠে। পুকুরের আঁশটে গন্ধ ভেসে আসে। মশার ঝাঁক পিন্ পিন্ করে। বাগানের একধারে গৌরের গ্যারেজ। সেখানে নিশ্চিন্তে ঘুমোয় ল্যান্ডমাস্টার। গৃহস্থ যেমন মাঝরাতে গোয়াল ঘরে শব্দ পেলে কুপি জ্বালিয়ে দেখে আসে, ঠিক সেই রকম, গ্যারেজে খুটখাট শব্দ পেলে গৌর টর্চ জ্বালিয়ে বেরোয়। দেখে আসে। বগলাপতির দেওয়া সেকেন্ডহ্যান্ড ল্যান্ডুটা ছাড়া তার আর আছেটা কী?

কদিন পর পর বৃষ্টি গেছে খুব। কলকাতার রাস্তা-ঘাটে এখনো হাঁটুভর জল জমে আছে। গৌর তাই আজ সকালে গাড়ি বের করে নি। মেঘ কাটছে, রোদ উঠেছে, একটুখানি। উঠোনের মাঝখানে মাটি শুকিয়ে সাদা হচ্ছে ক্রমে। জামরুল গাছে এবার ফুল আসে নি। খুব পিঁপড়ে বাইছে। নন্দীদের পাঁচটা হাঁস পুকুর থেকে উঠে এসে গৌরের উঠোনে দাঁড়িয়ে রোদ পোয়ায়। এ ওর ঝুঁটি ধরে পিঠে চাপে। একটা মাদী হাঁস খেলতে খেলতে সামলাতে না পেরে তলতলে একটা ডিম পেড়ে ফেলে মাটিতে, একটা হাঁস সেটা কপ্‌কপ্ করে খেয়ে নেয়। জামরুল গাছের ছায়ায় একটা বেতের চেয়ার টেনে বসেছে গৌর। কলকাতার একখানা স্ট্রীট ডাইরেক্টরীই গৌরের প্রিয় বই। অবসর পেলেই সেটা নিয়ে বসে। আজও বসেছে। কলকাতার সঙ্গে জানপয়ছান এখনো তার শেষ হয় নি। করে হবে তা বলাও যায় না।

কিন্তু কিছুতেই মন বসাতে পারে না সে। রাস্তার নাম মুখস্থ করতে করতে অন্য মনে চেয়ে থাকে। হাই তুলে বইখানা কোলে ফেলে রেখে তার বাড়িখানা দেখতে থাকে।

কতটুকুই বা জমি! কীই বা ভাল ঘরখানা! তবু বগলাপতির বড় সাধের বাড়িখানা। দেশের লোকদের সাথে মিলেজুলে একদিন এইখানে থাকবেন—এরকম ইচ্ছে ছিল তাঁর। ওদিকে বড়লোকদের পাড়ায় তিনতলাখানা ছাড়তেও কষ্ট হত তাঁর। তাই এই বাড়িটা করে এক গরীব জ্ঞাতিকে বসিয়েছিলেন। কড়ার ছিল—যতদিন না বগলাপতির দরকার হয় ততদিন বিনা ভাড়ায় থাকবে। জ্ঞাতি কাকা হরিরাম সেই থেকে বসলেন বাড়িটায়। পুরুত মানুষ, খুব নিরীহ। তাঁর পাঁচ ছেলেমেয়ে, বৌ বিধবা বোন নিয়ে বিরাট সংসার। কষ্টে চলত। বড় ছেলে নিতাই ছিল ব্যাঙ্কের পিওন। কী ভাগ্যে তার বৌটা হল সুন্দরী। সেই বৌই অবশেষে ভাগ্য ফিরিয়ে দিল তার। বিকেলের দিকে সাজগোজ করে বেরোতো, একটু বেশী রাতে ফিরে আসত। আবার ঘরের বৌয়ের মতোই চলাফেরা, শ্বশুর শাশুড়ীর সামনে ঘোমটা—সব বজায় রেখে চলত সে। বিয়ের আগেকার এক ছোকরা প্রেমিক ছিল তার। সে এখনো মুখের বঁড়শি ছাড়াতে পারে নি। চলে আসত রবিবারে। হাতে মাছ, মিষ্টি, দৈয়ের হাঁড়ি, বৌটি তাকেও খুশী রাখত। চা খাওয়াত, ভাত খাওয়ার নেমন্তন্ন করত মাঝে মাঝে। সব বজায় রেখে বৌটি নিতাইয়ের অবস্থা ফেরাতে লাগল আস্তে আস্তে। টেরিলিন টেরিকটন পরতে লাগল নিতাই, সিগারেটের ব্র্যান্ড পাল্টে ফেলল। কিন্তু পাড়ায় তখন তার বৌয়ের নামে ছিছিক্কার। কত লোক যে তাকে দামী গাড়িতে চড়ে অচেনা পুরুষদের সঙ্গে যেতে দেখেছে, কত লোক লক্ষ্য করেছে রাতে ফেরার সময়ে বড় রাস্তা পর্যন্ত তাকে গাড়ি এসে পৌঁছে দেয়। তখন নিতাইয়ের বৌয়ের পা টলমল

করে, খোঁপায় ফুল গোঁজা থাকে। নিতাই সে সব শুনে ভারী বিরক্ত হয়ে বলল—রিফিউজিদের সঙ্গে থাকা যায় না। পাড়ার উঠতি মেয়েরা পাছে ঐ বৌয়ের খপ্পরে পড়ে যায় সেই ভয়ে প্রতিবেশীরা মাঝে মধ্যে চড়াও হলে নিতাই ঘর থেকে হেঁকে বলত—কেন তোমাকে সন্দেহ করে বলো তো! তুমি সত্যিই কিছু করো-টরো না তো? বৌ কেঁদে বলত—ওমা! তাই কি পারি! নিতাই বলত—আমার গা ছুঁয়ে বলো যে তুমি ওসব করো না! বৌ তখন নিতাইয়ের গা ছুঁয়ে বলত যে সে ওসব করে না। তখন নিতাই বলত—তাহলে তোমার ভয় কী? সকলের মুখের ওপর বলে দাও সেই কথা। এ সব ঘটলে কদিন নিতাইয়ের বৌ বেরোতো না। তারপর আবার একদিন সাজগোজ করত, বেরোতো, ফিরত রাত নিশুতির সময়। আবার তার বিয়ের আগের ছোকরা প্রেমিক রোববার দৈ, মিষ্টি নিয়ে আসত। বগলাপতি কানাঘুষো শুনে ডেকে পাঠালেন—এ সব কী শুনছি হরিরাম? হরিরাম ভারী তৃপ্তির হাসি হেসে বলতেন—ওরকম বৌ হয় না। লক্ষ্মীমন্ত যাকে বলে। অবস্থার উন্নতি দেখলে কবে না পাঁচজন পাঁচ কথা বলেছে? ঐ বৌ আসার পর থেকেই আমাদের উন্নতি। বিষয়ী লোক বগলাপতি উন্নতির কথা শুনে খেঁকিয়ে উঠতেন—তোমার ছেলেরা কোন লাটসাহেবী পেয়েছে যে রাতারাতি উন্নতি হয়ে গেল? ওসব বোলো না। টাকা পয়সা কোন গলিঘুঁজিতে ঘুরে বেড়ায় তা আমি জানি। আমার বাড়িতে থেকে ওসব চলবে না। হরিরাম ম্লান মুখে চলে গেলেন বটে, কিন্তু তারপরই গোলমাল শুরু করে নিতাই আর হরিরামের আরো দুই ছেলে মাধু আর সতু। মাধু সতুর চেহারা বিশাল, স্কুলের এইট ক্লাসে আটকে পড়েছে, ছুরি-চামারি দিয়ে বাল্য-জীবন শুরু করে জোয়ান বয়সে বেশ ডাকাবুকো হয়ে উঠছে। বাড়ির বৌয়ের মান-ইজ্জত রক্ষার জন্য তারাও দাঁড়িয়ে গেল। তাদের সবচেয়ে বড় স্বার্থ ছিল অবশ্য এই সাড়ে চারকাঠা জমিওলা বাড়িটা। জমি বগলাপতির বাপের নয়, জবরদখল। যে দখল করে তার। দখলের অনেক পরে সরকার নামে নামে মঞ্জুর করেছে জমি। হরিরামের ছেলেরা বলে বেড়াতে লাগল, এই জমি বাড়িতে বগলাপতি কখনও থাকেন নি, সুতরাং জমি তার নয়। জবরদখল জমিতে বসবাস না করলে স্বত্ব জন্মায় না। তারাই এতকাল যখন বসবাস করেছে তখন জমি তাদেরই। এইসব বলে তারা পাড়ার লোককেও ভজাতে লাগল। বগলাপতি জ্ঞাতিভাই হরিরামকে ঠিক তুলে দিতে চান নি। চাইলে তুলতে পারতেন। তার বদলে তিনি হরিরামকে অন্য জায়গায় জমি দেখে দিয়ে বললেন—বাড়িটা ছেড়ে দাও। হরিরাম ছাড়তে প্রস্তুত ছিলেন ছেলেরা ছাড়ল না। মাধু আর সতু তখন পাড়ার মস্তান। নিতাইয়ের পকেট বিস্তর নম্বরী নোট। তার আদুরী বৌ বাড়িতে পাকা বাথরুম তুলে ট্যাপের জলে অনেকক্ষণ গন্ধ সাবান দিয়ে স্নান করে। কাউকে গ্রাহ্য করার নেই। পাড়ার ক্লাবে মোটা চাঁদা দেওয়া আছে। রাতে না ফিরলেও কেউ প্রকাশ্যে কিছু বলে না। কয়েকটা নারকোল গাছ ছিল বাড়িতে ফি বছর শ'খানেক নারকোল বগলাপতির বাড়িতে পৌঁছে দিত হরিরাম। গোটা কুড়ি সুপুরি গাছ থেকে প্রায় পনেরো বিশ সের সুপুরি আসত। হঠাৎ সে সব দেওয়া তারা বন্ধ করে দিল। বগলাপতির চাকর পৌষপার্বণের আগে নারকোল আনতে গিয়ে গলাধাক্কা খেয়ে ফিরে এল। হরিরাম এসে একদিন হাতে পৈতে জড়িয়ে

কেঁদে পড়লেন—দাদা, আপনার জমিতে আমি পরগাছা। উঠতে চাই, কিন্তু ছেলেরা দিচ্ছে না। আপনি আমার দোষ নেবেন না। বগলাপতি শ্বাস ফেললেন। মানুষটা বিষয়ী বটে কিন্তু হৃদয়হীন ছিলেন না। ভেবেচিন্তে বললেন—আমি যদিও রিফিউজি, কিন্তু জবরদখলের জমি আমার দরকার নেই। তুমিও অভাবী লোক, সময়মতো জমি নাও নি, এখন আর যাবে কোথায়? ওখানেই থেকে যাও। কিন্তু একটা শর্ত। আমার একটা ন্যাংলা-নুলো ছেলে আছে, গোরা। ওর যদি কোনো চুলোয় যাওয়ার না থাকে তো তোমরা ওকে একখানা ঘর ছেড়ে দিও। হরিরাম উত্তর দিলেন না। জামার হাতায় চোখ মুছে বললেন—দাদা, আমরা মা-বাপ হয়েও ঐ বাড়ির কোন কোণে পড়ে আছি, তো তোমার গোরা! আমাদের দেশের বাড়িতে এ কোণে ও কোণে বেড়ালের মতো পড়ে থেকে কত জ্ঞাতি মানুষ হয়ে গেল, কত কর্মনাশা বুড়ো হয়ে দাবা তাস পাশা খেলে-খেলে জীবনটা কাটিয়ে দিয়ে মরল, কেউ ফিরেও দেখে নি। কিন্তু আমার ছেলেরা তো একান্নবর্তী পরিবার দেখেনি। বড়বৌমা যদি আজই বলে তার বুড়ো শ্বশুর- শাশুড়ীকে আলাদা করে দিতে তো নিতাই তাই দেবে। ওরা রক্তের সম্পর্ক চেনেই না। জ্ঞাতি তো দূরের কথা। কুকুর বেড়ালটা যে এঁটো-কাঁটা খায় তাও ওদের গায়ে লাগে।

বাড়িটা ঐভাবে একরকম হাত-ছাড়াই হয়ে গিয়েছিল। বগলাপতি আর উকিল-মোক্তার করেন নি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, না-হক এই জমির জন্য লড়াই করে খামোকা রক্ত জল হবে। কোর্ট তাকে ডিক্রী দিলেও উচ্ছেদ করতে পারবে না। রিফিউজিদের জমির মায়া বড় বেশী। কলোনী থেকে এতকাল বসবাসের পর কেউ উচ্ছেদ হচ্ছে জানলে সবাই রুখে দাঁড়াবে, দাঙ্গা লেগে যাবে। তিনি তা করেন নি। উপরন্তু তিনি পুরোনো কালের লোক বলে জ্ঞাতির সম্পর্ক মানতেন। হরিরাম উচ্ছেদ হবে, এটা ভাবতে তাঁর ভাল লাগত না বোধহয়।

কিন্তু সেই সময়ে ডাকাতের মতো এসে পড়ল রাখোহরি। বিষয় সম্পত্তি বুঝে নেওয়ার সময়ে সে হিসেবে নানারকম ফাঁক ফোঁকর দেখতে পাচ্ছিল। তাই নিয়ে বাপ-ব্যাটায় বখেরা লেগে যায়। বগলাপতির পদ্ধতি ছিল ভিন্ন। তিনি হাত কচলে টাকা করেছেন। কাউকে চটাতেন না। তিনি ক্ষয়ক্ষতি হাসিমুখে সামলাতেন। আবার ধৈর্য ধরে সব ক্ষয়পূরণও করতেন। মানুষকে খাতির করা ছিল তার স্বভাব। যার কাছ থেকে কাজ আদায় হওয়ার সম্ভাবনাও নেই তাকেও তিনি হাতে রাখতেন। জীবন বড় অনিশ্চিত। কখন কী হয় বলা যায় না। তাঁর সেই পদ্ধতি কার্যকরীও হত। ফুড করপোরেশনের নগণ্য একজন কেরানীকে তার বৌয়ের টিবির সময়ে খুব সাহায্য করেছিলেন বগলাপতি। সাহায্য না করলেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু দেখা গেল পাঁচ-সাত বছরের মধ্যেই কী সব পরীক্ষা দিয়ে সেই কেরানী ডেপুটি সেক্রেটারী হয়ে গেল। বগলাপতিকে সে মনে রেখেছিল। বগলাপতির এই সহজ দার্শনিকতা রাখোহরি কখনো বুঝত না। বগলাপতি যে সরকারী অফিসের পিওন বা আর্দালীরও বাড়ির কুশল নেন, দুটো মিষ্টি কথা বলেন, মাঝে মধ্যে একটা দুটো টাকা হাতে ধরিয়ে দেন—এটা তাঁর ব্যক্তিত্বের অভাব বলেই ভেবে নিল রাখোহরি। সে তাই বুড়োবয়সের বগলাপতিকে আত্মসম্মান জ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা দিতে লাগল। যাদবপুরের জমিটা নিয়ে

কথা উঠতেই বগলাপতি বললেন—ওটা ছেড়ে দাও। জবরদখল জমি, ওটা বিক্রিও করা যাবে না, আমরা থাকবোও না। হরিরাম আছে, থাক। কিন্তু রাখোহরি ছাড়ল না। সে বলল—জমির জন্য বলছি না। সাড়ে চার কাঠা জমি দিয়ে আমাদের হবেটা কী? কিন্তু ওরা যে আপনাকে অপমান করে, জমির ফসল দেয় না, আমাদের জমিতে আছে বলে যে ওদের কৃতজ্ঞতা নেই, তারে জন্য কিছু করা দরকার। বগলাপতি শঙ্কিত হয়ে বললেন—ওদের সঙ্গে লাগতে যাওয়া ঠিক হবে না রাখু। গুণ্ডা বদমাইশদের সঙ্গে লেগে ইজ্জত যাবে। রাখোহরি ফুঁসে উঠে বলে—আপনার ঐ রকম ছেড়ে-দাও ছেড়ে-দাও ভাব আমার বরাবর খারাপ লাগে। হরিকাকা থাকুন ক্ষতি নেই, কিন্তু তাঁর ছেলেরা মাথা নিচু করে থাকবে না কেন? আমি ওদের মাথাটা নুইয়ে ছেড়ে দিতে চাই। বগলাপতি তখন জিজ্ঞেস করলেন—কী করবি তুই। কী করতে চাস? রাখোহরি বলল—মামলা করব। বগলাপতি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। জবরদখলের জমি, বিক্রিবাটার স্বত্ব নেই, বসতও করবে না কেউ, ঐ নীরেস চার সাড়ে চার কাঠার জন্য মামলায় টাকা খাওয়ানোর মতো অপচয় হয় না। মামলা মোকদ্দমা বগলাপতি বরাবর এড়িয়ে গেছেন। যেখানে কিছু ছেড়ে দিলে হয়, সেখানে বরাবর বগলাপতি কিছু ছেড়েছেন। মামলা করেন নি।

কিন্তু রাখোহরি দাপের লোক। বগলাপতির সেকেলে পদ্ধতি সে মুহুর্মুহু বাতিল করে দিচ্ছিল। কিন্তু সে নির্বোধ ছিল না। সে বুঝতে পেরেছিল, মামলায় ডিক্রী পেলেও উদ্বাস্তু কলোনী থেকে কাউকে বিধিমতো উচ্ছেদ করাও শক্ত ব্যাপার। কোর্টের পেয়াদা কিংবা পুলিস গিয়েও সুবিধে করতে পারবে না। তাই সে অন্য কায়দা নিল।

সে সময়ে মাঝে মাঝেই ডজগাড়িটায় রাখোহরিকে নিয়ে বেরোতো গৌর। দু চার জায়গায় কী সব খোঁজখবর নিয়ে রাখোহরি একদিন ডজ গাড়িটা যাদবপুরের সেন্ট্রাল রোডে বিকেলের দিকে দাঁড় করাল। সিগারেট ধরিয়ে গৌরকে বলল—তুই ঘুরে-টুরে আয়, আমি একজনের জন্য অপেক্ষা করব। নেংচে নেংচে গৌর একটু দূরে গিয়ে পুকুর পাড়ে একটা সিগারেট ধরিয়েছিল। সে সময়ে দূর থেকে দেখতে পেল ভারী সুন্দর একখানা মেয়ে এসে উঠল তাদের গাড়িতে। পুরোনো আমলের গাড়ি—এখনকার মতো বড় বড় কাচ লাগানো নয়। ভিতরটা একটু অন্ধকার, জানালা দরজা ছোটো ছোটো। সেই অন্ধকারে কী যে হচ্ছিল তা বুঝতে পারল না গৌর। একটু পরেই অবশ্য গৌরকে ডেকে গাড়ি ছাড়তে বলল রাখোহরি। মেয়েটা তখন নেমে গেছে। কিন্তু আবার কদিন পর সেন্ট্রাল রোডে ডজ গাড়ি দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করল রাখোহরি। মেয়েটা আবার এল। কাছ থেকে গৌর চিনতে পারল, নিতাইয়ের বৌ। পালে পার্বণে তাদের বাড়ি অনেকবার গেছে। সেদিন আর নিতাইয়ের বৌ নেমে গেল না, ময়দানে ঘুরে ঘুরে অনেকক্ষণই হাওয়া খেল রাখোহরির সঙ্গে। কত হাসি গল্প, ঠাট্টা-ঠিসি, গায়ে গায়ে ঢলে ঢলে পড়া। বড় লজ্জা করছিল গৌরের। কথার মাঝখানে একবার রাখোহরি তার পাসপোর্ট বের করে নিতাইয়ের বৌকে দেখিয়ে বলল—দেখ, এখনো তাজা পাসপোর্ট। ইচ্ছে করলে এক্ষুনি আবার বিলেতে চলে যেতে পারি। যদি বিয়ে করি তো বৌয়েরও ভিসা পেয়ে যাবো। তখন গৌর

অল্পবুদ্ধিতেও বুঝতে পারল, বিস্তর মেম-ঘাঁটা রাখোহরি নিতাইয়ের হাফ-গেরস্ত বৌয়ের জন্য একটুও নয়, অন্য কারণে লেজে খেলাচ্ছে বৌটাকে। রাখোহরিরও ফোরসাইট ছিল। বুঝেছিল, এ মেয়েকে কেবল টাকা বা ভয় দেখালে কিছু হবে না। এমন কিছু দেখাতে হবে যা নতুন, যার মধ্যে চমক আছে। পাসপোর্ট ভিসা আর বিলেতের গল্প সেই কাজটা হয়ে গেল। বিলেতের গল্প শুনতে শুনতে ভারী নেতিয়ে পড়ত নিতাইয়ের বৌ, শ্বাস ফেলতে ভুলে যেত। রাখোহরি গল্প বলতেও জানত। গোল্ডার্স গ্রীনের শীতের রোদ, ট্রাফলগার স্কোয়ারের পায়রা, হাইড পার্কের সবুজ ঘাস, বিখ্যাত কান্ট্রিসাইডের টিলা, শৌখিন জঙ্গলে শিকার, গল্ফ লিংকে ছুটির দুপুর, উইক এন্ড সমুদ্রের ধারের একশ মজা—সব জীবন্ত হয়ে উঠত। ছুটিছাটায় প্যারিস, মোমবাতির আলোয় ডিনার আর নাচ। সুইজারল্যান্ডের পাহাড়ী হ্রদের ধারে চেরী আর আপেলের ক্ষেত, ইটালীর জলপাইরঙের মানুষ দেখে বেড়ানো। কলকাতার দয়ে পড়ে থাকা নিতাইয়ের বৌয়ের বুকের ভিতরে ঝড় তুলে দিল রাখোহরি। আর সামনের সীটে বসে গাড়ি চালাতে চালাতে গৌর ঐ সব গল্প শুনতে শুনতে কলকাতার কথা ভুলে গিয়ে উইন্ডস্ক্রীন জুড়ে কেবল বিদেশী রাস্তা দৃশ্য দেখত।

রাখোহরির কয়েকটা পোষা ভূত আছে। সেই ভূতগুলোকে সে মানুষের মাথায় ঢুকিয়ে দিত। নিতাইয়ের বৌটা কয়েকদিনের মধ্যেই ভূতে পাওয়া মানুষ হয়ে গেল। রাখোহরি গৌরকে কোনোদিন পুরো মানুষ বলে ভাবে নি। তাই তার সামনেই ভূত ঢোকানোর খেলা খেলত। একদিন ময়দানের ধার ঘেঁষে গাড়ি যাচ্ছে, বসন্তকাল, হাওয়া-টাওয়াও ভালই দিচ্ছিল, দু চারবার কোকিলও ডাকল নিয়মমতো—সে সময়ে গৌরের গায়ে রোঁয়া দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ, সে শুনতে পেল, রাখোহরি নিতাইয়ের বৌকে বলছে—চলো আমাদের বিয়েটা সেরে ফেলি।

—সে কী? তা কী করে হবে? বৌটা বলে অবাক হয়ে।

রাখোহরি হাসে—আইনে আটকায় জানি। কিন্তু এখন ডাইভোর্স করতে গেলে অনেক ঝামেলা। আর তার দরকারই বা কী? আমরা যদি বিলেতে পালিয়ে যাই নিতাইয়ের সাধ্য নেই অত দূরের পাল্লায় কিছু করে। কিন্তু পালিয়ে যেতে হলেও পাসপোর্ট ভিসা তো চাই। তাতে ম্যারেজ সার্টিফিকেটটা দরকার। তাই বলছিলাম। একটা রেজিস্ট্রী করে আমি তোমাকে বৌ বলে পরিচয় দিয়ে পাসপোর্ট ভিসার দরখাস্ত দাখিল করি। বৌয়ের জন্য ভিসা পেতে বড়জোর দিন কুড়ি লাগে—তারপর—

বৌটা শ্বাস ফেলতে ভুলে গেছে তখন। ডজ গাড়ির আয়নায় গৌর দেখে, নিতাইয়ের বৌয়ের ঠোঁট কাঁপছে, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, ফুলে ফুলে উঠছে নাকের পাটা। তারপর আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে পড়ল বৌটা। মিনমিন করে জিজ্ঞেস করল—কবে?

সাড়ে চারকাঠা জমির জন্য বিস্তর ভূতের খেলা দেখাল রাখোহরি। সেই থেকেই গৌর জানে রাখোহরির মতো লড়াকু হয় না। ভাবলে আজও গৌরের গায়ে রোঁয়া দাঁড়িয়ে যায়।

পাসপোর্ট ভিসা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর একদিন সকালে নিতাই এসে রাখোহরিকে

ধরল—দাদা, এ কী শুনছি ?

—কী শুনেছো ?

—সে যে বড় পাপকথা ! এ সব করবেন না, ভাল হবে না। আমি পুলিসে খবর দেবো।

—দাও। উদাসভাবে হাই তুলে রাখোহরি বলে।

—এ সব করবেন না। আবার বলে নিতাই। কিন্তু তার গলার স্বর এক পর্দা নেমে গেছে তখন। সুন্দর চেহারার রাখোহরির মুখে সর্বদা যে নিষ্ঠুরতা এবং আত্মবিশ্বাস ফুটে থাকত তার সামনে অনেকেই দাঁড়াতে পারত না। নিতাই জানত, বৌ গেলে সে আটকাতে পারবে না। অথচ তার দুধেল গাই। তারই ওপর খেয়ে পরে আছে তারা, টেরিলিন টেরিকটন পরছে, সিগারেটের ব্র্যাণ্ড পাল্টেছে। বৌয়ের কাজকর্মে পাছে বাধা হয় সেই ভয়ে বাচ্চা কাচ্চা হতে দেয় নি। এখনো কেমন আঁট গড়নের লম্বা ছিপছিপে মেয়েটি রয়ে গেছে বৌ। পুরুষদের বাতাসে ভাসিয়ে রাখে। কিন্তু হঠাৎ এ কী ? এমনটা তো কখনো ভাবে নি নিতাই !

রাখোহরি কঠিন মুখ করে বলল—কী আর খারাপ কাজটা করছি ! একটা মেয়েকে নষ্ট করছ তোমরা। আমি তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি। তাকে সত্যিকারের ঘরসংসার দেবো।

—ও সব ব্লাফ। আপনি ওকে নিয়ে গিয়ে বাজারে ছেড়ে দেবেন। আমি জানি।

—জানো যদি তো ওকে সেটা বুঝিয়ে দাও না কেন ?

কিন্তু নিতাই যে তা অনেক বুঝিয়েছে, এবং বৌ বুঝতে চায় নি, তা তার মুখ দেখেই বোঝা গেল। হঠাৎ হম্বিতম্বি ছেড়ে নিতাই রাখোহরির পা চেপে ধরল—দাদা, দয়া করুন।

রাখোহরি তখন তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল।

কদিন পর জমির মামলা দায়ের হলে নিতাই রাখোহরির পক্ষে সাক্ষী দেয়। পাড়ার লোকদেরও সে-ই বোঝায়। উচ্ছেদের নোটিস পড়ার আগেই তারা বাড়ি ছেড়ে কসবার দিকে উঠে গেল। একটা শ্বাস ছেড়ে আর একটু বুড়ো হয়ে গেলেন বগলাপতি। রাখোহরি বাড়ির প্লাস্টার ফেলে নতুন সিমেণ্ট লাগিয়ে রঙ করে নিল। তারপরই বিয়ে করে রাখোহরি অন্য কাজে মন দেয়। বাড়িটা ভাড়া দেয় এক বুড়ো ব্যাচেলারকে।

এই সেই বাড়ি। দুখানা টিনের ঘর, সাড়ে চার কাঠা জমি। তেমন কিছুই না। তবু গৌর মনে মনে আজও বাহবা দেয় রাখোহরিকে। বগলুর ফোরসাইট ছিল, রাখোহরিরও ছিল। রাখোহরির পোষা ভূতগুলোই যেন তাকে জানিয়ে দিয়েছিল যে বালীগঞ্জের বাড়ি একদিন মর্টগেজে যাবে ! তাই আগে থেকেই খালাস করে রেখেছিল এই বাড়িখানা। বুড়ো ব্যাচেলার ভাড়াটে বসিয়েছিল, যাতে তুলে দিতে কষ্ট না হয়। বাড়িখানা কাজে লেগেছিল বটে। আবার কাজ ফুরালে রাখোহরি উঠে গেছে বালীগঞ্জে। জঙ্গুলে, লক্ষ্মীছাড়া বাড়িটাতে একা পড়ে আছে গৌর ! মাঝে মাঝে সে ভাবে, বোধহয় বাড়িখানা তারই হয়ে গেল, রাখোহরি স্বত্ব ছেড়েই দিল বোধহয়। কিন্তু ঠিক বিশ্বাস হয় না। রাখোহরির পোষা ভূতগুলোর কথা মনে পড়তেই

আজও রোঁয়া দাঁড়িয়ে যায় গায়ে। কোন কায়দায় যে রাখোহরি কাকে উচ্ছেদ করবে বলা যায় না। এইসব ভেবে গৌরের কেবলই মনে হয়, এই দুনিয়াতে একটা জীবন সে পরের ঘরে বাস করে যাচ্ছে। কোথাও তার নিজের ঘর নেই। পাখিদের মতো মানুষের পালক নেই যে উড়ে গেলেও দু-একটা পালক পড়ে থাকবে। কিন্তু গৌরের মনে হয়, পালক নয়, কিন্তু পালকের মতোই হাল্কা মিহি নরম কী যেন সব পড়ে আছে বাড়িটাতে। হাওয়া দিলে সেগুলো উড়ে উড়ে বেড়ায়। চোখে দেখা যায় না, কিন্তু গৌর ঠিক টের পায়। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে এক একদিন দেখে, জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে বিছানা ভাসিয়ে দিচ্ছে। সেই জ্যোৎস্নার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলে হঠাৎ দেখতে পায়, হাল্কা কুয়াশার মতো কী যেন ভেসে আছে। ঘুরছে ফিরছে, উঠছে নেমে আসছে। এ সব কী তা সঠিক জানে না গৌর, তবে তার মনে হয়, এ সব হচ্ছে মানুষের অদৃশ্য পালক। যেইখানে কিছুদিন বাস করে মানুষ সেইখানে তার কথার স্বর বাতাসে থেকে যায়, থাকে কামনা বাসনার ছাপ, ইচ্ছা অনিচ্ছা থেকে যায়। সে সবই হালকা মিহিন পালকের মতো ঘোরে ফেরে, বাতাসে ভেসে বেড়ায়। ইঁট কাঠ মেঝের ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য গাছের মতো শিকড় দিয়ে আঁকড়ে থাকে। তাড়ানো যায় না। হরিরাম কাকা, নিতাই, তার বৌ, মাধু, সতু, সেই বুড়ো ব্যাচেলার ভদ্র লোক, রাখোহরির ছেলে বৌ, সকলেরই পালক পড়ে আছে। সেইসব পালক গৌরের শ্বাসের সঙ্গে বুকে ঢুকে যায়, চোখে আঁশের মতো জড়ায়। প্রজাপতির মতো কাঁধে বা মাথায় বসে ডানা কাঁপায়।

দুনিয়াভর ভূতের খেলা চলেছে। সবাই দেখে না। গৌর দেখে। এই যে এখন দিন দুপুরে জামরুল গাছের ছায়ায় চেয়ার টেনে বসে আছে গৌর, তার চারদিকে অফুরান রোদ, এর ভিতরেও সেইসব পালকেরা উড়ে উড়ে ঘুরছে। দেখা যায় না, কিন্তু টের পাওয়া যায়। হালকা, মিহি। জ্যোৎস্নার মতো, সুখের স্বপ্নের মতো পল্কা জিনিস দিয়ে তৈরি। চারদিকে এইসব মানুষের পালক উড়ছে. টের পায় গৌর। তার হাই ওঠে। কেবলই মনে হয়, পৃথিবীতে তার নিজের বলতে কিছু নেই আর। বগলাপতি যা রেখে গিয়েছিলেন তার কিছু নিল রাখোহরি, আর যা আছে তা ভূতের কব্জায়। আরও আছে রাখোহরির ভূত। কখন যে সে কাকে উচ্ছেদ করে তার কিছু ঠিক নেই।

বেলা ন-টায় চড়া রোদ উঠে গেছে। পিঁপড়ের সারি নেমে আসছে গাছ বেয়ে। সকালটা বড় সুন্দর। গৌর গুনগুন করে একটা ইংরিজি প্রার্থনা সংগীত গাইতে থাকে। ফাদার ইভান্স গাইতেন প্রার্থনার গান। সেন্ট অ্যান্টনিজের প্রকাণ্ড হলঘরে পিয়ানোর ঢাকনার ছায়ায় ফাদার ইভান্সের মগ্ন মুখখানা চোখে পড়ে। বুড়ো মানুষ, বড় নরম মুখখানা তার। ধর্মসংগীত ছিল তার প্রাণ। যীশুর ক্রুশবহনের দিনে তিনি বিষাদসংগীত গাইতে গাইতে কাঁদতেন। যীশুর পুনরুত্থানের দিন তার গলায় রৌদ্র ঝিলমিল করত। হুল্লোড়বাজ অত ছেলের মধ্যে কোন ছেলেটার মুখে আনন্দ নেই, মনে নেই সুখ তা ঠিক খুঁজে বের করতে পারতেন ফাদার ইভান্স। ভিড় ঠেলে পথ করে আসতেন তার কাছে, কাঁধে হাত রাখতেন, গল্প বলতেন। টাইফয়েডের ঘোরলাগা অবস্থায় কতদিন গৌর দেখেছে শিয়রের কাছে বুড়ো-সুড়ো

boiRboi.net

সান্তা ক্লসের মতো ফাদার ইভান্স বসে আছেন। বাদামী দাড়ির ভিতরে হাসি, ঘন ভুরুর নিচে স্বচ্ছ জলের মতো চোখ। সেই জলের নিচে কৌতুক খেলা করে মাছের মতো। বাগানের গোলাপ কাঁটায় সুন্দর একটা জামা একবার ছিঁড়ে ফেলেছিল গৌর। তার কান্না দেখে ফাদার ইভান্স—'অ্যাও, কাঁডে টো মেয়েরা। টুমি মেয়ে নাকি?' বলে তার জামা খুলে নিপুণ হাতে রিপু করে দিয়েছিলেন। তারপরও বহুকাল জামাটা পরেছে গৌর।

খুব বুড়ো হয়েছিলেন ফাদার ইভান্স। তাই একদিন মারা গেলেন। অল্প অল্প বৃষ্টি ছিল সেদিন। ছায়াচ্ছন্ন দিন। ইভান্সের দেহ বহন করে আনল বাহক বন্ধুরা। কালো পোষাক, গম্ভীর মুখ সকলের। শব-বহনকারী গাড়ির পিছনে সেণ্ট অ্যাণ্ট-নিজের ছাত্রদের বিরাট সারি। নিঃশব্দে তারা ধীরগতি গাড়ির পিছনে পিছনে হাঁটছিল। তাদের সঙ্গে হাঁটছিলেন ফাদারেরা। সাহেবরা কাঁদে না। গৌরের পাশেই ছিলেন ফাদার ফ্রান্সিস। সে অনেকবার মুখ তুলে ফাদারের মুখখানা দেখল—গম্ভীর মুখ, কিন্তু কান্নার চিহ্ন নেই। কাঁদতে কাঁদতে গৌরের বুকে ব্যথা হয়ে গিয়েছিল সেদিন। ছিট ছিট বৃষ্টির জল ধুয়ে দিচ্ছিল তার মুখ। ফাদার ফ্রান্সিস তার হাত ধরে রাখলেন। কবরখানায় যখন ফাদারের দেহ রাখা হল গর্তে, ঝুরঝুরে মাটি চাপা পড়তে লাগল কফিনে, তখনো ফাদারেরা কেউ কাঁদে নি। সাহেবরা কাঁদে না—গৌরের মনে হয়েছিল। যখন গর্তটা প্রায় ভরাট হয়ে এসেছে, ছাত্ররা এগিয়ে গিয়ে মুঠো মুঠো মাটি দিচ্ছে কবরে, তখন গৌর হঠাৎ দেখে, একটা ভয়-পাওয়া ছোট্ট ব্যাঙ লাফিয়ে পড়েছে কবরে। বেরোবার পথ পাচ্ছে না। চারদিকে ভিড়। মাটির চাপ এসে পড়ছে তার ওপরে, সে প্রাণপণে লাফ দেওয়ার চেষ্টা করছে, সরে যাচ্ছে এদিক ওদিক, কিন্তু তবু চতুর্দিক থেকে মাটির ঢেলা এসে পড়ছে। ব্যাঙটা প্রায় চাপা পড়ে-পড়ে। সেইসময়ে গৌর দেখল, ফাদার ফ্রান্সিস হাঁটু গেড়ে বসলেন কবরের ধারে, দুহাত বাড়িয়ে ব্যাঙটাকে ধরবার চেষ্টা করতে লাগলেন। দীর্ঘকায় ফাদারের শরীরটা নুয়ে আছে ফাদার ইভান্সের কবরের ওপর, চারদিক থেকে মাটির চাপড়া এসে পড়ছে তাঁর বাড়ানো দুই হাতে, মেঘের ঘন ছায়ায় ফাদার ফ্রান্সিসের মায়াময় মুখখানা কী গভীর বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল! আজও গৌরের মনের মধ্যে ঐ ছবিটা রয়ে গেছে—ফাদার ফ্রান্সিস কুঁজো হয়ে কবরের ভিতরে একটা বিপন্ন ব্যাঙকে তুলে আনার চেষ্টা করছেন গভীর মমতায়। সেই সময়ে নতমুখ ফাদারের চোখ থেকে অবিরল জল ঝরে পড়ছিল। তাঁর অঞ্জলিবদ্ধ দুই হাতের তেলোয় ছোট একটা তুচ্ছ ব্যাঙ প্রাণভয়ে বসে আছে। গৌর দেখেছে।

ফাদার ইভান্সের শেখানো ধর্মসংগীত গুনগুন করে গাইতে গাইতে গৌর ওঠে। কতকাল ধরে মানুষ কত পালক ফেলে গেছে পৃথিবীতে। শিমুল তুলোর মতো ওড়াউড়ি করে সব পালকেরা। গৌর আপনমনে হাসে। ধর্মসংগীত গায়।

উকো দিয়ে গভীর মনোযোগে একটা পিস্টন রিং ঘষছিল গৌর। এখনো তার ঠোঁটে ধর্মসংগীত। সেই সময়ে নন্দীদের বাড়ির মেয়েটা এক কাপ চা নিয়ে এল। সঙ্গে দুখানা বিস্কুট।

—কী খবর? গৌর আলগাভাবে জিজ্ঞেস করে। মেয়েটার গড়ন বেশ। বয়স-

কালের লক্‌লকে ভাব শরীরে ফুটে আছে। পিছল চামড়া। তেমন সুন্দর কিছু নয়। তবু চোখের দীর্ঘ পাতায় একটা শীতলতা আছে। তাকিয়ে থাকলে জিরোতে ইচ্ছে করে।

চা দিয়েই মেয়েটা চলে গেল না। বলল—গৌরদা, আজ বেরোবেন না?

—বেরোবো।

—কখন?

—এই তো। বেরোলেই হয়।

—আমি আর মা একটু কালীঘাট যাবো। নিয়ে যাবেন?

চায়ে চুমুক দিয়ে গৌর মনে মনে একটু হাসে। বলে—কালীঘাটে গিয়ে কী হবে?

মেয়েটা বলে—মা পুজো দেবে। মানত আছে।

—ও। আচ্ছা, নিয়ে যাবো।

মেয়েটা ঘুরে ঘুরে ঘরখানা দেখে। তারপর হঠাৎ গৌরের দিকে ফিরে বলে—জিজ্ঞেস করলেন না কিসের মানত?

—কিসের?

মেয়েটা আঁচল তুলে মুখে চাপা দিয়ে হাসে। তারপর আঁচল সরিয়ে মুখখানা থম্‌থমে করে বলে—আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে তো, তাই।

—ও। তা কোথায় ঠিক হল?

মেয়েটা থম্‌থমে মুখেই বলে—সব কি বলতে আছে?

—কেন, বলতে নেই কেন?

—ভাঙচি দেন যদি!

—ভাঙচি দেবো? কেন?

—অনেকে তো দেয়।

গৌর ঠিক বুঝতে পারে না। ফাদার ইভান্সের ধর্মসংগীতের মধ্যে ডুবে ছিল সে, দুনিয়াময় মানুষের ফেলে যাওয়া পালক দেখছিল। সেই ডুবজল থেকে মুখ তুলে হঠাৎ পৃথিবীর ওপরকার সব কথাবার্তা, সম্পর্ক কিংবা ঘটনা বুঝতে তার একটু কষ্ট হয়। মেয়েটার মুখেচোখে রহস্য ফুটে আছে। চোখে সজল বিদ্যুৎ, ঠোঁটে টেপা নিষ্ঠুর হাসি। মেয়েটা হঠাৎ পাল্টে গেল যেন এইমাত্র। গৌর তা লক্ষ্য করে। কথাটা ঠাট্টা ভেবে সে একটু হাসে। বলে—ভাঙচি দেবো না।

এই মেয়েটাকে দিয়েই চা আর কুচো নিমকি পাঠিয়ে গৌরের একহাত জমি এনক্রোচ করেছিল নন্দীরা। গৌরের সেইকথা মনে পড়তে একটু হাসল। মেয়েটা কি তা জানত? ঠিক বোঝা যায় না। হয়তো মেয়েটা জানত, হয়তো জানত না। এই জমির জন্য লড়াকু রাখোহরি কত কী করেছিল, আর গৌর কুচো নিমকি চিবিয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে একটা বয়সকালের মেয়ের দিকে কয়েকপলক তাকানোর সুযোগ পেয়ে সেই দুর্লভ জমির একহাত ছেড়ে দিয়েছে। এক হাত বাই চল্লিশ হাত—কত হয়? একটু ভাববার চেষ্টা করল গৌর। তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইল। সতেজ গাছের মতো ডালপালা সমেত মেয়েটা। গৌরের—ফিফটি পার্সেন্ট হাফ-

ফিনিস—বগলুর তিন নম্বরের ল্যান্ডমাস্টারে চড়েই হয়তো একদিন এর বর আসবে।

মেয়েটা কী যেন বলবে-বলবে করে। বলে না। পিস্টন রিংটা হাতে ধরে থেকেই গৌর চেয়ে থাকে।

মেয়েটা একটু দম ধরে থেকে হঠাৎ চোখ বুজে বলে—আপনি আমার বিয়েতে ভাঙচি দিলে আমি খুশী হতাম।

—অ্যাঁ! গৌর ভারী অবাক হয়।

কিন্তু মেয়েটা দাঁড়ায় না। কথাটা বলেই বাতাসে ভেসে তর তর করে চলে যায়।

যেইখানে মেয়েটা দাঁড়িয়েছিল সেই শূন্য জায়গাটায় অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে গৌর। ঠিক বুঝতে পারে না কথাটা। কিন্তু বুঝবার চেষ্টা করে খুব। পিস্টন রিং আর উকোটা রেখে দেয় গৌর। জানালার ওপর একটা নিমডাল ঝুঁকে পড়েছে। নতুন বর্ষায় পাতা এসেছে তার। সতেজ পাতা। তাতে রোদ পড়ে সবুজ আলো দিচ্ছে চারধারে। পোকামাকড়ের আনন্দের শব্দ ওঠে চারদিকে। একটা কেন্নো জানালার শিক বাইছে। গৌর জানালায় দাঁড়িয়ে এইসব দেখে আর দেখে। সতেজ নিমগাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে ঐ দূরের মেঘহীন আকাশ দেখা যায়। ঐখানে ফাদার ফ্রান্সিস থাকেন, আর ফাদার ইভান্স। স্বপ্নের শিশুরা। লাল নীল বল। চারদিকে ওড়াউড়ি করে মানুষের ফেলে যাওয়া পালক। গৌর চেয়ে থাকে। মেয়েটার কথাটা বুঝবার চেষ্টা করে।

হাতের তেলকালি ঝাড়নে মুছে গৌর তার শোওয়ার ঘরে আসে। পেরেকে ঝোলানো হাত-আয়নাটা পেড়ে নেয়। মুখ দেখে। চোয়াড়ে একখানা মুখ। রুখো-শুখো দুখানা হাত-পা। স্থাবর অস্থাবর কিছুই নেই গৌরহরির। যা আছে সবই ভূতের কবজায়। রাখোহরি চোয়ালে থাপ্পড় মেরে কেড়ে নিতে চায় যদি, গৌর ঠেকাতে পারবে না। ভূতের খেলায় রাখোহরি বড় ওস্তাদ। মাথাটা এক বেহদ্দ নাচুনে মাগীর নাটমঞ্চ। গৌর নিজের মুখের দিকে চেয়ে থাকে আয়নায়। তবু সে বিয়েতে ভাঙচি দিলে মেয়েটা খুশী হয়! আরে বাঃ। এর অর্থ কী? মানে কী?

জানালা দিয়ে মেঘভাঙা রোদ এসে পড়েছে। চারদিক আলোয় আলোময়। এমন দিনে কিছুই অস্বচ্ছ থাকে না। গৌর ভাবে, এমন সুন্দর দিন বহুকাল দেখে নি সে। কিন্তু কী বলল মেয়েটা? গৌর ভাঙচি দিলেই খুশী হয়? না কি যে কেউ ভাঙচি দিলেই খুশী হয়। কোন কথাটার ওপর জোর দিল মেয়েটা—'আপনি' না 'ভাঙচি'? ঠিকঠাক বুঝতে পারে না সে। কিন্তু ভাবে। চারদিক থেকে মেঘভাঙা রোদ এসে তাকে ঘিরে ধরে। চড়াই পাখিরা উড়ে আসে ঘরে। আসে এক আধটা মৌমাছি, ফড়িং। পিঁপড়েরা দেয়ালে বায়, কেন্নো আসে, সবুজ পোকা একটা জানালার শিকে বেয়ে বেয়ে ওঠে। ভেজা জঙ্গলে রোদ পড়ে একটা বুনো মিষ্টি গন্ধ ছড়াতে থাকে।

বেলা সোয়া দশটা নাগাদ গৌর বুঝতে পারে, মেয়েটা তাকে ভালবাসে। কী করে বাসল, কবে বাসল তা ভেবে দেখতে আরো সময় লাগবে। কত সময় তা ঠিক জানে না গৌর। হয়তো একটা জীবনের সময় লেগে যাবে। তা লাগুক। একটা লম্বা

boiRboi.net

জীবন এখনো পড়ে আছে গৌরের। সেই একা নিঃসঙ্গ জীবনের জন্য কিছু কিছু সুন্দর প্রবলেম থেকে যাক। গৌর অবরে-সবরে বসে ভাববে।

দরজায় চাবি দিয়ে গৌর বেরোয়। গাড়ি বের করে হর্ন দিতে থাকে। হর্নটা আজ অন্যরকমের আওয়াজ ছাড়ে। ভোরবেলার অস্বচ্ছ আলো দেখে আনন্দে বিস্ময়ে মুর্গী যেমন ডাকে।

চার

বিয়ের দিন দমদম থেকে বর আনল গৌরহরিই। বৌবাজার থেকে ফুলের মালায় সাজিয়ে নিয়েছিল গাড়ি। সেই ফুলের গন্ধ গাড়ির ভিতরকার চৌকো বাতাসটা টৈ-টুম্বুর হয়ে রইল। বেশ লাগছিল গৌরের।

সন্ধে লগ্নে বিয়ে হয়ে গেল। আসরে উঁকি মেরে গৌর একবার মেয়েটাকে দেখে নিল। চন্দনে, সিঁথিমৌরে, গয়নায়, বেনারসীতে, ফুলে মেয়েটাকে চেনাই যায় না। মাইকে সানাই বাজছিল বুক খালি করে দিয়ে।

শেষ ব্যাচে খেয়ে গৌরকে বারকয়েক ট্রিপ দিতে হল আত্মীয়-স্বজনদের যে যার ডেরায় পেঁছে দিতে। দু খিলি পান গ্লাভস চেম্বারে রেখে দিয়েছিল। শেষ ট্রিপটা মেরে ফেরার পথে লেকে জলের ধার ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করিয়ে পান মুখে দিয়ে সিগারেট ধরাল গৌর। জলে আলো ভাঙছে। নানারকম আলো। জোর বাতাসে জলের গন্ধ আসে। শব্দ আসে। ফুলের মালাগুলি বাতাসে শুকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শুকোবার আগে শেষ তীব্র সুবাস ছড়িয়ে দিচ্ছে। গাড়ির ভিতরে সেই গন্ধ ভার হয়ে থাকে গৌরের বুকে। এক একটা ঝিমুনি চমকে আবার জেগে যায়।

কী বলেছিল মেয়েটা? কী যেন! আপনি আমার বিয়ের ভাঙচি দিলে খুশী হতাম। আরে বাঃ! গৌর ঘুম-ঘুম চোখে ভাবে। কথা কটা নেশারু ওম এনে দেয় চারধারে। এমন স্বার্থহীন ভালবাসার কথা তাকে কেউ কখনো বলে নি। মেয়েটার যে বর জুটছিল না এমন নয়। চা আর কুচো নিমকি দিয়ে এক হাত বাই চল্লিশ হাত জমিও তারা পেয়ে গেছে। তবে আর ঐ কথা বলার কী স্বার্থ ছিল তার? না কি ঠাট্টা করেছিল? তাও নয়, গৌর একা একা মাথা নাড়ে। কথাটা কুচো নিমকি আর চা-তে অনেক দূরে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, এক হাত বাই চল্লিশ হাত জমির স্বার্থত্যাগও তার কাছে লাগে না। বিয়ের চিত্রিত পিঁড়ির দিকে এক পা বাড়িয়েও কীরকম দীর্ঘশ্বাস তার! সে তো কখনো কিছু বলে নি গৌরকে আগে! বললেও লাভ ছিল না অবিশ্যি! হাফ-ফিনিশ গৌরের মূর্তিখানা পুরো গড়া হয় নি যে। তার অর্ধেক দুনিয়া ভূতের কবজায়, বাকী অর্ধেক সে এক দুলদুলে মিহিন বোঁটায় দুলছে। কখন ছিঁড়ে পড়ে কে জানে! মেয়েটা সবই জানত। তবু ঐ কথাটা বলে চিরকালের মতো চলে গেল।

চলে গেল বলে অবশ্য গৌরের কোনো ক্ষতি নেই। মেয়েটার জন্য তার দুঃখ হয় না। বরং যতবার সেই কথাটা মনে হয় ততবার আনন্দে গৌরের গা কেমন করে। ঐ কথাটুকুর মধ্যেই রয়ে গেল গৌরের মুখে চন্দনের ফোঁটা, গলায় মালা, মাথায় টোপর। গৌরের আর কী চাই! জীবনে এরকম অনেক রহস্য থেকে যায়, যার সমাধান

মানুষ চায় না। ওরকম দু'একটা রহস্য থেকে যাক। বাংলাদেশে ঝড়তি পড়তি মেয়ের অভাব নেই। গৌরের আছে চালু ল্যাণ্ডমাস্টার, সাড়ে চারকাঠা জমি, এখনো দুখানা ভাল হাত-পা রয়েছে তার। এর জোরে গলা বাড়ালে কেউ কেউ এখনো মালা দেয়। কিন্তু অমন স্বার্থহীন কথা কেউ শোনাতে পারে না।

এক গভীর আত্মপ্রসাদে, আনন্দে তার মনের আনাচে-কানাচে আলো এসে পড়ে। বাতাস বয়। দুটো রুখো-শুখো হাত-পা, মাথায় নাচের শব্দ, হাফ-ফিনিশ গৌর তার ভুতুড়ে ল্যাণ্ডমাস্টারের সীটে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে লেকের বাতাসে কখন ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে নানারকম সুন্দর স্বপ্ন দেখে সে।

পরদিন আবার কলকাতার সোয়ারী এধার ওধার করতে বেরোয় গৌর।

কলকাতার সোয়ারীরা 'ট্যাক্সি-ট্যাক্সি' বলে ডাকে। গৌরের গাড়ি থামে। মিটার ঘোরে। সোয়ারী খালাস হয় আবার। তখন গৌর মাঝে মাঝে আয়নাটা মেপে-জুখে ঘুরিয়ে রাখে। পিছনের ফাঁকা সীটখানা দেখা যায়। সেই সীটে মাঝে মাঝে নন্দীদের মেয়েটাকে বসে থাকতে দেখে গৌর। তার কল্পনায় মেয়েটা আরো সুন্দর হয়। ক্রমে ক্রমে আরো সুন্দর হয়ে উঠতে থাকে। চোখে চোখ পড়ে। কেউ চোখ সরায় না। গৌর বিড়বিড় করে বলে—আরো সুন্দর হও, আরো আরো সুন্দর। মেয়েটা সুন্দর হতে থাকে। তার বাদামী চামড়ায় দুর্লভ গোলাপী রঙ ফুটে ওঠে, চোখের তারা হয়ে যায় আকাশী নীল, চুলে ভোরের আলোর সোনালী আভা এসে লাগে, ঠোঁট তরমুজের মতো লাল। আবার তার চেহারা পাল্টে ফেলে গৌর। গায়ের চামড়া বাদামী, চুলে মধুর মতো রঙ, চোখ সমুদ্রের মতো সবুজ······

ডেডবডিটা মাঝে মাঝে মচ্ করে নড়ে ওঠে। গৌর ধমক দিয়ে বলে—চোপ্। নো ইণ্টারফিয়ারেন্স ইন লাভ···নো ইণ্টারফিয়ারেন্স···বলতে বলতে গৌর হাসে। তার মনে হয়, লম্বা সুতো ছেড়ে যেমন উল-এর বল গড়িয়ে যায় তেমনি নন্দীদের মেয়েটার সেই কথাটা গড়িয়ে আসছে। আসছে তো আসছেই। যতদূর যাবে গৌরহরি—বগলুর ব্যাটা—ততদূর যাবে। সেই সুতোর একপ্রান্তে বসে মেয়েটা বুনে যাচ্ছে একখানা সোয়েটার। সেই সোয়েটারের ডিজাইনের পরতে পরতে গৌরহরির নাম লেখা হয়ে যাচ্ছে।

সোয়ারীরা মুখ বাড়ায় জানালায়।

—কোথায় যাবেন? গৌরহরি জিজ্ঞেস করে।

সোয়ারীরা কত নাম বলে! চৌরাটবাজার, হাটখোলা, মুর্গীহাটা, হাওড়া। সেইসব নাম লোহার পাতের মতো গৌরের চারধারে একখানা শক্ত জাল বুনতে থাকে। ছেলেবেলায় সার্কাসে গৌর মৃত্যুকূপের যে খেলা দেখেছিল, তাতেও ছিল ঐরকম মজবুত একখানা জাল। ভিতরে দুখানা মোটর সাইকেল গোঁ গোঁ করে ঘুরত ফিরত, ল্যাণ্ড-মাস্টার তেমনি কলকাতার চারধারে জালে আটকে ঘোরে ফেরে। বাইরে যায় না।

বিকেলের দিকে মৌতাত জমে ওঠে ঠিক। সেইসময়ে কলকাতার রাস্তাঘাট মুছে গিয়ে কে যেন খাল নদী নালা কেটে রেখে যায়। কোথা থেকে জলধারা এসে কুল-কুল করে বইতে থাকে। স্টীমলঞ্চ যায় আসে। বয়ার ওপরে দাঁড়িয়ে টালমাটাল

জল-পুলিশ ট্রাফিক সামলায়। ঢাকার কামান দূর থেকে রঙীন গোলা ছুঁড়ে মারে। তখন ফাদার ফ্রান্সিস তার স্বপ্ন-শিশুদের নিয়ে মাটির কাছাকাছি চলে আসেন। গৌরহরির দিকে ছুঁড়ে দেন সেই বল—ফ্যাস্…ফ্যাস্ দি বল গৌর—গৌর হাত বাড়ায়। ধরতে পারে না। ফাদার হেসে কুটিপাটি হন। মাঝে মাঝে গাভীর ডাক শোনে সে। ট্রাফিক পুলিস কৃষ্ণের মতো দাঁড়ায়, হাতে আড়বাঁশি, পা দুখানা ক্রস করা! সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ের মোড়ে আটক গাড়িগুলো তখন গাভী হয়ে ডাকতে থাকে।

সন্ধে হয়ে আসে। কলকাতার অন্ধকারে নিওন সাইন দপাদপিয়ে জ্বলে ওঠে। ভারী অবাক হয়ে গৌর দেখে সেইসব নিওন সাইনে নন্দীদের মেয়েটার সেই কথা কটা জ্বলে জ্বলে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে। গঙ্গার হাওয়া দেয়। সেই বাতাসে ফিসফাস ভেসে আসে সেই কথা। কলকাতার রাস্তায় একা বকুলগাছ যখন অন্ধকারে তার বকুল ঝরায় তখন সেই পতনশীল বকুলের শব্দে গন্ধে সেই কথা জীবন্ত হয়ে ওঠে।

সময় বয়ে যায়। অনেক সময় বয়ে যায়। তবু সেই উলের বল গড়িয়েই আসে। দীর্ঘ সুতো পড়ে থাকে। যতদূর যায় গৌর—ততদূর গড়ায় উলের বল। যতদূরে যাবে গৌর, ততদূর গড়াবে। সুতো দীর্ঘ হতে থাকবে। ফুরোবে না।

বর্ষাকাল আর খুব দূরে নয়। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়। ওয়াইপার প্রাণপণে ঘোরে উইন্ডস্ক্রীনে। বৃষ্টির ঝরোখা দিয়ে এক ভিন্ন শহরের মায়াময় সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। গৌরের শ্বাসের ভাপ বন্ধ কাচের গায়ে লেগে মুছে যায়। বৃষ্টি থামলে চারদিকে অপরূপ জলছবি। জলে ছায়া আর রোদ ভাঙে। গাছে গাছে ঝালর ঝোলে।

মুর অ্যাভেনিউয়ের মোড়ে দুপুরবেলা গাড়ি থামিয়ে গৌর দেখে, রাস্তার ধারে ভিড়। ঢোলকের শব্দ হচ্ছে, আর মলের শব্দ। গৌর হাই তুলে গ্লাভস চেম্বার থেকে পুরোনো লটারীর টিকিটটা বের করে নম্বর দেখে। মেলে নি, তবু টিকিটটা ছেঁড়ে নি সে, রেখে দিয়েছে। কতকিছু রেখে দেয় মানুষ! টিকিটটা মমতাভরে আবার জায়গায় রেখে সে হাই তোলে। ঘুম পাচ্ছে। আঙুল মটকায় সে। পেট্রলের গন্ধ জমে আছে গাড়ির ভিতরে। খোলা বাতাসে শ্বাস নিতে বাইরে আসে গৌর। তারপর পায়ে পায়ে ভিড়টার দিকে এগোয়।

থুনখুনে এক বুড়ি ঢোলক বাজাচ্ছে। দুলে দুলে। চমৎকার হাতের কারুকাজ তার। একবারও ভুলভাল টোকা পড়ে না। গমকে গমকে ঢোলকের শব্দ ছিটিয়ে দেয় বুড়ো লোল হাতে। ভিড়ের মাঝখানে একটু ফাঁকা চত্বর। সেইখানে বাসন্তী রঙের ঘাগরা দুলিয়ে গোলাপী রুমাল হাতে একটা মেয়ে নাচছে। তার চোখে কাজল, কপালে টিকলি, নাকে বেসর। দেহাতের গমক্ষেতের উদাসীনতা তার মুখে। কিন্তু মাঝে মাঝে সেই মুখে মেঘ করে। বিদ্যুৎ চমকায়। পায়ের বোল ফুটিয়ে মেয়েটা ঘুরে যায়, ঘুরে ঘুরে যায়। হেলে দোলে কাঁপে। চোখের পাতা নাচায়। তার একটু ভোঁতা নাকের নিচে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। উত্তোলিত বাহুর নিচে বগলের জামা জুড়ে স্বেদচিহ্ন। দুই সবল পায়ে ফির্নাফিনে শরীর সে কোন অদৃশ্য লেত্তিতে জড়িয়ে ছেড়ে দেয়। মাতালের মতো ঘোরে! তার পুরুষ সেই সুন্দর দেহাতী যুবা মাঝে মাঝে চরকিবাজি লাফ দিয়ে উঠে মেয়েটার সঙ্গে দু চক্কর নাচে। চারদিকে ভিড়ের দিকে

তাকিয়ে সে চোখের ইশারা করে। ভিড় জমলে সে তার বাজীর ছোরা বের করবে, দেখাবে লাঠির খেলা, কাঠির ওপর পিরিচ ঘোরানো, হেঁটমুণ্ডু হয়ে পায়ের ওপর ঢোল নাচাবে। মেয়েটা তখন ক্লান্ত মুখে জনে জনের কাছে যাবে মাগুতে।

গৌর দাঁড়িয়েই থাকে। শুখো পায়ের ওপর শরীরটা বেঁকে থাকে তার। রুখো হাতখানা পকেটে ঢোকানো। পুরুষটা তার বাজী শুরু করে। তিনখানা চারখানা পাঁচখানা ছোরা একে একে শূন্যে ছুঁড়ে দেয়। লোফে, ছুঁড়ে দেয়। ছোরাগুলো রোদে ঝিলিক খেয়ে ওঠা নামা করে শূন্যে। মেয়েটা ঝম করে এক পা ফেলে, আবার ঝম্ করে অন্য পা। জনে জনের কাছে ঘুরেতে থাকে।

ক্রমে এগিয়ে আসে মেয়েটা। ভিড়ের মধ্যে গৌরের দিকেও হাত বাড়ায়। প্রত্যাশার চোখে তাকায় গৌরের মুখে। চিনতে পারে না। গৌর তো ভিড়ের একজন, চিনবে কী করে?

গৌর তার রুখো হাতখানা বের করে আনে। সেই হাতে একটা সিকি মেয়েটারে চোখের সামনে তুলে ধরে। তারপর কোষবদ্ধ হাতে সিকিটা ফেলে দেয়। মেয়েটা হাতখানা দেখে। হাত থেকে চোখ সরে আসে মুখে। ঘোলা জল কেটে যায়। চিনি-চিনি করে মেয়েটা চিনতে পারে গৌরকে। একটু হাসে। আশপাশের লোকজন একমনে বাজী দেখে। লোকটা তখন আশ্চর্য নিপুণতায় দুই হাতে চারটে কাঠিতে চারটে পিরিচ বন্ বন্ করে ঘোরায়। গৌর আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে—কী খবর?

মেয়েটা আঁচলে মুখের ঘাম মুছে বলে—ভাল। কাল আমরা দেশে ফিরে যাচ্ছি।

—কেন?

—এখন চাষবাসের সময়। ফসল উঠে গেলে আবার শীতের শেষে আসবো।

—আমি তোমার নাচ দেখে নিয়েছি।

কত লোক রোজ তার নাচ দেখে। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় খঞ্জনার মতো ক্লান্তিহীন, লজ্জাহীন, ইচ্ছাশূন্য কত নাচ নেচেছে সে। তবু গৌরের কথায় লজ্জা পেয়ে সে রাঙা মুখ একটু নত করে।

তারপর বলে—আবার যখন আসবো তখন আবার দেখো। তুমি বড় ভাল লোক।

গৌর চুপ করে থাকে।

মেয়েটা মুখ তোলে। সেই মুখে পড়ন্ত রোদ তার ঝলক তোলে। আনন্দিত মুখখানা। মেয়েটা তীব্র সুখের শ্বাসের সঙ্গে বলে—কাল—কাল আমরা দেশে যাচ্ছি।

—কী আছে দেশে?

—কিছু নেই তেমন। গঁহু আর ধানের ক্ষেত, জল, মাটি, আর কী? শীতের শেষে আবার আমরা আসবো। তুমি বড় ভাল লোক—

গৌর হাসে। মেয়েটা হাসে।

মলের ঝম্ শব্দ হয়। মেয়েটা আর এক পা এগোয়। অপরিচিত পুরুষের সামনে হাত বাড়িয়ে দেয়। সেই হাতে মেহেদীর নকশা, উলিক, প্রত্যাশা।

কাল ওরা দেহাত যাবে।

গৌর ফিরে এসে তার ল্যাণ্ডমাস্টারে বসে।

boiRboi.net

স্থলের গাড়ি জলে ভাসায় গৌর। জলের গাড়ি আকাশে ওড়ায়। তার সেই আশ্চর্য জাদুর খেলা কেউ লক্ষ্য করে কিনা কে জানে! জলে স্থলে অন্তরীক্ষে অবাধ ঘোরে ল্যান্ডমাস্টার। কখনো কখনো তার পিছনের কাচ দিয়ে দেখা যায় সমুদ্র, জাহাজের নিঃশব্দ মাস্তুল। দূরে জাহাজঘাটায় একটা টিলার ওপর ছোট্ট বাড়ি। বন্দরে একটা উঁচু জায়গায় নন্দীদের মেয়েটা একখানা হাত তুলে রাখে। গৌর এইসব দেখে।

ফিসফাস করে গঙ্গার বাতাস বয়ে যায়। মাঝে মাঝে কলকাতা জুড়ে জ্যোৎস্না ওঠে। বটের আঠার মতো জ্যোৎস্না। সেই আলোর নদী বয়ে যায় গাছপালার ডালপালা বেয়ে ফোটা ফোটা ঝরে পড়ে। সুস্বাদ সুঘ্রাণ সেই জ্যোৎস্নায় মাঝে মাঝে গৌর একটা পুরোনো প্রকাণ্ড বাড়িকে মনে মনে খোঁজে। সেই বাড়িটা ভাঙা হয়ে গেছে নাকি! কোথাও গৌর সেটাকে আর খুঁজে পায় না। জানালা দরজার পাল্লা নেই. হাঁ-হাঁ বাতাসে ফাঁকা বাড়িটায় কেবলই ক্ষয় আর পতনের ঝিরঝির ঝুরঝুর শব্দ ওঠে। মিহিন পতনের শব্দ। একটা বন্ধ দরজার ওপাশে টানা দীর্ঘ কাঠের শ্বাস টানে কেউ। কোথায় অলক্ষ্যে জ্বলে সবুজ আলোর বিজ্ঞাপন—তুমি চাও··· তুমি চাও···তুমি চাও···লায়লার রুটি। কোথাও পাওয়া যায় না সেই রুটি। গৌর খুঁজে দেখেছে। কিন্তু আছে সুর ঘরে। সেখানে সবুজ আলো এসে পড়ে। তখন ঘরখানায় মাঠঘাটের ছবি ফুটে ওঠে।

বৃষ্টি আসে। বৃষ্টির ঝরোখা ঠেলে চলে ল্যান্ডমাস্টার। উইন্ডস্ক্রীনে বিদেশী শহরের ছবি।

সর্বত্রই ওড়ে মানুষের ফেলে-যাওয়া পালক। উড়ে আসে ল্যান্ডমাস্টারের ভিতরে। গৌরের মাথার চারধারে ঘুরে বেড়ায়, শ্বাসের সঙ্গে বুকের ভিতরে চলে যায়। কাঁধে বসে, মাথায় বসে প্রজাপতির মতো ডানা কাঁপায়।

মলিনের লাইসেন্স কেড়ে নেয় পুলিস। আবার ফেরত দেয়। নির্বিকার মলিন গৌরের গাড়ির সামনে এসপ্ল্যানেডে গাড়ি ভিড়িয়ে হাই তোলে।

—মামু, কী খবর? গৌর জিজ্ঞেস করে।

মলিন আড়মোড়া ভেঙে বলে—ত্রিভঙ্গ, তোমার গাড়িটা যে রঙ জ্বলে, চটা উঠে ভারতবর্ষের ম্যাপ হয়ে গেল। মাডগার্ডের লোহা মুড়মুড়ে হয়ে এসেছে। এবার গাড়িটা মল্লিকবাজারে ছেড়ে দাও।

গৌর শ্বাস ফেলে তার ল্যান্ডমাস্টারের দিকে চেয়ে থাকে। কিছুই পৃথিবীতে অজর অমর নয়। গাড়িটা ক্ষয়ে যাচ্ছে ঠিকই। বাবা ল্যান্ডু, আমরা দুজনেই কি উচ্ছন্নে চলেছি!

বিবেকানন্দ ব্রীজ থেকে গঙ্গার শোভা দেখতে দেখতে একদিন গৌর নেমে আসছিল। সকাল দশটা। বালী চৈতলপাড়ার সোয়ারী ছিল, খালাস দিয়ে এসেছে।

দক্ষিণেশ্বর স্টেশনের সামনের চত্বরে গাড়ি নেমে এলে একজন মেয়েমানুষ হাত তুলল। গৌর গাড়ি থামায়।

—কোথায় যাবেন?

—কলেজ স্ট্রীট যাবো বাবা, নিয়ে যাবে?

boiboi.net

পথেই পড়বে। গৌর হাত বাড়িয়ে পিছনের দরজা খুলতে খুলতে একঝলক মেয়েমানুষটাকে দেখে। পরনে লাল পেড়ে গরদের শাড়ি, ঘাড়ে আঁচল। কপালে প্রসাদী সিঁদুর দগদগ করছে। উপোসী মুখখানার শুষ্কতা ভেদ করে পবিত্রতা ফুটে আছে। চোখ দুখানায় ঘোরলাগা সম্মোহিত ভাব। সঙ্গে দাসী, তাদের হাতে ফুল বেলপাতা, সন্দেশের বাক্স, পট, গঙ্গাজলের মেটে কলসী।

গৌর গাড়ি ছাড়ে। কিন্তু মুখখানা চেনা-চেনা লাগে তার। ঐ সুন্দর মুখ, কপালে ওড়া চুলের গুছি, গভীর চোখ সে আগেও দেখেছে। তেমন বেশী বয়স নয়, কিন্তু গরদের শাড়ি, সিঁদুর, উপবাস—সব মিলিয়ে একটা কেমন গম্ভীর পবিত্রতার ভাব মেয়েমানুষটাকে বয়স্কা করে রেখেছে। মনে পড়ি-পড়ি করেও পড়ে না গৌরের।

কপাল থেকে চুলের গুছি সরানোর জন্য হাত তোলে মেয়েমানুষটা। কী সুন্দর আঙুল! লম্বা, নিটোল, হলুদ রঙের আঙুল, মুক্তোরঙের পরিষ্কার নখ! চুলের গুছি সরাতে গিয়ে আঙুলগুলি—যেন বা পিয়ানোর রীডে—সুন্দর আলগোছে নড়ে। আর তখন একটা আঙটির হীরে হঠাৎ ঝিকিয়ে ওঠে।

সেই হীরের ঝলকই গৌরের অন্ধকার মাথায় তীব্র আলো ফেলে! মনে পড়ে। হাড়কাটা গলির মতিয়া। একপলকে ঘাড় ঘোরায় গৌর। আবার মুখ ফিরিয়ে নেয়। মতিয়া! মতিয়াই তো! কিন্তু পাউডার লিপস্টিক নেই, নখে পালিশ নেই। সব রঙ ধুয়ে ফেলেছে সে। দুর্লভ আতরের গন্ধটুকু পাওয়া যায় না। গরদের শাড়ি থেকে মৃদু ন্যাপথলিনের গন্ধ আসে। আর ফুল বেলপাতার গন্ধ। এ কী রকম মতিয়া? আর একবার মতিয়ার কাছাকাছি যাবে, যে বাতাসে শ্বাস ফেলে মতিয়া সেই বাতাসে শ্বাস টেনে নেবে—এরকম একটা ইচ্ছে ছিল গৌরের। আজ এত কাছে বসে আছে সে—গঙ্গাস্নানের পর, উপবাসের পর, রঙ-ধুয়ে-ফেলা মতিয়া—তবু একটুও রোমাঞ্চ হয় না গৌরের। গৌর আয়নার দিকে মাঝে মাঝে সবিস্ময়ে চেয়ে দেখে। মতিয়ার সুন্দর আঙুল শ্বেতপদ্মের মতো কপালে নড়ে, হীরেটা ঝিকোয়।

সম্মোহিত মুখে মতিয়া হঠাৎ একটু ঝুঁকে গৌরকে জিজ্ঞেস করে—বাবা, তুমি ঐ মন্দিরে কখনো গেছ?

—না।

—একবার যেও। বড় ভাল লাগবে।

—আচ্ছা।

—ওখানে স্নান করলে শরীর বড় ঠাণ্ডা হয়। রামকৃষ্ণদেবের পায়ের ধুলো এখনো ছড়িয়ে আছে ওখানে। গড়াগড়ি দিলে সেই ধুলো শরীরে উঠে আসে। মানুষের কত জন্ম ধন্য হয়ে যায়। একবার যেও বাবা।

চোখের জল গড়িয়ে নামে মতিয়ার। দুর্লভ ফোঁটাগুলি পড়ে। সেই অশ্রুর চিহ্ন গৌরের ল্যাণ্ডমাস্টার ধরে রাখে ঠিক। এ সব মানুষের পালক। মানুষ চলে যায়, তার চিহ্নগুলি পড়ে থাকে।

গৌরকে রাস্তা চেনাতে হয় না। সে নিজে থেকেই কলেজ স্ট্রীট ছেড়ে বাঁয়ের গলিতে ঢোকে। নির্ভুলভাবে মতিয়ার বাড়ির সদরে গাড়ি দাঁড় করায়।

ভ্রূ দুটো ওপরে তুলে মতিয়া জিজ্ঞেস করে—তুমি বাবা, আমার বাড়ি চিনলে কী করে?

boiboi.net

গৌর একটু হাসে।

মতিয়া লাজুক গলায় বলে—তাহলে আমাকে তুমি চেনো!

গৌর উত্তর দেয় না।

মতিয়া শ্বাস ফেলে বলে—আমি বড় পাপী বাবা। বড় পাপী।

মতিয়া পয়সা দেয়। গৌর নেয়।

—আসি বাবা। তুমি বড় ভাল লোক। মতিয়া বলে।

গৌর চুপ করে ফেরত পয়সা গুণে দেয়।

মতিয়া জানালায় ঝুঁকে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে—আমাকে মনে রেখো না বাবা।

কিন্তু তবু গৌরের সবই মনে থেকে যায়! স্থলের গাড়ি জলে ভাসায় গৌর, জলের গাড়ি শূন্যে ওড়ায়। ওড়ে পালক, থাকে আতরের সুগন্ধ, একটা টিকলির নকশা। কলকাতার নিওন সাইনগুলিতে কত পুরোনো দিনের কথা ফুটে ওঠে! গৌর ভুলবে কী করে?

পাঁচ

অনেক রাতে নাইট শো ভাঙার একটু আগে গাড়িখানা দক্ষিণমুখো করে দাঁড়িয়ে ছিল গৌরহরি। শো ভাঙলে যদি গ্যারেজের দিকের সোয়ারী পায়। আসলে এখন অনেক রাতে একা একা গাড়িখানা চালিয়ে নির্জন ঘুমন্ত গ্যারেজেটায় যাওয়ার সময়ে প্রায়ই গা ছমছম করে গৌরের। ঐ ডেডবডিটা ম্যাক্সিমাম নড়াচড়া করতে থাকে। ও শালাকে টিট করার একমাত্র উপায় গাড়িতে সোয়ারী তোলা। তুললেই শালা চুপ। আর নড়াচড়া নেই। তাই অপেক্ষা করছে গৌর! তার রাতের খাওয়া হয়ে গেছে। পাইস হোটেলে সে খেয়ে নেয়। একটা মিঠে পান খেয়েছে। তারপর রুখো-শুখো দুখানা হাত-পা-ওলা দুঃখী গৌরহরি আরামে বসেছে স্টিয়ারিঙের পিছনে হেলান দিয়ে। অপেক্ষা করছে। বহু ট্যাক্সি ওইরকম দাঁড়িয়ে। শেষ ট্রিপ যদি পায়। গৌরহরির পয়সার লালচ নেই। গৌরা যেমন কারো সার্ভেণ্ট না তেমনি না পয়সারও স্লেভ! কেবল এক আধজন সঙ্গী খোঁজে। নিশুত রাতে একটা ল্যাংডমাস্টারে একা বসে থাকতে তার কেমন একটু লাগে ঠিকই। যখন শালা ডেডবডিটা সবসময়েই রয়েছে সঙ্গে। একটু সাবধান থাকা ভাল। বাঁ দিকে একটা অন্ধকার গলি। সেই গলি দিয়ে একটা তেরো চোদ্দ বছরের হাফপ্যাণ্ট পরা ছেলে মুখ বাড়াল। চারদিক চেয়ে দেখছে। মুখখানা শুকনো। কেমন একটা অস্থির ভাব। পায়ে পায়ে সে গৌরের ট্যাক্সিটার কাছে আসছে। কিন্তু গৌর কারো সার্ভেণ্ট নয়। আসুক যে কেউ। গ্যারেজের দিকের সোয়ারী না হলে নেবে না। গৌরহরি অর্থাৎ বগলুর ছাওয়াল গৌরা মনে মনে নিজেকে শক্ত করে রাখে। ছেলেটা ম্লান মুখে কাছে আসে।

—ট্যাক্সি যাবে?

—কোনদিকে?

ছেলেটা ইতস্তত করে বলে—সাউথে।

—আমার গ্যারেজ যাদবপুরে। ওদিকে হয়তো যেতে পারি।

ছেলেটা শ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল—ওদিকেই।

boiRboi.net

—তবে উঠে পড়ো। গৌরহরি সরে গিয়ে জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে মিটার ডাউন করে।

ছেলেটা নরম গলায় বলে—ঐ গলির মধ্যে একটু যেতে হবে। মেয়েছেলে রয়েছে।

ঝামেলা! তবু তো সোয়ারী। নাইট শো ভাঙতে এখনো প্রায় আধঘণ্টা দেরি। তার আগেই যদি চলে যাওয়া যায় মন্দ কী?

—গলিতে গাড়ি ঢুকবে তো। ঘষা-ফষা লাগে যদি?

—লাগবে না। গলি চওড়া।

সাবধানে গাড়িটা বাঁ দিকে ঘুরিয়ে গলিতে ঢোকে গৌরহরি। ছেলেটা পিছনের সীট থেকে সামনে ঝুঁকে বলে—আর একটু এগিয়ে।

—কতদূর?

—এই সামনেই—কয়েকটা বাড়ি পর।

বিরক্ত গৌরহরি ঘুমন্ত, অন্ধকার গলিটার মধ্য হেডলাইট জেলে এগোয়। বলে—গাড়ি ঘোরাবো কী করে? ওদিক বেরোবার রাস্তা আছে?

—আছে। কোনো অসুবিধে নেই। আমরা তো আছি।

গৌরহরি এগোয়। পাকা হাত তার। আঁকা বাঁকা গলির মধ্যে ঘুরে ফিরে তার গাড়ি যায়।

—আর কতদূরে?

—আর একটু। বাঁ হাতে আর একটা গলি পড়বে—সেখানে।

—ইস্! বড় ঝামেলায় ফেললে।

এখন গৌরবাবুর বেড-টাইম নয় ঠিক। তবে মাঝে মাঝে হাই উঠছে। কেন গৌরবাবু নিজের ইচ্ছেমতো ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বে না? বিশেষত সে যখন কারো চাকর নয়। কার ধার ধারে সে?

গাড়ি আর খানিকটা এগিয়ে বাঁ হাতের গলিটা পায়।

—ওরে ব্বাস্। এ যে যম অন্ধকার। গলিটাও সরু।

—গাড়ি যায়।

—যায় যাক্। আমি যাব না! এখানে দাঁড়াচ্ছি, তোমার লোকজন ডেকে আনো। এটুকু সবাই হেঁটে আসতে পারে।

—এইটুকু নয়। গলিটা অনেক লম্বা। একদম ও-প্রান্তে যেতে হবে। তাছাড়া সঙ্গে খুচরো কিছু মালপত্র আছে! চলুন না, মিটারের বেশী দেবো।

গৌরহরিকে পয়সা দেখাচ্ছে! অ্যা! পয়সা দেখাচ্ছে বগলুর পোলা গৌরাকে! বগলাপতির আমলের পুরোনো ডজ গাড়িটার ছোট্টো আয়নায় গৌরহরি কি বিস্তর নম্বরী নোটের ছবি দেখে নি।

—বেশী দিলেই কি! আমি যাবো না।

ছেলেটা হঠাৎ অসহায় ভাবটা ঝেড়ে ফেলে হাসল, বেশ আত্ম-প্রত্যয়ের হাসি। গৌর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল।

—যাবেন না মানে! যাবেন, যাবেন। না গেলে কি চলে?

—না গেলে কী করবে?

ছেলেটা—বাচ্চা মিষ্টি চেহারার ছেলেটা হঠাৎ ডান হাত বাড়িয়ে গৌরের ঘাড় ধরে একটা ঝাঁকুনি দিল—চল্ শালা, ফের মুখে খুলেছিস কি ভোঁতা করে দেবো। ঢোক গলিতে—

গৌরহরি কোনোকালে মারপিট করে নি, মার খায়ও নি কখনো। বগলাপতি ক্কচিৎ কখনো চড়টা চাপড়টা দিয়েছেন তার বেশী কিছু নয়। ঘাড়ে ঝাঁকুনি খেয়ে হঠাৎ গৌরের বড় অপমান লাগল। সে কিনা গৌরহরি—টিকটুলির বগলুর পোলা গৌরা, তার কিনা ঘাড়ে হাত! গৌর তার ভাল হাতখানা বাড়িয়ে ছেলেটার হাত চেপে ধরল—খুব সাহস যে খোকা! অ্যাঁ! শালা মারব এমন থাপ্পড়—

ছেলেটা অনায়াসে তার হাত ছাড়িয়ে নিল। ধুলো ময়লা ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গীতে। ঠিক সেই মুহূর্তেই ট্যাক্সির দুই জানালায় দুজন ছায়ার মতো উটকো লোক এসে দাঁড়াল। তারা শুধু ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল—হুজ্জত করছে নাকি রে!

—একটু একটু—

বাইরে থেকে একজন হাত বাড়িয়ে গৌরের কলার চেপে ধরে গোটা দুই ঝাঁকুনি দিয়ে বলে—জান নিয়ে ফিরতে পারবে না, বুঝলে? গাড়ি জ্বালিয়ে দেবো তোমাকে সুদ্ধ।

জ্বালিয়ে দেবে! মানে! জ্বালিয়ে দেবে ল্যাণ্ডমাস্টারখানা! বগলাপতি অর্থাৎ কিনা বাপ বগলুর দেওয়া একমাত্র নিজস্ব জিনিসখানা তার! এত আদরের গাড়িখানা—যেটা কখনো তার প্রাইভেট কখনো বা পাবলিক! গৌরের আপাদমস্তক চমকে যায়। চেয়ে থাকে।

—যাবে কি না।

দরগায় সিন্নি, গীর্জেয় মোমবাতি, বদর-বদর—যাবো বৈ কি! রাস্তা দেখাও বাবাসকল। গৌরা যাবে। যদিও বগলুর পোলা গৌরা কারো চাকর না—তবু ল্যাণ্ডমাস্টারখানা গেলে গৌরের আর থাকে কী! অ্যাঁ। থাকে কী? থাকে শুধু দুটো রুখো-শুখো হাত পা আর মগজের ঝম্‌ঝম্ শব্দ!

গৌর একটু দম নিয়ে বলে—যাবো।

—গাড়ি ঘোরান। বাঁ দিকে।

গৌর গাড়ি ঘোরায়।

সেই দুটো লোক তার গাড়ির মধ্যে এসে বসেছে এখন! তাদের একজন তার বাঁ পাশে। তারা খুব চুপচাপ। কথা বলে না একটাও।

—আর কতটা পথ? গৌর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে।

—চালাও। আমরা বলব।

গলিটা অনেক লম্বা। লোকজন বড় একটা দেখা যায় না। বাঁ ধারে একটা জানালা-দরজাহীন পাঁচিল চলেছে। ডান হাতে কয়েকটা ছুটকো-ছাটকা বাড়ি। এসব পার হল গৌরহরি। ল্যাণ্ডমাস্টারখানা শব্দ না করে যাচ্ছে। পুরোনো আমলের ইঞ্জিন, তার ওপর যত্নে থাকে গৌরের কাছে।

ক্রমে ডানদিকের বাড়িঘর শেষ হয়ে গেল। একটা মাঠ। তাতে হেডলাইটের আভায় অনেক আগাছা দেখল গৌর। বাঁ দিকে একটা কারখানার মতো। সেটা

boiRboi.net

অন্ধকার, নিশ্চুপ। কথা না বলে গৌর এগোলো। আবার বাড়িঘর শুরু হচ্ছে। ছুটকো-ছাটকা। বাঁ দিকের লোকটা হাত বাড়িয়ে গৌরের হাতে চাপ দিল, চাপা গলায় বলল—এইখানে। বাতি নিভিয়ে দাও।

গৌর বাতি নেভাল। লোকগুলো কেউ নামল না। বসে রইল।

বড় ভয় করে গৌরের। বগলুর ছেলে গৌরাকে এ কোথায় নিয়ে এল অচেনা লোকেরা? ব্যাপারখানা কী! তার গাড়ির ডেডবডিটা নাছোড় বটে। কিন্তু কখনো বিপদে ফেলে নি তাকে। মাঝে মাঝে নড়ে চড়ে। লেগে থাকে এই পর্যন্ত! তা ছাড়া ডেডবডিটার আর কোন নিন্দে কেউ করতে পারবে না! এদের চেয়ে সেই ডেডবডিটা অনেক ভাল! তাকে নিয়েই তো এতকাল ল্যান্ডমাস্টারখানা দাবড়ে বেড়াচ্ছে বগলুর ছাওয়াল—

আরো তিনজন লোক অন্ধকার থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। তার মানে ছজন. গৌর বে-আইন দেখেও চুপ করে থাকে। লক্ষ্য করে যে তিনজন আসছে তাদের মধ্যে মাঝখানের জন নিজের ইচ্ছেয় বা শক্তিতে আসছে না। তাকে আনা হচ্ছে ধরে ধরে। বাঁ দিকে ছোট্ট জমিটুকু পার হয়ে তারা গাড়ির কাছে চলে এল। বাচ্চা ছেলেটা নেমে দাঁড়াল। নিঃশব্দে তিনজন উঠল পিছনের সীটে। আবছা মনে হল গৌরহরির, মাঝখানের লোকটার হাত বাঁধা। মুখে ন্যাকড়ার দলা ভরা আছে। লোকটা অস্পষ্ট একটু শব্দ করল। দুধারের দুজন সিগারেট ধরাল। কথা বলল না। বাচ্চা ছেলেটা আর পিছনের সীটে আগে যারা উঠেছিল তারা নেমে গেল।

গৌরহরির বাঁ পাশের লোকটা বলল—চালাও। সোজা গিয়ে প্রথম ডান হাতে যে রাস্তা পাবে সেইটে ধরো। হেডলাইট জ্বেলো না, জ্যোৎস্না আছে।

তাই সই। গৌর গাড়ি ছাড়ে। কোথায় চলেছে বগলুর বাচ্চা কে জানে! ডান হাতের রাস্তাটা চওড়াই। আলো আছে। লোকজনও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এ যেন চেনা কলকাতার কোনো রাস্তাই নয়। এ রাস্তা গৌরহরি তার বাপের, বগলাপতির আমলেও দেখে নি।

—কোনদিকে যাবো?

—চলো সোজা। আমরা বলে দেবো।

পিছনের সীটে ডেডবডিটা নেই বটে এখন, কিন্তু যা আছে তা জ্যান্ত বডি। হাত-পা বাঁধা লোকটা একটু পরেই ডেডবডি হয়ে যেতে পারে।

গৌর গাড়ি চালাতে থাকে। যেমন সে চালায় মন-প্রাণ দিয়ে, তেমনই চালাচ্ছিল। তার হাত পা মগজ ধীরে অধিকার করে নিচ্ছিল ল্যান্ডমাস্টারটার যন্ত্রপাতি।

—আস্তে, বাঁ দিকের লোকটা বলে।

গাড়ি বার করে গৌর।

লোকটা পিছনের দিকে তাকায়। কী একটা ইঙ্গিত করে।

গৌর দেখে, রাস্তাটা বড় অন্ধকার। কোনখানে আলো নেই। জ্যোৎস্নাও দেখতে পায় না গৌর। বোধহয় আকাশে মেঘ আছে, কিংবা লোকটা মিথ্যে বলল।

গাড়িটা আস্তে আস্তে যাচ্ছে। বাঁ দিকের লোকটা পিছন ফিরে কী দেখছে। গৌরের ঘাড় ঘোরাতে সাহস হয় না।

boiRboi.net

হঠাৎ কোঁক করে হোঁচকি তোলার মতো একটা আওয়াজ হয়। মাঝখানের লোকটাই শব্দটা করল। অনিচ্ছাতেও উইণ্ডস্ক্রীনের ওপর ছোট্ট আয়নাটায় চোখ গেল গৌরহরির। আবছায় তেমন কিছু বোঝা যায় না। তবু মনে হয়, ডানপাশের লোকটা একটা ছোরার হাতল মাঝখানের লোকটার পেট থেকে টেনে বার করল। সঙ্গে সঙ্গে গরম একটু কী ছিটকে এসে লাগল গৌরের বাঁ কানের পিঠে। শুখো হাতটা অবশ হয়ে আসছিল, কোনোক্রমে টাল সামলে নিল গৌরহরি।

বাঁ দিকের লোকটা তার হাত ছুঁয়ে বলল—ব্যস, আর না! গাড়ি থামাও।

খুব ম্লান জ্যোৎস্না ফুটেছে। অচেনা রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়েছে গৌরহরি। এ জায়গা সে চেনে না। কোনোকালে আসে নি।

তিনজন লোক তিনটে দরজা খুলে নেমে দাঁড়াল। একজন জানালায় ঝুঁকে বলল—একটা বডি রইল। যেখানে হয় ফেলে দিও। পুলিসে যদি যাও—আমরা নম্বর টুকে রেখেছি—

বডি! গৌরহরির চোখ কপালে ওঠে। সত্যিই একটা বডি অবশেষে সামিল হল ল্যাণ্ডমাস্টারটায়! বগলুর দেওয়া গাড়িটাতে! ভয় না, ভারী অবাক হয় গৌর।

—কী হে, শুনতে পাচ্ছো, যা বললাম?

গৌর মাথা নাড়ে।

—যাও। লাইট না জেবলে যাও। এগিয়ে গড়িয়াহাটা রোড পাবে।

গৌর মাথা নাড়ে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না। গড়িয়াহাট রোডটা যে আসলে কোথায় তা তার মাথায় ঢোকেই না। সে মাথা নেড়ে গাড়িটা ছাড়ে।

তারপর বগলাপতির ছাওয়াল গৌরহরি—অর্থাৎ কিনা বগলুর পোলা গৌরা তার অদ্ভুত সোয়ারীকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে। রাস্তাঘাট সে আর চিনতে পারে না। তার মাথার মধ্যে মল পরা দুটি পা ঝম্ঝম্ শব্দ করে। সে শব্দে কেমন তালগোল পাকাতে থাকে রাস্তাগুলি। যেন তাকে ধরেছে কানাওলা। একই রাস্তায় তার গাড়ি ঘুরছে আর ঘুরছে।

কী করেছি আমি! অ্যাঁ! কী করেছি আমি! কী পাপ? কোন অপরাধ? কী করেছে হে বগলুর ছাওয়াল, যার জন্য তার ল্যাণ্ডমাস্টারে ডেডবডি? তাকে কেন ধরেছে কানাওলায়? কোন অপরাধে হে বগলুর ছাওয়ালের—যার জন্য তার দুটো হাত-পা শুখো। আরে মগজে ঐ বেহদ্দ নাচের শব্দ? এইসব কাকে জিজ্ঞেস করব আমি! কে জবাব দেবে?

পিছনের সীটে ডেডবডিটা নড়ছে আর নড়ছে। একবার পিছন ফিরে তাকায় গৌর। দেখে, বডিটা ধীরে ধীরে কাত হয়ে জানালায় মাথা আটকে থেমে আছে। পেটে একটা হাঁ। রক্ত জমে গেছে। কে হে বাপু তুমি? কোত্থেকে এলে বগলুর ছাওয়ালের ল্যাণ্ডমাস্টারে! উড়ে এসে জুড়ে বসলে—কে হে তুমি?

গৌরহরির হাতে গাড়ি এই প্রথম টাল খাচ্ছে। নড়ে চড়ে যাচ্ছে। প্রাণপণে হাত সিধে রাখে গৌর। কলকাতার রাস্তায় ল্যাণ্ডমাস্টারে জীবন কাটে গৌরহরির—অর্থাৎ কিনা বগলুর ছাওয়ালের। তবু আজ তার গাড়ি এ কোন কলকাতা দিয়ে যাচ্ছে!

boiRboi.net

মাইরি, এ সব গাছপালা, রাস্তা আলো এসব যে গৌরবাবু কখনো দেখে নি! সোয়ারী যেমন বলে তেমনি চলে গৌর, কিন্তু অ.জকের সোয়ারী যে শালা কথাও বলে না! ভয় করে না নাকি বগলুর পোলার! অ্যাঁ! গৌরবাবুর কি ভয় করে না! কেন শালার ভ দেখাও গৌরবাবুকে! কোন অন্যায় করেছে গৌরা? হ্যাঁ, সত্যি বটে মাঝে মাঝে সে সোয়ারী কাট মারে। কতবার কত বিপদে পড়া লোককে সে তুলে নেয় নি। মেডিক্যাল কলেজের সামনে এক নতুন পোয়াতি কোলে বাচ্চা নিয়ে রোগা শরীরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছিল—অনেকদিন আগেকার কথা—গৌর তাকে কাট মেরে বেরিয়ে গিয়েছিল। আর একবার দুটো কাঁচ মেয়ে আর বৌ নিয়ে একটা মফঃস্বলী হাবা লোক গাড়িতে উঠেছিল। মাঝপথে যখন গৌর বুঝতে পারল এরা হাওড়া স্টেশনে যাবে—হাওড়ায় যাওয়া মানে বিচ্ছিরি জ্যাম আর পুলিসের আওতায় যাওয়া—তখনই সে গাড়ির চাকায় হাওয়া নেই বলে তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে লোক দেখানো জ্যাক লাগিয়েছিল গাড়িতে। সেই বোকা লোকটা মাঝপথে কাঁচ মেয়ে আর বৌ নিয়ে কী ভীষণ বিপদে পড়েছিল। এরকম আরো অপরাধ আছে তার। অনেক। কিন্তু কেউ কি গৌরের ল্যাণ্ডমাস্টারটার জন্য ঠেকে ছিল? যে যার গন্তব্যে পৌঁছায় নি কি শেষ পর্যন্ত? পৌঁছেছে, গৌর জানে। তবে আর কী! তবে কেন গৌরের ল্যাণ্ডমাস্টারে ডেডবডি? বগলুর ছাওয়ালকে কেন ধরেছে কানাওলা?

ডেডবডিটা নড়ে আর নড়ে। রাস্তার টালে গাড়ি লাফায়, আর লটপটে মাথাটা জানালায় ঠুকে যায়। চমকে ওঠে গৌর। কে হে বাপু তুমি? অ্যাঁ! উটকো উঠে বসে আছো! কোথায়? কে হে—?

নিশঃব্দ একরকম কথা আছে, সবাই শুনতে পায় না। গৌর শুনল!

ডেডবডিটা নিঃশব্দে বলল—আমি একজন—তুমি চিনবে না হে গৌরবাবু। কোটি কোটি মানুষের কজনকে তুমি চেনো? তবে আমি—বুঝলে—আমি এই সংসারের ভাল চেয়েছিলুম। ঐটুকুই আমার পরিচয়। তা দেখ গৌরবাবু, সংসারের ভালমন্দয় হাত দিলেই বিপদ। দিলেই তোমার ভালমন্দেও হাত পড়বে। তবু এই খেলার বড় মায়া। একবার শুরু করলে আর সহজে ছাড়া যায় না। শেষ পর্যন্ত যেতে হয়! আমিও শেষ পর্যন্ত গেছি। এই দেখ না—আমার পেটটা—কেমন হাঁ হয়ে আছে! কিন্তু তার জন্য আমার দুঃখ নেই গো, বেশ আরামই লাগছে। সব ভালমন্দ শেষ করেছি আমি। তোমার ল্যাণ্ডমাস্টারের চমৎকার গদীতে শুয়েছি আরামে—আর উঠবো না হে। দিব্যি লাগছে। বলতে কী গৌরবাবু, গাড়ি চালানোর হাত তোমার ভালই। দুলুনি লাগছে, ঘুম আসছে—বাইরে জ্যোৎস্না—মোলায়েম বাতাস বইছে—এর মধ্যে অনন্ত ঘুম ছাড়া বেশী সুখ আর কিসে? চালাও গৌরবাবু, চালাও—থেমো না। আমরা দুজনে চলো, এই ল্যাণ্ডমাস্টারে সংসার ছেড়ে যাই—চলো হে বগলুর পোলা—

তা গৌর তার উইণ্ডস্ক্রীন জুড়ে সত্যিই সংসারের বাইরের দৃশ্য দেখতে পায়। ঢাকার সেই কামান অবিরাম লাল নীল হলুদ গোলা ছুঁড়ছে। সেই গোলাগুলো ভাসতে ভাসতে চলেছে ফাদার ফ্রান্সিসের পিছু পিছু। ফাদার হেসে কুটিপাটি,

ডেকে বলছে—হেই গৌরহরি, ফ্যাস্—ফ্যাস্ দি বল—

গাছের পাতায় পাতায় ডালে ডালে কুয়াশার সাদা ফুল দোলে, দোলে চাঁদের মতো উজ্জ্বল ফল। রাস্তা হঠাৎ এঁকে বেঁকে আকাশ-মুখো উঠতে থাকে। গৌরহরির ল্যান্ডমাস্টার রাস্তার তোয়াক্কা না করে হঠাৎ শূন্যে উঠে উড়তে থাকে। ভেসে ভেসে চলে।

অনন্ত যাত্রায় একটা ডেডবডি সহ গৌরের ল্যান্ডমাস্টার চলে যায়। যেতে থাকে। তার মিটারের টাকা পয়সার অঙ্ক মুছে যায়। সেখানে পর পর ফুটে উঠতে থাকে—ভালবাসা…পরিপূর্ণতা…ঈশ্বর…

boiRboi.net

boiRboi.net

রক্তের বিষ

boiRboi.net

boiRboi.net

কুকুরগুলো বাইরে খ্যাঁকাচ্ছে। সে এমন চ্যাংড়ামি যে মাথা গরম হয়ে যায়।

গগনচাঁদ উঠে একবার গ্যারাজঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। লাইটপোস্টের তলায় একটা ভিখারী মেয়ে তার দুটো বাচ্চাকে নিয়ে খেতে বসেছে। কাপড়ের আঁচল ফুটপাথে পেতে তার ওপর উচ্ছিষ্ট খাবার জড়ো করেছে। কুকুরগুলো চারধারে ঘিরে দাঁড়িয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে যাচ্ছে লাগাতার।

গগনচাঁদ একটা ইঁট কুড়িয়ে নিয়ে নির্ভুল নিশানায় ছুঁড়ে কুকুরটার পাছায় লাগিয়ে দিল। কুকুরটার বীরত্ব ফুস করে উড়ে যায়, কেঁউ কেঁউ করতে করতে নেংচে সেটা পালায়। সঙ্গে আরগুলো। গগনচাঁদ ফের তার গ্যারাজঘরে এসে বসে। রাত অনেক হল। গগনচাঁদের ভাত ফুটছে, তরকারীর মশলা এখনো পেষা হয়নি।

মশলা পিষবার শিল-নোড়া গগনের নেই। আছে একটা হামানদিস্তা। তাইতেই সে হলুদ গুঁড়ো করে, ধনে-জিরে ছাতু করে ফেলে। একটা অসুবিধে এই যে হামানদিস্তায় একটা বিকট টংটং শব্দ ওঠে। আশপাশের লোক বিরক্ত হয়। আর এই বিরক্তির ব্যাপারটা গগন খুব পছন্দ করে।

এখন রাত দশটা বাজে। গ্রীষ্মকাল। চারপাশেই লোকজন জেগে আছে। রেডিও বাজছে, টুকরো-টুকরো কথা শোনা যাচ্ছে, কে এক কলি গান গাইল, বাসন-বোসনের শব্দও হয়। গগন হামানদিস্তা নিয়ে হলুদ গুঁড়ো করতে বসে। আলু ঝিঙে আর পটল কাটা আছে, ঝোলটা হলেই হয়ে যায়।

গ্যারাজটায় গাড়ি থাকে না, গগন থাকে। গ্যারাজের ওপরে নীচু ছাদের একখানা ঘর আছে, সেটাতে বাড়িওলা নরেশ মজুমদারের অফিসঘর। কয়েকখানা দোকান আছে তার কলেজস্ট্রীট-মার্কেটে। নিজের ছেলেপুলে নেই, শালীদের দু-তিনটে বাচ্চাকে এনে পালে-পোষে। তার বৌ শোভারাণীভারী দজ্জাল মেয়েছেলে। শোভা মাঝে মাঝে ওপরের জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বলে—শিল-নোড়া না থাকে তো বাজারের গুঁড়ো মশলা প্যাকেটে ভরে বিক্রি হয়, নাকি সেটা কারো চোখে পড়ে না। হাড়-হারামজাদা পাড়া-জ্বালানী গু-খেগোর ব্যাটারা সব জোটে এসে আমার কপালে!

সরাসরি কথা বন্ধ। বাড়িতে একটা মাত্র কল, বেলা ন'টা পর্যন্ত তাতে জল থাকে। জলের ভাগীদার অনেক। গ্যারাজে গগন। রাতে নরেশের কিছু কর্মচারী শোয় ওপর তলার মেজেনাইন ফ্লোরে। সব মিলিয়ে পাঁচজন। ভিতর-বাড়ির আরও চার ঘর ভাড়াটের ষোলো-সতেরোজন মিলে মেলাই লোক। একটা

টিপকল আছে, কিন্তু সেটা এত বেশি ঝকাং ঝকাং হয় যে বছরে ন'মাস বিকল হয়ে থাকে। জল উঠলেও বালি মেশানো ময়লা জল উঠে আসে। তাই জলের হিসেব ঐ একটা মাত্র কলে। অন্য ভাড়াটেদের অবশ্য ঘরে ঘরে কল আছে, কিন্তু মাথা উঁচু কল বলে তাতে ডিমসুতোর মত জল পড়ে। উঠোনের কলে তাই হুড়োহুড়ি লেগেই থাকে। একমাত্র নরেশের ঘরেই অঢেল জল। নিজের পাম্পে সে জল তুলে নেয়। কিন্তু সে জল কেউ পায় না, এমন কি তার কর্মচারীরাও নয়। গগনচাঁদ কিছু গম্ভীর মানুষ, উপরন্তু কলেজ আর তিনটে ক্লাবের ব্যায়ামশিক্ষক, তার বালতি কিছু বড় এবং ভারী। কাউকে সে নিজের আগে জল ভরতে দেয় না। নরেশ মাস আষ্টেক আগে জলের বখেড়ায় গগনচাঁদকে বলেছিল—আপনার খুব তেল হয়েছে। তাতে গগনচাঁদ তার গলাটা এক হাতে ধরে অন্য হাতে চড় তুলে বলেছিল—এক থাপ্পড়ে তিন ঘণ্টা কাঁদাব। সেই থেকে কথা বন্ধ।

গগন গুঁড়োমশলা কিনতে যাবে কোন্ দুঃখে! ভেজাল আর ধুলোবালি মেশানো ঐ অখাদ্য কেউ খায়? তাছাড়া হামানদিস্তায় মশলা গুঁড়ো করলে শরীরটাকে আরো কিছু খেলানো হয়। শরীর খেলাতে গগনের ক্লান্তি নেই।

গ্যারাজের দরজা মস্ত বড়। বাতাস এসে কেরোসিনের স্টোভে আগুনটাকে নাচায়। গগন উঠে গিয়ে টিনের পাল্লা ভেজিয়ে দিতে যাচ্ছিল। নজরে পড়ল আকাশে মেঘ চমকাচ্ছে। গ্রীষ্মের শেষ, এবার বাদলা শুরু হবে। ঠাণ্ডা ভেজা একটা হাওয়া এল। গগন ভ্রূ কুঁচকে তাকায়। অন্য ঋতু ততটা নয় যতটা এই বাদলা দিনগুলো তাকে জ্বালায়। গ্যারাজের ভিত নীচু, রাস্তার সমান সমান। একটু বৃষ্টি হলেই কল কল করে ঘরে জল ঢুকে আসে। প্রায় সময়েই বিঘৎ-খানেক জলে ডুবে যায় ঘরটা। সামনের নর্দমার পচা জল। সেই সঙ্গে উচ্চিংড়ে, ব্যাঙ এবং কখনো সখনো ঢোঁড়া সাপ এসে ঘরে ঢুকে পড়ে। তা সে-সব কীটপতঙ্গ বা সরীসৃপ নিয়ে মাথা ঘামায় না গগন। ময়লা জলটাকেই তার যত ঘেন্না। দুটো কাঠের তাক করে নিয়েছে, তোরঙ্গটা তার ওপর তুলে রাখে, কেরোসিন কাঠের নড়বড়ে টেবিলে স্টোভ জেলে চৌকিতে বসে সাহেবী কায়দায় রান্না করে গগন বর্ষাকালে। সে বড় ঝঞ্ঝাট। তাই আকাশে মেঘ দেখলে গগন খুশী হয় না।

এখনো হল না। কিন্তু আবার বর্ষা-বৃষ্টিকে সে ফেলতেও পারে না। এই কলকাতার শহরতলীতে বৃষ্টি যেমন তার না পছন্দ, তেমনি আবার মুরাগাছা গাঁয়ে তার যে অল্প কিছু জমিজিরেত আছে সেখানে বৃষ্টি না হলে মুশকিল। না হোক বছরে চল্লিশ পঞ্চাশ মণ ধান তো হয়ই। তার কিছু গগন বেচে দেয়, আর কিছু খোরাকি বাবদ লুকিয়ে কলকাতায় নিয়ে আসে।

মেঘ থেকে চোখ নামিয়েই দেখতে পায় ল্যাম্পপোস্টের আলোর চৌহদ্দি ফুঁড়ে সুরেন খাঁড়া আসছে। সুরেন এক সময় খুব শরীর করেছিল। পেটের পেশী নাচিয়ে নাম কিনেছিল। এখন একটু মোটা হয়ে গেছে। তবু তার দশাসই চেহারাটা রাস্তায় ঘাটে মানুষ দুপলক ফিরে দেখে। সুরেন গুণ্ডামি করে না বটে, কিন্তু এ তল্লাটে সে চ্যাংড়াদের জ্যাঠামশাই গোছের লোক। লরীর ব্যবসা আছে, আবার একটা ভাতের হোটেলও চালায়।

boiRboi.net

সুরেন রাস্তা থেকে গোঁত্তা-খাওয়া ঘুড়ির মত ঢুকে এল গ্যারাজের দিকে।

বলল—কাল রাত থেকে লাশটা পড়ে আছে লাইন ধারে। এবার গন্ধ ছাড়বে।

গম্ভীর গগন বলল—হুঁ।

—ছোকরাটা কে তা এখনো পর্যন্ত বোঝা গেল না। তুমি গিয়ে দেখে এসেছ নাকি?

—না। শুনেছি।

ঘরে ঢুকে সুরেন চৌকির ওপর বসল। বলল—প্রথমে শুনেছিলাম খুন। গিয়ে দেখি তা নয়। কোনখানে চোট-ফোট নেই। রাতের শেষ ডাউন গাড়িটাই টক্কর দিয়ে গেছে। কচি ছেলে, সতেরো আঠার হবে বয়স। বেশ ভাল পোশাক-টোশাক পরা, বড় চুল, জুলপী, গোঁপ সব আছে।

—হুঁ। গগন বলল।

হামানদিস্তার প্রবল শব্দ হচ্ছে। ভাত নেমে গেল, কড়া চাপিয়ে জিরে-ফোড়ন ছেড়ে দিয়েছে গগন। সঙ্গে একটা তেজপাতা। সাঁতলানো হয়ে গেলেই মশলার গুঁড়ো আর নুন দিয়ে ঝোল চাপিয়ে দেবে।

সুরেন খাঁড়ার খুব ঘাম হচ্ছে। টেরিলিনের প্যাণ্ট আর শার্ট পরা, খুব টাইট হয়েছে শরীরে। বুকের বোতাম খুলে দিয়ে বলল—বড্ড গুমোট গেছে আজ। বৃষ্টিটা যদি হয়!

—হবে। গগন বলে—হলে আর তোমার কি! দোতলা হাঁকড়েছ, টঙের ওপর বসে থাকবে।

সুরেন ময়লা রুমালে ঘাড়ের ঘাম মুছে ফেলল, তারপর সেটা গামছার মতন ব্যবহার করতে লাগল মুখে আর হাতে। ঘষে ঘষে ঘাম মুছতে মুছতে বলে—তোমার ঘরে গরম বড় বেশী, ড্রেনের পচা গন্ধে থাক কি করে?

—প্রথমে পেতাম গন্ধটা। এখন সয়ে গেছে, আর পাই না। চার সাড়ে চার বছর একটানা আছি।

—তোমার ওপরতলার নরেশ মজুমদার তো আবার বাড়ি হাঁকড়াচ্ছে ঝিল রোডে। একতলা শেষ, দোতলারও ছাদ যখন-তখন ঢালাই হয়ে যাবে। একবার ধরে পড়ো না, নীচের তলাকার একখানা ঘর ভাড়া দিয়ে দেবে সস্তায়।

গগন ভাতের ফ্যান-গালা সেরে ঝোলের জল ঢেলে দিল। তারপর গামছায় হাত মুছতে মুছতে বলল—তা বললে বোধ হয় দেয়। ওর বৌ শোভারাণী খুব পছন্দ করে কিনা আমাকে। একটু আগেও আমার গুষ্টির শ্রাদ্ধ করছিল।

—একদিন উঠে গিয়ে ঝাপড় মারবে একটা, আর রা কাটবে না।

গগন মাথা নেড়ে বলল—ফুঃ! একে মেয়েছেলে, তার ওপর বৌ মানুষ। বলে হাসে গগন। একটু গলা উঁচু করে, যেন ওপরতলায় জানান দেওয়ার জন্যই বলে—দিক না একটু গালমন্দ, আমার তো বেশ মিঠে লাগে। বুঝলে হে সুরেন, আদতে ও মাগী আমাকে পছন্দ করে, তাই ঝাল ঝেড়ে সেটা জানিয়ে দেয়। মেয়েমানুষের স্বভাব জান তো, যা বলবে তার উল্টোটা ভাববে।

বলেই একটু উৎকর্ণ হয়ে থাকে গগন। সুরেনও ছাদের দিকে চেয়ে বসে থাকে। মুখে একটু হাসি দুজনেরই। শোভারাণীর অবশ্য কোন সাড়া পাওয়া যায় না। ওপরে কোন বাচ্চা বুঝি স্কিপিং করছে, তারই টিপ টিপ শব্দ আসছে, আর মেঝেতে ঘুরন্ত দড়ির ঘষা লাগার শব্দ।

নরেশচন্দ্র বড় চতুর বাড়িওলা। ভাড়াটে ওঠানোর দরকার পড়লেই সে অন্য কোন বখেড়ায় না গিয়ে বৌ শোভারাণীকে টুইয়ে দেয়। শোভার মুখ হল আস্তাকুঁড়। সে তখন সেই ভাড়াটের উদ্দেশে আস্তাকুঁড়ের ঢাকনা খুলে আবর্জনা ঢালতে শুরু করে। সে বাক্য যে শোনে তার কান দিয়ে তপ্ত সিসে ঢালার চেয়েও বেশী কষ্ট হয়। সে বাক্য শুনলে গতজন্মের পাপ কেটে যায় বুঝি। শোভারাণী অবশ্য এমনি এমনি গাল পাড়ে না। নতুন ভাড়াটে এলেই তার ঘরদোরে আপনজনের মত যাতায়াত শুরু করে, বাটি বাটি রান্না করা খাবার পাঠায়, দায়ে-দফায় গিয়ে বুক দিয়ে পড়ে। ঐভাবেই তাদের সংসারের হাল-চাল, গুপ্ত খবর সব বের করে আনে। কোন সংসারে না দুটো চারটে গোপন ব্যাপার আছে! সেই সব খবরই গুপ্ত অস্ত্রের মত শোভার ভাঁড়ারে মজুত থাকে। দরকার মত কিছু রং-পালিশ করে এবং আরো কিছু বানানো কথা যোগ করে শোভা দিন-রাত চেঁচায়। ভাড়াটে পালানোর পথ পায় না। গগনও শোভার দম দেখে অবাক হয়ে বলে—এ তো হামিদা বানুর চেয়ে বেশী কলজের জোর দেখতে পাই!

একমাত্র গগনেরই কিছু তেমন জানে না শোভা। না জানলেও আটকায় না। যেদিন নরেশকে ঝাঁকি দিয়েছিল গগন, সেদিন শোভারাণী একনাগাড়ে ঘণ্টা আণ্টেক গগনের তাবৎ পরিবারের শ্রাদ্ধ করেছিল। বেশ্যার ছেলে থেকে শুরু করে যত রকম বলা যায়। গগন গায়ে মাখেনি, তবে ক্লাবের ছেলেরা পরদিন সকালে এসে বাড়ি ঘেরাও করে। ব্রজ দত্ত নামে সব চেয়ে মারকুট্টা যে চেলা আছে গগনের দোতলায় উঠে নরেশকে ডেকে শাসিয়ে দিয়ে যায়। মারত, কিন্তু গগন ওরকমধারা দুর্বলের গায়ে হাত তোলা পছন্দ করে না বলে মারেনি। তাতে শোভারাণীর মুখে কুলুপ পড়ে যায়। কিন্তু রাগটা তো আর যায়নি। বিশেষতঃ গগন তখনো ইচ্ছেমত জল তোলে, কলে কোনদিন জল না এলে নরেশের চাকরকে ডেকে ওপরতলা থেকে বালতি বালতি জল আনিয়ে নেয়। শোভা রাগ করে হয়তো, কিন্তু জল দিয়ে দেয়। ঝামেলা করে না।

ভেবে দেখলে গগন কিছু খারাপ নেই। কেবল ঐ বর্ষাকালটাকেই যা তার ভয়।

—লাশটার কথা ভাবছি, বুঝলে গগন!

—কী ভাবছ?

—এখনো নেয়নি। গন্ধ ছাড়বে।

—নেবে'খন। সময় হলে ঠিক নেবে।

—ছেলেটা এখানকার নয় বোধ হয়। সারাদিনে কম করে দু-চারশ' লোক দেখে গেছে, কেউ চিনতে পারছে না।

—এসেছিল বোধ হয় অন্য কোথা থেকে। ক্যানিং-ট্যানিং-এর ওদিককার হতে পারে।

boiRboi.net

সুরেন মাথা নেড়ে বলল—বেশ ভদ্রঘরের ছাপ আছে চেহারায়। কসরৎ করা চেহারা।

গগন একটু কৌতূহলী হয়ে বলে—ভাল শরীর ?

—বেশ ভাল। তৈরী।

—আহা ! বলে শ্বাস ছেড়ে গগন বলে—অমন শরীর নষ্ট করল ?

সুরেন খাঁড়া বলে—তাও তো এখনো চোখে দেখোনি, আহা-উহু করতে লাগলে।

—ওসব চোখে দেখা আমার সহ্য হয় না। অপঘাত দেখলেই মাথা বিগড়ে যায়। গত মাঘ মাসে চেতলার দিদিমাকে পোড়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম কেওড়াতলায়। সেখানে দেখি রাজ্যের কলেজের মেয়ে হাতে বই-খাতা নিয়ে জড়ো হয়েছে। সব মালা আর ফুলের তোড়া নিয়ে এসেছে, একটা খাট ঘিরে ভিড়, শুনলাম কলেজের প্রথম বছরে মেয়ে একটা। সে দেওয়ালীর দিন সিন্থেটিক ফাইবারের শাড়ি পরে বেরোতে যাচ্ছিল, আগুন লেগে তলার দিকটা পুড়ে যায়। ঐ সব সিন্থেটিক কাপড়ও খুব ডেঞ্জারাস, বুঝলে সুরেন ? ওতে আগুন লাগলে তেমন দাউ দাউ করে জ্বলবে না, কিন্তু ফাইবার গলে গায়ের সঙ্গে আঠার মত সেঁটে যাবে, কেউ খুলতে পারবে না। মেয়েটারও তাই হয়েছিল, কয়েক মাস হাসপাতালে থেকে শেষ পর্যন্ত মারা গেছে ! ভিড়-টিড় ডিঙিয়ে উঁকি মেরে দেখে তাই তাজ্জব হয়ে গেলাম। ঠোঁট দুটো একটু শুকনো বটে, কিন্তু কি মরি-মরি রূপ, কচি, ফর্সা ! ঢল ঢল করছে মুখখানা। বুকের মধ্যে কেমন যে করে উঠল !

সুরেন খাঁড়া বলে—ওরকম কত মরছে রোজ !

গগনচাঁদ ব্যাপারটা 'কত'-র মধ্যে ফেলতে চায় না, বলল—না হে, এ মেয়েটাকে সকলের সঙ্গে এক করবে না। কী বলব তোমাকে, বললে পাপ হবে কিনা তাও জানি না, সেই মরা মেয়েটাকে দেখে আমার বুকে ভালবাসা জেগে উঠল। ভাবলাম, ও যদি এক্ষুনি বেঁচে ওঠে তো ওকে বিয়ে করি। সেই ছেলেবেলা থেকে অপঘাতে মৃত্যুর ওপর আমার বড় রাগ। কেন যে মানুষ অপঘাতে মরে !

সুরেন রুমালে ঘাড় গলা ঘষতে ঘষতে বলে—তোমার শরীরটাই হোঁৎকা, মন বচ্ছ নরম। মনটা আর একটু শক্ত না করলে কি টিকতে পারবে ? চারদিকের এত অপঘাত, মৃত্যু, অভাব—এসব সইতে হবে না ?

গগনচাঁদ একটু থমকে গিয়ে বলে—তোমাদের এক এক সময়ে এক এক রকমের কথা। কখনো বলছ গগনের মন নরম, কখনো বলছ গগনের মেজাজটা বড় গরম। ঠিক ঠিক ঠাওর পাও না নাকি !

সুরেন বলে—সে তত্ত্ব এখন থাক, আমি লাশটার কথা ভাবছি।

—ভাবছ কেন ?

—ভাবছি ছেলেটার চেহারা দেখেই বোঝা যায় যে কসরৎ করত। তুমি তো ব্যায়াম শেখাও, তা তোমার ছাত্রদের মধ্যে কেউ কিনা তা গিয়ে একবার দেখে আসবে নাকি !

গগন ঝোল নামিয়ে এক ফুঁয়ে জনতা স্টোভ নিভিয়ে দিল। বলল—ও, তাই আগমন হয়েছে !

boiRboi.net

—তাই।

—কিন্তু ভাই, ওসব দেখলে আমার রাতের খাওয়া হবে না।

—খেয়ে নিয়েই চল, আমি ততক্ষণ বসি।

গগন মাথা নেড়ে বলে—তাও হয় না, খাওয়ার পর ওসব দেখলে আমার বমি হয়ে যেতে পারে।

সুরেন বলে—তুমি আচ্ছা লোক হে! বলছি তো তেমন ঘেন্নার দৃশ্য কিছু নয়, কাটা ফাটা নেই, এক চামচে রক্তও দেখলাম না কোথাও। তেমন বীভৎস কিছু হলে না হয় কথা ছিল।

গগনের চেহারায় যে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস আর শান্ত দৃঢ় ভাবটা থাকে সেটা এখন আর রইল না। হঠাৎ সে ঘামছিল, অস্বস্তি বোধ করছিল।

বলল—কার না কার বেওয়ারিশ লাশ! তোমার তা নিয়ে অত মাথাব্যথা কেন? ছেড়ে দাও, পুলিস যা করার করবে।

সুরেন ভ্রু কুঁচকে গগনকে একটু দেখল। বলল—সে তো মুখ্যুও জানে। কিন্তু কথা হল, আমাদের এলাকায় ঘটনাটা ঘটে গেল। অনেকের সন্দেহ, খুন। তা সে যাই হোক, ছেলেটাকে চেনা গেলে অনেক ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যায়। পুলিস কত কি করবে তা তো জানি!

সুরেন এ অঞ্চলের প্রধান। গগন তা জানে। সে নিজে এখানে পাঁচ-সাত বছর আছে বটে, কিন্তু তার প্রভাব প্রতিপত্তি তেমন কিছু নয়। এক গোটা পাঁচেক জিমনাসিয়ামের কিছু ব্যায়ামের শিক্ষানবীশ আর স্থানীয় কয়েকজন তার পরিচিত লোক। সুরেনের মত সে এখানকার শিকড়গাড়া লোক নয়। সুরেনের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ভালই, কিন্তু এও জানে, সুরেনের মতে মত না দিয়ে চললে বিস্তর ঝামেলা। সুরেনের টাকার জোর আছে, দলের জোর আছে, নিজেকে সে এ অঞ্চলের রাজা ভাবে। বিপদ সেখানেই, এ অঞ্চলে যা ঘটে সব তার নিজের দায় বলে মনে করে সুরেন। ক্ষেপে গেলে সে অনেক দূর পর্যন্ত যায়।

গগন প্যান্ট পরল, জামা গায়ে গলিয়ে নিল। চপ্পলজোড়া পায়ে দিয়ে বলল—চল।

—খেলে না?

—না। যদি রুচি থাকে তো এসেই যা হোক দুটো মুখে দেব। নইলে আজ আর খাওয়া হল না।

boiRboi.net

দুই

গতবার সন্তু একটা বেড়ালকে ফাঁসী দিয়েছিল। বেড়ালটা অবশ্য খুবই চোর ছিল, ছিনতাই করত, মাঝে-মাঝে দু'একটা ডাকাতিও করেছে। যেমন সন্তুর ছোট বোন দুধ খেতে পারে না, রোজ সকালে মারধোরের ভয় দেখিয়ে দুধের গ্লাস হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়, আর তখন খুব অনিচ্ছায় সন্তুর বোন টুটু এক চুমুক করে খায় আর দশ মিনিট ধরে আগড়ুম-বাগড়ুম বকে, খেলে, বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। এই করতে করতে এক ঘণ্টা। ততক্ষণে দুধ ঠাণ্ডা মেরে যায়, মাছি পড়ে। বেড়ালটা এ সবই জেনে তক্কে তক্কে থাকত। এক সময়ে দেখা যেত, প্রায় সকালেই সে গেলাস কাৎ করে মেঝেময় দুধ ছড়িয়ে চেটে-পুটে খেয়ে গেছে। এটা চুরি। এরকম চুরি সে হামেশাই করত, আর ছিনতাই করত আরো কৌশলে। পাড়ার বাচ্চাদের খাওয়ার সময়টা কি করে যে তার জানা থাকত কে বলবে! ঠিকঠাক খাওয়ার সময়ে হাজির থাকত সে। মুখোমুখি বসে চোখ বুজে ঘুমোনোর ভান করত, আর সুযোগ হলেই এর হাত থেকে, তার পাত থেকে মাছের টুকরো কেড়ে নিয়ে হাওয়া। ডাকাতি করত মা-মাসীদের ওপর। কেউ মাছ কুটছে, গয়লার কাছ থেকে দুধ নিচ্ছে, কি হরিণঘাটার বোতল থেকে দুধ ডেকচিতে ঢালছে, অমনি হুড়ুশ করে কোত্থেকে এসে বাঘের মাসী ঠিক বাঘের মতই অ্যাও করে উঠত। দেখা গেছে মা-মাসীর হাত থেকে মাছ কেড়ে নিতে তার বাধেনি, দুধের ডেকচিও সে ওল্টাতে জানত মা-মাসীর হাতের নাগালে গিয়ে। ওরকম বাঁদর বিড়াল আর একটাও ছিল না। বিশাল সেই হুলোটা অবশ্য পরিপাটি দাঁতে নখে ইঁদুরও মেরেছে অনেক। সিংহবাড়ির ছন্নছাড়া বাগানটার একাধিক হেলে আর জাতি সাপ তার হাতে প্রাণ দিয়ে শহীদ হয়েছে। গায়ে ছিল অনেক আঁচড়-কামড়ের দাগ, রাস্তার কুকুরদের সঙ্গে প্রায়দিনই তার হাতাহাতি কামড়া-কামড়ি ছিল। কুকুররাও, কে জানে কেন, সমঝে চলত তাকে। রাস্তাঘাটে বেড়াল দেখলেই যেমন কুকুর হামলা করে, তেমন এই হুলোকে কেউ করত না। কে যেন বোধ হয় রায়েদের বুড়ী মা-ই হবে, বেড়ালটার নাম দিয়েছিল গুণ্ডা। সেই নামই হয়ে গেল। হুলো গুণ্ডা এ পাড়ায় যথেচ্ছাচার করে বেড়াত, ঢিল খেত, গাল তো খেতই।

সন্তুকে দু-একটা স্কুল থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। প্রথমটায় যে স্কুলে সে পড়ত তা ছিল সাহেবী স্কুল, খুব আদব-কায়দা ছিল, শৃঙ্খলা ছিল। সেখানে ভার্তি হওয়ার কিছু পরেই সন্তুর বাবা অধ্যাপক নানক চৌধুরীকে ডেকে স্কুলের রেকটর জানালেন—আপনার ছেলে মেণ্টালি ডিরেঞ্জড্। আপনারা ওকে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখান। আমরা আর দুমাস টুয়েলে রাখব, যদি ওর উন্নতি না হয় তো দুঃখের সঙ্গে টি সি দিতে বাধ্য হব।

নানক চৌধুরী আকাশ থেকে পড়লেন। আবার পড়লেনও না। কারণ তাঁর মনে বরাবরই একটা খটকা ছিল সন্তু সম্পর্কে। বয়সের তুলনায় সন্তু ছিল বেশী নিষ্ঠুর, কখনো কখনো মার খেলে হেসে ফেলে। এবং এমন সব দুষ্টুমি করে যার কোন মানে হয় না। যেমন সে ছাদের আলসের ওপর সাজিয়ে রাখা ফুলের ভারী টবের একটা

দুটো মাঝে মাঝে ধাক্কা দিয়ে নীচের রাস্তার ওপর ফেলে দেয়। রাস্তায় হাজার লোক চলে। একবার একটা সন্তুর বয়সী ছেলেরই মাথায় একটা টব পড়ল। সে ছেলেটা দীর্ঘ দিন হাসপাতালে থেকে যখন ছাড়া পেল তখন বোধবুদ্ধিহীন জরদগব হয়ে গেছে। যেমন সে একবার সেফটি-পিন দিয়ে টিয়াপাখির একটা চোখ কানা করে দিয়েছিল। টিয়ার চিৎকারে সবাই ছুটে গিয়ে দেখে, একটা চোখ থেকে অবিরল রক্ত পড়ছে লাল অশ্রুর মত। আর পাখিটা ডানা ঝাপটাচ্ছে আর ডাকছে। সে কি অমানুষিক চিৎকার! খাঁচার গায়েই সেফটিপিনটা আটকে ছিল। আর একবার সে তার ছোট বোনকে বারান্দার এক-ধারে দাঁড় করিয়ে জোরে গুলতি মারে। মরেই যেত মেয়েটা। বুকে লেগে দমবন্ধ হয়ে অজ্ঞান। হাসপাতালে গিয়ে সেই মেয়েকে ভাল করে আনতে হয়। তাই নানক চৌধুরী অবাক হলেও সামলে গেলেন। তবে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে না গিয়ে সন্তুকে বাড়ি ফিরে একনাগাড়ে মিনিট পনেরো ধরে প্রচণ্ড মারলেন।

দু-মাস পর ঠিক কথামতই টি-সি দিয়ে দিল স্কুল। দ্বিতীয় স্কুলটি অত ভাল নয়। কিন্তু সেখানেও কিছু ডিসিপ্লিন ছিল, ছেলেদের ওপর কড়া নজর রাখা হত। দু-মাস পর সেখান থেকে চিঠি এল—আপনার ছেলে পড়াশুনায় ভাল, কিন্তু অত্যন্ত চঞ্চল, তার জন্য আর পাঁচটা ছেলে নষ্ট হচ্ছে।

এক বছর বাদে সন্তু সেকেণ্ড হয়ে ক্লাসে উঠল। কিন্তু প্রমোশনের সঙ্গে তাকে টি-সি ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অগত্যা পাড়ার কাছাকাছি একটা গোয়ালমার্কা স্কুলে ছেলেকে ভর্তি করে এবার নিশ্চিন্ত হয়েছেন নানক চৌধুরী। এই স্কুলে দুষ্টু ছেলের দঙ্গল, তার ওপর গরীব স্কুল বলে কাউকে সহজে তাড়িয়ে দেয় না। বিশেষতঃ সন্তুর বেতন সব সময়ে পরিষ্কার থাকে, এবং ক্লাসে সে ফার্স্ট হয়। নানক চৌধুরীকে এখন সন্তুর ব্যাপার নিয়ে ভাবতে হয় না, তিনি নিজের লেখাপড়ায় মগ্ন থাকেন।

সন্তু ক্লাস নাইনে পড়ে। স্কুলের ফুটবল টিমে সে অপরিহার্য খেলোয়াড়। তা ছাড়া সে একটা ব্যায়ামাগারে ব্যায়াম শেখে। গগনচাঁদ শেখায়। সন্তুর খুব ইচ্ছে সে ইনস্ট্রুমেণ্ট নিয়ে ব্যায়াম করে। তাতে শরীরের পেশী খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। কিন্তু গগন যন্ত্র ছুঁতেই দেয় না, বলে—ওসব করলে শরীর পাকিয়ে শক্ত জিংড়ে মেরে যাবে, বাড়বে না। গগন তাই ফ্রি হ্যাণ্ড করায় আর রাজ্যের যোগব্যায়াম, ব্রিদিং, স্কিপিং আর দৌড়। সন্তু অবশ্য সে-কথা শোনে না। ফাঁক পেলেই রিং করে, প্যারালাল বার-এ ওঠে, ওজন তোলে, স্প্রিং টানে। গগন দেখলে ঝাপড় মাড়বে, কিংবা বকবে। তাই প্রায় সময়েই রাতের দিকে জিমনাসিয়ামে যখন গগন থাকে না, দু-চারজন চাকুরে ব্যায়ামবীর এসে কসরৎ করে আর নিজেদের চেহারা আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, তখন সন্তু এসে যন্ত্রপাতি নেড়ে ব্যায়াম করে।

গুণ্ডা বেড়ালটাকে গতবার সন্তু ধরেছিল সিংহীদের বাগানে। বাগান বলতে আর কিছু নেই! কোমর-সমান উঁচু আগাছায় ভরে গেছে চারধার। একটা পাথরের ফোয়ারা ভেঙে ফেটে কাৎ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকটা পামগাছের গায়ে বহুদূর পর্যন্ত লতা উঠেছে বেয়ে। সিংহীদের বাড়িতে কেউই থাকে না। বছর দেড়েক

আগে বুড়ো নীলমাধব সিং মারা গেলেন। হাড়কিপটে লোক ছিলেন। অত বড় বাড়ির মালিক, তবু থাকতেন ঠিক চাকরবাকরের মত, হেঁটো ধুতি, গায়ে একটা জামা, পায়ে রবারের চটি। একটা চাকর ছিল, সে-ই দেখাশোনা করত। নীলমাধবের একমাত্র ছেলে বিলেতে থাকে, আর কেউ নেই। অসুখ হলে লোকটা ডাক্তার ডাকতেন না, নিজেই হোমিওপ্যাথির বাক্স নিয়ে বসতেন। বাজার করতেন নিজের হাতে। যত সস্তা জিনিষ এনে রান্না করে খেতেন। বাগানে কাশীর পেয়ারা, সফেদা, আঁশফল বা জামরুল পাড়তে বাচ্চা-কাচ্চা কেউ ঢুকলে লাঠি নিয়ে তাড়া করতেন। একটা সড়ালে কুকুর ছিল, ভারী তেজী, সেটাকেও লেলিয়ে দিতেন। ছেঁড়া জামাকাপড় সেলাই করতেন বসে বসে। একটা বুড়ো হরিণ ছিল, সেটা বাগানে দড়িবাঁধা হয়ে চরে বেড়াত। নীল মাধব পাড়ার লোকজনদের সঙ্গে বড় একটা কথা বলতেন না তবে তাঁর সঙ্গে কেউ দেখা করতে গেলে খুশী হতেন, অনেক পুরনো দিনের গল্প ফেঁদে বসবেন। এ অবশ্য নীলমাধবের পৈতৃক সম্পত্তি। নিঃসন্তান জ্যাঠা মারা গেলে দেখা যায় উইল করে তিনি নীলমাধবকেই সব দিয়ে গেছেন। লোকে বলে নীলমাধব এক তান্ত্রিকের সাহায্যে বাণ মেরে জ্যাঠাকে খুন করে সম্পত্তি পায়। লোকের ধারণা, নীলমাধব তাঁর স্ত্রীকেও খুন করেছিলেন। এ সবই অবশ্য গুজব, কোন প্রমাণ নেই। তবে কথা চলে আসছে।

সন্তু একবার নীলমাধবের হাতে ধরা পড়েছিল। সে বড় সাংঘাতিক ব্যাপার।

চিরকালই জীবন্ত কোন কিছু দেখলেই তাকে উত্যক্ত করা সন্তুর স্বভাব, সে মানুষ বা জন্তু যাই হোক। তাদের একটা চাকর ছিল মহী। লোকটা চোখে বড় কম দেখতো। তার সঙ্গে রাস্তায় বেরোলেই সন্তু তাকে বরাবর—মহীদা, গাড়ি আসছে …এই বলে হাত ধরে রাস্তার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিত! এবং মহী কয়েকবারই এভাবে বিপদে পড়েছে। সন্তু তাকে বার-দুই নালার মধ্যেও ফেলে দেয়। এরকমই ছিল তার স্বভাব। তখন সিংহীদের বাগানের বুড়ো হরিণটাকে সে প্রায়ই ঢিল মারত সিংহীদের বাগানের ঘর-দেয়াল অনেক জায়গায় ভেঙে ফেটে গেছে। টপকানো সোজা। প্রায় দুপুরেই সন্তু দেয়াল টপকে আসত, বাগানে ঘুরত-টুরত, আর বাঁধা হরিণটাকে তাক করে গুলোত মারত। হরিণটার গায়ে চমৎকার কয়েকটা দাগ ছিল, সেই দাগগুলো লক্ষ্য করে গুলতি দিয়ে নিশানা অভ্যাস করত সে। আর তার লক্ষ্য ছিল, হরিণের কাজল-টানা চোখ। কখনো বা গাছের মত দুটি প্রকাণ্ড শিংকেও লক্ষ্য করে ঢিল মারত সে। একবার হরিণটাকে দড়ি টেনে নিয়ে গিয়ে বাগানের উত্তর দিকে একটা গহীন লতানে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়ে আটকে দেয়।

সন্তু জানত না যে বুড়ো নীলমাধবের দূরবীন আছে। এবং প্রায়দিনই নীলমাধব দূরবীন দিয়ে তাকে খুঁজত। একটা দুষ্টু ছেলে যে হরিণকে ঢিল মারে সেটা তাঁর জানা ছিল। প্রিয় হরিণের গায়ে তিনি দাগ খুঁজে পেতেন।

হরিণকে লতাগাছে আটকে দেওয়ার পরদিনই সন্তু ধরা পড়ে। সন্তু রোজকার মতই দুপুরে বাগানে ঢুকেছে, পকেটে গুলতি, চোখে শ্যেনদৃষ্টি। চারদিক রোদে খাঁ খাঁ করছে সিংহীবাগান। হরিণ চরছে। গাছে গাছে পাখি ও পতঙ্গের ভিড়।

শিরীষ গাছে একটা মৌচাক বাঁধছে মৌমাছিরা। বর্ষা তখনো পুরোপুরি আসেনি! চারধারে একপশলা বৃষ্টির পর ভ্যাপসা গরম।

সফেদা গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে সন্তু ফল দেখছিল। খয়েরি রঙের কী ফল ফলেছে গাছে। ভারে নুয়ে আছে গাছ। হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে এক থোপা ফল ধরেও ফেলেছিল সন্তু। সেই সময়ে পায়ের শব্দ পেল, আর খুব কাছ থেকে কুকুরের ডাক। তাকিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। তিন ধার থেকে তিনজন আসছে। এক দিক থেকে কুকুরটা, অন্য ধার থেকে চাকর, আর ঠিক সামনে একনলা বন্দুক হাতে নীলমাধব সিংহ। একটা লাফ দিয়ে সন্তু দৌড়েছিল। পারবে কেন? মস্ত সড়ালে কুকুরটাই তাকে পেল প্রথম। পায়ের ডিমে দাঁত বসিয়ে জন্তুটা ঘাসজঙ্গলে পেড়ে ফেলল তাকে। পা তখন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কুকুরটা তার বুকের ওপর থাপ পেতে আধখানা শরীরের ভার দিয়ে চেপে রেখেছে। আর ধারালো ঘাসের টানে কেটে যাচ্ছে সন্তুর কানের চামড়া। ডলা ঘাসের অদ্ভুত গন্ধ আসছে নাকে। বুকের ওপর বন্দুকের নল ঠেকিয়ে নীলমাধব বললেন—ওঠো। চাকরটা এসে ঘাড় চেপে ধরল। সন্তু কোন কথাই বলতে পারছিল না।

বুড়ো নীলমাধব নিয়ে গেলেন সেই বিশাল বাড়ির ভিতরে। সেইখানে অত ভয়ভীতির মধ্যেও ভারি লজ্জা পেয়েছিল সন্তু দেয়ালে দেয়ালে সব প্রকাণ্ড মেমসাহেবের ন্যাংটো ছবি, আর বড় বড় উঁচু টুলে ঐরকমই ন্যাংটো মেয়েমানুষের পাথরের মূর্তি দেখে।

সব শেষে একটা হলঘর। সেইখানে এনে দাঁড় করালেন নীলমাধব। মুখে কথা নেই। সিলিং থেকে একটা দড়ি টাঙানো, দড়ির নীচের দিকে ফাঁস, অন্য প্রান্তটা সিলিংয়ের আংটার ভিতর দিয়ে ঘুরে এসে কাছেই ঝুলছে।

নীলমাধব বললেন—তোমার ফাঁসী হবে।

এই বলে নীলমাধব দড়িটা টেনে-টুনে দেখতে লাগলেন। চাকরটাকে বললেন একটা টুল আনতে। কুকুরটা আশেপাশে ঘুর ঘুর করছিল। সন্তু বুঝল এইভাবেই ফাঁসী হয়। কিছু করার নেই।

গলায় সেই ফাঁস পরে টুলের ওপর ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে থেকেছিল সন্তু। চোখের পাতা ফেলেনি। অন্য প্রান্তের দড়িটা ধরে থেকে সেই এক ঘণ্টা নীলমাধব বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতাটা খুব খারাপ লাগেনি সন্তুর। নীলমাধবের পূর্বপুরুষ কিভাবে বাঘ ভালুক এবং মানুষ মারতেন তারই নানা কাহিনী! শেষ দিকটায় সন্তুর হাই উঠছিল। আর তাই দেখে নীলমাধব ভারী অবাক হয়েছিলেন।

যাই হোক, এক ঘণ্টা পর নীলমাধব তাকে টুল থেকে নামিয়ে একটা চাবুক দিয়ে গোটা কয় সপাং সপাং মারলেন। বললেন—ফের যদি বাগানে দেখি তো পুঁতে রাখব মাটির নীচে।

এই ঘটনার পর নীলমাধব বেশিদিন বাঁচেননি। তাঁর মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হরিণটা মারা যায়। সড়ালে কুকুরটাকে নিয়ে কেটে পড়ে চাকরটা। নীলমাধবের পেয়ারের হুলো বেড়ালটাই অনাথ হয়ে ঘুরে বেড়াত পাড়ায় পাড়ায়। বড়লোকের বেড়াল বলেই কি না কে জানে, তার মেজাজ অন্য সব বেড়ালের চেয়ে

boiRboi.net

অনেক কড়া ধাতের। চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, গুণ্ডামি কোনটাই আটকাত না।

কে একজন রটাল, নীলমাধব মরে গিয়ে বেড়ালটার ভর করে আছেন।

বিলেত থেকে কলকাঠি নেড়ে নীলমাধবের ছেলে কি করে যেন বাড়ি বিক্রি করে দিল। শোনা যাচ্ছে, এখানে শীগগির সব বড় বড় অ্যাপার্টমেণ্ট হাউস উঠবে।

তা সে উঠুক গে। গতবারের কথা বলে নিই আগে। হুলো গুণ্ডা বেড়ালকে সিংহীদের বাগানে তক্কে তক্কে থেকে একদিন পাকড়াও করে সন্তু। ডাকাবুকো ছেলে। বেড়ালটার গলায় দড়ি বেঁধে সেই বাড়িটায় ঢুকে যায়। এবং খুঁজে খুঁজে ছাড়া-বাড়ির জানালা টপকে ভিতরে ঢুকতেই ফাঁসীর হলঘরে আসে। সিলিং থেকে দড়ি টাঙানোর সাধ্য নেই। সে চেষ্টাও করে নি সন্তু।

একটা মোটা ভারী চেয়ারে দড়িটা কপিকলের মত লাগিয়ে বেড়ালটাকে অন্য প্রান্তে বেঁধে সে বলল—তোমার ফাঁসী হবে। বলেই দড়ি টেনে দিল।

এসময়ে এক বজ্রগম্ভীর গলা বলল—না, হবে না!

চমকে উঠে চারদিকে তাকিয়ে দেখল সন্তু। হাতের দড়ি সেই ফাঁকে টেনে নিয়ে গলায় দড়ি সমেত গুণ্ডা পালিয়ে যায়।

কাকে দেখেছিল সন্তু তা খুবই রহস্যময়। সন্তু কিছু মনে করতে পারে না। সে চমকে উঠে চারদিকে চেয়ে দেখছিল, এসময় কে তাকে মাথার পিছন দিকে ভারী কোন কিছু দিয়ে মারে। সন্তু অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল।

সন্ধ্যের পর নানক চৌধুরী এক অচেনা লোকের টেলিফোন পেয়ে সিংহীদের বাড়িতে লোকজন নিয়ে গিয়ে সন্তুকে উদ্ধার করে আনেন। এরপর দিন-সাতেক সন্তু ব্রেন-ফিবারে ভোগে। তারপর ভাল হয়ে যায়। এবং এ ঘটনার পর গুণ্ডাকেও এ লোকালয়ে আর দেখা যায় নি। একটা বেড়ালের কথা কে-ই বা মনে রাখে!

সন্তুর কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয়, অলক্ষ্যে তার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী কেউ আছে। সিংহদের বাড়িতে যে লোকটা তাকে মেরেছিল সে বাস্তবিক তার শত্রু নাও হতে পারে। তার বাবা নানক চৌধুরী মানুষটা খুবই নির্বিকার প্রকৃতির লোক। ঘটনার পর নানক চৌধুরী থানা-পুলিস করে নি। ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করেছে। সন্তুকেও তেমন জিজ্ঞাসাবাদ করে নি। এমন কি কে একজন যে নিজের নাম গোপন রেখে টেলিফোন করেছিল তারও খোঁজ করবার চেষ্টা করে নি। নানক চৌধুরী লোকটা ওইরকমই, প্রচুর পৈতৃক সম্পত্তি আর নগদ টাকা আছে। বিবাহসূত্রে শ্বশুরবাড়ির দিক থেকেও সম্পত্তি পেয়েছে কারণ বড়লোক শ্বশুরের ছেলে ছিল না, মাত্র দুটি মেয়ে। কাজেই তাঁর মৃত্যুর পর সম্পত্তি দুই মেয়ের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। নানক চৌধুরীর শালী, অর্থাৎ সন্তুর মাসীর ছেলেপুলে নেই। বয়স অবশ্য বেশী নয়, কিন্তু ডাক্তারী পরীক্ষায় জানা গেছে তার সন্তান-সম্ভাবনা নেই। সেই শালী সন্তুকে দত্তক চেয়ে রেখেছে। সন্তুর মাসী যদি অন্য কাউকে দত্তক না নেয় তবে তার সম্পত্তিও হয়তো

একদিন সন্তুই পাবে। মাসী সন্তুকে বড় ভালবাসে। সন্তুও জানে একমাত্র মাসী ছাড়া তাকে আর কেউ নিখাদ ভালবাসে না। যেমন মা—মা কোনদিন সন্তুর সঙ্গে তার বোনকে কোথাও বেড়াতে পাঠায় না বা একা খেলতে দেয় না। তার সন্দেহ, সন্তু ছোটবোনকে গলা টিপে মেরে ফেলবে। বাবা সন্তুর প্রতি খুবই উদাসীন। কেবল মাঝে মাঝে পেটানো ছাড়া সন্তুর অস্তিত্বই নেই তার কাছে। লোকটা সারাদিনই লেখাপড়া নিয়ে আছে। বই ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না।

সন্তুর সঙ্গী-সাথী প্রায় কেউই নেই। তার কারণ, প্রথমতঃ সন্তু বন্ধুবান্ধব বেশী বরদাস্ত করতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ সে কাউকেই খুব একটা ভালবাসতে পারে না। তৃতীয়তঃ সে যে ধরনের দুষ্টুমি করে সে ধরনের দুষ্টুমি খুব খারাপ ছেলেরাও করতে সাহস পায় না। সন্তু তাই একা। দু'চারজন সঙ্গী তার কাছে আসে বটে, কিন্তু কেউই খুব ঘনিষ্ঠ নয়।

কাল সন্ধ্যেবেলা কিন্তু জিমনাসিয়াম থেকে বেরিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল, সেই সময়ে কালুর সঙ্গে দেখা। কালুর বয়স বছর ষোলোর বেশী নয়। সন্তুদের ইস্কুলেই পড়ত, পড়া ছেড়ে দিয়ে এখন রিকশা চালায়। তবে রিকশা চালানো ছাড়া তার আরো কারবার আছে। স্টেশনে, বাজারে, লাইনের ধারে সে প্রায়ই চুরি ছিনতাই করে। কখনো ক্যানিং বা বারুইপুর থেকে চাল নিয়ে এসে কালোবাজারে বেচে। এই বয়সেই সে মদ খায় এবং খুব হুল্লোড়বাজী করে। সন্তুর সঙ্গে তার খুব একটা খাতির কখনো ছিল না। কিন্তু দেখা হলে তারা দুজনে দুজনকে 'কি রে, কেমন আছিসরে' বলে।

কাল কালু একটু অন্যরকম ছিল। সন্তু ওকে দূর থেকে মুখোমুখি দেখতে পেয়েই বুঝল, কালু মদ খেয়েছে। রিকশায় প্যাডল মেরে গান গাইতে গাইতে আসছে। চোখ দুটো চকচকে। সন্তুকে দেখেই রিকশা থামিয়ে বলল—উঠে পড়্।

সন্তু ভ্রূ কুঁচকে বলল—কোথায় যাব ?

—ওঠ্ না। তোকে একটা জিনিস দেখাব, এইমাত্র দেখে এলাম।

কৌতূহলী সন্তু উঠে পড়ল। কালু রিকশা ঘুরিয়ে পালবাজার পার হয়ে এক জায়গায় নিয়ে গেল তাকে। রিকশার বাতিটা খুলে হাতে নিয়ে বলল—আয়।

তারপর খানিক দূরে তারা নির্জনে পথহীন জমি ভেঙে রেল লাইনে উঠে এল। সেখানে একটা পায়েহাঁটা রাস্তার দাগ। আর একটু দূরেই একটা ছেলে পড়ে আছে।

কালু বলল—এই মার্ডারটা আমার চোখের সামনে হয়েছে।

—ছেলেটা কে ?

—চিনি না। তবে মার্ডারটা কে করেছে তা বলতে পারি।

—কে ?

কালু খুব ওস্তাদী হেসে বলল—যে পাঁচশো টাকা দেবে তাকে বলব। তোকে বলব কেন ?

boiboi.net

তিন

সুরেন খাঁড়া আর গগনচাঁদ রেল লাইনের ওপর উঠে এল। এ জায়গাটা অন্ধকার। লোকজন এখন আর কেউ নেই। সুরেন খাঁড়া টর্চ জেবলে চারিদিকে ফেলে বলল—হল কি? এইখানেই তো ছিল!

গগনচাঁদ ঘামছিল। অপঘাতের মড়া দেখতে তার খুবই অনিচ্ছা। বলতে কি রেলের উঁচু জমিটুকু সে প্রায় চোখ বুজেই পার হয়ে এসেছে। সুরেনের কথা শুনে চোখ খুলে বলল—নেই?

—দেখছি না।

এই কথা বলতেই সামনের অন্ধকার থেকে কে একজন বলল—এই তো একটু আগেই ধাঙড়রা নিয়ে গেছে, পুলিশ এসেছিল।

সুরেন টর্চটা ঘুরিয়ে ফেলল মুখের ওপর। লাইনের ধারে পাথরের স্তূপ জড়ো করেছে কুলিরা। লাইন মেরামত হবে। সেই একটা গিট্ঠি পাথরের স্তূপের ওপর কালু বসে আছে।

সুরেন খাঁড়া বলে—তুই এখানে কি করছিস?

—হাওয়া খাচ্ছি। কালু উদাস উত্তর দেয়।

—কখন নিয়ে গেল?

—একটু আগে। ঘণ্টা দুয়েক হবে।

—পুলিশ কিছু বলল? সুরেন জিজ্ঞেস করে।

ফের টর্চটা জ্বালতেই দেখা গেল, কালুর পা লম্বা হয়ে পাথরের স্তূপ থেকে নেমে এসেছে। ভূতের পায়ের মত, খুব রোগা পা। আর পায়ের পাতার কাছেই একটা দিশী মদের বোতল আর শালপাতার ঠোঙা।

কালু একটু নড়ে উঠে বলে—পুলিস কিছু বলে নি। পুলিস কখনো কিছু বলে না। কিন্তু আমি সব জানি।

—কী জানিস?

কালু মাতাল গলায় একটু হেসে বলে—সব জানি!

সুরেন খাঁড়া একটু হেসে বলে—হাওয়া খাচ্ছিস, না আর কিছু?

কালু তেমনি নির্বিকার ভাবে বলে—যা পাই খেয়ে দিই। পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেই আরাম। জায়গাটা ভরাট রাখা নিয়ে হচ্ছে কথা।

—ইঃ, মস্ত ফিলজফার!

কালু ফের মাতাল গলায় হাসে।

—পুলিসকে তুই কিছু বলেছিস? সুরেন জিজ্ঞেস করে।

—না। আমাকে কিছু তো জিজ্ঞেস করে নি। বলতে যাব কোন দুঃখে?

—জিজ্ঞেস করলে কি বলতিস?

—কি জানি!

boiRboi.net

—শালা মাতাল! সুরেন বলে।

মাথা নেড়ে কালু বলে—জাতে মাতাল হলে কি হয়, তালে ঠিক আছে সব। সব জানি।

—ছেলেটা কে জানিস্ ?

—আগে জানতাম না। একটু আগে জানতে পারলাম।

—কে ?

—বলব কেন ? যে ছেলেটাকে খুন করেছে তাকেও জানি।

—খুন! একটু অবাক হয় সুরেন—খুন কি রে ? সবাই বলছে রাতে ট্রেনের ধাক্কায় মরেছে!

মাথা নেড়ে কালু বলে—সন্ধ্যের আগে এইখানে খুন হয়। আমি নিজে চোখে দেখেছি। মাথায় প্রথমে ডাণ্ডা মারে, তখন ছেলেটা পড়ে যায়। তারপর গলায় কাপড় জড়িয়ে গলা টিপে মারে। আমি দেখছি।

—কে মারল ?

—বলব কেন ? পাঁচশো টাকা পেলে বলব!

—পুলিস যখন ধরে নিয়ে গিয়ে পেঁদিয়ে কথা বার করবে তখন কি করবি ?

—বলব না। যে খুন করেছে সে পাঁচশো টাকা দেয় তো কিছুতেই বলব না।

—ঠিক জানিস তুই ?

—জানাজানি কি! দেখেছি।

—বলবি না ?

—না।

গগনচাঁদ এতক্ষণ কথা বলে নি। এইখানে এমটা মৃত্যু ঘটেছে, এই ভেবে সে অস্বস্তি বোধ করছিল। এবার থাকতে না পেরে বলল—খুনের খবর চেপে রাখিস না। তোর বিপদ হবে।

—আমার বিপদ আবার কি! আমি তো কিছু করি নি। কালু বলল।

—দেখেছিস তো! সুরেন খাঁড়া বলে।

—দেখলে কি ?

—দেখলে বলে দিতে হয়। খুনের খবর চাপতে নেই। সুরেন নরম সুরে বলে।

কালু একটা হাই তুলে বলে—তাহলে দেখি নি।

—শালা মাতাল! সুরেন হেসে গগনচাঁদের দিকে তাকায়।

কালু একটু কর্কশ স্বরে বলে—বার বার মাতাল বলবেন না। সব শালাই মাল টানে আপনিও টানেন।

সুরেন একটা অস্ফুট শব্দ করল। ইদানীং সে বড় একটা হাঙ্গামা-হুজ্জৎ করে না। কিন্তু এখন হঠাৎ গগনচাঁদ বাধা দেওয়ার আগেই অন্ধকারে দশাসই শরীরটা নিয়ে দুই লাফে এগিয়ে গেল। আলগা নুড়ি পাথর খসে গেল পায়ের তলায়। ঠাস্ করে একটা প্রচণ্ড চড়ের শব্দ হল। কালু একবার 'আউ' করে চেঁচিয়ে চুপ করে গেল।

boiRboi.net

অলগা পাথরে পা হড়কে সুরেন পড়ে গিয়েছিল। অন্ধকারে কালুকে দেখা যাচ্ছিল না তবে সে-ও পড়ে গেছে, বোঝা যাচ্ছিল। এই সময়ে কাছেই একটা বাজ ফেটে পড়ল। বাতাস এল এলোমেলো। বৃষ্টির ফোঁটা বড় বড় করে পড়ছে।

সুরেন টর্চটা জ্বলতে গিয়ে দেখে, আলো জ্বলছে না। একটা কাতর শব্দ আসে পাথরের স্তূপের ওধার থেকে। সুরেন একটা মাঝারি পাথর কুড়িয়ে নিয়ে সেই শব্দটা লক্ষ্য করে ছুড়ে মারে। বলে—শালা যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

কাতর শব্দটা থেমে যায়!

গগনচাঁদ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। অন্ধকারে বৃষ্টির শব্দ পায় সে। আকাশে চাঁদ বা তারা কিছুই নেই। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে। খুব দুর্যোগ আসবে। গ্যারাজঘরের অবস্থাটা কি হবে, ভাবছিল সে। বৃষ্টিতে তার বড় বিপদ।

সুরেন দাঁড়িয়ে নিজের ডান হাতের কনুইটা টিপে টিপে অনুভব করছে। বলে—শালা জোর লেগেছে। রক্ত পড়ছে!

আবার বিদ্যুৎ চমকায়। আবার। গগনচাঁদ দেখতে পায়, কালু লাইনের ধারে পড়ে আছে, তার ডান হাতটা রেল লাইনের ওপরে পাতা। মুহুর্মুহু গাড়ি যায়। যে কোন মুহূর্তে ওর ডান হাতটা দু-ফালা করে বেরিয়ে যাবে।

ভাবতে ভাবতেই খুব ক্ষীণ হলুদ একটা আলো এসে পড়ল লাইনের ওপর। বহু দূরে অন্ধকারের কপালে টিপের মত একটা গোল হলুদ আলো স্থির হয়ে আছে। গাড়ি আসছে।

গগনচাঁদ কিছু ধীর-স্থির। টপ করে কোন কাজ করে ফেলতে পারে না। সময় লাগে। এমন কি ভাবনা-চিন্তাতেও সে বড় ধীর! কখন কি করতে হবে তা বুঝে উঠতে সময় লাগে।

তাই সে গাড়ির আলো দেখল, কালুর কথা ভাবল, কি করতে হবে তাও ভাবল! এভাবে বেশ কয়েক সেকেণ্ড সময় কাটিয়ে সে ধীরে-সুস্থে পাথরের স্তূপটা পার হয়ে এল। গাড়িটা আর খুব দূরে নেই। সে নীচু হয়ে পাঁজাকোলা করে কালুকে সরিয়ে আনল লাইন থেকে খানিকটা দূরে। একটা পায়ে-হাঁটা রাস্তা গেছে লাইন ঘেঁসে। এখানে ঘাসজমি কিছু পরিষ্কার। সেখানে শুইয়ে দিল। এবং টের পেল মুশল-ধারে বৃষ্টির তোড়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড চারদিকে। সব অস্পষ্ট। তাপদগ্ধ মাটি ভিজে এক রকম তাপ উঠেও চারদিকে অন্ধকার করে দিচ্ছে।

সুরেন খাঁড়া বলল—ওর জন্য চিন্তা করতে হবে না। চল।

গগনচাঁদ কালুর বুক দেখল। এত বৃষ্টিতে বুকের ধুকধুকুনিটা বোঝা যায় না। নাড়ি দেখল। নাড়ি চালু আছে।

গগনচাঁদ বৃষ্টির শব্দের ওপর গলা তুলে বলল—জ্ঞান নেই। এ অবস্থায় ফেলে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

প্রায় নিঃশব্দে বৈদ্যুতিক ট্রেনটা এল। চলে গেল। আবার দ্বিগুণ অন্ধকারে ডুবে গেল জায়গাটা। সুরেনের খেয়াল হল, গাড়িটা ডাউন লাইন দিয়ে গেল। কালুর হাতটা ছিল আপ লাইনের ওপর। এ গাড়িটায় কালুর হাত কাটা যেত না।

boiRboi.net

সুরেনের গলায় এখনো রাগ। বলল—পড়ে থাক। অনেকদিন শালার খুব বাড় দেখছি। চল, কাকভেজা হয়ে গেলাম।

গগনদাদ দেখল, বৃষ্টির জল পড়ায় কালু নড়াচড়া করছে। গগন তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে বলে—তুমি যাও, স্টেশনের শেডের তলায় দাঁড়াও গিয়ে। আমি আর একটু দেখে যাচ্ছি।

মাটি ফুড়ে বৃষ্টির ফোঁটা ঢুকে যাচ্ছে এত তোড়। কোন মানুষই দাঁড়াতে পারে না। চামড়া ফেটে যায়। সুরেন একটা বজ্রপাতের শব্দের মধ্যে চেঁচিয়ে বলল—দেরি করো না।

বলে কোলকুঁজো হয়ে দৌড় মারল।

প্রচণ্ড বৃষ্টির ঝাপটায় কালুর মাথার অন্ধকার কেটে গেছে। গগনচাঁদ অন্ধকারেই তাকে ঠাহর করে বগলের তলায় হাত দিয়ে তুলে বসাল। কালু বসে ফোঁপাচ্ছে।

গগন কালুর মুখ দেখতে পেল না। কেবল অন্ধকারে একটা মানুষের আবছায়া। গগন বলল—ওঠ।

কালু উঠল।

অল্প দূরেই একটা না-হওয়া বাড়ি। ভারা বাঁধা রয়েছে। একতলার ছাদ ঢালাই হয়ে গেছে, এখন দোতলা উঠছে। পিছল পথ বেয়ে কালুকে ধরে সেখানেই নিয়ে এল গগনচাঁদ।

গা মুছবার কিছু নেই। সারা গা বেয়ে জল পড়ছে। গগন গায়ের জামাটা খুলে নিংড়ে নিয়ে মাথা আর মুখ মুছল। কালু উবু হয়ে বসে বমি করছে, একবার তাকিয়ে দেখল গগন। বমি করে নিজেই উঠে গিয়ে বৃষ্টির জল হাত বাড়িয়ে কোষে ধরে মুখে-চোখে ঝাপটা দিল।

তারপর ফের মেঝেয় বসে পড়ে বলল—শরীরে কি কিছু আছে নাকি! মাল খেয়ে আর গাঁজা টেনে সব ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

গগনচাঁদ সে কথায় কান না দিয়ে বলল—তোর রিকশা কোথায়?

—সে আজ মাতু চালাচ্ছে। আমি ছুটি নিয়েছি আজকের দিনটা।

—কেন?

—মনে করেছিলাম আজ পাঁচশো টাকা পাব।

গগন চুপ করে থাকে। কালুটা বোকা। সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে।

গগন বললে—যে ছেলেটা খুন হয়েছে সে এখানকার নয়?

কালু হাঁটুতে মুখ গুঁজে ভেজা গায়ে বসেছিল। প্রথমটায় উত্তর দিল না।

তারপর বলল—বিড়ি-টিড়ি আছে?

—আমি তো খাই না।

কালু ট্যাঁক হাতড়ে বলল—আমার ছিল। কিন্তু সব ভিজে ন্যাতা হয়ে গেছে।

ভেজা বিড়ি বের করে কালু অন্ধকারেই টিপে দেখল, ম্যাচিস থেকে এক কোষ জল বেরোল। সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটা অস্পষ্ট খিস্তি করে কালু বলে—সুরেন শালার খুব তেল হয়েছে গগনদা, জানলে?

boiRboi.net

গগন অন্ধকারে কালুর দিকে চাইল। তেল কালুরও হয়েছে। আজকাল সকলেরই খুব তেল।

গগন বলল—ছেলেটা কি এখানকার?

—কোন্ ছেলেটা?

—যে খুন হল?

—সে সব বলতে পারব না।

—কেন?

—বলা বারণ। কালু উদাস গলায় বলে।

গগনচাঁদ একটু চুপ করে থেকে একটা মিথ্যে কথা বলল—শোন একটু আগে সুরেন যখন তোকে মেরেছিল, তখন তুই অজ্ঞান হয়ে গেলি। তোর ডান হাতটা রেল লাইনের ওপর গিয়ে পড়েছিল। আর ঠিক সেই সময় গাড়ি আসছিল। আমি তোকে সরিয়ে না আনলে ঠিক তোর হাতটা চলে যেত আজ।

কালু নড়ল না, কেবল বলল—মাইরি।

—তোর বিশ্বাস হচ্ছে না?

কালু হঠাৎ আবার উদাস হয়ে গিয়ে বলল—তাতে কি হয়েছে? তুমি না সরালে একটা হাত চলে যেত! তা যেত তো যেত। এক-আধটা হাত-পা গেলেই কি থাকলেই কি!

গগনচাঁদ একটা রাগ চেপে গিয়ে বলল—দূর ব্যাটা, হাত-কাটা হয়ে ঘুরে বেড়াতিস তাহলে! রিক্সা চালাত কে?

—চালাতাম না। ভিক্ষে করে খেতাম। ভিক্ষেই ভাল, জানলে গগনদা। তোমাদের এলাকার রাস্তাঘাট যা তাতে রিকশা টানতে জান বেরিয়ে যায়। পোষায় না। শরীরেও কিছু নেই।

—কথাটা বলবি না তাহলে?

কালু একটু চুপ করে থেকে বলে—বলল, পাঁচটা টাকা দাও।

গগন একটু অবাক হয়ে বলে— টাকা! টাকা কেন?

—নইলে বলব না।

গগন একটু হেসে বলে—খুব টাকা চিনেছিস! কিন্তু এটা এমন কিছু খবর নয় রে। পুলিসের কাছে গেলেই জানা যায়।

—তাই যাও না।

গগনেরও ইচ্ছে হয় এগিয়ে গিয়ে কালুর গলাটা টিপে ধরে। সুরেন যে ওকে মেরেছে যে কথা মনে করে গগন খুশীই হল। বলল—টাকা অত সস্তা নয়।

—অনেকের কাছে সস্তা।

গগন মাথা নেড়ে বলে—তা বটে। কিন্তু আমার টাকা দামী।

কালু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে—দিও না।

গগন একটু ভেবে বলে—কিন্তু যদি পুলিসকে বলে দিই?

—কি বলবে?

—বলব খুনটা তুই নিজের চোখে দেখেছিস!

boiRboi.net

—বলো গে না, কে আটকাচ্ছে ?

—পুলিস নিয়ে গিয়ে তোকে বাঁশডলা দেবে !

—দিক। কালু নির্বিকার ভাবে বলে—অত ভয় দেখাচ্ছ কেন ? যে মরেছে আর যে মেরেছে তাদের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক কি ? যে যার নিজের ধান্দায় কেটে পড় তো। কেবল তখন থেকে খবর বের করার চেষ্টা করছ, তোমাদের এত খতেনে দরকার কি ?

গগনচাঁদ ভেবে দেখল, সত্যিই তো। তার তো কিছু যায় আসে না। কে কাকে খুন করেছে তাতে তার কি ? সুরেন খাঁড়া এই ভরসন্ধ্যাবেলা তাকে ভুজুং-ভাজুং দিয়ে না আনলে সে মড়া দেখতে আসতও না। যে মরল সে বিষয়ে একটা কৌতূহল ভিতরে ভিতরে রয়ে গেছে। বিশেষতঃ যখন শুনেছ যে মরা ছেলেটার শরীরটা কসরৎ করা। ভাল শরীরওয়ালা একটা ছেলে মরে গেছে শুনে মনটা খারাপ লাগে। কত কষ্টে এক একটা শরীর বানাতে হয়। সেই আদরের শরীর কাটা-ছেঁড়া হয়ে যাবে ! ভাবতে কেমন লাগে ?

বৃষ্টির তোড়টা কিছু কমেছে। কিন্তু এখনো অবিরল পড়ছে। আধখ্যাঁচড়া বাড়িটার জানালা-দরজার পাল্লা বসে নি, ফাঁক ফোকরগুলি দিয়ে জলকণা উড়ে আসছে। বাতাস বেজায়। শীত ধরিয়ে দিল। এধার ওধার বিস্তর বালি, নুড়িপাথর স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। কিছু লোহার শিকও। একটা লোক ছাতা মাথায়, টর্চ হাতে উঠে এল রাস্তা থেকে। ছাতা বন্ধ করে টর্চটা একবার ঘুরিয়ে ফেলল গগন-চাঁদের দিকে, অন্যবার কালুর দিকে। একহাতে বাজারের থলি। গলাখাঁকারি দিয়ে বাড়ির ভিতর দিকে একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সে ঘরের দরজায় টিনের অস্থায়ী ঝাঁপ লাগানো। লোকটা ঝাঁপের তালা খুলে ভিতরে ঢুকে গেল। চৌকিদার হবে।

কালু উঠে বলল—দেখি, লোকটার কাছে একটা বিড়ি পাই কিনা, বড্ড শীত ধরিয়ে দিচ্ছে !

কালু গিয়ে একটু বাদেই ফিরে এল। মুখে জ্বলন্ত বিড়ি। বলল—সুরেন শালা জোর মেরেছে, জানলে গগনদা ? চোয়ালের হাড় নড়ে গেছে, বিড়ি টানতে টের পেলাম। বসে বসে খায় তো সুরেন, তাই গা-গতরে খাসী, আমাদের মত রিকশা টানলে গতরে তেল জমতে পারত না।

গগন গম্ভীর ভাবে বলে—হুঁ।

হঠাৎ উবু হয়ে বসে বসে বিড়ি টানতে টানতেই বোধ হয় কালুর মেজাজটা ভাল হয়ে গেল। বলল—যে ছেলেটা খুন হয়েছে তাকে তুমি চেনো গগনদা !

গগন বাইরে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির ভাব-সাব বুঝবার চেষ্টা করছিল। স্টেশনে সুরেন অপেক্ষা করছে। যাওয়া দরকার। কালুর কথা শুনে বলল—চিনি ?

—হুঁ।

—কে রে ?

—এক বাণ্ডিল বিড়ি কেনার পয়সা দেবে তো ? আর একটা ম্যাচিস ?

গগন হেসে বলে—খবরটার জন্য দেব না।

boiRboi.net

—দিও মাইরি। কালু মিনতি করে—আজকের রোজগারটা এমনিতেই গেছে। বিড়ি আর ম্যাচিসও গচ্চা গেল।

গগন বলল—দেব।

কালু বলল—আগে দাও।

গগন দিল।

কালু বলে—ছেলেটা বেগমের ছেলে।

—বেগম কে?

—তোমার বাড়িওলা নরেশ মজুমদারের শালী। নষ্ট মেয়েছেলে, বাপুজী নগরে থাকে।

—ও। বলে খানিকটা চমকে ওঠে গগন।

—ছেলেটা তোমার আখড়ায় ব্যায়াম করত। সবাই ফলি বলে ডাকে। লোকে বলে, ও নাকি নরেশ মজুমদারেরই ছেলে।

—জানি। এসব কথা চাপা দেওয়ার জন্যই গগন তাড়াতাড়ি বলে—আর কি জানিস?

—তেমন কিছু না। ছেলেটা বহুকাল হল পাড়া ছেড়ে পালিয়েছে। খুব পাজী বদমাশ ছেলে। ইদানীং ট্যাবলেট বেচতে আসত।

—ট্যাবলেট! অবাক মানে গগন।

—ট্যাবলেট, যা খেলে নেশা হয়! প্রথম প্রথম বিনা পয়সায় খাওয়াত ছেলে-ছোকরাদের। তারপর নেশা জমে উঠলে পয়সা নিত। অনেককে নেশা ধরিয়েছে।

—ড্রাগ নাকি? গগন জিজ্ঞেস করে।

—কি জানি কি! শুনেছি খুব সাংঘাতিক নেশা হয়।

গগন বলল—এ পাড়ায় যাতায়াত ছিল তো, ওকে কেউ চিনতে পারল না কেন?

কালু হেসে বলল—দিনমানে আসত না। রাতে আসত। তাছাড়া অনেকদিন পাড়া ছেড়ে গেছে, কে আর মনে রাখে! আর চিনতে চায় ক'জন বল! সবাই চিনি না চিনি না বলে এড়িয়ে যায়। ঝঞ্ঝাট তো।

—নরেশ মজুমদার খবর করে নি?

—কে জানে? জানলে আসত ঠিকই, নিজের সন্তান তো। বোধহয় খুব ভাল করে খবর পায় নি।

বৃষ্টি ধরে এল। এখনো টিপটিপিয়ে পড়ছে। এই টিপটিপানিটা সহজে থামবে না, লাগাতার চলবে। রাতের দিকে ফের ঝেঁপে আসবে হয়তো।

গগন গলা নামিয়ে বলল—সত্যিই খুন হতে দেখেছিস? নাকি গুল ঝাড়ছিস?

কালু হাতের একটা ঝাপট মেরে বলে—শুধু শুধু গল্প ফেঁদে লাভ কি! আমার মাথায় অত গল্প খেলে না!

—ছেলেটাকে তুই চিনলি কি করে? গগন জিজ্ঞেস করে।

—কোন্ ছেলেটাকে?

—যে খুন হয়েছে, ফলি।

boiRboi.net

—প্রথমটায় চিনতে পারি নি। এক কেৎরে উপুড় হয়ে পড়েছিল, একটু চেনা-চেনা লাগছিল বটে। পুলিস যখন ধাঙড় এনে বডি চিৎ করল তখনই চিনতে পারলাম। নামটা অবশ্য ধরতে পারিনি তখনো। পুলিসের একটা লোকই তখন বলল—এ তো ফলি, অ্যাবসকণ্ডার। তখন ঝড়াক করে সব মনে পড়ে গেল। ইদানীং নেশা-ভাং করে মাথাটাও গেছে আমার, সব মনে রাখতে পারি না।

গগন খুব ভেবে বলল—খুনের ব্যাপারটাও মনে না রাখলে ভাল করতিস। যে খুন করেছে সে যদি টের পায় যে তুই সাক্ষী আছিস, তাহলে তোকে ধরবে!

—ধরুক না। তাই তো চাইছি! পাঁচ-কানে কথাটা তুলেছি কেন জানো? যাতে খুনীর কাছে খবর পেঁছয়!

—পেঁছলে কি হবে?

—পাঁচশো টাকা পাব, আর খবরটা চেপে যাব।

—ব্ল্যাকমেল করবি কালু?

কালু হাই তুলে বলে—আমি অত ইংরিজি জানি না।

গগন একটা শ্বাস ফেলে বলে—সাবধানে থাকিস।

কালু বলল—ফলিকে তুমি চিনতে পারলে?

গগন মাথা নেড়ে বলে—চিনেছি। আমার কাছে কিছুদিন ব্যায়াম শিখেছিল। লেগে থাকলে ভাল শরীর হত।

শরীর! বলে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী করে কালু। বলে—শরীর দিয়ে কি হয় গগনদা? অত বড় চেহারা নিয়েও তো কিছু করতে পারল না। এক ঘা ডাণ্ডা খেয়ে ঢলে পড়ল। তারপর গলা টিপে…ফুঃ!

গগন টিপ টিপ বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে এল। তার মাথার মধ্যে বেগম শব্দটা ঘুরছিল। শোভারাণীর বোন বেগম। খুব সুন্দর না হলেও বেগমের চেহারায় কি যেন একটা আছে যা পুরুষকে টানে। এখন বেগমের বয়স বোধ হয় চল্লিশের কাছাকাছি। কিন্তু চেহারা এখনো চমৎকার যুবতীর মত। শোনা যায় স্বামী আছে! কিন্তু সেই স্বামী বড় হাবাগোবা মানুষ। কোন একটা কলেজে ডেমনস্ট্রেটরের চাকরি করে। বেগম তাকে ট্যাঁকে গুঁজে রাখে। আসলে বেগমের যে একজন স্বামী আছে এ খোঁজই অনেকে পায় না। তার বাইরের ঘরে অনেক ছোকরা ভদ্রলোক এসে সন্ধ্যেবেলায় আড্ডা বসায়, তাসটাস খেলে, নেশার জিনিসও থাকে। লোকে বলে, ঐটেই বেগমের আসল ব্যবসা। আড্ডার নলচে আড়াল করে সে ফুর্তির ব্যবসা করে। তা বেগম থাকেও ভাল। দামী জামাকাপড়, মূল্যবান গৃহসজ্জা, চাকর-বাকর, দাসদাসী তো আছেই, ইদানীং একটা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড বিলিতি গাড়িও হয়েছে।

কয়েক বছর আগে নিঃসন্তান নরেশ আর শোভা বেগমের ছেলেকে পালবে পুষবে বলে নিয়ে আসে। বেগমও আপত্তি করে নি। তার যা ব্যবসা তাতে ছেলেপুলে কাছে থাকলে বড় ব্যাঘাত হয়। তাই ছোট্ট ফলিকে এনে তুলল নরেশ মজুমদার। লোকে বলাবলি করল যে, নরেশ আসলে নিজের জায়গা মত নিয়ে এসেছে। হতেও পারে। বেগমের স্বামীর পৌরুষ সম্পর্কে কারোরই খুব একটা উচ্চ ধারণা নেই।

ফলিকে এনে নরেশ ভাল ইস্কুলে ভর্তি করে দেয়। ছেলেটার খেলাধুলোর প্রতি টান ছিল, তাই একদিন নরেশ তাকে গগনচাঁদের আখড়াতেও ভর্তি করে দিল। কিছু ছেলে থাকে, যাদের শরীরের গঠনটাই চমৎকার। এসব ছেলে অল্প কসরৎ করলেই শরীরের গুপ্ত এবং অপুষ্ট পেশীগুলি বেরিয়ে আসে। নিখুঁত শরীরের খুব অভাব দেশে। গগনচাঁদ তার ব্যায়ামের শিক্ষকতার জীবনে বলতে গেলে এই প্রথম মজবুত হাড় আর সুষম কাঠামোর শরীর পেল। এক নজর দেখেই গগনচাঁদ বলে দিয়েছিল—যদি খাটো তো তুমি একদিন মিস্টার ইউনিভার্স হবে।

তা হতও বোধ হয় ফলি। কিছুকাল গগনচাঁদ তাকে যোগব্যায়াম আর ফ্রি-হ্যাণ্ড করায়। খুব ভোরে উঠে সে নিজে কেড্স্ আর হাফপ্যাণ্ট পরে ফলিকে সঙ্গে নিয়ে দৌড়ত। পুরো চত্বরটা ঘুরে ঘুরে গায়ের ঘাম ঝরাত। তারপর ফিরে এসে খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর আসন করাত। বিকেলে ফ্রি-হ্যাণ্ড। ফলি খানিকটা তৈরি হয়ে উঠতেই তাকে অল্পস্বল্প যন্ত্রপাতি ধরিয়ে দিয়েছিল গগন। খুব কড়া নজর রাখত, যাতে ফলির শরীরে কোন পেশী শক্ত না হয়ে যায়। যাতে বাড় না বন্ধ হয়। ফলি নিজেও খাটত। আশ্চর্যের বিষয়, কসরৎ করা ছেলেদের মাথা মোটা হয়, প্রায়ই বুদ্ধি বা লেখাপড়ার দিকে খাঁকতি থাকে। মনটা হয় শরীরমুখী। ফলির সেরকম ছিল না। সে লেখাপড়ায় বেশ ভাল ছিল। খরবুদ্ধি ছিল তার।

শোভারাণী অবশ্য খুব সন্তুষ্ট ছিল না। প্রায়ই ওপরতলা থেকে তার গলা পাওয়া যেত, নরেশকে বকাবকি করছে—ঐ গুণ্ডাটার সঙ্গে থেকে ফলিটা গুণ্ডা তৈরী হবে। কেন তুমি ওকে ঐ গুণ্ডার কাছে দিয়েছ ?

ফলির শরীর সদ্য তৈরী হয়ে আসছিল। কত আর বয়স হবে তখন, বড়জোর ষোল! বিশাল সুন্দর দেখনসই চেহারা নিয়ে পাড়ায় যখন ঘুরে বেড়াত তখন পাঁচজনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখত। আর সেইটেই ফলির কাল হল। সেই সময়ে সে পড়ল মেয়েছেলের পাল্লায়। প্রথমে গার্লস স্কুলের পথে একটি মেয়ে তাকে দেখে প্রেমে পড়ে! সেটার গর্দিশ কাটবার আগেই মুন্সীবাড়ির বড় মেয়ে, যাকে স্বামী নেয় না, বয়সেও সে ফলির চেয়ে অন্তত চৌদ্দ বছরের বড়, সেই মেয়েটা ফলিকে পটিয়ে নিল। সেখানেই শেষ নয়। এ বাড়ির ছোট বৌ, সে বাড়ির ধুমসী মেয়ে, এরকম ডজনখানেক মেয়েছেলের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে ফলি, মাত্র ষোল-সতেরো বছর বয়সেই। সম্পর্কটা শারীরিক ছিল, কারণ অত মেয়েছেলের সঙ্গে মিশলে বস্তু থাকে না, প্রেম ইত্যাদি ভাবপ্রবণতার ব্যাপারকে ফক্কিকারী বলে মনে হয়।

গগনচাঁদ মেয়েছেলের ব্যাপারে কিছু বিরক্ত ছিল। সে নিজে মেয়েছেলের সঙ্গ পছন্দ করত না। মেয়েছেলে বড় নির্বোধ আর ঝগড়াটে জাত, এই ছিল গগনের ধারণা। এমন নয় যে তার কামবোধ বা মেয়েদের প্রতি লোভ নেই। সে সবই ঠিক আছে, কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে সারাদিন ধরে মেলামেশা, এবং মেয়ে-শরীরের অতিরিক্ত সংস্পর্শ তার পছন্দ নয়। উপরন্তু তার কিছু নীতিবোধ এবং ধর্মভয়ও কাজ করে। প্রথমটায় যদিও ফলিকে এ নিয়ে কিছু বলে নি গগন। কিন্তু অবশেষে সেণ্ট্রাল রোডের একটি কিশোরী মেয়ে গর্ভবতী হওয়ার পর গগন আর থাকতে পারে নি। মেয়েটার দাদা আর এক প্রেমিক এ নিয়ে খুব তড়পায়। কিন্তু ফলিকে

সরাসরি কিছু করার সাধ্য ছিল না। কারণ ফলির তখন একটা দল হয়েছে, উপরন্তু তার মাসী আর মেসোর টাকার জোর আছে। তাই সেই দাদা আর প্রেমিক দুজনে এসে একদিন গগনকে ধরল। দাদার ইচ্ছে, ফলি মেয়েটিকে বিয়ে করে ঝামেলা মিটিয়ে দিক। আর প্রেমিকটির ইচ্ছে, ফলিকে আড়ংধোলাই দেওয়া হোক বা খুন করা হোক বা পুলিসের হাতে দেওয়া হোক।

কিন্তু গগন ফলির অভিভাবক নয়। সে ফলিকে শাসন করার ক্ষমতাও রাখে না। সে মাত্র ব্যায়াম-শিক্ষক। তবু ফলিকে ডেকে গগন জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। ফলির গগনের প্রতি কিছু আনুগত্য ও ভালবাসা ছিল তখনো। কারণ গগন বাস্তবিক ফলিকে ভালবাসত। আর ভালবাসা জিনিসটা কে না টের পায়! কিন্তু ফলিরও কিছু ছিল না। মেয়েছেলেরা তার জন্য পাগল হলে সে কী-ই বা করতে পারে! যত মেয়ে তার সংস্পর্শে আসে সবাইকে তো একার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়। তাছাড়া মাত্র ষোল-সতেরো বছর বয়সে বিয়ে করাও কি ঠিক? এসব কথা ফলি খোলসা করেই গগনকে বলেছিল।

গগন বুঝল। এবং সে রাতারাতি ফলিকে অন্য জায়গায় পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়।

ফলি কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে যায়। তার ফলে শোভারাণী গগনের শ্রাদ্ধ করল কিছুদিন। তার ধারণা, গগনই ফলিকে গুম করেছে। সেটা সত্যি না হলেও ফলির পালানোর পিছনে গগনের যে হাত ছিল তা মিথ্যে নয়। ফলি চলে যাওয়ায় পাড়া শান্ত হল। সেই কিশোরীটির পেটের বাচ্চা নষ্ট করে দিয়ে লোকলজ্জার ব্যাপারটা চাপা দেওয়া হল। যেসব মেয়ে বা মহিলা ফলির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল তারা কিছু মুষড়ে পড়ল। তবে অনেক স্বামী এবং অভিভাবক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল।

ফলি কোথায় গিয়েছিল তা কেউ জানে না। তবে সে বেগম অর্থাৎ মায়ের আশ্রয়ে আর যায় নি। কেননা সেখানে গেলেও তার ধরা পড়ার সম্ভাবনা ছিল। তবে লোকে বলে যে বেগমের সঙ্গে সে যোগাযোগ রেখে চলত।

কিন্তু গগন আজ এই ভেবেই খুব বিস্ময় বোধ করছিল যে, ফলির মত বিখ্যাত ছেলের মৃতদেহ দেখেও কেন কেউ সনাক্ত করতে পারল না! ঠিক কথা যে, ফলি বহুদিন হল এ এলাকা ছেড়ে গেছে, তবু তাকে না চিনবার কথা নয়। বিশেষতঃ সুরেন খাঁড়ার তো নয়ই।

রেল লাইন ধরে হেঁটে এসে গগনচাঁদ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে উঠল। প্ল্যাটফর্মটা এখন প্রায় ফাঁকা। বুকিং অফিসের সামনে ফলওয়ালা ঝুড়ি নিয়ে বসে আছে, তারই পাশে দাঁড়িয়ে সুরেন সিগারেট টানছে। গগন কিছু অবাক হল। সুরেন খাঁড়া বড় একটা ধূমপান করে না।

তাকে দেখেই সুরেন এগিয়ে এসে বলল—কী হল?

গগন কিছু বিস্মিত ভাবেই বলে—তুমি ফলিকে চিনতে পার নি?

—ফলি! কোন্ ফলি? কার কথা বলছ?

—যে ছেলেটা মারা গেছে। আমাদের নরেশ মজুমদারের শালীর ছেলে।

সুরেন একটু চুপ করে থেকে বলে—বেগমের সেই লুচ্চা ছেলেটা ?

—সে-ই। তোমার তো চেনা উচিত ছিল। তাছাড়া তুমি যে বয়স বলেছিলে, ফলির বয়স তা নয়। কম করেও উনিশ-কুড়ি বা কিছু বেশীই হতে পারে।

সুরেন গম্ভীর ভাবে বলল—চেনা কি সোজা ? এই লম্বা চুল, মস্ত গোঁফ, মস্ত জুলপী তা ছাড়া বহুকাল আগে দেখেছি, মনে ছিল না। তবে চেনা চেনা ঠেকছিল বটে, তাই তো তোমাকে ধরে আনলাম। ও যে ফলি তা জানলে কে করে !

কালুর কাছ থেকে বের করলাম। বিড়ি-দেশলাইয়ের পয়সা দিতে হয়েছে।

সুরেন একটা খারাপ গালাগাল দিয়ে বলল—বেটা বেঁচে আছে এখনো ? থাপ্পড়টা তাহলে তেমন লাগে নি।

—অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। অত জোরে মারা তোমার উচিত হয় নি সুরেন। ওরা সব ম্যালনিউট্রিশনে ভোগে, জীবনশক্তি কম, বেমক্কা লাগলে হার্টফেল করতে পারে।

—রাখো রাখো। বোতল বোতল বাংলা মদ সাফ্ করে গাঁজা টেনে রিকশা চালিয়ে বেঁচে আছে, আমার থাপ্পড়ে মারবে ? এত সোজা নাকি ! ওদের বেড়ালের জান।

গগনচাঁদ হেসে বলে—তুমি নিজের থাপ্পড়ের ওজনটা জানো না। সে যাক গে, কালু মরে নি। এখন দিব্যি উঠে বসেছে।

—ভাল। মরলে ক্ষতি ছিল না।

গগন শুনে হাসল।

দুজনে টিপ টিপ বৃষ্টির মধ্যে ফিরতে লাগল। কেউ কোন কথা বলছে না।

চার

সন্তু একবার উঁকি মেরে অর বাবার ঘর দেখল। তার বাবা নামক চৌধুরী ইদানীং দাড়ি রাখছে। বড় পাগল লোক, কখন কি করে ঠিক নেই। এই হয়তো আধ হাত দাড়ি, ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল হয়ে গেল। ফের একদিন গিয়ে দাড়ি কামিয়ে, মাথা ন্যাড়া করে চলে এল। তবু নানক চৌধুরীকে নিয়ে কেউ বড় একটা হাসাহাসি করে না। সবাই সমঝে চলে। একে মহা পণ্ডিত লোক, তার ওপর রেগে গেলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। ব্রজ দত্ত নামে মারকুট্টা ছেলেকেও একবার লাঠি নিয়ে তাড়া করেছিল নানক চৌধুরী। কারণ ব্রজ দত্ত পাড়ার একটা পাগলা ল্যাংড়া লোককে ধরে মেরেছিল। সেই পাগলা আর ল্যাংড়া রমণী বোস নাকি বলে বেড়িয়েছিল যে ব্রজ দত্ত আর সাঙাৎরা একরকম নেশা করে, তা মদের নয় কিন্তু মদের চেয়েও ঢের বেশী সাংঘাতিক।

সন্তু পর্দা সরিয়ে উঁকি মেরে সাবধানে বাবাকে দেখে নেয়। ঘরটা অন্ধকার, কেবল টেবিলল্যাম্পের ছোট্ট একটু আলো জ্বলছে, আর চৌধুরীর বড়সড় অন্ধকার

ছায়ার শরীরটা ঝুঁকে আছে বইয়ের ওপর। পাড়ায় বোমা ফাটলেও নানক চৌধুরী এসময়ে টের পায় না।

কালু আজ সন্তুর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করেছে। কাল রাতে লাশ দেখে ফেরার পথে কালু বলেছিল—সন্তু, খুনটা আমি নিজের চোখে দেখেছি। কিন্তু ভয় খায় যদি শালা খুনেটা জানতে পারে যে আমি দেখেছি তো আমাকেও ফুটিয়ে দেবে। তাই তোকে সব বলব, কাল সিংহীদের বাগানে রাত আটটায় থাকবি।

সন্তু বলল—কাল কেন ? আজই বল না !

কালু মাথা নেড়ে বলে—আজ নয়। আমি আগে ভেবে-টেবে ঠিক করি, মাথাটা ঠাণ্ডা হোক। আজ মাথাটা গোলমাল লাগছে।

সন্তু বলল—কত টাকা পাবি বললি ?

—পাঁচশো। তাতে ক'দিন ফুর্তি করা যাবে। রিকশা টানতে টানতে গতর ব্যথা। পাঁচশো টাকা পেলে পালবাজারে সব্‌জীর দোকানও দিতে পারি।

সন্তু ব্ল্যাকমেল ব্যাপারটা বোঝে। সে তাই পরামর্শ দিল—পাঁচশো কেন ? তুই এক হাজারও চাইতে পারিস।

—দেবে না।

—দেবে। খুনের কেস হলে আরও বেশী চাওয়া যায়।

—দূর! কালু ঠোঁট উল্টে বলে—বেশী লোভ করলেই বিপদ। আজকাল আকছার খুন হয়। ক'জনকে ধরছে পুলিস! আমাদের আশেপাশে অনেক খুনী ঘুরে বেড়াচ্ছে ভদ্রলোকের মত। খুনের কেসকে লোকে ভয় পায় না।

সন্তু কাল রাতে ভাল ঘুমোয় নি। বলতে কি সে কাল থেকে একটু অন্যরকম বোধ করছে। খুন সে কখনো দেখে নি বটে, কিন্তু বইতে খুনের ঘটনা পড়ে আর সিনেমায় খুন দেখে সে ইদানীং খুনের প্রতি খুব একটা আকর্ষণ বোধ করে। তার ওপর যদি সেই খুনের ঘটনার গোপন তথ্যের সঙ্গে সে নিজেও জড়িয়ে পড়ে তবে তো কথাই নেই।

রাত আটটা বাজতে চলল। দেয়ালঘড়িতে এখন পৌনে আটটা। এ সময়ে বাড়ির বাইরে বেরোনো খুবই বিপজ্জনক। নানক চৌধুরী, তার বাবা, যাকে সে আড়ালে নানকু বলে উল্লেখ করে, সে যদি পায় তো একতরফা হাত চালাবে। নানক চৌধুরী ব্যায়ামবীর বা গুণ্ডা-ষণ্ডাকে ভয় পায় না, তা ছেলের গায়ে হাত তুলতে তার আটকাবে কেন ?

তবু যেতেই হবে। সেই ভয়ঙ্কর গুপ্ত খবরটা কালু তাকে দিয়ে যাবে আজ।

সন্তু রবারসোলের জুতো পরে আর একটা দুই সেল টর্চবাতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সিংহীদের বাড়ির বাগান ভাল জায়গা নয়। পোড়োবাড়ির মত পড়ে আছে। সেখানে প্রচুর সাপখোপের আড্ডা।

মা রান্না নিয়ে ব্যস্ত। আজ মাস্টারমশাইয়ের আসার দিন নয়। কাজেই সন্তু পড়ার ঘরের বাতিটা জেবলে একটা বই খুলে রেখে বেরিয়ে পড়ল। মা যদি আসে তো ভাববে ছেলে পড়তে পড়তে উঠে বাথরুমে বা ছাদে গেছে।

খুব তাড়াতাড়ি সন্তু রাস্তা পার হয়ে খানিক দূরে চলে আসে। সিংহীদের

পাঁচিলটা কোথাও কোথাও ভাঙা। একটা ভাঙা জায়গা পেয়ে সন্তু অনায়াসে পাঁচিল টপকে বাগানে ঢুকে ঝোপঝাড় ভেঙে এগোয়। কালু এসে গেছে কিনা দেখবার জন্য এধার-ওধার টর্চের আলো ফেলে। কোথাও কাউকে দেখা যায় না।

শিরীষ গাছের তলায় এসে সন্তু দাঁড়ায়। দুবার মুখে আঙুল পুরে সিটি বাজিয়ে অপেক্ষা করে। না, কালু এখনো আসে নি। বরং খবর পেয়ে মশারা আসতে শুরু করে ঝাঁক বেঁধে। হাঁটু, হাত, ঘাড় সব চুলকোনিতে জ্বালা ধরে যায়। সন্তু দু'চারটে চড়চাপড় মেরে বসে গা চুলকোয়। কালু এখনো আসছে না।

চারদিক ভয়ঙ্কর নির্জন আর নিস্তব্ধ! ঐ প্রকাণ্ড পুরনো আর ভাঙা বাড়িটায় সন্তু গুণ্ডাকে ফাঁসী দিয়েছিল। এই বাড়িতেই মরেছে সিংহবুড়ো। তার ওপর গতকাল দেখা লাশটার কথাও মনে পড়ে তার। ছেলেটার বয়স বেশী নয়, একটা বেশ ভাল জামা ছিল গায়ে, আর একটা ভাল প্যাণ্ট। ছেলেটার চুল লম্বা ছিল, বড় জুলপী আর গোঁফ ছিল। ঐ রকম বড় চুল আর জুলপী রাখার সাধ সন্তুর খুব হয়। কিন্তু তার বাবা নানক চৌধুরী সন্তুকে মাসান্তে একবার পপুলার সেলুনে ঘুরিয়ে আনে। সেখানকার চেনা নাপিত মাথা স্ক্রু-কাট করে দেয়।

সন্তুর যে ভয় করছিল তা নয়। তবে একটু ছমছমে ভাব। কি যেন একটা হবে। ঠিক বুঝতে পারছে না সন্তু, তবে মনে হচ্ছে অলক্ষ্যে কে যেন একটা দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি আস্তে করে দো-বোমার পলতেয় ধরিয়ে দিচ্ছে। এখুনি জোর শব্দে একটা ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ হবে।

হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে শব্দ ওঠে। সন্তু শিউরে উঠল। অবিকল নীলমাধবের সেই সড়ালে কুকুরটা যেন জঙ্গল ভেঙে ধেয়ে আসত ঠিক তেমন শব্দ। সন্তুর হাত থেকে টর্চটা পড়ে গেল। আকাশে মেঘ চেপে আছে। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সন্তু কেবল প্যাণ্টের পকেট থেকে তার ছোট্ট ছুরিটা বের করে হাতে ধরে রইল। যেদিক থেকে শব্দটা আসছে সেদিকে মুখ করে মাটিতে উবু হয়ে বসে অপেক্ষা করছিল সে। হাত-পা ঠাণ্ডা মেরে আসছে, বুক কাঁপছে, তবু খুব ভয় সন্তু পায় না। পালানোর চিন্তাও সে করে না।

একটু বাদেই সে ছোট্ট কেরোসিনের ল্যাম্পের আলো দেখতে পায়। রিকশায় বাতি হাতে কালু আসছে। কিন্তু আসছে ঠিক বলা যায় না। কালু বাতিটা হাতে করে ভয়ঙ্কর টলতে টলতে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। সম্পূর্ণ মাতাল।

সন্তু টর্চটা জেবলে বলে—কালু, এদিকে।

—কোন্ শালা রে! কালু চেঁচাল!

—আমি সন্তু।

—কোন্ সন্তু? বলে খুব খারাপ একটা খিস্তি দিল কালু।

সন্তু এগিয়ে কালুর হাত ধরে বলে—আস্তে। চেঁচালে লোক জেনে যাবে।

কালু বাতিটা তুলে সন্তুর মুখের ওপর ফেলার চেষ্টা করে বলে—ওঃ, সন্তু!

—হ্যাঁ।

—আয়। বলে কালু তার হাত ধরে টানতে টানতে পোড়োবাড়ির বারান্দায় গিয়ে ওঠে। তারপর সটান মেঝেতে পড়ে গিয়ে বলে—আজ বেদম খেয়েছি মাইরি!

boiboi.net

নেশায় চোখ ছিঁড়ে যাচ্ছে।

সন্তু পাশে বসে বলে—কি বলবি বলেছিলি ?

—কি বলব ? কালু ধমকে ওঠে।

—বলেছিলি বলবি। সেই খুনের ব্যাপারটা।

—কোন খুন ? ফলির ?

—হ্যাঁ।

কালু হা-হা করে হেসে বলে—আমি পাঁচশো টাকা পেয়ে গেছি সন্তু, আর বলা যাবে না।

—কে দিল ?

—যে খুনী সে।

—লোকটা কে ?

কালু ঝড়াক করে উঠে বসে বলে—তোকে বলব কেন ?

—বলবি না ?

—না। পাঁচশো টাকা কি ইয়ার্কি মারতে নিয়েছি ?

সন্তু খুব হতাশ হয়ে বলল—তুই বলেছিলি বলবি।

কালু মাথা নেড়ে বলে—পাঁচশো নগদ টাকা পেয়ে আজ অ্যাতো মাল খেয়েছি। আরো অনেক আছে, পালবাজারে সব্জীর দোকান দেব, নয়তো লণ্ড্রী খুলব। দেখবি ?

বলে কালু তার জামার পকেট থেকে একতাড়া দশ টাকার নোট বের করে দেখায়। বলে—গোন্ তো, কত আছে। আমি বেহেড আছি এখন।

সন্তু গুনল। বাস্তবিক এখনো চারশো পঁচাশি টাকা আছে।

বলল—খুনি তোকে কিছু বলল না ?

—না! কী বলবে! বলল—কাউকে বলবি না, তাহলে তোকেও শেষ করে ফেলব!

—পাঁচশো টাকা দিয়ে দিল ?

কালু মাছি তাড়ানোর ভঙ্গী করে বলে—দূর, পাঁচশো টাকা আর কি! এরকম আরো কত ঝেঁকে নেব। সবে তো শুরু।

সন্তু উত্তেজিত হয়ে বলে—ব্ল্যাকমেল!

কালু চোখ ছোট করে বলে—আমি শালা ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার, আর তোমারা সব ভদ্রলোক, না ?

—ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার নয় রে। ব্ল্যাকমেল।

—আমি ইংরিজি জানি না ভেবেছিস! রামগঙ্গা স্কুলে ক্লাশ নাইন পর্যন্ত পড়েছিলাম্ ভুলে যাস না।

সন্তু এতক্ষণে হাসল। বলল—ব্ল্যাকমেল হল……

—চুপ শালা। ফের কথা বলেছিস কি···বলে কালু লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করল।

সন্তু কালুর হঠাৎ রাগ কেন বুঝতে না পেরে এক পা পেছিয়ে তেজী ঘোড়ার

boiRboi.net

মত দাঁড়িয়ে বলল—এর আগে খিস্তি করেছিস, কিছু বলি নি। ফের গরম খাবি তো মুশকিল হবে।

কালু তার বাতিটা তুলে সন্তুর মুখের ওপর ফেলার চেষ্টা করে বলল—আহা চাঁদু! গরম কে খাচ্ছে শুনি? বলে ফের একটা নোংরা নর্দমার খিস্তি দেয়।

সন্তুর হাত-পা নিসপিস করে। হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে ছুরিটা টেনে বের করে আনে সে। বেশী বড় না হলেও, বোতাম টিপলে প্রায় পাঁচ ইঞ্চি একটা ধারালো ফলা বেরিয়ে আসে। সন্তুর এখনো পর্যন্ত এটা কোন কাজে লাগে নি।

ফলাটা কেরোসিনের বাতিতেও লক-লক করে উঠল।

সন্তু বলল—দেব শালা ভরে!

—দিবি? কালু উঠে দাঁড়িয়ে পেটের ওপর থেকে জামাটা তুলে বলল—দে না! বলে জিব ভেঙিয়ে দু-হাতের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অশ্রাব্য গালাগাল দিতে থাকে।

সন্তুর মাথাটা গোলমেলে লাগছিল। গতবার সে একটা গুণ্ডা বেড়ালকে ফাঁসী দিয়েছিল। শরীরের ভিতরটা আনচান করে ওঠে। সে একটা ঝটকায় কালুকে মাটিতে ফেলে বুকের ওপর উঠে বসে। তারপর সম্পূর্ণ অজান্তে ছুরিটা তোলে খুব উঁচুতে। তারপর বিদ্যুৎবেগে হাতটা নেমে আসতে থাকে।

কালু কি কৌশল করল কে জানে! লহমায় সে শরীরের একটা মোচড় দিয়ে পাশ ফিরল। তারপর দুষ্টু ঘোড়া যেমন ঝাঁকি মেরে সওয়ারী ফেলে দেয় তেমনি সন্তুকে ঝেড়ে ফেল দিল মেঝের ওপর। পাঁচ ইঞ্চি ফলাটা শানে লেগে ঠকাৎ করে পড়ে গেল।

কালু একটু দূরে গিয়ে ফের পড়ল। তারপর সব ভুলে ওয়াক্ তুলে বমি করল বারান্দা থেকে গলা বার করে।

বিস্মিত সন্তু বসে রইল হা করে। সর্বনাশ! আর একটু হলেই সে কালুকে খুন করত! ভেবেই ভয়ংকর ভয় হয় সন্তুর।

কালু বমি করে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসল বারান্দার থামে হেলান দিয়ে। মাথা লটপট করছে। অনেক্ষণ দম নিয়ে পরে বলল—ছুরি চমকেছিস শালা, তুই মরবি।

সন্তু আস্তে করে বলে—তুই খিস্তি দিলি কেন?

কালুর কেরোসিনের বাতিটা এখনো মেঝের ওপর জ্বলছে। সেই আলোতে দেখা গেল, কালু হাসছে। একটা হাই তুলে বলে—ওসব আমার মুখ থেকে আপনা-আপনি বেরিয়ে যায়। কিন্তু গাল দিলে কি গায়ে কারো ফোস্কা পড়ে? আমাকেও তো কত লোক রোজ দুবেলা গাল দেয়। তা বলে গগনদার মত খুন করতে হবে নাকি!

সন্তু বিদ্যুৎ-স্পর্শে চমকে উঠল। গগনদা!

তড়িৎবেগে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, তোকে টাকাটা কে দিয়েছে কালু?

—বলব কেন?

—আমি জানি। গগনদা।

—দূর বে!

boiRboi.net

—গগনদা খুন করেছে ?

কালু মুখটা বেঁকিয়ে বলে—কোন্ শালা বলেছে ?

—তুই তো বললি।

—কখন ? নাঃ, আমি বলি নি।

সন্তু হেসে বলে—দাঁড়া, সবাইকে বলে দেব।

—কি বলবি ?

—গগনদা তোকে টাকা দিয়েছে। গগনদা খুনী।

কালু প্রকাণ্ড একটা ঢেঁকুর তুলে বুকটা চেপে ধরে বলে—টাকা! হ্যাঁ, টাকা গগনদা দিয়েছে। তবে গগনদা খুন করে নি!

সন্তু হেসে টর্চটা নিয়ে পিছু ফিরল। ধীরে-সুস্থে পাঁচিলটা ডিঙিয়ে এল সে।

পাঁচ

অন্ধকার জিমনাসিয়ামে গগনচাঁদ বসে আছে। একা। অথর্বের মত।

কিছুক্ষণ সে মেঘচাপা আকাশের দিকে চেয়ে ছিল। আকাশের রঙ রক্তবর্ণ। কলকাতার আকাশে মেঘ থাকলে এরকমই দেখায় রাত্রিবেলা।

এখন রাত অনেক। বোধ হয় এগারোটা। কাল রাতে বৃষ্টির পর গ্যারাজঘরটা জলে থৈ থৈ করছে। অন্তত ছয়-সাত ইঞ্চি জলে ডুবে আছে মেঝে। জলের ওপর ঘুরঘুরে পোকা ঘুরছে। কেঁচো আর শামুক বাইছে দেওয়ালে। ওরকম ঘরে থাকতে আজ ইচ্ছে করছে না। মনটাও ভাল নেই।

অন্ধকার জিমনাসিয়ামের চারধারে একবার তাকাল গগন। একটা মস্ত টিনের ঘর, চারধারে বেড়া। হাতের টর্চটা একবার জ্বালল। সিলিং থেকে রিং ঝুলছে, অদূরে প্যারালাল বার, টানবার স্প্রিং, রোমান রিং, স্ল্যাশিটংবোর্ড কত কি! একজন দারোয়ান পাহারা দেয় দামী যন্ত্রপাতি। একটু আগে দারোয়ান এসে ঘুরে দেখে গেছে। মাস্টারজি মাঝে মাঝে এরকম রাতে এসে বসে থাকে, দরোয়ান তা জানে। তবে গগনকে দেখে অবাক হয় নি। জিমনাসিয়ামের ছোট্ট উঠোনটার শেষে দরোয়ানের খুপরিতে একটু আগেও আলো জ্বলছিল। এখন সব অন্ধকার হয়ে গেছে। গগনের কাছে চাবি আছে, যাওয়ার সময়ে বন্ধ করে যাবে। কিন্তু ঘরে যেতে ইচ্ছে করে না গগনের। পচা জল, নর্দমার গন্ধ, পোকামাকড়। তবু থাকতে হয়। গ্যারাজ-ঘরটার ভাড়া মোটে ত্রিশ টাকা, ইলেকট্রিকের জন্য আলাদা দিতে হয় না, তবে একটা মাত্র পয়েন্ট ছাড়া অন্য কিছু নেই। গগনের রোজগার এমন কিছু বেশী নয় যে লাটসাহেবী করে। এ অঞ্চলে বাড়ি-ভাড়া এখন আগুন। একটা মাত্র ঘর ভাড়া করতে কতবার চেষ্টা করেছে গগন, একশোর নীচে কেউ কথা বলে না। অবশ্য একথাও ঠিক, গগন একটু স্থিতু মানুষ, বেশী নড়াচড়া পছন্দ করে না। গ্যারাজ-ঘরটায় তার মন বসে গেছে। অন্য জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করলে তার মন খারাপ

হয়ে যায়। গ্যারাজ-ঘরটায় বেশ আছে সে। শোভারাণী বকাবকি করে ভাড়াটেদের ক্যাচ ক্যাচ আছে, জলের অসুবিধে আছে, তবু খুব খারাপ লাগে না। কেবল বর্ষাকালটা বড্ড জ্বালায় এসে। তবু বর্ষা-বৃষ্টি হোক, না হলে মুরাগাছার জমি বুক ফাটিয়ে ফসল বের করে দেবে না। মানুষের এই এক বিপদ, বর্ষা বৃষ্টি গরম শীত সবই তাকে নিতে হয়, সব কিছুই তার কোন না কোন ভাবে প্রয়োজন। কাউকেই ফেলা যায় না। এই যে অঞ্চলে এত মশা, গগন জানে এবং বিশ্বাসও করে যে, এই সব মশার উৎপত্তি এমনি এমনি হয় নি। হয়তো এদেরও প্রকৃতির প্রয়োজন আছে। এই যে সাপখোপ বোলতা-বিছে, বাঘ-ভালুক—ভাল করে দেখলে বুঝি দেখা যাবে যে এদের কেউ ফেলনা নয়। সকলেই যে যার মত এই জগতের কাজে লাগে।

গগন উঠে জিমনাসিয়ামের ভিতরে এল। মস্ত মস্ত গোটাকয় আয়না টাঙানো দেয়ালে। অন্ধকারেও সেগুলো একটু চকচক করে ওঠে। গগন টর্চ জ্বেলে আয়না দেখে। গত চার-পাঁচ বছরে এসব আয়না তার কত চেলার প্রতিবিম্ব দেখিয়েছে। কোথায় চলে গেছে সব! আয়না কারো প্রতিচ্ছবি ধরে রাখে না। এই পৃথিবীর মতই তা নির্মম এবং নিরপেক্ষ। টর্চ জ্বেলে গগন চারিদিক দেখে। ঐ রিং ধরে একদা ঝুল খেয়ে গ্রেট সার্কেল তৈরী করেছে ফলি। বুকে মস্ত চাঁই পাথর তুলেছে। বীম ব্যালান্স আর প্যারালাল বার-এ চমৎকার কাজ করত ছেলেটা। শরীর তৈরী করে সাজানো শরীরের প্রদর্শনী গগনের তেমন ভাল লাগে না। বরং সে চায় ভাল জিমন্যাস্ট তৈরী করতে, কি মুষ্টিযোদ্ধা, কি জুডো খেলোয়াড়। সে-সব দিকে ফলি ছিল অসাধারণ। যেমন শরীর সাজানো ছিল থরে-বিথরে মাংস-পেশীতে, তেমনি জিমন্যাস্টিক্‌সেও সে ছিল পাকা। ফলিকে কিছুকাল জুডো আর বক্সিং শিখিয়েছিল গগন। টপাটপ শিখে ফেলত। সেই ফলি কোথায় চলে গেল!

ভূতের মত একা একা গগন জিমনাসিয়ামে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে এধার ওধার দেখে। মেঝেয় বারবেলের চাকা পড়ে আছে কয়েকটা। পায়ের ডগা দিয়ে একটা চাকা ঠং করে উল্টে ফেলল সে। এক হাতে রিং ধরে একটু ঝুলে খেল। প্যারালাল বার-এ উঠে বসে রইল কিছুক্ষণ। ভাল লাগছে না। মনটা আজ ভাল নেই! ফলিকে কে মারল? কেন ফলি ওসব নেশার ব্যবসা করতে গেল?

আজ সন্ধ্যেবেলা ফিরে এসে গ্যারাজ-ঘরে বসে সে অনেকক্ষণ উৎকণ্ঠ থেকেছে। না, শোভারাণীদের ঘর থেকে তেমন কোন সন্দেহজনক শব্দ হয় নি! রাত ন'টায় নরেশও ফিরে এল। স্বাভাবিক কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল ওপর থেকে। তার মানে ওরা এখনো ফলির মৃত্যুসংবাদ পায় নি। বড় আশ্চর্য কথা! ফলিকে এখানে সবাই এক সময়ে চিনত। তবু তার মৃতদেহ কেন কেউ সনাক্ত করতে পারে নি? কেবলমাত্র পুলিশ আর কালু ছাড়া! তাও পুলিস বলেছে—ফলি অ্যাবস্‌কণ্ডার। ফলি ফেরারই বা ছিল কেন?

মাথাটা বড্ড গরম হয়ে ওঠে।

গগনচাঁদের বুদ্ধি খুব তৎপর নয়। খুব দ্রুত ভাবনা-চিন্তা করা তার আসে না। সব সময়ে সে ধীরে চিন্তা করে। কিন্তু যা সে ভাবে তা সব সময়ে একটা নির্দিষ্ট যুক্তি-তর্ক এবং গ্রহণ-বর্জনের পথ ধরে চলে। হুটহাট কিছু ভাবা তার আসে না।

boiRboi.net

গগন বহুকাল ধরে নিরামিষ খায়। সম্ভবতঃ নিরামিষ খেলে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি কিছু ধীর হয়ে যায়। নিরামিষ খাওয়ার পিছনে আবার গগনের একটা ভাবপ্রবণতাও আছে। ছটফটে জ্যান্ত জীব, জালে বন্ধ বাঁচার আকুলতা নিয়ে মরে যাওয়া মাছ কিংবা ডিমের মধ্যে অসহায় ভ্রূণ, এদের দেখে তার বড় মায়া হয়। আরো একটা কারণ হল, আমিষ খেলে মানুষের শরীরের স্বয়ং-উৎপন্ন বিষ টক্সিন খুব বেড়ে যায়। টক্সিন বাড়লে শরীরে কোন রোগ হলে তা বড় জখম করে দিয়ে যায় শরীরকে। কেউ কেউ গগনকে বলেছে—নিরামিষভোজীরা খুব ধীরগতিসম্পন্ন, পেটমোটা। গগন তার উত্তরে তৃণভোজী হরিণ বা ঘোড়ার উল্লেখ করেছে, যারা ভীষণ জোরে ছোটে। তাদের পেটও মোটা নয়। নিরামিষ খেয়ে গগনের তাগদ কারো চেয়ে কম নয়। গতিবেগ এখনো বিদ্যুতের মত। জুডো বা বক্সিং শিখতে আসে যারা তারা জানে গগন কত বড় শিক্ষক। তাও গগন খায় কি? প্রায় দিনই আধসেরটাক ডাল আর সব্জী-সেদ্ধ, কিছু কাঁচা সব্জী, দুচারটে পেয়ারা বা সময়কালে কমলালেবু বা আম, আধসের দুধ, সয়াবীন, কয়েকদানা ছোলা-বাদাম। তাও বড় বেশী নয়। শরীর আন্দাজে গগনের খাওয়া খুবই কম। খাওয়া-দাওয়া নিয়ে কোনদিনই সে বেশী মাথা ঘামায় না। এই সব মিলিয়ে গগন। ধীরবুদ্ধি, শান্ত, অনুত্তেজিত, কোন নেশাই তার নেই।

মেয়েমানুষের দোষ নেই, তবে আকর্ষণ থাকতে পারে।

যেমন বেগম। ফলি যখন গগনের কাছে কসরৎ করা শিখত, তখন বহুবার বেগম এসেছে জিমনাসিয়ামে। সে বেড়াতে আসত বোনের বাড়ি, সেই তক্কে জিমনাসিয়ামে ছেলেকে দেখে যেত। ব্যায়ামাগারটাই ছিল বলতে গেলে ফলির বাসস্থান।

গগনের আজও সন্দেহ হয়, শুধু ছেলেকে দেখতেই আসত কিনা বেগম। বরং ছেলেকে দেখার চেয়ে ঢের বেশী চেয়ে দেখত গগনকে। তার তাকানো ছিল কি ভয়ঙ্কর মাদকতায় মাখানো। বড় বড় চোখ, পটে-আঁকা চেহারা, গায়ের রঙ সত্যিকারের রাঙা। রোগা নয়, আবার কোথাও বাড়তি মাংস নেই। কি চমৎকার ফিগার! প্রথমটায় গগনের সঙ্গে কথা বলত না। কিন্তু গগন বিভিন্ন ব্যায়ামকারীর কাছে ঘুরে ঘুরে নানা জিনিস শেখাচ্ছে, স্যাণ্ডো গেঞ্জি আর চাপা প্যাণ্ট পরা তার বিশাল দেহখানা নানা বিভঙ্গে বেঁকেছে, দুলছে বা ওজন তুলবার সময় থামের মত দৃঢ় হয়ে যাচ্ছে—এ সবই বেগম অপলক চোখে দেখেছে। বেগমের বয়স বোঝে কার সাধ্য! তাকে ফলির মা বলে মনে হত না, বরং বছর দু'তিনেকের বড় বোন বলে মনে হত। ফলি একদিন বলেছিল—মা চমৎকাব সব ব্যায়াম জানে, জানেন গগনদা! এখনো রোজ আসন করে।

বেগম প্রথমে ভাববাচ্যে কথা বলত। সরাসরি নয়, অথচ যেন বাতাসের সঙ্গে কথা বলার মত করে বলত—কতদিন এখানে চাকরি করা হচ্ছে? কিংবা জিজ্ঞেস করত—জামাইবাবুর সঙ্গে কারো বুঝি খুব খটাখটি চলছে আজকাল। পরের দিকে বেগম সরাসরি কথা বলত। যেমন একদিন বলল—আপনার বয়স কত বলুন তো?

বিনীত ভাবে গগন জবাব দিল—ঊনত্রিরিশ।

—একদম বোঝা যায় না। বিয়ে করেছেন?

—না।

—কেন ?

গগন হেসে বলে—খাওয়াব কি ? আমারই পেট চলে না।

—অত যার গুণ তার খাওয়ার অভাব !

—তাই তো দেখছি।

—আপনি ম্যাসাজ করতে জানেন ?

—জানি।

—তাহলে আপনাকে কাজ দিতে পারি করবেন ?

গগন উদাসভাবে বলল—করতে পারি।

—একটা অ্যাথলেটিক ক্লাব আছে, ফুটবল ক্লাব, খেলোয়াড়দের ম্যাসাজ করতে হবে। ওরা ভাল মাইনে দেয়।

গগন তখন বলল—আমার সময় কোথায় ?

খুব হেসে বেগম বলল—তাহলে করবেন বললেন কেন ? ঐ ক্লাবে গেলে সব ছেড়ে যেতে হবে। হোলটাইম জব। সময়ের অভাব হবে না। আর যদি ছুটকো-ছাটকা ম্যাসাজ করতে চান, পক্ষাঘাতের রুগী-টুগী, তাও দিতে পারি।

গগন বলল—ভেবে দেখব !

আসলে গগন ওসব করতে চায় না, সে চায় ছাত্র তৈরী করতে। ভাল শরীরবিদ, জিমন্যাস্ট, বক্সার, জুডো-বিশেষজ্ঞ। সে খেলোয়াড়দের পা বা রুগীর গা ম্যাসাজ করতে যাবে কেন ?

কিন্তু ঐ যে সে ম্যাসাজ জানে ওটাই তার কাল হয়েছিল। কারণ একবার বেগম নাকি সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে পা মচকায়। খবর এল, ম্যাসাজ দরকার। প্রথমে গগন যায়নি। সে কিছু আন্দাজ করেছিল। কিন্তু বেগম ছাড়বে কেন ? খবরের পর খবর পাঠাত। বিরক্ত হয়ে একদিন বাপুজি কলোনীর বাড়িতে যেতে হয়েছিল গগনকে।

হেসে বলেছিল—খুব ব্যথা বুঝলেন !

গগন পা-খানা নেড়ে-চেড়ে বলল—কোথায় ?

বেগম বলল—সব ব্যথা কি শরীরে ? মন বলে কিছু নেই ?

তারপর কি হয়েছিল তা আর গগন মনে করতে চায় না। তবে এটুকু বলা যায়, গগনের মেয়েমানুষে আকর্ষণ আছে, লোভ না থাক। বেগমের বেলা সেটুকু বোঝা গিয়েছিল। বলতে গেলে, তার জীবনের প্রথম মেয়েমানুষ ঐ বেগম। কিছুকাল খুব ভালবেসেছিল বেগম তাকে। তারপর যা হয় ! ওসব মেয়েদের একজনকে নিয়ে থাকলে চলে না ! গগন তো তার ব্যবসার কাজে আসত না। বেগম তাই অন্য সব মানুষ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আর বেগমের দেহের সুন্দর ও ভয়ংকর স্মৃতি নিয়ে গগন সরে এল একদিন।

আয়নায় কোন প্রতিচ্ছবি থাকে না। পৃথিবীতে কত ঘটনা ঘটে, সব মুছে যায়। অবিকল আয়নার মত।

ফলির কথাই ভাবছিল গগন। ফলি বেঁচে নেই। তার খুব প্রিয় ছাত্র ছিল

boiRboi.net

ফলি। মানুষ হিসেবে ফলি হয়তো ভাল ছিল না, নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ছাত্র হিসেবে ফলি ছিল উৎকৃষ্ট। ও-রকম চেলা গগন আর পায়নি।

অন্ধকার জিমন্যাসিয়ামে প্যারালাল বার-এর ওপর বসে গগনের দু-চোখ বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল নেমে এল। বিড়-বিড় করে কি একটু বলল গগন। বোধহয় বলল—দূর শালা! জীবনটাই অদ্ভুত!

অনেক রাতে গগন যখন গ্যারাজ-ঘরে ফিরল তখন সে খুব অন্যমনস্ক ছিল। নইলে সে লক্ষ্য করত, এত রাতেও পাড়ার রাস্তায় কিছু লোকজন দাঁড়িয়ে কি যেন আলোচনা করছে। আশপাশের বাড়িগুলোয় আলোও জ্বলছে।

গগন যখন তালা খুলছে তখন একবার টের পেল এ-বাড়ি সে-বাড়ির জানালায় কারা উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখল তাকে। নরেশ মজুমদারের ঘরে স্টিক-লাইট জ্বলছে। এত রাতে ওরকম হওয়ার কথা নয়। রাত প্রায় বারোটা বাজে। এ-সময় সবাই নিঃসাড়ে ঘুমোয়। কেবল অদূরে একটা বাড়ির দোতলায় নানক চৌধুরীর ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলে।

গগন ঘরে এসে প্রায় কিছুই খেল না। ঠাণ্ডা দুধটা চুমুক দিয়ে শুয়ে রইল। বাতি নেভাল না। ঘরে জল খেলছে, কোন পোকা-মাকড় রাতবিরেতে বিছানায় উঠে আসে। বর্ষাকালে প্রায় সময়েই সে বাতি জ্বেলে ঘুমোয়। নরেশ মজুমদারের মিটার উঠুক, তার কি?

ঘুম না এলে গগনচাঁদ জেগে থাকে। চোখ বুজে মট্‌কা মারা তার স্বভাব নয়। আজও ঘুম এল না, তাই চেয়ে থেকে কত কথা ভাবছিল গগন। ভিতর দিকে গ্যারাজ-ঘরের ছাদের সঙ্গে লাগানো, উঁচুতে একটা চার ফুট দরজা আছে। ঐ দরজাটা সে আসবার পর থেকে বরাবর বন্ধ দেখেছে। সম্ভবতঃ কোনদিন ঐ দরজা দিয়ে সহজে গ্যারাজে ঢোকা যাবে বলে ওটা করা হয়েছিল। বৃষ্টি-বাদলার দিনে ঘর থেকে নরেশ তার বৌ নিয়ে সরাসরি গ্যারাজে আসতে পারত। এখন গ্যারাজে গাড়ি নেই, গগন আছে। তাই দরজাটা কড়াক্কড় করে বন্ধ। প্রায় সময়েই গগন দরজাটা দেখে। হয়তো কখনো ঐ দরজা থেকে নেমে আসবার কাঠের সিঁড়ি ছিল। আজ তা নেই। গুপ্ত সুড়ঙ্গের মত দরজাটাই আছে কেবল। রহস্যময়।

আশ্চর্য এই, আজ দরজাটার দিকে তাকিয়ে গগন দরজাটার কথাই ভাবছিল। ঠিক এই সময়ে হঠাৎ খুব পুরনো একটা ছিটকিনি খোলার কণ্টকর শব্দ হল। তারপরই কে যেন হুড়কো খুলছে বলে মনে হল। সিলিংয়ের দরজাটা বার দুই কেঁপে উঠল।

ভয়ঙ্কর চমকে গেল গগনচাঁদ। বহুকাল এমন চমকায়নি। সে শোয়া অবস্থা থেকে ঝট্ করে উঠে বসল। প্রবল বিস্ময়ে চেয়ে রইল দরজার দিকে।

তাকে আরো ভয়ঙ্কর চমকে দিয়ে দরজার পাল্লাটা আস্তে খুলে গেল। আর চার ফুট সেই দরজার ফ্রেমে দেখা গেল, শোভারাণী একটা পাঁচ ব্যাটারীর মস্ত টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

গগন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না। অবাক চোখে চেয়ে ছিল। মুখটা হাঁ হয়ে আছে। চোখ বড়।

শোভারাণী সামান্য হাঁফাচ্ছিল। বেগমের বোন বলে ওকে একদম মনে হয় না।

শোভা কালো, মোটা, বেঁটে। মুখশ্রী হয়তো কোনদিন কমনীয় ছিল, এখন পুরু চর্বিতে সব গোল হয়ে গেছে।

শোভারাণী ঝুঁকে বলল—এই এলেন ?

—হুঁ। বলে বটে গগন, কিন্তু সে ধাতস্থ হয়নি।

—এতক্ষণ কোথায় ছিলেন ?

—বাইরে। ঘোরের মধ্যে উত্তর দেয় গগন। ওরা কি তবে ফালির খবরটা পেয়েছে! তাই হবে। নইলে এত রাতে গুপ্ত দরজা দিয়ে শোভা আসত না। শোভারাণীর মুখে অবশ্য কোন শোকের চিহ্ন নেই। বরং একটা উদ্বেগ ও আকুলতার ভাব আছে।

শোভা বলল—লাইনের ধারে যে মারা গেছে কাল সে কে জানেন ?

—জানি। একটু ইতস্ততঃ করে গগন বলে।

—সবাই বলছে ফালি। সত্যি নাকি ?

লুকিয়ে লাভ নেই। বার্তা পৌঁছে গেছে। গগন তাই মাথা নাড়ল। তারপর কপালে হাত দিল একটু।

—ফালিকে কে দেখেছে ?

গগন বলল—পুলিস দেখেছে। আর রিক্সাওলা কালু।

—ঠিক দেখেছে ? তীব্র চোখে চেয়ে শোভা জিজ্ঞেস করে।

—তাই তো বলছে। গগন ফের কপালে হাত দেয়।

শোভারাণী ঠোঁট উল্টে বলল—আপদ গেছে।

বলেই ঘরে আলো থাকা সত্ত্বেও টর্চটা জেবলে আলো ফেলল মেঝেয়। বলল—ঘরে জল ঢোকে দেখছি।

—বর্ষাকালে ঢোকে রোজ। গগন যান্ত্রিক উত্তর দেয়।

—বলেননি তো কখনো!

গগন আস্তে করে বলে—বলার কি! সবাই জানে!

শোভা মাথা নেড়ে বলে—আমি জানতাম না।

গগন উত্তর দেয় না। শোভার কাছে এত ভদ্র ব্যবহার পেয়ে সে ভীষণ ভালমানুষ হয়ে যাচ্ছিল।

শোভা টর্চটা নিভিয়ে বলল—শুনুন, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

গগন উঠে বসে ঊর্ধ্বমুখে যেন কোন স্বর্গীয় দেবীর কথা শুনছে, এমনভাবে উৎকর্ণ হয়ে ভক্তিভরে বসে থাকে। বলে—বলুন।

কালু একটা গুজব ছড়িয়েছে।

—কি ?

—ফালিকে যে খুন করেছে তাকে নাকি ও দেখেছে।

গগন মাথা নেড়ে বলল—জানি।

—কি জানেন ?

—কালু ওকথা আমাকেও বলেছে।

—কে খুন করেছে তা বলেনি ? শোভা ঝুঁকে খুব আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করে।

গগন মাথা নাড়ে—না। ও পাঁচশো টাকা দাবী করবে খুনীর কাছে। বলবে না।

boiRboi.net

শোভা হেসে বলে—সেই পাঁচশো টাকা কালু পেয়ে গেছে।

শোভারাণীর হাসি এবং শোকের অভাব দেখে গগন খুব অবাক হয়। ফলির মৃত্যুতে কি শোভার কিছু যায় আসেনি? বোনপোটা মরে গেল, তবু ও কি রকম যেন স্বাভাবিক!

গগন ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল—কার কাছে পেয়েছে?

শোভা অদ্ভুত একটু হেসে বলল—ও বলছে, টাকা নাকি ওকে আপনি দিয়েছেন!

—আমি! আমি টাকা দিয়েছি! খুব আস্তে গগনের বুদ্ধি কাজ করে। প্রথমটায় সে বুঝতেই পারল না ব্যাপারটা কি। ভেবে ভেবে জোড়া দিতে লাগল। তাতে সময় গেল খানিক।

শোভা বলল—একটু আগে কালুকে পুলিস ধরে নিয়ে গেছে।

গগন তেমনি দেবী-দর্শনের মত ঊর্ধ্বমুখ হয়ে নীরব থাকে। বুঝতে সময় লাগে তার। তারপর হঠাৎ বলে—আমি ওকে টাকা দিইনি।

শোভা ঠোঁট ওল্টাল। বলল—ও তো বলছে!

—আর কি বলছে?

শোভা হেসে বলে—খুনীর নামটাও বলেছে।

—কে? বলেই গগন বুঝতে পারে তার গলার স্বর তার নিজের ফাঁকা মাথার মধ্যে একটা প্রতিধ্বনি তুলল—কে!

শোভা তীব্র চোখে চেয়ে থেকে বলল—ও আপনার নাম বলছে।

—আমি! আমার নাম! বলে গগন মাথায় হাত দিয়ে বলে—না তো! ও মিথ্যে কথা বলছে।

শোভা দেয়ালে ঠেস দিয়ে বলল—কালু মদ-গাঁজা খায়। ওর কথা কে বিশ্বাস করে, আহাম্মক ছাড়া! তবে ফলিকে কেউ খুন করে থাকলেও অন্যায় করেনি। আমি তো সেজন্য জোড়াপাঁঠা মানসিক করে রেখেছি।

গগন উত্তর দিতে পারে না। মাথাটা ফাঁকা লাগছে। সে শুধু শোভার দিকে চেয়ে থাকে।

শোভা বলে—শুনুন। যদি ফলিকে কেউ মেরে থাকে তো আমার দুঃখের কিছু নেই। আমার স্বামী কাঁদছেন। তাঁর বোধ হয় কাঁদবারই কথা। তিনি ঠিক করেছিলেন, আমাদের বিষয়-সম্পত্তি সব ফলির নামে লিখে দেবেন। উইল নাকি করেও ছিলেন। আমি সেটা কিছুতেই সহ্য করতে পারিনি। ফলির জন্ম ভাল নয়।

গগন উত্তর দিতে পারছিল না। তবু মাথা নাড়ল।

শোভা বলল—আপনি বা যে কেউ ওকে খুন করে থাকলে ভাল কাজই হয়েছে। পেন্তা নামে যে বাচ্চা মেয়েটা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল, সে এখনো আমার কাছে আসে। তার বোধ হয় আর বিয়ে হবে না। ফলির গুণকীর্তির কথা কে না জানে! তবু আমার স্বামীকে কিছু বোঝানো যাবে না। তিনি সম্ভবত পুলিস ডেকে আজ রাতেই আপনাকে গ্রেফতার করাবেন।

—আমাকে!

শোভা সামান্য উষ্মার সঙ্গে বলে—ওরকম ভ্যাবলার মত করছেন কেন? এ সময়ে

বুদ্ধি ঠিক না রাখলে ঝামেলায় পড়বেন।

গগন হঠাৎ বলল—কি করব ?

শোভা বলে—কি আর করবেন, পালাবেন !

গগন দিশাহারার মত বলল—পালাব কেন ?

—সেটা বুঝতে আপনার সময় লাগবে। শরীরটাই বড়, বুদ্ধি ভীষণ কম। পুলিসে ধরলে আটক রাখবে, মামলা হবে, সে অনেক ব্যাপার। বরং পালিয়ে গেলে ভাববার সময় পাবেন।

—কোথায় পালাব ?

—সেটা যেতে যেতে ভাববেন। এখন খুব বেশী সময় নেই। এইখান দিয়ে উঠে আসতে পারবেন ?

গগন হাসল এবার। সে শরীরের কসরতে ওস্তাদ লোক। গ্যারাজ-ঘরের ছাদের দরজায় ওঠা তার কাছে কোন ব্যাপার নয়। মাথা নেড়ে বলল—খুব।

—তাহলে বাতিটা নিবিয়ে উঠে আসুন। এখান দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার ভাল রাস্তা আছে। কেউ দেখবে না। দেয়াল টপকে ওদিকে এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিনের কারখানার মাঠ দিয়ে গিয়ে বড় রাস্তায় উঠবেন। দেরি করবেন না। উঠে আসুন।

গগন বাতি নিভিয়ে দেয়। শোভা টর্চ জেলে রাখে। গগন পোশাক পরে নেয়। দুটো একটা টুকিটাকি দরকারী জিনিস ভরে নেয় ঝোলা ব্যাগে। তারপর হাতের ভর দিয়ে দরজায় উঠে পড়ে।

শোভা টর্চ জেলে আগে আগে পথ দেখিয়ে দেয়। মেথরের আসবার রাস্তায় এলে শোভারাণী তাকে বলে—এই রাস্তা দিয়ে চলে যান। টাকা লাগবে ?

গগন মাথা নাড়ে—না।

শোভা হেসে বলে—লাগবে। সদ্য সদ্য পাঁচশো টাকা বেরিয়ে গেছে, এখন তো হাত খালি !

গগন বিস্মিত ও ব্যথিত হয়ে তাকায়।

আর শোভারাণী সেই মুহূর্তে তাকে প্রথম স্পর্শ করে। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে তার প্যান্টের পকেটে বোধ হয় কিছু টাকাই গুঁজে দেয়। খুব নরম স্বরে বলে—বেগম খারাপ ! আমি খারাপ নই। আমি বিশ্বাস করি না যে আপনি খুন করেছেন। এখন যান। গ্যারাজ-ঘরের ভিতরটা আমি উঁচু করে দেব। সময়মত ফিরে এসে দেখবেন ঘরটা অনেক ভাল হয়ে গেছে। আর জিনিসপত্র যা রইল তা আমি দেখে রাখব। এখন আসুন তো !

গগন মাথা নাড়ে। তারপর আস্তে করে গিয়ে এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিনের পাঁচিল টপকায়। মাঠ পেরোয়।

কয়েকটা টর্চবাতি ইতস্ততঃ কাকে যেন খুঁজছে। গগন মাথা নীচু করে এগোয়। একটা বড় গাড়ি এসে থামল কাছেই কোথাও। গগন বাদবাকি পথটুকু দৌড়ে পার হয়ে যায়। ফের পাঁচিল টপকে বড়-রাস্তায় পড়ে।

রাতের ফাঁকা রাস্তা। কোথাও কোন যানবাহন নেই। কেবল একটা ট্যাক্সি সওয়ারী খালাস করে ধীরে ফিরে যাচ্ছে। গগন হাত তুলে সেটাকে থামায়। সচরাচর

সে ট্যাক্সিতে চড়ে না। পয়সার জন্যও বটে, তাছাড়া বাবুয়ানী তার সয় না। আজ উঠে বসল। কারণ অবস্থাটা আজ গুরুতর। তাছাড়া শোভারাণীর দেওয়া বেশ কিছু টাকাও আছে পকেটে।

পৃথিবীটাকে ঠিক বুঝতে পারে না গগনচাঁদ। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ মেঘলা করে আসে। গ্যারাজ-ঘরে জল ওঠে আধ-হাঁটু। জীবনটা এরকমই। মাঝে মাঝে বিনা কারণে এরকম পালাতে হয়।

অবস্থাটা এখনো ঠিক বুঝতে পারে না গগন। তবু সেজন্য তার চিন্তা হয় না। এখন সে শোভারাণীর কথা ভাবে। ভাবতে বেশ ভাল লাগছে তার।

ছয়

কালুকে পুলিস তেমন কিছু করেনি। দু-চারটে ঠোকনা যে না মেরেছে তা নয়, কিন্তু সে বলতে গেলে সিপাইদের আদর। পুলিসের আসল ধোলাই কেমন তা খানিকটা কালু জানে।

পুলিসের কাছে কালু কারো নাম বলেনি।

থানার বড়বাবু তাকে জিজ্ঞেস করল—তুই ফলিকে খুন হতে দেখেছিস ?

কালু দম ধরে রেখে খানিক ভাবল। ভেবে দেখল, সে অনেককেই ঘটনাটা বলেছে, তাই এখানে মিছে কথা বললে নাহোক ধোলাই হবে। আর পুলিস যদি মারে তো কোনো শালার কিছু করার নেই। তাই সে চোখ পিটপিট করে বড়বাবুর কোঁতকা চেহারাটা চোখ ভরে দেখতে দেখতে বলল—দেখেছি।

—সত্যি দেখেছিস, না কি নেশার ঘোরে বানিয়েছিস ?

কালুর সেই তেজ আর নেই, যেমনটা সে সুরেন খাঁড়া, গগন আর সন্তুকে দেখিয়েছিল। পুলিসের সামনে কারই বা তেজ থাকে ?

কালু মেঝেয় উবু হয়ে বসা অবস্থায় মাথা চুলকে বলল—নেশাও ছিল, তবে আবছা দেখেছি।

বড়বাবুর বুটসুদ্ধ মোটা একখানা পা তার কাঁকালে এসে লাগল এসময়ে। খুব জোরে নয়, তবে কালু তাতেই টাল্লা খেয়ে হড়াৎ করে পড়ে গেল। একদাঁত হেসে সে আবার উঠে বসে।

বড়বাবুর মুখে হাসি নেই, ভ্রূ কুঁচকে বলে—ঠিকসে বল।

—অন্ধকার ছিল যে।

—সেখানে তুই কী করছিলি ?

—সাঁজ বাজারে একটা লোক তাড়ি আনে। রোজ যেয়ে তার কাছে বসি।

বড়বাবু পা ফের তুলে বলে—এটুকু বয়সেই মালের পাকা খদ্দের !

—খাই মাঝে মাঝে, তাকৎ পাই না নাহলে।

এবারের লাথিটা আরো আস্তে এল। লাগল না তেমন।

বড়বাবু বলে—ঠিক করে বল কী করছিলি !

boiRboi.net

—বড় একটা ভাঁড় নিয়ে লাইনের ধারে বসে খাচ্ছিলাম। এসময় কতগুলো ছেলে এল লাইনের ওধারে। কী সব বলাবলি করছিল নিজেদের মধ্যে।

—কিছু শুনতে পাসনি ?

—না, খুব আস্তে বলছিল।

—ঝগড়া কাজিয়া বলে মনে হয়েছিল ?

—না। আপসে যেমন কথা হয় দোস্তদের মধ্যে।

—তারপর ?

—ওরা আমাকে দেখেনি, জায়গাটা অন্ধকার।

—ক'জন ছিল ?

—চার-পাঁচ জন হবে। তাদের একজন খুব লম্বাচওড়া।

—অন্ধকারে বুঝলি কী করে ?

—বললাম তো আবছা দেখা যাচ্ছিল।

—লম্বা চওড়া লোকটা কে ? গগন ?

—কী জানি !

—তবে লোককে বলছিস কেন যে গগনবাবু লাশ নামিয়েছে ?

কালু অবাক হয়ে বলে—কখন বললাম ?

—বলিসনি ? বড়বাবু চোখ পাকিয়ে বলে।

—মাইরি না।

এই সময়ে একটা সিপাই পাশ থেকে ঠোকনা মারে। খুব জোরে নয়, তবে তাতে কালুর ডান গালের চামড়া থেঁতলে রক্ত বেরিয়ে গেল, আর কষের একটা দাঁতের গোড়া বুঝি নাড়া খেয়ে আরো খানিক রক্ত চলকে দিল। মুখের রক্ত ঢোঁক গিলে পেটে চালান দিয়েছিল কালু। থানায় ধরে আনার পর থেকে দাঁতে কুটো পড়েনি। পেট জ্বলছে।

বড়বাবু বলে—সব ঠিকঠাক করে বল।

কালু হাসবার চেষ্টা করে বলে—বলছি তো বড়বাবু, গগনদার কথা কাউকে বলিনি।

—খুনটা কেমন করে হল ?

—সে খুব সাঙ্ঘাতিক। হঠাৎ দেখি সেই চার-পাঁচজনের মধ্যে একজনকে সেই জোয়ান লোকটা পিছন থেকে কী দিয়ে যেন মাথায় মারল।

—জোরে মারল ?

—তেমন জোরে নয়, তবে ছেলেটা পড়ে গেল মাটিতে।

—তারপর ?

—তারপর একটা তোয়ালে বা কাপড় কিছু একটা দিয়ে ছেলেটার গলা পেঁচিয়ে সেই জোয়ান লোকটা খুব চেপে ধরল।

—কতক্ষণ ?

—খুব বেশীক্ষণ নয়, ভয়ে আমি শব্দ করিনি।

—তারপর কী হল ?

boiRboi.net

—লোকগুলো চলে গেল।

—তুই খুনীকে চিনতে পারিসনি ?

—মাইরি না।

—তবে তোকে টাকা দিল কে ?

—টাকা ! কালু খুব অবাক হয়।

—তোকে নাকি খুনী পাঁচশ টাকা দিয়েছে ?

—মাইরি না বড়বাবু—

কালু পা ধরতে যাচ্ছিল, এ সময়ে আর একটা বেতাল ঠোকনা খেয়ে পড়ে যায়। মাথার পিছনে বাঁ ধারে মুহূর্তের মধ্যে একটা আলু ফুটে উঠল। ঝাঁ-ঝাঁ করছিল ব্যথায়।

—টাকা পাসনি ?

কালু দাঁতে দাঁত চেপে ভাবছিল কোন শালা কথাটা ফাঁস করেছে! সন্তু জানে, আর রিকশাওয়ালা নিতাই তার দোস্ত—সে জানে। আর সুরেন, গগন এরকম দু'চারজনকে সে মুখে বলেছিল বটে যে টাকা পেলে খুনীর নাম বলবে। এদের মধ্যেই কেউ ব্যাপারটা ফাঁস করেছে। কালুর সন্দেহ সন্তুকে। ওরকম হাড়বজ্জাত ছেলে হয় না।

—না। কালু চোখের জল মুছে বলে। পুলিস অবশ্য তাকে ধরে এনে প্রায় উদোম করে সার্চ করেছে। টাকা পায়নি।

মারধর কালুর যে খুব লাগে তা নয়। কিন্তু এটা ঠিক তাকে কেউ গমের বস্তা বলে মনে করলে তার মাথায় খুন চেপে যায়। —কিন্তু পুলিসের সঙ্গে হুজ্জত করার মুরোদ কারই বা থাকে ?

বড়বাবু বললেন—দ্যাখ ত্যাঁদড়ামি করিস না, করলে মেরে পাট করে দেবো। আজ ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু রোজ এসে হাজিরা দিয়ে যাবি। সত্যি মিথ্যে কী কী বলেছিস তার সব আমরা টের পেয়ে যাবো। এটা সত্যিই খুনের মামলা কিনা, নাকি তুই ব্যাপারটা ঘুলিয়ে তুলেছিস, এসব জানতে আমাদের বাকি থাকবে না। যদি শালা আমাদের ঘোল খাওয়ানোর চেষ্টা করে থাকো তবে জন্মের মতো খতম হয়ে যাবে।

কালুকে এরপর প্রায় ধাক্কা দিতে দিতে থানা থেকে বের করে দেওয়া হয়।

কালু অবশ্য তাতে কিছু মনে করেনি। সে জানে সে একটা রিক্সাওয়ালা মাত্র। কাজটা এতই ছোট যে দুনিয়ার কারো কাছে কিছু আশা করা যায় না। ইস্কুলের নীচু ক্লাসে পড়বার সময়েই সে কেন যেন টের পেত যে তার জীবনটা খুব সুখের হবে না। গড়ফায় তার বাবার একটা টিনের ঘর ছিল, উঠোন নিয়ে মোট চার কাঠা জমি। উদ্বাস্তুদের জবর দখল জায়গা। সেইখানে ছেলেবেলা থেকেই নানা অশান্তিতে বড় হয়েছে। বাবা রোজ মাকে দা বা কুড়ুল নিয়ে কাটতে যেত, দিদি বাসন্তী গিয়ে আটকাত। মা আর দিদি দুজনেই ঝি-গিরি করে বেড়াত, বাবা ছিল কাঠের মিস্ত্রী, প্রায় দিনই কাজ জুটত না। তার ওপর লোকটার একটা ভয়ঙ্কর অর্শের যন্ত্রণা ছিল যার জন্য বেশীক্ষণ উবু হয়ে বসে কাজ করতে পারত না, রোজগার যা হত তাতে দুবেলা খাওয়া জুটে যেত মাত্র, তা সে যে ধরনের খাবারই হোক। দিদি বাসন্তীর চরিত্র খারাপ

নয় তবে বাসন্তী যার সঙ্গে বিয়ে বসল তার আগের পক্ষের বউ আর চার-চারটে ছেলেমেয়ে আছে। জেনেশুনেই করল। সে লোকটার আবার বাসন্তীকে নিয়ে সন্দেহবাতিক—কোথাও বেরোতে দেয় না। এইসব ছেলেবেলা থেকে দেখেছে কালু। বাবার মৃত্যু দেখেছে চোখের সামনে। অর্শ থেকেই খারাপ ঘা হয়ে গিয়ে থাকবে। রক্ত পড়ত দিনরাত। শেষদিকে ঐ রক্তপাতেই দিন দিন ক্ষীণ হয়ে হয়ে একদিন রাতে ঘুমিয়ে সকালে আর ওঠেনি। মা এখনো ঝি খেটে বেড়ায়, ছোট বোন হেমন্তীও বেরোচ্ছে কাজে, ছোট ভাই ভুতু আর হাবু সন্ধ্যাবাজারে ডিম বেচে আর চুরি করে বেড়ায়। ক্লাস নাইন পর্যন্ত উঠে কালুকে থামতে হল। পড়তে ভাল লাগত না।

সেই থেকে কালুর সব দুঃখবোধ আর কান্না বিদায় নিয়েছে। কেমন যেন ভোঁতা হয়ে গেছে সে। মনে কিছু ভুরভুরি কাটে না। গাল খেলে গাল দেয়, মার খেলে উল্টে মার দেওয়ার চেষ্টা করে। ব্যস, এই ভাবেই যতদিন বেঁচে থাকা যায়। কালু যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশী ভালবাসতে শিখেছে তা হল টাকা। টাকার মতো কিছু হয় না।

সেলিমপুরে সওয়ারি ছেড়ে রিকশাওয়ালা মগন ফাঁড়ির উল্টোদিকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বসেছিল। যাদবপুরে ফিরবে, সওয়ারি পাওয়ার লোভে খানিক অপেক্ষা করছিল।

কালু গিয়ে মগনকে বলল—নিয়ে চলো দেখি মগনদা।

—তোর গাড়ি কোথায় ?

—ছেড়ে এসেছি, পুলিস ধরে আনল একটু আগে।

মগন ঝুঁকে বলল—পুলিস ! আই বাপ। কী হয়েছিল ?

—সে অনেক কথা, পরে কোনো সময়ে শুনো।

—পেঁদিয়েছে তোকে ?

—ও শালার সম্বন্ধীর পুতেরা কাকে না পঁ্যাদায় ?

মগন রিকশার হুড তুলে দিয়ে বলল—চেপে বোস, শালারা আবার টের না পায় যে আমার গাড়িতে উঠেছিস !

মগন রিকশা ছেড়ে জোর হাঁকাল।

কালু কেৎরে বসেছিল তার সীটে, মারধর নয়, আসলে খিদেয় পেট ব্যথা করছে। মদের ঝোঁকটা উবে গেছে কখন। এখন পেটে একটা চোঁ-ব্যথা। তবে তার মনটা এই ভেবে খুব ভাল লাগছিল যে পুলিসের হাতে পড়েও সে কারো নাম বলেনি।

এইট-বি বাস স্ট্যান্ডে ছেড়ে দিয়ে মগন বলল—মালিককে তিন দিনের পয়সা দিইনি।

কালু দাঁত বের করে বলল—আমার এক হপ্তার বাকি। কাল থেকে গাড়ি দেবে না। তার ওপর পুলিস লেগেছে।

—দুদিন জোর বৃষ্টি হলে ভাল সওয়ারি পাওয়া যায়।

—ইচ্ছেমতো তো আর বৃষ্টি হবে না।

মগন গাড়ি মালিকের বাড়িতে তুলে রাখতে বিজয়গড় গেল।

কালু স্টেশন রোডের মুখে খানিক দাঁড়িয়ে আর একটা রিকশা খুঁজল। পেল

boiRboi.net

না, হাঁটতে লাগল। বাড়ি না গেলেও হয়। গরফা পর্যন্ত হাঁটতে ইচ্ছে করছে না খিদে পেটে।

স্টেশনের গায়ে একটা তেলেভাজার ঝোপড়ার দোকান আছে। সেটা চালায় বিশে, তার দোস্ত, সেখানে গেলে কিছু খাবার জুটতে পারে। শোওয়ার জায়গার অভাব নেই, স্টেশনে গামছা পেতে পড়ে থাকলেই হল।

বিশে জেগে ছিল, ঝোপড়ায় হ্যারিকেন জ্বলছে। একটা বিদীকিচ্ছিরি কম দামের ট্রানজিস্টারে কোথাকার একটা পুরোনো হিন্দি গান হচ্ছে।

তাকে দেখে বিশে দাঁতের বিড়ি ফেলে দিয়ে বলল—পরশু মাল খাওয়াবি কথা ছিল।

কালু বলে—কাল খাওয়াবো।

—তোর শালা মুখ না ইয়ে।

—বেশী মেজাজ লিস না বিশে, আমার কচকচে সাড়ে চারশো টাকা আছে।

—যাঃ যাঃ!

—কিছু পেটের ব্যবস্থা হবে?

বিশে বলল—শালা রোজ এসে জ্বালালে এবার ঝাপড় খাবি।

তা বলে বিশে ফিরিয়ে দেয় না। মুড়ি, ছোলাসেদ্ধ আর ঠান্ডা বেগুনী খাওয়ায়। তারপর দুই বন্ধুতে বিড়ি ধরিয়ে গিয়ে স্টেশনে শুয়ে পড়ে গল্পগাছা করতে থাকে। বিশের মা ঝোপড়া আগলে রাখে।

বিশে সব শুনে বলে—তুই শালা ঘুণচক্করে পড়বি। খুনখারাবি নিয়ে দিল্লাগী নয় দোস্ত! সত্যি কথা বল তো কাউকে দেখেছিলি?

স্টেশনের শক্ত মেঝের ওপর চট পেতে শোয়া কালু পাশ ফিরে বিশের দিকে চেয়ে বিড়িতে টান মেরে বলে—তুই লাশটা দেখেছিলি?

বিশে বলে—দেখব না কেন? লাইনের ধারে দিনভর পড়েছিল। অনেকবার গিয়ে দেখেছি।

—চিনতে পেরেছিলি?

বিশে মাথা নেড়ে বলে—খুব, ফলি গুন্ডাকে কে না চেনে? এসব জায়গাতেই আড্ডা ছিল। সব সময়ে ট্রেনে আসত আর ট্রেনেই চলে যেত।

—ট্যাবলেট বেচতে আসত যে আমিও জানি। কিন্তু ট্রেনে আসত কেন বল তো?

—মনে হয় পাড়ায় ঢুকতে ভয় পেত। বাসেটাসে এলে তো বড় রাস্তা বা স্টেশন রোড ধরে আসতে হবে। ওসব জায়গায় ওর কোনো বিপদ ছিল মনে হয়।

কালু আর একটা বিড়ি ধরিয়ে বলে—লুকিয়েচুরিয়ে আসত তাহলে!

বিশে গম্ভীর হয়ে বলে—কিন্তু ফলিরও দল ছিল। সন্তোষপুর, পালবাজার, স্টেশন রোড এসব এলাকার বিস্তর মস্তান ছিল ওর দোস্ত। আমার দোকানে এসে ইঁট পেতে বসে কতদিন দিশি মাল আর তেলেভাজা খেয়েছে।

—তুই তাহলে ভালই চিনতি?

—বললাম তো। তুই খুনটা নিজে চোখে দেখলি?

—নিজের চোখে।

—খুনীকেও চিনলি ?

কালু হেসে বলে—নাম বলব না তা বলে। চিনলাম।

বিশে একটা আস্তে লাথি মারল কালুর পাছায়।

তারপর বলল—মালকড়ি ঝাঁকবি ?

—ঝেঁকেছি, কাল তোকে মাল খাওয়াবো।

বিশে ঘুমোয়। কালুর অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসে না। গালটা ফুলে টনটনে ব্যথা হয়েছে। মাজাতেও ব্যথা বড় কম নয়। এপাশ ওপাশ করে সে একটু কোঁকাতে থাকে।

শেষরাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল কালু। উঠতে অনেক বেলা হল। দেখল, বিশে উঠে গেছে। স্টেশনে গিজগিজ করছে।

লাইন পার হয়ে কালু পাড়ায় ঢুকে বাড়িমুখো হাঁটতে থাকে।

দরজায় পা দিতে না দিতেই মা চেঁচিয়ে বলে—হারামজাদা বজ্জাত, কার সঙ্গে লাগতে গিয়েছিলি ? কাল রাতে চারটে গুণ্ডা এসে বাড়ি তছনছ করেছে। ছেলে-দুটোকে ধরে কী হেনস্থা, যা বাড়ি থেকে দূর হয়ে ! গুণ্ডা বদমাশ কোথাকার !

সাত

নানক চৌধুরীর পড়ার ঘরের জানালা দিয়ে তাকালে পাড়ার অনেকখানি দেখা যায়।

ঘরে নানক চৌধুরী একাই থাকে। বাড়ির কারো সঙ্গেই হলাহলি গলাগলি নেই, এমন কি স্ত্রীর সঙ্গেও না। নিজের ঘরে বইপত্র আর নানান পুরাদ্রব্যের সংগ্রহ নিয়ে তার দিন কেটে যায়। কাছেই একটি কলেজে নানক অধ্যাপনা করে। না করলেও চলত, কারণ টাকার অভাব নেই।

টাকা থাকলে মানুষের নানারকম বদ খেয়াল মাথা চাড়া দেয়। নানক চৌধুরী সেদিক দিয়ে কঠোর মানুষ। মদ মেয়েমানুষ দূরের কথা নানক সুপুরিটা পর্যন্ত খায় না। পোশাকে বাবুয়ানি নেই, বিলাসব্যসন নেই। তবে খরচ আছে। জমানো টাকার অনেকটাই নানকের খরচ হয় হাজারটা পুরাদ্রব্য কিনতে গিয়ে। ইতিহাসের অধ্যাপক হলেও নানক প্রত্নবিদ নয়। তাই সেসব জিনিস কিনতে গিয়ে সে ঠকেছেও বিস্তর। কেউ একটা পুরোনো মূর্তি কি প্রাচীন মুদ্রা এনে হাজির করলেই নানক ঝটপট কিনে ফেলে। পরে দেখা যায় যে জিনিসটা ভুয়া। মাত্র দিন সাতেক আগে একটা হাঘরে লোক এসে মরচে-ধরা একটা ছুরি বেচে গেছে। ছুরিটা নাকি সিরাজ-দ্দৌলার' আমলের। প্রায় নশো টাকা দণ্ড দিয়ে সেটা রেখেছে নানক।

দেখলে নানককে বেশ বয়স্ক লোক বলে মনে হয়। দাড়ি গোঁফ থাকায় এখন তো তাকে রীতিমতো বুড়োই লাগে। কিন্তু সন্তু যদি তার বড় ছেলে হয়, তাহলে তার বয়স খুব বেশী হওয়ার কথা নয়। নানকের হিসেবমতো তার বয়স চল্লিশের কিছু বেশী।

রাত বারোটা নাগাদ নানক তার পশ্চিমধারের জানালায় দাঁড়িয়েছিল। সেখান

থেকে পাড়ার বড় রাস্তা দেখা যায়। পাশের বাড়িটা নীচু একটা একতলা। তার পরেই নরেশের বাড়ির ভিতরদিকের উঠোন। উঠোনে আলো নেই বটে, তবে বাড়ির ভিতরকার আলোর কিছু আভা এসে উঠোনে পড়েছে। লোকজন কাউকে দেখা যায় না। এত রাতে আলো বা লোকজন দেখতে পাওয়ার কথাও নয়। তবে আজকের ব্যাপার আলাদা। ফলি নামে কে একটা ছেলে লাইনের ধারে মারা গেছে, তাকে নিয়ে নানা গুজব। কেউ বলছে খুন। একটা রিকশাওয়ালা খুনীর নাম বলেছে গগন। এই নিয়ে পাড়ায় ভীষণ উত্তেজনা। প্রায় সবাই জেগে গুজগুজ ফুসফুস করছে।

গুজব নানকের পছন্দ নয়। সে জানে কংক্রিট ফ্যাক্ট ছাড়া কোনো ঘটনাই গ্রহণযোগ্য বা বিশ্বাস্য নয়। তার নিজের বিষয় হল ইতিহাস, যা কিনা বারো আনাই কিংবদন্তীর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। অধিকাংশই কেচ্ছাকাহিনী। তাছাড়া ইতিহাস মানেই হচ্ছে রাজা বা রাজপরিবারের উত্থানপতনের গল্প। তাই ইতিহাস সাবজেক্টটাকে দু চোখে দেখতে পারে না নানক। তার ইচ্ছে এমন ইতিহাস লেখা হোক যা সম্পূর্ণ সত্যমূলক এবং সমাজবিবর্তনের দলিল হয়ে থাকবে। ইতিহাস মানে গোটা সমাজের ইতিহাস। কিন্তু পাঠ্য প্রাচীন ইতিহাসগুলো সেদিক থেকে বড়ই খণ্ডিত।

নানক দাঁড়িয়ে চুপচাপ জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখছিল। চারদিককার পৃথিবী সম্পর্কে সে এখন কিছুটা উদাস এবং নিস্পৃহ। তার সবচেয়ে প্রিয় গ্রন্থটি হল রবিনসন ক্রুশো। এই প্রায়-শিশুপাঠ্য বইটি যে কেন তার প্রিয় তা এক রহস্য। তবে নানক দেখেছে, যখনই তার মন খারাপ হয় বা অস্থিরতা আসে তখন রবিনসন ক্রুশো পড়লেই মনটা আবার ঠিক হয়ে যায়। শুনলে লোকে হাসবে কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি।

আজ বিকেল থেকে নানকের মনটা খারাপ, তার প্রত্নবিদ বন্ধু অমলেন্দু এসেছিল, ছুরিটা নেড়েচেড়ে দেখে বলেছে, "এ হল একেবারে ব্রিটিশ আমলের বস্তু। বয়স ষাট-সত্তর বছরের বেশী নয়। তবে একটু ঐতিহাসিক নকলে তৈরী হয়েছিল বটে। ন'-ন'শোটা টাকা গালে চড় দিয়ে নিয়ে গেছে হে!"

নানক চৌধুরী তখন থেকেই রবিনসন ক্রুশো পড়ে গেছে! এখন মনটা অন্যমনস্ক। নানক চৌধুরী নিজেকে সেই নিরালা দ্বীপবাসী রবিনসন ক্রুশো বলে ভাবতে ভারী ভালোবাসে। সে যদি ওরকম জীবন পায় তবে ফ্রাইডের মতো কোনো সঙ্গীও জোটাবে না। এরকম একা থাকবে।

এইসব ভাবতে ভাবতে নানক হঠাৎ নরেশের বাড়ির উঠোনে টর্চের আলো দেখতে পায়। সেই সঙ্গে দুটো ছায়ামূর্তি। ছায়ামূর্তি হলেও চিনতে অসুবিধে নেই। বিপুল মোটা বেঁটে শোভারানীকে অন্ধকারেও চেনা যায়। আর গরিলার মতো হোঁৎকা জোয়ান জোয়ান চেহারার গগনকেও ভুল হওয়ার কথা নয়।

দুজনে করছে কি ওখানে? কোনো লাভ-অ্যাফেয়ার নয় তো!

একটু বাদেই নানক দেখে গগন দেয়াল ডিঙোচ্ছে। শোভারানী টর্চ জেবলে ধরে আছে। গগন দেয়ালের ওপাশে নেমে না যেতে যেতেই পুলিসের গাড়ির আওয়াজ রাস্তায় এসে থামে। ভারী বুটের শব্দ। কিছু টর্চের আলো এলোমেলো ঘুরতে থাকে।

তাহলে এই ব্যাপার !

নানক চৌধুরী লুঙ্গির ওপর একটা পাঞ্জাবি চড়িয়ে ঘর থেকে বেরোয়। নিজের ঘরে তালা দেওয়া তার পুরানো অভ্যাস। বাড়ির কারো বিনা প্রয়োজনে তার ঘরে ঢোকা নিষেধ। তালা দিয়ে নানক নীচে নেমে আসে। চাকরকে ডেকে সদর দরজা বন্ধ করতে বলে রাস্তায় বেরোয়।

মুখোমুখি একজন পুলিস অফিসারের সঙ্গে দেখা। নানক বলে—কাউকে খুঁজছেন ?

অফিসার বলে—হ্যাঁ। গগন নামে কাউকে চেনেন ?

—চিনি।

—লোকটা ঘরে নেই। পালিয়েছে।

নামক বলে—হ্যাঁ। আমি পালাতে দেখেছি।

—কোন্ দিকে ?

—পিছনের দেয়াল টপকে ল্যাবরেটারির মাঠ দিয়ে। এখন আর তাকে পাবেন না। বড় রাস্তায় পেঁৗছে গেছে।

—কখন গেল ?

—মিনিট দশ-পনেরো হবে। নরেশ মজুমদারের স্ত্রীও ছিল। পালাবার সময় টর্চ দেখাচ্ছিল।

—আপনি কে ?

—নানক চৌধুরী প্রফেসর।

নানক চৌধুরীর পরিচয় পেয়ে পুলিস অফিসার খুব বেশী প্রভাবিত হননি। শুধু বললেন—পালিয়ে যাবে কোথায় ?

এত রাতেও পাড়ার লোক মন্দ জমেনি চারদিকে। তাছাড়া চারিদিকের বাড়ির জানালা বা বারান্দায় লোক দাঁড়িয়ে দেখছে।

রাস্তার ভিড় থেকে সুরেন খাঁড়া এগিয়ে এসে একটু বিরক্তির সঙ্গে বলে—মদনদা, তোমরা একটা মাতাল আর চ্যাংড়া রিকশাওলার কথায় বিশ্বাস করে অ্যারেস্ট করতে এলে, এটা কেমন কথা ?

পুলিস অফিসারের নাম মদন। সুরেনের সঙ্গে এ অঞ্চলের সকলের খাতির। অফিসার একটু ভ্রূ কুঁচকে বলেন—অ্যারেস্ট করতে এসেছি বললে ভুল হবে। আসলে এসেছি এনকোয়ারিতে। তা তুমি কিছু জানো নাকি সুরেন ?

—কি আর জানব ? শুধু বলে দিচ্ছি, কালুর কথায় নেচো না। ও মহা বদমাশ। গগনকে আমরা খুব ভাল চিনি। সে কখনো কোনো ঝঞ্ঝাটে থাকে না।

—থাকে না তো পালাল কেন ?

—সে পালিয়েছে কে বলল ! পালায়নি। হয়তো গা-ঢাকা দিয়েছে ভয় খেয়ে। মদনদা, তোমাদের কে না ভয় খায় বলো ?

পুলিস অফিসার একটু হেসে বললেন—আরো একজন এভিডেনস্ দিয়েছে, শুধু কালুই নয়।

—গগনবাবুর ল্যান্ডলর্ড নরেশ মজুমদার। আবার এই প্রফেসর ভদ্রলোক

বলেছেন, গগনের সঙ্গে একটু আগেই নাকি মিসেস মজুমদারকেও দেখা গেছে। তোমাদের এ পাড়ার ব্যাপার-স্যাপার বেশ ঘোরালো দেখছি।

নরেশ মজুমদার এতক্ষণ নামেনি। এইবার নেমে আসতে সবাই তার চেহারা দেখে অবাক। রাস্তার বাতি, পুলিসের টর্চ আর বাড়ির আলোর জায়গাটা ফটফট করছে আলোয়। তাতে দেখা গেল নরেশ মজুমদারের চোখে-মুখে স্পষ্ট কান্নার ছাপ। চুলগুলো এলোমেলো। গায়ে জামা গেঞ্জি কিছুই নেই, পরনে একটা লুঙ্গি মাত্র।

নরেশ নেমে এসেই মদনবাবুকে হাতজোড় করে বলে—ভিতরে চলুন। আমার কিছু কথা আছে।

মদন সুরেনের দিকে ফিরে একটু চোখ টিপলেন। প্রকাশ্যে বললেন—সুরেন, তুমি তো পাড়ার মাথা, তা তুমিও না হয় চলো সঙ্গে।

নরেশ বলে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

সুরেন খুব ডাঁটের সঙ্গে বলে—নরেশবাবু কথা আপনার যাই থাক, বিনা প্রমাণে আপনি গগনকে ফাঁসিয়ে দিয়ে ভাল কাজ করেননি। কাল সন্ধ্যেবেলা গগন জিমনাসিয়ামে ছিল, ত্রিশ-চল্লিশ জন তার সাক্ষী আছে।

নরেশ গম্ভীরমুখে বলে—সব কথা ভিতরে গিয়েই হোক। রাস্তা-ঘাটে সকলের সামনে এসব বলা শোভন নয়। আসুন।

নরেশের পিছু পিছু সুরেন আর মদন ভিতরে ঢোকে।

নানক চৌধুরী ক্রুদ্ধ চোখে চেয়ে থাকে। তাকে ওরা বিশেষ গ্রাহ্য করল না। অথচ একটা অতি গুরুতর ব্যাপারের সে প্রত্যক্ষদর্শী।

ঘরের একধারে একটা রিভলভিং চেয়ারে বেগম আধশোয়া হয়ে চোখ বুজে আছে, কপালে একটা জলপট্টি লাগানো, ডান হাতের দুটো আঙুলে কপালের দুধার চেপে ধরে আছে। তার কান্না শোনা যচ্ছে না, তবে মাঝে মাঝে হেঁচকির মতো শব্দ উঠছে।

শোভারাণী ভিতরের দরজায় অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দাঁড়িয়ে। তার দু চোখে বেড়ালের জ্বলন্ত দৃষ্টি।

নরেশ মজুমদার যখন তার অতিথিদের এনে ঘরে ঢুকল তখন শোভারাণীর ঠোঁটে একটা হাসি একটু ঝুলে খেয়েই উড়ে গেল।

বেগম একবার রক্তরাঙা চোখ মেলে তাকায়। আবার চোখ বুজে বসে থাকে।

নরেশ মজুমদার বেগমের দিকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে মদনের দিকে চেয়ে বলে—ঐ হল ফলির মা, আমার শালী।

মদন গম্ভীরমুখে বলে—ওসব আমরা জানি।

নরেশ মজুমদার এ কথায় একটু হাসবার চেষ্টা করে বলে—এতক্ষণ আমি আমার শালীর সঙ্গে আলোচনা করছিলাম।

মদন আর সুরেন দুটি ভারী নরম সোফায় বসে। সুরেন বলে—অনেক রাত হয়েছে নরেশবাবু, কথাবার্তা চটপট সেরে ফেলুন।

নরেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ সুরেনের দিক চেয়ে বলে—আপনি বলছিলেন গতকাল গগন সন্ধ্যেবেলায় জিমনাসিয়ামে ছিল। আপনি কি ঠিক

BDeboi.net

জানেন ছিল ?

—আলবৎ। সুরেন ধমকে ওঠে।

নরেশ মাথা নেড়ে বলে—না সুরেনবাবু গগন সন্ধ্যেবেলায় জিমনাসিয়ামে ছিল না ! সে সন্ধ্যে সাতটার পর ব্যায়াম শেখাতে আসে। তারও সাক্ষী আছে।

সুরেন পা নাচিয়ে বলে—এ এলাকায় গগনকে সবাই চেনে নরেশবাবু। সে দেরি করে জিমনাসিয়ামে এলেও কিছু প্রমাণ হয় না। জিমনাসিয়ামে যাওয়ার আগে সে কোথায় ছিল সেইটাই তো আপনার জিজ্ঞাস্য ? তার জবাবে বলি, যেখানেই থাক লুকিয়ে ছিল না। আপনি গগনের পিছনে লেগেছেন কেন বলুন তো !

এ কথা শুনে বেগম আবার তার রক্তরাঙা চোখ খুলে তাকাল ! সোজা সুরেনের দিকে চেয়ে কান্নায় ভাঙা ও ভারী স্বরে বলল—গগনবাবু কাল সন্ধ্যেবেলা কোথায় ছিলেন তা কি আপনার জানা আছে ?

—না।

—তাহলে জামাইবাবুকে খামোকা চোখ রাঙাচ্ছেন কেন ? যদি জানা থাকে তাহলে সেটাই বলুন।

মদন কথা বলেনি এতক্ষণ, এবার বলল—ওসব কথা থাক। সাসপেক্ট কোথায় ছিল না-ছিল সেটা পরে হবে। আপাতত আমি জানতে চাই আপনারা কোন ইনফর্মেশন দিতে চান কিনা, আজেবাজে খবর দিয়ে আমাদের হ্যারাস করবেন না। কংক্রীট কিছু জানা থাকলে বলুন।

নরেশ মজুমদার বলল—ফলি কি খুন হয়েছে ?

মদন গম্ভীর মুখে বলে—পোস্টমর্টেমের আগে কি করে তা বলা যাবে ?

—খুন বলে আপনাদের সন্দেহ হয় না ?

—আমরা সন্দেহ-টন্দেহ করতে ভালবাসি না। প্রমাণ চাই।

—কিন্তু আই উইট্‌নেস তো আছে !

সুরেন ফের ধমকে ওঠে—উইটনেস আবার কি ? একটা বেহেড মাতাল কি বলেছে না বলেছে সেটাই ধরতে হবে নাকি ?

শোভারাণী এতক্ষণ চুপ ছিল, এবার সামান্য সুর করে নরেশকে বলল—তোমার অত দরদ কিসের বলো তো ?

—তুমি ভিতরে যাও।

—কেন, তোমার হুকুমে নাকি ?

নরেশ রেগে গিয়ে বলে—যাবে কি না !

—যাবো না। আমারও কথা আছে।

—কী কথা ?

—তা পুলিসকে বলব।

মদন হাই তুলে বলল—দেখুন, এখনো কেসটা ম্যাচিওর করেনি। চিলে কান নেওয়ার বৃত্তান্ত। খুন না দুর্ঘটনা কেউ বলতে পারছে না। আপনারা কেন ব্যস্ত হচ্ছেন ?

নরেশ বলল—যদি খুনটাকে দুর্ঘটনা বলে চালানোর ষড়যন্ত্র হয়ে থাকে ?

BoiRboi.net

—কিন্তু খুনের তো কিছু কংক্রীট প্রমাণ বা মোটিভ থাকবে!

নরেশ বলল—আপনারা পুলিসের কুকুর আনলেন না কেন? আনলে ঠিক—

মদন হেসে উঠে বলে—কুকুরের চেয়ে মানুষ তো কিছু কম বুদ্ধি রাখে না। আপনার যা বলার বলুন না।

বেগম তার রিভলভিং চেয়ার আধপাক ঘুরিয়ে মুখোমুখি হয়ে বলে—আমাদের তেমন কিছু বলার নেই। তবে আমাদের যা সন্দেহ হচ্ছে তা আপনাদের বলে রাখলাম। আপনারা কেসটা চট করে ছেড়ে দেবেন না বা অ্যাকসিডেণ্ট বলে বিশ্বাস করবেন না।

—ঠিক আছে। এ ছাড়া আর কিছু বলবেন?

—গগনবাবুকে আপনারা ধরতে গেলেন না?

—কেন ধরব? মদন অবাক হয়ে বলে।

—ধরতেই তো এসেছিলেন!

মদন হেসে বলল—হুটহাট লোককে ধরে বেড়াই নাকি আমরা?

—তাহলে কেন এসেছিলেন?

—আপনার জামাইবাবু আমাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তাছাড়া কালুও কিছু কথা আমাদের কাছে বলেছে। আমরা তাই গগনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

—উনি তো পালিয়ে গেলেন। তাইতেই তো প্রমাণ হয় ওঁর দোষ কিছু না কিছু আছে।

সুরেন ঝেঁকে উঠে বলে—না, হয় না।

নরেশ বলে—কালু যে গগনকে দেখেছে নিজের চোখে সেটাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন কেন?

এবার পুলিস অফিসার মদন একটু বিরক্তির সঙ্গে বলে—নরেশবাবু, কালু কিন্তু কারও নাম বলেনি। আর গগনবাবু যে পালিয়েছেন সেও গট্-আপ ব্যাপারটা হতে পারে। কারণ পাড়ার একজন বলছেন যে একটু আগে আপনার স্ত্রীই নাকি তাকে পালাতে সাহায্য করেছেন।

আট

ট্যাক্সিতে বসে গগন কিছুক্ষণ মাথা এলিয়ে চোখ বুজে রইল। মাথাটা বড্ড গরম, গা-ও গরম। মনের মধ্যে একটা ধাঁধা লেগে আছে।

গোল পার্কের কাছ বরাবর এসে ট্যাক্সিওয়ালা জিজ্ঞেস করল—কোন দিকে যাবেন?

কোন চুলোয় যাবে তা গগনের মাথায় আসছিল না। কলকাতায় তার আত্মীয়-স্বজন বা চেনাজানা লোক হাতে গোনা যায়। কালীঘাটে এক পিসি থাকে। কিন্তু পিসির অবস্থা বেশী ভাল নয়। ছেলের বৌয়ের সংসারে বিধবা পিসি কোল ঘেঁষে পড়ে থাকে, তার কথার দাম কেউ বড় একটা দেয় না। তাছাড়া আপন পিসিও নয়, বাবার মামাতো বোন।

আর এক যাওয়া যায় ছটকুর কাছে। বহুকাল দেখাসাক্ষাৎ হয় না বটে কিন্তু ছটকু একসময়ে গগনের সবচেয়ে গা-ঘেঁষা বন্ধু ছিল।

গগনের বন্ধু মানেই গায়ের জোরওলা, পেশীবহুল মানুষ। ছটকু ঠিক তা নয়। আড়েবহরে ছটকু খুব বেশী হবে না। সাড়ে পাঁচ ফুটিয়া পাতলা গড়নের ছিমছাম চেহারা। তবে কিনা ছটকু একসময়ে বালিগঞ্জ শাসন করত। আর সেটা করত বুদ্ধির জোরে। মারপিট করতে ছটকুকে কম লোকই দেখেছে। তবে দারুণ তেজী ছেলে, দরকার পড়লে দু হাজার লোকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাবে। ফেদার ওয়েটে ভাল বক্সার ছিল কলেজে পড়ার সময়। গগন যখন কলেজে পড়তে আসে ঐ ছটকু ছিল তার ক্লাসের বন্ধু, পরে জিমনাসিয়ামে গায়ের ঘাম ঝরাতে গিয়ে পরিচয়টা আরো গাঢ় হয়।

বকসিং ছটকু খুব বেশীদিন করেনি, কলেজের প্রথম দিকে খুব লড়ালড়ি করল কিছুদিন! ফোর্ট উইলিয়ামে এক কমপিটিশনে জিতেও গিয়েছিল। কিন্তু তারপরেই পড়াশুনোর তাগিদে সেসব ছেড়ে ভাল ছাত্র হয়ে গেল। কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে পড়ত। ফার্স্টক্লাস পেল, এম. এস-সিতেও তাই। কিছুদিন বোম্বাই গিয়ে চাকরি করল। সেখান থেকে গেল বিলেত, বিলেতে নিউমোনিয়া বাঁধিয়ে কিছুদিন ভুগে ছ'মাস বাদে ফিরে এল। বলল—বিলেত কি আমাদের পোষায়! টাকাটাই গচ্চা।

ছটকু বড়লোকের ছেলে। তার বাবা সরকারী ঠিকাদার, জাহাজের মাল খালাস করার ব্যবসাও আছে। এলাহী বাড়ি, এলাহী টাকা। বিলেত থেকে ফিরে এসে ছটকু কলকাতায় চাকরি নেয়। গগন কিছুদিন আগে খবর পেয়েছে যে ছটকু চাকরি ছেড়ে ব্যবসা করছে, খুব বড়লোকের সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করেছে এবং বৌয়ের সঙ্গে তার বনিবনা হচ্ছে না।

কোনো মানুষই নিখাদ সুখে থাকে না। পৃষ্ঠব্রণ একটা না একটা থাকবেই। ভেবে গগন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ট্যাক্সিওলাকে বলল—ম্যাণ্ডেভিল গার্ডেনস।

ছটকুদের বাড়িটা এত রাতেও জেগে আছে। পুরোটা জেগে আছে বললে ভুল হবে। দোতলা তেতলার বেশীর ভাগই অন্ধকার। তবু দু'চারটে জানালায় আলো জ্বলছে। দোতলার বাঁদিকের কোণের ঘরটা ছটকুর। তাতে আলো দেখা যাচ্ছে। সদরটা খোলা। দুটো দারোয়ান বসে কথা কইছে।

গগন ট্যাক্সি ছেড়ে নেমে সদরে উঠতেই দারোয়ানদের একজন বলে ওঠে—কাকে চাইছেন?

—ছটকু আছে?

—আছে।

—একটু ডাকবে ওকে? বড় দরকার। বলো গগন এসেছে

—দেখি। বলে দারোয়ান ভিতরে গেল।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র অপেক্ষা করতে হল। হঠাৎই পায়জামা আর স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরা ছটকু দরজায় দেখা দিয়ে অবাক হয়ে বলে—তুই কোত্থেকে রে?

—কথা আছে। রাতের মতো একটু থাকতে দিবি?

boiRboi.net

—হোল লাইফ থেকে যা না। আয় আয়।

গগন শ্বাস ফেলে বাঁচল। ছটকুর বউকে সে চেনে না। সে মহিলা কেমন হবে কে জানে! যেখানে মহিলারা সুবিধের নয় সেখানে থাকা বড় জ্বালা। তার ওপর ছটকুর সঙ্গে তার বউয়ের বনিবনা নেই বলে শুনেছে। তাই স্বস্তির মধ্যেও একটু কাঁটা বিঁধে রইল মনে। নিখাদ সুখ বলে তো কিছু নেই।

ছটকুর পিছু পিছু দোতলায় উঠে এল গগন। এ বাড়িতে সে আগেও এসেছে। বড়লোকদের বাড়ি যেমন হয় তেমনি সাজানো। যেখানে কার্পেট পাতা নেই সেখানকার মেঝে এত তেলতেলে আর ঝকঝকে যে পা পিছলে যেতে পারে।

ছটকুর ঘর তিনটে। কোণেরটা শোওয়ার ঘর। ঢুকতেই বিশাল একটা বসবার ঘর। বাঁদিকেরটা স্টাডি। বরাবর তিনখানা ঘর ছটকু একা ভোগ করেছে। এসব দেখে নিজের গ্যারেজের ঘরখানার কথা ভাবলে গগনের হাসি পায়। মানুষে মানুষে অবস্থার পার্থক্য কী বিপুল আশমান জমিন!

বসবার ঘরে মেঝে ঢাকা পুরু উলের গালচে। গাঢ় খুনখারাপী রঙের। দারুণ সব সোফা আর কৌচ, বিশাল রেডিওগ্রাম, টি-ভি সেট, বুক কেস, কাঁচের শো-বকস্। দরজায় পর্দার বদলে লম্বা হয়ে ঝুলছে সুতোয় গাঁথা বড় বড় পুঁতির মালা।

ছটকু তাকে বসিয়ে একটা চাকা লাগানো পোর্টেবল রুম এয়ার কণ্ডিশনার কাছে টেনে এনে চালু করল। হিমঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা লাগল গগনের শরীরে। বড় ভাল হাওয়াটা।

ক্যাম্বিসের ব্যাগটা মেঝেয় রেখে গগন একটা আরামের 'আঃ' শব্দ করে চোখ বুজে থাকে। মুখোমুখি বসা ছটকু কিন্তু একটা প্রশ্নও করেন নি। চুপ করে বসে একটা পাইপ ধরিয়ে টানতে লাগল, সময় দিল গগনকে।

গগন খানিক বসে থেকে হঠাৎ বুঝতে পারল যে এবার তার কিছু বলা উচিত। ছটকু কী ভাবছে?

গগন বলে—তোর বউ ঘুমিয়েছে?

—কেন? ছটকুর মুখে দুষ্টুমির হাসি।

—না, বলছিলাম কি পাশের ঘরে উনি এখন ঘুমিয়ে আছেন আর আমরা কথাবার্তা বলছি—এতে ওঁর ডিসটার্ব হতে পারে।

নিভন্ত পাইপটা আবার ধরিয়ে ছটকু মৃদুস্বরে বলে—ঘুমোয়নি, একটু আগেই কথা হচ্ছিল।

গগন আড়চোখে দেখে পাশের ঘরে আলো জ্বলছে। জোরালো আলো নয়, মিষ্টি একটা হলুদ আভার বাতি। শোওয়ার ঘরের দরজায় ফুটফুটে সাদা জালি পর্দা ঝুলছে। ওপাশে যে মহিলা আছেন তিনি গগনকে কী চোখে দেখবেন সেইটাই সমস্যা।

গগন বলল—একটু বিপদে পড়ে তোর কাছে এসেছি।

ছটকু হেসে বলে—গগ্, বিপদটা একটু নয়। একটু বিপদে পড়ে এত রাতে তুই আসিসনি।

বরাবরই ছটকু তাকে গগ্ বলে ডাকে। প্রথম জীবনে ছটকু তার নাম দিয়েছিল

boiRboi.net

গগ্যাঁ। গগন থেকে গগ্যাঁ, বিশ্ববিখ্যাত আঁকিয়ে গগ্যাঁর সঙ্গে নাম মিলিয়ে। পরে আর এক আর্টিস্টের নামের সঙ্গে মিলিয়ে গগ্ বলে ডাকত। ছটকুর ঐ স্বভাব, যে কারো নামই খানিকটা পাল্টে বা বিকৃত করে ডাকবে।

গগন রুমালে মুখ গলা মুছে বলল—বিপদটা কঠিন বলে মনে হয় না। তবে আমার একজন হিতৈষিণী আমাকে পালানোর পরামর্শ দিয়েছে।

—হিতৈষিণীটি কে?

—ল্যান্ডলর্ডের বউ। নাথিং রোমানটিক।

—অ। আর বিপদটা?

—একটা খুনের ব্যাপার।

—খুন! বলে ভ্রূ তোলে ছটকু।

গগনের হাসি আসে না, তবু দাঁত দেখিয়ে গগন বলে—খুন কিনা জানি না। তবে কেউ কেউ বলছে খুন। আর তাতে আমাকে ফাঁসানোর একটা চেষ্টা হয়েছে।

ছটকু কী একটা বলতে গিয়েও হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে সামলে গেল। কিছু একটা টের পেয়েছিল ছটকু। কারণ কথাটা গগন শেষ করার পরপরই শোয়ার ঘর থেকে একটি মেয়ে বাতাসে ভেসে আসবার মতো এঘরে এল। ভারী উদাসীন নিঃশব্দ আর অনায়াস হাঁটার ভঙ্গী।

এত সুন্দর মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। যেমন গায়ের রং, তেমনি ফিগার আর মুখখানা। এইসব মুখের জন্য দুই রাষ্ট্রে যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। লম্বাটে, পুরন্ত, ধারালো সুন্দর সেই মুখশ্রী, ভারী দুখানা চোখের পাতা আধবোজা। অল্প একটু লালচে চুলের ঢল ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা, পরনে একটা রোব।

ঘরে ঢুকে গগনের দিকে দু-এক পলক নিস্পৃহ চোখে চেয়ে থাকে মেয়েটি। ঘরটা এক সুগন্ধে ভরে যায়।

ছটকু ওর দিকে পিছন ফিরে বসেছিল। ঘাড় না ঘুরিয়েই বলল—লীনা, এ আমার বন্ধু গগন চৌধুরী।

লীনা কথা বলল না। তবে একটু ভ্রূ কুঁচকে বলল—নাইস টাইম ফর এ ফ্রেন্ড টু কল!

ছটকু সামান্য বিরক্তির সঙ্গে বলে—লীভ ইট!

লীনা বসবার ঘরের পিছনে বড় পর্দার ওপাশে আড়ালে চলে যায়।

ছটকু আবার পাইপ ধরিয়ে বলে—কী খাবি?

—খাবো? গগন অবাক হয়ে বলে—খাবো কী রে?

—না খেয়ে থাকবি নাকি? নাকি লজ্জাটজ্জা পাচ্ছিস?

বাস্তবিক গগন লজ্জা পাচ্ছিল। সঙ্গে আবার একটু ভয়ও। এইমাত্র ছটকুর বউ লীনা অ্যায়সা দারুন অ্যাকসেন্টে ইংরিজি বুলি ঝেড়েছে যে তাতেই গগন থমকে গেছে, ইংরিজিটা তো মেমসাহেবের মতো বলেই, তার ওপর মেজাজও সেই পর্দায় বাঁধা। তাই গগন বড় ভীত-সীতু হয়ে পড়েছে।

ছটকু একটু হাসল। বরাবর ছটকুর মাথা ক্ষুরের মতো ধারাল। টক করে অনেক কিছু বুঝে নেয়। গগনের ব্যাপারটাও বুঝে নিয়ে বলল—ঘাবড়াচ্ছিস? কিন্তু

boiRboi.net

ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমার ঘর এটা, আমিই মালিক। তোর কে কি করবে?

গগন বলে—আরে দূর! ওসব নয়। আমার খিদেও নেই।

—অত বড় শরীরটায় খিদে নেই কি রে? দাঁড়া, ফ্রিজে কিছু আছে কিনা লীনাকে দেখতে বলছি।

এই বলেই বেশ গলা ছেড়ে দাপটে হাঁক দিল ছটকু—লীনা! এই লীনা—

অত্যন্ত ভয়াবহ মুখে লীনা পর্দা সরিয়ে দেখা দেয়। চুলের একটা ঝাপটা তার অর্ধেক মুখ ঢেকে রেখেছে, চোখে সাপের চাহনি, মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে বলে—চেঁচিয়ে কি নিজেকে অ্যালার্ট করতে চাইছো? কী বলবে বল।

ছটকু সুখে নেই তা গগন নিজের দুঃখ-দুশ্চিন্তার মধ্যেও বুঝতে পারে। মেয়ে-ছেলেরা অ্যায়সা হারামী হয় আজকাল!

ছটকু গম্ভীর মুখে কিন্তু ঠাণ্ডা গলায় বলে—গগনকে কিছু খেতে দাও।

লীনা খুব অবাক হয়ে গগনের দিকে তাকায়! এত রাতে একটা উটকো লোক এসে খেতে চাইবে এটা যেন কল্পনার বাইরে।

গগন মিন মিন করে বলল—না, না, আমার কিছু লাগবে না।

—লাগবে, ছটকু ধমক দেয়।

লীনা অবাক ভাবটা সামলে নিয়ে খুব চাপা সরু গলায় বলে—তা সেটা আমাকে হুকুম করছো কেন? বেল বাজালেই সামু আসবে। তাকে বোলো।

—বেলটা তুমিই না হয় বাজালে!

গগন না থাকলে লীনা আরো ঝামেলা করত। সেটা গগন ওর চোখের ঝাঁজালো কটাক্ষেই বুঝল। কিন্তু মুখে কিছু না বলে দেওয়ালের একটা বোতাম একবার টিপে দিয়ে শোয়ার ঘরে চলে গেল।

ছটকু গগনের দিকে তাকিয়ে একটু যেন জয়ের হাসি হাসে। তবে হাসিটাতে বিষ মেশানো। আবার নিভে যাওয়া পাইপ ধরায়। বলে—বেশ আছি।

গগন একটু ঘামে। এয়ারকুলার যথেষ্ট ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়ে তাকে জমিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। তবু গগন ঠাণ্ডা হচ্ছে না তেমন। পকেটে এক গোছা নোট ভরে দিয়েছে শোভা। কেন দিয়েছে, কত দিয়েছে তা ভাববার বা দেখবার সময় পায়নি গগন। তবে দিয়েছে ঠিকই। এই টাকায় গগন বরং গিয়ে একটা হোটেলে উঠলে ভাল করত। এখানে এসে উপরি ঝামেলা পোয়াতে হত না। দুটো মানুষের লড়াইয়ের মাঝখানে পড়ে তখন তার ফাঁপর অবস্থা।

ধোপদুরস্ত পায়জামা আর শার্ট পরা চাকর সামু এল। ছটকুর হুকুমে তক্ষুনি গিয়ে কোত্থেকে খাবার এনে ডাইনিং হলে সাজিয়ে দিল।

ছটকুর তাড়ায় গিয়ে খেতেও বসল গগন। বড়লোকের বাড়ি বটে কিন্তু এরা অখাদ্য ইংরেজি খানা খায়। এক পট সাদা মাংস দেখে সরিয়ে রাখল গগন! মাংস খায়ই না সে। দুটো চীজ স্যাণ্ডউইচ ছিল মস্ত মস্ত। একখানা কামড়ে তার তেমন ভাল লাগল না। তবে টমেটো আর চিলি সস দিয়ে কোনোক্রমে গিলল সেটা। দ্বিতীয়টা ছুঁল না। এক বাটি সব্‌জী দিয়ে রান্না ডাল ছিল, সেটা খেল চুমুক দিয়ে।

ছটকু উল্টোদিকে বসে তার খাওয়া দেখছে। সামু সম্ভ্রম নিয়ে দাঁড়ালো।

boiRboi.net

গগন বেসিনে হাত ধুয়ে বলল—তুই বুঝছিস না ছটকু, খাওয়া নিয়ে মাথা ঘামানোর অবস্থা নয়।

ছটকু জবাব দেয় না। গগনকে নিয়ে ড্রয়িংরুম পার হয়ে স্টাডিতে ঢোকে। দরজা থেকেই ফিরে সামুকে হুকুম দেয়—এই সাহেবের বিছানা লাগিয়ে দাও স্পেয়ার রুমে।

স্টাডির দরজা বন্ধ করে ছটকু মস্ত সেকরেটারিয়েট টেবিলটার ওপাশে রিভলভিং চেয়ারে গিয়ে বসে। টেবিলবাতি জ্বলছিল বলে ঘরটা আবছা। দুটো এয়ারকুলার চালু আছে বলে বেশ ঠাণ্ডা। নিঝুমও বটে। এত নিস্তব্ধ ঘর গগন আর দেখেনি। মনে হয় খুব ভাল ভাবে সাউণ্ডপ্রুফ করানো আছে। তাই হবে। । দেয়ালে ছোট ছোট অজস্র ছিদ্র। রেডিও স্টেশনের স্টুডিওতে গগন এরকম দেখেছে। একবার আকাশবাণীর বিদ্যার্থী মণ্ডলে সে স্বাস্থ্যের বিষয়ে বলেছিল, তখন দেখেছে সাউণ্ডপ্রুফ স্টুডিওর দেয়ালে এরকম ফুটো থাকে। কথা বললে কোনো প্রতিধ্বনি হয় না।

এখানেও হল না। গগন বলল—তোকে খুব জ্বালাচ্ছি।

ছটকু মাথা নেড়ে বলল—না। বরং এসে আমাকে বাঁচালি। ঐ ভ্যাম্পটার কাছ থেকে খানিকক্ষণ সরে থাকতে পারছি।

গগন চুপ করে থাকে। এ প্রসঙ্গটা কটু। না মন্তব্য করাই ভাল।

ছটকু বলল—এবার তোর কথা বল।

গগন কোনো ব্যাপারেই তাড়াহুড়ো করে না। ও জিনিসটাই তার নেই। যা করে বা বলে তা ভেবেচিন্তে গুছিয়ে। তাই খুব আস্তে আস্তে সে ঘটনাটা ছটকুর কাছে ভাঙতে লাগল।

খুব বেশী সময় লাগল না। মিনিট কুড়ি বড় জোর। ঘটনা তো বেশী নয়।

ছটুকু যতক্ষণ শুনছিল ততক্ষণ তার দিকে তাকায়নি, মাথা নীচু করে ছিল। গগন থামতেই চোখ তুলে বলল—সব বলা হয়ে গেল? কিছু বাদ যায়নি তো?

—না। গগন বলে।

ছটকু মাথা নেড়ে চিন্তিত মুখে বলে—ঘটনার দিন খুনের সময়ে তুই কোথায় ছিলি?

গগন এটা ভেবে দেখেনি। তাই তো! কোথায় ছিল? অনেক ভেবে বলল—সন্ধ্যের একটু পরে জিমনাসিয়ামে ছিলাম।

—আর তার আগে?

—একটু বোধ হয় কেনাকাটা করতে গিয়েছিলাম বাজারে।

—কোন্ বাজারে?

গগন একটু চমক খেয়ে বলল—সাঁজবাজার।

—সেটা তো স্পটের কাছেই।

গগনের গলা হঠাৎ শুকনো লাগছিল। নাড়ির গতি বাড়ল হঠাৎ। সে কেমন ভ্যাবলার মতো বলল—হ্যাঁ।

ছটকু একটু চিৎ হয়ে আবার পাইপ ধরিয়ে বলে—আবার ভাল করে ভেবে দ্যাখ। কিছু একটা লুকোচ্ছিস।

boiRboi.net

—না না। গগন প্রায় আঁৎকে ওঠে। আর তার পরেই নির্জীব হয়ে যায়।

—বলে ফেল গগন। ছটকু ছাদের দিকে চেয়ে বলে।

ঠাণ্ডা ঘরে হঠাৎ আরো ঠাণ্ডা হয়ে যায় গগন। উদ্‌ভ্রান্ত বোধ করে। বেগমের কথা সে ছটকুকে বলেনি। নিজের চরিত্রদোষের কথা কে-ই বা কবুল করতে যায় আগ বাড়িয়ে।

গগন কথা বলে না।

ছটকু পাইপ পরিষ্কার করতে করতে সম্পূর্ণ অন্য এক প্রসঙ্গ তুলে বলে—তুই তো জানিস না, আমার হাতে এখন কোনো কাজ নেই। মানে বাবা আমাকে কোনো কাজ দিচ্ছে না, মোর অর লেস তাঁর একটা ধারণা হয়েছে যে আমি খুব অপদার্থ, বউয়ের সঙ্গে ইচ্ছে করেই গোলমাল করছি। ফলে বাড়িতে এখন দারুণ অশান্তি, লীনা নাকি টের পেয়েছে যে আমি একজন বিগতযৌবনা, ফিল্ম-অ্যাকট্রেসের সঙ্গে শোয়াবসা করে থাকি। বাড়িতে বলেওছে সেকথা।

গগন নড়ে বসে। সে সাহস পাচ্ছে।

পাইপে তামাক ভরে জ্বালিয়ে ছটকু বলে—কথাটা মিথ্যেও নয়। তবে কিনা সে মহিলাটির যৌবন এখনো যায়নি। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স, শরীরের সম্পর্ক হয়নি এমন নয়, তবে কোনো সেণ্টিমেণ্টাল অ্যাটেচমেণ্ট নেই। প্রেম-টেম তো নয়ই। জাস্ট এ সর্ট অফ ফ্রেণ্ডশীপ। উঁচু সমাজে খুব চলে এটা। নাক সিঁটকোবার কিছু নেই। তাছাড়া বিয়ের পর মেয়েটির সঙ্গে দেখা প্রায় হয়ইনি। কিন্তু লীনা সেটাকে ঘুলিয়ে তুলছে।

—মেয়েটি কে?

—তুই চিনবি না, পঞ্চাশের ডিকেডে ফিল্মে নামত। তেমন নাম-টাম করেনি। যা বলছিলাম, এসব কারণে আমার অবস্থাটা খুব খারাপ ফ্যামিলিতে। অলমোস্ট জবলেস ভ্যাগাবণ্ড, বউয়ের সঙ্গে শুই না। কিছুদিন মদ খাওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ওটা আমার স্যুট করে না একদম। বদহজম আর অ্যাসিড হয়ে অসম্ভব কষ্ট পাই। একজন বন্ধু জুটে কিছুদিন ড্রাগের নেশা করাল, খুব জমেছিল নেশাটা, বাবা নার্সিংহোমে ভর্তি করিয়ে কিওর করাল। শেষ পর্যন্ত দেখলাম সুকুমার রায়ের সেই অবস্থা। হাতে রইল পেন্সিল। বউয়ের সঙ্গে বনে না, বাপের সঙ্গে বনে না, মদের সঙ্গে বা ড্রাগের সঙ্গেও বনে না, কিছু নিয়ে থাকতে তো হবে।

বলে পাইপটা দেখিয়ে একটু হেসে চোখ টিপে বলে—এর মধ্যে যে টোব্যাকো রয়েছে, তাতে আছে অল্প গাঁজার মিশেল। গন্ধ পাচ্ছিস না?

—না!

—কিন্তু আছে। আজকাল নানারকম নেশার এক্সপেরিমেণ্ট করি। সময় কাটে না! বুঝলি গগন?

—বুঝলাম।

—তাই বলছিলাম তোর সব কথা আমাকে বল। তোকে নিয়ে আর তোর প্রবলেম নিয়ে একটু ভাবি। সময় কাটবে।

ছটকুকে গগন খুব চেনে। ও কুকুরের মতো বিশ্বাসী, কমপিউটারের মতো মাথা

boiRboi.net

ওর। ছটকুকে বকসিং অভ্যাস করতে দেখেছে গগন। অজস্র মার খেত, মারত। রোখ ছিল সাঙ্ঘাতিক। ভীতু নয়, লোভী নয়। ওকে বিশ্বাস করতে বাধা নেই।

কিন্তু গগনের লজ্জা করছিল।

ছটকু হাই তুলে বলল—তোকে আমার সব কথা বললাম কেন জানিস? যাতে আমাকে তোর অবিশ্বাস না হয়। বিশ্বাস কর, আমার তোকে হেলপ করতে ইচ্ছে করছে।

গগন চোখ বুজে এক দমকায় বলে উঠল—ফলির মায়ের সঙ্গে আমার প্রেম ছিল।

ঠাণ্ডা মুখে কথাটা শুনল ছটকু। একটু সময় ছাড় দিয়ে ঠাণ্ডা গলাতেই প্রশ্ন করে—ফলির মা কে?

—ওঃ, সে একজন সোসাইটি লেডি। গগন আবার চোখ বুজে বলে।

—সোসাইটি লেডি? তার সঙ্গে তোর দেখা হল কোথায়?

—হয়ে গেল।

—হয়ে গেল মানে? তোর কাছ থেকে সে পাবে কী? সোসাইটি লেডি বলতে আমরা অন্যরকম বুঝি। একটু নাক-উঁচু স্বভাবের, সিউডো ইনটেলেকট-ওলা মহিলা। এরা জেনারেলি হাই ফ্যামিলির মেয়ে! যেমনটা একদিন লীনা হবে।

গগন নিজের হাতের ঘাম প্যাণ্টে মুছে বলে—এও অনেকটা সেরকম, তবে হাই ফ্যামিলি নয়, স্বামী সামান্য চাকরি করে।

—খদ্দের ধরে পয়সা নেয় নাকি?

—না বোধ হয়। তবে প্রেজেণ্টেশন নেয়, সুবিধে আদায় করে, ধারও নেয়।

ছটকু হেসে বলে—তাহলে হাফ-গেরস্ত বল। ওসব মেয়েকে আমরা তাই বলি। সোসাইটি লেডি অন্য রকম, যদিও জাত একই। তোর কাছ থেকে কি নিত?

—কী নেবে? আমার আয় তো জানিস। চাইলেও দিতে পারতাম না। তবে চায়নি।

—শুধু শরীর?

—শুধু তাই। গগন লজ্জা পেয়ে বলে।

ছটকু চিন্তিত হয়ে বলে—ও সব মেয়ে তো ভাল তেজী পুরুষ বড় একটা পায় না। যারা আসে তারা প্রায়ই বুড়ো-হাবড়া কামুক, নইলে নভিস। তাই তেমন পুরুষ পেলে বিনা পয়সায় নেয়। নিতান্ত শরীরের স্বার্থে। তারপর কী হল?

—কিছুদিন পর ফলির মা বেগম আমাকে রিজেক্ট করে দেয়। গেলে আর খুশী হত না আগের মতো। আমি কিন্তু ওকে দারুণ ভালবেসে ফেলেছিলাম।

—বুঝেছি।

—মনে মনে বেগমের জন্য খুব ছটফট করেছি বহুদিন। এখনো করি। যাই হোক, ফলি যেদিন মারা যায় তার দিন দুই আগে বেগমের একটা চিঠি পাই। তাতে ও লিখেছিল, একটা বিশেষ দিনে সন্তোষপুরের একটা ঠিকানায় গিয়ে যেন দেখা করি ওর সঙ্গে। খুব জরুরী কথা, যেদিনের কথা লিখেছিল সেটা ছিল খুনের তারিখটাই।

—বেগমের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

—না। সে ঠিকানায় গিয়ে আমি বুড়বাক। সেখানে বউ-বাচ্চা নিয়ে এক প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার দিব্যি সংসার করছে। বেগমের কথা তারা জানে না।

—বেগমের হাতের লেখা তুই চিনিস ?

—না।

—তবে বুঝলি কী করে যে বেগম লিখেছিল ?

—অবিশ্বাসের তো কিছু ছিল না !

—যাক গে। তারপর কি হল ?

—কী হবে ? ওকে না পেয়ে ফিরে এলাম।

—কারো সঙ্গে দেখা হয়নি আসবার পথে ?

গগন চুপ করে থাকে। বলা উচিত হবে কি ? অথচ না বলেই বা গগন পারে কী করে ? এতদূর এগিয়ে আবার পিছোবে ?

গগন চোখ বুজে বলে—ফলির সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

এ কথায় ছটকুও যেন চমকে যায়। তবে গলার স্বরটা খুবই ঠাণ্ডা রেখে বলে—কোথায় ?

—বাজারের কাছে একটা চায়ের দোকানে বসে আড্ডা মারছিল। আমাকে দেখে উঠে আসে।

—কথা যা হয়েছিল তা মিঠে বা মোলায়েম নয়। একসময়ে সে আমাকে একলব্যের মতো ভক্তি করত, কথায় জান দিয়ে দিতে পারত। কিন্তু সেদিন সে হুট করে বেরিয়ে এসে আমার রাস্তা আটকে বলল—গগনদা, আপনার সঙ্গে কথা আছে। তার মুখচোখ দেখে আর গলার স্বর শুনে আমি চমকে গিয়েছিলাম। একটু যে ভয়ও খাইনি তা নয়। বেজায়গায় হঠাৎ ওরকম সিচুয়েশন হলে যা হয়। আমতা আমতা করছিলাম, কারণ মনে পাপ। আমি এসেছিলাম ওর মার চিঠি পেয়ে দেখা করতে, সেটা তো ভুলতে পারছি না। ও আমাকে একটা দোকানঘরের পিছনে নিয়ে গিয়ে সোজাসুজি বলল—আমার মার সঙ্গে আপনার খারাপ রিলেশন আছে আমি জানি, আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে। ঠিক এ ভাষায় বলেনি, তবে সেনস্‌টা এই রকমই। তখন আর গগনদা বলে ডাকছিল না।

—মারধর করার চেষ্টা করেছিল ?

—হ্যাঁ, দু-চারটে কথা চালাচালি হল। আমি দুম করে বলে বসলাম—বেগম কি আমার জন্যই নষ্ট ? ওর তো অনেক খদ্দের, খোঁজ নিয়ে দেখগে। আমি আবার মিথ্যে কথাটথা বানিয়ে গুছিয়ে বলতে পারি না। বেগমের সঙ্গে আমার রিলেশনটা যে অন্যরকম যে কোনো লোক হলে তা দিব্যি বানিয়ে-ছানিয়ে বলত। আমি পারি নি। যা হোক, একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বেমক্কা একটা পিস্তল বের করল পকেট থেকে। ওর চোখ দুটো তখন পুরো খুনীর। দোকানের পিছনের সেই জায়গাটা আবছা অন্ধকার মতো। সেই আবছায়ায় দু-চারজন যে গা-ঢাকা দিয়ে দেখছে তা বুঝতে পারছিলাম। তাদেরই একজন এসময়ে বলে উঠল—ফলি, চালাস না। স্টিল ভরে দে। ফলি তাতে দমেনি। পিস্তলটা তুলে বলল—তোমাকে এইখানে নাকখত দিতে হবে, থুতু চাটবে, জুতো কামড়ে ঘুরবে, তারপর তোমার পাছায় লাথি মারব।

বুঝলাম খুন না করলেও ফালি এবং তার বন্ধুরা আমাকে বেদম পেটাবে। তার আগে নানারকম ভাবে অপমান করবে। ফালি আর আগের ফালি নেই।

—তুই কি করলি ?

—খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। অতটা ভয় না পেলে আমি ফালিকে মারতাম না।

—মেরেছিলি ?

গগন অবাক হয়ে বলে—তুই কী বলিস, মারা উচিত হয়নি ?

ছটকু দাঁতে দাঁত চেপে বলে—তা বলিনি। শুধু জানতে চাইছি।

গগন একটু অন্যমনে চেয়ে থেকে বলে—আমিও ভেবে দেখেছি মারাটা উচিত হয়েছে কিনা, কিন্তু আমার আর কী করার ছিল ? বুঝি যে মায়ের নষ্টামির জন্য ছেলের অপমান বোধ হয় হতেই পারে। কিন্তু ফালির মাকে তো আমি নষ্ট করিনি, কোনদিনই আমি মেয়ে-মানুষের পিছনে ঘুরি না, কিন্তু বেগম আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছিল। তার জন্য ফালি খামোখা আমার উপর শোধ নেবে আর আমি দাঁড়িয়ে মার খাবো নাকি ? তাছাড়া তখন প্রাণের ভয়।

—কী করলি ?

—ফালি চোখেই দেখতে পেল না কী ওর মুখে গিয়ে লাগল, খুব কুইক ঝেড়েছিলাম ঘুঁষিটা। ফালি অ্যাই জোয়ান। সহজে কাবু হওয়ার মাল নয়, তার ওপর হাতে পিস্তল ছিল। কাজেই সে ছিল নিশ্চিন্ত। আশেপাশে বন্ধুবান্ধবও রয়েছে। ভয় কি ? তাই অপ্রস্তুত অবস্থায় আচমকা ঘুষি খেয়েই টলে পড়ল সামারসল্ট হয়ে। আমি দুই লাফে বেরিয়ে বাজার ধরে দৌড়ে পালিয়ে আসি।

—তাহলে তোকে অনেকে দেখেছিল তখন।

—দেখাই স্বাভাবিক। দোকানে লোক ছিল, বাজার তো তখন গিজগিজ করছে।

—কেউ তোর পিছু নেয়নি ?

—না।

—তারপর কী করলি ?

—সোজা জিমনাসিয়ামে চলে যাই।

ছটকু আবার পাইপ ভরে বলে—রিকশাওয়ালা কালুকে টাকাটা কে দিয়েছিল গগন ?

গগন অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর যেন ছিপি খুলে সোডার বোতলের গ্যাস বের করে দেয়, আস্তে করে বলে—জানি না।

এমনিতেই শব্দহীন ঘর। তার ওপর যেন আরো ভারী এক নিস্তব্ধতা নেমে এল।

ছটকু গগনের চোখে চোখ রেখে চোখাদৃষ্টিতে কী একটু দেখে নেয়। তারপর গম্ভীর মুখেই বলে—ঠিক বলছিস ?

গগন ভাবছে—ছটকু শালা কি আমাকেই সন্দেহ করছে ? করারই কথা অবশ্য। ঘটনা যা ঘটেছে তার সব কিছুই আঙুল তুলে তাকেই দেখাচ্ছে !

গগন ছটকুর চোখের দিকে আর না তাকিয়ে বলে—আমি টাকা দিইনি। তবে ঝামেলা এড়ানোর জন্য হয়তো কখনো কালুকে টাকাটা দেবো। যদি তাতে মেটে !

—মিটবে না। ছটকু বলে।

গগন বলে—বিশ্বাস কর, ফলিকে একটা ঘুষি মারা ছাড়া আর কিছু করিনি। এক ঘুঁষিতে মরার ছেলে ফলি নয়। পরে আর কেউ লাইনের ধারে ফলিকে মারে।

ছটকু খুব বড় একটা শ্বাস ছেড়ে বলে—দ্যাখ গগন, যে মানুষ জীবনে একটাও খুন করেছে তাকে চোখে দেখেই আমি চিনতে পারি। আমার একটা অদ্ভুত ইনস্টিংট আছে। এ ব্যাপারে কখনো ভুল হয় না আমার। তুই যদিও কখনো ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় কাউকে খুন করে থাকিস, তবে তোকে প্রথম দেখেই বুঝতে পারতাম। কিন্তু এটা খুবই সত্যি কথা যে তোর চেহারায় খুনীর সেই অবশ্যম্ভাবী ছাপটা নেই।

গগন নিশ্চিন্ত হল কি? বলা যায় না, তবে সে এবার কিছুক্ষণ স্বাভাবিক ভাবে দম নিল। বলল—আমি যে খুন করিনি তা আমার চেয়ে ভাল আর কে জানে! কিন্তু লোকে কি তা বিশ্বাস করবে? সকলের তো আর তোর মতো ইনস্টিংট নেই।

ছটকু একটু হাসে। হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে বলে—ফলি যে লাইফ লীড করত তাতে যে কোনো সময়ই তার খুন হওয়ার বিপদ ছিল। এ নিয়ে ভাবিস না। কাল থেকে আমি তোর ব্যাপারটা নিয়ে অ্যাকশনে নামব। সকালে ক'টায় উঠিস?

—খুব ভোরে। চারটে সাড়ে চারটে।

ছটকু একটু ভেবে বলে—আমি উঠি ছ'টায়, কিন্তু কাল থেকে আমি তোর মতো সকালে উঠবো। মনে হচ্ছে. একটু এক্সারসাইজ দরকার। সকালে উঠে দৌড়োবি!

—নয় কেন?

—দৌড়ের পর দুজনে একটু কসরৎও করা যাবে, কী বলিস?

গগন হাসে। বলে—ঠিক আছে।

নয়

অনেক রাত পর্যন্ত বেগম অঝোরে কেঁদেছে পুত্রশোকে। নরেশ পাড়ার ডাক্তারকে ঘুম থেকে তুলে ডেকে আনে। বড় ডোজের সেডেটিভ ইনজেকশন দেওয়ার পর বেগম ঘুমিয়ে পড়ে। অনেক বেলা অবধি সে ওঠেনি।

নরেশ সারারাত ঘুমোয়নি। কখনো কেঁদেছে, কখনো পায়চারি করেছে ঘরে বা ছাদে। শোভা তার তীব্র জ্বালাধরা দুখানা চোখে দেখেছে সবই, সেও ঘুমোয়নি। মাঝে মাঝে বিছানায় গেছে, আবার উঠেছে, দেখেছে, তারপর আবার শুয়েছে। বিছানা খুব তেতে যাচ্ছিল বার বার। কী এক জ্বালায় তার নিজের শরীর আর শ্বাস এত গরম যে বিছানায় শরীর রাখতে পারছে না। সোফা কৌচে বসতে পারে না। নরেশের সঙ্গে মুখোমুখি কথাও হচ্ছিল না তার। দুজনেই দুজনকে এড়াচ্ছে।

মাঝে মাঝে শোভা গিয়ে ঘুমন্ত বেগমকে দেখেছে। চোখের কোলে এখনো জল বেগমের, চুল উসকোখুসকো, একটু বুড়োটে হয়ে গেছে মুখের শ্রী, তবু এখনো বেগম হাড়জ্বালানী সুন্দরী। শোভার ইচ্ছে করে ওকে বিষ দিয়ে মারতে। চিরকাল খোলা-খুলি পুরুষদের নাচাল বেগম। কত মেয়েমানুষের স্বামী কেড়ে নিয়ে সর্বনাশ করেছে। নরেশ হল বেগমের ভেড়ার পালের একজন।

শেষরাতে যখন আকাশের তারা ফিকে হচ্ছে তখন শোভা আর থাকতে না পেরে ছাদের সিঁড়িতে গিয়ে নরেশকে ধরল।

—তুমি ভেবেছোটা কী, অ্যাঁ?

নরেশ তার দিকে খুব আনমনে চেয়ে রইল। তারপর ঘড়ঘড়ে গলায় বলল—তুমি বিছানায় যাও।

—কেন যাবো? তোমার হুকুমে?

—আমার মন ভাল নেই। একা থাকতে দাও।

—মন ভাল নেই কেন? ফলির জন্য?

নরেশ বলে—শোভা, তুমি মানুষ নও? ফলি কি তোমার কেউ নয়?

শোভা খুব খনখনে পেত্নীর হাসি হেসে বলে—ওমা! সে কথা কি বলতে আছে? ফলি যে আমার বুকের ধন, কোলের মানিক! লজ্জা করে না তোমার?

—কী বলছো?

—কী বলছি বুঝতে পারছ না, ন্যাকা!

—পারছি না।

—আমি জানতে চাই শালীর ছেলের জন্য তোমার অত ভেঙে পড়ার কী? দয়া করে রহস্যটা বলবে, নাকি আমার মুখ থেকে শুনবে?

নরেশ গুম হয়ে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে—এ সময় রাগারাগি থাক, তুমি শুতে যাও।

—আমি শোবো না। সত্যি কথাটা তোমার মুখ থেকে আগে শুনি, তারপর কী করব না করব তা আমি জানি।

—আমার কিছু বলার নেই।

—ফলি কার ছেলে, তাও ঠিক জানো না?

নরেশ চুপ করে থাকে।

শোভা আবার সেই পেত্নীর হাসি হেসে মোটা শরীরে হিল্লোল তুলে বলে—আমার গর্ভে হয়নি বটে কিন্তু বেগম হারামজাদীর পেটে ফলি এসেছিল কী করে তা আজ স্বীকার হও না কেন?

—তুমি যাবে?

জবাবটা এল অপ্রত্যাশিত একটা প্রচণ্ড চড় হয়ে।

মোটা হলেও শোভার হাজারটা ব্যামো। হার্ট খারাপ, প্রেসার বেশী, মেয়েমানুষী রোগও অনেক, তাছাড়া আরামে আয়েসে থেকে শরীর অকেজো। চড়টা লাগতেই চার-ধাপ সিঁড়ি টপকে অত বড় লাশটা পড়ল সিঁড়ির মোড় ঘোরার চাতালে। বাড়ি কেঁপে গেল তার পড়ার শব্দে।

দশ

বাড়িতে ঢুকেই কালু বুঝতে পেরেছিল, জায়গাটা গরম আছে। তার মতো লোকের ঘরে ঢুকে মস্তানরা যখন হুটোপাটি করে গেছে তখন বুঝতে হবে কেস খারাপ।

মা প্রথম দিকে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছিল, একটু বাদে দম ফুরিয়ে ঘ্যাজর-ঘ্যাজর করতে লাগল।

boiRboi.net

সেদিকে মোটে কানই দিল না কালু। বলল—ফালতু বাত ছেড়ে কাজের কথাটা বলে লে দিকি। কী হয়েছে কী?

—তোকে যমে নেয় না কেন বলবি?

—অরুচি বলে নেয় না। কারা এসে হাল্লাক করে গেছে?

—সে গিয়ে তোর পেয়ারের লোকদের জিজ্ঞেস কর গে। আমি কি সবাইকে চিনে রেখেছি? নাহ'ক হাবুকে আর ভূতুকে ধরে এই মার কি সেই মার! কেবল জিজ্ঞেস করে কালু কোথা বল। আমি ঠেকাতে গেলাম তো আমাকেও ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। কনুই ছড়ে এখনো রক্ত পড়ছে।

—হাবু ভূতু কই?

—তারা থানায় গেছে।

কালুর মাথাটা ঠিক নেই। বড্ড ঘোঁট পাকাচ্ছে চারদিকে। বলল—কাউকে চিনতে পারিসনি?

—হাবু বলছিল একজন নাকি বাইরে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। সে সুরেন খাঁড়া না কে যেন!

কালু সময় নষ্ট করল না। সোজা উঠোনে গিয়ে কচুগাছের গোড়ার মাটি খামচে তুলে ফেলল। তলায় একটা প্লাস্টিকের খামে তার টাকা। সেটা তুলে পকেটে পুরে সে গিয়ে মাকে বলে—আমি পাতলা হচ্ছি। খুঁজিস না। বাড়িতে থাকলে শালারা আবার আসবে।

—কী করেছিস বল! নইলে কুরুক্ষেত্র করব।

—চেঁচাস না। জানাজানি হলে আমিও যাবো, তুইও যাবি।

ভয় পেয়ে মা চুপ করে যায়।

কালু অপথ-কুপথ ঘুরে স্টেশনে চলে আসে। বিশে গনগনে আঁচে বেগুনী ভাজছে। কালু গিয়ে সোজা সেখানে বসে পড়ে বলে—গাড্ডায় পড়ে গেলাম্।

বিশে এক খদ্দেরকে বিদেয় করে বলে—আজ মাল খাওয়াবি বলেছিলি।

—মাইরি খাওয়াবো। আমাকে দু-একদিন থাকতে দিবি?

বিশে হেসে বলে—থাকার জন্য স্টেশন আছে।

কালু মাথা নেড়ে বলে—তা ঠিক।

—গাড্ডা কী?

—বাড়িতে হামলা করছে শালারা।

—কারা?

—আছে।

রামরতন রিকশাওয়ালা চপ কিনতে এসে কালুকে দেখে হাঁটুর গুঁতো দিয়ে বলে—অ্যাই শালা! তোকে নাকি শ্বশুরবাড়ি ঘুরিয়েছে?

কালুর মেজাজ ভাল নেই। উঠে সটাং করে এক চড় কষাল রামরতনের গালে। বলল—জল ভরে দেব শালা। গেলবারে গুপ্তর দোকানের মাল সরিয়ে তুমি শ্বশুরবাড়ি ঘোরোনি?

রামরতন বেশী ঘাঁটাল না। কালু একা নয়, বিশে আছে। বিশে মহা মারকুট্টা

boiRboi.net

ছোকরা। স্টেশনের ভিখিরিদের দঙ্গলটা দরকার মতো বিশের পক্ষ নেয়। বিশে ওদের ভাজা বেসনের কুঁড়ো আর নিঙড়োনো মুড়ি দিয়ে হাতে রাখে। তাই রামরতন গালে হাত বুলিয়ে বলল—খচছিস কেন? আমি শালা ভাল কথা বলতে গেলাম।

কালু আর বসল না। বিশেকে বলল—আমি সাঁজের পর আসব।

বিশে মাথা নাড়ে।

কালু স্টেশন রোড ধরে সোজা হাঁটা দেয়।

ঘুরে ফিরে কোথাও যাওয়ার নেই দেখে সন্তুদের বাড়ির কাছে চলে আসে কালু। এসে দেখে নরেশবাবুদের বাড়ীর সামনে জটলা হচ্ছে। দোতলা থেকে নরেশের মোটা গিন্নীর চেঁচানী আসছে—সব জানি, সব জানি। ঢাক পিটিয়ে সবাইকে বলব তোমার চরিত্রের কথা।

সন্তু নীচের তলায় ছিল। কালুর এক ডাকে বেরিয়ে এসে বলল—চল। তোর সঙ্গে কথা আছে।

দুজনে সিংহীদের বাগানে ঢুকে পড়ে।

সবেদা গাছটা ন্যাড়া করে ফল ছিঁড়ে নিয়ে গেছে পাড়ার ছেলেরা। সেই গাছের তলায় বসে সন্তু গম্ভীর মুখে বলে—তুই এরকম ডে-লাইটে ঘুরে বেড়াচ্ছিস?

—তাতে তোর বাবার কি?

—মুখ খারাপ করিস না কালু।

কালু হেসে বলে—রং লিস না সন্তু। আমি কাউকে ভয় খাই না।

সন্তু কালুর দিকে ভ্রূ কুঁচকে একটু চেয়ে থেকে বলে—যখন প্যাঁদানি খাবি তখন বুঝবি।

কালু বলল—ছোড় বে।

সন্তু চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে—ঠিক আছে; তোর ভালর জন্যই বলছিলাম।

—আমার ভাল নিয়ে তোর মত ভদ্দরলোকদের ভাবতে হবে না। আগে বল কী বলতে চেয়েছিলি!

সন্তু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে—তুই পুলিসকে গগনদার নাম বলেছিস?

—আমি বলব কেন?

—তবে কে বলেছে?

—তার আমি কী জানি? গগনদাকে ফাঁসিয়ে আমার কী লাভ?

—কিন্তু সবাই জানে তুই গগনদার নাম বলেছিস। গগনদা কাল পালিয়ে গেছে।

কালু এটা জানত না। একটু থমকে গিয়ে একগাল হেসে বলে—লাগ ভেলকি লাগ। খুব জমে গেল মাইরি।

সন্তু একদৃষ্টে চেয়ে ছিল।

হঠাৎ কালু মুখ গম্ভীর করে বলল—সুরেন শালাকে আমার বাড়ি চেনাল কে বল তো?

—তার আমি কি জানি!

—জানিস না?

boiRboi.net

—আমি জানব কি করে ?

—আমার বাড়িতে সুরেন গিয়ে হামলা করেছে কেন তা জানিস ?

সন্তু স্পষ্টই অস্বস্তি বোধ করছিল। তবু খুব তেজের গলায় বলে—ওসব আমার জানার কথা নয়।

—সুরেন আমার কাছে কী চায় তাও জানিস না ?

—না।

—এর আগেও সুরেন আমাকে একবার মেরেছে। শালা জানে না, কালু রিকশওয়ালা হলেও মেড়া নয়। শালার দিন ঘনিয়ে এসেছে।

—ওসব আমাকে বলছিস কেন ?

—আমার সন্দেহ হচ্ছে, কেউ সুরেনকে আমার বাড়ির পাত্তা লাগিয়েছে। নইলে আমার বাড়ি চেনার কথা ওর নয়।

—আমি ঠিকানা দিইনি।

কালু খুব হীন চোখে সন্তুর দিকে চেয়ে বলে—কাল তুই আমাকে ছোরা চমকেছিলি, মনে আছে ?

সন্তু জবাব দেয় না। অন্যদিকে চেয়ে থাকে।

কালু বলে—আমি কিছু ভুলি না।

—সে তোকে মারার জন্য নয়। ভয় দেখানোর জন্য !

কালু হাত বাড়িয়ে বলে—ছুরিটা দেখি।

—কাছে নেই।

কালু একেবারে আচমকা লাফিয়ে উঠে পটাং করে একটা লাথি লাগাল সন্তুর থুতনিতে। লাথিটা তেমন জোরালো হল না। কালুর শরীরে এখন আর তত তেজ বল নেই। সন্তু শালা ভাল খায়-দায়, গগনের কাছে ব্যায়াম শেখে। শক্ত জান, তবু আচমকা লাথি খেয়ে মুখ চেপে মাটি ধরে নিল।

কালু সময় নষ্ট করে না। পড়ে-থাকা সন্তুর প্যান্টের প্যাকেটে হাত চালিয়ে মালটা বের করে ফেলে। বিলিতি ছুরি, কল টিপলে ছ ইঞ্চি ইস্পাত বেরিয়ে আসে পটাং করে।

সন্তু যখন উঠল তখন কালুর হাতে ফলাটা জমে গেছে। চকচক করছে রোদে। কালু বলল—দেখ শালা, আমার জানের পরোয়া নেই। দরকার হলে আমি লাশ ফেলব। ঠিক করে বল, সুরেনকে কে আমার বাড়ির ঠিকানা দিয়েছে।

দাঁত বসে গিয়ে সন্তুর ঠোঁট ফেটে হাঁ হয়ে আছে। অঝোর রক্ত। হাতের পিঠে ক্ষতস্থান মুছে নিজের রক্ত দেখল সন্তু। তারপর খুব ঠাণ্ডা চোখে চাইল কালুর দিকে !

কালু কখনো ছুরি চালায় নি, সন্তু জানে। এও জানে, কালুর শরীরে কিছু নেই। তবে রোখ আছে।

হিসেব করতে কয়েক পলক সময় নিল সন্তু। গগনের কাছে সে বিস্তর প্যাঁচ শিখেছে।

সন্তু কী করল তা চোখে ভাল দেখতেও পেল না কালু। কিন্তু হঠাৎ টের

boiRboi.net

পেল তার ছুরির হাতটা মুচড়ে ধরে সন্তু তাকে উপুড় করে ফেলেছে। পিঠে হাঁটু চেপে বসিয়ে মাথাটা ঠুকবার তাল করছে মাটিতে।

কালুর লাগে না। মারধর সে বিস্তর খেয়েছে। প্রায়ই খায়। মুহূর্তে সে হাঁটুতে ভর দিয়ে পটাং করে শরীরটা ছুঁড়ে দিল উল্টোবাগে। সন্তু ছিটকে গেল।

দুজনেই উঠে দাঁড়ায়। তারপর প্রচণ্ড আক্রোশে ছুটে আসে পরস্পরের দিকে। কালুর হাতে আধলা ইঁট, সন্তুর হাতে ছুরি।

এগার

খুব ভোরেই উঠে পড়তে হল গগনকে। ভোরে ওঠা তার অভ্যাস, তার ওপর এখন প্রবল দুশ্চিন্তা চলছে।

বাথরুমের কাজ শেষ করে এসে যখন বাসী বিছানাটা নিজেই গোছাচ্ছে, তখন ছটকুর ঘর থেকে অ্যালার্ম বাজার শব্দ এল।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই ছটকু ফিটফাট হয়ে এসে গগনের দরজায় টোকা মেরে ডাকে—গগ, উঠেছিস ?

—উঠেছি।

—চল।

গগনের মন ভাল নেই। সকালে উঠে শরীর রক্ষার জন্য দৌড়ানো বা ব্যায়াম করার মতো মন এখন তার নয় তবু ছটকুর আগ্রহে যেতে হল।

বড়লোকী সব ব্যাপার। ছটকু তার ফিয়াট গাড়ি চালিয়ে ময়দানে এল। ঘড়িতে সোয়া চারটে। ভিকটোরিয়ার সামনে গাড়ি রেখে দুই বন্ধুতে ধীরলয়ে দীর্ঘ দৌড় শুরু করে। পাশাপাশি।

গগন টের পায়, ছটকু নেশাভাঙ যাই করুক এখনো ওর প্রচণ্ড দম। প্রায় মাইল দুই দৌড়ের পর বরং গগনের কিছু হাঁফ ধরেছে, কিন্তু ছটকু একদম ফিট।

বাড়িতে ফিরে ছটকু গগনকে নিয়ে গেল তার জিমন্যাসিয়ামে। ছোটর মধ্যে এত ভাল জিমনাসিয়াম গগন চোখেও দেখেনি। প্রত্যেকটা যন্ত্রপাতি ঝা-চকচকে নতুন আর দামী। বেশীর ভাগই বিদেশ থেকে আনা।

ছটকু বলে—এসব পড়েই থাকে বেশীর ভাগ। আমি মাঝে মাঝে খেয়াল হলে ব্যায়াম করি।

দুজনে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা নীরবে নিখুঁত ব্যায়াম করে যায়। গগন নিজে প্রশিক্ষক, কাজেই ব্যায়ামের খুঁটিনাটি সব তার জানা। কিন্তু সেও অবাক হয়ে যায় ছটকুর নিখুঁত ব্যায়াম দেখে। কোথাও কোনো খাঁকতি নেই।

ব্যায়ামের পর দুজনেই গ্লাভস পরে কিছু সময় ঘুষোঘুষি করে। ছটকু খুবই ভালো লড়ে। ওর বাঁ হাতের ছোবল বিষে ভরা। গগন দুটো ভুতুড়ে ঘুঁষি খেয়ে গেল ছটকুর হাতে। বলল—তুই এখনো একটি বিচ্ছু আছিস। লড়া ছেড়ে দিলি কেন ?

—আরে দূর ! লড়ে হবে কী ?

—কিন্তু এখনো তোর ঘুঁষিতে অনেক ব্যাপার আছে।

ছটকু গ্লাভস খুলে ফেলে উদাস মুখে বলে—কী জানিস! আসলে আমার জীবনটা তো হ্যাপী নয়। চারদিকটার ওপর আমার আক্রোশ। ঘরে একটা কালো সাপ পুষছি। কেউ আমাকে বোঝে না, আমার প্রতি কারো সিমপ্যাথি নেই। সেই সব দুঃখ, রাগ, আক্রোশ সব আমার ঘুঁষিতে বেরোয়।

গগন বুঝতে পারে। ছটকুর জন্য তার একটু মায়াও হয়। বড়লোকেরাও দুনিয়াতে সুখে থাকে না তাহলে!

গগনের চিন্তা ভাত-কাপড় নিয়ে। অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টায় তার দিন ক্ষয় হয় রোজ। সে লড়াই ছটকুর নেই। তবু ভগবান ওকেও তো সুখ দেননি।

এলাহি জলখাবারের আয়োজন টেবিলে সাজানো। বেশীর ভাগই ইংলিশ খানা। হ্যাম অ্যান্ড এগ, পরিজ, টোস্ট, ফল। গগন মাছ-মাংস খায় না বলে তার জন্য অনেকখানি ছানা দেওয়া হয়েছে। আর বাদামের সরবৎ।

গগন খুব বেশী খায় না। পেট ভার করে খাওয়া তার ভীষণ অপছন্দ। ছটকুও বেশী খেল না। সাজানো খাবারের অধিকাংশই পড়ে রইল।

ছটকু তার পাইপ ধরিয়ে বলে—তুই তো জুডো শিখছিলি, না?

—হ্যাঁ।

—আমিও শিখেছিলাম লণ্ডনে।

—জানি।

—জুডো শেখার সময় যে শপথ করানো হয়, তা মনে আছে গগ?

—আছে।

ছটকু হেসে বলে—নিতান্ত আত্মরক্ষার খাতিরে ছাড়া কাউকে আঘাত করা যাবে না।

—জানি।

—আমার সে নিয়মটা প্রায়ই ভাঙতে ইচ্ছে করে। বুঝলি! আজকাল মাঝে মাঝে আমার মাথা ভিসুভিয়াস হয়ে যায়।

গগন ব্যাপারটা বুঝল না। চুপ করে রইল।

সামু খাবার টেবিল পরিষ্কার করছে। আর একজন উর্দি পরা লোক কফির ট্রে নিয়ে এল।

গগন কফি বা চা খায় না। ছটকু কালো কফি ঢেলে নিয়ে চুমুক দিয়ে বলে—কাল রাতে আই হ্যাড অ্যানাদার এনকাউণ্টার উইথ হার।

গগন চোখ নামিয়ে নেয়। ছটকু এবং তার বউয়ের প্রসঙ্গটা বড় অপ্রীতিকর বলে তার মনে হয়। সে লক্ষ্য করেছে সকালে জলখাবারের টেবিলে ছটকুর বউ লীনা আসেনি। কিন্তু ভদ্রতায় বলে, আসা উচিত ছিল। তবে গগন নিজেকে খুব সামান্য মানুষ বলে মনে করে, তাই তার প্রতি কেউ তেমন সৌজন্য না দেখালেও সে কিছু মনে করে না।

কিন্তু ছটকুর বোধহয় ব্যাপারটা ভাল লাগছে না। কফি আর পাইপে কিছুক্ষণ ডুবে থেকে সে হঠাৎ বলল—দুনিয়ার কাউকেই ও মানুষ বলে মনে করে না। কাল রাতে আই হ্যাড টু বিট হার।

গগন ব্যথিত হয়ে মুখ তোলে। বলে—সে কি রে! মারলি?

—মারতে হল। প্রতিজ্ঞা রাখতে পারিনি। আই অ্যাম এ ফলেন গায়।

গগন অস্বস্তির সঙ্গে বলে—আফটার অল মেয়েমানুষ তো!

—তুই মেয়েমানুষ চিনিস না গগ। চিনলে অত দয়া হত না তোর। মেয়েমানুষকে যারা অবলা বলে তারা অনভিজ্ঞ। ওদের মতো এত নিষ্ঠুর আর নেই।

গগন রাত্রিবেলা কোনো সাড়াশব্দ পায়নি। তার ঘুম খুব চটকা। তার ওপর গতকাল সে ভাল ঘুমোয়নি। তবে কি ছটকুর ঘরটাও সাউণ্ড প্রুফ করা? কিন্তু তাহলে সকালে অ্যালার্মের আওয়াজ এল কী করে?

ছটকু অন্যমনস্কতার সঙ্গে বলল—কিন্তু মেরেও লাভ হয় না। লীনা যেমন-কে-তেমনই থেকে যায়। তেমনি কোল্ড-ব্লাডেড, ক্রুয়েল, সেলফিস, অ্যামবিশাস।

সামু সবই শুনছে। গগনের লজ্জা করছিল।

ছটকু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল—চল। অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামানো ছাড়া এখন আমার আর পথ নেই।

ছটকুর ফিয়াট গাড়িটা যখন প্রকাশ্য দিনের আলোয় পাড়ায় ঢুকছে তখন গগনের বুকটা একটু বেশী ধকধক করছিল। গলা শুকিয়ে গেছে।

ছটকু গগনের গ্যারাজ-ঘরের সামনেই গাড়িটা দাঁড় করাল। স্টিয়ারিঙে হাত রেখে গগনের দিকে ফিরে একটু হেসে বলল—দ্যাখ গগ, তুই আর আমি একসঙ্গে বিশটা লোকের মহড়া নিতে পারি। সুতরাং ঘাবড়াবি না। আমার মনে হয় না কেউ তোকে খামোখা ধরপাকড় করতে আসবে।

গগন গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বলল—তা নয়। তবে আমার লজ্জা করছে। তুই এখানে এলি কেন?

—এখান থেকেই কাজ শুরু করব বলে।

বেরোবার আগে ছটকু অনেকক্ষণ টেলিফোনে যাদবপুর থানার অফিসার-ইন-চার্জের সঙ্গে কথা বলেছে। নিজেদের প্রতিষ্ঠার জোরে ছটকু থানা-পুলিসের খাতির পায়। সকলের সঙ্গেই তার ভাল ভাবসাব।

টেলিফোনে কী কথা হয়েছে তা গগন শোনেনি। কথা বলার পর ছটকু তাকে সংক্ষেপে জানিয়েছে: *যাদবপুর থানা থেকে যেটুকু জানবার জেনে গেছি। এখন তোর কোন ভয় নেই।*

গগনের তবু ভয় যায় না।

বেলা বেশী হয়নি। দশটা বোধহয়। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদ চারদিক পোড়াচ্ছে। ছোট্ট গাড়িটা এর মধ্যেই তেতে ভ্যাপসা হয়ে গেছে।

গগনকে একটা রোদ-চশমা ধার দিয়েছে ছটকু। নিজেও একটা পরেছে। ছদ্মবেশ খুবই সামান্য। তবু হয়তো লোকের চোখ থেকে কিছুটা আড়াল করা যাবে নিজেকে।

নরেশের বাড়ির ওপরতলা থেকে শোভার প্রচণ্ড গলার শব্দ আসছে। বোধহয় সে নরেশেরই শ্রাদ্ধ করছিল—মায়ের পেটের বোন না হাতি! ঢ্যামনা কোথাকার! কার হুকুমে তুমি ওকে কোলে করে এনে এ বাড়িতে তুলেছো? বাড়ি আমার নামে। জবাবে একজন পুরুষ বোধহয় কিছু বলল।

শোভার গলা তুঙ্গে উঠে যায়—বেশ করেছি তাকে এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছি। একশবার দেবো। নির্দোষ লোকের নামে খুনের নালিশ করেছো, তোমার নরক হবে

boiRboi.net

না !···হ্যাঁ হ্যাঁ, তার সঙ্গে আমার ভাব আছে তো আছে···তোমার ভাব নেই কারো সঙ্গে ? ঢলানী মাগীটার সঙ্গে তো লোককে দেখিয়েই শোয়া বসা করো !

গাড়িটা লক করতে করতে ছটকু মৃদু হেসে চাপা গলায় বলল—অ্যানাদার লীনা।

দু'চারজন লোক তাদের লক্ষ্য করছিল। আশপাশের জানালা দিয়ে প্রচুর উঁকি-ঝুঁকিও টের পায় গগন।

ছটকুর তাড়াহুড়ো নেই। ধীরেসুস্থে সে চারদিকে তাকিয়ে দেখে। পাইপ ধরায়। তারপর বলে—চল।

—কোথায় ?

—নরেশের ঘরে। বেগমকে একটু ক্রস করা দরকার।

—বেগম ? সে এখানে থাকে না। গগন বলে।

—এখন আছে, চল।

গগনের বুক অসম্ভব কেঁপে ওঠে। পিছোনোর উপায় নেই। তবু বলল—তুই যা, আমি অপেক্ষা করি।

ছটকু ভ্রূ কুঁচকে বলে—তাতে লাভ হবে না। বেগমের সামনে তোর প্রেজেন্স্ খুব দরকার। নইলে ও শকড হবে না। বেগমের লেখা সেই চিরকুটটা কি হারিয়ে ফেলেছিস ?

গগন মনে করতে পারল না। বলল—কোথায় রেখেছি কে জানে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ছটকু বলল—এমন কিছু এসেনশিয়াল নয়। তুই পিছনে আয়, আমি আগে উঠছি।

দোতলায় নরেশের বৈঠকখানার দরজা খোলাই রয়েছে। ভিতরের কোনো ঘর থেকে শোভার গলা আসছে—সবাইকে বলব ফলির আসল বাপ তুমি। ওই নষ্ট মেয়েটার সঙ্গে তোমার শোয়া বসা।

ছটকু খুব হাসছে শুনে।

দুবার কলিংবেল বাজানো সত্ত্বেও কেউ এল না। তিনবারের বার ঝি এসে খোটকা মুখ করে কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল—কী চাইছো ?

ছটকু রোদ-চশমাটা এতক্ষণ খোলেনি। এবার খুলল। মুখটা ভয়ংকর গম্ভীর। চোখে ভীষণ ভ্রূকুটি। ছটকুর চোখ খুবই মারাত্মক। যখন রেগে যায় তখন তার দিকে তাকাতে হলে শক্ত কলজে চাই।

ঠাণ্ডা গলাতেই ছটকু নির্দ্বিধায় বলল—তোমার বাপকে চাইছি।

ঝি'টা কেমনধারা হয়ে গেল। চোখেমুখে, স্পষ্টই ভয়। কথা বলল না, কিন্তু শুকনো মুখে চেয়ে রইল।

ছটকু প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়ে বলল—যাও, গিয়ে নরেশবাবুকে ডেকে দাও।

ঝি চলে গেল। ছটকু নিঃসঙ্কোচে বৈঠকখানায় ঢুকে একটা কোচে গা এলিয়ে বসে গগনকে ডাকল—আয় গগ।

গগন খুব সংকোচের সঙ্গে ঢুকল, যেন বাঘের ডেরায় ঢুকছে। গরমে এমনিতেই তার ঘাম হচ্ছিল। এখন হঠাৎ তার সারাগায়ে ফোয়ারার মতো ঘামের স্রোত নামছে। পোশাক ভিজে যাচ্ছে, চোখে জিভে নোনতা জল ঢুকছে।

অনেকক্ষণ বাদে নরেশ এল। ভিতরে শোভার চেঁচামেচি একটু থেমেছে। গলার

boiRboi.net

স্বর শোনা যাচ্ছে এখনো, তবে বকবকানির।

নরেশের পরনের লুঙ্গিটা উঁচু করে কোমরে গোঁজা। হাঁটু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। খালি গা, চোখ লাল, চুল উসকোখুসকো—যেন এইমাত্র শ্মশান থেকে ফিরেছে।

ঘরে ঢুকেই নরেশ আচম্‌কা যেন বিদ্যুতের শক খেয়ে লাফিয়ে উঠল। বিস্ময়ে বোবা। চোখ পটপটাং করে খুলে অবিশ্বাসে তাকিয়ে আছে।

ছটকু উঠে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে বিনা ভূমিকায় নরেশের বাঁ হাতের কনুইয়ের ওপরটা লোহার হাতে চেপে ধরে বলল—আপনার সঙ্গে জরুরী কথা আছে। বসুন।

ছটকুর কণ্ঠস্বরে কিছু ভদ্রতা থাকলেও আচরণে নেই। সে নরেশকে ধীরে টেনে এনে একটা সোফায় বসিয়ে দিল।

নরেশ ঝেঁঝে উঠে বলল—হাত ধরছেন কেন ?

ছটকু হেসে বলে—লাগল বুঝি ?

নরেশ সে কথার জবাব না দিয়ে ছটকুর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল—এসব কী ব্যাপার ?

প্রশ্নটা গগনকে করা। নরেশ ছটকুকে চেনে না।

গগন জবাব দেয় না।

ছটকু কোচে এলিয়ে বসে পাইপ টানতে টানতে বলে—নরেশবাবু, গগনকে অ্যারেস্ট করতে আপনি পুলিস ডেকেছিলেন ?

নরেশ হঠাৎ বিকট গলায় চেঁচিয়ে ওঠে—একশবার ডাকব, শালার গুণ্ডার দল! ভেবেছো কি তোমরা ? বাড়িতে ঢুকে গায়ের জোর দেখানো হচ্ছে ? অ্যা ?

বলতে বলতে আচম্‌কাই নরেশ বে-হেড হয়ে লাফিয়ে উঠে একটা জয়পুরী ফুলদানী তুলে তেড়ে এল গগনের দিকে : গুণ্ডামীর আর জায়গা পাওনি ?

ছটকু হাত বাড়িয়ে নরেশের হাত টেনে ধরল এবং নিছক একটি ঝাঁকুনিতে তাকে নিস্তেজ করে আবার সোফায় বসিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলল—মেইনলি আমরা বেগমের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি, আপনার সঙ্গে নয়। তবে আপনাকেও দু'একটা জরুরী কথা বলা দরকার। সেটা পরেও হতে পারবে। এখন বেগমকে ডেকে দিন।

নরেশ যেন কিছুই বিশ্বাস করতে পারছে না। ভয়ংকর রাগী চোখে সে ছটকুকে দেখল, তারপর বলল—বেগমের সঙ্গে দেখা হবে না, আপনারা বেরিয়ে যান।

ছটকু পায়ের ওপর পা তুলে বসে বলে—বেয়াদবির সময় এটা নয়। গগন আমার বন্ধু। তাকে আপনি না-হক হ্যারাস করেছেন, পেছনে পুলিস লাগিয়েছেন। আমি আপনার সঙ্গে রসের কথা বলতে আসিনি। বেশী ত্যাদড়ামি করলে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে যাবো মেরে।

ছটকুর এই গলার স্বর গগনও চেনে না। খুবই ঠাণ্ডা গলা, কিন্তু তাতে ইস্পাতের মিশেল। যে শোনে সে জানে ছটকু প্রত্যেকটা কথাই মেপে বলছে। একটুও ভয় দেখাচ্ছে না। কিন্তু যা বলছে তাই করবে।

নরেশ এবার চোখ নামিয়ে বলল—বেগম ঘুমোচ্ছে।

ছটকু কিছু অধৈর্যের সঙ্গে বলল—তাকে তুলে দিন।

—সে অসুস্থ। তার ছেলে মারা গেছে।

—সেটা আমরা জানি। তার সঙ্গে কথা বলতেই হবে। ভিতরের দরজার পর্দা

সরিয়ে হঠাৎ শোভা ভিতরে আসে। তার চেহারাটা বড় কিম্ভূত দেখাচ্ছে। চুলগুলো পাগলীর মতো উড়োখুড়ো, মুখ ফুলে রাবণের মা, চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি।

গগনের দিকে চেয়ে বলল—আবার এসেছেন? ভাল চান তো পালান। নইলে ওই বদমাস আপনাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে। জানেন না তো, ওর এখন পুত্রশোক।

নরেশ উঠে শোভার দিকে তেড়ে যায়। গগন আটকানোর জন্য উঠতে যাচ্ছিল। ছটকু হাত বাড়িয়ে ইশারা করায় থেমে গেল।

নরেশ তেড়ে গিয়ে শোভাকে মারল না বটে, কিন্তু জাপটে ধরে হিঁচড়ে ভিতরে নিয়ে গেল। দরজাটা সপাটে বন্ধ হয়ে ছিটকিনি পড়ল ভিতর থেকে।

গগন অস্বস্তির সঙ্গে বলে—ছটকু, চল।

ছটকু না নড়ে বলে—দাঁড়া।

খুব বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। অল্প বাদেই অন্য একটা দরজার পর্দার আড়ালে একটা ফোঁফানির শব্দ উঠল, হিক্কা তোলার আওয়াজ। তীব্র হতাশার গলায় কোনো মহিলা বলে উঠলেন—সব গেল রে…!

ঠিক তার পরেই পর্দা সরিয়ে খানিকটা টলমলে পায়ে বেগম ঘরে ঢোকে। খুবই করুণ তার চেহারা। সুন্দরী বেগমকে কে যেন চোখের জল আর শোকের শুষ্কতা দিয়ে চটকে মেরেছে। সব রূপটুকু ধুয়ে তার চেহারায় বয়সের ভাঁটা ফুটে উঠেছে এখন।

বেগম তার দুখানা বিভ্রান্ত চোখে গগনকে চেয়ে দেখল। যেন অনেক কষ্টে চিনতে পেরে বলল—আমার ফলি কোথায় গেল?

ছটকু খুব নরম গলায় বলে—আপনি বসুন।

গভীর দীর্ঘশ্বাসে কেঁপে যাওয়া গলায় বেগম বলে ওঠে—হা ভগবান!

তারপর নিজের অজান্তেই বুঝি সোফায় বসে পড়ে বেগম। চোখ বুজে থাকে। চোখের পাতা ভিজিয়ে জলের ধারা নেমে আসে অঝোরে। দাঁতে দাঁত চেপে থাকে বেগম, শুধু থরথর করে তার রক্তহীন সাদা ঠোঁট কেঁপে কেঁপে ওঠে।

ছটকু বলে—ফলির মৃত্যুতে গগনের কোনো হাত ছিল না, বিশ্বাস করুন।

বেগম তার রক্তবর্ণ চোখে চাইল। প্রথমে কিছু বলল না। সামলাতে সময় নিল।

কিন্তু সামলে নিলেও সে। আঁচলে চোখ মুছল। অনেকক্ষণ শূন্য চোখে চেয়ে থেকে বলল—সেদিন……কবে যেন?

গগন বলল—পরশু।

বেগম গগনের দিকে স্থির চোখে চায়। তারপর একটু শিউরে উঠে বলে—সেদিন ফলি সন্ধ্যের পর আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। ওর ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়ছিল। বলল, গগনদা আমাকে মেরেছে। আপনি কি ওকে সত্যিই মেরেছিলেন?

গগন চোখ নামিয়ে নিয়ে বলে—হ্যাঁ। নইলে ও আমাকে মারত। ওর হাতে পিস্তল ছিল।

বেগম ঝুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে বলে—জানি। ওর কাছে পিস্তল থাকত! ইদানীং ও খুব বিপদের জীবন কাটাতো। আমি ওকে মানুষ করতে পারিনি, সে পাপের শাস্তি পেলাম গগনবাবু।

ছটকু নরম স্বরে বলে—কিন্তু ফলির মৃত্যুর পেছনকার ঘটনাটা আমাদের দরকার!

বেগম মাথা নাড়ে, বুঝেছে।

boiRboi.net

মুখটা নামিয়ে নিয়ে বলে—ফলি গগনবাবুকে মারবার জন্য প্ল্যান করেছিল। মারা মানে খুন নয়। উল্টে ও নিজেই মার খায়। সন্ধ্যেবেলা যখন আমার কাছে এল তখন ভীষণ ফুঁসছে, ওরকম রেখে যেতে ওকে আর কখনো দেখিনি।

ছটকু হঠাৎ বলে ওঠে—আপনার সঙ্গে ঝগড়া করেনি সেদিন?

বেগম মুখটা নামিয়ে রেখেই বলল—হ্যাঁ। শুধু ঝগড়া নয়, আমাকেও ও মেরে।

গগন অবাক হয়ে বলে—মেরেছে?

—আমার ওপর ওর ভয়ংকর রাগ ছিল। যতটা ভালবাসত ততটাই ঘেন্না করত আমাকে। আমার সম্পর্কে ওর কানে কে যেন কিছু খারাপ গালগল্প বলে বিষ ঢেলেছে. সেই দিন ও আমার জবাবদিহি চায়, আমি ওকে যত শান্ত করতে চাই, ও তত রেগে ওঠে। অবশেষে আমার চুলের মুঠি চেপে ধরে দেয়ালে মাথা ঠুকে দেয়, চড়-চাপড় মারে, গালাগাল করতে থাকে। হয়তো আরো মারত, পাড়ার লোক এসে ঠেকায়। তখন ও কার ওপর যেন শোধ নেবে বলে শাসিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আমি তখন এত দিশেহারা যে ওকে আটকাতে পারিনি। পারলে—

ছটকু জিজ্ঞেস করে—ঝগড়া ছাড়া আপনাদের মধ্যে আর কোনো কথাবার্তা হয়নি?

—না। সেদিন গগনবাবুর কাছে মার খেয়ে ফলি রাগে বেহেড হয়ে যায়। কেবল গগনবাবুর নামই করছিল। সেই থেকেই আমার সন্দেহ হতে থাকে—

ছটকু মাথা নেড়ে বলে—ভুল সন্দেহ বেগম দেবী।

বেগম ছটকুর দিকে স্থির-চোখে চেয়ে থাকে। দৃষ্টি স্বাভাবিক নয়। অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বলে—তাহলে ফলিকে কে মেরেছে?

—সেটা অনুমানের ব্যাপার। ছটকু গম্ভীর মুখে বলে। তারপর পাইপ ধরায়।

—অনুমানটা কী?

—তার আগে বলুন এ পাড়ায় ফলি আর কার কার কাছে যেত—

—আমি তা জানি না। আমার সঙ্গে তার বড় একটা দেখা হত না। তবে শুনেছি আমার জামাইবাবুর কাছ থেকে সে মাঝে মাঝে ধার বলে টাকা নিত। কিন্তু বাড়িতে আসত না। গদীতে গিয়ে দেখা করত।

—আর কেউ?

বেগম ভ্রূ কুঁচকে একটু ভাবে। তারপর বলে—না, আর কারো নাম কখনো বলেনি।

আচমকা ছটকু প্রশ্ন করে—আপনার স্বামী কোথায়? তিনি আসেননি?

বেগম অবাক হয়ে বলে—স্বামী? তিনি তো কাজে……মানে বাইরে গেছেন।

—তিনি ফলির মৃত্যু-সংবাদ জানেন?

—শুনেছেন।

—বাইরে কোথায় গেছেন?

—বলে যাননি।

—তাঁর কলেজের ঠিকানাটা দিতে পারেন?

বেগম একটু গম্ভীর মুখে মেঝের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে—তাঁকে এর মধ্যে না জড়ানোই ভাল। ওঁর শরীর খারাপ, তার ওপর এই ঘটনা।

ছটকু উঠে পড়ে। বলে আপনার এই শোকে কিছু বলার নেই। শধু অনুরোধ,

boiRboi.net

; গগনকে খামোখা ঝামেলায় জড়াবেন না। গগন ফলিকে মেরেছিল বটে, কিন্তু সে আত্মরক্ষার জন্য। ও খুনে নয়।

বেগম একবার গগনের দিকে তাকাল। কবে সেই ভালবাসা মরে গেছে। এখন আছে শুধু কিছু সন্দেহ আর আক্রোশ।

তবু গগন বেগমের চোখে চোখ রেখে কিছু খুঁজল কি ?

বারো

মধ্য কলকাতার বিশাল কলেজবাড়ির ভিতরে ফলির বাবা মহেন্দ্রবাবুকে খুঁজে বের করতে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ আর খোঁজখবর করতে হল।

অবশেষে ল্যাবরেটরি থেকে বেয়ারা প্রায় ধরে আনল অ্যাপ্রন পরা বুড়ো মানুষটিকে।

বাঁ চোখের চশমার কাচ ফাটা, মুখে কদিনের বিজবিজে সাদা কাঁচা দাড়ি. মোটা গোঁফ ঠোঁট ঢেকে রেখেছে। ক্ষয়া ছোট চেহারা। চোখে সন্দেহের বা কৌতূহলের দৃষ্টি নেই। একটু ভীতু ভাব। পুত্রশোক অবশ্যই তাঁকে স্পর্শ করেনি। নিজেই প্রশ্ন করলেন—আপনারা আমাকে কেন খুঁজছেন ?

—এঁকে চেনেন ? বলে ছটকু গগনকে দেখিয়ে দেয়।

মহেন্দ্র গগনকে খুব ঠাহর করে দেখে বলেন—দেখেছি। ফলিকে ব্যায়াম শেখাতো।

—ফলি মারা গেছে, জানেন ?

—জানি। মহেন্দ্রর চোখেমুখে অস্বস্তি।

—আমরা ফলির বিষয়ে কিছু জানতে চাই !

—জানার কিছু নেই। অতি বখাটে ছেলে ছিল। মরেছে, তা সে নিজেরই দোষে।

—শেষ কবে আপনার ফলির সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?

মহেন্দ্র ভেবে-টেবে বলেন—কবে যেন ! পরশুই হবে।

—কোনো কথা হয়নি ?

—যতদূর মনে পড়ে, ও খুব রেগেমেগে বাড়িতে এসেছিল। কোনোদিনই আমার সঙ্গে বনে না। ওর সঙ্গেও না, ওর মায়ের সঙ্গেও না। আমরা একটা অদ্ভুত পরিবার।

—কোনো কথা হয়নি ?

—তেমন কিছু নয়। স্বীকার করতে লজ্জা নেই. ফলি আমার ছেলে কি না তাও আমি জানি না। ওর মায়ের চরিত্র ভাল নয়।

করিডোরে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছে। আশেপাশে বহু ছেলে-ছোকরার যাতায়াত। কেউ হয়তো কথাটা শুনে ফেলতে পারে ভেবে গগন বরং সিঁটিয়ে গেল। কিন্তু মহেন্দ্রবাবু বেশ স্বাভাবিক গলাতেই বলেন—তাই ও ছেলের জন্য আমার তেমন দুঃখ নেই।

ছটকু হতাশ হয় না। আস্তে করে বলে—কিন্তু আমার এই বন্ধুকে ফলির মৃত্যুর জন্য দায়ী করা হচ্ছে। এ নির্দোষ।

মহেন্দ্র ফাটা কাচের চশমা দিয়ে গগনের দিকে তাকিয়ে বললেন—খুব নির্দোষ কি ?

boiRboi.net

ছটকু দৃঢ়স্বরে বলল—অন্ততঃ খুনের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই।

—তা হবে। সে-সব নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। মহেন্দ্র বললেন।

সংসারে বিশ্বাসঘাতকতা, ব্যর্থতা আর মূল্যেহীনতায় ভুগে ভুগে মহেন্দ্র এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছেন যে, আর কোনো ঘটনাকেই তেমন আমল দেন না। তাঁর মন এখন শক্ত হয়ে গেছে। দুনিয়ায় আর কারো কাছ থেকেই কিছু চাওয়ার বা পাওয়ার নেই।

ছটকু বলল—আমরা আপনার সাহায্য চাই, করবেন?

মহেন্দ্র একটু হাসলেন। সামনের চার-পাঁচটা দাঁত নেই। হাসিটা ভৌতিক এবং শ্লেষে ভরা। বললেন—আমার কিছু করার নেই। ফলির মা শাস্তি পাচ্ছে, একমাত্র সেটাই সান্ত্বনা! প্রায়শ্চিত্ত যে এখনো করতে হয়, চন্দ্র-সূর্য যে বৃথা ওঠে না, সেটা জেনে বড় ভাল লাগছে।

ছটকু মহেন্দ্রবাবুর কাঁধ হাত বাড়িয়ে ধরে খুব নরম স্বরে বলে—আপনার স্ত্রী সম্পর্কে সবই আমরা জানি। দরকার হলে আমার এই বন্ধু সাক্ষ্য দেবে, আপনার স্ত্রীর চরিত্র ভাল নয়।

মানুষের দুর্বলতা কোথায় কোন্ সুপ্ত মনের কোণে থাকে কে জানে! কিন্তু ছটকু ঠিক জায়গায় খোঁচাটা মেরেছে। মহেন্দ্রর চোখ হঠাৎ উৎসাহে চিকমিকিয়ে ওঠে। দু পা হেঁটে মহেন্দ্র বলে—এখানে নয়। চলুন, একটা ঘর আছে।

ল্যাবরেটরির পাশেই একটা ছোট বসবার ঘর। ফাঁকা। সেখানে অনেক কটা কাঠের চেয়ার পড়ে আছে। তাতে ধুলোর আস্তরণ।

মহেন্দ্র গোটাতিনেক চেয়ার একটা ঝাড়নে পরিষ্কার করলেন। সবাই বসলে মহেন্দ্র বললেন—বেগমকে আমি জানি। তাকে আমি ভালবেসে বিয়ে করি! তবে আমি শরীরের দিক থেকে খুব পটু ছিলাম না। বেগম বদমাইসী শুরু করল বিয়ের দু-তিন বছরের মধ্যে। সবই টের পেতাম, তবে তাকে রেড-হ্যাণ্ডেড ধরতে পারিনি কখনো।

—চেষ্টা করেছিলেন? ছটকু স্বাভাবিক কৌতূহল দেখায় যেন।

—না। ভয় করত। মনে হত, রেড-হ্যাণ্ডেড ধরলে মুখোমুখি ওর লাভারের সঙ্গে লড়াই লেগে যেতে পারে। তাছাড়া চক্ষুলজ্জা।

—অথচ ধরতে চান?

—খুব চাই। কিন্তু ধরলেই বা কী করব? থানা-পুলিস আদালতে যেতে পারব না। তাহলে লোকলজ্জা। নিজের হাতে শাস্তি দিতে পারব না। কারণ শক্তি নেই। এমন কি দুটো কথা যে শোনাবো, তাও বেগমের সঙ্গে গলার জোরে পেরে উঠব না। তাই ধরতে চাইলেও সেটা চাওয়াই থেকে যাবে।

—এতকাল ধরে ব্যাপারটা সহ্য করলেন কী করে?

—মানুষ সব পারে, পারতে হয়।

—স্ত্রীকে তার অপরাধের জন্য শাস্তি দিতে চান না?

মহেন্দ্র হেসে বললেন—শাস্তি ভগবান দিচ্ছেন।

—ভগবানের দেওয়া শাস্তিতে কি মানুষের মন ভরে?

—আমার মতো দুর্বলের সেইটেই একমাত্র ভরসা।

ছটকু হেসে ফেলে। তারপর পাইপ ধরিয়ে বলে—মহেন্দ্রবাবু, আমি নিজে ভাল

boiRboi.net

বক্সার। গায়ের জোরে এখনো যে কোনো পালোয়ানের সঙ্গে পাল্লা টানতে পারি। কিন্তু নিজের বউয়ের সঙ্গে আমি আজও এ'টে উঠতে পারিনি। আমি আপনার মতোই দুর্বল। কিন্তু সেটা মনের দুর্বলতা, শরীরের নয়। কাজেই আপনি শরীরের দিক দিয়ে দুর্বল বলেই নিজেকে দুর্বল ভাববেন না। পৃথিবীর ইতিহাসে গায়ের জোরের অভাবে প্রকৃত সাহসীদের কেউ দুর্বল ভাবেনি।

মহেন্দ্র যেন বহুকাল পর এক ভরসার কথা পেয়ে উৎসাহের সঙ্গে বললেন—কথাটা খুব ঠিক। আমার মনের জোর কম নেই। কিন্তু বেগমের মতো মেয়েছেলের সঙ্গে লাগতে যাওয়া মানেই ফালতু ঝামেলায় জড়ানো। নিজেকে ছোট করতে ইচ্ছে হয়নি।

—কিন্তু বরাবর নিজেকে ছোট ভেবেছেন!

মহেন্দ্র প্রসন্ন হেসেই বললেন—কী করা ঠিক হত বলুন তো।

—চাবকানো। পাইপে টান দিয়ে ধীরস্বরে ছটকু বলে।

—ওটা পারতাম না।

—এবার পারবেন।

মহেন্দ্র গগনের দিকে চেয়ে বললেন—আপনি কী সাক্ষী দেবেন?

গগনের কান মুখ গরম হয়ে ওঠে। সে চোখ ফিরিয়ে নেয়। ছটকুর সব বেহায়া কাণ্ড!

ছটকুই বলে—আপনার স্ত্রীর সঙ্গে এই গগনের ফিজিক্যাল রিলেশন ছিল।

গগন ভেবেছিল মহেন্দ্র এ কথা শুনে ফেটে পড়বে।

কিন্তু তার বদলে মহেন্দ্র চেয়ার আর একটু কাছে টেনে এনে বিগলিতভাবে বললেন—তাহলে এই প্রথম আমি একটা প্রমাণ পাচ্ছি। একটু বলুন তো এক্সপিরিয়েন্সের কথাটা!

গগন লজ্জা ভুলে ভীষণ অবাক হয়।

ছটকু সম্পূর্ণ নির্বিকার ভাবে বলে—ও কী বলবে? ওর তো দায়িত্ব ছিল না। চেহারাটা ভাল বলে আপনার স্ত্রীই ওকে পিক-আপ করে।

মহেন্দ্র গগনের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলে—হ্যাঁ, চেহারাটা ভাল। আপনারা দুজনেই ব্যায়াম করেন, না?

—করি! ছটকু জবাব দেয়।

—আমারও খুব শখ ছিল। হয়নি। অল্প বয়সেই সংসারে ঢুকে গেলাম আমার স্ত্রী কী রকম করত আপনার সঙ্গে? গগনকে জিজ্ঞেস করেন মহেন্দ্র।

ছটকু গগনকে একটা ঠেলা দিয়ে বলে—বল না।

গগন টের পায়, মহেন্দ্র খুবই কুৎসিত মনোরোগে ভুগছেন। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দেহ-সম্বন্ধ নেই, ঘৃণা আর রাগের সম্পর্ক। কিন্তু স্ত্রীর কাছে তাঁর অবদমিত শারীরিক ক্ষুধা মেটেনি বলেই তা আজ বিকৃত ভাবে তৃপ্তি খুঁজছে, স্ত্রীর প্রেমিকের কাছ থেকে তিনি সেই কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির বিবরণ চান।

ছটকু আবার ঠেলা দিয়ে চোখের ইশারা করে বলে—বল না।

মহেন্দ্রও বলে ওঠেন—ও কি খুবই কামুক? বাঘিনীর মতো?

গগন অস্পষ্ট স্বরে বলে—হ্যাঁ।

—কামড়ে দিত আপনাকে? মারত?

boiRboi.net

—হ্যাঁ।

ছুটকু বাধা দিয়ে বলে—আর সব পরে শুনবেন মহেন্দ্রবাবু, আগে কাজের কথাটা হয়ে যাক। সেদিন ফলির সঙ্গে আপনার কী কথা হয়?

মহেন্দ্রকে খুবই উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। তবে সে উত্তেজনা আনন্দের। চোখ চকচক করছে, মুখটা উজ্জ্বল, জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিলেন। উঠে গিয়ে ঘরের পাখাটা চালু করলেন। চারিদিকে ধুলো উড়তে লাগল বাতাসে।

মহেন্দ্র মুখোমুখি বসে বললেন—ফলি কোনোদিনই আমাকে পাত্তা দিত না। বুঝতেই পারছেন, মা যদি সম্মান না করে তবে ছেলেমেয়েরাও কোনোদিন বাবাকে সম্মান করতে শেখে না। বেগম কোনোদিন আমাকে মানুষ বলেই মনে করেনি কিনা! তবে ফলি যখন খুব ছোট ছিল, তখন কিন্তু আমাকে ভীষণ ভালবাসত।

—আপনি কি বরাবরই জানতেন যে, ফলি আপনার ছেলে নয়?

মহেন্দ্র ফাটা কাচের ভিতর দিয়ে ভৌতিক দৃষ্টিক্ষেপ করে বললেন—ঐ একটা বিষয়ে আমি আজও ডেফিনিট নই। ফলি যখন জন্মায় তখনো ওর মার সঙ্গে আমার শারীরিক সম্পর্ক ছিল। কাজেই কী করে বলি ও আমারই ছেলে নয়? তবে ওর চেহারা স্বভাব কিছুই আমার মতো ছিল না।

—তারপর?

—বিয়ের চার-পাঁচ বছর পর ফলি জন্মায়। তখন বেগম খুব বেলেল্লাপনা করে বেড়াচ্ছে। আমি তখন ঝিমিয়ে গেছি। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তখন খুব খারাপ। ফলি সে সময়ে জন্মায়। তার আগে অবশ্য আমি গোপনে ডাক্তার দেখাই। ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করে বলেছিলেন যে, সন্তানের বাপ হওয়ার ক্ষমতা আমার আছে। তাই ফলি জন্মানোর পর আমি তাকে নিজের ছেলে মনে করে খুব ভালবাসতাম। পরে ও বড় হলে বেগম ওর মন বিষাক্ত করে দেয়। কিন্তু তার ফলে বেগমেরও কিছু লাভ হয়নি। ফলি ওকেও দেখতে পারত না। এক ছাদের তলায় আমরা তিন শত্রু বসবাস করতাম।

—ফলির সঙ্গে আপনার ঝগড়া হত?

—না, কারো সঙ্গেই আমার মুখোমুখি ঝগড়া ছিল না। তবে মানুষ মানুষকে অপছন্দ করলে সেটা মুখে বলার দরকার হয় না, এমনিতেই বোঝা যায়।

—তা ঠিক।

—তবে ফলির সঙ্গে আমার কখনো-সখনো কথা হত। ওর গর্ভধারিণীর সঙ্গে হতই না।

—সেদিন কী কথা হল?

—আমি সন্ধ্যের বেশ কিছু পরে বাড়ি ফিরে দেখি, বাড়িতে অনেক লোক জড়ো হয়েছে, চেঁচামেচি চলছে। পাড়া-প্রতিবেশীর কাছেই শুনলাম ফলি তার মাকে খুব মেরেছে। শুনে ভারী আনন্দ হল। এর আগেও ফলি কয়েকবার ওর মাকে মারধর করেছে। বড় হয়ে মায়ের গুণের কথা শুনেছে তো! ছেলে হয়ে মায়ের বদমাইসী সহ্য করে কী করে? সে যাই হোক, গোলমাল দেখে আমি আর বাড়ির মধ্যে না ঢুকে বেরিয়ে এসে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। কিছু বাদে দেখি ফলি খুব জোরে হেঁটে আসছে। ওর মুখ-চোখ খুনীর মতো। কী যেন হল আমার, ওকে ডাকলাম। ও থমকে দাঁড়াল। প্রথমে ভাবলাম, বুঝি আমাকেও মারে। কিন্তু ওসব করল না।

boiRboi.net

খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল, নিজের বউকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারো না? আমি তার জবাব দিলাম না। মনে মনে জানি, আমাকে মারতে হবে না। মা-ব্যাটায় নিজেরাই খেয়োখেয়ি করে মরবে একদিন! যাকগে, ফলি আমাকে বলল, সিংহীদের বাগানে আমার সঙ্গে রাত আটটা নাগাদ দেখা কোরো! তোমার সঙ্গে কথা আছে।

—গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। তবে রাত আটটার অনেক আগে।

বলে মহেন্দ্র ফাটা কাচের ভিতর দিয়ে নির্বিকার ভাবে তাকিয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁর সেই দৃষ্টি এমনিতে যতই নির্বিকার মনে হোক, ছটকু টের পেল মহেন্দ্র কিছু একটা বলতে চান। তাই সে নরম স্বরে বলল—কী দেখলেন সেখানে?

—ফলির সঙ্গে দেখা হয়নি। একটু আগে আগে পৌঁছে ভাবলাম, জায়গাটা ঘুরে দেখি। বুড়ো সিংহীর অনেক টাকা ছিল। কৃপণ লোক ছিলেন। আমার ধারণা, সিংহীবাড়ির কোনো গুপ্ত জায়গায় বিস্তর লুকোনো টাকাকড়ি বা সোনাদানা আছে। আমার আবার ছেলেবেলা থেকেই গুপ্তধনের শখ। একটা টর্চ ছিল। ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। ঘরের দরজায় তালা ছিল। তবে একটা জানালার পাল্লা দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। আমি সেই পাল্লা খুলে দেখি, লোহার গরাদের একটা শিক ভাঙা। ঢোকা যায় দেখে ঢুকেই পড়লাম। ঘরে ঢুকে দেখি, ধুলোটুলো কিছু নেই। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘরদোর। এদিক ওদিক ঘুরে একটা ভিতরদিকের ঘরে গিয়ে দেখি, খাটিয়ায় বিছানা পাতা রয়েছে। শতরঞ্চী, মোমবাতি, তাস, সিগারেটের অনেক প্যাকেট আর খালি মদের বোতল। দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। নিশ্চয়ই গুণ্ডা-বদমাসের আস্তানা। ভয় খেয়েও অবশ্য পালাইনি, ভাল করে চারধারের সব কিছু দেখে নিচ্ছিলাম। তারপর হঠাৎ বাইরে কোথায় চাপা গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে দোতলার সিঁড়ির তলায় গা-ঢাকা দিই। বেশীক্ষণ নয়, একটু বাদেই ফলি আর কয়েকজন লোকের গলা পেলাম। খুব ঝগড়ার গলায় কথা হচ্ছিল। ফলি চিরকালের ডাকাবুকো। শুনলাম সে বলছে—গগনকে আজই খতম করব। তারপর তোদেরও ব্যবস্থা হবে। আমি তাদের কাউকেই দেখতে পাইনি। শুধু গলা শুনেছি।

—কোনো স্বর চেনা মনে হয়নি?

—না। ফলির গলা ছাড়া আর কারো গলা চিনতে পারিনি। তবে একজনের গলা খুব মোটা। যেন মাইক লাগিয়ে কথা বলছে। সে ফলিকে বলল—গগন তোর মার সঙ্গে লটঘট করেছে, তাতে আমাদের কি? আমরা খুনখারাবির মধ্যে নেই। একজন বুড়ো মানুষের গলাও পেয়েছিলাম বলে মনে হয়। তবে সে যে কী বলেছিল তা ধরতে পারিনি।

—আর কিছু?

মহেন্দ্র মাথা নেড়ে বলেন—না, কথাবার্তা বলতে বলতে ওরা বেরিয়ে গেল। তারপর আমি আর সেখানে থাকবার সাহস পাইনি।

—ফলি আপনাকে কী বলতে চেয়েছিল তা আন্দাজ করতে পারেন? নিভন্ত পাইপে আবার আগুন দিয়ে ছটকু বলে।

—না। আপনাদের সঙ্গে পরে আবার কথা হতে পারে। এখন আমার কাজ আছে। বলে মহেন্দ্র উঠে পড়লেন।

boiRboi.net

ছটকু হঠাৎ জিজ্ঞেস করে—ফলির জন্য আপনার কোনো শোক নেই ?

মহেন্দ্র মাথা নেড়ে বলেন—থাকার কথাও নয়। একে সে আমার ছেলে কিনা তাই সন্দেহের বিষয় তাছাড়া অতি বদমাস ছেলে।

তেরো

কী হয়েছিল তা কেউ বলতে পারবে না।

সন্তুর হাতে-মুখে রক্ত চটচট করছে। মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা। গোঙাতে গোঙাতে সে কয়েকবার জ্ঞান ফিরে পেয়ে আবার ব্যথায় অজ্ঞান হয়ে গেছে।

ওদিকে কালু নট নড়ন-চড়ন হয়ে পড়ে আছে ঘাসের ওপর।

সিংহীদের নির্জন বাগান। এখান থেকে গলা ফাটিয়ে চেঁচালেও কেউ শুনতে পায় না। সন্তু যখন শেষবার জ্ঞান ফিরে পেল তখন তার শরীর এত দুর্বল যে, বাগানটা হেঁটে পার হয়ে বাড়ি ফেরার কথা ভাবাই যায় না। চোখে সে সব কিছু সাদা দেখছে। বমি আসছে বুক গুলিয়ে। ওঠার ক্ষমতা নেই। হাঁফ ধরে যাচ্ছে শুধু টানার পরিশ্রমে।

হামাগুড়ি দিয়ে সে কোনোক্রমে বসে। তারপর বহুদিন বাদে তার চোখ দিয়ে হু-হু করে কান্নার জল নেমে আসে।

আর সেই কান্নার আবেগে আর একবার সে জ্ঞান হারায়।

জ্ঞান ফেরে আবার। তাকিয়ে দেখে সে একটা ঘরে শুয়ে আছে। তার মাথা-মুখ ভেজা।

চোখ খোলার পরই সে তার বাবাকে দেখতে পেল। দাড়িওলা সেই ভয়ংকর মুখ, তীক্ষ্ন অন্তর্ভেদী চোখের দৃষ্টি। দয়ামায়া রস-কষহীন এক মানুষ এই নানক চৌধুরী।

ঠাণ্ডা গলায় বাবা জিজ্ঞেস করলেন—কালুকে মেরেছো।

এ কথার জবাব সন্তুর মাথায় আসে না। কিন্তু খুব আবছা হলেও তার মনে পড়ে, কালুকে মারবার সুযোগ সে পায়নি। ছুরি নিয়ে ধেয়ে যাওয়ার সময়ে কালুর ইঁটের ঘায়ে সে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। তারপরও আবছা মনে পড়ে, কালু ছুটে এসে ইঁটটা তুলে তার মুখে মাথায় বার বার মেরেছে। তারপরও যদি সে কালুকে মেরে থাকে, তবে তা সজ্ঞানে নয়।

সন্তু বলল—মনে নেই।

নানক গম্ভীর হয়ে বলেন—কালুর পেটে আর বুকে ছুরির জখম। কাজটা ভাল করোনি।

এক ভয়ংকর আতঙ্কে সন্তু চোখ বুজল। খানিক বাদে আবার চোখ খুলল! সে শুয়ে আছে সিংহীদের বাড়ীতে। এই ঘরেই একদা তাকে নীলমাধব মেরেছিল। এ বাড়িতেই সে একদিন গুন্ডা বেড়ালকে ফাঁসি দিতে এসে এক রহস্যময় অচেনা লোকের হাতে মার খায়।

সন্তু ডাকল—বাবা!

তার গলাটা কেঁপে যায়।

নানক সামান্য ঝুঁকে বলেন—কী ?

—এ বাড়িতে কে থাকে ?

boiRboi.net

—কে থাকবে? নানক অবাক হয়ে বলেন—কেউ থাকে না।

সন্তু অত্যন্ত দুর্বল বোধ করে। তেষ্টায় গলা শুকনো। জিভে ঠোঁট চেটে নিয়ে সে বলে—কেউ থাকে। নিশ্চয়ই থাকে। একবার কে যেন এখানে আমার মাথায় পিছন থেকে লাঠি মেরেছিল।

নানক ঘটনাটা জানেন। চুপ করে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর বললেন—জানি না।

সন্তু তার বাবার দিকে তাকায়। বাবার পাঞ্জাবির হাতায় রক্ত লেগে আছে। দাড়ির ডগাতেও তাই। তাকে বাগান থেকে তুলে আনবার সময় বোধহয় লেগেছে। তবু সন্তু তার বাবার দিকে চেয়ে থাকে। তার মনে নানা কথা উঁকি মারে।

সন্তু হঠাৎ বলল—আমি কালুকে মারিনি।

—তুমি ছাড়া কে?

—তা জানি না। তবে আমি নই।

নানক চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেন—সে কথা এখন ভাববার দরকার নেই। ঘুমোও।

—আমি বাড়ি যাবো।

—একটু পরে। এখন তোমাকে নিতে গেলে আরও ব্লিডিং হতে পারে।

সন্তু তার বাবার দিকে স্থিরচোখে চেয়ে বলে—মার কাছে যাবো। আমাকে এখানে রেখেছেন কেন?

নানক গম্ভীর হয়ে বললেন—আমি সময়মতো এসে না পড়লে এতক্ষণ তুমি বাগানেই পড়ে থাকতে।

সন্তু উঠবার চেষ্টা করে বলে—কালু কি এখনো বাগানেই পড়ে আছে?

নানক ঠাণ্ডা গলায় বলেন—ও বোধ হয় বেঁচে নেই।

—কিন্তু আমি ওকে মারিনি। ও একটা মার্ডার কেস-এর ভাইটাল আই-উইটনেস।

এসব কথা সন্তু ডিটেকটিভ বই পড়ে শিখেছে। সে জানে কালু মরে গেলে ফলির খুনের কিনারা হবে না।

নানক তার বুকে হাতের চাপ দিয়ে ফের শুইয়ে দিলেন। একটু কড়া গলায় বললেন—তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। শোনো, কালুর সঙ্গে যে তোমার আদৌ দেখা হয়েছে তা আর কাউকে বলতে যেও না।

—কেন?

নানক বিরক্ত হয়ে বলেন—তোমার ভালর জন্যই বলছি। এইটুকু বয়সেই তুমি সব রকম অন্যায় করেছো। তুমি ইনকারিজিব্‌ল। কিন্তু তবু আমি চাই না, পুলিস তোমাকে নিয়ে ফাঁসিতে ঝোলাক।

—কিন্তু কালুকে আমি মারিনি।

—সেটা আমি বিশ্বাস করি না, পুলিসও করবে না। কাজেই বেআদবি করে লাভ নেই। যা বলছি শোনো।

সন্তু আবার আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। অবাক হয়ে সে তার বাবার দিকে চেয়ে থাকে।

নানক বললেন—তুমি ছাড়া কেউ কালুকে মারেনি।

boiRboi.net

—আমি নই। সন্তু গোঁ ধরে বলে।

—তুমিই। আমি ভাবছি তোমাকে বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দেবো। এখানে থাকা তোমার ঠিক হবে না।

সন্তু চুপ করে থাকে। কিন্তু তার মন নিশ্চুপ নয়। সেখানে অনেক কথার বুদ্বুদ উঠছে। সে খুব নতুন একরকম চোখে তার বাবার দিকে তাকায়। তারপর এত ব্যথা আর যন্ত্রণার মধ্যেও ক্ষীণ একটু হাসে।

গগন আর ছটকু যখন সিংহীদের বাড়িতে ঢুকল তখন বিকেল যাই-যাই। এর আগে তারা আর একটা মস্ত কাজ সেরে এসেছে। মৃত্যুপথের যাত্রী কালুকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছে।

কালুর জ্ঞান ফেরেনি। ফেরার সম্ভাবনাও খুব কম। অক্সিজেন চলছে। ঐ অবস্থাতেই ডাক্তাররা তার ওপর অপারেশন চালিয়েছে। জানা গেছে তার ফুসফুস ফুটো হয়েছে, পেটের দুটো নাড়ী কাটা। বাঁচা মরার সম্ভাবনা পঞ্চাশ পঞ্চাশ।

ছটকু পুলিসকে ঘটনাটা ফোনে জানিয়ে দিল। তারপর গগনকে নিয়ে বিকেলের দিকে সোজা আবার গাড়ি চালিয়ে সিংহীদের পোড়ো বাড়িতে!

ছটকু জানে। জেনে গেছে।

সদর দরজায় তালা ছিল, যেমন থাকে। ছটকু একটু চারদিক ঘুরে দেখল। পিছনের বাথরুমে মেথরের দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল।

নিঃশব্দে ভিতরে ঢোকে ছটকু। সঙ্গে গগন।

ভিতরে অন্ধকার জমেছে। এখানে সেখানে কিছু পুরোনো আধন্যাংটো মেয়েমানুষের পাথুরে মূর্তি। শেষ রোদের কয়েকটা কাটা ছেঁড়া রশ্মি পড়েছে হেথায় হোথায়।

বেড়ালের পায়ে এগোয় ছটকু। এ ঘর থেকে সে ঘর।

অবশেষে ঘরটা খুঁজে পায় এবং চৌকাঠের বাইরে চুপ করে অপেক্ষা করতে থাকে।

ভিতরে সন্তু ক্ষীণ একটু ব্যথার শব্দ করে বলে—আমি বাড়ি যাবো বাবা।

—যাবে। সময় হলেই যাবে।

ছটকু সামান্য গলাখাঁকারি দেয়।

অন্ধকার ঘরে নানকের ছায়ামূর্তি ভীষণ চমকে যায়।

ছটকু ঘরে ঢোকে। মাথা নেড়ে বলে—কাজটা ভাল হয়নি নানকবাবু।

নানক অন্ধকারে চেয়ে থাকেন।

ছটকু গগনকে ডেকে বলে—তুই সন্তুকে পাঁজাকোলে তুলে নিয়ে যা। ওকে এক্ষুনি ডাক্তার দেখানো দরকার।

গগন ঘরে ঢোকে। গরিলার মতো দুই হাতে সন্তুকে বুকে তুলে নেয়। নিজের ছাত্রদের প্রতি তার ভালবাসার সীমা নেই।

নানক কী একটু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন।

গগন সন্তুকে নিয়ে চলে গেলে ছটকু পাইপ ধরায়। তারপর নানকের দিকে চেয়ে বলে—আমি সবই জানি। কালু মরেনি।

নানক কথা বললেন না, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

ছটকু বলল—কিছু বলবেন?

boiRboi.net

নানক খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন—আমার ছেলেটা মানুষ হল না।
—আমরা অনেকেই তা হইনি। কালুকে কে মারল নানকবাবু।
—বদমাস এবং পাজিদের মারাই উচিত।
—কিন্তু সে কাজ আপনি নিজের হাতে করতে গেলেন কেন ?
নানক আস্তে করে বললেন—সন্তুর জন্য। ভেবেছিলাম সন্তুকে চিরকাল একটা খুনের সঙ্গে জড়িয়ে রাখব। সেই ভয়ে ও ভাল হয়ে যাবে।
—নিজের ছেলের স্বার্থে আর একটা ছেলেকে মারতে হয় ?
—মাঝে মাঝে হয়।
ছটকু পাইপ টানল খানিকক্ষণ। তারপর বলল—কালুকে টাকাটা কে দিয়েছিল ?
—আমি। ভেবেছিলাম, কালুকে হাত করে গগনকে ফাঁসাবো। ওর ব্যায়ামাগারটা তুলে দেওয়া দরকার। সেখান থেকে গুণ্ডা বদমাসের সৃষ্টি হচ্ছে।
ছটকু হেসে বলে—আপনি সমাজের ভাল চান, ছেলের ভাল চান, কিন্তু আপনার পদ্ধতিটা কিছু অদ্ভুত।
—বোধ হয়। শান্তস্বরেই নানক বলেন।
ছটকু আবার হেসে বলে—আর ফলির ব্যাপারটা ?
—জটিল নয়। ওকে যে মেরেছে সে অন্যায় করেনি।
—কিন্তু কে মেরেছে ?
নানককে অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু গলার স্বরে ঝাঁঝ ফুটল বললেন—আপনি কে ?
—আমি গগনের বন্ধু। গগনকে খুনের মামলা থেকে বাঁচাতে চাই।
—ও। তা বাঁচবে। গগন খুন করেনি।
—সেটা জানি। করল কে ?
—আমিই করিয়েছি। ফলি এ পাড়ার ছেলেদের নষ্ট করছিল। ড্রাগের নেশা ছড়িয়ে দিচ্ছিল। তা ছাড়া আমার প্রতিবেশী নরেশ মজুমদারের বাড়িতে থাকার সময়ে সে এক কুমারীর সর্বনাশ করে। নানক একটু থেমে বললেন—আমি সমাজের ভাল চাই। রাষ্ট্র যা করছে না তা আমাকেই করতে হবে।
ছটকু মাথা নেড়ে বলে—বুঝলাম।
—বুঝলে ভাল !
ছটকু মাথা নেড়ে বলে—কিন্তু যে সব গুণ্ডাকে টাকা খাইয়ে আপনি ফলিকে মারার কাজে লাগিয়েছিলেন তারাই কি ভাল ? তাদের অবস্থা কি হবে ?
—তারাও মরবে।
—কী করে ?
—তারা আমার টাকা খায়। এ বাড়িতে তাদের আড্ডা আমি মেইনটেন করি। একে একে সবাই যাবে। দুনিয়ায় খারাপ, লোচ্চা, বদমাস একটাকেও বাঁচিয়ে রাখব না।
ছটকু নিঃশব্দে বসে রইল। মনটা দুঃখে ভরা।
বাইরে ক্ষীণ পুলিসের বুটের আওয়াজ শুনল সে।
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছটকু উঠে দাঁড়ায়।

সমাপ্ত

boiRboi.net